কার্ত্তিক
প্রবাসী
১৩৭৩

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭৩

'THE PRABASI', 'THE MODERN REVIEW

77/2/1 Dharamtala Street,

Calcutta-13

Phone : 24-5520

Please send :

All correspondence, M.O.s, Advt. orders etc., to the above address.

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭৩

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

'THE PRABASI', 'THE MODERN REVIEW'

77/2/1 Dharamtala Street,

Calcutta-13

Phone : 24-5520

Please send :

All correspondence, M.O.s, Advt. orders etc., to the above address.

এক্সক্লুসিভ (৭৬) ৩২.৯৫
পুরুষের পদমর্যাদা
অটুট রাখে
বাটার জুতো
Bata
প্লেজার ২৮.৯৫

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭৩

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭৩

'THE PRABASI', 'THE MODERN REVIEW'
77/2/1 Dharamtala Street,
Calcutta-13
Phone : 24-5520

Please send :
All correspondence, M.O.s, Advt. orders etc., to the above address.

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭৩

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭৩

'THE PRABASI', 'THE MODERN REVIEW

77/2/1 Dharamtala Street,

Calcutta-13

Phone : 24-5520

Please send :
All correspondence, M.O.s, Advt. orders etc., to the above address.

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭৩

অমানিশার অর্ঘ্য

অমানিশার অর্ঘ্য

শিল্পী : শ্রীসুধীর খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৭৩

প্রথম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাকিস্তানের জন্মকথা

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কলিকাতায় ব্রিটিশের শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ঘটাইবার বিশেষজ্ঞ গুণ্ডাগণ চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিতেছে। অন্যান্য ছোটবড় সহরেও সাধারণকে উস্কাইবার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চলিতেছে। মুসলমানগণ কোথায় কোথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে ইংরেজ লেখকগণ মহা ব্যস্ত। ক্লীট ষ্ট্রীটে এক উদ্ নবিশ ইংরেজ লেখক পাকিস্তান কথাটির উদ্ভাবনা করিয়া সর্ব্বত্র সেই কথাটি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতায় হঠাৎ একটা দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। আক্রমণ করিল রাজাবাজারের গুণ্ডারা একটা পোষ্ট অফিসের গাড়ির উপর। যতটা মনে পড়ে ড্রাইভারের প্রাণ গেল। ট্রামে-বাসে দুই-চারজন জখম হইল। অশ্বারোহী পুলিশ রাজাবাজারে আসিয়া দাঙ্গা দমন করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাদিগকে মুসলমান গুণ্ডাগণ লাঠির মাথায় মশাল জ্বালাইয়া আক্রমণ করিল। দুই-চারিজন ঘোড়া হইতে পড়িয়া আহত হইল। প্রবাসীর ছাপাখানা ও দফ্ তর সেই সময় ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে; অর্থাৎ রাজাবাজারের খুবই নিকটে। লালবাজারে টেলিফোন করিয়া প্রবাসীর প্রধান কর্ম্মচারী পুলিশ কমিশনারকে ঘটনার কথা বলিলেন ও আহত পুলিশদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। একজন ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার কিছুক্ষণ পরে আসিয়া পুলিশদিগের ব্যবস্থা করিলেন।

সেই দিন বিকাল হইতে বাঙ্গালীদিগের উপর মুসলমান গুণ্ডার দল প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিল। ইহার পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা অপর জাতীয় লোকেদের মধ্যেই হইত। বাঙ্গালীরা নিরপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্ত্তক হইল সুরাওয়ার্দ্দি প্রমুখ মুসলমান প্রাধান্যের স্থাপনাকাঙ্ক্ষী দুর্ব্বৃত্তগণ। তাহাদিগের চেষ্টা ছিল বড়বাজার হইতে পেশাওরী গুণ্ডা আনাইয়া রাজাবাজারের অপেক্ষাকৃত হীনবল গুণ্ডাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিবার। পুলিশ তখনও মুসলমান গুণ্ডাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কারণ ঐ গুণ্ডাগণ পুলিশ ও ডাক বিভাগের লোকেদের উপর আক্রমণ করিয়া দাঙ্গা আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাতে খুব ফল হইতেছিল না। রাজাবাজারের নিকটে ঐ সকল আমদানি-করা পেশাওরী গুণ্ডাগণ খুন-খারাবি আরম্ভ করিল ও প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য হইল বাঙ্গালী বাড়ীগুলি। মানিকতলার বাজার লুট চেষ্টা হইল কিন্তু মৎস্য বিক্রেতাদিগের বঁটির আঘাতে গুণ্ডাগণ বিশেষ সক্ষম হইল না। অতঃপর একটা বড় রকম আক্রমণ হইল কিন্তু বাঙ্গালী পাড়ার যুবকগণ বন্দুক ব্যবহার করিয়া আক্রমণ

ব্যর্থ করিয়া দিল। এই দাঙ্গা থামিয়া থামিয়া প্রায় তিন-চার মাস চলে এবং সুরাওয়ার্দ্দির দলের গুণ্ডাগণ বাঙ্গালী যুবকদিগের নিকট বিধ্বস্ত হইয়া; প্রভু ব্রিটিশদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা বিশেষ করিয়া আরম্ভ করে। এই সময় হইতে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপন চেষ্টা প্রবলতর হয় এবং যে সকল মুসলমান দেশদ্রোহিতাকে লজ্জাকর মনে করিত না, তাহারা ব্রিটিশের সহিত ভিতরে ভিতরে মিলিতভাবে ব্যবস্থা করে যে তাহাদিগকে বাংলার রাজত্ব দিয়া দিলে তাহারা ব্রিটিশের দাসত্ব মানিয়া চলিবে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হিন্দু, মুসলমান ও অপরাপর লোকেদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য জনশক্তি সংগঠন করিবে। পরে যখন বাংলায় নাজিমুদ্দিন, সুরাওয়ার্দ্দি প্রভৃতির রাজত্ব স্থাপিত হয়, তখন ব্রিটিশের শক্তি এই দেশে প্রবল হইয়া উঠে। মহাযুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বোস যদি ভারতীয় সকল জাতীয় সৈন্যদিগকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে উদ্বুদ্ধ না করিতেন তাহা হইলে মুসলিম লীগ সারা ভারতে ব্রিটিশের আড়ালে থাকিয়া নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিত মনে হয়। অর্থাৎ মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান গঠন পন্থা অনুসরণকারী মুসলমানগণ ব্রিটিশেরই ষড়যন্ত্রের ফলে দলবদ্ধভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, যখন ব্রিটিশ দেখিল যে ভারতের সকল জাতিই মিলিতভাবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে, তখনই তাহারা একটা পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া স্বাধীন ভারতের প্রগতি গতিহীন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হয়। যুদ্ধের পরে সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার কারণও ব্রিটিশের পাপ প্রচেষ্টার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সারা বাংলা পাকিস্তান অন্তর্গত করিবার চেষ্টা বাঙ্গালী যুবকদিগের শৌর্য্যে ব্যর্থ হয়। কলিকাতায় সুরাওয়ার্দ্দির দল বিধ্বস্ত হইয়া সমগ্র বাংলা গ্রাস করিবার আশা ত্যাগ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ নেহরুকে চাপ দিয়া এক কোটির অধিক হিন্দু বাসিন্দা সমেত অনেক জেলা পাকিস্তান অন্তর্গত করিয়া দিয়া ভারতকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। এই ব্যবস্থার ফলে পরে লক্ষ লক্ষ লোক পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হয় এবং পাকিস্তান তাহাদিগের ভিটামাটি দখল করিয়া লইয়া তাহাদিগকে অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ইউ. এন. অথবা ভারত সরকার কেহই বলে নাই যে তাহাদিগের সংখ্যা অনুপাতে পাকিস্তানের কয়েকটি জেলা ভারতে সংযুক্ত করিয়া দিলে ঐ সকল লোক নিজেদের ন্যায্য পাওনা ফিরাইয়া পাইত। কিন্তু ইউ. এন. ছিল ব্রিটিশ-আমেরিকান চক্রান্তের কেন্দ্র। সেখান হইতে ব্রিটিশ-আমেরিকান প্ররোচনায় কৃত কোনও পাপকার্য্যের প্রতিকার কখনও হওয়া সম্ভব হয় নাই। পাকিস্তান গঠন করিয়াছিল যাহারা, তাহারা ছিল ভিতরে ভিতরে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রের অস্ত্র। দেশদ্রোহিতা, মানবতা-বিরুদ্ধতা ও স্বাধীনতার নামে পরাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা পাকিস্তানের নেতাদিগের চরিত্রগত। আজ সেই কারণে তাহারা চীনের নিকট আত্মবিক্রয় করিতেছে। নিজ দেশের জনসাধারণের উপরেও তাহারা অল্প সংখ্যক লোকের একাধিপত্য স্থাপন করিয়া, সাধারণতন্ত্রের একটা ব্যঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সৃজন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কাশ্মীরের গরীব মুসলমান ভাইদিগের দুঃখে কাতর ও তাহাদিগকে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের স্বাদ পূর্ণরূপে দান করিবার জন্য বহু গোলাগুলি চালাইয়া কাশ্মীরের বক্ষ রক্তে লাল করিয়া তুলিয়াছে!

পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছে মাতৃভূমির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ও বিদেশীর দাসত্ব করিয়া নীচ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য। ঐ প্রকার রাষ্ট্রের সহিত কোন বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু ভারত সর্ব্বদাই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়া মার খাইয়া ফিরিয়া আসে। পাকিস্তানের প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়াও ভারত সেই দেশের অনেক অংশ পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দেয়। দ্বিতীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াও ফল একই হইয়াছে। এখনও আমরা ভারতের ধর্ম্মের কাহিনীর আবৃত্তি শুনিয়া শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছি। আমরা পাকিস্তানের সহিত শান্তি চাই, বন্ধুত্ব চাই, ঘনিষ্ঠতা চাই; ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সকল ব্যক্তির স্বভাব ঘাসের ভিতর লুক্কাইত সর্পের মতই, তাহাদিগের সহিত শান্তি, বন্ধুত্ব, বা ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হইতে পারে না। ইহা একটা অতি সাধারণ সত্য। ইহা স্বীকার না করিয়া চলা মিথ্যার অনুসরণ। সত্যের অনুসরণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এমন কি অহিংসাও তাহার তুলনায় কিছুই

নহে। সত্য পথে গমন করিলে জয়লাভ করা সম্ভব হয়। অহিংসা জয়যুক্ত হয় এমন কথা কোন পণ্ডিত কখনও বলেন নাই। ভারতের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পাকিস্তান ও চীনের কোন না কোন প্রকার গুপ্ত ও আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকা। স্বাধীনতা পাইবার সময় পাকিস্তান হঠাৎ হঠাৎ লুঠতরাজ করিয়া রাজ্যবিস্তার করিবার চেষ্টা করিত। কাশ্মীরের উপর প্রথম আক্রমণ করে পাকিস্তানি সৈন্যগণ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পার্ব্বত্য পাঠান জাতির ধর্ম্মোন্মত্ত যোদ্ধা সাজিয়া। সে মিথ্যার অভিনয় অনেক কাল চালাইয়া পরে পাকিস্তান মানিয়া লয় যে, পাকিস্তানের সৈন্যগণই যুদ্ধ করিতেছে। গত বৎসরের কচ্ছ আক্রমণ গুপ্ত ও আকস্মিকভাবে করিয়া ভারতীয়দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা হয় যে পাকিস্তান কচ্ছেই যুদ্ধ করিতে চাহে; কিন্তু আসল মতলব ছিল ভারতের নজর উল্টা দিকে রাখাইয়া কাশ্মীর দখল করা। পাকিস্তান আমেরিকার নিকট পাওয়া ট্যাঙ্ক ও বিমান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবে তাহাও ব্রিটিশ-আমেরিকানদিগের জ্ঞাত ছিল। কাশ্মীর আক্রমণের নক্সাও সম্ভবত ব্রিটিশ-আমেরিকান বিশেষজ্ঞদিগের হাতেই টানা হইয়াছিল। অর্থাৎ পাকিস্তান কোন সময়েই কোনও স্বাধীন ও আত্মসম্মান সংরক্ষিত আদর্শে চলে না। সর্ব্বদাই বিদেশীর অর্থে, বিদেশীর সাহায্যে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা ঐ বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদিগের একমাত্র কার্য্য ও চিন্তা। জগতের ইতিহাসে কোনও সময় কোন দেশ এইভাবে নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশীর মাহিনা করা গুণ্ডার কার্য্য করিয়া দেশবাসীর চিরস্থায়ী কলঙ্কের কারণ হয় নাই। ভবিষ্যতে যখন ভারতীয় মহাদেশের ইতিহাস লিখিত হইবে তখন ভারতীয় মানবের পাকিস্তানী জাতির নাম ঘৃণার সহিতই লিখিত হইবে। দশ কোটি মানবের নেতৃত্ব লাভ করিয়া সেই নেতৃত্বের এইরূপ অপমান পাকিস্তানের নেতাগণের মত আর কেহ কখনও করে নাই।

এই যে পাকিস্তান, ইহা যতদিন জগতের রাষ্ট্রসভার অন্তর্গত থাকিবে ততদিনই ভারতের গুপ্তঘাতকের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রও মহাজাতি হইলেও তাহার দৃষ্টিভঙ্গী গুপ্তঘাতকের। পিছন হইতে ছুরি মারা পাকিস্তানের সমর-কৌশল। এ অবস্থায় পাকিস্তান যতদিন আছে ততদিনই আমাদিগের তৎপরতার সহিত আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহার উপরে আছে গুপ্তঘাতকের গুরু চীন। ঐ মহাদেশ অতিবড় পাপের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীন বর্ত্তমানে ও পাকিস্তান জন্মাবধি ভারতের জাত-শত্রু। তাহাদিগের সহিত কোন সদ্ভাব রাখা অসম্ভব। সকল প্রকার অস্ত্রসজ্জিতভাবে চির প্রস্তুত থাকা ব্যতীত ভারতের অপর পথ নাই বাঁচিবার। যাহারা একথা মনে রাখিবে না তাহারা ভুল পথের পথিক।

স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রয়াস

ষাট বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া লর্ড কার্জ্জন বাংলার তথা ভারতের সর্ব্বত্র একটা নব জাগরণের সূচনা করাইয়া দেন, তখন বহু উন্নত, উচ্চশিক্ষিত পরিবারের লোকেরা সর্ব্বস্বপণ করিয়া ঐ অঙ্গচ্ছেদ রহিত করাইবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সেই যুগের মানুষ ছিল চাকুরিগত প্রাণ ও আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যাকুল। গ্রাম হইতে দলে দলে সহরে চলিয়া আসা তখন আরম্ভ হইয়াছে। দেশের অভিজাতকুল গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া সহরে বাড়ীঘর করা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও সেই সময় অনেক শিক্ষিত লোক চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়া দেশের কার্য্যে লাগিয়া পড়িলেন, 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' বলিয়া সকলে ইংলণ্ডের প্রস্তুত দ্রব্য আগুনে পুড়াইয়া দিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায়' তুলিয়া লইতে লাগিলেন। কারণ সে যুগের দেশ-ভক্তগণ বুঝিয়াছিলেন যে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য। বাণিজ্য না থাকিলে সাম্রাজ্যও থাকিবে না। সেই জন্যই স্বদেশী আন্দোলন স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রধান অস্ত্র বলিয়া গ্রাহ্য হয়।

ইংরেজ বাংলার যুবশক্তিকে ভয় দেখাইয়া, বেত মারিয়া ও চাকুরি হইতে বিতাড়িত করিয়া দাসত্বের কারাগারে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইল। যুবশক্তি উৎপীড়নে ভয় পাইয়া ইংরেজের পায়ে আত্মসমর্পণ না করিয়া, ইংরেজকে আঘাতের উত্তরে আঘাত দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। মানিক-তলার বাগানে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ বোমা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বোস প্রথম বোমা নিক্ষেপ করিলেন। তারপরে আরম্ভ

হইল একটির পর একটি সশস্ত্র সংঘাতের ঘটনা। কত নব যুবক ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন, কত শত কারাগারে ও দ্বীপান্তরে জীবন কাটাইতে লাগিলেন তাহার ইতিহাস সুদীর্ঘ ও আত্মবলিদানের প্রেরণায় উজ্জ্বল। ইংরেজের শত্রুতা ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর স্পর্দ্ধার উচিত শাস্তির ব্যবস্থা হইতে লাগিল ও বাঙ্গালীর ব্যবসা, ঠিকাদারী, দোকান, আড়ত প্রভৃতি ধীরে ধীরে রাজ-শক্তির বৈপরীত্যের জন্য বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজের ব্যবসার অংশ বাঙ্গালী আর পাইতে সক্ষম হইল না। অপরাপর জাতির লোক ভারতীয় আমদানি-রপ্তানির কার্য্যে বাঙ্গালীকে সরাইয়া দিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লইতে লাগিল। বাঙ্গালী ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছু হটিতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধ যাহা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা চলিতে লাগিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই বাংলার অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিয়া দুই বাংলাকে এক করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু পশ্চিম বাংলা হইতে কাটিয়া সিংভুম, মানভুম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বিহারে সংযুক্ত করিয়া বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু বাংলা বিচ্ছেদের আন্দোলন শেষ হইয়া যাইলেও স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙ্গালী বিপ্লববাদীগণ জার্ম্মানীর সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করিয়া ইংরেজ বিতাড়ন ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা সক্ষম হয় নাই। যুদ্ধের পরে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির আবির্ভাব হয় ও কয়েক বৎসর সশস্ত্র বিপ্লব চেষ্টার গতিবেগ হ্রাস হইয়া যায়। পরে পুনর্ব্বার অহিংস-নীতির অবস্থা খারাপ হওয়ায় বিপ্লববাদী শক্তি সংহত হইয়া পূর্ণ বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। চট্টগ্রামের কাহিনী এখনও সাধারণের স্মৃতিতে জাগ্রত সুরক্ষিত আছে। চট্ট-গ্রাম সহর বিপ্লবীগণ দখল করিয়া লইয়া সকল ইংরেজকে সেই স্থল হইতে পালাইতে বাধ্য করেন ও ঐ স্থলে ব্রিটিশ রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে অনেকদিন সময় লাগিয়াছিল। ইহার পরের যে ঘটনাবলী বিপ্লবের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে তাহা হইল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর ভারত আক্রমণের কথা। সেই সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী জাপানীদিগের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া একের পর একটি ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া ভারতের দিকে পলাইতেছিল। বহু ভারতীয় সৈন্য জাপানী-দিগের হস্তে বন্দী হয় ও নেতাজী তাহাদিগকে লইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। যুদ্ধের অবসানে নেতাজী না থাকায় এই সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু ইংরেজ বুঝিয়া লয় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর শুধু শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না। সামরিক জাতিগুলিও ইংরেজকে মাতৃভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যুদ্ধ করিবে। ইংরেজ অতঃপর কিছু কিছু দেশদ্রোহী মুসলমানদিগকে নিজেদের দলে টানিয়া পাকিস্তান গঠনে মনোনিবেশ করিল। যে সকল মুসলমান ইংরেজের খাতিরে মাতৃভূমি ভাগ করিতে রাজী হইলেন না, তাঁহারা ভারতেই থাকিয়া যাইলেন। যদিও পাকিস্তান হইল পাঞ্জাব, পূর্ব্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচি-স্তান ও পাখতুনিস্তানে, তাহা হইলেও পাকিস্তানী আন্দোলন চালাইয়াছিল বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিম বাংলার দেশদ্রোহী কয়েকজন মুসলমান। তাহারা পরে ক্রমশঃ পাকিস্তানেও নিজেদের দলের একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সে দেশে সাধারণতন্ত্রের সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু ব্রিটিশ ও আমেরিকানগণ তাহাদিগকে শিকারের কুকুর হিসাবে বরাবরই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে।

মহাত্মার অহিংস নীতির ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম নিরাপদ হইয়া যায়। পূর্ব্বে স্বাধীনতার জন্য লড়িলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে হইত। মহাত্মাজী দলের লোকেদের অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিতেন না ও তাঁহারাও বিশেষ কোন দৈহিক ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন না ঐ অহিংস যুদ্ধের ফলে। এই কারণে বহু লোক স্বাধীনতা "সংগ্রামে" যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন, যাঁহারা বিশেষ কোন ত্যাগ বা ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এখন একটা যুদ্ধ-বর্জ্জিত হৈ হাল্লার পর্য্যায়ে পড়িয়া গেল। সংখ্যায় লোক বাড়িতে লাগিল ও কাল্পনিক ত্যাগ ও সংগ্রামের গল্প অনেক তৈয়ার হইয়া বাজারে চলিতে লাগিল; কিন্তু সত্যকার সংগ্রাম যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই বিস্মৃতির অতলে চলিয়া যাইলেন। সহজ পথের পথিকগণ দর করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া উপার্জ্জনের পথ খুঁজিতে

লাগিলেন। সমাজের অর্থকরী প্রচেষ্টার অনেক কিছুই যাঁহারা দেশের কার্য্যে কারাগারে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের জন্য বিশেষ করিয়া রক্ষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রিটিশের সাহচর্য্য ও অনুসরণে জীবন কাটাইতেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এখন দেশভক্তির তাড়নায় আকুল হইয়া উঠিলেন। ব্যবসায়ী যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা এখন তাহার প্রতিদানে সরকারী সুপারিশ ব্যবহার করিয়া কারবার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অহিংস যুদ্ধের যোদ্ধা ও রসদ সরবরাহ কার্য্যের কর্ম্মীগণ এখন পুরস্কার হিসাবে দেশের বহু ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া দাঁড়াইলেন। পুরাতন আভিজাত্য ও তাহার ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন কারখানাগত ধননীতির আবির্ভাব হইল। ইহার প্রবর্ত্তক ও পূজারী হইল বাজারের আড়তদার, সুদখোর মহাজন ও নকল-স্বার্থত্যাগী-স্বার্থপর "বিশেষভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ"।

সামরিক শক্তির গোষ্ঠী

জগতের সামরিক শক্তি যে সকল জাতির অধিক মাত্রায় আছে সেই সকল জাতি দল বাঁধিয়া এক একটা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছে। যথা ব্রিটিশ-আমেরিকান গোষ্ঠীতে রহিয়াছে অনেকগুলি জাতি। এইগুলির মধ্যে ফ্রান্স দুই নৌকায় পা দিয়া অবস্থিত। জাপান ও পশ্চিম জার্ম্মানী এখন যুদ্ধে হারিয়া বিজেতার দলে কিন্তু পরে কোথায় যাইবে বলা যায় না। ইতালি, নরওয়ে, হলাণ্ড, বেনেলুক্স প্রভৃতি মহাশক্তি নহে। রুশ গোষ্ঠীতে যাহারা আছে তাহাদিগের মধ্যে চীন বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ও অপর শক্তিগুলি মহাশক্তিশালী নহে। কখন যুদ্ধ হইলে সম্ভবত চীন ও রুশ আবার এক হইয়া যাইতে পারে। ভারত নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর অর্থাৎ ভারতকে কেহই নিজের মনে করে না। অথচ ভারত মহাশক্তিও নহে কিন্তু ভারতের দুইটি মহাশক্র আছে; চীন ও পাকিস্তান। এই দুই শক্তিই কোন-না-কোন সামরিক গোষ্ঠী ঘেঁষিয়া অবস্থিত। নিরপেক্ষ জাতি যে কয়টি আছে সবই প্রায় ক্ষুদ্রাকার ও অল্প শক্তিশালী। ভারতের নিরপেক্ষ ভাব বিশেষ সুবিধা জনক নহে। সুতরাং নিরপেক্ষ ভাব রক্ষা করিয়া ভারতের আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভারতের আরও অধিক সৈন্য ও অস্ত্রবল প্রয়োজন।

বাংলা দেশের অবস্থা

বাংলা দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। প্রথমত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদিগের নিষ্পেষণে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য বা লাভজনক উপার্জ্জনের অপর কোন সুবিধা পাইবার সহজ উপায় থাকে নাই। দ্বিতীয়ত প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গকে বাংলা হইতে কাটিয়া লইয়া পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয় ও পরে পশ্চিমবঙ্গের তিন-চারিটি জেলা বাংলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বেহারে সংযুক্ত করা হয়। এই জেলাগুলিই আবার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে, অর্থাৎ কয়লা, লৌহ, তাম্র, অভ্র, লাহা প্রভৃতিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ অংশ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে ঐ সকল অংশ বাংলা ফিরাইয়া পাইবে বলিয়া বহু প্রস্তাব কংগ্রেসের দেশভক্তগণ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে সে কথা বেহারের নেতাগণ বিশেষ ভাবেই ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন। মধ্যে একবার মানভূম ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অপূর্ব্ব ঔদার্য্য দেখাইয়া অল্প কিছু সকল সম্পদবর্জ্জিত ভূমি গ্রহণ করিয়া, কয়লাবহুল ধানবাদ, ঝরিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ড বেহারকেই চিরতরে দান করিয়া স্বদেশের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করেন। বাংলার জন নেতাগণ হয় অবাঙ্গালী ভারতীয়দিগের লাভের জন্য, নয়ত চীন, রুশীয়া বা অপর কোন বিদেশীদিগের সুবিধার জন্য প্রাণপাত করিয়া থাকেন। বাংলার মানুষের প্রতিষ্ঠা ও জীবনযাত্রা যাহাতে পূর্ণ বিকশিত ও সুগম হয়, তাহার চেষ্টা তাঁহারা ভুল করিয়াও কখন করিতেছেন বলিয়া দেখা যায় না। বাংলার সকল ব্যবসা অবাঙ্গালীর অর্থাৎ মাড়য়ারী, গুজরাটী, সিন্ধি প্রভৃতি লোকেদের হস্তে চাকুরির ক্ষেত্রে, ছোট কাজ করে বেহারী, উড়িষ্যাবাসী, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের লোকেরা। মাঝারি কাযে আছে পাঞ্জাবী ও মাদ্রাজী। এবং বড় বড় কাজ বাঙ্গালীর কিছু আছে ভগবানের দয়ায়। কারণ কিছু বাঙ্গালী বিদ্যায়-বুদ্ধিতে বিশেষভাবে নিজ শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন; কংগ্রেস অথবা চেম্বার অফ

কমান্সে'র সকল গুপ্ত নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াই ; শুধু সৃষ্টিকর্ত্তার বিধানে।

এখনও দেখা যাইতেছে, বাংলার যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য কোন জননেতার বিশেষ শিরঃপীড়া হইতেছে না। কলিকাতার গঙ্গা শুকাইয়া যাইলেও ফরাক্কার বাঁধ কিছুতেই আর শেষ হইতেছে না। কলিকাতায় বড় বড় জাহাজ না আসিতে পারিলেও, কিছু দূরে হলদিয়ার বন্দর সকল বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও কার্য্যত গঠনে অগ্রসর হইতেছে না। কারণ টাকার অভাব, কিন্তু ভারত সরকার বৎসরে ৩০০০৲ কোটি টাকা ব্যয় করিতে কোন অসুবিধা ভোগ করেন না। বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন বাংলার সাহায্যে, অর্থাৎ পাট ও চা-এর ব্যবসা দ্বারা বৎসরে দুই শত কোটি টাকার অধিক হইয়া থাকে। বাংলার জননেতাগণ তাঁহাদিগের ভারত বা বিশ্ব-প্রীতিতে মশগুল। বাঙ্গালী অভাবে ও নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত !

যুবশক্তির বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি

যদি ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার প্রকট রূপ চতুর্দ্দিকে বেকার, দরিদ্র, নিরাশ ও নিরানন্দ জনগণের মনে তাহাদিগের তুলনামূলক দুরবস্থার কথা ক্রমাগত জাগ্রত করিয়া দিতে থাকে তাহা হইলে বিক্ষোভ ও অশান্তির সৃষ্টি না হইয়া যাইতে পারে না এবং থাকিয়া থাকিয়া সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইবার জন্যই মানুষ নানান ভাবে চেষ্টা করিবে। আরও গভীর ও প্রবল আকারে সেই অপ্রীতি, অশান্তি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধতা প্রকাশিত হইতে থাকিবে যতই মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, ঐশ্বর্য্য ও ভোগের আড়ম্বর নির্ভর করিতেছে অন্যায় ও দুর্নীতির উপরে। কালোবাজারের উপার্জ্জন গরীবের অভাব থাকিলেই হইতে পারে। একের অভাব অপরকে অন্যায় ভাবে লাভ করিতে সাহায্য করে। যদি চাউল উচিত মূল্যে যথেষ্ট না পাওয়া যায় তাহা হইলে মানুষ বাধ্য হইয়া অপর সকল অভাব সহ্য করিয়া চাউল দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে ক্রয় করিবে। যদি ঔষধ না পাওয়া যায় ন্যায্য মূল্যে তাহা হইলে দশগুণ মূল্য দিয়াও ঔষধ ক্রয় করিতে হইবে। ডাক্তার যদি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দশের পরিবর্ত্তে শতমুদ্রা আদায় করিতে চাহেন বা আইন-জীবী আদালতে দাঁড়াইতে হইলে হাজার টাকার কমে দাঁড়াইতে রাজী না হন ; তাহা হইলে গরীবের সেই টাকা কর্জ্জ করিয়াও দিতে হয়। সামাজিক কারণে অলঙ্কার, আসবাব বা মূল্যবান বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেও মানুষকে দেউলিয়া হইতে হয়। যাহার চারি শত টাকা মাসিক আয় তাহার আয়কর টাকা হাতে আসিবার পূর্ব্বেই কাটিয়া লওয়া হয়। যাহার আয় মাসিক চল্লিশ হাজার তাহার আয়কর দিতেও বহু দিন কাটিয়া যায় ও নানান ভাবে সেই আয়করের অধিকাংশই দেওয়া হয় না। একশত টাকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা এক হাজারে বিক্রয় প্রায়ই হইতেছে। কাহাকেও টাকা ধার দিতে হইলে সুদের হার শতকরা বার্ষিক দেড় শত টাকাও হইতে পারে ও হইয়া থাকে। মিশাল, ভেজাল ও অপর অন্যায় উপায়ে ক্রেতাকে বঞ্চনা করাও ক্রমাগতই চলিতেছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে যাহারা পিতামাতার উপরে নির্ভর করিয়া স্কুলে-কলেজে পাঠ করে তাহাদিগের অবস্থাও অভাব ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাজর্জ্জরিত। খাওয়া-পরা, আনন্দে দিন কাটান, পুস্তক ক্রয়, বিশেষ শিক্ষার খরচ দেওয়া, ভ্রমণ করা কিংবা খেলাধূলার ব্যবস্থা করা ; কোন কিছুই ছাত্রদিগের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত হয় না। কারণ অর্থাভাব। অথচ কোন কোন ছাত্র ধনী-ঘরের সন্তান, তাহারা যান-বাহন, মূল্যবান বস্ত্র ও খরচের টাকা গরীব ছাত্রদিগের সম্মুখে দেখাইয়া ছাত্রদিগের অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণ হয়। শিক্ষকগণ ধনীর সন্তানদিগকে যে ভাবে নেক-নজরে দেখিয়া গরীব ছেলেদের তাহা দেখেন না। কারণ নিজেদের দারিদ্র্য। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে সমাজে যে নিদারুণ সাম্যের অভাব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় ; ছাত্রদিগের পাঠের ব্যবস্থা এবং নিজেদের ও শিক্ষকদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যেও সেই অসাম্য আরও প্রকট ভাবে ফুটিয়া উঠে। ছাত্রগণ রাষ্ট্র ও অর্থ-নীতির কথা আলোচনাও করে ও বিষয়গুলির গুরুত্বও তাহারা বুঝিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদিগের বিদ্যা-বুদ্ধিও অভিভাবক ও রাষ্ট্রনেতাদিগের তুলনায় অধিক। ন্যায়জ্ঞানও বিশেষভাবে অকলুষিত ও স্বাভাবিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়াই অবস্থিত। ছাত্রগণ যাহা চায় ও যাহা বলে তাহা রাষ্ট্রনেতাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও কথার তুলনায় সত্য ও ধর্ম্মের সহিত নিকটতরভাবে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে তাহা-দিগের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করিয়া রাষ্ট্রনেতাদিগের

মানসিক, দৈহিক ও চরিত্রগত অবস্থা বিচার অধিক প্রয়োজন। অর্থাৎ ছাত্রগণ কেন ঐ সকল নেতা ও শিক্ষকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখে না তাহা নির্ণয় করিয়া ঘৃণার পাত্র বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে ছাত্রদিগের নিকট হইতে সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা যতটা দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় যে, উপদেষ্টাদিগের মধ্যে অধিক লোকই বিদ্যায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, দেহের শক্তিতে, ত্যাগের মাহাত্ম্যে, ক্রীড়াক্ষেত্রে বা তর্ক-সভায় কোন উচ্চ স্থান লাভ করিতে অসমর্থ। আমরা না হয় "রাজভক্ত, রাজভক্ত বলে চেঁচাই উচ্চরবে; নইলে যে চাকরি যাবে নইলে যে চাকরি যাবে।" কিন্তু যুবজনের মধ্যে সে চাতুর্য্য দেখা যায় না। তাহারা সম্মানের উপযুক্ত পাত্রকেই সম্মান দেখায়। ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিয়া যে কোন গর্দ্দভকে ঘোড়দৌড়ের মাঠের শ্রেষ্ঠ ঘোটক বলিয়া মানিয়া লইতে তাহারা পারে না! এবং তাহাতে দোষের কিছুই দেখিতে পাই না।

উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত নেতা পাইতে হইলে যে ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-পরিচালনা চলিতেছে তাহাতে কুলাইবে না। কারণ দেড়শত দুই শত—এমন কি পাঁচ শত টাকা বেতন দিলেও আজকাল সেই জাতীয় শিক্ষক পাওয়া যাইবে না, যাহাদিগের সহিত আমাদিগের যৌবনে পরিচয় ছিল। রাষ্ট্রনেতাগণও এখন আর কেহই সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, রাসবিহারী কি বা সুভাষচন্দ্রের সহিত তুলনীয় নাই। এই অবস্থায় প্রয়োজন ফাটা কাপড় সেলাই করিয়া চালাইবার চেষ্টা না করিয়া নূতন সূতা দিয়া নূতন বস্ত্র বয়ন করিয়া লইবার চেষ্টা করা। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কার্য্যে ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদিগকে সমাজ ও ছাত্রদিগের সহিত আরও নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আনিতে হইবে। অতি সাধারণ ক্ষমতার ও গুণের আধার যাহারা তাঁহাদিগকে এখন অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না।

বিদেশী অর্থের প্রবাহ

ভারতের রুপিয়া দুনিয়ার বাজারে সস্তা করিয়া দেওয়াতে বিদেশীরা এখন নিজেদের অর্থে ভারতীয় দ্রব্য দেড়গুণ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে যত পাউণ্ডে বা ডলারে যে পরিমাণ চা, পাট কিংবা লোহা পাওয়া যাইত এখন ঠিক তত পাউণ্ড-ডলারেই পূর্ব্বের দেড়গুণ মাল পাওয়া যাইবে। সুতরাং বিদেশী ক্রেতাগণ এখন ভারতীয় মাল খরিদ করিতে অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক উৎসুক হইবে। ভারত যখন পূর্ব্বের ধার করা অর্থ শোধ করিবে সেই অর্থের ক্রয় শক্তিও দেড়গুণ হইয়া যাইবে। সুদের টাকারও মূল্য দেড়গুণ হইবে। অতএব ভারতের সহিত কাজ-কারবার করা এখন বিদেশীর পক্ষে দেড়গুণ লাভজনক হইবে এবং সেই কারণে কাজ-কারবার করিবার ইচ্ছাও প্রবলতর হইবে মনে হয়। শ্রীশচীন চৌধুরীর মতে বিদেশীগণ এখন ঋণ হিসাবে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে ভারতে টাকা পাঠাইতে আগ্রহ দেখাইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য যে পরিমাণ বিদেশী অর্থ পাওয়া দরকার তাহা এখন অনেকাংশে পাওয়া যাইবে বলিয়া শ্রীচৌধুরী মনে করেন।

এই সুবিধার দুইটি দিক আছে। প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাইলে ভারতীয়েরা কাজ করিতে সক্ষম হইবে, সুতরাং টাকা পাইয়া যাওয়াটা লাভজনক হইবে মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ঋণ সহজে পাওয়া যাইলে অপব্যয় বৃদ্ধি হইতে পারে। ফলে ভারতের অর্থনীতি গড়াইয়া নীচে যাইতে পারে তাহার আশঙ্কাও কিছু অধিক হইল বলা যায়। ভারতের নেতাদিগের মধ্যে ঋণ করিয়া সেই অর্থ অপব্যয় করা সম্বন্ধে লজ্জা অধিক লোকের মধ্যে দেখা যায় না। ইহার ফলে ভারতের জনসাধারণ এখন মাথাপিছু জাতীয় ঋণের দায়িত্ব লইয়াছেন প্রায় ২৫০৲ টাকার। অর্থাৎ এক একটি গরীব পরিবারের ১০০০৲ টাকা প্রমাণ জাতীয় ঋণের বোঝা নেতাদিগের দৌলতে স্কন্ধে চাপিয়াছে। একইভাবে এই অপকর্ম্ম চলিতে থাকিলে শেষ পর্য্যন্ত ভারতের কি অবস্থা হইবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু যদি ভারতীয় দ্রব্য বিদেশে অধিক রপ্তানি হইয়া বিদেশী মুদ্রা উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সেই বিদেশী অর্থের প্রবাহ আমাদিগের অর্থনীতিকে জোরাল করিয়া তুলিতে পারে।

নেপালকে চল্লিশ কোটি টাকার সাহায্য

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী খাটমাণ্ডু গমন করিয়া নেপাল ও ভারতের সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। খাটমাণ্ডুর পানীয় জল সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত নেপালকে

চল্লিশ কোটি টাকা দিয়া সাহায্য করিবে বলা হইয়াছে। ভারতের বহু সহরের জল সরবরাহ এখনও ঠিক মত হয় না। কারণ অর্থাভাব। ভারত যদি নিজ হিত করিতে অক্ষম হইলেও পর-হিতে সক্ষম হয় তাহা আনন্দের কথা। কিন্তু আমরা আশা করি যে, ঐ চল্লিশ কোটি টাকা বিদেশ হইতে ঋণ করিয়া আনিয়া নেপালকে দেওয়া হইবে না। হইলে কোনও ঘোর অন্যায় হইবে না। তবে হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে।

আমেরিকার নিকট সাহায্য গ্রহণ

আমেরিকা ক্রমে ক্রমে ভিক্ষুক জাতিগুলিকে নিজের প্রকৃত রূপ দেখাইতেছে। পূর্ব্বে ভারতের কান মলিয়া কি কি সর্ত্তে সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা আমেরিকা ভারতকে কিছুটা প্রকাশ্যে ও কিছুটা গোপনে জানাইয়াছিল। খাদ্য সরবরাহের মূল্য কেমন করিয়া সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে আদায় করা হইবে তাহাও ভারতকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ভারতের সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ আরও খর্ব্ব আকারে পঙ্গুর ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক চাপে ভারত স্বাধীনতার সকল অধিকার ক্রমশঃ বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টায় নিবিষ্ট হইবে বলিয়া ভয় হয়। অর্দ্ধ শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি শেষ অবধি কি হইবে তাহা আজ কেহ বলিতে পারে না। ভারত ইয়োরো-আমেরিকার অর্থ নৈতিক উপনিবেশ হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহা অমূলক নহে। অর্থনৈতিক চাপে মানব সমাজে কি ঘটিতে পারে তাহা আজ বাংলা দেশকে দেখিলে উত্তম রূপেই বুঝা যায়। ভারতীয় প্রতিভার কেন্দ্র বাংলা আজ অর্থের জন্য কোথায় নামিয়াছে তাহা বলিতেও লজ্জা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ আত্মবলিদানকারী বাঙ্গালী আজ ক্রূরবুদ্ধি অধর্ম্মের পূজারী ধনদানবদিগের চাটুকারিতায় নিযুক্ত। ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণও ঐ একইভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া-ফিরিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে ব্যস্ত। ঐ সঙ্গে ভারতের আত্মসম্মানবোধও বিক্রয় হইয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। আমেরিকা আজ বলিতেছে কিউবাকে পাটের থলি যদি সরবরাহ কর তাহা হইলে গম পাইবে না। পরে হয়ত বলিবে কাশ্মীর পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দাও নয় ত ঋণ পাইবে না। আমেরিকার ঔদ্ধত্য সহ্য করা কোন জাতির পক্ষেই উচিত নহে। কিন্তু ইহা চিন্তা করাও ভুল যে কম্যু-নিষ্ট জাতিগুলি আমেরিকার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বস্তুত কম্যুনিষ্ট জাতির সহিত সৌহার্দ্দ অর্থে বুঝিতে হয় সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ। সেই জন্য সকল ভাবেই পরমুখাপেক্ষিতা বর্জ্জন করিয়া স্বাবলম্বন পথই স্বাধীনতা ও জাতীয় সম্মান রক্ষার একমাত্র উপায়। ইহাতে যদি ভারতের সকল লোকেরই জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয় তাহা সহ্য করিতে হইবে। কারণ আমেরিকা যদি ভারতের সাধারণের খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য মাথাপিছু বৎসরে দশ টাকা প্রমাণ সাহায্য করে তাহা না পাইলে আমরা মাসিক মাথা পিছু এক বা দেড় টাকার খাদ্য কম পাইব। তাহা হইলে কেহ অকস্মাৎ মরিয়া যাইবে না। ঐ খাদ্য গ্রাম দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনাও যাইতে পারে; সে কথা বারম্বার বলা হইয়াছে। আমেরিকার নিকট খাদ্য ক্রয় একটা ভারত সরকারের মানসিক ব্যাধি। তাহা কোন মারাত্মক বা দুরারোগ্য অভাবের জন্য করা প্রয়োজন হয় নাই। শুধু সুব্যবস্থা করিবার অক্ষমতাই তাহার কারণ।

মূলধন হিসাবে যাহা ঋণ করা হয় তাহাও জাতীয়ভাবে বিশেষ ক্ষতিকর। কারণ সে ক্ষেত্রেও বিদেশীগণ নানা প্রকার সর্ত্ত করিয়া নিজেদের লাভের পথ আরও প্রশস্ত করিবার চেষ্টা করে। সেই সকল সর্ত্ত মানিয়া আমরা আজ দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে বিদেশী যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ কর্ম্মী সংগ্রহ করিয়া ভারতের কারখানাগুলিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে গঠিত কারখানা করিয়া তুলিয়াছি। কিন্তু সেই সকল কারখানাতে উৎপাদনও তেমন হয় না; এবং ভারতীয় কর্ম্মীগণও বিশেষ কিছু শিখিতে পারে না। কারণ বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের অজ্ঞতা ও ভারতীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অনিচ্ছা।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে প্রবাসী কার্য্যালয় ২০শে অক্টোবর (৩রা কার্ত্তিক) হইতে ২রা নভেম্বর (১৬ই কার্ত্তিক) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

বিস্মৃত লেখক ও উপেক্ষিত রচনা

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

সে সব বই কেমন, চিরকালের বই কি না—সাধারণ মানুষ আমি সেকথা বলতে পারব না। তবু দেখছি, বই ত ঘরের আলমারিতেই বেঁচে থাকে না, মানুষের মনেও ত সে বেঁচে থাকে।

কেমন করে থাকে, কারা মনে রাখে, যাঁরা মরে গেছেন, তাঁরা আবার কি করে কার মনে সেই বইয়ের কথা জাগিয়ে দিলেন প্রদীপ থেকে প্রদীপান্তরে জ্বেলে তোলা শিখার মত আর একটি স্মৃতিতে দীপ জ্বেলে উঠল সেকথা ভাববার কথা।

কিন্তু মানুষ কেমন করে যেন মনে রাখে ভুলে যায় না। এক বিদেশী সমালোচকের লেখায় পড়েছিলাম, ভাল বইয়ের কথা, সাহিত্যের কথা, কিছুকাল ভুলে যাওয়ার পরও কি করে লোকের মনে থাকে তিনি বলেন, 'কিছু মহৎ সাহিত্য ছোট বড় সৎ সাহিত্য কিছু পাঠক কেমন করে চিরকালই দেখতে পান। তাঁরাই বারে বারে যুগে যুগে সাধারণ লোকের সামনে সেই সাহিত্য অমৃত এনে দেন। তাঁর মতে সেই সব সাহিত্য তাঁদের মনে মনে বেঁচে থাকে। তাঁদেরই মুখে মুখে ভেসে আসে স্মৃতি ও শ্রুতির আনন্দলোকের পথে পথে চিরকালের লোকে বিলীয়মান হয়েও বারে বারে জেগে ওঠে।'

('লিটারারি টেস্ট।' আর্নল্ড বেনেট)

এখনও সামান্য কিছু লোকের মনে যে কয়েকখানা বই বেঁচে থেকে মনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় তার কথা একটু বলি।

আগে গল্প বা কথা সাহিত্যের কথাই বলি। এই কথা গল্পকে সাহিত্যে যতই কম গুরুত্ব দেওয়া হোক না কেন, তার স্থান সাহিত্যে সম্রাটের আসনেই। সংসারে শিশুর মতই—যেমন ঘরেই জন্মাক না যেমন দেখতে-শুনতেই হোক না—বাড়ীতে সিংহাসনখানি তারই জন্য থাকে—মানুষের মনের সকল ঘরে ঘরে। শিশুহীন সংসারের মত গল্পহীন সাহিত্য, সাহিত্য হলেও সব সময়ে তা মনোহর সাহিত্য নয়। মনোহরণই সাহিত্যের আদিকথা আদিম গুণ।

মানুষের মনের প্রথম ও প্রধান আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় ছোট্ট থেকেই গল্প শোনার। তার মনের অবুঝ শিশুটার চিরকালের প্রথম উক্তি হ'ল 'গল্প বল'। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের মতে, "গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা সবই কাব্য পর্যায়ে পড়ে এবং তা তত্ত্বকথা নয়, দর্শন নয়, চিন্তা নয়—শুধু রূপ। রূপ। রূপ। তাহাতেই সাহিত্যে জগৎ রূপী ব্রহ্মের দর্শন ঘটিয়া থাকে।"

আমার প্রথম আলোচ্য বইটির নাম হ'ল 'নয়নতারা'। লেখক শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁর পরিচয়ের কোন দরকার নেই সবাই জানেন। কিন্তু সে পরিচয় তাঁর সাহিত্য পরিচয় নয়। সে হ'ল তাঁর ধর্ম সমাজ ও কর্ম জগতের পরিচয়। ব্রাহ্ম সমাজের নব অভ্যুদয়ের গভীর ধর্মনিষ্ঠ মানুষের পরিচয়

নয়নতারা বইখানিতে রয়েছে সেই সময়ের হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙা-গড়ার সংঘাতের বেদনা-মধুর কাহিনী। যে সংঘাত নিয়ে কত লেখক কত প্রবন্ধ নাটক গল্প সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, বর্ণনা করেছেন কিন্তু 'নয়নতারার' মত এমন বই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দু'সমাজের প্রতি আশ্চর্য সহৃদয় ও শ্রদ্ধা দিয়ে এই দুই সমাজের ভাঙা-গড়ার এমন কাহিনী আর ত কারুর লেখায় চোখে পড়ল না। ব্রাহ্ম হিন্দু ঘরের ছেলেমেয়ের প্রেমের ক্ষেত্রে সামাজিক, পারিবারিক আদর্শের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের গোরাতেও পাই, সে কিন্তু যে সমাজের, যে মানুষদের কথা 'নয়নতারা' সেই ধরনের সেই মানুষদের কাহিনী নয়। 'গোরা'তে সুচরিতা পালিতা মেয়ে, গোরাও পালিত ছেলে, ললিতা ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে, বিনয় হিন্দু ছেলে হলেও তার বাপ-মা যুক্ত পারিবারিক জটিল ঘনিষ্ঠ কোন জীবন বন্ধন সামনে বা পিছনে নেই। কবি অনায়াসেই তাদের সমাজের বন্ধন ছিঁড়তে পেরেছেন। এবং যে দু-চারটি সামাজিক মন্তব্য পানুবাবু প্রমুখ কয়েকজনের মুখে তাদের সামনে এসেছে, তাতে এমন কোন গভীর সংঘাত বা কঠিন বাধা হয় নি—যে তারা মুচড়ে ভেঙে যায়, ভয়ে বেদনায় মুচড়ে ফিরে যায় পুরাতন সমাজে। তাদের চারজনকেই অনায়াসে কবি আনন্দময় পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধ সহজ পথে প্রেমের ঘাটে পৌঁছে দিয়েছেন।

নয়নতারায় কিন্তু তা হ'ল না। হতে পারে নি। হয় নি। সেকালের বই প্রায় ৭০।৮০ বছর আগের বই, হাতের কাছে পেলাম না, লাইব্রেরীতেও সুলভ নয়। তা হ'লে শাস্ত্রী

মহাশয়ের ঐ চমৎকার গল্পটির কথা কিছু কিছু তুলে দিতে পারতাম।

নয়নতারা চমৎকার সুন্দরী আদরিনী বাড়ীর দুহিতা। বাপ মা ভাই বোন প্রতিবেশী সকলের স্নেহভাজন, সকলের শ্রদ্ধেয়া চোখের তারার মত নয়নতারা। তাকে তার দাদারা ভালবাসে। বৌদিরা ভালবাসেন। বাড়ীর সব পরিজন এমন কি গোঁড়া পুরোহিত বাড়ীর কর্ত্রী টেঁপির ঠাকুমাও এত স্নেহ করেন যে, অনায়াসে 'এঁড়ে লাগা' অযত্নলালিত অপরিচ্ছন্ন টেঁপিকে নয়নতারার হাতে স্নেহভরেই দিয়ে দিলেন। যে নাক মুছে পেটে হাত মোছে,' যে আবদার করে এমন, যে, থামে না ইত্যাদি। নয়নতারার তাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে মুস্কিলের শেষ নেই। হ্যাঁ, তাঁরা ব্রাহ্ম বাড়ীতে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিলেন। এমনি মুগ্ধকারিণী সেবাময়ী সে।

বাড়ীর শিশুদের মাষ্টার হরেন্দ্র হিন্দু। পড়াশোনাও খুব আছে। কর্তা রায়মহাশয় (?) তাকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করেন। রূপগুণশালিনী নয়নতারার প্রতি সে আকৃষ্ট হ'ল স্বাভাবিক নিয়মেই। এবং নয়নতারাও।

কিন্তু নয়নতারার আধুনিক দাদারা তাকে সহ্য করতে পারলেন না ব্রাহ্ম সামাজিক দিক দিয়ে। দরিদ্র সন্তান। বিধবা কায়ক্লেশ কর্মপরায়ণা জননীর পুত্র

এদিকে নয়নতারার বোন সৌদামিনীর সহসা এক গোস্বামী বাড়ীর ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। সে গোঁসাই বাড়ীর সকলে নয়নতারাকে দেখে মুগ্ধ। আর নয়নতারাও তাদের আপনার করে নিলেন অতি সহজে এবং সৌদামিনীর সেই গোঁড়া বৈষ্ণব বাড়ীর ছেলে গোবিন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু শেষ অবধি লেখকের অত সাধের আদর্শ নয়নতারা তার অনাদরের সীমা রইল না। সেকালকার হিন্দু ব্রাহ্ম সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতময় প্রথম ইতিহাস বলা যায়। মনে হয় স্বর্ণলতাও পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস। সমাদৃতও চিরকাল। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ' 'নয়নতারা'ও আরেক রকমের সামাজিক ও পারিবারিক সংঘাতময় কাহিনী। তাদের আমরা ভুলে গেলাম কি করে। 'নয়নতারা' সমাদর পেল না কেন?

এরপর মনে পড়ে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা পল্লীচিত্র 'পল্লীবৈচিত্র্য'। একালে যাকে রম্য-রচনা বলা হয় সেই জাতীয় লেখা। যা সেকালে রামানন্দবাবু সম্পাদিত 'প্রদীপে' ও 'প্রবাসী'তে 'ভারতী'তেও আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। মনসা দেবতার গান, দুর্গাপূজা, নবান্ন, দোল, রথযাত্রা, 'রাস' দোলযাত্রা গ্রামের 'ষোষাণী' 'গ্রামের পিসিমা,' নানা প্রসঙ্গ ও নানা নামের পল্লীচিত্র।

তখন রবীন্দ্রনাথেরও প্রশংসা পেয়েছিল। বাংলা দেশে এবং প্রবাসের অনেক বাড়ীতে ঘরে সে বই ছিল। এবং এই রম্য-রচনা স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। লেখার জন্য লেখা নয় আনন্দিত মুগ্ধ মনের রচনা।

কিন্তু সহসা এসে পড়ল মাঝে মাঝে রহস্য লহরীর অসংখ্য রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীর প্রবাহ। সেই রচনা সম্পাদনে ব্যস্ত এক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের আবির্ভাবে কবি-লেখক দীনেন্দ্রকুমারের সেই বইগুলি কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন। এক কথায় রহস্য লহরীর নগদ রৌপ্য চক্রের চাকায় সেগুলি নিষ্পিষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল। যদিও তাঁর প্রথম খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ঐ পল্লী বিষয়ের লেখাতেই। লেখকও আর সেদিকে চেয়ে দেখেন নি। এইটাই আশ্চর্য লাগে। অর্থ ও প্রতিভার সংঘাত। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সেই চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা? এর সঙ্গেই মনে পড়ে উড়িষ্যার চিত্র। লেখক যতীন্দ্রমোহন সিংহ শেষ জীবনে যিনি 'সাহিত্যে নীতি ও দুর্নীতি'র অন্যতম কর্ণধার হয়েছিলেন। এবং কৌতুক এই যে, লোকের সেইটিই মনে আছে। সেটাই মানুষের এমনি রুচি! কিন্তু এই উড়িষ্যার চিত্রও না উপন্যাস, না ভ্রমণ কাহিনী, না ইতিহাস। এও যেন এক আশ্চর্য রস-সাহিত্য রম্য-রচনার দলের। এক কথায় চিত্রই বটে। এ লেখাগুলি বেরিয়েছিল সরলাদেবী সম্পাদিত ছোট ভারতীতে (১৩০১-১১) উড়িষ্যার গ্রামের সহরের করদ রাজা জমিদারদের প্রতাপান্বিত সদর-অন্তঃপুর চিত্রও আছেই। তা ছাড়া দেশ, প্রজা, পঞ্চায়েত, পাঠশালা, ক্ষুদ্র রাজসভা, মন্দিরের দেবালয়ের কথা, উড়িষ্যার সাধারণ পুরুষ মেয়ে নিয়ে চমৎকার চিত্রাবলী। আজও পড়তে নতুন লাগে। এঁর লেখা 'ধ্রুবতারা' 'অনুপমা' উপন্যাসও ছিল। সে অবশ্য উড়িষ্যার চিত্রগুলির মত নয়। কিন্তু সুলিখিত উপন্যাস। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন সিংহ রস-সাহিত্যে প্রায় লুপ্ত। সাহিত্যে নীতিরক্ষক শুধু! এবার বলি, আমাদের প্রথম মহিলা উপন্যাস রচয়িত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতার' কথা। বেশ বড় বই, দু'খণ্ডে লেখা। ঘাত-প্রতিঘাত আছে হিন্দু ব্রাহ্ম নয়, সমাজ নিয়ে। উৎপীড়িতা অবহেলিতা বিধবার কথা নিয়ে। একালের ছেলেমেয়েরা স্নেহলতা পড়েছেন কিনা জানি না। সবশুদ্ধ প্রায় একশো বছর আগের একটি সমাজ-চিত্র। সবে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সুরু হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষারও শৈশবকাল।

স্নেহলতা পালিতা মেয়ে—জগৎবাবুর পালিতা কন্যা।

জগৎবাবুর নিজের ছেলেমেয়ে আছে—চারু ও টগর। ছেলে চারু স্নেহলতার ওপর ঝুঁকেছিল। বিবাহে বাধা ছিল না। অনাথ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে? তাই সে প্রস্তাব চারুর মায়ের পছন্দ ছিল না। তারপর স্নেহলতার বিবাহ ও বৈধব্য এবং পরাশ্রিত জীবন সুরু। কিন্তু এতবড় উপন্যাসখানাতে ত শুধু ঐটুকু কাহিনী নেই।

জীবনবাবুর মা জগৎ ডাক্তারের গৃহিণী, পাড়া প্রতিবেশিনী নিয়ে তাসখেলায় গল্পের আসর। ঐ সব গল্পের আসরে যোগ দিতে পাল্কি করে এবাড়ী-ওবাড়ী যাওয়া-আসা। মাটির বাসন সেঁকতাপওয়ালা সেকেলে কঠোর বিচার-আচারভরা আড়ুঁড় ঘরের কাহিনী। স্নেহলতার চরিত্র দেবর নীচ প্রবৃত্তি। আবার তার বিষয় লুব্ধতা এবং ফাঁকি দেবার চেষ্টা স্নেহকে। চারুর স্নেহের প্রতি মোহ দুর্বলতা আবার পরে নিজের স্ত্রীর কাছে তাকেই অনায়াসে উপেক্ষা অবজ্ঞা···টগরের ও টগরের জননীর বিরক্তি ও উপেক্ষা ত ছিলই।

জগৎবাবুর ও জীবনের সেইজন্য স্নেহলতার উপর করুণা ও মমতা। তবু স্নেহ আর সইতে পারল না। শেষে স্নেহলতার আত্মহত্যাতে কাহিনী শেষ।

পরিণামে জগৎবাবুর স্ত্রী শিক্ষার উপর বক্তৃতা।

এ বইয়ের কথাও আমরা ভুলে গেছি। মনস্তত্ত্ব প্রয়োগের আধুনিক বাড়াবাড়ি নেই। না থাক। চমৎকার গল্পে 'কন্ট্রাস্ট' মনের কথার কথাও কম নেই। আমরা পাঠকরা গল্পই চাই, গবেষণা চাই না।

আর একখানি এঁরই বই জগদীর 'ইমাম বাড়ী।' ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে কাহিনী। দানবীর হুগলীর বিখ্যাত হাজী মহম্মদ মসীন ও তাঁর বোন মুন্নাজানের জীবন নিয়ে আরেক ধরনের চমৎকার উপন্যাস। হাজী সাহেব আর মুন্নাজানের পিতামাতা এক নন। গল্পটি মনস্তত্ত্ব ছোঁয়া। ভারি সুন্দর করে রচিত।

কয়েকটি প্রবন্ধ মনে পড়ছে। কিন্তু কে একালের ছেলেমেয়ে পড়েছেন জানি না। ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ।'

৬০ বছরেরও আগে আমাদের শৈশবে হয়ত পিতা পিতামহী আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন। কিংবা আমরাই ওই বইয়ের সহজ সরল চমৎকার কথা আলাপের ভাষায় লেখা পড়ে আলমারি থেকে বার করে নিয়েছিলাম, মনে পড়ে না।

প্রবন্ধের মত মোটেই গুরুগম্ভীর নয়। উদাহরণ দৃষ্টান্ত গল্প-কথায় ভরা নানা ইঙ্গিত দিয়ে লেখা পারিবারিক বিষয়ের সমস্যার উপর নিবন্ধ। তাতে ছিল একান্নবর্তী পরিবারের নানা কথা। আচার-ব্যবহার, বন্ধু স্বজন, লোক লৌকিকতা, শোক, রোগ, বিপদ, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, সখি সই মিতিন, কত রকমের আলোচনা, সমস্যা বঞ্ঝাটের সমাধানের ইঙ্গিত তাতে। বই পড়ে অবশ্য সমস্যার সমাধান হয় না লোকে বলবেন, তবু তা লোকে লেখেন। আর আমরা পড়িও। পড়তে ভালও লাগে ত। ঠিক মনে হয় একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্নেহশীল স্বজন-বৎসল পরিবারের কর্তা পরিজনদের নিয়ে বসে বসে নানা সময়ে যেসব গল্প করেছেন তারই সংগ্রহ-মালা। এখনকার মানুষ আর এসব পড়েন কি না বলা শক্ত। সেকালের একান্নবর্তী সংসার সহর-সমাজে সর্বত্র হয়ত আর নেই। কিন্তু সমস্যাগুলি আলোচনাগুলিতে ভাববার মত জিনিষ আছে। ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

তারপর পড়লাম সহসা এক সময়ে ১৩০২-০৩ সালে মনে হয় দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণী কথা"। চকচকে মলাটে রূপালী ছবি। সীতা অশোক বনে দাঁড়িয়ে। মূল্য মাত্র ১টাকা। ছবি বা বাঁধানোর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের অমূল্য ভূমিকাই তার রূপ আরও বাড়িয়েছিল।

বইখানি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক। ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য কিন্তু রসিক মানুষ কি পড়েন? দশরথ রাম কৈকেয়ী কৌশল্যা ভরত সীতা হনুমান চরিত্র আলোচনা বাংলায় এমন করে প্রথম। মনে পড়ছে হিমালয় কথা, বোধ হয় প্রথম হিমালয়। জলধর সেনের 'হিমালয়'। সেকালের পাঠক-পাঠিকা আমরা কি মুগ্ধ মনেই ঐ সঙ্কট-সঙ্কুল তীর্থ ভ্রমণ কথা পড়তাম তখন পরিব্রাজক নাম। জলধর সেনের প্রথম সাহিত্যিক পরিচয় 'হিমালয়েই'। তারপর তাঁর ছোট গল্প, বড় গল্প, উপন্যাস অনেক বেরিয়েছে। তখন তিনি আর পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী নন, গৃহী হয়েছেন। এবং হয়েছেন ভারতবর্ষের সম্পাদক অজাতশত্রু এবং সর্বজনীন সাহিত্যিকদের জলধর দাদা।

মনে পড়ছে "অভয়ের কথা"। কোন্ সময়ে (১৩১৫-১৬ সালে?) কোন্ সাল মনে পড়ে না ঠিক। 'মানসী' পত্রিকা তখনও "মানসী ও মর্ম্মবাণী" হয় নি। শুধু 'মানসী'ই ছিল ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা মুখোপাধ্যায়দের সম্পাদনায়। সেই 'মানসী'তে বেরোত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা'। তখন 'অভয়ের কথা' পড়বার বয়স এবং মন নয়। কতকাল পরে দেখলাম বইখানি বই আকারে। পূজনীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখক পরিচিতি ও ভূমিকা নিয়ে। আর একখানি ছবি লেখকের। লেখক বই প্রকাশের অনেক আগেই লোকান্তরে গমন করেছেন।

তার অনেক দিন পরে মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় আবার তার একটি সংস্করণ বেরোয়। এবারে রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকা ও মোহিতলালের বক্তব্য সমন্বিত হয়ে।

সংসারের ভয়ে-অভয়ে-মেলা জীবনে তখন ঘাটের কোঠায় পৌঁছেছি। বই হাতে নিয়ে চোখ আর ফেরে না। ভূমিকা। লেখকের পরিচয়। আর লেখকের ছবি। শক্ত কলার দেওয়া সার্ট গায়ে প্রসন্ন মূর্তি, যেন চিরকালের আত্মীয়ের মত এক আশ্চর্য স্নিগ্ধ দৃষ্টি মানুষের দিকে আমার চোখ চেয়ে রইল। সেই ছবির এর বেশী বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই।

তারপর বই 'অভয়ের কথা'ই বটে। যদিও তাঁর কথা বিষয়ে মন্তব্য বা কিছু বলা আমার এলাকার বাইরের বিষয়।

কিন্তু পড়লাম, ধর্ম, কর্মফল, মানুষ, তার সুখ দুঃখ, তার জগৎ, তার অনির্বচনীয়ের অন্বেষণ এবং কেন কি জন্য, কিসের আকাঙ্ক্ষা—কাকে চাওয়া, সে কথা লেখক যেন নিজের মনে নিজের কাছেই বলে চলেছেন—বাইরের শ্রোতাকে নয়।

আর ওঁদেরই দার্শনিক পরিভাষায় সমস্যার 'পেঁয়াজের খোসা'গুলি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খুলে ফেলছেন।

দেখালেন কর্মবাদ কর্মফলবাদের দোষ-গুণ, তার আদি সূত্র কথা। কিন্তু জানি ত আমি এ সব বলতে পারব না। বই কাছে থাকলে কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া যেত। নেই কাছে। যাঁর আগ্রহ হবে তিনি সহজেই বড় লাইব্রেরীতে পাবেন। এবং পেলে আমার মত তিনিও 'লেখক' 'লেখা' ভূমিকা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। সহসা লেখক কয়েক পাতার পর কর্মবাদ জন্মান্তর পাপ পুণ্য ইহলোক পরলোক সব কিছু সমস্যা আনলেন। জড় করে মিটিয়ে দিলেন একটিমাত্র সমাধানে। 'লীলাবাদ'। তার পর চলল লীলাবাদের ব্যাখ্যা। এল "ঠাকুরাণীর কথা"। প্রকৃতি পুরুষের কথা। এবং লীলাবাদ মানেই 'আনন্দবাদ'। মনে পড়ে যায় উপনিষদের শ্লোক—কিন্তু বলেছি ত বইখানি শুধু পড়বার। আর অবাক হয়ে শোনবার। যা লোকে চিরকাল শুনেছে সাধুমুখে, গুরুমুখে, মুনি ঋষিমুখে। চিরকাল শুনবে।

অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ সেদিন গল্প ভারতী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ '৭২) লিখেছেন নিজের অধ্যাপক জীবনের প্রথম পদক্ষেপের স্মৃতিকথায়—চোখে পড়ল।

লিখেছেন—ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরাট পণ্ডিত। ছাত্রমহলে মস্ত নাম। ধুতি পরা, উড়ানি গায়ে, পায়ে তালতলার চটি। গলায় শাদা উপবীত। খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। গণিতের অধ্যাপক। দেখলে মাথা নত হয়ে আসে। বলেছিলেন 'ভয় কি রে'... ক্লাসে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করে দিলেন। এঁরই লেখা বিখ্যাত বই 'অভয়ের কথা'। বুঝলাম 'অভয়ের কথা' উনিই লিখতে পারেন।"

এর পর মনে পড়ে ছোট একখানি বই। নাম 'ইয়োরোপের চিঠি।' লেখক হলেন দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকার। লীলাবতী সরকার সম্পাদিত রচনা। লেখাটি কি করে হাতে পড়েছিল মনে নেই। 'কন্ধ যেমন স্নিগ্ধ তেমনি গভীর স্বচ্ছ রচনা-ভঙ্গি। যেন সাহিত্য-জগতে প্রচারহীন একটি আশ্চর্য সাহিত্যিক মানুষকে দেখতে পেলাম। চিঠিগুলি বাড়ীতে স্ত্রীকে ও পরিজনদের লেখা। ব্যক্তি মানুষ। দার্শনিক মানুষ। দর্শনের বিষয় বলতেই তাঁর ইয়োরোপ যাওয়া। মনে নেই কোথায় গিয়েছিলেন। আর দার্শনিক লেখাতে মানুষে মিলিয়ে সেই পত্রাবলী পড়বার লোক নিশ্চয়ই ছিলেন। আছেনও হয়ত। কিন্তু বইখানি যেন উপেক্ষিত বইয়ের পর্যায়ে চলে গেছে।

আগেই যদিও পারিবারিক প্রবন্ধর উল্লেখ করেছি, আবারও এসে পড়ছে মনে ভূদেব বাবুর সামাজিক প্রবন্ধ। না বললে চলবে না। কি অদ্ভুত দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, আবার জাতির দোষ-গুণ বিচার। কি সংযমস্নিগ্ধ গভীর রচনা ও ভাষা।

অবান্তর হলেও মাঝখানে বলি। অনুরূপা দেবীর মনে ভারি ক্ষোভ ছিল। তাঁর লেখায়, তাঁর কথায় সেটা প্রকাশ হয়ে যেত, যে, তাঁর পিতামহদেবের এবং তাঁর রচনাবলীর যথোচিত সমাদর ও সম্মান হয় নি। "কথাটা খানিকটা সত্য হলেও সবটা কি করে সত্য বলে মেনে নিই? এখনও ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর তাঁর রচনাবলীর আদর মনীষী সমাজে কম নয়।

বইটার সব পরিচিতি দেওয়া সম্ভব নয় শুধু প্রবন্ধ বিভাগের নামগুলিই বইটির পূর্ণ একটি পরিচয় বহন করে আনবে।

ছটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় জাতীয় ভাব। তাই ধরে ছোট ছোট পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে। 'জাতীয় ভাবের উপাদান', 'ভারতবর্ষে মুসলমান', 'ভারতবর্ষে খ্রীষ্টানাদি', 'ঐতিহাসিক প্রকৃতিভেদ', 'জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের পথ'।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হ'ল সামাজিক প্রকৃতি। ছোট ছোট নিবন্ধে হিন্দু সমাজের নানা বিভাগের ও বিষয়ের আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায় হ'ল পাশ্চাত্য ভাব। নিবন্ধগুলির কয়েকটির নাম দিই লেখকের অপূর্ব চিন্তা জগৎ দেখাবার জন্য। ইংরাজ সমাগম। স্বার্থপরতা। উন্নতিশীলতা। সাম্য। বৈজ্ঞানিকতা। রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব। ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়। নাম হ'ল ইংরাজাধিকার। নিবন্ধ মাত্র তিনটি। কিন্তু অসাধারণ আলোচনা। ইংরাজের বণিক ভাব, রাজ ভাব। বৈদেশিক ভাব।

সবগুলি জড় করে বঙ্গ-ভাষা রচনা করতে পারেন ক'জন?

পঞ্চম অধ্যায় হ'ল ভবিষ্য বিচার। নিবন্ধ তিনটি মাত্র। সাধারণ কথা। ইয়োরোপের কথা। ভারতবর্ষের কথা।

কিন্তু ভারতবর্ষের কথাতে রয়েছে আরও বিভাগীয় ছ'টি নিবন্ধ প্রবন্ধ (১) উপনিবেশ যোগ্যতা, (২) ধর্ম, (৩) সমাজের রীতি, ৫ আর্থিক, অনেক বিষয়ে শেষে উপসংহার। ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধটি আজকের দিনে ভাল করে আলোচনা যোগ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম কর্তব্য নির্ণয়। প্রথম নিবন্ধটির নাম 'মেঘ প্রতীক্ষা'। সেটি ধরে নানা সূত্র আলোচনা করেছেন লেখক পড়বার ও ভাববার মত বিষয়।

স্বর্গীয়া শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীর উদ্দেশে আমি শুধু বলতে পারি প্রচারের ঢাক না বাজালে ঢেঁড়া না পেটালে যখন লোকে কান দেয় না, শোনে না, তখন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা আমরা যে শুনতে পাই নি, পাব না সেইটি স্বাভাবিক। কিন্তু তবু কিছু পাঠক তাঁর আছেন। এবং লেখাগুলি চিরকালের বস্তু হয়ে আছে। নাই বাজল ঢাক।

এরপরে বলি একজন উপেক্ষিত বিখ্যাত 'সাহিত্য' সম্পাদক এবং সাহিত্য সমালোচক সুখ্যাতিহীন সুবিখ্যাত সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের কথা। "সাহিত্য" সম্পাদক সমাজপতি। অন্য পরিচয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। হেমলতা দেবীর পুত্র। তাঁর লেখা ছোট গল্পের বই মাত্র একখানি আমরা দেখেছি, নাম 'সাজি'। অন্য লেখা হ'ল প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখা সমালোচনা সাহিত্য। সরল, কটু, তিক্ত, ক্ষুব্ধ, মুগ্ধ, মধুর নানা রসে রঙ্গে রহস্যে সমাবেশিত সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ থেকে পরবর্তী ছোট বড় মাঝারি কোন সাহিত্যিকই তাঁর কলমে ছাড়া পান নি। অকুণ্ঠ সুখ্যাতি ও নির্মম সমালোচনা তিনি পক্ষ নির্বিশেষে করেছেন।

তাঁর লেখাগুলি সংকলন করে সম্পাদন করা গেলে সেই সময়ের সাহিত্য-জগতের দুই পক্ষকে জনসাধারণ দেখতে পেত।

'সাহিত্যে' অনেক ভাল গল্প বেরিয়েছে। ছবিও। বিদেশী অনুবাদ গল্প ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বেরুত। সৃষ্টিমূলক সাহিত্য তাঁর আর ছিল কিনা জানা যায় না। প্রথমকার সৃষ্টিশক্তি যেন তাঁর সমালোচনাতেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল

আর একজন উপেক্ষিত লেখিকা প্রসিদ্ধ সম্পাদিকা ও সমাজকর্মী হলেন এক যুগের ও বেশি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা।

কিন্তু কি করে তিনি সাহিত্য-জগতে 'একপেশে' হয়ে বসে রইলেন বলা শক্ত। বহু কথা ও সংশয় জাগে এই প্রসঙ্গে। সঙ্গীতে ভারতী সম্পাদনায় সমাজকর্মে তিনি নেতৃস্থানীয়া

তিনি রবীন্দ্র প্রসার পান নি? পাশে কেউ ছিলেন না? কেউ প্রচার করে নি? কোন রচনা সংগ্রহ নেই?

সঙ্গীতজ্ঞা অসাধারণ সুগায়িকা এমন তেজস্বিনী মনস্বিনী মহিলার কাজ ও কথা আমরা ভুলে গেলাম কি করে? বইয়ের মধ্যে তাঁর একটি সঙ্গীতের গ্রন্থ আছে — 'শত গান'। স্বরলিপি সহ। আর আছে 'জীবনের ঝরা পাতা' নামে আত্মকথা। সংক্ষেপে বাল্য-যৌবনের কথা ও সাহিত্য কথা।

সাহিত্য-জগতে সম্পাদনা বিভাগে তাঁর সাহিত্যিক ও সম্পাদকীয় দান বেশ কিছু ছিল বৈ কি। কিন্তু কেউ সেগুলি সঞ্চয় ও সংগ্রহ করে রাখে নি। তিনি নিজেও কিছু করেন নি। 'ঝরা পাতা'য় মাত্র সেই স্মৃতিগুলি ধরে দিয়েছেন। তাতে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছেন, 'সরলার এডুকেশন পারফেক্ট হয়েছে'...। তাঁর ইচ্ছা, সরলা দেবী য়ুরোপ যান ...। এর পর আর দু'একটি এক সময়ে বিখ্যাত, এখন বিস্মৃত লেখকের বইয়ের কথা বললেই আমার মনে থাকা লেখক আর পুস্তকের কথা শেষ হয়।

একজন হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক। 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক চিন্তাশীল লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়। দীর্ঘায়ু ছিলেন। বহু বিষয়ে আলোচনাময় প্রবন্ধ নিবন্ধ ছিল। আছেও হয়ত। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরে একটি রচনা 'প্রক্ষেপ' করেন। এখনও আছে। 'চন্দ্রালোক' নামে।

'পিতা-পুত্র' নামে একটি আত্মকথা লেখেন। আরও দু'একখানি বই আছে। লোকে কিন্তু এঁকে ভুলেছেন।

আর একজন হলেন স্বর্গীয় নমস্য মহারাষ্ট্রীয় মানুষ বাঙ্গালী লেখক, বাঙ্গালীই বলা চলে।

নাম হ'ল সখারাম গণেশ দেউস্কর। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের বিখ্যাত বই প্রসিদ্ধ 'দেশের কথার' লেখক। সেকালে যে বইয়ের পনের-ষোল সংস্করণেরও বেশী ছাপা হয়েছিল। আশ্চর্য অনুসন্ধিৎসাময় ও তথ্যপূর্ণ রচনা। দেশের নানা বিষয়ের আলোচনা ইংরাজ আমলের ও তার আগের ভারতবর্ষের। অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিক বাংলাপ্রেমিক মানুষ ছিলেন।

১৯০৫।৬ সালে মনে হয় হিতবাদী (সাপ্তাহিক) পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকও ছিলেন। যে বাংলা ভাষা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষার সমান ছিল। এমনি লেখা।

এঁকে আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। কোনখানে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 'সাহিত্য পরিষদ' বা 'মহাজাতি সদনে' প্রদেশীয় বঙ্গ-প্রেমিকের ছবি আছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের বাল্যে ইনি বিখ্যাত 'স্বদেশী-ওয়ালা' ছিলেন, বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। অবান্তর হলেও বলি, এঁর একমাত্র কন্যাকে একবার সিটি বুক সোসাইটিতে দেখেছিলাম। বাঙ্গালী বিধবার মত বেশ-বসন। মিষ্টি কথাবার্তা। বাংলাতেই কথা বলেন। মারাঠি বিধবার মত কাপড় পড়েন নি। মনে হয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিবারের মত এঁরাও বাঙ্গালী উপনিবেশী হয়ে গেছেন।

আর একখানি চমৎকার বই। নাম "ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ"। অনুবাদ ফরাসী থেকে। লেখক বিখ্যাত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেউ পড়েন কি না জানি না। বইখানি সাহিত্য পরিষদ ছাড়া আর কোথাও আছে কি না তাও জানি না। কিন্তু উপেক্ষিতদের দলের বই। যদিও দীর্ঘকাল ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে।

আরেক জন লেখক এঁকে এবং এর রচনাকে আমরা সকলেই প্রায় ভুলে গিয়েছি দু'একজন ছাড়া (শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী ছাড়া)। এঁর নাম না করলে আমার ভুলে যাওয়া লেখক ও বইয়ের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁর নাম বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। ভাগলপুর প্রবাসী ডাক্তার ছিলেন। ১৩২৭।২৮ সালে লিখতেন সেকালের বঙ্গবাণী", "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায়। ব্যঙ্গ লেখক 'স্তাটায়ারিস্ট' যাই বলুন। মাত্র দু'খানি বই বই-আকারে বেরিয়েছিল "দশচক্র" ও "যোগভ্রষ্ট।"

একটি বা দু'টি নাটক 'বঙ্গবাণী' পত্রিকাতেই। উপন্যাস দশচক্র গল্পগুলিও ঐ সব পত্রিকাতেই বেরোয়। গল্পগুলি ও উপন্যাসের ভাষা বাচনভঙ্গি লেখার তীক্ষ্ণ শাণিত ধরন সবই ব্যঙ্গধর্মী। কিন্তু সেই ব্যঙ্গ বা শ্লেষের বিশেষত্ব হ'ল এই যে, নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে কৌতুক ব্যঙ্গ নয়, নিজেকে 'নায়ক' করে একটি 'আমি'র ভূমিকা নিয়ে তার মুখ দিয়ে অথবা আপনাকে নিয়েই সেই ব্যঙ্গোক্তি। প্রতিটি তীক্ষ্ণ উক্তি শ্লেষ বিদ্রূপ নায়কের প্রায়ই নিজেকেই বলা। তাঁর দু'টি প্রসিদ্ধ (তখনকার। এখন হয়ত কেউ জানেন না) গল্প "নরকের কীট" শনিবারের চিঠি (১৩৩৪ ?) আর "সিরাজীর পেয়ালা" বঙ্গবাণী (১৩৩৩.৩৪ আশ্বিন) ঠিক ঐ ভঙ্গিতে লেখা। একটির নায়ক পুরুষ, অন্যটির (সিরাজীর পেয়ালা) হলেন মেয়ে! ওরকম মেয়ে হয় কি না, ছিল কি না, আছে কি না জানি না।

পড়ে কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল কথাগুলি মেয়েদেরই কথা। তাদের মনের না-বলা কথা। হয়ত যা তারা বোঝে না। হয়ত জানে না। সম্ভবত বলতে শেখেনি। সেই কথাই লেখক তাদের একজনকে সৃষ্টি করে একটি 'আমি' রূপিনী নায়িকার মুখ দিয়ে সমাজের কোনে-থাকা শান্ত নির্বোধ ভীরু ভীতু মেয়েদের মাঝখানে সেই আগুনের ফুল্‌কিগুলি ব্যঙ্গ তেলে জেলে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। যেন তোমাদের হয়ে একে দিয়ে আমি বলিয়ে দিলাম! তোমাদের ত সাহস ভরসা রচনাশক্তি নেই। লেখককে বেশীর ভাগ পাঠকই ভুলে গেছেন মনে হয়। গত বৎসর তাঁর লোকান্তর হয়েছে। অনন্যসাধারণ চরিত্রের তেজস্বী মানুষ ছিলেন।

লেখা পড়া ছিল। সাক্ষাৎ ভাবে চিনতাম না। সহসা একদিন দেখেছিলাম হরিদ্বারে কনখলের রামকৃষ্ণ মিশনে। শাণিত খড়্গের মত দীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। প্রচারবিমুখ স্বভাব। ধরণটা যেন, 'যা ছিল তা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছি। ওতে আমার আর দরকার নেই। তোমাদের ইচ্ছে হয়ে কুড়িয়ে নাও।'

যখন আমি তাঁর লেখার একজন অনুরাগী পাঠিকা বলে জানালাম, তাঁর নির্লিপ্ত নিস্পৃহ "নির্মাণ মোহ" কিছু সঙ্কুচিত ভাবটা যেন ঐ ছিল। (এঁর অজস্র ব্যঙ্গ কবিতা, ছোট ব্যঙ্গ গল্পও ঐ সময়ের পত্র-পত্রিকায় আছে।) খ্যাতিমোহমুক্ত মানুষের মত শুধু 'বললেন আমি আর ও সব লেখার কথা ভাবি না। ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন।'… যে উক্তির কাছে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা প্রশংসা প্রতিহত হয়ে যায়।

বিস্মৃত লেখক ও বিস্মৃত রচনার কথা আমরা যতটা ভুলি নি সেইটুকুই লেখা হ'ল। মহাকালের সাহিত্য বিচারের হিসাব-নিকাশের ধরণ—আমাদের জানা নেই।

এঁদের কোথাও বা রচনা, কোথাও বা লেখক, কোথাও বা লেখক এবং রচনা দুইই বিস্মৃতি সাগরে ডুবে গেছেন।

এঁদের লেখা থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম জানি না। কিন্তু দেখছি ভুলে ত যাই নি। লেখকের ও লেখার যা পরম পুরস্কার মনে হয়। কেন ভুলে গেলাম না তাও ভাবি।

কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ভুলে যাওয়াটাই বোধ হয় নিয়ম।

মানুষ পুরোণকে মনে রাখতে পারে কি না, চায় কি না, উচিত কি না সে কথা পণ্ডিত বিদ্বান ঐতিহাসিকরা ভাববেন। "ভুলি নাই" বা "কে বলে যে ভোলো নাই" সে কথাও মানুষই বলেন। কবির কথা। মহাকবির ভ'রকম উক্তি।

সাধারণ আমরা দেখছি বাংলা সাহিত্যে বন্যার স্রোতের মত কথা কাব্য-কাহিনীর প্লাবন এসেছে। ঢেউএর পর ঢেউ এসে পাঠকের মনের সঞ্চয়গুলি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। 'পাড়' ভেঙে 'চর' পড়ে যাচ্ছে, পাঠক জাতের স্মৃতির স্রোতের ওপর। পাঠক আমরা যেন অভিভূত হয়ে সেই ভাঙন আর জাগরণের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে যাঁরা এই সাহিত্য-জগতকে দেখছেন, তাঁদের মনে হচ্ছে যেন কোনখানে কি একটা অভাবের গভীর খদ (খাদ) দেখা যাচ্ছে। এই প্রবাহে তা' ভরে গিয়েও, চাপা পড়েও যেন দূরে দূরে নদীর বুকের কঠিন ধূসর মুখের বালির চরের মত চরের ব্যবধান জেগে উঠছে।

দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির জগতে যেন তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে। মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই ছোটবেলায় দেখা বাজীকরের বাজীর খেলা। আমের আঁটি পুঁতল। জল দিল। একটু পরেই গাছ হ'ল। তারপর পাতা মুকুল ধরল। ফল ধরল তারপর। দেখতে দেখতে সবুজ থেকে রং ধরল। আম পাকল তার খানিক পরে গাছটা মরে গেল। কেউ সে আম খেয়ে দেখেছেন কি না সত্য আম কি না কিংবা পাকা কি না তা আর জানি না।

শুধু দেখছি যে আনন্দ, যে বিস্ময় সৃষ্টির ও অনুভবের গোড়ার কথা, লেখকের লিখতে, পাঠকের পড়তে রস-সাহিত্য পড়াতে শোনাতে, বলতে ও শুনতে ইচ্ছার আদি কথা—সেই মুহূর্তগুলি নানা রঙের আনন্দ নিমেষগুলি সামনে এসেই দ্রুত পদে বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে লেখক ও পাঠকের অবসরহীন বছর মাস ও দিন কালের স্রোতে। পাঠক ও লেখকের চারদিকে 'সময় নেই' সময় নেই লেখা ফুটে উঠছে। কারুকে মনে রাখার সময় আর আমাদের নেই তবু কোন কোন লোকের দুর্বল মন বলে "তবু মনে রেখো"

শোক

শৈবাল চক্রবর্তী

এইখানে বসত সুশান্ত।

পাশের চেয়ারটার দিকে তাকাল সরিৎ। রোজ তার পাশে বসে কাজ করত। তার ফাঁকে ফাঁকে চলত গল্প, হাসি, চা খাওয়া। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট সরিতের টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলত, 'নে রে। নিজের পয়সায় ত আর খাবি না। পরের পয়সাতেই ধোঁয়া ছাড়।'

আর কোনদিন সুশান্ত এখানে বসবে না। এই 'না'-টাকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সরিৎ। একটা অমোঘ, নিষ্ঠুর এই 'না'। সংসারে অনেক জায়গাতেই এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সরিৎ। সুশান্ত আর এখানে বসবে না, কথা বলবে না, চৌরঙ্গীর কফির দোকানে জলন্ত সিগারেট হাতে আর শোনাবে না সে ইংরেজী সিনেমা'র গল্প। না, না মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলেও যা গেছে তা আর ফিরবে না।

একটা রোমশ হাত যেন এখান থেকে মুছে নিয়ে গেছে সুশান্তর সব চিহ্ন। সরিৎ মাঝে মাঝে সেই হাতটাকে দেখতে পায়। যেখানে তার ছোঁয়া পড়ে সেখানটা অঙ্গার হয়ে যায়, পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

সরিৎ তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সুশান্তর শূন্য চেয়ারটা যেন আগুন ধরে গেল মন্ত্রবলে! হাতল পায়া ঢাকা পড়ে গেল লকলকে শিখার আড়ালে। সেই শিখাগুলি কিন্তু ঢাকতে পারল না সুশান্তর মুখ, সেই মৃদু মৃদু হাসি, উৎসাহভরা চোখ সব দেখতে পেল সরিৎ।

অনেক দিনের বন্ধু তার, প্রায় সাত বছরের। এই দীর্ঘ সময় তারা পাশাপাশি বসে কাজ করেছে, এ-ওর বাড়ী খেয়েছে, প্রয়োজনে টাকা ধার করেছে, আবার শোধ দিয়েছে মাইনে পেয়ে।

যে একটা বছর সুশান্ত সিংভূমে ছিল সরিৎ যেন আধমরা হয়ে ছিল সেই বছরটা। টাইপিষ্ট কাকলী মিত্র বলত, 'কি ব্যাপার সরিৎবাবু, বিবাগী হয়ে যাবেন না কি বন্ধুর বিরহে? মণিহারা ফণী কথাটা বইতেই পড়েছি, এখন চোখের সামনে দেখছি।'

আর সুশান্ত যে সিংভূমে কি অবস্থায় ছিল তাও কারও অজানা নেই। বদলীর অর্ডার নয় যেন বাজ পড়েছিল তার মাথায়। সুশান্ত ছিল কলকাতার সঙ্গে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা। চাকরি ছাড়া সে আরও পাঁচটা কাজ করত। একটা মাসিক পত্রিকায় সিনেমার রিভিউ লিখত, ভবানীপুরে একটা টিউটোরিয়ালে পড়াত সপ্তাহে দু'দিন, এছাড়া প্রাইভেট টিউশনি ছিল গোটা দুই-তিন। তার সমান অবস্থার চাকুরিয়াদের মধ্যে সুশান্তর অবস্থা ছিল বেশ স্বচ্ছল। পয়সার ব্যাপারে ভারী দিলদরিয়া ছিল সে।

সেই সুশান্তর ওপর যখন হুকুম হ'ল তিনদিনের মধ্যে বাক্স-বিছানা বেঁধে সিংভূম রওনা হও নতুন ব্রাঞ্চ খুলতে, তখন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়া কাকে বলে সে বুঝতে পারল। টাইপ-করা কাগজটা পড়েই সে ছুটে ম্যানেজারের ঘরে গিয়েছিল, বলতে গিয়েছিল অনেক কথা কিন্তু তার আগেই গম্ভীর মুখ ম্যানেজার মেয়েলি গলায় বলে উঠলেন, 'কান্ট হেল্প'। ম্যানেজারের এই কান্ট হেল্প যে কি মারাত্মক তা যারা ছ মাস চাকরি করেছে তারাই জানে। ঠাণ্ডা-ঘর থেকে বরফ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সুশান্ত।

কাঁদো কাঁদো মুখে সুশান্ত একবার যায় এর কাছে, একবার ওর কাছে। কেউ বলল 'মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে ডুব মেরে দে', কেউ বলল, 'বল বৌয়ের ভারী অসুখ, এখন কলকাতা ছাড়া যাবে না।' কিন্তু দু'টি মতলবের কোনটাই কাজের নয়। এতদিন দিব্যি সুস্থ ছিলে আর আজ বদলীর অর্ডারটি পেতেই সব বিগড়ে গেল? আর ছুটি নিয়েই বা কদিন থাকা যায়?

কোম্পানী যখন ব্রাঞ্চ খুলতে চাইছে তখন বেশীদিন ছুটিও পাওয়া যাবে না। অন্ধকার চোখে যখন কোন পথই দেখতে পেল না সুশান্ত, তখন টাইম-টেবিল খুলে বসল। কলকাতা ছেড়ে যাবার কত ট্রেণ রয়েছে! স্ত্রী সবিতা জলভরা চোখে স্বামীর স্যুটকেশ গুছিয়ে দিতে বসল। তাদের বিয়ের তখনও বছর পোরে নি। এ বিচ্ছেদ যে কি করুণ তার ছবি সবিতার মুখে আঁকা! তার পা চলে না, কাজ করতে হাত সরছে না। সবিতাকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন এখন অবান্তর। বুড়ো শ্বশুরকে দেখার জন্যে তার থাকা দরকার।

কলকাতার ওপর একটা অভিমান নিয়েই সুশান্ত বেঙ্গল-নাগপুর এক্সপ্রেসে চড়ে বসল। এত লোক এখানে করে খাচ্ছে, শুধু আমারই একটু ঠাঁই হ'ল না, মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে চলল সে।

নতুন জায়গায় ক'দিন হোটেলে থেকে শেষে একটা মেসে গিয়ে উঠল সুশান্ত। ছোট শহর, শহর না বলে তাকে বড় গোছের গ্রাম বলাই উচিত, ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠল তার মন। দিন পনের পরেই একটা সোমবার কিসের ছুটি ছিল। শনিবার দিন রাত্রে গাড়ি চড়ে বসল সুশান্ত। বাড়ীর সবার মুখগুলি মনে করতে করতে ট্রেণে সমস্ত রাতটা আনন্দে মশগুল হয়ে রইল সে।

কলকাতায় এসেই আবার সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল। 'আই এ্যাম সরি চৌধুরী' (ঠিক যেন একটি তরুণী কথা বলছে), কোম্পানীর কাছে তার কাজটাই বড়, তোমার অসুবিধেটা নয়…। লিফ্‌টে নামতে নামতে সুশান্তর মনে হ'ল সে যেন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে। কালই তার ছুটি ফুরবে। কলকাতার সমস্ত মানুষ দৃশ্য পথঘাট খুঁটিনাটি তার কাছে কত চিত্তাকর্ষক বলে মনে হ'ল। এই ত ট্রাম! লাফিয়ে উঠে দেখল অনেকগুলো সীটই খালি! ইচ্ছে মতন একটা বেছে নিয়ে বসলেই হ'ল। জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা সিনেমা-হাউসের চোখ-ধাঁধানো প্রসাধন, মেয়েরা দোকান আলো করে ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনছে, স্কুলের বাসে একরাশ কচি ফুল—এমন বিচিত্র জীবন্ত দৃশ্যের সমাবেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে? আর কোথায় জীবন এত মধুর মায়াতে জড়ান আর এত রঙ্গরসের হাতছানি। ইপেজে নেমে বাড়ী মাত্র দু'মিনিটের পথ। গিয়ে দেখে ধোঁয়া-ওড়া চা আর জলখাবার তার জন্যে তৈরি! কিন্তু সমস্তই বিস্বাদ লাগল মুখে এই ভেবে যে, কাল এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাকে তৈরি হতে হবে ঘড়ি দেখতে হবে ঘন ঘন। বাবা, বোনেরা, পাড়ার প্রবীণ আশু মল্লিক, ছোটন সীতাংশু সবাইকে মনে হ'ল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পরিবারের সদস্য। এদের সবাইকেই অল্প অল্প ঈর্ষা করে মনে মনে নিজের ললাটে করাঘাত করল সুশান্ত। ঝড় নেই, দুঃখ নেই—এই কলকাতাবাসী এই লোকগুলির জীবন শান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত! সবাই বাজারে যাচ্ছে, অফিস থেকে ফিরে তাজা হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছে বারান্দায় বসে এইসব দেখে ঘোলাটে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই নিজের মনের প্রতিচ্ছবিকে দেখতে পেল সুশান্ত। 'তুমি কি কালই যাবে?' ক্ষীণ, দুর্বল স্বরে প্রশ্ন করল সবিতা। সুশান্ত চাইছিল সবিতা তাকে জোর করে বলুক, 'তুমি কাল যেতে পাবে না। কাল আমরা অমুক ছবিটা দেখব। পরশু যেও।' এ জোর হয়ত তার মধ্যেও সংক্রামিত হ'ত কিন্তু নিরুত্তাপ সবিতার কণ্ঠ আর তার কালিপড়া চোখের দিকে তাকিয়ে যেন হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা রেলগাড়ি দেখতে পেল সুশান্ত।

সুশান্ত সরিৎকে লিখত কি করি বল ত? আমি কলকাতায় হ্যানো-ত্যানো কাজ করে শ' দুই টাকা রোজগার করতে পারি। দেব না কি চাকরিটা জলে ভাসিয়ে? সরিৎ কি বলবে? দু'শ টাকার দাম কি আজকাল বিশেষ যে রোজগারের কোন গ্যারান্টি নেই! চাকরিতে বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যৎ আছে। সুশান্ত সব জানে। সরিতের চিঠি পড়ে তার সব যুক্তিগুলোই যথার্থ বলে মনে হয় তার কাছে। কিন্তু এখানে যখন মনটা হাঁপিয়ে ওঠে রোজ রোজ একই দৃশ্য দেখে দেখে, তখন ইচ্ছে করে কলকাতায় গিয়ে মুটেগিরি নিয়ে পড়ে থাকতে। ব্রাঞ্চে কাজও কিছু নেই, যা দুটো-একটা চিঠিপত্তর আসে, কোন রকমে একটা পর্যন্ত তা নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায়। তারপর খবরের কাগজটা এ-মুড়ো থেকে-ও মুড়ো পর্যন্ত পড়া, ব্যস্—দিনের সব কাজ সারা! কলকাতার সব খবরেই উত্তেজনা আর নেশা!

এইভাবে বিকেলটাকে ঠেলে পার করালেও, সন্ধ্যের সুরু থেকে রাত্রে খাওয়া এই সময়টা যেন পাথর হয়ে বসে থাকে বুকের ওপর। থমথমে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে গড়িয়াহাট, চৌরঙ্গীর আলোর জলসা দেখতে পায়। চুপচাপ ভূতের মত বসে কলকাতার বন্ধুদের ঘরকন্নার ছোটখাট ঘটনার কথা যখন ভাবে তখন মেসের গোবিন্দ রক্ষিত বিড়িতে টান দিয়ে বলে, 'কি দাদা, বৌদির ধ্যান করছেন না কি?' অমনি যেন সুইচ টিপে আলো জ্বালার মত তার সবিতাকে মনে পড়ে যায়। কি করছে এখন ও? কে জানে এখনও সবিতা কাঁদে কি না! কিংবা হয়ত আস্তে আস্তে ওর সয়ে গেছে এই বিচ্ছেদ, নিজেকেও মানিয়ে নিয়েছে এই নতুন অবস্থার সঙ্গে, হয়ত এই মুহূর্তে ও হাসছে (সবিতার দাঁত ভারী সুন্দর), বা রেডিও শুনছে। কিন্তু সুশান্ত আর পারছে না। দুনিয়াটা শুধু নিষ্করুণ নয়, একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের বেশ চলে যায় এই স্বার্থপরের রাজ্যে! নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মানুষ আত্মপর ভুলে যায়। সুশান্ত সরিৎকে লিখত কিছু ভাল লাগছে না ভাই, তুই একটা উপায় বলে দে। সরিৎ লিখল, 'বৌকে নিয়ে যা।' কিন্তু শুধু সবিতাকে পেলেই সুশান্তর নিঃসঙ্গতা ঘুচবে না। তার চাই পুরো কলকাতাটাকে। ট্রাম-বাস থিয়েটার জলসা সমেত এই গোটা শহরটাই শুধু তার মনকে সজীব করতে পারে। এর মধ্যে সবিতা লিখল, আমার নিয়ে যাও। শ্বশুরবাড়ীতে আছি অথচ স্বামীর দেখা নেই, এ কেমন কথা। আমি কি একটা ঝি না কি?' সুশান্তর মাথা আরও গরম হয়ে গেল এই চিঠি পড়ে। তার সঙ্গ পেলে সবিতার দিক থেকে এতটা নিরাশ হবার কারণ ঘটত না। কোন্ পথে যে এ সমস্যার সমাধান তাও তার জানা নেই। সম্ভব-অসম্ভব অনেক কিছুই চিন্তা করল সুশান্ত কিন্তু পথ খুঁজে পেল না কোনদিকে।

সুশান্তর সঙ্গে এখানে সবচেয়ে যাঁর অন্তরঙ্গতা হ'ল তিনি হলেন ডাক্তার ভুবন সান্যাল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সুশান্ত ভুবনবাবুর ডাক্তারখানায় গিয়ে বসত। কাগজ পড়া, নানারকম গল্প-গুজব চলত। ভুবনবাবু ষাট পেরিয়েছেন কিন্তু তাঁর মনটি ভারি সজীব। শুধু মাথার চুলই পেকে সাদা হয়ে গেছে, শরীরের আর কোথাও জরা তার স্পর্শ রাখতে পারে নি। রুগীদের ভীড় পাতলা হয়ে গেলে ভুবনবাবু সুশান্তর সঙ্গে গল্প সুরু করতেন। সুশান্ত যা বলত তার বেশীর ভাগই কলকাতার কথা। ভুবনবাবুর সঙ্গে কলকাতার যোগ খুব সামান্যই। নেহাৎ প্রয়োজন না পড়লে তিনি ও-মুখো হন না। 'আপনাদের ওই কলকাতায় মশাই মানুষ থাকে?' তিনি বলে উঠতেন, 'খাবার-দাবার কিছু মেলে না। দূর, দূর...।' ভুবনবাবু এখানে পাকাপাকি ভাবে বাসা বেঁধেছেন। বাড়ী করেছেন, গাঁয়ের দিকে ধান-জমি রেখেছেন খানিকটা। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন: একজন জামসেদপুরে, আর একটি ধানবাদে। একটি মেয়ে বাকি আছে আরও। ছেলে একটিই, এখানে কালেকটারের পি. এ। বেশ স্বচ্ছল সুখী সংসার। ডাক্তারবাবুর প্রশান্ত মুখে সেই নিশ্চিন্ততা টলমল করছে— যা এখনকার দিনের খুব কম মানুষের মুখে দেখেছে সুশান্ত। কথায় কথায় সে একদিন ভুবনবাবুকে বলে বসল, 'ডাক্তারবাবু আমাকে একটু দেখুন ত।' 'কেন, কি হয়েছে আপনার?' ভুবনবাবু সবিস্ময়ে বললেন। সুশান্ত একটু ম্লান হেসে বলল,' শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ক'দিন ধরে।' 'দেখি, দেখি, কাছে আসুন'। পাশের চেয়ারে বসিয়ে সস্নেহে ডাক্তারবাবু ওর বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'কই, কিছু ত দেখছি না। অল পারফেক্ট! কি—কষ্ট কি আপনার?' সুশান্ত তখন ইতস্তত: করে আসল কথাটি ভাঙল। তার শারীরিক অসুবিধে কিছু নেই, শুধু চাই একটি সার্টি-ফিকেট। তার বদলীর পালে এই সার্টিফিকেট দেবে হাওয়া। শুনে ভুবনবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। 'ও, তাই বলুন। আমাকে দিয়ে বেশ গা-হাত-পা টিপিয়ে নিলেন এ্যাঁ! কিন্তু মশাই, এসব কাজে আমার সার্টিফিকেটে ত ফল হবে না। এর জন্তে আপনাকে যেতে হবে সিভিল সার্জেনের কাছে।' শুনে সুশান্ত ভয় পেয়ে বলল, 'ও বাবা, তা হ'লেই গেছি। ভুবনবাবু বললেন, 'কেন, গেছেন কেন সিভিল সার্জন লোক ভাল, একবার বলেই দেখুন না।' ভুবনবাবুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে দুর্গানাম নিয়ে সুশান্ত একদিন

হাসপাতালে গিয়ে সিভিল সার্জেনের সঙ্গে দেখা করল। সিভিল সার্জেন তার কথা শুনেই বললেন, 'হোয়াট! কলকাতায় বদলী! মাথা খারাপ হয়েছে! কলকাতায় লক্ষ রোগের জীবাণু কিলবিল করছে আর আমি আপনাকে কলকাতায় বদলীর জন্যে লিখব! আমি কি পাগল! কলকাতার জল খারাপ, কলকাতার হাওয়াতে বিষ…' আগ্নেয়গিরির লাভা-স্রোতের মত ভদ্রলোকের বক্তৃতা বেড়েই চলল। সুশান্ত কোনমতে পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে।

এই ভাবে সুশান্ত যখন প্রথমে মানুষ ও পরে ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে বসেছে তখন একটা কাণ্ড ঘটল। একদিন নতুন ব্রাঞ্চের হিসেব-পত্তর দেখে ম্যানেজিং ডিরেকটরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। গত এক বছরে লাভের ঘরে শূন্য এবং খরচ হয়েছে তিনগুণ। বাজারে প্রতিযোগিতা অসম্ভব এবং ভবিষ্যতেও যে অবস্থা ফিরবে এমন আশাও কম। বাড়ী ভাড়া এবং ষ্টাফের পেছনে সেখানে খরচ হচ্ছে মাসে আড়াই হাজার টাকা। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বোর্ডের অনুমতি নিয়ে সিংভূমের ব্রাঞ্চ গুটিয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন। সে টেলিগ্রাম পড়তে পড়তে সুশান্তর চোখে জল এল, 'হুর রে' বলে সে ছুটল ভুবনবাবুর বাড়ী। 'আমি চলে যাচ্ছি ডাক্তারবাবু' হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সুশান্ত। 'এই দেখুন।' ভুবনবাবু তখন ভেতরের ঘরে ইজি-চেয়ারে শুয়েছিলেন, ছোট মেয়ে লীলা তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল। সুশান্ত আচমকা ওভাবে ঢুকতেই ভুবনবাবু সোজা হয়ে বসেছেন। সুশান্তর হাত থেকে টেলিগ্রামটা পড়ে তিনি বললেন, 'তাই ত! বাঃ, বেশ হ'ল! এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। কিন্তু সুশান্তবাবু'—

—বলুন।

—যাওয়ার আগে যে আপনাকে একদিন গরীবের বাড়ীতে দু'টি মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যেতে হবে।

—বেশ ত। সুশান্ত হেসে বলল, তা একদিন হবে'খন।

—হবে'খন নয়, হতেই হবে। ভুবনবাবু চোখ পাকিয়ে টেবিলে একটি ঘুষি মারলেন। আমার লীলা মা'র হাতের সুক্ত ত খান নি, তা হ'লে অমন হেলা-ফেলা করে বলতে পারতেন না। বলে তিনি মেয়ের দিকে তাকালেন।

বলা বাহুল্য লীলা এ কথায় লজ্জা পেল। রং এমনিতেই খুব ফরসা, তাই অল্পেই তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। কতই বা বয়স হবে ওর, সুশান্তর মনে হ'ল আঠার কি উনিশের বেশী নয়। ওর মেজ বোন রাণুর বয়সী, রাণু এবার পার্ট ওয়ান দিচ্ছে।

—তা হ'লে কবে আসছেন বলুন? ভুবনবাবু হাল ছাড়েন নি।

—আমি যাচ্ছি মঙ্গলবার। মাঝে দুটো দিন। কাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে কতকগুলো বোঝাপড়া করতে হবে। পরশু আসতে পারি।

—বেশ। ভুবনবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন, তোমার কোন অসুবিধে নেই ত মা সেদিন?

লীলা মাথা নেড়ে বলল, না। কিন্তু সকালে ত?

ভুবনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কেন? সকালে কেন? রাত্তিরেই ত ভাল।'

ছোট্ট খুকীর মত মাথা নেড়ে লীলা বলল, 'বা রে, রাত্তিরে বুঝি সুক্ত খায়?

—ও হোঃ! আমার খেয়ালই ছিল না। ভুবনবাবু বললেন, তা হ'লে ওই কথাই রইল, পরশু সকালে। সকাল মানে দুপুর মধ্যাহ্ন ভোজন আর কি।

হঠাৎ এই ঘরটায় দাঁড়িয়ে এই মানুষ দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুশান্তর মনে হ'ল যে এই অবাঞ্ছিত জায়গাটা যেন তাকে টানছে। এই ছোট মফঃস্বল শহর-টারও যে একটা প্রাণ আছে, আকর্ষণ আছে তা সে আজই এই এক বছর দু' মাসের মধ্যে বুঝতে পারল প্রথম।

কত সংক্ষিপ্ত জীবনের আনন্দ, কত ভঙ্গুর তার পরমায়ু! এই এত হৈ চৈ, খুঁটিনাটি হিসেব, এই কিছু নেই। সুশান্তর অনেক সাধ ছিল। ব্যাঙ্ক আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে কিছু কিছু তুলে ছাতে দুটো ঘর তুলবে। বাড়ীতে জায়গার একটু টানাটানি চলছে; বোনেদের পরীক্ষা হয়ে গেলে সবাই মিলে ক'দিনের জন্যে দীঘা বেড়াতে যাবার কথাও হয়েছিল। আর

মনে মনে ভেবে রেখেছিল দক্ষিণের বারান্দার জন্যে এক সেট বেতের চেয়ার-টেবিল কিনবে। আজকে এই সব ছোটখাট সাধ-আহ্লাদ কত বড় হয়ে ছায়া ফেলছে সরিতের মনে। সুশান্ত তাকে সবই বলত।

কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে একটা দগদগে ঘায়ের যন্ত্রণা। কাণে আসছে একটা আকাশ-ফাটানো চীৎকার—'গেল' 'গেল'! উত্তাল কলকাতায় সে আওয়াজ একটা বুদবুদের মত উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সরিৎ সে চীৎকার শুনলে কালা হয়ে যেত চিরকালের জন্যে। সরিৎ দেখেছিল রক্ত—নোংরা, পাপী এই শহরের ধুলো সে রক্ত মেখে যেন পাঁক হয়ে জমে ছিল মৌলালীর মোড়ে।

ডবল ডেকার বাসটায় লোক যেন আর ধরছিল না। পেটমোটা একটা জন্তুর মত হাঁপাতে হাঁপাতে আসছিল সেটা। বাঁক নেবার সময় মনে হ'ল বাসটা নির্ঘাৎ কাত হয়ে পড়ে যাবে। হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে তার মধ্যেই দাঁত বার করে হাসছিল কেউ কেউ। এসব নিত্য-নৈমিত্তিক রঙ্গ। কিন্তু সকলের অজান্তে ঝুলতে ঝুলতে একজনের হাত দুটো অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

সরিৎ চিনতে পেরেছিল সুশান্তকে। বনস্পতির টিন-বোঝাই লরীটা তার মুখের ওপর দিয়ে চাকা চালায় নি ভাগ্যি! তা হ'লে বোধহয় সাত বছরের চেনা মুখটাকে সনাক্ত করাও কঠিন হ'ত। পকেটে অন্য নানা জিনিসের মধ্যে ও পেয়েছিল মস্ত নীল রংয়ের কাগজে-আঁকা বাড়ীর প্ল্যান। প্ল্যান পাশ হয়ে গেছে, এখন ওপরে ঘর তুলতে পারবে সুশান্ত।

অদ্ভুত দুটো স্থির চোখ সুশান্তর! আকাশের দিকে তাকিয়ে ও কি বলতে চাইছিল কেউ জানবে না। কিন্তু ডালহৌসীর ছ'তলার জানলা দিয়ে গড়ের মাঠের বিস্তৃতি আর নীচে কিলবিল-করা পোকা-মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে সরিৎ হিসেব করছিল এতগুলো লোককে চাপা দিতে চার-চাকার কতগুলো লরীর দরকার হবে!

———

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

ধীরা বলল, "সোনারূপো কিছু খাই না। তবে ভাতের বদলে রুটি খাই খুব বেশী। তা তুইও ত বেশ মোটা হয়েছিস।"

"অমন মোটা হয়ে লাভটা কি? দেখতে ত আরও খারাপ হয়ে গেছি? আর তাই নিয়ে খোঁটা খাচ্ছি।"

ধীরা বলল, "খোঁটা আবার দিচ্ছে কে? খোটা দেবার মত কিই বা হয়েছে?"

"কে আবার? তোমার ভগ্নীপতিটি। নিজে তালপাতার সেপাই বলে তাঁর মোটা পছন্দ হয় না। না খেয়ে-দেয়ে রোগা আবার হতে পারি বটে, তবে শরীর ত টিঁকবে না? আর যা উৎপাত এই বাচ্চার। ঘুমোতে দেবে না ত মাসের মধ্যে কুড়িদিন।"

"শরীর ভাল করে সারিয়ে ফেল, তা হ'লেই ঘুমোতে দেবে। ভাল ডাক্তার দেখা, আর ডাক্তারে যা বলে সেই মত চল। শুধু কাগজে প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে রেখে দিলেই ত বাচ্চা সেরে উঠবে না?"

নীরা বলল, "বলা ত সহজ, করাই শক্ত। বাড়ী জুড়ে যে একপাল বোকা বসে আছে, তাদের জ্বালায় কি আর আমার নিজের মতে কিছু করবার জো আছে? যদি এখানেও বেশীদিন থাকতে দিত, তা হ'লেও বা হ'ত। খুকীর খাওয়া-দাওয়াও নিয়মমত হ'ত, আর তুমিও ত ততদিনে ডাক্তার হয়ে এসে বাড়ীতে বসতে, দেখাশোনার কোন ভাবনাই থাকত না।"

ধীরা বলল, "আমি বুঝি এখানে এসে বসে থাকব তুই ভেবেছিস? মোটেই না। এখন থেকেই বাইরে কাজ খুঁজছি, পেলেই চলে যাব। পশ্চিমে থাকারই আমার ইচ্ছা।"

নীরা বলল, "কেন বাপু, বাংলা দেশ কি দোষ করল? আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না?"

"সত্যিই বাংলা দেশে থাকতে ইচ্ছা করে না। তবে আত্মীয় স্বজনকে দেখতে ত ইচ্ছে করে বটে।"

ধীরা বলল, "তা হ'লে একটা হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবী বিয়ে করে নাও, দিব্যি থাকবে ঐ দেশে।"

ধীরা বলল, "তা করব হয়ত কে জানে? ঐ শোন্ তোর মেয়ে চেঁচাচ্ছে, মা-ও দেখি তাকে বশ করতে পারলেন না।" দুই বোনে চলল তখন মায়ের সন্ধানে।

সুবালার এখন চুল পাকতে আরম্ভ হয়েছে। দিদিমা হবার উপযুক্ত চেহারা খানিকটা হয়েছে। নাতনী কিন্তু তাঁকে খুব বেশী পছন্দ করছেন না। বরং মামার সঙ্গে হুড়োহুড়ি করতেই তাঁর লাগে ভাল।

নীরার স্বামী প্রিয়নাথ দিন তিন-চার পরে এসে হাজির হ'ল। 'তালপাতার সেপাই' না হলেও চেহারাটা রোগাই বটে। তবে বিশেষ সুশ্রী নয় দেখতে, মুখে-চোখে একটা বিরক্তি আর অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে এই বয়সেই।

ধীরা সম্পর্কে বড়, কাজেই ছোট ভগ্নীপতি তাকে প্রণাম করতেই এল। ধীরা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বলল, "আমায় নমস্কার করলেই ঢের সম্মান করা হবে। আমি বয়সে ছোটই হব, আমায় প্রণাম করার দরকার হবে না।"

প্রিয়নাথ বলল, "যা বলেন আপনি। বয়সে ত অনেকটাই ছোট হবেন দেখছি। আপনার বোনের কাছে গল্প শুনে ভাবতাম আপনি ওর চেয়ে অনেক বড়। মহা ভক্তি ওর দিদির উপরে।"

নীরা বলল, "কি জ্বালা! ভক্তি আবার কখন দেখাতে গেলাম। পড়ায় ভাল ছিলে এই ত বলেছি, আর শীগগির ডাক্তার হয়ে বেরবে।"

প্রিয়নাথ বলল, "সত্যি, ডাক্তার একজন দরকার আপনার বোন আর বোনঝির জন্যে। রোগ এদের সারাক্ষণ লেগেই আছে। বাচ্চাটাও একেবারে ভাল থাকে না।"

ধীরা বলল, "বেশ কিছুদিন ওদের নিয়ে বাইরে কোন ভাল জায়গায় ঘুরে আসুন, দু'জনেই সেরে যাবে।"

"ছুটি কই? আর ছুটি যদি পাইও, তা হ'লেই কি আর আপনার বোনকে নিয়ে আর খুকুকে নিয়ে কোথাও গিয়ে থাকা সম্ভব? বাচ্চা সামলান, সেই সঙ্গে সংসার সামলান, সে কি আর ও একলা পেরে উঠবে?"

নীরা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "কখনও কি ভারটা দিয়ে দেখেছ? আমার চেয়ে বোকা অপদার্থ মেয়েও ঘাড়ে কাজ পড়লে দিব্যি সামলে নেয়।"

অতঃপর দাম্পত্য কলহ আরম্ভ হবে বলে ধীরা সে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল। যদি তা নাও হয়, তা হ'লেও বোন ত এখন খানিকক্ষণ চাইবে স্বামীর সঙ্গে একলা থাকতে?

ধীরা বেরিয়ে যেতেই প্রিয়নাথ বলল, "কে বলবে যে তোমরা দু'জন মায়ের পেটের বোন। একেবারে তোমার মত দেখতে নয় ত?"

নীরা বলল, "তা বোন হলেই কি আর একরকম দেখতে হয়? পাঁচটা আঙুল ত আর সব সময় সমান হয় না? মা বলেন আমার দিদিমা খুব সুন্দরী ছিলেন, দিদি তার মত দেখতে হয়েছে।"

প্রিয়নাথ বলল, "উনি বিয়ে করেন নি কেন? বাবা-মা ওঁর বিয়ে দিতে চান নি?"

"চেয়েছিলেন ত। কিন্তু দিদি যে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইল না।"

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল, "কোন রোম্যান্স ছিল না কি জীবনে?"

নীরা বলল, "কে জানে বাপু। আমি ত সেরকম কিছু দেখি নি।" আর বেশী প্রশ্ন করলে নীরা পাছে চটে যায় ভেবে প্রিয়নাথ তখন অন্য কথা তুলল। মনটা কিন্তু তার কৌতূহলে ভরপুর হয়ে রইল। এমন সুন্দরী তরুণী মহিলা, এমন সন্ন্যাসিনী হয়ে আছেন কেন? নীরাকে যখন কনে দেখতে এ-বাড়ীতে সে এসেছিল তখন ইনি কোথায় ছিলেন?

প্রিয়নাথের ছুটি বেশী দিনের ছিল না। রাত্রে মেয়ের কান্না এবং দিনে মেয়ের মায়ের নাকে কান্না এই দুটো তাকে কিছুদিন বড় জ্বালিয়ে তুলেছিল। নীরার শ্বশুরবাড়ী একেবারে পছন্দ হয় নি, সেই বিরাগটার সমস্ত ধাক্কাই সহ্য করতে হ'ত প্রিয়নাথকে। অথচ কিই বা সে করতে পারে? স্ত্রীর হয়ে আত্মীয়স্বজনকে কিছু বলতে একেবারে হিন্দুশাস্ত্র-বিরোধী ব্যাপার, তা হ'লে ত আর রক্ষাই থাকবে না। আর যদি স্ত্রীকে কিছু বলা যায় সহিষ্ণুতার মহৎ সম্বন্ধে তাহলেও বক্তৃতা 'আর কান্নার চোটে ঘর ছেড়ে পালাতে হয়। কাজেই স্থির করেছিল নীরাকে কন্যাসহ দিন কতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে একটু আরাম করবে। ছুটি বেশী নেবে না, দিন চার-পাঁচ শ্বশুরবাড়ী কাটিয়ে আসবে মুখ রাখতে নীরার আর নিজের।

কিন্তু এ রকম সুন্দরী শ্যালিকা দেখে মনটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় একটু করতে পারলে ভালই লাগত। ছুটিটা আর একটু বাড়িয়ে নেবে কি না ভাবতে লাগল, নিলেও সেটা এমন সাবধানে নিতে হবে যাতে নীরার মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে একটু দেরি হয়ে গেল। শুয়ে পড়ে স্ত্রীকে বলল, "খুকুর চীৎকারে ত রাত্রেও ঘুমোন যায় না। শরীর আমার এমনিতেই ভাল নয়, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখ মা তোমার দিদিকে বলে যদি বাচ্চাটাকে একটা ঘুমের ওষুধ দেন।"

নীরা বলল, "দিদি দেবে এখন এক কিল বসিয়ে পিঠে। বাচ্চাদের ওষুধ গেলান তার একেবারে পছন্দ নয়।"

প্রিয়নাথ বলল, "এ ত বুড়ো ডাক্তারের মত কথা হ'ল। নূতনরা ত সবাই বেশী বেশী ওষুধ খাওয়াতেই ভালবাসে।"

"কি জানি, ও যা বলে তাই বললাম। একদিন চেয়েও ছিলাম ওষুধ, তাতে বলল, বাচ্চার পেট ঠিক কর আগে, তারপর নিজেই ঘুমোবে।"

প্রিয়নাথ বলল, "তবে আমার জন্যেই একটা ঘুমের ওষুধ চেয়ে আন।"

নীরা বলল, "ভীষণ ঠাট্টা করবে। আচ্ছা, আজ যদি তোমার ঘুম না হয়, তা হ'লে কাল বলব।"

প্রিয়নাথ বলল, "তিনি আবার ঠাট্টাও করেন নাকি? দেখলে ত ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির মনে হয়। এমন যে রসের সম্পর্ক, তা ঠাট্টা করার কথা ত একবার মনেও এল না।"

"না আসাই ভাল। কখন যে কিসে বিরক্ত হয়ে যায় বোঝাই যায় না। ক্রমেই স্বভাবটা বদলে যাচ্ছে। ছোট-বেলা ত আমাদের মতই ছিল, ভয়-ডরও ছিল। এখন যেন দুনিয়ায় কাউকে পরোয়া করে না। একলা একলা নিজেকে নিয়ে থাকতেই ভালবাসে।"

শ্যালিকার স্বভাবের এ হেন বর্ণনা শুনে প্রিয়নাথ একটু নিরুৎসাহ হয়ে গেল। বেশী শক্ত স্বভাবের স্ত্রীলোক আবার তার পছন্দ নয়। ইচ্ছামত তাদের কাঁদান যাবে, আদর করা যাবে, তবে না তাদের সঙ্গে কারবার করে সুখ। ঐ রকম বিশাল চোখ জোড়া যদি সামনের মানুষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তাকিয়ে থাকে, অথবা মুখখানা ভ্রুকুটি-কুটিল হয়ে ওঠে, তা হ'লে ত তার সামনে দাঁড়ান শক্ত। নীরা যাই বলুক এই তরুণীটির জীবনে লুকোনো কথা কিছু আছেই, নইলে বাঙালী মেয়ে ঠিক এরকম হয় না। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল, কাজেই কথা না বাড়িয়ে ঘুমোনোর চেষ্টাই দেখতে হ'ল।

সকালে চা খেতে ব'সে বলল, "আপনার বোনঝির ভার আপনাকে একটু নিতেই হচ্ছে দিদি।"

ধীরা বলল, "কেন, কাল রাত্রেও খুব জ্বালিয়েছে?"

"খানিকটা জ্বালিয়েছে, খুব না হলেও। এই রকম যদি চলতে থাকে, তা হ'লে আমি আর নীরা দু'জনেই মারা

পড়ব। আর মেয়েও এমন দুষ্টু যে আর কারও কাছে থাকবেই না।"

ধীরা বলল, "কারও কাছে যদি না থাকে তা হ'লে আর আমি তার নেব কি ক'রে? আমার খুব বেশী ঘুমের বালাই নেই, রাত জাগাও অভ্যাস আছে। থাকতে যদি রাজী হত তা হ'লে আমি ওকে অনেক সময়ই রাখতে পারতাম। তবে আমি আর আছিই বা কতদিন?"

প্রিয়নাথ বলল, "এখন না হয় বেশীদিন নেই, কিন্তু ফাইন্যাল-এর পর ত আপনার অনেকদিন ছুটি থাকবে? তখন চলুন না কিছুদিন আমাদের সঙ্গে? আপনি সঙ্গে থাকলে স্বচ্ছন্দেই নীরা আর ঝুনুকে নিয়ে আমি বাইরে যেতে পারব। ছুটি নিয়ে নেব মাস খানিকের।"

প্রস্তাবটা শুনে নীরার মনে খুব যে একটা অবিমিশ্র আনন্দের ভাব এল, তা বলা যায় না। একবার দেখা হতে না হতেই এত কেন বাপু? আত্মীয়তার সম্পর্ক বটে, কিন্তু সত্যি রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়া ত নয়? পুরুষ জাতটাই এমনি বটে, সুন্দর মুখ দেখাও একটা, অমনি তার পাশ ঘেঁষে বসবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে। কই, আমাদের ত এরকম হয় না বাপু, কত সুন্দর মানুষ ত আমরাও দেখি? তবে দিদি যদি যেতে রাজী হয় তা হ'লে শ্বশুরবাড়ী থেকে বেরবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়, কিছু দিন বাইরে থাকাও যায়। তিন বছর বিয়ে হয়েছে তার মধ্যে তিনটে দিনও সে ঐ হাড়-জ্বালাতনের সংসার ছেড়ে বেরতে পেরেছে কি না সন্দেহ। দিদিকে অবশ্য সে চেনে ভাল করেই। একটা ছেড়ে হাজারটা ভগ্নীপতিও যদি কাছ ঘেঁষে বসে ত তার একটা কৃপাদৃষ্টিও লাভ করতে পারবে না। দিদি মোটে পুরুষ মানুষ দেখতে পারে না। এদিক দিয়ে ও ভয়ানক অদ্ভুত। মেয়েমানুষ যে কি করে এমন হয়, তা নীরা বুঝতেই পারে না।

ধীরা বলল, "যেতে পারলে ভাল হ'ত হয়ত। কিন্তু আমার যে আবার ছুটির Programme একেবারে ঠিক করা হয়ে গেছে? সাত-আট জন মিলে আমরা মাদ্রাজের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি। যদি পরে বেরই বা আগে ফিরে আসি, তাহলে তখন কিছু দিনের জন্যে যেতে পারি হয়ত। তা সেটা দিল্লী ফিরে গিয়ে তবে জানতে পারব।"

অগত্যা প্রিয়নাথকে তখনকার মত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। চার দিন থাকবে বলে এসেছিল, সে জায়গায় সাত-দিন থেকে গেল, এবং যতটা সময় পারল, ধীরার সঙ্গে গল্প করেই কাটাতে লাগল। ধীরার সন্দেহ হতে লাগল যে নীরা এতটা পছন্দ করছে না, কিন্তু ভগ্নীপতিকে নিরস্ত করার কোন উপায়ই খুঁজে পেল না।

যাবার দিন প্রিয়নাথ বলল, "দেখি আবার দু'চারদিনের জন্যে আসতে পারি কি না। মেয়েটাকে ছেড়ে থাকতে বড় কষ্ট হয়।"

নীরা বিদ্রূপ করে বলল, "না ঘুমোনটাই এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, যে, নিশ্চিন্তে ঘুমোবার সম্ভাবনাটা ভাল লাগে না।"

ধীরা বলল, "তুই আগেরই মত ঝগড়াটে আছিস দেখছি বেচারা মেয়ের নাম করে মনের দুঃখটা জানাল, আর তাই নিয়ে ঠাট্টা করছিস তুই?"

প্রিয়নাথ বলল, "ঐ রকমই স্বভাব। কথা শোনাবার একটা ছুতো পেলে হয় একবার। কথা শুনে কে বলবে যে আপনার বোন। ক'টা দিন ত রইলাম, কিন্তু একটা কড়া কথা বলতে শুনি নি আপনাকে।"

নীরা বলল, "এখন আর কপালে করাঘাত ক'রে হবে কি? আগে খোঁজ নাওনি কেন মশায়? দেখতেও বোনের মত নয়, শুনতেও বোনের মত নয় আমি। তবু ত গলায় মালা দিয়েছিলাম। অন্য জায়গায় গেলে কাঁচকলা পেত।"

ধীরা বলল, "নে বাপু, আকাশে কাঁটা মেরে ঝগড়া করিসনে। ও কি তাই বলেছে?"

(৮)

প্রিয়নাথ চ'লে যাবার পর নীরা দিন-দুই রাগ করে দিদির সঙ্গে ভাল করে কথা বলল না। তবে এসব অভিমানের রাগ আর কতদিন ধরে রাখা যায়? দেখতে দেখতে তার মেজাজ আবার ঠিক হয়ে গেল। তবে ধীরা ঠিকই করে নিল মনে মনে যে নীরাদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া তার চলবে না। প্রিয়নাথ মানুষটি একটু হাল্‌কা স্বভাবের। তার একটু বেশী রকম ভাল লেগে গিয়েছে শ্যালিকাকে। সেটা সে লুকোতে পারবেও না, চাইবেও না। মাঝ থেকে নীরা চটে আগুন হবে। তার হাওয়া বদলানটায় উপকার না হয়ে অপকারই হয়ে বসবে। দরকার নেই। তারা নিজেরা আগে যে ব্যবস্থা করেছিল, সেই মতে চললেই হবে। এখন সম্প্রতি ভাল করে পরীক্ষাটা পাশ করার ভাবনা ছাড়া আর কিছু ভাববার দরকার নেই।

দিল্লীতে এসেই বিভার খোঁজ নিল একবার। এখানেই আছে সে। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। ধীরা রবিবারের অপেক্ষায় রইল, গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। বিয়ে যদি ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লেও বিভা আর কলেজে বেড়াতে এসে সময় নষ্ট করবে না। জয়ন্তের কথা মনে পড়ল একবার ধীরার। লোকটা কোথায়

আছে কে জানে? কি করছে, বিয়ে করেছে কি না। বিভাকে ও ধীরাকে মনে রেখেছে কি না। কে বা জানে? জীবন-পথে কত লোকেরই ত পায়ের চিহ্ন পড়ে, বেশীর ভাগই ধূলোয় ঢাকা পড়ে যায়।

রবিবার একটা এসেই পড়ল। ধীরা আগেই চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে সে যাবে। তাকে দেখে বাড়ীর সবাই খুশী। বহুদিন সে আসে নি এ বাড়ী। লোক-গুলির বয়স তিন-চারটে বছর বেড়ে গিয়েছে, এ ছাড়া বিশেষ কোন তফাৎ সে দেখল না। বিভার মাকে শেষা-শেষি বড় চিন্তাকুল দেখাত, এখন মুখটায় একটু হাসির ভাব এসেছে। বিভা তেমনি রোগাটেই আছে, আগের সেই পুরন্ত চেহারাটা আর নেই। ধীরাকে দেখে বলল, "কি গো সুন্দরী, আসতে পারলে শেষ অবধি?"

ধীরা বলল, "আমার কি সুন্দরী ছাড়া আর কিছু নাম নেই?"

বিভা বলল, "তা ত আছে, কিন্তু কেন জানি না তোকে ঐ নামেই ডাকতে শুধু ইচ্ছে করে। প্রথম যেদিন ষ্টেশনে নামলি সেদিনই ঐ নামটা তোকে দিলাম।"

ধীরা বলল, "তা বেশ করলি। এখন নিজের খবর বল্ দেখি? এত পড়ার চাপের মধ্যেও এলাম সময় ক'রে এই জন্যে। কবে যাচ্ছ শ্বশুরবাড়ী?"

বিভা বলল, "এই যবে দিন পড়ে। মাসখানিক দেরি আছে যেন শুনছিলাম।"

ধীরা বলল, "ভাল রে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই। তোমার ত বিয়ে অথচ কথা বলছ এমন ক'রে যেন ও পাড়ার পদী পিসীর মেয়ের বিয়ে।"

বিভা ভ্রূকুটি করে বলল, "হঃ, ভারি ত না বিয়ে, তার দু'পায়ে আলতা।"

ধীরা বলল, "কেন রে? পছন্দ হয় নি মানুষটাকে? আলাপ-টালাপ করিস্ নি?"

"ঐ করেছি একটু লোক-দেখান গোছের। দু' তিন-দিন এসেছিল। ধরন-ধারণে ত ভদ্রলোক মনে হয়, তা বাইরে ত মানুষ মুখোশ পরে বেড়ায়। বিয়ের পর মুখোশ যখন আর থাকবে না, তখন যে আবার কি মূর্ত্তি দেখব তা কে জানে? কিন্তু আর ভাবতে ভাল লাগে না, বিয়ে দিলাম মত, তারপর যা হয় হবে।"

ধীরা বলল, এই রকম ক'রে মানুষ বিয়ে করে কেন? নিজের কিছু যার দেবার নেই, সে পরের কাছেই বা কি পাবে? নিতান্ত সম্বন্ধ করা বিয়ে, শাক বেগুনের মত বাজার দর অনুযায়ী বিক্রী হচ্ছে। সমস্ত সম্পর্কটাই গড়ে নিতে হবে নিজেদের। কিন্তু এতখানি ধূসর মন নিয়ে কি বন্ধনই বা তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবে।

বলল, "হ্যাঁ রে, আজ আসবে না তোর বর? তা হ'লে আমিও দেখে যেতাম।"

বিভা বলল, "রক্ষে কর ভাই, তোমার আর দেখে কাজ নেই। শেষে এটিও বেহাত হয়ে যাক্। বিয়ের পরে দেখ এখন।"

বলল কথাটা সে ঠাট্টা করেই কিন্তু ধীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বলল, "ওরে বাবা, থাক ভাই, তোমার সোনার চাঁদকে কেউ কেড়ে নিতে যাচ্ছে না।

"তুমি ত চাইবে না তা জানি। কিন্তু তুমি না চাইলেও ও যে তারা নিজের থেকেই বেহাত হয়।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, তোমার শুভদৃষ্টি আগে হয়ে যাক, তারপর আমি আলাপ করব এখন। তোমার থাকা হবে কোথায় এর পর? দিল্লীতেই না কি?"

"না, ও এখানে কাজ করে না। আগ্রায় থাকে।"

এরপর অন্য কথা উঠে পড়ল। আর একটা দিন ত? দেখতে দেখতে কেটে গেল, আর ধীরাও ফিরে গেল নিজের আস্তানায়। এবারে যথাসাধ্য খেটে তৈরি হতে লাগল পরীক্ষাটার জন্যে। এবারে পাশ ক'রে গেলে ত ছাত্রী-জীবন শেষ। এবারে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হবে, আর সেইখানেই হবে তার আসল পরীক্ষা। কতখানি মানুষ হয়েছে সে, কতখানি স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারবে সে। আত্মরক্ষা এরপর তাকে নিজেই করতে হবে, বাবা-মায়ের আড়ালে থাকার দিন ত ফুরোল। চেহারাটা হবে তার বড় শত্রু, মানুষের চোখকে সে যে বড় সহজে আকর্ষণ করে। নিজের ঘরের ভিতরেও যে তার নিষ্কৃতি নেই। নীরার স্বামীর কথা মনে পড়ল। সে ভদ্রলোক ইতিমধ্যে চিঠিপত্র কয়েকখানা লিখে ফেলেছে। ধীরা তাদের সঙ্গে যাবে কি না তাই জানতে মহা ব্যস্ত। নীরাও লেখে চিঠি মাঝে মাঝে। তার বক্তব্য হচ্ছে যে হাওয়া বদলাতে যেতে সে মোটেই ব্যস্ত নয়, দিদি যেন প্রিয়নাথের বাজে কথায় কান না দেয়।

ধীরা দু'জনকেই জানায় যে তার যাওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি পরীক্ষার পর সে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেই যাচ্ছে।

পরীক্ষা এসে পড়ল, এবং দেখতে দেখতে পারও হয়ে গেল। ভাল পরীক্ষাই দিল ধীরা। সে যে ভালভাবেই পাশ করবে সে বিষয়ে আর তার কোন সন্দেহ রইল না।

বিভার বিয়েটা হঠাৎ কেমন ক'রে জানি না এগিয়ে গেল খানিকটা। এখন আর পড়ার ভাবনা নেই, হষ্টেলে

থাকারও প্রয়োজন নেই। ধীরা বিভাদের বাড়ীই চ'লে গেল কিছুদিনের জন্যে। ঐখান থেকেই বেড়াতে বেরিয়ে যাবে সে।

বিয়েবাড়ীটা খুব যে আনন্দ-মুখর তা মনে হ'ল না ধীরার। মা, বাবা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন যাঁরা এসেছেন, তাঁরা আনন্দ করতেই চেষ্টা করছেন, কিন্তু বিভা একলাই সবাইকে দমিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের কনে যেন হেডমিসট্রেসের মত সবাইকে শাসন ক'রে বেড়াচ্ছে। নিজের শাড়ী জামা গহনা নিয়েও খুব একটা ফূর্ত্তি দেখাচ্ছে না।

তবু বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের রাতে বর দেখে ধীরা একটু নিরাশ হ'ল। একেবারে বড় বেশী সাধারণ যে? বিভার মনকে সে টানবে কিসের জোরে? অবশ্য মানুষটার ভিতরটা ত আর চোখে দেখা যাচ্ছে না? সেখানটায় সে অপূর্ব্ব সুন্দরও হতে পারে। আর সেখানের আকর্ষণটাই ত চিরস্থায়ী হবে? রূপ আর মানুষের ক'দিন থাকে? তবে মনের দরজাটা খোলা চাই ত? বিভার বিমুখ মনটাকে নিজের দিকে ফেরাবে সে কোন্ মায়ামন্ত্রে?

বাসরঘরে বরের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সাধারণ কথাবার্ত্তা, তবে কোনরকম উগ্র রসিকতার চেষ্টা কার সঙ্গে করছে না দেখে ধীরার ভালই লাগল। বিভাকে এখন যেন কিছু খুসী লাগছে। যা হবার হয়েও গেল গোছের একটা নিশ্চিন্ততা এসেছে তার মুখের ভাবে। যাক্, সব ভাল যার শেষ ভাল। একটু সন্তুষ্ট মনে ঘর-সংসার করতে পারে তা হ'লেই হয়। খুব একটা আনন্দ বিবাহিত-জীবনে সে পাবে ব'লে মনে হল না ধীরার।

পরদিনটা বাসি বিয়ের হৈ চৈ, কনে বিদায় প্রভৃতি নিয়েই কেটে গেল। বিভা অশ্রুহীন চোখেই চলল, মা-মাসীরা অবশ্য যথাযোগ্য কান্নাকাটি ক'রেই নিলেন। বিভা চলে যাবার খানিকক্ষণ পরেই ধীরাও নিজের দলবল-সহ বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

কলকাতা হয়েই যেতে হ'ল। নীরা এখনও সেখানেই রয়েছে, তবে প্রিয়নাথ আর আসে নি। নীরার আর এখন কোন রাগ নেই দিদির উপরে। সে যে প্রিয়নাথকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেয় নি এতেই নীরা খুসী। হাওয়া বদলাতে তারা হয়ত যাবে, তবে সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি কে যাবে সেটা এখনও ঠিক হয় নি। ঝুনু এখনও তেমনি চট্টই আছে।

অনেক জায়গা বেড়ান হ'ল ধীরার, অনেক দেশ দেখা হ'ল, ঢের জিনিষপত্রও কেনা হ'ল। এরপর বাড়ী ফিরবার পালা। এখন যতদিন না চাকরি স্থির হয় ততদিন কলকাতাতেই থাকতে হবে। পরীক্ষার ফল বেরবারও সময় হয়ে এসেছে। তারপর ভাল ক'রে চাকরির খোঁজ করা যাবে।

আবার কলকাতায় ফিরে এল। প্রিয়নাথের শরীর একটু খারাপ হওয়ায় নীরা চলে গেছে, বাড়ী এখন একেবারেই চুপ। মায়েরও অখণ্ড অবসর। তাঁর ভাল লাগে না, ঝুনু যখন ছিল তবু একটা কাজ ছিল। ধীরা আসাতে তবু কথা বলবার একটা লোক পেলেন।

একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা খুকী, চাকরি নিয়ে ত বিদেশে যাবি বলছিস্, একেবারে একলা থাকতে পারবি?"

ধীরা বলল, "পারতেই হবে। কে চিরকাল আর আমাকে আগলে নিয়ে বেড়াবে?"

মা বললেন, "তবু একেবারে একলা ভাবতেই যেন ভয় হয়। হষ্টেলে ছিলি পাঁচজনের মধ্যে তাতে ভয় হ'ত না, তা ছাড়া ওখানে ভবতোষ বাবুরা ছিলেন।"

ধীরা বলল, "চাকর-বাকর নিয়ে সবাই ত থাকে, আমাকেও তাই-ই করতে হবে।"

সুবালা বললেন, "তোর কাকীমার বাড়ী একজন ভাল আয়ার খোঁজ পেলাম, রাখব তাকে এখন থেকে ঠিক ক'রে? না হয় দু' এক মাস বসিয়েই মাইনে দেব। ভাল লোক সব সময় পাওয়া ত যায় না?"

ধীরা বলল, "আগে লোকটাকে না দেখে কি করে বলব? আয়া বলছ যখন তখন খ্রীষ্টান হবে বোধ হয়?"

"খ্রীষ্টানই, কিন্তু তাতে ত আর তোর আপত্তি নেই?"

ধীরা বলল, "আমার আবার কি আপত্তি থাকবে? আমি ত আর হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কাজে যাচ্ছি না? খ্রীষ্টানই ভাল, তাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সভ্যভব্যও হবে খানিকটা।"

সুবালা বললেন, "সেই রকমই ত ওরা বলছিল। ওদের পাশের বাড়ী এসেছিল, তার এক পাতান বোনের কাছে। চাকরি খুঁজছে। বলিস্ ত ডেকে পাঠাই।"

ধীরা বলল, "বেশ ত, দেখেই রাখা যাক্। যেখানেই যাই, লোক আমার চাই-ই, কলকাতায় যখন আমি থাকবই না।"

লোক গেল তার পরদিনই। তার সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হ'ল যশোদা আয়া। বেঁটে খাট মজবুত গড়নের স্ত্রীলোক। রং কাল, মুখশ্রী সুন্দর কিছু নয়, তবে বুদ্ধির ছাপ নাকে-চোখে। বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হতে পারে। এসেই সুবালাকে আর ধীরাকে নমস্কার করে হাসিমুখে দাঁড়াল।

সুবালা বললেন, "এই আমার মেয়ে। ডাক্তারী পাশ ক'রে বিদেশে যাবে চাকরি করতে। ওর জন্তেই লোক খুঁজছি। তোমার বিদেশে যেতে কোন আপত্তি নেই ত ?"

যশোদা বলল, "আমার আর আপত্তি কি মা ? দেশে আমি ক'টা দিনই বা থাকতে পেয়েছি ? বিধবা হয়েছিলাম একটা মেয়ে নিয়ে, তা সে মেয়েও ত রইল না। তারপর থেকে চাকরি ক'রেই খাচ্ছি, কত জায়গায় ঘুরেছি। মেমেদের বাড়ী অনেক বছর কাজ করেছি, মিশনে কাজ করেছি। আমাকে যেখানে যেতে বলবে যাব। তা দিদি-মণি ত বড় ছেলেমানুষ, আমার মেয়েটা বেঁচে থাকলে এত বড়টাই হত। একলাই যাবে ?"

ধীরা বলল, "একলাই যাব। তাই ত একজন শক্ত লোক খুঁজছি যে ঘর-সংসারও দেখবে, দরকার হলে আমাকেও দেখবে।"

"তা ত দেখতে হবেই ? মানষের শরীল সব সময় ভাল ত থাকে না, একজন দেখবার লোক ত চাই-ই ? তা তুমি ভেবো নি দিদিমণি, আমি যদি সঙ্গে যাই, তোমার আর লোক রাখতে হবে নি। রান্নার কাজও আমি খুব ভালই জানি। তুমি ত ডাক্তার, তা আমি নার্সের কাজও মাঝে মাঝে করেছি।"

ধীরা বলল, "তবে তুমি আর কোথাও কাজের চেষ্টা কো'রো না। আমিই তোমায় রেখে দিলাম এখন থেকে। মাইনে যেমন চাও পাবে।"

"মাইনের জন্তে কি আর ? আমার মুখ চেয়ে ত কেউ ব'সে নেই ? যা দু'চারটে ভাই-বোন আছে, নইলে আর সকলকে ত খেয়ে ব'সে আছি। আমি এই সাত-আটটা দিন দেশ থেকে ঘুরে আসি, তারপর কাজে লাগব। ঠিকানা রেখে নাও, যদি আগেই দরকার হয় ত আগেই আসব।"

ধীরা বলল, "সাত-আট দিনের আগে কিছু দরকার হবে না। মাসখানেক পরে বেরোব বোধ হয়। তুমি স্বচ্ছন্দে দেশ ঘুরে এস। তবে ঠিকানাটা রেখেই যাও, যদিই কিছু দরকার হয়।"

ঠিকানা রেখে দিয়ে হাসিমুখেই যশোদা প্রস্থান করল। আর সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই ধীরার পাশের খবর এসে পৌছল। খুব ভাল ক'রে পাশ করেছে সে। বাড়ীতে হৈ চৈ করবার লোক ত কেউ নেই, কাজেই হৈ চৈ কিছু হ'ল না। নীরাকে একটা খবর দেওয়া হ'ল। বিভা যে এখন কোথায় আছে তা ধীরা জানত না, কাজেই ইচ্ছা থাকলেও তাকে জানান গেল না।

এখন কাজকর্ম একটা ঠিক করার পালা। চেষ্টা অবশ্য অনেক আগেই আরম্ভ করা হয়েছিল। শুধু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের উপরেই নির্ভর ক'রে ব'সে ছিল না। নানা জায়গায় খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছিল। ধীরা অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রিয় ছাত্রী ছিল, তাঁরাই চেষ্টা করছিলেন তার জন্তে। একটা না একটা ভাল কাজ সে পেয়েই যাবে ধীরা জানত। ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার অনুপাতে ক'টা মেয়েই বা ডাক্তারী পাশ করছে ? ঘরে সাইনবোর্ড দিয়ে ব'সে থাকলেও তার নিজের দিন চলার মত উপার্জন সে ক'রে নিতে পারবে। কিন্তু প্রথমে সে চাকরিই চায়। একটু নিশ্চিন্ত ভাবে থাকতে চায়। তারপর কয়েক বৎসর পরে না হয় স্বাধীন ভাবে কাজ করবে।

মাঝে মাঝে দু'একটা ক'রে কাজের খবর তার আসতে লাগল। কোনটাই সব দিক্ দিয়ে ভাল নয়। নিজেও কয়েকটা জায়গায় আবেদন করল বিজ্ঞাপন দেখে। দিন-গুলো কাটান একটু মুস্কিল। কলকাতায় বন্ধুবান্ধব বেশী কেউ ছিল না তার। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী যাওয়া সে বেশী পছন্দ করত না।

যশোদা আবার এই সময় বাড়ীর থেকে ফিরে এল। তার গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। তার সঙ্গে নানারকম গল্প ক'রে তবু ধীরার সময়টা একরকম কেটে যেতে লাগল। যশোদার স্বভাবে বিনয় জিনিষটা খুব প্রবল ছিল না। তার গল্পের ভিতর নিজের কৃতিত্বগুলো খুব বড় স্থান পেত। কিন্তু সেগুলোর রস উপভোগ করতে কারও তাতে বাধা হ'ত না।

সেদিন সকালের একটা চিঠিতে ভাল খবর পাওয়া গেল। এলাহাবাদে একটা ভাল কাজ পাওয়া গেছে। ধীরা নিলেই হয় এখন। নূতন প্রতিষ্ঠিত একটা হাস-পাতালে কাজ করতে হবে। মাইনে বেশ ভাল। থাকবার জন্তে ছোট বাড়ী পাওয়া যাবে, হাসপাতালের বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে।

ধীরার মনটা আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল। ঠিক এই রকম কাজই সে চেয়েছিল। এলাহাবাদে চেনাশোনা বিশেষ কেউ নেই, যতখানি নির্জ্জনতা সে চায়, ততখানিই পাবে। নিজের বাড়ী হবে, একপাল লোকের মধ্যে গাদাগাদি ক'রে তাকে থাকতে হবে না। আর মা-বাবার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে হবে না তাকে, বরং উল্টে সেই তাঁদের সাহায্য করতে পারবে যদি কখনও প্রয়োজন হয়। স্বাধীন জীবন হবে তার। বাল্যকালের সব দুঃখ, লাঞ্ছনা ভুলে যাবে সে।

সেই দিনই কাজটা নিতে স্বীকৃত হয়ে সে চিঠি

লিখে দিল। তারপর স্থির হয়ে ব'সে ভাবতে চেষ্টা করল, কি ভাবে সে প্রস্তুত হবে যাবার জন্যে। এতকাল ঘরে কাটিয়েছে, না হয় বোর্ডিং-এ কাটিয়েছে। এখন নিজের ঘর-বাড়ী হ'লে, সেটাকে সাজাতে হবে। নিজেকেও বেশ ফিট্‌ফাট্‌ সুসজ্জিতই থাকতে হবে। বেশীর ভাগ মেয়েই তাই করে, যারা জনসাধারণের সামনে সারাক্ষণ থাকতে বাধ্য হয়।

সুবালা বললেন, "খুকী, তোর যা কিছু ইচ্ছে কিনে নে। টাকাপয়সা যা লাগে দেব। তোর জন্যে আর খরচ করার দিন ত ভগবান দেবেন না?"

সুবালার এই একটা ক্ষোভ মন থেকে যেতে চায় না। তাঁর এমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপবতী মেয়ে, তার না হ'ল বিয়ে, না হ'ল ঘর-সংসার। চিরদিন একলা থাকবে, কারও মুখে মা ডাক শুনবে না। ভগবানের কি বিচার! মেয়ে যে ইচ্ছা করলে এখন বিয়ে না করতে পারে তা নয়, কিন্তু সেরকম কোন ইচ্ছা তার দেখা যায় না। দিল্লীতে থাকতে তার সম্বন্ধও এসেছিল, কিন্তু মেয়ে ত কথা কানেও তুলল না। বিদেশে কে বা কি শুনছে? বিনা অপরাধে সে চিরদিন শাস্তি ভোগ করবে কেন?

ধীরা এবার জিনিষপত্র কি কি কিনবে তার তালিকা করতে বসল। যশোদা এতেও বিন্দুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ নয় দেখা গেল। সে কতদিন কত মেমেদের বাড়ী কাজ করেছে। কেমন ক'রে ঘর সাজাতে হয়, কোথায় কি রাখতে হয় তা কি জানেনা নাকি সে? দিদিমণি ত ছেলেমানুষ, সে দাঁড়িয়ে দেখুক যশোদা কাজ কেমন করে। শেষে অনেকাংশে ঘর-করণা সাজানর ভার তারই উপর ছেড়ে দিল ধীরা। নিজের কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিয়েই বেশী ব্যস্ত হয়ে রইল। সুবালা জোর ক'রে দু-তিনখানা নূতন গহনাও তাকে গড়িয়ে দিলেন।

নীরা একবার কয়েকদিনের জন্যে ঘুরে গেল। দিদি কতদিনের জন্যে চলল তা কে জানে? এমনিতেই কলকাতায় সে থাকতে চায় না আসতে চায় না, তার উপর এখন ত চাকরি নিয়ে যাচ্ছে, একেবারেই আসতে চাইবে না হয়ত। প্রিয়নাথ এবার আর অফিসের দোহাই দিল না, সোজাসুজি নিজেই স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

ঝুমুর ঝুমুর ঝুঁটুমি দিনের বেলায় সমানই আছে, তবে রাত্রে চেঁচামেচি আগের চেয়ে কম করে। খুব বেশী দিনের জন্যে বাইরে যাওয়া তাদের ঘটে ওঠে নি, তবে মাসখানিক গিয়ে মধুপুর ঘুরে এসেছে। তাতে সামান্য কিছু উপকার হয়ে থাকতে পারে।

প্রিয়নাথ তেমনি রোগা এবং নীরা তেমনি মোটাই আছে। মেজাজও দু'জনের কিছু ভাল হয়েছে আগের চেয়ে মনে হ'ল না। নীরা এখনও কথায় কথায় ঝগড়া বাধায়। শ্বশুরবাড়ীতে অবশ্য প্রিয়নাথ উল্টে ধমক দেয় না, তবে বাড়ীতে নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কয় না। দিদিকে দেখেই নীরা বলল, "তোমার আলাদা বাড়ী হচ্ছে, না ভাই দিদি? আমি এবার গিয়ে মাস ছয় থেকে আসব, কাউকে নিয়ে যাব না এবার।"

ভগ্নীপতিকে প্রতি-নমস্কার ক'রে ধীরা বলল, "মেয়েকেও নিয়ে যাবি না? ও কার কাছে থাকবে?"

নীরা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, "যার কাছে খুসি থাকুক গিয়ে। আমিই যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। যাদের মেয়ে তারা রাখুক না?"

ধীরা বলল, "এসেই এত রাগ কেন? রাস্তায় কি সমস্তটা সময় ঝগড়া করতে করতে এসেছিল?"

প্রিয়নাথ বলল, "প্রায় তাই। বাড়ীতে ত মুখ খুলবার জো নেই শ্বশুর-শাশুড়ীদের জ্বালায়, তাই ঘর থেকে বেরোলেই সুদে-আসলে পুষিয়ে নেয়।"

নীরা বলল, "তোমার চেয়ে ভাল ত। তোমার ত ঘরেও ধমকানির শেষ নেই আর বাইরেও সমালোচনার শেষ নেই।"

ধীরা বলল, "বাবা, দোহাই তোমাদের, প্রেমালাপটা এখন একটু থামাও। মা আসছেন, তিনি ভীষণ অবাক হয়ে যাবেন। তোমাদের এই গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের প্রেম ত সব মানুষ বুঝতে পারে না?"

প্রিয়নাথ সুবালাকে আসতে দেখে থেমেই গেল। নীরা তখনও গজগজ করতে লাগল।

তারপর খানিক পরেই অবশ্য নীরার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এবং চায়ের টেবিলে বসে দিদির বাড়ীর বর্ণনা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে লাগল। বলল, "কি মজা ভাই তোমার দিদি! কেমন সুন্দর নূতন সাজান ঘরবাড়ী পাচ্ছ। আর তার জন্যে তোমায় কারও দাসী হয়ে থাকতে হচ্ছে না। আমার কপালই মন্দ।"

প্রিয়নাথ বলল, "তা দিদির মত ডাক্তার কি উকীল কিছু একটা হয়ে যাও না, পার ত। মেয়েও ততদিন বড় হয়ে যাবে, তার ভাবনাও বেশী তোমায় ভাবতে হবে না।"

ধীরা বলল, "আর আপনার ভাবনাটা কে ভাববে শুনি?"

প্রিয়নাথ বলল, "ভগবান ভাববেন, অথবা কেউই ভাববে না। যাদের ভাবনা কেউ ভাবে না, তারাও ত বেঁচে থাকে?"

কথাটা ঠাট্টার পর্য্যায় থেকে অন্য গভীরতর পর্য্যায়ে চ'লে যাচ্ছে দে'খে ধীরা তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিল। মনটা তার একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল। এ দুটো মানুষ কিছুতেই কেন একটু বনিয়ে চলতে জানে না? নীরা এদিকে ত স্বামী সম্বন্ধে ভীষণ ঈর্ষ্যাকাতর, কারও দিকে প্রিয়নাথ একবার তাকালেই তেলে-বেগুনে জ্বলে যায়, অথচ বেচারাকে স্বস্তিও দিতে চায় না। তবে কি ওর ধারণা যে তার স্বামী তাকে পছন্দ করে না? না, প্রিয়নাথই এই রকম কিছু ভাবে-ভঙ্গিতে প্রকাশ করে ফেলেছে?

কিন্তু বোনের ভাবনা ভাববার তার খুব বেশী সময় ছিল না। তিন দিন পরে তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। জিনিষপত্র গোছানোর কাজে তাকে আর যশোদাকে সারাদিন খাটতে হয়। এই মানুষটা যদি হঠাৎ জোগাড় না হয়ে যেত তা হ'লে ধীরা একলা যে কি করত তা ভেবেও পায় না। নীরা আর ঝুনু এসে কাজের ব্যাঘাত করে, কিন্তু সেটা সয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

(৯)

ধীরার যাওয়াটা খুব ঘটা করেই হ'ল। সে আর যশোদা ছাড়া ধীরার ছোট ভাইও চলল এবং যশোদার অনেক নিষেধ সত্ত্বেও একজন ছোকরা চাকর শুবালা তার সঙ্গে দিয়ে দিলেন। ফাই-ফরমাস খাটবার একটা লোক ত থাকা চাই? বড় ভারি কাজগুলো না হয় যশোদাই করবে। ওখানে গেলে পর হয়ত একটা গাড়িও জুটতে পারে ধীরার, তখন ছোকরাটাকে গাড়ি ধোয়ার কাজটাও দেওয়া যেতে পারে।

নীরা শেষ অবধি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াটা চালিয়েই গেল। ধীরাকে বার বার ক'রে ব'লে রাখল যে সে গিয়ে একলা অন্ততঃ মাস ছয় দিদির বাড়ী থেকে আসবে। ধীরা অবশ্য মুখে তাকে আসতে বলল তবে মনে মনে ভাবল এমন সৌভাগ্য তার না হলেই ভাল।

এলাহাবাদে পৌঁছতে তার বেশী সময় লাগল না। একটা রাত অবশ্য কাটাতে হ'ল ট্রেণে। যশোদা এমন ক'রে তার যত্ন করতে লাগল যেন ধীরা ছ' বছরের মেয়ে। তার স্নানাহার নিদ্রা সব কিছুর সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত ক'রে তবে সে ছাড়ল। ধীরা দেখল, যশোদা কাজেই যে অত্যন্ত ভাল শুধু তা নয়, ভয় ডরও তার কিছুমাত্র নেই। গাড়ির থেকে চট্‌পট্‌-উঠছে নামছে, যেন গাড়িতেই চিরকাল তার ঘর-বাড়ী। ধীরা নিজে এর অর্দ্ধেক সপ্রতিভও নয়।

ভাবল, "অভ্যাসে কি না হয়। আর আমাদের দিশী ঝিগুলো বেশীর ভাগই ত কাপড়ের পুঁটলির সামিল।"

এলাহাবাদে পৌঁছেও তাদের কিছু অসুবিধা করতে হ'ল না। হাসপাতালের লোক এসেছিল তাকে নিতে, কাজেই বাড়ী খোঁজার জন্য কিছু ঘোরাঘুরি তাদের করতে হ'ল না। পৌঁছে গিয়ে মস্ত বড় বাগানের মধ্যে ছোট বাড়িটি দেখে ধীরা মুগ্ধ হয়ে গেল। ঠিক যেন একখানি ছবি। মানুষকে যতটা দূরে রাখতে সে চায়, ততটা দূরেই রাখতে পারবে, অথচ যখনি দরকার হবে তাদের সান্নিধ্য পাবে, সাহায্য পাবে। যদি সাহচর্য্য চায়, তা হ'লে তাও হয়ত পেতে পারে।

কিন্তু সম্প্রতি এখন নাওয়া খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা করা দরকার, তারপর বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করতে হবে, সাজাতে হবে। যশোদা ও চাকর বিধু কাজে লাগল। যশোদা একলাই একশ। কোন কাজ তাকে বোঝাবার জো নেই, সে না জানে কি? দিদিমণি ত তার মেয়ের বয়সী আর বিধু ছোঁড়া মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়।

একটা তোলা উনুনও সে জোগাড় ক'রে এনেছে। গিয়ে উনুন পেতে তবে রান্না করতে হলেই হয়েছে আর কি? তাও গুদাম ঘরটা বেশ দূরে। তবে সাহেবী ফ্যাশানের বাড়ীতে এ রকম দূরে দূরেই রান্নাঘর, চাকরের ঘর হয় বটে। মেম-সাহেবরা চাকর-বাকর সারাদিন ঘাড়ের উপর হটর-পটর করা পছন্দ করে না। যখন ডাকবে তখন আসবে, অন্য সময় তফাতে থাকবে। রান্নার জিনিষও সব সঙ্গেই ছিল, কাজেই রান্না হয়ে যেতে কিছু দেরি হ'ল না। ধীরা আর তার ভাইয়ের স্নানাহার সময় মতই হয়ে গেল। যশোদা আর বিধুও খেয়ে নিল। কিন্তু তারপর দিবানিদ্রা দেবার কোন চেষ্টা করল না, ঝাঁটা বালতি নিয়ে আবার ঘর পরিষ্কার করতে লাগল। ধীরা বলল, "একটু বিশ্রাম ক'রে নাও। এত তাড়াও কিছু নেই"

যশোদা বলল, "না দিদিমণি, আমি এত 'মেলেচ্ছ' দেখতে পারব নি। আমাদের আবার বিশ্রাম! আর ও ছোঁড়াটা আর তোমার এখানকার মালী জমাদার, তাদের কথা আর বলো নি। ঝ্যাণ্ড সব কুঁড়ে। ওরা চারটেতে যে কাজ করবে আমি একা সে কাজ করব," বলে ঝড়ের বেগে ঝাঁটা চালাতে লাগল।

ধীরার বোধ হয় যশোদার ছোঁয়াচ লাগল একটু। সেও না শুয়ে, ঘুর ঘুর করে সারা বাড়ী ঘুরতে লাগল। বড় একটা হলের মত ঘর, তাতে খাওয়া-দাওয়ার কাজও চলে,

বসার কাজও চলে। দু'টি শোবার ঘর, দুটোরই সঙ্গে বাথরুম লাগান আছে। চারিদিকে চওড়া ঢাকা বারান্দা টবের গাছ দিয়ে সাজান। বসবার জন্য চেয়ার-বেঞ্চিও দেওয়া আছে। হাসপাতালের বিরাট 'লন' আর বাগানের মধ্যে ছোট বাড়ীটি যেন পাখীর বাসার মত লুকিয়ে আছে। বাইরের বড় রাস্তার সঙ্গে এর আলাদা সংযোগের পথ রয়েছে ছোট গেট দিয়ে। হাসপাতালের প্রকাণ্ড প্রবেশ-পথের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখলেও ধীরার চলবে।

বাড়ীটায় আসবাবপত্র সবই প্রায় রয়েছে, আর যা দরকার ধীরা তা নিজেই কিনে নেবে স্থির করল। গৃহসজ্জা কিছু কিছু কিনতে হবে। বইয়ের আলমারি একটা কিনতে হবে। বই তার অনেক জমা হয়েছে। যশোদা আর যা যা চায়, তাকে তাও সংগ্রহ ক'রে দিতে হবে।

যশোদা ইতিমধ্যে ঘর ধোওয়ার কাজ শেষ ক'রে মস্ত একটা থলি নিয়ে এসে হাজির হ'ল। বলল, "টাকা কিছু দাও দিদিমণি, ভাঁড়ার সব জিনিষ কিনে রাখি। কাল থেকে ত তুমি ডিউটি করবে, তোমার আর নাগালও পাব নি, আর সারাক্ষণ মনিবকে জ্বালাব কেন? কখন কি দরকার আমি কি জানি নি? মেমরা এরকম করতে দেয় না। হপ্তায় শুধু দু'দিন তাদের কাছে যাবার অর্ডার।"

ধীরা বলল, "তুমি বাজার চিনবে কি করে?"

"ঐ জমাদার ছোঁড়াকে নিয়ে যাচ্ছি, ঐ এক'দিন দেখিয়ে দেবে।"

যশোদা চলল বাজার করতে। ধীরার ভাই ছোট শোবার ঘরটায় নাক ডাকিয়ে ঘুমতে লাগল। বিধু বারান্দায় ব'সে ঢুলতে আরম্ভ করল, এবং ধীরাও একটু শ্রান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের চেষ্টা দেখল।

কখন হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। জাগল যখন তখন যশোদা চা নিয়ে ডাকাডাকি করছে। ধীরার ভাইও উঠে পড়েছে।

যশোদাকে জিজ্ঞাসা করল ধীরা, "বাজার বেশ বড়? সব জিনিষ পাওয়া যায়?"

"তা আর যাবে নি? এত বড় শহর। ভাগ্যে হিন্দীটা জানি, না হ'লে কথা কইতে বড় অসুবিধা হ'ত।"

ধীরা মনে মনে বলল, 'তুমি না জান কি?' মুখে বলল, "দাম কি রকম? কলকাতার মত?"

যশোদা বলল, "এক-এক জিনিষের বেশীও আছে, আবার এক-এক জিনিষের কমও আছে। মাছ ভাল পাওয়া গেল নি। এখানে ডিম আর মাংসই বেশী ক'রে খেতে হবে।"

প্রথম দিনটা ত ভালভাবেই কেটে গেল। তারপর দিন ধীরার ভাই কলকাতায় ফিরে গেল আর ধীরা গিয়ে নিজের কাজে যোগ দিল। সহকর্ম্মীদের তার ভালই লাগল, দু-একটিকে ছাড়া। ব্যবস্থা সবই ভাল। রোগিণী অনেক-গুলি জুটে গেছে এর মধ্যে, নানা জাতের, নানা প্রদেশের। বাচ্চাদের ঘরটা দেখে তার ভারি ভাল লাগল। যেন সারি সারি প্রাণবন্ত খেলার পুতুল সাজান রয়েছে এক একটা কি মিষ্টি দেখতে! প্রত্যেকটা নম্বর দেওয়া বালা পরা। একটা চেঁচাতে আরম্ভ করলে সব ক'টাই সেই সঙ্গে চেঁচাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল, মা-গুলো কি সৌভাগ্যবতী; এরই এক একটাকে কোলে নিয়ে কেমন বাড়ী চ'লে যাবে। এর ভিতর বড়লোক আছে, দুঃখী আছে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য ভগবান্ ত প্রায় সব মেয়েকেই দিয়েছেন। কিন্তু ধীরা কোনদিন কোন শিশুকে বুকে পাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে দেখল, যশোদা আর বিধু মিলে ঘর-দোর প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছে। বেশ কিছুদিন বাস করা বাড়ীর মত দেখাচ্ছে। চা টা খেয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল একটা মাসিকপত্র নিয়ে। এই রকম একটা ছবিই সে কল্পনায় চোখে দেখত, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের। কোনদিকে ত ত্রুটি নেই, বরং টাকা-কড়ির দিক দিয়ে ভালই। যা আশা করেছিল তার চেয়ে ভালই। কিন্তু যতটা সুখী হবে ভেবেছিল, তা কেন হতে পারছে না? সে যে বড় একলা। তরুণ বয়সে মানুষ এতটা একলা ত থাকতে চায় না, থাকতে পারেও না। দিল্লীতে তবু এই শূন্যতাটাকে অনুভব করবার বেশী সময় ছিল না। সহপাঠিনী অনেক ছিল, সঙ্গে যারা হষ্টেলে বাস করত তারা ছিল। বিভা ছিল। অবশ্য বিভা বেশীর ভাগ সময়ই নিজেকে নিয়ে এত বিব্রত থাকত যে ধীরার জন্যে বেশী সময় দেওয়া তার সম্ভব ছিল না। তবু অনেকখানি জায়গা সে জুড়ে ছিল ধীরার জীবনে। এখন সে কোথায় আছে, কেমন আছে, ধীরা জানেওনা। বিয়ে ক'রে তার মনে একটুও কি শান্তি এসেছে। নব-বিবাহিত স্বামীকে একটুও কি ভালবাসতে পেরেছে? অসন্তকে একটুও কি ভুলেছে? ঠিক করল, একটা চিঠি লিখবে বিভার মায়ের কাছে। কোথায় আছে এখন বিভা তা জেনে নেবে।

সন্ধ্যাটা রাত্রির দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এলাহাবাদে আলাপী লোক একজনও যে নেই সেটা সে প্রথমে এলাহাবাদের গুণ ব'লেই ধরেছিল। এখন মনে হ'ল, চেনা-শোনা দু'চারটে মানুষ থাকলে মন্দ হ'ত না। তারা মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসতে পারত, ধীরাও তাদের বাড়ী যেতে পারত। হাসপাতালে যারা কাজ করে তাদের

মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুইই আছে। মেয়েদের সঙ্গে ভাব ত সহজেই করা যায়, যদিও তারা সকলেই ধীরার চেয়ে বড়, এক একজন মায়ের বয়সীও আছে। নার্সদের মধ্যেও নানা বয়সের নানা প্রদেশের মেয়ে রয়েছে। একটি মেয়েকে দেখে মনে হ'ল সে বাঙালী। অবশ্য কথা বলছে সকলে হিন্দীতে বা ইংরেজিতে। মেয়েটির নাম শুনল চঞ্চলা।

পুরুষদের মধ্যেও যুবক দু'জন আছেন, পক্ককেশ প্রৌঢ়ও রয়েছেন দু-তিনজন। আলাপ সকলের সঙ্গেই করা হয়েছে। সকলেই ধীরাকে বেশ মন দিয়ে দেখেছে। বড় বেশী ছেলেমানুষ, ভেবেছেন প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ারা। অল্প বয়সীরা ভেবেছেন, "বাঃ, দেখবার মত চেহারা একখানা।" তাঁদের মনোভাবটা চোখের চাউনির মধ্যে একেবারেই প্রকাশ পায় নি তা নয়। ধীরার মনটা এতে একটু সঙ্কুচিত হয়েছে। দিল্লীতেও চেহারা নিয়ে মন্তব্য সারাক্ষণ শুনেছে, এখানেও শোনা যাবে বোঝা গেল।

ভাল যে একেবারে না লাগে তা নয়। আত্মপ্রসাদ একটু মানুষ অনুভব করেই এতে। বিশেষ ক'রে তরুণ বয়স হলে। তবে ধীরার মন এতে যে অবিমিশ্র আনন্দই আসত তা নয়। চেহারার জন্য জীবনে বড় যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা একবার হয়ে গেছে তার, সেই স্মৃতিটা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই তাকে খানিকটা বিষণ্ণ আর উন্মনা করে তুলত। বন্ধু-বান্ধবে বললে জিনিষটা সে হাল্কা ভাবেই নিত। অপরিচিত লোকের কথায় বা দৃষ্টিতে তার রূপের স্বীকৃতিটা তত খুশী করত না তাকে। ক্রমশঃ

আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা

শ্রীপ্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়

দার্শনিকরা বলেন, 'জীবন স্বপ্ন'। একমাত্র এই কারণেই হয়ত বলা যায় আমরা আছি। যেহেতু স্বপ্ন দেখা, বা অনুভব করার জন্যও দর্শকের অস্তিত্ব (Existence) প্রয়োজন। দর্শনের এই 'জীবন স্বপ্ন'—জগতের গতি (Motion)। 'এক আমি বহু হব' লীলাময়ীর এই ইচ্ছাতেই, মহাকালের গতিতে শক্তির বিচিত্র রূপান্তর। বিশ্বজীবনের নব নব সৃষ্টির উন্মেষ তারই ফলে। আর—সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেই এসেছে আধুনিক বিজ্ঞান।

আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি যতই লুকোনো তত্ত্ব এবং তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরছে, ততই বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের, বেদের, উপনিষদের, সর্বোপরি ভারতীয় চিন্তাধারার যোগসূত্রটা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি।

আমরা আগেই জেনেছি, Atom বা পরমাণুর প্রথম আবিষ্কারক—ভারতীয় ঋষি কণাদ। তাঁরই নাম থেকে প্রথমে 'কণা' এবং ক্রমে 'অণু' 'পরমাণু'র উৎপত্তি। এ ছাড়া, রামায়ণ-মহাভারতেও আমরা পুষ্পক রথ (আজকের বিমানের সাথে তুলনীয়) এবং নানা প্রকার বাণ ও মারণাস্ত্রের (আজকের রকেট এবং 'মিসাইল' কি?) কথা পড়েছি।

এখানে জীবনের (Life) স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞান এবং দর্শন কি বলে তাই শুধু আলোচনা করছি।

জীবন [১] সামগ্রিকভাবে এক মহাশক্তি। এর উৎস—অসাম্যে (সৃষ্টির আদিতে যা ছিল), যাত্রা এর সৃষ্টিমুখে সাম্যের সন্ধানে। জীবনের বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে। আরম্ভ নেই; শেষ নেই; গতি আছে। বলতে গেলে, এ যেন সীমার মাঝে অসীমের খেলা।

বিজ্ঞানও বলে,—জীবনের যা মূলে—সেই অণু-পরমাণু'র মধ্যে রয়েছে এক অদম্য শক্তি (Atomic Energy)। এ শক্তিরও আরম্ভ নেই, শেষ নেই; আছে শুধু রূপান্তর, দারুণ গতি এবং সৃষ্টির ক্ষমতা—যা সব সময় এক এবং অসীম।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেছেন, "একই অণু কখন মৃত্তিকাকারে, কখন উদ্ভিদাকারে, কখন মনুষ্যদেহে, পুনরায় কখন অদৃশ্য বায়ুরূপে বর্তমান।" শক্তিতত্ত্বের এই রূপের আলোয় জড় (Non-living) ও জীবনের (Living) মধ্যে সঠিক সীমারেখা টানা কঠিন। কেননা—"জড় পদার্থ আকাশের আবর্ত মাত্র।"—বলেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। বস্তুগত রূপের বিভিন্ন এই প্রকাশ, শক্তির তারতম্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আচার্য বসু জড় ও জীবিত পদার্থে উত্তেজনা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, উভয়েই সাড়া দিতে সক্ষম।[২] তার মানে,—জড় ও জীবিত উভয়েরই উৎস সেই এক আদি অকৃত্রিম শক্তি থেকে।

এই যুক্তিতেই মনে হয় গীতা বলছেন :

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
>
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
>
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
>
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
>
> (শ্রীমদ্ভাগবদগীতা; দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ, পৃঃ ৮৭)

এর সবচেয়ে সোজা অর্থ করলে দাঁড়ায়—আত্মা জন্মহীন, বিনাশরহিত, অবিক্রিয় ও নিত্যসিদ্ধ।"

বিভিন্ন আধারে পরমাণুশক্তির বিচিত্র বিকাশ কি এরই নামান্তর নয়? জড় ও জীবন, মূলতঃ এই শক্তি দ্বারাই বিধৃত।

বিভিন্ন আধারে, এই শক্তিই জড় ও জীবনের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞানও বলে, প্রাণশক্তির মাধ্যম বা আধার (Medium)—তা গাছই হোক, কাঠই হোক, বা জীবন্ত প্রাণীকোষই হোক, সে

১। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, বাহ্য ব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারের সামঞ্জস্য বিধানের অবিরাম নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন।

২। "তাড়িতোর্মির (Electric wave) উত্তেজনায় জড়দ্রব্য বিকৃত হয়, ইহা পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা হইতে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটনায় জড়দেহে ও জীবদেহে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য।"—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সমস্তই জড়বস্তুকণিকা উদ্ভূত। এই সব কোটি কোটি অণু-পরমাণুর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সৃষ্টির মূলকথা।

"You are carrying in your body, today, substances that were born millions of years ago in the fiery crucible of a star."

—('The Amazing Biography of An Atom By Mr. J. Bronowski.)

কিন্তু প্রাণশক্তির উদ্ভব হচ্ছে কি করে? এই শক্তি কি বাইরে থেকে মাধ্যমকে আশ্রয় করছে, অথবা কোন এক বিশেষ অবস্থায়, মাধ্যমেই উদ্ভূত হচ্ছে ৩ কিংবা এর উদ্ভব de novo ?? গীতা বলছেন:

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫

(ত্রয়োদশোঽধ্যায়: ; পৃ: ১০৫)

—অর্থাৎ, 'আত্মা (Soul) প্রাণীগণের বাহিরে এবং ভিতরে বিদ্যমান আছে। তাহা স্থিরও বটে, গতিশীলও বটে। সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা অবিজ্ঞেয়; তাহা দূরস্থও বটে আবার তাহা নিকটেও রহিয়াছে ॥১৫"৪

বিভিন্ন অণুর আপেক্ষিক (Relative) জড়তা ভেঙে আসে জীবনের গতি। তারপর সেই প্রাণশক্তির হয় বিবর্তন (Evolution) বিচিত্রপথে, হয় রূপান্তর, চলে সৃষ্টির বিচিত্র খেলা। (ডারয়্যুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ।)

জীবনের এই ধারা জীব থেকে জীবে কি করে বইছে বংশপরম্পরায় এর উত্তর দিয়েছে অত্যন্ত হালফিল বিজ্ঞানের DNA (De-oxyribonucleic acid) এবং RNA (Ribonucleic acid)। এটাও জানা গেছে, যে, বিভিন্ন জীবিত বস্তুর যে বিভিন্ন রূপ দেখা যায় তাও এদেরই জন্য। কিন্তু মূল সমস্যা হ'ল, DNA জড়বস্তু-কণিকা দিয়েই তৈরী এবং শুধুমাত্র জীবিত বস্তু থেকেই এর নিষ্কাশন সম্ভব হয়েছে। জড়বস্তুকণিকা দিয়ে তৈরী এই DNA এবং RNA, কিভাবে জড় ও জীবিতের মধ্যে এই তফাৎ নিয়ে আসছে তা এখনও রহস্যাবৃত। (সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি পেলে, বারান্তরে DNA ও জীবন নিয়ে কিছু লিখতে চেষ্টা করব।

বিজ্ঞানের এই ভাবধারার ছায়া দেখা যায়:

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬

(ত্রয়োদশোঽধ্যায়: ; পৃ: ১০৭)

অর্থাৎ,—"সেই জ্ঞেয় (আত্মা) ভূতনিবহের মধ্যে অবিভক্ত অথচ বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত! তাহা ভূতগণের ভর্ত্তা, তাহা বিশ্বকে গ্রাস করে এবং তাহাই আবার বিশ্বের প্রভাবিতা ॥ ১৬"

প্রাণশক্তিকে আত্মার (soul) সঙ্গে তুলনা করলে প্রথমেই যে সাদৃশ্য চোখে পড়ে, তা হ'ল—

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিত দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

(ত্রয়োদশোঽধ্যায়: ; পৃ: ১৪৬)

এর মধ্যে গীতা বলছেন, "আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়াও অত্যন্ত সূক্ষ্মতা নিবন্ধন কোন বস্তুর সহিত উপলিপ্ত হয় না, এইরূপ আত্মা সকল দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না॥ ৩২"

বিজ্ঞানের সঙ্গে, ভারতীয় দর্শনের মিল এইখানেই। এক প্রাণশক্তি—বিভিন্নরূপে, ক্ষুদ্র বীজাণু (Bacteria) থেকে মানুষ অবধি সর্ব্বচরাচরে নিজেকেই প্রকাশ করে থাকে,—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।—
সূর্য্য যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধকদের অতীন্দ্রিয় মানসিক প্রভাব (Extra-sensory perception) দেখা গেছে জড়বস্তু এবং জীবিত বস্তু উভয়ের ওপরই সমানভাবে কাজ করেছে।

এই শক্তি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ'-এ লিখেছেন,—"আমাদের শরীরের অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী করা যাইতে পারে।" প্রাচীন হঠযোগীদের সম্বন্ধে তিনি বলছেন,—"হৃদ্‌যন্ত্র (Heart) তাঁহার ইচ্ছামত চালিত অথবা বন্ধ হইতে

৩। বিজ্ঞানও স্বীকার করে, আজ থেকে বহু কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল—জীবন সৃষ্টির সহায়ক পারমাণবিক সংগঠনের (Atomic Configuration) সঙ্গে বহিঃশক্তির বা তৎকালীন পরিবেশের এক জটিল বিক্রিয়ার (complicated reactions) ফলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বীক্ষণাগারে কৃত্রিম সেই শক্তির সৃষ্টি করে, জীবনের প্রথম প্রাণকোষ সৃষ্টির চেষ্টা এখনও চলেছে।

৪। আত্মার স্বরূপ-এর (৩) সঙ্গে তুলনীয়।

পারে— শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে পারেন।"(৫)

অধ্যাপক রাইন জড়বস্তুর ওপর এই শক্তি প্রয়োগকে বলেছেন,—Psychokinesis

অজিতায় সজও মনের ওপর অপর মনের এই প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

বিশ্বজীবনের বিচিত্র, আপাত পরস্পরবিরোধী, সমস্ত ক্রিয়ারই মূলে রয়েছে সুসংবদ্ধ সেই মহাশক্তির প্রকাশ।

---

(৫)ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক) "আমাদের দেশের একটা প্রাচীন শাস্ত্রের ওপর বিজ্ঞানের নবীনতর শাখাগুলোরই একটির সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছেন যেগুলো নিছক দেহের জগৎ ও মনের জগতের মধ্যে সীমানাচিহ্ন ক্রমশঃ লুপ্ত করে ফেলেছে।"—'বিজ্ঞানের আলোকে প্রাচীন শাস্ত্র' নামের একটি প্রবন্ধে প্রবন্ধকার 'শ্রীসত্যার্থী' লিখেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন—ডাঃ দাস, ইলেকট্রো-এন্‌কেফেলোগ্রাফ (Electro-encephalograph) বা (সংক্ষেপে EEG) যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ণ সমাধির সময় সাধকের মস্তিষ্কের তরঙ্গ-লেখায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।

এ সমস্তই ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে—আধুনিক বিজ্ঞানের নিবিড় সম্বন্ধেরই পরিচায়ক। তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাই লিখেছেন,—"They who see but one, in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth—unto none else, unto none else."

সর্ব্বাধুনিক বিজ্ঞানের এই অনুসন্ধান, তাই আমাদের সুপ্রাচীন সেই পথ ধরেই চলেছে পরিপূর্ণতার সেই সৌন্দর্য্যে, যেখানে লুকিয়ে রয়েছে জীবন রহস্যের শেষ-শেষ কথা—

"যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অনন্ত দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সংগমে।"
('পথের শেষে'—'জন্মদিনে' : গুরুদেব।)

গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা,—প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত।
২। Science of Life—Wells S. Huxley
৩। অব্যক্ত,—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।
৪। New Frontiers of Mind—J. B. Rhine
৫। পাতঞ্জল যোগদর্শন।

নীলগিরির "টোডা" সংস্কৃতি

শ্রীতুষারকান্তি নিয়োগী

চারপাশে শুধু সবুজ বন, কচি কচি পাতার গন্ধ নরম মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। বনের মধ্যে নানা জানা-অজানা পশুপক্ষীর স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণোল্লাস। যন্ত্রের ঘরঘর নেই, নেই চুল্লীর ধোঁয়ায় ভরা নীল নীলিমের কালিমা। একটা নৈঃশব্দ কোলাহল-হীন নিরুদ্বেগ স্বভাব-সুন্দর শান্ত পরিবেশ। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসা বুনো মোষের স্বরগ্রাম তথা পদধ্বনির বিচিত্র শব্দানুরণন। নিসর্গ-বিস্মিত ভ্রমণকারী হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে এই ধ্বনি শুনে—বুঝতে পারে নিকটে কোথাও নিশ্চয় "টোডা" পল্লীর অবস্থান। আমরা দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলের কথা বলতে চাইছি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই পাহাড়ের উচ্চতা গড়ে ৬০০০ থেকে ৭০০০ ফিট মৌসুমীর অযাচিত দানে বন সবুজ ঘন, মৃত্তিকা সিক্ত সরস ও উর্বর। বিষুবরেখা থেকে মাত্র ১১° বা ১২° উত্তরে অবস্থিত হলেও নীল-গিরি উপত্যকা মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ। মাথার ওপর অনন্ত নীলের নিঃসীম প্রবহমানতা—দিকচক্রবালে সেই আকাশ আর মাটি হাত ধরাধরি ক'রে, করে হাস্যহাসি, মাখামাখি। দক্ষিণ ভারতের আর পাঁচটা স্থান থেকে স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই নীলগিরি, আর এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী আদিবাসী "টোডা"রাও বেঁচে আছে আপন সংস্কৃতির বিশিষ্ট চেতনা নিয়ে সবার থেকে একান্ত একক হয়ে।

প্রাগৈতিহাসিক কোন শিলালেখ বা স্মৃতিচিহ্ন নেই, যার সাহায্যে আজ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার ধারা-বাহিক বিবরণ উদ্ধার করা যায়, তাছাড়া ওদের বর্তমান আচার-সংস্কার অতীত দিন থেকে এত বেশী পৃথক হয়ে গেছে যে, তার মধ্যে প্রাচীনতার কোন ছাপ আর অবশিষ্ট নেই। ইংরেজ আমলে বৃত্তিভোগী পদস্থ কর্মচারীর অবসর জীবন যাপনের স্থান ছিল এই নীলগিরি অঞ্চল। গত শতব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরো-পীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এ অঞ্চলে বেশী চোখে পড়ে—"উটকামণ্ড" গড়ে ওঠে গ্রীষ্মাবকাশ কেন্দ্রগুলির প্রধান পীঠস্থান। ইংরেজ এবং ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে টোডারা আজকাল সভ্যতার আলো পেয়েছে—কিন্তু সেই সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার কালির দাগও তারা মেখে নিয়েছে তাদের গায়। পশ্চিমের বুদ্ধিজীবী সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ যেমন টোডাদের মনের গ্লানি ও মালিন্য দূর করে তাদের ওপর সভ্যতার দু'এক চিলতে আলো ছিটিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনি তারা "টোডা"দের দেহের গ্লানি ও মালিন্যকে করে দিয়েছে স্বতঃপ্রকাশ—"সিফি-লিস" ও "গনোরিয়ার" জীবাণু নীলগিরির টোডারক্তে আজ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করে চলেছে। এই যৌন ব্যাধি টোডা জনসংখ্যার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সংখ্যা ন্যূন হ'তে হ'তে ওরা আজ কমবেশী হাজার খানেকের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কোন একটা কথ্যভাষায় কথা বলে ওরা। প্রতিবেশী আদিবাসী "বাডগা" "কোটা"দের কথার সঙ্গে সে ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু অপরিচিত লোকের সামনে অথবা উৎসব ইত্যাদির সময় "টোডা"রা কথার মধ্যে বেশ কিছু প্রাচীন এবং কেবলমাত্র স্ব-বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে। লিখতে না জানলেও টোডারা ১০০০-এর ওপর গুণতে পারে, সময় নির্দেশের সময় সভ্য মানুষের মতই ওরা "বার" মাসে বছর, "তিরিশ" দিনে মাস এবং "সাত" দিনে সপ্তাহের হিসেব রাখে।

আশপাশের অধিবাসীদের তুলনায় টোডাদের গায়ের রঙ বেশ মাজাঘষা, কালো হলেও তার মধ্যে ঔজ্জ্বল্য আছে—পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা রঙের বিচারে বেশী উজ্জ্বল। ওদের মাথাভর্তি একরাশ ঘন কালো ঢেউ-খেলানো চুল, টোডা পুরুষের দাড়ি অন্যান্য অঞ্চলের পুরুষদের তুলনায় বেশী ঘন, ওদের গায়েও ঘটেছে চুলের প্রকাশ। টোডা পুরুষ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য আদি-বাসীদের মত খর্বাকায় নয়—লম্বায় পুরুষ প্রায় ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে মাথায় ৬ ইঞ্চি খাটো। শারীর লক্ষণের অন্যান্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ওদের মাথার আকার ছোট, লম্বাটে, গোলমুখ, বাদামী চোখ, উন্নত নাসা এবং পূর্ণ ওষ্ঠ। পুরুষদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা,

যথেষ্ট শক্তির অধিকারী ওরা। একজন ৭০ বছরের টোডা ১৫ মাইল সমতলে হাঁটবার পর একই দিনে ৩০০০ ফিট উঁচুতে বস্তা কাঁধে নিয়ে সহজেই উঠে আসতে পারে। যুবতীদের উজ্জ্বল চোখ, মাথাছাপান কালো চুল, টোডা যুবতী অনেক সভ্য চোখেও প্রকৃত সুন্দরীর স্থান পেতে পারে। টোডা স্ত্রীপুরুষের চেহারা দেখলে গ্রীসীয় দেহকাঠামোর কথা মনে আসে।

নীলগিরির পার্বত্য উপত্যকায় "টোডা" ছাড়াও আর কয়েকটি আদিম কোম বসবাস করে। এরা হ'ল "বাডগা", "কোটা", "কুরুম্বা" এবং ইরুলা। শেষ দু'টি আশপাশের আদিবাসীদের সরবরাহ করে এবং এর পরিবর্তে ওরা তাদের কাছ থেকে নানা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পায়, পায় নানা কাজে ওদের সাহায্য ও সহযোগিতা। কৃষিজীবী "বাডগা"দের কাছ থেকে টোডারা পায় নানা রকম উৎপন্ন ফসল। এই বাডগারাই টোডাদের সমতলের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসায় মধ্যব্যক্তির কাজ করে, বাডগারা তাদের বাৎসরিক উৎপন্ন শস্যের এক অংশ টোডাদের দেয়, কারণ টোডাদের দাবি যে ওরাই জমির প্রকৃত মালিক। তা ছাড়া টোডাদের যাদুবিদ্যার ওপর বাডগাদের আছে সহজাত ভয়, সেই

নীল আকাশের নীচে
শ্যাম বনানীর আশেপাশে
ছোট্ট কুঁড়ের সামনে বসা "টোডা পরিবার।"
(ফটো : মাদ্রাজ মিউজিয়মের সৌজন্য)

কোম অত্যন্ত প্রাচীন ভূমিজ। বাহ্যিক আদান-প্রদানে এই পাঁচটি কোমের মধ্যে সংযোগ ঘটে শ্রমবিভাজনের গুরুত্ব ও মান অনুসারে।

টোডারা কোন চাষ-আবাদের ধার ধারে না, তবে কিছু কিছু ক্ষুদ্র যন্ত্রশিল্পের কাজ ওরা করে। ওদের প্রধান কাজ গোষপালন। ওদের সংস্কৃতি তথা জীবনায়নের একটি প্রধান অঙ্গ হ'ল এই গোষপালন। গোষশালার নানা রকম কাজকর্ম করা ওদের প্রতিদিনকার কাজ।

টোডারা প্রচুর পরিমাণ ঘি মাখন দুধ ইত্যাদি সঙ্গে তারা সম্মানও করে টোডা আচার ও সংস্কৃতিকে। অল্পস্বল্প কৃষিকাজ জানলেও টোডাদের মূলতঃ গোষপালন ও ছুতার-কামারের কাজ করতে দেখা যায়। সহবাসী অন্যান্য কোম, যেমন কোটারা, টোডাদের লোহার তার ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য ও উৎসব আচার, গানবাজনার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করে। এসব আদিবাসী পরিবর্তে টোডাদের কাছ থেকে পায় বলির মাংস দুধ ঘি মাখন ইত্যাদি। স্বাজাত্যগর্ব টোডামানসিকতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যাই হোক, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত আদিম কোম

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই করে থাকে। যুদ্ধ ইত্যাদি সমস্যা এখনও এদের সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনচেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। আর তীর-ধনুক এবং হাতুড়ি-কুঠারছাড়া টোডারা অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়—প্রয়োজনও বোধ করে না নিজেদের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করতে।

টোডাদের গৃহস্থালী বেশ ছোট। চাষ করবার জন্য ওদের কোন লাঙলের দরকার হয় না—কেননা চাষ ওরা করে না, শিকার উপযোগী কোন যন্ত্রপাতি ওদের নেই—কেননা শিকার ওদের উপজীবিকার মৌল অঙ্গ নয়, অস্ত্র দিয়েও ঘর সাজায় না ওরা—কেননা যুদ্ধে ওদের একান্ত অনীহা। ওদের না আছে মৃৎশিল্প না আছে কাপড়-চোপড় তৈরীর ব্যবস্থা। অরণ্যে কাঠসংগ্রহ করতে ছুরি ও কুঠার হলেই চলে। তবে মোষপালনের জন্য খাটাল রাখতে হয় বলে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি—ঝাঁটা, চালানি, এবং শস্যগুঁড়োনর হামান—দরকার হয় কিন্তু এ দরকার মেটে কোটাদের সাহায্যে। গাছের কাঁটা দিয়ে হয় ছুঁচ, পাতা দিয়ে হয় বাসন এবং পানপাত্র। যাই হোক, দাক্ষিণাত্যের বা ভারতের অন্য অঞ্চলের আদিবাসীদের যে সহজ দক্ষতা কিছু কিছু যন্ত্রশিল্পে ও ক্ষুদ্র সুকুমার শিল্পের মধ্যে প্রকাশ পায়, তা টোডাদের মধ্যে অপহৃত, তবে শরীরে উল্কি করা বা কাপড়ে রং করা ইত্যাদির মধ্যে হয়ত ঐ শৈল্পিকবোধ প্রকাশ পথ খোঁজে—পথ খোঁজে বাঁশী বাজান তথা উৎসবাদিতে গীত সঙ্গীত রচনার আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে। কেবলমাত্র মৃত্যু-উপলক্ষ্যে টোডারা একটা নাচের অনুষ্ঠান করে--তবে এ নাচ নিতান্ত সাধারণ, শিল্পগুণবর্জ্জিত।

স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পরনে থাকে কটিবন্ধ, আর উপরের দিকে কোনাকুনি করে কাপড় জড়ান থাকে। উপরের কাপড়ে প্রায়ই সুতোর কাজ দেখা যায়। মাথা আর পা আলগাই থাকে। মাথার পেছনে ও সামনে দু'গুচ্ছ চুল ছাড়া বাচ্চাদের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। সোনা রূপা পেতলের গয়নায় মেয়েদের গা থাকে ভর্তি—কানের দুল, ব্রেসলেট, আর্মলেট, বাজু ও নানা রকমের অলংকারে নারী-অঙ্গ হয় বিভূষিত। পুরুষেরা আংটি ও কানে দুল ব্যবহার করে—আগে গলায় হারও পরত। বৃদ্ধারা বুকে, কাঁধে ও হাতের উপরের দিকে উল্কি পরে। মাঝে মাঝে টোডাদের মুখে প্রসাধনের ছোপ দেখা যায়—তবে দেহে ওরা কোন প্রসাধন করে না। টোডারা সারা গায় এত বেশী ঘি মাখে যার জন্য ওদের গা থেকে সব সময় একটা তীব্র কটু গন্ধ বের হয়।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একজাতীয় কুঁড়েতে টোডারা বাস করে। ঘরের ধারগুলি বক্র ছাউনির প্রক্ষেপ। তালপাতা দিয়ে ঘরের চাল ও চারপাশ ছাওয়া থাকে—তালপাতার ওপর থাকে শক্ত বাঁশের বাঁধুনি। সামনে থাকে ঘরে ঢোকবার ছোট্ট দরজা। ঘরের ভেতরটা সব সময়ই ধোঁয়ায়ভরা থাকে—ফলে একটা শ্বাসরোধকারী পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেখানে। টোডারা ঘরের মধ্যে সব সময়ই আগুন জ্বালিয়ে রাখে। মেঝের কোন একটি স্থান উঁচু করে তার ওপর মোষের বিষ্ঠা ঘেড়ে দিয়ে শোবার স্থান প্রস্তুত হয়। ঘরের মাঝখানে থাকে একটা গর্ত—এই গর্তের মধ্যে বীজ শস্য ইত্যাদি গুঁড়ো করা হয়। মেয়েরাই কেবলমাত্র এই কাজে অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি টোডাপল্লীতে এই জাতীয় ৬/৭টি টোডাগৃহ বা কুঁড়ে দেখতে পাওয়া যায়। ঘর তৈরীর জন্য একটু উঁচু জমি নির্বাচন করা হয় যার কাছেই থাকে নদী বা ঝর্ণা, আর চারপাশে থাকে পাথরের পাঁচিল, যার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রবেশ সহজসাধ্য হলেও মোষ বা অন্যান্য বন্যজন্তু প্রবেশ করতে পারেনা।

টোডাদের পালিত পশুর মধ্যে মোষ এবং বিড়ালই প্রধান। মোষ চারণ ও পালনের কাজ পুরোপুরি পুরুষদের ওপরই ন্যস্ত। পালিত মোষগুলির মধ্যে শ্রেণীভেদ লক্ষ্য করা যায়। টোডাপল্লীতে দু'রকম মোষ দেখা যায়। এক শ্রেণীর মোষকে ওরা বিশেষ পবিত্র জ্ঞান করে এবং এদের পালন চারণের ওপর বিশেষ দৃষ্টি ও যত্ন দেওয়া হয়। অপর শ্রেণীর মোষ সাধারণ—এগুলি চরায় ছেলেরা ও সাধারণ পুরুষেরা, আর দোহনও করা হয় বসতিকেন্দ্রে। পক্ষান্তরে পবিত্র মোষ যে কেউ চরাতে পারে না—বিশেষ লোকের দ্বারা এই সব মোষের রক্ষণাবেক্ষণ হয় এবং এগুলির দোহন-কার্যের জন্যও আছে নির্দিষ্ট দোহনশালা। দোহনের কাজ হয় দিনে দু'বার—একবার খুব সকালে, আর একবার বিকেলে। দোয়া দুধ বাঁশের বালতিতে সংগ্রহ করে পরে মাটির পাত্রে ঢেলে তার মধ্যে মন্থন-দণ্ড ঘুরিয়ে মাখন তোলা হয়। মন্থনের ফলে ঘনীভূত পদার্থ থেকে এক তরল অংশ বিভক্ত হয়ে যায়; ঘনীভূত পদার্থ হ'ল মাখন। তারপর এই মাখন জ্বাল দেওয়া হয়। জ্বাল দেবার পর অকেজো তলানি বার করে নিয়ে তার সঙ্গে চর্বি ইত্যাদি মিশিয়ে খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই মিশ্রিত দ্রব্য টোডাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। আর মন্থনাবশিষ্ট তরল পদার্থ থেকে ঘি ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হয়।

মোষ টোডাদের অত্যন্ত প্রিয়—কেবলমাত্র বিশেষ কোন অনুষ্ঠান ছাড়া টোডারা কখনও ওদের পালিত মোষের মাংস খায় না। টোডাদের প্রিয় খাদ্য হ'ল দুধভাত, ঘোল, মিষ্টি দই আর কোন একটা তরকারি। পানীয় হিসেবে ঘোল ব্যবহৃত হয়--কোন উত্তেজক পানীয়ের ব্যবহার ওদের মধ্যে চালু নেই। রান্নার কাজটা পুরুষদেরই করতে হয়, খাওয়ার ব্যাপারটাও তারা মেয়েদের আগেই সেরে ফেলে। টোডারা দিনে দু'বার খায়—একবার সকালে, আর একবার রাত্রে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে।

আদিবাসী টোডারা দু'টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। দু'টি বিভাগের জনমানসের মধ্যে আচারগত ও কথ্য ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি প্রীতির সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে দু'টি দলের প্রকৃত পার্থক্য বিবেচিত হয় মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথম এবং প্রধান দল "টারথর"—এই দলের লোকেরা ক্ষমতা সম্মান সব দিক দিয়েই দ্বিতীয় দল "টেইবলি"র লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত, অন্তত "টারথর"রা নিজেদের সম্পর্কে সেই মনোভাবই পোষণ করে। টারথরদের অধীনে থাকে সমস্ত পবিত্র মোষ এবং তারাই খাটালগুলির মালিক। "টেইবলি"র লোকেরা নানাভাবে টারথরদের কাজকর্মে সহায়তা করে। জনসংখ্যার দিক দিয়েও টারথররা গরিষ্ঠ প্রত্যেকটি দল আবার বহির্বিবাহ (exogamous) উপদলীয় গোত্রে (clan) বিভক্ত। টারথর দলের মধ্যে আছে ১২টি গোত্র উপবিভাগ আর টেইবলিতে আছে ৬টি গোত্র-উপবিভাগ। প্রত্যেকটি গোত্রোপদল আবার কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত। খাটাল সংরক্ষণ অথবা অন্য কোন কাজে অর্থব্যয় হলে সব পরিবারের কাছ থেকে খরচের টাকা সংগ্রহ করা হয়।

সম্পত্তি অধিকারের ব্যাপারে টোডাদের মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব অধিকার কেবলমাত্র কাপড়, গয়না ও গৃহস্থালীর জিনিষপত্রের ওপর। কিন্তু জমির মালিকানা কখনও ব্যক্তিবিশেষের হতে পারে না। মোষ, সে সাধারণ বা পবিত্র যাই হোক না কেন, সাধারণতঃ ব্যক্তি বা পরিবারের সম্পত্তি বলেই গণ্য হয়; তবে সবচেয়ে পবিত্র মোষ, ওদের ভাষায় "তি"র মালিকানা গোটা গোত্রোপদলের। জমিজমা, প্রধান বসতিকেন্দ্রগুলিও গোটা গোত্রোপদলের সম্পত্তি। সম্পত্তির অধিকারভোগ পিতৃতন্ত্রনিয়মে হয়ে থাকে; প্রত্যেক ছেলে সম্পত্তি, অলংকার, কাপড়, অধিকৃত দ্রব্য ও অর্থের সমান ভাগ পেয়ে থাকে। ছেলের মৃত্যু হলে দৌহিত্র সেই ভাগ পেয়ে থাকে। সব ছেলে মিলে-মিশে বাস করলে মোষ ইত্যাদি পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ একত্রই করে--আলাদাভাবে থাকলে মোষগুলিও ভাগ হয়ে যায় পুত্রদের মধ্যে। তবে ভাগের সময় জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠের ভাগে একটা করে জন্তু বেশি পড়ে। অকেজো মোষগুলিরও ভাগ এবং পরে সেগুলিকে বিক্রী করে দেওয়া হয়। পিতা কোন ধার রেখে মারা গেলে তা ছেলেদের শোধ করতে হয়।

প্রত্যেক পরিবারেই একজন প্রধান ব্যক্তি থাকে যার কাজ হ'ল পরিবারের সংগ্রহ ও খরচপত্তরের কাজ দেখাশোনা করা। প্রত্যেক গোত্রোপদলের থাকে একজন নেতা। অভিজ্ঞ কর্মঠ ও বলিষ্ঠ লোককে নেতা নির্বাচন করা হয়—রুগ্নতা ও বার্দ্ধক্যের জন্য এই পদ পরিত্যাগ করতে হয়। সমগ্র "কোমে"র আলাদা কোন "কোমপতি" নেই—কিন্তু "কোমে"র আভ্যন্তরীণ শাসন শৃংখলা দেখাশোনা করার জন্য পাঁচজন সদস্যের একটি "কোমপরিষদ" আছে। একে টোডারা বলে "নিয়াম"। পাঁচজনের তিনজনকে নেওয়া হয় "টারথর" দল থেকে, একজনকে গ্রহণ করা হয় টেইবালি দল থেকে, আর পঞ্চম জন হ'ল একজন "বাডগা" সদস্য। দুই উপবিভাগেরই কাজকর্ম সম্পর্কে এই "পরিষদ" বিশেষ জ্ঞাত থাকে। কাজটি দেওয়ানী-সম্পর্কিত হাঙ্গামা, বিভিন্ন উপবিভাগীয় গোলমাল, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যকার বিবাদ-বিসংবাদ অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তির ত্রুটি ইত্যাদি ব্যাপারের বিচার ও নিষ্পত্তি করে। এসব কাজ ছাড়া উৎসব পরিচালনার দায়িত্বও এই কমিটির তথা পরিষদের ওপর ন্যস্ত। তবে ফৌজদারী ব্যাপারে পরিষদের কোন দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব নেই—কেননা ফৌজদারী-সংক্রান্ত ঘটনা, খুন, জখম, মারপিটের ঘটনা টোডা সমাজে বড় একটা ঘটে না। টোডারা নিয়ম-শৃংখলা ও ঐতিহ্যপ্রত্যয়ে বিশ্বাসী।

টোডাদের আত্মীয়সম্পর্কও বিচিত্র ধরনের। আত্মীয়সম্পর্কের এই বিচিত্রতা নির্ভর করছে ওদের বিবাহের নিয়ম, ওদের সমাজমানসিকতা ইত্যাদির ওপর। ওদের বিবাহ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করার পূর্বে আত্মীয়সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমরা ওদের সমাজের বিবাহে দ্রৌপদীত্ব (polyandry) ও মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ সম্পর্কের (cross cousin marriage) কথা উল্লেখ করছি; কেননা এর ওপর ভিত্তি

করে ওদের আত্মীয়সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয়। বিবাহে দ্রৌপদীত্ব অর্থাৎ বহুস্বামীর এক স্ত্রী থাকার ফলে পিতৃত্বটা কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর অর্পিত হয় না, আবার নারী-পুরুষের মিলন ব্যাপারে তথাকথিত সীমাবদ্ধতা না থাকায় সন্তানরাও "মা" বলতে কোন বিশেষ নারীকে বুঝলেও পিতাদের সম্পর্ক-সম্পৃক্তাদেরও বুঝে থাকে। তাই "বাবা" বলতে ছেলে যার ঔরসে সৃষ্ট তাকেও যেমন বোঝে, সেইসঙ্গে জ্যাঠা, খুড়ো ইত্যাদিকেও সেই একই নামে ডাকে—পিতার গোত্রের সমস্ত পুরুষই টোডা ছেলেমেয়েদের বাবা। তেমনি গর্ভধারিণী ছাড়াও মাসী এবং মায়ের গোত্রের সকল নারীকেই ছেলেমেয়েরা "মা" জ্ঞান করে। ঠিক "পুত্র-কন্যা" অর্থের মধ্যেও এই ব্যাপকতর অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। টোডাদের মধ্যে "মামাতো-পিসতুতো" ভাইবোনরা পরস্পর পরস্পরকে ডাকে "মটচুনি" বলে—বিবাহও হয় ওই মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে। তাই উভয়পক্ষের ছেলেমেয়ে বিবাহযোগ্য হলে পরস্পরের সম্পর্কে "স্বামী" বা "স্ত্রী" এই মনোভাব পোষণ করে। সেইভাবে "মামা" ও পিসেমশাই হয়ে যায় "মুন" অর্থাৎ শ্বশুর। কিন্তু নিজের বোনের ছেলে ও সমগোত্র দলসম্পর্কিত বোনের ছেলের মধ্যে একটা পার্থক্য ওরা সহজেই করে থাকে। তাই একজনকে বলে—"আমার বোনের ছেলে", এবং অপরজনকে বলে—"আমাদের বোনের ছেলে"।

টোডাদের সমাজসংগঠন এবং বংশপর্যায় পুরুষশাসিত এবং পিতৃতান্ত্রিক। সন্তান পিতার গোত্রেই পরিচিত হয়। বিবাহে দ্রৌপদীত্ব চালু থাকার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই যে বহুপিতার প্রশ্ন ওঠে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু বহুপিতার এই প্রশ্নের টোডারা একটা সমাধান করেছে একজন বিশেষ পিতা" তথা "আইনত পিতা"র ধারণায়। এই 'আইনত পিতা" হতে গেলে একটা উৎসব-আচারের অনুষ্ঠান করতে হয়। যার ঔরসে পুত্রজাত তিনি প্রকৃতপক্ষে "আইনত পিতা" নাও হতে পারেন। আইনত পিতা নির্দ্ধারণের ব্যাপারটা বেশী পরিমাণে নারীর নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। সাত মাস গর্ভবতী নারী তার আগামী সন্তানের পিতা হিসেবে একজনকে গোত্রের "আইনত পিতা" হিসেবে মনোনয়ন করে। নির্বাচিত ব্যক্তি এমন কি স্ত্রীলোকটির স্বামী নাও হতে পারে। কেননা অনেক সময় সন্তানসম্ভবা নারী বিবাহিত না হতে পারে, অথবা আচারকালীন সময়ে নারীর স্বামী সেখানে উপস্থিত না থাকতে পারে, অন্য লোক আচার পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সেই "পিতা" নির্বাচিত হয়। আচার পালনের সময় স্ত্রীলোক, তার নির্বাচিত পুরুষ কয়েকজন আত্মীয়সমেত বনের মধ্যে প্রবেশ করে। লোকটি কোন গাছের একটা অংশ কেটে ভেতরটা ফাঁপা করে প্রদীপ রেখে দেয়, তারপর তীর-ধনুকের আকারে নকল একটি খেলনা তৈরী করে; এরপর ওই তীর-ধনুক ও একটা বাছুর লোকটি স্ত্রীলোকটিকে দান করে। স্ত্রীলোকটি সেই দান গ্রহণ করে এবং খেলনা ধনুক কপালে স্পর্শ ক'রে জ্বলন্ত প্রদীপের দিকে চেয়ে থাকে যতক্ষণ সেটা না নেভে। তারপর সে খাবার প্রস্তুত করে। তারপর সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া করে সেই রাত্রে জঙ্গলের মধ্যেই কাটিয়ে দেয়। প্রথম সন্তান জন্মের আগে এই আচার পালন টোডা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাঁচ মাস গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে স্বামী কুঁড়ে থেকে স্বতন্ত্র হয়ে অস্থায়ী বাসস্থানে থাকতে হয়। সন্তান জন্মের সময় বিশেষ কোন আচার টোডা নারীর পালন করতে হয় না। সন্তান জন্মের প্রাক্কালে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী স্ত্রীলোক "মা"য়ের কাছে উপস্থিত থাকে। সন্তান জন্মের সময় গর্ভকাতরা নারী হাঁটু গেড়ে স্বামীর বুকে মাথা রেখে বসে। অতিরিক্ত বেদনা বোধ করলে প্রার্থনা করে যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা করা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর নাভিনাড়ী ছুরি দিয়ে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। অবাঞ্ছিত সন্তান, বিশেষত কন্যাসন্তান হলে, তাকে তখনই শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হয়—তারপর কবর দেওয়া হয়। টোডাদের যমজ সন্তান হলে ওরা একটাকে মেরে ফেলে—এমন কি দুটো যদি ছেলেও হয় তবুও এই ব্যবস্থাই ওরা করে। আর যমজ সন্তানের দুটোই যদি মেয়ে হয় তবে দুটোকেই ওরা হত্যা করে। সন্তান জন্মের পর এক মাস স্ত্রীলোককে অন্য কুঁড়েতে বাস করতে হয় ও কিছু কিছু নিষেধাচার পালন করতে হয়। তিন মাস পর্যন্ত সন্তানের মুখ ঢেকে রাখা হয়, পাছে নজর লাগে এই ভয়। তারপর নামকরণের পালা। নামকরণের সময় সন্তানের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়—নামকরণ করে পিসীমা, ওদের ভাষায় "মামি" (mumi)। নামকরণ পর্যন্ত সাধারণত সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করান হয়। এরপর থেকে গরম দুধে গলা ভাত মিশিয়ে খাওয়ান হয়। রোগ ও

নানা বিপদ এড়াবার জন্ম কোন পাখীর হাড় এবং পাথর সন্তানের কোমরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

টোডাদের বিয়ে হয় খুব অল্পবয়সে। ছেলেমেয়েদের বয়স যখন দুই কি তিন বছর তখনই ওদের বিয়ে হয়। বেশ পছন্দমত মেয়ে · .ব ছেলের বাবা মেয়ের বাবার সঙ্গে বিয়ের কথাব'র্তা বলে। বিয়ে হয় কনের বাড়ী। এই উপলক্ষে ছোট একটা উৎসবের আয়োজন করা হয়—উৎসবে মেয়ের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে একখণ্ড কটিবস্ত্র দেওয়া হয়। এরপর থেকে বছরে ২'বার করে বর কনেকে কটি বস্ত্র উপহার দেয়। কনের দশ বছর হলে অঙ্গরাখা উপহার হিসেবে পাঠান হয়। এই টুকরো কাপড়ের মূল্য হয়ত বেশী নয় কিন্তু বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে এর যথেষ্ট তাৎপর্য আছে।

(অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিয়ের পর বাপের বাড়ীতেই থাকে। তারপর বয়:সন্ধির সময় ভিন্ন গোত্রের কোন পুরুষকে দিয়ে তার কুমারীত্ব নাশ করা হয়। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে সে পায় কাপড় আর গয়না, তারপর যায় স্বামীর ঘর করতে। সেখানে ছোট্ট একটা আচার পালনের মাধ্যমে তার গোত্রান্তর হয়।)

বিবাহ সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়ম টোডারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করে। টোডারা কোন সময়ই অন্য কোমের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করে না। বিবাহ মূলত: মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনে বিয়ে হলেও খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইবোনের মধ্যে কখনই বিয়ে হয় না। তবে এসব বিধিনিষেধ কেবল বিয়ের ব্যাপারেই পালনীয়—বিবাহবহির্ভূত যৌন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ নিয়ম রক্ষিত হয় না। বিবাহ-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীত্বের কথা এবং একই স্ত্রীর ওপর নিজের নিজের ভাই ও গোত্র-ভাইয়ের অধিকারের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এ প্রসঙ্গে আরও স্মর্তব্য যে, ঐ স্ত্রীর স্বামীদের কোন ভাই যদি তার বিয়ের পরও জন্মায় তবুও বয়সকালে স্বাভাবিক ভাবেই সেই স্ত্রীর ওপর তারও অধিকার জন্মাবে। ভাইরা সকলে মিলে একত্রে নির্ঝঞ্ঝাটে বসবাস করে। যখন কোন একজন ভাই স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকে তখন তার উপস্থিতির নিদর্শন স্বরূপ সে ঘরের বাইরে একখণ্ড কাপড় ও একখানা ছড়ি রেখে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীর স্বামীরা পরস্পরের ভাই নয় এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। এমন অবস্থায় স্ত্রীলোকটিকে বিভিন্ন ভাইদের সঙ্গ দেবার জন্ম মাসান্তরে গ্রামান্তরে যেতে হয়। আবার প্রত্যেক ভাই যদি স্বতন্ত্র বিয়েও করে তবুও স্ত্রীরা সবাই ভাইদের যৌথ সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। ছেলেমেয়েরাও সবাই গোত্রোপদলের ছেলেমেয়ে বলে গণ্য হয়।

স্ত্রীর অলসতা ও নির্বুদ্ধিতার অজুহাতে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী নি:সন্তানা অথবা ব্যভিচারিণী এই যুক্তিতে কোন সময়ই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা চলে না। যাই হোক যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে দণ্ড স্বরূপ স্বামীকে একটা মোষ দিতে হয়, পরিবর্তে সেও স্বামীর কাছ থেকে ফেরত পায় একটা মোষ, যেটা সে বিয়ের সময় স্বামীকে দিয়েছিল শবানুষ্ঠানে উৎসর্গ করার জন্ম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, টোডারা মোষ সাধারণত: বলি দেয় না, তবে মৃত্যুর পর একটা আচার-অনুষ্ঠানে ওরা মোষ বলি দেয়। এই মোষ টোডা পুরুষ মেয়ের পক্ষ থেকে বিবাহে যৌতুক হিসেবে পেয়ে থাকে। টোডা সমাজে "বিপত্নীক" অথবা "বিধবা" থাকা ঘৃণার ব্যাপার। আর আমরা যে অর্থে "কুমারী" কথাটা ব্যবহার করি তা যে কোন টোডাকে যথেষ্ট হাসির খোরাক জোগাবে। যদি কোন টোডা স্ত্রীর সমস্ত স্বামীরই হয় তখন সে তার ছেলেপিলে নিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে যায়, তবে ইচ্ছে করলে আবার বিয়েও সে করতে পারে। এখন যে ব্যক্তি এই স্ত্রীলোককে বিয়ে করবে সে স্ত্রীর পূর্ববর্তী সন্তানদের মোষ উপহার দেবে। শিশুকালে কন্যা হত্যা করে বলে টোডা-সমাজে মেয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম; আর এর জন্যই হয়ত ওদের মধ্যে এক স্ত্রীর ভাগ্যে বহু স্বামী জোটে। তাই "স্ত্রী"লোকের মৃত্যু টোডাসমাজে অত্যন্ত মর্মান্তিক বেদনার ব্যাপার। একজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু মানে গোটা সমাজ থেকে একজন বিবাহযোগ্যা স্ত্রী কমে গেল এবং প্রায় একদল লোকের ওপর দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নেমে এল, তারা বিপত্নীক হ'ল। এজন্য ওরা অর্থের বিনিময়ে অপরের স্ত্রীকে ভোগ করবার নিয়মও চালু রেখেছে।

টোডাদের মধ্যে বিপরীত দলের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক না থাকলেও যৌনসম্পর্ক স্থাপনের কোন নিষেধ নেই। অনেক সময় "টেইবলি" পুরুষ ও "টারথর" স্ত্রীলোক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কেই শান্তিতে বসবাস করে। কেবলমাত্র পুরুষটি সন্তানের "আইনত পিতা" হবার অধিকার পায় না, সন্তান জন্মালে স্ত্রীলোকটির দলের কোন'লোক আচার পালনের মাধ্যমে "আইনত পিতা" হয়ে থাকে। অপর দলের পুরুষ স্ত্রীলোকটি প্রেমিক বলে গণ্য হয় এবং তাই অধিকার স্ত্রীলোকটির ওপর তার স্বামীদের চেয়ে

কিছুমাত্র কম নয়। স্ত্রীলোকটির সন্তানের ব্যাপারে তথাকথিত স্বামীদের অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না তার। কেবল মাঝে মাঝে সে সেই স্বামীদের মূল্যবান জিনিস উপহার দিয়ে তাদের তুষ্ট রাখে।

বিবাহ এবং আত্মীয় সম্পর্কের যে আলোচনা করেছি তা থেকে বেশ সহজেই বোঝা যাচ্ছে, যে টোডা-সমাজে নারীর যৌন স্বাধীনতা অত্যন্ত ব্যাপক—সে প্রাক্ বা উত্তরবিবাহ, যে কোন কালেই হোক। সমাজ-অনুমোদিত একাধিক স্বামীভ্রাতা, গোত্রভ্রাতা ও প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ছাড়াও টোডা মেয়েরা পবিত্র মোষশালার মালিকদের সঙ্গে যৌনাচারে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ ছাড়া আরও নানা ব্যাপারে টোডা মেয়েদের যে সব যৌনসম্পর্কিত স্বেচ্ছাচারের অধিকার আছে তাতে তাদের সমাজের পক্ষ থেকে কোন সময়ই নিন্দাভাজন হতে হয় না। এমনকি, বিয়েতে যে সমগোত্রীয় নিষেধাচার মানা হয়, যৌনাচারের ক্ষেত্রে তাও আমল দেওয়া হয় না। বাছবিচারহীন যৌনাচারের অত্যাসক্তি লক্ষ্য করেই হয়ত টোডা-সমাজবিদ্যাবিদ রিভার সাহেব বলেছেন: The Todas may almost be said to live in a condition of prrmisenity. ব্যভিচার বলে কোন শব্দ ও তার অর্থ টোডারা জানে না, বরং স্ত্রীকে ঢেকে রাখা, অন্যে যারা ভোগ না করতে দেওয়াটাই ওদের কাছে লজ্জা ও নিন্দার ব্যাপার। অন্যত্র রিভার সাহেব এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন: Instead of adultery being regarded as immoral, immorality attaches to the man who grudges his wife to another.

আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যে দেশে যে প্রথা!

যৌনব্যাপারে স্ত্রীলোকের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা টোডা-সমাজে প্রায় হলেও একথা মনে রাখতে হবে যে সমাজে ব্যাপকভাবে স্ত্রীলোকের স্থান বেশ নীচের দিকে। কেবলমাত্র দু'একটা উৎসব ছাড়া টোডা স্ত্রীলোক মোষ অথবা মোষশালার কোন কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। কোনরকম রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও যাদুবিদ্যা এবং আর পাঁচটা উৎসব আচারের ব্যাপারে মেয়েদের কোনরকম সাহায্য অথবা কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় না। মাঝে মাঝে মেয়েরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাদের স্বতন্ত্রভাবে অন্য কুঁড়েতে বাস করে এবং প্রায়মৃতের মত ঘৃণ্য ও নোংরা অবস্থায় পড়ে থাকে। কয়েকটা উৎসব অনুষ্ঠানের সময় ত মেয়েদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়—এবং যে পথে পবিত্র মোষ ইত্যাদি চলাফেরা করে সে পথে তারা চলাফেরাও করতে পারে না। তবে মেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কখনই ক্ষুণ্ণ করা হয় না। অর্থনৈতিক ব্যাপারে মেয়েদের বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেই। পরিবার জীবনে মেয়েদের অধিকার কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। জল আনা, কাপড় কাচা, কাপড়ের ওপর সুতোর কাজ করা, শস্য ভাঙানো, ঘর ধোয়া, গোবর দিয়ে ঘর নিকানো, কিছু কিছু আসবাবপত্র পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজে মেয়েদের পূর্ণ অধিকার। হয়তো মেয়েদের সংখ্যান্যূনতার সঙ্গে তাল রেখে মেয়েদের ওপর কাজের চাপটাও কম দেওয়া হয়েছে।

শবানুষ্ঠান সম্পর্কিত আচারেও টোডাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়, ওরা দু'বার মৃতের সৎকার করে। কোন পুরুষের মৃত্যু হলে প্রথম আচারটি পালিত হয় একটা মোষ পালনের খাটালের কাছে অথবা নির্দিষ্ট একটা কুঁড়েতে। স্ত্রীলোকের সৎকার উপলক্ষেও ঐ জাতীয় স্বতন্ত্র একটা কুঁড়ে তৈরী হয় এবং শবানুষ্ঠানের পর সেটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। একটা কাঠের খাটিয়াতে মৃতদেহ সেখানে নিয়ে আসা হয়। এখানে নানারকম ছোটখাট আচার পালন করে মোষ বলি দেওয়া হয়—মৃতের মরজগতে শান্তির জন্য এই ব্যবস্থা।

বলির মোষ সংগৃহীত হয় একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে। মৃতের বিপরীত পক্ষের দলের একদল যুবক মোষটাকে প্রচণ্ডভাবে তাড়া করে নিয়ে যায়, তারপর তার শিং ধরে তাকে টেনে আনে বধ্যভূমির দিকে। বন্দী পশুকে ভালকরে মাখন মাখিয়ে তার গলায় বেঁধে দেওয়া হয় একটা পবিত্র ঘণ্টা। এ সময় সবাই কান্নাকাটি করে মৃতের জন্য—অবশ্য শোকের কিছুটা মোষের জন্যও বটে, এরপর হয় শবদাহ। দাহের পর মৃতের কয়েকগাছি চুল ও করোটির এক অংশ ছাইয়ের ভেতর থেকে বার করে আনা হয়, এবং রেখে দেওয়া হয় দ্বিতীয় অনুষ্ঠান পর্যন্ত। যারা এ সময় উপস্থিত থাকে তাদের অশৌচ হয়। আত্মীয়দের মধ্যে কি বিধবা, কি বিপত্নীক, সবাই চুল কেটে ফেলে, পালন করে কয়েকটি নিষেধাচার খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে প্রথম অনুষ্ঠানের অনেকগুলি আচারই পুনর্পালিত হয়। তবে এই অনুষ্ঠানে আরও বেশী সংখ্যক মোষ বলি দেওয়া হয় এবং কয়েকটা নতুন আচারও পালন করা হয়। পাথর দিয়ে একটা স্থান ঘিরে তার মধ্যে মৃতের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বাসনকোশন ইত্যাদিতে মাখন মাখান হয়।

তারপর সেইসব জিনিষপত্র পুঁতে ফেলে তারওপর ছাইচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। সেই বৃত্তাকার স্থানকে একজন লোক তিনবার প্রদক্ষিণ করে, ঘণ্টা বাজায়। সকলে সেই ছাইচাপা স্থান ও তারওপর পোঁতা পাথরের ফলককে প্রণাম করে। তারপর নিষিদ্ধতার কাল শেষ হয়, শেষ হয় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আচার পালনের কাল। প্রত্যেকে মাথা থেকে একগাছি চুল ছিঁড়ে শোক প্রকাশের স্বীকৃতি জানায়—পরের অমাবস্যায় কয়েকটি আচার পালনের মাধ্যমে ওরা শুচিতা ফিরে পায়।

ভূতপ্রেত সম্পর্কে টোডাদের বিশেষ কোন কৌতূহল নেই—তবে ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বক্তার ওপর ওদের বিশ্বাস আছে। ওদের জীবনে যখন দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নেমে আসে অর্থাৎ অসুস্থতা ও মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, কোন কারণে খাটাল অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়, মোষ দুধহীনা হয়ে পড়ে, তখন ওরা ওই গণক তথা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এ সবের কারণ জানবার জন্য। এইসব ওস্তাদরা নানারকম যাদুবিদ্যা ও ভেল্কিবাজীর সাহায্যে অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করে থাকে। সাহায্যপ্রার্থীর জন্য কিছু করবার সময় ওরা মন্ত্রজাতীয় কিছু উচ্চারণ করে যা টোডা জনসাধারণের কাছেও দুর্বোধ্য। ওদের বিশ্বাস এই দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা তারা ভগবানকে জাগাতে সক্ষম এবং দুঃখবেদনা তথা সর্বনাশের কারণ বার করতে সক্ষম।

টোডা-সমাজে সব পরিবারের সব মানুষের এই ক্ষমতা থাকে না। এ কাজ কেবলমাত্র বিশেষ ব্যক্তি তথা বিশেষ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাদুবিদ্যাবিদ, গণক ইত্যাদির কাজ পাপাচারের কারণ অনুসন্ধান করা—এই সব পাপই দুর্ভাগ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ। সাধারণতঃ খাটাল থেকে দুধ চুরি করলে, দিবামৈথুনের পর খাটালে ঢুকলে, কোন পরিত্যক্ত কুঁড়ে অথবা শবানুষ্ঠান থেকে ফিরে সরাসরি খাটালে ঢুকলে পাপ হয়। তবে এসব করে ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি না হলে ওরা বিশেষ মাথা ঘামায়না, কিন্তু তার বিপরীত ব্যাপার ঘটলে তাকে গণকের কাছে যেতে হয় পাপ-খালনের জন্য। এ বাবদ তাকে দেবতার উদ্দেশে একটা মোষ বা একখানা কাপড় উৎসর্গ করতে হয়। অবশ্য এসব দেবতার নামে নিজেদেরই অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটতে সহায়তা করে—এক দলের জিনিস উৎসর্গ হবার পর অপর দলের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অনেক সময় দেবতাকে উৎসর্গ করবার মোষ দেবতার নামে নিজের কাছেই রেখে দিতে পারে—এতে করে নিজের প্রয়োজন ও আচারতন্ত্র দুটোই রক্ষা করা যায়।

টোডা-সমাজে উৎসব অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কয়েকটা পবিত্র দিন পালিত হয়। এই দিনগুলোতে কয়েকটা নিষেধাচার (Taboo) পালন করা হয়। এইদিন কোন স্ত্রীলোক কোন গ্রাম ত্যাগ করতে পারে না, অথবা কোন গ্রামে প্রবেশ করতেও পারেনা। জিনিষপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা অথবা কেনাকাটা করা কিছুই চলেনা। পবিত্র খাটালের পুরোহিতরাই এই সময় আচার অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করে থাকে। এইভাবে প্রায় বছরের সারা সময় ধরেই নামকরণ উৎসবাচার, শবানুষ্ঠান, গর্ভসংস্কার ইত্যাদি নানা উপলক্ষে নানা আচার-পালনের মাধ্যমে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে টোডাপল্লী।

সংক্ষেপে এই হ'ল টোডাসংস্কৃতি তথা জীবনায়নের মনোরম ইতিহাস। ভারতের অসংখ্য আদিবাসীর মধ্যে টোডারা একটি বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। তাদের বাসভূমির সংযত সৌন্দর্য আর তাদের জীবনবৃত্তের স্বভাব বৈশিষ্ট্যই তাদের সবার মাঝে একক করে তুলেছে,—যদিও সব আদিবাসীদের স্বভাবের মধ্যেই কিছুটা এককত্বের ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। তথাকথিত সভ্যতার স্রোতে না গিয়েও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্নিগ্ধ শিল্পগুণ টোডারা সহজেই আয়ত্ত করতে পেরেছে—উৎপন্নের তথা আয়ের এক বৃহদাংশ শক্তিদম্ভে তথা যুদ্ধকর্মে না ব্যয় করে সাজিয়ে তোলে ওরা মোষশালা, লতাপাতা-ছাওয়া কুঁড়ে আর নারী-শিশুর দেহমন।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-পরিচিতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বরদীপ্তি বিশ্বের সুধীমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া একদিকে যেমন অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় দিক-দিগন্তকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল তেমনি অপরদিকে তাহা তাঁহার পারিবারিক জ্যোতিষ্কগুলিকেও আলোক বিতরণ করিয়া অধিকতর ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার অনন্যসাধারণ অনুপ্রেরণার প্রসাদলাভ করিয়া সৌরমণ্ডলের যে সব লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর-পরিবারের যে সব বয়ঃকনিষ্ঠগণ কৈশোরে উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উদীয়মান রবীন্দ্রপ্রতিভার দীপ্ত আকর্ষণে অনিবার্য্যভাবে ধরা পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব সৃজনী শক্তি ও রস-পিপাসা অনুযায়ী সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ এই সকল জ্যোতিষ্কের অন্যতম এবং স্বীয় কীর্ত্তিতে দেদীপ্যমান। অন্যান্য লেখক-লেখিকাগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঋতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, হেমলতা দেবী, ইন্দিরা দেবী, প্রজ্ঞা দেবী ইত্যাদির নাম স্মরণীয়। ১২৯২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে তৎকালীন প্রচলিত সাহিত্যপাঠে হাতেখড়ি দিয়া সাহিত্য-রচনায় উৎসাহিত করা। ঐ প্রচেষ্টার মূলে রবীন্দ্রনাথের যে সক্রিয় সমর্থন ছিল তাহা আশা করি কাহারও অবিদিত নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র পরোক্ষে থাকিয়া বালক-বালিকাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করেন নাই, তিনি নিজে ঐ পত্রিকায় একাধিক রচনা প্রদান করিয়া উহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐ সাহচর্য্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সুধীন্দ্রনাথ মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সেই 'বালক' পত্রিকায় 'স্বাধীনতা' নামে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা প্রকাশিত করেন। মাত্র এক বৎসর চলার পর ১২৯৩ সালে 'বালক' 'ভারতী' পত্রিকার সহিত যুক্ত হইয়া 'ভারতী ও বালক' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৩০১ সাল পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়। এই 'বালক' পত্রিকার তরুণ লেখকগণের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টিতে পতিত হন, যাহার ফলে ১২৯৮ সালে ঠাকুর পরিবারের অপর পত্রিকা 'সাধনা' প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, সুধীন্দ্রনাথের উপরই ঐ পত্রিকার সম্পাদনা ভার অর্পণ করা হইয়াছে। যদিচ এ কথা সত্য যে, 'সাধনা'র চারি বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে প্রথম তিন বৎসর সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে অবস্থান করিলেও আসলে রবীন্দ্রনাথই উহার নিয়মিত প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করেন, তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, সুধীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকতা ও কর্ম্মনৈপুণ্য ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অসমান্য স্রষ্টা পুরুষ তাঁহার উপর পত্রিকা পরিচালনার গুরুভার অর্পণ করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। বলা বাহুল্য 'সাধনা' সম্পাদকরূপে সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব যে কোনও প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদকের সহিত তুলনীয়। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, তাঁহার তিন বৎসর কার্য্যকালে তিনি নিজের রচনা সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে পরিবেশন করিয়াছেন। একটি ছোট গল্প, একটি কবিতা এবং কয়েকটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা ব্যতীত 'সাধনায়' সুধীন্দ্রনাথের আর কোনও রচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ এই তিন বৎসরে প্রতি সংখ্যায় ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সাময়িকী সকল বিভাগে একাধিক রচনার দ্বারা পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার সৃজনী-পর্ব্বের একটি মূল্যবান অধ্যায় এই সাধনাকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর যাঁহাদের দানে এই পত্রিকা পুষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যে

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ বর্ষে 'সাধনা'র সম্পাদনাভার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিলে পর সুধীন্দ্রনাথ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—'ভারতী', 'সাহিত্য' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ঐ রচনাগুলির অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়।

অতঃপর আমরা সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় মনোনিবেশ করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যের ফলে সুধীন্দ্রনাথ গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই পারদর্শিতা লাভ করেন; যদিও পদ্য অপেক্ষা গদ্য রচনায় তাঁহার অধিকতর সাফল্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা অর্থাৎ তাঁহার গল্প এবং প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সামগ্রী। ঐগুলিতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া এক নবতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। 'বালক' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে এবং রবীন্দ্র-অনুগামী তরুণ কবিগণের মধ্যে হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ এবং সুধীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই দুইটি করিয়া কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। হিতেন্দ্রনাথের 'শতদল' (১২৯৩) ও 'ত্রিশূল' (১৮১০ শকাব্দ), সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'বৈতানিক' (১৩ ৯) ও 'দোলা' (১৩০৩) এবং বলেন্দ্রনাথের 'মাধবিকা' (১৩০৩) ও 'শ্রাবণী' (১৩০৪) তে স্ব স্ব কবিকণ্ঠের পরিচয় রহিয়াছে। সুধীন্দ্রনাথের 'বৈতানিক' বত্রিশটি কবিতার সংগ্রহ। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার সাক্ষাৎ অনুসরণ লক্ষিত হয়। এমনকি কতকগুলি কবিতার নামকরণেও রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার নামের শরণ লওয়া হইয়াছে। তথাপি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা এমন একটি আন্তরিকতার নিবিড় অনুভূতি লাভ করি যাহা রসিক-চিত্তকে অভিষিক্ত না করিয়া পারে না। তাঁহার 'বৈতানিক' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে কবি-হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভক্তিরসের বিনম্র প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি যেন আপনাকে বিধাতার এবং বিশ্বেশ্বরের বেদীমূলে ভক্তের ন্যায় নিবেদন করিয়াই জীবনের স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতে চান। তাঁহার প্রাণে অন্য কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা নাই। তিনি শুধু এই প্রার্থনা জানান:

> "হৃদয় মন্দিরে দেব, আমি তব দাসী,
> ভক্ত সেবিকা তোমার—নহিগো প্রত্যাশী।" (দাসী)

কবি স্থির বুঝিয়াছেন যে মানুষ বিশ্ববিধাতার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। বিধাতাই এই সৃষ্টির মূলাধার এবং একমাত্র নিয়ামক। যন্ত্রীর ন্যায় তিনি যখন যে সুরের আলাপ করেন মানুষের জীবনযন্ত্রে তখন সেই সুরের অনুরণন জাগে। এই পৃথিবীর যত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-বৈফল্য সবকিছুই বিধাতার উপর প্রত্যর্পণ করিয়া অথবা তাঁহারই নিগূঢ় বিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়া কবি-হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করেন এবং এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হন:

> "এই সুখ, এই দুঃখ, আমার জীবনে
> এই রাগিণী বিচিত্র, বাসনা বেদনা,
> এই ভাষাহীন চির অশেষ প্রার্থনা,—
> যখন যেমন সুরে বেজেছে যে তার
> সে সুর তোমারি প্রভু, তোমারি ঝঙ্কার!" (যন্ত্রী)

কবি শেলীর সেই অমর উক্তি—'Make me thy lyre, even as the strings are thine' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'আমারে কর তোমার বীণা' একই হৃদয়ানুভূতির সাক্ষাৎ প্রদান করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ আরও অনবদ্যভাবে বলিয়াছেন:

> আমায় নিয়ে খেলেছ এই মেলা,
> আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
> মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে
> তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুধীন্দ্রনাথও একটি কবিতায় তাঁহার অন্তরের মানসী প্রতিমাকে ভাবের রেখায় এবং ভাষার বর্ণ-বৈচিত্র্যে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার মানসীর উদ্দেশে বলিয়াছেন: 'হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?' অথবা আরও রসোত্তীর্ণ কাব্য-পঙ্‌ক্তিতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন:

"ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর ধর্মের গেহিনী
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী"

সুধীন্দ্রনাথের 'মানসী' সেইরূপ সার্থকতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার কাব্যে একটি সুগভীর লিরিক সুর এবং কবিচিত্তের আত্মনিষ্ঠ রসমাধুরী প্রতিবিম্বিত বাক্যঝঙ্কারে এবং সুললিত ছন্দের ব্যঞ্জনায় মূর্ত হইয়াছে :

"সে যে তারকার বিন্দু আকাশের গায়,
সে যে সীমাহীন সিন্ধু—নাহি ধরা যায়,
সে যে দূরে কাছে আছে সারা বিশ্বময়,—
সে যে আপনার মনে আপনি উদয়।
সে যে বচন অতীত, চির মনোনীত,
সে যে আপনার জন, তবু জানিনি ত।" (মানসী)

'বৈতানিক' কাব্যে কতকগুলি গীতি-কবিতাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐগুলি সুর সংযোজিত হইলে সার্থক সঙ্গীতের রসাস্বাদন করা যায়। ঐগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি কবিতা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। যেমন কবি ভুবনেশ্বর তীর্থদর্শনে গিয়া তথাকার ঐতিহাসিক দেবমন্দিরের কারুশিল্পে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন :

"একি এ দেউল,—না, এ পাষাণের ফুল—
পার্ব্বতীর তনুঘেরা লাবণ্য দুকূল!
ত্রিভুবনেশ্বর রাজে অন্তরের মাঝে!"(ভুবনেশ্বর)

বাংলা দেশের দুইজন মনীষীর চরিত্র তাঁহাকে কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাও দুইটি কবিতায় অপূর্ব্বভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কান্তকবি রজনীকান্তের অমরস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে সকল বাঙালীরই হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁহারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলিতে পারি :

"হে ব্রাহ্মণ বুধ,
লক্ষ অক্ষৌহিণী যেথা নিষ্ফল আয়ুধ,
অকর্ম্মণ্য রাজন্যক,—তুমি সেথা একা
বিজয় করেছ বিশ্বমানবের মন!
কোবিদের শাস্ত্র আর শূরশস্ত্রচয়
করুণার মূর্ত্তিপানে মুগ্ধ চেয়ে রয়।" (বিদ্যাসাগর)

কান্তকবি রজনীকান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার সহিত আমরাও স্মরণ করি : "অন্তপার---হের তবু রজে চারিধার
রজোহীন রজনীর জ্যোৎস্না পারাবার
সঙ্গীত থামিয়া যায়--রহে তার রেশ
জীবন আলোকময়—কোথা তার শেষ!"
(কবি রজনীকান্ত)

'বৈতানিক' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারীকে তিনি তাহার বহু বিচিত্র মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন। সংসারে লক্ষ্মী স্বরূপিণী গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :

"বন্দী কভু নহ তুমি বন্দনীয়া নারি!
প্রেমের এ দ্বারকায় নাহি কোন দ্বারি,
তবু আছ চিরস্থির, ধীর অচঞ্চলা,
বক্ষে ভরি স্নেহ ভক্ষ্য সুধার পয়োধি।"
(গৃহলক্ষ্মী)

'ভারতমহিলা', 'তুমি', 'প্রেমের আহ্বান', এবং 'ফুল ও মধুপ' কবিতাতে প্রেমের একটি তন্ময় রূপ এবং নিবিড় আত্মগত রসের আবেষ্টনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

সুধীন্দ্রনাথের 'দোলা' কাব্যগ্রন্থ ঊনত্রিশটি কবিতার সমষ্টি। ইহার মধ্যে অনেকগুলি 'বৈতানিকে'ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। 'দোলা'র কবিতাগুলিতে কবির প্রেমিক চিত্তের নানা ভাবের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। কবি যেন তাঁহার মানসীপ্রিয়ার সহিত নিরন্তর বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করিতেছেন। প্রকৃতির অন্তঃপুরে বসন্তের মিলন বাঁশী বাজিয়া উঠিলে কবিও উতলা হইয়া পড়েন এবং স্বগত ভাবে বলিতে থাকেন : "আবার বসন্ত ফিরে বিশ্বের শিয়রে!
আজি এস তুমি এস হৃদয়-বন্দরে
তীর বেগে ফিরে এস তরীর মতন!
নিয়ে যাও তোমাহারা আমার জীবন!"
(বসন্তে)

কবি যেন প্রবাসে বিরহী যক্ষের ন্যায় নির্ব্বাসিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন এবং প্রিয়ার সহিত মিলনের আশা ত্যাগ করিয়া আকুল হৃদয়ে তাহাকে ধ্যান করিতে থাকেন, তাহার "সেই মুখ, সেই হাসি, সেই এলোচুল" তাঁহার স্মৃতির পর্দায় প্রতিফলিত হয়। 'দোলা' কাব্যের 'নিমন্ত্রণ রক্ষা' কবিতাটি এক হিসাবে

উল্লেখযোগ্য। শাসকস্থানীয় বিদেশীয়গণের নিমন্ত্রণ সভায় পরাধীন বাঙালীকে এক সময় কিরূপ অনাদর মাথা পাতিয়া লইতে হইত এই কবিতাতে তাহা অতিশয় অথচ তীব্র শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে ব্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটির ছন্দের মধ্যেও ভাবটি সার্থকভাবে গ্রথিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

"বিবাহরাতি জ্বলিছে বাতি
শত শত শত !
উঠান মাঝে, টেবিলে সাজে
ব্র্যাণ্ডি সোডা কত !
তাহে গোরার নাহি বিচার
ঢালে আর খায়।
করিয়া শ্রাদ্ধ, গড়ের বাদ্য,
বিষম বাজায়।

* * *

উপরে হল, মেমের দল
করিয়াছে পূর্ণ !
তাহে বাঙালী যেন কাঙালী
সমাদর শূন্য !" (নিমন্ত্রণ রক্ষা)

কিন্তু 'দোল' কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতা 'অদৃষ্ট দেবী'। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাহার 'অন্তর্যামী' নামক কবিতায় বহির্জগতের বিচিত্ররূপিনী এবং অন্তর্জগতের একাকিনীকে কল্পনা করিয়াছেন, যিনি কবির জীবনকে পূর্ণতার মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন, কবি সুধীন্দ্রনাথও তাঁহার জীবনের কর্ণধারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া এই শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন :

"চিরতরঙ্গিত এই জীবন সাগরে
এতদূর আনিয়াছ তুমি হাত ধ'রে
যাহা ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে'
এবে তোমা কাছে যাচি—জানত সুন্দরি
অন্তরের মাঝে মোর দিবসশর্ব্বরী
কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পূর্ণ করি
জীবনের সুধাপাত্রখানি দাও ভরি',—
তারপরে রথচক্রতলে বাঁধি মোরে
যেথা খুসি নিয়ে যেয়ো জন্ম জন্ম ধরে'।"
(অদৃষ্ট দেবী)

সুধীন্দ্রনাথের কবিকর্ম সম্বন্ধে আলোচনার পর এইবার আমরা তাঁহার গদ্য রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুধীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ এবং ছোট গল্প দুই বিভাগেই আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। অতঃপর এই বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে সাধারণভাবে তাঁহার গদ্য রচনার সহিত কিছু পরিচয় করা প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাধর ব্যক্তিপুরুষদের বাদ দিলে গদ্য সাহিত্যের আসরে যাঁহাদিগকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত দেখা যায় তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ, রাজনারায়ণ, কালীপ্রসন্ন ও ভূদেবের পর বঙ্কিমযুগের অক্ষয় সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং পরবর্ত্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়গণের নাম অগ্রগণ্য। গদ্যলেখকরূপে সুধীন্দ্রনাথ এই সকল পূর্ব্বাচার্য্যেরই ধারার উত্তর-সাধক। বস্তুতঃ সুধীন্দ্রনাথ যে সময় গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন সেই সময় তাঁহাকে যে কিরূপ কঠোর সাধনা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখকদের সহিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইয়াছিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি মাসিক পত্রিকায় যে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'প্রসঙ্গ' নামে একটিমাত্র সংগ্রহে চতুর্দ্দশটি প্রবন্ধ আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার রচনা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠকের রসপিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

'প্রসঙ্গ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি যেমন চিন্তাপূর্ণ তেমনি বিষয়ের গুরুত্বে আকর্ষণীয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্ম এবং সমাজই অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকে। তাহার আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, সভ্যতাসংস্কৃতি, বচন-আচরণ সব কিছুই ঐ ধর্ম্মমত এবং সামাজিক অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবাসীমাত্রেই এমন সংস্কারানুগামী যে সামাজিক অনুশাসন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ-নিরপেক্ষ জীবনযাপন করা তাহার সাধ্যাতীত। ফলে তাহার মনন এবং কল্পনা, ধ্যান এবং ধারণা যুগে যুগে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া জীবনের ঘাটে ঘাটে নূতন পাড়ি দিয়াছে এবং সমাজকে নানা উত্থান-পতনের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

বলিয়াছেন: "আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্ব্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্ত্তী নহে।...ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম সাধনার জন্য।" সুধীন্দ্রনাথও তাঁহার ধর্ম নামক প্রবন্ধে এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন: "ইংরাজী রিলিজন শব্দ আমাদের ধর্ম শব্দের ভাববাচক প্রতিশব্দ নহে। ধর্ম শব্দ আমাদের শাস্ত্রে বহুব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। যাহা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধৃত, বা যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই ধর্ম...বিচার ও তর্ক দ্বারা ধর্মের যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় সহজ জ্ঞানেও তাহাই হয়। যাহা শুভ, যাহা শ্রেয়স্কর, যাহা মঙ্গলময় তাহাই ধর্ম - ধর্ম মঙ্গলের নামান্তর মাত্র। ধর্ম এক বই দুই নহে, ধর্ম তোমার নিকট একরূপ, অন্যের নিকট বিভিন্ন রূপ হইতে পারে না।"

পক্ষান্তরে ধর্মের নামে কপট আচরণ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মধ্যে এমন প্রবলভাবে বর্ত্তমান যাহা সুধীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়াছে। 'ধর্মে বণিকবৃত্তি' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া আদর্শভ্রষ্ট ধর্মবণিকদের মুখোস উন্মোচিত করিয়া বলিয়াছেন: "ধর্ম এক্ষনে রঙ্গমঞ্চে, ধর্ম এক্ষনে সভামণ্ডপে, ধর্ম এক্ষণে পন্য বীথিকায়—ধর্ম মুখে, অশনে বসনে, ভূষণে,— ধর্ম নাই কেবল ধর্মের স্বস্থানে, জীবনে প্রাণের অভ্যন্তরে।" নিষ্ঠাহীন পুরোহিত ও অর্থলোলুপ পাণ্ডাপ্রপীড়িত তীর্থস্থানে ধর্মের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া ভগবদ্দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "যে দর্শনকে আমাদের শাস্ত্র দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, যে দর্শনের পূর্ব্বে কত সংযম, কত সাধনা, কত চিত্তশুদ্ধি, কত ধ্যান-ধারণার আবশ্যক করে—সেই দর্শন এক্ষনে মন্দিরাভ্যন্তরে দেববিগ্রহের প্রতি নিমেষ কটাক্ষপাতে কেবল নিয়মরক্ষা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।" এবং অবশেষে এই মন্তব্য করিয়াছেন: "দেহ এবং আত্মা লইয়াই মানব-জীবন। অন্ন যেমন দেহের পরিপোষক, ধর্ম সেইরূপ আত্মার পরিপোষক। ধর্ম আত্মার ভোগ সাধন করিয়া মানব-জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলে। ধর্মের পথ সাধনার পথ—নিষ্ঠাই এই পথের সম্বল।"

আমাদের দেশের ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং এই বিশ্বচরাচর ও জীবলোক সেই আনন্দ হইতেই উদ্ভূত, জীবিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। কারণ আনন্দের স্বভাব ও ক্রিয়া স্বতঃই বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে আপনাকে মুক্তি দেওয়া। তাই তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি।" এই আনন্দ আবার আত্মহারা প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি। এই আনন্দানুভূতি ও প্রেমের অভিন্নত্বাদ কিরূপ তাহা বুঝাইতে সুধীন্দ্রনাথ 'আনন্দ' নামে একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন: "আনন্দ পাইব বলিয়া প্রেম নহে, প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফলই আনন্দ। সকল আনন্দ অপেক্ষা পর-মাত্মার সহিত সংযোগজনিত আনন্দকে আমাদের শাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ, তৃপ্তিহেতু। রসোবৈসঃ। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। সংসারে প্রিয়তমকে লাভ করিয়া মানবের যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, ভগবানে সেই আনন্দের পূর্ণত্ব, পরিসমাপ্তি।" সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প-কলায় এই অনাবিল আনন্দরস পান করা যায় বলিয়াই পণ্ডিতগণ ইহাকে ব্রহ্মস্বাদসোদর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ধর্ম ব্যতীত সমাজও সুধীন্দ্রনাথের চিন্তার বিষয় ছিল। ফলে সমাজের নানা ব্যাধির প্রতি তিনি অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা' নামক প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যাক। এখানে লেখক একদল নিষ্ঠাহীন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর হস্তে সমাজের যে অধঃপতন দেখা দিয়া'ছিল তাহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন: "ব্রাহ্মধর্ম যোগের ধর্ম। ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগ সাধন করা।......কঠোর তপস্যা করিয়া রামমোহন রায় এই যে সভ্যতা, এই যে উন্নতি— ব্রাহ্ম ধর্ম, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি এই যে আজন্মসাধন ধন আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন, আমরা উত্তরাধিকারীরা কয়জন তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করি।" 'সমাজের ভিত্তি' নামক প্রবন্ধে তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকদের নিষ্ক্রিয়তা ও আন্তরিকতাহীন বাহ্যাড়ম্বর বর্ণিত হইয়াছে: "সত্যি সত্যি কাজ করিতে গেলে যে কঠোর সাধনা, যে কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যক, তদুপযোগী বল আমাদের নাই, অথচ ভান যথেষ্ট

আছে। মুখে এক, ব্যবহারে স্বতন্ত্র, বক্তৃতায় জলদের ঘটা ও বিদ্যুৎচ্ছটা—কার্য্যে শূন্য বর্ষণ—থিয়েটারের পরিবর্ত্তনের ন্যায় মিনিটে মিনিটে পট পরিবর্ত্তন ইহা ত আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপার।" সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে 'শিশুজীবন', 'বুনিয়াদি জমিদারদিগের অধঃপতন', 'ভক্ত ও তাহার নেশা' তাঁহার সংস্কারক মনের পরিচয় বহন করিতেছে। কিন্তু 'প্রসঙ্গ' গ্রন্থের যে দুইটি প্রবন্ধ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তাহা এ পর্য্যন্ত অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধ দুইটির নাম 'কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা' এবং 'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী'। প্রবন্ধ দুইটি প্রথমে সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সমালোচনামূলক পত্রিকা হিসাবে 'সাহিত্য' এর খ্যাতি সকলের নিকট সুবিদিত। বলাবাহুল্য এই দুইটি প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথের রসবিচার শক্তির যেরূপ স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল তাহা অনুসৃত হইলে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগ তাহার নিকট মূল্যবান সম্পদ লাভ করিতে পারিত।

আলোচ্য প্রবন্ধ দুইটি সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধের রীতি হইতে কিছু স্বতন্ত্র। ইহাতে তাঁহার ভাবের কিছু অতিরেক হইলেও লেখকের আন্তরিকতাগুণে সার্থকতায় পরিণত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি এবং মিরাণ্ডা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ না হইলেও অভূতপূর্ব্ব কৃতি। এই দুই চরিত্রচিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া সুধীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই: "প্রকৃতির স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্যতরঙ্গ; পাখীর গানে, তটিনীর কলতানে, মেঘের গাম্ভীর্য্যে, দিবালোকের সৌন্দর্য্যে তাহা কিশোর হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। প্রকৃতির বিচিত্র ভাবময় মূর্ত্তি মনুষ্যের অন্তরেও প্রতিফলিত হয়। ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার অন্ধকারের সহিত হৃদয়েও অন্ধকার নামিয়া পড়ে, বসন্তের নবশ্যাম সৌন্দর্য্যে হৃদয় মাতিয়া উঠে - সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া মুক্তাকাশে বাহির হইতে চায়। প্রকৃতির বিস্তৃত তরঙ্গায়িত শ্যামলক্ষেত্রে হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা—সমাজ-নিগড়ে, কৃত্রিমতার পাষাণস্তূপে হৃদয়ের মলিনতা ও সঙ্কীর্ণতা; হৃদয় সেখানে বাঁচিতে পারে না। এই রহস্যময়ী চিরপরিবর্ত্তনশীলা অনন্ত শোভাময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে দুইটি শিশু-হৃদয় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা। কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডার হৃদয় বিমলস্নিগ্ধ কোমলভাবে পরিপূর্ণ, দেহ কমনীয় মাধুর্য্যে পরিপুষ্ট। গৃহহারা সংসার-সুখে বঞ্চিত হইয়া ফেনোচ্ছ্বসিত বারিধি-কূলে উভয়ের গৃহপ্রতিষ্ঠা। যাহাদের নগ্ন, আলুলায়িত উচ্ছৃঙ্খল বনবালার সৌন্দর্য্য ভাল লাগে তাহাদের জন্য কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডার সৃষ্টি।" চরিত্র দুইটির সাদৃশ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া অতঃপর সুধীন্দ্রনাথ উহাদের বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন: "মিরাণ্ডায় আমরা বনবাসীনীর উপর প্রেমের সরল প্রভাব দেখিতে পাই, কপালকুণ্ডলায় আমরা বনবাসিনী-হৃদয়ে প্রেমের ব্যর্থতা দেখিতে পাই।" চরিত্র হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ কপালকুণ্ডলাকে মিরাণ্ডা অপেক্ষা আদর্শ ও স্ফুটতর বলিয়া মনে করিয়াছেন।

'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটি মানসকন্যা। ইহাদের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া 'বিষবৃক্ষ' নামক কাহিনী রচিত। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'বিষবৃক্ষ' একটি অবিস্মরণীয় অবদান। সেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে চারটি যেমন বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজির ন্যায় বিরাজিত, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস রচনায় স্পেন অথবা ফরাসী দেশীয় উপন্যাস রচনার পদ্ধতিকে গ্রহণ না করিয়া ইংরাজী উপন্যাসের প্রকরণকে অনুসরণ করিয়াছেন। সুধীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' নামক প্রবন্ধে দুই জাতীয় উপন্যাসের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। স্পেন এবং ফরাসী উপন্যাস ভাব-প্রধান এবং উহাদের বৈশিষ্ট্য: "ছায়াময়ী কল্পনার প্রাচুর্য্যে ও মোহনসৌন্দর্য্যে হৃদয়ের অর্দ্ধস্ফুট ভাবগুলিকে শিশির স্নাত করিয়া ফুটাইয়া তোলা, দক্ষিণের মেঘের মত হৃদয়ে গোধূলির ম্লানচ্ছায়ারঞ্জিত একটি অস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া দেওয়া ও ধীরে ধীরে তুলিকার মৃদুস্পর্শে ও সজোরে আঘাতে তাহাকে বিভাসিত করিয়া হৃদয়কে মাতাইয়া তোলা। নিকট হইতে কেবল বিক্ষিপ্ত বর্ণের সমাবেশ, দূর হইতে একটি সুন্দর ছবি।" কিন্তু ইংরাজী উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা জীবনরস-প্রধান। ইহার সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: প্রকৃত জীবনের রহস্যময় চির-পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাসমূহের সন্নিবেশ। মনুষ্যচরিত্রের ক্রম-বিকাশ, ক্রমপতন, অনুতাপের দাবানল, আশার ছলনী, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার, বাসনার অতৃপ্তি, সুখের বিদ্যুৎলহরী,

দুঃখের সুতীব্র যাতনা, প্রেমের লীলা, সমাজের আবর্ত্ত, হৃদয়ের আবর্ত্ত, জীবন সংগ্রাম—এক কথায় জীবনের পঞ্চাঙ্ক অভিনয় দেখানই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য।" বিষবৃক্ষ এই শেষোক্ত প্রকারের উপন্যাস হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে বাঙ্গালীভাবের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কুন্দ-নন্দিনী ও সূর্য্যমুখী দুইটি বিপরীতধর্ম্মী চরিত্র। ইহাদের বৈপরীত্য উপন্যাসের কাহিনীকে অধিকতর জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুধীন্দ্রনাথ তাঁহার আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছেন: "একদিকে লজ্জাশীলা ভীরু স্বভাবসম্পন্না, আত্মঘাতিনী সুন্দরী চপল বালিকা, অন্যদিকে সেবাপরায়ণা বুদ্ধিমতী, সংযতা, সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী। একদিকে সূর্য্যমুখীর প্রবল অবিরাম, অবিরল, অপ্রতিহত দাম্পত্য প্রেম; অন্যদিকে কুন্দর রূপজ মোহ হউক স্বাভাবিক পূর্ব্বরাগ। কুন্দনন্দিনী সরলতার মূর্ত্তিমতী ছবি; সূর্য্যমুখী কর্ত্তব্যতার পূর্ণাভাস। কুন্দ ঊষাময়ী, সূর্য্যমুখী সন্ধ্যা।" বিষবৃক্ষ উপান্যাসের প্রতিপাদ্য কি তাহা সুধীন্দ্রনাথের একটি স্বল্পোক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে: "বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে দুইটি সুন্দর চিত্র দেখাইয়াছেন। একটি পাপীর প্রায়শ্চিত্ত, অন্যটি পত্নীর আত্মবিসর্জন; তার মাঝ-খানে কুন্দমোহাবরণ। কুন্দ চটুল স্রোতস্বিনী, সূর্য্যমুখী গভীর সমুদ্র।"

এ পর্য্যন্ত আমরা সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্ম্মের দুইটি বিভাগের পরিচয় পাইলাম। আর একটি বিভাগের আলোচনা করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা হইবে। বিষয়টি সুধীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্য। এই বিভাগে তাঁহার দান অপর দুইটি বিভাগ অপেক্ষা অধিক। মায়ার বন্ধন (১৩১১) নামক বড় গল্পটি বাদ দিলেও তাঁহার ছোট গল্পের গ্রন্থসংখ্যা বলিতে চারটি দাঁড়ায়। ঐগুলির নাম—মঞ্জুষা (১৩১০), চিত্ররেখা (১৩১৭), করঙ্ক (১৩১৯) ও চিত্রালী (১৩২৬)। তাঁহার ত্রিশটি ছোট গল্প এই চারিটি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও 'মঞ্জুষা'র অনেকগুলি গল্প 'চিত্রালী' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে তথাপি উহাদের স্বকীয়তা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যাহত হয় নাই। ১২৯৮ সালের মাঘ সংখ্যার 'সাধনায়' প্রকাশিত 'সোরাব ও রোস্তম' নামক গল্পটি সুধীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প। অতঃপর 'ভারতী', 'সাহিত্য' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। ঐগুলির সম্পূর্ণ সংগ্রহ প্রকা[শ] করিতে পারিলে একই সঙ্গে পাঠক ও প্রকাশক লাভবা[ন] হইবেন।

সুধীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্পূর্ণরূপে আড়ম্বরবর্জ্জিত এব[ং] তাঁহার প্রত্যেকটি কাহিনী স্বাভাবিক পরিণতির অভিমুখী অর্থাৎ গল্পের সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত কোনরূপ কষ্ট-কল্পনা বা দ্রুত ছেদ পতন হয় নাই। লেখকের নিবিড় অনুভূতি অধিকাংশ কাহিনীগুলিকে যে করুণ রসে অভিষিক্ত করিয়াছে তাহা পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। উহাতে ঘটনার যেমন ঘনঘটা নাই তেমনি চরিত্র-চিত্রণে বা কাহিনীবস্তুর বিন্যাসে কোনরূপ কৃত্রিম প্রয়াস বা প্রচেষ্টা নাই। লেখক যেন অত্যন্ত সহজ সুরে গভীর কথা বলিয়াছেন। আমাদের অতি-পরিচি[ত] জীবনে—সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে—আদর্শ এবং নীতির যেসব বিরোধ বা বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে দুর্ব্বহ এবং দুঃসহ করিয়া তুলে অর্থাৎ হিংসাদ্বেষ, কামনাবাসনা, লোভমোহ ছলনাবঞ্চনা ইত্যাদি নর-নারীর জীবনে অবস্থার পাকচক্রে বা ঘটনার প্রতিকূলতায় কিরূপ উগ্র আকার ধারণ করে তাহারই উজ্জ্বলচিত্র আমরা ঐ গল্পগুলিতে প্রতিফলি[ত] দেখিতে পাই। পক্ষান্তরে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা প্রভৃতি মানুষের চিরাগত সুকোমল বৃত্তিগুলিকে আশ্রয় করিলে যে পরম শান্তি ও আনন্দলাভ করা যায় তাহাও ঐ গল্প হইতে রসিক ব্যক্তি উপলব্ধি করিবেন। বস্তুতঃ এই গল্পগুলিতে দেবাসুরের সংগ্রামে অসুরের পরাজয় ও বিনাশ যেমন নিশ্চিতরূপে দেখা দেয়, তেমনি আবার সংসারে প্রেমের দ্বন্দ্ব, নিয়তির অন্ধতা বা অদৃষ্টের পরিহাস—যা মহৎকে নিষ্ঠুর দৈবনিগ্রহে পতিত করে, অকপটের সম্মুখে আনে অন্তহীন বিশ্বাসঘাতকতা, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতার হাহাকার এবং দুরতিক্রম্য শক্তির ক্রীড়নকরূপে অতিশয় দুর্ব্বল মানুষের সহায়হীন বিষাদক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখচ্ছবি অনাবৃত করে তাহারও বাস্তব চিত্রটি আমাদের নয়নগোচর করিয়া দেয় তথাপি বিচক্ষণ পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে সুধীন্দ্রনাথের গল্পে নীতিনিষ্ঠা যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তেমনি সমস্ত দুঃখ দৈন্য বিফলতা ও গ্লানির অন্তরালে একটি আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা জীবনের মহত্বে

।কটি নির্ভরতার আশ্বাস এবং পরমেশ্বরের কল্যাণ ।ক্তিতে অটুট অবস্থা অবিকৃত ভাবে বিরাজ করিতেছে।

অতঃপর কয়েকটি গল্পের আলোচনায় আমাদের উপরোক্ত বিষয়টি দৃষ্টান্ত হিসাবে সমর্থন করার চেষ্টা করা াক। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'সোরাব ও রুস্তম' সুধীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প। এই গল্পটি ম্যাথ্যু আর্নল্ডের বিখ্যাত কবিতার কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন পারস্যের দুই বীর যোদ্ধার (যাঁহারা পিতাপুত্র ।ম্বন্ধে আবদ্ধ) অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কিন্তু এই প্রথম গল্প হইতেই সুধীন্দ্রনাথের শিল্প-শক্তির নিশ্চত পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের পটভূমিকায় বর্ণনা তাঁহার লেখনীতে কিরূপ চিত্তাকর্ষক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। কাহিনীর সূচনা এইরূপ "পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্তে সিস্তান নামে একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ। বহুদূরব্যাপী মরুভূমি এই প্রদেশের চারিপাশ দিয়া চলিয়াছে। দূরে স্থানে স্থানে শুষ্কভূমি ভেদ করিয়া দুই একটি ক্ষুদ্র নদী মন্দ স্রোতে বাহিয়া যাইতেছে। যে স্থান দিয়া নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ ভুমি যা একটু উর্ব্বরা—শস্যক্ষেত্রে শোভিত, নতুবা দিগন্তহারা বালুকার স্তর কেবল ধূ ধূ করিতেছে। গ্রীষ্মকালে এই প্রদেশে উত্তপ্ত বায়ু থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, যাহা সম্মুখে পায় তাহা উষ্ণ নিঃশ্বাসে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলে। মধ্যাহ্নে এ বায়ুর অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে না পারিয়া পশু-পক্ষীগণ বালুকার ভিতর মুখ গুঁজিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে, অনেক সময় তাহাদিগকে মৃত বলিয়া ভ্রম হয়। মধ্যে মধ্যে দগ্ধ ধরণীর স্ফোটকের ন্যায় দুই-একটি ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যায়। সেই পাহাড়ের উপর হরিণ-শিশুরা খেলা করিয়া বেড়ায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের বড় একটা দেখা যায় না। সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয় যে প্রকৃতি দেবী এ প্রদেশ দিয়া অতি লঘু পদে চলিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার শ্যামল চরণের চিহ্ন তেমন ফুটিতে পারে নাই। মধ্যাহ্নে গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, কোথাও সাড়াশব্দ শুনা যায় না। মনে হয় যেন কোন এক ভীমদর্শন নিষ্ঠুর দৈত্য সমস্ত প্রদেশটির বুক চাপিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতেছে।"

সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পে একটি করুণ সুর ধ্বনিত হইয়া পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করে। যে ভাবরস আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ, তাহাও তাঁহার লেখনীর যাদু-স্পর্শে অপূর্ব্ব অনুভূতি উদ্রিক্ত করে। তাঁহার 'খ্রীষ্টানের আত্মকথা' (সাহিত্য-১৩০৭) সনাতন হিন্দু আচার প্রথায় লালিত-পালিত স্বচ্ছল জীবনে হিন্দু স্বামীর খ্রীষ্টান পাদ্রীর সংস্পর্শে আসিয়া স্বধর্ম্মত্যাগ এবং স্ত্রীপুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একান্তে পরধর্ম্মসেবা এবং তাহার অনুশীলনের কাহিনী। সর্ব্বশেষে পুত্রের উপনয়ন দিনে স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া পুত্রের ঝুলিতে একটি বাইবেল গ্রন্থ ভিক্ষাপ্রদান গল্পের রসকে ঘনীভূত করিয়াছে এবং "দুইদিন পরে এস্তান-সোলে আসিয়া দেখি আমার প্রদত্ত বাইবেলখানি খাটিয়ার উপর পড়িয়া আছে। ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছে…" এই উক্তি গল্পের যে সমাপ্তিরেখা টানিয়া দিয়াছে তাহা যেমন স্বাভাবিক তেমনি শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'কাসিমের মুরগী' (ভারতী, ১৩১৮) গল্পে দ্বাদশ-বর্ষীয় মুসলমান বালকের পশুপক্ষীপ্রীতি অনবদ্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'তে যেমন রামের মৎস্যপ্রীতি অশচয্য অপূর্ব্বতায় চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি এই গল্পে মুসলমান বালক কাসিমের মুরগীপ্রীতি উৎপীড়ক খুল্লতাত কর্ত্তৃক তিনটি প্রিয় মুরগীকে নিধনচেষ্টা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মুরগীর হত্যাকাণ্ডে মূর্চ্ছিত কাসিমের তীব্র প্রতিবাদ এবং অবশেষে তৃতীয়টিকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত রাত তাহাকে বুকের কাছে রাখিয়া শুইয়া থাকা গল্পের যে আবহ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সত্যই হৃদয়স্পর্শী। 'পোড়ারমুখী' দরিদ্র পিতামাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান। ইতিপূর্ব্বে পাঁচটি কন্যার বিবাহে পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তাই স্নেহলতা মাতার নিকট পোড়ারমুখী নামে স্নেহ লাভ করিয়াছে। দারিদ্র্যের কঠোর অবস্থা হইতে পিতামাতাকে পরিত্রাণ করিবার উদ্দেশ্যে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা দেওয়ালীর রাত্রে জমিদার পুকুরে মা কালীর পদতলে কিরূপে আত্ম-বিসর্জ্জন দিল তাহাই এই গল্পে মর্ম্মন্তুদ ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 'রসভঙ্গ' গল্পে মনোরঞ্জন এবং প্রভার সুখময় দাম্পত্যজীবনে লক্ষীরূপিণী মৃণালিনীর আবির্ভাব, তাহার

অতীত দিনের বর্ণনা—বালবিধবা নারী কিরূপে প্রেমের পিচ্ছিলপথে পা বাড়াইয়া প্রতারিত হইয়াছিল সেই কাহিনী রসঘনভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং সবশেষে মনোরঞ্জনকে উদ্দেশ করিয়া লক্ষ্মীর উক্তি—'ওগো, এই সেই বাবু এবং এই সে বাড়ী' গল্পের নাটকীয় যবনিকাপাত করিয়াছে। 'রসভঙ্গ' সুধীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। আজিকার বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের সমৃদ্ধির দিনেও ইহার আবেদন অবসিত হয় নাই। 'পাগল' সুধীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ছোট গল্পের আদর্শ এবং আর্ট ইহাতে বিশেষ দক্ষতার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে। এই গল্পের বাঁধুনি ও রস পরিবেশন সূক্ষ্মভাব এবং স্বকীয় অনুভূতির গৌরবে দীপ্ত। 'পাগল' গল্পের নায়ক ভ্রমবশতঃ পিতার পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে হত্যা করিয়া অনুতপ্ত হইয়া বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছে। পুলিশ পোষ্যপুত্রকে খুনী সন্দেহ করিয়া ফাঁসী দিয়াছে। কিন্তু পাগলের জীবনে তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে তাহা তাহার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। পাগল বলিতেছে: "সেটা ত (পিতার পোষ্যপুত্র) আমার হাত এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যে এখন জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।...বৌয়েব সেই মরণ-ক্রন্দন এখনো আমার কানে বাজিয়া তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় দিবারাত্র আমাকে দগ্ধ করিতেছে।...প্রত্যহ উষাকালের নবস্ফুটন্ত পবিত্র পুষ্প দিয়া হাতের এই পাপ মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছি না।" এই কিছুতেই পাপ মুছিয়া ফেলিতে না পারাই তাহাকে আরও পাগল-করিয়া তুলিতেছে এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠে—"উঃ, কি যাতনা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!" 'সন্তোষিণীর ডায়েরী' আজিকের দিক দিয়া একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এই গল্পে একটি দার্শনিক মনের এবং জীবন-জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই। উচ্ছৃঙ্খল স্বামী এবং রুগ্না কন্যা লইয়া সংসারে হিন্দু নারীর যে দুর্ভোগ এবং দুশ্চিন্তা জীবনের আকাশে কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ঘনাইয়া আসে সেই নৈরাশ্য ও দুঃখের মাঝেও যে একটি সান্ত্বনা আছে, আশ্বাস আছে তাহা এই গল্পে প্রকটিত হইয়াছে। তাই দুর্দৈব যতই তাহাকে আঘাত করুক না কেন, মানুষ যদি তাহার সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে তবে তাহার ভার লাঘব হয়। এই গল্পের নায়িকা বলিতেছে: "বেশ বুঝেচি, যজ্ঞেশ্বর যিনি প্রতিদিনের এই বৃহৎ যজ্ঞে কাহারও পাতে মিষ্টরস কাহারও বা পাতে তিক্ত রস পথ্য স্বরূপ দিচ্ছেন, তাঁকে ডাকা ছাড়া এ মোহের হাত থেকে রক্ষা পাবার এবং রক্ষা করবার আর উপায় নেই। আমার মানস-সভায় যখন তাঁকে একমাত্র অধীশ্বর করে বসাতে পারব তখন তাঁরই করুণায় সব অমঙ্গল জয় করতে পারব।" আমাদের সংসারে নারী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বিরাজ করে। তাহার ক্ষমাসুন্দর ও প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টি ও স্পর্শ পুরুষকে শত গ্লানি ও পাপের দীনতা হইতে বাঁচাইয়া রাখে। এই প্রেম প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রেমের বিকৃতি ঘটিলে সংসারে যে কিরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় তাহা অনেকেরই অবিদিত। 'সন্তোষিণীর ডায়েরী'তে এই কথাটি অতিশয় সহজ ভাবে বলা হইয়াছে: "পুরুষরা ভাবেন, আমাদের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে জোর করে কাজ আদায় করে নিচ্ছেন। কিন্তু আমরা যে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত এই খাঁচার ভিতর ঝাঁট দিয়ে, উনুন ধরিয়ে, বাটনা বেটে, রান্না করে মরচি, এ কি সমাজের অনুশাসনে, না পুরুষের কটাক্ষ ভয়ে, না কর্ত্তব্যবুদ্ধির তাড়নায়? কোনটার জন্যই নয়? এ কেবল ফুলের সৌরভের মত স্বতঃ উৎসারিত ভালবাসার দরুণ। নইলে ইচ্ছা করলে আমরা সংসারকে জালিয়ে ছারখার করে দিতে পারি।"

সুধীন্দ্রনাথের 'লাঠির কথা'কে রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' বা 'রাজপথের কথা'র অনুভূতি বলিয়া ধরিয়া লইলে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হইবে না। বস্তুতঃ এই গল্পের অন্তরালে সতীশ ও তাহার পরিবারের বেদনাবিধুর কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়া সুমধুর পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই গল্পটির ইহাই সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহার ভিতরে যে একটি সহজ হিউমার বা হাস্যরস আছে তাহা পাঠকমাত্রেই উপভোগ করিবেন। এই হাস্যরসের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত হইল। "আমার নাম বংশযষ্টি। সেনেদের সুঁড়োর বাগানবাড়ীতে এঁদো পুকুরের পাড়ে আমার জন্ম। এক ঝাড়ে আমরা সাতটি ছিলাম, তন্মধ্যে আমি কনিষ্ঠ। নিশ্চিত পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলে কিংবা কোন দেবতার অভিসম্পাতে আমার এই বংশত্ব প্রাপ্তি; নহিলে কেন অপরাধী স্কুলের ছাত্রের ন্যায় খাড়া দাঁড়াইয়া

থাকিয়া দিবামাত্র একই চিত্র দেখিব।" যে মালী আসিয়া দুই চারি কোপে বংশকে শাপবিমুক্ত করিল তাহার স্ত্রীর আকৃতি বর্ণনাও হাস্যরসপূর্ণ। "দীর্ঘায়ত বপু, মুখে ডায়মণ্ড-কাটা বসন্তের দাগ, বামপদে গজেন্দ্রচরণদর্পহারী প্রকাণ্ড গোদ, নাকে সুদর্শন চক্র ঝুলিতেছে, রং ভীমরুলের উপর বোলতার উপবেশন যদি কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন, তবে তদ্রূপ হরিদ্রারসসিক্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং রসনা প্রতিক্ষণ দংশনে উদ্যতা।" এই প্রসঙ্গে 'জুতার আত্মকথা' গল্পটিও অবশ্য-পাঠ্য। 'জুতার আত্মকথা' কিন্তু 'টাকার আত্মকথা'র ন্যায় মামুলী ধরনের গল্প নয়। ইহাতে লেখকের কল্পনা অভিনব রূপায়ণের মাধ্যমে বিষাদের বেহাগ রাগিণীর আলাপ করিয়াছে। চীনার দোকান হইতে জুতার ধনীগৃহে আগমন—ধনীর বালিকা কন্যার পদতলে কিছুকাল অবস্থানের পর বিজয়ার দিন তাহার সহিত চির-বিচ্ছেদ একটি লিরিক বেদনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'মা ও ছেলে' গল্পের খ্যাঁদা ধনীর ধনদৌলত ও জমিদার গৃহিণীর কৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ না হইয়া সহজাত আবেগে মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে। 'সহধর্ম্মিণী' নামক গল্পটি উপেন এবং তাহার স্ত্রী শৈলর নির্য্যাতনমনের কাহিনী। দাম্পত্য-জীবনের প্রথম লগ্নের সহজাত কামনাকে অবদমিত করিয়া অনাদৃতা স্ত্রী যখন অন্তর্মুখী হইয়াছে সেই সময় বন্ধু বিমলের দৈনন্দিন দাম্পত্য জীবনের মধুর মিলনচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া অনুতপ্ত উপেন পুনরায় তাহার অবদমিত কামনাকে এবং নিরুদ্ধ প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া স্ত্রী-কর্ত্তৃক কিরূপ প্রত্যাখ্যাত ও ভর্ৎসিত হইল তাহাই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীর শেষ দৃশ্যে উপেনের প্রতি শৈলর উক্তি—"আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, কুহকিনী বা মায়াবিনী নই" যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি যথাযোগ্য। এই সকল গল্পগুলি ব্যতীত সুধীন্দ্রনাথের—'সেবিকা', 'বুড়ী', 'অগ্নিপরীক্ষা' অথবা 'অনুতাপ', 'জলাঞ্জলি' ইত্যাদিতে লেখকের রসসংস্কার এবং সমাজচেতনা এমন সূক্ষ্মভাবে এবং বাস্তবনিষ্ঠভঙ্গিতে বিবৃত হইয়াছে যাহা আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত তন্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া রসপ্রাণকে ক্ষণেকের জন্যও আকুল করিয়া দেয়। বস্তুতঃ সুধীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি রসসৃষ্টি হিসাবে কি পরিমাণ সার্থক তাহার প্রমাণ লইতে হইলে আজিকার দিনের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি গল্প সংগ্রহের পার্শ্বে তাঁহারও গল্পগুলির একটি সঙ্কলন রাখিয়া বিচার করিলে সকল সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। কেননা এই গল্পগুলির অধিকাংশ এমন বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর অধিকারী যে ইহার আবেদন বা প্রেরণা কোনও বিশেষ কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—তাহা যুগোত্তীর্ণ প্রাণধর্ম্মের উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ নিজের ছোট গল্প-গুলির রসমূলের ও সৃজনী-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন সুধীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধেও তাহা অবিসম্বাদিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। তাই আলোচনার শেষে পাঠকগণকে সেই মূল্যবান উক্তিটি পুনরায় স্মরণ করিতে অনুরোধ করি :

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা,
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি, প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তাহারই দু'চারিটি অশ্রুজল ;
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

———

প্রিয়ং ব্রুয়াৎ!

শ্রীভাস্বর ভট্টাচার্য

অনেকের ধারণা, ব্যবহারবিজ্ঞান আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের অবদান। কিন্তু এই ব্যবহারের সুপ্রয়োগবিধি সম্পর্কে যে প্রাচীন ভারতে ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে,—তা অনেকেই অনবহিত। লেখক ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোকে ব্যবহার-বিধির সুপ্রয়োগ ও তজ্জাতীয় চর্চা ও চর্যার যে উল্লেখ করেছেন, তা আশাকরি চিন্তাশীল পাঠকদের আনন্দ দেবে।

কথা বলা যে একটা আর্ট, সেটুকু প্রাচীন-অর্বাচীন উভয়েই কবুল করেন। প্রাচ্য বলেন: প্রিয়ং ব্রুয়াৎ অর্থাৎ লোককে প্রিয় কথা বোলো, এমন কি সত্য অপ্রিয়ও বোলো না। মনু ছাড়াও মহাভারতকার এবং অন্যান্য সংহিতাকারেরাও এই বাক্-পারুষ্য ত্যাগের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রতীচ্যের ব্যবহার-বিজ্ঞানীরাও এই একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন: **words are like chemicals. They often cause explosions. Harsh words have broken up homes and partnerships. They led to violence. They have started wars.** অর্থাৎ 'বাক্যালাপটা যেন এক রাসায়নিক বস্তু, যা প্রায়শই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে। কর্কশ কথা অনেক ঘর ভেঙেছে, অনেক দাম্পত্যজীবন বিষময় করে তুলেছে। আর এই কটু কথাই সুরু করেছে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ'। এতদ্বিষয়ে ভারতীয় এক আধুনিক ব্যবহারবিজ্ঞানীর কথাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: 'বাক্যপ্রয়োগ যেন একটা ধারালো ক্ষুর, যার সু-প্রয়োগে সমূহলাভ—অপ-প্রয়োগে নিশ্চিত রক্তপাত!' সুতরাং মোদ্দা কথা হ'ল, কথা যদি বলতেই হয় তা যেন প্রিয়, রম্য ও রুচিকর হয়। গুছিয়ে কথা বলা যে একটা আকর্ষণীয় সদ্গুণ, তা আপনি আমি সকলেই স্বীকার করি। আর মিষ্টভাষী হিসাবে একটা উচ্চ স্বীকৃতি পাবার যে চাপা লোভ আপনার আমার মধ্যে আদৌ নেই, এমন কথাও হলফ্ ক'রে বলা যায় না। সুতরাং কথা অপরের কাছেই বলুন কিংবা নিজেদের কাছেই বলুন, সে বিষয়ে যেন একটা সচেতন অবহিতিবোধ ও প্রাক্-প্রস্তুতি থাকে। আর এই সমনস্কতাই আপনাকে অনেক 'অ-কথা', 'কু-কথা' থেকে বিরত করবে।

বাক্যালাপে প্রাক্-প্রস্তুতি

কথা বলার পূর্বে যে সেই কথা সম্পর্কেই কিছু বলার থাকতে পারে—সেটিও খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। কোন কথার উদ্ভব, বিস্তার ও পরিণতি সম্পর্কে একটু গুছিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, কথার উদ্ভব হয় প্রয়োজনবোধে। এই প্রয়োজনবোধের মূল উৎস ও উপপত্তি (cogency) নির্ণয় করাই আমাদের উপস্থিত বিবক্ষিত বিষয়। আর এই প্রয়োজনটুকুও নির্ণীত হয় কিন্তু মনে মনে কথা বলার মাধ্যমেই। সুতরাং যে প্রয়োজন আমাদের বাক্য-স্ফুরণে নিয়োজিত করে, সেই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিনিশ্চয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। সেই 'সিদ্ধান্ত'কে যেন কোন আবেগ (emotion), সংস্কার (propensity) ও পারুষ্য (acrimoniousness) আবিল, নিদিষ্ট ও প্রগলভ না করে তোলে। 'বেশি কথা বলার অসংযম' যাঁদের মধ্যে নেই, যাঁরা মিতবাক্ এবং ধীর, প্রায়শঃ তাঁদের মধ্যেই

উপযুক্ত সদ্‌গুণগুলি নজরে পড়ে। আর চিন্তায় যারা অপুষ্ট, চিন্তিত বিষয়ের অপুষ্টিও তাদের ধরা পড়ে পদে পদে। তাদের এই ক্ষত বা অপ্রস্তুতির চিহ্ন তারা রেখে যায় তাদের বাক্যে ও আচরণে।

কোন কটূক্তি বা কুবাক্যের প্রয়োগ প্রায়শঃ দু'টি কারণ থেকেই ঘটে থাকে। ১) বিদ্বেষ কিংবা অসূয়াদি ২) 'হঠাৎ কিছু বলে ফেলা' বা চিন্তা-দৈন্য। এই চিন্তা-দৈন্য বা Incompleteness of thoughts-ই হচ্ছে 'হঠাৎ মন্তব্যের' জনক। চিন্তার এরূপ অপ্রস্তুতি বা unpreparedness সম্পর্কে এক ব্যবহার বিজ্ঞানী, যারা বাক্যে অপ্রস্তুত তাদের হুঁশিয়ার করে বলেছেন: Make no apologies for yours own unpreparedness. You have no right to be unprepared. 'তোমার এই অপ্রস্তুতির কোন অজুহাত দেখিও না। এরূপ থাকার তোমার কোন অধিকার নেই'। সুতরাং সত্যই যদি আপনার মনে কোন বিশেষ স্বার্থ কিংবা বিদ্বেষ-বহ্নি না থেকে থাকে, তবে বাক্য স্ফুরণের আগে সেই কথাগুলোই বারকয়েক নিজের কাছে বলে নিন। দেখবেন, ক্রমশ আপনার বাক্য ও ব্যবহার কেমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। কটূক্তি-প্রবণতা দিনের দিন আপনার বাক্য থেকে অপসৃত হচ্ছে।

কথা বলার কথা

প্রায় বাঙালীর ঘরের সব ছেলেরাই জ্ঞানোন্মেষের সংগে সংগেই পড়ে থাকে:......'কখনও কাহাকেও কুবাক্য বলিও না, কুবাক্য বলা বড় দোষ। যে কুবাক্য বলে কেহ তাহাকে ভালবাসে না' ইত্যাদি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে অপরের ভালবাসা পাওয়া এবং জনপ্রিয় হবার শ্রেষ্ঠ ও ত্বরান্বিত পথ হল—সুবাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ প্রিয় ও রুচিকর কথা বলা।

অন্যান্য দিক বাদ দিয়েও একজন রূঢ়ভাষী ও কটূক্তি-কারকের এইরূপ প্রবণতার মৌল-বিশ্লেষণ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেই করা যেতে পারে। একজনের এইরূপ রূঢ়ভাষণের ও কটূক্তির কারণ কি? কারণ দু'টি: ১) হয় সে কথা বলতে জানে না, ২) কিংবা জেনে-শুনেই তার এটি ইচ্ছাকৃত অনাচার। দ্বিতীয়টির কারণ যখন স্পষ্ট, তখন সে নিয়ে বাদানুবাদ না ক'রে প্রথম বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করা যাক্। একজন 'কথা বলতে জানে না' এ কথার প্রকৃত অর্থ কি? এর অর্থ এইরূপই দাঁড়ায়, তার বাক্যপ্রয়োগ ও শব্দচয়ন পদ্ধতির মধ্যে এমন কোন রূঢ়তা বা কার্কশ্য প্রকটিত হয়ে ওঠে—যা শ্রোতার আত্মমর্যাদাকে পীড়া দেয় কিংবা শাব্দিক-অপপ্রয়োগের (vulgarity) জন্য তা শ্রোতৃমণ্ডলীর রুচিকর হয় না। বাক্য ও সংলাপ প্রায়ই সংস্কার, রুচি ও শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি রুচি ও শিক্ষাও সময় সময় মানুষের পূর্ব-সংস্কার ও মানসিক-প্রণোদনকে মেরামত করে উঠতে পারে না। এ নজিরও বিরল নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন একটি পরিবারকে জানি (যাঁরা আমার খুব নিকট আত্মীয় ও উচ্চশিক্ষিত), যারা মেয়ে-পুরুষে সকলেই উচ্চশিক্ষিত হয়েও প্রত্যেকেই পরশ্রীকাতরতা ও অসূয়া-তে ভুগছে। পৃথিবীর কারোরই শ্রীবৃদ্ধিতে তারা খুশী নয়, কিন্তু প্রত্যেকের গুণেই পিছনেই কিছু-না-কিছু বদনাম বা ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে তারা সকলে এক নীচ আনন্দ অনুভব করে। আর সর্বদা এরূপ একটা অপগুণ হৃদয়ে পোষণ করার জন্যে তাদের বাক্য-স্ফুরণ, আচার ও আচরণে কদর্য এবং সাধারণের অনভিপ্রেত এক ভাবাভিব্যক্তি উগ্রভাবে প্রকটিত হয়ে ওঠে। মানুষকে প্রিয়কথা না বলতে পারার এইটিও হল আর এক অন্যতম চারিত্রিক অন্তরায়। উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি দেখতে পেলাম, বাক্যে অসংলগ্নতা, কার্কশ্য ও মানসিক অসূয়াদি কথোপকথনে ও সংলাপে এক বিপর্যয় এবং আবিলতা সৃষ্টির সহায়তা করে।

বাক্যের সুপ্রয়োগ ও ইউফিমিজম্

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও, বিশেষ একটি দিকের অনবধানতার জন্যে বাক্য সার্থক ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে না। তা হ'ল, কোন অপ্রীতিকর ভাব কিংবা ভাষাকে সুন্দরতর ভাষার দ্বারা প্রকাশে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাব। আমরা জানি, গান যেমন শ্রুতিসুখকর না হ'লে তার কোন মূল্য অথবা সার্থকতা নেই। ঠিক তেমনভাবে,

বাক্য যদি শ্রোতার মনোগ্রাহী না হয়, তবে তেমন কোন বাক্যের দ্বারা শ্রোতার কাছ থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়াও সম্ভব নয়। একটি মাত্র সুপ্রযুক্ত বাক্য যে শ্রোতার মনে কিরূপ আলোড়ন ও সুদূরপ্রসারী অনুরণন জাগাতে পারে—তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয়। কথা যে একটা শিল্প, একথা অনেক কথাবলা শিল্পীরাই ভুলে বসে থাকেন। কথা যদি শোনাতেই হয় তবে যেন Herbert V. Prochnow-এর এই কথাগুলি স্মরণ করেই বলি :…'An anecdotes prosperity lies in ear of him that hears it, never in the tongue of him that makes it.'

ইউফিমিজম্ (Euphemism) হ'ল কোন অপ্রীতিকর ভাব কিংবা ভাষাকে সুন্দরতর শব্দনিচয়ের দ্বারা প্রকাশ করা। ইচ্ছা যদি থাকে, কোন মর্মচ্ছেদী বাক্যের দ্বারা অপরকে এক হাত নেব না, তবে এই প্রয়োগ-নৈপুণ্যে মানুষের জিহ্বা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণ দিলে, বিষয়টা হয়ত একটু স্পষ্ট হবে। ধরা যাক্, কোন নিঃসন্তান মহিলাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হ'ল, তাঁর কোন সন্তানাদি আছে কি না? তখন কেমন ক'রে জিজ্ঞাসা করতে হবে, সেইটিই হ'ল ইউফিমিজম্-এর এলাকার কথা। তাঁকে দু'রকমভাবেই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। যথা : (১) আচ্ছা, আপনি কি অপুত্রক? কিংবা আপনার সন্তানাদি ক'টি? আর দ্বিতীয়টি হ'ল : (২) আপনি কি বাঁজা?

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উপযুক্ত বাক্য দু'টির মধ্যে কোনটি মর্মস্পর্শী এবং কোনটিই বা মর্মচ্ছেদী? নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে দ্বিতীয়টিই শ্রুতিকটু ও হৃদয়বিদারক। বাক্যের এই শ্রুতিকটুতা ত্যাগ করে সুন্দর ও রুচিকর অভিব্যক্তির মাধ্যমে বাক্যকে সুশ্রাব্য করে তোলাই হ'ল বাক্যের যথার্থ সুপ্রয়োগ ও ইউফিমিজম্। আর দ্বিতীয় বাক্যের অনুরূপ শব্দপ্রয়োগে বক্তা ত সাধারণ্যে ও শ্রোতার কাছে কটুভাষী, অপ্রীতিকর, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এমন কি অভদ্র (তা যত শিক্ষিতই হ'ন না কেন) বলে প্রতিভাত হবেনই, উপরন্তু এই অবগুণের জন্য তাঁর উপস্থিতি এবং সান্নিধ্য—(দূরের লোক ত দূরের কথা) তাঁর অতিবড় পরমাত্মীয়রাও এক মুহূর্তের জন্যে তাঁকে চাইবেন না সুতরাং প্রিয়ংবদ হবার জন্যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হ'ন।

বাক্য-দূষণের আরেক দিক

এতক্ষণ আমরা বাক্যের প্রয়োগ-বিধি, বাক্যে অসংলগ্নতা, কার্কশ্য, রূঢ়তা প্রগলভতা প্রভৃতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। উপস্থিত মানুষের এইরূপ আচরণ ও ব্যবহারের নেপথ্যে যে প্রবৃত্তি, চিন্তাধারা ও সংস্কারাদি সক্রিয় এবং মূর্তভাবে কাজ করে চলে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

এমন অনেক লোক প্রায় আমাদের চোখে পড়ে নাই, যিনি সর্বদাই তিরিক্ষি মেজাজে আছেন। তার মুখ দেখলে মনে হয় যেন তিনি দারুণ দৌর্মনস্যে ভুগছেন; রাজ্যের অসন্তুষ্টি যেন তার মুখে মাখানো। তাকে আমি বা আপনি কোন কিছু দিয়েই সন্তুষ্ট করতে পারব না, কিংবা তাকে ভালোভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, হয় তিনি উত্তর দেবেন না কিংবা দিলেও ঝাঁঝিয়ে কোন কথার উত্তর দেবেন অথবা যা উত্তর দেবেন তা হ'ল—গালাগালি কিংবা শ্লীলতা বহির্ভূত কোন শব্দ-সমষ্টি।

রূঢ়ভাষী কোন মানুষের মানস-সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, এ ধরনের রূঢ়ভাষিতা, বাক্যে অসৌজন্য কিংবা অপরকে আক্রমণাত্মক কথাবার্তা চালানর পেছনে কোন প্রাক্তন ক্ষোভ, দুঃখ, নিরাশা অথবা দম্ভ বা কোন বিকৃত আত্মসচেতন, তাই তার বাক্য ও আচরণে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় নিয়োজনে ব্যাপৃত আছে। এই বিকৃতি (complex) বা সংক্ষোভ গভীর মনোগহনে থাকলেও তার অভিব্যক্তিটি চাপা থাকে না। সময় পরিপার্শ্বেও কোন বিশেষ ঘটনায় সেটি এক বিশেষ আকারে ও প্রকারে প্রকট হয়ে ওঠে। একজন তিরিক্ষি মেজাজের বা দৌর্মনস্যে ভোগা-লোককে আমরা চিনতে পারি কি করে? চিনতে পারি এইজন্যেই যে, সে সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক নয় বলেই। আচারে-ব্যবহারে তার কোথায় যেন অসংগতি—কোথায় যেন ব্যতিক্রম! একজন রূঢভাষী বা তিরিক্ষি মেজাজের কোন লোককে দেখা যায় তিনি রুক্ষ, অসমঞ্জস, অবিন্যস্ত ও cynic। এ ধরনের লোককে মনঃ-সমীক্ষা (Psyco-Analysis) করে দেখা গেছে, তাদের প্রায়শই চিন্তাক্লিষ্ট অসন্তুষ্ট এবং বিশেষ কোন মানসিক চিন্তার

চাপে (যার হয়ত অধিকাংশই অবাস্তব) তাঁরা পর্যুদস্ত। সর্বদা একটি এ ধরনের মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ও অবদমনের জন্য একটা মনের সংগে সংগে কি তার শরীরের ভীষণ ক্ষতিসাধিত হয়, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হবে। কোন বৃত্তি কিংবা প্রবৃত্তির অত্যধিক প্রশ্রয় বা মাত্রাধিক্য ঘটলে সে মানুষকে তার চলার পথে বেসামাল করে দেবেই। সর্ববিষয়ে সমঞ্জসতা বা sense of proportion বজায় রাখাই সুস্থ ও উর্বর মস্তিষ্কের লক্ষণ। মোটামুটি ভাবে একজন দৌর্মনস্যে-ভোগা রুক্ষ রূঢ়ভাষী ও অসৌজন্য-প্রবণ লোকের যে মানস ও শরীর বিপর্যয় ঘটতে পারে, তার একটি সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া গেল। মানব-চরিত্রে দুর্মুখতা যে কী মারাত্মক শত্রু—তা নিচের তালিকাটি গভীর-ভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যায় মানসিক ও ব্যবহারিক দিক :

১) তিনি জনপ্রিয়তা হারাবেন এবং দুর্মুখ বলে নিন্দনীয় ও অপখ্যাত হবেন।

২) তিনি একক ও বন্ধুবিহীন হবেন নিশ্চিতভাবে।

৩) তিনি দুর্মুখতার জন্যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন এবং কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন না।

৪) ফলে, পৃথিবী তাঁর কাছে অসুন্দর হয়ে উঠবে এবং তিনি cynic হওয়ার জন্যে জগদ্ব্যাপী সকলকেই হয় স্বার্থপর কিংবা হীন ভাববেন।

৫) নিজের প্রিয়জনেরাও তাঁকে এড়িয়ে চলবে ও অশ্রদ্ধা করবে মনে মনে। তবু তিনিই যে ঠিক এটি প্রতিপন্ন করার জন্যে লোককে জীবনভোর জ্ঞান দেবেন।

৬) এই বিপুলা পৃথিবীতে অনুগত বলতে (একমাত্র সাধুব্যক্তি এবং স্বার্থান্বেষী ছাড়া) তাঁর কেউ থাকবেনা।

৭) দাম্পত্য জীবন বিষময় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচুর।

শারীরিক দিক :—

১) দারুণ শিরঃপীড়া ও চোখের রোগে ভুগবেন তিনি।

২) মাথা ও মুখমণ্ডল খসখসে হয়ে উঠবে।

৩) চুল উঠে টাক পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৪) দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে অসুন্দর হয়ে উঠবে।

৫) মাথার ও বুকের রোগে প্রায়ই ভুগবেন।

৬) সর্বদা স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত থাকার জন্য প্রায়শই স্নায়বিক-বিপর্যয় ঘটবে (Nervous Breakdown)।

৭) সন্ন্যাস রোগ, মৃগী অথবা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পক্ষাঘাত হবার সম্ভাবনাও প্রচুর।

৮) পেটে মারাত্মক ক্ষত হতে পারে (ulcer)।

৯) ভীষণ ধরনের বাত হতে পারে ও উৎকট বহুমূত্র রোগে ভুগবেন।

১০) অতিরিক্ত রক্তচাপ বৃদ্ধি পাবে, সেজন্যে কোন এক সময় হঠাৎ মারা যাওয়াও তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

বাক্য-দূষণের এতগুলি বিপর্যয় লক্ষ্য করার পর আশা করা অমূলক হবে না যে, মানুষের প্রতি সদয়, সৌজন্যপ্রবণ ও সুবাক্য প্রয়োগ একান্ত অনস্বীকার্য। মূলতঃ অপরের প্রতি আন্তরিক ও সহৃদয় ব্যবহারে আমরা নিজেরই পরোক্ষে উপকার করে থাকি এবং মুখে হাসি, চিত্তে সৌমনস্য বজায় রেখে সাধারণের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা আমরা নিজেরই ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করে থাকি।

ভাবনা ও ভারসাম্য

আমাদের দুর্বলতার আরেকটা দিক হ'ল, আমরা নিজের সম্পর্কে একটু অতিরিক্ত চিন্তা বা over estimate করে থাকি প্রায়ই। আত্ম-প্রত্যয় অথবা নিজের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা স্পষ্টরেখ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সেটির যখন মাত্রাধিক্য ঘটে, তখনই তা বিপর্যয় রেখার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। আসলে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে অনেক কিছুই ধারণা থাকতে পারে যেটি বড় কথা নয় কিন্তু সেইটিরই প্রতিচ্ছবি ও প্রতিচ্ছায়া আমাদের আচার এবং ব্যবহারের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে যা আমাদের আদর্শ, যা আমাদের মনোগত ভাবনা। এ বিষয়ে 'নরম্যান ভিনসেণ্ট্ পিল' একটা সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'You are not what you think you are, but what you think, you are'। অর্থাৎ আপনি নিজেকে যা ভাবেন তা আপনি নন, আপনি নিজে যা ভাবেন তাই হলেন আপনি।

আমাদের মনোগহনে অনেক রুগ্ন ও পর্যুসিত চিন্তা থাকতে পারে। এবার থেকে তদ্বিষয়ে যেন অবহিত হওয়া

হয়। কোন খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় গলাধঃকরণ করার সময় আমরা সেই জিনিষটি কত শতবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিই, কিন্তু কোন চিন্তাকে 'মনের-রাজ্যে' পাঠাবার আগে কি এই একই আচরণ আমরা করে থাকি? এইবার থেকে কোন চিন্তা ও চিন্তিত বিষয়কে হৃদয়ে ঠাঁই দেবার আগে আমরা যেন এবিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি।

এতক্ষণ আমরা বাক্যের বিভিন্ন গতিপ্রকৃতি ও তার বিশেষ বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করলাম, উপস্থিত সাধারণ মানুষের ভাবনা ও তার ভারসাম্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

চালু ঘড়িতে দম থাকা পর্যন্ত যেমন সে টিক্ টিক্ করে যাবে, ঠিক তেমনতরো প্রাণবন্ত মানুষও চিন্তা করে চলবে যতক্ষণ প্রাণশক্তি না ফুরিয়ে যায়। হয় সে কথা বলবে মনে মনে, কিংবা তার ভাবধারা প্রকাশিত হবে উচ্চারিত কোন শব্দ-সমষ্টির মাধ্যমে। এই ভাব ও ভাবনাকে সুষ্ঠু পথ ও পদ্ধতির মধ্যে নিয়োজিত করাই হল প্রথম কথা। প্রবণতা ও সংস্কারাদির দ্বারা অনুসৃত চিন্তা বা ভাবনা প্রায়শ শিক্ষা, রুচি অথবা culture প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর তখনই যথার্থভাবে শুরু হয়ে যায় আবেগজনিত ভাবনার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ-প্রজ্ঞার সংঘাত (emotion versus reason)। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে যিনি বিজয়ী হন যতটুকু—তাঁকেই আমরা বলে থাকি বস্তু বা যুক্তিনিষ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ।

'চরিত্রের মূল বিচ্যুতির কেন্দ্রস্থল'কে লক্ষ্য করে (heart of the problem) যদি আমরা বীর্যসহকারে অতি আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রয়াসী হই, তবে সে যতই জটিল বা বক্র সমস্যাই হোক না কেন, তার নিরাকরণ অধিকাংশভাবেই সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বিশ্বের সত্যকে বুঝতে বা জানতে আমাদের অন্যতম প্রধান এবং প্রথম অন্তরায় হ'ল: unwillingness of thoughts বা 'চিন্তা ফোবিয়া' আমাদের সত্যই সবচেয়ে বড় রোগ হল এই 'চিন্তা ফোবিয়া'। যে অসমর্থতার জন্যে আমরা আমাদের সঠিক নির্দেশ পথ থেকে বারবার পিছলে যাই বা সরে আসি। এখন থেকে নিশ্চয় ক'রে যখন জানলাম দুর্বাক্য প্রয়োগের কি ভয়াবহ পরিণতি তখন যেন মহাভারতকারের সংগে সুর মিলিয়েই বলি: 'ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা দূষণং ব্যাহরেৎ ক্বচিৎ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহারও দোষ বলিবে না।

বাক্য পরিলেখ
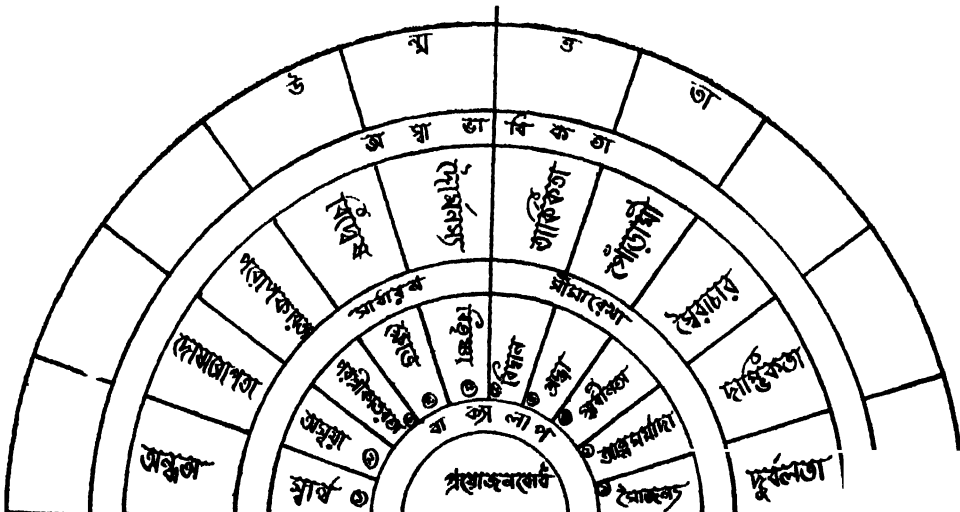
উপর্যুক্ত এই 'বাক্য পরিলেখ'-এর বা Diagramটির মধ্যে দিয়ে আমরা ভাবনা ও ভারসাম্য অংশটিকে একটু স্পষ্টীকৃত করার প্রয়াস পেয়েছি। এই পরিলেখে বাক্যের উৎপত্তি, বিস্তার এবং তার বিপর্যয়রেখাও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। সব ক্রমেরই যেমন একটাব্যতিক্রম আছে, এস্থানেও তদ্রূপ। পরিলেখটিকে চিন্তা-সহায়িকা হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে মাত্র। এটিকে উপমারূপেই গ্রহণীয়, উদাহরণরূপে নয়।

বাক্যালাপটা প্রয়োজনভিত্তিক বলেই, প্রয়োজন বাক্য-স্ফুরণের জনক। এখন এই বাক্যালাপটি কোন ভিন্নকোটি বা ব্যতিরেক কোন প্রবৃত্তির দ্বারা বিঘ্নিত না হ'লে তা মোটামুটি ভাবে [সৌজন্য ১, আত্মমর্যাদা ২, স্বাধীনতা ৩, শ্রদ্ধা ৪, বিচার ৫ (ডান দিকের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি) এবং স্বার্থ ১, অসূয়া ২, পরশ্রীকাতরতা ৩, ক্ষোভ ৪, বিতৃষ্ণা ৫ (বামদিকের স্বাভাবিক অপ-বৃত্তি-গুলি) প্রভৃতি] এইসব বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে।

বাক্যস্ফুরণে যে স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয় ১০টি (সৌজন্য, আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা, শ্রদ্ধা, বিচার, এবং স্বার্থ, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা) সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে চলে, তা মানুষকে তার ব্যবহারিক ও সামাজিক জগতে সুন্দর ক'রে প্রতিষ্ঠা করে এবং তার সামাজিক জীবন চলার পথে এক সুষম ছন্দ ও শ্রী ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু এই বৃত্তিনিচয়কে পরিপালনেরও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যতক্ষণ এই বৃত্তিগুলি খেলা করে তা শোভন ও রমণীয়। কিন্তু এই সদ্বৃত্তিগুলিও যখন sense of proportion হারিয়ে ফেলে, তখন এই মনোরম বৃত্তিগুলি পরিবর্তিত হয়ে ওঠে এক ভিন্ন রূপ ও রুচি নিয়ে। ধরা যাক, পরিলেখ-এর ৪নং যে গুণটি মানুষকে তার বাক্যে ও ব্যবহারে এক স্বর্গীয় সুষমা ও সৌম্যশ্রী এনে দেয়, তার নাম 'শ্রদ্ধা'। এই শ্রদ্ধারূপ সদ্গুণটি দ্বারা মানুষ জ্ঞানী হয়, তপশ্চর্যা করে, বীর্য-সহকারে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়ে, অসাধ্য সাধন করে, এমন কি জীবন পর্যন্ত দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু এই শ্রদ্ধারও এক নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। সেটি যথার্থরূপে প্রতিপালিত না হ'লে— তার রূপ নেয় "গোঁড়ামি'তে। (পরিলেখ দেখুন)

"গোঁড়ামি"র উৎপত্তি শ্রদ্ধা হ'তে হলেও, সেটি যে কি ভীষণ ও ভয়াবহ রূপ নেয় শেষে—সেটুকু যে কোন ইতিহাসের পাতার দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে। এই অতিশ্রদ্ধা বা গোঁড়ামীর দৌরাত্ম্যে অনেক সাধু ব্যক্তির অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে, হয় অগ্নিদগ্ধ হয়ে কিংবা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে। আটপৌরে একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে হয়, দুধকে সবশ্রেষ্ঠ পানীয় এবং সবচেয়ে পুষ্টিকর বলে আখ্যা দিলেও, এই দুধ যখন পচে যায়, তখন তার মতন মারাত্মক ভয়াবহ পানীয় আর দ্বিতীয় থাকে না। ঠিক তেমনতরো কোন গুণকে পালন করা ভাল, কিন্তু তা যেন পরিপালনের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, আত্মমর্যাদাবোধ মানুষের একটি আকর্ষণীয় সদ্গুণ (পরিলেখ ২নং দেখুন)। এই গুণটির জন্য ব্যবহার ও বাক্যে এক পরিচ্ছন্ন ও তীক্ষ্ণ মানসিকতা ফুটে ওঠে এবং যে বলিষ্ঠতার জন্যে এই মানুষটি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধা ও সুনাম পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই অকর্ষণীয় সদ্গুণটির যদি অতিরিক্ত মাত্রাধিক্য ঘটে, তবে সেই গুণটিও গুণ থাকেনা—হয়ে ওঠে অবগুণ। আর এই আত্মমর্যাদা এক বিভীষণ রূপ নিয়ে দেখা দেয় দাম্ভিকতা নামে। এই দাম্ভিকতার যে কি ভয়াবহ রূপ, আশা করি সকলেই অবহিত আছেন। বাক্যকে জঘন্য, শ্রুতিকটু ও আবিল করে তোলে এই দাম্ভিকতার স্থূল ও কদর্য বিষবাষ্প. আত্মমর্যাদাবোধের মধ্যে শালীনতা ও রুচির সৌরভ ভেসে আসে – দাম্ভিকতায় পাওয়া যায় ঠিক তার বিপরীত এক কদর্য, স্থূল, অবজ্ঞ এবং ঘৃণিত দুর্গন্ধ। বক্তার কাছে সেটি খুব রসালো এবং তৃপ্তিদায়ক মনে হলেও, শ্রোতার কাছে এটি শ্রুতিকটু, ক্লান্তিকর এবং বিবমিষাবহ বলেই মনে হয়ে থাকে।

সুতরাং মোদ্দা কথা হ'ল, হাজারো রকমের বৃত্তি আমাদের এই মনের মালগুদামে নিহিত আছে। সেইগুলির যথাযথ চর্চা ও পরিশীলনের দ্বারা আমাদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক কাজে সুষ্ঠুভাবে লাগাতে হবে। আর অবশ্যই তা যেন একটা নির্দিষ্ট ও সুন্দর পথ এবং পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। মনে রাখা দরকার, ভাবনা যখন নিজের proportion বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখনই তা অস্বাভাবিক বা বিপর্যয় সীমারেখার

কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সেইদিকে যেন আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অবহিতিবোধ থাকে। আমাদের বাক্যে ও ব্যবহারে যে ত্রুটি ও অসংগতি থাকে তা আমাদের নিজেদের চোখে ধরা পড়া কষ্টসাধ্য। কারণ সাধারণতঃ আমাদের নিজের এবং নিজস্বদের প্রতিটি বস্তুর প্রতি আমাদের এক মূঢ় দৃষ্টি বা অবোধ-মমত্ব জড়িয়ে থাকে--- সেজন্যে সঠিক কুবাক্য এবং কুব্যবহারের নিরাকরণ আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। এবিষয়ে এক অজ্ঞাত মনীষীর কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন: "আমাদের নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের মতামতের চাইতে শত্রুদের মতামতই বেশি সত্যি হবার সম্ভাবনা।" সুতরাং যখন আমাদের নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ ও আবিল, তখন অন্ততঃ শত্রুর কাছে না গিয়ে (যেহেতু অতটা মনের জোর আমাদের নেই) কোন সহৃদয় মিত্রের কাছে গিয়ে নিজের একটা ত্রুটির তালিকা নির্মাণ করিয়ে নিলে কেমন হয়? আর যা দিয়ে, আমরা অন্ততঃ আমাদের চারিত্রিক চেহারার একটা নিখুঁত মানচিত্র পেতে পারব।

বাক্যকে দূষিত এবং ব্যবহারকে কলুষিত করতে বামদিকের ৫টি স্বাভাবিক বৃত্তি (পরিলেখ দেখুন) যথা, স্বার্থ, অসূয়া. পরশ্রীকাতরতা, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা প্রভৃতি অনেকখানি সাহায্য করে থাকে। আর সবচেয়ে মজার কথা হ'ল, কোন মানুষই সাধারণত আচার ও ব্যবহারের মধ্যে এই কুপ্রবৃত্তিগুলোকে প্রদর্শিত করতে চায় না। কারণ সে মনে মনে ভালভাবেই জানে এইগুলি চরিত্রের দূষণীয় দিক এবং এটি প্রকটিত হ'লে তাকে নিন্দনীয় হ'তে হবে। সেজন্যে অন্ততঃ সে সাধু সাজার ভানও করে থাকে। সুতরাং নেপথ্যচারী এই কুপ্রবৃত্তিগুলি নেপথ্য হ'তেই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কিন্তু পূর্বের মতো এই ভাবনাগুলোও যদি ভারসাম্য হারায়, তবে সেগুলিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যথাক্রমে—অন্ধতা, দোষারোপতা, পরোপকারতা, বিদ্বেষ এবং দৌর্মনস্যে। সুতরাং মনের কোন ধারণা (তা বদ্ধমূলও হতে পারে) বা ভাবনাকে অযথা আস্কারা দিলে, তা যে একদিন নিজেরই মাথায় চেপে বসবে—সেটিও আমাদের একটা চিন্তা করার দিক।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল: মনে কোন চাপা ক্ষোভ বা বিদ্বেষ পুষবেন না। অকারণ মুখমণ্ডল ও জিহ্বাকে উৎক্ষিপ্ত ও কদর্য করে তুলবেন না। এমন শব্দের চয়ন করবেন না, যা দিয়ে অপরের চোখ দিয়ে জল পড়ে কিংবা হৃদয়ের ক্ষত দিয়ে টপ্ টপ্ ক রে রক্ত ঝরে। প্রতিশোধ প্রবণতা ত ইতর প্রাণীদের মধ্যেই বেশি, সেই আচরণের পুনরাবৃত্তি না ক'রে ক্ষমা ও তিতিক্ষার দ্বারা মানবিক-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করুন। দেখবেন, আপনার মুখমণ্ডল ও বাক্যের মধ্যে কেমন স্নিগ্ধশ্রী ও কোমল শীতলতা স্পর্শ করেছে। যে স্বর্গীয় সুষমা এই জ্বালাময় পৃথিবীতে এবং ক্ষতবিক্ষত মানুষের হৃদয়ে এক স্নিগ্ধ চন্দন-প্রলেপের মতোই রমনীয়।

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

দেরাদুনে প্রদর্শনী : বিজয়লক্ষ্মীর দ্বারা দ্বারোদ্‌ঘাটন

কাগজে দেখলাম শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দেরাদুনে মুসুরীতে আসবেন। তাঁকে চিঠি লিখলাম। দেরাদুনে আসবার আগে জানাতে, তখন দুন স্কুলের আর্ট গ্যালারীতে আমার ও ছাত্রদের ছবির প্রদর্শনী করব। ওঁকে দিয়ে তার ফরমাল ওপনিং হবে। উনি রাজী হয়ে চিঠি লিখলেন। এপ্রিল মাসে প্রদর্শনী হবে। হৈ হৈ ছবির প্রদর্শনী সাজিয়ে ফেললাম। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী আসবেন লিখেছেন দুন স্কুলে আমার অতিথি হয়ে। আমি পড়ে গেলাম বেগতিকে! ফুট সাহেবকে না বললে কি করে চলে? উনি হেড মাষ্টার। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দুন স্কুলে এলে ফুট সাহেবকেই সংবর্ধনা করা উচিত। তাঁকে বললাম। উনি বেশ খুশী হয়ে নিজের বাড়ীতে একটা চায়ের বন্দোবস্ত করলেন। চায়ের পর আর্ট স্কুলে এসে প্রদর্শনী খুললেন। বাইরের অনেক বিশিষ্ট লোকেরা প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। মনে আছে, মিসেস্ অমু স্বামীনাথন সেই সময় দুন স্কুলে অতিথি হয়েছিলেন। তিনিও প্রদর্শনী দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন।

মুসুরীতে একক প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনী করেও ক্লান্তি নেই। ঠিক করে ফেললাম, এবারেও মুসুরীতে প্রদর্শনী করব,—জুন মাসের ছুটি হলেই। পণ্ডিত অমরনাথ ঝা সেই সময় মুসুরীতে থাকবেন। তাঁকে দিয়েই প্রদর্শনী খোলা যাবে। সাভয় হোটেলে প্রদর্শনী হ'ল এবারেও। মে মাসের শেষে ছেলেদের বাৎসরিক প্রদর্শনী শেষ করে, ছুটি আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ছবির পাততাড়ি নিয়ে মুসুরী রওনা হলাম। উঠলাম গিয়ে সোজা সাভয় হোটেলে। একেবারে ভরা এবার। এক তিল জায়গা নেই। এখানে-ওখানে বহু তাঁবুও ফেলা হয়েছে। তাতেও লোক রয়েছে। আমাকে একটা 'সিংগল সীটের' ঘর দেবেন, এঁরা কথা দিয়েছিলেন স্কোয়াস কোর্টের নীচে। টেনিস কোর্টের দিকে, নীচে একটা ঘর পাওয়া গেল। সেইখানেই ছবির বোঝা নিয়ে ঢুকে পড়লাম।

১৯৪৭, জুন : সাভয় হোটেল : রুম নং ১৭১

সকাল বেলা ঘুম ভাঙল টেনিস খেলার শব্দে। ভারতবর্ষের অনেক নাম-করা টেনিস খেলোয়াড় এসেছে মুসুরীতে। নরেশকুমারও আছেন। নূর মহম্মদ না গোষ মহম্মদ মনে নেই নামগুলো তিনিও আছেন। সকাল হতে না হতেই তাঁরা টেনিস খেলার প্র্যাক্‌টিস্ করেন। আর জোটে যত তরুণ-তরুণীর দল টেনিস কোর্টের চারপাশে। স্কার্ট-পরা মেয়েগুলো—সিন্ধী পাঞ্জাবীই বেশী—সব টেনিস খেলা শিখতে চায়। হতে চায় তারা টেনিস তারকা। খেলার চেয়ে তাদের নজর বেশী আপ-টু-ডেট টেনিস পোষাকে! আমার ঘরের সামনেই চলে ওদের খেলা।

জানলা দিয়েই দেখা যায়। খেলার নামে লীলায়িত দেহের প্রদর্শনী যেন! মন্দ লাগে না।

ব্রেকফাষ্টের ঘণ্টা পড়ে সাড়ে আটটার সময়, কিন্তু বেলা দশটা পর্য্যন্ত ব্রেকফাষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং তাড়া নেই। সকালে বেয়ারা চা দিয়ে গেছে,—ছোটা হাজরী। ধীরে-সুস্থে তৈরী হয়ে ব্রেকফাষ্টে গেলেই হবে। হোটেল ভরা যা লোক, একটু দেরিতে যাওয়াই ভালো। এক পত্তন লোকের খাওয়া হয়ে যাক্—নয়ত জায়গাই পাবো না বসবার।

তৈরী হয়ে যখন বার হলাম ঘর থেকে, তখন ন'টা বেজে গেছে। বেশ রোদ উঠেছে। সখের খেলোয়াড়রা সব ভেগেছেন। কেবল নেহাতই ছেলে-ছোকরা দু'চারজন ভালো খেলোয়াড় হবার লোভ সামলাতে না পেরে রোদের মধ্যে ঘামছে আর খেলছে।

ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখি তখনো বেশ ভীড়। বসবার জায়গা আছে দু'একটা টেবিলে, কিন্তু সব অচেনাদের মধ্যে গিয়ে বসা যায় না। একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কোথাও বসা যায় কি না। ওয়েটার এসে জিজ্ঞাসা করল আমার রুম নাম্বার। তাকে বললাম একটা আলাদা নিরিবিলি জায়গা ঠিক করে দিতে। সে বলল, আমার কোন ফ্রেণ্ডস থাকলে তাঁদের সঙ্গে বসলেই সবচেয়ে সুবিধে। বললাম—'আই এ্যাম এ নিউ-কামার। আই ওয়াণ্ট টু হ্যাভ মাই মীলস্ এ্যালোন।'

সে জায়গা খুঁজতে গেল। ওয়েটারটি গোয়ানিজ। ডাইনিং রুমটি বেশ বড়। দূরে দেখলাম, একটি সুন্দরী চেনা মহিলা তাঁর দু'টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেতে বসেছেন। তাঁদের টেবিলে একটি জায়গা খালি আছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল বছর খানেক আগে। মেয়েটি বোধ হয় মুসুরীতেই কোন স্কুলে পড়ে, ছেলেটি আমাদের স্কুলে পড়ে। গরমের সময় গত বছরেও উনি মুসুরীতে এসেছিলেন, সেই সময়ই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। বড় লোক ওঁরা, কি জানি ওঁর হয়ত মনে নেই—সেইজন্য ওদিকে না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ওয়েটারের অপেক্ষায়। কিন্তু এক্ষেত্রে হ'ল অন্য রকম। ভদ্রমহিলা একটি ওয়েটারকে ডেকে আমাকে দেখিয়ে কি যেন বললেন দেখলাম। ওয়েটারটি আমাকে এসে বলল,—'স্যর, মিসেস্ সোনী বললেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আপনি ওঁদের টেবিলে বসে খেতে পারেন। ওখানে ওঁরা মাত্র তিন জন; আর একজনের বসবার জায়গা আছে।"—এরপর ওঁদের টেবিলে না যাওয়া অভদ্রতা এবং না খাওয়ার ত কোন কারণ নেই। আমি সোজা ওঁদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। মিসেস্ সোনী আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—'আসুন, আমাদের টেবিলে জায়গা আছে,—এখানেই বসে খাবেন আমাদের সঙ্গে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ার টেনে বসলাম। কাছাকাছি যারা বসে খাচ্ছিলেন, তাঁরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন—অর্থাৎ কে এই ভাগ্যবান পুরুষ!

নানা রকম কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। হোটেলের নোটিশ-বোর্ডে ও লাউঞ্জে আগে থেকেই আমার প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন লাগান ছিল। সুতরাং হোটেলের সবাই জানে যে এখানে আমার প্রদর্শনী হবে। মিসেস সোনী সেই কথাই বললেন—'এখানে এসে অবধি শুনছি আপনি আসবেন, আজকে আমার ছেলের মুখে শুনলাম আপনি এসেছেন। খুঁজছিলাম আপনাকে খাবার ঘরে, না দেখতে পেয়ে ভাবছিলাম অন্য কোথাও উঠেছেন বুঝিবা"—

বললাম—"না, এই হোটেলেই উঠেছি, তবে ঘরটা বড় বেখাপ্পা জায়গায়। সকাল হতে না হতেই টেনিস খেলোয়াড়দের জ্বালায় অস্থির!'

—টেনিস কোর্টের ধারে আপনার ঘর বুঝি?

—হ্যাঁ, সামনে টেনিস—ধরের অন্যধারে স্কোয়াশ কোর্ট। তবু ভালো যে তাঁবুতে উঠতে হয় নি। এবারে মুসুরীতে বেশ ভীড়।

—আপনার প্রদর্শনীর পক্ষে ভালো। অনেকে দেখতে পাবে আপনার ছবি।

—শুধু দেখেই যাবে?

—বিক্রীও হবে নিশ্চয়— যদি বিক্রী করেন!

ছেলেমেয়ে দু'জনেই চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিল। এতক্ষণে মিসেস সোনী বললেন—'আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেই—এটি আমার মেয়ে, আমার ছেলের মতো একেবারেই না'—

বললাম—'অর্থাৎ—?'

মিসেস সোনী কিছু বলার আগেই মেয়েটি বলল —'অর্থাৎ আমি ছবি আঁকতে পারি না, গান গাইতে পারি না, পারি কেবল টেক্সট বই পড়তে; সেলাইও জানি না'—

মিসেস সোনী হেসে বললেন—'না না, ও বেশ সেলাই জানে, রাঁধতেও জানে'—

ওয়েটার অপেক্ষা করছিল। ডিম পোচ খাওয়া হয়ে গেছে। মাছভাজা নিয়ে এসেছে এবারে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র! যা পাওনা তার চেয়ে বেশী পায়। যা কিছু রান্না হয় হোটেলে, সবই মিসেস সোনীকে দেখান হয়। সেই সঙ্গে টেবিলের অন্যদেরও জুটে যায়। কথায়-বার্তায় জানলাম যে মিঃ সোনীর ছুটি নেই, তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে মিসেস সোনী অন্ধ্রে ফিরে যাবেন। সেদিন ব্রেকফাষ্ট হয়ে যাবার পরও টেবিলে বসে অনেকক্ষণ গল্প হ'ল। প্রদর্শনী আরম্ভ হবার আগেই উনি ছবি দেখতে চান। কথা দিলাম, আগেই দেখাব। তারপর চলে আসবার সময় বললেন—'দেড়টার সময় লাঞ্চ খেতে আসি আমি; ঐ সময় যদি আপনিও আসেন, তবে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।' তারপর হেসে বললেন— 'কোনদিন যদি অন্য ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে খেতে ইচ্ছা হয় ত খাবেন, কোন বাধাবাধি নেই'—

হেসে জবাব দিলাম—'আশ্চর্য এই যে, আপনারা ছাড়া এখনো একজনও আলাপী কাউকে দেখতে পাচ্ছি না এখানে —ধন্যবাদ, দেড়টার সময় দেখা হবে।'

চেনা কেউ নেই বলে ত ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলাম—লাউঞ্জে এসে দেখি জ্ঞান সিং পরিবার বসে আছেন সেখানে। মিস সিং আমার কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসত! মেয়েটির বাবা, মা, ভাই ও ছোট্ট বোন—সবাই বসে আছেন পিয়ানোর পাশে। দেখতে দেখতে দু'চারটে ডুন স্কুলের ছেলেরও আবির্ভাব হ'ল। তারাও সাভয় হোটেলে আছে। তাদের কাছে খবর পেলাম, তিখি খান্নাও (ডুন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র) না কি এই হোটেলেই আছে। ওর মা ও দিদিমা বারলোগঞ্জে আছেন। তিখি রোজ বারলোগঞ্জ থেকে সকালে এসে সারাদিন খেলাধুলো ও আড্ডা দিয়ে বিকেলে ফিরে যায়। জ্ঞান সিং পরিবারের সঙ্গে দেরাদুনে থাকতেই আমার বেশ আলাপ হয়েছিল। তারা সবাই হৈ চৈ করে আমায় ধরল—'কবে এসেছ? ক'দিন থাকবে? প্রদর্শনী কবে থেকে?' আরো কত রকম প্রশ্ন। মিস্ সিং ফস করে বলল—'ব্রেকফাষ্ট খাচ্ছিলেন যখন, তখন দেখেছি আপনাকে, আমাদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় ছিল না তখন আপনার'—

বললাম—'অর্থাৎ'—

সে হেসে তার মায়ের গায়ে ঢলে পড়ে বলল—"সত্যি না মা?"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কি সত্যি?'

এবারে মিসেস জ্ঞান সিং বললেন—'সত্যিই ত, শীলা সোনী বেশ সুন্দরী। এ হোটেলে ওঁর মতো সুন্দরী বোধ হয় কেউ নেই। বয়স হলে কি হবে, এখনো কি সুন্দর চেহারা রেখেছে'—

বুঝলাম এতক্ষণে যে, মিসেস্ সোনীর সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট খাওয়াটা সমস্ত হোটেল শুদ্ধ লোক নোটিশ করেছে। এবং প্রথম দিনই আমি শিল্পী বলে না হোক—মিসেস সোনীর এক টেবিলে খানা-খাইয়ে বলে বিখ্যাত হয়ে পড়েছি। তা হোক। এতে লজ্জা করলে চলবে কেন? বললাম ওঁদের কথায় সায় দিয়ে—'হ্যাঁ সত্যি, মিসেস সোনী বেশ সুন্দরী। মনেই হয় না যে ওঁর অত বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে'—

ডুন স্কুলের একটি ছেলে—গুলষণ পিয়ানোতে বসে কি বাজাবার চেষ্টা করতেই মিস্ সিং লাফিয়ে উঠলেন। আমাকে বললেন—'আপনি একটা গান করুন না'—কথাটা পড়তে পেল না। গুলষণ চেয়ার ছেড়ে বলে উঠল— 'কাম অন স্যর!' সবাই ঠেলে আমাকে বসিয়ে দিল পিয়ানোতে। পিয়ানো বাজানো অভ্যেস নেই। অর্গ্যানের মত করে বাজাতে লাগলাম। নাচানো সুরের গান— 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা'—খানিক বাজিয়ে গান ধরলাম। বেশ জোরে গানটা ধরেছিলাম। গান শেষ করে দেখি লাউঞ্জ একেবারে ভরে গেছে লোকে। আমার পিছনে হোটেলের অনেক ছেলেমেয়ের দল ভীড় করেছে। থামতেই সবাই বলে উঠল—'ওয়ান মোর।' ব্রেকফাষ্টের পর

সেখানেই প্রায় বেলা বারোটা পর্যন্ত কেটে গেল গান গেয়ে, সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোরাস্ জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'—'একলা চলরে'—সবই হ'ল।

আগেও মুসুরীতে এসে প্রদর্শনী করেছি, কিন্তু এবারে যেন প্রথম দিনেই একটু বেশী মাখামাখি করে ফেললাম। শেষটায় তাল সামলাতে পারলে হয়! উঠে চলে আসছিলাম, কিন্তু গুলবণ ও মিসেস জ্ঞান সিং কিছুতেই ছাড়ছিল না। ঠিক সেই সময় নজরে পড়ল মিসেস শীলা সোনী তাঁর মেয়েকে নিয়ে লাউঞ্জের পাশ দিয়ে আমার দিকে তাঁর বড় বড় চোখ দিয়ে প্রখর দৃষ্টি হেনে চলে গেলেন। ব্যাপার কিছুই নয়, কিন্তু একটু অপ্রস্তুত লাগল যেন! কাজ আছে অজুহাত দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলাম, ঘরে গিয়েই বা করব কি? সাভয় হোটেলের ভেতরেই প্রকাণ্ড একটা প্রাঙ্গণ আছে। সেই প্রাঙ্গণের মধ্যে দু'টি অতি প্রাচীন ফার পাইন গাছ, তার তলায় বসবার জায়গা আছে। সেখানে গিয়ে বসলাম। প্রাঙ্গণ পার হয়ে যাবার সময় মিসেস জ্ঞান সিং আমাকে একলা বসে থাকতে দেখে বললেন চেঁচিয়ে—'কাজ আছে বলে চলে এসে এই বুঝি কাজ হচ্ছে?'

আবার অপ্রস্তুত হলাম। হেসে বললাম, হ্যাঁ, এও একটা কাজই—কাজ নয়? কেমন বসে বসে ভাবছিলাম।

মিসেস জ্ঞান সিং কাছে এসে গলাটা খাটো করে বললেন—'কি ভাবছিলেন বসে একলা একলা? কার কথা?'

তাঁর কথায় মনটা বিগড়ে গেল। ভাবলাম, সকালে মিসেস শীলা সোনীর সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট খাওয়াটা দেখছি এঁরা কিছুতেই ভুলবেন না! অথচ মিসেস জ্ঞান সিং ও সব ভেবে বলেন নি হয়ত কথাটা। উনি আমায় একলা বসে থাকতে দেখে হয়ত একটু সমবেদনা জানাতে চেয়েছিলেন। আমাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বললেন, 'ডিড্ আই হার্ট ইউ? একটু বসব এখানে? সত্যি, বেশ জায়গাটা! কি বড় গাছ দুটো!'

বললাম—'নিশ্চয় বসবেন! বসুন না!'

উনি পাশে এসে বসলেন। বললেন—'লাউঞ্জ থেকে তুমি চলে আসবার পর অনেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল; ওদের সবাইএর তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে'—একটু থেমে আবার বললেন—'অনেকদিন আগেই একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হয়েছিল, তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করি নি—'

বললাম—'কি কথা?'

বললেন, 'তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন? তোমার মধ্যে গুণের ত অভাব নেই। যে সব গুণে মেয়েদের মন ভোলে সবই ত তোমার আছে। তবে একজনকে বেছে নিলেই তো তোমার এই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হ'ত না।'

হাসি পেল। বললাম—'যদিও এ বিষয়ে তর্ক করা যেতে পারে—তবুও স্বীকার করে নিলাম, মন ভোলানোর সব গুণ আমার আছে, তবে ভুলে যাবেন না যে আমি ঠিক নিঃসঙ্গ নই—আমার মা আছেন, মেয়ে আছে, তারা দেরাদুনে আমার কাছেই থাকেন।'

মিসেস সিং স্মিত হাসি হেসে বললেন—'মা ত তাঁর অন্য ছেলেমেয়েদেরও মা, তোমার একলার নয়; —আর মেয়ে—সেও ত একটু বড় হলেই অন্যের হয়ে যাবে।'

বললাম—'তা বটে। তবে আমার ছবি আছে, রং আছে, তুলি আছে, মাটি, হাতুড়ি বাটালি—আরো অনেক কিছু আছে আমার সঙ্গী, ভাববেন না আমার জন্য—'

মিসেস সিং বললেন—'ভাবছি না, হঠাৎ মনে হ'ল তাই বললাম। কিছু মনে করো না,···তোমার জীবন তুমিই ভালো বুঝবে,···তোমার নিজের ভালোমন্দ আমরা বাইরে থেকে আর কতটা বুঝতে পারব!"

এক জাতের মেয়েদের পুরুষদের জন্য চিরন্তন এই সমবেদনা। 'আহা!' 'বেচারী' করেই অস্থির! এঁরা মায়ের জাত। মিসেস সিং সেই জাতের। তাঁর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বড় দু'টি ছেলে এখন কলেজে পড়ে। তাঁর স্বামী আরমির দাক্তার। তাঁর নিজের ও নিজের পরিবারের ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই,—তার ওপর আমার জন্যও তাঁর চিন্তা। সমবেদনা পেলে কে না খুশী হয়। মিসেস সিংএর আমার প্রাইভেট লাইফের ওপর এই এনক্রোচমেণ্টে রাগ করলাম না। কথাটা ঘুরিয়ে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—'কতদিন আর থাকবেন মুসুরীতে? আমার প্রদর্শনী পর্যন্ত থাকবেন ত?'

—'কি করি, থাকবার ত ইচ্ছে ছিল, কিন্তু স্বামীর ছুটি নেই। আমাদের আবার বদলী করে দিয়েছে রাঁচীতে। আর তিন দিন আছি। তারপর দেরাদুন গিয়ে জিনিষপত্র প্যাক করা, ...আবার কবে দেখা হবে কে জানে ?'

—'দেখা হবে বৈ কি ! ছোট্ট পৃথিবী, দেখা না হওয়াই আশ্চর্যের।'

—'তা বটে। আচ্ছা চলি। সবাই বোধ হয় আমার জন্ত অপেক্ষা করছে...আবার দেখা হবে'...

মিসেস সিং 'বাই বাই' করে চলে গেলেন। আমি নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। তৈরী হয়ে যখন লাঞ্চ খেতে বার হলাম—দেড়টা বেজে গেছে।

খাবার টেবিলে সবাই খেতে বসে গিয়েছে। আমারই দেরি হয়েছিল সেদিন। মিসেস সোনী ওয়েটারকে বলছিলেন, স্যুপ আনতে। পোলাও, কারী আছে। মাছ, মাংস—দুইই আছে। বিলিতি খাবারও আছে। ওয়েটার জিজ্ঞেস করল—'বিলিতি খাবার চাই, না দিশী ?' মিসেস সোনী বললেন—'যা অচ্ছা হ্যায়, ওই চীজ লানা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইউ আর লেট !' খুব মজলিশ জমিয়েছিলে। ইউ আর র‍্যাদার কুইট ইন মেকিং ফ্রেণ্ডস্।'

হেসে জবাব দিলাম—'অল অব দেম আর ওল্ড অ্যাকোয়েনটেন্স্।'

—'সকালে যে বললে, ইউ হ্যাভ নো ফ্রেণ্ড হিয়ার ?'

—'ডিসকভার দেম আফটার ব্রেকফাষ্ট ওনলি।'

—'দেন ইউ ডোণ্ট রিকয়ার নিউ ফ্রেণ্ডস্, পারহ্যাপস ?'

—আই হ্যাভ ফ্যাসিনেশান ফর নিউ ফেণ্ডস, নিউ থিংস, নিউ প্লেস'—

—'ও আই সি'—মিসেস সোনী হাসলেন। বললেন—'বেশ ভালো হ'ল—আপনি আমাদের টেবিলে বসে খাচ্ছেন। আমাকে অন্তরা কেউ তাদের সঙ্গে খেতে ডাকবে না সহজে। আর যদি ডাকেও, আপনাকেও ডাকতে হবে সঙ্গে।'

বললাম—'সে কি কথা ! আপনাকে যদি কেউ খেতে ডাকে তবে আমার জন্ত ভাববেন না। আমি একলা খেতে অভ্যস্ত।'

মিসেস সোনী বললেন—'না, না। আমি ওসব উড়ন্তি লাঞ্চ ডিনার অ্যাভয়েড করতে চাই। আমার ভালো লাগে না।'

বললাম—'আমাকে যদি খেতে ডাকে, আমি কি করব বলুন ত ? বলব, মিসেস সোনীকে না বললে আমি যাব না,—কি বলেন ?'

মিসেস সোনী ও তাঁর ছেলেমেয়ে সবাই হেসে উঠল।

মিসেস সোনী বললেন—'তা কেন ? আপনি কেন যাবেন না ? আমাকে ত আর একলা বসে খেতে হবে না। আমার ছেলেমেয়ে সঙ্গে আছে। আপনি যে একেবারে একলা বসে খাবেন আমরা না থাকলে।'

—'তাতে কি ! দু' একদিন ও রকম একলা খেতে দোষ কি ? বেশ ত খেতে খেতে নানান রকম নতুন নতুন লোকদের মুখ ষ্টাডি করা যাবে।'

মিসেস সোনী বললেন—তা নয়, আপনি থাকাতে আমার একটা প্রোটেকশন্ হয়েছে। অনেক নাছোড়বান্দা আছেন, যাঁরা ডিনারে ডাকেন মাঝে মাঝে, কিছুতেই ছাড়েন না। আপনি থাকলে সেসব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে যাওয়া চলে"—বলতে বলতেই একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের টেবিলে এসে মিসেস সোনীকে বললেন—'পরশু তা হ'লে আপনি ডিনারে আসছেন 'হ্যাক্‌ম্যানস'এ।"

'হ্যাকম্যানস্ একটি বিখ্যাত হোটেল। সেখানে বল-নাচ গান হয় সন্ধ্যে থেকেই। তারপর ভদ্রলোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আই হোপ ইউ উইল অলসো কাম।'

আমি বললাম—'না না, আমার কাজ থাকতে পারে পরশু দিন, আমি বোধ হয় থাকব না। থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ।"

মিসেস সোনী বললেন—'তবে আমিও যাব না। ইউ মাষ্ট কাম উইথ আস।'

—'সে দেখা যাবে পরে।'

ভদ্রলোকটি হেসে বললেন,-'প্লিজ ডোণ্ট ডিস্যাপয়েন্ট মি। লেট মি নো বাই টুমরো।' আর একবার সোনীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—'আই উইল বি অনার্ড প্লিজ ডু কাম'—

ভদ্রলোক ত চলে গেলেন। মিসেস সোনী বললেন—'লোকটি ছিনে জোঁক। খুব টাকা আছে লোকটার। কিন্তু লোকটা সুবিধের নয়।

ভদ্রলোকের ধরন-ধারণ আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগে নি। মিসেস সোনী কেন যে এর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে চাচ্ছেন না একলা বুঝতে পারি, কিন্তু 'না' করে দিতেও দেখি ইচ্ছে নেই। আমাকেও মিছি মিছি জড়াচ্ছেন কেন তাই ভাবছিলাম। চুপ করেই রইলাম। মিসেস সোনী ভাবলেন আমি ডিনারে যেতে রাজী হয়ে গিয়েছি। মনে মনে আমি ঠিক করেই ফেলেছিলাম যে,

বললাম নির্লিপ্তভাবে—'বেশ ত, কালকে ব্রেকফাস্টের পর আপনাকে দেখাব ছবি।'

—'আজকে বিকেলে কি করছেন?'

'আজকে বিকেলে ভাবছি ডাক্তার অমরনাথ ঝা'র সঙ্গে দেখা করতে যাব। উনিই ত প্রদর্শনী খুলবেন ঠিক আছে।

—'ফিরবেন কখন? ডিনার খাবেন ত হোটেলে?'

—'কোথায় আর খাব। হোটেলেই আসব ফিরে—'

বিলিয়ার্ড খেলা

লাঞ্চের পর নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করব ঠিক করে

গগরি ভরনে

এদের সঙ্গে ল্যাজ হয়ে ডিনারে যাব না। কিছুতেই নয়! কালকে একটা রিগ্রেট করে চিঠি ঐ ভদ্রলোকের নামে হোটেলের অফিসে দিয়ে, পৌছে দিতে বলে বেরিয়ে যাব—তা হ'লেই হবে।

মিসেস সোনী বললেন—'ছবিগুলো আনপ্যাক করা হয়েছে কি?'

বললাম—'আনপ্যাক করা কিছু শক্ত নয়। বাক্সর ডালা খুললেই আনপ্যাক হবে।'

—'তা হ'লে আজকে কিংবা কালকে দেখতে পারি ছবিগুলো? আমার কয়েকটা ছবি কেনবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে।

রওনা দিলাম ডাইনিং রুম থেকে। কিন্তু রুম থেকে বেরিয়ে দেখি লাউঞ্জের পাশের ঘরটায়—যেখানে বিলিয়ার্ড খেলা হয়—সেখানে বিলিয়ার্ড খেলা চলছে। বিলিয়ার্ডে আমার খুব সখ ছিল। গোয়ালিয়র থাকতে খেলতাম মাঝে মাঝে। ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখি দুন স্কুলের কয়েকটি ছেলে জুটেছে সেখানে। তিষি খান্নাও রয়েছে—ওরাই খেলছে। আমাকে দেখে হৈচৈ করে উঠল। তিষি বলল—'কাম অন স্যার, জয়েন আস, ইউ এণ্ড মি—গোবিন্দ এণ্ড আনন্দ—লেট দ্য টু আদার্স প্লে টুগেদার!'

বিশ্রাম করা চুলোয় গেল। বিলিয়ার্ড খেলায় লেগে

গেলাম।' তিবি খেলতে খেলতে বলল—'আই অ্যাম নো গুড স্যার, আই হোপ ইউ আর বেটার দ্যান মী।'

—ডোণ্ট বদার। লেট আস হ্যাভ সাম ফান। উই ডোন্ট ওয়াণ্ট টু উইন।

আনন্দ ও গোবিন্দ—দু'ভাই ভাল খেলে। তারা হাসল। বেলা চারটে পর্যন্ত খেলা চলল। হোটেলের বেয়ারাকে বলা গেল ওখানেই চা আনতে—ঘরে নিয়ে যাবার দরকার নেই—

হেরে গেলাম আমরা বলাই বাহুল্য। অনেকদিন পর বিলিয়ার্ড খেললাম। এ সব খেলায় অভ্যাস ও রীতিমত সাধনা দরকার, তা না হলে 'শট' ঠিক হয় না, মাঝে মাঝে অবশ্য হাত খুলে যায়। নেশার মত লাগে। একবার খেলতে সুরু করলে সহজে খেলা ফেলে যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু খেলা বন্ধ করে চা খেয়ে রওনা দিলাম। অমরনাথ ঝা'র সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার। উনি থাকেন ভিক রোডে—সারলাভিল হোটেল ছাড়িয়ে। তিবি খানিকদূর আমার সঙ্গ নিল। বলল—বারলোগঞ্জ থেকে তার মা ও বোনের আসবার কথা সন্ধ্যেবেলা। তারপর তারা এক-সঙ্গে বাড়ী ফিরবে।

তিবি খান্নার মা ও বোন

সাভয় হোটেল থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিবি চেঁচিয়ে উঠল ওর মা ও বোন উষাকে দেখে। সালোয়ার কামিজ পরা দু'জনেই। মায়ের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। উষার বয়স বড় জোর আঠারো উনিশ। ভগবান এঁদের স্বাস্থ্য পুরোমাত্রায় দিয়েছেন—সৌন্দর্যের বাচাই না হয় নাই করলাম। স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য তা এঁদের দেখলেই বোঝা যায়। মুখে-চোখে কী উজ্জ্বল দীপ্তি। আমাকে দেখে দুজনেই নমস্কার করলেন। তিবি বলল—'চলুন কিছুক্ষণ বসা যাক। একটু পরেই না হয় যাবেন দাক্তার ঝা'র কাছে।'

বললাম, 'বেশ'। সাভয় হোটেলের ফার পাইনের তলায় গিয়ে বসলাম আমরা।

উষা বার বার আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগল—'প্রদর্শনী হবে কবে থেকে, আজকাল ছবি আঁকছি কি না, ওর অটোগ্রাফ খাতায় কিছু এঁকে দেব কি না, কতদিন থাকব, ওদের বাড়ীতে বেড়াতে যাব কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি—। তিবির মাও একদিন বারলোগঞ্জে তাঁদের বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করলেন। কথা দিলাম যে নিশ্চয়ই যাব।

দাক্তার ঝা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ

সন্ধ্যে হবার আগেই সারলাভিলের রাস্তায় পা চালিয়ে দিলাম। ওঁরাও (তিবির মা ও বোন) কিংসক্রেগের রাস্তায় রওনা হয়ে গেলেন। ওঁদের অনেকটা পথ যেতে হবে—প্রায় মাইল চারেক, অবশ্য সবটাই উতরাই।

দাক্তার ঝা'র সঙ্গে দেখা করে চলে এলাম। তিনি বাড়ী থেকে বের হচ্ছিলেন সেই সময় গিয়ে পড়েছিলাম। কত ছবি এনেছি, কি ধরনের ছবি উনি সব জিজ্ঞেস করে নিলেন। বললেন; কার্ড ছাপা হলে কয়েকখানা যেন বেশী পাঠাই—ওঁর বন্ধুবান্ধব কয়েকজনদের দেবেন। কার্ড ছাপিয়েই এনেছিলাম, বিলি করতে আরম্ভ করি নি। সপ্তাহখানেক আগে বিলি করলেই চলবে। পোষ্টার ছাপিয়ে ফেলতে হবে, মুসৌরীর কাগজে দিতে হবে প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন। দু' তিন দিনের ভেতর এই কাজগুলো করে ফেলতে হবে।

রাত্রে ডিনার টেবিলে

রাত্রে ডাইনিং রুমে খেতে গেলাম। দেরি হয়ে গিয়েছিল। মিসেস সোনী ও তাঁর ছেলে খেতে বসে গিয়েছেন। তাঁর মেয়ে স্কুলে ফিরে গেছে। আবার আগামী শনিবার আসবে। আমি যেতেই বললেন—'আমরা ভাবছিলাম আপনি বোধ হয় আজ আর আসবেন না।'

হেসে বললাম—'কোথায় আর যাই'—

—'ও' আই সি, যাবার জায়গার আবার অভাব। বাট আই স' ইউ উইথ টু প্রেটি লেডী।'

মুসৌরী জায়গাটা এমন যে, রোজ রাস্তায় বের হলে সবার সঙ্গেই প্রায় দেখা হয়ে যায়। একটিমাত্র রাস্তা 'ম্যালরোড'। লাইব্রেরী বাজারের সামনে সবাই জটলা করে। তিবির মা ও বোনের সঙ্গে আমাকে দেখেছেন বুঝলাম। বললাম—'ওঁদের সঙ্গে মাত্র আজকে আলাপ হ'ল। আমাদের এক ছাত্রের মা ও বোন।'

—'মনে হচ্ছিল দে আর ইয়োর ভেরি ওল্ড ফ্রেণ্ডস।'

—'কি রকম?'

—'ডোণ্ট বি সো টচি, আই ওয়াজ জোকিং'—মিসেস সোনী এবার গম্ভীর হয়ে বললেন।

যেতে যেতে কিছুক্ষণ গল্প চলল। হোটেলে কারা কারা আছেন, কারা হাই ষ্টেকে ব্রীজ খেলেন সমস্ত দিন বারান্দায় বসে, কে কত হেরেছেন আজকে। মেয়েরাই বেশী তাস খেলে এ হোটেলে। উনি নিজে তাস খেলা একেবারেই দেখতে পারেন না—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'হ্যাকম্যানস'এ কনে দেখা

ডুন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অনেকেই সেবারে মুসৌরীতে এসে জুটেছিল। আর্মিতে কাজ করে এমন অনেক ডুন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রও ছিল। পুরী বলে একটি শিখ প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে একদিন দেখা। সে আমার ছবির প্রদর্শনী হবে শুনে খুব উৎসাহ দেখাল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পর একটু লজ্জার সঙ্গে বলল যে, সে হ্যাক্‌ম্যান্‌স'এ একটি চায়ের পার্টি দিচ্ছে পরশু দিন। আমার যদি সেদিন কোন দরকারী কাজ না থাকে তবে যেন পার্টিতে যোগ দেই।

বললাম—'শুধু চেহারা দেখে কিছু বলা যায় না। গুণ যা, তা থাকে ভিতরে চাপা, না মিশলে তা কি বোঝা যায়?'

পুরী বলল—'হ্যাঁ গুণ আছে বৈ কি। বেশ ভাল সেতার বাজাতে পারে'—

—'সে ত হ'ল। রাঁধতে পারে ত?'

পুরী জোর দিয়ে বলল—'পাঞ্জাবী মেয়েরা কর্মিষ্ঠা হয়। ডাল রুটি পাকাতে ওস্তাদ সবাই।'

বললাম—'তবে ভাল।'

পুরীর চায়ের পার্টিতে ডুন স্কুলের অনেক ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রেমলাল ও ইজ্জত রায়কে সেখানে আবিষ্কার করলাম। তাঁরাও ডুন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। প্রেমলাল কোন হোটেলে জায়গা না

অধ্যাপক আর্নল্ড বেক

তারপর খানিক থেমে বলল যে, তার ভাবী বধূ সেখানে আসবে। সে আমার কাছে জানতে চায় যে, তার পছন্দ ঠিক হয়েছে কি না। —অদ্ভুত ছেলে! বললাম—'বেশ ছেলে তুমি। তোমার পছন্দটাই সবচেয়ে বড়। আমাদের পছন্দ বা অপছন্দতে কিছু যায়-আসে না।'

পুরী হেসে বলল.—না, না, আপনি আর্টিষ্ট। আপনার চোখে কেমন লাগে জানবার ইচ্ছে'—

পেয়ে 'হোটেল রিভিয়েরা' বলে রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট হোটেলে উঠেছে।

যাই হোক, চায়ের পার্টিতে খুব হৈ চৈ করল সব ছেলেরা। মেয়েদের দলও কম ছিল না সেখানে। কে যে ভাবী বধূ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম পুরীকে। সে আমাকে তার ভাবী বধূর কাছে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিল। দেখতে খুব সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু সুন্দরী হবার চেষ্টার ত্রুটি

করে নি। রং মেখেছে গালে, ঠোঁটে, নখে। পাঞ্জাবী মেয়েরা রং মাখতে ওস্তাদ। হাত তুলে সে সপ্রতিভভাবেই আমায় নমস্কার করল। প্রতি-নমস্কারে বললাম—'আই উইশ ইউ গুড লাক!'

পুরী হেসে বলল—'শুধু গুডলাক উইশ করলে চলবে না। ছবির প্রদর্শনীতে গিয়ে একটা ছবি বাছব।'

মেয়েটি ছবির রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিল না তখন। রাজ্যের গয়না গায়ে, নিকেল করা মুখে, জোর করে হাসি টেনে সবার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছিল। সেখান থেকে আমায় প্রেমলাল এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেল!

মিসেস সোনীর বিরক্তি ও একাধিপত্য

সেদিন রাত্রে হোটেলে যখন খেতে গেলাম, তখন মনে পড়ল মিসেস সোনীরা 'হ্যাকম্যান্‌সে' গেছেন। আমি একলা বসে খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। ভদ্রলোকের নামে চিঠি লিখে হোটেলের পিজেন হোলে রেখে দিয়েছিলাম, পেয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। সুতরাং আমাকে তাঁরা আশা করবেন না।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট খেতে গিয়ে দেখলাম, মিসেস সোনী আগেই এসে খেতে সুরু করেছেন। গম্ভীর তাঁর মুখখানা! আমাকে দেখে ফেটে পড়লেন যেন! সুন্দরী মেয়েরা যখন রাগ করে তখন তাদের মোটেই সুন্দর দেখায় না—এ কথাটা যদি তাদের জানা থাকত তবে তারা নিশ্চয়ই রাগ কম করত। তিনি রাগতভাবে বলতে লাগলেন—আমাকে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন তিনি ভাবেন নি—ইত্যাদি, ইত্যাদি—চুপ করে শুনে গেলাম। তাঁর রাগের কারণ—আমি কেন ডিনারে যাই নি। যাব না যে সেটা অন্ততঃ তাঁকে জানান উচিত ছিল। আমি যে জানিয়েছিলাম, সেটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। রাগটা একটু কমলে ওঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আমি চিঠি লিখে হোটেলের অফিসে দিয়ে গিয়েছিলাম। সে চিঠি ভদ্রলোকের না পাওয়ার কোন কারণ নেই।— 'আচ্ছা, ভদ্রলোককে না হয় চিঠি লিখে জানিয়েছিলে, কিন্তু আমায় কেন জানালে না যে তুমি যাচ্ছ না'—

—'আপনাকে বলতাম দেখা পেলে, কিন্তু দুপুর থেকে নানা কাজে বাইরে ছিলাম—বলবার সময় পেলাম কোথায়?'—

—'বলা উচিত ছিল।'

—'যাকে বলা উচিত ছিল, তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম।'

—'আমাকেও বলা উচিত ছিল, কারণ একলা সেখানে আমি যেতাম না—তোমাকে আগেই জানিয়েছিলাম।'

—'একলা কেন? আপনার ছেলে কি সঙ্গে যায় নি?'

—'না, সে ছেলেমানুষ—ও সব ডিনার পার্টিতে তাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে নিজেও যেতে চায় নি।'

ঝগড়া থামাবার জন্য আমি এইবার স্বীকার করলাম—'আই অ্যাম ভেরি সরি ইনডিড!'—কিন্তু কিছুতেই মনে মনে স্বীকার করলাম না যে, আমার তাঁকে বলা উচিত ছিল। হোটেলে এক টেবিলে খাচ্ছি বলে আমার উপর তিনি অতটা অযথা জুলুম করতে পারেন না। এমনি করে কয়েকদিন কাটল। হোটেলে অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে লাউঞ্জে গানের ইনফরমাল আসর বসত ব্রেকফাষ্টের পর। মিসেস সোনী খানিক বসে চলে যেতেন। পরে খাবার সময় আমায় ঠাট্টা করতেন। বেশ বুঝতাম—অন্য কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশাটা তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। এই হোটেলে আমার উপর তাঁরই একমাত্র আধিপত্য এটাই তিনি দেখাতে চাইতেন। সেদিন লাঞ্চ খেয়ে উঠে চলে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি বললেন—'আজকে তোমার ছবিগুলো দেখব।'

বললাম—'কালকে ছবিগুলো লাউঞ্জে টাঙাব, তখন দেখবেন, কেমন?'

তিনি রাগ করে বললেন—'কতদিন থেকেই ত দেখাবে বলছ—এখনও দেখালে না—কালকে আমার সময় হবে না'—

হেসে বললাম—'O. K, চলুন তা হ'লে আমার ঘরে।' তিনি রাজী হলেন। এই প্রথম তিনি আমার ঘরে এলেন। ছবির বাক্স খুলে সব তাঁকে দেখালাম। চার-পাঁচখানা ছবি তাঁর খুব পছন্দ। অনেকবার সেগুলো নানান জায়গায় রেখে দেখতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ছবিগুলোর দাম কত?'

ছবিগুলোর দাম বললাম। দাম শুনে ভেবেচিন্তে বললেন, 'বেশ, এই ছবিগুলি আমার জন্য রেখ, অন্য

কাউকে বিক্রি ক'রো না,—আমার ড্'চার জন বান্ধবীকেও বলব প্রদর্শনীতে আসতে—তাঁরাও ছবি কিনতে পারেন।'

ছবি দেখতে দেখতে প্রায় চায়ের সময় হয়ে এল। মিসেস সোনীর কাছে কারা এসেছেন, বেয়ারা এসে বলে গেল। তিনি চলে গেলেন। আমি আমার ছবিগুলো গুছিয়ে রাখলাম।

প্রদর্শনীতে ছবি টাঙ্গাম

তিপি খান্না ও প্রেমলাল ড্'জনে মহা উৎসাহে প্রদর্শনীতে ছবি টাঙ্গান সমাধা করল। উষা সেদিন বার্‌লোগঞ্জ থেকে সকালেই এসেছিল। মেয়ে একজন থাকলে ছেলে-ছোকরারা শুধু নয়,—সব বয়সের পুরুষেরাই বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে। উষা খান্না থাকাতে প্রেমলাল, গুলষণ, আনন্দ—সবাই বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রদর্শনীর ঘরটা সাজিয়ে ফেলল। ঘণ্টা ড্য়েকের মধ্যে সব ছবি টাঙ্গান হয়ে গেল। ফুলের টব আনিয়ে চার কোণায় রাখা হ'ল। সোফা চেয়ার লাগিয়ে সব যখন ঠিকমত তৈরী হয়ে গেল, মিসেস সোনী প্রদর্শনী ঘরে এলেন। প্রেমলাল, তিপি ও উষার সঙ্গে তাঁকে আলাপ করিয়ে দিলাম। মিসেস সোনী যে ছবিগুলো পছন্দ করেছিলেন, সেগুলি আবার বিশেষ করে ঘুরে-ফিরে দেখলেন। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম—এই ছবি পছন্দ করার ব্যাপারে তিনি কারুর মতামত গ্রাহ্য করেন না। তিনি নিজের মনকে জানেন খুব ভাল করে। অনেকেই দেখেছি ছবি বাছতে বিপদে পড়েন। ছবি কিনবার ইচ্ছে, অথচ কোন্‌টা কিনবেন কিছুতেই ঠিক করতে পারেন না। আবার অনেকে আছেন, পাছে খারাপ পছন্দ করে বসেন, সেই ভয়ে তাঁরা ছবি কিনতেই ভরসা পান না। একজন কেউ কিনবার সময় সাহায্য না করলে তাঁরা যেন অকূলে পড়েন।

'মোষ্ট অ্যাট্রাক্টিভ লেডী'

মিসেস সোনীর ছবিগুলোর উপর আগে থেকেই 'সোল্ড' বলে লিখে রাখলাম। প্রদর্শনী খুলবে পরের দিন। মনটা নিশ্চিন্ত ছিল। মনে ভয় ছিল না, খরচান্ত করে প্রদর্শনী করব অথচ বিক্রী নেই। মিসেস সোনী আগেই ছবি কিনে বাঁচিয়েছেন সে চিন্তা থেকে। তবে মনে একটা বিষয় অশান্তি বোধ হচ্ছিল যে, মিসেস সোনী ছবি কিনে মনে না করেন, আমাকে কিনে ফেলছেন আমার ছবির সঙ্গে।

মিসেস সোনী চলে গেলেন। উনি চলে গেলে উষা খান্না প্রথমে মুখ খুলল—'ইনিই প্রসিদ্ধ শীলা সোনী!' তিপিদের কাছে গল্প শুনেছে—ইনি সাভয় হোটেলের সবচেয়ে 'এ্যাট্রাক্টিভ লেডী'। কথাটা যে মিথ্যে নয় তা' উষা স্বীকার করল।

মিসেস সোনী ছিপ্‌ছিপে, অথচ রোগা নন। মুখটা লম্বাটে, কিন্তু মানানসই। চোখ ড্টো বড় বড় এবং টানা টানা, অথচ সপ্রতিভ, নেহাৎ গরুর মত নয়। ঠোঁট ড্টো পাতলা, অথচ পাতলাও নয়, গড়ন আছে ঠোঁটের। গলা লম্বা, অথচ বকের মত নয়। বয়স হয়েছে, কিন্তু শরীরের গড়ন ভাঙে নি। উষাকে মেনে নিতেই হ'ল যে, ওঁকে সুন্দরী বললে অত্যুক্তি হয় না। যে ছবিগুলি উনি কিনতে চান, সেগুলি তাদের দেখালাম। তারা ত খুব খুসী হয়ে উঠল। পাঁচখানা ছবি কিনেছেন। প্রেমলাল ত ভুলেই গেল যে, আমি তার শিক্ষক ছিলাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'স্যর, মিসেস সোনী আপনাকে ভালবাসেন।'

বললাম—'ভালবাসেন কি না জানি না, তবে অপছন্দ করেন না। অপছন্দ করলে আমার ছবিও পছন্দ করতেন না, সে আমি জানি।'

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন

প্রদর্শনী ত হ'ল। বহু লোক এসেছিল। ডাক্তার অমরনাথ ঝাকে নিয়ে উষা ছবি দেখাল। ডাক্তার ঝা ড্'খানা ছবি কিনলেন। অচেনা অনেকে আরও কতকগুলি ছবি কিনলেন সেদিন। সত্যিই, এরপর হোটেলের সবাই মেনে নিল যে, আমি শুধু বড় শিল্পী নই, আমি ভাগ্যবান শিল্পী। ছবি বিক্রীও হয় আমার।

রবিবার বিকেলে অনেকেই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। সবাইকে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই সময় মিসেস সোনী এলেন। আমাকে বললেন—তাঁদের ফিরতে আজ দেরি হবে, আমি যদি ইচ্ছে করি আগে খেয়ে নিতে পারি। উষা, তিপি ও তাদের মা ছিলেন সেখানে। উষা বলল—'তবে চল আজ সবাই বার্‌লোগঞ্জে। আমাদের ওখানে খেয়ে রাত্রে বেড়াতে বেড়াতে ফিরে আসবে।'

খুব ক্লান্ত ছিলাম, তবু রাজি হয়ে গেলাম। মিসেস সোনী বললেন—'বারলোগঞ্জে যাবে এখন? সে ত বহুদূর! ফিরবে কখন?'

উষা বলল—'আজকাল চাঁদনী রাত—ভয় নেই—রাত এগারটার মধ্যেই নিশ্চয় পৌঁছে যাবে।'

মিসেস সোনী তাঁর বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে বললেন, 'রাত এগারটা? তা হ'লে তোমার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না?'

উষা মুখরা। সে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে ত ওঁর রোজই দু'বেলা দেখা হয়। এক হোটেলে থাকেন। আজকে না হয় খেলেন আমাদের সঙ্গে একদিন।'

—'নিশ্চয়ই, তবে ভাবছিলাম, অত রাত্রে একলা ফিরবেন'—মিসেস সোনী হেসে বললেন।

উষা তৎক্ষণাৎ বলল, 'প্রেমলাল থাকবে সঙ্গে, কোন ভয় নেই। তা ছাড়া আমরা 'কিংসক্রেগ' পর্যন্ত পৌঁছে দেব নিশ্চয়ই, তারপর আর কতটাই বা'—

মিসেস সোনী আর কিছু বললেন না। 'গুডবাই' বলে চলে গেলেন। উনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই উষার কি হাসি! প্রেমলাল বলল, 'আই উইশ টু বী অ্যান আর্টিষ্ট!'

উষা বলল, 'সব আর্টিষ্টদের সমান ভাগ্য নাও হতে পারে!' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আই পিটি ইউ সুধীরজী! আপনাকে একেবারে মনোপলি করে নিয়েছেন যেন! নিজে যাচ্ছেন মেয়েকে পৌঁছুতে, এই সামান্য সময়ের জন্যও আপনাকে আমাদের সঙ্গে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না! বী কেয়ারফুল সুধীরজী!'

—'ডোন্ট বি সিলি'—হেসে বললাম, আই নো মাইসেলফ্ এণ্ড আই নো হাউ টু লুক আফটার মাইসেলফ্ অ্যাজ ওয়েল।'

এতক্ষণে উষার মা মুখ খুললেন। পাঞ্জাবী ভাষায় যা বললেন তার বাংলা অর্থ হচ্ছে—'উষা তুই বড় ফাজিল হয়ে উঠছিস্!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ী যাবেন ত চলুন শীগগির।' প্রেমলাল ও তিম্বিকে তাড়া দিয়ে নিজেও এগোলেন।

মিসেস খান্নার বয়েস হয়েছে। কিন্তু উৎসাহ আছে। বললেন, 'সুধীরজী, বাঙালী গানা গাইতে হবে আজ। তিম্বির কাছে শুনেছি আপনি গাইতে পারেন।'

পথে চলতে চলতেই গান ধরলাম। তিম্বি বলল—'সুধীরজী, বাঁশী আনেন নি মুসৌরীতে?'

—'হোটেলে আছে। ভুলে গেলাম আনতে। আর একদিন হবে।'

—'মিসেস সোনীর অনুমতি পাবেন ত?' উষা হেসে বলল।

—'ফের ইয়াকি হচ্ছে উষা!' মিসেস খান্না ধমকে উঠলেন।

সমস্ত রাস্তা হাসি, ঠাট্টা, গল্প করতে করতে আমরা বাড়ী পৌঁছলাম।

উষা দিল্লীতে লেডী আরউইনে পড়ে। রান্না শিখেছে কেমন দেখাবার জন্য সে নিজেই রান্নাঘরে ঢুকল। রান্না করাই ছিল। মুলো বাটার পুর-দেওয়া পরোটা তৈরী হ'ল। গরম গরম মন্দ লাগে না খেতে। মুসৌরীতে এসে এই প্রথম প্রাণ খুলে কথা বললাম। সাভয় হোটেলে বড়-লোকের মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। সেদিন রাতে বার্লোগঞ্জে ঘরোয়াভাবে খেয়ে, হৈচৈ করে বেরিয়ে পড়লাম। উষা ও তিম্বি এগিয়ে দিল খানিকটা। তারপর আমি ও প্রেমলাল বাকি পথটা আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। হোটেলে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত এগারটা বেজে গেছে।

'উষার সুধীরজী'

পরদিন ব্রেকফাষ্টের সময় ডাইনিং রুমে মিসেস সোনীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি একলাই বসে ছিলেন। যেতেই বললেন, 'ছেলেটার শরীর ভাল নেই, এখনও তৈরি হয় নি। ওর ব্রেকফাষ্ট ঘরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।' তারপর কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'কালকে কখন ফিরলে?'

—'এগারটায়।'

—'পাঞ্জাবী খানা কেমন লাগল?'

—'বেশ লাগল। আমার অভ্যেস আছে পাঞ্জাবী খানায়।'

—'তোমাকে ওঁরা খুব ভালবাসেন। ঘরের লোকের মত কেমন ডেকে নিয়ে গেলেন!'

—'ওঁরা খুব ভাল লোক।'

পরিজ ঢালতে ঢালতে উনি বললেন, "সুধীরজী' বলে

প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ

ডাকে তোমায় ঐ মেয়েটি। তাই না? কি নাম যেন ওর? উষা, উষা না?"

—হাঁ।

উত্তরে মিসেস সোনী উষার নকল করে মিষ্টি সুরে বললেন, "হাঁন সুধীরজী! তোমার স্ত্রী ত অনেকদিন মারা গেছেন। তুমি আর সকলের মত বিয়ে করলে না কেন বল ত? তুমি কি মনে কর বিয়ে করলে তোমার মৃতা স্ত্রী দুঃখিত হবেন? তা যদি মনে কর তবে তুমি ভুল বুঝেছ! স্ত্রী বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে করলে অন্য কথা! মারা যাবার পর কোন স্ত্রীই বোধ হয় চায় না যে, তার স্বামী একলা, নিঃসঙ্গ, ছন্নছাড়া জীবন যাপন করুক—"

—'আমি কি ছন্নছাড়া জীবন যাপন করছি?'

—'ছন্নছাড়া নয় ত কি? সাভয় হোটেলে একলা বাস করা কোন ইয়ং ম্যানের পক্ষেই সঙ্গত নয়। ছন্নছাড়া হতে দু'দিনও লাগে না এখানে—'

—'প্রথমতঃ আমি ইয়ংম্যান নই। আমার বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হোটেল ছেড়ে কোথায় যাই বলুন?'

—'কোথাও নয়! একটি বড়-ঘর দেখে ভাল মেয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার কর।'

—'কেন হঠাৎ আজকে এই উপদেশ? পদস্খলন হবার কোন সম্ভাবনা হয়েছে বলে মনে হয় না কি?'

—'তোমাকে সবাই ডাকাডাকি করে যেভাবে বাড়ীতে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে, মনে হয়, তা হ'তে আর দেরি নেই।'

—'আপনি আমায় 'বাচ্চা ছেলে' মনে করেন বোধ হয়?,

—'পুরুষরা সব সময়েই বাচ্চা! ছেলেবেলায়ও বাচ্চা' বুড়ো হয়েও বাচ্চা। কিন্তু তুমি কথার উত্তর দাও নাই! তোমার পরলোকগতা স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার জন্যই বিয়ে না করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে?'

—'বেশ ত কেটে যাচ্ছে দিন। আমার মেয়ে আছে, মা আছেন, ছবি আঁকা, মূর্তিগড়া আছে—'

—'মডেল আছে?'

—'হ্যাঁ, মডেলও আছে বৈকি! যারা সীটিং দেয়, তারা আমার কাছে মডেল। দেবেন সীটিং? তবে আপনারও একটি মূর্তি গড়ি!

—'আমার আবার চেহারা, বুড়ী হয়ে গেছি—'

—'কি যে বলেন। শুনবার ইচ্ছে যে আপনি বেশ সুন্দরী—"

—'সুধীরজী। ইউ আর ফ্ল্যাটারিং মি! সত্যিই আমার মডেল হবার ইচ্ছে নেই। মডেল ত সবাই হয়, অনেকেই হয়েছে—অনেকেই হবে। মডেলের আদর ততক্ষণই, যতক্ষণ সে মডেল। তারপর তার আর আদর থাকে না, কারণ শিল্পীর হাতে প্রাণ পায় সে ছবিতে বা মূর্তিতে। সেই ছবি ও মূর্তি আসল মডেলের চেয়ে বড় হয়ে যায়—ও আমার সহ্য হবে না।'

ওয়েটার এসে পরিষ্কার প্লেট নিয়ে অন্য প্লেট রেখে গেল। এগ্ এণ্ড বেকন ও সঙ্গে আলু টমেটো ভাজা। এ একেবারে নকল বিলেত বিশেষ। সকালে এগ্ এণ্ড বেকন ব্রেকফাষ্ট না খেলে জীবনটাই বৃথা! * * *

হাঙ্গেরিয়ান শিল্পী মা ও মেয়ে

ব্রেকফাষ্টের পর আমি প্রদর্শনী-ঘরে, অর্থাৎ লাউঞ্জে গেলাম। দু'চারজন ভদ্রমহিলা ছবি দেখতে এসে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান মা ও মেয়ে শিল্পী 'ব্রুনার' রাও রয়েছেন। সাস্ ব্রুনার—মাতা, এলিজাবেথ ব্রুনার কন্যা। এই ব্রুনারদের সঙ্গে আমার বহুকাল আগের আলাপ। প্রথম যখন তাঁরা ভারতবর্ষে আসেন—সে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা, তাঁদের দেখেছিলাম শান্তি-নিকেতনে। তখন আমি ছাত্র। খুব সাদাসিদে পোষাকে ওখানে এখানে স্কেচ করে বেড়াতেন। শুনেছিলাম তাঁরা সন্ন্যাসী-গোছের, নিরামিষ খান। তারপর ভারতের বহু জায়গায় তাঁরা ঘুরে ঘুরে অনেকের পোর্ট্রেট আঁকেন। এঁদের বোধ হয় টাকার অভাব নেই। সব সময় বড় হোটেলেই থাকেন এঁরা। সাভয় হোটেলেই আছেন এখানে।

আরেকটি বিদেশী মহিলা শিল্পীর সঙ্গে দেখা হল প্রদর্শনীর ঘরে। তিনি হচ্ছেন মাদাম ভেলাতিনী। বুড়ী শিল্পী মূর্তি গড়েন, পোর্ট্রেট আঁকেন। বড়লোক ও রাজা-রাজড়াদের কাছে অতিথি হয়ে থাকেন সর্বদা। * *

পাঞ্জাবীতে ভরা মুসূরী

এ বছর মুসূরীতে কি ভীড়। পাঞ্জাবীতে ভরে গেছে পার্টিশনের জন্য বহু বড়লোক পাঞ্জাবীরা দেরাদুনে এবং

গেছে। মুসৌরীতে সেই কারণেই ভীড়। বড়লোক ভিটে ছাড়া হয়ে সম্পত্তি যতটা পেয়েছে নিয়ে চলে এসেছে। গরীবরা আছে পথে-ঘাটে, রেফিউজি ক্যাম্পে। বড়-

নন্দলাল বসু ও লেখক

লোকেরা হাওয়া খাচ্ছেন মুসৌরীতে,—মনে একটা বেপরোয়া ভাব। সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে রঙিন সিল্কের শাড়িতে বা সালোয়ারে কামিজে সাজগোজ করে চোখে-মুখে রং লাগিয়ে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় ম্যাল রোডে। পুরুষেরা বিলিতি আপ-টু-ডেট স্যুট পরে ঘোরেন স্মার্ট হয়ে। কে বলবে এরা ভুগেছে বা দেশছাড়া হয়ে এসেছে। মুসৌরীতে রাস্তায় রাস্তায় ছোলাভাজা, আলুর দম আর চাটভাজা চলছে। ছেলেমেয়ের দল রাস্তায় ভীড় করে দাঁড়িয়েছে সেই সব দোকানের আশেপাশে, মুখ চলছে, লিপস্টিক

লাগানো লাল লাল ঠোঁট নড়ছে, খাচ্ছেন তাঁরা শব্দ করে 'চাট্'। লজ্জা-শরম এদের এমনিতেই একটু কম, দেশ-ছাড়া হয়ে সেটা একেবারেই ঘুচেছে।

বিদায়বেলা : জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ

মিসেস সোনী ফিরে যাবেন। তাঁকে 'সী অফ' করতে লাইব্রেরীতে গিয়েছি। প্রকাণ্ড ট্যাক্সিতে জিনিষ-পত্র উঠিয়েছেন। ওঁর বন্ধুবান্ধব অনেকেই এসেছেন। মিসেস সোনী ট্যাক্সিতে উঠবেন এবার। ছেলে উঠে গেছে আগেই। সবার সঙ্গে বিদায় নেবার পর আমার দিকে ফিরে তাকালেন। নমস্কার করলাম। তিনি প্রতি-নমস্কার করলেন না। আমার ডান হাতখানা ধরে বললেন, "সুধীরজী, আমাকে ভুলে যেতে তোমার সময় লাগবে না; বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ভুলেই যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ফিরে গিয়ে তোমার কথা সর্বদা স্মরণ করব জেন। নির্জন ঘরে আমার একটি বীণা সঙ্গী। এবারে গিয়ে সে ঘরে টাঙাব তোমার ছবি। এবারে চলি—তাড়াতাড়ি তিনি মোটরে ঢুকে পড়লেন। বৃষ্টি সুরু হয়েছে। কাঁচটা তুলে দিলেন। চোখটাও যেন ছলছলিয়ে এসেছে। গেট খুলে গেছে। হুইশিল বেজে উঠতেই মোটরটা চোখের সামনে থেকে নীচে পাহাড়ের পথে নামতে লাগল। এক নিমেষে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হ'ল!

বারলোগঞ্জে : একটি দুপুর

পরের দিন সকালে প্রেমলাল ও তিবি এসে হাজির। তিবি বলল, 'আজকে ব্রেকফাষ্ট করে বারলোগঞ্জে যেতে হবে, সেখানে 'ডে স্পেণ্ড' করতে। উষার নিমন্ত্রণ।'

প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে। কাজ ফুরিয়েছে। মিসেস সোনীও চলে গেছেন। বললাম, 'যেতে কোন বাধা নেই। পুরো ছুটি!'

—'একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতা।' তিবি বলল।

ব্রেকফাষ্টের পর ঝোলার মধ্যে ক্যামেরা, স্কেচ বই, বাঁশী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বারলোগঞ্জের পথে দু'টি তরুণের সঙ্গে।

পৌঁছলাম বেলা এগারটায়। উষা খুব খুশী! চোখে মুখে তার খুশী উপচে পড়ছে যেন!

দুন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র প্রেমলাল ও তিবি ক্রিকেট খেলায় ওস্তাদ। ওরা খেলা সুরু করে দিল। উষাও খেলে। ভালই খেলে সে। আমিও ব্যাট ধরলাম। উষা এক বলেই আউট করে দিল আমাকে! কি হাসি সবার! উষার কয়েকজন বান্ধবী এসেছিল। তারা বলল, বাঁশীর পরে গান গাইতে হবে। রাজী! কি গান? 'টেগোরকা গানা'। 'আধেকু ঘুমে নয়নু চুমে'—অবাঙালীর মুখে বিকৃত বাংলা। শুনে হাসি পেল। গাইলাম গানটা। তারা খুব খুশী। বেলা দুটোর খাওয়া। পোলাও, পরোটা, ডিমের ডালনা, মাংস! উড়ত কা ডালও আছে। কাঁচা মুলো, পিঁয়াজ, টমেটো, কিছুরই অভাব নেই। ভৈষা ঘি, দুধ, লাস্যি! বাঙালীদের মত ভাজাভুজির ধার ধারে না এরা।

খাওয়ার পর গাছের তলায় ক্যারাম। কিছুক্ষণ পর তিবি, উষার মা এলেন গল্পে যোগ দিতে। উষাকে এক-খানা ছবি দেব শুনে খুব খুশী! তৎক্ষণাৎ বললেন, 'উষা, ছবি নিচ্ছিস, তুই কি দিবি?'

—'সুধীরজীর যা ইচ্ছে তাই দেব! হাঁন সুধীরজী, কি চাই তোমার? রুমাল, না পুলওভার? নিজের হাতে সেলাই করে বা বুনে দেব।'

উষার মা এবারে বললেন—'আচ্ছা তুই রুমাল করে দিস, আমি না হয় সোয়েটার বুনে দেব।'

পেন্সিল এল। রুমালে কি ডিজাইন হবে? আঁক! আঁকলাম নিজের নামের সীল। কি রঙ হবে সোয়েটারের? লাইট গ্রে। বেশ, লাইট গ্রে, বেশ রং। সুধীরজী ইজ নো মোর এ ইয়ং ম্যান।

—ক্যামেরা এনেছেন? তুলুন ছবি। আবার হৈ-চৈ। গাছের তলায় এমনি ইমফরমাল ছবি তুলতে হবে। হ'ল ছবি তোলা!

—'চারটে বাজে প্রায়। ঘুম পাচ্ছে। উষাজী, একটু চায়ের ব্যবস্থা হোক। না, কফি হোক'—প্রেমলাল বলল।

চা কফির পালা শেষ হতেই বাড়ীতে তালা লাগিয়ে সবাই রওনা হলাম মুসৌরীর দিকে। বিকেলে ম্যাল রোডের রওনক না দেখলে মুসৌরীতে আসাই বৃথা!

সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চলতে চলতে উষা একেবারে কাছে এসে বলল, "দিল্ টুট গয়া, লীলা সোনী চলি গৈ"—কি উত্তর দেব? চুপ করেই রইলাম।

এরপর দু'দিন মাত্র ছিলাম মুসৌরীতে। হঠাৎ একদিন জিনিষপত্র ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দেরাদুন ফিরে এলাম।

দেরাদুনে তখন নেমেছে ঘনঘোর বর্ষা!
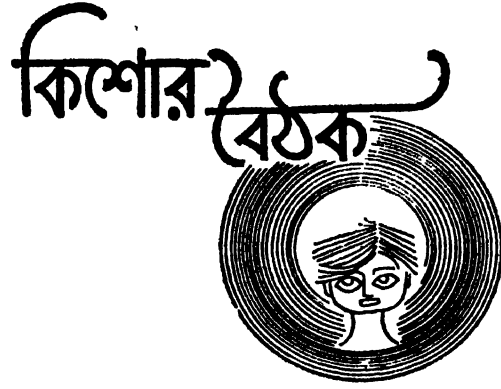
দাদাজী

ভূগোলের গোল

সুকোমল বসু

সত্যি ক'রেই গোল রয়েছে—ভূ-গোলেতে ভাই—
এই জীবনেই বারে বারে বুঝেছিলাম তাই।
ভূগোলেতে গোল্লা পেলুম, বাবা বললেন—'ছিঃ—
গোল্লা পেলি ?—কিচ্ছুই কি লিখতে পারিস নি ?'
আমি বললুম—'খুব লিখেছি—মাষ্টার মশা'র খেয়াল
পাতার পরে পাতা লিখেও তাই হ'ল এ হাল !
প্রশ্ন ছিল : গঙ্গা নদীর উৎপত্তি কোথায় ?
লিখেছিলাম—ঝাঁকড়া-জটা শিবঠাকুরের মাথায়।
তাই শুধু নয়—গঙ্গা-নামার সমস্ত গল্পটা
লিখতে আমার লেগেছিল একটি খাতা মোটা !
হিমালয়ের বর্ণনাতে—দেবলোকের কথা
বৃত্রাসুরের আক্রমণ আর দেবতাদের ব্যথা—
'পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের ব্যবস্থা'র উত্তরে
পলতা এবং টালার কথা লিখেছি প্রাণ ভরে
পাতার পরে পাতা লিখেও গোল্লা যদি পাই
পাস্ করবার উপায় দেখি এই জীবনে নাই।'

যাঁদের করি নমস্কার (৭)

শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। আজ তা গল্প-কথা হয়ে গেছে। বড় বড় সার্কাসে বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়াই হ'ত। কিন্তু, সেখানে বাঘ ব্যাচারাও না খেয়ে-খেয়ে অস্থি-চর্ম সার। সবার ওপর, সেখানে থাকত তার চাবুকের ভয়। তাই, সে বিশেষ কায়দা করে উঠতে পারত না মানুষের সঙ্গে।

এখানে যে বাঘের কথা আমি বলছি সে একেবারে জঙ্গলের টাটকা-তাজা বাঘ। সেই রকম এক বাঘের সঙ্গে সামান্য একটা ছুরি নিয়ে লড়াই করেছিলেন এক বাঙ্গালী যুবক। তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত, বাঘটাই হেরে গিয়েছিল এবং সারা দেহে ছুরির ঘা খেয়ে মাটি থেকে আর উঠতে পারে নি। সেই থেকেই যতীনবাবু বাংলা দেশে বাঘা যতীন নামে পরিচিত হলেন। তরুণের দল ভিড় ক'রে গেল তাঁর কাছে। এত বড় বীরের সঙ্গ লাভ করা কত বড় ভাগ্যের কথা।

দিনে দিনে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে গ'ড়ে উঠল বলিষ্ঠ বিপ্লবীর দল।

যতীনবাবু বিবাহ করেছিলেন অল্প বয়সেই। তাই, যখন তিনি বাংলা দেশ জুড়ে ইংরাজ তাড়ানোর আয়োজন করেছিলেন তখন তাঁর এক সহকর্মী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'যতীনদা' আপনি সংসারী মানুষ। আপনার পক্ষে বিপ্লবী দলের ভয়ঙ্কর কাজগুলো হাতে করা কি ঠিক হবে? যে কোন সময় আপনার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে।' যতীনবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন—'আমি সংসারী বলে কি আমার দেশ-মায়ের জন্য এই সামান্য জীবনটুকু দেবার যোগ্যও নই।

১৯১৫ সালে ইংরাজসরকার দেশ জুড়ে ঢাক পিটিয়ে দিলে যে, যতীনবাবুর মাথাটা যে সরকারের কাছে এনে দিতে পারবে সে মোটা টাকার পুরস্কার পাবে। অর্থাৎ, যতীনবাবুকে জীবন্ত বা মৃত যে কোন অবস্থায় ধরিয়ে দিতে হবে। ঠিক সেই সময় একদিন যতীনবাবু যে বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন তার পাশে কোন একটি বাড়ীতে আগুন লাগল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে বেরিয়ে গেলেন আগুন নেভাতে। নিভল আগুন। অনেকগুলি মানুষ প্রাণে বেঁচে গেল।

দলের ছেলেরা ঐ ব্যাপার দেখে একেবারে খাপ্পা। একজন তাঁকে বলেই বসল—'আমরা কোথায় আপনাকে লুকিয়ে রেখেছি—ধরা পড়লেই ত ফাঁসি। আর, আপনি তা ভুলে গিয়ে আগুন নেভাতে ছুটলেন।' যতীনবাবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন—'তবু জানতাম যে দেশের একটি মানুষেরও উপকার করে মলাম।'

পরের জন্য যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে তার আবার প্রাণের মায়া কি? আত্ম-পর বিচার তার থাকে না। তা যদি থাকত, তা হ'লে, মাত্র পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে ইংরাজের এক বিরাট পুলিশবাহিনীর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়ার উৎসাহ যতীনবাবুর থাকত না।

বিপ্লবী-বাঘ যতীন্দ্রনাথ উড়িষ্যার বালেশ্বরে সেদিন বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রমাণ ক'রে গেলেন যে দেশ-মায়ের জন্য তাঁর জীবনের দান কত মহিমময়। দেশকে ভালবাসতে শিখলে জীবনের আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়—দেশপ্রেম ছোট্ট জীবনটাকে মহৎ জীবনের আলোর রাজ্যে পৌঁছে দেয়।

মহেঞ্জোদরো

শ্রীনিরঞ্জন সেন

শোন,—

—ইতিহাস ত তোমরা পড়েছ—

তা হ'লে নিশ্চয় পড়েছ সিন্ধু সভ্যতা (The Indus Civilisation)। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে সেই সভ্যতার নামকরণ হয়েছে "সিন্ধু সভ্যতা" ।...

সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, চানহুদরো, ঝুকাজেনদোর, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি স্থানে সিন্ধু সভ্যতার নানান চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে কি জান—সিন্ধু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড় শহর হল মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা।

ঐ দু'টি শহরের (মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা) মধ্যে দূরত্ব অনেক তবে জলপথে যাতায়াত ছিল সহজসাধ্য।

১৯২১ সালে বাঙালী ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লারকান জেলায় বেড়াতে যান।

তিনি দেখতে পান একটা বড় বাড়ী ভেঙে অনেকগুলো মাটির জালা বাইরে আনা হয়েছে।

তিনি মাটির জালার কাছে যান এবং কৌতূহলী মন নিয়ে একটির ভেতর হাত চালান—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের একটা আঙুল কেটে যায়।

যারা দেখার জন্ত জমা হয়েছিল তারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিল যে—ঐ মাটির জালার মধ্যে নিশ্চয়ই সাপ আছে আর সেই সাপই ওঁর (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) আঙুলে কামড়েছে।...

তিনিও ভাবলেন তা হতেও পারে—তবে তিনি ছাড়ার পাত্র নন, তাই আঙুল বেঁধে সাপ মারার জন্ত মাটির জালা ভাঙা হ'ল—কিন্তু সাপের পরিবর্তে মাটির জালার ভেতর কটি মাটির ভাঁড় বের হ'ল—তার মধ্যে একটি ভাঁড়ের মুখে একটি পাথরের ছুরি পাওয়া গেল আর ঐ ছুরিতেই ওঁর হাত কেটে গেছে।

তিনি আরও দেখলেন—প্রত্যেক মাটির ভাঁড়েই মানুষের হাড়। আর ঐ মাটির ভাঁড়ের ভেতর আরও মাটির ছোট ছোট ভাঁড় আছে। সব মাটির ভাঁড়ের মধ্যে ধান, যব, তামাক, গয়না, কাঁচের বাসন, কাঁচের পুঁতির মালা—তা ছাড়াও পাথরের নানান অস্ত্র।

ঐসব দেখে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারলেন সিন্ধু দেশের দক্ষিণ দিকে যা কিছু অতীতের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে তা উত্তর দিকের আবিষ্কৃত অতীতের চিহ্ন এক জাতীয় নয়—বুঝলে ?? তিনি আরও অনুমান করলেন, পাথরের যুগ শেষ হতে যখন মানুষ ধাতুর ব্যবহার করতে শিখেছিল, তখন ধর্ম বিষয়ের কোন কাজের জন্ত পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত—এইগুলি সেই যুগের।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯২৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদরো খোঁড়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।

মহেঞ্জোদরো অর্থাৎ মড়ার ঢিপি—এ ত তোমরাও জান আশা করি। সিন্ধু দেশবাসীরা সাপের দেবতার পূজা করত—পরে ওরাই আবার অগ্নির পূজা করত বলেও জানা গেছে, অবশ্য এ বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

সার জন মার্শাল-এর কাছে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদরো খোঁড়ার জন্য অর্থ সাহায্য চাইলেন—। অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করলেন সার জন মার্শাল।

মহেঞ্জোদরো খোঁড়ার কাজ সুরু হ'ল—

একটু নীচে পাওয়া গেল পাথরের শীল-মোহর। তবে শীল-মোহরের গায়ে যা লেখা ছিল তা আর পড়া গেল না।

হরপ্পার আবিষ্কৃত শীল-মোহরের মতই। তাই দেখে তিনি প্রমাণ করলেন মহেঞ্জোদরোর সভ্যতা ও হরপ্পার সভ্যতা একই যুগের।

আরও পাওয়া গেল সিন্দুকের ভেতর মানুষের দেহের সমাধি। ওর ভেতর কলসী ছিল—আর কলসীর ভেতর মানুষের হাড়। অন্ত একটি পাত্রে মৃতের ছাই আর দগ্ধ

হাড়। তিনি আরও কয়েকটি নিদর্শন পেলেন, যা থেকে তাঁর মনে ধারণা হ'ল তারা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলত।

আরও কিছু নীচে তিনি এমন সব নিদর্শন পেলেন যাতে মৃতদেহ না পুড়িয়েও সংকারের অন্য প্রকার ব্যবস্থা।

তিনি অনুমান করলেন—প্রস্তর যুগের কিংবা প্রাক্‌-বৌদ্ধযুগের মৃতদেহ সংকারের প্রথা ওটা।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় —

ভারতে আর্যরা তাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিত। ওদের পূর্ব পুরুষদের প্রথা অনুসরণ করত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করলেন নানান নিদর্শন থেকে, ক্রীট (ভূমধ্যসাগর উপকূলের অধিবাসী) প্রভৃতির সঙ্গে এই সভ্যতার সাদৃশ্য দেখা যায়।

কাজে কাজেই মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সভ্যতা প্রাচীন ব্যাবিলন ও সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। মহেঞ্জোদরো খুঁড়ে আরও পাওয়া গেল রং-করা মাটির পাত্র গায়ে সুন্দর সুন্দর নক্সা আঁকা।

হাতীর দাঁতের কাজ-করা শাঁখের গয়না। কাঁচের পাত্র, কাঁচের গয়না—নানান সভ্যতার নিদর্শন।

আরও নীচে পাওয়া গেল, চৌকো আকারের তামার মূর্তি—গায়ে খোদাই করা ছিল নানান অক্ষর।

তিনি অনুমান করলেন, ঐ মূর্তিগুলি তৎকালে মুদ্রা রূপে ব্যবহার করা হ'ত।

তিনি প্রমাণ করে দিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যবহৃত প্রাচীন মুদ্রা।

তিনি অনুমান করলেন, মহেঞ্জোদরোর সভ্যতা সিন্ধু ও "সাটলেজ" উপত্যকায় বাধা দিয়ে চলে গেছে।...

মহেঞ্জোদরোতে যে সব বাড়ীর ভগ্নস্তূপ দেখা গেছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে, বাড়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হ'ত। পোড়া ইট ব্যবহার করা হ'ত। মহেঞ্জোদরো শহরের রাস্তা ছিল বেশ সুন্দর সোজা ও বেশ চওড়া।

রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দালান। প্রত্যেক বাড়ীতেই কুয়ো, স্নান করার ঘর। জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। সাজানো ছবির মত শহর—বুঝলে ত !!

সভ্য মানুষের ব্যবহৃত জিনিষের নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে! মন্দির প্রভৃতিও দেখা গেছে!

তিনি বলেছেন মহেঞ্জোদরোর অধিবাসীরা ধর্মকর্ম করত, তবে নিজের নিজের বাড়ীতে—!

এক কথায় তোমাদের বলছি, মহেঞ্জোদরোর অধিবাসীরা অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবনযাপন করত, নানান নিদর্শন থেকে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

তৎকালীন খাদ্য ছিল গম, বার্লি, খেজুর, তাছাড়া নানান ফলও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত!

সূতী ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্রই না কি সেযুগের ব্যবহৃত বস্ত্র। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিষপত্রের মধ্যে যা পাওয়া গেছে, তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে বেশই উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেখানে। তবে সামরিক সাজসরঞ্জাম বা প্রতিরক্ষার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে দেখা যায় নি বলে জানা যায়। অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা ছিল, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ থেকে সুরু হয়েছিল কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে বৈদিক যুগের অনেক আগেই ভারতে অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছিল!

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, এই সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগের।

ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, মুদ্রাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবিষ্কার অতীতের সভ্যতার এক জলন্ত উদাহরণ। তাঁর অমর কীর্তির—অমূল্য আবিষ্কারের ভাণ্ডার যা রেখে গেছে তা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে যুগ যুগ ধরে।

সপ্তপদীর শেষে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

এই যে তোমার মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার স্বচ্ছন্দ সত্তা বলিষ্ঠ
হল—
ঋজু শুভ্র পদাতিক! এতে কোনো ভুল আছে বলো!
এই যে উজান ঠেলে
মুক্তির প্রবাহে প্রাণ মেলে
সুখে দুঃখে জীবনযাত্রায় নানা আঁকাবাঁকা পথে
চলেছি তোমার সঙ্গে অনায়াসে,—
তোমার মুখের দিকে যখনি চেয়েছি
দেখেছি
আমার মন উদ্ভাসিত তোমার দুচোখে
আশ্বিনের আকাশের মত দুটি গাঢ় স্বচ্ছ উন্মীলিত চোখ
কখনো সজল হল দুঃখে
সুখে
ঝিকমিক ঢেউ টলোমলো।
প্রত্যহের পদক্ষেপে এই যে প্রাণের মন্ত্র ওঠে —
উদ্যম-প্রয়াস-চিন্তা কর্মের মর্মরাঙা জীবনের বোধ,

এই যে প্রত্যয়ী সুখে
চলেছি সম্মুখে—
সত্তার সীমান্ত স্বপ্নে অনির্বচনীয়
নানা বর্ণে এই রমনীয়
ঘ্রাণ ভরা ফুল যে ফুটেছে
শাখায় শাখায় প্রতি স্তবকে স্তবকে;
এর মূলে আছে কি না দুর্গন্ধ গোবরের নোংরা জঞ্জাল
জানি না—জানি না।।
জানলেও সে কথার শব্দহীন শব
আঁধারে ঘুমিয়ে থাক। পচা হাড়-ছাই-পাঁশ সব
এখন হয়েছে স্নিগ্ধ ভালো মাটি
পরিপাটি,
তাই জানি,—ফলেছে ফসল।
সম্বন্ধের ভাগীরথী আরো তাকে বেধে জল
—রোদ-বৃষ্টি-মেঘের কাজল,
এবং সে ব'য়ে যাবে কুলুকুলু শ্মশানের পাশ কেটে কেটে।।

প্রার্থনা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জনমে জনমে মোর সমস্ত হৃদয়
তোমারে বাসিবে ভালো। স্বর্ণ-রৌপ্য নয়,
নহে খ্যাতি। পাণ্ডিত্যও করিনা কামনা।
অনুক্ষণ ধ্যানে মোর তোমারই ভাবনা
জ্বলে যেন অনির্ব্বাণ দীপশিখাসম।
সমস্ত চিন্তায় মোর তুমি, প্রিয়তম,
থাকো যদি নিরবধি,—সেই ভাবনার
পরম সাধন দিয়ে করুণা তোমার
পাবো আমি। তুমি মোর মনের কাঙাল
সচ্চিৎ-আনন্দ-ঘন-মূরতি দয়াল!
ছিন্ন করো মৃত্যুজাল। তৃষ্ণা-মরু-পারে
চির-শান্তি! শুধু তব অনুগ্রহ পারে
তৃষ্ণার করিতে ক্ষয়। তাই তো তোমারই
চরণারবিন্দে আমি কৃপার ভিখারী।

একটি কথা

(রবার্ট বার্ণস্ থেকে)

অনুবাদক : শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

নারী যেন আর কখনো কয় না এমন কথা—
প্রেম পুরুষের অথির অনিবার ;
নারী যেন আর কখনো কয় না এমন কথা—
হাল্কা মানুষ ঘুরছে চারিধার !

এই প্রকৃতির আগাগোড়া দেখতে যদি চাও,
চপল নিয়ম দেখতে শুধুই পাও
হায় রমণী, সত্যি কি চমৎকাও,
এই নিয়মে মানুষ যদি চলে দুনিয়ার ?

তাকিয়ে দ্যাখো হাওয়ার গতি, তাকাও আকাশ পানে !
জোয়ার ভাটায় সাগর বাড়ে কমে ;
সূর্য্য-শশী ডোবেন রোজই উঠ্‌তে সসম্মানে !
ছয়টি ঋতু ঘুরছে ক্রমে ক্রমে !

তবে কেন তোমরা চাহ, বোকা মানুষগুলি
বিশ্ববিধান চলুক্ অবহেলি' !
রইবো অটল যতক্ষণ না পারি,
এর বেশী কি থাকতে পারো তোমরাই, মনোরমে !

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডিভ্যালুয়েশনের স্বরূপ এবার প্রকট !

বিদেশী পাকা বাজারে দেশী কাঁচামাল রপ্তানী !

ভারতীয় টাকার মূল্যমান কমাইয়া কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা বিদেশী বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া কোটি কোটি বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের যে স্বপ্ন-বিলাস করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ দুঃস্বপ্নে পরিণত হইতেছে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসী তথা সরকারী কর্ত্তাদের নিকট এই ডিভ্যালুয়েশন বিষম এক আতঙ্কের বস্তু হইয়াছে। টাকার মূল্য কমাইবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সমর্থক যে-সব কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী কর্ত্তারা ছিলেন এবং জোর গলায় ডিভ্যালুয়েশন সমর্থন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই—তাঁহারা আজ আতঙ্কে নীরব—কেবলমাত্র অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী ছাড়া। এমন কি পরিকল্পনা-বিশারদ অশোক মেটাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সর্ব্বশেষ রিপোর্ট দেখিয়া হতবাক্, নতশীর হইয়াছেন—! কেন্দ্রীয় সরকারও এই রিপোর্ট দেখিয়া একটা শীতল প্রবাহের কাঁপুনি অনুভব করিতেছেন সর্ব্বাঙ্গে !

মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্যের বেসাতি করিয়া এ-দেশে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার ফাঁপাইয়া তুলিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সরকারী-বেসরকারী ভাবে করা হইতেছে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে 'পরামর্শ দিবার জন্ম আমাদের অ-বিশেষজ্ঞদের ঝাহু এবং পরিপক্ক মাথাগুলি দিবারাত্র কি বিষম পরিশ্রম করিতেছে, তাহাতে আমরা বিস্ময়বোধ না করিয়া পারি না—এ-বিষয়ে পত্রান্তরে প্রকাশিত মতামত সময়োচিত বলিয়া উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করি :

তবু যে আমাদের বিদেশী মুদ্রার ভাঁড়ে মা ভবানী, তাহার জন্ম আমাদের দেশীয় পাকা মাথাগুলিকে দায়ী করিলে ভীষণ ভুল হইবে, বিদেশীদের আহাম্মকিই ইহার জন্ম দায়ী ! আমাদের পরামর্শদাতাদের ভাল ভাল উপদেশের মর্ম ডলারের দেশের মানুষেরা যে এখনও গ্রহণ করিতে পারিল না, এই কারণেই তাহাদিগকে একদিন পস্তাইতে হইবে !

আমাদের শিল্প পসরাগুলি ডলারের হাটে বিকায় নাই। তাই যোজনা-কমিশনের এক চাঁই পরামর্শ দিয়াছেন :

এইবার ওই হাটে দেশীয় সবজি পাঠাইতে হইবে। তাঁহার নূতন শ্লোগান :

"ডলার আনিতে সবজি পাঠাও।" জাহাজ বোঝাই দিয়া ঝিঙা, লাউ, কুমড়া, মানকচু, ওল, থোড়, মোচা, নধর পুঁইডাটা এবং কচি আমড়া একবার ডলারের হাটে লইয়া ফেলিতে পারিলে আর কথা নাই, দেখিতে দেখিতে জাহাজ সাফ হইয়া যাইবে : (ফিরতি জাহাজ বোঝাই) ডলার আসিতে পথ পাইবে না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য প্রসঙ্গে সম্প্রতি নয়া দিল্লিতে দুইদিনব্যাপী এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহারই উদ্বোধনী ভাষণে যোজনা কমিশনের একজন অতিপক্ক এবং বিশেষ বিশেষজ্ঞ সদস্য এই অমূল্য পরামর্শ উদ্গীরণ করিয়া তাঁহার পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ওই সঙ্গে তিনি আরও একটি সুপারিশ করিয়াছেন :

ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে যুক্তরাষ্ট্রে যাইতে দেওয়া হউক এবং সস্ত্রীক। তাঁহারা সেখানে গিয়া মার্কিণ ব্যবসায়ীদিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্ত্তা বলিবেন।

শিল্পদ্রব্য রপ্তানির উপর আস্থা হারাইয়া (কারণ তাঁহারই কথায় : 'যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানী করিয়া ভারত তাহার অসম বাণিজ্য সমস্যাবলীর সুরাহার আশা করিতে পারে না') উক্ত 'বিশেষ-বিশেষজ্ঞ' যখন 'সবজি ভেজো৷

আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে সুপারিশ করিয়াছেন, তখন স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে যে, তিনি 'ভারতীয় ব্যবসায়ী' বলিতে সবজিমণ্ডল অথবা কোলে মার্কেটের ফড়িয়াদেরই বুঝিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতের নাগরিকমাত্রেরই বিদেশে যাইবার অধিকার আছে। অতএব ফড়িয়ারা বিদেশে বাণিজ্যেতে যাইবেন, তাহাতে কাহার কী বলিবার আছে? কিন্তু সঙ্গে স্ত্রী কেন—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বভাবদোষে এই কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসিতে পারেন। যোজনা-কমিশনের সদস্য ইহার সদুত্তর দেন নাই (ফড়িয়া গৃহিণীরা মার্কিণবাসীদের ঝাল, ঝোল, সুক্ত, চচ্চড়ি, অম্বল প্রভৃতি ভারতীয় খানা রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে এবং শিখাইতে পারিবেন—মতলব এই)।

মার্কিণ মুলুকে ভারতীয় সবজি চালাইতে গেলে উহার রন্ধনপ্রণালীটিও শিখাইয়া আসা দরকার। সেই কারণেই তিনি ফড়িয়াদের সস্ত্রীক যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই।

(কাঁচা সবজির সঙ্গে) এই ধরনের পরামর্শদাতাদের কিছু কিছু বিদেশে চালান দিয়া বিদেশী-মুদ্রা অর্জ্জন করা যায় না কি? ডলারের হাটে এমন পসরা না বিকাইয়া যায় না।

বিদেশের বাজারে পাট, চা, এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের টান কমিতেছে। চা-এর বাজার ত বিশেষ মন্দা—পাটও প্রায় সেই পথে। বলা বাহুল্য এই দু'টি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ যাঁহারা করেন, সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী (এবং চা-বাগানের মালিক) যে-ধারায় কার্য্য পরিচালনা করেন, তাহাতে ভেজাল এবং নিম্নমানের পণ্যই শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে (চা) রপ্তানী হইতেছে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এবং এই ব্যবসায়িক সদাচারের ফলেই আজ একে একে ভারতীয় পণ্যের বিদেশী-বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতেছে—আরো হইবে।

পাট এবং চা এই দুইটি বস্তুই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিদেশী মূল্য অর্জ্জন করিতেছিল, কিন্তু আমাদের অব্যবস্থা এবং পাট ও চা ব্যবসায়ীদের প্রতি অহেতুক, অন্যায় এবং অযথা সরকারী স্নেহ প্রদর্শনের ফল এবার ফলিতেছে। বিদেশী বাজারে চা-এর প্রতিযোগিতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে এবং সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন আন্তর্জ্জাতিক চা-এর বাজারে আমরা সিংহলের বহু নীচে পড়িয়া যাইব। পাট সম্পর্কেও একই কথা। কিন্তু আমাদের বিদেশী মুদ্রা অবশ্যই অর্জ্জন করিতে হইবে বিশেষ করিয়া:

মন্ত্রীগোষ্ঠীর রামা, শ্যামা, হরে, মেধো, যেদো, গোবরা প্রভৃতির বে-কায়দা বিদেশ ভ্রমণের (pleasure trip?) খরচ মিটাইবার জন্য এবং এই দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা এবার: পুঁই, কলমী, হিংচে, শুষনী, কচু, কাঁচকলা, গাঁদাল, কাঁকরোল, চিচিঙ্গে প্রভৃতি জাহাজভর্ত্তি রপ্তানী করিয়া সহজ সম্ভব হইবে! ইহাতে লাভ দুই দিকে—প্রথমত দেশে মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতে চাষীদের লাভ এবং লোকের হাতে ফালতু টাকাটা বাহির হইয়া প্ল্যানিং মাষ্টার জেনারেলের মনে যে অর্থ-শোক আছে, তাহা অ-শোক হইবে কারণ এই টাকাটা তাঁহার বেপরোয়া পরিকল্পনার কাজে ব্যয়িত হইবে—লোকের উপকার ইহাতে হউক বা না হউক।

সত্যই পরিকল্পনা কমিশনের যে-সদস্যের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে ভারতীয় সবজি রপ্তানী প্ল্যান নির্গত হইয়াছে—সেই মস্তিষ্ক অবশ্যই শ্রেষ্ঠ জান্তব (বোধ হয় গোময়) সারে পরিপূর্ণ!

"বন্ধ"—দুই পক্ষকেই সাফল্যযুক্ত করিয়াছে!

কিছুকাল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে যে দুইদিনব্যাপী 'বন্ধ' অনুষ্ঠিত হইয়া গেল—তাহাতে তথাকথিত জনগণেরই হইয়াছে একটি বিষয়ে নীট লাভ।

একদিকে: সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির যুক্ত বিবৃতিতে 'বন্ধ' সফল করার জন্য জনগণকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। এই সাফল্যে না কি ইহাই আবার প্রমাণিত হইল যে বামপন্থী ফ্রন্ট এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির দাবীর প্রতি আছে সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন এবং সরকারী নীতির বিরুদ্ধে পূর্ণ অনাস্থা। পূর্ণ বিবৃতিটি দিবার প্রয়োজন নাই—সংবাদপত্রে ইতি-পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্যদিকে: রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনও সংবাদপত্রে প্রায় চারদিন ধরিয়া ক্রমাগত বিবৃতি দান

করিয়াছেন—'বন্ধ' ব্যর্থ করার জন্য জনগণকে অভিনন্দিত করিয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলিতেছেন:

"'বন্ধ' ব্যর্থ করার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি"।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি—'বন্ধ' যাঁহারা ঘোষণা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। জনসাধারণ 'বন্ধ'-এর ডাকে প্রায় কোন সাড়াই দেন নাই, তাঁরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক ধ্বনি অপেক্ষা সংবিধান-প্রদত্ত স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশী।

একটা বিষয় পরিষ্কার হইল—'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। যে রাজা ঠ্যাঙানি ভক্ষণ করিয়াও প্রজাদের রাজভক্তির প্রশংসা করেন, সত্যই তিনি মহানুভব। এ-জগতে সবই যে মায়া—এবং কোন অবস্থাতেই যাঁহার প্রফুল্ল-আননে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে না, তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজা হইবার যোগ্য—সিংহাসনে বসিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহারই আছে। আমরা গরীব প্রজাকুল সত্যই আজ স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছি!

'বন্ধ'-এর দু'দিন আমরা পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে পদযাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম—কিন্তু দিব্যদৃষ্টির অভাবে হাট-বাজার দোকানপাট গাড়ি-ঘোড়া--সচল থাকা সত্ত্বেও বন্ধ এবং অচল বলিয়া মনে হইয়াছিল! দৃষ্টি-শক্তির এই অভাবের কারণেই আমরা কংগ্রেসীরাজের প্রজাকল্যাণকর বিবিধ কার্য্য এবং প্রয়াস-পরিকল্পনার সম্যক মূল্য না দিয়া বিরূপ কথাই বলিয়া থাকি। তথা-কথিত সফল---'বন্ধ' যে প্রকৃতপক্ষে অসফল---তাহা জানিতে পারিয়া আজ গভীর হর্ষবোধ করিতেছি। দুঃখ হইতেছে ইহা ভাবিয়া যে 'বন্ধে'র দুই দিন বৃথাই ঘরে বসিয়া, প্রায় অনাহারেই কাটাইলাম! 'একদিক দিয়া আমরাও দেখিতেছি মায়ামুগ্ধ বাস্তব অবস্থা বুঝিবার মত শক্তি আমরা হারাইয়াছি। এ-বিষম অনর্থকারী দৃষ্টিভ্রম কবে কাটিবে?—

'বন্ধ'-এর অসাফল্য সন্দেহাতীত প্রমাণিত!

'বন্ধ' যে সফল হয় নাই—এ-বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ আছে তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাই যে সুদূর বোম্বাই শহর হইতে চির-বিষণ্ণ শ্রীনন্দ আনন্দ বার্ত্তা দিয়াছেন যে "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী চিরপ্রফুল্ল 'শ্রী পি, সি, সেন যে অপূর্ব্ব বিচার-বুদ্ধি ও দক্ষতার সহিত ৪৮ ঘণ্টা বাঙলা 'বন্ধ'-জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।" দূর-দৃষ্টিতে শ্রীনন্দার চোখে সবই সত্য প্রতিফলিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আরো ভাল করিয়া জানিবার (ষ্টাডির) প্রয়োজনে তিনি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত টাইম-টেব্‌ল মত এর্ণাকুলম্ যাত্রা করেন নাই—বোম্বাই এ বহুক্ষণ বিলম্ব করেন! প্রকৃত রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং ট্যাক্‌টের পরিচয়! পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ষ্টাডি করিবার উপযুক্ত স্থান বোম্বাই—কারণ ঐ স্থান হইতে সুদূর পশ্চিম-বঙ্গের যে ভিউ (View) পাওয়া যায়, তাহা একদিকে যেমন স্বচ্ছ, অন্যদিকে তেমনি আন্‌বায়াস্‌ড্। বিগত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় শ্রীনন্দা দিল্লী হইতে আকাশ-পথে কলিকাতায় আসিয়া যে-ভাবে এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর শ্রীকর্ণ শ্রীমর্দ্দন করিয়া তৎকালীন পুলিশ-কমিশনার শ্রীঘোষের 'মেডিক্যাল-লিভের' ব্যবস্থা করেন—এবার আর তাহা করেন নাই, গতবারে নন্দ মহারাজ শ্রীসেনকে কেবল অপদার্থই প্রমাণ করেন নাই, স্বাধীনতার পর কলকাতার সুযোগ্যতম সৎ, ভদ্র এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ কমিশনের সেবা হইতে কলিকাতাবাসীদের বঞ্চিত করেন! (তবে ইহার দ্বারা লাভ হইয়াছে ব্যক্তি বিশেষের—নাম করিবার প্রয়োজন নাই!)

শ্রীনন্দার এবারের প্রশংসাবাণী এবং efficiency certificate আশা করি শ্রীসেনের পূর্ব্বের শ্রীকর্ণের জ্বালা কিছু উপশম হইবে।

বহুঘোষিত সমবায় ভাণ্ডার—কোন্ পথে?

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সর্ব্ব প্রয়োজন মিটাইবার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার অপ্রাপ্তি সমস্যা সমাধানের 'সর্ব্বজ্বরগজসিংহ' মোক্ষম দাওয়াই সরকারী আওতায় কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা এবং অন্যত্র বহু সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হয়—সকলেই জানেন। সংবাদপত্র হইতে জানা যায়:

কলিকাতা এবং চব্বিশ পরগণা জেলার প্রায় চারশ-

সমবায় ভাণ্ডার কেন্দ্রে এখন রীতিমত অসহায়জনক অবস্থা। কলিকাতায় দু'টি এবং বারাকপুর মহকুমায় নয়টি অনুরূপ ভাণ্ডার কেন্দ্র আগেভাগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার দু'শটি ছাড়া অন্যান্য জেলার সাড়ে তিন হাজারের মত যে সংস্থা ভাণ্ডার আছে তাহার প্রায় অর্দ্ধেকের কাজ কোনরকমে জোড়াতালি দিয়া চালানো হইতেছে।

বিভিন্ন ভাণ্ডার পরিচালক মহলের অভিযোগ, তাঁরা নিয়মমত দ্রব্য-সামগ্রী সরকারের নিকট হইতে পান না। ফলে, বাহির হইতে চড়া দামে মাল কিনিয়া ক্রেতাকে সস্তায় দিতে হয়। ইহাতে তাহাদের কারবার চালানো মুশকিল হইয়াছে। অনেক সময় ভাণ্ডারে পর্য্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী রাখা সম্ভব হয় না—ভাণ্ডারের সভ্যরা ক্রমশঃ সদস্যপদ ত্যাগ করিতেছেন।

হিসাবে দেখা গিয়াছে, কামারহাটি এবং রহড়া এলাকার সমবায় ভাণ্ডার-কেন্দ্রে ১৯৬৩-৬৪-তে সদস্য ছিল ৩০২১। আর '৬৫ সালের শেষে তাহা ৭০৪ হইয়াছে। বেলঘরিয়ার একটি ভাণ্ডার কেন্দ্রেরও হাল একই। বারাকপুর মণিরামপুর এলাকার একটি কেন্দ্রের বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা নাকি মাত্র ১২৭ জন।

ওদিকে রাজ্য সমবায় সংস্থা কর্ত্তৃপক্ষের খেদ, ভাণ্ডার কেন্দ্রগুলি আজকাল ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতেছে, ভাঙিতেছে। সুরুতে সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের যে উৎসাহ, উদ্দীপনা থাকে তা কিছুদিনের মধ্যেই উবিয়া যায়। ভাণ্ডার-কেন্দ্র থেকে নানা অভিযোগ আসিতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার গণ্ডগোলের অভিযোগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুনিতে হইতেছে। কতকগুলি কেন্দ্রে আবার নামমাত্র সংখ্যক সভ্যও নাই। নাই সামান্য পরিমাণ মূলধনও। সংস্থায় নানা জটিলতা। তাই এখন কর্ত্তৃপক্ষ খুব সতর্কতার সহিত নতুন ভাণ্ডারের 'পারমিট' দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

রাজ্য সমবায় সংস্থার এক মুখপাত্রকে কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার 'পাততাড়ি গোটানো' ভাণ্ডার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তর আসে, এ ব্যাপারে সঠিক কিছু তাঁহারা বলিতে পারেন না।

ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। সরকারী প্রায় সকল ব্যবসায়গুলি একই পথে চলিতেছে। ব্যবসায় ব্যাপারে সরকারের কঠিন নীতি—ব্যবসায়ে যেন কোথাও লাভ না হয়, কারণ ব্যবসায়ে লাভের অর্থই হইল ক্রেতাকে ঠকাইয়া মুনাফা লুটা! জনকল্যাণ-ব্রতী রাজ্য সরকার এ-পাপক্রিয়া কেমন করিয়া করিতে পারেন?

আরো আছে। গোড়ার দিকে সমবায় ভাণ্ডারগুলি কারখানা কিংবা প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে সরাসরি মাল পাইতেছিল, বিশেষ করিয়া বেবি-ফুড, ঘি, তৈল, সাবান প্রভৃতি। কিছুকাল পূর্ব্বে হঠাৎ কোন পূর্ব্ব-বিজ্ঞপ্তি না দিয়া প্রস্তুতকারকগণ মাল বিতরণ ব্যবস্থা তাঁহাদের পেটোয়া এজেন্ট্-ডিস্ট্রিবিউটার মারফত প্রবর্ত্তন করিলেন। ফলেঃ নামমাত্র মাল সমবায় ভাণ্ডার এবং অন্যান্য খুচরা দোকান পাইতেছে এবং মালের শতকরা অন্ততঃ ৬০।৭০ ভাগ কৃষ্ণবাজারে অন্তর্ধান করিতেছে। একটি দৃষ্টান্ত দিব—

কলিকাতার একটি বৃহৎ কো-অপারেটিভ ষ্টোর সরাসরি 'আমূল' বেবি-ফুড পাইত প্রায় ২৫০ টিন। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে মাল-সাপ্লাই চলিয়া গেল ডিস্ট্রিবিউটারের হাতে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এই বিশেষ কো-অপারেটিভের আমূলের কোটা দাঁড়াইল—৬০।৭০ টিনের বেশী নয়! বলা বাহুল্য—পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী এ-রাজ্যে আসে তাহার শতকরা একশতটিরই পরিবেশক। এজেন্ট অবাঙ্গালী কোন সংস্থা। এমনও শুনা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে যে-সকল অবাঙ্গালী ডিস্ট্রিবিউটার আছেন, তাঁহাদের অনেকেই অন্য রাজ্যস্থিত কারখানার (প্রস্তুতকারকদের)—বেনামী কারবারী—অর্থাৎ প্রস্তুতকারক গাছেরও খাইতেছেন, তলারও কুড়াইতেছেন!!! পশ্চিমবঙ্গের ক্রেতা সাধারণ দু'-তরফা কেবল মারই খাইতেছে!

এ-রাজ্যস্থিত সমবায় ভাণ্ডারগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে মাল জোগানের সকল দায়িত্ব লইতে হইবে সরকারী কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন সংস্থাকে। জোগানের ভার যদি হাঙ্গরদের জিম্মায় থাকে—তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের পুঁটিমাছ এমন কি রুই-কাতলাগুলিও হাঙ্গরদের পেটেই যাইবে, একটি একটি করিয়া।

বলা বাহুল্য—সরকারী নিয়ামক যাঁহারা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবেন, তাঁহাদের নির্ব্বাচন পদাধিকার কিংবা পদ-গৌরবে

দেখিয়া করিলে চলিবে না। এ-বিষয়ে সরকারী কর্ত্তাদের উপর কতখানি নির্ভর করা যায় বলা শক্ত!

"কংগ্রেসের বর্ত্তমান সংগ্রাম দুরূহ, দায়িত্ব বিরাট!!"

বলিতেছেন বর্ত্তমান ভারতের দুই নম্বর নেপথ্য-শাসক (এক নং কামরাজ)। শ্রীঘোষের মতে "কংগ্রেস সংগ্রামের পথই বাছিয়া লয়—আজিও কংগ্রেস সেই পথ পরিত্যাগ করে নাই! তফাৎ এই যে, গতদিনের সংগ্রাম ছিল দেশকে স্বাধীন করিবার, আর অদ্যকার সংগ্রাম—সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ হইতে দেশকে ত্রাণ করিয়া দেশবাসীকে দৈন্য, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, সামাজিক বৈষম্য এবং কুসংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত স্বাধীন জাতির মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা! এই সংগ্রাম যেমন দুরূহ, দায়িত্বও তমনি বিরাট!" অতুল্যবাবুর মতে কংগ্রেস স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ (?) প্রতিটি দেশবাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের দু'বছরের মধ্যেই এমন এক শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হইল যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে নাকি অভূতপূর্ব্ব সত্য কথা—এই শাসনতন্ত্র! ক-হাজার পাতার লিখিত এবং মুদ্রিত, তাহা ঠিক জানা নাই, তবে ওজন বোধ হয় দুই-তিন কুইণ্টল হবেই। (আমাদের এই শাসনতন্ত্র রচনার কৃতিত্ব অবশ্য স্বর্গত ডঃ আমবেদকর, হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী এবং অন্য দু-চার জনের যাঁহারা কংগ্রেসী ছিলেন না।) স কথা যাউক। নব ভারতের বিচিত্র শাসনতন্ত্র এমনি য তাহা কথায় কথায় কর্ত্তাদের সুবিধা এবং প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে! যথা—নেহরুজী তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুনকে খুসী করিবার বেরুবাড়ীর (পঃ বঙ্গ) অর্দ্ধেক যৌতুক দিয়া বসিলেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ কাটিয়া পর রাষ্ট্রকে দান করিবার ক্ষমতা পৃথিবীর অন্য কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন প্রধানমন্ত্রীর নাই। জমিদার অবশ্য তাঁহার জমিদারীর বিলি-ব্যবস্থা ইচ্ছামত করিতে পারিতেন, এখন আর তাহাও পারেন না। মহামতি নেহরুর এই কর্ণ-সমান দানকে আইনত প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য—ভারতীয় সংবিধান পরিবর্ত্তন করিতে হইল! ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, দেশের সংবিধান অপেক্ষা দেশের প্রধান-মন্ত্রীর স্থান উচ্চতর। সংবিধান একটা সং-বিধান মাত্র।

কংগ্রেসের অ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল শ্রীঅতুল্য আরো বলেন যে—"আর্থিক ক্ষমতা ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থহীন এবং এই মহাসত্যের উপলব্ধিতেই কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ (??) তৈয়ারী করিয়াছে! এই পথই আত্মনির্ভরশীল হইবার পথ।...গণতন্ত্রের আকাশের নিচে থাকিয়াও ভারত পরিকল্পনার সিঁড়ি বাহিয়া ক্রমশঃ উন্নতির (অবনতি বলিলেই সত্য-বাস্তব ভাষণ হইত না কি?) (চড় চড়) করিয়া আগাইয়া যাইতেছে! অন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বোধ হয় এই রকম দুঃসাহসিক (না—গর্দ্দভোচিত বেকুবি) প্রচেষ্টা করে নাই!—পরি-কল্পনাগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিতে দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা লাভে কংগ্রেস সমর্থ হইয়াছে। অবশ্যই হইয়াছে! তবে এ-সমর্থন যে গলায় ট্যাকসের গামছা দিয়া কংগ্রেস সরকার আদায় করিতেছে (অতি সত্য হইলেও তাহা আমরা বলিব না!)—এইবার অতুল্য মহারাজ আরো কি বলেন দেখুন:

—ভারতের অবস্থায় অন্যান্য দেশের অনেককে অনা-হারে প্রাণ দিতে হইয়াছে—কিন্তু (কংগ্রেসী রাজত্বে) দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ ভারতের সংগ্রামী (কি অর্থে?) মানুষ-দের ত্যাগে কাহাকেও প্রাণ হারাইতে হয় নাই!!! মানুষ প্রাণত্যাগ করিয়া প্রাণ দেওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এমন ভীষণ অতুলনীয় সত্য ভাষণ অন্য কেহ করিতে লজ্জাবোধ করিত, নীরব থাকাই শ্রেয় বোধ করিত, কিন্তু লজ্জা, মান (?), ভয় থাকিলে দেশের কল্যাণ করা যায় না, কাজেই অতুল্য ঘোষ মহাশয় নারীর ভূষণ লজ্জা প্রথমেই পরিহার করিয়া দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন!

অতুল্যবাবু জবাব দিবেন কি—কংগ্রেসী শাসনের ছায়াতলে বাস করিয়া এই পশ্চিমবঙ্গের শতকরা প্রায় ৮০জন লোক সপ্তাহে দুই দিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না কেন? বাঙলাতে আজ কেন এবং কিসের অভাবে এই বিষম হাহাকার? অর্থ নাই, বস্ত্র নাই, অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীও আজ সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাহিরে। রোগে ঔষধ নাই.(বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে). পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করা বহুজনের আয়ত্তের বাহিরে, সামান্য যাহা পাওয়া যায়—তাহা অশুদ্ধ ভ্রান্তিপূর্ণ। বেশীর ভাগই মূর্খ গো-পণ্ডিতদের রচিত! অতুল্যবাবু কি বলিতে

চাহেন—এ-সবই "সংগ্রামী মানুষ" কংগ্রেসী পরিকল্পনার সার্থকতার জন্যই ত্যাগ করিয়াছে? ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, "কংগ্রেসী" মার্কা সংগ্রামী 'মানুষেরা' পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সরকারী উদ্যোগের কল্যাণে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে ক্রমাগতই আগাইয়া চলিয়াছেন—এবং দেশের অসংগ্রামী এবং অকংগ্রেসী মানুষেরা—বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাহা অবলোকন করিয়া আনন্দের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে?

কংগ্রেসী শাসনে অনাহারে কেহ মরে নাই—ইহা অপূর্ব্ব অসত্য ভাষণ হইলেও মানিয়া লইলাম। কিন্তু দেশের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তত আড়াই কোটি মানুষ যে আধমরা অবস্থায় অন্তিমের ডাক শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, ইহা কি ঘোষ মহাশয় অস্বীকার করিতে পারিবেন? কংগ্রেসের গুণকীর্ত্তন অতুল্যবাবুর মত মহাশয় এবং কংগ্রেসী মহানেতারা অবশ্যই করিবেন, কারণ তাঁহারা নিমকহালাল। কিন্তু গুণকীর্ত্তন করিতে হইলে কি মানুষ কাণ্ডজ্ঞান এবং সত্যমিথ্যা বিচার-বুদ্ধিও পরিত্যাগ করে কিংবা হারাইয়া ফেলে?

শ্রীঘোষ বিগত কিছুকাল হইতে আকাশপথে এবং উচ্চ মার্গে ভ্রমণ করেন—সেই কারণেই হয়ত মাটির সহিত তাঁহার বর্ত্তমানে আর কোন পরিচয় নাই এবং মাটির সহিত সম্পর্কচ্যুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির মানুষদের সঙ্গেও তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। আজ অতুল্যবাবুর সকল কারবার একমাত্র কংগ্রেসী (অ)মানুষদের সঙ্গে—যাঁহারা এখন সংগ্রামী (অতুল্যবাবুর মতে) মানুষ। সংগ্রাম এই শ্রেণীর (অ)মানুষরা অবশ্যই করিতেছে, তবে তাহা বিত্তের উপর আরো বিত্ত, ক্ষমতার সীমা আরো প্রসারিত এবং দেশের সাধারণ মানুষকে জাঁতাকলে একেবারে শুষ্ক মাংসপিণ্ডে পরিণত করিতে। স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষ এ অত্যাচার, এ অবাঞ্ছনীয় যন্ত্রণা আর কতকাল ভোগ করিবে—জানেন বিধাতা পুরুষ। তবে একটা কথা বিশ্বাস করি যে—চেতনাহীন মৃতপ্রায় মানুষও একদিন সচেতন হয়, জাগিয়া উঠে—এবং তখনই সকল অত্যাচার, অনাচার-অবিচারের বিচার সুরু হয়। সে-ইঙ্গিতও ক্রমশ স্পষ্ট হইতেছে। আজকের উচ্চ-মার্গে যাঁহারা বিহার করিতেছেন—তাঁহাদের এই মাত্র বলিব যে—"মনে কর শেষের সে-দিন ভয়ঙ্কর"—

কংগ্রেসের মধ্যে খেয়োখেয়ী নাই (?)॥

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-কংগ্রেসের আর একজন হঠাৎ-নেতা এবং 'সংগ্রামী-মানুষ' শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত (কুশলী আইনজ্ঞ বলিয়া সুবিদিত)—রাজ্য বিধান সভার গত 'বন্ধ' আলোচনা ও বিতর্ককালে ঘোষণা করেন যে, "বামপন্থীদের মত কংগ্রেসীদের মধ্যে খেয়োখেয়ী নাই"। সত্য কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিলাম—উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, কেরল, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেসী 'সংগ্রামী' মানুষেরা কেমন অতি নিরীহ এবং শান্তশিষ্ট মেষের মত ঘর করিতেছে সকলেই জানেন। মহারাষ্ট্র এবং মহীশূর এই দুইটি কংগ্রেসী রাজ্য ত অপূর্ব্ব এক স্বর্গীয় প্রেমালিঙ্গনে পরমানন্দে নৃত্য এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধুর ঝঙ্কারে সমগ্র ভারতকে বিস্মিত মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে! মহারাষ্ট্রে ডজন দেড়েক মন্ত্রী হঠাৎ এক সঙ্গে ভুল করিয়া পদত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের তাল কাটিয়া দেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই শ্রীকামরাজের পাখোয়াজের আওয়াজে আবার তাল ঠিক করিয়া দেন! শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত মহাশয় নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কংগ্রেসী 'সুখী-পরিবারের' কথা প্রচার করার ফলে, দক্ষিণ এবং বামপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি লজ্জাবোধ করিতেছে এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে এই দুই কমিউনিষ্ট শাখা হয়ত আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া 'সংগ্রামী কংগ্রেস'কে চিন্তায় ফেলিতে পারে, বিশেষ করিয়া কেরল রাজ্যে! অশোককৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বিশেষ ধরনের মামলা পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেন হঠাৎ। তাঁহার পক্ষে এ-ভাবে নির্ব্বাচনী প্রতিপক্ষকে সচেতন করিয়া দেওয়াটা কি সুচতুর আইন ব্যবসায়ীর যোগ্য হইল। পূর্ব্বে কংগ্রেসী অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীঘোষের পরামর্শ লইয়া কিছু বলা তাঁহার পক্ষে ভাল হইত।

আর একটা কথা, অশোক দত্ত মহাশয় বলেন: 'কংগ্রেসীদের মধ্যে বামপন্থীদের মত খেয়োখেয়ী নাই'। না থাকিবারই কথা। বামপন্থীরা অভাবগ্রস্ত, দুঃখীদের দল—অভাবের জ্বালায় খেয়োখেয়ী করে। আর কংগ্রেসীরা?

কোন অভাব নাই—টাকার ছড়াছড়ি! কংগ্রেসী পরিবারের কর্ত্তা গৌরী সেন! ভাগ বাঁটোয়ারার কল্যাণে সংগ্রামী কংগ্রেসীমাত্রেই তৃপ্ত, ভরপেট।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনিক মিতব্যয়িতা—

ইংরেজ আমলে বর্ত্তমান পঃ বঙ্গের প্রায় চারিগুণ পুরাতন বাঙ্গলা প্রদেশে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে ইংরেজ লাট-বেলাটগণ যে লোকবল এবং অর্থ নিয়োগ করিতেন বর্ত্তমান এই 'লিলিপুট' বাঙ্গলা শাসন করিতে আজিকার কর্ত্তারা সেই পুরাতন 'ব্রব্‌ডিগনাগ' বাঙ্গলাকে বহুগুণে অতিক্রম করিয়াছেন।

স্বাধীনতার পর এই ব্যয়বৃদ্ধির কৈফিয়ত হিসাবে বলা হয়, পরাধীন পুলিস-রাষ্ট্র আজ স্বাধীন 'কল্যাণ'-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। বিদেশী শাসকেরা টাকা খরচ করিত শুধু সৈন্যসামন্ত ও পুলিশবাহিনী মোতায়েন রাখিতে, যাহাতে তাহাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে—এখন আমরা নানা কল্যাণকর্ম্মে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছি, অতএব সরকারী খরচ যে শুক্লপক্ষের শশিকলার মত দিনে দিনে বাড়িয়া যাইবে সেটা আর এমন কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? যাঁহারা প্রশাসনিক ব্যয়বাহুল্যের এমন ধরনের ভাষ্য করেন তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, জোর করিয়া খরচ কমাইতে গেলে অনর্থ বাধিবে—দেশের প্রগতি ব্যাহত হইবে, সরকারকে অর্থাভাবে অনেক প্রয়োজনীয় প্রকল্প বর্জ্জন করিতে হইবে, সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ম্মনৈপুণ্য অনেকটা হ্রাস পাইবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও, মনে হইতেছে, এমনতর আশঙ্কা পোষণ করেন।......

কথা উঠিয়াছে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রশাসনিক ব্যয় কমাইতে হইবে। কেমন করিয়া সে ব্যয়সঙ্কোচ করা যায় তাহার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবদের লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়-সাশ্রয়ের পন্থা সচিবগোষ্ঠী কি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন? ইদানীং প্রশাসনিক ব্যয় যে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে তাহার মূলে ত আছে তাঁহাদেরই বাদশাহী মেজাজ। আড়ম্বরে তাঁহাদের আসক্তি অত্যাধিক। তাঁহারা দপ্তরে আসর জমাইয়া বসিতে চান—তাহার জন্য নানা আসবাবপত্র চাই-ই, আরও চাই একান্ত সচিব, স্টেনো, দুই-দশজন কেরানী এবং একাধিক চাপরাসী বা আরদালী। এসব ঠাট না হইলে না কি তাঁহাদের 'প্রেষ্টিজ' থাকে না। কাজেই তাঁহাদের সম্মানার্থে নিত্য-নূতন পদের সৃষ্টি হইতেছে, নিত্য-নূতন নানা শ্রেণীর লোক লওয়া হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে, আর তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া বাড়িয়াছে প্রশাসনিক ব্যয়ের বহরও।

সরকার যদি বাস্তবিকই ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে চান তবে ওই নবাবী চাল ছাড়িতে হইবে। প্রশাসনিক দপ্তরগুলির বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি আর চলিবে না। এত লোকলস্কর, এত আড়ম্বর এ যুগে কী দরকার? কোন্ দেশে সরকারী সচিবেরা পারিষদবর্গ-পরিবৃত হইয়া কাজ করিয়া থাকেন? যেখানে কাজই মুখ্য, সেখানে এ ধরনের সামন্ততান্ত্রিক জাঁকজমক নিষ্প্রয়োজন ত বটেই, অনিষ্টকরও। এমন পরিবেশে কাজ না হইয়া অকাজই হয়, এবং তাহার খেসারত দিতে হয় দেশের সকল লোককে। নয়া দিল্লীর এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীর ওই প্রাণহীন শোভা-সর্বস্ব অচলায়তনগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রশাসন-দপ্তরগুলিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সচিব বা আমলারা কাজ নিজেরা করিবেন, খাতাপত্র নিজেরা রাখিবেন, দরকার হইলে ফাইল নিজেরা রাখিবেন, দরকার হইলে ফাইল নিজেরা বহিয়া লইয়া গিয়া অপরের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। প্রত্যেকেরই একদল সহায়ক কর্ম্মী বা চাপরাসীর কী প্রয়োজন? এক-একটা দপ্তরের জন্য জনকয়েক স্টেনো বা ওই ধরনের কর্ম্মচারী থাকিলেই যথেষ্ট। যাঁহার যখন প্রয়োজন হইবে তিনি সেই কর্ম্মীদলের সাহায্য পাইবেন। এইভাবে যদি শাসনতন্ত্রের নব-রূপায়ণ করা যায়, তবে কর্ম্ম-তৎপরতা ত বাড়িবেই, প্রচুর অর্থের সাশ্রয়ও হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে নিজেদের বনিয়াদী চাল বদলাইতে সচিবেরা বা আমলারা কি রাজী হইবেন? তা যদি না হয় তবে

ব্যয়-সঙ্কোচের কোনও প্রয়াসই সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু যত যুক্তিই দেওয়া হউক না কেন—খরচ কমাইবার পক্ষে তাহা সরকারী মহলে সহজ-গ্রাহ্য হইবে না। সরকার এবং সরকারী মহল প্রশাসনিক খরচ সব দিকে কমাইলে যে আশঙ্কা করেন—

একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, এ ধরনের আশঙ্কার কোনও 'দৃঢ় ভিত্তি নাই। আসলে এ সবই হইতেছে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার স্বপক্ষে চতুর ওকালতি। পুলিস-রাষ্ট্র ও কল্যাণ-রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই যথেষ্ট। কল্যাণ-রাষ্ট্রে সরকারের কর্ম্মসূচী সীমিত নয়—সরকারের দায়িত্ব সেখানে অনেক, কাজ অনেক। একথাও সত্যসরকারী কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইলে প্রশাসনিক ব্যয়ও বাড়িয়া যায়। কিন্তু এ সব ত তত্ত্বকথা। আমাদের দেশে প্রশাসনের ব্যয় যে এত বাড়িয়া গিয়াছে তাহার কতটুকু ঘটিয়াছে সরকারের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার ফলে? কল্যাণরাষ্ট্রের দোহাই দিয়া প্ল্যানিংয়ের নামে সরকারী দপ্তর কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কাজের কাজ তাহাতে কতটুকু হইতেছে? যে অর্থ ওই সব দপ্তরের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে তাহার কতটা খরচ হইতেছে দেশের কল্যাণ-সাধনে? সে তথ্য না জানিলে কেমন করিয়া বলা যায়, সে অর্থের সদ্ব্যয় হইয়া থাকে?

এত ব্যয়-বাহুল্য সত্ত্বেও দেশের প্রশাসনিক রূপ পরিবর্ত্তন ত হয়ই নাই—বরঞ্চ আরো খারাপই হইয়াছে। বিদেশী আমলের প্রশাসনিক খরচ এবং ব্যবস্থাকে বলা হইত গরীবের ঘরে রোলস্ রয়েস! আজ আরো বহুগুণে দরিদ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থা হইয়াছে 'জেট প্লেন' প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলন!

বিদেশী আমলে প্রশাসনিক রোলস্ রয়েসের ভার সামলাইতে দেশসুদ্ধ লোক হিমশিম খাইত। এখন জেটের মাশুল গুনিতে গিয়া তাহারা নাস্তানাবুদ হইতেছে। প্রশাসনিক যন্ত্র ক্রমশই স্ফীতকায় হইতেছে, তাহাকে চালাইবার জন্ত ক্রমশই আরও বেশী লোক লাগিতেছে এবং যাহার ফলে প্রশাসনিক ব্যয় হু-হু করিয়া বাড়িয়া গিয়া এমন একটা স্তরে পৌঁছিয়াছে যেটা ইংরাজ আমলে অকল্পনীয় ছিল।

এত ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও কিন্তু এই প্রজাকল্যাণ রাষ্ট্রের বা রাজ্যের—প্রজাকুল আজ অকূলে পড়িয়াছে। প্রশাসনিক রজ্জু যেভাবে আজ রাজ্য সরকারের গলায় জড়াইয়াছে তাহা একদিন গলায় ফাঁস হইয়া দমবন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, এ-রাজ্যের সাধারণ মানুষও সেই সঙ্গে প্রশাসনিক রজ্জুর ফাঁস মৃত্যু বরণ করিবে!

দু'-একটি সামান্য উদাহরণ

সরকারী প্রশাসনে আজ কোন ডিপার্টমেণ্ট বা সেকসন্ নাই। প্রতিটি বিভাগের নব-নামকরণ হইয়াছে 'ডিরেকটোরেট' অব হেল্থ, এগ্রিকালচার ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভাগীয় কর্ত্তারা হইয়াছেন "ডিরেক্টর"—ডেপুটি ডিরেক্টর সহকারী ডিরেকটর—এক একটি ডিরেকটোরেটে এই প্রকার কত শত পদের, উপ-পদের সৃষ্টি হইয়াছে—সঠিক বলা শক্ত।

এই সকল বড় বড় ডিরেকটর ডেপুটি ডিরেকটর, সহকারী ডিরেকটর, এমন কি বিভাগীয় সুপারইনটেনডেণ্টদেরও ব্যবহারের জন্য জিপ্ নামক গাড়ির এবং তাহার সঙ্গে চালাও পেট্রলের ব্যবস্থা সরকারী খরচায় চলিতেছে। গাড়ির চালক-দের সংখ্যাও যে কত তাহা খোদ ডিরেকটরও জানেন না।

তারপর পুলিশ বিভাগ এবং জনস্বাস্থ্য ডিরেক্টরেট—এখানে জিপ, সুপারজিপ, পুলিসবাহী লরি এবং জালে ঘেরা গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স যে কত আছে, তাহার সংখ্যা এবং মাসিক খরচাই বা কত, কেহ বলিতে পারিবেন কি?

সরকারী জীপ এবং অন্যান্য গাড়ি, ট্রাক্, ষ্টেশন ভ্যান প্রভৃতি—কতখানি সরকারী কাজে এবং কি পরিমাণই বা কর্ত্তা, উপকর্ত্তাদের ব্যক্তিগত এবং 'ফ্যামিলি'-কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা রাজ্য সরকারের এ.জি,ও. হয়ত বলিতে পারিবেননা—যদিও এই এ.জির আপিস হইতে সরকারী গাড়ি বছরে কত কোটি টাকা ব্যয় হয়—তাহা জানা যাইতে পারে চেষ্টা করিলে একথা অনেকেই জানেন যে পুলিশ থানার গাড়ী-গুলি অহরহ বড়বাবুদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক প্রয়োজনে সদা ব্যবহৃত হইতেছে সরকারী পেট্রল এবং আমাদের টাকাতেই। এ-বিষয়ে প্রতিবাদ বা বাধা দিবার কেহ নাই—দিতে প্রয়াস পাইলে হয়ত তাহাকে বা তাহাদের নানাভাবে বিব্রত এবং বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। "আঠারো"-ঘা এর ব্যাপার বড় সহজ নহে, হাড়ে হাড়ে জানি।

আর বেশী কি বলিব?

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

একথা অনস্বীকার্য যে এই মায়াবিনী মনোহারিণী কাজিনের উপস্থিতিতে ব্যারণের ভাবভঙ্গি অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। তিনি যেন অনেক হাল্কা ধরনের হয়ে যেতেন, এবং তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা দুর্বল হয়ে পড়ত। আর ঐ মহিলাটি যখন আমার দিকে চাইতেন, মনে হ'ত আমাকেও যেন তাঁর যাদুকরী দৃষ্টির দ্বারা সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছেন।

বেশীক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হ'ল না। ওঁদের যুগলকে দেখা গেল বাগানের দরজার কাছে, কথাবার্তা এবং হাসিতে দু'জনে যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছেন। মেয়েটির মুখচোখ দিয়ে মনের খুশী এবং আনন্দ ও মজার ভাবটা উপচে পড়ছিল। মাঝে মাঝে সে বেশ খারাপ ভাষাতেই কথা বলছিল—একটু বেশী মনের রাশ আলগা দিয়ে কিন্তু তার কথাবার্তায় একটা রুচিবোধ লক্ষ্য করেছিলাম। একটা নিষ্কলুষ পবিত্রতার ভাব নিয়ে সে দ্ব্যর্থক ভাষায় আলাপ করছিল—তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে সে ইচ্ছা করেই এবং বুঝেই ওই নানা অর্থবোধক শব্দগুলো ব্যবহার করছে। ধূমপান বা মদ্যপানের সময়ও সে সব সময় বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে সে একজন নারী এবং নারীর সবচেয়ে যা বড় সম্পদ, অর্থাৎ "যৌবন," তা সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কোন দিক থেকেই এতটুকু পুরুষালি ভাবে তার ভেতর লক্ষ্য করি নি—সে যে স্বাধীনতাকামী নারীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, একথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, লোক-দেখানো শালীনতাতে যে সে আস্থাশীল নয় তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না, তার কথা বলার ভঙ্গি থেকে। তার সঙ্গটা বেশ কৌতুকপ্রদ এবং উপভোগ্য বলেই মনে হচ্ছিল। একথা অস্বীকার করব না—সময়টা বেশ তাড়াতাড়িই কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছিল এবং যার থেকে আমার আগেই ভবিষ্যৎ সঙ্কটের ইঙ্গিত পাওয়া উচিত ছিল, তা হচ্ছে এই—মেয়েটির মুখ থেকে যখনই কোন দ্ব্যর্থক, অশালীন শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল, ব্যারেনেস একেবারে আনন্দে ফেটে পড়ছিলেন। একটা বন্য হাসিতে তিনি সারা পরিবেশটা মুখরিত করে তুলছিলেন, তারপর একটা সিনিক্যাল এক্সপ্রেসন্ তাঁর মুখেচোখে ফুটে উঠ্ছিল—এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বিভৎস দিকগুলো সম্বন্ধে ব্যারেনেসের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

যাই হোক আমরা যখন এভাবে আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলাম, ব্যারনের আঙ্কেল এসে আমাদের এই ছোট্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন এবং বহুদিন থেকেই মৃতদার পুরুষ। তাঁর আচার-ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর এবং অত্যন্ত সিভ্যালরাশ্—আমাদের সঙ্গিনী দু'জনের তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়পাত্র অর্থাৎ দু'জনেই আঙ্কলকে মন থেকে ভালবাসত। আঙ্কল নিঃসঙ্কোচে এদের দু'জনকে আদর করতেন, হাতে চুমো খেতেন, গাল টিপে দিতেন। আঙ্কল আসাতে দু'দিক্ থেকে দুই বোন এসে তাঁর কাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আনন্দধ্বনি করে উঠ্ল।

"দুষ্টু মেয়েরা সাবধান। আমার মতন বুড়ো পুরুষের পক্ষে একলা একসঙ্গে যৌবনমদমত্তা দু'জন যুবতীকে সামলানো প্রায় অসম্ভব। সুতরাং সাবধান! নিজেরা যে ভেতরে ভেতরে শেষে পুড়ে মরবে।

শিগ্‌গীর কাঁধ থেকে হাত উঠিয়ে নাও। তা না হ'লে আমি শেষ পর্যন্ত কি করে বসব জানি না।"

ব্যারনেস দুই ঠোঁটের ভেতর একটি সিগারেট গুঁজে নিয়ে আঙ্কলকে উদ্দেশ করে বললেন—"আঙ্কল, দয়া করে অন্ততঃ একটু আগুন দাও।"

"আগুন! আগুন! অত্যন্ত দুঃখিত বৎসে, তোমার কোন কাজে লাগতে পারলাম না।" এরপর ধূর্ততা-ব্যঞ্জক ভঙ্গিতে আঙ্কল বললেন—"আমার ভেতরের আগুনটা অনেকদিন নিভে গেছে।" 'তাই না কি?' জিজ্ঞেস করলেন ব্যারনেস। তারপর তাঁর সুন্দর নরম আঙ্গুল দিয়ে আঙ্কলের কান মলে দিলেন। বৃদ্ধ তাঁর হাতটা ধরে ফেলে নিজের দুই হাতের ভেতর নিয়ে চাপ দিলেন—ব্যারনেসের হাতটা আদর করে টিপতে টিপতে তাঁর কাঁধ অবধি এগিয়ে এলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, 'প্রিয়তমে বাইরে থেকে দেখে তোমাকে যতটা রোগা মনে হয় তা ত তুমি নও'—এরপর স্লিভের ভেতর দিয়ে ব্যারনেসের হাতটা টিপতে সুরু করে দিলেন। ব্যারনেস দেখ্‌লাম কোন আপত্তি করলেন না। আঙ্কল তাঁকে স্বাস্থ্যবতী বলায় মনে মনে বেশ খুশীই হয়েছিলেন তিনি। হাসতে হাসতে খেলার ছলে তিনি জামার হাতাটা উপরের দিকে টেনে তুলে দিলেন—সুন্দরভাবে গঠিত তাঁর অনিন্দিত বাহুটি, কোমল, গোলাকার এবং দুধের মত সাদা, মোলায়েম—অনাবৃত অবস্থায় আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হ'ল। প্রায় তখুনি, আমার উপস্থিতি স্মরণ করে, আবার তিনি জামার হাতাটা তাড়াতাড়ি টেনে নামিয়ে নিলেন। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের ভেতরও আমি ব্যারনেসের দৃষ্টিতে একটা ক্ষয়কারী আগুনের আভার ঝলক দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর মুখভাবে ক্ষণতরে পরিস্ফুট হয়েছিল প্রেমার্ত নারীর অন্তরের আকূতি।

সিগারেট ধরিয়ে দেবার জন্য একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরাতে গিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা ছিটকে এসে পড়ল আমার কোট এবং ওয়েষ্টকোটের মাঝে।

ভয়সূচক চীৎকার করে ব্যারনেস আমার কাছে ছুটে এলেন এবং আঙুলের চাপ দিয়ে কাঠিটা নেবাতে চেষ্টা করলেন। তাঁর স্পর্শে আমিও যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য আত্মসংযম হারিয়ে ফেললাম—তাঁর হাতটা আমার বুকের উপর চেপে ধরলাম। এমন একটা ভাব দেখালাম যেন ঐভাবে চাপ দিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা নেবাতে চেষ্টা করছি। এরপর ব্যারনেসকে ধন্যবাদ জানালাম—তিনি কিন্তু তখনও যথেষ্ট উত্তেজিত।

সাপারের সময় অবধি আমরা নানা গল্পগুজবে কাটালাম। সূর্যাস্তের পর আকাশে চাঁদ উঠল—চাঁদের আলো বাগানের গাছপালা ফুলফলের উপর এসে পড়াতে নানা রংএর বাহারের সৃষ্টি করল। আমি ব্যারনেসকে বললাম: "দেখুন, পৃথিবীর সব কিছুই কল্পনার দ্বারা তৈরী। আসলে রং জিনিষটার কোন পৃথক সত্তা নেই। কি ধরনের আলো কোন্ জিনিষের উপর পড়ল, তার থেকেই রং ফুটে ওঠে। সুতরাং সব কিছুই মায়া।"

ব্যারনেসের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। তাঁর অবিন্যস্ত রক্তিম কেশগুচ্ছকে মনে হচ্ছিল একটা জ্যোতিশ্চক্রের মত—এঁর মাঝে তাঁর মুখটা চাঁদের আলো পড়ে অত্যন্ত ফ্যাকাসে লাগ্‌ছিল। আমি যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছিলাম আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ব্যারনেস—অনিন্দ্যসুন্দর সুসমতা পূর্ণ তাঁর দেহ, দীর্ঘ এবং ঋজু—ষ্ট্রাইপড্ পোষাকে তাঁকে অত্যন্ত তনুদেহী বলে মনে হচ্ছিল—চাঁদের আলোতে ষ্ট্রাইপগুলো সাদা এবং কালো রংএর বলে প্রতিভাত হচ্ছিল। গাছগুলো থেকে এমন একটা সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল যা সহজেই মনকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তোলে। শিশির-স্নাত ঘাসের উপর বসে ঝিঁঝি-পোকার দলের কিচির-মিচির ডাক শোনা যাচ্ছিল। মৃদুমন্দবায়ু গাছের ভেতর দিয়ে মর্মরধ্বনির সৃষ্টি করে প্রবাহিত হচ্ছিল। গোধূলি তার নরম পাতলা রঙ্গিন আলোর আবরণে সব কিছুকে ঢেকে দিয়েছিল। নারীর কাছে পুরুষের অন্তরের স্বরূপ তুলে ধরবার এই ত অনুকূল পরিবেশ। কিন্তু সহজভাবে মনের গোপন অনুভূতিকে ব্যারনেসের কাছে খুলে বলতে পারলাম না—সৌজন্যবোধের দরুনই ও কথা বলতে আমার সাহসে বাধল—প্রেমের স্বীকৃতি করবার জন্য মনে যে ব্যাকুলতা এসেছিল তা আমার ওষ্ঠদ্বয়ে ঈষৎ কম্পনের সৃষ্টি করে নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

বাতাসের ধাক্কায় একটি আপেল শাখাচ্যুত হয়ে এসে আমাদের পায়ের কাছে পড়ল। ব্যারনেস নীচু হয়ে সেটি তুলে নিয়ে আমার হাতে দিলেন এবং ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। 'নিষিদ্ধ ফল'! মৃদুস্বরে বললাম। না, এটা চাই না—আপনাকে ধন্যবাদ। তারপরেই বুঝলাম একটা মারাত্মক ভুল মন্তব্য করে ফেলেছি—অবশ্য এ ভুল আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়।

তাড়াতাড়ি সেটাকে সেরে নেবার জন্ম নিজের কথার বিশ্লেষণ করে বললাম—"বাগানের আসল মালিকের অগোচরে এভাবে তাঁর জিনিষ গ্রহণ করলে অপহরণের অপরাধে অপরাধী হব—তিনি জানতে পারলে কি মনে করবেন বলুন ত?" তিনি বললেন—মনে করবেন আপনি একজন 'নাইট উইদাউট্ রিপ্রোচ'। এরপর তিনি শ্রীরাধার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন—ওখানে লতাগুলোর অন্তরালে ব্যারণ এবং বেবী বিশ্রম্ভালাপে সময় কাটাচ্ছেন—মনের কথার আদান-প্রদানের সময় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বিরক্তিকর বলেই বোধ হয় ওঁরা নির্জন পরিবেশটা বেছে নিয়েছেন। সাপার খাওয়া হয়ে গেলে পর ব্যারণ প্রস্তাব করলেন যে বেবীকে তিনি বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবেন। সামনের দরজা অবধি সবাই গেলাম—ব্যারণ নিজের হাতটা বেবীর দিকে এগিয়ে দিলেন, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'বন্ধু, আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্ম সঙ্গদান করুন। আমি আপনাকে একজন 'পারফেক্ট ক্যাভ্যালিয়ার' বলে জানি—সে কথাটা ওর কাছে ভালভাবে প্রমাণ করে দিন।" তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা কোমলতাপূর্ণ অনুনয়ের আভাস ছিল। একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। আমি আর ব্যারনেস হাতে হাত রেখে হাঁটছিলাম। সন্ধ্যাটায় একটু গরম পড়েছিল, স্কার্ টা খুলে ব্যারনেস সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন এবং আমার গায়ে একটু হেলান দিয়ে চলছিলেন। তাঁর সুন্দর বাহুর গ্রেসফুল আউটলাইনটা সিল্কের জামার স্বচ্ছ-আবরণের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ব্যারনেসের সর্বাঙ্গ থেকে একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তি উৎসারিত হয়ে আমার দেহমনকে যেন ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

এই সন্ধ্যার পর থেকে আমি আমার নিজের ভেতর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার নিজের মন এখন থেকে আর কোন পৃথক সত্তা নেই। কি একটা অদৃশ্য শক্তিবলে আমার দেহের রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ব্যারনেস যেন নিজের রক্তধারা মিশিয়ে দিয়েছেন—তাঁর অন্তরাত্মার সঙ্গে আমার অন্তরাত্মা এক হয়ে মিলে গিয়েছে। বাড়ীতে ফিরে এসে বেশ ধীরে-সুস্থে ভবিষ্যতের বিষয় নিয়ে চিন্তা করলাম। এই যে বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি? এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করব? অথবা কোথাও বিদেশে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার জন্ম উঠে-পড়ে লাগব? হঠাৎ মনে হ'ল প্যারিসে যাই—সভ্যতার পীঠস্থান বলতে ত প্যারিসকেই বোঝায়। একবার সেখানে যেতে পারলে গ্রন্থাগারগুলো এবং মিউজিয়াম-গুলোতে কাজ নিয়ে ডুবে থাকব—অন্য কোন কথা আর মনেই আসবে না। প্যারিসে আমি নিজেও বড় ধরনের কিছু একটা কাজ সম্পন্ন করতে পারব।

পরিকল্পনাটি ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে কার্যকরী করবার জন্ম উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে লেগে গেলাম। একমাস বাদে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। এবার এখানকার বন্ধুবান্ধবদের থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে এখান থেকে আমি যে পালিয়ে যাচ্ছি এ কথাটা আর কেউ বুঝতে পারল না। সেলমা, অর্থাৎ আমার সেই ফিনিশ বান্ধবী, চার্চের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ের কথাটা পাবলিশ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার বিদেশে যাবার ব্যাপারটা এর সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল—যেন অন্তরের গভীর ক্ষত এবং স্মৃতির দংশনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্মই বিদেশে গিয়ে আমি সব ভুলে থাকতে চাই, সেদিক দিয়ে আমার দেশত্যাগের কারণ হিসাবে এই ঘটনাটা আমাকে খুবই সাহায্য করল।

বন্ধুদের অনুরোধে যাবার দিনটা কয়েক সপ্তাহের জন্ম পেছিয়ে দিতে হ'ল। আমি ঠিক করলাম জাহাজে হাভ্র্ পর্যন্ত যাব।

এরপর আবার যাবার দিন পেছোতে হ'ল। কারণ অক্টোবরে আমার বোনের বিয়ের দিন স্থির করা হয়েছিল। এই সময়টায় ব্যারনেসের কাছ থেকে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ পেতাম। কাজিনটি তার মা-বাবার কাছে ফিরে গিয়েছিল। সুতরাং বেশীর ভাগ সন্ধ্যাই আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাটাতাম। ব্যারণ নিজের অজ্ঞাতসারে স্ত্রীর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাকে সুনজরে দেখতে সুরু করেছিলেন। তাছাড়া আমি চলে যাচ্ছি, একথা ভেবে তিনি বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এইসব ভেবেই বোধহয় তিনি আবার আগেকার মত আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে—লাগলেন।

ব্যারনেসের মা এক সন্ধ্যায় তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যারনেস একটা সোফায় মার কোলে মাথা রেখে, গা.

এগিয়ে দিয়ে গল্পগুজব শুরু করলেন। আদুরে সুরে তিনি ঘোষণা করলেন যে তখনকার একজন বিখ্যাত অভিনেতাকে তিনি গভীরভাবে এড্‌মায়ার করেন। বুঝতে পারলাম না, আমি কতটা কষ্ট পাই দেখবার জন্যই তিনি ঐ ধরনের স্বীকারোক্তি করলেন কিনা। তাঁর মা মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তারপর ব্যারেনেসের মা আমাকে সম্বোধন করে বললেন—যদি কখনও উপন্যাস লেখেন এই বিশেষ শ্রেণীর আবেগপ্রবণ নারীদের কথা স্মরণে রাখবেন। আমার মেয়েটি সত্যিই অনন্যসাধারণ। কখনও সত্যিকার সুখী হতে পারে না, যতক্ষণ না স্বামী ছাড়া আর একজন অন্য পুরুষের সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে।

'মা ঠিক কথাই বলেছেন' মেনে নিলেন ব্যারনেস। তারপর বললেন—'এখন আমি ঐ অভিনেতাটির প্রেমে ডুবে আছি। ওর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'মেয়েটা একেবারে পাগল'—বলে হেসে উঠলেন ব্যারণ।

বেশ বুঝতে পারলাম বাইরে ব্যাপারটাকে হাল্কা করতে চাইলেও, ভেতরে ভেতরে তিনি বিরক্তিবোধ করছিলেন।

ক্রমে যাবার দিন এগিয়ে এল। জাহাজ ছাড়বার আগের রাত্রে আমি ব্যারণ দম্পতিকে আমার ব্যাচিলারস্ এ্যাটিকে নৈশ আহার করবার জন্য নেমন্তন্ন করলাম। মাননীয় অতিথিরা আসবেন—সুতরাং ঘরটাকে যথাসম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলাম। অবশেষে ওঁরা এসে হাজির হলেন—চারতলা অবধি উঠতে হয়েছে, ওঁরা বেশ হাঁফাচ্ছিলেন। ঘরে আলোর বাহার এবং সাজসজ্জা দেখে ব্যারনেস মোহিত হয়ে গেলেন—তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন খুব সাক্‌সেসফুল ষ্টেজ সেটিং দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন—আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লেন ব্যারনেস এবং বললেন 'ব্রেভো! আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর ষ্টেজ ম্যানেজার।"

"তা ত বটেই, আমি অনেক সময়েই প্লে-এ্যাকটিং দেখে আনন্দ উপভোগ করি—আর এর সাহায্যে আমার স্থিরমাসুবর্তিতা এবং ধৈর্যের পরীক্ষাও হয়।

ব্যারনেসের ক্লোকটা খুলে নিলাম। ওঁদের অভিনন্দন জানালাম, এবং ব্যারনেসকে সোফায় এনে বসালাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। ব্যারনেস আগে কখনও কোন ব্যাচিলারের ঘর দেখবার সুযোগ পাননি—তাই খুব কৌতূহলের সঙ্গে আমার ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। কলমটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করবার পর, ব্লটারটা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর এদিক ওদিকে কি যেন খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলেন—আমার মনে হচ্ছিল আমার নিজস্ব কোন কিছু গোপনীয় ব্যাপার আবিষ্কার করে রহস্যের সমাধান করবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। বুক সেল্‌ফ্‌গুলোর কাছে গিয়ে বইগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন। আয়নার কাছে গিয়ে একবার চুলটা ঠিক করে নিলেন। প্রত্যেকটি ফার্ণিচার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন—ফুলদানির কাছে গিয়ে ফুলের আঘ্রাণ গ্রহণ করলেন—এই সময়টায় মাঝে মাঝেই মিশ্রিত আনন্দের ধ্বনি করছিলেন ব্যারনেস।

ঘরের সবকিছু ভালোভাবে দেখা হয়ে গেলে পর, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি বিশেষ দরকারী ফার্ণিচার ওখানে নেই। তাই জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কি এই ঘরেই ঘুমোন?'

'হ্যাঁ, ওই সোফাটাতেই আমি রাত্রে শুই।'

'বা! কি মজা, অবিবাহিত পুরুষদের জীবনটা কি সুন্দর!

বোধহয় তাঁর কুমারী জীবনের বিস্মৃত স্মৃতিগুলো তাঁর মানসপটে ভেসে উঠছিল। আমি বললাম: 'আমাদের জীবনটা আমার অনেক সময় ভাল মনে হয়।'

'নিজের বাড়ীতে নিজের সর্বময় কর্তা হয়ে ভাল্ লাগে? আবার ঐ ধরনের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য আমি কি না করতে পারি। বিয়ে ব্যাপারটাই অত্যন্ত ঘৃণ্য—কি বল ডার্লিং?"

এইবার ব্যারনেস স্বামীর দিকে চাইলেন। ব্যারণ এতক্ষণ ভালমানুষের মত স্ত্রীর এইসব মজার, মজার মন্তব্য শুনছিলেন এবং বেশ উপভোগ করছিলেন তাঁর কথাবার্তা। এবার মৃদুহেসে জবাব দিলেন—"ঠিকই বলেছ, বিবাহিত জীবনটাই আসলে অত্যন্ত ভাল্।"

ডিনার রেডিই ছিল—আমরা খেতে বসলাম। প্রথম গ্লাস মদ্য পান করবার পরই আমাদের সবার মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখন মনে হল এই উৎসবের কারণ হ'ল আমার এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা, তখন আবার আমরা একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। অতীতে যে সব দিনগুলো আমরা একসঙ্গে আনন্দে কাটিয়েছি, তাই

নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলতে লাগলাম। কল্পনার সাহায্যে সে সব দিনের নানা ঘটনা আবার জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল আমাদের স্মৃতিপটে। পূর্বস্মৃতির আলোচনায় প্রত্যেকেরই চোখে একটা স্পষ্ট উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছিল—থেকে থেকেই আমরা স্থাম্পেন করছিলাম, এবং একে অন্যের সঙ্গে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে মদ্যপান করবার সময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলাম।

খুব তাড়াতাড়ি সময় কেটে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল—আর একথা মনে হয়েও দুঃখ অনুভব করছিলাম যে বিদায় নেবার সময় এগিয়ে এসেছে। স্ত্রীর ইঙ্গিত পেয়ে ব্যারণ পকেট থেকে একটি ওপেল-যুক্ত আংটি বের করে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "এই সামান্য উপহারটি কিপ্‌সেক হিসাবে রাখুন—আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন। ভগবান করুন, আপনার মনের সমস্ত বাসনা এবং আকাঙ্ক্ষা যেন সার্থকতা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করে। এটাকে আমার আন্তরিক ইচ্ছা হিসাবে গ্রহণ করবেন—কারণ আপনাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসি এবং মানী লোক হিসাবে শ্রদ্ধা করি। আপনার যাত্রা সব দিক দিয়ে শুভ হোক। আমরা আপনার কাছে বিদায় চাইব না, শুধু বলব 'এর পরের সাক্ষাৎকারের দিনের অপেক্ষায় উদগ্রীব ভাবে অপেক্ষা করব।'

মানী লোক? ব্যারণ কি আমার এখান থেকে চলে যাবার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরেছেন? আমার বিবেকের চেহারাটা কি ওঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে? না, তা হ'তে পারে না।··· কারণ এরপর নিজের বক্তব্যকে ভালভাবে বোঝাতে গিয়ে তিনি সেল্‌মার নিন্দায় ফেটে পড়লেন। সে নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে নি বলে তাকে গালাগাল দিলেন। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে এমন কথাও বললেন যে সেল্‌মা নিজেকে এমন একজন পুরুষের কাছে বিক্রি করেছে যে······যে পুরুষকে সে ভালবাসে না, যে পুরুষটি সেল্‌মাকে লাভ করতে পেরেছে শুধু আমার অদ্ভুত ভদ্রতাবোধের জন্য।

আমার অদ্ভুত ভদ্রতাবোধ! কথাটা শুনে মনে মনে লজ্জা পেলাম। কিন্তু এই সরল চরিত্রের লোকটির কথা শুনে আমিও যেন এই ভ্রান্ত ধারণাটাকে সত্যি বলেই মেনে নিলাম—ফলে নিজেকে অত্যন্ত অসুখী মনে হতে লাগল এবং এই বিমর্ষ ভাবটাকে মুখে-চোখে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। ব্যারনেস কিন্তু আমার এই অভিনয় দেখে সত্যিই প্রতারিত হলেন, ভাবলেন সত্যি সত্যিই আঘাতটা আমাকে খুব বেজেছে এবং একটা মাতৃভাব নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে সুরু করলেন।

"ও আবার একটা মেয়ে—ওকে ভুলে যান। ওর থেকে আরও অনেক ভালো ভালো মেয়ে আছে। ওর কথা ভেবে দুঃখ করবেন না, যে মেয়ে আপনার জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারল না, সে আপনার মূল্য কি বুঝবে? তা ছাড়া আপনাকে বলছি, ওর সম্বন্ধে আমি অনেক কথা শুনেছি।"······

এরপর পৈশাচিক আনন্দের সঙ্গে ব্যারনেস সেলমা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলতে লাগলেন যা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না।

ব্যারনেস কিন্তু বলে চলেছিলেন—ভাবতে পারেন! সেল্‌মা এক সদ্বংশজাত অফিসারের কাছে প্রোপোজ করেছিল ও তার কাছে নিজের বয়সটাও কম করে বলেছিল······আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, ও হচ্ছে অতি সাধারণ ফ্লার্ট টাইপের মেয়ে······

ব্যারণ ইসারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে এভাবে কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না—ব্যারনেস নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে আমার হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং এমন কাতরভাবে আমার দিকে চাইলেন যে আমার মনটা দুঃখে ভরে উঠল। ব্যারণ এতক্ষণের অতিরিক্ত মদ্যপানে একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন—ভাবের আবেগে কত যে ভালবাসার কথা শোনালেন, আমি যে তাঁর নিজের ভাইয়ের মত, আমার মত উদার হৃদয়ের লোক তিনি আর কখনও দেখেন নি, আমি যেন তাঁকে ভুলে না যাই ইত্যাদি আরও কত কি।

তবে একটা কথা বুঝতে পারলাম যে ব্যার' আসলে লোকটি ভাল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলা: যে তাঁর সঙ্গে আমি সত্যিকার কোনও অন্যায় ব্যবহা: করব না—প্রাণ গেলেও না।

এবার বিদায় নেবার জন্য সবাই উঠে দাঁড়ালাম ব্যারনেস হঠাৎ কান্নায় ফেটে পড়লেন এবং স্বামী: কাঁধে মুখ লুকোলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—এঁকে এতটা অন্তর থেকে গ্রহণ করেছি বলেই ইনি

চলে যাচ্ছেন শুনে মনটা একেবারে ভেঙে গেছে। তারপর ব্যারনেস তাঁর স্বামীর সামনেই দুই হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখচুম্বন করলেন। আর আমাকে উদ্দেশ করে সাইন অভ্ দি ক্রশ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বামীর হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন।

আমার চার্‌ওয়্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল—এ দৃশ্য দেখে তারও চোখে জল এসে গিয়েছিল—বাঁ হাতে সে চোখ মুছে ফেলল। এই ক্ষণটিকে ভারী পবিত্র মনে হচ্ছিল আমার—চিরকাল মনে করে রাখবার মত।

শুতে গেলাম প্রায় একটায়। ঘুম আসছিল না। ভয় হচ্ছিল ঠিক সময়ে উঠতে না পারলে ষ্টীমার ধরতে পারব না। জাহাজ ছাড়বে সকাল ছটায়—জাহাজঘাটে যাবার জন্য একটা ক্যাব ঠিক করেছিলাম। সকাল পাঁচটায় সেটা এসে হাজির হ'ল। একলাই রওনা হলাম।

অক্টোবরের সকাল—চারিদিক কুয়াসায় ভরা—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, জোরে বাতাস বইছে। রাস্তার ধারের গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো শুভ্র তুষারের দ্বারা মণ্ডিত হয়ে আছে। নর্থ ব্রিজের উপর এসে মনে হ'ল, যেন এক সেকেণ্ডের জন্য হ্যালিউসিনেশন দেখছি—আমার ক্যাব যে পথ ধরে চলেছে, ব্যারণ সেই পথ ধরেই হেঁটে আসছেন। বুঝতে পারলাম খুব ভোরে উঠে তিনি আমাকে সি অফ্ করতে এসেছেন। তাঁর বন্ধুত্ব যে কতটা প্রগাঢ় একথা উপলব্ধি করে মনটা ব্যথিয়ে উঠল। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতে লাগল—মনে মনে ভাবছিলাম, ওঁর এতটা ভালবাসা পাবার যোগ্যতা আমার নেই। কোন সময়ে ওঁকে খারাপ লোক মনে করেছি ভেবে এখন আমার অনুতাপ হতে লাগল।

আমরা ল্যাণ্ডিং ষ্টেজে এসে পৌছলাম। ব্যারণ আমার সঙ্গে এসে আমার ক্যাবিনটা পরীক্ষা করে দেখলেন, কাপ্টেনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। ব্যারণ এমন ব্যবহার করছিলেন যেন তিনি আমার বড় ভাই এবং অনুরক্ত বন্ধু—অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে এবার দু'জনে দু'জনের কাছে বিদায় নিলাম। যাবার আগে ব্যারণ বলে গেলেন, "শরীরের যত্ন নেবেন। আপনার চেহারাটা বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না"।

সত্যিই শরীরটা খুব ভাল লাগছিল না। এই সময় আমার মনে একটা ভয়ের ভাব এল। এই সুদীর্ঘ এবং অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন জার্নির কথা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠলাম। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পাড়ে গিয়ে উঠি। কিন্তু শরীরের সমস্ত শক্তি যেন মিলিয়ে গেছে—জেটির উপরই দাঁড়িয়ে ব্যারণ রুমাল নাড়ছিলেন, আমিও রুমাল নেড়ে তার উত্তর দিলাম—জাহাজও ধীরে ধীরে চলতে চলতে গতি বাড়িয়ে দিল—ব্যারণের মুর্তি অস্পষ্ট হতে হতে শেষে মিলিয়ে গেল। বোটটি ছিল ভারি কার্গোতে বোঝাই। মেন্ ডেকে একটি মাত্রই ক্যাবিন। নিজের বার্থে গিয়ে ম্যাট্রেসের উপর টান হয়ে পড়লাম। গায়ের উপর কম্বলটা টেনে নিলাম। ঠিক করে ফেললাম প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে কাটাব। আধঘণ্টা বাদে যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে জেগে উঠলাম—বেশ বুঝতে পারলাম কাল সারা রাতের অনিদ্রা এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই এতটা শরীর খারাপ হয়েছে। এক মুহূর্তের মধ্যে আমার বর্তমান, নির্জন এবং একক জীবনের বাস্তব দিকটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন কি রকম শক্ত এবং কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ডেকে চলে গেলাম যাতে খানিকটা ব্যায়াম করে শরীরটাকে আবার নরম এবং নমনীয় করে তুলতে পারি। মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম—কিন্তু এই ডেকে অন্য কোন প্যাসেঞ্জার আছে বলে আমার মনে হ'ল না। ব্রিজ বেয়ে উঠে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ জমাতে গেলাম—দেখলাম লোকটা মিশতে চায় না। এই জাহাজে এখন সঙ্গীহীন অবস্থায় দশ দিন কাটাতে হবে ভেবে আমার দেহমন অস্থির হয়ে উঠল। এই জার্ণিটা ত তা হ'লে একটা যন্ত্রণাকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

বোটের ডেকের চারিদিকে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম—আমার অস্থিরতায় বোটের স্পিড্ও বাড়বে না—এবং জার্নির দীর্ঘ সময়টাকেও কমিয়ে আনা যাবে না। মাথাটা যেন রক্তের চাপে গরম হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তে হাজারো রকমের বিস্মৃত স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠছিল। স্পষ্টভাবে এর কোন-টাকেই অনুধাবন করতে পারছিলাম না। সব যেন একসঙ্গে মিলে-মিশে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। ষ্টীমার যত খোলা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমার দেহমনের

তীব্র যন্ত্রণা ক্রমশঃ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। আমি বেশ উপলব্ধি করছিলাম যে বাঁধনের দ্বারা আমি আমার মাতৃভূমি, আমার পরিবার এবং ব্যারনেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছি, দূরে সরতে সরতে সেটা যাবে ছিঁড়ে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দোলানি খেতে খেতে আমার কেমন ভয় করতে লাগল যে আমার আর নিজের বলতে কোন আশ্রয় থাকবে না, সবাই আমাকে পরিত্যাগ করেছে, ভয়াবহ নির্জনতার মধ্যে এককজীবনের দুঃসহ কষ্টের পেষণে আমাকে বাকী জীবন কাটাতে হবে। কেন আমার এই দুর্মতি হ'ল যে পরিচিত পরিবেশ, মাতৃভূমি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা দেশের অভিমুখে পাড়ি দিলাম। সেখানে কেউ আমাকে জানেনা, চেনেনা—আমাকে তারা বন্ধুভাবে গ্রহণ করবে কেন? এই যে জাহাজের লোক-গুলো এরা ত আমার অস্তিত্বকেই স্বীকার করতে চায় না। অবশ্য জাহাজে ওঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত এক ঘণ্টার বেশী সময় অতিবাহিত হয় নি। কিন্তু কি সুদীর্ঘ মনে হচ্ছিল এই এক ঘণ্টা সময়কে। আর গন্তব্যস্থলে দশ দিন বাদে পৌঁছনর পরও যে আমি মনের শান্তি ফিরে পাব তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে? এখন ভাবছিলাম, এই দেশত্যাগ করে আসবারই বা আমার কি দরকার ছিল। কেউ ত আমাকে চলে আসবার জন্য বাধ্য করে নি? আমি যদি ফিরেই যাই, তা হ'লেই বা কে আমাকে কি বলবে? ......সে রকম ত কেউ নেই! ......তবু!... হ্যাঁ, লজ্জা পেতে হবে বই কি, সবার লাফিং ষ্টক হয়ে দাঁড়াব, নিজের সম্মান থাকবে না। না! না! ফিরে যাবার আশা মনে পোষণ করে কোন লাভই নেই। তা ছাড়া হ্যাভ্রের পথে বোটটি আর কোন জায়গাতেই থামবে না। অতএব এগিয়ে যেতে হবে, সাহসের সঙ্গে। •

কিন্তু এই সাহসটা নির্ভর করে দেহ এবং মনের শক্তির উপর—এর একটিও আমার নেই। উপরের ডেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন লোকের মুখ দেখতে পাই নি। ঠিক করলাম এবার নীচের ডেকে যাব—যদি কারোর সন্ধান পাই। নামবার সময় প্রায় একজনের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছিলাম—দেখলাম এক বৃদ্ধা মহিলা সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বাতাসের ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। মহিলার পরণে কালো পোষাক, মাথার চুলগুলো সব পাকা, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কথা বললাম। তিনি ফরাসী ভাষায় আমার কথার জবাব দিলেন—অল্পক্ষণের ভেতরই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল।

দু'চারটে সাধারণ কথা বলার পর দু'জনেই দু'জনের কাছে এই সমুদ্র-যাত্রার উদ্দেশের কথা বললাম। মহিলা প্রমোদ-ভ্রমণের জন্য আসেন নি। তিনি বিধবা—স্বামী ছিলেন টিম্বার মার্চেন্ট—ষ্টকহমে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কিছুদিন থেকে আছেন—ছেলে উন্মাদ অবস্থায় হ্যাভ্রের এক পাগলা-গারদে আছে—তাকে দেখবার জন্যই জাহাজে হ্যাভ্র অভিমুখে চলেছেন। তাঁর কাহিনী কত সরল অথচ কত মর্মবিদারক! এ কাহিনী শুনে আমার মনে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হ'ল। হঠাৎ মহিলা কথা বলা বন্ধ করে আমার দিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—তারপর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি অসুস্থ?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার অসুখ করেছে। আমার মনে হচ্ছে আপনার এখন কিছুক্ষণ ঘুমোন দরকার।'

'সত্যি কথা বলতে কি কাল সারারাত আমি একটুও ঘুমতে পারি নি—এখন ভয়ানক ক্লান্ত বোধ করছি। কিছুদিন ধরেই অনিদ্রা রোগে ভুগছি এবং কোন রকমেই এর নিরসনের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আচ্ছা, আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন। আপনি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ুন আমি আপনার জন্য একটা পানীয় তৈরি করে আনছি, যা থেকে আপনার ঘুম আসবেই আসবে। মহিলা আমাকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিলেন—তারপর কিছুক্ষণের জন্য নিজের ঘরে চলে গেলেন—ফিরে এলেন একটি ফ্লাস্ক হাতে—এটার ভেতরে ছিল তাঁর তৈরী ঘুমের ওষুধ। এক চামচে ওষুধ তিনি আমাকে খাইয়ে দিয়ে বললেন—'এবার নিশ্চয় ঘুম এসে যাবে।'

আমি মহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি খুব যত্নের সঙ্গে আমার গায়ে কম্বলগুলো চাপা দিয়ে দিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে যেন আমার উদ্দেশ্যে করুণাধারা বর্ষিত হচ্ছিল, সেই ধরনের করুণাধারা যা শিশুরা

পেতে চায় তাদের মায়েদের কাছ থেকে। তাঁর হাতের শান্তিস্পর্শ পেয়ে আমিও শান্ত হয়ে গেলাম এবং মিনিট দুয়েকের ভেতর অচেতনতা এসে আমাকে গ্রাস করতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল আবার যেন আমার শৈশবকাল ফিরে এসেছে। আমি দেখছিলাম আমার মা যেন আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা ঠিকঠাক করে রাখছেন, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে এক একবার এসে আমার মাথায় কপালে হাত বুলোচ্ছেন। তারপর মনে হ'ল মায়ের মূর্তিটা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এবং সেই অস্পষ্টতা ভেদ করে ধীরে ধীরে ব্যারনেসে স্নেহকোমল সহানুভূতিপূর্ণ চেহারাটা পরিস্ফুট হ উঠছে। আমার মনটা তখন চেতনতা এবং অচেতনতা মাঝামাঝি একটা স্তরে বিরাজ করছিল। বৃদ্ধা মহিল আমার মা, এবং ব্যারনেসের মূর্তি অস্পষ্টভাবে আমা শয্যার পাশে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছিল—তাঁরা যেন আমার সেবার ভার নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল—তারপর একসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে গভীর নিদ্রা আচ্ছন্ন হলাম।

চার বন্ধুর ভ্রমণ কাহিনী

শ্রীসুজাতা রায়

শ্যামল মস্ত বড় একটা ম্যাপ বার ক'রে ফেলল। ভানু দৌড়ে এসে বলল, "এ যে একেবারে প্রলয় ব্যাপার দেখছি! দাদা, আমরা কি সারা ভারতটা বেড়িয়ে শেষ করব! এত বড় ম্যাপ দিয়ে কি হবে?" শ্যামল বলল, "সারা ভারত বেড়াতে ত হবেই, তবে সেটা এ ছুটিতে হবে না। কিন্তু তা বলে ছোট ম্যাপ বার ক'রে ত লাভ নেই। কোন্ কোন্ জায়গায় যাব দেখতে হ'লে বড় ম্যাপ দরকার।"

ভানু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদা, এবারে আমরা কোথায় কোথায় যাব?" শ্যামল উত্তর দিল, "চল এবারে রাজগীর, নালন্দা আর গয়ার দিকটা শেষ করে ফেলা যাক।" ভানু বলল, "গয়ার কথা ত জানি, সেখানে লোকে পিণ্ড দিতে যায়। আমরা আবার সেখানে গিয়ে কি করব? ও সব পিণ্ড দেওয়া আমাকে দিয়ে চলবে না। রাজগীর নালন্দাতেই বা কি দেখবার আছে?" শ্যামল হেসে বলল, "না না, পিণ্ড তোমাকে দিতে হবে না। আর আমিও দেব না। আমরা ত ভূতপ্রেতকে ভয় করি না। ও সব জায়গায় গিয়ে আমরাই দৌরাত্ম্য করব। ভূতের সাধ্য কি আমাদের সঙ্গে পারবে? আর করবার কথা যদি বল, রাজগীরে পাহাড়ে চড়াটা বুঝি কিছু কম কাজ?"

পরদিন হৈ হৈ—রৈ রৈ! ভানু আর শ্যামল দু'ভাই এবারে লক্ষ্মীপুজোর সময় নিজেরা বেড়াতে যাবে। তাদের মা-বাবা একটু চিন্তিত। কোন দিন বাইরে যায় নি ওরা। নিজেরা কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে তাঁরা ভেবেই পাচ্ছেন না। ওরা দু'জনে কিন্তু নাছোড়-বান্দা, বলে উঠল, "আমরা এখন স্বাধীন দেশের ছেলে, আমাদের বয়স পনের আর চোদ্দ হয়েছে, আমরা যদি এখনও নিজেদের ওপর নির্ভর ক'রে বার হতে না পারি, তবে কি জীবনে কোনদিন গাগ্‌রিণ আর টিটভের মত আকাশ-যাত্রা করতে পারব?" মা-বাবা কি করেন? এই রকম কথার পর ওদের আর বাড়ীতে আটকে রাখতে পারলেন না।

যেদিন ওরা রওনা হবে, সেদিন হঠাৎ কোত্থেকে বিশু আর রামদাস এসে হাজির হ'ল। তারাও সঙ্গে যাবে। বিশু তার কাকার কাছে থাকে। কাকার অনুমতি ও নিয়ে এসেছে। কিন্তু রামদাস? রামদাস পলাতক। তার দিদি তাকে দেখা-শুনা করেন। কিন্তু দিদিকে না বলেই পালিয়ে এসেছে। তবে সে কথা সে বন্ধুদের কাছে ভাঙল না।

চার বন্ধুতে মিলে হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হ'ল। সেখানে টিকেট কেটে তারা একটা গাড়ির থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে বসল। গাড়িতে ভয়ানক ভীড়। তার মধ্যে আবার অন্ধ, খোঁড়া, ভিখিরীরা এসে নানারকম গান করে ভিক্ষে চাচ্ছে। ফিরিওয়ালারা নানারকম মাল বিক্রী করছে। এসব দেখে ওদের বেশ মজা লাগল। কিন্তু সব থেকে তাদের আশ্চর্য লাগল জুতো ব্রাশ করিয়ে ছেলেদের দেখে। বাচ্চারা কেমন একটা স্বাধীন উপার্জনের পথ বার করে ফেলেছে।

গার্ডের বাঁশী বাজল। ফিরিওয়ালা ইত্যাদি সবাই নেবে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল। ক্রমশে যাত্রীদের কথাবার্তা কিছু কানে আসতে লাগল। শীঘ্রই চারজনে অবাধে ঘুমোতে লেগে গেল। জায়গার অভাবে এ-ওর ঘাড়ে পিঠে ভর দিয়ে, একবার সোজা, একবার কাৎ হয়ে পড়ছে। এই ভাবে রাত কেটে গেল।

গয়ায় পৌঁছে দেখে চার দিক লোকের ভীড়। আর বেশী গোলমাল পাণ্ডাদের। এক এক জন লোককে চার-পাঁচ জন পাণ্ডা ধরছে। আর কী বাকবিতণ্ডা! নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে নানা কৌশলীবার্তা পাণ্ডাদের। এমন কি জিনিষপত্র টানাটানি পর্যন্ত চলছে। শ্যামল বন্ধুদের বলল, "চল আমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়ি। পাণ্ডাদের পাল্লায়

পড়লে আর রক্ষা নেই।" রামদাস জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবে তা কি ঠিক করেছ?" শ্যামল জবাব দিল, "ভারত সেবাশ্রমে যাওয়া যাক, সেখানে জায়গা না পেলে তখন আবার ভেবে দেখা যাবে।"

একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ভারত সেবাশ্রমের পথ দেখিয়ে দিলেন। চার বন্ধু তাদের সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করল। তিনি তাদের বললেন, "একটা ঘর ত দিতে পারি কিন্তু রান্নার ব্যবস্থা কি হবে?"

ভানু তাতে বলল, 'ভাত-ডাল সেদ্ধ করে নিতে ত আমরা পারি, কিন্তু তা করতে গেলে বেড়ানোর সময় পাব না। কাজেই ভাবছি চিঁড়ে দৈ দি.য় ফলার করে এ যাত্রা কাটাব।"

কর্মাধ্যক্ষ ভানুর কথায় খুব খুসী হলেন। বললেন, "এই ত চাই। তোমারা যে সবরকম কষ্ট সহ্য করতে স্বীকার ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছ এতেই বুঝতে হবে যে আমাদের দেশে নব যুগের সূচনা হয়ে গেছে। আগেকার দিনে লোকে কষ্ট স্বীকার করে তীর্থ ভ্রমণের পুণ্য সঞ্চয় করত। এ যুগের তীর্থ ভ্রমণকারী তোমরাই এবং তীর্থ হচ্ছে জগতের প্রত্যেকটি দেশ। যত দেখবে, যত শিখবে ততই তোমাদের এবং দেশেরও লাভ" তারপর সেই ভদ্রলোক ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ওদের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন এবং আরও বললেন, "তোমরা আজকে আমাদের অতিথি, কাজেই এ বেলা আমাদের সঙ্গেই ভাত ডাল খাবে।"

চার বন্ধু ত মহাখুশী। তখনই তারা স্নানাদি সেরে নিল। তারপর শ্যামলের বোঁচকা থেকে আবার বেরুল একটা ম্যাপ। এ বারের ম্যাপটা আগের মত আকারে অত বড় নয়। কিন্তু এটাতে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আছে। সমস্ত গয়া জেলার বিশদ বিবরণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। বিশু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ ম্যাপ তুই কোথায় পেলি রে শ্যামল? আমাদের স্কুলে যত ম্যাপ আছে সব নেড়ে-চেড়ে দেখেছি, কিন্তু এ ধরনের আর এত সুন্দর ম্যাপ ত দেখি নি।"

শ্যামল হেসে উত্তর দিল, "এটা সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস থেকে কিনে নিয়ে এসেছি। আমাদের স্কুল থেকে দু'বছর আগে জগদীশদা যে পাশ ক'রে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে কি তোর মনে আছে?"

ওরা সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল "খুব মনে আছে।" ভানু বলল, "জগদীশদা কি রকম চট করে গাছে উঠে ডাব পারতে পারতেন, তা কি ভুলতে পারি?"

রামদাস বলল, "সেবার খেলাধুলোর প্রতিযোগিতায় দৌড়ে জগদীশদাই ত সব স্কুলকে হারিয়ে প্রথম হয়েছিলেন।" বিশু বললে, "শুধু খেলা আর গাছে চড়া কেন? সব রকম কাজ ভাল করার জন্যে আর কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে পুরস্কার ত উনিই পেয়েছিলেন।"

শ্যামল বলল, "জগদীশদা এখন সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে কাজ করেন, আমি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাই। তিনিই আমাকে এই ম্যাপের সন্ধান দিয়েছেন। এখন দেখা যাক গয়ার জেলার কোন্ দিকটা আগে দেখব। আমার ত মনে হচ্ছে প্রথমে বোধ-গয়ায় গেলেই ভাল হয়। তোমরা কি বল?" সকলে উপু হয়ে বসে ম্যাপ দেখে চীৎকার করে বলে উঠল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, বোধ গয়া যখন এখান থেকে মাত্র সাত-আট মাইল দূরে, তখন ওটা আমরা আজই সেরে ফেলতে পারব।"

দুপুরে তারা তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল। বোধ গয়ার রাস্তা ধরে তারা এগোতে লাগল। পথের দু'ধারে সবুজ মাঠ, কোথাও বা রাস্তার পাশে বড় বড় গাছের ছায়া, কোথাও বা রাখাল ছেলে আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছে। আবার একটু দূরেই ছোট্ট একটা পাঁচ ছ' বছরের ছেলে গরু-মহিষের পাল নিয়ে মাঠে চরাচ্ছে, বাচ্চা ছেলে, যখন ইচ্ছে হচ্ছে লাফিয়ে মহিষের পিঠে চড়ে বসছে। এই সব মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে সাত-আট মাইল পথ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। বোধ গয়ায় পৌঁছে তারা দেখল অপূর্ব সুন্দর গম্ভীর মন্দির, তার ভিতরে বুদ্ধদেব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন! মন্দিরের মধ্যে একজন জাপানী ভিক্ষু বসে একটি ডংকা বাজিয়ে চলেছেন, কতক্ষণে তাঁর পূজা শেষ হবে কে জানে! তারপর সকলে মিলে মন্দিরের চারপাশ ঘুরে দেখল,— কারুকার্যখচিত সুন্দর দেয়াল ও পাঁচিল, তার একদিকে

সেই চিরন্তন বোধি-দ্রুম। এই গাছটি অবিশ্যি সেই প্রাচীন বৃক্ষ নয়, কিন্তু তারি সন্তান! বাতাসে পাতা-গুলো থর থর করে কাঁপছে, সে যেন জগৎকে ডেকে বলছে—তোমরা দেখে যাও এই সেই জায়গা, যেখানে মহাজ্ঞানী মহাস্থবির তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন! শ্যামল, বিশু, ভানু ও রামদাস এই স্থানটি দেখতে পেয়ে নিজেদের জীবন ধন্য মনে করল। কাছাকাছি বুদ্ধদেবের আর কি কি স্মৃতি-চিহ্ন আছে দেখবার জন্যে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। সমস্ত দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। এখন তারা মন্দির থেকে বার হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছে। এমন সময় একজন ভিক্ষুর সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। কথায় কথায় ওদের পরিচয় পেয়ে ভিক্ষু বললেন, "এখন তোমরা অভুক্ত ফিরে যেতে পারবে না, আমাদের ধর্মশালায় অতিথিদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। আজ রাতে সেখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে কাল সকালে রওনা হয়ো।" চার বন্ধু সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হ'ল।

ভিক্ষু ধর্মশালার খাবার ঘরে তাদের নিয়ে গেলেন। ঘরটা খুব সুন্দর। খাবার ঘর এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে দেখে অবাক লাগল। শ্যামল দেখল যে তারাই একমাত্র অতিথি নয়, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত—তিব্বতী, জাপানী, ব্রহ্মদেশীয়, সিংহলী, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক, তা ছাড়া ইউরোপের দু' চারজন তীর্থযাত্রীও আছেন। বুদ্ধদেবের বিরাট কীর্তি দর্শন করতে এবং বুদ্ধের পায়ে নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এঁরা সকলে একত্র হয়েছেন। দিনের শেষে ধর্মশালার কর্তৃপক্ষের আপ্যায়নে এঁরা আহার করবার জন্যে এখানে সমবেত হয়েছেন।

পরিবেশন সুরু হ'ল। অতি সুন্দর সুগন্ধি চালের ভাত ও নির্ভেজাল ঘি দিয়ে আরম্ভ হয়ে ডাল ডাল ও পাঁচমিশালি তরকারির লাবড়া ও চাটনি দিয়ে আহার যখন শেষ হ'ল তখন বন্ধুদের মনে হ'ল যে তারা আজ অমৃতের স্বাদ লাভ করল।

খাওয়া-দাওয়ার সময় তাদের পাশে বসেছিল এক বাঙালী পরিবার। দাদু, মা আর দু'টি ছেলেমেয়ে। ছেলেটির নাম সমীর আর মেয়েটি কল্যাণী। দেখতে দেখতে তাদের সঙ্গে চার বন্ধুর খুব ভাব জমে উঠল। খেলাধুলো, স্কুলের গল্প ইত্যাদি ত হ'লই, তা ছাড়া তারা এখন কোথায় কোথায় যাবে সে বিষয়ে আলোচনাও হ'ল। খাওয়ার পর যখন বন্ধুরা ফিরে গয়ায় যাবার উপক্রম করছে তখন সমীরের মা জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন, "কি কাণ্ড! এই এত রাতে এত পথ তোমরা কি হেঁটে যাবে?"

তাতে বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠল, "আমরা ত এখন যাত্রী, সব রকম কষ্ট ত সহ্য করতে হবে।" সমীরের মা বললেন, "সে ত খুব ভাল কথা, কষ্ট স্বীকার করবার যে শক্তি তোমাদের আছে সেটা আমাদের আশা ও আনন্দের ব্যাপার। তবে কষ্ট ত নানা রকমেই সহ্য করা যায়। আমাদের সঙ্গে অনেক ভারি ভারি জিনিষ যাবে। সেগুলো ওঠান-নামান, তারপর পথে রান্না-বান্না, জল বয়ে আনা ইত্যাদি কাজগুলোও কষ্টসাধ্য, তোমরা এ সব করতে পার কি? এত সাহস কি তোমাদের আছে?"

বিশু আর রামদাস বলল, "এ সব কাজ আমরা খুব করতে পারি।" তখন সমীরের মা বললেন, "দাঁড়াও, আমি তোমাদের পরীক্ষা নেব। চল, এখন আমাদের ঘর বদলাতে হবে। জিনিষপত্র টানাটানির জন্যে লোক আনতে বলেছিলাম, তোমরাই না হয় সেই কাজটা করে দেবে। আর আজ রাতে আমাদের পাশেই যে ঘরটা খালি আছে, সেই ঘরে শুয়ে কাল আমাদের সঙ্গে গাড়িতে গেলে তোমাদের সময়ও কিছু নষ্ট হবে না।"

সমীরের দাদু হেসে বললেন, "বাঃ! বৌমা ত খুব সঙ্গী জুটিয়ে ফেললে দেখছি। সমীরের সঙ্গে এরা চার চারজন জুটলে পঞ্চ পাণ্ডবের মিলন হবে।"

শ্যামলরা অতি সহজেই সমীরদের মালপত্র অন্য ঘরে পৌঁছে দিল। সমীরের মা নিজেদের জিনিষপত্র থেকে চারটে চাদর বার করলেন। পাশের খালি ঘরে সেগুলো পেতে নিয়ে চার বন্ধুতে আরামে নিদ্রা দিল। ভোর-বেলায় যখন ঘুম ভাঙল তখনও সূর্য ওঠে নি। পাখীদের কাকলী শোনা যাচ্ছে। পূর্বাকাশ সোনার রঙে লাল হয়ে উঠেছে। বন্ধুরা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে দৌড়ে গিয়ে শেষবারের মত মন্দিরের শোভা ও বোধিদ্রুমকে দর্শন করে এল। ফিরে এসে দেখল সমীরের মা চায়ের

আয়োজন ক'রে গরম দুধ আর মুড়ি নিয়ে বসে আছেন। দাদু বলছেন, "বৌমা! তুমি চা করে ফেললে? আমাদের নকুল-সহদেবের রান্নার পরিচয়টা পেলাম না যে!"

তা শুনে ভানু বললে, "দাদু! আপনি কিছু ভাববেন না। দুপুরের রান্নাটা আমরাই ক'রে দেব।" কয়েকটা এনামেলের বাটি বার হ'ল। কল্যাণী বললে, "মা, আমি সকলকে খাবার দেব।" মা ত মহাখুসী। বলল, "তা ত দেবেই, আমাদের পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদী যখন নেই তখন তাদের দেখাশুনার ভার তাদের বোনকে, নিতে হবে। তোমার ওপর সেই দায়িত্ব রইল।"

কল্যাণীর বয়স আট বছর। কিন্তু সে কাজের ভার পেয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে দুধের বাটি হাতে নিয়ে সকলকে দুধ দেওয়া সুরু ক'রে দিল। একটা ধামার মধ্যে মুড়ি ছিল, হাঁড়িতে ছিল গুড়। প্রত্যেককেই আন্দাজ করে পরিবেশন করে গেল। এমন সময় কোথেকে একজন লোক এক কাঁদি কলা এনে হাজির। দাদু ত মহাখুসী। বললেন, "লোকে বলে কলা অযাত্রা, কিন্তু আমি বলি যে যাত্রার আরম্ভে এ রকম কলা পেয়ে আমাদের সুযাত্রা সুরু হ'ল। তিনি অনেকগুলি কলা কিনে নিলেন। দুধ-মুড়ি ও কলা দিয়ে সকলের ফলাহার হ'ল। ইতিমধ্যে সমীরের মা চা করে ফেলেছেন। কল্যাণী উঠে পড়ল কারণ তাকে চা পরিবেশন করতে হবে। পঞ্চ পাণ্ডব দেখল যে এত বড় গরম কেটলি নিয়ে কল্যাণী পেরে উঠবে না। কিন্তু তাকে যদি চা দিতে বারণ করা হয় তা হ'লে হয়ত তার মনে দুঃখ হতে পারে। ভানু বুদ্ধি করে বলল, "কল্যাণী, তুমি ওখানেই থাক, এটা একটা ক্যানটিন কি না, তাই আমরা প্রত্যেকে তোমার কাছে গিয়ে বাটি ধরব, আর তুমি ঢেলে ঢেলে দেবে। সেই মজা হবে।"

কল্যাণী ত মহাখুশী। সকলকে চা দিয়ে সে গর্ব অনুভব করল। এমন কি দাদু পর্যন্ত তার কাছে এসে চা নিয়ে গেলেন। খাওয়া শেষ হলে প্রত্যেকে নিজের নিজের বাটি ধুয়ে আনল, কেবল দাদু আর মায়ের বাটি দুটো তাদের নিজেদের মেজে আনতে হ'ল না, রামদাস আর বিশু তাঁদের হাত থেকে জোর ক'রে নিয়ে ধুয়ে আনল। তাদের এ কাজে দাদু খুব খুশী হলেন। মনে মনে ভাবলেন, "এ ছেলেরা ভবিষ্যতে ভাল ছেলে হবে। এদের মনে যেমন একদিকে সাহস আছে তেমনি অন্য দিকে রয়েছে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা। এই রকম মানুষই আমরা ভবিষ্যতে ভারতে চাই।"

দাদু ডাক দেবার মাত্রই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এল। গাড়িটা সাধারণ গাড়ির মত নয়। একটি বড় ভ্যানকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে সংসারের যত জিনিষ-পত্র যাতে বেঞ্চের তলায় খোপে খোপে ঢুকে যায়। জিনিষপত্রের আর কোন চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। ছেলেমেয়েরা সকলে গাড়িতে উঠে পড়ল। ড্রাইভারের পাশে দাদু ও মা বসলেন। গাড়ি রওনা হ'ল রাজগীরের পথে। অপূর্ব সুন্দর রাস্তা ধরে গাড়ি হু হু করে ছুটল। দু' পাশে শুধু বন আর জংগল। মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে সুদূরে নীলা পাহাড়। চার বন্ধুর মুখে আর কোন কথা নেই। সবাই ভাবছে বেড়ানটা যে এত সুন্দর ও এত ভালভাবে হবে তা তারা আগে কল্পনাও করতে পারে নি। শ্যামল ত মনে মনে একটা ছড়াই তৈরী করে ফেলল, "সাহসে মেলায় ভাগ্য ভয়েতে দুর্গতি।"

বন্ধুদের কাছে এ কথাটা বলার জন্যে মনটা ওর ছটফট করতে লাগল কিন্তু দাদু ও মায়ের সামনে গোলমাল করাটা অসভ্যতা হবে মনে করে সে আপাততঃ চুপ করে রইল।

একটি গিরিবর্ত্মের মত জায়গা পার হয়ে অবশেষে তারা রাজগীরে পৌঁছল। গয়া থেকে একচল্লিশ মাইল এই রাজগীর। দাদু কিন্তু এখানে নামতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "রাজগীরটা আমাদের খুবই ভাল করে দেখতে হবে, তাই এখানেই আমাদের আস্তানা করব, অতএব চল, এবেলা আমরা নালান্দা দেখে আসি। সেখানকার কীর্তিকলাপ দেখবার জন্যে আমার মনটা খুব ব্যস্ত রয়েছে।" সকলেই এ কথায় খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। কেবল সমীরের মা জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন; "তা হ'লে কিন্তু দুপুরে আবার সকলকে ফলাহার করতে হবে। রান্নার ত মোটেই সময় পাওয়া যাবে না।" দাদু বললেন, "আমাদের ত একাদশী করা

অভ্যেস আছে, আশা করি তোমরাও এক বেলা দৈ চিঁড়ে খেয়ে থাকতে পারবে।"

ছেলেরা সকলে সমস্বরে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই পারব, দৈ চিঁড়ে ত খুব ভাল জিনিস। বিশেষ করে সকাল বেলার কলাও আমাদের সঙ্গে আছে।" তাই ঠিক হ'ল, গাড়ি তখন আবার নালান্দার অভিমুখে ছুটল।

নালান্দা পৌঁছতে বেলা ২টা বেজে গেল। গাড়ি থেকে নেবে সকলের চিন্তা হ'ল খাওয়া-দাওয়া। দোকান খুঁজে বার করে দৈ কেনা হল। পাওয়া গেল চমৎকার খাজা। শীলাউয়ের খাজা অতি বিখ্যাত জিনিষ। এটা কিনতে পেয়ে সকলেই খুসী। গাড়ি থেকে কলা আর চিঁড়ে নাবিয়ে দৈ আর খাজা দিয়ে গাছের তলায় বসে পরম তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া করা হ'ল। তারপর টিকিট ঘরে গিয়ে টিকিট কিনে এনে সকলে চলল প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তির নিদর্শন দেখতে।

মাইল খানেক জোড়া একটা বিরাট জায়গা। তার অনেক অংশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে ভারতবর্ষের পুরাতন সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্মের কীর্তির বিশেষ বিশেষ নিদর্শনগুলো দেখা যায়। নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল এখন থেকে ২০০০ বছর আগে। এক সময় ১০,০০০ হাজার ছাত্র ও ১৫০০ শিক্ষক থাকতেন। প্রবেশদ্বারের ভিতরে চৈত্য বা মন্দির। আরও ভিতরে অসংখ্য স্তূপ। কোন স্মৃতিচিহ্নের উপর নির্মিত বেদী। এগুলি তৈরী হয়েছিল গুপ্ত ও পাল রাজাদের আমলে। এক শ'টি গ্রামের ফসল ও দুধ দিয়ে এর খরচ চলত। ভারতীয় ও বিদেশী ছাত্র এবং শ্রমণরা এখানে থেকে পড়াশুনা করতেন। এক একটি ঘরে দুই জন বা একজন থাকতেন। থাকবার ঘরগুলোতে একটি বেদীর উপর শোবার ব্যবস্থা ও জিনিসপত্র রাখবার ব্যবস্থা কিভাবে ছিল তা এখনও দেখে বুঝতে পারা যায়। আর দেখতে পাওয়া যায় জল-সরবরাহের প্রণালী। সেই পুরাকালে সভ্যতা কত উন্নতির স্তরে উঠেছিল ভাবতে বিস্ময় লাগে।

প্রাকৃতিক কারণে বা অত্যাচারীর হাতে এই সব চৈত্য, স্তূপ বা সৌধগুলি কতবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আবার সেগুলির উপরে নূতন করে সব গঠন করা হয়েছে। এই রকম অন্ততঃ নয়বার ভাঙা-গড়ার নিদর্শন সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে বুদ্ধমূর্তি ও নানা কারুকার্যখচিত দেয়াল। এ সবগুলো ভাল ভাবে দেখতে হলে বেশ কয়েক দিন সময় লেগে যায়। কিন্তু অত সময় না থাকাতে ছেলেমেয়েদের তাড়াহুড়ো করে ওখান থেকে বার করে নিয়ে দাদু যাদুঘরটি দেখতে গেলেন। ছোটখাটো অতি মূল্যবান পাথরের কারুকার্যের নিদর্শনগুলো সবই এখানে রক্ষিত হয়েছে। অতি সুন্দর এই জিনিসগুলি দেখে ছেলেমেয়েরা খুব আনন্দিত হ'ল।

বেলা পড়ে এসেছে। সকলে তাড়াতাড়ি গাড়িতে করে রাজগীরে ফিরে চললেন। রাজগীরে ওঁরা আগে থেকেই বিশ্রামশালার দুটো ঘরের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। ফিরে গিয়ে সোজা সেখানে উঠলেন। গাড়িতে জ্যোতির্ময়ী দেবী অল্প পরিমাণে চাল, ডাল ও আলু সর্বদাই রেখে দেন। এখন বাজারে আর না গিয়ে সেগুলো ষ্টোভে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। এই সব করতে রামদাসই বেশী ওস্তাদ। দাদু আর জ্যোতির্ময়ী দেবীকে ছেলেরা আর কিছুই করতে দিল না। বিশু আর ভানু এবার খাটিয়াগুলির উপর বিছানা বিছাতে লেগে গেল। কল্যাণী গিন্নিপনা করে বলল, "আমি পরিবেশন করব। অগত্যা ছেলেরা রাজী হ'ল। দোকান থেকে আনা হয়েছিল শালপাতা। থালা মাজবার আর কোন হাঙ্গামা হ'ল না। খাওয়ার পরে হাঁড়ি কড়া ঢেকে রেখে সকলেই শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকাল বেলা, অন্যদের ঘুম ভাঙবার আগেই শ্যামল আর বিশু হাঁড়ি কড়া মেজে ফেলেছে। তাদের তৎপরতা দেখে জ্যোতির্ময়ী দেবী ও দাদু আশ্চর্য বোধ করলেন এবং খুব খুশী হলেন। জলখাবারের জন্যে বেশী ভাবতে হ'ল না, কারণ ভোরবেলাতেই দুধওয়ালা এসে হাজির। বিশ্রামশালায় যাত্রী এলে ফিরিওয়ালারা জিনিসপত্রের বিক্রয়ের সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হয়। আর যাত্রীদেরও কেনাকাটার জন্যে ছুটোছুটি করতে হয় না। বেশ ভাল ভাবেই জলখাবারের পর্ব শেষ হল।

এবারে সকলে বেড়াতে যাবেন। কিন্তু ফিরে এসে কি খাওয়া হবে সে ব্যবস্থা না করে বার হওয়া যায় না—

সে কথা ভেবেই জ্যোতির্ময়ী দেবী একটা বিরাট হুকার সঙ্গে এনেছেন। ছেলেরা সকলে মিলে চাল, ডাল আর আলু ধুয়ে হুকারে চড়িয়ে দিল। চান করার জন্তে ঘরে তালা দিয়ে সকলে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথমেই চললেন ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। রাজগীরে অসংখ্য গরম জলের ঝর্ণা আছে। ব্রহ্মকুণ্ডটি কিন্তু একটি ঝর্ণা নয়। এটি একটি গরম জলের পুকুরের মত। অতিরিক্ত গরম মনে হওয়াতে আমাদের যাত্রীরা এখানে চান না করে এরই পাশ দিয়ে যে সপ্ত ধারার ঝর্ণা নামছে সেখানে গেলেন। অসংখ্য যাত্রী সপ্তধারার নিচে মাথা পেতে চান করছে। একটু বেলা হয়েছে বলে সব জায়গায় বেশী ভীড় জমে উঠেছে। কাজেই চান করতে বেশ একটু দেরিই হ'ল। কোন রকমে চান করে সকলে পাহাড়টার উপর একটু উঠলেন। তারপর গাছের তলায় পাথরের উপর বসে একটা পরামর্শ সভা করলেন। ঠিক হ'ল এ বেলা বেশী ঘোরাঘুরি না করে বিশ্রামশালায় ফেরা যাক। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকালে বেড়াতে যাওয়া হবে। তখন শরীরটা সুস্থ বোধ হবে। আর রোদটাও কম লাগবে। এই রূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে সকলে বিশ্রামশালায় ফিরে এলেন। দেখা গেল ভাত, ডাল, আলুর দম তৈরী হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে আনা হয়েছিল দৈ ও মিষ্টি। খাওয়ার ব্যাপারটা বেশ ভাল ভাবেই সমাধা হ'ল।

অল্প বিশ্রামের পর বেলা ছুটো আন্দাজ সকলে বেরিয়ে পড়লেন। রাজগীর একদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যে সমৃদ্ধ ও অন্তদিকে হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও বৌদ্ধদের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান। আমাদের যাত্রীদের এক একজনের মনে এক একটা বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল প্রবল হয়ে দেখা দিল। কল্যাণীর মন প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে ছুটল। সে বলে যে যতগুলো কুণ্ড ও ঝর্ণা আছে সেগুলো আগে দেখা যাক। জ্যোতির্ময়ী দেবী ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যগুলো, যেমন মগধের রাজার রাজধানী কোথায় ছিল, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক কোথায় লেখা হয়েছিল এবং মহাবীর ও বুদ্ধ কোথায় সাধনায় বসেছিলেন, এ সবগুলো দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ছেলেরা সকলে ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের পৌরাণিক স্থান দেখবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল। তখন দাদু বললেন, "এক কাজ করা যাক, চল আমরা আগে পাহাড়ে উঠি। পথে যে ক'টা ঝর্ণা আছে দেখে যাব। এতে কল্যাণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারপর সপ্তপর্ণী গুহা ও ত্রিপিটক লেখার স্থান দেখে নিয়ে ফেরার পথে ভীমের গদাযুদ্ধক্ষেত্রের সেই বিরাট উপত্যকাটি দেখে আসব।"

একথা প্রত্যেকেরই মনের মত হ'ল এবং সকলে পাহাড়ে উঠবার পথে রওনা হলেন। পাহাড়গুলোর নাম ভারি সুন্দর। বিপুল গিরি, উদয় গিরি, সোন গিরি, বৈভার ও কাছেই বাণগঙ্গা। অর্জুন তীর ছুঁড়ে এই বাণগঙ্গায় জল এনেছিলেন। বৈভার পর্বতে সপ্তপর্ণী গুহা। এই গুহা যে শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্মৃতির পীঠস্থান তা নয়; তার অপরূপ সৌন্দর্য সত্যিই লোকের মন হরণ করে। কি নিভৃত ও গম্ভীর অথচ একটি স্নিগ্ধ তীর্থস্থান। সহরের কোলাহল থেকে দূরে এই রকম জায়গাই সত্যিকারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের উপযুক্ত। পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ত্রিপিটক লেখার জন্ম এখানে একত্রিত হয়েছিলেন। এইখানে কিছু সময় কাটিয়ে এবার সকলে চললেন ভীমের গদাযুদ্ধের জায়গা দেখতে। জরাসন্ধ মথুরার রাজা কংসের শ্বশুর ছিলেন। তিনি আটাশ দিন ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে শেষে হেরে যান। ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে পিপলার গুহার একটা বড় পাথরকে জরাসন্ধের বৈঠক বলা হয়। তার কিছু দূরে মল্লযুদ্ধের উপত্যকা।

ছেলেরা দু'তিন জন আগে আগে আছে। দু'একজন বা পেছনে আর দাদু ও জ্যোতির্ময়ী দেবী আছেন মাঝখানে। ছুটোছুটি, হাসির গল্প করতে করতে উপত্যকাটির ঠিক উপরে এসেই সমীর দাঁড়িয়ে পড়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে চিৎকার করে বলল, "এই যে আমি ভীম, কার সাধ্য আছে জরাসন্ধ হবে? এগিয়ে এস।" শ্যামল আর বিশু ছিল দলের পেছনে। তারা দৌড়ে এল। একজন বলল, "ওসব হবে না, আমি হব ভীম।" তারা উৎসাহের চোটে এমন ভাবে ছুটোছুটি সুরু করে দিল যে গুরুজনদের অস্তিত্ব ভুলে গেল। দাদু এতে কিছুমাত্র বিরক্ত হলেন না, মুক্ত প্রান্তরে ওদের এই আনন্দ উল্লাস তাঁর ভালই লেগেছিল। এমন সময় জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন, "তোমরা মারামারি আর

গদাযুদ্ধ করতে গিয়ে বেচারী কল্যাণীকে যেন দু' ঘা বসিয়ে দিও না। কল্যাণী কোথায় গেল?" দাদু তখন বলে উঠলেন, "তাই ত কল্যাণী—কোথায় গেল? তাকে ত অনেকক্ষণ দেখি নি মনে হচ্ছে।" এ কথায় ছেলেরা চুপ হয়ে গেল। শ্যামল আর বিশু বলল, "কল্যাণী ত আগের দলে ছিল দেখেছিলাম।" সমীর বলে উঠল, "না, ঐ বাঁকটা ঘুরবার সময় সে যে বলল, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি পেছনে দলের সঙ্গে আসছি।" সকলেই মহা ভাবনায় পড়লেন। কি করা যাবে তাই তাঁরা ভাবতে লাগলেন। সপ্তপর্ণী গুহাতেও কল্যাণী ওদের সংগে ছিল, তারপরে অনেকখানি পথ আসা হয়েছে। পাহাড়ে রাস্তা, ঠিক কোন্ জায়গা দিয়ে আসা হয়েছে তা ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসছে। সংগে মাত্র একটি টর্চ আছে। এ অবস্থায় কল্যাণীকে কি ভাবে খুঁজে বার করা হবে তাঁরা ভেবেই পাচ্ছেন না। ভানু বলল, "আমরা এক একজন এক এক দিকে চলে যাই, গিয়ে গোটা পাহাড়টাতে গরু খোঁজার মত খুঁজে ফেলা যাক।" জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন, "ওরকম করলে শেষকালে তোমরা সকলেই হারিয়ে যাবে। একজনকে খোঁজার বদলে সবাইকে খুঁজতে হবে।"

নানা রকম পরামর্শের পর স্থির হল টর্চ নিয়ে শ্যামল পথ দেখিয়ে চলবে। অন্য ছেলেরা তার থেকে খানিকটা দূরে চারদিক খুঁজতে খুঁজতে যাবে। প্রত্যেকে এতটা দূরে থাকবে যে, তারা প্রত্যেকেই যেন শ্যামলের ডাক শুনতে পায়। আর যেন দেখতে পায় টর্চের আলো। শ্যামল তিনবার ডাক দিলেই অথবা তিনবার টর্চের আলো দেখালেই প্রত্যেকে সেখানে গিয়ে হাজির হবে। এই ভাবে খুঁজতে খুঁজতে তারা সপ্তপর্ণীর গুহার দিকে চলল। প্রায় অর্ধেক পথ যাওয়ার পর দূর থেকে বিশুর ডাক "শ্যামল, শীগগির এদিকে ছুটে আয়" শোনা গেল। শ্যামল অমনি টর্চ নিয়ে ছুটে গেল। গিয়ে দেখে বেশ বড় একটা পাথরের ওপর কল্যাণী আরামে ঘুমিয়ে আছে। শ্যামল তখন তিনবার ডাক দিল ও তিনবার টর্চের আলো দেখিয়ে সকলকে সেখানে জড় করল। দাদু, জ্যোতির্ময়ী দেবী ও ছেলেরা মনে করল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেখানে বসে পড়লেন। তখনই আবার জ্যোতির্ময়ী দেবীর মনে সন্দেহ হ'ল, কল্যাণী কি স্বাভাবিকভাবে ঘুমোচ্ছে, না খারাপ কিছু ঘটেছে। তিনি ভাল করে ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও শরীর দেখে নিশ্চিন্ত হলেন—না খারাপ কিছু হয় নি। মনের আনন্দে তাঁর দু' চোখে জল এসে গেল। দাদু ডেকে বললেন, "বৌমা, তুমি ওকে ডেকে ওঠাবে না?" জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন, "বাবা, আপনি ত জানেন না ওর ঘুমটা কি রকম। সন্ধ্যায় একবার ঘুমিয়ে পড়লে ডাকাডাকি করে ওকে জাগানো যায় না। এখন এই এতটা পথ ওকে কি করে নিয়ে যাওয়া যাবে তাই ভাবনা।" দাদু বললেন, "এই-বারে ভীমসেনদের বীরত্বটা দেখা যাবে।" ছেলেরা মহাখুসি হয়ে বলল, "আচ্ছা দাদু, তা হ'লে আমাদের পরীক্ষাটা এখনই হয়ে যাক্।" বসবার জন্যে আনা হয়েছিল একটা মোটা চাদর। শ্যামল সেটা পেতে ফেলে কল্যাণীকে তাতে শুইয়ে, একদিক নিজে ধরে বিশুকে অন্যদিকটা ধরতে বলল। এই ভাবে তারা অক্লেশে কল্যাণীকে নিয়ে চলল। খানিক দূর যাওয়ার পর আর দু'জন এগিয়ে এল। এই কাজের অংশ তাদেরও দিতে হবে। এই ভাবে পালা করে খুব তাড়াতাড়ি তারা বিশ্রামশালায় পৌঁছে গেল।

আগের দিনের মতই সেদিন খিচুড়ি রান্না হ'ল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকলে শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ছেলেরা জলখাবারের সময় মুখ টিপে টিপে হাসছে। কল্যাণী ত কিছুই বুঝতে পারছে না। এবারে মাকে জিজ্ঞাসা করল, "মা, ওরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন?" মা বললেন, "কাল তুমি কোথায় ঘুমিয়েছিলে মনে কর দেখি?" সে বলে উঠল, "ওমা, তাই ত, সপ্তপর্ণী গুহা দেখার পর তোমরা যখন ভীম-সেনের মল্লযুদ্ধের জায়গা দেখতে যাচ্ছিলে তখন পথে কি সুন্দর যে একটা পাখী দেখলাম তা তোমরা জান না। সেটাকে ধরবার জন্য ছুটেছিলাম। কিন্তু পারি নি, সেটা উড়ে গেল। কিন্তু তার পেছনে ছিল সুন্দর একটা খেঁকশিয়ালী—রংটা লালচে, মোটা ল্যাজ—তার বাচ্চাকে নিয়ে খেলছিল, একটা বাচ্চাকে ধরব মনে করে যেই পেছনে ছুটেছি সে-ও অমনি পালিয়ে গেল। আর আমি

ফিরে দেখি যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমাদের কত ডাকাডাকি করলাম তা কেউ শুনতে পেলে না। তখন আর কি করি, বেশ পরিষ্কার একটা জায়গায় শুয়ে আকাশে জলজলে তারাগুলো দেখতে লাগলাম। হ্যাঁ, মা, তার পরে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?" মা বললেন, "তোমার একটুও ভয় হয় নি? যদি বাঘ কি ভাল্লুক এসে পড়ত?" কল্যাণী বলল, "ভয় কেন করবে? কুকুর, বেড়াল, পাখী সবাইর সঙ্গেই আমার ভাব আছে। বাঘ কি ভাল্লুক যদি আসত ত কি মজাই হ'ত! তাদের সঙ্গেও ভাব জমিয়ে ফেলতাম। আর আমিও জানি তোমরা আমাকে খুঁজে নেবেই।" দাদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার মত সরল বিশ্বাস থাকলে আমরা বেঁচে যেতাম। আশীর্বাদ করি তোমার মনটা যেন চিরকাল এমনি থাকে।"

ছেলেদের হাসি আর ত থামে না। সমীর কল্যাণীর নিজের ভাই, সে বলে উঠল, "তুমি ত বেশ খেঁকশিয়ালের বাচ্চা দেখেছ, আর আমরা যে এদিকে একটা মজা দেখেছি তা ত শুনতে পাও নি।" কল্যাণী বলল, "কি মজা দাদা?" সমীর বলল, "মানুষের এক বাচ্চা দোল দোল করে চলেছে। আমরা যদি দোলা করে না নিয়ে তোমাকে একটা লাউয়ের খোলার মধ্যে ভরে সেই লাউ গড়গড় বুড়ীর মত ঠেলে দিতাম তা হ'লে ত আরও মজা হ'ত কি বল শ্যামল?" কল্যাণী কিন্তু এতে একটুও খেপলো না, সে বলল, "বাঃ আমাকে বুঝি দোলায় করে নিয়ে এলে? বেশ, বেশ মজা হয়েছে। এতগুলো ভাই থাকতে শেষে কি না আমাকে লাউ গড়গড় করে আনবে? তাতে আমার হাড়গোড় ব্যথা হয়ে যেত না? তখন তোমাদের ফুট-ফরমাস খাটত কে?" কল্যাণীর মা খুশী হয়ে বললেন, "ঠিক হয়েছে, এইবারে ভাইয়েরা খুব জব্দ। আর কল্যাণী এক গ্লাস জল দে বলা চলত না।"

আবার আজকে বেড়ানো হবে। আজ গৃধ্রকূটে যাওয়া হবে। এই গৃধ্রকূট পর্বতের চূড়ায় বেণুবনে বুদ্ধদেব থাকতেন। এখান থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে বিম্বিসারকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বিম্বিসার এখান থেকে পর্বতের চূড়ায় বুদ্ধদেবকে দেখতে পেতেন।

এই স্থানে যাবার আগে রান্নার জন্য কুকার বসানো হবে—আয়োজন হচ্ছে। রান্নার কাজে রামদাসই অগ্রণী, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে, রামদাস কোথায়ও নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে যখন তাকে পাওয়া গেল না তখন অন্যরা মিলে কাজের ব্যবস্থা করে রওনা হবেন ভাবছেন, এমন সময় পাশের ঘরে কাল রাতে যে নতুন যাত্রী এসেছেন তিনি ওদের দরজায় টোকা দিলেন। দাদু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বসালেন ও কথাবার্তা সুরু করলেন।

পরিচয়ে জানা গেল তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। শ্যামল আর বিশুর খোঁজ তিনি করলেন। তারা দু'জনে এগিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে যা শুনল তা হচ্ছে এই, —এই ভদ্রলোকের নাম রমাপতি বসু। রামদাসের ভগ্নীপতি। রামদাসের দিদি রামদাসকে কি সামান্য একটু বকেছিলেন সেই জন্য কাউকে না বলে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। রমাপতিবাবু স্কুলে গিয়ে খবর নিয়েছেন যে শ্যামল ও বিশুর সঙ্গে রামদাসের খুব ভাব ছিল। সেই সন্ধান নিয়ে শ্যামলদের বাড়ী গিয়ে শুনলেন যে তারা এদিকে বেড়াতে এসেছে। তখন কালবিলম্ব না করে সোজা এখানে হাজির হয়েছেন। রামদাসকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নেবেন। এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারলেন যে, রামদাস রমাপতিবাবুকে দেখেই পালিয়েছে।

অনেক খুঁজেও যখন রামদাসকে পাওয়া গেল না তখন সকলে কি আর করেন, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা ক'রে গৃধ্রকূট যাবার জন্য রওনা হলেন। তাঁরা রমাপতিবাবুকেও তাঁদের সঙ্গে বেড়ানোর জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। রমাপতিবাবু খুসি হয়ে তাঁদের সঙ্গে চললেন। এখানে তিনি এই প্রথম এসেছেন বলে কিছুই চেনেন না। দলের সংগে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে ভালই হ'ল। এই সময় দেখা গেল কল্যাণী একটি ছোট স্যুটকেশ ও ঘুড়ির সুতোর নাটাই নিয়ে চলেছে। ভাইয়েরা ত হেসেই অস্থির। স্যুটকেশের ভেতরে কি আছে তা জানবার জন্য তারা খুবই ব্যস্ত। কল্যাণী কিন্তু কিছুতেই বলল না। স্যুটকেশটা এত ছোট যে, তার ভেতর ঘুড়ি থাকতে পারে না। সমীর বিজ্ঞের মত বলল, "কল্যাণী

মনে হয় বড় রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক হয়ে গেছে। সে গৃধ্রকূটে গিয়ে বোধ হয় ঐ নাটাইয়ের সুতোর ঘুড়ির বদলে ঐ স্যুটকেশটাই উড়িয়ে চন্দ্রলোকে পাঠিয়ে দেবে। শ্যামল, বিশু আর ভাস্থ হাসি চেপে না রাখতে পেরে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। একমাত্র রমাপতিবাবু কল্যাণীর দিকে হলেন। তিনি বললেন, "চল দিদি, আমি তোমার স্যুটকেশটা নি, তুমি নাটাই নিয়ে চল, আমরা এগিয়ে চলি।" এই বলে তাঁরা রওনা হলেন। দাদু আর জ্যোতির্ময়ী দেবী ঘরে তালা লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন। কাজ সেরে তাঁরাও দু'জনে আগের দলকে ধরে ফেললেন। ছেলেরাও চারজন একসঙ্গে তাঁদের পেছন পেছন আসতে লাগল। তাঁদেরও পেছনে গৃধ্রকূট-যাত্রী আরও লোক আসছে দেখা গেল।

গৃধ্রকূট যাবার পথ বাঁধানো হলেও বেশ লম্বা ও ক্রমাগত উঁচুতে উঠতে হয় বলে গুহার কাছাকাছি এসে দাদু আর জ্যোতির্ময়ী দেবী একটা জায়গায় বিশ্রাম করতে বসে গেলেন। রমাপতিবাবু কল্যাণীর সঙ্গে থাকাতে কল্যাণীকে তাঁরা ওপরে যেতে দিলেন। ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করে পাহাড়ে উঠতে লাগল। তারা গুহার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে যে যেদিক দিয়ে পারে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে গেল। যে গুহার মধ্যে বসে বুদ্ধদেব তপস্যা করেছিলেন তা দেখতে পাবে এই আনন্দে সবাই আত্মহারা। কিন্তু তারা বেশীদূর এগোতে পারল না। হঠাৎ তারা একটা বিকট শব্দ শুনতে পেল। আর শ্যামল, যে সব থেকে আগে ছিল, সে দৌড়ে ফিরে এল। বলল, "আর ভেতরে গিয়ে কাজ নেই। ভয়ানক একটা বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার বাঘের ঘরের কাছে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়।" সকলেই বুঝল যে, আর এগোন উচিত হবে না। সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য পথ ধরে তারা নামতে সুরু করল। সেই দিকটা অনেক বেশী দুর্গম। এদিকে গেলে পথ হারিয়ে যেতে পারে মনে করে ছেলেরা একটু ইতস্ততঃ করছে এমন সময়ে তারা দেখল যে চারজন লোক যারা ওদের পেছনে আসছিল তারা একটা ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, কিছু না বলেই তারা চটপট শ্যামল, বিশু, ভাস্থ আর সমীরকে ধরে তাদের মুখ বেঁধে ফেলল। ছেলেরা ত একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছে। লোকগুলো তারপর ছেলেদের হাত-পা বাঁধবার ব্যবস্থা আরম্ভ করল। এমন সময় খুব কাছেই হঠাৎ মুখ জোরে "পুলিশ, পুলিশ" চিৎকার শোনা গেল। বেজে উঠল পুলিশের বাঁশী, লেগে গেল চারদিকে হৈ চৈ। লোকগুলো হতভম্ব হয়ে প্রাণপণে ছুটে যে যেদিক দিয়ে পারে ছুটে পালাল।

শ্যামল নিজের মুখের কাপড়টা খুলে ফেলেই আর তিন জনের মুখ খুলতে সাহায্য করল। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্। প্রথমে সমীরের মুখ থেকে কথা বেরোল। সে বলল, "এ রকম ব্যাপার যে এখানে ঘটবে তা ত কল্পনাও করতে পারি নি। যাক্, এ যাত্রা ত সকলে রক্ষা পেয়েছি। এখন চল, দেখি পুলিশ কোত্থেকে এল।" গোলমালের শব্দটা তখনও চলছিল। সেই আওয়াজটা লক্ষ্য করে ঝোপ, ঝাড় আর পাথরগুলো ডিঙিয়ে তারা যেখানে পৌছাল সেখানে দেখা গেল কল্যাণী আর রমাপতিবাবু এক রেডিও নিয়ে বসে আছেন। বিশু অবাক হয়ে বলল, "এ কি ব্যাপার, এখানেও রেডিও?" কল্যাণী হেসে উত্তর দিল, "আজকে রবিবার, সকালে ছেলেদের নাটক আছে। নাটকটা যে শুনতে হবে আমি ত আগেই ঠিক করে রেখেছি। অথচ বেড়ানোর প্ল্যানটাও ত ছাড়া যাবে না, তাই স্যুটকেশে করে রেডিওটা নিয়ে এলাম। তোমাদের কেমন জব্দ করে দিলাম?" ভাস্থ বলল, "তা সত্যি, কিন্তু এদিকে যে কি জব্দের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি তা কি তুমি জান?" ভাস্থ এর পর সেই দুর্বৃত্তদের কাণ্ডটা বর্ণনা করল। রমাপতিবাবু তখন উঠে পড়লেন। তিনি বললেন, "চল, ওদিকে মা আর দাদু কেমন আছেন সেটা দেখা দরকার।" জঙ্গলের মধ্যে পথ কোন্‌দিক দিয়ে সে কথা সকলে আলোচনা করতেই কল্যাণী খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল, "চল, রাস্তার ভাবনা তোমাদের করতে হবে না, আমিই পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে কল্যাণী নাটাইয়ের সুতোটি ধরে এগিয়ে চলল। সে বুদ্ধি করে পাকা রাস্তার পাশে একটা গাছের সঙ্গে সুতো বেঁধে এসেছিল। খুব সহজেই সেই সুতোটা অনুসরণ করে এসে দাদু ও জ্যোতির্ময়ী দেবীর কাছে পৌছল।

দাদু ও মা পাহাড়ের নীচে বসে বিশ্রাম করতে করতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন আর কি। ওরা যেতেই দাদু আর মা উঠে পড়লেন। সব কাণ্ডকারখানার কথা শুনে তাঁদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তাঁরা বললেন, "এত লোক এখানে আগে কোনও দিন ত এ ধরনের চোর-ডাকাতের কথা শুনি নি। রমাপতিবাবু বললেন, "রাজগীর ভ্রমণে ত আজকাল সকলেই আসে। বিশেষ করে উষ্ণ প্রস্রবণে বাত ও অন্যান্য অসুখের উপকার হয় বলে অনেক রুগ্ন লোকও আসে। কিন্তু চোর-ডাকাতের খবরটা সত্যি এর আগে শোনা যায় নি। তবে আমি রওনা হবার আগেই কাগজে দেখেছিলাম বটে যে একদল দুর্দ্ধর্ষ লোক কলকাতায় কাছেই নিজেরাও রাহাজানি করে বেড়াচ্ছে এবং অল্পবয়স্ক ছেলে ধরে নিচ্ছে নিজেদের দল বাড়াবার জন্যই বোধ হয়। সম্ভবতঃ সেই দলই এখানেও এসেছে।"

সকলের মনেই একটা শঙ্কা জেগে উঠল রামদাসকে তারাই ধরে নিয়ে যায় নি ত? আর দেরি না করে সবাই মিলে বিশ্রামশালায় ফিরে এলেন। এবারে দাদু বললেন, "আমাদের ত অনেক দিন বেড়ান হ'ল আর অনেক জায়গা দেখা হ'ল, চল, এবার বাড়ী ফেরা যাক।" "এ কথায় জ্যোতির্ময়ী দেবী বললেন, "জৈন তীর্থস্থান পাওয়া-পুরী না দেখেই ফিরে যাব?" রমাপতিবাবু বলে উঠলেন, "সত্যিই, শুনেছি ওটা না কি এতি সুন্দর জায়গা। হ্রদের মাঝখানে মর্মর নির্মিত জৈন মন্দির দেখতে অপূর্ব।" রাজগীর থেকে এই পাওয়া-পুরী মাত্র বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত। যাই হোক, হিসেব করে দেখা গেল যে, তাড়াতাড়ি না ফিরলে স্কুল কামাই হবে। ওদিকে রমাপতিবাবুরও ব্যবসায় নানা ক্ষতি হতে পারে। অতএব এখন ফিরে যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। তা ছাড়া রামদাস কোথায় গেল সে চিন্তাতে সকলের মন ভারাক্রান্ত। কলকাতায় ফিরে গেল কি না দেখতে হলে সেখানে তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। কাজেই ফিরে যাওয়াই স্থির হ'ল।

পরদিন সকলে গাড়ি করে কলকাতায় ফিরে যাবেন ঠিক হ'ল। রমাপতিবাবু কিন্তু ওদের সংগে যেতে রাজী হলেন না। বললেন, "রামদাস কোথায় আছে কে জানে। কাছাকাছি যদি থাকে ত আমাকে তোমাদের সংগে দেখলে হয়ত আরও দূরে পালাবে। তোমরা নিজেরা আছ দেখলে সে ফিরে দলে যোগ দিতেও পারে। কাজেই আমি ট্রেণেই চলে যাই। পথে নানা ষ্টেশনে খোঁজখবর নিয়েও যেতে পারব।" সমীর আর শ্যামল সকালে তাঁকে তুলে দিতে তাঁর সংগে রাজগীর ষ্টেশনে গেল। ওরা রমাপতিবাবুকে একটা কামরায় বসিয়ে দিল। গাড়ি ছাড়তে এখনও বেশ সময় বাকি আছে। শ্যামল আর সমীর ফিরে আসবে, ঠিক সেই সময় শ্যামল দেখল পাশেই অন্য একটা কামরা থেকে জগদীশ মুখ বার করে আছে। শ্যামল সমীরকে নিয়ে সেই দিকে ছুটে গেল। জগদীশ শ্যামলকে দেখে খুব খুসী। বলল, "আচ্ছা ভাই তোমরাও এসেছ দেখছি। আমি অফিসের একটা জরুরী কাজে এখানে এসেছিলাম। আরে, আমার জুতো ব্রাশ করিয়ে ছেলেটা গেল কোথায়? ছোকরা পালাল না কি?" গাড়িতে একটা সোরগোল বেধে গেল। দেখা গেল জুতো ব্রাশ করিয়ে ছেলেটা একটা বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে আছে। সকলে দেখা মাত্রই টানাটানি করে তাকে বের করে নিয়ে এল। তার মধ্যে একজন বললেন, "ছোকরা নিশ্চয়ই চোর। তা না হ'লে ওরকম লুকোবে কেন? ভীড়ের মধ্যে থেকে আর এক বীর সদর্পে আস্তিন গুটিয়ে ছেলেটাকে উত্তম-মধ্যম দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। জগদীশ খপ্ করে তার হাতখানা চেপে ধরল। বলল, "দেখুন ও পালাতে পারবে না। পালাবে কেমন করে? আপনারা সবাই ত মাথায় ওর থেকে হাতখানেক লম্বা আর ওকে ঘিরে রয়েছেন। কোন কিছু না জেনেই ওকে মারলে কি আমাদের খুব একটা দেশোদ্ধার করা হবে? এস ত বাচ্চা, এদিকে এস। তোমার কি হয়েছিল শুনি? আরে, এর মুখটা যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে। তোমার নামটা কি বল ত? ততক্ষণে শ্যামল আর সমীর ভীড় ঠেলে জগদীশের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামল বলে উঠল, "বাঃ, এ যে রামদাস। তুই কি ভেবেছিস যে এই ছেঁড়া প্যাণ্ট পরে মুখে কালি মেখে ঘুরলে আমরা তোকে চিনতে পারব না? তুই করেছিস কি? কি হয়েছে বল ত? রাম-

দাস কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "কি করব ভাই, ট্রেণের ভাড়া আর পেটটা চালাতে হবে ত? তাই স্বাধীন ব্যবসা করে আয় করছিলাম।" সমীর বলল, "কেন আমাদের সঙ্গে কি খেতে পেতে না? তা ছাড়া ট্রেণের টিকিটও ত লাগত না, সবাই ত গাড়িতেই যাচ্ছিলাম, তবে তোমার এই দুর্মতি হল কেন?" রামদাস বলল, "হ্যাঁ, তোমাদের সংগে কেমন করে যাব? তোমাদের ঘরে যে কেউটে সাপ এসেছে।" শ্যামল আর সমীর এক-সংগে বলে উঠল, "কেউটে সাপ, সে আবার কি? ওঃ বুঝেছি, রমাপতিবাবুর কথা বলছিস বুঝি? তাঁকে তোর এত ভয় কিসের? তিনি ত খুব ভাল লোক।" রাম-দাস বলল, "ভয় করব না? দিদি আর উনিই ত পরামর্শ করে আমাকে আর্টস পড়াবার চেষ্টায় ছিলেন। ঐ সব পড়ে কি আর কোন দিন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারব? অফিসে কেরাণী হয়ে চিরদিন কাটাতে হবে।" জগদীশ এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছিল। অন্য সব লোক যখন দেখল যে ছেলেটা চুরি করে নি এবং মার-ধোর করবার কোনও সুযোগ মিলবে না তখন তারা থেমে গেল। জগদীশ কিছুটা আঁচ করে নিয়েছে। সে হেসে বলল, "আর্টস পড়লে শুধু কেরাণী হতে হয় না। অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক, লেখক ও বিদ্বান লোক আর্টসই পড়েছেন। তবে তোমার যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছা হয় সেটা অন্য কথা।" শ্যামল বলল, "এই নিয়ে ঝগড়া করে বুঝি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিস?"

এই কামরায় অনেকক্ষণ ধরে একটা গোলমাল হচ্ছে শুনে রমাপতিবাবু কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা কেউ টেরই পায় নি। এবারে তিনি বলে উঠলেন, "এই ব্যাপার নিয়ে দিদির সংগে ঝগড়া হয়েছে সেকথা আমাকে জানালেই হ'ত। আমি ত তোমাকে ইঞ্জি-নিয়ার করতেই চাই। তুমি ঘুণাক্ষরেও যদি এ কথা আমাকে জানাতে তা হ'লে এই এত সময় নষ্ট আর এত টাকাও খরচ হত না। এত দুশ্চিন্তা আর এত খোঁজা-খুঁজিও করতে হ'ত না। বেশ ত, তুমি ইঞ্জিনিয়ারই হবে। এখন চল, আমার সংগে বাড়ী যাবে।" সমীর এবারে রমাপতিবাবুকে বলল, "এইবারে রামদাসকে নিয়ে আমাদের সংগে চলুন। আমরা একই সংগে বাড়ী ফিরে যাব।" শ্যামল তখন জগদীশের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবে আছে দেখে বলল, "আপনি ত শ্যামলদের জগদীশদা, আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি। আপনি আপনার ম্যাপের তল্পি-তল্পা নিয়ে আমাদের সংগে চলুন। নতুন পথ দিয়ে গাড়িতে যেতে হলে আপনি সংগে থাকলে অনেক সুবিধা হবে।" রমাপতিবাবু আর দেরি না করে বললেন, "চলুন জগদীশ-বাবু, সমীরের মা আর দাদুকে না দেখলে বেড়ানোর আনন্দটাই পুরো হবে না। পথে অনেক রকম মজা করা যাবে।" এদের সকলের আগ্রহ দেখে জগদীশ রাজি হ'ল। গাড়ি থেকে নেমে সকলে বিশ্রামশালায় গিয়ে হাজির হ'ল। শ্যামল আর সমীরের সংগে রমাপতিবাবুকে ফিরে আসতে দেখে জ্যোতির্ময়ী দেবী একটু ভাবনায় পড়েছিলেন। এর মধ্যে দাদু হেসে উঠলেন, "ঐ যে আমাদের পলাতক আসামী দেখছি পেছনে আসছে।" শুনে সকলে মহাখুসী।

সবাই এখন এক জায়গায় হয়েছে। জগদীশের পরিচয় পেয়ে দলের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। একটু পরেই গাড়ি সকলকে নিয়ে রওনা হ'ল। মনের আনন্দে সকলে গান ধরল "আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু।"

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

সব মানুষের কাছেই বোধ হয় নিজের প্রথম জীবনের দিনগুলির মূল্য নানা কারণে খুব বেশী। অনাবিল সুখ যে কি, তা মানুষ বাল্যকালেই ভোগ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতা অনেক বেড়ে যায়, আনন্দের বদলে জীবনে সংঘাত আর সংগ্রামই জায়গা জুড়ে বসে। তাই মানুষ অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেশী করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই স্মৃতির ছবিগুলির রং যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

আমার প্রথম জীবনে ডাইরি লেখার অভ্যাস ছিল। দশ-বারো বৎসরের ডাইরির খাতা এখনও আমার কাছে ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। যা কিছু তখন লিখেছিলাম, তার বেশীর ভাগেরই মূল্য শুধু আমার কাছে, তবে এমন কথাও জায়গায় জায়গায় আছে যা বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকার কাছে ভালই লাগতে পারে। এগুলি যখন লিখতে আরম্ভ করি তখন আমার বয়স বছর ষোল হবে, স্কুলের পর্ব্ব তখনও শেষ হয় নি। অর্দ্ধ শতাব্দীর বেশ কিছু আগের কথা।

১৬ই অক্টোবর (১৯১১)—কাল ৩০শে আশ্বিন। বঙ্গের অবচ্ছেদের কথা বাঙালী যাতে না ভোলে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ এই দিনে রাখী বন্ধনের নিয়ম করেছেন। এলাহাবাদে থাকতেই আমরা রাখী বন্ধন করতাম। মা আগের দিন খাবার তৈরি করে রাখতেন, কারণ এই নির্দ্দেশ ছিল যে, ছোট ছেলেমেয়ে আর রোগীদের জন্যে ছাড়া রান্না করা হবে না ৩০শে আশ্বিন। আমরা বসে বসে হলদে আর লাল রেশমের সুতো দিয়ে অনেক রাখী তৈরি করলাম। কেনা রাখীগুলো বড় জবড়জঙ্গ দেখতে, আমার পছন্দ হয় না। সব জায়গায় ত নিজে গিয়ে রাখী পরান যায় না তাই অনেক জায়গায় ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। ভোরবেলা দিদি আর কুচু (অশোক) মিলে অনেক গান করেছিল। স্নানের পর পাড়ায় চেনাশোনা যত মানুষ ছিল, সকলকে রাখী পরালাম। রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা গানের দল চলেছে। আজকে খাওয়া-দাওয়াটা বেশ সংক্ষিপ্ত, কাজেই দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। বিকেলে অনেক মিছিল গেল রাস্তা দিয়ে।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯১১—কাল এক কাণ্ড হয়ে গেল। বেথুন কলেজের একটা পার্টি সেরে এসে, সাজসজ্জা ছেড়ে ঘরের কাপড় পরে দুই বোনে পড়তে বসেছিলাম। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। এমন সময় মনে হ'ল ঘরটা একটু একটু কাঁপছে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে জোরে ট্রাম গেলে বাড়ীটা একটু একটু কাঁপে, প্রথমে ভাবলাম সেই রকমই কিছু হচ্ছে বুঝি। হঠাৎ ঘরটা বেশ জোরে দুলে উঠল আর ঘরের চেয়ার-টেবিল গুলো নাচতে আরম্ভ করল। ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। দিদি এতক্ষণ বুঝতেই পারে নি যে কি হচ্ছে, আমার চিৎকার শুনে সেও উঠে পড়ল। ছোট দুই ভাই পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। দাদা এক লাফে ঘরে এসে মুলুকে একটানে কাঁধে তুলে নিয়ে কুচুকে জোরে একটা ধাক্কা লাগাল। কিন্তু তার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল না। ইতিমধ্যে আবার একটা ভয়ানক ধাক্কা এল, আমার মনে হ'ল ঘরটা ঠিক গলির ভিতর উলটে পড়ছে। দাদা আর একবার কুচুকে জাগাবার চেষ্টা করল। না পেরে মুলুকে নিয়েই নীচের দিকে ছুটল। মাও উপরে ছুটে এলেন ছেলেমেয়েরা কি করছে দেখতে। আমি ততক্ষণে দোতলায়। সেখানে এসে দেখি বড়মামা চোর এসেছে ভেবে লাঠি খুঁজছে, তার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি। ব্যাপারটা কি তাকে বুঝিয়ে দিতে দিতে নীচে নেমে পড়লাম। বাবা তখন কোথা থেকে যেন বাড়ী ফিরছিলেন, সকলে মিলে একসঙ্গে সমাজপাড়ার মাঠে গিয়ে হাজির হলাম। কুচুকে কোনমতে টানতে টানতে নিয়ে মা আর দিদিও নামলেন। নামতে বেশ খানিকটা দেরিই হয়েছিল আমাদের, মাথার উপর বাড়ীটা স্বচ্ছন্দেই ভেঙে পড়তে পারত। মাঠে এসে দেখি সেখানে রীতিমত ভীড় জমে গেছে। অনেকে খেতে খেতে এঁটো হাতে নেমে এসেছে। পাশের বাড়ীর সুন্দরী খুকীটি প্রায় কিছু না পরেই এসেছে ঠাকুরমার সঙ্গে। ভীষণ শীত, বুদ্ধি করে একটা গরম র‍্যাপার গায়ে দিয়ে এসেছিলাম, তাই আমিই তাকে তাড়াতাড়ি কোলে নিলাম। তখনও ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছে। আর কিছু হ'ল না দেখে খানিক পরে যে যার বাড়ী ফিরে এলাম। ঘুমটা তারপর আর ভালভাবে এল না।

১২ই ডিসেম্বর—আজকের দিনটা সমস্ত বাংলা দেশের

পক্ষে একটা উৎসবের দিন। ছয়-সাত বছর আগে ইংরেজ শাসক বাংলা দেশকে ভেঙে দু'টুক্‌রো করেছিল, আজ তা আবার জোড়া লাগল। এত বৎসর ধরে এই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের জন্ত কত আন্দোলন, কত রক্তপাত হয়ে গেল। আজ তার অবসান। সত্যিই আজকের দিন শুভদিন। আজ তাঁদের কথা মনে হচ্ছে যাঁরা এই আন্দোলনের মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছেন। তাঁদের আত্মদান সার্থক হ'ল। কেমন করে খবরটা শুনলাম তাই বলি।

দাদারা G. P. O.-তে গিয়েছিল খবর জানতে। দুপুরে ফিরে এসে বলল যে দিল্লীর দরবারে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করার কোনো কথাই ওঠে নি। সকলেই অত্যন্ত নিরাশ হলাম।

অতঃপর একটু বেরলাম। চারুবাবু অনেকদিন অসুখে ভুগছিলেন। কাছেই শিবনারায়ণ দাসের লেনে তাঁর বাড়ী একটু গিয়ে তাঁকে দেখে এলাম। সেখান থেকে ফিরে একটু পড়তে বসলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পিছনে যে ছোট মাঠ ছিল, সেখানে ত রোজ সন্ধ্যায় বেড়াই। দিদি, আমি আর আমার এক বন্ধু এই তিনজন বেড়াচ্ছি, এমন সময় দিদির মাষ্টারমশায় আসাতে সে ফিরে গেল। মন্দিরে তখন উপাসনা হচ্ছিল। আমরাও অল্প পরে বেড়ান শেষ করে বাড়ী ফিরলাম।

হঠাৎ রাস্তার দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল। বারান্দায় বেরিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম একদল ছেলে, সকলেই প্রায় এক একটা সাইকেল হাতে করে চলেছে। খুব চেঁচামেচি করছে সবাই মিলে। আমাদের বাড়ীর সামনে এসেই চিৎকার করে উঠল, "রামানন্দবাবু কোথায় ?" মা বললেন, "তিনি বাড়ী নেই।" ছেলেগুলি চেঁচিয়ে বলল, "পার্টিশন রহিত হয়েছে", বলেই আবার দৌড় দিল। আমি প্রথমে গোলমাল চেঁচামেচি শুনে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, যে, আবার কাউকে দ্বীপান্তর করা হ'ল না কি। এখন আসল ব্যাপারটা শুনে খুব আনন্দ হ'ল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ভাবলাম খবরটা কাকে দিই। দিদি তখনও পড়ছে, তার মাষ্টারমশায় শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার তখনও আলাপ হয় নি। কিন্তু উৎসাহের চোটে তখন অত সামাজিক আইন-কানুন মানা গেল না। দিদিকে ডেকে খবরটা দিলাম, সেও সতীশবাবুকে বলে দিল। তিনি ত শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করলেন না, তারপর আমার কাছে সব বৃত্তান্ত আগাগোড়া শুনে স্ফুহকে বললেন, "বাড়ী ভাল করে আলো দিয়ে সাজাও", বলেই ছাত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে হুড়মুড় করে প্রায় দৌড়ে চলে গেলেন।

তিনি যাবার পরে বাড়ীতে আলো দেওয়ার ধুম পড়ে গেল। পাড়াতে সবার আগে আমরাই আলো দিয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে অন্তরাও দিল। রাস্তা দিয়ে মিছিল যেতে লাগল। ভাইরা তাদের সঙ্গে চলে গেল। ১৭ই ডিসেম্বর এই উপলক্ষ্যে অনেক বাড়ী-ঘর সাজান হ'ল। আমরাও সাজিয়েছিলাম, দেখতে বেশ ভালই হয়েছিল।

২৮শে ডিসেম্বর কলকাতায় Theistic Conference হয়ে গেল। শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথ আসবেন। এসেও ছিলেন। কাল তাঁর প্রবন্ধ পাঠ হয়ে গেল। সিটি কলেজের তিন তলার মাঝারি গোছের একটা হলে সভার জায়গা হয়েছিল। আমরাও সকাল সকাল গিয়ে জায়গা জুড়ে বসলাম। ঘরটা খুব বেশী বড় নয়, সিঁড়িও সরু, বেশী ভীড় হলেই মনে হয় সবশুদ্ধ ভেঙে পড়বে। আর একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা দেবেন সুতরাং ভীড়টা কি রকম হয়েছিল তা কল্পনা করা শক্ত নয়। সরোজিনীকে এই আমি প্রথম দেখলাম। খুব উজ্জ্বল চেহারা, বলেনও ভারি সুন্দর। একদল volunteer তাঁকে খুব ঘটা করে নিয়ে এল, তার মধ্যে আমার ছোট ভাই মুলু ছিল। সভাপতি হয়েছিলেন Mr. Raghunathaiya বলে দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক। বৃদ্ধের চেহারাটা ভারি অমায়িক আর ভদ্র আর তিনি এমন সস্নেহ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাচ্ছিলেন যে মনে হচ্ছিল সমস্ত মানব জাতির সঙ্গেই তাঁর একটা প্রীতির সম্বন্ধ আছে। নীচে খুব গোলমাল হচ্ছিল, শুনলাম যে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, তবে সিঁড়িতে এমন ভীড় যে তাঁকে উপরে নিয়ে আসাই যাচ্ছে না। বাস্তবিক তাঁর উপরে এসে পৌছতে খুব দেরিই হয়ে গেল। সভা আরম্ভ হ'ল, প্রথম গান হয়ে গেল, সভাপতি উঠে প্রার্থনা সুরু করলেন, এমন সময় সিঁড়ির মুখে শোনা গেল প্রচণ্ড করতালি। রবীন্দ্রনাথ উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছেন সেটা বুঝলাম, তবে এরকম করে প্রার্থনার মধ্যে করতালি দেওয়াটা ভাল লাগল না। কবি এসে আসন গ্রহণ করবার পরে কনফারেন্স-এর রিপোর্ট পড়া হ'ল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ পড়তে উঠে দাঁড়ালেন। খুব বেশীক্ষণ বললেন না। তাঁর পরে নব-বিধান সমাজের বিনয়েন্দ্রনাথ সেন একটা ছোট বক্তৃতা দিলেন। বেশ ভাল বলেন ভদ্রলোক। আর একটি গান হবার পর সভা ভঙ্গ হ'ল। রবীন্দ্রনাথ উঠবার সময় যথেষ্ট হয়রান হয়েছিলেন, তাই বোধ হয় গান শেষ হবামাত্র তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন।

২৯শে ডিসেম্বর—রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরীর কলকাতায় আসা নিয়ে খুব ক'দিন হৈ চৈ চলল। আমার

দু' মাস পরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা, কিন্তু বেথুন স্কুল আর কলেজ থেকে তিন-চার গাড়ি ভর্ত্তি বালিকা আর মহিলা রেড রোডের সমারোহে যোগ দিতে যাচ্ছে শুনে আমিও হুজুকে যোগ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে স্কুলে চললাম, সেখান থেকে স্কুলের বাসে অন্যদের সঙ্গে যাব। (তখনকার কালে তের-চৌদ্দ বছর পেরলেই মেয়েদের মস্ত বড় মহিলা মনে করা হ'ত। তারা ফ্রক পরার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। আজ ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বসে ভাবছি যে আমাকে সেই বয়সে শাড়ী-জামা পরে, মাথায় ঘোমটা চড়িয়ে যেতে দেখলে আমার নাতনীরা নিশ্চয় মুর্চ্ছা যেত।)

স্কুলে গিয়েই যে রাজ-দর্শনে সরাসরি যাত্রা করতে পারলাম, তা নয়, অনেক বকাবকি-চেঁচামেচির পর তবে গাড়ি ছাড়ল। সেই বেথুন কলেজ থেকে রেড রোড প্রায় এক দেশ থেকে আর এক দেশ, তাও যাচ্ছি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে। অনেকক্ষণ লাগল গন্তব্যস্থানে পৌছতে। রাস্তাতেও ভয়ানক ভীড়, গাড়ি খালি আটকে আটকে যাচ্ছে। ট্রামগুলো ত ভেঙ্গে পড়বার যোগাড়। দলে দলে সব ছোট-বড় স্কুলের ছেলে রাস্তা দিয়ে মার্চ্চ করে চলেছে। অনেক কষ্টে গিয়ে ত ঠিক সময় পৌঁছলাম। রাস্তার এক ধার জুড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসবার জন্যে খোলা গ্যালারি, মাথার উপর রোদ-জল আটকাবার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে উঠে বসবার আগেই দু'টো জিনিষ লাভ হ'ল, একটা flag আর একটা medal

গিয়ে ত বসলাম। রোদে খুবই কষ্ট হত, তবে বু—দির দয়ায় তা হ'ল না। তাঁর ছাতাটায় ভাগ বসালাম। আমাদের পিছনে অর্থাৎ উপরে একদল মফঃস্বল স্কুলের মেয়ে রোদের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার আশায় মাথায় কাগজের তৈরি গাধার টুপি পরে বসেছিল। তাদের দেখে আমরা হাসলাম বটে, তবে যা রোদ, ওদের দোষ দেওয়া যায় না। আর তাদের বয়সও খুবই কম, তবে তাদের শিক্ষয়িত্রীরাও পরেছিলেন বলে একটু হাস্যকর লাগছিল। আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল বড় বেশীক্ষণ। আমরা ওখানে গিয়ে পৌছেছিলাম ১০টার সময় আর রাজা যখন এলেন, তখন বেলা ২টা। রাজাকে অভ্যর্থনা করার জন্য দলে দলে সৈন্য, গাড়ি ঘোড়া কত কি গেল। সৈন্যগুলোই ছিল আসল দেখবার জিনিষ। রেড রোডের সাজসজ্জা তেমন কিছু ভাল হয় নি। অন্য সব সৈন্যরা চলে যাবার পরও, কেবল একদল Highlander তাদের জাতীয় পোষাক পরে, রাস্তার দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ তারা ঐ ভাবে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ royal procession গেল ততক্ষণ তাদের মনে হচ্ছিল পাথরের মূর্ত্তি, মানুষ নয়। সৈন্যদের ব্যাণ্ড বাজনাটাও খুব ভাল হয়েছিল।

একজন মেম সবাইকে তালিম দিয়ে বেড়াচ্ছিল, রাজা এলে কি বলে জয়ধ্বনি করতে হবে। তাঁদের slogan হ'ল, "জয়তু জয়তু সম্রাট, জয়তু জয়তু সম্রাজ্ঞী"। মেমী উচ্চারণে সংস্কৃত যা শোনাচ্ছিল তা আর কি বলব। বলা বাহুল্য আমরা বড় মেয়েরা এ উৎকট চীৎকারে যোগ দিই নি।

রোদে বসে বসে যখন মাথা বেশ ধরে গেল, তখন রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এসে পৌছলেন হাবড়ায়। বার বার তোপধ্বনি হতে লাগল। আমাদের সামনা-সামনি, রাস্তার ওধারটায় যে বিরাট জনতা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের বেড়ার মধ্যে আটকে রাখবার জন্য এতক্ষণ পুলিশ বেদম প্রহার করছিল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হ'ল না, তারা পুলিশদের উল্টে ফেলে দিয়ে একেবারে পাঁচিলের উপরে এসে পড়ল। যাক, রাজার মিছিল অতঃপর এগিয়ে এল। প্রথমে চলল একদল দারুণ জমকাল পোষাক-পরা সৈন্য, কাল রংএর পোষাক, আগাগোড়া জরির কাজকরা। নানা regiment-এর সৈন্য গেল, সবশুদ্ধ বেশ কয়েক হাজার হবে। এরপর এল রাজার গাড়ি। সবাই খুব চেঁচাতে লাগল। গাড়িতে শুধু রাজা আর রাণী। রাজা সামরিক পোষাক পরা, helmet-এ হাত ঠেকিয়ে চিৎকারের জবাব দিচ্ছেন। রাণী সাদা পোষাক পরা, জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন, আমরা তাঁর মুখ দেখতে পেলাম না।

রাজার গাড়ির পরে আরও কয়েকখানা গাড়ি গেল। তাতে কারা ছিলেন জানি না। Lord Cread প্রভৃতি হবে হয়ত। রাজার গাড়ির পর চলল আবার দলে দলে সৈন্য। এই সময় গেট খুলে দেওয়াতে জনতা রেড রোডে এসে পড়ল এবং সেনাদল আর জনতা মিশে গেল। মেয়ে দেখলে একটু কিছু বাঁদরামি না করে এরা পারে না, রাজেই কিছু জ্বালাতনও হতে হ'ল।

রাস্তার ভীড় খানিকটা কমে গেলে আমরা গ্যালারির থেকে নেমে স্কুলের গাড়ির দিকে চললাম। গ্যালারির পর খানিকটা জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে থেকে বেরিয়ে কাগজের ব্যাগ ভরা খানিক কেক্ বিস্কুট এবং শিশুজীবন বলে একখানা বই পেলাম। আমাদের একটা group ছবিও তোলা হ'ল। পুলিশের সাহায্যে ভীড় ঠেলে এসে গাড়িতে উঠলাম এবং অনেকক্ষণ পরে বাড়ীতে এসে পৌছলাম। ভাইবোনরা গল্প শোনার চেয়ে থলি ভর্ত্তি খাবারের সদ্ব্যবহার করতেই বেশী ব্যস্ত রইল। পরে পরে

বা একদিন অন্তর সরকারী উদ্যোগে বাজী পোড়ান আর illumination হ'ল। বাজীটা বাড়ী থেকেই বেশ খানিকটা দেখা গেল। তবে ভয়ানক শীত, খুব বেশীক্ষণ ছাদে থাকতে পারলাম না। শহরের আলোকসজ্জা দেখবার জন্যে এক দল ছেলেকে escort স্বরূপ জোগাড় করে রাস্তায় রাস্তায় খানিক ঘোরা গেল। খুব বেশীদূর যাওয়া হয় নি, খুব বেশী ভীড়, এবং escort-দের ক্ষিদে পেয়ে গেল।

২৫শে জানুয়ারী, ১৯১২—এবারের মাঘোৎসবটা একটা কারণে স্মরণীয়। এবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ১১ই মাঘের উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। আগে কখনও যাই নি। ওঁদের বহু পুরণো বাড়ী, আগে যেটা ঠাকুর-দালান ছিল এখন সেটা উপাসনার মণ্ডপরূপে ব্যবহার করা হয়।

ওখানেও খুব জনসমাগম হয়। নিমন্ত্রণ-পত্র হাতে যাঁরা যেতে পারেন তাঁদেরই খালি যাবার কথা, তবে কার্য্যতঃ যার খুশি সেই যায়, ভীড় সমানই হয়। আমরা খানিক আগেই গেলাম। দরজার কাছে রথীবাবু আর সন্তোষবাবু অভ্যর্থনা করছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে এক মস্ত বড় দল এসেছে দেখলাম, গান গাইবার জন্যে। এ ছাড়া ঠাকুরবাড়ীর বাঁধাধরা গায়করা ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিপুল বাদ্যযন্ত্রগুলি নিয়ে এসে মঞ্চের উপর বসলেন। আচার্য্যদের জায়গাও ঐখানেই। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ এসে আসন গ্রহণ করলেন, তাঁর সঙ্গে উপাচার্য্য চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ও এলেন। গান আরম্ভ হ'ল, অত ওস্তাদি গান আমার তত ভাল লাগল না। পরে পরে অনেকগুলি গান হ'ল। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন করলেন, শেষের sermonও তিনিই দিলেন। দু'লাইন গান গেয়ে তিনি শেষ করলেন। শেষে পাঁচ ছ'টা গান হ'ল। ওস্তাদরা যদিও নামকরা গাইয়ে, তবুও তাঁরা মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভুল করছিলেন বোধ হয়, কারণ দেখলাম রবীন্দ্রনাথ বার বার পিছন ফিরে তাঁদের ভ্রম সংশোধন করছেন। কিছুতেই তাঁদের সামলাতে না পেরে শেষে তিনি তাঁদের সঙ্গে নিজেও গাইতে আরম্ভ করলেন, তাঁর গলাই উঠল সকলের উপরে। শেষে গান হ'ল "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।" (আজকার জাতীয় সঙ্গীত ঐ গানটি ঐ সময়ই রচিত। পঞ্চম জর্জ্জের আগমনও ঐ সময়, কাজেই অনেক বুদ্ধিমানের ধারণা হয়েছিল যে গানটি রাজাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

উপাসনা শেষ হবামাত্র আচার্য্য উঠে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও তখন উঠলাম বটে, তবে বাইরে বেরিয়ে আসা তখনই সম্ভব হ'ল না। ভয়ানক ভীড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেনাশোনাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। তারপর দোতলায় উঠলাম কোনক্রমে। মীরাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিয়ম করে গিয়েছিলেন যে মাঘোৎসবে যাঁরা আসবেন, তাঁদের উপাসনান্তে খুব ভাল করে মিষ্টিমুখ করান হবে। তখন অল্প মানুষই উপাসনায় যোগ দিতে আসতেন, তখন সবাইকে খাওয়ান সম্ভব ছিল। এখন অত বৃহৎ জনসমাগমে নিয়মটা একটু পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের কারও সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাই উপরে উঠতেন এবং রবীন্দ্রনাথের dining room-এ বসে বৃহদাকৃতি মিষ্টান্নগুলির সদ্ব্যবহার করতেন। আমাদেরও খাবার ঘরে ঢুকতে হ'ল, এবং জলযোগ করতেও হল। এখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম দেখলাম। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চেহারায় সাদৃশ্য আছে বটে, তবে অতখানি লম্বা নয়, ছোটখাট মানুষ। তিনি অল্পক্ষণ থেকে, সকলের পরিচয় নিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর আমরাও বাড়ী ফিরলাম।

২৮শে জানুয়ারী—আজকে একটা ব্যাপার হয়ে গেল, যা আমার জীবদ্দশায় আর ঘটবে কি না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় টাউন হলে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা হল। এর তোড়জোড় ত বহুকাল ধরেই চলছিল তবে ২৫শে বৈশাখ থেকে গড়াতে গড়াতে শেষে মাঘ মাসে এসে তবে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল। কর্ম্মকর্ত্তা ও উদ্যোক্তারা বোধহয় একটু ঢিলেঢালা মানুষ ছিলেন, খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথও নাকি তাঁদের চাঁদা তোলার গড়িমসি দেখে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "কি হে, টাকাটা আমিই লুকিয়ে লুকিয়ে দিয়ে দেব না কি?"

যা হোক, অবশেষে ব্যাপারটা হয়েই গেল। সেদিন মাঘোৎসবের উদ্যান সম্মেলন হচ্ছিল। সেখান থেকে একে একে সবাই ফিরবার পর টাউন হলে যাবার জন্যে সবাই তৈরি হলাম। যেতে একটু দেরিই হল, ভয় হচ্ছিল যে হয়ত খুব পিছনে বসতে হবে, কিছু দেখতে পাব না। কিন্তু বেশ ভাল জায়গাই পেলাম, একেবারে সামনে। শুনলাম মেয়ের দল, অর্থাৎ আমরা, যারা তাঁকে চিনি তারা সবাই কবিকে ফুলের তোড়া উপহার দেবে। ফুলও এসে গিয়েছে দেখা গেল। আমরা ফুল হাতে করেই বসলাম। কখন ফুল দিতে হবে, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত শোনা যেতে লাগল। অবশেষে স্থির হ'ল যে, সাহিত্য পরিষদ্ থেকে তাঁকে সোনার জরির মালা দেওয়া হবে, তার পরেই মেয়েরা ফুল দেবে, এবং তারও পরে ভদ্রলোকদের ভিতর যাঁরা দিতে চান তাঁরা দেবেন। আমরা যখন গিয়ে বসলাম তখনও রবীন্দ্রনাথ আসেন নি। তবে

হোম্‌রা-চোম্‌রা ব্যক্তি অনেকেই এক এক ক'রে আসছিলেন, আর করতালির ধুম পড়ে যাচ্ছিল। এই ভাবে একে একে ঢুকলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ গোখলে প্রভৃতি। তারপর তুমুল কোলাহল আর প্রচণ্ড করতালি ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সভাকক্ষে ঢুকলেন। তিনি গিয়ে সিংহাসনের মত একটা বড় এবং উঁচু চেয়ারে বসলেন। তখনই তাঁর সামনে এমন লোকের ভীড় জমে গেল যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাঁকে দেখতেই পাওয়া গেল না। সভার আরম্ভে প্রথমে একতান বাদ্য হ'ল। সেটার দিকে অবশ্য দর্শকবৃন্দ বিশেষ কান দিলেন না, সবাই তখন গোলমাল করতেই ব্যস্ত। সভাপতি ছিলেন জাষ্টিস সারদাচরণ মিত্র, তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন সভার উদ্বোধন করতে তখন সবাই একটু শান্ত হ'ল। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, দুজনে অভিনন্দন পড়লেন। গানও হ'ল বেশ ওস্তাদী গান। বিশিষ্ট পণ্ডিতরাও সংস্কৃতে মঙ্গলাচরণ করলেন এবং কবিকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তাঁর শতায়ু কামনা করলেন। রবীন্দ্রনাথকে সোনার-রূপোর অনেক উপহার দেওয়া হ'ল। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন তাঁর "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয় দেখে, এতদিন পরে তিনি সেইটিই কবিকে উপহার দিলেন। এ সবের পরে রবীন্দ্রনাথ উঠে তাঁর অনবদ্য ভাষায় অভিনন্দনের উত্তর দিলেন। এরপর আমরা মেয়েরা গেলাম তাঁকে ফুলের গুচ্ছ উপহার দিতে। মেয়েদের দেখেই তিনি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের পরে ভদ্রলোকরা গেলেন। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখার আমি খুব ভক্ত, তাঁকে এই প্রথম দেখলাম। রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য পরিষদ্‌ থেকে যে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল, তা হাতীর দাঁতের ফলকে খোদাই করা। দর্শকদের মধ্যে অনেকে সেটি দেখতে পায় নি বলে গোলমাল করাতে রামেন্দ্রসুন্দর সেটি নিয়ে হাত উঁচু ক'রে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। তাঁর মুখে আর হাসি ধরছিল না।

এরপর সভা ভঙ্গ। প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর গাড়িটাকে খুব করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল।

হলের একদিকে Hopsing and Co, রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফের একটা ছোট প্রদর্শনী খুলেছিল, সেটাও গিয়ে দেখে এলাম। এরপর কোনমতে বাড়ী ফেরা গেল।

২৯শে সেপ্টেম্বর আমাদের বাড়ীর সামনে যে "পান্তীর মাঠ" বলে ছোট একটা মাঠ আছে তাতে 'স্বদেশী মেলা' হচ্ছিল। ক'দিন ধরেই চলছিল। খানিকটা exhibition এর মত, আবার থিয়েটার সিনেমা, সার্কাস প্রভৃতিও খানিক খানিক আছে। প্রায়ই যাচ্ছি তবে উল্লেখযোগ্য এখন পর্য্যন্ত কিছু দেখিনি আজ মাষ্টার মদন নামক একটি অতি বাচ্চা ছেলের গান শুনলাম। মেলার উদ্যোক্তাদের ভিতর একজন হেমেন্দ্রমোহন বসু মাষ্টার মদনকে কোলে করেই নিয়ে এলেন। ছেলেটি ভারি সুন্দর দেখতে, হিন্দুস্থানী পোষাকে তাকে মানিয়েছিল ভাল। আমি ভেবেছিলাম ওর বয়স বুঝি ইচ্ছে করে কমিয়ে বলা হয়, কিন্তু আজ দেখলাম, বাস্তবিকই সে একেবারে বাচ্চা, এখনও উচ্চারণই পরিষ্কার হয় নি। মখমলের জামার সামনেটা একেবারে সোনায় মেড়েলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তার বাবা তার গানের সঙ্গে সঙ্গে হার্মোনিয়ম বাজালেন। বিন্দি গান গাইল। সমাগত মহিলাবৃন্দ এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েরা এত চ্যাঁ ভ্যাঁ লাগালেন যে ভাল ক'রে গান শোনাই গেলনা। ছেলেমেয়ে বাড়ীতে রেখে কোথায়ও যাওয়াত আমাদের বঙ্গললনারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

২৯শে জানুয়ারী ১৯১৩,—আজ দিনটা ভাল গেল। ক'দিন আগেই শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর একটা বক্তৃতায় যাবার জন্য কার্ড পেয়েছিলাম। আমাদের মত বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ দুই মেয়ের নামে কেন যে কার্ড এল, তা বোঝা গেল না। বাবা জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন, সেই সুবাদে তিনি আমাদের নাতনী বলতেন, এই জন্যই কার্ড পাঠিয়েছিলেন বোধ হয়। স্থান, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সেখানেও ইতিপূর্বে কখনও প্রবেশ লাভ হয় নি। যা হোক যথাকালে গিয়ে ত পৌঁছলাম। বাড়ীটা বেশ জমকাল দেখতে, তবে চারদিকে অচেনা মানুষের ভীড় দেখে কেমন অস্বস্তি লাগছিল। দোতলায় উঠলাম, সেখানে চেনাশুনা অনেক লোককে দেখলাম। বক্তাও এই সময় এসে পৌঁছলেন, বাবা তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের নিয়ে গিয়ে একেবারে সামনের সাইনে বসিয়ে দিলেন। তখন পর্য্যন্ত দর্শকদের মধ্যে মহিলা আমরা দু'জনই। আর কেউ আসবে না ভেবে একটু nervous লাগছিল। অবশ্য খানিকক্ষণের মধ্যেই আরও অনেক মহিলা এসে জুটলেন। বাঙালী ছিলেন, মেমসাহেবও ছিলেন। একজন খুব সুন্দরী মেমসাহেবকে দেখলাম, তিনি বোধ হয় লেডী জেনকিংস।

বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল ছিলেন সভাপতি। এঁকে আমাদের স্কুলের প্রাইজ দেওয়ার দিনেও দেখে-ছিলাম। তখন খুব হাসিখুশি লোক মনে হয়েছিল। আজ দেখলাম ভদ্রলোক ভীষণ গম্ভীর হয়ে বসে আছেন।

জগদীশচন্দ্রের অনেকগুলি ছাত্র ঐখানে বসে নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছিলেন। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও বক্তার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করে দেখালেন। আমার বক্তৃতা খুব ভাল লেগেছিল। জগদীশচন্দ্র খুব রসিয়ে কথাবার্ত্তা বলতে পারেন। পেঁয়াজকলি, মূলো, এরা যে আবার রাগ করে তা জানতাম না। যদিও বিজ্ঞানের কিছুই জানি না, তবু রসগ্রহণে কিছু বাধা হ'ল না।

অতঃপর সভাপতি উঠে তিনটে কথা বলে তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন। জগদীশচন্দ্রের ছাত্ররা মেমসাহেবদের কাছ থেকে অনেক প্রশংসাবাদ শুনলেন। মিসেস্ বসু (তখনও জগদীশচন্দ্র নাইট উপাধি পাননি) এসে আমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে গেলেন। আমাদের সঙ্গে গল্প করতে পারে এমন লোক বেশী দেখলাম না, অতঃপর নীচে নেমে বাড়ী ফিরে এলাম।

৬ই সেপ্টেম্বর—আজ আমাদের দু' জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল। এক স্বদেশী মেলার ওপেনীংএর মিটিং এবং দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি কলেজে ডাঃ জে, সি, বোসের বক্তৃতা, দ্বিতীয়টাতেই গেলাম। একবার সবার আগে গিয়ে বেশ অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম, তাই এবার বেশ কিছু দেরি করে গেলাম। এতে আমাদের কিছু অসুবিধা হল না, তবে বাবাকে একটু পিছনে বসতে হ'ল। এবারে খুব বেশী লোক দেখলাম, চেনা পরিচিত মানুষও ঢের দেখলাম। বক্তৃতা খুব ভাল হয়েছিল এবং ভাল লেগেও ছিল, তবে মাঝে মাঝে হলের ফ্যান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভীষণ গরম লাগছিল। বক্তৃতার শেষে Dr. & mrs Bose এসে খানিক গল্প করলেন। Dr. Bose জানতে চাইলেন আমরা বুঝতে পেরেছি কি না, এবং আমাদের ভাল লেগেছে কি না। দুটো প্রশ্নের উত্তরেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

১৪ই নভেম্বর—আজ কলেজ থেকে এসে শুনলাম যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। ভারতবর্ষের লোক এই প্রথম এ পুরস্কার লাভ করলেন। মুখে মুখে এ খবর সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ল। শুনলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্ব্বপ্রথম কবিকে এ খবর দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে টেলিগ্রাম লিখতে জানেন না বলে অন্যকে দিয়ে লেখাচ্ছিলেন, তার আগেই রবীন্দ্রনাথের ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। শান্তিনিকেতনে শুনছি মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ শুদ্ধ নীচু বাংলা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "রবি, তুই নবেল প্রাইজ পেয়েছিস্!" রবীন্দ্রনাথ অবিচলিতই আছেন শুনছি। অধ্যাপকদের নিয়ে মিটিং করছিলেন টেলিগ্রামটা পড়ে একজন অধ্যাপকের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনাদের বাড়ী তৈরি হ'ল।" কি একটা বাড়ীর কাজ তখন অর্থাভাবে বন্ধ ছিল।

বাংলা দেশের আজ শুভদিন। যে শুনছে সেই আনন্দ করছে। যারা এতকাল ধরে রবীন্দ্রনাথকে প্রাণপণে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে, তাদের মুখগুলো এখন বড়ই ভোঁতা দেখাবে।

কলকাতার থেকে স্পেশ্যাল ট্রেণে করে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করার প্রস্তাব উঠেছে। আমরা তা হ'লে নিশ্চয়ই যাব।

বর্ষ-পঞ্জী

এক বৎসরের ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

পাকিস্তানী আক্রমণ

এক বৎসরের কিছু বেশী হইল পাকীস্তানি সেনাবাহিনী আধুনিক মার্কিণী ও বিলাতী অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই ঘটনাটিই গত এক বছরের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

কাশ্মীরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতের উপর পাকিস্তানী হামলা নূতন নয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতের প্রাক্তন ইংরাজী রাজ সরকার ও ভারতীয় কংগ্রেস দলের মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান দুইটি নূতন এবং বস্তুতঃ পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ইংরাজের প্ররোচনায় এবং কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের দুর্ব্বলতা-প্রসূত স্বীকৃতির ফলেই যে অখণ্ড ভারত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া এই দুইটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, এটা অনস্বীকার্য্য ঐতিহাসিক সত্য। তেমনি এও ঐতিহাসিক সত্য যে, নূতন পাকিস্তানী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া ভারতকে দাবাইয়া রাখিবার অসাধু অভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার তাগিদে ইংরাজ প্রথম হইতেই পাকিস্তানকে উস্কানি এবং সক্রিয় সাহায্য দিয়া আসিতেছিল।

এই-উস্কানিরই ফলে কাশ্মীরের উপর, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানী রাষ্ট্রের সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সশস্ত্র অভিযানের দ্বারা কাশ্মীর রাজ্য দখল ও পাকিস্তানভুক্ত করিতে লাগিয়া গেল। সে সময় মহারাজা হরি সিং শাসিত কাশ্মীর রাজ্য পাকিস্তান বা ভারত কোন্ রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইবে (accede to) তাহা তখনো স্থির হয় নাই। পাকিস্তানী আক্রমণের ফলে অনতিবিলম্বে মহারাজ হরি সিং ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যের সংযুক্তির আবেদন করেন এবং পাকিস্তানী হামলা প্রতিরোধ করিবার জন্ম ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যের আবেদন জানান। কাশ্মীর রাজ্য যথারীতি ভারতের সহিত সংযুক্ত হইল (Kashmir executed the necessary legal instruments of accession) এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানী আক্রমণ হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের সহিত আইনত সংযুক্ত কাশ্মীর রাজ্যের উপরে পাকিস্তানের অন্যায় সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগলিপি পেশ করেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণকারী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে অনেকটা পিছু হটাইয়া দিতে সমর্থ হন। নিরাপত্তা পরিষদের একটি জরুরী বৈঠকে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের উপরেই অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির (cease-fire) নির্দ্দেশ জারি করা হয় এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিরতির সীমারেখা (cease-fire line) নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং যুদ্ধবিরতির সর্ত্ত পালনের জন্ম তত্ত্বাবধানের (supervision) আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধবিরতির দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বস্তুতঃ অধিকৃত সীমারেখা হইতে ভারতবাহিনীকে, নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশক্রমে অনেকখানি পিছু হটাইয়া দিয়া যুদ্ধবিরতি-রেখা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ভারত সরকার নিরাপত্তা পরিষদের এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেনাবাহিনীকে পিছু হটাইয়া লন।

ইতিমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের অভিযোগ উপলক্ষ্য করিয়া বৈঠকের পর বৈঠকে নানা প্রকার বাদানুবাদ চলিতে থাকে। প্রথমতঃ পাকিস্তান সরকার অস্বীকার করেন যে, তাঁহাদের সেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল; তাঁহারা বলেন যে স্বাধীনতাকামী আজাদ কাশ্মীর দলের নেতৃত্বে এই অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। পরে পাকীস্তান অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে তাঁহাদের সরকারী সেনাবাহিনীই এই অভিযান পরিচালনা করেন এবং পাল্টা দাবি করেন যে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কাশ্মীরীদের গণভোটের (plebiscite) দ্বারা স্থির করা

হউক কাশ্মীর রাজ্য ভারত কিংবা পাকিস্তান, কোন্ রাষ্ট্রের সহিত স্বেচ্ছায় সংযুক্ত হইবে। ভারত সরকার একটি সর্তে এই দাবি স্বীকার করিতে রাজী হন, যে, তৎপূর্ব্বে পাকিস্তান তাঁহার অধিকৃত এলাকাগুলি খালাস করিয়া দিয়া নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে দিবেন। এই সর্ত পাকিস্তান কখনোই মানিয়া লয়েন নাই এবং ফলে গণভোট গ্রহণের প্রশ্ন কখনো কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে পর পর দুই দুইবার সকল প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকারের (universal adult franchise) ভিত্তিতে কাশ্মীর বিধান পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক (democratic parliamentary) সরকার (government) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে জম্মু ও কাশ্মীর বিধান সভার সর্ব্বসম্মতিক্রমিক সিদ্ধান্তের (unanimous decision) ফলে এতাবৎকাল ভারতের সহিত সংযুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গৃহীত হয় এবং অন্যান্য সকল রাজ্যেরই মতন রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Parliament) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের গণপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। ইহার পরে কোনক্রমেই আর জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা (status) নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গণভোট গ্রহণের প্রশ্ন, আইনতঃ, বা মূল নৈতিক কারণে, আদৌ উঠিতে পারে না। অবশ্য ইতিমধ্যে পাকিস্তানের বেআইনী দখলে অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিরাট অংশের উপরে গণতান্ত্রিক জম্মু ও কাশ্মীর সরকার তথা ভারত সরকারের প্রশাসনিক অধিকার স্থাপনের কোন উপায় নাই। কেননা যতদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ এই বিষয়ে কোন অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন এবং পাকিস্তানকে সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জ্জাতিক নীতির আগাগোড়া পৃষ্ঠপোষক এবং বিশ্বশান্তিকামী ভারত রাষ্ট্র অস্ত্রবলে ঐ এলাকায় তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত।

ইতিমধ্যে প্রায় প্রথম হইতেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যখনই সুযোগ পাইয়াছেন, যুদ্ধবিরতির সীমারেখা বারে বারে লঙ্ঘন করিয়া জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নানা স্থানে হামলা করিয়া আসিতেছে। অবশ্য ভারত-পাকিস্তানের আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-সীমা অতিক্রম যে তাঁহারা লঙ্ঘন করেন নাই এমন নহে। পাঞ্জাব সীমান্তে, পশ্চিমবঙ্গে, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁহারা অনবরতঃই কখনো ছোট ছোট দলে, কখনো বা বৃহৎ আয়োজনে হামলা চালাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে নির্দ্দিষ্ট এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করিয়া এইরূপ হামলার সংখ্যা ও প্রাবল্য প্রথম হইতে সমধিক বেশী ও জোরদার ছিল। নিরাপত্তা পরিষদে ভারত সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি এই বিষয়ে পরিষদের নিকট বারংবার অভিযোগ পেশ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কখনো কোন ফল হয় নাই; হয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক এ সকল অভিযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, কিংবা যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া বারংবার পাকিস্তানী হামলার স্বপক্ষে তাঁহার এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের অধিকাংশের গোপন সায় ও উস্কানি ছিল। বর্ত্তমানে তত্ত্বাবধায়ক বদল হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বাবস্থা যে বিশেষ বদলাইয়াছে তাহা নহে। এখনো স্থানে স্থানে এবং ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধবিরতি-সীমা লঙ্ঘিত হইতেছে, ইহা বন্ধ হইবার কোনও উপায় হয় নাই।

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন যে ১৯৪৭ সালের কাশ্মীরে পাকিস্তানী আক্রমণের সময়ে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশক্রমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিকৃত সীমা হইতে পিছু হটাইয়া যুদ্ধবিরতির সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিবার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ভারত সরকারের পক্ষে ভুল এবং দুর্ব্বলতার পরিচায়ক প্রমাণিত হইয়াছে। যে কোন যুদ্ধে যখন যুদ্ধবিরতি সংঘটিত হয়, তখন যুযুৎসু পক্ষ-দ্বয়ের বাস্তবপক্ষে অধিকৃত (actual line of occupation) সীমা ধরিয়াই যুদ্ধবিরতির সীমা নির্দ্দিষ্ট করা চিরাচরিত প্রথা। ইহার অন্যথা করিয়া যখন নিরাপত্তা পরিষদ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পিছু হটাইয়া যুদ্ধবিরতির সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তখন ভারতের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া সদ্বিবেচনার কাজ হয় নাই। ইহার ফলে পাকিস্তানী অন্যায় অভিযানের স্বপক্ষে সায় দেওয়া হইয়াছে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের যে অংশটি পাকিস্তান অন্যায় ভাবে অধিকার করিয়া রহিল তাহার প্রতি পরোক্ষ সমর্থন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এবং মূলতঃ

ইহারই ফলে যুদ্ধবিরতির নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া অনবরতঃ পাকিস্তানী হাম্‌লার উস্কানি দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ১৯৪৭ সাল হইতে এই দীর্ঘ ১৮।১৯ বৎসর ধরিয়া পাকীস্তান সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে তথাকথিত কাশ্মীর সমস্যা জীয়াইয়া রাখাটাই,কাশ্মীর লইয়া ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী দাবির পরোক্ষ সমর্থনের সামিল। বস্তুতঃ কাশ্মীর সমস্যা প্রকৃতপক্ষে যে পিছনের দুয়ার দিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রিটেনের ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে অনুপ্রবেশ ও বিরোধের আগুন চিরকালের জন্ম জ্বালাইয়া রাখিবার দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত প্রয়াসের অন্যতম পরিচয় তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

কেবল মাত্র ব্রিটেন নয়, আন্তর্জ্জাতিক শক্তি-জোটের অপ্রমেয় দ্বন্দ্বের জটিল গ্রন্থিবন্ধনের ফলে অন্যান্য অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্রও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে অনিবার্য্যভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতের নিরপেক্ষ নীতির ফলে ভারতকে যখন কোন শক্তিজোটের সঙ্গে জড়িত করা সম্ভব হইল না, তখন গণতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট উভয় শক্তি-জোটই ভারতকে তাঁহাদের ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের (cold war) জটিল গ্রন্থির মধ্যে ভারতকে সরাসরি সম্ভব না হইলেও, অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবে জড়াইবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। নেহরু প্রবর্ত্তিত ও অনুসৃত জোট-নিরপেক্ষ ভাবে উভয় দলের সকল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নিরপেক্ষতা ও সমান মিত্রতার নীতির ফলে ১৯৫৪-৫৬ সালে যখন ভারত লাল চীনা সরকারের সঙ্গে কিছুটা বেশী অন্তরঙ্গতা করিতেছিলেন, তখন উভয় পক্ষেই খানিকটা আশা ও আশঙ্কার আন্দোলন যে লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। হাঙ্গেরীয় বিপ্লব সম্পর্কে নেহরুর একপক্ষে খানিকটা সহানুভূতি বা সমর্থনের প্রকাশ, অন্যপক্ষে এই আশঙ্কার গভীরতা স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি করিতে থাকে। লাল চীনের সহিত ভারতের মিত্র সম্পর্ক যদি ঘনিষ্ঠতর অন্তরঙ্গতা ও আদান-প্রদানে পরিণতি লাভ করে, তবে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়াতে কমিউনিষ্ট জোটের শক্তি যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে সেই আশঙ্কা গভীর হইয়া উঠিল। অন্যদিকে সোবিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের আর্থিক ও অন্যান্য ধরনের আদান-প্রদান দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল। অতএব পাকিস্তানকে এশিয়ার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট-প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে সকলে তৎপর হইয়া উঠিলেন। পাকিস্তানও আপন মতলব হাসিল করিবার জন্ম সিয়াটো ও সেন্টো জোটে সামিল হইলেন। এই ভাবে সম্ভাব্য কমিউনিষ্ট অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করিবার বাহ্য অজুহাতে পাকিস্তান মার্কিণী ও ব্রিটিশ অস্ত্রসাহায্যের ফলে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু পাকিস্তান স্বয়ং যতটা না দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিষ্ট শক্তি প্রসারের প্রতিরোধকল্পে, তাহা হইতে অনেক বেশী ভারতের উপরে তাহার অসংখ্য অন্যায় দাবি বাহুবলের দ্বারা নিষ্পত্তি করিবার মানসে, ব্রিটিশ ও মার্কিণী অস্ত্রসাহায্য আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সুরু করিল। এই অস্ত্র-সাহায্যের একটি বিশেষ সর্ত্ত ছিল যে ইহা সাহায্যকারী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ কোন রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করা হইবে না; বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এশিয়ায় কমিউনিষ্ট শক্তির প্রভাব যাহাতে প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত না করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্মই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা হইল। ইতিমধ্যে কাশ্মীর এবং অন্যান্য ভারতীয় এলাকা সম্বন্ধে পাকিস্তানের অন্যায় দাবি ব্রিটেনের প্রায় প্রকাশ্য উস্কানির ফলে এবং ভিক্ষালব্ধ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে ক্রমেই জোরদার হইয়া উঠিতে লাগিল। পাকিস্তানের কাশ্মীরের উপর অন্যায় দাবি ব্রিটেনের প্রায় প্রকাশ্য সমর্থন ও অনুকূল প্রচারের ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে আমেরিকা ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট-বিরোধী জোটেরও নিকট খানিকটা সহানুভূতি ও সমর্থন পাইতে লাগিল। সম্ভবতঃ ভারতের দৃঢ় নিরপেক্ষতার নীতি এবং বিশেষ করিয়া কোন শক্তিজোটের সামিল হইতে আগাগোড়া অস্বীকৃতির ফলেই আমেরিকা ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট-বিরোধী শক্তিজোটের নিকট ভারতের প্রতি মিত্রতার তাপমাত্রা প্রকাশ্যে না হইলেও অন্ততঃ প্রচ্ছন্ন ভাবে অনেকটা জুড়াইয়া আসিতেছিল। অন্য-পক্ষে এশিয়াখণ্ডে আপন প্রভাব বিস্তৃতির তাগিদে লাল চীন ও ভারতের সঙ্গে পূর্ব্বের মৈত্রী সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া অন্যায় ভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অনেকখানি এলাকা চীনা সরকার প্রথম দখল করিয়া লন এবং পরে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ সুরু করেন। চীনা আক্রমণ সম্ভবতঃ নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্যায় এবং অবৈধভাবে ভারত রাষ্ট্রের কিছু কিছু যে এলাকা চীনারা দখল করিয়া লইয়াছিলেন তাহা তাঁহারা

ত্যাগ করিয়া যান নাই। অন্তপক্ষে ভারত সীমান্তে জোরদার সৈন্য স্থাপন ইত্যাদি আশঙ্কামূলক কাজ তাঁহারা করিয়াই চলিয়াছেন।

ভারতের উপর চীনা আক্রমণের সময়ে ইঙ্গ-মার্কিণ সরকারদ্বয় চীনা আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে ভারতকে সামান্য পরিমাণ অস্ত্রসাহায্য দান করিয়াছিলেন। এতাবৎ কাল ভারত দুনিয়ার বিবিধ শক্তিজোটের কোনও পক্ষ হইতেই কোন প্রকার অস্ত্র-সাহায্য (arms aid) প্রার্থনা করেন নাই বা গ্রহণ করেন নাই। ভারতের সামরিক শক্তি কেবলমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গঠন করা হইয়াছিল, সেই জন্য তাহার আয়োজনও ছিল অপেক্ষাকৃত সামান্য। স্বাধীনতার পর হইতে বার্ষিক প্রতিরক্ষা ব্যয়-বরাদ্দের অপেক্ষাকৃত স্বল্পতা ইহার সাক্ষ্য দিবে। চীনা আক্রমণ উপলক্ষ্যে ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিণ অস্ত্রসাহায্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তান প্রবল প্রতিবাদ জানাইলেন এই অজুহাতে যে, তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, উক্ত অস্ত্রাদি ভারত পাকিস্তানকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে। চীনা আক্রমণের কাল হইতে ভারত সরকার দেশের সামরিক আয়োজনে আমাদের জটিল প্রতিরক্ষা প্রয়োজন (Complex defence requirements) যাহাতে সত্যই সাধিত হইতে পারে সেই দিকে নজর দিতে সুরু করিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ অস্ত্র সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানের সর্ব্বাধুনিক এবং ব্যাপক সমর আয়োজনের তুলনায় তাহার আয়তন এ পর্য্যন্ত সামান্যই ছিল। পাকিস্তানও সম্ভবতঃ তাহাই মনে করিতেছিলেন।

যাহা হউক অন্ততঃ বাহ্যতঃ ভারতের বিস্তৃতিমান প্রতিরক্ষা আয়োজনের সম্ভাব্য প্রাবল্য হইতে আত্মরক্ষার অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির বিশেষ অনুগ্রহভাজন এবং এশিয়া ভূখণ্ডে কমিউনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধকল্পে তাঁহাদিগের সাহায্যপুষ্ট ব্যাপক সমরায়োজনে শক্তিমান পাকিস্তান লাল চীনের সঙ্গে বিশেষ মৈত্রী স্থাপন করিতে সুরু করিলেন। পাকিস্তান কর্ত্তৃক অবৈধ ভাবে দখল-করা কাশ্মীর রাজ্যের লাডাক্ অঞ্চলের খানিকটা এলাকা পাকিস্তান এই মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়ীকরণকল্পে চীনকে দান করিলেন, বিনিময়ে চীনা সরকার ঘোষণা করিলেন যে কাশ্মীর রাজ্যের উপরে পাকিস্তানের দাবির বৈধতা তাঁহারা স্বীকার ও সমর্থন করেন।

এই হইল গত বৎসর কাশ্মীর এলাকায় পাকিস্তানের ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমরাভিযানের বাস্তব পটভূমিকা। এই স্পষ্ট আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বের কয়েক মাস ধরিয়া পাকিস্তানের গরিলা বাহিনী কর্ত্তৃক নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যুদ্ধবিরতির সীমারেখা লঙ্ঘনের সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি পায়; তাহা ছাড়া দলে দলে সশস্ত্র পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা কাশ্মীরের নানা স্থানে প্রবেশ করিতে সুরু করিল। এ ভাবে কাশ্মীরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা যখন প্রবল হইয়া উঠিল, এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট যুদ্ধবিরতি-সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহ যখন যথারীতি উপেক্ষিত হইতে লাগিল, তখন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দ্বারা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী পুঞ্চ-উরী এলাকায় যুদ্ধবিরতি সীমার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রতিরক্ষা আয়োজন দৃঢ়তর করা হইল; দলে দলে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদিগকে স্থানীয় লোকেরা ধরাইয়া দিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি পাকিস্তানী ঘাঁটি, যেখান হইতে এই অনুপ্রবেশ চলিতেছিল বলিয়া আশঙ্কা হয়, দখল করিয়া লইলেন। আগষ্ট মাসের শেষে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঐ এলাকায় যুদ্ধবিরতি সীমার অপর পার্শ্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গিরি-সঙ্কটের অন্তর্বর্ত্তী (কারগিল, টিথওয়াল ও হাজিপীর) পাকিস্তানী ঘাঁটি কয়টি দখল করিয়া লইলেন। বস্তুতঃ এই সকল ঘাঁটিগুলি হইতেই যুদ্ধবিরতি সীমা অবাধে লঙ্ঘন করিয়া কাশ্মীরের উপরে পাকিস্তান বারে বারে হামলা চালাইয়া যাইতেছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি অষ্ট্রেলিয়াবাসী জেনরেল রবার্ট নিম্মো এবং তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক দল হয় যুদ্ধবিরতি সীমার এভাবে অবাধ লঙ্ঘন বন্ধ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না, কিংবা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অতএব ভবিষ্যতে যাহাতে এসকল এলাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা অবাধে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব ভারতীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে স্বয়ং গ্রহণ করিতে হয়।

কারগিল, হাজিপীর ও টিথওয়ালে অবস্থিত পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দখলে আনিবার পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত একমাত্র মৃদু প্রতিবাদ ব্যতীত পাকিস্তানী সরকার প্রায় দুই সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীর সীমান্ত এলাকায় প্রায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছিলেন। এই নিশ্চেষ্টতার আসল তাৎপর্য্য কি তাহা অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ বোঝা গেল।

কাশ্মীর রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত চ্ছাম্ব ও দেওরা উপত্যকা সীমান্তবর্তী পাকিস্তানী পাঞ্জাবের সমতলভূমির সংলগ্ন এলাকা, অপর পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। চ্ছাম্ব ও দেওয়া গ্রাম দুইটি এবং পাঞ্জাব সীমান্তের পশ্চিম পার্শ্বঃর্ত্তী সমগ্র উপত্যকাটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারত অধিকৃত অংশের মধ্যে পড়ে। ছোট্ট চ্ছাম্ব গ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। চ্ছাম্ব গ্রামে ভারতীয় ৯১তম বাহিনীর ইন্‌ফ্যান্ট্রি ব্রিগেড এবং সঙ্গে একটি ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রন, একটি আর্টিলারী রেজিমেণ্ট এবং একটি মেশিন-গান ব্যাটারী প্রতিষ্ঠিত ছিল। গত বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের অতি প্রত্যুষে হঠাৎ সমগ্র উপত্যকা ও সন্নিহিত ছোট ছোট গ্রামসমূহের নিরুদ্বেগ শান্তি ভঙ্গ করিয়া ৭০টি মার্কিনী ট্যাঙ্ক হইতে কামানের বিধ্বংসী শব্দ একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল। গ্রামবাসীরা চাষের কাজে ব্যস্ত ছিল, এই হঠাৎ আক্রমণে তাহারা আশ্রয়ের সন্ধানে দিগ্‌বিদিকে ছুটিতে লাগল। ৭০টি ট্যাঙ্কের বিরাট সাঁজোয়া পাকীস্তানী বাহিনী সম্মুখে রাখিয়া একটি পুরা ইন্‌ফ্যান্ট্রি ডিভিসন অগ্রসর হইয়া চলিল। ছয় ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করিয়া চ্ছাম্ব ও দেওরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ভারত বাহিনীর কংক্রিট বাঙ্কারগুলি গুঁড়াইয়া দিয়া আট মাইল আরো অগ্রসর হইয়া গুরুত্বপূর্ণ জম্মু-শ্রীনগরের পথের দিকে মানওয়ার-টাওয়াই নদীর তীরে গিয়া পৌঁছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় হাওয়াই বাহিনীর ভ্যাম্পায়ার জেট বিমান হইতে শত্রু বাহিনীর উপর প্রতি-আক্রমণ সুরু হইল, ১০টি প্যাটন ট্যাঙ্ক এই আক্রমণে ধ্বংস হইবার পর পাকিস্তানী এফ্‌ ৮৬ স্যাবার জেট বিমান ভারতীয় হাওয়াই বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ সুরু করে।

পরদিন পাকিস্তানী বাহিনী আরো অগ্রসর হইয়া ভারতের এলাকার মধ্যে ২০ মাইল পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল। আর মাত্র ৩০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলে জম্মু-শ্রীনগর রাজপথের দখল পাকিস্তানের কবলে আসিতে পারে। এই পথটি অধিকার করিতে পারিলে সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তান তাহার শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, সম্ভবতঃ ইহাই ছিল এই অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পথটি অধিকার করিতে হইলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আখনুরে প্রতিষ্ঠিত শক্ত ঘাঁটিটির দখল লইতে হইবে। পাকিস্তানের সহসা এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্ম ভারতীয় বাহিনী প্রস্তুত ছিল না। ইঙ্গ-মার্কিণী অস্ত্র সাহায্যের বলে পাকিস্তানী বাহিনী সকল প্রকার আধুনিক ও শক্তিশালী মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এই অভিযান সুরু করিয়াছিল। ভারতীয় বাহিনীর অস্ত্রসজ্জা ছিল অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও কম শক্তিশালী। তথাপি ভারতীয় বাহিনীর পরিচালকদের মনে কোন আশঙ্কা ছিল না যে তাঁহারা প্রথমটা খানিকটা পিছু হটিতে বাধ্য হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যই সাফল্যের সঙ্গে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে এবং অধিকৃত অঞ্চল হইতে শত্রুকে হঠাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী বিমান ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর অসম সাহসিক পাল্টা আক্রমণের ফলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অস্ত্রসজ্জার একটা বেশ ভারী অংশ অকার্য্যকরী করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। কারণটি স্পষ্ট। পাকিস্তানের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অংশ বিশেষ দখল করিয়া লওয়া। ভারতীয় সেনাবাহিনী লড়িতেছিলেন ভারতের পূর্ণ ও স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা লইয়া। ফলে ভারতীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের সাফল্য ছিল সমধিক বেশী। এই লড়াইয়ে অন্তরীক্ষে এবং স্থলে, উভয় স্থানে ভারতীয় সংযুক্ত সামরিক বাহিনী যে অসীম সাহসিকতা, দুর্দ্দম উত্তম ও সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দুনিয়ার ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধানাধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরী, বিমান-বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ এয়ার চীফ্‌ মার্শাল অর্জ্জুন সিং, উভয়েই আধুনিক যুদ্ধবিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রে পারদর্শী কুশলী। ইঁহাদের সম্মিলিত পরামর্শের ফলে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর লড়াইটিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (second front) প্রসারিত করিয়া পাকিস্তানের উপরে লাহোরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পাল্টা আক্রমণ চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে তৎপরতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং কার্য্যকরী করা হয়, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। লাহোর এলাকায় পাল্টা আক্রমণ সুরু করা হয় গত বৎসরের ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে। প্রথম হইতেই কাসুরের সন্নিকটবর্ত্তী এলাকায় পাকিস্তানী বাহিনী এমন ঘায়েল হইতে লাগিল যে অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই ভারতীয় বাহিনী রাজধানী শহর লাহোরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। বাধ্য হইয়াই চ্ছাম্ব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানী বাহিনী নিষ্ফল হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে লাহোর এলাকায়

কয়েকটি বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় বাহিনী ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পাকিস্তানী বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে প্রতিরোধ চালাইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না। চারিদিক হইতে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ভারতীয় বাহিনী লাহোর শহরটি ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। সেই সময়ে অনায়াসেই ভারতীয় বাহিনী লাহোর শহরের দখল লইতে পারিতেন কিন্তু ভারত সরকারের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহারা সেই প্রয়াস হইতে বিরত রহিলেন।

ইতিমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানী লড়াইকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। ব্রিটেনের লেবার প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ লইয়া এই লড়াইয়ের দায়িত্ব ভারতের উপরে চাপাইবার অপপ্রয়াস করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহার এবং ব্রিটেনের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির প্ররোচনায় নিরাপত্তা পরিষদেও এ বিষয়ে ভারতকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিবার প্রয়াস করা হইয়াছিল। পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের অভিযোগ মোটামুটি উপেক্ষিত হইয়াই রহিল। মার্কিণ সরকার এ বিষয়ে সরাসরি কোন পক্ষে পক্ষপাতিত্ব না করিলেও, ভারতীয় অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনার পূর্ব্বেই উভয় পক্ষকেই যুদ্ধবিরতিতে (cease fire) বাধ্য করিবার জন্য পেড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ভারত সরকার প্রথমে, যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে, দাবি করেন যে যে, সকল স্থানে পাকিস্তানী বাহিনী ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে, সে সকল স্থান হইতে পাকিস্তানী সৈন্য সীমান্ত ছাড়িয়া পিছু হটাইয়া লইবার পর ভারত যুদ্ধবিরতি করিতে স্বীকৃত হইবেন। পাকিস্তান এই সর্ত্তে রাজী হইল না, বরং পাল্টা দাবি করিয়া বসিল যে কারগিল, টিথোয়াল, হাজি পীর ইত্যাদি এলাকায় ভারত অধিকৃত পাকিস্তানী ঘাঁটি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং লাহোর এলাকায় ভারত-বাহিনী পাকিস্তানী সীমান্ত ছাড়িয়া পিছু হটিলে তবে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি সর্ত্তে রাজী হইবেন। কয়েকদিন ধরিয়া নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যস্থতায় এ বিষয়ে নানা প্রকার সর্ত্ত ও পাল্টা সর্ত্তের নিষ্ফল আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধানাধ্যক্ষ উ-থাণ্টের ব্যক্তিগত মধ্যস্থতায় একটা আপোষ রফা সম্ভব হইল। সর্ত্ত হইল উভয় রাষ্ট্রের বাহিনীদ্বয় অপরের সীমানা ত্যাগ করিয়া পিছু হটিয়া যাইবে এবং কারগিল ইত্যাদি এলাকায় ভারত অধিকৃত পাকিস্তানী ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া ভারত-বাহিনী পিছু হটিয়া আসিবে এবং পাকিস্তানী বাহিনী সেই সকল ঘাঁটি হইতে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব পর্য্যন্ত পিছু হটিয়া অবস্থিত থাকিবে; অন্তর্বর্ত্তী এলাকাটুকু শূন্য রাখা হইবে। এই সর্ত্তে অবশেষে যুদ্ধবিরতি সংঘটিত হয় এবং তিন সপ্তাহব্যাপী ভারতের উপরে পাকিস্তানী সমরাভিযানের আপাতঃ মীমাংসা হয়।

কিন্তু ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মুখ্য কারণ, তথাকথিত কাশ্মীর সমস্যার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থানুযায়ী আজিও কোন সমাধান হয় নাই, তাহার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। ভারত গণভোটের দ্বারা কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের দাবি আর কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারেন না, পাকিস্তানও এই দাবি ছাড়িতে রাজী নহেন। অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে এই বিষয়ে যে অবস্থা বহাল ছিল, আজিও তাহাই রইল। ইতিমধ্যে পাকিস্তান অধিকৃত তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর এলাকায় গভীর অশান্তি ও অরাজকতা যে ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রমাণ আজাদ কাশ্মীর হইতে পালাইয়া আসা দলে দলে শরণাগতের সাক্ষ্যেই পাওয়া যাইতেছে। এই আসার আজিও বিরাম নাই এবং ইহাদের আশ্রয় দানের দায়িত্ব কাশ্মীর ও ভারত সরকারকে বহন করিতে হইতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার একটা শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের উপর অনবরতঃ পাকিস্তানী উপদ্রবের কখনো শেষ হইবে না। এই সমস্যার একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান হইতে পারে কাশ্মীর বিভাগের দ্বারা এবং পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীর এলাকাটি পাকিস্তানকে দান করিয়া দিয়া। এরূপ মীমাংসায় ভারত সরকার আদৌ রাজী হইতে পারেন কি না এবং বিশেষ করিয়া কাশ্মীরীরা স্বয়ং এই সমাধান মানিতে রাজী হইবেন কি না, সেটাই প্রশ্ন। তাহা ছাড়া আর একটি আশঙ্কাও আছে; কোন্ পক্ষ হইতে এরূপ সমাধানের প্রস্তাব হইবে? পাকিস্তান সরকার এরূপ সমাধানের প্রস্তাব করিলে পাকিস্তানীগণের নিকট সরকারের মর্য্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি? অন্যপক্ষে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এরূপ প্রস্তাব হইলে পাকিস্তানী সরকারের নিকট ইহা ভারতের দুর্ব্বলতার পরিচয় হিসাবে গৃহীত

হইবে না ত?—এবং তাহা হইলে পাকিস্তানের পক্ষ হইতে আবার নূতন নূতন দাবি ও আবদারের সৃষ্টি হইবে না ত? এ সকল কারণে অনেক কূটনীতি-বিশারদ মনে করেন যে, কাশ্মীর সমস্যা-সম্পর্কিত ভারত-পাকিস্তান বিরোধের কোন রাজনৈতিক সমাধান (political solution) আদৌ সম্ভব নহে। তাঁহারা বলেন যে, গত ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের সামরিক সমাধানের দ্বারাই একমাত্র এই উনিশ বৎসরের পুরানো সমস্যার একটা শেষ সমাধান সম্ভব হইতে পারিত। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় যে যুদ্ধবিরতির দ্বারা এই লড়াইয়ের শেষ হইল তাহার দ্বারা কোন সমাধানই হইল না, কেবল পূর্ব্বাবস্থা পুনর্বহাল করা হইল। এই সমস্যার কবে এবং কি ভাবে সমাধান হইবে তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

* * *

তাসখন্দ চুক্তি

তাসখন্দ শহরটি যুক্ত সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের অন্যতম সোবিয়েৎ বা রাজ্য, উজবেগীস্থানের রাজধানী। গত বৎসরের ভারত-পাকিস্তানী লড়াইয়ের যুদ্ধবিরতিতে সমাপ্তি ঘটিবার পর, সোবিয়েৎ প্রধানমন্ত্রী এ্যালেক্সেই কোসিগিনের অন্তর্বর্ত্তিতায় ভারত ও পাকিস্তানের সকল বিরোধের সমাধান যাহাতে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও আপোষ রফার মধ্যে ভবিষ্যতে হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে দুইটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে একটি আপোষ আলোচনা বৈঠকের আয়োজন হয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কোন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ এবং পক্ষপাতমুক্ত আবহাওয়ায় এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হইলে ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়িবে এই আশায় সোবিয়েৎ প্রধানমন্ত্রী ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রীদ্বয়কে আমন্ত্রণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের সহিত সঙ্গে সঙ্গেই এই আমন্ত্রণ সাগ্রহে স্বীকার করেন। কিন্তু উদ্দিষ্ট বৈঠকে কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে এইরূপ একটি পূর্ব্ব-সর্ত্ত ব্যতীত পাকিস্তানী রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ ইহাতে সামিল হইতে প্রথমে অস্বীকার করেন। ভারত স্বভাবতঃই এরূপ সর্ত্ত মানিতে রাজী হইতে পারেন না। স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, যদিও গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তানী লড়াইয়ের যুদ্ধবিরতি আনুষ্ঠানিক ভাবে উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু বৎসরান্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের তরফ হইতে আগেকার মতনই ছোটখাট হামলা লাগিয়াছিল। এ সকল হামলা সম্পূর্ণ না বন্ধ হইলে আলোচনায় মিলিত হইয়া কোন সার্থকতা লাভ হইবে না, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনে করেন এবং ইহাই ছিল এই বৈঠকে মিলিত হইবার তাঁহার একমাত্র পূর্ব্বসর্ত্ত। সোবিয়েৎ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল যে উভয় রাষ্ট্রের একের উপরে অন্যের কোন দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে বা কোন সমস্যার মীমাংসা করিতে কেহ কখন সমরায়োজনের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না, আপোষ আলোচনার দ্বারাই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন,—উদ্দিষ্ট বৈঠকের আপোষ আলোচনার দ্বারা এই পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিটি আদায় করিয়া লওয়া। অবশেষে উভয় পক্ষ রাজী হওয়াতে তাসখন্দের সুন্দর সহরে এবং সোবিয়েৎ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আতিথেয়তায় উভয় প্রধান-মন্ত্রী মিলিত হইলেন। অনেক প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করিয়া উভয় নেতা একটি যুক্ত ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। ইহার বিশেষ বিষয় ছিল—ভবিষ্যতে সকল প্রকার ভারত পাকিস্তানের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্যা শান্তিপূর্ণ আব-হাওয়ায় এবং আপোষ আলোচনার দ্বারা সমাধান করিবার প্রয়াস করা হইবে; নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হইয়াছে তাহাকে অবিলম্বে কার্য্যকারী করা হইবে; ১৯৬৫ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে অবস্থিত স্থানে ভারতীয় ও পাকিস্তানী সৈন্য-বাহিনী তাঁহাদের সকল প্রকার সাজসজ্জা সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; উভয় পক্ষ স্বীকার করিয়া লইলেন যে, উভয় রাষ্ট্রের কাহারো এমন কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না যাহা পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা নিরসন করা অসম্ভব হইতে পারে। ইহাই ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তির মূল প্রতিশ্রুতি। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় এই চুক্তি সাধিত হয়। ইহা হইতে কতকগুলি আশার আভাস পাওয়া গেল। ভারত ও পাকিস্তানের পরিস্পরিক মৈত্রীর পথে যে সকল বাধাগুলি ক্রিয়া করিতেছিল, যথা চীনা-পাকিস্তানী প্ররোচক দলের প্রভাব, ভারত-পাকিস্তান বিরোধে ইঙ্গ-মার্কিনী উস্কানি ও প্রভাব-এ সকলে খানিকটা মন্দা পড়িল এবং পাকিস্তানের উপরে বর্দ্ধমান সোবিয়েৎ শান্তিকামী প্রভাবের ফলে ভারত মহাদেশে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র

য়ের শান্তিপূর্ণ এবং মৈত্রীবদ্ধ সহাবস্থানের আশা প্রজ্জ্বলিত হইল।

* * *

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণ

যেই দিন সুদূর তাসখন্দ শহরে শাস্ত্রী-আয়ুব স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরোধী শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তে ভারতের জন্ত একটি আকস্মিক ক্ষতি অপেক্ষা করিয়াছিল। পরদিন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এমন ব্যবস্থা ছিল। হঠাৎ গভীর রাত্রে হৃদযন্ত্রের নিকট তিনি সামান্ত বেদনা অনুভব করিলেন। পার্শ্বচরকে ডাকিয়া তুলিয়া চিকিৎসককে সংবাদ পাঠান হইল, কিন্তু তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়া তাঁহার জীবনাবসান ঘটিয়া গিয়াছে। যে কোন ব্যক্তির নিজের দিক হইতে এরূপ আকস্মিক প্রয়াণ সম্ভবতঃ খুবই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কোন রোগ-যন্ত্রণা পাইতে হইল না; যে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তিনি অব্যবহিতপূর্ব্ব পর্য্যন্ত গভীর ভাবে লিপ্ত ছিলেন তাহা কেবল মাত্র সুসম্পন্ন হইয়াছে; যে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে স্বদেশের শাসন পরিচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সবচেয়ে সঙ্কট-পূর্ণ পরিচ্ছেদ কয়েক সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে প্রায় বিনা ক্ষতিতে তিনি দেশকে অতিক্রম করাইয়া আনিয়াছেন; জগতের দেশে বিদেশে একাধারে তাঁহার সৌজন্য ও দৃঢ়তার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এক কথায় মানুষ এই মর্ত্ত্যজীবনে যাহা কিছু কামনা করে, সকলই তিনি পাইয়াছেন; তখন আপন যশের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিবার পর, মৃত্যুর পরিণতি তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে সুন্দর ও ভীতিমুক্ত মনে হইবে-সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভারতেতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সুদূর বিদেশে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণ যে একটা গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান কেবল মাত্র বিরতি লাভ করিয়াছে; উন্নয়ন পরিকল্পনার রচনার ভিত্তিমূলে নানা অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ ও পরিকল্পনা রূপায়ণবিধিতে ও পরিচালনায় নানা গোল-যোগের ফলে দেশের আর্থিক সঙ্কট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া একটা নিশ্চল অবস্থার প্রায় সম্মুখীন হইয়া আসিয়াছে; এই দরিদ্র দেশের অসংখ্য সাধারণ লোকের দারিদ্র্য উপবাসের পর্য্যায়ে ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে; দেশ জোড়া খাদ্য সঙ্কট; রপ্তানী বাণিজ্যে বর্দ্ধমান ঘাটতি; সরকারী ব্যয় বরাদ্দের আয়তন বৃদ্ধি; প্রতিরক্ষা আয়োজনের উপর বর্দ্ধমান চাপ, তথা ঐ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি; প্রশাসনিক গোলযোগ বৃদ্ধি; কংগ্রেস দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি দেশের ইতিহাসের অসংখ্য সমস্যা জর্জ্জরিত সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকস্মাৎ মহাপ্রয়াণ দেশজোড়া যে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

অতি সামান্ত কাল মাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কালে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সঙ্কটপূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সে সকলই তাঁহার পূর্ব্বসূরীর আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি পাকিস্তানী সমর অভিযানটিও যে পূর্ব্বসৃষ্ট সমস্যার পরিণতি মাত্র তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। একে একে তিনি সকল সমস্যাগুলির আপাতঃ সমাধানের পথ করিয়া লইতে-ছিলেন। তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত সব সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই; তাঁহার কোন কোন নির্দ্দেশ যে তাঁহার দলীয় অনুবর্ত্তীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী হয় নাই তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যাহা উচিত ও কল্যাণকর বিবেচনা করিয়াছেন তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। হয়ত উপযুক্ত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করিয়া থাকিলে, দেশের অনেকগুলি গুরুতর সমস্যার তাঁহার অভিপ্রেত সমাধানের উপায় তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন।

* * *

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন

জওহরলাল নেহরুর তিরোধানের পর তাঁহার পরবর্ত্তী প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে কংগ্রেস দলের বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় দলের নেতৃগোষ্ঠীর মধ্যে বড় কেহ একটা নেহরুর উত্তরাধিকারী হইতে ভরসা করিতে পারিতেছিলেন না। ঐতিহাসিক বিচারে নেহরুর রাজত্ব হয়ত কোন বৈশিষ্ট্য দাবি করিবার অধিকারী বিবেচিত হইবে না। বস্তুতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেহরুর প্রশাসনিক, আর্থিক, আন্তর্জ্জাতিক ইত্যাদি নীতিসমূহ ঐতিহাসিক বিচারে এক কালে ভুলে পরিপূর্ণ

বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সেই নিরপেক্ষ বিচারের সময় এখনো আসে নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীত্বের উত্তরাধিকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা আছে। জওহরলাল নেহরুর সামাজিক পুরাবৃত্ত, তাঁহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচণ্ড প্রভাব (glamour of his personality) এ সকলের উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবার সাহস বা আত্মপ্রত্যয় বড় কাহারও থাকিবার কথা নহে। তাই বড় কেহ একটা নেহরুরপরিত্যক্ত পদের জন্ত প্রার্থী হইয়া আগাইয়া আসিতে ভরসা পান নাই। সকলেরই মনে আশঙ্কা হয়ত ছিল যে তুলনায় তাঁহারা নেহরুর পূর্ব্বাধিকৃত পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হইবেন।

তাই এই পদের জন্ত যখন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নাম প্রস্তাবিত হইল তখন কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অগ্রসর হইয়া আসেন নাই। লালবাহাদুর শাস্ত্রী কিন্তু এই মনোনয়ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি জানিতেন নেহরুর সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁহার ছিল না, তিনি ছিলেন নিতান্ত সাধারণ ঘরের স্বল্পশিক্ষিত জনগণের একজন এবং সেই কারণে অনেক দিক দিয়া তাহাদেরই বেশী উপযুক্ত প্রতিনিধি। নেহরুর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের তিনি অধিকারী ছিলেন না, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু তাঁহার ছিল নিজস্ব একটি গুণ—শান্ত, নিরুদ্বেগ দৃঢ়তা। এ সকল হইতে তাঁহার লাভ হইয়াছিল একটি অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বহনে ও পালনে এই আত্মপ্রত্যয়ই যে একমাত্র তাঁহাকে সার্থকতার পথে চালিত করিতে পারিবে এই ভরসা তাঁহার ছিল। তিনি নেহরুর প্রতিচ্ছবি মাত্র হইতে চাহেন নাই, কখনও চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার নিজের মতন করিয়া এদেশের অসংখ্য সমস্যা ও সঙ্কট জর্জ্জরিত রাজশক্তির পরিচালনা করিবার গুরুতর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন ও বহন করিবার তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। একাধিকবার—তাঁহার অল্পকালের শাসনকালে—সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তিনি এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যাহা তাঁহার অনুবর্ত্তী দল-নেতৃত্বের সক্রিয় অনুমোদন লাভ করে নাই। কিন্তু তিনি নিজের বিচার হইতে কখনো বিচ্যুত হন নাই।

কিন্তু লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তিরোধানের পর যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ আবার খালি হইল, তখন এই পদের প্রার্থীর আর অভাব রহিল না। অনেকেই তখন এই পদের জন্ত লালায়িত হইলেন। দলের শীর্ষ-নেতৃত্বের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপও তখন আর প্রচ্ছন্ন রহিল না। শাস্ত্রে বলে লোভ একটি রিপু, একটি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। কিন্তু যত প্রকারের লোভ হইতে পারে, তাহার মধ্যে ক্ষমতার লোভই নিকৃষ্টতম লোভ। এই নিকৃষ্টতম লোভের কুৎসিত প্রকাশ তখন সাধারণ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। দলের উচ্চতম অধিকারীরা এই কুৎসিত দ্বন্দ্বের কোন প্রকার সমাধান করিয়া একটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত প্রার্থীকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমর্থ হইলেন না। অবশেষে এই দ্বন্দ্ব প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নেহরুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এই পদের প্রার্থী হইতে বলিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান হইল না; একটি বিশেষ প্রার্থী তখনও নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে বদ্ধপরিকর হইয়া রহিলেন। সুখের বিষয় বিরাট ভোটাধিক্যে ইন্দিরা নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্ব্বাচনে দেশের লোক খুশী হইয়াছে। আর যাঁহারা এই পদটির প্রার্থী ছিলেন তাঁহারা সকলেই বৃদ্ধ হইয়াছেন, কাহারও বয়স ৬৫র কম নহে, কেহ কেহ আরো বৃদ্ধ। বৃদ্ধ বয়সের কুৎসিত লোভের যে চিত্র দেশের লোক দেখিয়াছে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান-মন্ত্রীত্ব লাভে তাহারা কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছে।

মাত্র কয়েক মাস হইল ইন্দিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই ক্ষমতা প্রয়োগের সার্থকতার বিচার করিবার সময় এখনো হয়ত আসে নাই। আর মাত্র চারি মাস পরে সাধারণ নির্ব্বাচন। নির্ব্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল যাহা তাহাতে কংগ্রেসের পুনর্ব্বার ক্ষমতায় বহাল হইবার আশাই বেশী। কিন্তু তাহা হইলেও ইন্দিরাই যে পুনর্ব্বার প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইবেন এমন নিশ্চয়তা এখনই নাই। না হইলে প্রধান-মন্ত্রীর পদে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগের সার্থকতার প্রশ্ন হয়ত কখনো উঠিবে না। কিন্তু পুনর্নির্ব্বাচনের পর ঐ পদে যদি তিনি আবার পুনর্বহাল হন তখন তাঁহার কার্য্যকলাপ ইতিহাসের অনুসন্ধানীদিগের বিচারের বিষয় হইয়া উঠিবে; ঐ পদে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন কি না, তখন তাহার বিচার হইবে।

* * *

টাকার বিনিময় মূল্য

বর্তমান বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে অন্যতম গত ৬ই জুন তারিখ হইতে টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য কমাইয়া দেওয়া। ইহার অর্থ এই যে, গত ৬ই জুন হইতে অন্যান্য দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইলে ভারতীয় মুদ্রায় তাহার মূল্য শতকরা ৫৭.৫ ভাগ বেশী পড়িবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ দর্শাইতে গিয়া ভারতীয় অর্থমন্ত্রী বলেন যে, গত দশ বৎসরে (১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে ১৯৬৩-৬৪ সাল) ভারতে দ্রব্যমূল্য পাইকারী বাজারে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় টাকার ক্রয়-মূল্য মাত্র আন্দাজ ৩৬ পয়সায় দাঁড়াইয়াছে। অন্য একটি হিসাবে দেখা গেল যে, ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪ সালে টাকার ক্রয় মূল্য প্রায় ১৭ পয়সার মতন হইবে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্য চালু রাখিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। টাকার বিনিময় মূল্য কমাইয়া ইহার বর্তমানের বাস্তবিক ক্রয়ক্ষমতার সহিত বিদেশী মুদ্রার সত্যকার মূল্যের (অর্থাৎ ক্রয়-ক্ষমতার) সামঞ্জস্য সাধন করা হইল। ইহার ফলে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইতে সুবিধা হইবে এবং চোরা আমদানী বন্ধ করিবার প্রয়োজন সাধন করা সম্ভব হইবে।

অবশ্য তিনি স্বীকার করেন এই বিনিময় মূল্য কমাইয়া দিবার ব্যাপারটা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র। ইহাকে ফলবতী করিতে হইলে নানাবিধ আনুসঙ্গিক প্রয়োগ ফলবতী করা একান্ত প্রয়োজন—যথা উৎপাদন বৃদ্ধি, ভোগ সঙ্কোচ (যাহাতে রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে), সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ এবং স্থির মূল্যাবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি।

ইহার আপাত ফল যাহা হইতেছে তাহা এই যে, বিদেশ হইতে আবশ্যিক আমদানীর (essential imports) জন্য আমাদিগকে এখন ৫৭.৫% অধিক মূল্য দিতে হইতেছে; বিদেশী ঋণের পরিশোধ্য কিস্তি ও তৎসম্পর্কিত সুদ বাবদও টাকায় আমাদিগকে ৫৭.৫% বেশী ব্যয় করিতে হইতেছে; বিদেশী কুশলীদের বেতন ও ভাতায় ৫৭.৫% বেশী দিতে হইতেছে ইত্যাদি। রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে বলা যায় যে, আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য যদি পূর্বাবস্থায় মাত্র রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে রপ্তানীর পরিমাণ অন্ততঃ ৫৭.৫% বাড়াইতে হইবে।

স্থির মূল্যাবস্থা রক্ষা করিবার বিষয় বলা যায় যে, এই সিদ্ধান্তটি প্রযুক্ত হইবার পর হইতে দেশের ভোগ্য-পণ্যের মূল্যমান মোটামুটি গত দুই মাসে ১০.১২% বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার একটা মোটা অংশ সরকারী মঞ্জুরী পাইয়াই বাড়িয়াছে।

* * *

চতুর্থ উন্নয়ন পরিকল্পনা

তিনটি পরিকল্পনাকালের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োগের ফলে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি ঘটিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে:—

মূল্যবৃদ্ধি—৮০%রের অধিক, অর্থাৎ টাকার ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া কমিয়া বর্তমানে ৩৬ পয়সায় দাঁড়াইয়াছে।

খাদ্যসঙ্কট—দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছিল যে, খাদ্যশস্যের ফসলের পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার ফলে জনপ্রতি দৈনিক ১৬ আউন্স খাদ্যশস্যের ভোগের ব্যবস্থা হইতে পারে; ইহা যথেষ্ট নহে, কিন্তু যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে দৈনিক জনপ্রতি ১৮ আউন্সের ব্যবস্থা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সাল পর্য্যন্ত, সম্ভব হইতে পারে।

গত দুই বৎসর ধরিয়া দেশে ঘোরতর খাদ্য সঙ্কট চলিতেছে। নির্দ্ধারিত সরকারী মূল্যমানের তুলনায় খোলাবাজারে চাউল ও গমের পাইকারী লেনদেন যথাক্রমে ২০০% এবং ১২৫% বেশী মূল্যে চলিতেছে।

কিছু কিছু সঙ্কীর্ণ এলাকায় সরকারী পরিচালনায় পূর্ণ র‍্যাশনিং এবং কোন কোন এলাকায় আংশিক র‍্যাশনিং ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ণ র‍্যাশনিং বিস্তৃত এলাকায় পূর্ণবয়স্কদের জন্য দৈনিক খাদ্য-শস্যে বরাদ্দ হইয়াছে ১০ আউন্সের কিছু কম, এবং আংশিক র‍্যাশনিং এলাকায় প্রায় ৮½ আউন্স।

গত বৎসর বিদেশ হইতে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া প্রচার হইয়াছে; বলা হইয়াছে আগামী বৎসর ১৮০ লক্ষ টন আমদানী হইবে।

পরিকল্পনা প্রয়োগের আর যে সকল কুফল ঘটিতেছে এবং ঘটিয়াছে তাহা বাদ দিয়া কেবল মাত্র যে দুইটি ফল সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়

প্রতিনিয়ত অপঘাত সৃষ্টি করিতেছে, মাত্র তাহারই উল্লেখ করিলাম।

পরিকল্পনা অনুগামী উন্নয়ন প্রয়োগের একটি গোড়ার পাঠ—প্রথম, উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনকারী কৃষি ব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সার্থক শিল্পায়ন ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব হয় না; দুই, উন্নয়ন প্রয়োগ উদ্দেশ্যে পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ যথার্থ পুঁজি সঞ্চতি অতিক্রম করিয়া গেলে, অসহনীয় মূল্যচাপ সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে এমন একটা অস্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে উন্নয়ন-সার্থকতা লগ্নীর পরিমাণের তুলনায়, বিশেষ পরিমাণে বিঘ্নিত হয়; তিন, উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের যথার্থ আর্থিক ভিত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচনা করা প্রয়োজন এবং তাহার প্রয়োগ-গতি বুনিয়াদী অর্থব্যবস্থার গতিবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিয়মিত করা প্রয়োজন। যথা যেদেশে লগ্নীযোগ্য পুঁজির অভাব এবং কর্ম্মসংস্থান প্রার্থী শ্রমিকের কোন অভাব নাই, সে সকল দেশে নিয়োগযোগ্য শ্রমিক-প্রতি লগ্নীকৃত পুঁজির পরিমাণ বেশী হইলে সামাজিক কাঠামোয় ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইয়া পুঁজি নিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সে সকল দেশে প্রয়োজন প্রতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি লগ্নীর দ্বারা যাহাতে বৃহত্তম সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ সম্ভব হয় তাহারই আয়োজন করা। অর্থশাস্ত্রের এ সকল মূল পাঠের সব কয়টিই উপেক্ষা করিয়া এতাবৎকাল এদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও প্রয়োগ করা হইয়া আসিয়াছে। ফলে নিম্নতম-আয়ের মানে মহার্ঘ্যতম অর্থ ব্যবস্থার (low income-cum high lost economy) সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঘোরতর সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

———

আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

ছাত্র বিক্ষোভ

আর্থিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে ছাত্র-বিক্ষোভের কথা কি করিয়া আসে সে প্রশ্ন অনেকে করিতে পারেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, দেশের আর্থিক জীবনে ছাত্রদিগের শান্ত, নিরুদ্বেগ এবং অনন্যমনা অধ্যয়ন অনুশীলনের মধ্য দিয়াই একমাত্র সুস্থ, স্বাভাবিক, উন্নয়নশীল এবং গতিবান আর্থিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতে পারে, অন্যথায় নহে। ইহার অন্যথা হইলে যে প্রচণ্ড সামাজিক ও আর্থিক অপচয় অনিবার্য্য ভাবে ঘটিতে বাধ্য, তার বিষময় ফল শুধু আপাতঃ বর্ত্তমানে নহে, বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে। তাই এই আলোচনা যে শুধু প্রাসঙ্গিক তাহা নহে, ইহা কর্ত্তব্যও বটে।

স্বাধীনতার পর হইতেই ছাত্র বিক্ষোভ একটা নূতন রূপে এবং পথে আত্মপ্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছিল। দেশের ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ও ক্ষমতারূঢ় ব্যক্তিগণ প্রথমে ইহাকে নূতন স্বাধীনতা লাভের ফলে অনিবার্য্য উত্তেজনাপ্রসূত-বালসুলভ চপলতার এবং খানিকটা হয়ত আতিশয্যের প্রকাশ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে যখন এই বিক্ষোভ আয়তনে এবং বিস্তৃতিতে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে সুরু করিল এবং ক্রমে ধ্বংসাত্মক পথে চলিতে সুরু করিল তখন দেশনেতারা ছাত্রসমাজকে ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়াই এবং তাহাদিগের অসংযত ব্যবহার সংযত না হইলে কঠিন দণ্ড বিধান অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে এই ভয় দেখাইয়া আপনাদের দায়িত্বমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ক্রমশঃপ্রসারী ছাত্র বিক্ষোভ ও অসংযমের আসল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া এবং ইহার যথার্থ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কেহ কখনো প্রয়োজন মনে করিয়াছেন এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। রোগের কারণ নির্ণয় না করা পর্য্যন্ত যে উপযুক্ত এবং কার্য্যকরী চিকিৎসা যে কখনো সম্ভব হয় না, এ কথাটি কেহ কখনো চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

সম্প্রতি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীকামরাজ না কি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান দেশজোড়া ছাত্র বিক্ষোভ ও অসংযমের অন্যতম প্রধান কারণ, রাজনৈতিক দলগুলি ইহাদিগকে তাহাদিগের দলীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিতেছে। তিনি না কি দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলিকে উপদেশ দিয়াছেন যে, ছাত্র বিক্ষোভ রূঢ়তার দ্বারা দমন করা যাইবে না, ধৈর্য্য, সংযম ও ভদ্র ব্যবহারই একমাত্র তাহাদিগকে শান্ত করিতে সমর্থ হইবে। তিনি না কি আরো বলিয়াছেন ছাত্রদিগের অভিযোগ সম্বন্ধে সহানুভূতি ও তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ছাত্রগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলনে ব্যবহার করা আজ নূতন নয়। কংগ্রেস দলই এই বিষয়ে যে সমধিক অপরাধী তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। স্বাধীনতার বহু পূর্ব্ব হইতেই কংগ্রেস দল তাহাদিগের বিদেশী-সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলি জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তনগুলি হইতে তাহার প্রধান উপাদান সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই বিষয়ে বিশেষ অপরাধী ছিলেন। ১৯২১ সালে তাঁহার নিখিল ভারত অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের প্রতি তাঁহার "গোলামখানা ছাড়ো" নির্দ্দেশের কথা সকলেই জানেন। শিক্ষাব্রতী চিন্তাশীল দেশনায়কেরা তখন ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য তথা লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপলক্ষ্যেও তিনি এবং তাঁহার অনুগামী নেতৃবর্গ সম্পূর্ণবিবেকহীনতার সঙ্গে ছাত্রদের ব্যবহার করিয়া আন্দোলনের রসদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অসংখ্য এবং স্থানীয় রাজনৈতিক উপলক্ষ্যে ছাত্রদের ব্যবহার করা হইয়াছে,—কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃবর্গ ইহার কখনো প্রতিবাদ ত করেনই নাই, বরং দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ইহাতে সায় দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার পরেও যে কংগ্রেস দল ছাত্রগোষ্ঠীকে আপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গত তিন তিনটি সাধারণ নির্ব্বাচনে ব্যাপক ভাবে এবং নির্ব্বিচারে কংগ্রেস এবং তথাকথিত বিরোধী দলগুলি যে ছাত্রগোষ্ঠীকে আপন আপন নির্ব্বাচনের কাজে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রমাণের কোন অভাব নাই। আসন্ন নির্ব্বাচনেও যে কংগ্রেস আবার বিরোধী দলগুলিরই মতন তাহাদিগকে ব্যবহার করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তবে শ্রীকামরাজের এ সকল উপদেশ বাণীর সত্যকার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য অতি স্পষ্ট—আগামী চারি মাসের মধ্যে আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচন—ইতিমধ্যে ছাত্র আন্দোলন প্রশমিত করিতে না পারিলে নির্ব্বাচনে জয়লাভের আশায় গভীর সন্দেহের ঘুণ ধরিয়া বসিবে, এই আশঙ্কা। তবে এহ বাহ্য।

সম্প্রতি প্রচারিত একটি সংবাদে প্রকাশ যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ছাত্র অসংযমের প্রধান কারণ চতুর্ব্বিধ; যথা—শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব; আর্থিক দুরবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার; শিক্ষা-ব্যবস্থায় অসুবিধা (defects) এবং সাধারণতঃ, আদর্শ-বাদের অভাব। সরকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয় আদৌ এই রকম একটি কারণানুশীলনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং বহন করিবার সত্যকার অধিকারী কি না, সে সম্বন্ধে অবশ্য গভীর

সন্দেহের অবকাশ আছে। সরকারী অসামরিক কর্মচারী গোষ্ঠী এবং প্রাক্তন বিচারপতি লইয়া গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একদিকে ছাত্র গোষ্ঠীর সহিত কোন আত্মিক যোগ থাকিবার বা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবার কোনই অবকাশ নাই; অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ, তাহার গতি ও প্রকৃতি, ইত্যাদি সম্বন্ধেও ইঁহাদের কোন বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা নহে। তবুও তাঁহারা বর্তমান ছাত্র বিক্ষোভের যে চতুর্বিধ কারণ দেখাইয়াছেন তাহার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে বর্তমানে যে নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহা স্পষ্ট ও অনস্বীকরণীয়। ইহার কারণ এই অনুশীলনে নির্ণয় করিবার কোন প্রয়াস করা হয় নাই। কিন্তু কারণটি জলের মতন স্পষ্ট (self evident); সত্যকার শিক্ষকের বৃত্তি-সম্পন্ন বড় কেহ একটা আজকাল শিক্ষকের কাজে আসেন না। প্রথমতঃ জীবন ধারণের প্রকৃতি আজকাল ক্রমশঃ এমন জটিল এবং বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়িতেছে, যে, একটা নিম্নতম আর্থিক সঙ্গতি শিক্ষকের পক্ষেও একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ শিক্ষায়তন গুলি শিক্ষকের জন্ম এই নিম্নতম আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ। আনুসঙ্গিক আরো দুইটি কারণে সত্যকার শিক্ষাব্রতী এ পথে আসিতে দ্বিধা করেন। আমাদের তথাকথিত সমাজবাদী আদর্শবাদের বুলি সত্ত্বেও সমাজে গত কয়েক দশকের মধ্যে একটি নূতন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতি বিচার দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছে। মনুসংহিতা নির্দ্দিষ্ট বর্ণবিচারে সমাজের যাঁহারা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-শাস্ত্রানুশীলন ইত্যাদি শ্রমে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদিগকেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। শাসক সম্প্রদায় ছিলেন দ্বিতীয়াধিকারী ক্ষত্রিয় এবং বাণিজ্যবৃত্তিধারী ধনিক শ্রেষ্ঠী গোষ্ঠী বৈশ্য ছিলেন মাত্র তৃতীয়াধিকারী। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বেও আমাদের সমাজে জড় সম্পদহীন শিক্ষাব্রতীর স্থান ছিল সমাজের শীর্ষতম পর্য্যায়ে। কিন্তু ক্রমশঃপ্রসারী বৈশ্য শক্তির ফলে ক্রমে অর্থ সঙ্গতিই তার মানবিক অধিকার নহে,মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষাব্রতী চিরকালই তাঁহার আর্থিক দারিদ্র্য ও তজ্জনিত সকল প্রকার সাংসারিক দুঃখ ও অসুবিধা স্বীকার করিয়াও তাঁহার নিজ ব্রতে শ্রেষ্ঠতম সামাজিক আসন পাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বৈশ্যতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসনের ফলে আজ সেই আসন হইতে তিনি চ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, সেটি কালোবাজারী বিত্তবানদের অধিকারে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যকার শিক্ষাব্রতীর নিকট সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিজস্ব খুব একটা মূল্য নাই, ইহার একমাত্র মূল্য ছিল তাঁহার বৃত্তি ও ব্রতের প্রতি সমগ্র সমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার প্রভাবেই তিনি শিষ্যের হৃদয়ে ও মনে আপন চরিত্রের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারিতেন। তাহাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলতে পারিতেন। আজ নূতন সামাজিক বর্ণভেদের ফলে তাঁহার ব্রত পালনের উপযুক্ত পরিবেশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সত্যকার শিক্ষাব্রতী আজ নিরাশ হইয়া শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের বদলে আজ যাঁহারা শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই ঝুটা মাল, সত্যকার শিক্ষকের বৃত্তির দায়িত্ব গ্রহণের ইঁহাদের অধিকার নাই, ক্ষমতাও নাই। শিক্ষকতা ইঁহাদের নিকট জীবিকা মাত্র, শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোন অধিকতর অর্থ সঙ্গতি সম্পন্ন বৃত্তিতে প্রবেশাধিকার পাইলে শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে ইঁহাদের কোন দ্বিধা নাই; শিক্ষকতার আর্থিক দারিদ্র্য ইঁহারা নানা প্রকার আনুসঙ্গিক এবং সত্যকার শিক্ষকের পক্ষে অবমাননাকর উপায়ে পূরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের নিকট নেতৃত্বের আশা করাই বাতুলতা। রাজপথে মিছিল করা, ঝাণ্ডা ওড়ান শিক্ষক ছাত্রগোষ্ঠীর নিকট শ্রদ্ধার আশা করিতে পারেন না।

আমাদের কংগ্রেস রাজ সরকার শিল্পায়নে, বাণিজ্যে ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে সমাজবাদী (তথাকথিত) আদর্শের অনুসরণে সরকারী প্রয়োগের (public centerprise) আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু সমাজ গঠনের কাজে সকলের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রে এবম্প্রকার সরকারী প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে বা তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহারা কোন তৎপরতার লক্ষণ দেখান নাই।

আর্থিক অসুবিধা আজ সমগ্র দেশে সার্ব্বজনীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহার প্রতিঘাত অনিবার্য্যভাবেই ছাত্র গোষ্ঠীর উপর আসিয়া পড়িতেছে। ইহার নিরসনের কোন উপায় নাই। কেননা সমাজবাদী পরিকল্পনামূলক পঞ্চবার্ষিকী আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োগের চাপে, কেবলমাত্র একটি মুষ্টিমেয় বৈশ্যগোষ্ঠী ব্যতীত, দেশের আর সকলের আজ আর্থিক নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ইহা হইতে এটা সামগ্রিক বিপ্লব (total revolution) ব্যতীত মুক্তি

পাইবার অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না। রাজসরকার আজ এমন ভাবে বৈশ্যস্বার্থ কবলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তিন তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তাহার প্রয়োগবিধির বিষময় ও সঙ্কটপূর্ণ ফল স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠা সত্ত্বেও এই বৈশ্যস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে, ইহার অনিবার্য্য প্রতিঘাতের স্বরূপ জানিয়াও তাঁহারা একই পথে এবং প্রয়োগবিধির পূর্ব্বানুবৃত্তিমূলক চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির নিষেধ বাণী, স্থায়শাস্ত্রের সকল চিরন্তনী নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই তাঁহারা এ পথে চলিতেছেন। ছাত্রগোষ্ঠী এ সকলই দেখিতেছে, আপনাদের জীবনে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে, তাহারা দেখিতেছে এই বৈশ্যস্বার্থ অধ্যুষিত সমাজে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারে মগ্ন, কোথাও কোন আশার আলোক বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না। তাহাদের মনে যে প্রবল বিস্ফোরক বিক্ষোভ পর্ব্বত-প্রমাণ হইয়া জমিয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাত্রদের অনিবার্য্য অন্ধকার ভবিষ্যতের ভয়াবহ আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিবার কোন উপায় চিন্তা করিয়াছেন কি?

তৃতীয় কারণ বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ অসঙ্গতি ও দোষ। স্বাধীনতার পর হইতে কংগ্রেস দলের সকল পর্য্যায়ের তথাকথিত নেতৃবর্গ সকলেই শিক্ষা সংস্কার করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেককেই কোন ভাবাতেই শিক্ষিত বলিয়া স্বীকার করা চলে না। বস্তুতঃ ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট নিখিল ভারতপ্রসারী প্রভাবশালী দলনেতাকে প্রায় নিরক্ষর বলিলেও অন্যায় হয় না। ইঁহারাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আজিকার দিনে নিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতা। দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ও আয়োজনের একটা নূতন করিয়া পরিমাপ করিবার কোনও আয়োজন শিক্ষা মন্ত্রণালয় করিয়াছেন কি? বলা বাহুল্য দলীয়, এমনকি পার্লামেণ্টারী কমিটির দ্বারাও এরূপ পরিমাপের ফলে কোন লাভ হইবে না; একমাত্র সত্যকার শিক্ষাব্রতীর দ্বারাই এই উদ্দেশ্য স্বার্থক ভাবে সিদ্ধ করা সম্ভব। আর এই রূপ পরিমাপের কাজটি প্রাথমিক হইতে সুরু করিয়া সর্ব্ব স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে হওয়া জরুরী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের শেষ কথা—ছাত্রদের মধ্যে সাধারণতঃ আদর্শবাদের অভাব। প্রশ্ন হইতেছে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে কোথাও কোন স্তরে আদর্শবাদের কণামাত্র অবশিষ্ট আছে কি না? আমাদের গৃহে, পল্লীতে, রাজ্যে, রাষ্ট্রে, শাসন-সংস্থার সর্ব্বত্র আদর্শবাদকে মারিয়া স্বার্থবাদ (expediency) আপন স্থান করিয়া লইয়াছে। বিত্তবানের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত নির্ব্বাচন-বৈতরণী উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না, অতএব শাসকগোষ্ঠী অন্যায় করিয়াও তাহার স্বার্থ সাধন করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এ সকলই ছাত্রগোষ্ঠীরা দেখিতেছে এবং বুঝিতেছে। সে দেখিতেছে যে শাসকগোষ্ঠীর অন্দর মহলে কালোবাজারী, রাজস্ব ফাঁকিবাজ তস্করের অবাধ আনাগোনা। সে দেখিতেছে অন্যায়কারী দলীয় মন্ত্রী, কেবল দলের স্বার্থে অব্যাহতি পাইতেছে, এমন কি নির্ব্বিরোধে মন্ত্রিত্বও করিয়া চলিয়াছে। এ সকলের অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া তাহাকে আদর্শবাদের তথাকথিত মোহ হইতে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। অর্থাৎ মূল্যবোধ বদল হইয়াছে—চরিত্রবলের আজ কোন দাম নাই, না আপন গৃহে, না সমাজে, না রাষ্ট্রে—এই পরিবেশে কেবলমাত্র ছাত্রগোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া আদর্শবাদের অঙ্কুরটি বাঁচিয়া থাকিবে?—এমন অদ্ভুত আশা বা আব্দার করিলে চলিবে কেন? ধর্ম্ম সমাজ ও গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে—সমূলে বিনষ্ট হওয়াই ইহার অনিবার্য্য পরিণতি।

শীতরাত্রি : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২৯ এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলিকাতা-১৯। মূল্য তিন টাকা।

কয়েকটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কবি হিসাবে ধীরেন্দ্রনাথের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই; সত্যিকার কবি বলিয়া তাঁর খ্যাতি আছে। নূতন-পন্থী, প্রাচীন-পন্থী বলিয়া কোন শ্রেণী-ভাগ করিব না, পড়িতে ভাল লাগে, কাব্যের এই বিচারই যথেষ্ট! ধীরেনবাবু জাত-কবি। কবিতার প্রতিটি ছত্রে তাহা সুপরিস্ফুট।

"পিচ-ঢালা পথ, রৌদ্রে আগুন জ্বালা,
হরকোপানলে দগ্ধ মদনতনু,"

অথবা,

"নিজে বাঁচা, না কি দেরি হ'তে বাঁচা ভাল,
বুঝিতে পারি না, ছুটেছি উর্দ্ধশ্বাসে,"

এরূপ লাইন যথার্থ কবির কলম ছাড়া বাহির হইতেই পারে না। বহুদিন পরে একখানি ভাল বই পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম।

ঝিনুক নিয়ে খেলা : বিনায়ক সান্যাল, ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

কবি বিনায়ক সান্যাল প্রাচীন কবি। আজকে তাঁর কথা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি সেকালে কম ছিল না। কবি নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রোত্তরকালে কাব্যের রূপকল্প নিয়ে পরীক্ষ-নিরীক্ষ। নেহাত কম চলছে না; রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করার ইচ্ছাই এর কারণ কি না জানি না। তা ছাড়া, লোকরুচির কাঁটাও কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে হেলছে। এই ক্রান্তিসন্ধিক্ষণে পুরাণ দিনের পসরা নিয়ে জনচিত্তরঞ্জনের আশা দুরাশা মাত্র···"ইত্যাদি।

তবু আজকের পড়ুয়াদের সামনে সেকালের কবির কয়েকটি লাইন তুলিয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না :

"ফুল সে ফুটে চলে ফলের লাগি' সে কি ?
ছন্দ গাঁথে কবি কাহার রূপ দেখি ?
নয়ন-জলে মালা বিরহী গেঁথে চলে,
রতন-মণি সে কি ফিরিয়া পাবে বলে ?"

ইহার পর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ক্রীড়া-সম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী : শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীসুনীলকুমার দত্ত এম, এ,ই, ই মহাশয় বইখানি প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য চার টাকা।

নগেন্দ্রপ্রসাদের জীবন-কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা—তাঁহারই প্রচেষ্টায় বাংলায় তথা ভারতে ফুটবল খেলার জন্ম হয়। সুপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি খেলার জনকরূপেই নগেন্দ্রপ্রসাদের প্রসিদ্ধি। ফুটবল খেলাতে অদ্বিতীয় 'ফরওয়ার্ড প্লেয়ার' বলে প্রাচীনদের গল্প করতে শুনেছি; অনেকে তাঁকে শোভাবাজার ক্লাবের Lindsay বলতেন। এক দিক্রমে ২৫ বছর সমান তেজে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা, নগেন্দ্রপ্রসাদ ছাড়া অন্য কোন বাঙালীতে সম্ভব হয় নি। তিনি ছিলেন সে যুগের আয়রণ-ম্যান।"

গ্রন্থকার নগেন্দ্রপ্রসাদের জীবন-চরিত্রের মাধ্যমে তখনকার বাংলার ইতিহাসই রচনা করিয়াছেন। তাঁর এই গ্রন্থ হইতে অনেক তথ্যই আমরা জানিতে পারি। আমরা অনেকেই হয়ত জানি না, বর্তমান 'আই, এফ, এ' শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলার প্রবর্তনের মূলে ছিলেন এই নগেন্দ্রপ্রসাদ। নগেন্দ্রপ্রসাদ শুধু খেলা লইয়াই ছিলেন না, তিনি সাহিত্য চর্চাও করিয়া গিয়াছেন। তিনি খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা আজকের দিনে সকলেরই মনে রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছেন—"ডন কুস্তি, মুগুর ভেঁজে গুণ্ডাও হয়, আবার মহাপ্রাণও হয়। শেষেরটাই বেশী হয়। খেলা হবে—রেক্তোর গাঁথুনি, দু'ঘা খেতেও পারবে আর দু'ঘা দিতেও পারবে। তারেই বলি খেলোয়াড়, যে হিংসা-দ্বেষ বিবর্জিত, যে ধ্যানমগ্ন, যে সাধনা-নিরত।"

শাক-সব্জীর বাগান, ও চাষের পাঁজি : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, মেরিট পাবলিশার্স', ৫১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

'অধিক খাদ্য উৎপাদন' আন্দোলনের সময় এই গ্রন্থ দু'খানি খুবই কাজে লাগিবে। গ্রন্থকার এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর বহু প্রবন্ধ আমরা প্রবাসীতেই পাঠ করিয়াছি। আজ পরিণত বয়সেও তিনি কৃষি ও পল্লী সমস্যা যে চিন্তা করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়। টেবিল-চেয়ারে বসিয়া যাঁরা চাষ সম্বন্ধে উপদেশ বিতরণ করেন, ইনি সে-শ্রেণীর লোক নন। হাতে-কলমে কাজ করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁহার ছিল।

স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, বপন ও রোপণের সময়, উন্নত বীজ, ও বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা, জমির পরিচর্য্যা, সার প্রয়োগ, জল-সেচন, কীট-পতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ ও তাহার প্রতিকার—সকল বিষয় এই পুস্তিকা দু'খানিতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া অনভিজ্ঞ লোক ত উপকৃত হইবেনই, উপরন্তু চাষীরাও অনেক নূতন কথা শিখিতে পারিবেন।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ডঃ কালিদাস নাগ

জন্ম : ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ মৃত্যু : ৮ নভেম্বর, ১৯৬৬

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩	দ্বিতীয় সংখ্যা

কালিদাস নাগ

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার নবজাগরণের যুগ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দির শেষের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। এই যুগের আরম্ভ হয় রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের পরে ও ইহা শেষ হয় রবীন্দ্রনাথের জীবন অবসানের সহিত। রবীন্দ্রনাথের পরে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ক্রমাগত নূতন পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। নূতন পথ না পাইয়া কষ্ট-কল্পনার ও অক্ষম অনুকরণের আশ্রয়ে চলার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন গৌরবের দীপ্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবার প্রেরণা হারাইয়া নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্ধকারের আবির্ভাবের মধ্যেও যাঁহারা ভারত প্রতিভার আলোক দীপ্যমান রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন কয়েকদিন পূর্বে নরদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। তিনি কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বিশ্বের 'ভারতবন্ধু' সমাজে ভারতের কৃষ্টির দূত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ কালিদাস নাগ।

কালিদাস নাগ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অর্জন স্কুল-কলেজে পাঠ করিয়া, পুস্তকাগারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে অনুশীলন করিয়া ও মহা মহা পণ্ডিতজনের নিকটে শিক্ষা লইয়াই আরম্ভ হয়; কিন্তু পরে তিনি পূর্বকালের অনেক পণ্ডিতদিগের মতই বিদ্যালাভের জন্য দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে অনুশীলনের বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া জ্ঞানাহরণ করিতে থাকেন। এই কার্য্যে তিনি আজীবন নিযুক্ত ছিলেন ও তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে তাঁহার এই সাক্ষাৎ অর্জিত বিদ্যার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা, উচ্চ মানবতা ও ধর্মবোধ এবং মানবজীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান; তাঁহার নিকটে বসিয়া

দিনের পর দিন আলোচনা করিলেই শুধু পূর্ণরূপে বুঝা যাইত। ইতিহাসে যে সকল মহা মহা পরিব্রাজক পণ্ডিতদিগের কথা আমরা শুনিয়া থাকি; আধুনিক কালের দূর-দূরান্তরে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় কালিদাস নাগ বহু পণ্ডিত পরিব্রাজকের কার্য্য নিজের জীবনে একেলাই করিয়া গিয়াছেন বলা যায়। তিনি মেগাস্থিনিস, ই-ৎসিং, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, মার্কোপোলো, আলবেরুনি, ইবন্ বতুতা প্রভৃতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরিব্রাজকদিগের সহিত তুলনীয়; এবং তাঁহার জীবন ও পাণ্ডিত্যের পূর্ণ আলোচনা করিতে হইলে বহু দেশ ও বহু বিষয়ের কথা বলিতে হয়। তিনি বিগত চল্লিশ বৎসরাধিক কাল কত দেশে গমন করিয়া, কত গুণীজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কত আলোচনা সভায় যোগদান করিয়া বিশ্বের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে বিদ্যা আহরণ করিয়া ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা অল্প কথায় হইতে পারে না। ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টির কথাও তিনি দেশ-দেশান্তরে প্রচার করিয়া বিশ্বের পণ্ডিত সভায় ভারতের কথা জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শান্ত সৌম্য প্রিয়দর্শন কালিদাস নাগ বহু দেশের মনীষীদিগের সাহচর্য্যে বিদ্যার্জ্জন ও প্রচার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে দেশেই যখন গিয়াছেন সেই দেশের মানব জীবনের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ও সর্ব্বমানবের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতিবশতঃ তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মেলামেশা করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন। তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে মহা মহা পণ্ডিতজন ত ছিলেনই কিন্তু আরও দেখা যাইত কত লোক যাঁহারা হাস্যমুখে ঐ ভারতীয় পণ্ডিতকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেন। ছাত্র, দোকানের বিক্রেতা, ভোজনাগারের পরিবেশনকারী, লাইব্রেরীর কর্ম্মী, হোটেলের কর্ম্মী, সংবাদপত্রের সংবাদ-সংগ্রাহক ও কত অজানা অচেনা লোক তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া উঠিতেন তাহার সংখ্যা হয় না। এই হিসাবে তিনি বিশ্ববন্ধু ছিলেন ও বিশ্বমানবের প্রতি ভালবাসা তাঁহার মধ্যে স্বতঃস্ফুরিত হইয়া জাগ্রত ছিল।

মূলতঃ কালিদাস নাগ ইতিহাস ও মানবতার চর্চ্চাতেই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত Discovery of Asia গ্রন্থে তিনি শেষের দিকে বলিয়া গিয়াছেন—

Religion apart the basic ethical ideals of the East are reacting clearly against the aggression of the West. The Cairo Conference on Afro-Asian Solidarity gives a signal that civilisation may yet be salvaged and Humanity saved through the solemn and scientific truths of Co-existence and Non-violence. May the men and women of goodwill all the world over, join Asia to strengthen the Cause of World Peace for, as the Indian Sages ever pronounced, Humanity stands on the foundations of Peace, Goodness and Unity: শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

অর্থাৎ—ধর্ম্মের কথা বাদ দিয়া শুধু প্রাচ্যের সুনীতির আদর্শ বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, সেই আদর্শ পাশ্চাত্ত্যের আক্রমণ ও বল প্রয়োগ রীতির প্রতিকারের পথ খুলিয়া দিতেছে। কায়রো জাতি সভায় আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টাতে বিশ্বমানবের কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষার একটা আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে আশা অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ সমবেত জীবনযাত্রার আন্তরিক সঙ্কল্পের উপরেই ন্যস্ত। পৃথিবীর সকল দেশের নরনারীর কর্ত্তব্য এশিয়ার সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বশান্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, কারণ এই মহাদেশের (ভারতের) ঋষিগণই বলিয়া গিয়াছেন যে, মানবতার ভিত্তি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম—যা শান্তি, মঙ্গল ও একতার ভিতরেই দৃঢ়স্থিত।

কালিদাস নাগ ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় অক্রুর দত্ত লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

পিতার নাম মোতিলাল নাগ। তিনি বাল্যকালে শিবপুর ইংলিশ হাই স্কুলে পাঠ করেন ও পরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিশ চার্চেস কলেজ হইতে ইতিহাসে বিশেষ সম্মান আহরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করেন। পরে এম, এ, উপাধি পাইয়া তিনি ১৯১৫ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত স্কটিশ চার্চেস কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহলে মাহিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই কার্য্য এক বৎসর করিয়া তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন ও তিন বৎসর কাল ফ্রান্সে বিব্লিয়োথেক নাসিয়োনাল দ্য লা সরবোন, কলেজ দ্য ফ্রাঁস, একোল দ্যু লুভ্র এবং ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে অনুশীলন করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে তাঁহার নিবন্ধ "লো তিয়োরী দিপ্লোমাতিক দ্য ল্যাঁন্দ আঁসিয়েন এ ল্যার্ত শাস্ত্র" এর জন্য ডি, লিট, (ত্রেজ অনরাব্ল) উপাধি দান করেন। তাঁহাকে অসিরিস ফাউণ্ডেশন হইতে ২০০০ ফ্রাঁ পুরস্কারও দেওয়া হয়। কালিদাস নাগ ছাত্রাবস্থায় ইয়োরোপে অবস্থান কালে কয়েকটি বৃহৎ আলোচনায় যোগদান করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জিনিভাতে কংগ্রেস অফ এডুকেশন, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লুগানোর পিস কংগ্রেসে ও বার্লিন ও প্রাগের জার্মান ওরিয়েণ্টালিষ্ট কংগ্রেসে আলোচনায় যোগদান করেন।

এই সময়ে তিনি প্রায়ই স্ট্রাসবুর্গ, প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি সহরে শিক্ষার কারণে যাতায়াত করিতেন। কখন কখন তিনি প্যারিসে মধ্যরাত্রে আসিয়া পড়িয়া কোন স্থানে বাসের ব্যবস্থা না থাকায় কোন বন্ধুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই যেখানে যাঁহার নিকটেই যাইতেন বন্ধুগণ তাঁহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ পরিবারেরই একজন বলিয়া ধরিয়া লইতেন। তিনি কোন গৃহে আসিলে সেইখানে সকলের জীবন পূর্ণতরভাবে আনন্দময় হইয়া উঠিত। কারণ তাঁহার সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে, কথোপকথনে ও গল্পে আলাপে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মধুর কণ্ঠ কালিদাস নাগ বাক্যে ও গানে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহার কথায় কখন কোন কঠোর বা তীব্র ভাব লক্ষিত হইত না। রসবোধ তাঁহার অন্তরের নিজস্ব ধন ছিল। পরনিন্দা, শ্লেষ বা কাহারও মনে কষ্ট হইতে পারে এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি কালিদাস নাগের মুখ হইতে কখন নিসৃত হইত না। ১৯২০-২৩ খ্রীঃ অব্দে ইয়োরোপে অবস্থান কালে তিনি প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আগমনকালে বহু গুণীজনের সহিত আদান-প্রদানে নিযুক্ত হইতেন। সেই সময়ে জ্ঞান ও কৃষ্টির ক্ষেত্রের মহারথীগণ অনেকে প্যারিসে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় যুবকের ইতিহাস জ্ঞান ও ব্যবহারে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তিনি এই সময় ইংলণ্ড, সুইতজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইতালি, জার্মানি এবং স্পেনের মিউজিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয় ও চিত্রশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বেড়ান। ইহা ব্যতীত তিনি সুইডেন, নরওয়ে, মিশর, জেরুজালেম প্রভৃতি দেশের দ্রষ্টব্য সকল দেখিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনশ্যেণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি এণ্ড কালচারের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইহার পরে তাঁহার বৃহত্তর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল। তিনি বহু দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইয়া বিদ্যার আদান-প্রদানে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং সেই কার্য্যে তিনি স্থান ও কালের দূরতম প্রসার লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। মানব জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি, যথা কোন কোন রাজবংশ বা আন্তর্জ্জাতিক কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া গভীর ভাবে শুধু সেইগুলিরই আলোচনায় নিমগ্ন থাকাতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। মানব জীবনের অনন্ত প্রসার ও সেই জীবন-প্রবাহের দিকে দিকে বিস্তৃতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল ও মানব কৃষ্টি ও সভ্যতার কোন অঙ্গই তিনি অবহেলার চক্ষে দেখিতেন না। শিশুর খেলার পুতুল, বসন-ভূষণ, খাদ্য, আসবাব, গৃহসজ্জা, পট আলপনা, সঙ্গীতবাদ্য প্রভৃতি সকল কিছুরই মধ্যে

তিনি মানবতার প্রকাশ দেখিতেন ও সকল কিছুর চর্চাই তিনি মানুষের পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য প্রয়োজন মনে করিতেন। মানুষের ইতিহাস বলিতে তিনি বুঝিতেন তাহার পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন কাহিনী। তাঁহার সহিত যাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁহারা দেখিয়াছেন যে ছাত্র জীবনে তিনি মাতুল বিজয়কৃষ্ণ বসুর (আলিপুর চিড়িয়াখানার পরিচালক) গৃহে থাকিয়া যখন কলেজে পাঠ করিতেন তখন হইতেই তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা ছিল অসংখ্য। এই সময় হইতেই তিনি জ্ঞানী ও গুণী মহলে পরিচিত হইতে আরম্ভ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তিনি ভারতের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থানে গমনাগমন আরম্ভ করেন ও ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যা ও শিক্ষকতার জন্য খ্যাতি ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তাঁহাকে যে সিংহলে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র মাহিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয় তাহা তাঁহার প্যারিস গমনের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তিনি ইয়োরোপে উচ্চ শিক্ষা আহরণ করিতে করিতেই নানান স্থলে কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বক্তৃতা ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বলকান দেশগুলি, গ্রীস, ইতালি, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে দিয়াছিলেন। ইহার পরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ৩২ বৎসর কাল সেই কার্য্য করেন।

(১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপানে গমন করেন ও প্রত্যাবর্ত্তন কালে স্বয়ং মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি, চম্পা, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশে কৃষ্টি বিনিময় কার্য্যে গমন করেন। তিনি পিকিং, নানকিং, কাইফেঙ, হ্যানকাও, সাংহাই, কিয়োটো, টোকিও, বাতাভিয়া, সুরাবাইয়া, হ্যানয়, সাইগন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর কাল তিনি বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে লীগ অফ নেশনস আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায় ও ইহার পরে তিনি নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম, বোষ্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস ও হারভার্ড, ইয়েল, কলাম্বিয়া, পেনসিলভেনিয়া, চিকাগো, ইভন্‌স্টান, পিটস্‌বার্গ, মিনেসোটা, লস অ্যাঞ্জেলিস, সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে, অরিগন, মনটানা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দান করেন।)

১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি জগৎ লেখক পি. ই. এন্‌ কংগ্রেসে বুয়োনেস এয়ারস্‌এ যোগদান করেন ও পরে আরজেনটাইন, উরুগুয়ে, ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯৩৭ তাঁহাকে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সম্বন্ধে নূতন স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্রে বিশেষ বক্তা নিযুক্ত করিয়া লইয়া যায় ও তৎপরে তিনি হনলুলু একাডেমি অফ আর্টস্‌এ বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি ঐ সময় অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি সহরে কমনওয়েলথ রিলেশনস্‌ কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত থাকেন। পরে তিনি পার্থ, মেলবোর্ন, এডেলেড এবং অকল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন (নিউজিল্যাণ্ড) প্রভৃতি স্থলে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি ফিলিপাইনস ম্যানিলাতে কিছুকাল আমন্ত্রিত অধ্যাপকের কার্য্য করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার দেশে দেশে ভ্রমণ, অধ্যাপনা প্রভৃতি কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকে। এই সময়ের একটা হাস্যকর ঘটনার বিষয়ে কিছু বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো কালিদাস নাগকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দেন মহাবোধি সোসাইটিকে দিবার জন্য। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর কলিকাতার পুলিশ জাপানের পঞ্চম বাহিনীর সন্ধানে ঘুরিয়া অবশেষে তোজোর নিকট টাকা পাওয়ার জন্য কালিদাস নাগকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েকদিন কারাবদ্ধ রাখেন। কালিদাস নাগ কারাবাসকে একটা নূতন অভিজ্ঞতা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের সুবিধা বলিয়া ব্যবহার করেন ও মুক্তিলাভের পরে

কারাগারের বহু প্রশংসা করেন। তিনি সকল বাধা ও দুঃখকে সহাস্য মুখে বরণ করিয়া লইতে সক্ষম ছিলেন। অভাব তাঁহাকে কখনও নিরাশ করিতে পারে নাই। যুদ্ধের পরে কয়েক বৎসর তিনি ভারতে বিশ্বশান্তির ও মানবতা প্রচারের জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া কার্য্য করেন। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার রাজদূতের আহ্বানে তিনি ফুল ব্রাইট কমিটিতে কার্য করেন। ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য টেহেরান, বাগদাদ, ডামাসকাস, বেরুথ, আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ও মিশরে বহুস্থলে ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করিয়া বেড়ান। ১৯৫১-৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (মিনেসোটা ইউ এস এ) অধ্যাপকের কার্য্য করেন। এই সময় তাঁহার পত্নী ও তিন কন্যা তাঁহার সহিত আমেরিকায় গিয়াছিলেন। কন্যাগণ সেখানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন ও পত্নী শান্তাদেবী কোথ ও কোথাও সাহিত্য ও সাহিত্যিক কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কালিদাস নাগ ১৯৬১-৬২ খ্রীঃ অব্দে রুশদেশে ও জাপানে বক্তৃতা দিয়া ও সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি হিরোশিমাতে গমন করিয়া আণবিক বিস্ফোরণের বিভীষিকার স্বরূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন ও তাহা দেখিয়া তাঁহার শান্তিবাদের উপর বিশ্বাস আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠে।

জগতের সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্বত্র পরস্পরের সভ্যতার প্রচার ও বিভিন্ন মতবাদের প্রতি সাধারণ ভাবে শ্রদ্ধা জাগ্রত করিবার চেষ্টা। এই কার্য্য আজীবন করিয়া গিয়াছিলেন কালিদাস নাগ। তিনি একদিকে এশিয়ার ইয়োরোপীয় প্রান্তের সভ্যতার ধারা ও অপর দিকে বৌদ্ধ, শিন্তো ও কনফুসিও সভ্যতার মধ্যে অবস্থিত ভারতের বৈদিক-জৈন-বৌদ্ধ সভ্যতার বিশেষত্ব পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজে পরিচিত ও আদৃত করাইবার জন্য ক্রমাগত প্রচার-কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। ফরাসী মনীষী সিলভ্যাঁ লেভি কালিদাস নাগ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে তিনি চীন, জাপান, ইন্দোচায়না, জাভা প্রভৃতি দেশে বক্তৃতা দিয়া বিশেষ সুযশ আহরণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ সিলভ্যাঁ লেভি নিজে পরে ঐ সকল দেশে গিয়া পাইয়াছিলেন। লেভি আরও বলেন যে কালিদাস নাগের ভারত সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান বহুদূর বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন যে কালিদাস নাগ ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে শিক্ষকের কার্য্যে অতি বিশিষ্ট। তিনি ইতিহাস ও সাধারণ ভাবে কৃষ্টির বিস্তার চর্চ্চায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে সকল মানুষই অন্তরে একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার অনুভব করিয়া থাকেন।

কালিদাস নাগ আজীবন দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিয়া নিজ আদর্শ অনুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দেশেও তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, নাগপুর, মহিশূর, অন্ধ্র, ওসমানিয়া ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন ও এশিয়াটিক সোসাইটি, মহাবোধি সোসাইটি, বিশ্বভারতী, গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি, রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অফ কালচার, ইণ্ডিয়ান একাডেমি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও অপর বহু সংঘ ও সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়নে তিনি রোম্যাঁ রোলাঁকে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছিলেন ও দেশ-বিদেশের বহু লেখক তাঁহার নিকট সাহায্য লাভ করিয়া ভারত সম্বন্ধে সত্য তথ্য প্রকাশে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় যে শূন্যতা আজ প্রকট হইয়া উঠিল তাহা কবে কি ভাবে দূর হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম

আধুনিককালের অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মতে ধর্ম ও সুনীতির মানবজীবনে কোন স্থান থাকিতে পারে না। কারণ মানবজীবন অর্থনৈতিক কারণ, প্রেরণা, উদ্দেশ্য, আবেগ, প্রয়োজন ও পরিস্থিতির উপরেই নির্ভরশীল; অপরাপর মানসিক বৃত্তি বা বাস্তব অবস্থা মানবজীবনকে স্পর্শ করিলেও গভীরভাবে করিতে পারে না। এই সকল কথার মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইতিহাস ইহার সত্যতা প্রমাণ করে না। যে সকল সময়ে ও দেশে মানবজীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নতভাবে চলিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই সেই সকল যুগে ও স্থানে ধর্ম ও সুনীতির প্রভাব এবং প্রচারও বিস্তৃতভাবে অবস্থিত ছিল। পুরাতনকালে সম্রাট অশোকের যুগে এবং মধ্যযুগে সম্রাট আকবরের রাজত্বে এইরূপভাবে ধর্ম ও সুনীতি জাতীয় জীবনে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য বহু শত দেশ, জাতি, ভাষা ও ব্যবহারিক রীতির উপর দিয়া বিস্তৃত ছিল। তাহা সত্ত্বেও সেই সাম্রাজ্যে মানবজীবন সুখের ও সুনিয়ন্ত্রণাবদ্ধ ছিল। সম্রাট অশোকের রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর আদেশ বা নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহারা যেন কোন কারণেই প্রজাদিগের উপর কোন অত্যাচার না করেন ও অন্যায় ভাবে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ না করেন। রাজকর্ম্মচারীগণকে সাবধান করা হইত যেন তাঁহারা ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ চালিত হইয়া কোন কার্য্য না করেন; যেন অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা না ভুলেন এবং আলস্য ও কার্য্যে অবহেলা করা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথাযথভাবে করিতে থাকেন। অশোকের ধর্ম্মমহামাত্যগণ সর্ব্বদা তাঁহার সাম্রাজ্যের সকল কর্ম্মচারী এমন কি রাজবংশের ব্যক্তিদিগের উপরেও দৃষ্টি রাখিতেন যাহাতে কেহ ধর্ম্মপথ হইতে সরিয়া গিয়া কোন অধর্ম্ম না করে। "পিতামাতাকে মানিয়া চলিতে হইবে। সকল জীবকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সত্য কথা বলিতে হইবে। ছাত্রদিগকে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া চলিতে হইবে। সকল আত্মীয়জনকে সম্মান দেখাইতে হইবে।" এই সকল আদেশ ব্যতীত সাধারণভাবে ধর্ম্মপথে চলা, কর্ত্তব্য করা, দুঃখী ও অভাবগ্রস্তের প্রতি মমতা প্রদর্শন, দাস ও ভৃত্যদিগের প্রতি দয়া, দান ও সহনশীলতা শিক্ষা দেওয়া হইত। পথিক ও পরিব্রাজকদিগের সুবিধার ব্যবস্থা, কূপ খনন, বিশ্রামাগার স্থাপন, বৃক্ষরোপণ ও মানুষ এবং জীবজন্তুর চিকিৎসার আয়োজন করিবার কথা বিশেষভাবে বলা হইত। আধুনিককালে সুনীতি ও ধর্ম্ম পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় মাত্র দেখা যায়। তাহাও অনেক সময় যায় না। যথেষ্ট সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া যথেচ্ছাচার করিলে তাহা মানিয়া লইতে হইবে এই কথাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে নীতি বলিয়া প্রচলিত। নীতি না হইলেও তাহা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রের নেতাগণ সেরূপ অধর্ম্ম ও অন্যায় করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, তেমনি তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে জনসাধারণকে পথ দেখাইয়া উন্নততর জীবনযাত্রা শিক্ষা না দিয়া নিজেরাই দুর্ম্মতিগ্রস্ত লোকেদের অনুসরণ করিয়া চলেন। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, ধৈর্য্যহীনতা, আলস্য, অন্যায় ও অধর্ম্ম রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে প্রবল। সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রাজকর-লব্ধ অর্থে পোষণ করা হয় যাহারা বস্তুত কোন জাতি ও দেশের পক্ষে লাভ বা মঙ্গলজনক কার্য্য করেন না। ইঁহাদিগের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দফ্তর, বাসস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হয় এবং তাহার উপর শত শত মন্ত্রণাগৃহ ইত্যাদিও সাধারণের কষ্ট উপার্জ্জিত অর্থে গঠন করা হয়। ভারত অপেক্ষা বহুগুণ ঐশ্বর্য্য যে সকল দেশে আছে সেই সকল দেশেও কোথাও রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য এত সুখ সুবিধার ব্যবস্থা দেখা যায় না। বস্তুত ভারতবর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে শুধু রাজকর্ম্মচারী, রাষ্ট্রনেতা ও তাহাদিগের অনুচরবর্গের ভোগের ও স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্র। জনসাধারণ এই দেশে শুধু স্বৈরাচারীদিগের সুখ-সুবিধার খোরাক সংগ্রহ করিয়া খাটিয়া মরে। সাধারণের মধ্যে যাহারা অধর্ম্মের পথে থাকিয়া অধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের চাটুকারিতা ও সহায়তা করে তাহারাও এই দেশে সানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিতে সক্ষম হয়। সত্য বা ধর্ম্ম এদেশে জাগ্রত ও জয়যুক্ত এখনও হয় নাই। হইবে কি না তাহাও বলা যায় না। কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতিবাদকারীগণও মনে হয় ঐ একই পথের পথিক। রাষ্ট্রীয় দলগুলিও সত্য ও ধর্ম্মের আশ্রয়স্থল নহে।

গো-হত্যা বনাম নরহত্যা

কিছুদিন পূর্ব্বে গো-ভক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভারতে গো-হত্যা নিবারণের জন্ত হঠাৎ একটা প্রবল বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। ভারতের অধিকাংশ লোক হিন্দু হইলেও তাহাদিগের মধ্যে গোভক্তি সমানভাবে বর্ত্তমান নাই। অনেক হিন্দুই অন্তলোকে গো-বধ করে কি না তাহা লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন না এবং গো-রক্ষার আগ্রহ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকটভাবে জাগ্রত আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে যাঁহারা গো-হত্যা নিবারণের জন্ত নরহত্যা করিতেও পশ্চাদপদ হন নাই, তাঁহারা ইংরেজ শাসনের সময় গোমাংসাহারী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। অনেকে ইংরেজের অধীনে কার্য্য পাইলে সানন্দে তাহা গ্রহণও করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গোবধ শুধু এক ভাবেই হয় না। গো-বৎসগুলিকে খাইতে না দিয়া মারিয়া ফেলা হিন্দু গোয়ালাদিগের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়; কিন্তু গো-রক্ষাকারীগণ ঐ গোয়ালাদিগকে শাসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা কখন শুনি নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে কোন কোন লোক গো-চর্ম্মের ব্যবসা করেন। তাঁহারাও অনেক সময় গো-বধের কারণ হইয়া থাকেন। ইঁহারা গো-ভক্ত হিন্দুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন এরূপ সংবাদ আমরা কখনও শুনি নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা পূর্ব্বে ইংরেজ রাজত্বকালে গো-বধ দেখিয়াও চক্ষু বুজিয়া থাকিতেন ও এখনও নানাভাবে গরুর প্রাণহানী হইতেছে দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাঁহারাই গো-বধ নিবারণের উদ্দেশ্যে হাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অবস্থায় এই সকল ব্যক্তির কার্য্যের সমর্থন করা কাহারও পক্ষে সহজ নহে। সম্রাট অশোক জীব হিংসা করা মহাপাপ মনে করিতেন। কিন্তু তিনিও তাঁহার রাজশক্তি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিয়া জীবমাংস ভক্ষণ নিবারণ চেষ্টা করেন নাই। বস্তুত ভারতে বহু জাতি রহিয়াছে যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে। তাহাদিগকে যদি শান্তির পন্থা অনুসরণ করিয়া ঐ অভ্যাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা হইলে হয়ত ভবিষ্যতে গো-ভক্তদিগের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে গোভক্তদিগকে নিজেদের গোভক্তি প্রমাণ করিতে হইবে গো-সেবা ও গো-জাতির উন্নতি সাধন করিয়া। যাঁহারা গৃহে গো-সেবা ত করেনই না বরং গরুগুলিকে মহাকষ্ট দিয়া কোন প্রকারে জীবন্ত রাখেন তাঁহাদিগের গো-ভক্তির কোনই মূল্য নাই। তাঁহাদিগের মধ্যেই আবার কেহ কেহ গো-বৎসগুলিকে খাইতে না দিয়া মারিয়া ফেলেন। মানুষের প্রতি অগাধ প্রীতি যাঁহাদিগের ও যাঁহারা নরহত্যা মহাপাপ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই আবার এই দেশে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল দিয়া মানুষের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকেন। তাঁহারা মানুষকে না খাইয়া মরিবার পথ খুলিয়া দিয়া থাকেন খাদ্যমূল্য বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া, নিজের লাভের জন্ত অপরের শ্রমমূল্য পুরাপুরি না দিয়াও অন্ত নানাভাবে। সাক্ষাৎভাবে মানুষের গলায় ছুরির আঘাত না করিয়া নরঘাতক হওয়া যেরূপ সহজ ও সম্ভব; গোবধও সেইরূপ পরোক্ষভাবে করা যাইতে পারে ও যায়। সুতরাং গো-হত্যা নিবারণের পূর্ব্বে দেখা প্রয়োজন যে, যাঁহারা তাহা চাহিতেছেন তাঁহাদিগের গোভক্তি কতটা সত্য ও সকল কর্ম্মের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা কতটা গোজাতির সত্যকার বন্ধু। মানুষের অন্তরের কথা না জানিয়া তাহার আস্ফালন ও হুঙ্কার দিয়া তাহার সত্য মনোভাব বিচার করা যাইতে পারে না।

অভাব ও বিক্ষোভ

সকল বিক্ষোভের মূলে থাকে অভাব। সাক্ষাৎভাবে অভাব জানাইয়া মানুষ আন্দোলন আরম্ভ না করিতেও পারে, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিলে সবসময়েই দেখা যায় যে, কোন-না-কোন প্রকার অভাব থাকাতে মানবমন চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে ও ফলে যে কোন একটা সাক্ষাৎ উপলক্ষ্য পাইলেই মানুষ ভিতরের অপ্রকাশিত চাঞ্চল্য কার্য্যে দেখাইতে আরম্ভ করে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, ছাত্র-আন্দোলনের চিকিৎসা উচ্চ স্তরের রাষ্ট্রনেতাদিগের বক্তৃতা দ্বারা হইতে পারে না। ছাত্রগণ শ্রীমতী ইন্দিরার উপর কোন ক্রোধ বা বিরাগ পোষণ করে না। সুতরাং ছাত্রদিগকে

যদি তিনি উপদেশ দিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে সে উপদেশ বিষয়-বহির্ভূত হইয়া বাড়াবাড়ি আতিশয্য ও তাহার ফলে ছাত্র-আন্দোলন থামিতে পারে না। অপরাপর রাষ্ট্রীয় দলের পাণ্ডাদিগের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রয়োগ করা যায়। কারণ ছাত্রজীবনের সহিত এই সকল মহা মহা রথীদিগের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ছাত্রগণ কৃষ্টি, শক্তি, আনন্দ, অসাধ্যসাধন, প্রতিভা, প্রেরণা প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হয় ও সেই আকর্ষণে নিজ নিজ চির-অনুসৃত পথ ছাড়িয়া অপর পথে চলিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে সেই কৃষ্টি, শক্তি, আনন্দ, প্রতিভা ও প্রেরণার উৎস নাই বা থাকিলেও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের বাণী যুবজনকে আর মুগ্ধ করে না, তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ ও চরিত্র কাহাকেও আকর্ষণ করে না। তাঁহারা দেশবাসীর জীবনের অঙ্গে অঙ্গে নিজেদের অসংযত ও অশোভন আচরণের বিষ ঢালিয়া দিয়া সকলের প্রাণেই নিদারুণ জ্বালা ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হইবে শিক্ষা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অবসানের ব্যবস্থা করিয়া দেশের সুশিক্ষিত লোকেদের হস্তে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ কার্য্য ফিরাইয়া দেওয়া। পাঠ্য পুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও বিক্রয়, শিক্ষক ও পরীক্ষক মনোনয়ন, তাঁহাদিগের বেতন প্রভৃতি নির্দ্ধারণ, কোন্ বিষয় শিক্ষা কি ভাবে কতটা দেওয়া হইবে প্রভৃতি সকল কার্য্য বিদ্বান ও কর্ম্মীলোকের স্বাধীন চিন্তার দ্বারা চালিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ, মধ্যম কিংবা প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলি রাষ্ট্রের আমলা ও তাঁবেদারদিগের দ্বারা চালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। শিক্ষা রাষ্ট্রীয় পথ ছাড়িয়া নিজ পথে চলিতে পারিলে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদিগের রাষ্ট্রীয় ধরনের রোগ আর হইবে না। মিছিল বাহির করিয়া চীৎকার করা, ধর্ণা দেওয়া, হরতাল ও ইষ্টক নিক্ষেপ, বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় দলের কর্ম্মপদ্ধতির সহিত একান্তভাবে জড়িত। শিক্ষাকেন্দ্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও রাষ্ট্রনেতাদিগের আবির্ভাব মঙ্গলকর নহে। যদিও আমাদিগের রাষ্ট্রীয় দলগুলি আত্মম্ভরিতা দোষে জর্জ্জরিত ও নেতাগণের সকলেই অহং সর্ব্বস্ব ও "সবজান্তা", তথাপি জনসাধারণের মতে তাঁহাদের মধ্যে অধিক লোকেরই কোন এরূপ গুণ বা কর্ম্মক্ষমতা নাই যাহাতে দেশের কোন কার্য্যই তাঁহারা সক্ষমভাবে করিতে পারেন। এই অবস্থায় দেশের তরুণ ও যুবজনের শিক্ষার ভার তাঁহাদিগের হস্ত হইতে যত শীঘ্র সরাইয়া লওয়া যায় ততই দেশের মঙ্গল।

অভাব ও বিক্ষোভসংযুক্ত সমস্যা এ কথার প্রমাণ প্রয়োজন হয় না। আজকালকার যত বিক্ষোভ শিক্ষার অথবা অপরাপর ক্ষেত্রে তাহার মূলে রহিয়াছে অভাব ও সেই অভাব দূর করিবার অক্ষমতা। সাধারণ যানবাহনের কিংবা মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা, তাহাও এ দেশে ঠিকমত হয় না। খাদ্য সরবরাহ, ঔষধ বা চিকিৎসার আয়োজন, বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা, উচিত ভাড়ায় বাসস্থান পাওয়া, উচিত মূল্যে কোন কিছুই ভেজাল-বর্জ্জিতভাবে সংগ্রহ করা, এ দেশে কিছুই নাই বা হওয়া সম্ভব নহে। কারণ হইল অনুপযুক্ত হস্তে ক্ষমতা দান। কে দিয়াছে? রাষ্ট্রীয় দলের স্বেচ্ছাচারী নেতাগণ। রাষ্ট্রীয় দলগুলি আজ দেশের সকল উন্নতির পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কারণ আদর্শ সেই দলগুলির যাহাই হউক না কেন, সেগুলি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদিগের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রেই চালিত হইয়া চলিতেছে। এই চক্রান্তকারিতায় কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট বা অপর যে কোন দল পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতেছে। উদ্দেশ্য দেশ শাসনের ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া যথেচ্ছাচার। এই যে সর্ব্ব প্রসারিত মহামারির মত এক মানসিক ব্যাধি, ইহার প্রশমন কি করিয়া হইবে? সর্ব্বসাধারণ যদি সজাগ হইয়া সকল রাষ্ট্রীয়দলের চক্রান্তপ্রিয়তার প্রতিবিধান না করেন তাহা হইলে এই কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। (২৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মরমী কথাশিল্পী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

"যখন গল্প লিখলুম, লোকে বললে, এসব আমার নিজের কথা। আর যখন আত্মজীবনী লিখলুম, সবাই বললে—গল্প লিখেছি।" সাহিত্য-শিল্পী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বলতেন, ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে। নিজের সাহিত্য-কর্মের বিচারে পাঠকদের বিবেচনা শক্তিকে যেন বিশ্লেষণ করতেন—পাঠকবর্গের এ কেমন সিদ্ধান্ত? গল্পের কল্পনাকে তাঁরা লেখকের নিজের কথা অর্থাৎ বাস্তব এবং জীবনস্মৃতিকে অলীক কাহিনী সাব্যস্ত করেছেন!

আতর্থী মহাশয়ের রচিত সাহিত্য পাঠ করে অনেকে কল্পনাকে বাস্তব এবং বাস্তবকে কল্পনা মনে করায় তিনি যেন কিছু হতাশা বোধ করেন। তাঁর হয়ত ধারণা হয়েছিল, তাঁর সাহিত্যের আবেদন সেই পাঠকদের মনে যথোচিত সাড়া জাগাতে পারে নি। তাই সে নিবিড় দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবন লীলা, বাস্তবের নানা অঘটন-ঘটন লোকের কাছে অ-যথার্থ বোধ হয়েছে এবং কল্পিত মানস বিলাসের কলা-কৌশল প্রতিভাত হয়েছে সত্যের রূপে।

লেখক হয়ত চিন্তা করে দেখেন নি, তাঁর সাহিত্য-শিল্প সার্থক হওয়ার জন্যেই পাঠকদের এই চিত্ত বিভ্রম ঘটে। পাঠকের মন এমন করে হরণ করে যে সাহিত্য তা শিল্পকর্ম-রূপে অনিন্দ্য সাফল্যেরই নিদর্শন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সাহিত্য-কৃতি এই শ্রেণীর। তাঁর রচনায় অলীক ও সত্য, ভাব ও বস্তু অঙ্গাঙ্গী মিশে গিয়ে, ঘটনা ও মানস একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে পাঠকের চিত্তে এক গভীর অনুভব সৃষ্টি করে। আন্তরিক হৃদয়াবেগে উদ্বেল তাঁর সাহিত্য দেখা দেয় পরম উপভোগের বস্তু হয়ে। পাঠকের মন এক অপরূপ আনন্দ বেদনার রসে আপ্লুত হয়। দরদী লেখকের অসামান্য বর্ণনা-শক্তির গুণে বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে সত্য ও মিথ্যা কতখানি আছে, এ প্রশ্ন তখন অবান্তর। জীবনের সত্য সাহিত্যের সত্য হয়ে কখন পাঠকের চেতনায় একাকারে মিশে যায়।

এমন জীবন্ত, এমন আন্তরিকতাময় রস সমুজ্জ্বল আতর্থী মহাশয়ের সাহিত্য রচনা। মানুষের রূপলোক ও অন্তরলোকের এমন শিল্প-সুন্দর উদ্‌ঘাটন, এমন সজীব নিসর্গ, চিত্র এমন মর্মস্পর্শী প্রকাশরীতি ও বর্ণনাশৈলী যাঁর তিনি যে পাঠকদের মন অধিকার করবেন, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! মরমী কথাশিল্পী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন জাত সাহিত্যিক। প্রাণের প্রতপ্ত আবেগ, যথার্থ শিল্পী মানস এবং বিপুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জীবনকে তিনি সাহিত্যায়নের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

তিনি বলতেন, "Feel করলেই লেখা যায়।" এটি তাঁর বিনয়ের কথা। অর্থাৎ তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই যেন লিখতে সক্ষম হন। লেখা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

কথাটি কিন্তু সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। অনুভব তো মানুষ মাত্রেই করে থাকে। কিন্তু তা প্রকাশ ক্ষমতা আছে ক'জনের? শিল্প ভিন্ন তা সম্ভব নয়। আর যেমন-তেমন প্রকাশ হলেও চলে না। শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে সেই ভাব সঞ্চারিত করা চাই অপরের মনে। তিনি নিজেও একথা অন্যরকমভাবে একবার লিখেছিলেন: "মানুষ মাত্রেই, সে নারী হোক বা পুরুষই হোক, ভালবাসার শক্তি তার সহজাত; কিন্তু ভালবাসা প্রকাশ করবার শক্তি যে দেব-দুর্লভ। ঠিক রসিক ও কবিতে যে পার্থক্য।" (মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭)।

তিনি ছিলেন সেই দুর্লভ শক্তির অধিকারী স্বভাব শিল্পী। তাই তাঁর মর্মোৎসারিত রচনা পাঠকের প্রাণে প্রত্যক্ষ সাড়া জাগায়। তাঁর সৃষ্ট সব চরিত্র যেন জীবন থেকে উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। লিপি-নৈপুণ্যে তাদের চোখের সামনে দেখা যায়, এমন সজীব। পাঠকদের ধারণা হয় যে গল্পের পাত্র-পাত্রীরা বাস্তব জগতেরই মানুষ, বর্ণিত কাহিনী একদিন সত্যই ঘটেছিল।

আর একটি কারণে তাঁর গল্পগুলি 'তাঁর 'নিজের কথা' অর্থাৎ সত্য মনে হয় অনেক পাঠকের। তা হ'ল—তাঁর উৎকৃষ্ট অনেকগল্পের মূল চরিত্র ও আখ্যান বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া। দৃষ্ট ও শ্রুত জগৎকেই তিনি আপন অনুভবের রঙে রঞ্জিত করে তাঁর সাহিত্যের উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করেছেন রীতিমত দক্ষতার সঙ্গে।

এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যায়। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "মোতিলাল", বাস্তবের ভিত্তিতে রচিত। বাস্তব জগতের মোতিলাল প্রেমাঙ্কুরের সুপরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্র সমগ্রভাবে গল্পটির আকারে প্রকট হয় নি। গল্পের প্রয়োজনে শিল্পী প্রেমাঙ্কুর তাঁর জীবন-কাহিনী সুসমঞ্জসভাবে পরিবর্তিত ও অনুরঞ্জিত করে দেন। তাঁর আর একটি উল্লেখ্য গল্প 'বড়দা' সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। "পাগলিনী"র আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ সত্য। উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীট অঞ্চলে একসময়ে এই ভিখারিণীকে সকলে জানত। পাগলিনীর সঙ্গে কয়েকদিন কথা বলেন প্রেমাঙ্কুর। এই গল্পে তাঁর নিজস্ব সংযোজন হ'ল, শেষাংশের শ্যাম (কৃষ্ণ) সম্পর্কে বিবৃতিটি। তাঁর দেখা পাগলিনীর জীবনে এই মহৎ উপসংহার ছিল না। এই অংশটুকু যুক্ত করে দিয়ে গল্পটিতে তিনি যে অভাবনীয় উচ্চাঙ্গের ব্যঞ্জনা দেন, তা তাঁর শিল্পকর্ম শিল্পী মানসের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। "শেফালী" গল্পের মূলেও সত্য আছে, তবে পরিবেশ রচনার জন্যে অনুকূল কাল্পনিক আবহ সৃষ্টি করেন। পশ্চিমাঞ্চলের সেই কুষ্ঠ রোগীর ছোট গল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তব উপকরণ নিয়ে হুবহু লেখা। "হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট" গল্পে যে ওস্তাদজীর বর্ণনা আছে তা সাক্ষাৎ ভাবে বিখ্যাত সরদী করামৎ উল্লার চরিত্র অবলম্বনে গঠিত। ওস্তাদ করামৎ উল্লার কথা প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গীত-শিক্ষা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে। এই গল্পে করামৎ উল্লার চরিত্র, ধ্যান-ধারণা ও কথাবার্তার ধরন-ধারণ সঠিকভাবে বর্ণনা করে লেখক দেখিয়েছেন যে, হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্যে pact যতই হোক, মুসলমানের ধর্মান্ধতা ও ধর্মাহঙ্কারের জন্যে আসল fact অন্যরকম। ১৯২৬ সালের কলকাতায় দাঙ্গার অব্যবহিত পরে তিনি এই গল্পটি লেখেন। তাঁর 'তখ্‌ত্‌-এ-তাউস্' শিশিরকুমার ভাদুড়ির পরিচালনায় ও প্রধান ভূমিকায় শ্রীরঙ্গম্ মঞ্চে অভিনীত হবার পরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকথা নিয়ে লেখা একটি হালকা সরস রচনা হ'ল তাঁর "নাট্যকার" নামে গল্পটি।

এমনিভাবে দেখা যায়, তাঁর বেশির ভাগ গল্পে তিনি সম্পূর্ণ বাস্তব উপাদানে তাঁর গল্পগুলি গঠন করেছেন। এ বিষয়ে অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নেই। নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে যেমন বেশি যান নি, তেমনি কল্পনার আশ্রয়ও বিশেষ নেন নি সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে। তাঁর অনেক সার্থক গল্প এই পর্যায়ের।

অবশ্য কিছু গল্প তাঁর আছে যা নিজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়। কিন্তু সেখানেও কল্পিত কাহিনী তেমন স্থান পায় নি। এসব ক্ষেত্রে তিনি অন্যের জানাশোনা বাস্তব ঘটনা বা বিবৃতি নিয়ে কাজ করেছেন গল্পের উপকরণ হিসাবে। তাই থেকে আখ্যানভাগ পুনর্গঠিত করেছেন। তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি "দুই রাত্রি" এই শ্রেণীর রচনা। এই মর্মস্পর্শী কাহিনীকে ছোট উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলাই সমীচীন। এমন আন্তরিকতার রসে "দুই রাত্রি" গল্পটি নিষিক্ত, বর্ণনাশক্তির গুণে এর মূল চরিত্র দু'টি, বিশেষ নায়িকার, এমন জীবন্ত এবং ঘটনা-বৈচিত্র্য, এমন আকর্ষক যে পাঠকের স্বভাবতই মনে হবে যে, এ গল্প লেখকের 'নিজের কথা'। অন্ততঃ তাঁর স্বচক্ষে দেখা। কিন্তু তা নয়। এর মূল আখ্যান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনার বিবরণ মাত্র। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ খবরের কাগজের এই অংশটি প্রেমাঙ্কুরকে গল্প রচনার জন্যে দিয়েছিলেন। জামাতা, সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ প্রেমাঙ্কুরকে বিশেষ স্নেহ করতেন অবনীন্দ্রনাথ। যা হোক, সংবাদপত্রের সেই সামান্য বিবৃতিটুকুকে তিনি এক অসামান্য সাহিত্যশিল্পে পরিণত করেন গল্পের ভূমিকা, পরিবেশ, বিস্তারিত আখ্যান এবং নায়ক চরিত্র পরিকল্পনা করে। এই নায়ক মূল গল্পে ছিল না। তাকে গল্পের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সুদক্ষভাবে যুক্ত করে দিয়ে যে ভাবে গল্পটিকে পরিণতির পথে নিয়ে গেছেন তা তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দ্যোতক। এই গল্পের অনেক স্থানে এমন প্রগাঢ় জীবন বোধের প্রকাশ ঘটেছে যে পাঠকদের অভিভূত হতে হয়। যথা,—"জীবনযাত্রা শুরু করবার আগে রাণী খুব চড়া পর্দায় সুর বেঁধেছিল। কিন্তু সংসার তাকে বুঝিয়ে দিলে, যে পর্দায় যে সুর বেঁধেছিল সে পর্দায় সুর বাঁধাই চলে, বাজানো চলে না। জীবন-যন্ত্রের

সমস্ত তারগুলি আলগা করে দিয়ে আবার সে নতুন পর্দায় সুর বাঁধলে।”

তাঁর “বৌঠান” গল্পের আখ্যান বস্তুও “দুই রাত্রি”র মতন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনা। এটিও অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে খবরের কাগজের অংশ থেকে দেন।

তাঁর আর একটি গল্প আছে, তার বর্ণিত ঘটনাস্থল হল পশ্চিমের এক দেহাতী অঞ্চল। ‘আমি’র জীবনীতে বিবৃত এই গল্পে সেখানকার এক নারীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ভ্রমে নির্যাতিত হবার কৌতুক করুণ বর্ণনা এমন নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে যে মনে হয় তা স্বয়ং লেখকের এক প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা। আসলে এটি সেসিল বি. ডি. মিলের একটি বইয়ের এক অংশের পরিবর্তিত রূপ।

এমনিভাবে তাঁর হৃদয়গ্রাহী রচনাশক্তির গুণে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে পাঠকের মনশ্চক্ষুতে দেখা দেয়, তা সে কাহিনী তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা কিংবা অন্যের কাছে পাওয়া গল্প যাই হোক। এমন বেশ কয়েকটি ছোট গল্প তাঁর আছে যা ভুলে যাবার নয়।

তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির একটি গূঢ় কথা এই যে, মানুষকে তিনি অন্তঃস্থল পর্যন্ত গভীর ভাবে দেখেছেন এবং তাকে রূপে উদ্‌ঘাটিত করেছেন যথার্থ শিল্পীর হাতে। তাঁর অতি-শয় সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর মনে বিশেষ ধরণের (টাইপ) লোক আকর্ষণ জাগাত বেশী এবং মানুষটিকে তিনি ছাঁকা তুলে নিতেন মনের পটে। সেই বিশিষ্ট মানুষটিকে, তার সংসার বা পরিবার এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে নয়। তার-পর নিজের অন্তরের গাঢ় হৃদয়ানুভূতিতে তাকে সঞ্জীবিত করে প্রকাশ করতেন। বাস্তব চরিত্র বা ঘটনা বা কাহিনী সংগ্রহ করবার সঙ্গে তিনি তাদের স্বাভাবিক পটভূমিও যথাসম্ভব উপস্থাপিত করেন রচনায়, গল্পের প্রয়োজনে ঘটনা সংস্থানের অদল বদল করে নিয়ে।

তাঁর সাহিত্য রচনার মূল অনুসন্ধানের প্রশ্নে বর্তমান লেখককে তিনি ওই ভাবে নিজের সাহিত্য মানসের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাঁর লেখার এক প্রধান আকর্ষণ হল বর্ণনাশক্তির সৌকর্য। তাঁর বর্ণনা একাধারে ত্রুটিহীন বাস্তব এবং কবিত্বময়। চিত্রধর্মী এবং অতি মনোগ্রাহী তাঁর বর্ণনার গুণে জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রত্যেক বিষয়। বহিরঙ্গ জীবনযাত্রার নানা প্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ করে প্রাণের গোপন কথা। মানুষের নন্দন-কান্তি কিংবা চির বৈচিত্র্যময় নিসর্গ চিত্র। রস-রসিকতা কিংবা মর্মন্তুদ বেদনা। অন্তস্থলের সূক্ষ্মতম অনুভূতি কিংবা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রামের বৃত্তান্ত। স্মৃতির বিভিন্ন রহস্য স্বাদ কিংবা বর্তমানের চেতনা অনুভবের সচকিত উদ্‌ঘাটন। ভোগ-বিলাস ও দেহাত্মবাদ কিংবা অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ইত্যাদির চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাঁর বর্ণচ্ছটাময় বর্ণনায়।

ভাষা এবং প্রকাশশৈলী দুই-ই তাঁর নিজস্ব সম্পদ, তা কারুর অনুকৃতি নয়। আত্ম-বিকিরণের আকৃতিতে স্বভাব-সুন্দর ভাষণ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত, মার্জিত ও কথ্য রূপের অপরূপ সম্মিলনে ঐশ্বর্যময় তাঁর ভাষা। সেই সঙ্গে বিচিত্র জীবন-রসের জন্যে তাঁর সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র আস্বাদ। এবং পাঠকের মনে তা অনুরূপ অনুরণন জাগায়। তাঁর রচনার কিছু কিছু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল:

“আকাশ থেকে একটা পৃথিবী-জোড়া অন্ধকার নীচের দিকে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ মাঝ পথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমার বহুদিন-বিস্মৃত ছেলেবেলার কথাগুলো একে একে মনে পড়তে লাগল।” (বাজীকর)

“জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখতে পেলুম, দূরে স্মৃতি সাগরের ওপারে আমার অতীত জীবনটা এই সুখদুঃখ-মাখা সংসারের মধ্যে ফিরে আসবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উপরে চেয়ে দেখলুম, সন্ধ্যাকুমারী অস্তরবির সোনালী পাড়-ওয়ালা নীলাম্বরী পরে পৃথিবীর সামনে এসে মোহন বেশে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মাঝখানে আমার এই জীবনটা নিষ্ফলে কেটে গেছে।” (ঐ গল্প)

“সামনে চেয়ে দেখলুম, দিনান্তের নিভন্ত চিতার শেষ রশ্মিটি তখনও কুতবমিনারের চূড়ার ওপর ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে। পূর্বদিক থেকে একটা বিরাট অন্ধকার পাখা মেলে সেই আলোটুকুকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে।” (ঐ)

“মাথার ওপর ত চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু মনের ওপর যেই চাদর মুড়ে দেবার চেষ্টা করি, অমনি সেই নূপুরের আওয়াজ যেন চাদরের একটা খুঁট তুলে ধরে বলতে থাকে—কোথায়? দেখি দেখি এত লজ্জা কিসের?” (নিশির ডাক)।

"বাঁশীর সুর গুম্‌রে গুম্‌রে আমার রুদ্ধ দুয়ারে এসে আঘাত করতে লাগল। সে কি করুণ অনুনয়—যাসনে! ওরে যাসনে! আমাকে ফেলে যাসনে ?" (চাষীর মেয়ে)।

"দারিদ্র্য কাকে বলে এতদিন তা আমার জানা ছিল না, কুকুরের মত সে আমার শ্বশুরের সংসারের পেছনে ঘুরতে থাকত···।" (ঐ)

"পরের দিনের সকালটা যেন দিনের বুকে অসাড় হয়ে পড়ে রইল, কিছুতেই আর সে যেতে চায় না।" (ঐ)

"সুখের আনাচে-কানাচে দুঃখ ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবনের পায়ে পায়ে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায় এ আমরা দেখেও দেখিনা।" (ঐ)

"সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা দৈন্যের লজ্জা ঢেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।" (ঐ)

"মানুষের হৃদয় বিচিত্র উপাদানে তৈরি। অপরে তো দূরের কথা, মানুষ নিজের হৃদয়কেই চিনতে পারে না। মানুষ সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে বাঁচে মরে কিন্তু তার নিজের মধ্যে যে রহস্যময় জগৎ রয়েছে, তার কোন্ কোঠায় কি সঞ্চিত আছে তা সে জানেও না।" (ঐ)

"জন্মভূমি! যেখানে আমার জীবন-পদ্মের সমস্ত মধু নিংড়ে রেখে চলে গিয়েছিলুম, সেই জন্মভূমি! পুরুষের কাছে জন্মভূমি কি তা জানি না, কিন্তু নারীর কাছে জন্মভূমি যেন সোনার স্মৃতি মন্দির।" (ঐ)

"কে যেন স্মৃতি-সাগর থেকে এক অঞ্জলা জল তুলে নিয়ে আমার চোখে ঝাপটা মারলে। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল।" (ঐ)

"দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন জন্মেছিলেন বটে এ যুগে, কিন্তু তাঁর মনটা বাঁধা ছিল সে যুগের খোঁটায়। আধুনিক আবহাওয়ার ঝড়-ঝাপ্‌টা যতবার তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, ততবারই তিনি দ্বিগুণ বেগে সে যুগের খোঁটার মূলে ফিরে এসেছেন!" (কল্পনা দেবী)

"কিন্তু বিয়ে জিনিষটা তো আর ভালবাসার টিকে নয়।" (ঐ)

"বয়সে সে বৃদ্ধা কিন্তু যৌবন যে তার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে, এ বয়সেও তার চিহ্ন বর্তমান।" (ঐ)

"আকাশে তখনো মেঘের ছুটোছুটি থামে নি। সেদিন প্রতিপদের চাঁদখানা মেঘের ওড়নায় মুখ ঢেকে কার অভিসারে ছুটে চলেছিল, কিন্তু চঞ্চল বাতাস বার বার তার মুখের বসন খসিয়ে দিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। নীচে নদীর জল ছায়ানটের গম্ভীর করুণ তানে ঘাটের ওপর বার বার আছড়ে কি কথা জানাচ্ছিল, কে জানে।" (অচল পথের যাত্রী)

"উমার চোখ দুটো ছিল আশ্চর্য উপাদানে তৈরি। আমার মনে হত সে দুটো যেন সর্বদা জ্বলছে। সেই আগুনের পশ্চাতে যে অশ্রুসাগর লুকানো আছে, ঘুণাক্ষরে সেকথা জানতে পারা যেত না।" (ঐ)

"সমুদ্রতীর। আমার সামনে দিগন্তবিহীন নীল জল থৈ থৈ করছে। সমুদ্রে একটুও ঢেউ নেই। মধ্যে মধ্যে আমারই বুকের দীর্ঘশ্বাসের মত সমুদ্রের বুকখানা একটু ফুলে উঠছে মাত্র। তারপর দিগন্তব্যাপী একটা শব্দ—হা হা হা।" (ঐ)

"শীত কেটে গেল। নিশান্তে সুন্দরীর জাগরণের মত প্রকৃতি সবেমাত্র তার চোখ খুলেছে, চোখের জড়তা ও আলস্য তখনো কাটেনি। ধরণীর এই যৌবন-সৌন্দর্য দেখবার জন্য আকাশ তার চোখ থেকে কুয়াশা মুছে ফেলছে। এইরকম একটা সময়ে একদিন দুপুরবেলা চির-রহস্যময় চির-মৌন হিমালয়ের প্রতিচ্ছবি আকাশে ফুটে উঠল। আমি ভাবলুম, এবার আমার যাবার সময় হয়েছে।" (ঐ)

"যে চোখ শরৎ প্রভাতের সৌরকরোজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মতন ঝলমল করত, সে চোখ যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, যেন ঊর্মিমুখর সাগর একটা প্রাকৃত বিপ্লবে শান্ত হয়ে গিয়েছে।" (মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড)

"আমার মূর্ছিত অতীত চমকে উঠে বিস্মিত বর্তমানের দিকে চেয়ে রইল।" (ঐ)

এই ধরনের নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে তাঁর রচনা দীপ্তিময় হয়ে আছে। আরো উদ্ধৃত করবার অবকাশ থাকলে দেখান যেত, জীবন-সত্যের কত দুর্লভ, চকিত প্রকাশে তাঁর নানা গল্প, উপন্যাস ও আত্মজীবনী সমৃদ্ধ।

তাঁর আত্মস্মৃতি কথন "মহাস্থবির জাতক" তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম। তিন খণ্ডের এই জাতক গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যে তাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর এই

পরিণত বয়সের এবং শেষ সৃষ্টিকে শ্রীমণ্ডিত করেছে তাঁর রচনার সমস্ত মনোহারী বৈশিষ্ট্য। আত্মজীবনীর উপকরণে গঠিত তাঁর জাতক বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের সগোত্র হয়েও প্রেমাঙ্কুরের মহাস্থবির জাতক আপন বিশিষ্ট ঐশ্বর্যে ভাস্বর।

বিংশ শতকের এই জাতকের ঘটনাবলী- রচয়িতার নিজের উক্তি অনুসারে—'শতকরা ৯০ ভাগ সত্যি।' অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রের উক্ত সৃষ্টিতে বাস্তব ও কল্পনার অনুপাত প্রায় বিপরীত হতে পারে। কিন্তু দুই গ্রন্থের মধ্যে বিষয় ও গুণগত সাদৃশ্য হ'ল—অনন্য, বিচিত্র চরিত্রাবলী ও নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরায় বিধৃত সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসা এবং স্বকীয় শিল্প দৃষ্টির আলোকপাতে প্রাণ রহস্যের উদ্ভাসন।

এই দু'টি গ্রন্থের জীবনবোধের কোন তুলনাত্মক আলোচনা এখানে লক্ষ্য নয়, তাদের সাজাত্য উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য।

মহাস্থবির জাতকের লেখক অল্প বয়স থেকেই বিদ্যালয়ের বাইরে জীবনের বৃহত্তর পাঠশালায় যে পাঠ সাক্ষাৎভাবে পেয়েছিলেন, তাঁর আপন বিশিষ্ট সত্তা অন্তরের প্রেরণায় যেমন বিকাশ লাভ করেছিল, যে অন্তর্দৃষ্টিতে জীবন, জগৎ ও মানুষকে তন্নিষ্ঠ হয়ে দেখেছিলেন, জীবনে পথে পথে যে অমৃতের সন্ধান করে বেড়িয়েছিলেন আকুল আবেগে—জাতকের ছত্রে ছত্রে সেই পিয়াসী মনের, সেই ভূয়োদর্শনের, সেই স্বেচ্ছা-যাযাবরের বৃত্তান্ত দীপ্যমান হয়ে আছে। লেখকের মহৎ আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মপ্রকাশের এক সুকর স্বাক্ষর মহাস্থবির জাতক :

"আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধির অগোচরে যে আরো একটা রহস্য লোক আছে, সেখানকার ইঙ্গিত এই প্রথম এল আমার জীবনে। তারপর সারা জীবন ধরে আভাসে-ইঙ্গিতে সেখানকার কত বার্তাই আমার কাছে এসে পৌছল, কিন্তু সে লোকে প্রবেশ করবার হদিস আজও পেলুম না। জীবনের এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যেই এই জাতকের অবতারণা, এই অভিজ্ঞতার জন্যেই আমি মহাস্থবির।" (মহাস্থবির জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড)

"আমি খুঁজব তাঁকে, যিনি আমার ভাগ্যলিপি লিখেছেন। জিজ্ঞাসা করব তাঁকে, কেন তিনি দিলেন আমার মধ্যে এই আবেগ ও আকুলতা, অথচ সংসারের প্রতিটি জিনিষকে লেলিয়ে দিলেন আমার বিরুদ্ধে—যেন কোন কাজেই আমি সাফল্য লাভ না করতে পারি।" (ঐ, তৃতীয় খণ্ড)

"কবি বলেছেন, সুখ দুঃখ দুটি ভাই। কি রকম ভাই? মায়ের পেটের ভাই, কি চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—সে বিষয়ে তিনি নীরব। তাই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে এইখানে তেড়ে একটি ভাষণ ঝাড়বার প্রলোভন হচ্ছে।" (ঐ, তৃতীয় খণ্ড)

"আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন এই রহস্যের গভীরতম গভীরে প্রবেশ করছি, নিজের ইচ্ছায় নয়, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার কাজ শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া আর আমার কাজ শুধু বিস্মিত হওয়া। বিস্ময়রসই জগতে একমাত্র রস। সমস্ত রসেরই অন্তরতম প্রদেশে আছে বিস্ময়। যে বিস্মিত হয় না, সেই শুধু অন্য রসে মজতে পারে।" (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড)

আর এক ধরনের তত্ত্বদর্শী মন্তব্য জাতকের মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাঁর দু'একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হবে। নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধের গণ্ডী ভেদ করে তিনি বেরিয়েছিলেন বৃহত্তর জীবনের পথে-বিপথে। স্বচক্ষে জগৎটাকে দেখতে গিয়ে দুঃখ সুখের ও সুদুর্লভের বিপুল অভিজ্ঞতায় তাঁর নিজের জীবনের পাত্র প্রায় পূর্ণ হয়েছিল। ভূয়োদর্শী লেখকের সেই সব লব্ধ জ্ঞানের নানা পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে জাতকের নানা স্থানে। যথা,

"মানুষের মধ্যে যত প্রকার শ্রেণী আছে—অর্থাৎ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিবেচক, অবিবেচক, ধূর্ত, নির্বোধ, সুবোধ, দুর্বোধ—এদের কারুকেই স্রেফ দেখেই বোঝা যায় না যে কোন্ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ, যারা পরশমণির ছোঁয়া পেয়েছে—তাদের দেখলেই চেনা যায়। অন্তত এই শ্রেণীর যত লোকের সাহচর্যে আমি এসেছি, তাদের দেখেই চিনতে পেরেছি।" (ঐ, তৃতীয় খণ্ড)

"দুষ্ট লোক পরের সুখে হিংসা করে ও পরের দুঃখে

আনন্দিত হয়। সাধারণ লোক পরের সুখে হিংসা করে এবং পরের দুঃখ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকে। অসাধারণ লোক পরের দুঃখে দুঃখী হয়, কিন্তু পরের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। ভাল লোক পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হয়। কিন্তু পরের সুখ দুঃখকে এমন ভাবে ভোগ করা যে সম্ভব হতে পারে, তা এখানেই প্রথম দেখলুম।" (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড)

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, ৩১ ডিসেম্বর তারিখে, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম হয়। জন্মস্থান: উত্তর কলকাতা। পিতা মহেশচন্দ্রের পূর্ব নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরে। সেখান থেকে তিনি ১৭ বছর বয়সে কলকাতায় এসে বাস আরম্ভ করেন। তাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

মহেশচন্দ্র আতর্থী সমাজসেবা ও সংস্কারের প্রবল প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত হন। বিবাহ করেন হাওড়ার এক ব্রাহ্ম পরিবারে। তাঁর ৪ পুত্র—নরেশ, প্রেমাঙ্কুর, জ্ঞানাঙ্কুর ও পরেশ।

বহু ক্লেশ স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করে সমাজসেবার এবং অসাধারণ চরিত্রবলের জন্যে মহেশচন্দ্র পরে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহযোগিতায় তিনি Women's Protection League বা নারীরক্ষা সঙ্ঘ গঠন করেন এবং মুসলমান কর্তৃক নিগৃহীতাদের উদ্ধারের জন্যে অনেক নিগ্রহ ভোগ করেন নিজে। উক্ত সংস্থার Organising Secretary বা সাংগঠনিক সম্পাদকরূপে তিনি প্রধান কর্মী ছিলেন। দুর্ভাগিনী নারীদের উদ্ধারকল্পে একাধিকবার প্রাণ বিপন্ন হয়েছিল তাঁর। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের কাছে একটি নারী হত্যায় বাধা দেবার ফলে তাঁর নিজের মাথা কাটারির ঘায়ে সাংঘাতিকভাবে বিক্ষত হয়। এই ঘটনাটি প্রেমাঙ্কুর পরে 'মহাস্থবির জাতকে' পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন।

সমাজ কল্যাণের কাজে নানাভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন মহেশচন্দ্র এবং তাঁর জীবন ছিল ঘটনা-বহুল। ঠিক সাহিত্য-চর্চা কি না জানা যায় না, তবে তিনি নিজের জানাশোনা ঘটনার বিবরণ লিখতেন। সে লেখা কোথাও প্রকাশের জন্যে দিতেন না, কিন্তু তাঁর লেখার অভ্যাস ছিল। নিজের বিচিত্র ও বিপদ-সঙ্কুল অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে লিখেছিলেন—"জীবনের খাতা"। তা অবশ্য প্রকাশিত হয় নি। তা ছাড়া, প্রেমাঙ্কুরের ভাষায় "মা, বাবা, দুজনেই পড়তে খুব ভালবাসতেন।" পুত্র হয়ত এইসব থেকেই লাভ করেন সাহিত্য বিষয়ে উত্তরাধিকার।

মহেশচন্দ্রের চরিত্রের কিন্তু আর একটি দিক প্রকট ছিল, যার প্রতিক্রিয়ায় সম্ভবত প্রেমাঙ্কুরের জীবনের গতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হয়।

ধর্মীয় আচার-ব্যবহার সংস্কারাদিতে নিষ্ঠার আতিশয্য গোঁড়ামির প্রচণ্ড পর্যায়ে পৌঁছেছিল মহেশচন্দ্রের জীবনে। উপরন্তু তিনি অত্যন্ত ক্রোধী ছিলেন। পুত্রদের শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়ে সদা-শাসন নিতান্ত কঠোরতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে প্রেমাঙ্কুর স্বভাবতঃ বীতরাগ ও অমনোযোগী ছিলেন, পিতার নিষ্ঠুর তাড়নার ফলে পাঠ্য-পুস্তক ও গৃহজীবন দুই-ই বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কিত এই সব অধ্যায় যথাযথভাবে মহাস্থবির জাতকে চিত্রিত আছে।

বাল্যকাল থেকেই দুরন্ত-স্বভাব প্রেমাঙ্কুর পিতার প্রবল পীড়নেও বশ্যতা স্বীকার করলেন না। বিদ্যাচর্চাতেও উন্নতি হ'ল না আদৌ। আধ ডজন স্কুল অদল বদল করেও কোনক্রমে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল, ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল, [illegible] স্কুল, সিটি স্কুল, কেশব এ্যাকাডেমি ইত্যাদিতে তিনি যাতায়াত করেন ঐ পর্যন্ত। গৃহ এবং পিতার কবল থেকে পলায়ন করতে আরম্ভ করেন ১২।১৩ বছর বয়স থেকেই। প্রথম দিকে বেশীদূর যেতে পারতেন না, গ্রেপ্তার হয়ে পুনরায় গৃহ ও স্কুল-কারায় আবদ্ধ হতে হ'ত যথারীতি। ১৫ বছর বয়স থেকে দূর যাত্রায় পশ্চিমাঞ্চলে পাড়ি দিতে লাগলেন। এসব প্রসঙ্গ নাটকীয় ভাবে অনেকাংশেই বর্ণনা করা আছে জাতকে।

পিতার চরিত্রও সমস্ত মহত্ত্ব, সরলতা, ত্যাগ, সেবাধর্ম, আদর্শবাদ এবং কঠোরতা সমেত প্রেমাঙ্কুর আশ্চর্য দক্ষতায় 'মহাদেব' নামে জাতকে অঙ্কন করেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেশচন্দ্রকে বর্ণনা করেছেন 'স্থির' বলে। পিতার শাসনের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে নরেশচন্দ্র ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে চলে যান, প্রথমে লণ্ডনে ও পরে আমেরিকায়। সেখানে চিকিৎসাবিদ্যায় এম্. ডি. ডিগ্রি লাভ করে, Plastic Surgeon রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, স্ব-দেশে আর প্রত্যাবর্তন করেন নি। তৃতীয় ভ্রাতা জ্ঞানাঙ্কুরকে জাতকে 'অস্থির' নামে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নায়ক নিজের ডাকনাম থেকেই স্মরণ করে বোধহয় 'স্থবির' নামটি গ্রহণ করেছেন। লেখকরূপে সেই নাম থেকে হয়েছেন মহত্তর তাৎপর্যময় মহাস্থবির।

পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর বিদ্যাচর্চায় ব্যর্থতার অন্তরালে কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের জীবনে এক মহৎ সার্থকতার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছিল। অদম্য আগ্রহে এবং গোপনে তিনি নানা সাহিত্য-গ্রন্থ পাঠ করতেন বাল্যবন্ধু প্রভাতচন্দ্রের সহযোগে। উত্তর জীবনে খ্যাতনামা দেশব্রত-সংবাদপত্র-সেবী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রেমাঙ্কুরের নিকটতম প্রতিবেশী এবং ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলে (এখানকার নিম্নশ্রেণীতে বালকরাও যোগ দিতে পারত) তাঁর সহপাঠী। সেযুগের অন্যতম ব্রাহ্ম নেতা, 'অবলা বান্ধব'-পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতচন্দ্র বাল্যজীবনে ১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের বিপরীত বা পূর্বদিকে) বাস করতেন। সেই বাড়ীর সংলগ্ন বাড়ীটিতে থাকতেন সপরিবারে মহেশচন্দ্র আতর্থী। যে ১৩ সংখ্যক গৃহের উত্তরাংশে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা, বহুমুখী প্রতিভাধর উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বাস ছিল, তারই দক্ষিণ অংশে ছিল ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল। এবং সেই বাড়ীতে প্রভাত-চন্দ্রের মাতুলেরা এক পারিবারিক লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। সেই লাইব্রেরীর গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যে অনেক সময় সাহিত্য-পাঠে নিমগ্ন থাকতেন প্রভাতচন্দ্র ও প্রেমাঙ্কুর। স্কুল পাঠ্য বহির্ভূত এই সব পাঠ্যের বিষয়ে দুই বন্ধুতে প্রচুর আলোচনাও হ'ত।

তার কিছুকাল পরে তাঁদের দুজনের সঙ্গেই আলাপ হ'ল প্রসাদ রায়ের সঙ্গে, প্রেমাঙ্কুরের তখন ১৪ বছর বয়স। প্রসাদ তাঁর চেয়ে বছর দুয়েক জ্যেষ্ঠ এবং তখনই যে ছদ্মনামে বাংলা পত্র-পত্রিকায় রচনা আরম্ভ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই হেমেন্দ্রকুমার রায় নামেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হন। সেই কিশোর বয়সে সাহিত্যের সঙ্গী হলেন তিনজনে।

সাহিত্য ও শিল্পাদি ক্ষেত্রে আকুল পিপাসা তৃপ্ত করতে তিন বন্ধু পরে যাতায়াত আরম্ভ করেন তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, স্ট্রাণ্ড্ রোডের মেট্‌কাফ্ হলে। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়, সত্যেন্দ্রনাথ যদিও প্রেমাঙ্কুরের ৮ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, প্রেমাঙ্কুরের শেষ রচনায় প্রকাশিত হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথেরই স্মৃতিকথা। সত্যেন্দ্রনাথের পরে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। মণিলালের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী হৃদ্যতা ছিল অবশ্য হেমেন্দ্রকুমারের। প্রেমাঙ্কুর সাহিত্য-রচনার প্রথম জীবনে হেমেন্দ্রকুমার এবং মণিলাল দুজনের কাছেই উপকৃত ছিলেন, একথা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও বলে গেছেন।

প্রেমাঙ্কুরের সাহিত্যকর্ম ১৩১০ বছরের মধ্যেই আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু তা কখনো অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয় নি। কারণ, আগেও বলা হয়েছে, পলাতক জীবন তাঁর আরম্ভ হয়েছিল কিশোর বয়স থেকেই। বার বার বাড়ি থেকে পলায়ন করেছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বহু বিচিত্র মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েছেন। বেদনা আনন্দে বিজড়িত বৃহত্তর জীবন তাঁকে নিরন্তর আহ্বান জানিয়েছে আর সে ডাকে সাড়া দিতে গতানুগতিক ধারায় ইস্তফা দিয়ে তিনি বারংবার গৃহছাড়া হয়েছেন। তাঁর পাঠ এইভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বিদ্যালয়ের বাইরে। আপাত রিক্ততার মধ্যেও অন্তর তাঁর জীবনদেবতার অজস্র দাক্ষিণ্যে পূর্ণ হয়। জীবনের পথে কিছুই যায় না ফেলা। চিত্তের সেই সঞ্চিত অমৃত ক্ষরিত হয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে। জীবনে যত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়েই তাঁকে যেতে হোক, শিল্পী-সাহিত্যিকের মন ও দৃষ্টি তাঁর চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। সংসারযাত্রার জন্যে যত প্রকার জীবিকাই অবলম্বন করুন, মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। সাহিত্যকর্মে জীবনের নানা বাঁকে ছেদ পড়লেও জাত সাহিত্যিক তিনি থাকেন ঠিকই।

'জাহ্নবী' মাসিক পত্রিকায় প্রেমাঙ্কুরের ১৭ বছর বয়সে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। সে গল্পটি তাঁর কোন

গল্পপুস্তকে পরে অন্তর্ভুক্ত করেন নি তিনি। তখন 'জাহ্নবী'র সম্পাদক ছিলেন সুধাকৃষ্ণ বাগচি নামে একজন অর্বাচীন, কিন্তু পত্রিকাটি আসলে কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর ছিল। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের পরিচালনায় কিছুকাল থাকবার পর এটি আসে ঐ ব্যক্তির হাতে। সুধাকৃষ্ণের অযোগ্যতার ফলে পত্রিকা বানচাল হবার উপক্রম করলে তিন বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাতচন্দ্র এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর সংশ্লিষ্ট থাকেন।

তার কয়েক বছর পরে প্রেমাঙ্কুর বিখ্যাত 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় গল্প প্রকাশ করেন এবং ক্রমে সুপরিচিত হন 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম শক্তিশালী লেখকরূপে। ভারতীর কর্ণধার তখন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে লেখকরূপেও প্রেমাঙ্কুর অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। হেমেন্দ্রকুমার ভিন্ন সাহিত্য রচনার বিষয়ে বিশেষ ঋণী ছিলেন তিনি মণিলালের কাছে। "মণিলাল আমার লেখা দেখে-শুনে দিতেন, এটা এইরকম হলে ভাল হয় ইত্যাদি জানাতেন।" প্রথম সাহিত্য-জীবনের প্রসঙ্গে বলতেন প্রেমাঙ্কুর।

কিন্তু সাহিত্যিকরূপে সে অগ্রগতির আগে ও পরে তাঁর জীবনে অন্য নানা কর্মপ্রচেষ্টাও ছিল। প্রথম যৌবন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সময়ে জীবন-সংগ্রামের বহু পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাঁকে। জীবিকা অর্জনের জন্যে অনেক রকমের কাজই তিনি করেছিলেন। অল্প বয়সের পলাতক জীবনে বিদেশে নানা উঞ্ছ কাজ করতে বাধ্য হন তিনি—পথে কায়িক শ্রম থেকে আরম্ভ করে গৃহস্থের পরিচারক ও পাচকের কাজ পর্যন্ত কিছুই তাঁর বাকি ছিল না।

কলকাতাতেও নানা রকমের সামান্য কাজ করেন। এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে কার এণ্ড্ মহলানবীশের ক্রীড়া সরঞ্জামের দোকানে সাধারণ বিক্রেতার কর্মে অতিবাহিত হয় ছ বছর—১৯১১ থেকে ১৯১৭ খ্রীঃ। এই দোকানে কাজ করবার সময়েও সাহিত্য-চর্চায় তাঁর বিরতি ছিল না। "ফুটবলে পাম্প্ করতে হত, লেখাও চলত।" নিজ উক্তি।

ঠনঠনে অঞ্চলে পশ্চিমের এক চশমা ব্যবসায়ীর কারবারে চশমার কাজও বেশ কিছুদিন করেছিলেন।

নিজে কয়েক রকমের ব্যবসাও করেন নানা সময়ে, প্রত্যেকটিতে ব্যর্থ হন। বেনেপুকুর অঞ্চলে জুতোর ব্যবসা। ঘিয়ের ব্যবসা। সিগারেটের ব্যবসা। সবেতেই কিছু-না-কিছু লোকসান দিয়ে বন্ধ করতে হয়।

সিনেমা জগতেও তিনি যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। তাঁর জীবনে ছায়াচিত্রের স্থান ছিল সাহিত্যের নীচেই। সে প্রসঙ্গ কিছু বিস্তারিত, পরে তার পরিচয় দেওয়া হবে।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছেন একাধিকবার, সখ করে নয়, পেশা হিসাবেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত সান্ধ্য দৈনিক পত্র 'বৈকালী'-তে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সহযোগে লেখনী চালনা করেছেন। এই 'বৈকালী' সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নাম মুদ্রিত থাকলেও, সম্পাদনার প্রায় যাবতীয় দায়িত্বই পালন করতেন তাঁরা তিন বন্ধুতে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধও তাঁরা লিখতেন।

'বৈকালী' ভিন্ন আরো একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রেমাঙ্কুর সাংবাদিক-লেখকরূপে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সংবাদপত্রটির নাম হিন্দুস্থান।

দু' জায়গাতেই কাজ তাঁর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। পরে আর একটি বিশেষ ধরণের পাক্ষিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন।—'বেতার জগৎ' সে পরিচয় তাঁর কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অবস্থানের প্রসঙ্গে দেওয়া হবে। কিন্তু সৃজনী সাহিত্যের পথে যে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলেন, নানা বাধা-বিঘ্নে তার গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হলেও, স্তব্ধ হ'তে পারে নি কোনদিন। 'যমুনা' ও পরে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় তাঁর গল্প মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে স্বকীয় উৎকর্ষের জন্যে গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে যুগের 'যমুনা' ও 'ভারতী'তে তাঁর প্রত্যেক গল্প শরৎচন্দ্র পড়তেন এবং তাঁর সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করতেন, এ কথা শরৎচন্দ্র প্রেমাঙ্কুরকে জানিয়েছিলেন।

প্রেমাঙ্কুরের সেই সব সাহিত্যকর্ম সার্থক সৃষ্টি হলেও অর্থকরী ছিল না। তখনকার কালের প্রথা অনুসারে তিনি মাসিকপত্র থেকে কিছুই পেতেন না গল্প লিখে।

বই প্রকাশিত হলে যা পেতেন, তাও সামান্য। একথা উল্লেখ করবার উদ্দেশ্যে এই যে, তিনি সাহিত্যসেবা করতেন সে যুগের অনেকেরই মতন অন্তরের প্রেরণায়। সাহিত্য চর্চা তাঁর শিল্পী সত্তার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল।

তাঁর প্রথম গল্প পুস্তক "বাজীকর" আট আনা সংস্করণের বই। "বাজীকর" প্রকাশের সময় তাঁর বয়স ৩০ পার হয়েছে।

এই গল্পের বইয়ের আগে অন্য একটি গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁর অন্যতম বন্ধু চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায়। সেটি ছোটদের জন্যে গল্প, কবিতা, রঙীন ছবি ইত্যাদির সংকলন গ্রন্থ। নাম 'রং মশাল'। সেযুগে ছেলেমেয়েদের জন্যে এমন উচ্চমানের সচিত্র সংকলন পুস্তক বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে পথিকৃতের কাজ করেছিল। তাঁর সম্পাদিত এই গ্রন্থের লেখক ও শিল্পীদের তালিকা থেকে বোঝা যায় কত উচ্চশ্রেণীর হয়েছিল সংকলনটি। অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতির লেখা এবং গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যতীন্দ্রকুমার সেন, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতির অঙ্কিত পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি। তা ছাড়া, চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা ৩৩টি রেখা ছবি। বইখানির আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, মুখপাতে প্রত্যেক লেখকের কবিতায় পরিচয় রচনা। দেখা যায়, তখনই (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল) অবনীন্দ্রনাথ 'ছবির রাজা অবীন ঠাকুর' আখ্যাত হয়েছেন। যথা :

"ছবির রাজা অবীন ঠাকুর রংয়ের নেশায় আছেন ভুলি,
পেয়েছি তাঁর চিত্র, লেখা বিচিত্র সে ভাবের তুলি।"

লেখক পরিচিতির শেষ দু'ছত্র হ'ল :

"ভুল চুক সব মাপ কোরো ভাই, এটাই প্রথম চেষ্টা যখন,
শ্রীচারু রায় প্রেমাঙ্কুরের যুক্ত করে এই নিবেদন।"

কবিতাটি প্রেমাঙ্কুরের রচনা। এখানে বলে রাখা যায় যে, কবিতা লেখাতেও তাঁর হাত ছিল। শেষ জীবনে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গল্পের বই "শেফালী"র উৎসর্গ পত্রে একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা রচনা করেন তাঁর অন্যতম বাল্যবন্ধু অমল হোমের উদ্দেশে। ছোটদের জন্যে প্রেমাঙ্কুরের প্রথম উচ্চশ্রেণীর সংকলন গ্রন্থ 'রংমশাল'-এর প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর সাহিত্য-জীবনে বরাবরই শিশুসাহিত্যে একটি স্থান অধিকার করে ছিল। ছোটদের জন্য তিনি নানা সময়ে নানা ধরনের মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশ করেন—গল্প, ঐতিহাসিক কাহিনী, পুরাণকথা ইত্যাদি। সেসবের মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্ন পত্রিকায় রয়ে গেছে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'আনারকলি', 'ডানপিটে' ও 'ছোটদের ভাল ভাল গল্প'।

'রং-মশাল'-এর পর প্রথম গল্পের বই "বাজীকর" প্রকাশিত হয়। তার প্রায় তিন বছর পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল—"চাষার মেয়ে"। সে যুগের নির্বাক ছায়াচিত্রে এটি রূপায়িত হয়েছিল। "চাষার মেয়ে"র পরের বছর বেরয় "আনারকলি"। তার প্রায় দু'বছর পরে "দুই রাত্রি" আত্মপ্রকাশ করে। তারপর "ঝড়ের পাখী", "অচল পথের যাত্রী", ইত্যাদি আরো কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ হয়ে তিনি ক্রমে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শেষোক্ত দু'খানিই উপন্যাস।

তা ছাড়াও তাঁর আরো কয়েকখানি পুস্তক—তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট রচনা—প্রকাশিত হয়েছিল, যেসব পরে উল্লেখ করা হবে। আপাতত তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিণতির আলোচনায় আর অগ্রসর না হয়ে তাঁর প্রথম ও মধ্য-জীবনের অন্যান্য কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়োজন। কারণ আরো একাধিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র প্রতিভা পুষ্পিত হয়েছিল।

প্রথমত তাঁর সঙ্গীতচর্চার কথা।

প্রেমাঙ্কুরের শিল্পীমন সহজাত ছিল। অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিক বা শিল্পীর জীবনে যেমন দেখা যায় ললিতকলার অন্য কোন কোন বিভাগেও তাঁদের অন্তরের গভীর যোগ এবং খানিক পরিমাণে নৈপুণ্য আছে, প্রেমাঙ্কুরের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্যণীয়। তাঁর জীবনে সঙ্গীত ও অভিনয়কলার স্থান ছিল। তার মধ্যে প্রথমটির চর্চা তিনি রীতিমত করেছিলেন বেশ কিছুকাল ধরে।"

সঙ্গীতের আকর্ষণ যে বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে

নিবিড়ভাবে অনুভূত হ'ত, তার অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি 'মহাস্থবির জাতকে'র প্রথম খণ্ডে যথার্থ শিল্পীর মতনই প্রকাশ করেছেন। নৌকার ওপর সেই পশ্চিমা বাঈজীর মর্মস্পর্শী ঠুংরি বালকের চেতনায় যে অপূর্ব অনুভব সৃষ্টি করেছিল তা প্রেমাঙ্কুরের নিজেরই অভিজ্ঞতা। তাঁর "চাষার মেয়ে" উপন্যাসে মনের ওপর বাঁশীর সুরের আচ্ছন্ন করা প্রভাবের কথা একাধিক আছে। তাঁর "অচল পথের যাত্রী" এবং "দুই রাত্রি"র মধ্যেও পাওয়া যায় মাদকতাময় সঙ্গীত অনুষ্ঠানের বিবরণ। "বাজীকর" পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "মল্লারের সুর" গল্পটিও তাঁর রাগ-সঙ্গীত প্রীতির একটি নিদর্শন। তাঁর রচনাবলীর আরো নানা স্থানে প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গীতজ্ঞতার পরিচয় বিধৃত আছে।

তিনি যে সঙ্গীতচর্চা করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অবশ্য কণ্ঠসঙ্গীত নয়। যন্ত্রসঙ্গীত—সেতার। রাগ সঙ্গীতের সুর বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে যৌবনে তিনি সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন এবং কয়েকজন ওস্তাদের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে যেতেন। তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ করামৎউল্লা খাঁর সঙ্গ করেছিলেন সবচেয়ে বেশী। খাঁ সাহেবের আগে তাঁরই কনিষ্ঠ কৌকভ খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলেন। মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র দরবারে আগত সরদী নিয়ামৎ-উল্লা খাঁর এই পুত্রদ্বয় পিতার শিক্ষাধীনে সবিশেষ কৃতী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গীতজীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কলকাতায় অতিবাহিত করে, কয়েকজন গুণী বাঙ্গালীকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রথমে কলকাতায় আসেন ওস্তাদ কৌকভ খাঁ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে এবং প্রায় ৮ বছর কলকাতায় সগৌরবে অবস্থানের পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত "সঙ্গীত সঙ্ঘে"র প্রধান যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষক থাকায় তাঁর মৃত্যুতে তাঁর অভাব পূরণের জন্যে উক্ত সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ এলাহাবাদ থেকে ওস্তাদ করামৎউল্লাকে আনিয়েছিলেন। করামৎউল্লা কলকাতায় ১০ বছরেরও অধিককাল কলকাতার একজন সর্ববিখ্যাত ওস্তাদরূপে বসবাস করেন। খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে ধীরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্র কৃষ্ণ শীল, কালিদাস পাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নাটোররাজ যোগীন্দ্র নাথ রায়, নৃপেন্দ্রনাথ বসু, ননী মতিলাল, যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) প্রমুখ সঙ্গীতশিক্ষা করেন এবং তাঁদের মধ্যে একমাত্র (অন্ধগায়ক) কৃষ্ণচন্দ্র দে কণ্ঠসঙ্গীতে খেয়ালের তালিম পান, অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতের শিষ্য। প্রেমাঙ্কুর দুই ভ্রাতার কাছেই, বিশেষ ওস্তাদ করামৎউল্লার কাছে সেতার শিক্ষা করেন। তা' ছাড়া, তিনি এনায়েৎ খাঁর পিতা সেতার সুরবাহার বাদক ইমদাদ খাঁর কাছেও কিছুদিন শিখেছিলেন। আধুনিককালে ঠুংরি গানের নেতৃস্থানীয় কলাবত গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব)-এর শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছেও যাতায়াত করতেন প্রেমাঙ্কুর। সেখানে কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা না করলেও সঙ্গীত বিষয়ে কিছু উপকৃত হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনের নানামুখী গতি প্রধান শিল্পকর্ম সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ ইত্যাদি কারণে তাঁর সেতার শিক্ষা সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে পারে নি—রাগসঙ্গীতের সাধনায় একান্তভাবে নিমগ্ন না হলে তা' সম্ভবও হয় না কারুর পক্ষে।

প্রেমাঙ্কুরের জীবনে আর একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হল কলকাতা-বেতার কেন্দ্রে তাঁর কার্যকাল। কলকাতা বেতারের আদি যুগে, প্রতিষ্ঠানটি যখন বেসরকারী ছিল, তিনি সেখানে যোগ দেন এবং প্রায় ৭ বছর একাদিক্রমে নিযুক্ত থেকে শুধু নিজের একাধিক গুণের পরিচয় দেন নি, বেতারের উন্নতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্যেও কিছু অবদান রেখেছিলেন।

বেতারকেন্দ্রে তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল বক্তা এবং 'বেতার জগৎ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে। তাছাড়া, স্বরচিত অনেক গল্পও এখানে তিনি পাঠ করতেন, প্রথম যুগে এবং নিয়মিত কার্যকাল শেষ হবার বহু পরে পর্যন্তও। তবে এখানে প্রথম যুগে তাঁর কাজের কথাই বিশেষ করে উল্লেখ্য।

বক্তারূপে বেতারে তাঁর একটি ছদ্মনাম ছিল—সোমদত্ত। এই নামে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতেন। সে যুগের বেতার-কেন্দ্রের যে ক'টি বিভাগ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল—'মহিলা মজলিস', শ্রোতৃদের জন্যে বিশেষ আসর। 'মহিলা মজলিসে'র

পরিচালক ছিলেন বিষ্ণু শর্মা ছদ্মনামে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, যিনি বেতার নাটুকে দল (সেকালের বেতারের নাট্যগোষ্ঠী)-এর প্রধান অভিনেতা ও প্রযোজকরূপে এবং হাস্যরসিক বক্তা হিসাবেও বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণুশর্মা পরিচালিত সেই মহিলা মজলিসের আসরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সোমদত্ত ছদ্মনামে নিয়মিত ভাষণ দিতেন বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল আলোচনার জন্যে সোমদত্ত সেকালের বেতার শ্রোতৃবৃন্দের কাছে অতি সুপরিচিত ছিলেন।

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের মুখপত্ররূপে 'বেতার জগৎ' পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও প্রেমাঙ্কুরের নাম বিশেষ স্মরণীয়। 'বেতার জগতে'র তিনি শুধু অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ন'ন, প্রথম সম্পাদকও। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে প্রায় ছ' বছর তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন। 'বেতার জগৎ' শুধু বেতারের অনুষ্ঠানলিপি ছিল না, পাঠযোগ্য বিষয়াদির সমাবেশে তা জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর সম্পাদন নৈপুণ্যে।

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের আর একটি বিশেষ ও বিখ্যাত অনুষ্ঠানের জন্যেও প্রেমাঙ্কুরের নাম স্মরণযোগ্য। তা হ'ল, প্রতি বছরের মহালয়া তিথির ব্রাহ্ম মুহূর্তে অনুষ্ঠিত "মহিষাসুরমর্দিনী।" বেতারের সেই বেসরকারী এবং প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে এক অন্তরঙ্গ পরিবেশ ছিল এবং যে ক'জন বাঙ্গালী তার সঙ্গে কর্মসূত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁরা শুধু নিয়মতান্ত্রিক ভাবে শুষ্ক কর্তব্য পালন করে দায়িত্ব শেষ করতেন না। রেডিওর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্যে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করতেন নতুন নতুন বিভাগ ও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে। একদিন অভাবিত সময়ে বেশিক্ষণ ধরে এমন একটি বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান পত্তন করলে হয় যাতে শ্রোতাদের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, বেতার সম্পর্কে লোকে নতুন করে সচেতন হয়ে ওঠে—এমন একটি আইডিয়া প্রেমাঙ্কুরের মাথায় আসে এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ফলে মহালয়ার ভোর রাত্রির এই অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত হয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে সুরেলা আবৃত্তি, পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সুরসংযোজনা, অন্যান্য গায়ক-গায়িকার সহযোগে সঙ্গীতাঞ্জলী বাণীকুমার লিখিত এই "মহিষাসুর-মর্দিনী" কলকাতা বেতারকে অগণিত শ্রোতাদের ঘরে ঘরে আপন করে নিতে অনেকখানি সাহায্য করে।

এইভাবে কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকবার সময়ে প্রেমাঙ্কুরের যোগাযোগ ঘটে ফিল্ম জগতে স্বনামপ্রসিদ্ধ নিউ থিয়েটার্সে'র সঙ্গে। তাঁর জীবনের আর একটি প্রখ্যাত পরিচ্ছেদের সূচনা হয়। অর্থাৎ তাঁর সিনেমা জীবন।

সিনেমা জগতের সঙ্গে এবার তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন, যদিও আরো কয়েক বছর আগে এ যোগাযোগের সূত্রপাত হয়েছিল। এবং তা ঘটে তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ, উত্তরকালের স্বনামধন্য নট ও নাট্যাচার্য শিশির-কুমার ভাদুড়ির উদ্‌যোগে। নাট্যাচার্য হবার আগে, নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে তিনি এক ফিল্ম্ সংস্থার পত্তন করেছিলেন। তাজমহল ফিল্ম কোং। প্রেমাঙ্কুরকে তিনি চিত্রনাট্য রচনা করবার জন্যে আহ্বান করলেন। প্রেমঙ্কুরও সোৎসাহে যোগ দেন শিশিরকুমারের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সে চলচ্চিত্রের কাজ শিশিরকুমারের বেশিদিন চলে নি, সুতরাং প্রেমাঙ্কুরেরও সেজীবনে তখনকার মতন ছেদ পড়ে।

কিন্তু শিশিরকুমারের সেই সিনেমা প্রচেষ্টার সংস্পর্শে আসবার পর থেকে প্রেমাঙ্কুর ফিল্মের জগতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তারপর মাঝে মাঝে সিনেমার কাজ করেন নানা ধরনের। নানা জায়গায় সাময়িক কাজ। সেও এক রকমের বোহেমিয়ান জীবন। কিছুকাল লাহোরের এক ফিল্ম প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তাঁদের 'আনারকলি' ছবির 'কন্টিনিউইটি ম্যান' হন প্রেমাঙ্কুর। তাঁদের কার্যালয় লাহোরে, কিন্তু কর্মক্ষেত্র অর্থাৎ শুটিং চলত দিল্লীতে। সে সব দিনের স্মৃতি তাঁর কোন কোন গল্পে ("শেফালি"পুস্তকের অন্তর্গত) দেখা যায়।

সে কাজ করবারও আগে প্রেমাঙ্কুর কিছুদিন নির্বাক যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী সীতা দেবীর প্রচার-সচিব ছিলেন। সীতা দেবী নামে সুপরিচিতা হলেও তিনি ছিলেন ইঙ্গ-ভারতীয় (এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান)। ম্যাডান কোম্পানীর বহু সফল ছবির নায়িকা (ভ্রমর, সরলা, আয়েষা প্রভৃতি) রূপে সেকালের সিনেমা-জগতের একজন শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন।

তারপর প্রেমাঙ্কুর আবার কিছুদিন প্রচার সচিবের কাজ করেন এক ভ্রাম্যমান প্রতিষ্ঠানে। ভারতীয় সিনেমা-ক্ষেত্রে অন্যতম আদি পরিচালক নিরঞ্জন পাল একটি থিয়েটারের দল গঠন করে এক সময় ভারতের নানা স্থানে অভিনয় প্রদর্শন করতেন। প্রেমাঙ্কুর ছিলেন সেই দলের প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

সিনেমা সংশ্লিষ্ট জগতে এমনি নানা বিচিত্র কাজ তিনি আগেই করেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর নিজের প্রথম উপন্যাস "চাষার মেয়ে" নির্বাক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় প্রথম যুগের অন্যতম চিত্র-পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায়।

এই সব পর্বের পর প্রেমাঙ্কুর কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করবার সময়ে আবার নতুন করে তাঁর সিনেমা জগতে প্রবেশ ঘটে। এবার আরো প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে এবং প্রথমে গল্প-লেখক ও চিত্র-নাট্যকার রূপে।

এ যাত্রায় বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের সত্বাধিকারী বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের প্রথম থেকেই যোগাযোগ হয়। তখন নির্বাক ছবির শেষ পর্যায় চলেছে এবং বীরেন্দ্রনাথের ছবির জন্যে প্রেমাঙ্কুর রচনা করলেন কাহিনী ও চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রটি নির্মাণের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হ'ল। এমন সময় বাধা পড়ল অকল্পিতভাবে, যেমন বাধা দেখা গেছে প্রেমাঙ্কুরের সারা জীবনে অসংখ্যবার।

হঠাৎ সবাক ছবির যুগ আরম্ভ হয়ে গেল। ম্যাডান প্রতিষ্ঠান থেকে বেরুল প্রথম সবাক চিত্র। সরকার মহাশয় নির্বাক ছবির পরে আর অগ্রসর হলেন না, সবাক চিত্র নির্মাণের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। প্রেমাঙ্কুরের সেই গল্প ও চিত্রনাট্য সবই নষ্ট হ'ল। তবে বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যে-কর্মসূত্রে পরিচিত হয়েছিলেন, তার সুফল লাভ করলেন কিছুদিনের মধ্যেই।

এবার নিউ থিয়েটার্সের সকল চিত্র প্রস্তুতির অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হলেন প্রেমাঙ্কুর। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' সবল ছবি রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে। সিনেমা পরিচালক রূপে প্রেমাঙ্কুরের জীবন কয়েক বছর ধরে এগিয়ে চলল। এতদিন পরে এই প্রথম তিনি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করলেন বটে, কিন্তু সাহিত্য-জীবন হ'ল রাহুগ্রস্ত। ১০ বছরেরও বেশী সাহিত্যের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক রহিত হয়ে গেল। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর পরিচালনায় পর পর সবাক ছবি মুক্তি লাভ করতে লাগল— 'কপালকুণ্ডলা', 'ইহুদী কী লেড়কী (হিন্দী), 'পুনর্জন্ম', 'দিক-শূল', 'সুধার প্রেম' ইত্যাদি।

শুধু পরিচালনা নয়, এখানে তাঁর আরো একটি কৃতিত্বের প্রকাশ দেখা যায়। তা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' নাটকের সবাক চিত্রে প্রেমাঙ্কুর প্রধান ভূমিকা যাদবের অংশ অভিনয় করেন। চমৎকার হয় তাঁর যাদবের অভিনয়। 'কপালকুণ্ডলা' চিত্রেও তিনি একটি ছোট অংশে অভিনয় করেছিলেন এবং 'ইহুদী কী লেড়কী'-তেও একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা তিনি নেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অভিনয়-শক্তি তাঁর ছিল, কিন্তু তার অভ্যাস তিনি কখনো করেন নি। তাঁর কথাবার্তার ধরনই ছিল নাটকীয়। অত্যন্ত সরস ও আকর্ষক কথার ভঙ্গিতে তিনি কোন বিষয়কে বর্ণনা করতে পারতেন রীতিমত জীবন্ত ক'রে—(তাঁর লেখারও এ বিশেষত্ব) এবং বর্ণনার সময়ে তাঁর মুখে-চোখে যে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেত, তা নিপুণ অভিনেতার। হাবভাব যথোচিত প্রকট করে শ্রোতাদের মনে বিষয়ের ছবি এঁকে দেবার জন্যে তিনি কথা-বার্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে হাত ও অঙ্গাদি সঞ্চালন করতেন। ফলে তাঁর বর্ণিত বিষয়ই শুধু প্রাণবন্ত হত না, সে আসরও হয়ে উঠত সজীব মজলিস। এও তাঁর অভিনেতা-সত্বার এক লক্ষণ। সে যা হোক, নিউ থিয়েটার্সের পর সিনেমা-জীবনে তিনি ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সেও কিছুকাল ছিলেন। তারপর চলে যান বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে।

বোম্বাই অঞ্চলে প্রায় ১০ বছর থেকে যান। সেখানে তাঁর পরিচালনায় 'সরলা', 'ভারত কী বেটী' এবং অন্যান্য হিন্দী উর্দু কয়েকটি চিত্র গৃহীত হয়। সেখানে তাঁকে হিন্দী উর্দু ছবিতেই কাজ করতে হয়েছিল। সেজন্যে ভাষা দু'টিও বেশ খানিক শিখতে হয়েছিল—উর্দুতে অভিনয়-শিক্ষাও দিতে হ'ত তাঁকে।

বোম্বাইতে বাসের মধ্যে কোলাপুরে কয়েকমাস চাকরি সূত্রে কাটিয়ে আসেন। এইভাবে প্রায় ১০ বছর পরে বোম্বা-

ইয়ের পালা শেষ ক'রে প্রত্যাবর্তন করেন বাংলাদেশে। এই দীর্ঘকাল সাহিত্য সৃষ্টি শুরু ছিল, বলা যায়। তবে প্রবাস জীবনের এসব ঘটনাবলীর কিছু কিছু তাঁর সাহি-ত্যের বিষয়বস্তু রূপে রূপায়িত হয়েছে উত্তরকালে।

কলকাতায় ফিরে আসবার পরে আবার তাঁর সাহিত্যচর্চার কিছু ফসল ফলে। "স্বর্গের চাবি" নামে স্মরণীয় গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে। তাঁর সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফলন অবশ্য "মহাস্থবির জাতক", যার তিনটি খণ্ড তাঁর জীবনের অপরাহ্ণে ১০ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। জাতক তাঁর শেষ সৃষ্টিও। তৃতীয় খণ্ড জাতক প্রকাশের পর তিনি আরো ১০ বছর বর্তমান ছিলেন, কিন্তু আর নতুন রচনা বিশেষ সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার আগে তাঁর ব্যক্তি-জীবন ও সাহিত্য-জীবনেরও কিছু তথ্য জানাবার আছে।

সাহিত্য জীবনের মধ্যে তাঁর নাটকের প্রসঙ্গ। দু'খানি নাটক তিনি লিখেছিলেন, তার মধ্যে একখানির নাম বাংলার নাট্যমোদীদের সুপরিচিত। 'তখ্‌ত-এ-তাউস' অর্থাৎ ময়ূর সিংহাসন। মোগল বাদশাহীর পতনের যুগে আওরঙ্গজেবের পৌত্র জাহান্দার শা'র এক বছরের বাদশাগিরি ও পরে নিজের ভাইপুত্র ফরুখশিয়ারের দ্বারা নিহত হওয়ার বৃত্তান্ত অব-লম্বনে রচিত এই নাটকটি নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের পরি-চালনায় ১৯৫১ খ্রীঃ ১০মে থেকে শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে মহা সমা-রোহে অভিনীত হয়। যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নতুন নাটক ভাদুড়ি মহাশয়ের শেষ জীবনে তাঁর প্রতিভার যোগ্য বাহন হয়েছিল, প্রেমাঙ্কুরের এই শক্তিশালী নাটকটি তার অন্যতম বিশিষ্ট। 'তখ্‌ৎ-এ-তাউস'-এর নায়ক জাহান্দার শা'র চরিত্রে অভিনয় করে শিশিরকুমার নিজের অভিনীত 'দিগ্বিজয়ী' যের প্রতিভার পরিচয় আবার নতুন করে দিয়েছিলেন—নাট্যকার প্রেমাঙ্কুরের পক্ষে তা কম গৌরবের কথা নয়। নাটকটির স্বাতন্ত্র্য পূর্ণ ঐতিহাসিকত্বে। প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনা এমন নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকৃত ইতিহাস থেকে নাট্যকার গ্রহণ করেছেন যে, কোন কাল্পনিক ব্যক্তি বা ঘটনা স্থানের নাটকে স্থান দেন নি। অথচ আদ্যোপান্ত নাট-কীয় উপাদান ও আবেদনে অনবদ্য চিত্তাকর্ষক। এই দিক থেকে প্রেমাঙ্কুরের এই নাটক বাংলায় অনন্য।

নাটকটি তিনি লেখেন ১৯২৫ খ্রীঃ অর্থাৎ ২৬ বছর পরে তা মঞ্চস্থ হয়। কারণ শিশিরকুমার এটি হারিয়ে ফেলে-ছিলেন সে সময়। প্রেমাঙ্কুর রচিত আর একখানি নাটকও শিশিরকুমারের কাছে ছিল এবং সেটিও হারিয়েছিলেন, আর পাওয়া যায়নি। সেটিও শিশির কুমারের অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল এবং অভিনয় করবেন বলে রেখেছিলেন—প্রেমাঙ্কুরের ভাষায় "এমন যত্ন করে শিশির রাখলে যে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।"

সেই লুপ্ত নাটকখানির নাম "মাটির ঘর।" রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীর Lower Depths নাটকের ছায়া অবলম্বনে প্রেমাঙ্কুর রচনা করেন "মাটির ঘর"। তবে তিনি বলতেন, "এরকম স্তরের জীবন আমি নিজে বিস্তর দেখেছি, আমার এবিষয়ে খুব অভিজ্ঞতা আছে।" গোর্কীর Lower Depths-এর ভাব অনুসরণে এবং এদেশে তাঁর নিজের দেখা ঐ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা ও চরিত্র নিয়ে নাট্যসূত্র গ্রথিত করে প্রেমাঙ্কুর লিখেছিলেন "মাটির ঘর"। শিশিরকুমার যখন সেটি আগ্রহ করে নিয়েছিলেন নিজে মঞ্চস্থ করবার জন্যে, তখন "মাটির ঘর" যে একটি সার্থক নাটক রচনা হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। সেই সঙ্গে 'তখ্‌ত্‌-এ-তাউস'-এর সাফল্য স্মরণ করলে মনে হয় যে, আরো নাটক রচনা করলে তিনি এ বিভাগেও স্মরণীয় অবদান রেখে যেতেন।

আরো কিছু লেখা তাঁর ছিল, যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। "দক্ষিণে" শিরোনামায় তাঁর দক্ষিণ ভারতের একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায় চার সংখ্যায় ধারা-বাহিকভাবে বেরিয়েছিল। একটি ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁর অনুবাদ রচনা, আর একটি মাসিক পত্রিকায় কয়েক মাস ধ'রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাও সম্পূর্ণ করতে পারেন নি গুরুতর শারীরিক পীড়ার জন্যে। সে লেখাটি ছিল দিল্লীর মোগলদের বিষয়ে ইতালিয় গ্রন্থকার Mammeci-র পুস্তকের অনুবাদ। তা' ছাড়াও, ছোটদের জন্যে লেখা কয়েকটি গল্পাদি, সাধারণ সাহিত্যের আসরে 'নব্য-ভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর স্মৃতিকথা প্রভৃতি আরো কিছু রচনা তাঁর সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

'মহাস্থবির জাতক'-এর চতুর্থ খণ্ড তিনি আংশিক

লিখেছিলেন, শেষ বয়সের অসুস্থতার জন্যে সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তার কোন কোন অংশ মুখে মুখে বলে লেখাতেন, সেই রকম একাধিক রচনা তাঁর মৃত্যুর বছরে এবং তার দু' এক বছর আগে শারদীয় সংখ্যার পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, মহাস্থবির জাতক তাঁর শেষ গ্রন্থ। এই তিন খণ্ডের পর যে ক'টি পুস্তক তার প্রকাশ হয়, তা সবই পুরানো গ্রন্থের নতুন সংস্করণ কিংবা পূর্বে প্রকাশিত রচনার সংকলন। বোম্বাই থেকে ফিরে আসবার পর তাঁর 'স্বর্গের চাবি' আত্মপ্রকাশ করেছিল বটে, কিন্তু সাহিত্যরচনায় তেমন ভাবে তিনি নিমগ্ন হতে পারেন নি। তখনো তাঁর সঞ্চরণ ছিল সিনেমা জগতেই বেশি।

তাঁর শিল্পী মানসের যথার্থ সৃষ্টিক্ষেত্র সাহিত্যের আসরে গৌরবোজ্জল পুনরাবির্ভাব ঘটে যে 'মহাস্থবির জাতক' নিয়ে, তা রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু এক বাহ্যিক উপলক্ষ্যের ফলে। স্বয়ং শরৎচন্দ্র এই উপলক্ষ্য হয়েছিলেন। প্রেমাঙ্কুরের স্বকীয় প্রত্যেকটি লেখা যিনি সেই অতীতের 'ভারতী'-'যমুনার' যুগেও পাঠ করতেন, তাঁর সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জল বলে যাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, তাঁকে যিনি সাহিত্যকর্মের জন্যে অতি স্নেহের চক্ষে দেখতেন, সেই শরৎচন্দ্র একদিন তাঁকে তীব্র ভাষায় যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন সিনেমায় মেতে উঠে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়ে দেবার জন্যে। তাঁর প্রতিভার যোগ্য ক্ষেত্র সাহিত্য রচনা বন্ধ ক'রে তিনি নিজের চূড়ান্ত ক্ষতি করছেন, এই ধরনের মর্মান্তিক ভৎসনা তাঁকে করলেন অনেকের সমক্ষেই।

শরৎচন্দ্রের এই সুতীক্ষ্ণ অনুযোগের ফলে প্রকারান্তরে সাহিত্যে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা প্রেমাঙ্কুর মনের মধ্যে লাভ করলেন। লেখা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল না। বেশ কিছুদিন পরে, নিজেরই বর্ণচ্ছটাময় অতীতের অমৃত মন্থন ক'রে, সমগ্র জীবনের নির্যাসে সুরভিত করে লিখতে লাগলেন 'মহাস্থবির জাতক'। অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে লিখতে লাগলেন,জীবন-পাত্র থেকে কলমে কালি ভ'রে নিয়ে।

প্রথম খণ্ডটি সম্পূর্ণ করতেই দু'বছর লাগল। লিখেছেন, সংশোধন করেছেন, আবার নতুন করে লিখেছেন। শিল্পকর্ম হিসেবে যতদিন না মনের মতন হয়েছে, প্রকাশ করেননি "শতকরা নব্বই ভাগ সত্য" এই রচনা। দু'বছর ধরে লেখা প্রথম খণ্ড শেষ হবার পর, 'শনিবারের চিঠি' মাসিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বই আকারে দেখা দেয় তারও পরে। বাংলা সাহিত্যে 'মহাস্থবির জাতক' রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রেমাঙ্কুরের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় বহুকালের জন্যে।

শরৎচন্দ্র অবশ্য প্রেমাঙ্কুরের এই সার্থকতম সাহিত্য-প্রয়াস দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু প্রেমাঙ্কুর শেষ বয়সেও শরৎচন্দ্রের সেই সস্নেহ তিরস্কার এবং তার ফলে এক মহৎ প্রেরণা পাবার কথা উল্লেখ করতেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার সঙ্গে। তাঁর স্বভাবের এই এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নিজের সাহিত্যকৃতি নিয়ে কখনো অহমিকা প্রকাশ করতেন না। তাঁর লেখা পাঠ করে বিশেষ তৃপ্তি পাওয়া যায় একথা বললে তাঁর মুখ প্রসন্নতায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠত, এই পর্যন্ত। একদিকে অহঙ্কারের অভাব, অন্যদিকে নিজের সমস্ত দোষত্রুটি দুর্বলতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের দুর্লভ সরলতা প্রকাশ পেত। নিজের কোন গুণের কথা ফলাও করে গৌরব নেবার চেষ্টা করতেন না, সহজাত বিনয় বশত। তাঁর সাহিত্যে যেমন, ব্যক্তিচরিত্রেও অন্তরঙ্গ আন্তরিকতাতার গভীরে এক আশ্চর্য নিরাসক্ত মন প্রচ্ছন্ন ছিল। এই নিরাসক্তি নিয়ে কিন্তু তিনি জীবন ও জগৎকে দেখেছিলেন প্রাণ ভরে। তাই অতি স্থূল বাস্তবের মধ্যে তিনি জীবনে বহুবার অবগাহন করলেও পঙ্ক তাঁর অন্তরকে আবিল করতে পারে নি। পঙ্কজের মতন তিনি শুভ্র সুন্দরকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অমৃত সাহিত্যে।......

তাঁর অমর সৃষ্টি 'মহাস্থবির জাতক' তিনি লিখেছিলেন উত্তর কলকাতার সুকিয়া (বর্তমানে কৈলাস বসু) স্ট্রিট অঞ্চলে ২, রঘুনাথ চ্যাটার্জী লেনের বাসাবাড়ীতে। বোম্বাই থেকে ফিরে আসবার পরে এই বাড়ীতে তিনি ১২ বছর বাস করেন এবং এখানে তাঁর পত্নী ও প্রিয় কনিষ্ঠ জ্ঞানাঙ্কুরের মৃত্যু হয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত এ বাড়ীতে বাসের সময়ে ১৯৪৩ সালে তাঁর পত্নী পরলোকগতা হন এবং ১৯৫১ সালে প্রেমাঙ্কুর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এ্যাস্‌মা টাইপের ব্রঙ্কাইটিসে। পরে হাই ব্লাড প্রেসার দেখা দেয়।

১৯৫৩ সালে সেই নিঃসঙ্গ বাড়ী ছেড়ে চলে আসেন বিবেকানন্দ রোডের পাশে ৭এ চালতাবাগান লেনে, তাঁর দুই কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠার গৃহে। এখানেই তাঁর শেষ প্রায় ১১ বছর অতিবাহিত হয়েছিল। সে সময়ের মধ্যে সাহিত্যকর্ম নতুন করে প্রায় কিছুই করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। শেষ পরিচ্ছেদের ৭।৮ বছর একরকম শয্যাশায়ী ছিলেন। নিজের হাতে কিছু লিখতে পারতেন না, হাত কাঁপত। মুখে মুখে বলে কয়েকটি মাত্র রচনা এবং মহাস্থবিরের চতুর্থ খণ্ডের কিছু অংশ লেখা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত, পরিহাস-রসিক, বেশে বাসে ভাষণে উজ্জ্বল এবং চিত্তাকর্ষক সদালাপী। অবশেষে ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে সপ্তমী পূজার সকালে তাঁর যাযাবর জীবনের শান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

অনন্যা

শিলালি

এ কাহিনীর সমস্ত নাটকীয় ঘটনা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শিলং পাহাড়ের একটি ছোট প্রাইভেট হোটেলের সিটিং-রুমে। হোটেলটি অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। সামনে খানিকটা দূরে উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী—পাহাড়ের গায়ে ঘন পাইনের বন। পাইন বনে যখন হাওয়া খেলতে থাকে, একটা বেদনা-ভরা কান্নার আওয়াজ যেন ভেসে আসে হাওয়ার তরঙ্গে—সন্ধ্যেবেলায় হোটেলের বারান্দায় যাঁরা বসে থাকেন, হঠাৎ এই আওয়াজ কানে এলে ভয়ে শিউরে উঠে নিজেদের বাস্তব জীবনের কথা ক্ষণতরে ভুলে গিয়ে আত্মিকসত্তার সম্বন্ধেই যেন সচেতন হয়ে ওঠেন। এমনিতেই দার্জিলিংএ যেমন বাইরের জনতার ভিড়, শিলংএ তেমনটা কখনই দেখা যায় না। আমাদের দেশের হিল ষ্টেশনগুলোর ভিতর শিলং অপেক্ষাকৃত নির্জন এই 'সি গাল' হোটেলটি আবার যে জায়গায়, সে জায়গাটি আরও নির্জন।

ব্রিটিশ আমলে এই 'সি গাল' হোটেলের মালিক ছিলেন এক সাহেব। স্বাধীনতার পর এক বাঙ্গালী দম্পতি হোটেলটি কিনে নিয়ে এখানেই বসবাস এবং ব্যবসা চালাচ্ছেন। এঁরা নিঃসন্তান—বর্তমান মালিক অনাদি দত্ত সরকারী চাকরি থেকে রিটায়ার করবার পর শিলংএ বেড়াতে এসে জলের দামে হোটেলটি পেয়ে যান—ভাবলেন স্বাস্থ্যের পক্ষেও পাহাড়ে যায়গা ভাল, আর ঠিকভাবে হোটেলের ব্যবসা চালাতে পারলে, দু'পয়সা রোজগারও হবে—বেকার হয়ে বসে থেকে জমা টাকা খরচ করে সংসার চালাতে হবে না। এই সময়টাতেই ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যায়। হোটেলের পেছন দিকে একটি দু'কামরার কটেজে স্বামী-স্ত্রীতে থাকেন। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে স্ত্রী মৃন্ময়ীর কাছ থেকে অনেক রকমের সাহায্য পান অনাদিবাবু।

হোটেলের সিটিং রুমটি সাহেব মালিকের আমলেরই পুরণো আসবাবপত্রে সাজানো। ঘরটির পেছন দিকে কয়েকটি ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো—তারপরেই বিস্তৃত লন—লনের পর রাস্তা। জানলার ওপারে কেউ এসে দাঁড়ালেই ঘর থেকে তাকে পরিষ্কার দেখা যাবে। ঘরের পেছনের বাঁ দিকে ফায়ার প্লেস। তারপরেই একটি দরজা। এর মাঝের জায়গায় একটি বড় সাইজের আয়না—ঘরের ফার্ণিচার বলতে কয়েকটি কাউচ, সোফা, এবং ছোট ছোট টেবিল। বিকেলে অনেক সময়েই বোর্ডাররা এই ঘরে বসে চা পান করেন। ডানদিকে একটি বুককেস। এ কাহিনীর সুরু হচ্ছে শীতকালের এক বিকেলে। শীতের সময় বলেই শিলংএ এখন লোকজন কম। সিটিং রুমের একটা কাউচে হেলান দিয়ে বসে মিস সুরমা মল্লিক আগাথা ক্রিষ্টির একটা বই খুব মনোনিবেশ সহকারে পড়ছিলেন। মিস মল্লিক রিটায়ার্ড হেড মিসট্রেস—বয়স ৪৭।৪৮। অবসর নেবার পর থেকেই তিনি নানাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, স্কুলে থাকতে তিনি ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। কর্মজীবনে বাধ্য হয়েই তাঁকে ইতিহাসের চর্চা করতে হ'ত বটে, তবে একমাত্র ডিটেকটিভ বই পড়েই তিনি সত্যিকার আনন্দ পেতেন। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট বা নেপোলিয়নের থেকে শারলাক হোমসকে তিনি অনেক বেশী প্রতিভাবান ব্যক্তি মনে করতেন। হোমসকে তিনি পৃথিবীর সবকালের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন বটে, তবে হারকিউল পয়রোকে অন্তর থেকে ভালবাসতেন। হোমস্ যেন স্বর্গের দেবতা কিন্তু পয়রো মর্তের মানুষ—সুতরাং আমাদের ধরা-ছোঁয়ার নাগালের ভেতর।

ক্রিষ্টির 'মিষ্টিরিয়াস এ্যাফেয়ার এ্যাট ষ্টাইলস্' বইটা সপ্তমবার রি-রিড করছিলেন মিস মল্লিক—অনেকক্ষণ ধরে একটানা পড়েছেন। বইটা বন্ধ করে মনে মনে ভাবছিলেন সুরমা—ভাবছিলেন, কি অদ্ভুত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, কি চমৎকার ভাবে চরিত্রগুলো পরিস্ফুটিত হয়েছে, আর আগাথা ক্রিষ্টির ইংরাজী লেখার ষ্টাইলেরও তুলনা হয় না। আচ্ছা এই মিষ্টিটা সলভ করার কাজে যদি হোমস্ আর পয়রো একযোগে কাজ করতেন? তা হ'লে প্রব্লেমটার আরও কত সহজে সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়ল—ঘরে ঢুকলেন অনাদিবাবু, হোটেলের মালিক। অনাদিবাবুই বইটা সুরমা দেবীকে পড়তে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে বইটা মিস মল্লিক?'

—'বইটা বহু আগেই আরও কয়েকবার পড়েছি—তবু ভাল লাগছে।'

'জেমস বণ্ডের একটা বই আছে—এরপর আপনাকে দেব।'

"ফ্লেমিংএর লেখা আমার ভাল লাগে না। বরং ক্রিষ্টির অন্য কোন বই থাকলে দেবেন। বণ্ডের বই কিন্তু খুব পপুলার।'

'আমি কোন রস পাই না—খালি মারামারি, গুণ্ডামি আর রাহাজানি—আমেরিকান ষ্টাইলের লেখা।'

'আচ্ছা, আমি খুঁজে দেখব—ক্রিষ্টির কোন বই থাকলে আপনাকে দিয়ে যাব। হ্যাঁ, আপনার চা কি এখন আনতে বলব মিস মল্লিক?'

'মিস সেন কোথায় মিঃ দত্ত?'

'উনি ঘরেই আছেন। কিছুক্ষণ আগে আমাকে ফোনে বললেন একটু বাদে সিটিং রুমে এসে চা খাবেন।'

তা হ'লে আমিও অপেক্ষা করি। মিস সেন এলে একসঙ্গেই বসে চা খাওয়া যাবে। তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি।'

'তবে আপনার যদি অন্য কোন কাজ থাকে তা হ'লে এখুনি কিন্তু আপনাকে চা দিয়ে যেতে পারে।'

সুরমা মল্লিক হেসে উঠে বললেন 'এখানে কি কাজ করতে এসেছি মিঃ দত্ত? খাচ্ছি, বই পড়ছি, বিশ্রাম করছি, আর বসে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছি।' অনাদিবাবুও এবার হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'আমিও একটু আগে বসে বসে ঝিমোচ্ছিলাম—একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখলাম খানিকক্ষণ।'

'কি রকম?'

জানেন মিস মল্লিক, চাকরির জীবনে এক সময় লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করতাম। স্বপ্ন দেখছিলাম যেন সকালে ফিনসবেরী পার্কের বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা রেস্তোরাঁতে চা, স্যাণ্ডউইচ দিয়ে ব্রেকফাষ্ট সারলাম, তারপর বাসে রওনা হলাম—ক্যামডেন টাউনের বাড়ীঘর চোখের উপর ভাসতে লাগল—বাস এসে পড়ল টটেনহাম কোর্ট রোডের উপর—একটু এগোতেই সামনে ওডিয়ান সিনেমা হাউস। রাস্তায় কত লোকজন চলছে—সাহেব-মেমের দল এত জোরে হাঁটছে যে দেখলে মনে হবে এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেলে ওদের সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। বাসটা চলতে চলতে হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকানি খেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুমও গেল ভেঙে—কোথায় লণ্ডন! দেখলাম দার্জিলিংএর হোটেলে নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছি।'

সুরমা দেবী এই অদ্ভুত স্বপ্নের গল্প শুনে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। নিজের মনেই আবার ভাবলেন চাকরির জীবনে, হঠাৎ যখন তিনি হেড মিসট্রেস ছিলেন, এমন খিলখোলা হাসি তাঁকে হাসতে দেখলে অন্যান্য শিক্ষিকারা বোধ হয় ভয়ে ভিরমি খেত আর ভাবত হেড মিসট্রেস পাগল হয়ে গেছেন। স্কুলের চাকরির জীবনে তাঁকে কেউ কখনও হাসতে দেখে নি। তিনি এমন রাশভারী ছিলেন যে, ছাত্রীরা ত দূরের কথা, অন্যান্য শিক্ষিকারা পর্যন্ত সহজে তাঁর সামনে আসতে সাহস পেত না। যাই হোক নিজেকে সামলে নিয়ে সুরমা মল্লিক বলতে লাগলেন: 'জানেন মিঃ দত্ত, আমি আবার এমন অনেক জায়গা সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখি, যেখানে আগে কখনও যাই নি। খুব স্পষ্টভাবেই এসব জায়গার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, লোকজনের যাতায়াত চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘুমন্ত অবস্থায়—কি করে যে এটা সম্ভব হয় বুঝি না।'

'স্বপ্নের ব্যাপারে সবই সম্ভব'—মন্তব্য করেন অনাদি দত্ত।

'ঠিক বলেছেন—স্বপ্নের ব্যাপারে সবই সম্ভব। এমন কি অনেক সময়ে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলে এইসব স্বপ্ন'—অন্যমনস্ক এবং আত্মমগ্ন ভাবে জবাব দেন সুরমা মল্লিক।

'কি রকম?'

এ প্রশ্নে সচেতন হয়ে যান সুরমাদেবী। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলতে থাকেন—'আগে থেকেই স্বপ্নে দু'চারটা জায়গা খুব স্পষ্টভাবে দেখার পর, যখন পরে সত্যি সত্যিই ওসব জায়গায় গিয়েছি, এক এক সময় আমার স্বপ্নের সঙ্গে জায়গাগুলোরও অদ্ভুত মিল দেখেছি।'

'বলেন কি? খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। তা হ'লে আপনাকে বলতে আর বাধা নেই মিস মল্লিক। আমার স্ত্রী কিন্তু স্বপ্ন দেখা বিষয়ে একেবারে এক্সপার্ট। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনার কোনো হয় কথা নি?'

'না, মিসেস দত্ত ত আমাকে কিছু বলেন নি।

জানেন মিস মল্লিক, আমাদের সম্পর্কীয় কারোর কোন বিপদের সম্ভাবনা হলে আমার স্ত্রী আগেই সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত পান।'

'বলেন কি, অনাদিবাবু!'

'আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন মিসেস মল্লিক, কোন বিপদ ঘটবার আগে মিসেস দত্ত একই ধরনের একটি বিশেষ স্বপ্ন দেখেন।'

'কি রকম?

এইবার ক্রমশঃ বিকেলের আলো কমে আসাতে সামনের পাহাড়ের উপর একটা কৃষ্ণ আবরণের আচ্ছাদন এসে পড়েছিল—আবছা আবছা ভাবে পাহাড়ের গাছগুলোকে এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছিল অশরীরী কতকগুলো জীব এক রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন অনাদি দত্ত। তারপর সুরু করলেন :

"ঐ যে সামনে পাহাড়টা দেখছেন মিস মল্লিক, ওখানে রয়েছে একটা গভীর বন, বহুদূর অবধি বিস্তৃত। আমার স্ত্রী এই একই স্বপ্ন দেখেন বারবার। উনি যেন কি ভাবে গভীর রাত্রে ঐ বনের ভেতর গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। যত এগিয়ে চলেছেন বন আরও ঘন, আরও অন্ধকার হয়ে উঠছে—কখনও সে লোকালয়ে ফিরে আসতে পারবেন সে আশাও আর নেই। নিজেকে এত অসহায় মনে হয় যে, দুঃখে তাঁর চোখে জল এসে যায়। অনেক সময় শিশুর মত ঘুমের ভেতরই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠাতে সেই শব্দে আমি জেগে উঠেছি—আমিই তখন ধাক্কা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। আর এই ধরনের স্বপ্ন দেখবার পরই কি ভয়াবহ ব্যাপার মিষ্টার দত্ত—এর পরেই বুঝি বিপদ-আপদ ঘটে।'

সিগারেটের আর একটা টান দিয়ে অনাদি দত্ত উত্তর দেন, 'ঠিক তাই। মৃন্ময়ী যখনই বলেন—শুনেছ! কাল আবার স্বপ্নে বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তার মানে বুঝছ? দু'একদিনের মধ্যেই এখানে বিপদ ঘটবে। হয়ত তাই। প্রতিবারেই কোন না বিপদ ঘটে।'

'কি সর্বনেশে কাণ্ড। মুচকি হেসে একটু ঠাট্টার ছলেই সুরমা দেবী বলেন, আমি আসবার পর এ ধরনের কোন স্বপ্ন মিসেস দত্ত দেখেন নি ত অনাদিবাবু?' মিঃ দত্ত মিস মল্লিকের এই হাল্কাভাবে কথা বলার ধরনটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গম্ভীর গলায় জবাব দেন—'কাল রাত্রি অবধি দেখেন নি বটে……'

যাক্ হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। সুরমা মল্লিক বুঝতে পারলেন অনাদি দত্ত তাঁর বলার ভঙ্গিটা পছন্দ করেন নি। তাই এবার যথাসম্ভব গম্ভীর ভাবেই উত্তর দেন—"দেখুন অনাদিবাবু, আমিও আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে একটু আগেই বললাম। তবে আমার মনে হয় এই সব অদ্ভুত ঘটনার পেছনে অনেক সময়েই একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন আছে যেগুলো জানি না বলেই আমরা ওসব ব্যাপারকে অঘটন আজও ঘটে মনে করে আনন্দ পাই। কিছু কিছু সময় শিয়ার কো-ইন্সিডেন্সের জন্যই অনেক ব্যাপারকে সুপারন্যাচারল বলে মনে হয়—যেমন আপনার স্ত্রীর স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা। নিজে আমি ঠিক অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করতে চাই না। কিন্তু আপনার কথাবার্তার ধরনে মনে হচ্ছে আপনি এসব ব্যাপারে বিশ্বাস করেন।'

আমারও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না মিস মল্লিক—কিন্তু যখন দেখি বারবার একই ব্যাপার ঘটছে তখন ঠিক হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখে সুরমা দেবী এবার প্রশ্ন করলেন—"আপনি বললেন কাল রাত্রি অবধি মিসেস দত্ত ঐ স্বপ্নটি দেখেন নি… "

'কিন্তু আজ দুপুরে যখন ঘুমোচ্ছিলেন "

হেসে উঠলেন সুরমা মল্লিক। তারপর বললেন—তা হ'লে আমারই ওপর দিয়ে কি এবার বিপদ ঘটবে অনাদিবাবু?'

'হাসবেন না মিস মল্লিক যখন-তখন যে কারোর ওপর দিয়েই বিপদ ঘটতে পারে। আপনাকে আগেই বলেছি অলৌকিক ব্যাপারে আমিও সহজে বিশ্বাস করতে চাই না। তবে জীবনে এমন সব ঘটনা এক এক সময়ে ঘটতে দেখেছি যাকে ঠিক হেলায় অগ্রাহ্য করা যায় না। আমার নিজের একটি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কথা বলছি—ব্যাপারটা আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছি না, কিন্তু সত্যই এটা ঘটেছিল আমারই চোখের ওপর। এটাকে ঠিক কো-ইন্সিডেন্স বলে মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারি নি আজও পর্যন্ত।'

'বেশ ত, বলুন না মিষ্টার দত্ত।'

'মিস মল্লিক, ঘটনাটা ঘটে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়। আমার বয়স তখন ষোল, সতের। আমার বাবার পরিচিত অনাদি গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোকের কাছে কাজ শিখতাম। মিষ্টার গুপ্ত ছিলেন মনেপ্রাণে সাহেব—যুদ্ধের বাজারে গভর্ণমেণ্টকে নানা রকম মাল সাপ্লাই করে তিনি প্রচুর পয়সা করে ফেলেছিলেন—থাকতেনও সাহেবী ষ্টাইলে—বিরাট বাড়ী, দু'টি দামী গাড়ি, কিন্তু গরীবদের প্রতি তাঁর দয়ামায়া ছিল না। রাস্তায় কেউ ভিক্ষে চাইতে এলে যা তা বলে হাঁকিয়ে দিতেন। গুপ্ত সাহেবের বিশ্বাস ছিল এরা খেটে খেতে চায় না বলেই সমাজের পরগাছা হয়ে এদের জীবনধারণ করতে হয়। নিজের পরিশ্রমে দরিদ্র অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন বলে তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল পরিশ্রম আর মেহনত করলে সবাই অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারে। গুপ্তসাহেব আমাকে বড় ভালবাসতেন—অফিসের পরও গাড়িতে আমাকে নিয়ে

অনেক জায়গায় ঘুরতেন—নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ইচ্ছা ছিল শিখিয়ে-পড়িয়ে আমাকে তাঁর যোগ্য সাকরেদ গড়ে তুলবেন।' আর একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন অনাদি দত্ত। তারপর ফের সুরু করলেন :

'একদিন বিকেলে অফিস থেকে বের হবার সময় আমাকে ডেকে নিলেন গাড়িতে—ড্রাইভারকে বললেন হাওড়া ষ্টেশনে যেতে। ওখানে গিয়ে তাঁর এক বন্ধু সরকারের এক বড় চাকুরে সাহেবকে সি-অফ্ করলেন। ষ্টেশনের রেস্তোরাঁতে চা-পর্ব শেষ করে আমরা গাড়িতে এসে উঠলাম। এমন সময় কোথা থেকে এক ভিখিরী মহিলা এসে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইল। গাড়িটা তখনও ষ্টার্ট দেয় নি—মহিলা গাড়ির ভেতর হাত বাড়িয়ে দেওয়াতে গুপ্তসাহেবের জামায় এসে তার হাতটা স্পর্শ করেছিল। ঘৃণায় শিউরে উঠলেন গুপ্তসাহেব—এক ধমক দিয়ে বললেন—যত সব চরিত্রহীন বদমাস স্ত্রীলোক, সতীত্ব বিক্রী করে পয়সা রোজগার করছে, তার উপর আবার ভিক্ষে চাওয়া···আপনাকে বলব কি মিস মল্লিক, আজও সে দৃশ্য আমার চোখের কাছে এতটুকু অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। গুপ্তসাহেবের কথা শুনে মেয়েটি এক মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল—মনে হতে লাগল যেন বিষধর সাপ আঘাত পেয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে। তার চোখমুখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছিল—গুপ্তসাহেবকে উদ্দেশ করে বললে দু'পয়সার মালিক হয়ে তুই এতবড় পাপের কথা আমাকে বললি—আমি যদি সতী হই কাল রাত্রির ভেতরই তোকে যমে নেবে। গাড়ি ততক্ষণে ষ্টার্ট দিয়েছিল—এই পরিবেশ থেকে সরে যাবার জন্ত ড্রাইভারকে বললাম, চল'।

'তারপর ?'

'আজও এ ব্যাপারটার ভেতর কোন কার্যকারণ খুঁজে পাই না মিস মল্লিক। পরদিন সকালে গুপ্তসাহেব অফিসে এলেন না, অথচ সাধারণতঃ দশটার আগেই সবার আগে তিনি এসে যান। বারটার সময় তাঁর বাড়ী থেকে ফোন এল যে গুপ্তসাহেব মারাত্মক রকম অসুস্থ—তখুনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। শুনলাম অফিসে বেরোবার সময় অসুস্থ বোধ করেন—তার কিছু পরেই অজ্ঞান হয়ে যান। দু'তিনজন বড় ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়—সারাদিন যমে মানুষে যুদ্ধ চলল—সন্ধ্যার দিকে গুপ্তসাহেব শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।'

'হার্ট ফেল হয়েছিল আর কি'—বললেন সুরমা দেবী।

'কিন্তু এর দিন পনের আগে ডাক্তারকে দিয়ে সব বিষয়ে চেক্-আপ করিয়েছিলেন গুপ্তসাহেব। ডাক্তারের মতে তখন তাঁর ব্লাডপ্রেসার ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।' দু'জনেই এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ করে রইলেন—তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিস মল্লিক বললেন 'আপনার স্ত্রীর ধারণা কারোর কোনো বিপদ ঘটবে। ওঁর কি বিশেষভাবে এবার কারও সম্বন্ধে ভয় হচ্ছে অনাদিবাবু ?' সরাসরি এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না অনাদি দত্ত। বললেন—'আপনার ওপর কোন বিপদ আসবে না। আপনার সম্বন্ধে মৃন্ময়ী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। তবে ?'

কিছু মনে করবেন না মিস মল্লিক। আমার হোটেলের ব্যবসা—যে যখন আসুন তাতে আমারই লাভ—পয়সা আসবে। কিন্তু কৌতূহল হয় বলেই জিজ্ঞেস করছি—মিস সুজাতা সেন এই অফ সিজনে এখানে কেন এসেছেন বলতে পারেন ?''

সুরমা দেবী হেসে বললেন—''আমিও তো অফ সিজনেই এসেছি মিঃ দত্ত।''

"আপনার কথা আলাদা মিস মল্লিক। আপনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। এ ধরণের নির্জনতা আপনার ভাল লাগবে এ ত অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। কিন্তু ওঁর বয়সের মেয়েদের—ত' ছাড়া আমার স্ত্রী বলছিলেন মিস সেনের মুখে সব সময়েই কেমন একটা বিষাদের ছাপ দেখা যায়—যেন কখন কি বিপদ ঘটবে ভেবে উনি আগে থেকেই সন্ত্রস্ত। তারপর আজ দুপুরে ঐ স্বপ্ন দেখবার পর থেকেই মৃন্ময়ী ভয়ানক চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। ঐ যে মিস সেন আসছেন—এবার আপনাদের চা আনতে বলি।"

অনাদি দত্ত উঠে গিয়ে একধারে টেবিলের উপর রাখা টেলিফোন বক্সের নবটা ঘুরিয়ে প্যান্ট্রির সঙ্গে কানেক্ট করলেন। তারপর টেলিফোনে কথা বলতে লাগলেন 'কে, ইব্রাহিম ? হ্যাঁ, সিটিং-রুমে মিস মল্লিক আর মিস সেনের চা পাঠিয়ে দেও। আজ সকালে মিসেস গিবসনের ওখান থেকে আনা পেষ্ট্রি আর কেক সঙ্গে করে আনবে। দেরি কোরো না কিন্তু।'

কথা শেষ করে অনাদি দত্ত টেলিফোন রেখে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন মিস সুজাতা সেন।

সুজাতা সেনের বয়স বছর পঁচিশ, ছাব্বিশ—গায়ের রং বেশ ফর্সাই বলা চলে, টানা টানা চোখ, দৃষ্টিতে একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। উনি ঘরে আসবামাত্রই অনাদিবাবু বললেন, 'আপনার চা পাঠিয়ে দিতে বলেছি মিস সেন। মিস মল্লিকও আপনার সঙ্গে বসে চা খাবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন।'

মিস সেন এ কথা শুনে লজ্জা পেয়ে বললেন, তা হ'লে আমায় ডেকে পাঠালেন না কেন মিস মল্লিক? মিছিমিছি আমার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আপনার দেরি হয়ে গেল—আমি সত্যিই লজ্জিত বোধ করছি।'

'না, না, এতে লজ্জা পাবার কি আছে। এক সময়ে খেলেই হ'ল। কিন্তু আপনাকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন, মিস সেন? আপনার চোখে-মুখে যেন একটা ভয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। আবার কি......'

"হ্যাঁ, মিস মল্লিক। এই একটু আগে আবার তাকে দেখতে পেয়েছি "

উদ্বেগভরা কণ্ঠে অনাদিবাবু জিজ্ঞেস করলেন: "আবার সেই ছাই রং-এর গাউনপরা বুড়ী মেমসাহেবকে দেখতে পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

'কোথায় দেখলেন?' প্রশ্ন করলেন সুরমা মল্লিক। 'চা খেতে আসবার আগে পোশাকটা বদলিয়ে নিচ্ছিলাম। জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাগানের ধারে সেই মেমসাহেবটি দাঁড়িয়ে আছেন।' এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনাদিবাবুর দিকে চেয়ে সুরমা দেবী বললেন: এ ব্যাপারটা কি অনাদিবাবু? অনাদিবাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন। আবার সুজাতা সেনই বললেন: এখানে এসে কয়েকবারই ছাই রংয়ের পোশাক পরা ঐ বুড়ীকে হোটেলের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—মুখে তার স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। অনাদিবাবুকেও এ কথা বলেছি—আমার মনে হয় উনিও ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। কি বলেন অনাদিবাবু?

অনাদিবাবু কিছু বলার আগেই মিস মল্লিক প্রশ্ন করলেন: 'আপনি নিজেও বুঝি মেমসাহেবকে দেখেছেন অনাদিবাবু?' একটু ইতস্ততঃ করে অনাদিবাবু উত্তর দিলেন: 'না, আমি নিজে দেখি নি। মাস কয়েক আগে আমার ছোট বোন লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েকদিনের জন্য এখানে এসেছিল। সে নাকি কয়েকবার ঐ ছাই রংয়ের পোশাক পরা বুড়ীকে হোটেলের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।' এতক্ষণে বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলের উপর রাখল। মিস মল্লিক বললেন, 'আমিই চা-টা তৈরী করি—আপনাকে কতটা চিনি দেব মিস সেন?'

'এক চামচ।'

চা ঢেলে চিনি দুধ দিয়ে এক কাপ সুজাতার দিকে এগিয়ে দিলেন সুরমা মল্লিক এবং নিজের কাপে চুমুক দিয়ে আবার আগের কথায় ফিরে এলেন—

'এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার অনাদিবাবু। আপনার বোন কয়েকবারই ঐ অশরীরী মেমসাহেবকে বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন?' অনেকটা আত্মমগ্নভাবেই সুজাতা বলে উঠলেন, এই ধরনের নির্জন পরিবেশেই—অর্থাৎ যে সব জায়গায় মানুষের উপর প্রকৃতির প্রাধান্য তথাকথিত অশরীরী আত্মাদের আবির্ভূত হতে দেখা যায়।' সুরমা মল্লিক একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই আড়চোখে একবার সুজাতা সেনের দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়ত মনে মনে ভাবলেন এই সব আধুনিক মেয়েরা উচ্চশিক্ষিতা, বিলেত-ফেরতা অথচ কি সুপারষ্টিসাস্।'

অনাদিবাবু এতক্ষণে কথা বললেন: ঠিকই বলেছেন মিস সেন। কোন জনবহুল বড় সহরে সচরাচর স্পিরিটের আবির্ভাব হয় না। সুরমা মল্লিক বাইরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা, ঐ ছাই রংএর পোষাক-পরা মেমসাহেব ছাড়া অন্য কারোকে কি দেখা যায় নি?

আমি আরও কয়েকজনকে দেখেছি, তবে তাদের চেহারা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে নি—বললেন সুজাতা সেন

সুরমা মল্লিক এতটা আশা করেন নি। বড্ড ছেলেমানুষী এবং বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন মিস সেন। তাই মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, কিন্তু এসব ভৌতিক ব্যাপারে আমার ঠিক বিশ্বাস আসে না। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য হবার আরও কিছুটা বাকী ছিল, কারণ সুজাতা সেন এবার বললেন, বিশ্বাস আমিও করি না।' মিস সেনের এই জবাব শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন সুরমা দেবী। অবাক হয়ে বললেন, অশরীরী আত্মাদের আপনি দেখতে পান—যেমন এই একটু আগেই দেখতে পেয়েছেন ছাই রংএর পোষাকপরা মেমসাহেবটিকে?

দেখেছি বটে, কিন্তু সে ঠিক তার প্রেতাত্মা নয়, আমার মনে হয় অশরীরী আত্মারা জীবিতকালে তাদের পারিপার্শ্বিকের উপর ইমপ্রেশন বা দেহের ছাপ রেখে যান—যেমন বালির উপর পায়ের ছাপ পড়ে বা কাঁচের গ্লাসের গায়ে আঙুলের ছাপ। অনুভূতির তীব্রতার উপরই ইমপ্রেসন-এর গভীরত্ব নির্ভর করে। সুজাতা সেনের বলবার ভঙ্গিটা এমন কন্‌ভিন্‌সিং ছিল যে, সুরমা দেবী মুহূর্তের জন্য একটু হকচকিয়ে গেলেন। যাই হোক তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদুস্বরে মন্তব্য করলেন, 'You are a most unusual kind of girl, Miss Sen.' না, তা ঠিক নয়—আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই জগতে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা নিশ্চয় ঘটে, যাকে ঠিক হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার এমন অপ্রাকৃত

ব্যাপারের কথা শোনা যায় একটু তলিয়ে দেখলেই সেগুলোর একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। কথা শেষ করে সুজাতা সেন অনাদিবাবুকে প্রশ্ন করলেন :

'আচ্ছা, অনাদিবাবু, আমি যে ভাবে সুপারন্যাচারেল এ্যাপিয়ারেন্সের ব্যাখ্যা করলাম সেটা কি আপনার অবিশ্বাস্য মনে হ'ল ?'

অনাদিবাবু বললেন—'দেখুন মিস সেন, আমি নিজের চোখে কখনও কোন সুপারন্যাচারেল ঘটনা দেখি নি। অন্যের কাছে অনেক কথা শুনেছি না বিশ্বাসযোগ্য না হলেও যারা সে কথা বলেছেন তাঁদের আমি সত্যবাদী বলেই জানি। আর এই সব ভৌতিক কাণ্ড-কারখানার ফলে এক এক সময় যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতিও ছ' একজনকে ভোগ করতে হয়। ধরুন না, আজ যদি এখানে রটে যায় যে আমার এই হোটেলে ভৌতিক আবির্ভাব ঘটে তা হ'লে কেউ আর সহজে এখানে এসে উঠবে না। আপনাদের যেদিন সময় থাকবে আমার এক বন্ধুর এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলব।'

'বেশ ত আজই বলুন না'—বললেন সুরমা মল্লিক। মিস সেনও অনুরোধ জানালেন তখনি সে কাহিনী বলবার জন্য।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েকদিন বাদে—সুরু করলেন অনাদিবাবু—'আমার এক বন্ধু, ইনি যুদ্ধের সময় আর্মির ডাক্তার ছিলেন—চাকরি থেকে রিটায়ার করে একটি নার্সিং হোম খুলবেন ঠিক করলেন। লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর একটা বড় বাড়ী ভাড়া নেওয়া হ'ল এই উদ্দেশ্যে বন্ধুর ডক্টর নিরোদ ঘোষের সংসার বলতে তিনি আর তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবী—তাঁদের সন্তান সন্ততি ছিল না। নার্সিং হোমেরই একটা উইংসে এঁরা থাকতেন। বাড়ীটা নিয়ে প্রথমে ভালভাবে রিপেয়ার্স সুরু হ'ল—তখনও পেসেণ্ট ভর্তি করা হয় নি। বাড়ীটার সামনে একটু বাগানের মত ছিল—নীরোদ এবং তার এক বন্ধু একদিন বিকেলে এই বাগানে বসে চা খাচ্ছলেন—এই বন্ধুটি একটু-আধটু অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। নীরোদ মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করছিলেন যে বন্ধুটি থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে স্থির দৃষ্টিতে বাড়ীটির দোতলার দিকে কি দেখছিলেন। এবার নীরোদ জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি বল ত, উপরের দিকে কি দেখছ ? বন্ধুটি একটু চমকে উঠলেন, তারপর বললেন—তুমি ভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস কর ? নীরোদ হেসে জবাব দিলেন, দেখ, আমার পেশা হচ্ছে ডাক্তারী—সুতরাং যে ব্যাপারের পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তাকে ত আমরা এ্যাকসেপ্ট করতে পারি না।

বন্ধুটি জবাব দিলেন—এ্যাকসেপ্ট 'আমি তোমাকে করতে বলছি না। তবে এ সব ব্যাপার নিয়ে আমি খানিকটা চর্চা করেছি এ কথা ত তুমি জান—আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ীটা হনটেড হাউস। বন্ধু হিসাবে অনুরোধ করছি তুমি একটা স্বস্ত্যয়ন করবার ব্যবস্থা কর। আর এতে ত তোমার কোন ক্ষতি নেই। নীরোদ উত্তরে হেসে উঠে বললেন, দেখ, বিশ্বাস করি না বটে—তবে ওসব ক্রিয়াকর্ম করতে আমার সত্যিই কোন আপত্তি নেই। এই সামান্য প্রিভেনটিভ মেজার নিয়ে ভূত-প্রেতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় তবে সেটা গ্রহণ করতে আমি কোনদিনই আপত্তি করি না। সত্যি সত্যিই একজন শাস্ত্রজ্ঞের থেকে বিধান নিয়ে ভালভাবে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে নার্সিং হোমের দ্বারোদ্ঘাটন করা হ'ল।'

এই পর্যন্ত বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দিয়ে আবার অনাদি দত্ত বলতে সুরু করলেন—

'হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, নীরোদ এবং তার স্ত্রীর এই সময় একটা বাতিক হয়ে গিয়েছিল প্ল্যানচেটে বসবার। এ ব্যাপারে সে যে বিশ্বাস করত তা নয়, তবে বেশ মজা লাগত তথাকথিত আত্মাদের আবির্ভাব ঘটিয়ে।

যাই হোক কয়েক মাস যায়—আস্তে আস্তে ছ' চারটি করে রুগীও নার্সিং হোমে আসছে। এই সময় দিন চারেকের জন্য নীরোদের এক পাঞ্জাবী ডাক্তার বন্ধু এল অমৃতসর থেকে এক রুগীকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য। তাকে ত এই নার্সিং হোমে ভর্তি করা হ'ল—নীরোদ বন্ধু ইকবাল সিংকে বললে যথেষ্ট ঘর খালি আছে, তুমিও এখানেই থেকে যাও এ ক'দিন। ব্যবস্থা করা হল দোতলার বাঁদিকের শেষ রুমটিতে ডক্টর সিং থাকবেন। ছ' তিন দিন কাটল—একদিন প্রায় সন্ধ্যের সময় ডক্টর সিং নীরোদের বসবার ঘরে এসে হাজির—ভদ্রলোকের মুখে-চোখে আতঙ্কের ভাব। নীরোদ জিজ্ঞেস করলে কি ব্যাপার সিং ? ডক্টর সিং একবার চারদিকটা দেখে নিলেন—না, কাছাকাছি কেউ নেই। তখন বললেন, ঘোষ, তুমি হয়ত আমার কথা শুনে হাসবে, কিন্তু তবু না বলে পারছি না। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি, হঠাৎ দেখি দরজার সামনে একজন এংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার পরণে গোলাপী রংএর গাউন, ছ'চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে—আমাকে যেন

পারলে ভস্ম করে দেবে। উঠে দাঁড়াতেই মূর্তিটি মিলিয়ে গেল—হাঁ, মেয়েটার বাঁ দিকের ঠোঁটের তলায় একটা কাল জড়ুল ছিল। নীরোদ এ নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা করল সিংকে—পাঞ্জাব থেকে এতদূরে এসে এই বয়সে শেষকালে তোমার কাঁধে এংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে চাপল সিং। সিং কিন্তু ঠাট্টায় কান দিলেন না—ও ঘরে আর তিনি কিছুতেই থাকতে রাজী হলেন না। এর পরেও দু'একজন ওই একই দৃশ্য দেখলেন ঐ ঘরে। আর আশ্চর্যের কথা এই প্রত্যেকের বর্ণনা ঠিক একই রকম—গোলাপী রং-এর গাউন পরে এংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি এসে দাঁড়ায়—বাঁ দিকের ঠোঁটের তলায় একটা কাল জড়ুল—আর তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরতে থাকে। নীরোদ পড়ল মহা মুস্কিলে, একবার যদি ভূতের বাড়ী হিসাবে নাম বেরিয়ে যায় তা হ'লে কেউ আর নার্সিং-হোমে আসতে চাইবে না।'

সুরমা দেবী প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, ডক্টর ঘোষ বা তাঁর স্ত্রী নিজেরা এ দৃশ্য দেখেছিলেন?' অনাদিবাবু বললেন—'না, মেমসাহেবকে তারা দেখে নি। কিন্তু এর পরেই তারা আরও এক বিপদের সম্মুখীন হ'ল।

সুরমা দেবী এবং সুজাতা সেন একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম!'

নীরোদ আমাকে বলেছিল—'দেখ দত্ত, এর দু'চারদিন পর থেকেই এক ভয়ানক বিপদে পড়লাম। সব সময়েই মনে হয় কে যেন সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে—তাকে চোখে দেখতে পাই না অথচ তার অস্তিত্ব অনুভব করি। ললিতাকেও একথা বলতে মনে মনে লজ্জা পাই অথচ আমি এ কথা আগে জানতে পারি নি যে ললিতারও ঠিক এই ধরনেরই অনুভূতি হচ্ছে ক'দিন থেকে। শেষে সেই একদিন সঙ্কোচ কাটিয়ে তার অনুভূতির কথাটা আমাকে জানাল—আমিও এবার তার কাছে আমার মনের কথা বললাম—প্রথমেই দু'জনে প্রাণভরে খানিকটা হেসে নিলাম। যাক্, মনটা ত খানিকটা হাল্কা হ'ল—কিন্তু এভাবে বেশীদিন চললে ব্যবসা ত লাটে উঠবে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল—কিছুদিন আগে আমার বড় মামা মারা গিয়েছিলেন। ভাবলাম তাঁর আত্মাকে প্ল্যানচেটে এনে তাঁর উপদেশ নিলে হয়। বড় মামার আত্মাকে ত আনা গেল—তিনি প্রথমেই বললেন, এভাবে আমাদের ডেকে এনো না—আমাদের পৃথিবীতে আসতে বড় কষ্ট হয়। তাঁকে সব ব্যাপারটা বলা হ'ল—একটু বাদে তিনি লেখার ভেতর দিয়ে জানালেন যুদ্ধের সময় এ বাড়ীটা এখেল হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত এবং এখানে বেশীর ভাগই আসত আর্মির লোকেরা। এ এংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে এ বাড়ীর দোতলার ঘরে কে বা কারা এক রাত্রে খুন করে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই তার আত্মা ঐ ঘরটিতে হণ্ট করে। বড় মামাকে অনুরোধ করা হ'ল এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে, তিনি জানালেন তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। সব থেকে আশ্চর্য কথা, ঐ মৃত মেমটিকে আর কখনও দেখা যায় নি। বড় মামার কথামত আমরাও প্ল্যানচেট করা ছেড়ে দিলাম। এতটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরও ব্যাপারটাকে আমি বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি নি দত্ত।

"সত্যিই বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না', বললেন সুরমা মল্লিক।

"কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল—আপনাদের আর চা বা কেক দিতে বলব?"

দুজনেই একসঙ্গে অসম্মতি জানালেন।

'আচ্ছা, আমি তা হ'লে একটু ভেতর থেকে আসছি।'

সুরমা মল্লিক ডাকলেন—'মিঃ দত্ত।'

'বলুন।'

'আপনি যে বলেছিলেন কারা এখানে এসে উঠবেন?'

'ফার্ণডেল হোটেলের ম্যানেজার সকালে ফোন করেছিলেন যে সন্ধ্যার পর কলকাতা থেকে দু'জন বেড়াতে আসছেন। ওদের হোটেলে জায়গা না থাকাতে আমাকে অনুরোধ করেছেন এখানে ব্যবস্থা করতে। আচ্ছা, আমি আসছি'—মিষ্টার দত্ত বেরিয়ে ভেতরের দিকে গেলেন।

এঁরা দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন, সুরমা মল্লিক একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলেন সুজাতা সেন আত্মমগ্নভাবে কি চিন্তা করছেন। নিশ্চয় কোন দুশ্চিন্তা—তা না হ'লে মিস সেনকে এত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল সুজাতা সেনের।

সুরমা মল্লিকের মনটা সমবেদনায় ভরে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি অসুস্থ বোধ করছেন মিস সেন?'

সুজাতা ভেতরকার চাঞ্চল্য চাপবার চেষ্টা করে বললেন, 'না, ও কিছু নয়।'

'কিন্তু আপনার মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনিও ঠিক সুস্থ নন।'

'আপনাকে ত কালকেই বলেছি মিস মল্লিক যে এখানে আসবার আগে বড্ড টায়ার্ড ফিল করছিলাম।'

'চেঞ্জ অব ক্লাইমেটে এ ভাবটা দু'দিনেই কেটে যাবে। আবার আগের কথায় ফিরে আসি—আমি কিন্তু আপনার ঐ অশরীরী আত্মাদের পারিপার্শ্বিকের উপর ইমপ্রেশন রেখে যাবার কথাটা ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'ব্যাপারটা খুবই সহজ মিস মল্লিক। আমি বলতে চাইছিলাম মানুষ যখন বেঁচে থাকে তার সুখদুঃখের গভীর অনুভূতির সময় তার দেহমনের ছাপ পড়ে যায় তার পারিপার্শ্বিকের উপর। তার মৃত্যুর পরেও কেউ কেউ ঐ সব ছাপের ইমেজেস দেখতে পেয়ে মনে করে ঐ লোক বুঝি অশরীরী ছায়ারূপে পুরাণো জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

সুরমা দেবী আশ্চর্য হয়ে বললেন : 'এভাবে সত্যিই কথাটা কখনও ভেবে দেখি নি আগে। একটু থেমে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, মিস সেন, আপনি ত ছবি আঁকা শিখতে বিলেত গিয়েছিলেন। একদিনও ত আপনাকে আঁকতে বসতে দেখলাম না।'

প্রথমটায় একটু চমকে গেলেন সুজাতা, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন, 'বিলেত থেকে ফিরেই কোনও কারণে সোজা এখানে চলে এসেছি। এ দেশের প্রখর আলোটা চোখ-সওয়া হয়ে নিতে অন্ততঃ আরও কয়েকদিন লাগবে।'

অনাদিবাবু আবার ঘরে ঢুকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ডিনারে এঁদের কারোর কোন স্পেশাল ফরমাস আছে কি না। দুজনেই অসম্মতি জানালেন। সুরমা দেবী প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, মিষ্টার দত্ত, আপনাদের আর যে দুজন বোর্ডার আসছেন তাঁদের কোন পরিচয় পেয়েছেন কি?'

'না, কার্ণডেনের ম্যানেজার তাঁদের নাম বলেন নি। কাপ-ডিশগুলো দেখি এখনও নিয়ে যায় নি—যাই, কারোকে পাঠিয়ে দিই গিয়ে—' ব্যস্তভাবে ভেতরের দিকে চলে গেলেন অনাদি দত্ত।

এরপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন অর্থাৎ সুরমা মল্লিক আগাথা ক্রিষ্টির বইতে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলেন, আর সুজাতা সেন অন্যমনস্ক হয়ে কি চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন। কিন্তু মিস মল্লিকের বোধ হয় বইতে মন বসছিল না, আড়চোখে একবার সুজাতা সেনের দিকে চাইলেন, কিছুক্ষণ তাঁর মনোভাবটা ষ্টাডি করবার চেষ্টা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা সুরু করলেন :

'অনাদিবাবু এবং তাঁর স্ত্রী কিন্তু আপনার সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল মিস সেন। একটু আগে আপনার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন আমার কাছ থেকে—অবশ্য খুবই ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করছিলেন।'

সুজাতা সেন তেমন মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনলেন না—অন্যমনস্কভাবে মন্তব্য করলেন, 'অনাদিবাবু লোকটি বড় ভাল।

সুরমা মল্লিক তাঁর বক্তব্য বলে বললেন, 'আমি অবঃ তাঁর কৌতূহল মেটাতে পারি নি। এ কথাও ওঁকে ব'ল[illegible] যে আপনাকে আরও ভালভাবে জানবার কৌতূহল আমার কম নয়।' সুজাতা সেন এ কথা শুনে হেসে ফেললেন বললেন, 'আপনার কথা বলার ধরণটা এত সরল মিস মল্লিক যে একটু আলাপ হলেই লোকে আপনাকে না ভালবেসে পারবে না। কোন একটা ব্যাপারে এখন আমি অত্যন্ত worried হয়ে আছি। কিন্তু আমার ভেতর কোন রহস্যময়তাই নেই এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।'

এ কথা শুনে সুরমা মল্লিক সত্যিই খুশী হয়ে উঠলেন। অথচ চাকরির জীবনে সহকর্মীরা কেউ তাঁকে ভেতরে ভেতরে বিশ্বাস করত না এ কথাও তাঁর জানা ছিল—সবাই মনে করত তিনি অত্যন্ত জটিল ধরনের মানুষ, এ জন্য কেউ তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলতেও সাহস পেত না। আর আজ মিস সেন বলছেন তিনি সরল প্রকৃতির মহিলা—সত্যিই হাসি পেয়ে গেল সুরমাদেবীর। যাই হোক মনের ভাবটা সামলে নিয়ে ফের বললেন গত তিনদিন ধরে আমরা এই হোটেলে বাস করছি এবং এক্ষেত্রে সাধারণতঃ যতটা পরিচয় হয় তার থেকে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে হয়েছে, সেকথা নিশ্চয়ই স্বীকার করেন?' একটু ইতস্ততঃ করে সুজাতা উত্তর দিলেন, 'কেন জানি না, আপনাকে মনে হয় আমার বহুদিনের পরিচিত—আমার সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই যদি মনে করেন, তবে মনের ভাব গোপন না করে অন্ততঃ আমার কাছে খুলে বলুন কি জন্য আপনার এই দুশ্চিন্তা—সব সময়েই দেখছি আপনি অদ্ভুত রকম অন্যমনস্ক—কি যেন বিপদের আশঙ্কায় সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত...'

'আমার সম্বন্ধে এ ধারণা আপনার হ'ল কি ক'রে, মিস মল্লিক? দেখুন মিস সেন, বিলেত থেকে ফিরেই আপনার এভাবে এই নির্জন জায়গায় আউট অফ সিজনে চলে আসাটাকে কেমন অস্বাভাবিক লাগে। এখানে নিশ্চয় ছবি আঁকতে আসেন নি—কারণ যতই আলোর এক্সকিউজ দেখান, আঁকবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে এভাবে এতদিন চুপ করে বসে থাকতেন না। বিশ্রাম করাও আপনার উদ্দেশ্য নয়—কারণ সব সময়েই দেখছি আপনার ভেতর একটা অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্য'—

সুজাতা সেন কথাটাকে হাল্কাভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। বললেন : আমার মনে হয় আগাথা ক্রিষ্টির বই পড়ে আপনি সাধারণ ব্যাপারের ভেতরও রহস্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু সুরমা দেবী ছাড়লেন না—আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন: দেখুন মিস সেন, আপনার থেকে বয়সে আমি অনেক বড়, সেই জন্যই জীবন সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী। বিশ্বাস করুন আমার চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারেন নি! আমার নিজের জীবনের ওপরে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেছে—আমার মনে হয় আপনার জীবনের সমস্যার কথা খুলে বললে আমি আপনাকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারব।

সুজাতা সেন চুপ করে কি ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাই যদি সম্ভব হ'ত।

বেশ ত, বলেই দেখুন না।

এবারে বেশ সহজভাবেই উত্তর দিলেন সুজাতা সেন: শুনুন মিস মল্লিক, আমার জীবনের যা সমস্যা তাতে কারোর পক্ষেই কোন সাহায্য করা অসম্ভব। আর সেই কারণেই আজ আমার জীবনটা এত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতেও আমি যেন ভেতর থেকে বাধা পাই। আর সেই জন্যই···কথাটা আর শেষ করলেন না সুজাতা সেন।

আমার কি মনে হচ্ছে বলব? প্রশ্ন করলেন মিস মল্লিক।

বলুন।

আপনি এখানে কারোর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছেন—

Yet you are afraid of the meeting.

সুজাতা একথা শুনে বিস্মিতভাবে বললেন: আমি কি নিজের মনের ভাবটা এতটা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে ফেলেছি?

আমার কথা সত্যি কি না বলুন?

আপনি ঠিকই ধরেছেন।

আপনি এখানে কার জন্য প্রতীক্ষা করছেন মিস সেন?

একটু ইতস্ততঃ করে সুজাতা বললেন: তিনি একজন সাহিত্যিক—আর ভদ্রলোক বিবাহিত।

সুরমা মল্লিক মনে মনে সত্যিই এবার বেদনা অনুভব করলেন সুজাতা সেনের জন্য। দু'তিন দিনের মাত্র আলাপ মিস সেনের সঙ্গে—অথচ মেয়েটির প্রতি একটা মমতার ভাব এসে গিয়েছিল মনের কোনায়। মুখে বললেন: আমি সত্যিই দুঃখিত সুজাতা দেবী। বুঝতে পেরেছি আপনি সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোককে ভালবাসেন—অথচ এখন আর আপনাদের মধ্যে কোন মিলনের সম্ভাবনা নেই। আপনার ভাল না লাগলে এ বিষয়ে আলোচনা করে আর আপনাকে বিরক্ত করব না।

সুরমা দেবী ভেবেছিলেন তাঁর একথা শুনে সুজাতা সেন এবার ভেঙে পড়বেন—হয়ত একটু চোখের জলও পড়বে এবং তার ফলে মনটা একটু হাল্কা হয়ে যাবে। কিন্তু মিস সেনের মুখে এতটুকু ভাব পরিবর্তনের আভাসও পাওয়া গেল না। বেশ গম্ভীর ভাবেই বললেন:

এতটাই যখন জেনেছেন, তখন বাকীটা না শুনলে আমার সম্বন্ধে আপনার মনে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা থেকে যাবে মিস মল্লিক। আপনি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, সাহিত্যিক অভিজিৎ গুপ্তের সঙ্গে আমার কখনও মৌখিক আলাপ হয় নি আজও পর্যন্ত।

সুরমা দেবী শুনে কিছুক্ষণের জন্য একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন—মেয়েটা বলে কি! যাই হোক, বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে বললেন, সে কি! আমি ভেবেছিলাম···

তাঁকে কথা শেষ না করতে দিয়ে সুজাতা সেন বলে উঠলেন: আপনি কি ভাবে ভেবেছিলেন সে আমি আপনার কথা বলবার ভঙ্গি থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। আসলে এ ব্যাপারটা একেবারেই সেরকম নয়। অভিজিৎ গুপ্ত এখানে আসছেন সে কথা ঠিক—কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসছেন না। I don't think he is even aware of my existence.

আপনি বলছেন কি মিস সেন! আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই? সমস্ত ব্যাপারটা আমার যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি কি তাঁকে নিয়ে তামাসা করছে—মনে মনে ভাবলেন সুরমা মল্লিক। সুজাতা সেনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন—কই, মুখের ভাব দেখে ত সে কথা মনে হচ্ছে না! বরং সারা মুখে এমন একটা গাম্ভীর্য মাখানো যা দেখলে মনে হয় হাল্কা বাজে ব্যাপার নিয়ে উনি কখনও সময় নষ্ট করতে পারেন না।

সুজাতা সেন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: না, পরিচয় আছে বলতে পারি না। কিন্তু আমি তাঁকে জানি—এবং এমনভাবে জানি যে ভাবে অন্য কেউ তাঁকে জানে না।

ব্যাপারটা যে আরও হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে মিস সেন—আপনি ঠাট্টা করছেন না ত?

I am desperately serious—এর থেকে সিরিয়াস কিছু আমার জীবনে কখনো ঘটে নি মিস মল্লিক। সুরমা মল্লিক অল্পক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন: মিঃ গুপ্ত কি আপনাকে বলেছিলেন যে এখানে আসবেন? না, তাই বা কি করে হবে—আপনাদের ত মৌখিক পরিচয়ই নেই। হ্যাঁ, অবশ্য লিখে জানিয়ে থাকতে পারেন······

সুজাতা সেন বাধা দিয়ে বললেন : না, দেখেন নি—আমি বলে যে কেউ আছি তাই তিনি জানেন না।

সে কি! আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও উনি কিছু জানেন না? তা হলে আপনি বোধ হয় কোন রকমে জানতে পেরেছিলেন যে উনি এখানে আসছেন?

অনেকটা তাই বটে। বিলেত থেকে জাহাজে দেশে ফিরছিলাম। কিছুই তেমন করবার ছিল না—তাই বেশীর ভাগ সময়, বুঝলেন মিস মল্লিক, ডেক-চেয়ারে শুয়ে আধ-ঘুমে, আধ জাগরণে কাটাতাম। খালি মনে হ'ত অভিজিৎ গুপ্ত অত্যন্ত মর্মাহত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত নেই···বিলেতে থাকতে ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। জাহাজের ওপর আবার সেই পুরোন স্মৃতি আমাকে পেয়ে বসল মিস মল্লিক।

সুরমা দেবী এবার বেশ হকচকিয়ে গেলেন—বললেন : আপনার কথা আমার ক্রমশঃ দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে মিস সেন। আপনি ত বলছিলেন যে ভদ্রলোক বিবাহিত—ওঁর স্ত্রী এখন কোথায়?

আমি যতদূর জানি, বিবাহিত জীবনে ওঁরা সুখী হ'তে পারেন নি মিস মল্লিক। তার পরে দু'জনে সেপারেটেড হয়ে যান। কবে এবং কিভাবে এটা ঘটল তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু একথা আমি জানতে পেরেছি যে, ওঁরা দুজনেই এখানে আসছেন—একবার শেষ চেষ্টা করবেন ওঁরা নিজেদের ভেতরকার সমস্ত গোলমাল মিটিয়ে ফেলবার জন্য। লোক-বিরল এই পরিবেশেই নিজেদের যাচাই করে নেওয়াটা সব দিক দিয়ে সুবিধার হবে এই বোধ হয় ওঁদের মনের ভাব।

সুরমা মল্লিক কিছুক্ষণ ধরে ভাবছিলেন—ভাবছিলেন এই অভিজিৎ গুপ্তের কথা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এঁর লেখা তিনি পড়েছেন, কিন্তু? মুখে বললেন : অভিজিৎ গুপ্তের নাম শুনেছিলাম এক সময়—কিন্তু তার পরে ভদ্রলোক যেন একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন সাহিত্য জগৎ থেকে। হঠাৎ তিনি এভাবে লেখা বন্ধ করলেন কেন জানেন?

যেন অভিজিৎ গুপ্ত সম্বন্ধে সবকিছুই জানেন এই ধরনের ভঙ্গিতে সুজাতা উত্তর দিলেন : অনেকদিন ধরে কোন বড় কাজ তিনি শেষ করেন নি—আরম্ভ করেন, খানিকটা লেখেন, ছেড়ে দেন।

আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়াতে খুব উৎসাহ ভরে সুরমা দেবী ফের আরম্ভ করলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ছে, ওঁর একটা নাটক এক সময় দেখেছিলাম—দর্শক-মহলে তখন নাটকটি একটা বিরাট আলোড়নও এনেছিল কিন্তু আমার যেন কিসের একটা অভাব লাগছিল লেখার ভেতরে।

ঠিকই বলেছেন—এ পর্যন্ত ওর সব লেখার ভেতরেই সেই অভাবটা আছে। একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে নিয়ে যেন আপন মনেই অভিজিৎ গুপ্তের লেখার বিশ্লেষণ সুরু করে দিলেন সুজাতা সেন। রচনার কারিগরীর দিকটা ওঁর হয় নিখুঁত। কিন্তু নিজের সত্যিকার প্রতিভাকে—দু'চারটি লেখায় ছাড়া—উনি এখনও ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আসলে ওঁর অন্তরটি হচ্ছে অত্যন্ত উপবাসী। যে নারীর সাহচর্যে ওঁর হৃদয়-বীণার তারগুলো বেজে উঠবে, তার দেখা উনি আজও পর্যন্ত পান নি। সৃষ্টির আগে শিল্পীর মনে যে Composure-এর দরকার তার অভাব হয় বলেই তিনি লেখার সময় ঠিকমত ভাষা খুঁজে পান না। ঠিকমত মনোভাবকে প্রকাশ করতে পারেন না। মনের ভেতর সব সময় একটা অশান্তি; অল্পেতেই রেগে যান, লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার পর্যন্ত করেন—অথচ পরে এর জন্য অনুতপ্ত হন। আসল কথা কি জানেন মিস মল্লিক! জীবনের সঙ্গে সহজভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না বলেই he becomes dominated by terrible, bitter black moods। অনেক ক্ষেত্রেই আমি দেখেছি······! কি ভেবে কথাটা আর শেষ করলেন না সুজাতা দেবী।

একটু অপেক্ষা করে সুরমা মল্লিক বললেন···কি বলছিলেন? বলুন।

একটু ইতস্তত করে সুজাতা সেন উত্তর দিলেন : না, থাক—এভাবে অভিজিৎ গুপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

আমি সব থেকে অবাক হচ্ছি কি ভেবে জানেন মিস সেন—আপনি ওঁর সম্বন্ধে এত কথা জানেন অথচ মিঃ গুপ্ত আপনার বিষয়ে কিছুই জানেন না। আপনিই বললেন সামান্য মৌখিক পরিচয়ও আপনাদের ভেতর হয় নি। আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেছি, মিস সেন!

বেশ বোঝা যাচ্ছিল সুজাতা সেন এবার সত্যিই বিব্রত বোধ করছিলেন। মৃদুস্বরে মন্তব্য করলেন : আমি বেশ বুঝতে পারছি মিস মল্লিক, এ ব্যাপারে এত কথা বলাটাই আমার উচিত হয় নি।

সুরমা মল্লিক এবার হেসে ফেললেন। তারপর আলোচনার জের টেনে বলতে লাগলেন : তা হয়ত

বলেছেন, কিন্তু এর ফলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যেন আরও বেশী জটিল হয়ে উঠেছে। ঠিক কি বলতে চাইছেন···

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে সুজাতা সেন বলে উঠলেন: আমাকে ক্ষমা করবেন—এর বেশী এখন আর আমি বলতে পারব না। সুরমা মল্লিক এবার যেন আত্মমগ্ন ভাবেই মন্তব্য করলেন—একটা কথা আপনাকে বলছি মিস সেন, আমার এতটা বয়স হওয়া সত্ত্বেও আজও অবধি আপনার মত রহস্যময়ী নারীর সংস্পর্শে আমি এর আগে কখনও আসি নি।

সুজাতা সেন একটু ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বললেন—এ আপনার ভুল ধারণা। আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে আমার কোনও অমিল নেই। আমি শুধু এই ভেবে আশ্চর্য হই মিস মল্লিক, মানুষের জীবন যতটা সহজ-সরল আমরা ভাবি, আসলে তা আরও বেশী জটিল, অনেক বেশী রহস্যঘন। হঠাৎ কথা বলতে বলতে কিরকম বিহ্বলের মত হয়ে গিয়ে সুজাতা সেন এবার উঠে দাঁড়ালেন।

কি হল—জিজ্ঞেস করলে সুরমা মল্লিক।

অভিজিৎ এসেছে—উত্তর দিলেন সুজাতা। চমকে উঠে সুরমা দেবী প্রশ্ন করলেন—সে কি! কই? আমি জানি সে এসেছে।

আচ্ছা—আমি দেখে আসছি—আপনি ব্যস্ত হবেন না।

সুরমা মল্লিক বাইরের দিকে খোঁজ করতে যাবেন। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে পেছন করে সুজাতা সেন নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন—তাঁকে দেখলে মনে হবে কেউ যেন তাঁকে সম্মোহিত করে এইভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কিছুক্ষণ সারা ঘরটায় একটা অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করবে। এবারে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর ওপারে এসে অভিজিৎ গুপ্ত দাঁড়াবেন। সুরমা মল্লিক ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকে বলবেন, কই, কাউকে ত দেখলাম না মিস সেন! হঠাৎ ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে তাঁর নজর পড়বে, এবং অভিজিৎকে দেখে চমকে উঠে বলবেন—কে?

মিস মল্লিকের কথায় চমকে উঠে মিস সেন ফিরে দাঁড়াবেন এবং ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে নজর পড়াতে অস্ফুট স্বরে বলবেন—'অভিজিৎ!' অভিজিৎ এসেছে মিস মল্লিক। এবার অভিজিৎ গুপ্ত পাশের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকবেন। সুজাতার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলবেন—

অলকা, তুমি আমার আগেই এসে গেছ? আমি ভাবতে পারি নি···

সামনে এসে সুজাতাকে দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারবেন অভিজিৎ গুপ্ত—

দেখুন, ক্ষমা করবেন—দূর থেকে আপনাকে দেখে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভুল করাতেই···তাঁরও এখানে আসবার কথা—বাকীটা উহ্য। সুজাতা এবং অভিজিৎ কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন নির্বাকভাবে। একটু ইতস্তত করে অভিজিৎ আবার শুরু করলেন: দেখুন, আপনি হয়ত আমার ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়েছেন···

নিজের কানেই কথাটা কিরকম বেখাপ্পা শোনাল, তাই একটু থেমে গিয়ে কেন যে কথাটা মনে এল বলে ফেললেন: কিন্তু আমাদের নিশ্চয় আগে কোথাও আলাপ হয়েছে। আপনি আবারও ভুল করছেন—বলেই দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুজাতা সেন—বোধ হয় বাইরে গিয়ে খানিকটা সামলে নেবার জন্যই।

অভিজিৎ কিছুক্ষণ সুজাতার যাবার পথের দিকে চেয়ে থাকবেন—তারপর একবার ঘ্রাণ করে এগিয়ে এসে একটা কাউচে বসবেন। চোখ তুলে চাইতেই সুরমা মল্লিকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হবে—একটু বিস্মিতই হবেন অভিজিৎ গুপ্ত—এ মহিলা যে এতক্ষণ পাশের কাউচেই বসে ছিলেন নজরেই আসে নি তাঁর।

'মিষ্টার অভিজিৎ গুপ্ত?' প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকাবেন সুরমা মল্লিক।

'ঠিকই ধরেছেন।'

'আমি মিস সুরমা মল্লিক।'

অভিজিৎ অন্যমনস্কভাবে নমস্কার জানাবেন এবং বিহ্বলভাব কাটিয়ে উঠে বলতে থাকবেন: কি আশ্চর্য ব্যাপার!

ঐ ভদ্রমহিলার নামটা কি বলতে পারেন, মিস মল্লিক?

ওঁর নাম মিস সুজাতা সেন।

সুজাতা সেন? আগে ঐ নামের কারোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে ত মনে পড়ছে না। কিংবা হয়ত কোথাও দেখে থাকব।

না, আপনি আগে মিস সেনকে দেখেন নি।

আপনি কি করে জানলেন?

একটু আগেই মিস সেন আমাকে বলছিলেন যে আগে আপনাদের দেখা হয় নি।

আমার কথা উনি বলেছিলেন—কখন?

আপনি আসার একটু আগে।

কি বলছিলেন?

যে আপনি এখানে আসবেন।

আশ্চর্য!

এতক্ষণে অনাদি দত্ত এসে ঘরে ঢুকবেন। অভিজিৎকে উদ্দেশ করে বলবেন, আপনার আদেশ মতই আপনার লাগেজ আমি আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি—চার নম্বর ঘরটাতেই দিলাম। ঘরটি ভারী সুন্দর—ঘর থেকেই চার পাশেই দৃশ্যাবলী চমৎকার দেখা যায়। আমার অফিস থেকে চাবিটা নিয়ে যাবেন মিষ্টার গুপ্ত—আর বলেন ত এখানেও পাঠিয়ে দিতে পারি।

না, ধন্যবাদ। আমিই পরে নিয়ে নেব।

আপনাকে কি এখন চা পাঠিয়ে দেব মিষ্টার গুপ্ত?

একটু বাদে আপনাকে খবর দেব।

আচ্ছা, নমস্কার—অনাদিবাবু তাঁর অফিসের দিকে পা বাড়াবেন। হঠাৎ যেন রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে—এই ভাব নিয়ে অভিজিৎ মিস মল্লিককে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করবেন:

দেখুন, এবার বুঝতে পেরেছি। মিস সেনের বোধহয় আমার স্ত্রী অলকার সঙ্গে পরিচয় আছে!

আমার মনে হয় না সুজাতা দেবী আপনার স্ত্রীকে চেনেন—উত্তর দেবেন সুষমা মল্লিক।

ব্যাপারটা ত ক্রমশঃই জটিল হয়ে উঠছে। বুঝতে পারছি না উনি কি করে জানলেন আমি এখানে আসব?

আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। তবে একটা কথা আপনাকে জানাতে বাধা নেই মিষ্টার গুপ্ত—She is rather an extraordinary young woman.

মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে অভিজিৎ মন্তব্য করলেন, তাই বটে!

সুষমা মল্লিক উঠে দাঁড়ালেন—অভিজিৎ গুপ্তের শেষের মন্তব্যটা তাঁর মোটেই ভাল লাগে নি—যাই হোক মনের ভাব প্রকাশ না করে বললেন, আমি একটু বেরোচ্ছি—পরে দেখা হবে।

মিস মল্লিক চলে যাবার পর কিছুক্ষণ ঘরময় অস্থির ভাবে পায়চারি করে বেড়ালেন অভিজিৎ গুপ্ত। তারপর আপন মনেই বলতে লাগলেন:

আশ্চর্য! আমার সঙ্গে আলাপ নেই—অলকাকে চেনে না—তা ছাড়া আমি যে এখানে আসব, আগে থেকে সে কথাই বা কি করে জানতে পারলে।

এবার এগিয়ে গিয়ে কলিং বেলের নবটা টিপলেন অভিজিৎ গুপ্ত—মনে মনে ভাবলেন আগে একটু চা খাওয়া যাক।

ধীরে ধীরে সুজাতা সেন এসে ঘরে ঢুকলেন।

আসুন মিস সেন! বসুন।

সুজাতা গিয়ে অভিজিৎএর ডানদিকে একটি সোফায় বসবে—বয় এসে দাঁড়াবে।

মিস সেন! আপনার জন্য চা বা কফি আনতে বলব? না, ধন্যবাদ! একটু আগেই আমার ও পর্ব সারা হয়ে গেছে। আমাদের দেশের হোটেল রেস্তোঁরার ওয়েটার, বেয়ারারা চিরকালই কেমন রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে থাকে। এখানকার বয়টিও সেই শ্রেণীর—বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে—এ সময় আমরা চা ছাড়া অন্য কিছু সার্ভ করি না—অর্ডার দিলেও কফি দিতে পারব না।

অভিজিৎএর সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠল। চড়া গলায় চিৎকার করে উঠলেন—তার মানে? সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণস্বরে সুজাতা ডাক দিলেন—মিষ্টার গুপ্ত!

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিলেন অভিজিৎ, তারপর অর্ডার দিলেন চা আনতে। বয়টি বেরিয়ে গেলে বললেন, লোকটার কথা বলার ঐ রুক্ষ ভঙ্গিটা আমি মোটেই পছন্দ করি নি—আপনি থামিয়ে না দিলে—সুজাতা মৃদু হেসে জবাব দিলেন, আমি জানতাম ক্রমশঃ আপনার মেজাজ চড়ে উঠবে—এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত বেচারীকে হয়ত চড় চাপড় দিয়ে বসবেন।

অভিজিৎও এবার হেসে উঠলেন—বললেন, আমি স্বীকার করছি আমার মেজাজ হঠাৎ চড়ে যায়। কিন্তু আপনিও কি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে এভাবে চেক করবার চেষ্টা করেন? অন্যের বেলায় করি না।

এই উত্তর শুনে অভিজিৎ কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলেন—বার বার মনে হতে লাগল এ মহিলার সঙ্গে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ রয়েছে—ইনি তাঁর মোটেই অপরিচিতা নন। মৌনতা ভঙ্গ করে আবার প্রশ্ন করলেন, ঐ মহিলাকে, মানে, মিস মল্লিককে আপনি বলেছেন, যে আমাদের আগে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি?

তা বলেছি।

কিন্তু কেন?

সেটাই সত্যি কথা বলে।

ওঁকে এ কথাও বলেছেন যে আমি এখানে থাকতে আসছি?

এবার সুজাতা সেন একটু বিব্রত বোধ করলেন।

মুখে বললেন, মিস মল্লিক আবার সে কথা জানাতে গেলেন কেন?

সুজাতার কথাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অভিজিৎ ফের জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি করে জানলেন যে আমি এখানে আসছি?

যে ভাবেই হোক আমি জানতে পেরেছিলাম।

আমাকে বলতে আপত্তি কি?

সুজাতা সেন অল্পক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, আপনার মুখ থেকেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

উত্তেজনায় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন অভিজিৎ গুপ্ত।

আমার মুখ থেকে? কবে? কোথায়?

আপনি লং ডিষ্টেনসে কথা বলছিলেন—বম্বে থেকে কোলকাতায়—

বম্বে থেকে আমি কথা বলছিলাম টেলিফোনে!

কিন্তু…

Please অভিজিৎ don't drive me so hard! সুজাতাকে এভাবে তার নাম সম্বোধন করতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন অভিজিৎ গুপ্ত।

মুখে বললেন, অভিজিৎ!

সুজাতাও ওভাবে নামটা উচ্চারণ করে বেশ নার্ভাস বোধ করলে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমি অত্যন্ত লজ্জিত। হঠাৎ যে ওভাবে কেন আপনার নাম ধরে সম্বোধন করলাম জানি না। আপনার যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলো আমি অনেকবার দেখেছি। তা ছাড়া আপনার সব লেখাই আমি অনেকবার পড়েছি। আপনার নামটা আমার এতই পরিচিত সেই জন্তই বোধ হয় হঠাৎ ওভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

এতে দুঃখিত বা লজ্জিত হবার কিছু নেই মিস সেন। হয়ত আপনি যেভাবে বললেন তাই ঠিক…কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনার বলবার ভঙ্গিটা কিন্তু ছিল অন্যরকম। আপনার অনেক কথাই আমার সম্পূর্ণ হেঁয়ালীর মত লাগছে। এই সময় অনাদিবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, মিষ্টার গুপ্ত, আপনার মালপত্র সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা বাক্স যা ভারী ছিল—বোধ হয় বইয়ে ভর্তি?

বইই বেশী, আর আমার লেখা কয়েকটা পাণ্ডুলিপিও আছে।

বেশ, বেশ—বললেন অনাদিবাবু। এখানে নিরিবিলিতে লেখার কাজ করবার যথেষ্ট সুবিধা পাবেন মিষ্টার গুপ্ত। অভিজিৎ এবার যেন নিজের মনেই বলতে থাকবে—চার বছর আগে একটা নাটক লিখি—লেখাটা ঠিক মনের মত না হওয়াতে ফেলে রেখেছিলাম। কিছুদিন ধরে সেটাকে নিয়েই মাজাঘষা করছি।

আত্মবিস্মৃতভাবে কৌতূহল এবং আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা তখুনি বলে উঠবে, আপনার 'দুর্গম হয় পন্থা' নাটকটার কথা বলছেন ত?

হ্যাঁ, ঐ নাটকটাই।

সুজাতা সেন অনেকটা আত্মগতভাবেই মন্তব্য করলেন, আমি জানতাম এ নাটকটায় আপনাকে আবার একদিন হাত দিতে হবে।

নাটকটা লিখতে সুরু করেছিলাম প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে। শেষ করলাম—কিন্তু মন ভরল না। বড় এ্যাবস্ট্র্যাক্ট লাগল—প্রাণবন্ততার অভাব।

আমি জানি—বললেন সুজাতা সেন।

অভিজিৎ গুপ্ত এতক্ষণ নিজের চিন্তাতেই মত্ত হয়ে ছিলেন। সুজাতা সেন যা বলছিলেন খুব মন দিয়ে শোনেন নি। কিন্তু মিস সেনের শেষ কথাটায় কেমন কনৃশাস হয়ে উঠলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন? কিন্তু এ বিষয়ে আপনি কি করে জানবেন?

সুজাতা সেন উত্তর না দিয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। অনাদিবাবু এবার মিস সেনের সাহায্যে এগিয়ে এলেন—তিনি মনে করলে, স্বাভাবিক সংকোচবশতঃই সুজাতা দেবী নিজেও যে শিল্পী সে কথা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছেন। তাই জানিয়ে দিলেন—মিস সেন নিজেও শিল্পী—উনি ছবি আঁকেন।

অভিজিৎ উৎসাহ ভরে বলে উঠল—বটে! তা হলে আপনি আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝবেন। ঔৎসুক্য মিশ্রিত কণ্ঠে সুজাতা জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই। তবে এখন কিন্তু নাটকটায় প্রাণ আসছে মিষ্টার গুপ্ত।

চার বছরে আমার অর্থশিপ্য অভিজ্ঞতাও অনেক বেড়েছে। নাটকটার পাণ্ডুলিপি সঙ্গেই এনেছি—এখানে একটু নির্জনতা, একটু মনের শান্তি পেলেই 'দুর্গম হয় পন্থাকে' প্রথম শ্রেণীর নাটক হিসাবে তৈরী করে ফেলতে পারব। আত্মবিস্মৃত হয়ে আবেগের সঙ্গে সুজাতা সেন বলে ফেললেন, আমিও সব সময় তাই ভেবেছি—

কথাটা বলে ফেলেই সঙ্কোচ অনুভব করবেন সুজাতা সেন, বুঝতে পারবেন নিজের অধিকারের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে গেছেন এই ধরনের উক্তি করে। কথাটা শুনে নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সুজাতা দেবীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন অভিজিৎ গুপ্ত—তারপর বলবেন, একথা আপনিও সব সময়েই ভেবেছেন।

সুজাতা সেন কথাটা এবার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন—না, ও কিছু নয়…হঠাৎ অভিজিতের দৃষ্টি পড়বে অনাদি

বাবুর দিকে—সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠবে—লোকটা নিশ্চয় ওঁদের কথাবার্তা শোনবার জন্ত এখানে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্লেষ-মাখানো স্বরে জিজ্ঞেস করবেন—"মিষ্টার দত্তের কি এখানে কোন দরকার আছে?

অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করবেন অনাদিবাবু। কুণ্ঠিত কণ্ঠে জবাব দেবেন—আজ্ঞে না, আমি যাচ্ছি—বলেই তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন।

সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা যেন বিশ্রী হয়ে উঠবে। সুজাতা সেনও এবার বেশ নার্ভাস ফিল করবেন। এ পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ত আপন মনেই বলে উঠবেন—এখানে আমরা ডিনার একটু আগেই খাই—

আমি একটু উঠছি…

বসুন মিস সেন—অত্যন্ত গম্ভীর এবং শান্ত কণ্ঠে অভিজিৎ অনুরোধ করবেন। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করবেন—একটা কথা আমার মনে পড়ল—আপনি কিন্তু নিজে থেকেই 'দুর্গম হয় পন্থা' নাটকটির নাম করলেন মিস সেন, তাই না?

সুজাতা সেন নার্ভাস ভাবে উত্তর দেবেন, তাই বুঝি? হ্যাঁ, তাই। চার বছর আগে যখন এ নাটকটি লিখে বাক্সে আটকে রাখি—তখন থেকে আজও পর্যন্ত কারো কাছে এর সম্বন্ধে কোন উল্লেখই আমি করি নি। আপনি কি করে এ নাটকের নাম জানতে পারলেন আমি বুঝতে পারছি না। সুজাতা এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। অভিজিৎ আবার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই হোটেলে আপনি ক'দিন ধরে আছেন?

দিন চারেক।

তার আগে?

লণ্ডন থেকে জাহাজে যেদিন বম্বে আসি, সেদিনই প্লাই করে কলকাতা পৌঁছাই। এক রাত্রি কলকাতায় থেকে পরের দিন এখানে আসি।

তা হ'লে দিন সাতেক আগে আপনি ছিলেন সমুদ্রের ওপর জাহাজে?

ঠিকই বলেছেন।

সিগারেট কেস খুলে কেসটা সুজাতা সেনের দিকে এগিয়ে ধরবেন অভিজিৎ গুপ্ত।

না, ধন্তবাদ, আমি স্মোক করি না।

কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করবেন অভিজিৎ—তারপর ধীরে ধীরে এবং প্রতিটি শব্দ বেশ মেপে মেপে বলতে থাকবেন:

—দেখুন মিস সেন, আমি যখন দং ডিটেক্সে বসে থেকে কলকাতায় টেলিফোনে অলকার সঙ্গে—অর্থাৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম—তাকে জানাচ্ছিলাম শিলংএ এসে আমরা মিট করব—তখন আপনি জাহাজে সমুদ্রের ওপর রয়েছেন। অথচ আপনি একটু আগে বললেন যে, You heard me talking on the telephone about this trip.

শান্তভাবে সুজাতা জবাব দেবেন—আমি সত্যি কথাই বলছি।

অভিজিৎ গুপ্ত এবার একটু বিরক্ত হয়ে উঠবেন—দেখুন মিস সেন, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, না পাগলের মত আবোল-তাবোল কথা বলছেন। অত্যন্ত অপরাধীর মত ভাব করে সুজাতা জবাব দেবেন—

বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথাই বলেছি।

তবে আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলছেন না কেন?

এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়ে গেছে মিঃ গুপ্ত। এ কথাটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অভিজিৎ ফের বললেন—বিশদভাবে আমাকে সমস্ত ঘটনাটা বলুন না?

যে ভাবে সমস্ত ব্যাপারটার আপনি বিচার করেছেন, তারপর আমার উত্তর দেবার কিছু নেই মিষ্টার গুপ্ত। অনুগ্রহ করে আমাকে যেতে দিন।

সুজাতা সেনের বলার ভঙ্গিতে এমন একটা করুণভাব ছিল যে অভিজিতের মনটা ওর প্রতি সহানুভূতিতে ভরে গেল। এগিয়ে এসে ওঁর দু'টি হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে কোমলভাবে বললেন:

আমি ত সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে চাইছি মিস সেন। আপনার ওপর জোর খাটাব সে অধিকার ত আমার নেই।'

ঠিক এই সময় অলকাগুপ্ত ঘরে এসে ঢুকবেন এবং ওদের এই অবস্থায় দেখবেন।

বেশ শ্লেষভরে অলকা হেসে উঠবেন। অভিজিৎ চমকে উঠে হাত সরিয়ে নেবেন এবং স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করবেন, অলকা! তুমি কখন এলে?

প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অলকা ঠাট্টার সুরে বলবেন, 'তোমার বান্ধবীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

অভিজিৎ এবার উঠে দাঁড়াবেন—'হ্যাঁ, দেব বইকি—মিস সুজাতা সেন, এখানে এসেই আলাপ হ'ল আজ। আর মিস সেন! এই আমার স্ত্রী অলকা গুপ্ত।

দু'জনে দু'জনকে নমস্কার করবেন—তারপর সুজাতা ভেতরের দিকে যেতে যেতে বলবেন—ভাবছিলাম কালই এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু এখন সবদিক বিবেচনা করে মনে হচ্ছে এখানে থেকে যাওয়াটাই হবে সব দিক দিয়ে ভাল।

কিছুক্ষণ সারা ঘরটায় নিস্তব্ধতা বিরাজ করল—তারপর অলকা প্রশ্ন করলেন, এ বান্ধবীটির কথা ত আগে কখনও শুনি নি। বান্ধবী নন, আজই এঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল—চল, ঘরে গিয়ে কথা হবে।

এরপর দু'জনেই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন।

২

সকাল বেলায় নতুন জায়গায় ঘুমটা একটু আগেই ভেঙে গিয়েছিল—অভিজিৎ এবং অলকার। বেড-টি-টা সেরে নিয়ে দু'জনে কিছুক্ষণ হোটেলের বাগানের সামনে পায়চারি করলেন। একটি মাত্রই আলোচনার বিষয়—অর্থাৎ সুজাতা সেনকে অভিজিৎ কতদিন থেকে চেনেন। কথা বলতে বলতে দু'জনে হোটেলের সিটিং রুমে এসে ঢুকলেন—তখন পর্যন্ত ঘরটি একেবারে খালি। অন্যান্য বোর্ডাররাও বোধ হয় কেউ এখনও ঘর থেকে বেরোন নি। অলকা গুপ্তা আগের কথার জের টেনে বললেন: ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যাই ঠিক করি না কেন, তোমার এই ব্যাপারটা কোন রকমেই ক্ষমা করা যায় না।

তার মানে?

এইখানে ঐ মহিলাকে এভাবে নিয়ে আসা…

রাগে জ্বলে উঠলেন অভিজিৎ গুপ্ত—বিরক্তি ভরে জবাব দিলেন মহিলাকে আমি এখানে নিয়ে আসি নি—আমি এখানে এসেছিলাম আমাদের আগের ব্যবস্থামত তোমাকে মিট্ করতে।

এবার অলকাও রেগে উঠলেন—উগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন তবে ওই মহিলা কে?

ঠাট্টার সুরে অভিজিৎ জবাব দিলেন: কাল রাত্রেই ত বলেছি, ওঁর নাম সুজাতা সেন—আর ওঁর পেশা হচ্ছে ছবি আঁকা। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল অলকার মুখে—বেশ বোঝা যাচ্ছিল অভিজিতের একটি কথাও তিনি বিশ্বাস করছেন না। মুখে বললেন: তারপর?

তারপর আর বলবার কিছু নেই, কারণ এর বেশী ওঁর সম্বন্ধে আমি আর কিছু জানি না।

আমি এবার একটা কথা বলব?

নিশ্চয় বলবে, এতে আর আমি কি আপত্তি করতে পারি।

বেশ অভিজিৎ, আমার কাছে সত্যি কথা গোপন করে কোনও লাভ নেই। আমি বুঝতে পারছি মেয়েটির সঙ্গে এখন তোমার অনেকদিন বাদে দেখা হ'ল। কিন্তু এক সময় দু'জনের খুবই ভাব ছিল—তখন কিন্তু সব সময়েই তোমাদের দেখা হ'ত। আমার মনে হচ্ছে আমাদের বিয়ের সময় অবধি তোমাদের ভেতর এই ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সব কারণেই এর নাম পর্যন্ত কোনদিন আমার কাছে তুমি কর নি। অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে ত আর কখনও কোন গোপনতা করতে তোমায় দেখি নি?

সুতরাং এ মহিলার সঙ্গেও কোনরকম পরিচয় থাকলে সেকথা তোমার কাছে গোপন রাখতাম না।

এ ক্ষেত্রে গোপন করবার নিশ্চয় বিশেষ কারণ আছে।

কি রকম?

অন্য যেসব মেয়েদের কথা আমার কাছে বলেছ তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ছিল হাল্কা এবং ঠাট্টা-ইয়ার্কির। এর ব্যাপারটা বোধহয় আরও গভীর, তাই এত গোপনতা—কি বল?

তোমার অদ্ভুত কল্পনাশক্তির তারিফ না করে পারছি না—কখন এসব তথ্য আবিষ্কার করলে বল ত?

যে মুহূর্তে কাল রাত্রে এই ঘরে ঢুকে দেখলাম দু'জনে দুজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছ।

সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা অত্যন্ত নোংরা পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছ অলকা।

হ্যাঁ, অপরাধটা আমারই বটে।

এরপর একটা বিশ্রী নীরবতা বিরাজ করল কিছু সময়ের জন্য। কিছুই করবার নেই, অগত্যা কেস খুলে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিলেন অভিজিৎ গুপ্ত। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে তিনি ধূমপান করতে লাগলেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অলকাই আবার কথা সুরু করলেন:

আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। আমরা যখন বিয়ে করব ঠিক করেছি সেই সময় থেকেই আমার কেমন মনে হ'ত কারোকে প্রকাশ না করলেও এমন একজন বান্ধবী তোমার আছে, যার কাছে গিয়ে তুমি নির্বিচারে তোমার মনের সব গোপন কথা আলোচনা করো। যে সব কথা এমনকি আমার কাছে বলতেও তুমি অন্তর থেকে সায় পাও না। এরপর আমাদের বিয়ে হ'ল—এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য তোমার জীবন থেকে সে সরে গেল। সেইজন্যই বিয়ের পর প্রথম দিকটায় আমাদের এত আনন্দে কেটেছে। তারপর আবার তার চিন্তা তোমাকে পেয়ে বসল। এখন

ত সে নিজেই এসে হাজির হয়েছে—নিশ্চয় তোমার কাছ থেকেই খবর পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্ল্যান করে এখানে আমায় ডেকে এনে অপমান করবার অর্থ কি বলতে পার?

অস্থির ভাবে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করলেন অভিজিৎ গুপ্ত—তারপর অলকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমার এই উদ্ভট কল্পনা শক্তি দেখে যে কি চমৎকৃত হয়েছি অলকা, কি বলব!

বিরক্তিভরে অলকা চিৎকার করে উঠলেন—চুপ করো। এখানে আসবার আগে আমাদের মধ্যে কি ঠিক হয়েছিল?

বিশ্বাস করো অলকা, যা ঠিক হয়েছিল এখন পর্যন্ত তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। মিছিমিছি রাগ কোরো না—ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে আমাকে একটু সাহায্য কর। শোন অলকা, আমি এখন 'দুর্গম হয় পন্থা' বলে একটি নাটকে হাত দিয়েছি। চার বছর আগে এটাকে শেষ করে ফেলে রেখেছিলাম—এ লেখাটি সম্বন্ধে আমি কারোকেই কিছু বলি নি—কারণ নাটক শেষ হলে দেখলাম লেখাটি ঠিক আমার মনোমত হয় নি। আচ্ছা, এ রচনাটি সম্বন্ধে তুমি কিছু জানতে?

কিছুই না, কিন্তু এখন এ প্রশ্ন কেন?

অভিজিৎ অলকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন,

অথচ নাটকটি সম্বন্ধে সুজাতা সেন কিন্তু সব কথাই জানেন। অলকা গুপ্ত এবার তিক্তভাবে মন্তব্য করলেন: তা হ'লে এই সুজাতা সেন শুধুমাত্র নর্মসহচরী নন, সঙ্গে সঙ্গে কর্মসহচরীও?

বিরক্তিভরে অভিজিৎ জবাব দিলেন—কি বলতে চাইছি, আর তুমি কি ভাবে তার মানে করছ। সত্যিই অলকা, আজও পর্যন্ত তুমি আমাকে ঠিকভাবে বোঝবার চেষ্টা করলে না।

শ্লেষের হাসি হেসে অলকাদেবী বললেন: 'তা ত বটেই, আমি তোমাকে বোঝবার চেষ্টা করি নি, অথচ সুজাতা সেনের সঙ্গে তোমার কি চমৎকার আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং রয়েছে—না?

অভিজিৎ উষ্ণ হয়ে উঠলেন—কি আজেবাজে কথা বলছ। তুমি জান কবে এবং কখন ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে?

চড়া গলায় অলকা গুপ্তা উত্তর দিলেন—জানি না এবং জানবার প্রবৃত্তিও আমার হয় না। তোমাদের সম্বন্ধে আমি কি মনে করি তা ত একটু আগেই বললাম।

অভিজিৎ উত্তপ্ত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন—You have told me a lot of rubbish.

অলকা এতক্ষণের উত্তেজনায় যেন ক্লান্ত হ পড়েছিলেন। নীচু গলায় ডিস্ ইণ্টারেষ্টেড টো বললেন—বেশ বল, কোথায় এবং কবে ঐ মহিলার সা তোমার দেখা হয়েছে।

সেই কথাটাই তো শুনতে বলছি—দেখা হয়েছে য কাল সন্ধ্যায় এবং এই ঘরে।

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—You are a lia তোমার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না। তুমিই এইমাত্র বললে তোমার সযত্নে লুকিয়ে রাখা নাটকটি সম্বন্ধে সব খবর রাখেন এই মিস সুজাতা সেন।

বিরক্ত হয়ে উঠলেন অলকার কথা বলার ভঙ্গি অভিজিৎ—আমি এ বিষয়ে এতটুকুও বানিয়ে বলি নি শুনলে আশ্চর্য হবে, আমি যে এখানে আসছি সে কথা সুজাতা সেন এখানকার অন্য মহিলা বোর্ডার সুরমা মল্লিকে আগে থেকেই জানিয়েছিলেন। এমন কি যখন তোমা লং-ডিষ্টেন্সে কলকাতায় ফোন করছিলাম, তাও মিস সে শুনেছিলেন—যদিও সেই সময়টায় তিনি ছিলেন সমুদ্রে বুকে জাহাজের উপর।

কিছুক্ষণ চিন্তামগ্নভাবে ঘরময় পায়চারি করলে অভিজিৎ গুপ্ত—একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দি অলকার দিকে এগিয়ে এলেন। অলকা দেবী কি বল যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে ফের নিজের কথায় জে টেনে বলতে সুরু করলেন অভিজিৎ গুপ্ত—

কাল এই ঘরটায় ঢুকে প্রথমটায় তোমার সঙ্গে ওঁ ভুল করলাম—ভগবান জানেন কেন এই ধরনের ভুল হ'ল তারপরেই আমার মনে হল নিশ্চয়ই কোথাও আগে সুজা সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। পরে জানলা আমার এ ধারণাও ঠিক নয়—ওঁর সঙ্গে আমার আগে কখনও মৌখিক আলাপ হয় নি। সমস্ত ব্যাপারটাই যে কেমন উদ্ভট এবং রহস্যভরা বলে মনে হতে লাগল। ওঁ কাছ থেকে যখন এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছি, তু এসে ঘরে ঢুকলে আর সব দিলে পণ্ড করে।

হ্যাঁ, সব দোষটা ত আমারই। যাই হোক তোমা কথাই যদি সত্যি হয়—

আঃ কতবার বলব যে আমি একটি কথাও বানিয়ে বলি নি। মহিলা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। ওঁর ক বয়স, কোথায় থাকেন, কিছুই আমি জানি না।

তোমার বক্তব্য ত শুনলাম—বললেন অলকা। কিন্তু আমারই বা কাল ঘরে ঢোকবার সময় সঙ্গে সঙ্গে কেন মনে হল যে ওই মহিলা তোমাকে অনেকদিন থেকে জানেন। আমি আসাতেই…

তুমি যদি ঠিক সেই সময়টাতে না আসতে, আমি ব্যাপারটার খানিকটা হদিস পেতাম।

অলকা এবার বিরক্তভাবে মন্তব্য করলেন—অর্থাৎ যেমন সব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—সব দোষটাই আমার।

অসহিষ্ণুভাবে অভিজিৎ বলে উঠলেন—আহা, সে কথা ত বলছি না। আসল কথাটা বাদ দিয়ে···

এবার অলকা বাধা দিলেন। হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললেন: আচ্ছা অভিজিৎ! কাল সুজাতা সেন এ ঘর থেকে যাবার আগে বললেন যে উনি আগে ভেবেছিলেন এখান থেকে চলে যাবেন, কিন্তু সব দিক দেখে ঠিক ধরলেন, থেকে যাওয়াটাই সবার পক্ষে ভাল হবে। এ কথাটার মানে কি?

বিরক্তির সঙ্গে অভিজিৎ জবাব দিলেন—আমি ত টেলীপ্যাথী জানি না যে ওঁর মনে তখন কি হয়েছিল সেকথা তোমাকে বলব।

দরজার কাছে সুরমা মল্লিকাকে দেখে থেমে গেলেন। সুরমা মল্লিক এঁদের দেখে অভিনন্দনের সুরে বললেন: সুপ্রভাত মিষ্টার এণ্ড মিসেস গুপ্ত, আপনাদের ব্রেকফাষ্ট হয়ে গেছে না কি? আমি ত সেরে নিলাম।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রত্যভিবাদন জানালেন। অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে সুরমাদেবীর সঙ্গে অলকার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—আমরা এইবার গিয়ে ব্রেকফাষ্ট সেরে নেব। ভারী সুন্দর সকালটা—এখনি বেড়াতে বের হব—সারাদিন আজ বাইরেই থাকব। আপনারা বেরোবেন না মিসেস গুপ্ত?

আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

এরপর একটু ইতস্ততঃ করে অলকা গুপ্ত প্রশ্ন করলেন—মিস মল্লিক। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

আড়চোখে স্বামী-স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখলেন সুরমা দেবী—কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে যে এঁরা বিব্রত বোধ করছেন সে কথা বুঝতে তাঁর কোন অসুবিধা হ'ল না। তাই পাল্টা প্রশ্ন করলেন—মিস সেন সম্বন্ধে ত?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন—বিস্ময় মাখানো কণ্ঠে উত্তর দিলেন অলকা গুপ্ত। সুরমা দেবী এবার বেশ গম্ভীরভাবেই কথার জের টেনে বললেন—কি জানতে চান বলুন। আমিও অবশ্য ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না—তবে গত চারদিন এক সঙ্গে থাকবার পর······

কথাটা শেষ করলেন না সুরমা দেবী। অলকা গুপ্ত বেশ কুণ্ঠার সঙ্গে বলতে লাগলেন: 'মানে·· অভিজিতের কাছে যে সব কথা শুনলাম···আপনাকে আমি বেশ ফ্রাঙ্কলি আমার মনের কথাটা খুলে বলছি মিস মল্লিক···আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না যে মিস সেন সত্যি কথা বলেছেন।

একটু বিরক্তই বোধ করলেন সুরমা মল্লিক মিসেস গুপ্তের মন্তব্য শুনে। আসলে দিন চারেকের পরিচয়েই সুজাতাকে তিনি অন্তর থেকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। মুখে বললেন, সারাজীবন হেড মিষ্ট্রেসের কাজ করেছি—অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে মিসেস গুপ্ত। মুখের ভাব দেখে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমি ধরতে পারি, কে সত্যি কথা বলছে, আর কে বলছে না। মিস সেন যে মিথ্যে কথা বলছেন না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কি রকম অদ্ভুত মনে হয় না?

অদ্ভুত ব্যাপার যে অহরহই আমাদের চারপাশে ঘটতে দেখছি মিসেস গুপ্ত। কাল আপনারা আসবার আগে সুজাতা দেবীর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। উনি বলছিলেন সময় সময় উনি এমন সব লোক এবং ঘটনাবলী দেখতে পান···

আপনিও ত ব্যাপারটা হেঁয়ালী করে তুলছেন মিস মল্লিক—কাদের দেখতে পান উনি? জিজ্ঞেস করলেন অভিজিৎ গুপ্ত।

সাধারণে যাদের মনে করে মৃত বা অতীতের মানুষ।

আপনি কি অশরীরী আত্মাদের কথা বলছেন? প্রশ্ন করেন অলকা। সুরমা দেবী এ প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে নিজের মনেই বলে যান—মিস সেনের মতে এরা হচ্ছে কতকগুলো ইমপ্রেশনস। যেমন পায়ের ছাপ বা আঙুলের ছাপ—যা এক সময়ে জীবিত লোকেরা রেখে গেছেন প্রকৃতির বুকে। এ ছাড়া অতীত এবং ভবিষ্যতের, অর্থাৎ যা ঘটে গেছে বা পরে ঘটবে, এমন অনেক ঘটনাও তিনি চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখতে পান। আমাকেও এসব বিষয়ে যে সব কথা বলেছেন, বুদ্ধি দিয়ে তার ঠিক ব্যাখ্যা করা চলে না। দেখে-শুনে আমার মনে হয় ওঁর মনটা একটা বিশেষ ছাঁদে তৈরী, আর পাঁচ জনের সঙ্গে ওঁর ঠিক তুলনা করা যায় না।

অভিজিৎ এবার বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মন্তব্য করলেন, না হয় আপনার কথাই মানলাম। কিন্তু এর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলার কি অর্থ বলতে পারেন?

সুরমা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। যাই হোক নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমি ত তা বলতে পারি না। অবশ্য আমারও খুবই জানবার কৌতূহল। শুধু এইটুকুই জানি যে আপনার বিষয় অনেক কথাই মিস সেন জানেন।

মূর্তি। সূর্য বোধ হয় এবার মেঘের আড়ালে পড়ল—কারণ ঘরের রোদটা মিলিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটাও। কে জানে এটা অশরীরী আত্মা, না অতীতের মৃত মেমসাহেবটির চেহারার ইম্প্রেশন!

এরপর উত্তেজিতভাবে কথা কাটাকাটি করতে করতে এ ঘরে ঢুকবেন অভিজিৎ ও অলকা।

অলকা উষ্মার সঙ্গে বলবেন: তোমার একটু শান্তিতে বসে ব্রেকফাস্টটাও খেতে পারলাম না।

বেশ ত ফিরে যাও—গিয়ে একলা বসে আর একবার খেয়ে এস। যে মেয়েকে চিনিই না—তার সম্বন্ধে ঐ একঘেয়ে অভিযোগও শুনব আর ব্রেকফাস্টও খাব, এ আমার ধাতে সয় না—বেশ জোরগলায় উত্তর দিলেন অভিজিৎ গুপ্ত।

তাই বলে না খেয়ে উঠে আসবে?

তোমাকে ত বললাম ফিরে গিয়ে খাওয়া শেষ করে এস।

আমি এখানে খেতে আসি নি—আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তোমার সঙ্গে কতকগুলো বিষয়ে কথা বলা।

'তা হ'লে অনুগ্রহ করে খাওয়ার বিষয়ে আলোচনা না করে, কথাই বল। এখন এ ঘরে কেউ নেই ত, সুতরাং তোমার কথা বলার কোন বাধা নেই।

এরপর অভিজিৎ পেছনের দিকে গিয়ে জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থাকবেন, তারপর ফিরে বিরক্তিস্বরে আগের কথার জের টেনে বলবেন: বম্বে ছেড়ে এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে। তাচ্ছিল্যভরে অলকা গুপ্তা মন্তব্য করবেন: কোন বিষয়েই তোমার এতটুকু ধৈর্য নেই। এই জন্যই নিজেও কখনও শান্তি পাও না—আর অন্যদেরও শান্তিতে থাকতে দাও না।

এবার রাগে ফেটে পড়লেন অভিজিৎ গুপ্ত—আমাকে চমৎকার বুঝেছ তুমি। অস্থির ভাবে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করে ফের বলতে থাকবেন—গত কুড়ি বছর ধরে I am feeling within my bones যে অনেক কথা আমার বলতে হবে লেখার ভেতর দিয়ে—কেন জানি না কিছুতেই নিজের বক্তব্য ভাষায়—কিসের একটা অভাবে আমার মন যেন পঙ্গু হয়ে গেছে আর তুমি এসেছ উপদেশ দিতে ধৈর্য ধরতে।

অলকা এবার বাধা দিয়ে বলে উঠবেন—'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না একথা ত বহুবার বলেছ। যা হোক আমাকে যা তা বলে বা এই জায়গাটার ওপর দোষারোপ করে ত লাভ নেই। এখানে আসবার কথা ত তুমিই suggest করেছিলে।

তার মানে যেহেতু এ জায়গাটা আমিই বেছেছি সুতরাং আমাকে বলতে হবে এখানকার সব কিছুই ভাল —এখানকার বিশ্রী ব্রেকফাষ্ট অতি চমৎকার খেতে—এখানকার এই পচা বৃষ্টি অতি সুন্দর—কি বল?

বিরক্তি সত্ত্বেও অভিজিতের এই অদ্ভুত ধরনের কথা শুনে অলকা খিলখিল করে হেসে উঠবেন। তারপর বলবেন—শোন 'অভিজিৎ।'

বল।

নিজেদের ভেতর এমন খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার সুযোগ আর হয়ত পাওয়া যাবে না। এখানে যখন এসেইছি......

বেশ ত, সুরু কর—

আচ্ছা, কাল যখন এখানে এসে পৌছলে তখনও কি তোমার মনটা এমনি তিক্ততায় ভরা ছিল?

মোটেই না। গত ছ'মাস আমি বেশ ভাল ছিলাম। ভাবলাম এখানে এসে নিজেদের মধ্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে। I wanted either to mend it or end it. ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক হয়ে গেলে পর, নিশ্চিতভাবে আমার কাজ শুরু করতে পারব। আমিও এই ভেবেই এসেছিলাম এবং সেইটেই আমার বোকামী হয়েছে—কিন্তু সত্যিই আশা করেছিলাম···

যাই হোক······কি বলতে যাচ্ছিলে?

এখানে আসা পর্যন্ত তোমার মনে যদি বেশ শান্তিই ছিল, তবে হঠাৎ এ পরিবর্তনটা এল কেন?

অলকার কথায় আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

অভিজিৎ বিদ্রূপের সুরে বললেন: ঘুরে-ফিরে আমাদের আলোচনাটা গিয়ে পর্যবসিত হবে সুজাতা সেনের উপর।

বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছ।

আমি বহুদিন থেকে সুজাতা সেনকে চিনি—এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই অলকা।

তুমি যখন বলছ, আমি মেনে নিচ্ছি তোমাদের আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু একথা নিশ্চয় অস্বীকার করবে না যে, মিস সেনকে দেখবার পর থেকেই তোমার ভেতর একটা পরিবর্তন এসেছে?

সেটা আর কিছু নয়—আমি শুধু অবাক হয়ে গেছি এই ভেবে, মিস সেন আমার জীবনের এত সব গোপন খবর জানতে পারলেন কি করে?

অলকা গুপ্তা একটু ইতস্তত: করে বললেন—রাগ করো না অভিজিৎ—আমার ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিচ্ছে...তোমাদের দু'জনের ভেতর এমন একটা কিছু আছে—

অভিজিৎ রূঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—এ আলোচনা কিন্তু আগেই একবার হয়ে গেছে।

অলকা এবার একটু নরম হয়ে বললেন: অভিজিৎ! হয়ত আমি বোকার মত কথা বলছি, তবু বিশ্বাস কর, আমি মনে মনে যা উপলব্ধি করছি তাই তোমাকে বললাম। তোমার আমার মাঝে এরই অদৃশ্য presence আমি যেন বারবার অনুভব করেছি। এরই ভয়ে আমি সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থেকেছি।

কিসের ভয়?

যে শেষ পর্যন্ত এ এসে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—বলতে বলতে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবেন অলকা গুপ্ত।

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করবেন অভিজিৎ, মুখে বলবেন: This is unfair, অলকা।

ঠিক এই টেন্স মুহূর্তে অনাদিবাবু ঘরে ঢুকে অভিজিৎকে সম্বোধন করে কি বলতে উঠবেন—কিন্তু তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রাগত স্বরে অভিজিৎ চীৎকার করে উঠবে—আপনার জ্বালায় কি মশায় আমরা নিজেরা বসে একটু আলোচনা করতে পারব না। প্রথমটায় অনাদিবাবু একটু হকচকিয়ে যাবেন। কোন একজন ভদ্রলোক যে অপর একজন অপরিচিতকে এভাবে অপমানকর কথা বলতে পারেন এ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন: আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম সাকে আপনাদের জন্য বিশেষভাবে কিছু করতে হবে কি না?

একই ভঙ্গিতে অভিজিৎ বললে—মহা কর্তব্যজ্ঞান দেখাতে এসেছেন। অন্যের কথা শোনবার জন্য এত কৌতূহল কেন মশাই?

এবার অনাদিবাবুও বেশ রুক্ষস্বরেই জবাব দিলেন:

সিটিং রুমটা গোপন কথা বলবার জায়গা নয় মি: গুপ্ত—নিজেদের ঘরে বসে আলোচনা করুন না···

অভিজিৎ এ কথায় ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে উত্তর দেবে—থাক, আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না—

দেখুন মি: গুপ্ত, একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন—আপনার ঐ চোখ রাঙানোকে আমি ভয় করি না। ভাল না লাগলে অন্য হোটেলে যান।'

কি বললেন? সামান্য হোটেলওয়ালার এত তেজ? রাগতভাবে অনাদিবাবুর দিকে এগিয়ে আসবেন অভিজিৎ।

অনাদিবাবু তাচ্ছিল্যভাবে বিদ্রূপের সুরে বলবেন—মারবেন না কি?

অভিজিৎ যেন সমস্ত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছেন—তাঁর ভেতরের অশান্ত পশুটা জেগে উঠেছে—দ্রুতবেগে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে অনাদিবাবুর দুই কাঁধ চেপে ধরবেন—ঠিক এই সময় দরজার ফাঁক থেকে সুজাতা সেনের উৎকণ্ঠাপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে: অভিজিৎ, ফাদার ভারমিয়ারের উপদেশ ভুলে যেও না।"

চমকে উঠে অভিজিৎ অনাদিবাবুর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে সুজাতাও ঘরে ঢুকবে। বিস্মিতভাবে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করবেন ফাদার ভারমিয়ার···সে কথা তুমি···আপনি কি করে জানলেন? সুজাতা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনাদিবাবুকে সম্বোধন করে বলবে, আপনি দয়া করে ভেতরে যান। অনাদিবাবু তখনও নিজেকে সামলাতে পারেন নি। বললেন—শুনলেন ত মিস সেন, নিজের কানেই ত শুনলেন, কি বিশ্রীভাবে···

আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি—কিছু মনে করবেন না। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

অগত্যা অনাদিবাবু ভেতরের দিকে পা চালালেন।

মূর্তি। সূর্য বোধ হয় এবার মেঘের আড়ালে পড়ল—কারণ ঘরের রোদটা মিলিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটাও। কে জানে এটা অশরীরী আত্মা, না অতীতের মৃত মেমসাহেবটির চেহারার ইম্প্রেশন !

এরপর উত্তেজিতভাবে কথা কাটাকাটি করতে করতে এ ঘরে ঢুকবেন অভিজিৎ ও অলকা।

অলকা উষ্মার সঙ্গে বলবেন: তোমার একটু শান্তিতে বসে ব্রেকফাস্টটাও খেতে পারলাম না।

বেশ ত ফিরে যাও—গিয়ে একলা বসে আর একবার খেয়ে এস। যে মেয়েকে চিনিই না—তার সম্বন্ধে ঐ একঘেয়ে অভিযোগও শুনব আর ব্রেকফাস্টও খাব, এ আমার ধাতে সয় না—বেশ জোরগলায় উত্তর দিলেন অভিজিৎ গুপ্ত।

তাই বলে না খেয়ে উঠে আসবে ?

তোমাকে ত বললাম ফিরে গিয়ে খাওয়া শেষ করে এস।

আমি এখানে খেতে আসি নি—আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তোমার সঙ্গে কতকগুলো বিষয়ে কথা বলা।

'তা হ'লে অনুগ্রহ করে খাওয়ার বিষয়ে আলোচনা না করে, কথাই বল। এখন এ ঘরে কেউ নেই ত, সুতরাং তোমার কথা বলার কোন বাধা নেই।

এরপর অভিজিৎ পেছনের দিকে গিয়ে জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থাকবেন, তারপর ফিরে বিরক্তিভরে আগের কথার জের টেনে বলবেন: ঘর ছেড়ে এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে। তাচ্ছিল্যভরে অলকা গুপ্তা মন্তব্য করবেন: কোন বিষয়েই তোমার এতটুকু ধৈর্য নেই। এই জন্যই নিজেও কখনও শান্তি পাও না—আর অন্যদেরও শান্তিতে থাকতে দাও না।

এবার রাগে ফেটে পড়লেন অভিজিৎ গুপ্ত—আমাকে চমৎকার বুঝেছ তুমি। অস্থির ভাবে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করে ফের বলতে থাকবেন—গত কুড়ি বছর ধরে I am feeling within my bones যে অনেক কথা আমায় বলতে হবে লেখার ভেতর দিয়ে—কেন জানি না কিছুতেই নিজের বক্তব্য ভাবার—কিসের একটা অভাবে আমার মন যেন পঙ্গু হয়ে গেছে আর তুমি এসেছ উপদেশ দিতে ধৈর্য ধরতে।

অলকা এবার বাধা দিয়ে বলে উঠবেন—'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না একথা ত বহুবার বলেছ। যাই হোক আমাকে যা তা বলে বা এই জায়গাটার ওপর দোষারোপ করে ত লাভ নেই। এখানে আসবার কথা ত তুমিই suggest করেছিলে।

তার মানে যেহেতু এ জায়গাটা আমিই বেছেছি সুতরাং আমাকে বলতে হবে এখানকার সব কিছুই ভাল—এখানকার বিশ্রী ব্রেকফাস্ট অতি চমৎকার খেতে—এখানকার এই পচা বৃষ্টি অতি সুন্দর—কি বল ?

বিরক্তি সত্ত্বেও অভিজিতের এই অদ্ভুত ধরনের কথা শুনে অলকা খিলখিল করে হেসে উঠবেন। তারপর বলবেন—শোন 'অভিজিৎ।'

বল।

নিজেদের ভেতর এমন খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার সুযোগ আর হয়ত পাওয়া যাবে না। এখানে যখন এসেইছি......

বেশ ত, সুরু কর—

আচ্ছা, কাল যখন এখানে এসে পৌঁছলে তখনও কি তোমার মনটা এমনি তিক্ততায় ভরা ছিল ?

মোটেই না। গত দু'মাস আমি বেশ ভাল ছিলাম। ভাবলাম এখানে এসে নিজেদের মধ্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে। I wanted either to mend it or end it. ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক হয়ে গেলে পর, নিশ্চিন্তভাবে আমার কাজ শুরু করতে পারব। আমিও এই ভেবেই এসেছিলাম এবং সেইটেই আমার বোকামী হয়েছে—কিন্তু সত্যিই আশা করেছিলাম···

যাই হোক······কি বলতে যাচ্ছিলে ?

এখানে আসা পর্যন্ত তোমার মনে যদি বেশ শান্তিই ছিল, তবে হঠাৎ এ পরিবর্তনটা এল কেন ?

অলকার কথায় আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

অভিজিৎ বিদ্রূপের সুরে বললেন: ঘুরে-ফিরে আমাদের আলোচনাটা গিয়ে পর্যবসিত হবে সুজাতা সেনের উপর।

বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছ।

আমি বহুদিন থেকে সুজাতা সেনকে চিনি—এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই অলকা।

তুমি যখন বলছ, আমি মেনে নিচ্ছি তোমাদের আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু একথা নিশ্চয় অস্বীকার করবে না যে, মিস সেনকে দেখবার পর থেকেই তোমার ভেতর একটা পরিবর্তন এসেছে?

সেটা আর কিছু নয়—আমি শুধু অবাক হয়ে গেছি এই ভেবে, মিস সেন আমার জীবনের এত সব গোপন খবর জানতে পারলেন কি করে?

অলকা গুপ্তা একটু ইতস্তত: করে বললেন—রাগ করো না অভিজিৎ—আমার ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিচ্ছে...তোমাদের দু'জনের ভেতর এমন একটা কিছু আছে—

অভিজিৎ রূঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—এ আলোচনা কিন্তু আগেই একবার হয়ে গেছে।

অলকা এবার একটু নরম হয়ে বললেন: অভিজিৎ! হয়ত আমি বোকার মত কথা বলছি, তবু বিশ্বাস কর, আমি মনে মনে যা উপলব্ধি করছি তাই তোমাকে বললাম। তোমার আমার মাঝে এরই অদৃশ্য presence আমি যেন বারবার অনুভব করেছি। এরই ভয়ে আমি সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থেকেছি।

কিসের ভয়?

যে শেষ পর্যন্ত এ এসে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—বলতে বলতে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবেন অলকা গুপ্ত।

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করবেন অভিজিৎ, মুখে বলবেন: This is unfair, অলকা।

ঠিক এই টেন্স মুহূর্তে অনাদিবাবু ঘরে ঢুকে অভিজিৎকে সম্বোধন করে কি বলতে উঠবেন—কিন্তু তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রাগত স্বরে অভিজিৎ চীৎকার করে উঠবে—আপনার জ্বালায় কি মশায় আমরা নিজেরা বসে একটু আলোচনা করতে পারব না। প্রথমটায় অনাদিবাবু একটু হকচকিয়ে যাবেন। কোন একজন ভদ্রলোক যে অপর একজন অপরিচিতকে এভাবে অপমানকর কথা বলতে পারেন এ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন: আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম যাকে আপনাদের জন্য বিশেষভাবে কিছু করতে হবে কি না?

একই ভঙ্গিতে অভিজিৎ বললে—মহা কর্তব্যজ্ঞান দেখাতে এসেছেন। অন্যের কথা শোনবার জন্য এত কৌতূহল কেন মশাই?

এবার অনাদিবাবুও বেশ রুক্ষস্বরেই জবাব দিলেন:

সিটিং রুমটা গোপন কথা বলবার জায়গা নয় মি: গুপ্ত—নিজেদের ঘরে বসে আলোচনা করুন না...

অভিজিৎ এ কথায় ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে উত্তর দেবে—থাক, আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না—

দেখুন মি: গুপ্ত, একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন—আপনার ঐ চোখ রাঙানোকে আমি ভয় করি না। ভাল না লাগলে অন্য হোটেলে যান।'

কি বললেন? সামান্য হোটেলওয়ালার এত তেজ? রাগতভাবে অনাদিবাবুর দিকে এগিয়ে আসবেন অভিজিৎ।

অনাদিবাবু তাচ্ছিল্যভাবে বিদ্রূপের সুরে বলবেন—মারবেন না কি?

অভিজিৎ যেন সমস্ত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছেন—তাঁর ভেতরের অশান্ত পশুটা জেগে উঠেছে—দ্রুতবেগে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে অনাদিবাবুর দুই কাঁধ চেপে ধরবেন—ঠিক এই সময় দরজার ফাঁক থেকে সুজাতা সেনের উৎকণ্ঠাপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে: অভিজিৎ, ফাদার ভারমিয়ারের উপদেশ ভুলে যেও না।"

চমকে উঠে অভিজিৎ অনাদিবাবুর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে সুজাতাও ঘরে ঢুকবে। বিস্মিতভাবে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করবেন ফাদার ভারমিয়ার...সে কথা তুমি...আপনি কি করে জানলেন? সুজাতা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনাদিবাবুকে সম্বোধন করে বলবে, আপনি দয়া করে ভেতরে যান। অনাদিবাবু তখনও নিজেকে সামলাতে পারেন নি। বললেন—শুনলেন ত মিস সেন, নিজের কানেই ত শুনলেন, কি বিশ্রীভাবে...

আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি—কিছু মনে করবেন না। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

অগত্যা অনাদিবাবু ভেতরের দিকে পা চালালেন।

মূর্তি। সূর্য বোধ হয় এবার মেঘের আড়ালে পড়ল—কারণ ঘরের রোদটা মিলিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটাও। কে জানে এটা অশরীরী আত্মা, না অতীতের মৃত মেমসাহেবটির চেহারার ইমপ্রেশন!

এরপর উত্তেজিতভাবে কথা কাটাকাটি করতে করতে এ ঘরে ঢুকবেন অভিজিৎ ও অলকা।

অলকা উষ্মার সঙ্গে বলবেন: তোমার একটু শান্তিতে বসে ব্রেকফাষ্টটাও খেতে পারলাম না।

বেশ ত ফিরে যাও—গিয়ে একলা বসে আর একবার খেয়ে এস। যে মেয়েকে চিনিই না—তার সম্বন্ধে ঐ একঘেয়ে অভিযোগও শুনব আর ব্রেকফাষ্টও খাব, এ আমার ধাতে সয় না—বেশ জোরগলায় উত্তর দিলেন অভিজিৎ গুপ্ত।

তাই বলে না খেয়ে উঠে আসবে?

তোমাকে ত বললাম ফিরে গিয়ে খাওয়া শেষ করে এস।

আমি এখানে খেতে আসি নি—আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তোমার সঙ্গে কতকগুলো বিষয়ে কথা বলা।

'তা হ'লে অনুগ্রহ করে খাওয়ার বিষয়ে আলোচনা না করে, কথাই বল। এখন এ ঘরে কেউ নেই ত, সুতরাং তোমার কথা বলার কোন বাধা নেই।

এরপর অভিজিৎ পেছনের দিকে গিয়ে জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থাকবেন, তারপর ফিরে বিরক্তিভরে আগের কথার জের টেনে বলবেন: ঘর ছেড়ে এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে। তাচ্ছিল্যভরে অলকা গুপ্তা মন্তব্য করবেন: কোন বিষয়েই তোমার এতটুকু ধৈর্য নেই। এই জন্যই নিজেও কখনও শান্তি পাও না—আর অন্যদেরও শান্তিতে থাকতে দাও না।

এবার রাগে ফেটে পড়লেন অভিজিৎ গুপ্ত—আমাকে চমৎকার বুঝেছ তুমি! অস্থির ভাবে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করে ফের বলতে থাকবেন—গত কুড়ি বছর ধরে I am feeling within my bones যে অনেক কথা আমার বলতে হবে লেখার ভেতর দিয়ে—কেন জানি না কিছুতেই নিজের বক্তব্য ভাষায়—কিসের একটা অভাবে আমার মন যেন পঙ্গু হয়ে গেছে আর তুমি এসেছ উপদেশ দিতে ধৈর্য ধরতে।

অলকা এবার বাধা দিয়ে বলে উঠবেন—'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না একথা ত বহুবার বলেছ। যাই হোক আমাকে যা তা বলে বা এই জায়গাটার ওপর দোষারোপ করে ত লাভ নেই। এখানে আসবার কথা ত তুমিই suggest করেছিলে।

তার মানে যেহেতু এ জায়গাটা আমিই বেছেছি সুতরাং আমাকে বলতে হবে এখানকার সব কিছুই ভাল—এখানকার বিশ্রী ব্রেকফাষ্ট অতি চমৎকার খেতে—এখানকার এই পচা বৃষ্টি অতি সুন্দর—কি বল?

বিরক্তি সত্ত্বেও অভিজিতের এই অদ্ভুত ধরনের কথা শুনে অলকা খিলখিল করে হেসে উঠবেন। তারপর বলবেন—শোন 'অভিজিৎ।'

বল।

নিজেদের ভেতর এমন খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার সুযোগ আর হয়ত পাওয়া যাবে না। এখানে যখন এসেইছি……

বেশ ত, সুরু কর—

আচ্ছা, কাল যখন এখানে এসে পৌছলে তখনও কি তোমার মনটা এমনি তিক্ততায় ভরা ছিল?

মোটেই না। গত দু'মাস আমি বেশ ভাল ছিলাম। ভাবলাম এখানে এসে নিজেদের মধ্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে। I wanted either to mend it or end it. ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক হয়ে গেলে পর, নিশ্চিন্তভাবে আমার কাজ শুরু করতে পারব। আমিও এই ভেবেই এসেছিলাম এবং সেইটেই আমার বোকামী হয়েছে—কিন্তু সত্যিই আশা করেছিলাম…

যাই হোক……কি বলতে যাচ্ছিলে?

এখানে আসা পর্যন্ত তোমার মনে যদি বেশ শান্তিই ছিল, তবে হঠাৎ এ পরিবর্তনটা এল কেন?

অলকার কথায় আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

অভিজিৎ বিদ্রূপের সুরে বললেন: ঘুরে-ফিরে আমাদের আলোচনাটা গিয়ে পর্যবসিত হবে সুজাতা সেনের উপর।

বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছ।

আমি বহুদিন থেকে সুজাতা সেনকে চিনি—এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই অলকা।

তুমি যখন বলছ, আমি মেনে নিচ্ছি তোমাদের আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু একথা নিশ্চয় অস্বীকার করবে না যে, মিস সেনকে দেখবার পর থেকেই তোমার ভেতর একটা পরিবর্তন এসেছে?

সেটা আর কিছু নয়—আমি শুধু অবাক হয়ে গেছি এই ভেবে, মিস সেন আমার জীবনের এত সব গোপন খবর জানতে পারলেন কি করে?

অলকা গুপ্তা একটু ইতস্তত: করে বললেন—রাগ করো না অভিজিৎ—আমার ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিচ্ছে...তোমাদের দু'জনের ভেতর এমন একটা কিছু আছে—

অভিজিৎ রূঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—এ আলোচনা কিন্তু আগেই একবার হয়ে গেছে।

অলকা এবার একটু নরম হয়ে বললেন: অভিজিৎ! হয়ত আমি বোকার মত কথা বলছি, তবু বিশ্বাস কর, আমি মনে মনে যা উপলব্ধি করছি তাই তোমাকে বললাম। তোমার আমার মাঝে এরই অদৃশ্য presence আমি যেন বারবার অনুভব করেছি। এরই ভয়ে আমি সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থেকেছি।

কিসের ভয়?

যে শেষ পর্যন্ত এ এসে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—বলতে বলতে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবেন অলকা গুপ্ত।

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করবেন অভিজিৎ, মুখে বলবেন: This is unfair, অলকা।

ঠিক এই টেন্স মুহূর্তে অনাদিবাবু ঘরে ঢুকে অভিজিৎকে সম্বোধন করে কি বলতে উঠবেন—কিন্তু তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রাগত স্বরে অভিজিৎ চীৎকার করে উঠবে—আপনার জ্বালায় কি মশায় আমরা নিজেরা বসে একটু আলোচনা করতে পারব না। প্রথমটায় অনাদিবাবু একটু হকচকিয়ে যাবেন। কোন একজন ভদ্রলোক যে অপর একজন অপরিচিতকে এভাবে অপমানকর কথা বলতে পারেন এ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন: আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম তাকে আপনাদের জন্ত বিশেষভাবে কিছু করতে হবে কি না?

একই ভঙ্গিতে অভিজিৎ বললে—মহা কর্তব্যজ্ঞান দেখাতে এসেছেন। অন্তের কথা শোনবার জন্ত এত কৌতূহল কেন মশাই?

এবার অনাদিবাবুও বেশ রুক্ষস্বরেই জবাব দিলেন:

সিটিং রুমটা গোপন কথা বলবার জায়গা নয় মি: গুপ্ত—নিজেদের ঘরে বসে আলোচনা করুন না...

অভিজিৎ এ কথায় ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে উত্তর দেবে—থাক, আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না—

দেখুন মি: গুপ্ত, একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন—আপনার ঐ চোখ রাঙানোকে আমি ভয় করি না। ভাল না লাগলে অন্ত হোটেলে যান।'

কি বললেন? সামান্ত হোটেলওয়ালার এত তেজ? রাগতভাবে অনাদিবাবুর দিকে এগিয়ে আসবেন অভিজিৎ।

অনাদিবাবু তাচ্ছিল্যভাবে বিদ্রূপের সুরে বলবেন—মারবেন না কি?

অভিজিৎ যেন সমস্ত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছেন—তাঁর ভেতরের অশান্ত পশুটা জেগে উঠেছে—দ্রুতবেগে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে অনাদিবাবুর দুই কাঁধ চেপে ধরবেন—ঠিক এই সময় দরজার ফাঁক থেকে সুজাতা সেনের উৎকণ্ঠা-পূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে: অভিজিৎ, ফাদার ডারমিয়ারের উপদেশ ভুলে যেও না।"

চমকে উঠে অভিজিৎ অনাদিবাবুর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে সুজাতাও ঘরে ঢুকবে। বিস্মিতভাবে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করবেন ফাদার ডারমিয়ার...সে কথা তুমি...আপনি কি করে জানলেন? সুজাতা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনাদিবাবুকে সম্বোধন করে বলবে, আপনি দয়া করে ভেতরে যান। অনাদিবাবু তখনও নিজেকে সামলাতে পারেন নি। বললেন—শুনলেন ত মিস সেন, নিজের কানেই ত শুনলেন, কি বিশ্রীভাবে...

আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি—কিছু মনে করবেন না। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

অগত্যা অনাদিবাবু ভেতরের দিকে পা চালালেন।

এরা দু'জনে কিন্তু কিছুক্ষণ বিস্ময়ভাবে সুজাতার দিকে চেয়ে রইলেন। অলকা অভিজিৎকে উদ্দেশ করে বললেন, ফাদার ভারমিয়ার। উনি তোমাকে কি বলেছিলেন তাঁর বিষয়ে? অভিজিৎ যেন আত্মমগ্নভাবেই বলতে লাগলেন: "ছেলেবেলায় St. Xaviers School-এ পড়তাম। একজন সহপাঠী একদিন আমাকে অপমান করে—রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এমনভাবে তার গলা টিপে ধরেছিলাম যে ফাদার এসে ছাড়িয়ে না দিলে সেদিন ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারত। হঠাৎ কি মনে হওয়াতে অভিজিৎ গুপ্ত থেমে গেলেন—তারপর সুজাতার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—এরপর কি হয়েছিল মিস সেন? বলতে পারেন তার পরের কথা? আপনি ত সর্বজ্ঞ।

সুজাতা সেনকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন অভিজিতের ঐ কাহিনী শুনতে শুনতে সম্মোহিতের মত হয়ে গেছেন। স্বপ্নের ঘোরেই যেন তিনি উত্তর দিলেন—তাঁর চেহারা ছিল খুব লম্বা ও জোয়ান। দুই হাত দিয়ে আপনার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়েছিলেন এই বৃদ্ধ মানুষটি—আপনার দুরন্ত রাগ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল এবং ভয়ে আপনি শিউরে উঠেছিলেন। এবার অভিজিৎ খুব মৃদুকণ্ঠে বলতে থাকবেন—ফাদার ভারমিয়ার সেদিন বলেছিলেন—তোমার মনের ভেতর একটা পাগলা কুকুর বাস করছে গুপ্ত—এটাকে যদি বাইরে আসতে দাও তবে তোমার মহা সর্বনাশ ঘটবে—সবসময় আমার একথাটা স্মরণ রেখে নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করবে।'

অতীতের কাহিনী বলতে বলতে যেন অতীতের মধ্যেই বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন অভিজিৎ গুপ্ত। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সুজাতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ফাদার ভারমিয়ার কি এ কথা কখনও গল্পচ্ছলে আপনাকে বলেছিলেন? আপনি নিশ্চয় তাঁকে জানতেন?

সুজাতা সেনকে এখন অনেক শান্ত ও সমাহিত মনে হচ্ছিল। অভিজিতের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—না। আমি একবার তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম ঐ অবস্থায় আপনার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব—অধৈর্যভাবে জিজ্ঞেস করবেন অভিজিৎ গুপ্ত।

এই মন্তব্যে এতটুকু বিচলিত না হয়ে সুজাতা বলতে থাকবে—দিল্লীতে একটি হোটেলের সিটিং-রুমে বসে একদিন এই ঘটনার কথা আপনি ভাবছিলেন—তার আগেই হোটেলের একটি কর্মচারীর ব্যবহারে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন······

আশ্চর্য হয়ে অভিজিৎ মনে মনে কি হিসাব করলেন—তিন বছর আগে?

হ্যা, তিন বছর আগে।

এগিয়ে এসে সুজাতা সেনের মুখোমুখি হয়ে বসবেন অভিজিৎ গুপ্ত। তারপর বলবেন—এ নিয়ে আমাদের বিশদভাবে আলোচনা হওয়া দরকার মিস সেন। কোন ওজর-আপত্তি দেখিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না—আপনি বিশদভাবে এ ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলুন। এঁদের এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ভয়ে শিউরে উঠছিলেন অলকা। তাঁর মনে হচ্ছিল এ নিয়ে বেশী আলোচনা হলে তাঁরই হবে সমূহ বিপদ—তাই ভয়ে ভয়ে বলে উঠলেন—না, না, অভিজিৎ, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই কোন দরকার নেই ওই সব কথা আলোচনার।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে অভিজিৎ চীৎকার করে উঠলেন—আঃ বাধা দিও না অলকা—তুমি এখান থেকে যাও।

বাইরের এক মহিলার সামনে এভাবে অপমান করাতে অলকাদেবী আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না—কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সুজাতা সেন নিজের চেয়ার ছেড়ে অলকার সামনে এসে দাঁড়ালেন, সহানুভূতিভরে ডাকলেন, মিসেস গুপ্ত!

অলকা কিন্তু তাতে আরও চটে উঠলেন, দৃপ্তভঙ্গিতে সুজাতার দিকে চোখ তুলে বললেন—আপনি সব সময় আমাদের মাঝে অদৃশ্যভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন।

ব্যথিতভাবে সুজাতা জবাব দিলেন, এ আপনার অত্যন্ত ভুল ধারণা মিসেস গুপ্ত। অভিজিৎ অসহিষ্ণুভাবে বলবে—অলকা, দোহাই তোমার, এখান থেকে এখন যাও। আমাকে এ ব্যাপারটা একটু স্পষ্টভাবে বুঝতে দাও।

এ ধরণের কথায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন অলকা গুপ্ত।

এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অসহায় বোধ করবেন সুজাতা সেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমারই উচিত ছিল এখান থেকে চলে যাওয়া।

তা হ'লে আমাকেও সেই সঙ্গে যেতে হ'ত—কারণ আমাকে এই ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে হবে। আমার সম্বন্ধে এমন অনেক কথাই আপনি জানেন যা আর কেউ জানে না! কি করে এটা সম্ভব হ'ল? এ কি কোন রকম অলৌকিক ব্যাপার, clair voyance বা টেলিপ্যাথী?—প্রশ্ন করলেন অভিজিৎ গুপ্ত।

সুজাতা সেন উত্তর দিলেন—আমি এর নাম দিয়েছি পর্যবেক্ষণ। সাধারণ চোখে দেখার সঙ্গে এর তফাৎ আছে—এই পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ভাবাবেগ, চিন্তাধারা সব কিছুকেই অনুভব করা যায়।

দূর থেকেও কি এই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব!

সময় সময় অনেক, অনেক দূর থেকেও এভাবে দেখা যায়। এমন কি দূর অতীত বা অনাগত ভবিষ্যতের ছবিও স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

আপনার এই যে দেখবার ক্ষমতা এটা ত সব কিছুর বেলায়ই প্রযোজ্য হওয়া উচিত—তবে আমাকেই বিশেষভাবে কেন্দ্র করে আপনার এই দৃষ্টিশক্তি কার্যকরী হয়ে উঠেছে কেন বলতে পারেন?

এ প্রশ্ন আমার মনেও এসেছে—বললেন সুজাতা সেন। তারপর কথার জের টেনে বলতে শুরু করলেন—Perhaps it began as a mere accident—like—like telephone wires getting crossed, অথবা এও হতে পারে আমাদের এই পৃথিবী বা এই পার্থিব সময়ের গভীর বাইরে এমন একটা মহাজগৎ এবং মহাকালের অস্তিত্ব আছে যেখানে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ রয়েছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝতে শিখেছি যে, মানুষের সত্তার একটা বড় অংশই আমাদের এই পৃথিবীর স্থান-কালের বাইরে অবস্থান করছে।

এ কথা শুনে অভিজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা, এ বিষয়ে আপনার প্রথম অনুভূতির কথা বলুন।

সুজাতা উত্তর দিলেন—পাঁচ বছর আগে একবার আমার বিশ্রি রকমের ফ্লু হয়। জ্বর কমবার পরও কিন্তু তেমন ভালভাবে সেরে উঠি নি—নাট্যাচার্য পরিচালিত আপনার একটি নাটক দেখতে যাই···

অভিজিৎ বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ড্রামা-ক্রিটিক?

না, এ সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান তা আপনার নাটক পড়ে এবং অভিনয় দেখে···

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অভিজিৎ বললেন, সত্যিই মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে কত কালের পরিচয়!

সুজাতা সেন যেন সম্মোহিতের মত বলে চললেন—আপনার ঐ নাটকটির নাম ছিল 'বাসির বরণ'—প্রথম অভিনয় রাত্রে দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। অন্য এক নাট্যালয়ের···

সুজাতার কথায় বাধা দিয়ে অভিজিৎ বলে উঠলেন, কলকাতার রঙ্গ-জগতের সেই বলিবর্দরূপে খ্যাত নট-নাট্যকার ও নাট্যাচার্য হিমেশ দাশ আমাকে নৈশ আহারের নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। খাওয়া শেষ হবার পর এই ভাণ্ডার হেডটি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে নাট্যাচার্যের সঙ্গে থাকলে আমার নাটকের কমার্শিয়াল সাকসেস হবে না—কিন্তু ওর ষ্টেজে প্রতিটি নাটক শত রজনী ধরে চলে, সুতরাং ওর সঙ্গে একযোগে কাজ করলে আমি উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পারব। আমি তাকে মুখের উপর শুনিয়ে দিই যে নাট্যাচার্যের মঞ্চে আমার নাটক এক রাত্রি অভিনয় হওয়াটাকেও আমি ওর মঞ্চে শত রজনী অভিনয়ের থেকে গৌরবের কথা বলে মনে করি।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন অভিজিৎ গুপ্ত—এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন।

সুজাতা সেন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—এরপর অনেক রাত্রে আপনি বাড়ী ফিরে আসেন—ঘুম আসছে না বলে লেখবার টেবিলের কাছে বসে আপনি চিন্তা করছিলেন—মনটা তখন আপনার গভীর বিষাদে ভরা···

এ কথা শুনে চমকে উঠবেন অভিজিৎ। প্রশ্ন করবেন—আপনি এত কথা কি করে জানতে পারলেন?

মৃদু হেসে জবাব দিলেন সুজাতা—আমি তখন ঐ

থিয়েটার থেকে ফিরে এসে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে আপনার নাটকটি সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম, সেই প্রথম, একের পর এক, ঐ সব দৃশ্যগুলো আমার চোখের উপর ভেসে উঠল—

অভিজিৎ অবাক হয়ে বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন—সে রাত্রে বাড়ীতে ফিরে আমার মনটা বিষাদে ভরে গিয়েছিল—কি কারণে এমনটা হয়েছিল বলতে পারেন ?

পারি বৈ কি ! যদিও সে রাত্রে আপনার নাটক যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে, আপনি নিজে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন এ সাফল্যের মূলে ছিল নাট্যাচার্যের অভিনয়—আসলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আপনার নাটকটিতে অনেক ডিফেক্টস রয়ে গেছে।

অভিজিৎ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকলেন সুজাতার দিকে, তারপর বললেন, আশ্চর্য ! আপনি যা বললেন তা একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। কিন্তু আমার এই মনের ভাবটা ত আমি কাউকে বলি নি—সুতরাং অন্যের কাছ থেকে এ কথা জানা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সুজাতা নিজের কথার জের টেনে বললেন, এই ভাবেই আমার প্রথম অনুভূতির সুরু হয়।

এরপর আমার সম্বন্ধে আর কি কি ঘটনা দেখেছেন ?

এত দেখেছি যে এক-আধদিনে বলে শেষ করা যাবে না। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিন বছর ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন আপনার জীবনের অনেক ছবিই আমার চোখের উপর ভেসে উঠেছে।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে অভিজিৎ গুপ্ত কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করলেন, তারপর অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মতই করলেন।

কি একটা বিশ্রী ধরণের জীবন আমাকে কাটাতে হবে এখন থেকে। যা বলব, যা করব, যা ভাবব সব প্রকাশিত হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ একজন অপরিচিতার কাছে।

কিন্তু আমি ত তোমার অপরিচিতা নই অভিজিৎ—কোমলভাবে মাধুরী-মেশানো কণ্ঠে উত্তর দিলেন সুজাতা সেন।

অভিজিৎ এবার নিজের অজান্তেই যেন সুজাতার অনেক কাছের মানুষ হয়ে আসবেন। আর তাঁর মনে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা নেই। অতি সহজ ভাবেই বলবেন : তুমি ঠিকই বলেছ সুজাতা। বহুদিন পাশাপাশি থেকেও একজন মানুষ অপরজনকে এতটুকুও চিনতে শেখে না। আবার এক একজনকে একবার মাত্র দেখেই মনে হয় এ আমার মনের মানুষ।

সুজাতা প্রশ্ন করবেন, আচ্ছা, আমাকে কি তুমি একেবারেই চিনতে পার নি ?

অভিজিৎ ফ্যাকাশে হেসে বলবেন, আমার সবকিছু যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। গত রাত্রে এ ঘরে ঢুকে প্রথমটায় তোমাকে অলকা বলে ভুল করলাম। তারপর মনে হ'ল তোমার সঙ্গে আগে কোথাও আলাপ হয়েছে। কেন যে তোমাকে অলকার সঙ্গে ভুল করলাম ?

সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা হঠাৎ বলে উঠলেন, এমনও ত হতে পারে যে আগাগোড়াই অলকাকেই আমার সঙ্গে ভুল করে চলেছ !

তাই কি ? এ তুমি কি বকছ ?

না, না, এ কথা আমি বলতে চাই নি । আমি তোমাকে শুধু এই কথাটাই বোঝাতে চাইছিলাম যে তুমিও যেন মাঝে মাঝে ব্যাকুলভাবে আমাকে আহ্বান করতে।

তাই কি তুমি এখানে এসেছ সুজাতা ?

অনেকটা তাই অভিজিৎ। দু'বছর আগে তুমি যখন অলকাকে বিয়ে করলে আমি কঠিন পণ করলাম যে এবার তোমার জীবন থেকে সরে যেতে হবে অনেক দূরে। এইজন্যই লণ্ডনে গেলাম—প্রথমটায় কষ্ট হলেও আস্তে আস্তে নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেললাম তোমার সম্পর্কে। এতটা সহজ হলাম যে, দেশে রওনা হবার আগে তোমার কথা মনে আসতে এতটুকু ভয় পেলাম না। কারণ তখন আমি নিশ্চিন্ত যে আগেকার মত আর আমি তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব না।

কিন্তু এ সঙ্কল্প তুমি রাখতে পেরেছিলে—জিজ্ঞেস করলেন অভিজিৎ গুপ্ত।

তাই যদি পারতাম তা হ'লে কি তোমার ঐ টেলিফোনে এখানে আসবার কথা জানতে পারতাম ?

আচ্ছা, আমি তোমার presenceটা feel করি নি কেন ?—প্রশ্ন করলেন অভিজিৎ।

তুমি কি সত্যিই তাই মনে কর?

নিশ্চয়ই।

বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই অভিজিৎ। বেশ গভীর রাত্রে তুমি বসে বসে তোমার 'দিগন্তের মায়া' নাটকটি লিখছিলে—কিন্তু শেষ অঙ্কে কিছুতেই চরিত্রগুলোকে সামলাতে পারছিলে না—শেষে লেখা ছেড়ে ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলে। এর মধ্যে উঠে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে, কিন্তু সে রাত্রিটা ছিল পূর্ণিমার রাত্রি, জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছিল তোমার মুখে, তুমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে, চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না।

তারপর?

তোমার এই অবস্থাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম নিজের ঘরে বসে। হঠাৎ যেন আমার মনে হ'ল আমি নিজের ঘরে নেই—তোমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তারপর তোমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

বিস্ময়ে অভিজিৎ কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হয়ে যাবেন। তারপর অস্ফুট স্বরে বলতে থাকবেন—এ তুমি কি বলছ! অথচ এখন আমার সে রাত্রির কথা স্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে। তুমি আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলে—আমি তোমার হাতটা কপালে চেপে ধরে রাখলাম কিছুক্ষণ। পরে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল মনে হ'ল সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্নে দেখছিলাম।

সুজাতা যেন শুনতে শুনতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন, বললেন: সত্যিই, এক ধরনের স্বপ্নই একে বলা যায়।

অভিজিৎ উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—না, না, স্বপ্ন নয়। তুমিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য সুজাতা। এখন আমি বুঝতে পারছি তোমার অভাবটাই আমাকে জীবনে কখনও স্থিরভাবে কিছু করতে দেয় নি। তাই আমার লেখার ভেতর এতকাল স্পষ্ট করে তুলতে পারি নি নিজের স্বপ্নলোকের আলোছায়ার খেলাকে। আজ তোমাকে পেয়েছি—আর আমার চিন্তা নেই সুজাতা—সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবার আমি লেখা সুরু করব—সবদিকে দেখিয়ে দেব আমার আসল শক্তি কতটা। জান সুজাতা, অনেক কিছু কাজ আমার করবার আছে—

জানি। কিন্তু আমাকে তুমি মুক্তি দেও অভিজিৎ—

এখন আর তা হয় না সুজাতা—চল, আমরা দু'জনে আজই এখান থেকে কোথাও দূরে চলে যাই—

কিন্তু অলকা—?

তাকে বলব আমাদের ভেতর মিটমাট হওয়াটা সম্ভব নয়, সুতরাং We must end this relationship—তারপর একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করতে হবে। তুমিও তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেও···

সেজন্য আমার সময় লাগবে না।

এরপর অভিজিৎ গুপ্ত উঠে গেলেন টেলিফোনের কাছে, অনাদিবাবুকে ডেকে জানালেন যে লাঞ্চের পরই তাঁরা হোটেল ছেড়ে চলে যাবেন, একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করতে বললেন ষ্টেশনে যাবার জন্য।

এরপর সুজাতা বললেন—অনাদিবাবুর সঙ্গে একটু আগে তুমি সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছ অভিজিৎ।

আচ্ছা, যাবার সময় মাপ চেয়ে নেব।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন সুজাতা। তারপর অনুযোগের সুরে বললেন—আগে থেকে যদি নিজের ব্যবহার এবং কথাবার্তা সম্বন্ধে সচেতন থাক তা হ'লে পরে এ ধরনের আচরণের জন্য মাপ চাইবার কোন কারণ ঘটতে পারে না। অনাদিবাবুর কথা ছেড়ে দেও, তোমার রাগ হলে তার ফল ভুগতে হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গাড়ির ড্রাইভার, হোটেলের ওয়েটার বা ষ্টেশনের কুলিদের।

অভিজিৎ জবাব দিলেন—এর জন্য আমি নিজের উপরেও কম বিরক্ত হই না। তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে অন্যায় ব্যবহার করার পরই, অন্যভাবে সেটা পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করি—

হেসে উঠে সুজাতা বললেন—বেশী বক্‌শিশ দিয়ে, এই ত? কিন্তু ভুলে যাও কেন যে এরাও তোমার মত মানুষ?

এবার থেকে দেখবে আমি সম্পূর্ণ বদলে গেছি, তুমি পাশে থাকলে আমার real self-কে খুঁজে পাবো—আমার সমস্ত মন থাকবে লেখার ভেতর—আর তুমিও নিশ্চয় এবার থেকে খুব ভাল ছবি আঁকতে পারবে।

উৎসাহ ভরে সুজাতা জবাব দিলেন, পারব বই কি! আমি কি তোমার থেকে পেছিয়ে থাকব মনে কর?

আচ্ছা, এখান থেকে আমরা কোথায় যাব প্রথম…?

হেসে উঠে সুজাতা বললেন—কেন? আমরা যাব নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

অভিজিৎ এবার আবৃত্তি সুরু করবেন—

"যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে—'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়—
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।"

ঠিকই বলেছ, প্রথমটা হবে নিরুদ্দেশ যাত্রা—অর্থাৎ গাড়িতে বসে যেখানে মনে হবে সেখানেই যাব।

এবার সুজাতা প্রস্তাব করলেন পাহাড় থেকে নেমে ষ্টেশনে গিয়ে যে নামটা মনে আসবে সেখানকারই টিকিট নিয়ে গাড়িতে উঠে বসবেন দু'জনে।

অভিজিৎ বললেন—agreed, আমি সম্পূর্ণ একমত। এরপর ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকলেন অলকা—এতক্ষণ যেন এক স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছিলেন অভিজিৎ গুপ্ত এবং সুজাতা সেন। অলকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের জালটা যেন ছিন্ন হয়ে গেল—দু'জনেই একটু থমকিয়ে গেলেন। অলকা গুপ্তই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, এতক্ষণে নিশ্চয় রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে?

একটু ইতস্তত: করে অলকাকে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন—

বেশ বিরক্তির সঙ্গে অলকা জিজ্ঞেস করলেন, কি বলতে চাইছিলে, বল?

উত্তর দিলেন সুজাতা—বললেন, আমিই বলছি।

অলকা চিৎকার করে উঠলেন—আপনার মুখ থেকে আমি কোন কথা শুনতে চাই না—যা বলবার অভিজিৎকেই বলতে দিন।

অভিজিৎ এবার যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমরা এখানে এসেছিলাম finally settle করতে যে ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আমরা জীবন কাটাতে পারব কি না—ভেবে দেখলাম তা আর সম্ভব নয়—একটু বাদেই আমি শিলং ছেড়ে চলে যা…

একলা…না…কথাটা শেষ করবেন না অলকা গুপ্ত।

আমিও সঙ্গে যাব—বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেবেন সুজাতা।

আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারেই বোধ হয় এটা হচ্ছে?

অত্যন্ত চটে উঠবেন অলকার এই মন্তব্যে। বিরক্তিভরে বলবেন—আগেকার বন্দোবস্ত বলতে "ক মনে কর—ব্যাপারটা কি এতই হাল্কা।

তাই ত আমার মনে হচ্ছে। আধ ঘণ্টা আগেও ত এমন ভাব দেখাচ্ছিলে যেন কেউ কারোকে চেন না।

যা বোঝ না সে বিষয়ে কথা বলতে এস না।

না—আমি ত কিছুই বুঝি না!

অলকা! ধমকের সুরে চীৎকার করে উঠলেন অভিজিৎ।

এবার সুজাতা উঠে এসে অভিজিৎকে অনুরোধ করলেন ও ঘর থেকে চলে যেতে—কারণ সুজাতা সেনের দৃঢ় বিশ্বাস তিনিই অলকাকে সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে পারবেন। সে সময়টাও অভিজিৎও জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে পারবেন। বিরক্তিভরে অভিজিৎ ঘর থেকে ভেতরের দিকে চলে গেলেন—এরপর এঁরা দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ করে থাকবেন। তারপর অলকা গুপ্তই প্রথম কথা সুরু করবেন:

আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনার কথায় ভুলে ওকে আমি আপনার সঙ্গে চলে যেতে দেব তবে ভুল করছেন। গত কয়েকমাস আমরা আলাদা ভাবে ছিলাম—কারণ দেখছিলাম আমার সঙ্গটা অভিজিৎ কিছুতেই সহ্য

করতে পারছে না—আর তাতে ওর কাজের খুবই ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এখানে আসবার আগে আমি ঠিক করে এসেছিলাম যে মিটমাট আমাদের করতেই হবে—ডিভোর্সের ব্যাপারে আমি কিছুতেই রাজী হব না।

কিন্তু কেন রাজী হবেন না?

কারণ আমি সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করি—স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য বলে মানি।

আপনি কি বুঝতে পারছেন না অলকাদেবী, যে অভিজিৎ ঠিক আর পাঁচজন মানুষের মত নয়—অনেক কিছু বড় কাজ করবার শক্তি ওর আছে। আপনার সংস্পর্শে থাকলে কোন কিছুই ও করতে পারবে না। এভাবে ওর জীবনটাকে নষ্ট করে দেবার অধিকার কি আপনার আছে!

আমার কাছ থেকে ঐ কৈফিয়ৎ চাইবারই বা আপনার কি অধিকার?

আছে বই কি অলকা দেবী! আমি অভিজিৎকে শ্রদ্ধা করি, ওর বিরাট প্রতিভা সম্বন্ধে জানি, আর সবার উপরে ...আমি ওকে ভালবাসি।

আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝি ছিল আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া মিস সেন?

না, সেজন্য আমি এখানে আসি নি। ও এখানে আসছে অত্যন্ত বিষাদভরা মন নিয়ে, এটাই জানতাম। গত দু'বছর আমি লণ্ডনে ছিলাম এবং ওর কোন খবরও রাখতাম না। এখানে এসে দেখলাম, আমাকে ওর দরকার—আমাকে কাছে না পেলে ওর ভেতরকার শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না—কোন কিছু সৃষ্টি করবার প্রেরণাও পাবে না।

কি করে জানলেন?

বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না, অলকাদেবী! আমার বা আপনার বিষয় চিন্তা না করে অভিজিতের কথা ভাবুন। ও সত্যিকার জাত-শিল্পী, আর প্রতিভা থাকলেই যা হয়—ওর মনটা অত্যন্ত sensitive, অত্যন্ত delicate। ওকে প্রেরণা দিতে হলে শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না।

আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু আপনিও ত খালি নিজের কথাটাই ভাবছেন মিস সেন।

তার মানে?

তার মানে অত্যন্ত সহজ। অভিজিতকে ভালবাসেন, তাই তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছেন—তার ফলে আমার জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু বিবাহিত জীবনে আপনারা ত সুখী হতে পারেন নি মিসেস গুপ্ত।

এ আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা মিস সেন। বিয়ের পর প্রথমটায় আমি খুবই আনন্দে কাটিয়েছি। তখন মনে হয়েছে, সব কিছুই মধুর, সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই আলোয় ভরা।

বাধা দিয়ে সুজাতা বললেন, তাই যদি হয়, তবে কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে বললেন আমি অদৃশ্যভাবে আপনাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করতাম?

অলকা গুপ্ত অল্পক্ষণের জন্য একটু থমকিয়ে গিয়ে তারপর জবাব দিলেন—তা বলেছিলাম। পরে এই কথাটাই মনে হ'ত—মনে হ'ত আমাদের দু'জনের মাঝে যেন একটা ছায়া এসে পড়েছে—যেন কেউ একজন অদৃশ্য ভাবে থেকে আমাদের ওয়াচ করছে। কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করুন, এই অশরীরীর আবির্ভাবের আগে আমরা যে কি আনন্দে কাটিয়েছি!

এবার সুজাতা বললেন—মিসেস গুপ্ত, আমি সত্যিই আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অলকা জবাব দিলেন—অভিজিৎও আজকাল আমাকে বুঝতে পারে না। হয়ত এর জন্য আমি নিজেই বেশী অপরাধী। আমি যে তার ওপর কতটা নির্ভরশীল সে কথা ওকে কখনও বুঝতে দিই নি। ভেবেছি এর ফলে ওর কাছে আমার চার্ম যাবে নষ্ট হয়ে। ক্রমশঃ ও যখন আমাদের সম্বন্ধটাকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল—আমিও এমন ভাব দেখালাম, যেন আমারও ওই একই সন্দেহ। দু'জনে ঠিক করলাম আলাদা ভাবে কিছু দিন থাকব, তারপর দু'জনে আলোচনা করে ঠিক করব কোন্ পথে যাব। অথচ জান সুজাতা, ওর থেকে দূরে থাকতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এর থেকে বড় শাস্তি যে কিছু হতে পারে, তা আমি কল্পনা করতেও পারি না। আজ যদি ও আমার কাছ থেকে

চিরকালের মত দূরে চলে যায়, তারপর কি নিয়ে বেঁচে থাকব বলতে পার ?

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। সুজাতা সেন অল্প সময় আত্মসমাহিতের মত বসে রইলেন—তারপর এই ঘোরটা কাটিয়ে নিয়ে আত্মগত ভাবেই বললেন—তুমি যে অভিজিতকে এতটা গভীরভাবে ভালবাস, তা সে জানে না অলকা !

আমি স্বীকার করছি সুজাতা—ওইখানেই আমার—ভুল হয়েছে, নিজের মনটা ওর কাছে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধরি নি।

সত্যিই তুমি ভুল পথে গিয়েছিলে অলকা—মন্তব্য করলেন সুজাতা সেন।

অলকা এবার অনুনয়ের সুরে বললেন—আমি বুঝতে পারছি ওর ওপর তোমার অনেক বেশী প্রভাব—কিন্তু আমি তোমার কাছে ওকে ভিক্ষে চাইছি সুজাতা। আমার এমন কোন আকর্ষণ করবার ক্ষমতা নেই—আমি বিদগ্ধ নই, ইন্‌টেলেকচুয়াল নই, শিল্পী নই, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।

সত্যিই যদি তাই মনে কর—অলকার চোখের দিকে চোখ পড়াতে আর কথাটা শেষ করলেন না সুজাতা সেন।

অলকা মৃদু হেসে বললেন—আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে ও কি প্রত্যাশা করবে।

এরপর আরও মৃদুস্বরে আগের কথার জের টেনে অলকা ফের বলতে লাগলেন—কিন্তু ভেবে দেখ, ও যদি জানতে পারে ওর ওপর আমি কতটা নির্ভরশীল, ওর থেকে আলাদা-ভাবে আমার নিজস্ব কোন সত্তা নেই, ওর ভালবাসা পেলে তবেই আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে—তখনও কি অভিজিৎ আমাকে ভালবাসতে পারবে না ? আমি বলছি, প্রথমটায় হয়ত ওর অনুকম্পা হবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে ভালবাসতেই হবে। আর আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি ওকে সুখী করব—ওর মনে শান্তি ফিরিয়ে আনব—ও আবার সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠবে।

সত্যিই কি তুমি তা পারবে ?—ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন সুজাতা।

ওর উত্তরে অলকা বললেন—আমি জানি, আমার এ দাবির পেছনে কোন যুক্তি নেই। তুমি সব দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বেশী যোগ্য। কিন্তু অভিজিতকে বাদ দিয়েও তোমার জীবনের আর একটা দিক আছে সুজাতা—তুমি তোমার ছবি আঁকা নিয়েই সব কিছু ভুলে থাকতে পার।

অলকার কথাগুলোতে এমন একটা বেদনা এবং আন্তরিকতার আভাস ছিল যে সুজাতা সেনের মনটা এই মেয়েটির প্রতি মমতায় ভরে উঠল—অস্ফুটস্বরে জবাব দিলেন—তা হয়ত পারি।

অলকা গুপ্তর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল একটা পবিত্রতা এবং শিশুর মত সারল্যের ভাব। কোন রকম সঙ্কোচের বালাই না রেখে তিনি বলতে লাগলেন, আর তোমাদের ভেতর যদি কোন অদৃশ্য বন্ধন থেকে থাকে, সে ত চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকবে সুজাতা। সে বন্ধন ছিন্ন করব এমন শক্তি আমি কোথায় পাব বল ?

তুমি সত্যি কথাই বলেছ অলকা। কিন্তু আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ঐ অভিজিৎ আসছে ঐ দিকের দরজাটা দিয়ে তুমি নিজের ঘরে চলে যাও—জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে অভিজিতের সঙ্গে ফিরে যাবার জন্ত তৈরী হও গিয়ে আর দেরি ক'রো না।

অবিশ্বাস ভরে অলকা বলে উঠলেন—তুমি তা হ'লে সত্যিই আমার কথায় রাজী হ'লে ?

আঃ, দেরি করো না অলকা, চলে যাও।

অনেক ধন্তবাদ সুজাতা—ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে যাবেন অলকা গুপ্ত।

অল্প বাদেই ঘরে ঢুকবেন অভিজিৎ গুপ্ত। দেখবেন সুজাতার চোখে-মুখে একটা বিষাদ এবং গাম্ভীর্যের ছায়া। দু'জনের এবার দৃষ্টি বিনিময় হবে—ফ্যাকাশে ভাবে হেসে অভিজিৎ গুপ্ত বলবেন : আমি বুঝতে পেরেছি সুজাতা, তুমি অলকার চোখের জল দেখে ভুলে গেছ—You have let me down.

আমাকে ভুল বুঝ না অভিজিৎ......

এই একটু আগে আমাকে আশার আলো দেখিয়ে উত্তেজিত করে তুললে, আর তার পর মুহূর্তেই আবার টেনে নিয়ে এলে তিমির অন্ধকারে—কেনই বা এত সব কথা আমাকে বললে···

বলতে ত আমি চাই নি অভিজিৎ—তুমিই ত আমাকে বাধ্য করলে বলতো বেশ, তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম। কিন্তু সব জানার পর কি করে আমি তোমার থেকে দূরে সরে থাকতে পারি বল?

দেখ অভিজিৎ, একটু আগে পর্যন্ত অলকার মনের আসল পরিচয়টা আমি জানতাম না। আর তুমি ওকে এখন পর্যন্ত চিনে উঠতে পার নি।

হো, হো করে হেসে উঠবেন অভিজিৎ গুপ্ত—তারপর বলবেন: স্বামী স্ত্রী হিসাবে এতদিন বাস করবার পরও আমি ওকে চিনে উঠতে পারি নি, আর এই অল্পক্ষণের আলাপে তুমি ওকে বুঝে ফেললে সুজাতা?

একটা ভুল ধারণার বশে ও তোমার কাছে নিজের মনটা ঠিক খুলে ধরে নি অভিজিৎ। তোমাকে বাদ দিয়ে ও নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারে না।

তুমি বোধ হয় জান না সুজাতা, যে, আমার মত অলকাও যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে উঠেছিল আমাদের এই দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে। আমরা দু'জন এই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিলাম যে হয় আমরা মিটমাট করব, আর না হয় এ সম্পর্কের অবসান ঘটাব বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা।

মুখে ও কথা বললেও সে মনে মনে জানত তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। She is entirely dependent on you.

আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ সুজাতা। আমার কাছে ওর মনের আসল পরিচয়টা তা হ'লে এতদিন গোপন করে রেখেছিল কেন?

ওর বোধহয় মনে হয়েছিল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে দিলে, তোমার কাছে ও পুরোনো হয়ে যাবে। অলকার সঙ্গে তুলনায় আমরা দু'জনেই অনেক বেশী শক্ত—কারণ আমাদের দু'জনেরই আছে একটা শিল্পচর্চার দিক। ওর যে তা নেই—তোমাকে দিয়েই যে ওর জীবন।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ থাকবেন। তারপর অভিজিৎই কথা সুরু করবেন—

হয়ত তোমার কথাই ঠিক সুজাতা। সত্যিই কখনও ওর মনের আসল চেহারাটা বোঝবার চেষ্টা করি নি। কিন্তু এও বলব, নতুনভাবে আমাদের সম্পর্কটাকে গড়ে তোলবার চেষ্টাও খুব সহজ হবে না।

দেখ অভিজিৎ, তোমাদের পুরোনো দিনগুলো তোমরা ভুলে যাও। আমার কথা বিশ্বাস কর—এ অলকা আর সেই আগের অলকা থাকবে না—আমাদের এই দেখাশোনা আর খোলাখুলি কথাবার্তার পর তুমিও হয়ে যাবে অন্য মানুষ।

হয়ত তোমার কথাই ঠিক সুজাতা, আমরা প্রত্যেকেই এবার অনেক বদলে যাব—তবু তোমাকে এমন আকস্মিক ভাবে খুঁজে পাব আর এমনভাবে আবার হারাব…এ আমি ভাবতেও পারিনি।

এইবার তোমার ভুল হ'ল অভিজিৎ—হারাবে কেন—এদিকে এই আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াও—কি দেখছ আয়নায়?

কি আবার দেখব—দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি—

সুজাতা দেবী একটু দূরে সরে গিয়ে বলবেন! এবার দেখ আমার reflection আর পড়ছে না—কিন্তু তাই বলে কি আমি তোমার কাছে নেই?…পার্থিব জীবনে হয়ত আমরা পাশাপাশি থাকব না অভিজিৎ—কিন্তু সে জীবনটা ত ওই আয়নার উপরকার প্রতিবিম্বের মত এই দেখা যাচ্ছে, আর পর মুহূর্তেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে আমাদের আত্মার সম্বন্ধ সেখানে ত কোন বাধা এসে আমাদের মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারবে না—এবার অনাদি-বাবু এসে ঘরে ঢুকবেন। জানিয়ে দেবেন অভিজিতের গাড়ি এসে গেছে।

আচ্ছা, ধন্যবাদ, আমার বিলটা ঘরে পাঠিয়ে দিন অনাদিবাবু।

তাই দিচ্ছি, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন অনাদিবাবু।

গুড বাই সুজাতা!

গুড বাই অভিজিৎ!

অভিজিৎ ভেতরের দিকে চলে যাবেন। কিছুক্ষণ সারা ঘরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করবে—এরপর সুরমা মল্লিক এসে এ ঘরে ঢুকবেন—আড়চোখে একবার সুজাতার দিকে চেয়ে নিজের মনেই বলতে থাকবেন: ওঃ, সারাটা দিন খুব ঘোরা গেল মিস সেন—আমার এক বান্ধবী বলছিলেন তিনিও একবার এই হোটেলে উঠে কয়েকবার ঐ ছাই রং-এর পোষাক-পরা মেমসাহেবকে দেখেছেন—তারপর থেকে আর কখনও শিলং-এ এলে…

মাপ করবেন, আমার মাথাটা একটু ধরেছে, আমি উঠলাম মিস মল্লিক—

চলুন, আমিও উঠছি—দরকার হলে আমাকে খবর দিতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না মিস সেন।

দু'জনেই উঠে ভেতর দিকে চলে যাবেন।

প্রতি

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(শেলী থেকে)

মৃদু গীতি লভে যবে মরণে,
রেশ তার অনুরণে' স্মরণে !
মিঠে জুঁই ঝরে যবে ভূতলে,
বাস জেগে রহে মনোবিরলে !

গোলাপ শুকালে, পাতা কুড়ায়ে
তার প্রিয়-বিছানায় ছড়ায়ে !
তুমি গেলে রবে স্মৃতি এমনি ;
ঘুমায়ে পড়িবে প্রেম আপনি !

বিলাপ

(শেলী থেকে)

হা পৃথিবী ! হা জীবন ! হায় মহাকাল !
তোমাদের শেষ ধাপে এসে নাজেহাল !
কাঁপিতেছি,—উঠি যেথা প্রথম সময় !
ফিরিবে তোদের কবে গৌরবের কাল ?
আর নয়—উঃ, কভু আর নয় !

আজিকার এই দিবা বিভাবরী মাঝ
একটা আনন্দ ছিল, উড়ে গেছে আজ !
নূতন বসন্ত গ্রীষ্ম শীত ঋতুচয়
মজালো এ-হৃদি দুখে, সুখে নেই কাজ
আর নয়—উঃ, কভু আর নয় ।

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

নিজের কাজকর্ম নিয়ে দিন কাটতে লাগল তার। যশোদার সঙ্গে কোনরকম অসুবিধাই হচ্ছিল না ধীরার। মানুষটা ধীরাকে বড় ভালবাসে। প্রথমদিনই ধীরাকে দেখে তার মনে হয়েছিল, তার মেয়ে বেঁচে থাকলে এত বড়ই হ'ত। দেখতে আর কোথা থেকে এত সুন্দর হ'ত, চাষী ভুষী ঘরের মেয়ে ত? তবু কোথায় যে সে ধীরার মধ্যে নিজের মেয়ের সাদৃশ্য দেখত তা সেই জানে। আদর জানাবে আর কি করে? ধীরা ত কচি মেয়ে নয় যে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে? তাই যথাসম্ভব তার জন্যে খেটে সে নিজের স্নেহকে তৃপ্ত করত। মনিবের সঙ্গে ভৃত্যের যে সম্বন্ধ তা তার ধরন-ধারণের কোনখানে ছিল না। ধীরার মায়েরই প্রতিনিধি হয়ে যেন সে এখানে এসেছিল।

বাড়ীর চিঠি ধীরা প্রায়ই পেত। মা লিখতেন, বাবা বিশেষ লিখতেন না। সুবালা লিখছেন এটাকেই তিনি নিজের লেখা বলে ধরে নিতেন। ভাই লিখত মাঝে মাঝে, নীরা প্রায়ই লিখত। স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নীরাকে যথেষ্ট আদর করে না। মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে মাকে বড় বেশী জ্বালাতন করে। সে দিদির কাছে আসতে চায়। এটা যে তার মনের কথা নয় সেটা বুঝতে দেরি হয় না। প্রিয়নাথকে জানান যে তারও জগতে যাবার জায়গা আছে। কিন্তু তাকে ছেড়ে এসে এখানে একলা যে নীরা একদিনও থাকতে পারত তা নয়। ধীরা ভেবেই পেত না কি করলে এই দারুণ অসন্তোষের অবসান হতে পারে। আসল কথা নীরা স্বামীকে যে ভাবে যতটা চায় তা পায় না। একটা ঘটি-বাটির মত হয়ে থাকতে তার ভাল লাগে না, অথচ ভাগ্য তার বেশী মর্য্যাদা নীরাকে দেয় নি। মানুষের চোখে নিজের মূল্য বাড়িয়ে নেবার কোন মন্ত্র তার জানা নেই, সে জানে কেবল অভিযোগ করতে।

বিভার খোঁজ ধীরা পেয়েছে। তার মা লিখেছেন বিভা আগ্রায় আছে, ভালই আছে। শারীরিক ভালই আছে ধীরা ধরেই নিল, কিন্তু মনের খবর তার মা কিছুই দেন নি। ধীরা বিভাকে একটা চিঠি লিখেছে, তার কোন উত্তর আজও পায় নি।

মাসখানেক হতে চলেছে সে এলাহাবাদে এসেছে। এর মধ্যে একটাও নূতন লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয় নি। সহকর্মীদের সঙ্গে অবশ্য পরিচয় হয়েছে। তার মধ্যে মহিলারা দু'চারবার তার বাড়ী এসেছেন, চাও খেয়েছেন। ধীরাও তাঁদের বাড়ী এক-একবার গিয়েছে। মধ্যবয়স্কারা বিবাহিতা, সন্তানের জননী, ঘরের গৃহিণী। তাঁদের সঙ্গে গল্প করার কোন বিষয় ধীরা পায় না। অল্পবয়স্কাদের ভিতর একজন বিবাহিতা, আর একজন কুমারী, তবে বিয়ের চেষ্টায় প্রবলভাবে প্রেমের অভিনয় ক'রে যাচ্ছেন, একই সময়ে দু'টি যুবকের সঙ্গে। তার ভিতর একজন আবার এই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে। এদের সঙ্গেও ধীরার খুব যে মেলে তা নয়। ছেলেপিলের গল্প, তরকারি-মাছের বাজার দর, এ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রণয়ীরা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে কে কি বলেছে তার গল্প বান্ধবীর কাছে শুনতে ধীরার কিছুই ভাল লাগে না।

আজ রবিবার, কাজের চাপ কম। সকালের কর্ত্তব্য সে ক'রে এসেছে, বাকি দিনটা তার ছুটি। গাড়ি ছোট একটা সে কিনবে, ঠিক করেছে তা হ'লে বেড়ানর সুবিধা খুব হবে। টাকা ধার পাবে, অল্পে অল্পে শোধ করবে। গাড়ি একটা দেখতে যাবার কথা আছে, তবে যিনি নিয়ে যাবেন তিনি আজই আসতে পারবেন কি না জানান নি। তার বাজার যাবারও দরকার আছে। ট্যাক্সি করে একবার বাজার ঘুরে আসবে স্থির করল।

বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল কাপড়-চোপড় বদলে। আগে শাদা কাপড়ই বেশী পরত, কিন্তু এখানের মহিলাদের দেখাদেখি তারও রং-এর ছোঁয়াচ লেগেছে। রঙীন কাপড়ই এখন বেশীর ভাগ পরে। আজও পরে চলল হাল্কা সবুজ রং-এর পাতলা রেশমী শাড়ী।

ট্যাক্সি ডাকতে বলল বিধুকে। টাকা-পয়সা বার করে নিয়ে যশোদাকে বলল, "আমি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আসছি, ফিরে এসে চা খাব।"

যশোদা তার জন্যে কি কি আনতে হবে, তার একটা তালিকা দিয়ে দিল তাড়াতাড়ি। ধীরা বেরিয়ে গেল। যে দোকানটায় সে বরাবর যায় সেখানেই গিয়ে উঠল। এটি তার এক সহকর্মিনী তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। জিনিষপত্র মন্দ পাওয়া যায় না।

আজ রাস্তায় কি কারণে জানি না বেশ ভীড়। কাছের কোন বাড়ীতে বিয়ে বা অন্য কিছু আছে। লোকজন খুব যাওয়া-আসা করছে। ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, এক্কা প্রভৃতিতে রাস্তা একেবারে ভরপুর। পায়ে হেঁটে লোক চলেছে সার দিয়ে। অনেকে শুধু তামাশা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়েই আছে।

যা কিছু চেয়েছিল তার বেশীর ভাগই পাওয়া গেল না। অল্প যা পাওয়া গেল তা নিয়ে ধীরা নিজের হ্যাণ্ড-ব্যাগে রাখল, তারপর দাম চুকিয়ে দিয়ে দোকান ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। যে ট্যাক্সিতে এসেছিল সেটা ত সে ছেড়ে দিয়েছে। অল্প দূরে সামনে তিন-চারটে খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। এরই একটা ধরবার আশায় রাস্তা পার হবার জন্যে সে পা বাড়াল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শোনা গেল একটা প্রচণ্ড হৈ চৈ। একটা এক্কার ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে একটা দ্রুত ধাবমান্ ট্যাক্সির প্রায় সামনে এসে পড়ল, এবং ট্যাক্সির চালক তার উপর দিয়ে না গিয়ে, ষ্টীয়ারিং হুইলের এক মোচড়ে গাড়িটা ঝট্ করে ঘুরিয়ে এসে পড়ল একেবারে ধীরার গায়ের উপর।

একটা জোর ধাক্কা লাগল তার গায়ে এইটুকু ধীরা সজ্ঞানে বুঝল। ভয়ে চোখ বুজে একবার ভগবানের নাম নিল, তারপর প্রায় অচৈতন্যই হয়ে গেল বোধ হয়। এখনি হয়ত গাড়িটা তার গলার উপর দিয়ে বা বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু ঠিক সেরকম কিছু ঘটল না। পিছন থেকে দুটো বলিষ্ঠ বাহু তার বাহুমূল ধরে তাকে টেনে সরিয়ে নিল, প্রায় গাড়ির চাকার তলা থেকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ধীরার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল। তখন বুঝল যে সে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের উপরেই, একজন কার বাহুবেষ্টনের মধ্যে। সমস্ত শরীরটা তার কাঁপছে, মাথাটাও লুটিয়ে পড়েছে তার উদ্ধারকারীর বুকের উপর।

মিনিট খানিকের মধ্যে নিজের ঘাড়টা একপাশে হেলিয়ে ধীরা দেখতে চেষ্টা করল তার উদ্ধারকারীকে। দেখতে পেল আশ্চর্য্য সুন্দর একটি মুখ আর উদ্বেগ আর করুণায় ভরা বিশাল দু'টি চোখ তার মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে। ধীরার চোখের সামনে জগতটার চেহারা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। এ কে? একে কি সে আগে কখনও দেখেছে? চেনা মনে হয় না কি? তার পিছনের জীবনটা ছায়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে কেন? জগতে সে আর এই মানুষটি ছাড়া আর যেন কেউই নেই।

যে যুবকটি তাকে ধরে দাঁড়িয়েছিল সে এতক্ষণে কথা বলল, "আপনি কি বাঙালী?"

অস্পষ্ট স্বরে ধীরা বলল, "হ্যাঁ।"

যুবক বলল, "আপনাকে ছেড়ে দিলে আপনি এখনি প'ড়ে যাবেন। আপনার সঙ্গে কি কেউ আছে, না একলা এসেছেন?"

ধীরা বলল, "না, সঙ্গে কেউ নেই।"

যুবক বলল, "এখানে বসবারও ত কোন জায়গা দেখছি না। আচ্ছা, কয়েক পা হেঁটে আসতে পারবেন? সামনেই আমার গাড়িটা রয়েছে। চলুন", বলে তাকে অতি সযত্নে এবং সাবধানে ধ'রে একটু এগিয়ে গেল। মাঝারি আয়তনের একটা গাড়ির দরজা খুলে তার ভিতর ধীরাকে বসিয়ে দিল। নিজেও উঠে বসল তার পাশেই।

জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় থাকেন আপনি? পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে। যত শীগগির পারা যায় একজন ডাক্তার দেখান ভাল। কোথাও বেশী লেগেছে মনে হচ্ছে?"

ধীরা এতক্ষণে স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে পারল। শরীরের অবস্থা এখনও কিছু ভাল লাগছে না। বুকের ভিতরটা ভয়ানক কাঁপছে। একটা অদ্ভুত অচেনা অনুভূতি তাকে পেয়ে বসেছে। এ মানুষটার হাতের স্পর্শের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত কি কিছু ছিল?

যুবক তখনও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। তার কথার উত্তরে ধীরা বলল, "আমি থাকি খুব দূরে নয়। হস্পিট্যালের কম্পাউণ্ডেই আমার বাড়ী, ওখানেই কাজ করি। ডাক্তার ত সহজেই দেখান যায়। আমায় একটা ট্যাক্সি ডেকে দেন, তা হ'লে এখন বোধ হয় যেতে পারি।"

যুবক বলল, "কি যে বলেন! আপনাকে এই অবস্থায় একলা ছেড়ে দেওয়া যায়? পথে যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন? নিজেই ত ডাক্তার বোধ হচ্ছে, আপনাকে আর কি ডাক্তারি শেখাব আমি? ঐ হস্পি-

ট্যালে কাজ করেন আপনি? নূতন একজন এসেছেন শুনেছিলাম বটে, আমার এক বন্ধুর বোনের কাছে। সে ওখানে নার্সের কাজ করে। তার নাম চঞ্চলা।"

একটা সাধারণ কথা বলবার বিষয় পেয়ে ধীরা খানিকটা খুশী হ'ল। তার ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল এতক্ষণ। একবার মনে হচ্ছিল পালাতে পারলে বাঁচে, আবার মনে হচ্ছিল এখন না যেতে হয় ত ভাল হয়।

বলল, "ও, চঞ্চলাকে ত চিনি। ওকে বাঙালীই ভেবেছিলাম, তবে আমার সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা ত হয় নি।"

যুবক বলল, "আপনার নাম ত শুনেইছি। আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিই, এখানে যখন পরিচয় করে দেবার মত তৃতীয় ব্যক্তি কেউ উপস্থিত নেই। আমার নাম নিরঞ্জন মিত্র। এলাহাবাদে বছর তিন আছি। এন্‌জিনিয়ারের কাজ করি। Civil Lines-এই থাকি। কলকাতারই মানুষ। আপনিও বোধ হয় তাই?"

ধীরা বলল, "মানুষ কলকাতারই, তবে ডাক্তারী পাশ করেছি দিল্লী থেকে।"

নিরঞ্জন বলল, "এইবার আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া উচিত। খাড়া বসিয়ে রাখা ঠিক নয়। খুব আস্তেই যাব আমি।" উঠে গিয়ে সে চালকের আসনে বসল এবং গাড়িটাও আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করল।

নিরঞ্জনের পিছনে বসে ধীরা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল। কি যে সে ভাবছিল তা নিজেও যেন বুঝতে পারছিল না। আজ এই মানুষটি না থাকলে কি হ'ত তার? এতক্ষণে গাড়ির চাকার তলায় ম'রে পড়ে থাকত বোধ হয়। একে ত তার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত? কিন্তু কোন কথা তার মুখে আসছে না কেন? সে কি বাংলা ভাষা ভুলে গেছে? নিরঞ্জনই বা তাকে মনে করছে কি?

বাড়ী পৌঁছতে অল্প সময়ই লাগল। নিরঞ্জন গাড়িটা থামিয়ে বলল, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই গেটের কাছ থেকে ঐ সিঁড়ি অবধি আপনি যাবেন কি ক'রে? অতটা হাঁটা ত ঠিক নয়। বাড়ীতে কে আছেন আর?"

ধীরা বলল, "কে আর থাকবে? আয়া আর চাকর আছে। ঐ যে ছেলেটা বারান্দায় বসে আছে ওকে ডাকুন, বলুন আমার আয়া যশোদাকে ডেকে দিতে।"

নিরঞ্জন নেমে বিধুকে ডেকে যশোদার সন্ধানে পাঠাল। গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি হয়ত সঙ্কুচিত হবেন প্রায় অপরিচিত বলে, না হ'লে আমিই নিয়ে যেতে পারতাম এটুকু।"

ধীরার হাত-পা আবার কাঁপতে আরম্ভ করল, রক্তোচ্ছ্বাস ঘনিয়ে উঠল তার মুখে। আবার? না, না।

যশোদা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। অপরিচিত ভদ্রলোকের গাড়িতে দিদিমণিকে দেখে তার ত প্রায় চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসবার জোগাড়। জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে দিদিমণি?"

দিদিমণি কিছু বলবার আগেই নিরঞ্জন বলল, "একটা ট্যাক্সির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল। এখন হাঁটা উচিত নয় অতটা। তুমি ওঁকে ধ'রে নিয়ে যেতে পারবে?"

যশোদা ভাল ক'রে ব্যাপারটা বুঝে নিল। দিদিমণি ছেলেমানুষ বটে, তবে লম্বা আছে বেশ, যশোদার চেয়ে অনেক লম্বা। নামাতে গিয়ে যদি ফেলে দেয় তা হ'লেই চিত্তির। সে মেয়ে যশোদা নয়। বলল, "হাসপাতালের একটা নার্সকে ডেকে আনি না হয়।"

নিরঞ্জন বলল, "অত লোক ডাকাডাকি এখন করবার সময় নেই। আমি নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি এই পাশে এসে ধর," ব'লে গাড়ির দরজা উল্টো দিক দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। ধীরাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে বাড়ীর দিকের দরজা দিয়ে নামিয়ে দিল মাটিতে। যশোদাকে বলল, "শক্ত ক'রে ধর, আমি আসছি এখনি। ওঁর ত সমস্ত শরীর কাঁপছে, প'ড়ে যেতে পারেন।" এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে এদিকে চ'লে এল। ধীরাকে প্রায় জড়িয়ে ধ'রে বলল, "চলুন আস্তে আস্তে। পড়বেন না, ভয় নেই।"

যশোদা আর নিরঞ্জন যখন তাকে ড্রইং রুমে নিয়ে এসে শোয়াল, তখন ধীরার মুখ কাগজের মত শাদা হয়ে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিও একেবারে অভিভূতের মত। যশোদা বলল, "এর হাত-পাও ত দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এখন আমি করি কি বলুন ত?"

নিরঞ্জন বলল, "এখানে ত দু'জন ডাক্তার সব সময়ে থাকেন ব'লে শুনেছিলাম। যাও, যাঁকে পাও ডেকে আন। আমি দেখছি এঁকে।" যশোদা এক ছুটে চলে গেল।

একটা চেয়ার টেনে ধীরার কাছে ব'সে নিরঞ্জন বলল, "নিজে কিছু কি বুঝতে পারছেন? চোখের দেখায় যতটা বুঝলাম, খুব বেশী আপনার লাগে নি, ধাক্কা একটা জোরে লেগেছিল। কিন্তু চোখে দেখে কতটাই বা বোঝা যায়? কোথাও ব্যথা বোধ হচ্ছে?"

ধীরার আয়ত চোখ দুটো নিরঞ্জনের মুখের উপর একবার ঘুরে গেল। মৃদু গলায় বলল, "ব্যথা? না।"

নিরঞ্জন কথা বলল না আর। তার চোখ দুটোও খানিকক্ষণ ধীরার মুখেই আবদ্ধ হয়ে রইল।

এমন সময় যশোদার সঙ্গে ডাক্তার এবং নার্স এসে হাজির হলেন। উপরি উপরি খানিক পরীক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ডাক্তার বললেন, "এমনিতে ত কিছু বেশী হয়েছে মনে হচ্ছে না। তবে shock পেয়েছেন ভয়ানক। সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার দু'তিন দিন। কালও যদি অসুস্থ থাকেন, তা হ'লে X-ray করার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরঞ্জন এতক্ষণ বারান্দায় ঘুরছিল। ডাক্তার চ'লে যেতেই ঘরে এসে বলল, "বাড়ীতে না-হয় টেলিগ্রাম করুন মা-বাবার কাছে। এরকম অসুস্থ শরীরে একলা থাকবেন কি ক'রে? এখানে কি আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব কেউ আছেন?

ধীরা বলল, "কেউ নেই। আজ রাতটা যাক্, কালও যদি এইরকম থাকি তা হ'লে বাবার কাছে টেলিগ্রাম করব।"

নিরঞ্জন বল্‌ল, "রাত্রে একজন নার্সকে থাকতে বলুন। একলা আমার উপর নির্ভর করবেন না, যতই ও কাজের হোক। আর দেখুন, আমার এই কার্ডটা রাখুন, আমার ঠিকানা আছে। যদি কোন কারণে দরকার হয়, খবর পেলেই আমি আসব। প্রায় অপরিচিত ব'লে সঙ্কোচ করবেন না। পরিচয় ও জন্মাবামাত্রই সকলের সঙ্গে হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। আমি আসি তা হ'লে এখন?"

ধীরা বল্‌ল, "এখনি যাবেন না। আর একটু বসুন।"

নিরঞ্জন বলল, "নিশ্চয়। আপনি বললে বসব না কেন? ভাবছিলাম আমি থাকাতে হয়ত অসুবিধা হচ্ছে আপনার। এখন একটু ভাল বোধ করছেন?"

ধীরা বললে, "আপনার অনেক সময় নষ্ট করালাম আমি। চা খাওয়ার সময়ও হয়েছে, আপনি চা-টা এখানেই খেয়ে যান। আপনি বেশী দেরি ক'রে গেলে কেউ কি ভাব্‌বে? তা হ'লে এখান থেকে খবর দেওয়া যায়।"

নিরঞ্জন বললে, "আপনিও যেমন একলা থাকেন, আমিও ত তাই। আমার জন্যে আবার কে ভাবতে যাবে?"

ধীরা বল্‌ল, "আপনাকে ত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি যেন আজ কথা বলতেও ভুলে গেছি।"

নিরঞ্জন বলল, "ধন্যবাদ আবার কিসের জন্যে দিতে যাবেন? মানুষ মাত্রেই ত এটুকু করত। আমি কপালক্রমে ঠিক সময়ে ঐ জায়গাটায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, এইটুকুই ত আমার কৃতিত্ব। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া যায়।"

যশোদা এই সময় চায়ের সরঞ্জাম এনে হাজির করল। ধীরাকে বিশেষ কিছু খাওয়ানো গেল না। নিরঞ্জন চা খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। বল্‌ল, "আমি সকাল বেলাই এসে খবর নেব। এরকম অবস্থায় আপনাকে রেখে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আপনার ত এখন ঘুমোনো দরকার। ভদ্রতার খাতিরে জেগে থাকা ঠিক নয়।"

ধীরাকে একটা নমস্কার করা উচিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু একজনেরও সে কথাটা মনে পড়ল না।

(১০)

নিরঞ্জন চ'লে যেতেই যশোদা এসে বলল, "আচ্ছা দিদিমণি, এখন একেবারে শোবার ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুলে হ'তনি? ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া করতে? তোমার ত উঠতে বারণ ক'রে গেছে?"

ধীরা বল্‌ল, "তুমি আগে হাসপাতালের ডাক্তার মেমসাহেবের কাছে যাও একবার। একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। একজন নার্স সঙ্গে দেবে, তাকে নিয়ে এস। তারপর অন্য সব ব্যবস্থা করা যাবে।"

নার্স আবার কি জন্যে দিদিমণি? আমি তোমার কাজটুকু করতে পারব নি?"

"না, তা নয়। দু'জন লোক ত দরকার? ধর, যদি আবার ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে তোমাকে বাইরে যেতে হয়, তখন আমার কাছে থাকবে কে?"

যশোদা বল্‌ল, "সে ত ঠিক। আচ্ছা, নিয়েই আসি নার্স, দাও চিঠি।"

উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই ধীরা একটা চিঠি লিখে দিল। যশোদা চলল নার্সের সন্ধানে। ধীরা আবার সোজা হয়ে শুল। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর শরীরটা তার একটু ভাল বোধ হচ্ছে। বুকের

ভিতরের সেই প্রচণ্ড কাঁপুনিটা নেই। কিন্তু স্বাভাবিক আর একেবারেই লাগছে না নিজেকে, সে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তার পুরনো জীবনটা কোথায় গেল? সেটার মধ্যে এরকম প্রবল ভাবাবেগ ত ছিল না? এটা কি পেয়ে বসল তাকে?

নার্স সঙ্গে ক'রে যশোদা এই সময় ফিরে এল। তারপর ধীরাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া, তার চুল বাঁধা, তার কাপড়-চোপড় ছাড়ান, এই সব করতেই খানিক সময় কেটে গেল। তারপর যশোদা চলল তার রান্নাবান্না শেষ করতে। দিদিমণির এই ব্যাপারে তার কাজকর্মের অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। নার্স ধীরার কাছে ব'সে রইল। বাঙালী নয় কাজেই ধীরার সঙ্গে বেশী বাক্যালাপের চেষ্টা করল না।

ধীরা চেষ্টা করল কিছু না ভাবতে, যদি চোখে ঘুম আসে। কিন্তু ঘুম কোথায় তার জগতে তখন? মাথার ভিতর গত কয়েক ঘণ্টার ছবি যেন বায়োস্কোপের চিত্রের মত নাচ্‌তে লাগল। তার ভিতর এই নূতন দেখা মুখটাই প্রায় পর্দার সমস্ত জায়গাটা জুড়ে রইল। শরীরটা কয়েকবারই কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। একে সে কোনদিন দেখে নি, তা নিশ্চিত, কিন্তু একে একেবারেই অচেনা মনে হচ্ছে না কেন?

খাবার নিয়ে এল যশোদা, কিন্তু এবারেও ধীরা বিশেষ কিছুই খেতে পারল না। সামান্য কিছু খাবার পর সব ঠেলে সরিয়ে রাখল। যশোদা তুলে নিয়ে গেল বাসনপত্র। নার্স কফি খেতে চাওয়ায় এক পেয়ালা কফি ক'রে দিয়ে গেল। তারপর রাত্রের পাট চুকোতে চলল। আধ ঘণ্টা পরে নার্স ধীরাকে বল্‌ল, "ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিতে বলেছিলেন আপনাকে, দেব?"

ধীরা বল্‌ল, "অল্প দাও, অর্দ্ধেক dose-এ। আমার ঘুমের ওষুধ বেশী পছন্দ হয় না।"

অল্প একটু ওষুধ খেয়ে শুয়েই রইল। বই পড়াটড়া উচিত নয়, ঘুমের আসার ব্যাঘাত হতে পারে। অথচ ঘুমোন যে একান্ত দরকার? মস্তিষ্কটাকে সুস্থ করা দরকার, স্বাভাবিক করা দরকার? রক্তের ভিতর তার কিসের ধারা এসে মিশেছে? এত অস্থিরতা কেন?

নিরঞ্জন! নামটাও কিরকম সুন্দর! কে যেন মনের ভিতর গান গেয়ে উঠ্‌ল তার। সত্যিই ত সে বলেছিল যে জন্মাবামাত্রই সকলের সঙ্গে পরিচয় হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। চব্বিশ বছর লাগল ধীরার এর সঙ্গে পরিচয় হতে। এতদিন কি এর জন্যেই সে অপেক্ষা ক'রে ছিল? ওরই বা কত বয়স কে জানে? ধীরার চেয়ে বড়ই হবে।

ওষুধ খাওয়ার গুণেই হোক বা স্বাভাবিক ক্লান্তিতে হোক ক্রমে ক্রমে একটা তন্দ্রার ভাব তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। কিন্তু ঘুমটাও স্বপ্ন-সমাকুল। মাঝে মাঝে কোন্ এক অচেনা অজানা জগতে সে জেগে উঠতে লাগল। এমনি ক'রে কয়েক ঘণ্টা পরে ভোরের আলো এসে ঢুকল তার ঘরে।

জাগবামাত্র প্রথম কথা তার মনে হল, নিরঞ্জন সকালে আসবে ব'লে গেছে। সকাল ত সব মানুষের এক সময়ে হয় না? তার ক'টার সময় সকাল হয় তা কে জানে? একলা পুরুষ মানুষ, দেরি ক'রেই ওঠে হয়ত। যা হোক, ধীরা অনেক আগেই উঠেছে, আস্তে আস্তে তৈরি হতে থাকুক।

যশোদা বল্‌ল, "দিদিমণি, অমনি উঠে বসলে যে? আজও ত শুয়ে থাকতেই বলেছিল ডাক্তারে?"

ধীরা বলল, "কত শুয়ে থাকতে পারে মানুষে? এখন ত শরীর খারাপ লাগছে না কিছু কাল থেকে স্নান হয় নি, রাস্তায় ত একবার প'ড়েও গিয়েছিলাম। বড় অপরিষ্কার লাগছে নিজেকে। একেবারে স্নানটা ক'রে নি। তারপর দরকার হয়ত আবার শোওয়া যাবে।"

যশোদা বল্‌ল, "কি কাণ্ডই গেল মা কালকে! ভাগ্যে ঐ ভদ্রলোকটি ছিল তাই, না হ'লে কি যে হ'ত। প্রভু পাঠিয়েছিলেন ওকে তোমায় রক্ষে করতে। বেশ মানুষ, দেখতেও কেমন ভাল। রং না হয় বেশী ফর্সা নাই হ'ল।"

ধীরা বল্‌ল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি আমার কাপড়-চোপড়গুলো দাও ত স্নানের ঘরে। এই নাও, আলমারির থেকে একটা ধোপার বাড়ীর শাড়ী বার ক'রে দাও। কালকের ছাড়া কাপড়গুলো কাচতে দিয়ে দাও।"

নার্স এতক্ষণ ব'সে ব'সে তার রাত্রের report লিখছিল। অন্য রোগিণী হলে সে এতক্ষণ একটু তাড়াহুড়ো দিত হঠাৎ চট্ ক'রে উঠে বসার জন্যে। কিন্তু রোগিণীই যেখানে ডাক্তার, তাকে আর কি ক'রে তাড়া দেওয়া যায়? সে নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, "আজ রাত্রে আবার আসব কি?"

ধীরা স্নানের ঘরে যেতে যেতে বল্‌ল, "পরে জানাব, আজ বোধ হয় আর দরকার হবে না।"

স্নান সেরে, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় প'রে ঘরে এসে দাঁড়াতেই চাকর বিধু দরজার ওধার থেকে বল্‌ল, "সেই ভদ্দরলোক এসেছেন।"

ধীরা বেরিয়ে এল শোবার ঘর থেকে। নিরঞ্জনও তখন সবে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, "রুগ্ন মানুষদের এত ভোরে ওঠা ত উচিত নয়। তার উপর স্নানও সেরে ফেলেছেন দেখছি। ডাক্তারের পরামর্শটা তা হ'লে নিতান্তই শুনবেন না?"

ধীরা বলল, "আমি নিজেও ত ডাক্তার, নিজের কথাটাই শুনলাম। ডাক্তারের কথাই শোনা হ'ল। আপনি বসুন।"

নিরঞ্জন বলল, "আপনি ডাক্তার হলেও বল্‌ছি, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলেই ভাল করতেন। আপনি নিজেও হয়ত বুঝতে পারছেন না যে কতটা shock কাল আপনি পেয়েছিলেন। আমারই ভয় হচ্ছিল আপনাকে দেখে। যা কাজ আমার, তাতে accident অনেক সময়ই দেখতে হয়। তবে তারা হ'ল মিস্ত্রি, কুলী, মজুর, হাড় তাদের শক্ত। আপনাদের মত অত delicate নয়। সজ্ঞানে যে বাড়ী এসে পৌঁছবেন সে আশাটাও সব সময় হচ্ছিল না।"

ধীরা বলল, "অতটা হবার কথা নয়, কেন হ'ল জানি না। শারীরিক আঘাত কোথাও লেগেছে ব'লে ত আজ মনে হচ্ছে না। তবে মাথাটা এখনও ঘুরছে। ঠিক করেছি আজ সারাটা দিন শুয়ে না থাকি, ঘোরাফেরা করব না।"

নিরঞ্জন বলল, "যা আপনার অভিরুচি। তবে একলা রয়েছেন, বেশী সাবধান হওয়াই বরং ভাল, তবু অসাবধান হওয়া ভাল নয়। বাড়ীতে টেলিগ্রাম করবেন কি না ঠিক করেছেন?"

ধীরা বল্‌ল, "এখন করলে অনর্থক ভয় দেখান হবে। বোধ হচ্ছে আর কিছু গোলমাল হবেনা।"

নিরঞ্জন বলল, কালকের accident-টাকে আপনি স্বীকারই করবেন না স্থির করেছেন?"

ধীরা বলল, "স্বীকার না ক'রে উপায় কি? আঘাতটা শরীরে হয়ত লাগে নি তত, কিন্তু মনে ঘা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এত ভয় আর জীবনে বেশী পেয়েছি ব'লে মনে হয় না। জ্ঞানই ছিল না বোধ হয় বেশ খানিকক্ষণ।"

নিরঞ্জন বল্‌ল, "সে দুটোকে arrest করেছে শুনলাম আজ। তখন আপনাকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, যে অন্য লোকগুলোর কি হচ্ছে আশেপাশে তা আর দেখতে পারি নি। আমাকে বোধ হয় আপনার কোন আত্মীয় ভেবেছিল ওরা, তা না হ'লে আমার পিছনেও রিপোর্টার তাড়া করত দু-একজন।"

ধীরা বলল, "সর্ব্বনাশ! তা হ'লেই হয়েছিল আর কি?"

"কি আর এমন হ'ত? এমন ত অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়? রাস্তায়-ঘাটে গাড়ি চাপা পড়া ত দিনে দশটা হচ্ছে এখানে, কে বা তার খোঁজ রাখে? তবে পাশ্চাত্য দেশে হলে ছবি-টবি দিয়ে একটু চমকপ্রদ বিবরণ বেরোত হয়ত। ছবি তুলবার মত মানুষ ত সব সময় চাপা পড়েনা, এক্ষেত্রে প'ড়েছিল, সেটার সুযোগ কাগজওয়ালারা ছাড়তনা।"

একথার কোন উত্তর দেবার আগেই যশোদা খুব যত্ন ক'রে দু'জনের মত চা এনে উপস্থিত করল। নিরঞ্জন সম্বন্ধে ধারণাটা তার এরই মধ্যে খুব উচ্চ হয়ে উঠেছিল। ও না থাকলে দিদিমণির কি হ'ত না জানি!

ধীরা বলল, এত সকালে নিশ্চয়ই খেয়ে বেরোন নি?

"খেয়েই বেরিয়েছি, তবে আর একবার খেতে আপত্ত নেই। কাল রাত্রে নার্স রেখেছিলেন ত? হয়ত রাখেন নি মনে ক'রে একটু উদ্বিগ্নই লাগছিল অনেক রাত্রি অবধি।"

ধীরা বল্‌ল, "দেখুন, মানুষ নিঃস্বার্থ হওয়ার ঐ এক মুস্কিল। যে ভাবনা একেবারেই আপনার নয়, তাই নিয়ে সময়ও গেল অনেকটা আপনার, ভাবনাও ভাবতে হল ঢের।"

নিরঞ্জন বল্‌ল, "অত ভদ্রতা যদি করেন তা হলে ত আর কথাই বলা যাবে না আপনার সঙ্গে। ভাবনাটা আমার নয় কেন? সব মানুষের ভাবনাটা সব মানুষের। তবে ভাব্‌বার সৌভাগ্য আর সুযোগ সকলের হয় না। আমিই যদি চাপা পড়তাম, তা হ'লে আমি আপনার কেউ নয় বা আমাকে আগে কখনও দেখেন নি ব'লে আপনি কি মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতেন? পারতেন তাই?"

ধীরা সত্য কথাই বল্‌ল, "একেবারেই পারতাম না।"

"তা হ'লে আমিই বা কি ক'রে পারতাম'? আমার ত পারা আরও শক্ত।"

ধীরা একবার তাকাল তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। কিন্তু নিরঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

নিরঞ্জন বলল, "এক ত পুরুষ ব'লেই আমার পক্ষে এক্ষেত্রে আর কিছু করা অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়তঃ কেন জানি না আপনি যে অপরিচিতা একটি নারী তাও আমি তখন ভাবতে পারি নি, এবং সত্য কথাই বলছি, এখনও ভাবতে পারছি না।"

ধীরা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কি নিজের মনের কথারই প্রতিধ্বনি শুনছে না কি? এটা কি ক'রে সম্ভব 'হল?

তাকে একেবারে চুপ হয়ে যেতে দেখে নিরঞ্জন বল্‌ল, "বিশ্বাস করছেন না, না? আশা করি রাগ করছেন না?"

ধীরা বল্‌ল, "বিশ্বাস না করব কেন? জগতে এটা ঘটে না এমন ত নয়? আর রাগ করার বদলে খুসীই ত হওয়া উচিত আমার? জগতটাও আমার অচেনাতেই ভরা। নিজের রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া কাকেই বা আমি চিনি? হঠাৎ বিশ্বজোড়া অচেনার মধ্যে একেবারে চেনা কাউকে পেলে খুসী না হয়ে কি মানুষে পারে?"

নিরঞ্জন একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌ল, "এত সুন্দর ক'রে বল্‌লেন কথাটা আপনি! আমি পারতাম না। আপনি কবি হলেই ভাল হ'ত সব দিক্ দিয়ে। ডাক্তারী পড়তে গেলেন কেন?"

"ডাক্তারী পড়লে কি আর ভাল ক'রে কথা বলা যায় না? আর ক'রে খেতে হবে ত? কবিদের ত অনাহারেই থাকতে হয় আমাদের দেশে।"

"তা অবশ্য। তবে এক-একটা কথার সঙ্গে মানুষের মনে এক-একটা চেহারা ভেসে ওঠে যেন। চঞ্চলার কাছে শুনেছিলাম যে ধীরা রায় ব'লে একজন নূতন মহিলা ডাক্তার এসেছেন। মনে হ'ল যেন চোখের সামনে দিয়ে ছদ্মনামী লেখক পরশুরামের গল্প 'চিকিৎসা সঙ্কটে'র ডাক্তার বিপুলা মল্লিক হেঁটে চ'লে গেলেন। তার বদলে যদি আপনাকে দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে যাই, তা হ'লে আমাকে দোষ দেওয়া যায় না।"

ধীরা বল্‌ল, "তা বটে, তবে নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, চেহারা ক'টা লোকের বা হয়?"

নিরঞ্জন বল্‌ল, "আচ্ছা, একেবারেই একটা অন্য কথা তুল্‌ছি। ব্যক্তিগত মনে হবে হয়ত, কিন্তু রাগ করবেন না।"

ধীরা বল্‌ল, "কি কথা বলুন?"

"আপনারা হিন্দু সমাজের কি? না ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান?"

ধীরা বল্‌ল, "আমি হিন্দু সমাজেরই বটে। কিন্তু কেন জানতে চাইছেন?"

নিরঞ্জন বল্‌ল, "অনর্থক কৌতুহলই প্রায়।"

ধীরা বল্‌ল, "ডাক্তার হতে গেলাম কেন, তাই ভাবছেন?"

"ঠিক তাই ভাবছিলাম না, তবে তার কাছাকাছি কিছু বটে। কিন্তু এভাবে আপনাকে বসিয়ে রাখা উচিত নয়। খানিকটা বিশ্রাম আপনাকে করতেই হবে। শুয়ে থাকুন এখন খানিকক্ষণ। আচ্ছা, ও বেলাও যদি আসি খবর নিতে তা হ'লে বিরক্ত হবেন?"

ধীরা বল্‌ল, "আমি কি পাগল?" এলে বিরক্ত হতে যাব কেন?"

"তবে অফিস সেরে আর একবার আসব। এখন উঠি।" ব'লে বেরিয়ে চ'লে গেল। এবং এবারেও নমস্কার করতে তার মনে রইল না।

যশোদা চায়ের বাসন সরাতে সরাতে বল্‌ল, "মাকে একখানা চিঠি লিখবে নি। এত বড় কাণ্ড একটা হয়ে গেল।"

ধীরা বল্‌ল, "দেখি আজ কেমন থাকি। একেবারে সেরে উঠেছি খবর দিয়ে লিখতে পারলে ভাল। না হলে মা-বাবা অনর্থক ভাববেন।"

যশোদা বল্‌ল, "তা এখন শোবে চল। ব'লে গেল তিন দিন শুয়ে থাকতে, তা তুমি চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতে উঠে ঘুরতে আরম্ভ করলে। এখনও বাপু মুখ-চোখ কেমন যেন কালি-পড়া দেখাচ্ছে।" অগত্যা ধীরাকে গিয়ে শুয়ে পড়তে হ'ল আবার।

শুয়েও ত তার শান্তি নেই, ঘুমও আসে না। কি ভাবে তার ঠিক নেই, যত সব অসংলগ্ন চিন্তা। পৃথিবীতে এতদিন এসেছে সে, অনেক কিছু ভাবনা-চিন্তা তার ছিল, এখন সেগুলো গেল কোথায়? কেন সে কিছুই ভাবতে পারছে না আর?

অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা তার ছিল না বললেই হয়। তবে স্কুল-কলেজে, এবং চাকরির সূত্রে কয়েকজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় অবশ্য হয়েছে। তবে যে কাজের জন্যে মেশা, তার গণ্ডির বাইরে সে কোনদিন পদার্পণ করে নি। একমাত্র অনাত্মীয় যুবক যার সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে এক কালে আলাপ হয়েছিল, সে ছিল জয়ন্ত। কিন্তু জয়ন্তকে পুরুষ ব'লে খুব আলাদা ক'রে ভাবতে পারে নি ধীরা। সে বিভার বন্ধু, বিভা তাকে ভালবাসে এই ছিল জয়ন্তের পরিচয় তার কাছে। সে যখন ধীরার জীবন থেকে একেবারেই সরে গেল, তখন কোন শূন্যতা রেখে যেতে পারল না।

কিন্তু এই যে নূতন পায়ের চিহ্ন পড়ল ধীরার জীবন-পথে, এ ত সেরকম একেবারে নয়। এ যেন বিজয় রথে চড়ে চ'লে এল একেবারে তার অনাসক্ত নারী-হৃদয়ের দরজা পর্য্যন্ত। একে কোথায় রাখবে সে? কি রূপে বরণ করবে? ধীরার মন সভয়ে চমকে যেন পিছিয়ে গেল। কি ভাবছে সে? একদিনের মাত্র পরিচয় তার সঙ্গে। হয়ত আরো কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেলে এই নিদারুণ পাগলামি তার মন থেকে বিদায় নেবে। এত ভয় এখনই কেন সে পাচ্ছে? আর নিরঞ্জন? সেই বা ধীরাকে কি মনে করছে?

নিজের ব্যবহারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। কোথাও কি কিছু অসঙ্গত আচরণ করেছে সে? কোন এমন কথা বলেছে যা তার বলা উচিত ছিল না? না। ক'টা কথাই বা সে বলেছে? বেশীর ভাগ কথা ত নিরঞ্জনই বলেছে।

কিন্তু কথা ত যে যাই ব'লে থাক, অন্য কিসের স্মৃতি এমন ক'রে তার হৃদয়ের মধ্যে সুরের মত বাজছে? এই যুবকটির সবল বাহু দুটো কতক্ষণ তাকে বুকের কাছে ধ'রে রেখেছিল। তার হৃৎপিণ্ডের শব্দটা এখনও কেন ধীরা কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে? বাড়ীতে এসেও সেই তাকে কোলে করে নামিয়েছে; প্রায় বহন ক'রেই নিয়ে এসেছে ঘরের মধ্যে। তার স্পর্শটা এখনও যেন লেগে রয়েছে ধীরার দেহে, বার বার শিহরণ জাগিয়ে দিচ্ছে।

পুরুষ জাতি সম্বন্ধে ধীরার একটা মারাত্মক বিতৃষ্ণা ছিল। ভয়ে এবং ঘৃণায় তার দেহের প্রত্যেকটা স্নায়ু যেন অবশ হয়ে যেত, কেউ তাকে স্পর্শ করতে আসছে ভাবলেই। প্রথম যৌবনের নিদারুণ তিক্ত ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতাই এর কারণ ছিল। এটা সে কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে নি এতদিন।

সেই মানুষের আজ এ কি হ'ল? নিজের কাছে কিন্তু সে লজ্জিত হ'ল না। কি একটা মায়ামন্ত্র যেন কাজ করছে তার জীবনে। এটা কি তার সঙ্গের সঙ্গী হবে চিরদিনের জন্যে, না তাকে ছেড়ে যাবে দু'দিন পরে, আগেকার সেই কঠিন রিক্ত চিরতুহিনাবৃত দেশে?

যশোদা এসে বলল, "ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

চমকে উঠে ধীরা মনটাকে সজোরে ফিরিয়ে আনল বর্ত্তমানের মধ্যে। ডাক্তার ঘরে এসে বললেন, "কেমন আছেন মিস্ রায়?"

ধীরা বলল, "কালকের চেয়ে অনেক ভাল, তবে স্বাভাবিক লাগছে না এখনও।"

ডাক্তার নাড়ী দেখা প্রভৃতি যথাকর্ত্তব্য সেরে বললেন, "রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, না? নার্স বলছিল ওষুধ সবটা খান নি?"

"অর্দ্ধেকটা খেয়েছিলাম। বেশী ঘুম হয় নি অবশ্য।"

ডাক্তার উঠে পড়লেন, "আচ্ছা দেখুন আজকের দিনটা আর একটু ভাল থাকা উচিত ছিল। কাল বোঝা যাবে ঠিক কি করা কর্ত্তব্য।" তিনি বিদায় হলেন।

শরীরটা সত্যিই খুব বেশী ভাল লাগছিল না তার। সরাটা দিন শুয়েই রইল, খাওয়া-দাওয়া সামান্য কিছু করল, কিন্তু বিকালে দেখা গেল তার সামান্য একটু জ্বর হয়েছে।

যশোদা ত একেবারে হৈ হৈ করে উঠল। আবার জ্বর এল কেন? না দিদিমণির আর কোন কথাই সে শুনবে না। তাকে ভাল ক'রে ডাক্তার দেখাতে হবে, ওষুধ খেতে হবে এবং সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে। সে এখনই নার্স ডেকে আনছে।

ধীরা বলল, "ডেক এখন বাপু রাত্রে হয়ত দরকারই হবে। সম্প্রতি আমার চুলটা বেঁধে দাও।"

বিকালে জোর করে উঠতে আর সাহস করল না ধীরা। শুয়েই রইল, উৎসুক হয়ে কার পায়ের শব্দের জন্য।

নিরঞ্জন বেলা থাকতে থাকতেই এসে উপস্থিত হ'ল। যশোদা দেখল তাকে আগে। খবর দিল, "এ বেলা দিদিমণি ত জ্বর বাধিয়ে বসেছে।"

নিরঞ্জন বলল, "তাই না কি? ভাল নয়ত এটা। কোথায় রয়েছেন তিনি?"

"এই যে এখানে, আসুন আপনি," ব'লে যশোদা তাকে সোজাসুজি ধীরার শোবার ঘরের সামনে এনে

হাজির করল। এটা নিশ্চয়ই সে মেমদের বাড়ী দেখে নি, কিন্তু উৎকণ্ঠার আতিশয্যে তখন আর তার সে কথা মনে ছিল না।

নিরঞ্জনকে দেখে ধীরা কেমন যেন চম্‌কে গেল। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, "আর ওঠা একেবারেই চলবে না আমার। এইখানেই বসুন।"

যশোদা চেয়ার এগিয়ে দিল। নিরঞ্জন ব'সে প'ড়ে বললে, "নিজের ডাক্তারী ক'রে এ কি করলেন বলুন ত?"

ধীরা বলল, "এই জন্তেই ত নিজের ডাক্তারী করা বারণ। অন্য ডাক্তার শরীরটা দেখে, আর রোগী আর ডাক্তার একই মানুষ হলে মন আর ইচ্ছাটাই প্রাধান্য লাভ করে।"

নিরঞ্জন বলল, "তা হ'লে দোহাই আপনার, অন্য ডাক্তারই ডাকুন। এই রকম ক'রে নিজে ভুগবেন না, আর অন্যকে ভোগাবেন না।" তার গলার স্বরটা ভয়ানক অস্বাভাবিক শোনাল।

ধীরা একটু বিচলিত হয়ে বলল, "অন্যকেও কি খুব বেশী ভোগাচ্ছি?"

নিরঞ্জন বলল, "সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না? এই রকম একলা বাড়ীতে প'ড়ে যদি খালি অসুখে ভোগেন, তা হ'লে সেটা কেমন লাগে আমার? অবশ্য আমাদের পরিচয়টা সময় হিসাব করলে খুব বেশীক্ষণের নয়, কিন্তু সব জিনিষ ত আইন মেনে চলে না? অনেক সময় দেখা যায় যে, অন্যক্ষেত্রে যেটা চব্বিশ ঘণ্টা, কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে সেটা চব্বিশ মাসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।"

ধীরার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ কেমন যেন আছাড় খেতে আরম্ভ করল। এইরকম ক'রেই তাকে ভেসে যেতে হবে না কি? পারবে না সে নিজেকে ধ'রে রাখতে?

নিরঞ্জন কথার কোন জবাব না পেয়ে বলল, "আর তা ছাড়া আপনাকে কাল গাড়ির চাকার তলার থেকে তুলে এনে অবধি মনে হচ্ছে আপনার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দেবার একটা অধিকার আমার জন্মে গেছে। কথাটা অবশ্য আস্পর্দ্ধার মত শোনাচ্ছে।"

ধীরা বলল, "আসলে কিন্তু আস্পর্দ্ধা সেটা মোটেই নয়।"

"সেটা তাহলে স্বীকার করছেন? আমার উপদেশে তা হ'লে রাগ করবেন না। আপনি আর একটু বেশী নিজের সম্বন্ধে সাবধান হোন্। যত শক্ত নিজেকে মনে করেন, তা আপনি নন। সে ত কালই দেখলাম। বাড়ীতে খবর দিতেও বোধ হয় চান না? একলাই থাকবেন?"

ধীরা বল্‌ল, "মাকে বেশী ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করছে না। এমনই তিনি আমার জন্যে বড় বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন। আমাকে এভাবে থাকতে দিতে তিনি মোটেই চাননি, আমিই জোর ক'রে এসেছি। আমিই তাঁর প্রথম সন্তান, চিরদিন তাঁর কাছে খুকীই থেকে গেছি।"

"খুকীর চেয়ে খুব বেশী বড় আর কি হয়েছেন? দেখলে ত মনে হয় না। আপনাকেও 'আপনি', 'আজ্ঞে' ক'রে কথা বলতে হয় নেহাৎ শিষ্টাচারের খাতিরে।"

ধীরা হেসে ফেল্‌ল, বল্‌ল, "খুব ঠাকুরদাদার মত কথা বলছেন। আপনিই কি আর এত বুড়ো হয়েছেন?"

"বুড়ো না হই, বড় ঠিকই হয়েছি। আমাকে ছেড়ে দিতে মা বা বাবা কারো কোন আপত্তি হয় নি।"

"তাঁরা কেউ এখানে থাকেন না?"

"না, এখানে কেউই নেই। মায়ের মস্ত বড় সংসার, তাঁর ধারণা তিনি সেখানে উপস্থিত না থাকলে সব ভেসে চ'লে যাবে। আমায় ছেলেধরায় ধরবে এ ভয় তাঁর নেই, কাজেই নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিয়েছেন। আপনার মা কিন্তু আপনাকে না ছাড়লেই পারতেন। এখনও নিজের অভিভাবিকা হবার মত বয়স বা মন আপনার হয় নি।"

ধীরা বল্‌ল, "বয়সটা খুব কম নয়, চেহারা দেখে আপনি যাই ভাবুন। আর মনের আবার কি ক্রটি হ'ল? কান্নাকাটি ত করি নি?"

"কাঁদেন নি ঠিকই। তবে যতক্ষণ আমি ধরে-ছিলাম, ততক্ষণই কেঁপেছেন। খুব সাবালিকা এখনও হন নি।"

ধীরা বল্‌ল, "শরীরটাই আসলে খুব সবল নয় আমার। মনের জোরের খুব অভাব আছে ব'লে মনে হয় না। পাঁচ-ছ বছর একলাই ত ছিলাম, নিতান্ত অসহায় লাগত না নিজেকে।"

"সে চল্লিশ-পঞ্চাশ বা তারও বেশী মানুষের সঙ্গে বোর্ডিংএ থাকা। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। তবে এখন যে ভাবে আছেন তাতে ভয়ের কারণ

আপনার যখন-তখন ঘটতে পারে। বাইরেও প্র্যাক্‌টিস্ করেন না কি?"

ধীরা বল্‌ল, "অনুমতি পাব তারও শুনছি।"

নিরঞ্জন বল্‌ল, "না পেলেই ভাল, তখন ঐরকম ট্যাক্সি চ'ড়ে দিনে-রাতে যেখানে-সেখানে একলা ঘুরবেন ত?'

ধীরা হেসে ফেল্‌ল। বল্‌ল, "তা ত যেতেই হবে, রুগীরা কি শুধু দিন-দুপুরে অসুখ করবে আমার খাতিরে? কিন্তু আমি ত আর রেড্ রাইডিং হুড্ নয় যে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেল্‌বে?"

নিরঞ্জন বল্‌ল, "আপনার মত রেড্ রাইডিং হুড্‌কে খেয়ে ফেল্‌তে চাইবে এমন নেকড়ে একেবারেই বিরল নয়।"

ধীরা বল্‌ল, "আঃ, আরো ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে। তবে আমি কি করব? চিরজীবন দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকব?"

"তা ত থাকবেন না। তবে চিরজীবনটা এক-ভাবেই নাও যেতে পারে ত? তা ছাড়া বয়সটা ত বাড়বেই। চেহারাটাও আরো শক্ত-পোক্ত হয়ে যেতে পারে। এখন আপনাকে দে'খে যা impression হয়, তাতে আপনাকে লোকে খুব ভয় ক'রে চলবে না।"

ধীরা বল্‌ল, "একবার গাড়ি চাপা পড়ে গিয়ে আমার দেখছি চিরদিনের মত নাম খারাপ হ'ল আপনার কাছে। সত্যিই এত দুর্ব্বল, অসহায় বা ভীরু নই আমি। কিন্তু সেটা আপনার কাছে প্রমাণ করা ত শক্ত।"

"আচ্ছা, সেটা নাই বা প্রমাণ হ'ল। আপনাদের জাতটিকে দুর্ব্বল ও অসহায় ভাবতে আমাদের ভালও লাগে খুব। নিজেদের অহঙ্কারটাও পরিতৃপ্ত হয় অনেকখানি। এরই থেকে chivalry জিনিষটার জন্ম। মন্দ নয় জিনিষটা, যদিও আধুনিকা মহিলারা এটাকে খুব বেশী মূল্য দেন না।"

ধীরা বলল, "দেয় না নাকি? নিজেদের কাজে যখন লাগে তখন ত কেউ এটার সুবিধা নিতে পশ্চাৎ-পদ হন না?"

এমন সময় ডাক্তার আবার আসছেন শোনা গেল। জ্বর হবার খবরটা যশোদা তাঁকে দিয়ে এসেছে। নিরঞ্জন বল্‌ল, "তা হ'লে আমি উঠি এখন।"

ধীরা বল্‌ল, "না, না, যাবেন না এখন। সারা সন্ধ্যা একলা ব'সে ব'সে কি করব আমি? খুব দরকারী কোন কাজ আছে?"

"কাজ কিছুই নেই। থাকতও যদি তাতেই বা কি? আচ্ছা, আমি বাইরের ঘরে বসছি। আপনাকে উনি দেখে যান।" ব'লে বসবার ঘরে গিয়ে বসল।

ডাক্তার আবার তাকে দে'খে গেলেন। বললেন, "জ্বর কেন হ'ল, আঘাতের জন্যে ব'লে ত মনে হচ্ছেনা। কিন্তু কালও যদি না ছাড়ে ত X ray ক'রে দেখতেই হবে। আজও নার্স থাক রাত্রে। বিছানা ছেড়ে একেবারেই উঠবেন না।"

তিনি চ'লে যেতেই নিরঞ্জন আবার ফিরে এল। বলল, "আপনার আয়া দেখি আবার চা আনছে। আপনি এখনও খান নি না কি? না আমার জন্যে দ্বিতীয় বার করা হচ্ছে? অত formality-র রোজ রোজ দরকার হয় না।"

ধীরা বলল, "চা ত লোকে সারাক্ষণই খায়; ওর আর অসুবিধা কি? আমি নিজেও খাই নি এখনও। এ বিষয়ে যশোদাকে কিছু বলবার দরকার হয় না। আমাকে ও মনিব ত ভাবে না, পালিতা কন্যাই ভাবে। আমাকেও সেই ভাবে চলতে হয়। এত বেশী ভাল-বাসে আমাকে যে, ওর কোন কথার উপরে কথা আমি বলিও না, পাছে ওর মনে কষ্ট হয়।"

নিরঞ্জন বলল, "তা হ'লে দু'জনেরই কপাল ভাল বলতে হবে। এ রকম মনিব পেলে ভাল আর না বাসবে কে? আর এত যত্ন করতে সত্যি আমি আর কোন আয়া বা ঝিকে দেখি নি। সে দিক্ দিয়ে আপ-নারও ভাগ্য ভাল।"

চা এল, খাওয়াও হ'ল। নিরঞ্জন বলল, "উঠি তা হ'লে এখন। নইলে আপনার ডাক্তার এবার চ'টে যাবেন। আজই একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তবে কালও আমি দু'বেলাই আসব। আপনি আজ ভুলে যান যে আপনি নিজে ডাক্তার। অন্যদের উপদেশ মতই আজ রাতটা কাটুন। ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে বলে তাই না হয় ঘুমোন। কাল যেন আর জ্বর না থাকে।"

ধীরা বলল, "সত্যি, কালও জ্বর থাকলে বড় মুস্কিলে পড়তে হবে। উঠতে ত পাবই না, তার উপর X-ray করার উৎপাত। সর্ব্বোপরি, মা যদি এসে হাজির হন তা হ'লে ত সোনায় সোহাগা। এমন ভয় পাবেন যে আমিও ভয় পেয়ে যাব।"

নিরঞ্জন বলল, "দেখুন যদি মনের জোরে কাল জ্বরটা ছাড়াতে পারেন। আমি অবশ্য ডাক্তার নই, তবু মনে হচ্ছে না যে, আপনার সাংঘাতিক আঘাত কোথাও

লেগেছে। তা হ'লে কি আর দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারতেন অত সহজে?"

সে চলে গেলে পর আজও নার্স এল, এবং ধীরাকে পুরোপুরি রোগী সেজে শুয়ে থাকতে হ'ল। অর আর সে চায় না। উঠে-হেঁটে বেড়াতে চায়, কাজকর্ম করতে চায়। সারাদিন কত আর ভাববে সে? সময় ত চ'লে যাচ্ছে, কিন্তু তার মন ত ফিরছে না? একটা ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে এ কি এল তার জীবনে? আচ্ছা, নিরঞ্জন ব্যাপারটাকে কি ভাবছে? এটা তার কাছে কিছুই কি নয়? শুধুই কি ভদ্রতা, শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞান? তা ত মনে হয় না? কথাতেও না, চোখের দৃষ্টিতেও না, কথার স্বরেও না? এত আগ্রহ ক'রে কেন সে ধীরাকে বারে বারে দেখতে আসছে? কেন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, সে ধীরাকে অপরিচিত মনে করতে পারছে না, কয়েক ঘণ্টা আগের দেখা মানুষ মনে করতে পারছে না?

হঠাৎ বিভার সেই কবিতা আওড়ান মনে প'ড়ে গেল। বলেছিল, "দৈবে যাহারে সহসা বুঝায় সে ছাড়া সে আর বোঝে না কেহ।" দৈবই কি এল এই আগন্তুকের রূপ ধ'রে?

আজ কিন্তু নার্স ডাক্তারের সবরকম উপদেশ নিয়ে বেশ শক্ত হয়ে এসেছিল। ধীরার কোন কথাই আজ শোনা হ'ল না। সে শুয়ে শুয়েই খাওয়া-দাওয়া করল এবং বেশ পুরো মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে একটু পরে ঘুমিয়ে গেল। ঘুমের ওষুধের কল্যাণেই বোধ হয় আজ রাত্রে সে বেশী স্বপ্ন দেখল না। তবু দু'চারবার কার মুখ যেন সুপ্তি সাগর পার হয়ে তার মনের মধ্যে ঘুরে গেল।

শহরের মধ্যেই খানিক দূরের একটা বাড়ীর একলা বাসিন্দা, খাওয়া-দাওয়া সেরে মাঝ রাত পর্য্যন্ত বারান্দায় ঘুরে বেড়াল। একটা কুকুর খানিকক্ষণ তার পিছন পিছন ঘুরল, তারপর প্রভুর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টাটা বৃথা দেখে একটা পাপোষের উপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। নিরঞ্জন ভাবছিল কি কে জানে? মুখের আবিষ্ট ভাবটা দেখে মনে হয়, কোনও একটা বিষয়ে তার মনটা একেবারে ডুবে রয়েছে। হয়ত কোন কোমল সুন্দর দেহের স্পর্শটা সেও ভুলতে পারছিল না। মুখটাও বড় বেশী সুন্দর। কিন্তু সুন্দরী নারী এর আগে সে কখনও দেখেনি, এমন ত নয়? কিন্তু এই মানুষটি যেন হঠাৎ তার মনটাকে সম্পূর্ণ ক'রে পরিপূর্ণ ক'রে জুড়ে বসল। ধীরার কাছে যা বলেছে তা ত বানান কথা নয়। এ যে কোনোদিন তার জীবনে ছিল না, এ কথা সে ভাবতে পারছে না কেন? কোনোদিন তার জীবনে নাও আর থাকতে পারে, এ চিন্তাটাও একেবারে অসহ্য কেন? প্রেম জিনিষটার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তার পরিচয় ঘটে নি, এবং সেটা যে কি ভাবে মানুষকে একেবারে অভিভূত ক'রে দেয়, তার পরিচয় পেয়ে সে বিস্মিত হয়ে গেল।

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

দিল্লী ঃ জুলাই, ১৯৪৭

দেরাদুনে এসে দেখি ছুটিতে অনেকেই আছেন, বাইরে যান নি। আমাদের স্কুলে কেমিষ্ট্রি পড়ান আগরওয়ালা, তাঁর সঙ্গে ডাক্তার শিখিভূষণ দত্তের বন্ধুত্ব—তাঁর বাড়ীতে দত্তমশাই সপরিবারে এসে রয়েছেন। দিল্লীর বর্ষার চেয়ে দেরাদুনের বর্ষা নাকি ঢের ভাল,—গরম অনেক কম। আমার পক্ষে ভালই হ'ল। কথা বলবার লোকের অভাব হ'ল না। শ্যামলী আমার বোন শান্তি ও মা'র সঙ্গে কলকাতা গিয়েছে,—ফিরবে স্কুল খুললে। ছবি আঁকায় মন দেবার চেষ্টা করলাম। শিখিবাবু মাঝে মাঝে আসেন। আমিও বিকেলে ওঁদের কাছে যাই। শিখিবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগে। নানান বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য। ওঁর স্ত্রী অবশ্য কথা বলতে আরম্ভ করলে সহজে থামতে চান না। রাজ্যের খবর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়। বুদ্ধিও রাখেন। শিখিবাবু ত সব সময় 'ওগো শুনছ' বলে তাঁর মতামত নিয়ে তবে সব কাজ করেন। দুই মেয়ে আর একটি ছেলে—এই নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলেটি স্কুলে পড়ে। বড় মেয়ে মঞ্জু কলেজে পড়ে, ছোট মেয়ে টুবলুর বয়স ছ' সাত বছর। মিসেস দত্ত রাঁধেন ভাল, তার পরিচয় মাঝে মাঝেই পেতাম।

মঞ্জু গান গায়। ভালই গায়। পড়াশুনায় ভাল। ওস্তাদী গান শিখেছিল। রবীন্দ্র সঙ্গীত জানে কিন্তু বিশেষ ভক্ত নয় সে গানের। ঐখানটায় ওঁদের সঙ্গে আমার মিল নেই মোটেই। আমি রবীন্দ্র সঙ্গীত পেলে আর কিছু চাই না। আসামী ঝুমুর জানে কয়েকটা—মঞ্জুর গলায় মন্দ লাগে না। মেয়েটির খুব ভাল একটা গুণ—গাইতে বললে গায়, ন্যাকামি নেই এ বিষয়ে।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। খুব বৃষ্টি চলছে। শিখিবাবুরা এবার ফিরবার ব্যবস্থা করছেন। ওঁরা বললেন—"আপনার ত ছুটি এখনও বাকী আছে। চলুন আমাদের সঙ্গে দিল্লী। কোনো অসুবিধা হবে না আপনার সেখানে।" এমন আন্তরিক আহ্বানকে কি হেলাফেলা করা যায়। রাজী হয়ে গেলাম!

দিল্লী রওনা হবার আগের দিন ওঁরা সবাই আমার কোয়ার্টারে এসে হাজির। মিসেস দত্ত বললেন—'বলতে এলাম, ছবি নিয়ে চলুন, রজোবা সাহেবকে দেখাবেন। উনি একটা ফণ্ড করেছেন। দিল্লীর সব হল ও লাইব্রেরী ছবি কিনে সাজাচ্ছেন।' ঘরে প্রকাণ্ড গান্ধীজীর ডাণ্ডি মার্চের ছবিটা টাঙ্গানো ছিল। ওটার দিকে চোখ পড়ল তাঁর। বললেন—'এটাও নিতে ভুলবেন না। এটা রজোবা সাহেব নিশ্চয়ই নেবেন।' ছবি বহুদিন আগের আঁকা, অনাদৃত হয়ে এক কোণে ঝোলান ছিল। যাই হোক, উনি যখন বলছেন, তখন নিয়েই যাব ভাবলাম।

চললাম দিল্লী শিখিবাবুর সঙ্গে। য়ুনিভার্সিটির কাছেই তাঁর কোয়ার্টার। বেশ সুন্দর বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। খাই-দাই, গপ্পো করি, গান শুনি, গান গাই, বিকেলে ওঁদের সঙ্গে বেড়াতে বার হই, দুপুরে মাঝে মাঝে বসে ছবি আঁকি।

একদিন, দিন ঠিক করে রঙ্কোবা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। শিখিবাবুই নিয়ে গেলেন। রঙ্কোবা সাহেব ছবি দেখলেন, পছন্দ করলেন। গান্ধীজীর ছবিটা সত্যিই নিলেন হাজার টাকায়। ছোট ছবিও নিলেন দশ-বারো খানা। সঙ্গে সঙ্গে চেকও লিখে

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের প্রতিমূর্তি

দিলেন। বাড়ী ফিরে এলাম চেকটি নিয়ে। মিসেস দত্ত ত খুব খুশী! তাঁর কথা ফলেছে।—"দেখলেন ত! আমার কথা শুনে চললে আরও কত বিক্রী হবে। এবারে খাওয়াতে হবে। ফাঁকী দিলে চলবে না।"

জুলাই মাসটা দিল্লীতে কাটিয়ে আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে ফিরে এলাম দেরাদুন। ছুটি তখনও শেষ হয় নি। বাকী ছুটিটা কাটালাম ছবি এঁকে।

ছুটি ফুরোল। শ্যামলী ও মা কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। ফিরে এল ছেলেদের দল। আবার চলল কাজের ঘানি। নানান অভিজ্ঞতার বৈচিত্রে ছুটি কাটল বটে!

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ : দেরাদুনে দাঙ্গা

'৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা সুরু হ'ল। দেশ স্বরাজ হবার ঠিক আগেই বাংলা দেশ আর পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হ'ল। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। খবরটা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দুর্যোগ সুরু হয়ে গেল। সুরু হ'ল দেরাদুনের মুসলমানদের উপর মারপিট! মুসলমানেরা দলে দলে তাদের নয়া বাসস্থান পাকিস্তানে পালাতে লাগল সাহারানপুরের পথে। বহু হিন্দু শিখ পাঞ্জাব থেকে দেরাদুনে এসে গিয়েছিল। তারাই সুরু করেছিল মুসলমানদের উপর হামলা। দেরাদুনের নিরীহ পাহাড়ীরাও উঠল ক্ষেপে। 'মার মার, কাট কাট' পড়ে গেল চারিদিকে! সে কী বীভৎস উত্তেজনা! ঘরের বার হওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল!

দুন স্কুলের মুসলমান ছেলেরা—যাদের পশ্চিম পাকিস্তানে বাড়ী—তাদের রাতারাতি পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হল। দেরাদুনে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, সুতরাং তারা বিপদেই পড়ল।

দুন স্কুলের চাকর বেয়ারা খানসামার দল, প্রায় সবাই মুসলমান। সুতরাং দাঙ্গাওয়ালাদের চোখ পড়ল দুন স্কুলের উপর। মুসলমান চাকররা আর

রাস্তায় বার হতে পারে না। হিন্দুরাও ভয়ে ভয়ে বার হয়, নেহাৎ দরকার পড়লে। পাছে তাদের মুসলমান ভেবে খুন করে, সেই ভয়ে যারা কোনদিন টিকি রাখত না, কপালে তিলক কাটত না—তারা মাথায় মোটা টিকি রাখল, কপালে মস্ত ফোঁটা দিতে সুরু করল। ব্রাহ্মণরা এমনভাবে গলায় পৈতে রাখল, যাতে পৈতেটা দেখা যায় সার্ট-পাঞ্জাবীর গলার ওপর দিয়ে। শোনা যায়, এক মুসলমান নাকি হিন্দু সেজে ট্রেণে করে কোথাও যাচ্ছিল—তাকে শিখেরা ধরে মারতে চায়, হিন্দু কি মুসলমান তা জানবার জন্ম তাকে বলা হ'ল যে গায়ত্রী মন্ত্র না বলতে পারলে তার প্রাণ যাবে। কিন্তু সে পারবে কেন? সুতরাং প্রাণটাই গেল তার। অনেক হিন্দু—যাঁরা গায়ত্রী মন্ত্র শেখে নি কিংবা ভুলে গেছে, তারা প্রাণের ভয়ে গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করতে লাগল। বহু মুসলমান মারা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে কিছু হিন্দুও। এমনি গোলমালের ভেতর চলল আমাদের স্কুলের কাজ। ক্রমে ছুটির সময় এল। তখনও গোলমাল চারিদিকে। ট্রেণে চলাফেরা করা তখনও বিপজ্জনক। ঠিক হ'ল, সেবারকার শীতের ছুটি হবে না। সারা শীত স্কুল চলবে, তার বদলে গরমের সময় এক মাস ছুটি বেশী হবে। ৭ই জুন থেকে সচরাচর ছুটি, কিন্তু সেবারে ছুটি হবে ১লা মে থেকে। ততদিন গোলমালটা নিশ্চয়ই বন্ধ হবে আশা করা যায়।

মিঃ 'ম' ও মিস 'প'

যুদ্ধের সময় অনেক ইংরেজ ও আমেরিকান আরমি অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হ'ল। প্রায়ই তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছবি কিনে নিয়ে যেত আমার কাছ থেকে।

মিঃ ম ব'লে একটি যুবক এসেছিলেন দেরাডুনে। তিনি প্রায়ই আসতেন আমার কাছে। আসলেই আমার সঙ্গে ব'সে চা খেতেন কিংবা রাত্রে একেবারে ডিনার খেয়ে অর্থাৎ চাপাটি তরকারি খেয়ে তবে যেতেন গল্প-গুজব করে। ছবি ও মূর্তি দুই ভালবাসতেন—ভাল-মন্দ বুঝতেন। আমার কাজের ওপর দু'বার প্রবন্ধ লিখেছিলেন; একবার 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে, আরেকটি 'নিউ হোরাইজন' বলে একটি এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায়। লেখবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। আমার মূর্তির অ্যালবামের ভূমিকাও তিনি লিখে দিয়েছিলেন।

'ম' সাহেব খুব ভাল মানুষ লোকটি। ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধে মিশতেন। প্রায়ই আমার কাছে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসতেন। 'ম'-এর মূর্তি গড়েছিলাম, মাথায় প্রকাণ্ড টাক—লম্বায় সাড়ে ছ' ফিট দেহ, গোঁফ জোড়া বেশ ফৌজি প্যাটার্ণের হ'লেও মুখ চোখের ভাব মোটেই ফৌজের লোকদের মত নয়।

মিস 'প' বলে একটি মেয়ে মহিলা ওয়েলহাম স্কুলে কাজ করতেন। তিনি আইরিশ মহিলা—বেশ লম্বা দেহখানা, মুখখানাও লম্বা-গোছের।

মিস 'প'-এরও মূর্তি গড়েছিলাম- ইনিও প্রায়ই আসতেন আমার কাছে। একদিন আমার ঘরেই মিস 'প'-এর সঙ্গে মিঃ 'ম'-এর আলাপ হ'ল। আলাপটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মিঃ 'ম'-এর স্বভাবটাও আমাদের দেশী ভাল ছেলেদের মত। দেশে থাকতে যুদ্ধে যোগ দেবার আগে 'ম'-এর একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল। দেশে ফিরে গিয়ে তাকে বিয়ে করবে আশা ছিল 'ম'-এর মনে। কিন্তু যুদ্ধ কবে থামবে, কবে সে দেশে ফিরতে পারবে কিছুই ঠিক নেই। সেই জন্যে সে মেয়েটিকে জানিয়েছিল সব খুলে। তাকে এ কথাও লিখেছিল যদি সে অন্ম কারুকে বিয়ে ক'রে সুখী হতে পারে তা হ'লে 'ম'-এর কোন আপত্তি নেই। স্বার্থপরের মত কতদিন আর সে মেয়েটিকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে বলবে! মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন মিস 'প'-এর সঙ্গে ভাব হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ 'ম' বদলি হয়ে গেল দেরাডুন থেকে। 'ম' চলে গেল নওসেরা বলে এক জায়গায়। আমাকে সেখান থেকে চিঠি লিখত মাঝে মাঝে। মিস 'প' 'ম' চলে যাবার পরও প্রায়ই আসত আমার কাছে। তাকে একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলাম—'কি হ'ল তোমাদের? শেষ রক্ষা করতে পারলে না?

মেয়েটি সহজভাবেই জবাব দিয়েছিল—"তোমার বন্ধুটি বড় বেশী 'ইনটেলকচুয়েল'—নাগাল পেলাম না! আমি অতি সাধারণ মেয়ে!"

'দাক্তার মিয়াস্ত'

একটি ইংরেজ দাক্তার—খুব অল্প বয়সী—দাক্তার মিয়াস্ত এখানকার সি আই এম এইচ-এর দাক্তার

অনুশীলনী

হ'য়ে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আলাপ। আলাপ জমে উঠল প্রথম দিনেই। নানান কথাবার্তার পর জিজ্ঞেস করলাম, "কতদিন থাকবেন?"

উত্তর পেলাম, 'আর মাত্র তিনদিন। দেশে ফিরে যাচ্ছি।"

বললাম—'বেশ, আমি কাছেই হুন স্কুলে আছি—আসবেন কাল?'

মিয়াস্ত রাজী হ'ল। পরের দিন এল বিকেলে। ছবি দেখতে চাইলে। দেখালাম ছবি তাকে। সে

'বললে, আমাদের দেশে তোমার ছবির প্রদর্শনী করো না কেন ?'

—'করেছি একবার। নিজেই গিয়েছিলাম ছবি নিয়ে। নিজে না গেলে ছবির প্রদর্শনী সুবিধের হয় না।"

—আমাকে বিশ্বাস করে যদি ছবি দাও, আমি সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনী করতে পারি।

রাজী হয়ে গেলাম। চেনা নেই, শোনা নেই মিয়াস্তর সঙ্গে পঞ্চাশখানা ছবি পাঠিয়ে দিলাম বিলাতে। রয়েল ইণ্ডিয়া সোসাইটির সেক্রেটারী দাক্তার রিকটারকে চিঠি দিলাম। আবার তাঁরা লণ্ডনে আমার ছবির প্রদর্শনী করলেন। কাগজে বেশ প্রশংসা বার হয়েছিল। প্রথমবার লণ্ডনে প্রদর্শনী করেছিলাম ১৯৩৭ সালে। ঠিক দশ বছর পরে ১৯৪৭ সালে আবার প্রদর্শনী হ'ল আমার ছবির। কেবল এবারে আমি উপস্থিত থাকলাম না। এখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব লণ্ডনে আবার প্রদর্শনী হ'ল কাগজে দেখে ভাবলেন, আমি বুঝি আবার বিলেতে গিয়েছি। মিয়াস্ত সাহেবের উৎসাহে আবার প্রদর্শনী হয়ে গেল। ছবি পাঠাতে কোন হাঙ্গাম হ'ল না। ছবিগুলো বিলাতে ফ্রেম করাতে অনেক খরচ হয়ে গেল। ছবি কিছু বিক্রী হয়েছিল তাই রক্ষে। অনেকগুলো ছবি শেষে এক ভারতীয় হোটেলওয়ালা কিনেছিলেন সস্তা দামে। অনেকের মুখেই শুনতাম যে আমার ছবি তাঁরা এক ভারতীয় হোটেলে দেখেছেন লণ্ডনে। আমার ছবি দেখেই নাকি চেনা যায়। এটা কমপ্লিমেন্ট কি না জানি না। সব খরচ মিটিয়ে মিয়াস্ত সাহেব আমাকে পাঁচ পাউণ্ড আন্দাজ পাঠিয়েছিলেন। প্রদর্শনীর লাভের অংশ! মন্দের ভাল যে পকেট থেকে পয়সা দিতে হয় নি!

মিয়াস্ত সাহেবের সঙ্গে বহুকাল চিঠিপত্র নেই।

লর্ড 'অ'—

মিঃ 'ম' একদিন নিয়ে এসেছিলেন মেজর 'অ' কে। ইনিও লম্বা সাড়ে ছ'ফিট প্রায়—'খানসাম' যুবক, মাথার চুল লাল। যুদ্ধে যোগ দেবার আগে তিনি এক অভিনয়ের দলে ছিলেন ছাত্রভাবে। অভিনয় করা যে তাঁর অভ্যাস সে প্রথম দিন থেকেই বুঝেছিলাম। মোটর থেকে যেমন সুষ্ঠু ভাবে নেমে মোটরের দরজা বন্ধ করলেন তাতেই বোঝা গেল। মেজর 'অ'-কে আর্ট ও আর্টিষ্ট সম্বন্ধে বেশ 'সিমপ্যাথেটিক' দরদী বলে মনে হয়েছিল। ভালো জিনিষটা সহজেই চিনে বার করতেন। ইনিও সময় পেলেই আমার কাছে আসতেন। রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে যেতেন।

হঠাৎ একদিন 'ম' ও 'অ' মোটরে করে আমার আস্তানায় এসে হাজির। অভিনয়ের ঢংএ 'ম' বললে, "মীট লর্ড 'অ'—রসিকতা নয়!" মেজর 'অ'-র কাছে হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর এসেছে—তাঁর এক কাকা হঠাৎ মারা গেছেন, তাঁর পুত্র-কন্যা না থাকাতে মেজর 'অ' উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাকার সম্পত্তি ও 'লর্ড টাইটেল' পেয়েছেন। মেজর 'অ'-র ইচ্ছে ছিল যুদ্ধের পর আবার অভিনয় করতে নামবেন। গল্পচ্ছলে বলেছিলেন আমায় তাঁর বাল্যজীবনী। তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁর বাবার মনেপ্রাণে মিল ছিল না। বাবা ছিলেন সাধারণ ব্যবসায়ী প্রকৃতির মানুষ। মা ছিলেন গায়িকা। বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেন নি তাঁরা। কিন্তু তাঁর মাকে অসুখী বললে ভুল হবে। কারণ গানের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল। এবং সেইজন্য ছেলে যখন অভিনয়ের দলে ঢুকেছিল, তখন বাপের আপত্তি থাকলেও, মায়ের কাছ থেকে মেজর 'অ' সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন।

আমার আশ্চর্য লেগেছিল, আরমিতে থেকেও লর্ড 'অ' নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিলেন। লর্ড হবার পর তাঁর প্রমোশন হ'তে দেরি হ'ল না। কর্নেল হয়ে গেলেন শিগগীরই। তারপর একদিন উধাও হয়ে গেলেন, তাঁর খবর আর পাই নি।

মিঃ 'ল'—

মিঃ 'ল' আরমি অফিসর র‍্যাঙ্কের ঠিক নন। তাঁর র‍্যাঙ্ক খুব উঁচু ছিল না। একদিন এঁর সঙ্গেও আমার হঠাৎ আলাপ। মুখচোরা ভালোমানুষ 'ল'-কে আমি স্কুল স্কুলে নিয়ে আসি একদিন স্কুল দেখাবার জন্য। তাঁর 'র‍্যাঙ্ক' ছোট বলে 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' ছিল তাঁর। তাঁকে নিয়ে আমাদের ইংরেজ হাউস মাষ্টারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াতে তিনি যেন কৃতার্থ বোধ

করলেন। তারপর থেকে সময় পেলেই আমার কাছে আসতেন। ছবি দেখতে ভালবাসতেন তবে যে খুব বুঝতেন তা নয়। 'আর্ট' মানে যে 'হাইব্রায়ো' ব্যাপার একটা কিছু মনে করতেন।

সেই সময় পাঁচ-ছয়টি মেয়ে সহর থেকে দুন স্কুলের আর্ট স্কুলে আমার কাছে শিখতে আসত। 'ল' মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে বেশ খুশী হতেন। ভদ্রলোককে আমি একটু আস্কারা দিতাম, নেহাৎ ভালোমানুষ বলে। দুন স্কুলের সায়েন্স 'ল্যাবে' এসে ছেলেদের স্পেয়ার টাইম 'হবি' ক্লাশে তিনি কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। খাটবার শক্তি ছিল তাঁর। এমনি করে ক্রমে ক্রমে তিনি দেরাদুনের ইংরেজ অফিসারদের সুনজরে পড়লেন তারপর তাঁর উন্নতি হ'ল। ক্যাপটেন হলেন আমাদের চোখের সামনে। তারপর বদলি হয়ে চলে যাবার সময় আমার কাছ থেকে একটা ছবি কিনে নিয়ে গেলেন। বলে গেলেন যে তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁকে নীচু 'র‍্যাঙ্কে'র বলে অবজ্ঞা না করে সমানভাবে মিশতাম বলে আমার প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মেছিল। যে ছবিখানা উনি কিনেছিলেন, সে ছবিখানা একটি টরসো একটি মেয়ের উন্নত গড়নের ছবি। ছবিখানা 'ল'-এর বহুদিনের পছন্দ। প্রথম যেদিন এসেছিলেন, সেইদিনই ছবিখানা দেখে বলেছিলেন, 'টাকা থাকলে এটা আমি কিনতাম। কিন্তু কি করি, আমি নেহাৎ গরীব সৈন্য মাত্র। তখন আমি ছবিটা এমনি দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু 'ল' তখন তা নেন নি। ক্যাপটেন হয়ে ছবিখানা কিনে তাঁর আনন্দ হয়েছিল খুব। ছবিখানা মুফত পেলে তাঁর সে আনন্দ বোধ হয় অতটা হ'ত না।

শরৎ

ক্যাপ্টেন অরবিন্দ বসু

ক্যাপ্টেন অরবিন্দ বসু, মধ্যবয়সী, মোটাসোটা বাঙালী অফিসর। জর্মনীতে বহুদিন ছিলেন—জর্মন ভাষা খুব ভালো করে আয়ত্ত করেছিলেন ইনি—সেই সময় যুদ্ধের সময় এঁকে দরকার পড়েছিল প্রেমনগরে (দেরাদুন থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে (চক্রাতা যাবার রাস্তায়) জর্মন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের 'সেনসর' অফিসারের কাজে। এঁর কাজ ছিল, জর্মন কয়দীরা যা চিঠি লিখে তা পড়ে দেখা,

কোন আপত্তিজনক কিছু আছে কিনা, এবং তারা যেসব চিঠি বই ইত্যাদি সেগুলোও খুলে দেখা ও পড়ে দেখেশুনে সেগুলি তাদের বিলি করে দেওয়া। এ সব করে বাকী সময়টা যা তাঁর হাতে থাকত সে সময় ক্যাপ্টেন বসু নিজের ইচ্ছে মতো পড়াশুনা বা ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন।

ভদ্রলোক ভাবুক এবং একটু অন্যমনস্ক গোছের মানুষ, তা সহজেই বোঝা যেত। ইনি ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভক্ত! সেই সূত্রেই আমার কাছে এসেছিলেন। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এঁর আসল পরিচয় পেলাম। ইনি বাংলা দেশের এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মেছেন। ইনি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পুত্র ও স্যার জগদীশ বসু এঁর নিকট আত্মীয়, সুতরাং এর মধ্যে যে একটু ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হবে সেটা কিছু আশ্চর্যের নয়।

জ্যোৎস্না রাতে একলা জঙ্গলের পথে উনি মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয় মাইল রাস্তা পার হয়ে আমার কোয়ার্টারের কাছে এসে হাজির হতেন। হয়তঃ তখন রাত এগারটা বেজে গেছে। চাপা গলায় আমার জানলার কাছে এসে আমায় জাগাবার চেষ্টা করছেন। আমি রাত্রে বেশ বেশী রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। সুতরাং ক্যাপ্টেন বসুর চাপা গলার আওয়াজ কানে আসে। দরজা খুলে দিই। তিনি ঘরে ঢুকেই বলেন, জেগে আছ দেখছি—কি সুন্দর জ্যোৎস্না রাত। খাবার পর এমন রাতে বিছানায় গিয়ে শোওয়াও সহজ নয়। বড় সুন্দর লাগে এই ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে বড় বড় পাইন গাছের মধ্য দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে—প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়!'

সারাদিন কাজকর্মের পর একটুখানি ঘুমোন দরকার। বিরক্ত বোধহয় প্রথমটা। কিন্তু ক্যাপ্টেন বসুর সরল ও তাঁর এই কবিজনোচিত ব্যবহারে মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করি। হেসে বলি, রাত এগারটা বেজে গেছে, একটু ঘুমোবেন না? ফিরতে হবে ত আপনাকে?'

ক্যাপ্টেন বসু বলেন, "তোমার এইখানে সোফাতে শুয়ে থাকব কিছুক্ষণ, তবেই হবে। কি বল? এখন একটু গান শোনাবে না? 'কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে—উছলে পড়ে আলো'—ধর না একটা গান। চল চল—বাইরে বেরিয়ে পড়ি।"

আমায় টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। ইউক্যালিপটাস অ্যাভেনিউ দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ি। ক্যাপ্টেন বসু নিজেই গুন গুন ক'রে গান ধরেন। মাঝে মাঝে আমায় বলেন—'গাও না হে—আমার সুরগুলো ঠিক মনে পড়ে না—গাইতে ত আর শিখি নি।'

নিজের মনে নানান কথাবার্তা বলে চলেন কন্টিনেন্টে কোথায় কোথায় ঘুরেছেন—জর্মনীতে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন—কোন্ কন্যের পাণিগ্রহণের আশায়; তাঁর কথায় বুঝি একটি দরদী হৃদয় জ্যোৎস্না রাতে সঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনে যাই ক্যাপ্টেন বসুর আবোল তাবোল জর্মনীর স্মৃতি। অনেক কথাই বলেন—কিন্তু একটা ব্যথার জায়গা সর্বদা বাঁচিয়ে চলেন। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় কিন্তু সঙ্কোচ হয় কেমন যেন!

জর্মন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অনেক গল্পই শুনি ক্যাপ্টেন বসুর কাছে। বহু নাম-করা লোকেরা সেই ক্যাম্পে ছিলেন তখন। অনাগরিক গোবিন্দ বৌদ্ধ জর্মন শিল্পী এই ক্যাম্পেই ছিলেন। 'কিং কং' পালোয়ানও ছিলেন। আরও অনেক গুণী ও জ্ঞানী এই ক্যাম্পে বছরের পর বছর কাটিয়ে গেছেন। যুদ্ধ থামবার কিছুদিন আগে একবার অষ্ট্রিয়ান কয়েকজন এই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যান। চিত্রকর ও পটার: কা.জ সিদ্ধাংশু কয়েকজন ছিলেন এই ক্যাম্পে। অনুমতি ও উপযুক্ত পাহাড়াওলা সঙ্গে নিয়ে এঁরা কয়েকবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

ভাল ভাল আর্টের বই মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন বসুর কাছে দেখতাম। সবই 'সেনসর' অফিসার আগে পেতেন। নিজে প'ড়ে নেবার পর যার বই তার কাছে সেগুলো চালান করে দিতেন। আমিও সুবিধে পেলে দেখে নিতাম বইগুলো।

রূপাদিত্য অশোকা

খবর পেলাম 'রূপাদিত্য অশোকা' নাম নেওয়া একজন জর্মণ যুবক আছেন এই ক্যাম্পে। ভারতীয় নাচ জানেন। ভারত নাট্যম ও কথাকলি শিখেছিলেন কিছুদিন মালাবারে গিয়ে। রূপাদিত্য অশোকার আসল নামটা মনে নেই। ষ্টেজের নাম রূপাদিত্য অশোকা—আসল মুলুক ছিল জর্মনীতে। অনুমতি নিয়ে একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। বছর ত্রিশের যুবক—নাচিয়েদের মতো মাথায় ঝাঁকরা চুল। চেহারায় একটা গাম্ভীর্য্য অথচ ছেলেমানুষ ভাব আছে।

অশোকার মূর্তি গড়েছিলাম। সে ক্যাম্প থেকে আমার কাছে আসবার অনুমতি পেয়েছিল। আমার ঘরে রেকর্ড বাজিয়ে নাচ অভ্যেস করেছে অনেকদিন। মাথা গড়েছিলাম প্রথম। তারপর অশোকার সুন্দর সুগঠিত দেহ দেখে তার সম্পূর্ণ দেহেরও মূর্তি গড়েছিলাম।

'কয়েদীর নৃত্য' বলে সে একটি নাচ রচনা করেছিল। সেই কয়েদীর নাচের একটি 'পোজ'-এ তাকে গড়েছিলাম। পরে যখন সে ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেল তখন

সমর্পিতা

আমাদের স্কুলের 'ওপেন এয়ার' থিয়েটারে তার নাচ হয়েছিল। পরে মুসৌরীতে গিয়ে কিছুদিন সে বড় বড় হোটেলে নাচ দেখাত। তারপর বম্বেতে গিয়ে তাজমহল হোটেলে নাচ দেখিয়ে নাম করে। বছর খানেকের ভেতরে সে বেশ নাম করে নিয়েছিল। পরের বছর সে একটি ভারতীয় মেয়েকে 'পার্টনার' করে নাচতে সুরু করে। পরে সেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে আমেরিকা চলে যায়। তারপর তার খবর আর বিশেষ কিছু পাই নি। ভারতীয় নাচ যে সে খুব ভাল করে শিখেছিল তা নয়! সামান্য শিখে সুষ্ঠুতার সঙ্গে পাঁচ-ছয় মিনিটের এক একটা নাচ 'কম্পোজ' করে সুন্দর সাজে সেজে সে ষ্টেজে নামত। এই জন্যই তার নাচ ভাল লাগত।

গান্ধীজিকে হত্যা

দাঙ্গার জন্যে শীতের ছুটি বন্ধ এবার। শীতের সময় পুরোদমে ক্লাস চলছে। ছেলেরা সকালে ক্লাস করে, সমস্ত দুপুর ক্রিকেট খেলে, আবার সন্ধ্যেবেলা থেকে ক্লাস সুরু হয়। একদিন সন্ধ্যেবেলা ক্লাস করছি, হঠাৎ একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, "গান্ধীজিকে মেরে ফেলেছে।" বিশ্বাস হ'ল না কথাটা। ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে পারছিল না। কোনরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, সে রেডিওতে শুনেছে নিজে, অবিশ্বাসের কথা নয়। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম;—কি করি! ছটফট করতে লাগলাম একপাল ছেলেদের মধ্যে। দেখতে দেখতে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল স্কুলের সর্বত্র! স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। তারপর কি বিশ্রী দিনগুলো! ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ। রেডিও খুলে খবর শুনি। রামধুন চলছে রেডিওতে থেকে থেকে। গান্ধীজির প্রার্থনা-সভার রেকর্ড চালানো হচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই সব শুনি একলা বসে নিজের ঘরে শীতের রাতে।—গড্‌সে কেন করল এমন কাজ? হায়রে—মানুষের মন ও তার বিচিত্র চিন্তাধারা! মানুষ মানুষকে মেরে মনে করে, উচিত কাজ করলাম। পুণ্য করলাম—কর্তব্য করলাম। গান্ধীজির মত মহাত্মাকেও মানুষের হাতে নিজের দেশের লোকের হাতেই প্রাণ হারাতে হ'ল—এইটাই আশ্চর্যের মনে হয়েছিল। বার্ণার্ড শ' ঠিকই বলেছিলেন, খুব ভাল হলেই এমনটি হয়! অদ্ভুত ভগবানের এই বিধান! গান্ধীজির মত লোক একজন পৃথিবী থেকে চলে গেলেন কিন্তু তার জন্য কিছুই বসে রইল না। সময় বয়ে যাচ্ছে, রাতের পর দিন হচ্ছে। পাখী ডাকছে—বাতাস বইছে, সূর্য উঠছে, কেবল আমরা ভারতীয়েরা শুধু কিছুদিনের জন্য একটু অস্থির ও চঞ্চল বোধ করলাম। সারা পৃথিবীর লোক দুঃখ করে সমবেদনা জানাল, তারপর যেমন দিন যায়—দিন আসে।

—রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সময়ও মনে বড় দাগ দিয়েছিল। দেরাদুনেই ছিলাম তখন। কি বৃষ্টি আগষ্ট মাসের প্রথম থেকেই! খবরটা পেয়ে মনটা একেবারে মুষড়ে গিয়েছিল।

জামসেদপুরে দু'মাস ১৯৪৮। প্রদর্শনী ও রোটারি ক্লাবে বক্তৃতা

মে মাসের ১লা তারিখে মা ও শ্যামলীকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। ১৯৪৩-এ কলকাতা গিয়েছিলাম, সেখান থেকে মেদিনীপুরের 'জুনপুটে' সমুদ্রের ধারে, স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে। তারপর আর যাই নি। এবারে সাড়ে তিন মাস ছুটি—জিনিষপত্র নিয়ে চলেছি—লম্বা ছুটি জামসেদপুরে ও বাংলা দেশে কাটাব। দু' ট্রাঙ্ক ভরা ছবি ও আঁকার সরঞ্জাম নিয়েছি সঙ্গে। সুবিধে হলে প্রদর্শনী করব।

মে মাসে ইউ. পি. ও বিহারে ট্রেণে যেতে কি কষ্ট—প্রচণ্ড গরম! গরম হাওয়া, যাকে বলে 'লু'—তাই বইছে; তার মধ্য দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে। দরজা-জানলা এঁটে বসে আছি মাথায় ভিজে গামছা জড়িয়ে।

জামসেদপুরে মে ও জুন পুরো দু'মাস ছিলাম। আমার এক ভাই সুরেশ—আমার চেয়ে মাত্র বছর দেড়েকের বড়, তাকে আর দাদা বলি না—টাটাতে ইঞ্জিনিয়ার সে। তার বাড়ীতেই উঠেছি। মে মাসটা কি গরম জামসেদপুরে। তার ওপর সেই ওয়ার্কশপের শব্দ। ঘরের মধ্যে থেকে সর্বদা মনে হয়, যেন জাহাজে চড়ে কোথাও চলেছি। দোতলায় একটা ঘরে মাদুর পেতে ছবি ও রং ছড়িয়ে বসে আঁকি রোজ। বিকেল হলে একটু বেড়াই। শ্যামলী সুরেশের মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যায় পাড়ায়। তারা প্রায় সমবয়সী। ইউনাইটেড ক্লাবের সুইমিং ট্যাঙ্ক বেশ বড়—সেখানে গিয়ে ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করে। সাঁতার কাটে বা সাঁতার কাটা দেখে। নানান দেশের লোক সব। পার্শী, গুজরাটী, বাঙ্গালী, এ এক অদ্ভুত সোসাইটি জামসেদপুরের। কিরিঙ্গিয়ানাটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না। দুন স্কুলেও নানান দেশের ছেলেদের ও মাষ্টারদের সমাবেশ, কিন্তু ঠিক কিরিঙ্গিয়ানা দুন স্কুলে হয় না।

এই গরমের মধ্যেই টাউন হলে আমার ছবির প্রদর্শনী হ'ল। সুরেশের উৎসাহেই হ'ল। হৈ চৈ হ'ল বটে, কিন্তু গরমের মধ্যে তেমন 'এনজয়' করা গেল না! আবার একদিন রোটারী ক্লাবে বক্তৃতাও দিতে হ'ল ভারতীয় চিত্রকলার ওপর। বক্তৃতার পর 'লাঞ্চ' খেয়ে বাড়ী এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন!

জুন মাসের শেষে জামসেদপুর থেকে কলকাতায় ফিরে গেলাম। সেখানে মা ও শ্যামলীকে রেখে শান্তিনিকেতন রওনা দিলাম। নন্দবাবুর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। লিখেছিলেন ছবি নিয়ে আসতে। 'হ্যাভেল হলে' প্রদর্শনী করবেন আমার ছবির। এ এক সমস্যা। অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক ছবি বাছাবাছি করে পঞ্চাশখানা ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। দশ বছর পর শান্তিনিকেতন গেলাম।

* * * *

শান্তিনিকেতনে দশ বছর পর। ১৯৪৮

১৯২৯ সালের শেষে শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্রাবস্থা কাটিয়ে বার হয়ে পড়েছিলাম। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুর কাছে ছাত্রভাবে যা শিখেছিলাম, কেবলমাত্র সেটুকুই আমার সম্বল ছিল। তারপর ভারতবর্ষ ও সিংহলের নানান জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আমার ওপর আদেশ ছিল ভারতবর্ষের শিল্প ও শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা ও মনে প্রাণে ভারতের শিল্পের রস উপলব্ধি করা। ভারতবর্ষ ও সিংহল ঘুরে দেখবার পর গোয়ালিয়রে গিয়ে চাকরি নিই—সে কথা আগেই বলেছি। গোয়ালিয়রে দু'বছরের কিছু বেশীদিন কাজ করবার পর দেরাদুনে কাজ নিয়ে যাই। ১৯৩৭ সালে শীতের এক ছুটিতে আমি শান্তিনিকেতনে মাস খানেকের জন্য গিয়েছিলাম এবং তখন গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) মূর্তি গড়বার সুযোগ পাই। ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনকে যে চোখে দেখেছিলাম—প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে শান্তিনিকেতনের আরেক রূপ চোখে পড়েছিল। ছাত্রভাবে শিল্পীগুরু নন্দলাল বসুকে একরকম ভাবে জেনেছিলাম, প্রাক্তন ছাত্র ভাবে আরেক রকম ভাবে জানলাম। ছাত্রাবস্থায় তিনি আমাদের নানান ভাবে শিখিয়েছিলেন। শিল্প সম্বন্ধে কথাবার্তা, আলাপ ও আলোচনা করেছেন, একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি। প্রকৃতি ও বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হবার পদ্ধতি তিনি আমাদের শিখিয়েছেন।

গুরুদক্ষিণা

শান্তিনিকেতন থেকে বার হয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেই সময় তিনি (নন্দলাল বসু) আমায় তাঁর একটি চিঠিতে গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁর সেই অদ্ভুত গুরুদক্ষিণার মর্ম তখন সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি নাই। কিন্তু আজ তার মর্ম বুঝবার সামর্থ্য হয়েছে। তাঁর সেই চিঠির কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—"আমার ত কাজ করবার ইচ্ছা এখন বাড়িয়া যাচ্ছে—এ জীবনে ও শক্তিতে কুলাবে না, যা' হ'ক, তোমরা আছ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তবে আটিষ্ট বন্ধু সকলকে

কখনও তাচ্ছিল্য করিও না, আমার এই অনুরোধটি রাখিও। আর তাহাই আমি (গুরুদক্ষিণা) বলিয়া লইব জানিও।"

—তাঁর চিঠির এই কয়েকটি লাইন থেকে বোঝা যায় তাঁর নিজের ছাত্রদের ও দেশের শিল্পীদের প্রতি তাঁর কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা! তিনি মনে-প্রাণে জানেন, দেশের শিল্পকে বাঁচাতে হ'লে, ইংরাজীতে যাকে বলে "Team work" —তাই দরকার।

কিছুকাল থেকেই মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। নিজের সাধ্য মত কাজেকর্মে মনকে ডুবিয়ে রেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দে যেন ভাঁটা পড়ে আসছিল। যে রাস্তায় চলেছি—ঠিক পথ ত? সন্দেহ মনে জেগেছিল। সুবিধে ও সুযোগ পেয়েই দশ বছর পর আবার শান্তিনিকেতন গিয়ে পৌঁছুলাম।

মাষ্টারমশাইকে খবর দেওয়াই ছিল। সন্ধ্যের সময় গেষ্ট হাউসের সামনে গাড়ি থেকে নামতেই দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমারই অপেক্ষায়। প্রণাম করে দাঁড়ালাম তাঁর পাশে। তিনি কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বললেন, "স্নান সেরে নাও, তারপর আমার ওখানে এস —কথাবার্তা হবে।"

* * সন্ধ্যের সময় স্নান সেরে নন্দবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছুলাম। তাঁর নতুন বাড়ীতে গিয়েছিলাম ১৯৩৭ সালে, সুতরাং খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় নি। শিল্প বিষয় নানান রকম কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। সব কথা লিপিবদ্ধ ক'রে সবার সামনে ধরবার জিনিষ নয়; একান্ত গুরু-শিষ্যের মধ্যেই সন্তর্পণে তাকে রেখে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ফিরে আসবার সময় বললেন, তাঁর বাড়ীতে পরের দিন খেতে এবং খাবার পর তিনি তাঁর আঁকা ছবি দেখাবেন। খুশী হয়ে বিদায় নিলাম।

* * সকালে বৈতালিক হয়ে যাবার পর ছাত্র-ছাত্রীরা আগের মতই এখানে-সেখানে গাছের তলায় পড়াশুনায় মন দিলে। তাদের মধ্যে কেউ কি বুঝলে যে আমিও এককালে তাদের মত এই সব গাছের তলায় ক্লাস করতাম! শ্রীসদনের (মেয়েদের বোর্ডিং) সামনে দিয়ে যে রাস্তা গেছে, তাই ধরে কলাভবনের দিকে এগিয়ে যাবার পথে পুরোণো বন্ধু রামকিঙ্করের সঙ্গে দেখা। সে আমারই সমসাময়িক; এখন কলাভবনের শিক্ষক! ছবি ও মূর্তি গড়ায় সে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছে। রামকিঙ্করের সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে ছবি দেখলাম। মূর্তি গড়বার ঘরে গিয়ে তার ও ছাত্রছাত্রীদের মূর্তি দেখলাম।

বিনোদবাবু (মুখোপাধ্যায়) শুনলাম তখনও ফেরেন নি। মুসুরীতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী করতে গেছেন। দু' একদিনের মধ্যে ফিরবেন। বিনায়ক মনোজীর কাজও একদিন দেখলাম।

বেলা এগারটার সময় নন্দবাবুর বাড়ীর দিকে চললাম। নন্দবাবু বাড়ীতে ফিরেছেন—পিছনের বারান্দায় বসে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হ'ল। পুরোণো ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে তাঁরও ভাল লেগেছে তা' বুঝতে পারলাম কথাবার্তায়। খাওয়াটাও সেদিন ভালমতই হ'ল।

খাওয়ার পর ঘরের ভেতর গিয়ে বসা গেল। বিশ্বরূপ (তাঁর বড় ছেলে) পাশের ঘর থেকে একটা একটা ক'রে ছবি এনে সামনে রাখতে লাগল, আর তিনি মাঝে মাঝে দুটো-একটা কথা বলতে লাগলেন ছবির বিষয়। অনেক কাজই নতুন। মনে হ'ল শান্তিনিকেতনে আসা সার্থক হ'ল। সেদিন যা পেলাম তার কূল-কিনারা নেই! * * *

* * * সন্ধ্যের সময় নন্দবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বার হয়েছিলাম। তিনি আমায় নিয়ে তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের যে বাড়ী তখন তৈরী হচ্ছিল—সেইদিকে চললেন। বাড়ীটা বেশ সুন্দর, প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ঘুরে-ফিরে তাই দেখলাম। বললেন, 'অবনীন্দ্রনাথের শরীর বিশেষ ভাল নেই। বাড়ী ত তৈরী হ'ল, এখন কিছুকাল এই বাড়ীতে বাস ক'রে যেতে পারেন, তবেই সব সার্থক হয়।' খোয়াই-এর পথ—যেখানে কোন বাড়ী-ঘর ছিল না—সব জায়গায় প্রায় বাড়ী-ঘরে ভরে উঠেছে।

ফেরবার পথে রাণী চন্দের সঙ্গে দেখা। আগেকার আলাপ থাকা সত্ত্বেও আবার নতুন করে আলাপ করতে হ'ল। বহুদিন পর সন্ধ্যের অন্ধকারে তিনি আমায় চিনতে পারেন নি। মাষ্টারমশাই বললেন, 'এঁর ছবিও দেখে যেও। ভাল 'কলেকশন' আছে।' দূরে একটা বাড়ী দেখিয়ে বললেন, 'ওটা কিরণ বাড়ী। কিরণ সিংহ—ওর কাজও দেখ।' সন্ধ্যের অন্ধকারে ফিরে এসে উত্তরায়ণে যাবার পথের ধারে বসে নানান কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। তিনি বোধ হয় বুঝেছিলেন, আমার শোনার সময় উপস্থিত। তাঁর কথা শুনবার দরকার হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীকেই নিজের নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। পথ-নির্দেশ করে দেওয়াটা বোধহয় গুরুর কর্তব্য নয়! কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা শিষ্যের কাছে ব্যক্ত করলে শিষ্যের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। * * *

••• পরের দিন সাগরময় ('দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক) কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসে হাজির হ'ল। ভালই হ'ল আমার পক্ষে। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। একজনকে পাওয়া গেল যাকে নিয়ে ঘোরা যাবে। শান্তিদেব তাঁদের বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন। সুতরাং সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করব সে ব্যক্তি আমি নই! খাওয়ার আগে ও পরে শান্তিদেবের মুখে গুরুদেবের গান শোনাটাও কম লোভের কথা নয়! রাত্রে ঝড়-বাদলে চলাফেরার জন্য তাড়াতাড়ি একটা টর্চ সংগ্রহ করলাম। প্রথম দিনই গেষ্ট হাউসের সামনে প্রকাণ্ড একটা সাপ চোখে পড়েছিল। রাত্রে শান্তিদেবের বাড়ীতে সেই টর্চ নিয়ে গিয়ে হাজির। কিছুক্ষণ পর শান্তিদেবের আরেক ভাই মণ্টু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বাড়ী এল। তার কাপড় ছিঁড়ে গেছে। সর্বাঙ্গে কাদা। যা' বললে, তা শুনে সবার চক্ষু স্থির! ভূতের গল্প নয়—অন্ধকারে আসবার সময় কাপড় বেয়ে একটা সাপ তার গায়ে উঠেছিল। সেটাকে তুমুল নৃত্য ক'রে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে তার ঐ অবস্থা! ••

রাণী চন্দ

••• একদিন দুপুরে শান্তিদেবের বাড়ীতে দুপুরের খাওয়া সেরে সাগরকে নিয়ে বার হলাম। সে বাড়ীতে এসেছে কলকাতা থেকে—ছুটি কাটাতে। তাকে নিয়ে রাণী চন্দের হাতে আঁকা ছবি দেখতে উত্তরায়ণে ঢুকলাম। দুপুর বেলা, উনি বাড়ীতেই ছিলেন। আমাদের নিয়ে বসালেন তাঁর ছবির ঘরে। একটা একটা করে অনেক ছবি দেখালেন। অনেক ছবিতে দেখলাম অবনীবাবুর স্বাক্ষর নিজের স্বাক্ষরের সঙ্গে। দু'জনে মিলে আঁকা। ছবিগুলো বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। সব ছবি দেখানো হ'লে নিয়ে আসলেন তাঁর সম্প্রতি আঁকা ছয়টি ছবির প্যানেল। লাব কেষ্ট—রাধার শৈশব, যৌবন—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ইত্যাদি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—নন্দবাবুর ধাঁচে আঁকা। বুঝলাম, ছবিগুলোতে নন্দবাবুর হয়ত নির্দেশ আছে। নানান কথাবার্তা ও জলযোগে সময় কেটে গেল, যাবার সময় বলেছিলেন, আবার আসবেন। •••

••• বিনোদবাবু (মুখোপাধ্যায়) ফিরে এসেছেন। কলাভবনে যেতেই তাঁর সঙ্গে দেখা। হিন্দী ভবনে তিনি যে সম্প্রতি ছবি (দেয়াল-চিত্র) এঁকেছেন, তা দেখে নিয়েছিলাম আগেই। আরো কিছু কাজ দেখলাম তাঁর ঘরে গিয়ে। তাঁর কাজের ধারা যে একটু বদলেছে তাতে সন্দেহ নাই। তবে তিনি এখনও ভারতীয় শিল্পী—খাঁটি আধুনিক ভারতীয় শিল্পী। পথ-ভ্রষ্ট নন। ••

••• শ্রীযুক্ত বিনায়ক মসোজীর কলাভবনের গিয়ে একদিন বসা গেল। তাঁর প্রকাণ্ড এসরাজ নিয়ে তিনি বাজাতে লাগলেন।—গুরু-গম্ভীর আওয়াজ খাসা! সেই সঙ্গে গান ধরতে হ'ল আমার। পুরো দিনগুলো এমনিই ছিল। বাইরে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে, বিকেল না হতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে আকাশে ঘন কাল মেঘ—বাতাস ঠাণ্ডা—এসরাজের গম্ভীর শব্দ (গোঁ গোঁ করে) অন্ধকার ঘরের ভেতর গুমরোচ্ছে। আমি শান্তিনিকেতনে থাকতে নিয়ম করে গানের ক্লাসে যাই নি কোনদিনই। উৎসব ও অভিনয়ের সময় গানের দলে যোগ দিতাম—গানের দল ভারী করতে—এই ঐটুকু বিদ্যে নিয়ে শান্তিনিকেতনের মধ্যে বসে গুরুদেবের গান গাওয়াতে সাহস দরকার। আমাদের সময় দিনু বাবু (স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) গুরুদেবের গানের ছিলেন একমাত্র কাণ্ডারী। তিনিই নতুন গান হ'লেই গুরুদেবের কাছে ব'সে স্বরলিপি লিখতেন। তিনিই ছেলেমেয়েদের ডেকে গানগুলো শিখিয়ে দিতেন। স্বরলিপির ওপর তখন কেউ অতটা নির্ভর করত না। এখন স্বরলিপির ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর গতি নেই! এখন অনেকের মুখে গুরুদেবের গানগুলো যখন শুনি তখন মনে হয় আমরা যেরকম সুরে শিখেছিলাম ঠিক তেমনি সুরে ঢঙে গানগুলো যেন পাওয়া হচ্ছে না। সুরের মধ্যে স্বরলিপির আড়ষ্টতা যেন এসে গেছে— ••

••• মসোজীর ঘরে গিয়ে তাঁর হাতের আঁকা ছবি দেখলাম। নতুন বাঁধের ধারে তাঁর বাড়ী। ছবি দেখতে লাগলাম, তিনি নিজে হাতে ষ্টোভ ধরালেন চা তৈরী করলেন। রুটি, বিস্কুট মাখন ও চা খাওয়া হ'ল। অনাড়ম্বর—সহজ সুন্দর জীবন মসোজীর! ••

আমার ছবির প্রদর্শনী

••• আমার নিজের আঁকা ছবি যা নিয়ে গিয়েছিলাম এবার সেগুলি সঙ্কোচের সঙ্গে বার করতে হ'ল শুধু সবার কাজ দেখেই যাব প্রতিদান করব না, তা সঙ্গত নয়। মসোজী এসে ছবিগুলো গেষ্ট-হাউসের ঘর থেকে নিয়ে গেলেন কলাভবনে। হ্যাণ্ডেল চলে সেগুলো সাজিয়ে দিলেন। দু'তিনদিন সেগুলো সেখানে রইল মনের মধ্যে সঙ্কোচের অবধি ছিল না। কিন্তু নিজের কাজ দেখাতে লজ্জা-সঙ্কোচ করলে ত আর চলে না সঙ্কোচ কেটে গেল যখন বিশ্ব-ভারতীর নিউজে ও খবরে

কাগজে নন্দবাবুর অভিমত আমার ছবি বিষয়ে বার হ'ল। যে প্রশংসা-বাণী তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তাতে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল।

* * * শান্তিনিকেতনের নানান রঙের দিনগুলি কেটে গেল সহজেই। মনের মধ্যে গেঁথে রইল কেবলমাত্র তার স্মৃতিটুকু। কলকাতায় ফিরে গিয়ে মা ও শ্যামলীকে নিয়ে ছুটি ফুরোবার কিছু আগেই আবার দেরাদুনে ফিরে গেলাম। দেরাদুনের আকাশ মেঘে ঢাকা—অবিশ্রান্ত বরষা!

দিল্লীর রামবাবুর আর্ট গ্যালারী

'ধূমিমল ধরমদাস'—এই নামে নিউ দিল্লীর কনট প্লেসে একটা দোকান আছে। সেই দোকানের প্রোপ্রাইটর ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র জৈন। 'রামবাবু' বলে তিনি শিল্পীদের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজে ছবি আঁকতেন শুনেছি এবং সব শিল্পীদের ছবির ওপর

য়ুনিভারসিটির কোন হস্টেলে রাখা আছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর কোথায় রাখা রয়েছে সে খবর জানিনে। রয়োবা সাহেব সেই সময় আমার দশ-বারো খানা ছবি কেনেন তাঁর লাইব্রেরী ডেকরেশন করার অর্থ দিয়ে। এই প্রদর্শনীতে মূর্তি এবং ছবি বিক্রীর টাকা দিয়ে মিস ওলিক্যান্টের দেনা শোধ করি। পূর্বেই লিখেছি মিস্ ওলিক্যান্ট আমায় চার হাজার টাকা দিয়েছিলেন, যা' দিয়ে আমার ছ'টি মূর্তি ব্রোঞ্জে ঢালাই করেছিলাম। ১৯৪৮ সালে যখন দেরাদুনে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লাগে, সেই সময় তিনি আমার কাছে সেই টাকার জন্য তাগাদা দেন। কারণ তাঁর নিজের স্থিতির সম্বন্ধে তিনি একটু বিচলিত হ'য়েছিলেন। ধূমিমল ধরমদাসের দোকানে তাড়াতাড়ি প্রদর্শনী ক'রে ছবি ও মূর্তি বিক্রী করে সেই টাকায় ঋণমুক্ত হ'তে পেরেছিলাম—এ আমার পরম ভাগ্য বলতে হবে।

ত্রয়ী

তাঁর সমান প্রীতি ছিল। দোকানটিতে বই ষ্টেশনারী জিনিষ ও আর্ট মেটিরিয়েল, অ্যালবাম ও ছবির প্রিন্ট ইত্যাদি বহুল পরিমাণে থাকত, এখনও বোধ হয় থাকে। শুধু তাই নয়, দোকানের ভিতরে 'ব্যালকনী' মত আছে এবং সেইখানে বহু শিল্পীর অরিজিন্যাল ছবির গ্যালারী আছে। সেই গ্যালারীতে মাঝে মাঝে শিল্পীদের একক প্রদর্শনী হ'ত—এখনও বোধ হয় হয়। ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বর মাসে সেই দোকানে যেবার প্রদর্শনী করি, সেবারে শ্রীযুক্ত রয়োবা সাহেব আমার ছবির প্রদর্শনী উদ্বাটন করেন। সেই প্রদর্শনীতেই আমি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মূর্তি দু'টি প্রথমে রেখেছিলাম। রয়োবা সাহেব মূর্তি দু'টো কিনে নিয়েছিলেন। জওহরলালের মূর্তিটি দিল্লী

তুলি ছেড়ে কালি কলম

'ওরিয়েন্ট' সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে শিল্প বিষয় লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। নিজে দেখেশুনে যতটা অভিজ্ঞতা হয়েছে তারই ওপর ভিত্তি করে ও ভিত্তি রেখে লেখবার সাহস অর্জন করেছিলাম। সুতরাং লেখাগুলো সর্বদাই ব্যক্তিগত হয়ে পড়ত। শিল্পীর ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া বা অন্যান্য শিল্পের কাজেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখা উচিত, অনেকে মনে করেন। আর্ট-ক্রিটিকদের কাজ হচ্ছে শিল্পী ও শিল্পকে দেশের ও দশের কাছে পরিচয় করা। কিছুকাল থেকেই লক্ষ্য করছিলাম, জনকয়েক আর্ট ক্রিটিক ভারতের শিল্প ও শিল্পীদের অযথা গালি-গালাজ করে তাঁদের ছোট করবার চেষ্টা করছেন। তুলি ও হাতুড়ি ছেড়ে সেই জন্যই মাঝে মাঝে শিল্পীদের কালি-কলম তুলে

নেওয়া উচিত বলে মনে করি। শিল্পীদেরও লিখে বলবার অধিকার ও সামর্থ্য আছে এইটুকু আর্ট-ক্রিটিকদের যদি জানা থাকে, তবেই তাঁরা তাঁদের কলমকে সংযত রাখবেন বলে মনে হয়। একজন আর্ট-ক্রিটিক বম্বের বিখ্যাত সাপ্তাহিকে এক প্রবন্ধ লিখলেন, তাতে বললেন যে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থান করবার চেষ্টা করে ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ করেছেন। তাঁদের শিল্পে বলিষ্ঠতার অভাব। পুরাতন অঙ্কন পদ্ধতি নকল ক'রে তাঁরা দেশে শিল্পকে বাড়বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি—

এই সময় আমি সেই সাপ্তাহিকে 'শিল্পীর অভিমত' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপতে পাঠাই। প্রবন্ধটি সেই আর্টক্রিটিকের লেখাটির উপযুক্ত জবাব হয়েছে ব'লে আমাকে অনেকেই লিখেছিলেন কিন্তু আর্ট-ক্রিটিকের গোষ্ঠী আমার ওপর খড়্গ হস্ত হলেন। আমি যে পুরাতন-পন্থী—নন্দলাল বাবুর ছাত্র—আমি যে শিল্পে গতানুগতিক ভাব থেকে মুক্ত নই, সে কথা তাঁরা লিখতে লাগলেন সুবিধে পেলেই। এইরকম যখন চলছিল সেই সময় একদিন খবর পেলাম—'কৃষ্ণচৈতন্য' ব'লে একজন দিল্লীর আর্ট-ক্রিটিক আমার বিষয় সচিত্র প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখেছেন 'ন্যাশানাল হেরাল্ডে'। এক কপি 'ন্যাশানাল হেরাল্ড' আমার নামে এল। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হ'ল—'কৃষ্ণচৈতন্য' আমার প্রতি অবিচার করেন নি। নানান ভাবে নানা কাজের সমালোচনা ক'রে আমাকে প্রশংসাই করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের আরম্ভেই তিনি ১৯৪৭ সালে লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে আমার যে ছবির একক প্রদর্শনী হয়েছিল, তার কথা উল্লেখ ক'রে, লণ্ডনের বিখ্যাত আর্ট-ক্রিটিক, হারকোর্ট রবার্টসনের মতামত তুলে দিয়ে তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেছেন। হারকোর্ট রবার্টসন তাঁর সমালোচনায় আমার ছবির বিষয় লিখেছিলেন, 'কন্‌ট্রোলড্ মডার্নিজম্', যখন আমাদের দেশের বহু শিল্পী বিলাতী অতি আধুনিকতার নেশায় ডুবেছেন, —পিকাশো ও ভ্যান গকের ও ফরাসী 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট'দের অনুকরণে মগ্ন, সেই সময় আমার ছবিতে আধুনিকতার মধ্যে সংযত ভাব তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এই কথাই তিনি তাঁর আলোচনায় বিশেষ ভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন। দিল্লীতে আর্ট-ক্রিটিকদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণচৈতন্যই আমার প্রতি অবিচার করেন নি বলেই আমার বিশ্বাস।

ক্রিটিক ও শিল্পীদের মধ্যে বহুকাল থেকেই এই কলহ। ক্রিটিকরা হ'তে চান উপদেষ্টা, তাঁরা হতে চান পথ-প্রদর্শক। তাঁরা শিল্পীর সৃষ্টিকে আলোচনা ক'রে ক্ষান্ত হন না—কেমন হওয়া উচিত ছিল যখন বলতে চান তখনই তাঁরা বিপদ সৃষ্টি করেন। শুধু ক্রিটিকরা নন বহু প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে এসে দেশের নেতারাও তাঁদের মতামত দেন এবং তাঁদের বক্তৃতায় তাঁরা শিল্পীদের পরামর্শও দিয়ে থাকেন। জনসাধারণের শিল্প-বোধ জাগাবারও চেষ্টা করেন। শিল্প ও শিল্পীরা যেন দেশের 'বেওয়ারিশ' মা-বাপ-হারা বেচারার দল সবাই তাদের অভিভাবক!

কন্যার শিক্ষা-সমস্যা

শ্যামলীকে দেরাদুনেই দুন স্কুলের ভিতর একজন মাষ্টারের স্ত্রীর (মন্টিসরী ট্রেনড্) প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। সেখানেই সে পড়ছিল। এর পরে দুন স্কুলেই তাকে ভর্তি করতে পারতাম। দুন স্কুলে মাষ্টারদের ছেলেমেয়েদের দুন স্কুলে ভর্তি হতে বাধা নেই। মেয়েদেরও 'ডে স্কলার' হিসাবে নেওয়া হয় কিন্তু ইংরেজী মাধ্যমে, মাতৃভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলেদের মধ্যে 'হংসো মধ্যে বকো যথা'—হ'য়ে আড়ষ্ট ভাবে বসে দু'একজন মেয়ে পড়ে যে দেখলে মায়া হয়। তা ছাড়া আমার আরো অসুবিধা—আমি থাকি নিজের কাজকর্মে—আর বাড়ীতে আমার মা আছেন ঠাকুরমার সঙ্গও যে সব সময় ছোটদের পক্ষে ভাল তা নয়। তিনিও বয়স হওয়াতে একটু অথর্ব হয়ে পড়ছিলেন। অনেক করেছেন আমাদের জন্য এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত। এখানে সঙ্গীবিহীন ভাবে একা থাকতে তাঁর ভালো লাগবার কথা নয়। কর্তব্যবোধ আছে বলেই আছেন। আর কতদিনই বা তাঁকে দেরাদুনে আটকে রাখা যায়! নানান রকম যুক্তির মার-প্যাঁচের জট ছাড়ানো শেষে সম্ভব হ'ল ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। মাকে ও শ্যামলীকে নিয়ে পৌঁছুলাম শান্তিনিকেতনে। শ্যামলীকে শান্তিনিকেতনে পড়ানোই ঠিক ক'রে ফেললাম। গুরুদেবের কন্যা মীরা দেবীর বাড়ি (মালঞ্চের) দোতলাটা ভাড়া নিয়ে সেখানেই মা ও শ্যামলীকে রাখবার ব্যবস্থা করলাম।

শান্তিনিকেতনের পাট আরম্ভ করতে খরচ বাড়বে সন্দেহ নাই। দুটো 'এস্‌টাব্লিসমেন্টের' খরচ চালাতে আমার মাইনা যা পেতাম—তা সবই খরচ হ'য়ে যেতে লাগল। ছবি বিক্রী না হ'লে হাতে প্রায় কিছু থাকত না। গরমের ছুটিতে শ্যামলীকে নিয়ে

দেরাদুনে আমার কাছে আসতেন। আবার জুনের শেষে আমাদের ছুটি আরম্ভ হলে তাদের নিয়ে আমি শান্তিনিকেতনে যেতাম। আমাদের ছুটি আগষ্টের শেষ পর্যন্ত। ছুটিটা শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে আমি দেরাদুন ফিরে যেতাম। শীতের ছুটিতেও আমি শান্তিনিকেতনে কাটাতাম সে সময়!

তোলা উনুন, চায়ের সরঞ্জাম, এমন কি শিলনোড়া —সবই দেখে-শুনে কিনলাম। ঘর বাঁধতে যা লাগে সবই আস্তে আস্তে জোগাড় হ'ল। জানুয়ারী মাসের ১৯।২০ তারিখে রওনা দিলাম। এলাহাবাদে আমার ছবির প্রদর্শনী হবে ঠিক ছিল।—২৬শে জানুয়ারী থেকে ২৯শে পর্যন্ত। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা হয়ে

মিসেস এথেল পামার

এলাহাবাদে প্রদর্শনী। জানুয়ারী, ১৯৫০

১৯৫০ সালে জানুয়ারী মাসে মাকে ও শ্যামলীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলাম। তাদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে, দরকারী জিনিষপত্র সব কিনে দিলাম। দরজা-জানলার জন্য পরদা থেকে আরম্ভ করে পাপোষ,

এলাহাবাদ পৌঁছুলাম ২২শে জানুয়ারী।

দাস্তার দস্তুর তখন এলাহাবাদ য়ুনিভারসিটির ইংরাজীর প্রফেসর। উনি একবার আমার ছবি মুসুরীর প্রদর্শনী থেকে কিনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেই থেকে আলাপ ছিল। দেরাদুনেই তিনি একাধিকবার এসেছিলেন আমাদের স্কুলে। প্রায়ই বলতেন, এলাহাবাদে

আবার ছবির প্রদর্শনী করতে। উনি সেখানকার 'কালচারাল সোসাইটির' প্রেসিডেণ্ট। তা ছাড়া য়ুনিভারসিটিতে আর্ট সেণ্টার হয়েছে। তাদের তরফ থেকেও প্রদর্শনী হ'তে পারে বলেছিলেন। আমি রাজী হয়ে চিঠি লিখেছিলাম।

মনে আছে এলাহাবাদে পৌছেছিলাম রাত দশটায়। ষ্টেশনে এসেছিলেন য়ুনিভারসিটির লেকচারার রবী দেব মশায়। তিনি নিজে ছবি আঁকেন—লেখেনও! আর্ট-ক্রিটিক। ১৯৩৮ সালে বিলেত থেকে ফিরে এলাহাবাদে যে প্রদর্শনী করেছিলাম, তখন থেকেই এঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। সেবারে আমার ছবির বিষয় প্রকাণ্ড আলোচনা লিখেছিলেন 'লীডর' খবরের কাগজে। রবী দেব মশায়কে ষ্টেশনে দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তা না হ'লে ছবির বোঝা নিয়ে রাত্রে কোথায় যাব ঠিক জানতাম না। ষ্টেশন থেকে রবী দেব মশায়ের বাড়ী যখন পৌছুলাম তখন রাত হয়েছে বেশ। মিসেস দেব খাবার নিয়ে আমাদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। খেয়ে-দেয়ে গল্পগুজব করে যখন শুতে গেলাম, তখন রাত একটার কাছাকাছি।

রবী দেব মশায় থাকতেন য়ুনিভারসিটির সামনে 'হল্যাণ্ড হলে'। য়ুনিভারসিটির আর্ট ক্লাবের ঘরে প্রদর্শনী হবে। পরের দিন সেখানে ছবি নিয়ে গেলাম। অনেকেই সাহায্য করলেন ছবি টাঙাতে। শ্যামলীর আঁকা সাত-আট খানা ছবিও সেবারে প্রদর্শনীতে রেখেছিলাম।

এলাহাবাদে তখন থেকেই শ্রীক্ষীতিন্দ্রনাথ মজুমদার কাজ করছেন য়ুনিভারসিটিতে।—ছবি আঁকা শেখান। রোজ আসতেন—নানান রকম গল্প-গুজব হ'ত। শিল্পী শম্ভুনাথ মিশ্রের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। এবারে আরো দু'চারজন শিল্পীর সঙ্গে দেখা হ'ল এলাহাবাদে। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় ভক্তিরাজ (প্রসাদ) ত্রিবেদী আমাদের সঙ্গে ছিল—সে অবশ্য শিক্ষা ভবনের ছাত্র ছিল! এখন এলাহাবাদ য়ুনিভারসিটির একজন লাইব্রেরিয়ান। তার সঙ্গে দেখা হ'ল—খুব খুশী। একদিন ওর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াল। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে। বড় মেয়ে বিবাহযোগ্যা বলে ভক্তিপ্রসাদ তখন ভাবিত!

প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করলেন তখনকার ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য। বেশ লোক হয়েছিল! সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল—প্রদর্শনীতে কতগুলো ছবি বিক্রী হয়ে গেল দেখে। ডাক্তার দস্তুর ও রবী দেব আমাকে প্রথম থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, যে ছবি বিক্রী হবার আশা না রাখতে। আমার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। প্রদর্শনীতে কিছু ছবি বিক্রী না হ'লে মনে হয় প্রদর্শনী ঠিক জমল না যেন, সে যতই ভীড় হোক না কেন! তা ছাড়া প্রদর্শনী ক'রতে খরচপত্র হয়, খরচ না উঠলে মনটা একটু দমে যায় বৈকি।

ক্ষীতিন বাবু ও রবী দেব মশায় তাঁদের আঁকা ছবি দেখালেন। ক্ষীতিন বাবু সেই আগেকার মতই ছবি এঁকে চলেছেন। মাসে দু'একখানার বেশী আঁকা না কি হয় না। ও রকম নিখুঁত ফিনিশ করা ছবি বেশী আঁকা সম্ভবও নয় একমাসে দু'একখানার বেশী।

রবী দেব মশায় অবশ্য 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ছবি। তবে ছবিতে 'ডিজাইন' থাকে, 'রিদম্‌ও থাকে। সুতরাং চোখকে পীড়া দেয় না মোটেই। সপ্তাহখানেক তাঁর বাড়ীতে বেশ কাটিয়েছিলাম। কত লোকের কাছে যে সেবা-যত্ন পেয়েছি, তাঁদের জন্য কতটুকুই বা আমি করতে পেরেছি! ফেব্রুয়ারী মাসের ১লা, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে দেরাদুন এসে পৌছুলাম। আবার সেই স্কুলের কাজ!—ঘানিতে লেগে গেলাম।

কালীপুজোয় একশ টাকা চাঁদা দিতে হবে—পাড়ার ছেলেরা এসে বলেছে, নইলে জীবন সংশয়।

চাঁদার উৎপাতের কথা শোনা ছিল বটে, কিন্তু এমন ক'রে আমার ঘাড়ে এসে পড়বে ভাবি নি! স্ত্রী বললেন, পাড়া ছেড়ে যাও। বললাম, কোথায় পালাব? ওরা যে সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করবে না তাই বা কে বললে! তুমি বুঝতে পারছ না, টাকাটাই ওদের লক্ষ্য নয়, আমার প্রাণটাই লক্ষ্য।

—বল কি!

—এমন ঘটনা খবরের কাগজে পড় নি?

—এখন উপায়?

—থানায় খবর দিয়ে কোনো লাভ নেই। দেখবে সাদা পোষাকে ওরাই ওদের দলে আছে। আজকে দেশের অরাজকের মূলে এই পুলিশ। গবর্ণমেণ্ট কি জানে না? সব জানে। আজকের গবর্ণমেন্ট হচ্ছে ঠুঁটো জগন্নাথ। হাত থেকেও নাই।

ইংরেজের আমলে এই সব ব্যভিচার দেখেছ কখনো? ঘুষ তারাও খেত। আজকের মূলমন্ত্র—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এই স্বার্থের অনুশাসনে তাই কেউ কারো বশে থাকছে না। ছেলেকেই আয়ত্তে রাখা যাচ্ছে না। কি ক'রে যাবে? ছেলেরা আজ আন্দোলনে মেতেছে, আর সে আন্দোলনের ইন্ধন যোগাচ্ছে আমাদেরই গবর্ণমেন্ট।

আগে সমাজের শাসন ছিল। আজ সমাজ কোথায়? সে-সমাজ ভাঙলে কে? সেও আমাদের এই গবর্ণমেন্ট। গান্ধীজী চেয়েছিলেন পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠা করতে, সমাজ গড়তে। আজ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যারা গবর্ণমেন্টেরই নির্দেশে চলবে। গান্ধীজী কি এই পঞ্চায়েৎ চেয়েছিলেন? হায় গান্ধীজী, তুমি মরে বেঁচেছ।

আজ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতেই আমরা ভুলে গিয়েছি। সে গোষ্ঠীও ভেঙেছে সরকার। কারণ আজকের নীতি জোট-বাঁধার নীতি নয়। আমরা ঘর ভেঙেছি, নিজের ভাইও আমাদের কাছে পর। আগেকার একান্নবর্তী পরিবার আর নেই। সেখানেও স্বার্থ। আপন আপন ঘর বেঁধে আপনজনকেই দিচ্ছি ফাঁকি। আজ এই ফাঁকির খেসারৎ কম দিতে হচ্ছে না। ফ্ল্যাট বাড়ী। স্বামী বেরিয়ে গেলেই স্ত্রী একা। পাশেই গুণ্ডার দল ওঁৎ পেতে আছে। প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যাচ্ছে—স্ত্রীকে গলা কেটে রেখে গুণ্ডার দল সর্বস্ব অপহরণ করে পালিয়েছে। একা থাকার সুখ ত এই! আজ একশ টাকার চাঁদার হুমকি দেখাতে এরা সাহস পায় কি করে? এ নালিশ আজ কার কাছে করব? মানুষ নেই—বোধ হয় ভগবানও নেই।

খুড়ো এসে বললে, গর্জন ক'রে লাভ নেই—চাঁদাটা দিয়ে ফেল।

দিতেই হ'ল।

মহা সমারোহে কালীপুজো হয়ে গেল। দীপালী দেখতেও বেরিয়েছিলাম। সেও এক কাহিনী।

দীপালী দেখতে বেরিয়েছিলাম। তাই শুনে খুড়ো বললে, জীবন্ত দেহে যে ফিরে এসেছ, এ তোমার পিতৃপুরুষের অশেষ পুণ্য ছিল। দেখে ত এলে বাবাজি, কিন্তু কি দেখলে? দীপালী কোথায়? সব ত পটকাবাজী। বলতে পার, এই দুদিনে কত লক্ষ টাকা শুধু আগুনে পুড়ে গেল? তবে দেবতা বটে অগ্নিদেব—কাঁচা-খেকো দেবতা! সর্বস্ব গ্রাস করেও সন্তুষ্টি নেই!

বললাম, খুড়ো রাগ করছ কেন, সিগারেটে ত আমরা দৈনিক কম টাকা পোড়াই না।

—আরে বাবাজি, কমই যদি পুড়বে, তবে এমন ক'রে কপাল পুড়বে কেন! ইংরেজ আমলে এই বোমা তৈরির জন্যে কি কাণ্ডই না হয়েছে—আর আজ? ঘরে ঘরে বাবাজি,

—সে কি বোমা খুড়ো, ফটকা—

—বোমা, বোমা। ফটকার অমন আওয়াজ হয়! কত লোকের হাত-পা উড়ে গেল, তার হিসেব রেখেছ? আর কি সর্বনেশে বাজী আমদানী হচ্ছে বিদেশ থেকে। চটপটি, উড়োন-তুবড়ি, ছুঁচো-বাজী—সব ক'টাই পাজি। একবার কাপড়ে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। চোখের ওপর একটা জল-জ্যান্ত সোমত্ত মেয়েকে পুড়ে যেতে দেখেছি।

—কি ক'রে পুড়ল?

—ঐ উড়োন-তুবড়ি। কোত্থেকে এসে কাপড়ে ঢুকল—আর যাবে কোথা, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্—চতুর্দিকে ঘুরে ঊর্ধ্বগতি হয়ে বেরুল! তাহলেই বুঝতে পারছ, মেয়েটার অবস্থা কি।

তে-তলার ভাড়াটে। তখন বেলা চারটে কি পাঁচটা। মেয়েরা ছাদে বসে সংসারের কাজ করছে। কোত্থেকে এক অনন্ত-তুবড়ি এসে পড়ল একজনের মাথার ওপর। শুনলাম, মেয়েটা হাসপাতালের পথেই মারা গিয়েছে। কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার খবর রাখ! একসঙ্গে দুটো পরিবারই শেষ হয়ে গেল—আমি দেখেছি। দোতলা বাড়ী। ওপর তলায় এক পরিবার, নীচের তলায় আর-এক। নীচে যারা থাকে, তারা স্বামী-স্ত্রী আর দুটো ছেলে-মেয়ে। বড় ছেলেটি, আহার নেই নিদ্রা নেই—আজ ক'দিন ধ'রে বাজী তৈরী করছে। রকমারি বাজী—তুবড়ি, ইলেকট্রিক তুবড়ি, রংমশাল, বড় বড় বোম,

গগন-বিদীর্ণকারী বোম—শব্দে সকলকে টেক্কা দিতে হবে। প্রতিযোগিতার উন্মাদনা। জোট বেঁধে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে—ছোট ছোট ভাইবোনেরা, এমন কি তার মা-বাবাও এসে দাঁড়িয়েছে, ছেলের কেরামতি দেখবার জন্যে।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ…

কেউ কোথাও নেই, সব সাফ্! বারুদ-ঠাসা ঘর, একসঙ্গে সব জ্বলে গেল—দুম্ দাম্ ঘর-বোঝাই সব বড় বড় বোম, দোতলায় যারা ছিল তারা ছাদশুদ্ধ নেমে গেল অনন্ত বারুদের ঘরে।

খুড়োর কথাই ব'সে ব'সে ভাবছি। আমরা এই ফটকা-বাজীর উৎসবে মেতেছি, আর আমাদেরই প্রতিবেশী আশেপাশে—যারা সব হারিয়ে, গাছতলায় এসে জমায়েৎ হয়েছে, যাদের পরণে নেই বস্ত্র, মাথায় আচ্ছাদন আছে, কি নেই, যারা চিকিৎসা অভাবে ম'রে যাচ্ছে—যাদের এক-বেলাও পেট ভরে আহার জুটছে না, দুধের অভাবে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু শুকিয়ে ম'রে যাচ্ছে—তারা এই উৎসবের দিকে ভীত-শুষ্ক চোখে চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ টাকা তাদেরই চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! বোবা কান্নায় তাদের অশ্রু আজ রুদ্ধ।

একটা ভিখিরি-বুড়ী গাল দিতে দিতে যাচ্ছে। উড়োন-তুবড়ির আগুনে তার কাপড়ের আধখানা পুড়ে গিয়েছে। গাল সে মানুষকে দিচ্ছে না—দিচ্ছে তার ভগবানকে।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

2nd December. 1918. স্পেশ্যাল ট্রেণে চড়ে শান্তিনিকেতন ঘুরে আসা গেল। গিয়েছিলাম ২৩শে নভেম্বর। সকাল থেকেই সেদিন ধুম লেগে গিয়েছিল। সেদিন হাওড়া ব্রীজ্ খোলা হয়েছে শুনে আমরা বেজায় অসুবিধা বোধ করলাম, আর বাস্তবিক সেদিন যা কিছু অপ্রিয় কাণ্ড ঘটেছিল, তার মূলেই এই ব্যাপারটি ছিল। অনেকে ট্রেণ ফেল করেছিল এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এমন দেরি করে গিয়েছিলেন যে তাঁদের জন্যে ট্রেণটারই মিনিট পনেরো দেরী হয়ে গেল। ঐ কারণে সব arrangement গোলমাল হয়ে যাওয়ায় বহুস্থানেই line clear পেলনা। এইসব কারণে বোলপুর পৌঁছতে দুঘণ্টাখানিক দেরি হয়ে গেল।

অনেক তাড়াতাড়ি করে ত নটায় বেরলাম। হাওড়া ব্রীজ খোলা, কাজেই Outramghat এ গিয়ে ferry steamer এ পার হতে হল। এত ভীড় যে সারাক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতে হল। ষ্টীমার থেকে নেমেও দেখি ভীড় সমান। ঠেলাঠেলিতে দলের সবাই চারিদিকে ছিটকে পড়েছিল, অনেক কষ্টে সবাইকে আবার জোগাড় করা গেল। তারপর স্পেশ্যাল ট্রেণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ট্রেণটি খুব flag দিয়ে সাজান হয়েছিল। লোক কম হয়েছে বলে শুনেছিলাম, এখানে এসে কিন্তু সেরকম কিছু দেখলামনা। মেয়ের সংখ্যাও কিছু কম ছিলনা। অধিকাংশ যাত্রীরাই চেনা। ট্রেণ ছাড়বার সময় হয়ে এল, সব যাত্রীরা দৌড়াদৌড়ি করে কামরাতে উঠতে লাগলেন, কিন্তু তখনও যিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে সভাপতি হবেন সেই জগদীশচন্দ্র বসুরই দেখা নেই। সবাই যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখন তিনি নিজের কয়েকটি আত্মীয়ের সঙ্গে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলেন। তিনি উঠতেই ট্রেণ ছেড়ে দিল।

ট্রেণটা ব্যাণ্ডেলে একবার থামল। অনেকে নেমে পড়ে একটু ঘোরাঘুরি করল, কেউ বা খাওয়ায় মন দিল। ট্রেণ ছাড়তেই রসুনচৌকি বাজতে সুরু করল। বাস্তবিক এমন মজার ট্রেণে আগে আর কখনও চড়া হয়নি এবং পরেও আর কখন হবেনা বোধহয়। দেখছিলাম লাইনের দুপাশে দাঁড়িয়ে অনেক লোক এই অপরূপ ট্রেণ দেখছে। এরপর যেখানে সেখানে ট্রেণ থামতে লাগল এবং ছেলেরা ওঠা নামা করতে লাগল। বর্দ্ধমানে এসে মহা খাওয়ার ধুম বেধে গেল। ইতিমধ্যে আবার এক গোলমালের সূত্রপাত হল। আমরা যে কামরাটাতে ছিলাম, তারই একটা চাকায় আগুন লাগবার উপক্রম হল। কাজেই আমাদের সেটার থেকে নেমে পড়ে পাশের কামড়াটাতে উঠ্‌তে হল। এটাতে বড় ঠাশাঠাশি হয়ে গেল। এইসব ব্যাপারে বর্দ্ধমান থেকে ছাড়তে অনেক দেরি হল। যা হোক, বেশ খানিক দেরি করে অবশেষে বোলপুর ষ্টেশনে এসে গাড়ী থামল। ষ্টেশনে যা ভীড় হয়েছিল, তা আর বলবার কথা নয়। তবে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কল্যাণে আমাদের মোটেই ভীড়ের ধাক্কা খেতে হয়নি। সকলে গেরুয়া পোষাক পরে এসেছিল বলে সেই জনসমুদ্রে তাদের বেশ আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল। পুরুষ যাত্রীরা ত নেমেই হাঁটতে আরম্ভ করলেন মেয়েদের জন্যে কয়েকটা গাড়ী এসেছিল কিন্তু তাতে সকলের স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে বয়স্কা এবং বাচ্চাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমরা মেয়েরা হেঁটেই চললাম। প্রথমে রোদে একটু কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু সে কষ্ট বেশীক্ষণ রইলনা। হাল্‌কা মেঘ করে বেশ একটা আলোছায়ার সৃষ্টি করল।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রের দল আমাদের দুপাশে আর সামনে সার বেঁধে চল্‌ছিল, বাইরের কোনো

লোককে ধারে কাছে আসতে দিচ্ছিলনা। যদিও বোলপুরের সব ক'টি বাসিন্দাই বোধহয় রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা দেখতে। গাড়ী ক'খানা কেবলই যাওয়া আসা করছিল, এবং রাস্তা থেকে মেয়েদের বারে বারে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। একটা "স্বাগত" লেখা গেটের কাছে গিয়ে গাড়ীগুলি দাঁড়াল, মেয়েরা নেমে পড়লেন। অনেকদিন পরে এখানে এসে পুরনো বন্ধুদের দেখে খুব ভাল লাগছিল। সকলের সঙ্গে গিয়ে সভাস্থলে বসা গেল। সভার কাজ তখনই আরম্ভ হয়ে গেল। সভাপতি মনোনয়ন করা অভিনন্দনপত্র submitted ও approved হওয়া প্রথম হল, তারপর ক্ষিতিমোহনবাবু, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কয়েকজন ছেলে ঋকবেদ থেকে শ্লোক পড়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। তারপর সভার থেকে পাঁচজন লোক গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন।

তাঁর বসবার জায়গা হয়েছিল একটি পদ্মপাতা বিছান মাটির বেদির উপর, তার চারধারটা আলপনা দিয়ে সুন্দর করে চিত্রিত। সব আয়োজনগুলিই খুব প্রাচ্য ধরনের হয়েছিল। একপাল কলকাতার মানুষকে ঠিক যেন এখানে মানাচ্ছিলনা। রবীন্দ্রনাথকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করা হল, অভিনন্দন-পত্র পড়ে তাঁর হাতে দেওয়া হল। এগুলি সভাপতি জগদীশচন্দ্রই করলেন বেশীর ভাগ। নিজের তরফ থেকে টবে বসান একটি ছোট লজ্জাবতী লতার চারা উপহার দিলেন। এরপর গান এবং উপাসনা। অনেক প্রতিষ্ঠান এবং সমিতির থেকে তাঁকে নানা উপহার দেওয়া হল। বক্তৃতা হল কিছু কিছু। এ'র সবই যে বাঙ্গালীরা করছিলেন তা নয়। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক ছিলেন, ইংরেজও জন দুই ছিলেন। চারদিকে camera উঁচিয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে, ছবি অবশ্য কটা উঠেছিল তা জানিনা।

সকলের বলা কওয়া শেষ হবার পর রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। যেমন কানখাড়া করে শুনতে বসে ছিলাম, তেমনি নিরাশ হলাম। তিনি বেশ অম্ল-মধুর দুকথা শুনিয়ে দিলেন, তাতে অম্লের ভাগটাই বেশী। তার অতি সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই—তিনি জানেন যে দেশের বহুলোকেরই তাঁর প্রতি ভালবাসা নেই। এখন একটা আকস্মিক আনন্দের জোয়ারে অনেকে ভেসে যাচ্ছেন, কিন্তু সে মোহ চলে গেলেই আবার ধাপে ধাপে পাঁক বেরিয়ে পড়বে। তিনি গীতাঞ্জলি যাঁকে নিবেদন করেছিলেন তিনি যে তা গ্রহণ করেছেন এতেই তিনি ধন্য। পুরস্কার যদি কিছু পেয়ে থাকেন তা তাঁর অন্তরেই সঞ্চিত আছে অন্য কোনো পুরস্কারে নিজের চিত্তকে উচ্ছ্বসিত করে তোলার দুর্ভাগ্য যেন তাঁর কখনও না হয়। যাঁরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন তাঁদের সম্মানার্থে তাঁদের প্রদত্ত সম্মান তিনি নিচ্ছেন, কিন্তু তিনি সেটা অন্তরের সঙ্গে নিতে পারছেন না।

এ রকম কথা তাঁর মুখে শুনব তা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। হতে পারে অনেক লোক তাঁর বিরোধী আছে, কিন্তু যারা সেদিন ওখানে গিয়েছিল, তারা অধিকাংশই আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করতেই গিয়েছিল। যদি কেউ অন্য ভাব মনে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলেও দু একটা লোকের জন্যে আর সকলকে ওরকম করে আঘাত করা তাঁর পক্ষে ঠিক হলনা। তাঁর কথাগুলোর মানে যতই ভাল করে বুঝতে লাগলাম, ততই বেশী করে খারাপ লাগতে লাগল।

তারপর তাঁকে আরো গোটা কয়েক উপহার দেওয়া হল, এবং তিনি উঠে দাঁড়াবামাত্র তাঁকে প্রণাম করার ধুম পড়ে গেল। অতঃপর ফেরার পালা। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আবার ষ্টেশনের দিকে হাঁটতে সুরু করলাম। ট্রেণে এসে উঠলাম, তবে বোলপুর ষ্টেশন ছাড়তে ট্রেণটা অনেক দেরি করল। শান্তিনিকেতনের ছেলেরা গাড়ীর প্রত্যেক কামরায় জলখাবার দিয়ে গেল। এটা সভাভঙ্গের পর ওখানেই দেবার কথা ছিল। তবে ঐ রকম অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটাতে সবাই এত হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে কারো অতিথি সৎকারের কথা মনে হয়নি।

ইতিপূর্ব্বে week end ticket নিয়ে বেশ কিছু লোক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তাঁরা এই সময় সুযোগ বুঝে special trainটায় উঠে পড়লেন, এবং টাকা দিতে বা নেমে যেতে গম্ভীরভাবে অস্বীকার

করলেন। এই নিয়ে খুব গোলমাল বাধল, এবং যাত্রীদের গোপাগুনি চলতে লাগল। দেখা গেল সব শুদ্ধ প্রায় ১৫০ জন যাত্রী বেশী হয়েছে। Special trainটি নেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নামে, সকলে ভয় করতে লাগল যে এই সব প্রতারকদের জন্যে তাঁরই অনেক টাকা দণ্ড দিতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কি মীমাংসা হল জানিনা। আমরা বেশ খানিক রাত করে বাড়ী পৌঁছলাম।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী মহলে শান্তিনিকেতনের এই কাণ্ড নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক চলতে লাগল। রবীন্দ্র ভক্তের দল ত কৈফিয়ৎ এবং explanation দিতে দিতে অস্থির। বিরোধী পক্ষ ও এমন সুযোগ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গেই কলকাতায় চলে এসে ছিলেন। উত্তেজনার মুখে একটা কাজ করে তারপর নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে তিনি নিজের অনুরক্ত ভক্তদের অত্যন্ত আঘাত দিয়েছেন। বন্ধু বান্ধব স্থানীয় সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মন থেকে এই আঘাতের চিহ্ন মুছে দিতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন অনেক ক্ষেত্রেই তা করতে পেরেও ছিলেন। তবে জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপারটা অনেকদিনব্যাপী আলোচনার খোরাক জুগিয়েছিল।

5th December পরশু বিকেলে ছাত্র সমাজে Dr Sunderland বক্তৃতা দিলেন। লোক প্রথমতঃ মন্দ হয়নি, কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গলা বেশী দূর শোনা যাচ্ছিল না বলে অনেকেই বেরিয়ে গেল। (সেটা mike এর যুগ ছিল না) Dr, Sunderland এবং তাঁর মেয়ে Dr, J, C, Rose এর বাড়ি অতিথি হয়ে এসেছিলেন। কাই Dr, Roseকে সভাতে উপস্থিত দেখলাম। পরদিন সকালে মন্দিরে Sunderland সাহেবের service ছিল। শুনলাম তিনি unitarian. serve মন্দ হয়নি।

আজ বিকেল বেলা ভিক্টোরিয়া স্কুলে, south African passive Resester-দের সাহায্যার্থে একটা সভা হয়েছিল, সেখানে যাওয়া গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম বড় বড় লোকের ভীড়, তবে সে অনুপাতে টাকা কেউই খুব বেশী উঠল, তা নয়। যিনি যত লম্বা বক্তৃতা দিলেন, তিনিই টাকা দিলেন তত কম।

10th December আজ সকালে ফুচু (শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়) এসে বললে যে নীচে এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকছেন। সে ভদ্রলোক কে হতে পারেন সে বিষয়ে অনেক গবেষণা করে ত নামলাম নীচে। দোতলার ঘরে একজন বিরাট চেহারার মানুষ, আপাদমস্তক গেরুয়া পোষাক পরা। ঢুকেই প্রথম বুঝতে পারিনি তিনি কে। তারপর বুঝলাম তিনি বাবার অনেকদিন আগের ছাত্র বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এখন নিরালম্ব স্বামী নাম নিয়েছেন। সন্ন্যাসীর পোষাকে অবশ্য তাঁকে আগেও দেখেছি। কুম্ভমেলা প্রভৃতির সময় তিনি মধ্যে মধ্যে এলাহাবাদে আমাদের বাড়ী এসে কিছুদিন করে থেকে যেতেন। আমাকে প্রায়ই নিজের জীবনের বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী শোনাতেন। এখন কলকাতায়ই আছেন।

17th December দিন চার আগে, গত শনিবারে একটা বেশ remarkable বিয়ে হয়ে গেল। বর শ্রীসুকুমার রায়. এবং কনে শ্রীমতী সুপ্রভা দাস (টুলুদি) দুজনেই আমাদের বন্ধু স্থানীয়, কাজেই বাবার জন্যে খুব উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে ত হাজির হলাম। বিবাহ সভাটা আমাদের বাড়ীর কাছেই হয়েছিল। সেই বিখ্যাত 'শান্তির ঘাটে'র পরেই 'রাজমন্দির' বলে একটা বাড়ী ছিল সেখানেই। বাড়ীটা খুব সাজান হয়েছিল, আর বাইরে দাঁড়িয়েছিল একজন সুসজ্জিতা ছোট মেয়ে, তারা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য। বাড়ীর ভিতর লোকে লোকারণ্য।

বিয়ের আসর বসেছিল নীচের ঠাকুর দালানে, সেটাকেও এমন করে সাজান হয়েছিল যে প্রায় চেনাই যায় না। সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে, তবে তখন পর্য্যন্ত মেয়েরা কেউ সেখানে বসেন নি। আমরা বুঝলাম বরের এবং বাইরের সব মেয়েই উপরে উঠেছেন, কারণ কনে সেখানেই আছেন। আমরাও উঠলাম এবং কনের কাছে গিয়ে বসলাম। কনে যখন তখন তিনিও খুবই সুসজ্জিতা। উপরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীচের জনসমাগম দেখতে লাগলাম। প্রচণ্ড হলুধ্বনি এবং শঙ্খ-

খানিক মধ্যে বরও এসে গেলেন। বর কনে ও আচার্য্যের বসবার জায়গা সবটাই লাল রং-এর মখমল দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল। বিয়ের registration-টা উপরেই হয়েছিল, তারপর বর কনেকে নীচে নামাবার জোগাড় হচ্ছে এমন সময় এক ব্যাপারে সকলের মন হঠাৎ বর কনের দিক থেকে অন্যদিকে চলে গেল। সহসা একটা হাততালির শব্দ শুনে সবাই অবাক্ হয়ে গেল। কি ব্যাপার? বিয়ের সভায় হাততালি দেওয়াটা ত নিয়ম নয়? একটু ঝুঁকে পড়ে দেখলাম যে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাই হাততালি দিচ্ছে। তিনি যে আসবেন তা জানা ছিল না, শুনলাম সুকুমার বাবুর বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্যেই তিনি শিলাইদার থেকে কলকাতায় এসেছেন। এতবড় honour কিন্তু আশাতীত।

যাক রবীন্দ্রনাথ বসবার পর আর সকলে বসে পড়ল। গায়িকারা গিয়ে গানের জায়গায় বসল। গান আরম্ভ হল, দুটো গান সাহানা একলা করল, আর দুটো সব ভাই বোন cousin প্রভৃতি মিলে করল। বেশ ভালই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ খুব মন দিয়ে শুনছিলেন, সব ক'টি গানই প্রায় তাঁর নিজেরই রচিত।

প্রতিমা এসে আমার পাশেই বসেছিলেন, বিয়ে শেষ হবার পর তাঁর সঙ্গেই ঘুরলাম খানিকক্ষণ। টুলুদি কত উপহার পেয়েছে, তা গিয়ে একবার দেখে এলাম। বর কনে নিয়ে খুব আলোচনা চলতে লাগল। কনে অবশ্য মাথা নীচু করে পুরোপুরি কনের মতনই বসেছিলেন। বর খুব dignified ভাবে নিজেই নিজের বক্তব্য বলে গেলেন, আচার্য্যকে আর কষ্ট করে মন্ত্র পড়াতে হলনা।

অতঃপর খেয়ে দেয়ে যে যার বাড়ী ফিরলাম। "ব্রাহ্মমন্দির" বাড়ীটা তাঁদের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীর কাছাকাছি হওয়াতে উপেন্দ্রকিশোর বাবুর আর দুটো পারিবারিক উৎসব এইখানে পরে পরে হয়ে গেল। একটি পুত্রের বৌভাত আর একটি কনিষ্ঠা মেয়ের বিয়ে।

20th December কাল ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাবাকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি Mr Ramsay medonald কে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা যেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে সেখানে যান। একজন ২০ বছরের এবং আর একজন ১৮ বছরের মহিলাকে sweet children বলে উল্লেখ করাতে children দুর পা ছড়িয়ে বসে খানিক হাসাহাসি করল।

সাহেব সুবোকে meet করতে যেতে কোনদিনই আমি পছন্দ করি না, তবু বাবাকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা করল না, যেতে রাজীই হলাম।

আমাদের অবশ্য গাড়ী পেতে কিছু দেরি হল, তাই আমরা যথা সময়ের একটু পরেই পৌঁছলাম বোধ হয়। নিমন্ত্রণকর্ত্তা অবশ্য, লিখেছিলেন যে একটা very small party হবে, কিন্তু সেখানে পৌঁছে বাড়ীর সামনের রাস্তায় যে পরিমাণ গাড়ী আর মোটরের ধুম দেখলাম, তাতেই বোঝা গেল যে পার্টিটা কিছুমাত্র small নয়। এক ভদ্রলোক আমাদের খুব যত্ন করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এরকম magnificent বাড়ীর ভিতরে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঢুকিনি। অনেকগুলি hall পার হয়ে ত একটা lawn-এ পৌঁছান গেল। সেখানে কুমুদিনীদিদের দেখে বাঁচলাম, এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটাও চেনা লোকের মুখ দেখিনি। বাড়ীর মেয়েদের প্রতিনিধি হিসাবে ভূপেন বাবুর একটি আট ন-বছরের নাতনীকে দেখলাম। বড় মেয়েরা নাকি এ সব পার্টিতে বেরন না।

খাবার দাবারের প্রচুর আয়োজন হয়েছিল এবং আদর যত্নেরও কোনো ত্রুটি হয়নি, কিন্তু খেতে টেতে বিশেষ পারলাম না। ভূপেন বাবু নিজেও এসে অনেক আপ্যায়িত করে গেলেন।

Medonald সাহেব দেখতে বেশ ভালই, তবে গায়ের রং কিছু তামাটে, সাহেবদের মত অত উগ্র শাদা নয়। তিনি ভদ্রলোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে খানিকটা দূরে বসেছিলেন, তখন পর্য্যন্ত তাঁকে মেয়েদের দিকে আনা হয়নি। খানিকক্ষণ বসে গল্প করা গেল, তারপর গৃহস্বামী সকলকে উঠিয়ে নিয়ে ড্রইং রুমে চললেন, সেখানে গান বাজনা হবে শুনলাম। দারুণ সাজান ঘর, ছবিতে ছাড়া এত সাজসজ্জা দেখিনি কোথাও। নানা দেশের জিনিষের ছড়াছড়ি। ঘরের মধ্যে Pisa থেকে আনা একটা মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তি, আশ্চর্য্য সুন্দর দেখতে।

প্রথমে ভেবেছিলাম সেটা কাপড় দিয়ে drape করা, পরে দেখলাম সবটাই পাথরের।

কুমুদিনীদিরা গান আরম্ভ করবার জোগাড় করছেন, তখন হঠাৎ ডাঃ নীলরতন সরকারের মেয়েরা এসে ঢুকলেন। গানের দল আরও বড় হল।

কি গান হবে তা আর কিছুতেই ঠিক হয় না। নানা সম্ভব এবং অসম্ভব প্রস্তাবের পর স্থির হল যে সাহেবকে একটা স্বদেশী গান শোনাতে হবে। তাই হল। মেয়েরা "বঙ্গ আমার জননী আমার" ধরলেন এবং ভদ্রলোকেরা chorus এ যোগ দিলেন। গানটা শুনতে বেশ ভালই লাগল। রবীন্দ্র সঙ্গীতও গোটা দুই হল, তারপর সমবেত ভাবে "বন্দে মাতরম্" গেয়ে গানের পালা শেষ হল।

Mcdonald সাহেব খুব মন দিয়ে গান শুনছিলেন, সেটা শেষ হতেই যাবার জোগাড় দেখলেন। ভূপেন বসু মহাশয়ের সেই ছোট নাতনীকে দিয়ে তাঁকে মালা পরান হল। সাহেব এতই লম্বা আর বালিকাটি এতই ছোট যে অবশেষে ক্ষুদে মহিলাকে তার ঠাকুরদাদা তুলে ধরলেন। বাবার সঙ্গে সাহেবের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তারপর প্রধান অতিথি প্রস্থান করলেন।

এর পর আমরাও যাবার জন্যে উঠলাম। গেটের কাছে আবার গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা হল, তিনি আমাদের নিয়ে আসবার জন্যে বাবাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন।

April 1914

গ্রীষ্মের ছুটির জন্যে বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগে এবার "অচলায়তন" অভিনয় হল। নাটকটি লেখা হয়েছিল দু'তিন বছর আগে, তবে অভিনয় এই প্রথম হল আমরা গিয়ে উঠলাম পুরন অতিথিশালার বাড়ীতে। শান্তিনিকেতনের এইটিই প্রথম পাকাবাড়ী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এটি তৈরি করিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে এই বাড়ীতে এসে থাকতেন, তবে সম্প্রতি তিনি তাঁর ছোট দোতলা বাড়ী "দেহলী"তে ছিলেন, অতিথিশালা খালিই পড়েছিল, আমরা দলবল সহ এখানেই উঠলাম।

বলা বাহুল্য অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য অদীনপুণ্যের ভূমিকা নিয়েছিলেন আর জগদানন্দ রায় মহাপঞ্চক সেজেছিলেন। বিশাল দেহ দিনেন্দ্রনা কিশোর পঞ্চকের ভূমিকায় দেখাচ্ছিলনা ভাল, তত গান অমন সুন্দর করে আর কে গাইবে? কি মোহনবাবু দাদাঠাকুর সেজেছিলেন। অভিনয়ের ভি এক জায়গায় আচার্য্য দাদাঠাকুরকে প্রণাম করা এই দৃশ্যে আছে। আমরা কেমন যেন চমকে গেলা যিনি সবার প্রণম্য তিনি আবার প্রণাম করে কাকে?

পিয়ার্সন্ সাহেব শোনপাংশু সেজে ছেলেদের খুব উৎসাহে নৃত্য করছেন দেখলাম। বাংলায় কথ বললেন কয়েকবার। বাংলা তখনও খুব ভাল শেখে কিন্তু তাতে দমবার লোক তিনি নয়।

আচার্য্য অদীনপুণ্যরূপী রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সু মূর্ত্তি এখনও চোখে ভাসছে। দেখতে যিনি অত সু তাঁকে যে কোনো বেশেই অসুন্দর লাগত না, কি এবারকার পোশাকটাতে তাঁকে মানিয়েছিল আশ্চ রকম ভাল। শাদা গরদের ধুতি পরনে। জামা কি পরেছিলেন কিনা তা বোঝা যাচ্ছিল না। একটি শা রেশমের চাদর বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পিছনে গ্রা বেঁধে এসেছিলেন। আমার ছোট ভাই বুলু তারপর ব দিন ঐ রকম করে চাদর পরে বেড়াত। এর পরে "অচলায়তনে"র অভিনয় হয়েছে, কিন্তু অত ভা লাগেনি।

April 1915

রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক "ফাল্গুনী" দেখতে গিয়েছিলাম ক'দিন আগে। প্রথম প্রথম যখন শান্তি নিকেতনে যেতাম, তখন যেয়ে অতিথির সংখ্যা খুব কম ছিল। আমাদের সুপরিচিত দলটি ছাড়া বিশেষ কেউ যেতনা। কিন্তু এবার দেখলাম, নানা জায়গা থেকে নানা দলে বিভক্ত হয়ে মেয়েরা এসেছেন, অচেনা মানুষও দুচারটি দেখলাম। থাকার জায়গায় টানাটানি পড়ে গেল। গরমের দিন, কাজেই ছাদ বারান্দা প্রভৃতি সব জায়গাতেই বিছানা পাতা আরম্ভ হল। পুরুষ অতিথির সংখ্যাও বেশ বেশী। আশ্রমের লোকেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবে তখনকার দিনের

অতিথিরা কোন অসুবিধা গায়ে মাখতেন না, কাজেই ছুটিনটা দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

"ফাল্গুনী" অভিনয় জমেছিল খুব। রঙ্গমঞ্চ ত ফুল পাতায় একেবারে ঢেকে গিয়েছিল। দু পাশে ছিল দুটি দোলনা। এই দোলনা দুটিতে অতি অল্প বয়সের দুটি গায়ক বসে গান ধরলেন, "ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।" তাঁদের সঙ্গীর দল স্টেজে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে চলল।

রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউল সেজেছিলেন। তাঁর গান এখনও যেন কানে বাজছে, "ধীরে বন্ধু গো ধীরে ধীরে চল তোমার বিজন মন্দিরে।"

January 1916

অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও রবীন্দ্রনাথদের বাড়ীর উৎসবে তিনি পৌরোহিত্য করলেন। মাঘোৎসবের পরেই এক নূতন ব্যাপার হল। বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুর্গতদের সাহায্য করে ঠাকুর বাড়ীর বিস্তৃত ঠাকুর দালানে আবার "ফাল্গুনী" অভিনয় করা স্থির হল। এ জায়গায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে ব্রহ্মোপাসনা ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। কাজেই এখানে অভিনয় করা নিয়ে নানাস্থান থেকে বিরূপ সমালোচনা উঠতে লাগল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মত দিয়েছিলেন, কাজেই বিরুদ্ধতাটা এক সময় থেমেও গেল।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় "বৈরাগ্য সাধন" বলে একটি ছোট নাটিকা লিখে "ফাল্গুনী'র সঙ্গে জুড়ে দিলেন। এই ভাবেই কলকাতায় অভিনয় হল। "বৈরাগ্য সাধনে"র রাজসভার দৃশ্যটি হয়েছিল অপরূপ। যেন প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের একটি দৃশ্য জীবন্ত হয়ে উঠল। বোধহয় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আঁকা শূদ্রকের রাজসভা'র একটি ছবি মাসিক পত্রে দেখেছিলাম, সেটিই যেন রঙ্গমঞ্চে উঠে এসেছে মনে হচ্ছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই ভাই যশস্বী চিত্রকর বলেই জানতাম, তাঁরা যে এত ভাল অভিনয় করতে পারেন তা আগে শুনিনি। অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতিভূষণের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কোনোদিন তা ভুলতে পারবেন না।

প্রহরীর ভূমিকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করে কিছু অবাক্ হলাম। তাঁরা যে আবার অভিনয় করতে নামছেন, তা জানতাম না।

রবীন্দ্রনাথ যখন কবিশেখর সেজে এসে স্টেজে ঢুকলেন তখন দর্শকেরা একেবারে অবাক্। কোন্ মন্ত্রবলে জানি না তিনি নিজের বয়স থেকে ত্রিশটা বছর খসিয়ে ফেলেছেন। এলাহাবাদে তাঁকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। কবিশেখর রূপে তাঁকে যেন সে বয়সের চেয়েও অল্পবয়স্ক দেখাচ্ছিল। চিরদিন তাঁকে গৈরিক বা সাদা পোশাকেই দেখেছি, বিচিত্র মহার্ঘ্য সজ্জায় সজ্জিত কবিশেখরের ভিতরে আমাদের সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পেতেই অনেক সময় কেটে গেল। দর্শকেরা অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করলেন।

"বৈরাগ্য সাধন" অবশ্য চোখ ধাঁধিয়ে দিল, এবং কানেও মধু বর্ষণ করল কম নয়। কিন্তু "ফাল্গুনী"র অভিনয় শান্তিনিকেতনে যত জমেছিল, এখানে যেন ততটা জমল না। ছোট ছেলেগুলি যেমন মন প্রাণ ঢেলে গান গাইল, দোলনাও তত জোরে দুলল না। রবীন্দ্রনাথ এবারেও "অন্ধ বাউল" সেজে গান গেয়ে গেলেন।

October 1916.

গিরিধি বেড়িয়ে এলাম। গিয়েছিলাম এ মাসের পয়লা। ষ্টেশনে যাওয়াটা বড় হুড়োহুড়ি করে হল। অনেকে see off করতে এসেছিল। গিরিধির সব গাড়ী আবার through যায় না, কতগুলোকে মধুপুরে change করতে হয়। আমাদের গাড়ীটা through যাবে কি যাবেনা তাই নিয়ে আমাদের এক মাননীয় সহযাত্রী প্রচুর গোলমাল করলেন। কয়েকজন সহযাত্রিনী আমাদের গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ গল্প করলেন, এ ছাড়া আর ত কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে পড়ছে না। গিরিধি ষ্টেশনে যখন পৌঁছলাম, তখনও রাত ভোর হয়নি। অনেকে প্রস্তাব করলেন যে এখন আর গাড়ী থেকে নেমে কি হবে, এখন এখানেই ঘুমিয়ে থাকা যাক, দিনের আলো ফুটলে তখন গাড়ী

থেকে নামা যাবে। আমাদের কিন্তু এ ব্যবস্থাটা ভাল লাগল না। আকাশ একটু পরিষ্কার হবা মাত্র আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম এবং কিঞ্চিৎ গোলমালের পর দুখানা ঘোড়ার গাড়ী জোগাড় করে যাত্রা আরম্ভ করলাম। বাড়ী যে কোথায় তা জানিও না, গাড়ী চলেছে ত চলেছেই। কত মাঠ ঘাট রাস্তা যে পার হল তার ঠিকানাই নেই। আমরা গাড়োয়ানের উপর নির্ভর করে অটল গম্ভীর ভাবে বসেই আছি। শেষে রাস্তা যেখানে একেবারে শেষ হল, তখন গাড়ী বাধ্য হয়ে থামল। তার পর দুই দূরেই রাস্তাটা ভেঙে গিয়ে নদীতে নেমে পড়েছে। সেইখানেই আমাদের বাড়ী।

বাড়ী দেখে বেশ পছন্দই হল। চারদিকের দৃশ্য যেন পটে আঁকা ছবির মতন। আশে পাশে ধানের ক্ষেত আর খোলা মাঠ। দক্ষিণ দিকে নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর ও পারেও ধানের ক্ষেত এবং খানিক দূরে দূরে একটা করে কুঁড়ে ঘর। দুটো পাহাড়ও দেখা গেল একটা একটু দূরে, আর একটা বেশ কাছেই। অবশ্য পাহাড় বলে এদের একটু বাড়ানই হচ্ছে, খুব উঁচু টিলা আর কি। বাড়ীটার সামনে খানিকটা খোলা জায়গা আর একটা শাল গাছের group, আমরা সেটার নামকরণ করে ফেললাম The seven sister's.

সামনের উশ্রী নদীটি সাধারণতঃ ক্ষীণস্রোতা, শেয়াল কুকুর হেঁটে পার হয়ে যায়। কিন্তু তখন বানের জলে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আমরা যে ক'দিন ছিলাম তার মধ্যে জল একদিনও কমেনি, কাজেই আমরা একবারও ওপারে বেড়াতে যেতে পারিনি।

বাড়ীতে ঢুকে সবাই ঘর দোর গুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে একটা খাটিয়ায় পড়ে দিব্যি ঘুম দিলাম। সেদিন দুপুর অবধি একরকম কাটল, কিন্তু বিকাল থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হল। সে বৃষ্টি এক সপ্তাহ একেবারেই থামল না, তারপর দুই এক দিন করে থেমে থেমে হতে লাগল। ভোর বেলা উঠে দেখি বাইরের দৃশ্য চমৎকার। নদীর জল একেবারে কূল ছাপিয়ে প্রায় দোরগোড়ায় এসে হাজির। ধানের ক্ষেত ভেসে গিয়েছে। আমরা ত জলে ভিজতে ভিজতে নদীর ধারে গিয়ে হাজির। সেই ঝিরঝিরে নদী এখন বাঘের মত গর্জাচ্ছে। ঝুমু একটু জলে নেমে পরীক্ষা করতে লাগল যে কোনো জায়গা দিয়ে পার হওয়া সম্ভব কিনা, কিন্তু জলের টান এত বেশী যে সেদিন আর পার হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হলনা। ওপারে দেখলাম একদল বেদে গরু ছাগলের পাল নিয়ে ছোট ছোট কম্বলের তাঁবু খাটিয়ে বসে আছে এধারে আসতে পারছে না। বেদেরা ছাড়াও আরো অনেক লোক জড় হয়েছে, তারা নদী পার হয়ে গিরিদিতে কাজ করতে আসে, আজ হতাশ হয়ে জলের ধারে এসে বসে আছে।

দিনের পর দিন বাদল ধারা ঝরতে লাগল, দেখে দেখে বিরক্ত ধরে গেল।

ঘর থেকে বেরতে পাইনা, কোনো লোকের মুখ দেখতে পাইনা। কে আর এই দারুণ বৃষ্টিতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে? বইটইও বেশী কিছু আনিনি যে ঘরে বসে বসে' পড়ব। শেষে একদিন দুপুরে, যেই বৃষ্টি একটুখানি থামল, অমনি কোনো বাধা না মেনে আমি আর ঝুমু বেরিয়ে পড়লাম। এর ফল আমার পক্ষে কিছু ভাল হলনা। প্রথমে হেরম্ববাবুদের বাড়ী গেলাম, সেখানে কিছুক্ষণ থেকে সহপাঠিনী সুজাতাদের বাড়ী গেলাম। তাদের সঙ্গে একবার উশ্রীর বান দেখতেও গেলাম। ওদের বাড়ীর আমতলার ঘাটের আমগাছটি দেখলাম ঝড়ে একেবারে উপড়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। এই ঘোরাঘুরি করতে যত সময় লেগেছিল, তার প্রায় সমস্তটা সময়ই জলে ভিজেছিলাম এবং বাড়ী এসেও বিশেষ ক্ষান্ত ছিলাম না। কয়েকবারই বোধহয় নদীর ধারে ভিজতে গেলাম। ফলে তারপর দিনই শয্যা গ্রহণ করতে হল। সর্দিকাশি, দাঁতে ব্যথা, facial neuralgia, কিছু হতে আর বাকি রইল না। ঝুমুও আমার সঙ্গে সমানেই ভিজেছিল, তবে সে বলিষ্ঠ ছেলে, তার কিছুই হলনা। বড় বেশী কষ্ট পেয়েছিলাম, চারদিন চার রাতের মধ্যে দশ মিনিটও ঘুমইনি বোধহয়। দিন ছয় সাত ভুগে আবার উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম।

তবে বেড়ানটা একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রইল। বারশওর খানিকটা, পঞ্চা রোডের খানিকটা, আর পাঁচ ছ'খানা বন্ধুবাড়ীর বাইরে আর কোথাও বেড়াম না।

খুব বেশী দিন থাকব বলে আসিনি, ফিরবার দিন এগিয়ে এল। বেড়ান-চেড়ান কিছুই ইচ্ছামত হলনা, বর্ষার কৃপায়। তবে না বেড়ালেও নদীর ধারে বসে থাকতে ভাল লাগত। মাছ ভাল পাওয়া যেতনা, তবে নদীর জল খানিক কমে যাওয়ায়, ওপার থেকে জেলেনীরা ছোট ছোট "চুধিরা" মাছ নিয়ে আসত, তাই কিনবার জন্যে মাঝে মাঝে যেতাম।

ফিরবার দিনটা চট্ করে এসে গেল। সকালে উঠে দেখলাম, জিনিষপত্র কিছুই গোছান হয়নি। সেদিকে না তাকিয়ে, আমি যত ধার করা বই জমা করেছিলাম, তাই ফিরিয়ে দিতে ছুটলাম। এই কাজেই আমাকে অনেক বাড়ী ঘুরতে হল। বাড়ী ফিরে নাওয়া খাওয়া করে বাক্স বিছানা বেঁধে, যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলাম। প্রতিবেশিনী দু-চার জন দেখা করতে এলেন। অল্পক্ষণ পরে গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল। জিনিষপত্র সব তাতে তোলা হল, এবং সেগুলি ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হল। সঙ্গে গেল আমাদের চাকর এবং আমার দুই ভাই। আমাদের ঘোড়ার গাড়ী চড়ে যাবার কথা, কিন্তু গাড়ী আর আসেই না।

অবশেষে একটি ঘোড়ার গাড়ী এল বটে, কিন্তু তার যা চেহারা, তা দেখে আর উঠতে ভরসা হচ্ছিল না। কিন্তু সবাই মিলে বোঝাল যে মহরমের দিন কোনও রকম গাড়ী যে পাওয়া গেছে, সেই ত ঢের। অগত্যা উঠে বসা গেল। রাস্তায় তখন মহাধুম, ক্রমাগতই তাজিয়া চলেছে আর ঢাকঢোল বাজছে। সকাল থেকেই ঐ ব্যাপার শুরু হয়েছিল, আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই গোটাকতক তাজিয়া নদী পার হয়ে গেল। লাল নীল, সবুজ ময়দা নানা রংএর শাড়ী পরে ওড়না উড়িয়ে দলে দলে মেয়ে চলেছে, রং বেরংএর টুপি আর জামা পরা বাচ্চারও অন্ত নেই। এদেশের মেয়েদের চলনটা বেশ, পশ্চিমেও দেখতাম তাই, বেশ free আর graceful. এক একটা অল্পবয়সী মেয়ে চলেছে যেন রাণীর মত। বাঙালী মেয়েরা এদের পাশে বড় জবুথবু। নব্যারা তবু একটু মানুষের মত হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

ক্রমে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। গাড়োয়ান ভাড়া না নিয়েই ছুট্ দিল। সেদিন সে ঘোড়া গাড়ির কাজ নিয়েছিল, কত লোককেই যে পার করল, তার ঠিক নেই। Waiting roomএ ঢুকে দেখলাম যে একজন গেঞ্জি পরা মহিলা বসে আছেন, আর বেশ কয়েকটি ছেলে-পিলে এধার ওধার ঘোরাঘুরি করছে ও একজন হ্যাট্ কোট্‌ধারী ভদ্রলোক অত্যন্ত ভ্রুকুটি কুটিল মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আন্দাজ করলাম তিনিই মহিলার স্বামী, যদিও দুজনের বেশভূষায় যুগ প্রভাবের সাম্য লক্ষিত হলনা। ঘরটি অতি অন্ধকার ও গরম, কাজেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আসা যাওয়া দেখতে লাগলাম। খানিকপরে কুকুর সঙ্গে প্ল্যাট্‌ফর্মে বেড়াতে গেলাম। বেশ খানিক staring লাভ করা গেল এবং আশে পাশে যে সব রেলওয়ে কর্মচারী ঘোরাঘুরি করছিলেন, তাঁরা যে ইংরেজী জানেন এই জ্ঞানটা লাভ হল। আবার waiting roomএ ফিরে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে যাত্রী সমাগম দেখতে লাগলাম। যত মানুষ গিরিধি বেড়াতে এসেছিল, মনে হল সকলেই এই ট্রেনে ফিরে যাচ্ছে। আর প্রতি দলের সঙ্গে আর একটি দল তাদের see off করতে এসেছে। কাজেই জন-সমাগম নিতান্ত মন্দ হয়নি।

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে লাগল। তখন গাড়ীতে জিনিষপত্র ওঠান এবং নিজেরা ওঠা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল। যথাযোগ্য গোলমাল ও রাগারাগি সহকারে কার্য্য সমাপ্ত হল। ট্রেনে অসংখ্য চেনা লোক, কাজেই প্রতি ষ্টেশনেই বন্ধুবান্ধবীর দল, এ কামরা থেকে সে কামরা এবং সে কামরা থেকে এ কামরা করে বেড়াতে লাগলেন। ছেলেরা তাঁদের নিয়মমত ট্রেন থেকে নেমে পড়েই কোথায় যে উধাও হয়ে যেতে লাগলেন তার ঠিক নেই এবং শেষটা বাজিয়ে গাড়ি নড়ে উঠবার আগে কেউই ফিরে আসা প্রয়োজন মনে করলেন না। মাও থেকে তাঁদের মা বোনদের উদ্বেগে কণ্ঠাগত প্রাণ।

যা হোক journeyটা boring হয়নি মোটেও। সারাপথ গল্প চলল, বিভিন্ন groupএর সঙ্গে এবং বিভিন্ন কামরায় ঢুকে নিমন্ত্রণ খাওয়াও হল। মধুপুরে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াল কাজেই দলশুদ্ধ নেমে খুব বেড়ান হল। এতবড় দল দেখে ষ্টেশনের লোকেরা খুব অবাক হয়ে তাকাতে লাগল। কি আমাদের ভেবেছিল জানি না।

তারপর ত মধুপুর থেকে ট্রেন ছাড়ল, এবং নিয়ম-মাফিক নির্দিষ্ট সময় কলকাতায় এসে পৌঁছলাম।

সুখস্মৃতির ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল—নিজেই ভেবে পাচ্ছিলাম না কেন এসব কথা এখন এভাবে মনে পড়ছে। আমাদের জাহাজটি একটি সৈকতাংশের পাশ দিয়ে ঘুরে আসছিল—কুয়াশার মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে কয়েকটি লাল রংয়ের বাড়ীর ছাদ চোখের সামনে ভেসে উঠল—একটা ফ্ল্যাগ ষ্টাফ দেখতে পেলাম, কয়েকটি সজ্জিত বাগান চোখে পড়ল, একটা ব্রিজ, চাচের বুরুজ, কবরখানা দেখলাম…… আমি কি স্বপ্ন দেখছি?…এর সবটাই কি মায়া?

না—এই শান্ত সমুদ্রের ধারের জায়গাটায় ছাত্রজীবনে অনেকবারই গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাবার জন্য অতীতে আমি এসে থেকেছি। গত বছর বসন্তকালে, ঐখানেরই একটি ছোট বাড়ীতে একরাত্রি ছিলাম—আমার সঙ্গে ব্যারন এবং ব্যারনেসও গিয়েছিলেন। সারাদিনটা আমাদের কেটেছিল সমুদ্রে নৌকাভ্রমণ এবং বনজঙ্গলের ভেতর ঘোরাঘুরি করে। ঐখানে পাহাড়ের উপরের একটি বাড়ীতে আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ ব্যারনেসও সেখানে এলেন—কি সুন্দর মুখশ্রী! সোনালি চুলের আভায় তাঁর সারা মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, মাথায় ছিল জাপানী টুপী এবং তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্লু-ভেইল। দস্তানা-মণ্ডিত ছোট্ট হাত নেড়ে তিনি আমাকে ইঙ্গিত দিলেন থেতে যাবার জন্য বললেন…ঐ এখনও ব্যারনেস ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার দিকে চেয়ে তিনি রুমাল নাড়ছেন…আমি তাঁর মধুর সুরেলা কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি …কিন্তু সত্যি সত্যি কি এমন ঘটছে? জাহাজের গতি মন্থর হয়ে এল—এঞ্জিন থেমে গেছে—পাইলট-কাটার আমাদের দিকে আসছে (এ নৌকা জাহাজকে মোহানা থেকে পোতাশ্রয় নিয়ে যাওয়া এবং বের করে দেওয়ার ব্যাপারে পথপ্রদর্শকের কাজ করে)…হঠাৎ…বিদ্যুতের শিহরণের মত… একটি মাত্র চিন্তা এসে আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, বৈদ্যুতিক শক্তির শিহরণে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—পাগলের মত দ্রুতগতিতে আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরের ব্রিজের কাছে ছুটে গেলাম—ক্যাপ্টেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম—চীৎকার করে বললাম, আমাকে এই মুহূর্তে তীরে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর, তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব। ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন, আমার মনোভাব বিশ্লেষণ করে বোঝবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। তাঁর মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তিনি খুব ভয় পেয়েছেন। পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে-আসা উন্মাদের যেমন মুখের চেহারা হয়, আমাকে দেখে বোধ হয় সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ক্যাপ্টেনের মনে—সেকেণ্ড অফিসারকে ডেকে আদেশ দিলেন এ ভদ্রলোককে তাঁর মালপত্রসহ তীরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস—ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমি পাইলট-কাটারে গিয়ে উঠলাম। খুব দ্রুতবেগে নাবিকের দাঁড় টেনে অল্প সময়ের ভেতরই আমাকে কূলে পৌঁছিয়ে দিল।

আমার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—আমি ইচ্ছা করলে সুনিশ্চিতভাবে বধির এবং দৃষ্টিহীন হয়ে থাকতে পারি। সুতরাং এখানকার হোটেলে যাওয়ার সময় চলবার সময় এমন কিছু আমার কানে এল না বা চোখে দেখলাম না, যা আমার অন্তর্বোধকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। পাইলটদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে যে আমার মনে সন্দেহ করছিল সেই লোকটির কোনও সম্বন্ধ আছে, তারা যে আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরেছে…এ ধরনের কোন সন্দেহ আমার মনে স্থান পায় নি, কারণ এদের অস্তিত্বটাকেও সময়টায় আমি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করছিলাম এবং ভুলে ছিলাম। হোটেলে পৌঁছে একটি ঘর চাইলাম—খাবার জিনিসের অর্ডার দিলাম এবং একটা সিগার ধরিয়ে চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি কি উন্মাদ হয়ে গেছি? আমার মানসিক সমতা কি এতটা বিপর্যস্ত হয়েছে যে জাহাজের লোকেরা মনে করেছে আমাকে বিনা বিলম্বে তীরে এনে তোলা দরকার? আমার বর্তমান মনের অবস্থায় কোন সিদ্ধান্তে আসবার ক্ষমতা আমার ছিল না—কারণ ডাক্তারেরা বলেন কোন উন্মাদ ব্যক্তিই তার মস্তিষ্কবিকৃতির বিষয় সচেতন হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আগে আমার জীবনে এ ধরনের যে সব ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলাম।

যখন কলেজে ছাত্র ছিলাম সে সময় আমার ভয়ানক স্নায়বিক উত্তেজনা হয়েছিল—কারণ স্বভাবতঃই আমার

স্নায়ুগুলো ছিল অত্যন্ত দুর্বল—উপর্যুপরি কয়েকটি বিরক্তিকর ঘটনা ঘটায়, মনটা আরও অস্থির হয়ে উঠল। এই সময় একজন বন্ধু আবার আত্মহত্যা করল—এতে আমার নার্ভগুলো যেন আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমার হতাশা এমন বেড়ে গিয়েছিল যে সবকিছু মিলে আমি যেন স্নায়বিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম ঐ বালক বয়স থেকেই। দিনের বেলাতেও সামান্য সামান্য ঘটনা দেখে আমি অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। কখনও একলা একঘরে থাকতে পারতাম না। নিজের ছায়ামূর্তি যেন ক্ষণে ক্ষণে আমার আশেপাশে ঘুরত—বন্ধুরা রাত্রে পালা করে আমার ঘরে থেকে আমায় পাহারা দিত। সারারাত্রি একটার পর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘর আলো করে রাখা হত—কারণ আমি অন্ধকার সইতে পারতাম না। আর ঘর গরম রাখবার জন্য স্টোভেও আগুন জ্বলত, অথচ একটুতেই চোখের দুইপাতা এক করতে পারতাম না—সারারাত জেগে কাটত।

কিন্তু এখন আমি কি করি? বন্ধুবান্ধবদের কাছে কি আগেই আমার অসুস্থতার কথা লিখে জানাব? কারণ পরে নিশ্চয়ই নানা গুজব তারা সবার মুখেই শুনতে পাবে আমার অসুখের বিষয়। কিন্তু এ খবর জানাতেও কেমন অপমানে বাধে এবং লজ্জাবোধ হয় যে আমি নিজেকে এখন থেকে উন্মাদ-শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করছি। না, এ ধরনের চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য! কাছের লেকশিনের একটা পাথরের উপর হেলান দিয়ে আমি [illegible] শিশুর মত কাঁদতে লাগলাম। মনে পড়ে গেল 'এক সহস্র এক রজনী' বইটিতে পড়েছিলাম বাসনা অতৃপ্ত থাকলে প্রেমিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শুধুমাত্র প্রেমিকারা যখন তাদের আয়ত্তাধীনে আসে তখনই তাদের রোগ নিরাময় হয়। সুইডিশ লোকসঙ্গীতের টুকরো টুকরো কলি আমার মনোবীণার তারে ঝঙ্কার তুলতে লাগল—এ কলিগুলোর বক্তব্য ছিল একই ধরনের—অর্থাৎ উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীরা দয়িতের সঙ্গে মিলিত হতে না পেরে হতাশায় মৃতপ্রায় অবস্থায় নীত হয়েছে, তারা তাদের মায়েদের অনুরোধ করছে তাদের মৃত্যু-সজ্জায় সজ্জিত করে রাখতে। বৃদ্ধ নাস্তিক হাইনের কথা স্মরণে এল—যিনি আসরা উপজাতীয়দের সম্বন্ধে অবিস্মরণীয় গীতরচনা করে গেছেন—"যারা প্রেমের পরমলগ্নে মৃত্যুর দ্বারা তাকে অমরত্ব দান করে।" বেশ অনুভব করছিলাম আমার এই প্রেমাবেগের ভেতর কোনও কৃত্রিমতা নেই—কারণ একটি মাত্র চিন্তা, একটিমাত্র ছবি, একটি মাত্র অনুভূতি আমার সারা মনকে আবেশবিভোল করে তুলেছিল।

মনটাকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্য নীচের দিকে তাকালাম—সমুদ্রের বুকে ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ—স্কচ ফারেস্-এর দ্বারা দ্বীপগুলো আবৃত, মাঝে মাঝে পাইন গাছের সারি, ছোট ছোট পাহাড়, বালুকামণ্ডিত তটভূমি—তার পার দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধূসর সবুজ মিশ্রিত সমুদ্রের ঢেউয়ের নৃত্য-চঞ্চলা ব্রেকাসগুলো তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে—তরঙ্গশীর্ষের শুভ্র ফেনরাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে বেলাভূমিতে—আবার টানে টানে ঢেউগুলো কূলের দিক থেকে সমুদ্রের দিকে ফিরে যাচ্ছে—অল্পপরেই স্থির গতিতে ফের ফিরে আসছে—একটানাভাবেই ছুটে চলেছে সমুদ্রের বুকের উপর সহস্র সহস্র তরঙ্গের এই একটানা ছন্দোময় নৃত্য।

আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘপুঞ্জের নানা রঙের ছায়া এসে পড়ছিল জলের উপর—রক্তিম, বাদামী, বটল-গ্রীন, প্রাশিয়ান ব্লু—রঙের মেঘের প্রতিফলিত রূপ দেখতে পাচ্ছিলাম দুধার শুভ্র ঢেউগুলোর বুকের উপর। একটি খাড়া উঁচু পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ দেখা যাচ্ছিল—সেখানকার চিমনিগুলো থেকে কালো জমাট ধোঁয়া উপরের দিকে উঠতে গিয়ে বাতাসের ঝাপটায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, যে কালো বোটটাতে আমি এসেছিলাম সেটা চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি যে ভেতরে ভেতরে কত দুর্বলচিত্ত তারই সাক্ষ্য প্রমাণসহ যেন ভাগ্যই আমার চোখের সামনে আবার দেখা দিয়েছে—এ দৃশ্য সহ্য করবার মত মনের জোর আমার ছিল না। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে বনের দিকে পালিয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ গাছপালার ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। হতাশায়, নৈরাশ্যে।

বতে মনটা তিক্ততায় ভরে গেল! নাঃ এই অসহ্য রস্থিতির থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে র দেরি না করে বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ করা। এরপর ান্দায় পায়চারি করে, আবহমান সমুদ্র দেখে এবং টাইম-া লগুলোর পাতা উল্টিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। াজ আসবার সময় হয়ে গেল—ইচ্ছে করেই ওঁদের গত করতে যাই নি। নিজের ঘরে গিয়ে বসে াম।

অল্পক্ষণ বাদেই বাইরে ব্যারনেসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম ে ল্যাণ্ডলেডীকে আমার স্বাস্থ্যের বিষয় প্রশ্ন করছিলেন। থেকে বেরিয়ে ব্যারনেসকে অভিবাদন জানালাম। াকে দেখা মাত্র আবেগাভিভূত ভাবে এগিয়ে এসে, স্থিত সবার সামনেই আমার মুখচুম্বন করলেন ব্যারনেস। রে গলায় তিনি বার বার অনুযোগ করতে লাগলেন যে তিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলেই আমার এই খটা হয়েছে—তিনি আমাকে তখন থেকেই উপদেশ ত শুরু করলেন যে আমার পক্ষে এখন সহরে ফিরে য়াই হবে সবদিক থেকে বিধেয় এবং প্রবাস-যাত্রাটা ামী বসন্ত কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে।

ব্যারনেসকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুদ্রের য়া লেগে তাঁর গাল দুটি টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছিল, াখ বেয়ে যেন অজস্র ধারায় আমার প্রতি মমতা ঝরে ছিল। তাঁকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য আশ্বাস দিয়ে াম যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। তিনি আমার স্বাস্থ্যের মধ্যে না এনে বললেন যে আমাকে শবদেহের ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে এবং তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার। তাঁর কথা-া এবং ব্যবহারে মনে হচ্ছিল আমি যেন একটি শিশু। মধুর এবং সুন্দরভাবে তিনি মায়ের ভূমিকায় অভিনয় ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে যেন আমার প্রতি আদর চে পড়ছিল। খেলাচ্ছলে নানা প্রিয় নামে তিনি কে সম্বোধন করছিলেন। নিজের গায়ের শালটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। খাবার সময় আমার য়ের উপর ন্যাপকিনটা বিছিয়ে দিলেন, আমার খানিকটা মদ ঢেলে দিলেন, এবং সর্বরকমে র পরিচর্যা করতে শুরু করলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম ব্যারনেস আমার মত অপাত্রে তাঁর এই অগাধ স্নেহ, করুণা যত্নের অপচয় না করে সেটা তা নিজের সন্তানের জন্যই রাখলে পারতেন। আমি এদিকে তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর অনুরাগকে অনেক কষ্টে সংহত করে রাখবার চেষ্টা করছিলাম। —ব্যারনের সামনে আমার মনোভাবের লেশমাত্রও যাতে প্রকাশিত না হয়ে পড়ে সেদিকটাও আমাকে দেখতে হচ্ছিল।

ব্যারনের মহানুভবতা আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আমার কাছে ঐভাবে টেলিগ্রাম করার জন্য কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া দূরে থাকুক, নানাভাবে তিনি আমার সন্তোষবিধানের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ডিজ্যারটের পর যখন তাঁদের ফিরে যাবার সময় এল, ব্যারন প্রস্তাব করলেন যে, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তিনি বললেন যে তাঁদের বাড়ীতেই একটি ঘর ঠিক করা রয়েছে সেখানে আমি গিয়ে থাকব। আমি এ প্রস্তাবে সোজাসুজি আপত্তি জানালাম। এ ধরনের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার মানে আগুন নিয়ে খেলা সুরু করা। আমি জানালাম যে আর এক সপ্তাহ এখানে থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমি সহরে ফিরে গিয়ে আমার পুরানো এ্যাটিকেই উঠব।

তাঁরা আপত্তি তুললেন, কিন্তু আমি আমার মতে সুদৃঢ় হয়ে রইলাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে ভারি আশ্চর্য বোধ করলাম। তাঁর মতের বিরুদ্ধে নিজস্ব সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করলেই ব্যারনেস আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছিলেন। এতক্ষণ ইতস্ততঃ করছিলাম এবং তাঁর খামখেয়ালীপনায় সায় দিচ্ছিলাম, ব্যারনেসের ভালবাসা আমার প্রতি করুণাধারায় বর্ষিত হচ্ছিল, আমার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সৌজন্যবোধের প্রশংসায় ব্যারনেস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ-ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে কথা বলছিলাম, অমনি ব্যারনেস আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন এবং অমার্জিত রূঢ় ব্যবহার করতেও তাঁর এতটুকু বাধা ছিল না।

ব্যারনের প্রস্তাবমত একই বাড়ীতে থাকার কথা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি, এই ব্যবস্থায় কি সুখে এবং আনন্দে আমরা দিন কাটাতে পারবো, ব্যারনেস তার একটা সুন্দর ছবি আমার চোখের সামনে তুলে

ধরবার চেষ্টা করলেন—যখন-তখন আমরা পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করতে পারব, তার জন্য আগে থেকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করে ব্যবস্থা করতে হবে না।

আমি বাধা দিয়ে বললাম: "মাই ডিয়ার ব্যারনেস, একজন অবিবাহিত পুরুষকে এভাবে নিজের বাড়ীতে থাকতে নিয়ে এলে লোকে কি বলবে?"

"লোকে যা খুশী বলুক তাতে কি এসে যায়?"

"আপনার মা, আপনার আন্ট, এঁদের কথা ভেবে দেখছেন কি? তা ছাড়া আমার পুরুষসত্ত্বা এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় এ ধরনের ব্যবস্থায় সাধারণ লোকের অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে। আপনার পৌরুষের অভিমানকে একটু চাপা দিয়ে রাখুন। সবদিক থেকে নিজেকে দেখুন— এই ছেলেমানুষিটাকেই কি আপনি খুব পৌরুষের কাজ বলে মনে করেন?"—বললেন ব্যারনেস।

পুরুষমানুষ কঠিন না হতে পারলে তার পুরুষ বলে পরিচয় দেওয়াই সাজে না—আমি উত্তর দিলাম।

ব্যারনেস এবার ভয়ানকভাবে চটে উঠলেন। নারী ও পুরুষের ভেতর যে চিরন্তন বৈষম্য থাকা উচিত তা যেন তিনি মানতেই চাইলেন না। তাঁর মেয়েলী স্বভাবজ যুক্তিগুলো শুনতে শুনতে আমার নিজের চিন্তার ধারাটাই যেন ধাক্কা খাচ্ছিল। ব্যারনের দিকে তাকালাম। তিনি করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন, ঠোঁটের কোনায় একটু হাসির রেখা—বেশ বুঝতে পারলাম মেয়েদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটাও আমারই অনুকূলে—তবে আমরা দু'জনেই এবিষয়ে একমত যে চিন্তামার্গে নারীজাতি একটু অনগ্রসরেই বিচরণ করেন।

বিকেল ছটার সময় জাহাজের নোঙর তুলল, বন্ধুদের বিদায় দিয়ে একলা হোটেলে ফিরলাম।

এই সন্ধ্যেটা ছিল সবদিক দিয়ে মনোমুগ্ধকর। সারা আকাশ কমলা রংএ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল। গভীর ঘন নীল সমুদ্রের বুকের উপর সাদা ডোরা-কাটা আলোর রেখাগুলো পড়ে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল—স্কচ্‌কারসের পেছন থেকে তামাটে রঙের চাঁদটি আকাশের গা বেয়ে ভেসে উঠছিল।

আমি ক্রমে টেবিলের ধারে আত্মমগ্ন হয়ে বসেছিলাম—কখনও মনটা ব্যথায় ভরে উঠছিল, আবার সে ভাবটা সরে গিয়ে একটা প্রশান্তি এসে তার স্থান অধিকার করছিল। আমার ল্যাণ্ডলেডী কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন তা টের পাই নি। তিনি আরও কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন: যে মহিলা একটু আগে এখান থেকে চলে গেলেন, তিনি আপনার সহোদরা, না?

না, এ আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

কি আশ্চর্য, অথচ আপনাদের দু'জনের ভেতর কি অদ্ভুত চেহারার সাদৃশ্য। আমার ত মনে হয়েছিল একটুকু দ্বিধা না করে আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, আপনারা আপন ভাইবোন।

এ বিষয়ে আর কথা চালাতে ইচ্ছা হলনা—কিন্তু প্রশ্নটি আমার মনে চিন্তার ঢেউ তুলে দিয়ে গেল।

ক্রমাগত আমার সঙ্গ পেয়ে পেয়ে ব্যারনেসের চেহারার উপর আমার চেহারার প্রভাব এসে পড়ল কি না কে জানে! অথবা তাঁরই মুখভাব গত দু'মাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমার মুখাকৃতিকে তাঁর মতন করে পরিবর্তিত করল। দীর্ঘদিনের আত্মায় আত্মায় সংযোগে এরকমটা হওয়া মোটেও বিচিত্র নয় অথবা এমনও হতে পারে দু'জনেই দু'জনকে খুশী করবার জন্য নিজেদেরই অজান্তে উভয়ের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি এবং অভিব্যক্তি করার ধারাকে অনুকরণ করে চলেছি—এবং তারই ফলে আমাদের মুখভাবে এবং প্রকাশভঙ্গিতে একটা অদ্ভুত ঐক্যের ভাব ফুটে উঠেছে অন্যের দৃষ্টিতে। আমাদের দু'জনের ভেতর যে একটা পরম আত্মিক মিলনের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে এবং একের সত্তা থেকে অপরের সত্তাকে যে আর পৃথক করে ভাববার উপায় নেই, এ কথা ত আর অস্বীকার করা চলে না? বেশ বুঝতে পারলাম ভবিতব্য আমাদের জীবনে তার খেলা শুরু করে দিয়েছে—ভাগ্যে লিখন রক্তের অক্ষরে ফুটে উঠবেই—তার দুর্বার গতিরোধ করবার ক্ষমতা কারোরই নেই। ঐশ্বরিক শক্তি যে বলটিকে ঠেলে গড়িয়ে দিয়েছে তার অগ্রগতিকে বাধাস্বরূপ হয়ে এসে দাঁড়াতে গেলে—সম্মানবোধ, বিচারবুদ্ধি, সুখশান্তি, কর্তব্যনিষ্ঠা, জ্ঞান, ধর্ম সব কিছুকেই সে দলে, পিষে, ধ্বংস করে গতিপথে এগিয়ে চলবে।

এই যে যুবক প্রেমিককে নিজের বাড়ীতে এসে থাকবার জন্য সরলভাবে সব দেখিয়ে আহ্বান করা—ব্যারনেস ত

বেশ ভালভাবেই অনুভব করতে পারেন যে তাঁর এত কাছাকাছি থাকলে তাঁর সম্বন্ধে আমার অন্তরে তীব্র আবেগকে সংহত করে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েই উঠবে—তবে কেন এ অনুরোধ? তাঁর মনে কি পাপের বীজ ঢুকেছে, না আমাকে ভালবেসে বিচারবুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। না, না, তাঁর মনে কোন পাপ থাকতেই পারে না। আমি জানি তিনি ভেবেচিন্তে কোন কাজ করতে পারেন না, হঠাৎ হঠাৎ যা করে বসেন তার পেছনে রয়েছে তাঁর চারিত্রিক উচ্ছলতা, তাঁর শিশুর মত সারল্য এবং মাতৃসুলভ অন্তরের মাধুর্য এবং কোমলতা। নিজের চরিত্রের অনেক দোষত্রুটির কথা তিনি নিজেই অকপটে আমার কাছে স্বীকার করেছেন—যেমন, তিনি অত্যন্ত খামখেয়ালী, সবসময় মনের সমতা বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না—কিন্তু এসব দোষ থাকলেও তাঁকে পাপী বা অসৎ-চরিত্রা আখ্যা দেওয়া বাতুলতা।

কিন্তু সে যাই হোক, আমাকে এখন শঠতার আশ্রয় নিতে হবে—পরিচিত মহলকে আমার আসল মনোভাব কিছুতেই বুঝতে দেওয়া হবে না। একটি চিঠি লিখতে বসলাম—তার বিষয়বস্তু হল সেই সেলমার সঙ্গে আমার ছাকনিভ্ প্রেম এবং নৈরাশ্যের কাহিনী—চিঠির সঙ্গে দু'টি কবিতাও দিয়ে দিলাম—"টু-হার"। বলা বাহুল্য দুইভাবে কবিতা দু'টির ব্যাখ্যা করা চলে—দেখা যাক্ ব্যারনেস বিরক্ত হয়ে ওঠেন কি না।

চিঠি বা কবিতার কোন উত্তর পেলাম না। হয়ত এ ব্যাপারটা ব্যারনেসের অত্যন্ত বেশী জোলো লেগেছে—সেই কারণেই উত্তর দেবার মত উৎসাহ বোধ করেননি।

এখানকার শান্ত সুন্দর দিনগুলো, দ্রুতগতিতে আমার শরীর সারিয়ে তুলতে লাগল। দিনের বেশীর ভাগ সময়টা আমি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাটাতাম। গাছ, লতা, পাতার বর্ণ, গন্ধ এবং বনের অভ্যন্তরে আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে আমার অন্তরের সমস্ত গ্লানি যেন কেটে যেতে লাগল—আমি দেহমনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম। আসলে বোধ হয় ব্যারনেসের এখানে আসাটা এবং ভবিষ্যতে আবার সহরে ফিরে তাঁকে দেখতে পাব এই চিন্তাটাই আমাকে নতুন জীবন এবং বিচারবুদ্ধি ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

———

তার নাম জানো ?

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

আঠারো বছরের মেয়েটা।
যে বয়সটা চিরকালই মানুষের মোহের বয়স।
অসামান্য রূপসী
তন্বী শ্যামা শিখরী দশনা—
কাব্যে গানে শ্লোকে যাকে চিরদিন কবিরা—
করেছেন অর্চনা।

•

কে সে? সে কি মেরী ম্যাগডালিন?
যার কাছে একদা লুব্ধ মুগ্ধ পুরুষেরা এসেছিল ভিড় করে।
তারপর একদিন তারাই ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে মারতে এসেছিল
আরো একটা নারীর নিরাবরণ দেহে—দলে দলে।
পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে পতিতা বলে।
সহসা থেমে গিয়েছিল কার গম্ভীর শান্ত কণ্ঠ স্বরে।
পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্যতম উক্তি; শ্রেষ্ঠতম উক্তি বুঝি!
সে-উক্তি হল "যে কখনও পাপ করেনি—
সেই ওকে আগে আঘাত কর।"

•

সে কি উর্বশী?—বহুবল্লভা ও বহুভোগ্যা।
অনন্ত যৌবনা! কবি বলেছেন আহা 'বিশ্বের কামনা'
তবু বিশ্বমাঝে অর্জুনই বিমুখ করেছে তাকে।

•

সে কি সেই দেশের মেয়ে?
(কবি বলেছেন) যার কাছে 'এসেছে আর্য্য এল অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান
শক হুন দল পাঠান মোগল"—
(আর তারপর খৃষ্টান?)
সে কি সেই দেশের মেয়ে
যারা তার নামের সঙ্গে এক করে বলেছিল—
"তৈল মৎস্য মাংস সম্ভোগ নিষেধ"।
তারা কি নরমাংস ভুক্ ছিল? বনচর কাপালিক
ছিল? স্ত্রীমাংস ভক্ষণ করত?
আহা! না, না! তারা ধার্মিক…

•

হ্যাঁ সেও এক নারী। সে বীরভোগ্যা। সে কখনও
কখনও কাপুরুষ ভোগ্যা।
তখন তার বড় কষ্ট। বড় কষ্ট। বড় কষ্ট!
জানো তার নাম? চেন তাকে?

তার নাম ভারতবর্ষ
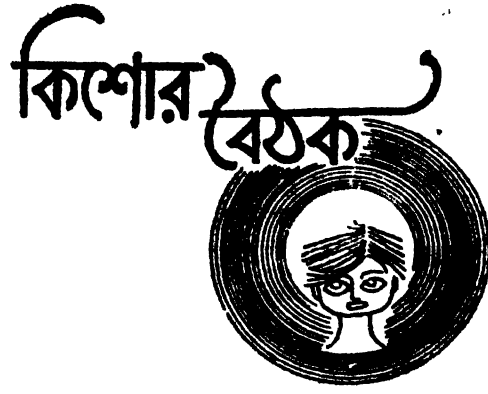
দাদাজী

গান্ধীজী

সুধাকর

'হরিশ্চন্দ্র' যাত্রা হবে দূরে সে এক গ্রামে
ভিড় জমে খুব প্রতিবারেই ঐ নাটকের নামে
বালক সে এক আসছে ছুটে অনেক দূরে বাড়ি
আসন নিয়ে শ্রোতার দলে হয় যে কাড়াকাড়ি
বহুবারের দেখা নাটক তবু দেখা চাই
'হরিশ্চন্দ্র'—নাটক সে নয়, জীবন খাঁটি,—তাই
দেখে দেখে প্রতিবারেই ঐ ছেলেটির চোখ
অশ্রুভারে জড়িয়ে থাকে, দেখে সকল লোক।
সেদিন যেন হঠাৎ কোন বাঁধা নদীর ধারা:
বাঁধ ভেঙে যেন, বালক কাঁদে হয়ে আত্মহারা
প্রশ্ন হ'ল—"যাত্রা দেখে কান্না কেন অত?"
উত্তর হয়—"মিলবে না কেউ হরিশ রাজার মত
সত্যবাদী, দাতার সেরা, ত্যাগের হিমালয়
হয় না কেন সবাই এমন বিশ্বভুবনময়।"
পাগল নাকি এই ছেলেটি, প্রশ্ন করে কী!
হায়রে কপাল! সেই ছেলে যে হ'লেন গান্ধীজী।

যাঁদের করি নমস্কার (৮)

শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়

সকালে শিবমন্দিরে ভিড় লেগে গেছে। পুজো-দেওয়ার ভিড়। দূরে মন্দিরের একটি কোণে সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে একটি তরুণ আপন মনে বলে চলেছে— "শিব ঠাকুর, যদি হুকুম দাও ত' আমি হত্যে দিই এখানে, জানতে চাই, কতদিন পরে ইংরেজ শাসনের অসুখ থেকে আমরা সবাই সেরে উঠব।"

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। জানা গেল, কে একজন ডাক-হরকরার থেকে ডাকব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছে। সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুলিশ আস্তিন গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল অপরাধীর খোঁজে। কিন্তু আসামী তখন নাগাল-ছাড়া।

আসামী আর কেউ নয়। সে সেই তরুণটি যে সকালে শিব মন্দিরে শিব ঠাকুরের কাছে তার মনের কথা বলতে গিয়েছিল। এর নাম ক্ষুদিরাম বসু।

বিলাতি-বর্জন আন্দোলন যখন দেশে খুব প্রবল হয়ে উঠেছে সেই সময় ক্ষুদিরামের ভয়ে দোকানদাররা সব সময় তটস্থ হয়ে থাকত। কারণ, তখন ক্ষুদিরামের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল বিলাতি জিনিসের দোকান পুড়িয়ে দেওয়া, বিলাতি কাপড়ের গাড়ি লুঠ ক'রে নেওয়া, লবণের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া, এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরাম দলের নেতাদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে।

একদিন মজঃফরপুর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বধ করার দায়িত্ব এল ক্ষুদিরামের ওপর। মনের মত কাজ পেয়ে ক্ষুদিরামের আনন্দ আর ধরে না। তাই, হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। কিন্তু, এ কী হ'ল! কিংসফোর্ড মরল না। যে ফিটন গাড়িটিতে ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করেছে তাতে কিংসফোর্ড ছিল না। ছিল দু'জন ইংরাজ-মহিলা। এই ভুলের জন্য ক্ষুদিরাম অন্তরে দুঃখ প্রকাশ করে।

'ওয়াইনি' নামক স্টেশনের কাছে ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। তারপর, যা হবার তাই হ'ল। হুকুম হ'ল ফাঁসির।

ফাঁসির আগে তার শেষ বাসনা কি জানতে চাওয়া হ'ল। উত্তর হ'ল—'বধ্যস্থানে যাবার আগে আমি চতুর্ভুজার প্রসাদ খেয়ে যেতে চাই।'

ফাঁসির দিন অতি প্রত্যুষে স্নান সেরে ক্ষুদিরাম বসল প্রার্থনায়। সময়মত চতুর্ভুজার প্রসাদ এল। দেবীর উদ্দেশে আর একবার প্রণাম জানাল ক্ষুদিরাম। তারপর এগিয়ে গেল ফাঁসির মঞ্চে। পিছন দিকে হাত বেঁধে দেওয়া হ'ল, গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হ'ল। কারাধ্যক্ষ এলেন ফাঁসির হুকুম পাঠ করতে। তখন উপস্থিত সরকারী কর্মচারীবৃন্দকে বিস্মিত করে ক্ষুদিরামের কণ্ঠ হতে শব্দ বেরিয়ে এল—'ফাঁসির দড়িতে মোম দেওয়ার কারণ কি?' কিন্তু, জবাব দেওয়ার সময় নেই তখন। জল্লাদ তার কাজ শেষ করল। শেষবারের মত ক্ষুদিরামের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হ'ল—'বন্দেমাতরম'।

ক্ষুদিরামের নশ্বর দেহ দাহ করা হ'ল গণ্ডক নদীর তীরে। জনসমুদ্র ভেঙে পড়ল তার চিতার আশেপাশে। সেই চিতার আগুন ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে। তার আলোয় পথ কেটে এগিয়ে চলল বাংলার তরুণ দল।

ক্ষুদিরামের গান গেয়ে বাংলার বাউল আজও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। কান পেতে শোন, শুনতে পাবে, সে গাইছে—

> একবার বিদায় দে, মা, ঘুরে আসি।
> হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে জগৎবাসী।

আত্মার অমরত্ব

আমাদের বিশ্বাস মানব আত্মা অমর। এই বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানব আত্মা মানব দেহ ত্যাগ করিয়া অপর কোন নিরাকার রূপ অবলম্বন করিয়া, নিজ ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরলোকে অর্থাৎ অপর এক বাসোপযোগী লোকে অবস্থিত থাকিবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই যে পৃথিবী বা ইহলোক, যাহাতে আমরা সর্বত্র শব্দ, বর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক বস্তু সকলের পরিচয় পাইতেছি ও নিজের পরিচয় অপরকে জ্ঞাত করাইতেছি; এই লোক ত্যাগ করিয়া অমর আত্মা যখন অন্যলোকে গমন করে তখন সেই চলিয়া যাওয়ার হিসাব দূরত্ব দিয়া বিচার করা যায় না। কারণ দূরত্ব বাস্তব গতি ও পরিস্থিতি হইতে উদ্ভূত এবং বস্তুহীন জগতের দূরত্ব বা নৈকট্য থাকিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। যাহার চক্ষু নাই তাহার নিকট যেরূপ বর্ণের কোনও অর্থ নাই, যাহার শ্রবণশক্তি নাই তাহার যেরূপ শব্দবোধ নাই; সেইভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে এক এক করিয়া বর্জন করিলে বস্তুর বাস্তবতা বা সৃষ্টির অস্তিত্ব বিচার কঠিন হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু সৃষ্টির অবস্থিতি অপ্রমাণ হইয়া যায় না। কারণ বিজ্ঞান আমাদিগকে শ্রবণশক্তির বহির্ভূত শব্দতরঙ্গ যন্ত্রের সাহায্যে ধরিয়া প্রমাণ করিয়া দেয় যে যাহা শুনা যায় না সেইরূপ শব্দ সৃষ্টিতে বর্তমান রহিয়াছে। বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করিয়া দেয় যে, দৃষ্টি যাহা ধরিতে পারে না সেইরূপ আলোকরশ্মি সর্বত্র তরঙ্গায়িত রহিয়াছে। সৃষ্টিতে বহু বস্তু বিরাজমান রহিয়াছে যাহা মানুষ নিজ সীমাবদ্ধ বোধশক্তি দিয়া সাক্ষাৎ ও বাস্তব ভাবে অনুভব করিতে পারে না। বিজ্ঞান আরও বহু অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দেখাইয়াছে। মানুষ পূর্বে এক ঘণ্টায় যতদূর যাইতে পারিত আজ এক মুহূর্তেই প্রায় ততদূর যাইতে পারে। আলোকরশ্মির গতিবেগ তাহা অপেক্ষাও লক্ষগুণ দ্রুত। মনের গতি আলোকরশ্মি অপেক্ষাও লক্ষগুণ দ্রুত। কিন্তু তাহা বাস্তব ভাবে প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। তাহাতে প্রমাণ হয় না যে মনের গতি নাই। মন সময়ের ক্ষেত্রে পূর্বে ও পশ্চাতে সমানভাবে গতিশীল। মন বস্তুর বাহিরে অবাস্তবের সন্ধানেও যাইতে সক্ষম। আত্মা দেহস্থিত চিন্তা ও অনুভূতির অর্থাৎ জীবন্ত মানবমন অপেক্ষা অগম্যকে গম্য করিয়া পাইতে সক্ষম। পরমাত্মা সর্বত্র রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে গতি বা গমনের কথা উঠে না। অশরীরী মানব আত্মা দেহত্যাগ করিয়া কোথায় কিরূপে অবস্থিত থাকে তাহা আমরা স্থির নিশ্চয় ভাবে বলিতে পারি না। মানব-ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত যে পরলোক তাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। মানব-ব্যক্তিত্ব যতদূর দেহের সহিত সংযুক্ত তাহা লয়প্রাপ্ত হইলেও মানবআত্মার অন্তরতম যাহা তাহা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অমর হইয়া থাকিয়া যায় ইহা আমাদিগের বিশ্বাস। দেহ পৃথিবী ও পারিপার্শ্বিককে যেভাবে অবলম্বন করিয়া থাকে আত্মা সেই ভাবেই অপরলোকে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া থাকে এই ধারণা সহজ হইলেও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। স্থিতি, গতি, ধরিয়া থাকা বা ত্যাগ করিয়া যাওয়া বাস্তব অনুভূতির কথা। অবাস্তব যাহা তাহার স্বরূপ জ্ঞান অনুভূত হইতে পারে কিন্তু শব্দবোধ্যভাবে ব্যক্ত ও প্রকাশিত হইতে পারে না। ঐ যে আত্মার ও পরমাত্মার স্বরূপ অনুভূতি তাহা সকলের অন্তরে জাগ্রত হয় না। সাধনা ও ধ্যান অর্থে আমরা বুঝি মানব মনকে ক্রমশঃ বাস্তব পারিপার্শ্বিক হইতে সরাইয়া লইয়া আত্মার উপলব্ধিকে অধিক জাগ্রত করিয়া তোলা। ইহা যখন সফল হয় তখন সেই অবাস্তব ও সর্বত্র বিরাজমান প্রাণশক্তি বা পরমাত্মা আমাদিগের আত্মাকে ব্যাপ্ত করিয়া নিজ স্বরূপ প্রকাশ

করিতে পারেন। দেহী আত্মার পক্ষে পরমাত্মার অনুভূতি মাত্র লাভ হইতে পারে। সাক্ষাৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ভাবে তাঁহার পরিচয় লাভ মহাপুরুষদিগের পক্ষে হয়ত সম্ভব কিন্তু সাধারণ মানবে তাহা ঘটে না। মানবাত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতি কিভাবে ব্যক্ত হয় আমরা তাহা জানিনা। ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তবের উপলব্ধি যে বহুলাংশে অমূলক ও মোহাচ্ছন্ন তাহা বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে। দূরত্ব, গতি, স্থিতি বা সময় যেভাবে মানব-মনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে তাহাও মোহাবৃত বলিয়া দেখা যায়। মানুষের গতি, পৃথিবীর সূর্য্য আবেষ্টনের গতি আলোকরশ্মির গতি ও পরে মানবমন বা আত্মার গতি ক্রমে দেখাইয়া দেয় একই মুহূর্ত্তে সকল কিছু সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে পারে এই ধারণা অসম্ভবের কল্পনা নহে যাহা ছিল, যাহা আছে ও যাহা থাকিবে সেই সকলের পার্থক্যও ক্রমশঃ অপসৃত হইতেছে; অর্থাৎ সময়ের উপলব্ধিও মোহের আবরণে আবৃত। বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে যে অনতিক্রম্য অন্তরায় তাহাও থাকিতেছে না। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তুর ভিতরে ও বাহিরে এক অবিনশ্বর প্রাণশক্তি বর্ত্তমান আছে তাহাও চিন্তা ও অনুভূতিগ্রাহ্য সর্ব্বজনস্বীকৃত। ব্যক্তির আত্মা ও প্রাণ সেই মহাশক্তির সহিত কিভাবে সংযুক্ত তাহা জানিবার ও জ্ঞান প্রচেষ্টার অনতিগম্য নহে। দার্শনিক অনু-সন্ধিৎসার যুগের পরে বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে বাস্তব প্রমাণ না থাকিলে কিছুই স্বীকৃত হইত না। কিন্তু বিজ্ঞানের বিস্তার ক্রমশঃ দর্শনকে বিজ্ঞানের অতি নিকটে আনিয়া ফেলিয়াছে। এখনও উভয়ের মিলন অসম্পূর্ণ; কিন্তু পূর্ণ মিলন বহুদূরে নহে অদূর ভবিষ্যতে মানব প্রাণ ও প্রেরণার উৎপত্তির উৎস কোথায় কিভাবে অবস্থিত তাহা আধুনিক মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। তখন আর মৃত্যুর বিভীষিকা মানব-মনকে আতঙ্কিত করিবে না ইহলোকে দেশ-বিদেশে যাওয়া-আসা ও ইহলোক পর-লোকে গমনাগমন তখন প্রায় একইভাবে মানুষ দেখিতে পারিবে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন:

আবার যদি ইচ্ছা করো
　　আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো
　　এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
　　ভাসি নয়ন-নীরে।

মহাকবি অসম্ভবের কল্পনা করিতেন না। পরমাত্মার ইচ্ছায় যাওয়া-আসা তাঁহার মনে অচল বিশ্বাসের কথা ছিল। সেই বিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁহার অন্তর দৃষ্টি ও সত্যজ্ঞানের প্রেরণা। অচেনা যাহা তাহা তাঁহার অতি নিকটের ছিল

"অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে?
　　অচেনাকেই চিনে চিনে
　　উঠবে জীবন ভ'রে।
ছিল আমার মা অচেনা
　　নিল আমার কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো
　　তাই তো হৃদয় দোলে।"

ভারত-মৈত্রী-মহামণ্ডল

কালিদাস নাগ

[প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ কালিদাস নাগ গত ৮ই নবেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। রবীন্দ্র সহচর এই মনীষীর মৃত্যুতে আমাদের সংস্কৃতির এক মহান প্রতিনিধি এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্‌কে হারাইলাম। তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রবাসীর পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়া আছে। পুরাতন প্রবাসী হইতে তাঁহার দুটি রচনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।]

ঋষিকবি অশ্বঘোষ তাঁহার "শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রে" সর্ব্বসত্ত্বের যে কল্যাণ ও মুক্তিকে ব্যক্তিজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন, ভারতবর্ষ তাহার সমাজ ও রাষ্ট্র, তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সেই আদর্শকে চরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার ও বরণ করিয়াছিল। মহামানবতার এই আদর্শ যেদিন জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করে সেদিন দেশ ও জাতি নিজেকে আর নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না; শক্তি ও সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও সাধনা, ত্যাগ ও প্রেম তাহার সকল অঙ্গ ছাপাইয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সীমার বাহিরে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, সকলকে নিবিড় আলিঙ্গনে এক করিয়া লয়। ভারতের জাতীয় জীবনেও একদিন তাহা হইয়াছিল। সেই মহান্ আত্মদান ও আত্মবিকাশের ফলেই ভারত একদিন সমগ্র প্রাচ্যখণ্ড লইয়া এক অপূর্ব্ব মৈত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল।

এশিয়া জুড়িয়া বিস্তার

খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ হইতেই দেখিতেছি, ভারতবর্ষ বৃহত্তর ভারত রঙ্গমঞ্চে বিশ্বমানবতার নটভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ভারত শুধু তাহার তত্ত্ববিদ্যা ও ধ্যানলব্ধ বাণীকেই দিকে দিকে প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই; সে তাহার কোনো সার্ব্বভৌম নরপতির উৎসাহে ও সাহচর্য্যে শুধু অল্পবিস্তর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই; ভারতের বিচিত্র জাতি যেন কোন্ এক দৈব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া পরম রহস্যময় আবেশে ও আনন্দে সকল সঙ্কীর্ণ অহংকারকে বিসর্জ্জন দিয়া পরিপূর্ণ বিশ্বানুভূতির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাধনা ও সভ্যতার এই বিস্তার, ধর্ম্মবিজয়ের এই প্রসার, একদিকে নেপাল তিব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া চীন কোরিয়া জাপান, আর একদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যাম, চম্পা, কাম্বোজ, জাভা, মালয় পর্য্যন্ত সকল দেশকে ভারতের সঙ্গে এক মহামিলনসূত্রে বাঁধিয়া দিল। ভারতবর্ষের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মবিজয়ের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। মানবের ইতিহাসে বিশ্বৈকবোধের বিকাশের ধারাটিকে যিনি অনুসরণ করিতে চাহেন, ভারতের মৈত্রী সাম্রাজ্যের এই অধ্যায়টিকে তাঁহার অবহেলা করিলে চলিবে না। এই অজ্ঞাত বিস্মৃত ইতিহাসের কথা ভারতের কোন মহান্ ঐতিহাসিক একদিন শুনাইবেন। এখন অল্পকথায় শুধু তাহার আভাস দেওয়া যায় মাত্র। "দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে"—মহামানবতার এই যে উদার আদর্শ, এ আদর্শ এই যুগে অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধ ও জরথুস্ত্র, লাওট্সে ও কনফুসিয়াসের বাণী, ম্যানিকিয় (Manichaean) ও খৃষ্টীয় তত্ত্ব এক অদ্ভুত সমন্বয় ও সাহচর্য্যে একে অন্যকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সকল জাতির মিলিত চেষ্টায় এই বিরাট্ বিস্মৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার সম্ভব।

রিচার্ড্ গার্বে (Garbe) ও ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ (Smith) স্বীকার করেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম বিকাশের অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং সেই খৃষ্টধর্ম্মও পরে হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি আচার ও মতবাদকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। মেম্ফিসে (Memphis) ভারতীয় নরনারীর প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হইবার পর মিশরের পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্লিন্ডার্স পেট্রি (Flinders Petrie) বলিয়াছিলেন,—"ভূমধ্যসাগরের তীরে ভারতীয় সভ্যতার ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন।

সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে ভারতের যে সম্বন্ধের কথা গ্রীসে অশোকের ধর্মমহামাত্য প্রেরণের যে কাহিনী, আমরা এত কাল শুনিয়া আসিয়াছি তাহার কোন বাস্তব নিদর্শন এতদিন পাওয়া যায় নাই। এখন মনে হইতেছে, এতদিন পরে হয়ত আমরা মেম্‌ফিসে ভারতীয় উপনিবেশের বাস্তব তথ্যটি আবিষ্কার করিলাম এবং আশা হইতেছে ইহারই সূত্র ধরিয়া হয়ত ভবিষ্যতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্বন্ধের আরও নূতন তথ্যের আবিষ্কার সম্ভব হইবে।"

গান্ধার হইতে খোটান; মধ্য-এশিয়া হইতে চীন

ভারতবর্ষের মহাযান পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে ততটা রূপান্তরিত করিতে পারিল না, যতটা পারিল এই সুবিস্তীর্ণ প্রাচ্য মহাদেশকে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আরিয়ান্ (Arrian) তাঁহার "ইণ্ডিকায়" বলিতেছেন —"ভারতবর্ষের কোনো রাজা বা সম্রাট সাধারণতঃ ভারতের বাহিরে রাজ্যজয়ের প্রচেষ্টা করেন নাই—ন্যায়-বুদ্ধি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে সে-চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিত।" আরিয়ান্ যাহা বলিয়াছেন ভারতবর্ষ মোটামুটি এ সংস্কারকে মানিয়া চলিত, কাজেই মহাযান-পন্থী ভারতবর্ষ এবার যে জয়ের আশায় উৎসাহিত হইয়া এশিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তাহা দিগ্বিজয় নয়, রাজ্যবিজয় নয়, তাহা অশোকের ধর্ম্মবিজয়। ভারতবর্ষ তাহার পুরাতন থেরবাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বকে পিছনে ফেলিয়া অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু সত্য তাহাকে স্বীকার করিল, "সর্ব্বাস্তিবাদ" তত্ত্বকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই নূতন তত্ত্বকে প্রচারিত করিয়াছিলেন অশ্বঘোষের গুরু কাত্যায়নীপুত্র তাঁর বিভাষা ও মহাবিভাষা নামক গ্রন্থদ্বয়ে। সর্ব্বাস্তিবাদীদের এই বৈভাষিক সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরে, গান্ধারে এবং সেইখান হইতে উদ্যান, কাশগর, খোটান, পারস্য প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া এই সম্প্রদায় ধীরে ধীরে চীনে বিস্তার লাভ করিল। বস্তুতঃ এই সময় চীনের জাতীয় চিত্ত ভারত ও ভারতীয় সাধনার সন্ধানে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায়, ২১৭ খৃষ্টপূর্ব্বে সম্রাট সিন-সিহ্ হুয়াংটির (Tsin Shih Huang-ti) রাজত্বকালে চীন রাজধানীতে আঠারজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর আমদানী হইয়াছিল। আর এ কথাও নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৮-১১৫ অব্দের মধ্যে চাং-কিয়েন (Chang-Kien) নামে জনৈক 'দণ্ডনায়ক' চীনের দুর্গম পশ্চিম সীমান্তে বর্ব্বর হিউএঙ্ নু (Hiueng nu) মণ্ডল ভেদ করিয়া তা-হিয়া (Tahia = Bactria) এবং সেন্-টু (Shen-tu = Sindhu-Hindu) প্রদেশদ্বয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য চীন-সম্রাটকে উপহার দিয়াছিলেন।

এদিকে খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভেই শুনিতে পাই, মধ্য-এশিয়া হইতে ভারে ভারে বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ ও মূর্ত্তি পতাকাদি শিল্প-নিদর্শন লইয়া পার্শিয় ও ইউএচি রাজদূতেরা চীনরাজসভায় আসিতেছে। মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো স্থানে যে ইতিমধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। ৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মিং-তির (Ming ti) রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভূত সম্মানে ও গৌরবে চীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে শুধু ধর্ম্মগ্রন্থই গেল না, বৌদ্ধশিল্প ও বুদ্ধমূর্ত্তিও গেল। দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ এই ধর্ম্মযাত্রার অগ্রদূত হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে হোনান্ (Honan) প্রদেশের রাজধানী লোইয়াং (Loyang) নগরীতে পাইমা (Paima) মন্দির গড়িয়া উঠিল এবং অনেক তা' ও এবং কনফুসিয়ান্ ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুন

এই সময় ভারতবর্ষে বিরাট্ কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-পত্তন হইতেছিল। মধ্য এশিয়ার এই দুর্দ্দান্ত বর্ব্বর জাতি অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের সাধনা ও সভ্যতার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়াছিল। কনিষ্ক ছিলেন এই কুষাণ সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্; অশোকেরই মতন ছিল তাঁহার মনের প্রসার, ও আদর্শে শ্রদ্ধা। এই কনিষ্কেরই শ্বেতছত্রছায়ায় গান্ধার শিল্প লালিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল; ইহারই রাজ-সভায় বাস করিতেন প্রাতঃস্মরণীয় নাগার্জ্জুন; ইনি একদিকে যেমন ছিলেন প্রাচীন ভারতের রসায়ন-বিদ্‌দের মুকুটমণি তেমনি আর একদিকে অশ্বঘোষ প্রবর্ত্তিত মহাযান-তত্ত্বের প্রচারক।

কণিষ্কের যুগে পুরুষপুর (Peshawar) তক্ষশিলা প্রভৃতি এমনি করিয়াই একাধারে শিল্প, বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার কেন্দ্র হইয়া উঠিল—চরক হইলেন আয়ুর্বেদের আচার্য্য, কাত্যায়নীপুত্র তাৎকালীন তত্ত্ববিদ্যার উদ্গাতা, এবং অশ্বঘোষ হইলেন সঙ্গীত ও কাব্যকলার প্রবর্ত্তক।

সমুদ্র পারাপার—চম্পা, কাম্বোজ, সুমাত্রা, জাভা

শুধু কি স্থলপথেই ভারতবর্ষ আপনার ধর্ম্মদূতগণকে দেশে দেশে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়াছিল? এই যুগেই দেখিতেছি, হিপ্পেলাস্ নামে এক গ্রীক্ নাবিক মৌসুমী বায়ুর আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাতে সমুদ্র পারাপারের অত্যন্ত সুবিধা হইয়া গেল। আর-এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের যে পুঁথিখানা (Periplus of the Erythrean Sea *) সৌভাগ্যক্রমে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে, সে পুঁথিখানি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে একদিকে আফ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত পর্য্যন্ত, আর একদিকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর চীন পর্য্যন্ত কত বিস্তৃত ছিল সে যুগের বাণিজ্য-প্রসার। ভারতবর্ষের নাবিককুল ভারতের সাধনা ও সভ্যতার নব নব উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্ত পাল তুলিয়া উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল চম্পায়, কাম্বোজে, সুমাত্রায়, জাভায়। টলেমি (Ptolemy) তাঁহার ভূগোলে—(খৃষ্টাব্দ ১৫০—) "যবদিউ" বলিয়া যবদ্বীপের নাম করিতেছেন; ফরাসী পণ্ডিত পেলিয়ো (Pelliot) প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই ফুনানে (Fu-nan প্রাচীন কাম্বোজ) ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনের সুস্পষ্ট পরিচয় এবং সমুদ্র পারাপারের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম ও তত্ত্বগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কথা, সাহিত্য, গাথা ও কাহিনী এবং তাহার শিল্পধারা ইতিপূর্ব্বেই এই সমুদ্র-পথ দিয়া ধীরে ধীরে চম্পা কাম্বোজ সুমাত্রা ও জাভায় প্রবেশ লাভ করিতেছিল; ইহার কিছুকাল পরেই দেখি চীন সেই সমুদ্র-পথ অবলম্বন করিয়াই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তার করিতেছে। পশ্চিমে ভারতবর্ষ যেমন বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, পূর্ব্ব জগতে তেমনি অতুলনীয় সাধনা ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারত তাহার জাতীয় জীবনকে ভাবে ও গৌরবে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতেছিল। বিশ্ব-সভ্যতার আদান-প্রদানে সেইজন্যই তাহার ব্যাকেরিয়া (Bakeria), ভারুকচ্ছ, বিদিশা, বৈশালী, তাম্রপর্ণী, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বাণিজ্য-সঙ্গমগুলি, জাতির কথায় গাথায় অবদানে জাতকে চিরকালের জন্ত অমর হইয়া রহিল।

সভ্যতার আদানপ্রদানে জনসাধারণ

বিরাট্ বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তার ও সভ্যতার আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া এই বিশ্বানুভূতি, ইতিহাসের সত্যবস্তু হইয়া ভারতের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে; তাহার পার্শ্বে সমস্ত রাজ্য-বিজয়-গর্ব্ব, নব নব সাম্রাজ্য ও শাসনতন্ত্রের পতন ও অভ্যুদয়ের ঘটনাবহুল ইতিহাস ম্লান হইয়া যায়। জাতির রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কতটুকু দাবী রাখে? সে-জীবনকে গঠিত করে কত নীরব অদৃশ্য ইঙ্গিত, কত অজ্ঞের অমোঘ উপাদান, সহজে যাহার কোনো সার্থকতা আমরা আবিষ্কার করিতে পারি না। কাজেই একদিকে যখন দেখি একই সময়ে ভারতবর্ষে কুষাণ (Kushan) সাম্রাজ্য, ও চীনে হান্ (Han) সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর একদিকে পারস্যে সাসেনীয় (Sassanian) সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, ঠিক তখনই এই তুচ্ছ রাজ্য-ভাঙাগড়ার তলে তলে, বাণিজ্য-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সভ্যতার আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া, জাতিতে জাতিতে ভাবে কর্ম্মে ও প্রেমে মিলনের পন্থা সহজ ও সুগম হইয়া উঠিতেছে এবং সকল রাষ্ট্রীয় বিপদ-আপদকে অতিক্রম করিয়া জাতীয় জীবন বিশ্বানুভূতির বিকাশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তাই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের বুকের উপর যখন বর্ব্বর হূণদল ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তখনই ভারতবর্ষ তাহার

* Erythrean Sea বলিতে গ্রীকনাবিকেরা বর্ত্তমান লোহিত সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত জলভাগকেই বুঝিত।

কুমারজীব ও গুণবর্ম্মণকে সেই সুদূর চীনে পাঠাইতেছে মৈত্রী-ধর্ম্মের প্রচারের জন্য, আর চীন হইতে আসিতেছেন —তীর্থযাত্রীর দল ফাহিয়ান্, চিহ্‌মঙ্, কামোঙ্; ভারতের মূল ধর্ম্ম-উৎসের অমৃত পান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইতেছেন। বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রীর বর্ষা-প্লাবনে দেশ ও জাতির ক্ষুদ্রস্বার্থের সীমারেখা ভাসিয়া ডুবিয়া গেল; সমস্ত সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ আপন বিরাট্ আত্মাকে জানিল; ভারতবর্ষ চাহিল হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের প্রতিবেধকে লঙ্ঘন করিয়া অজানা দেশের অজানা মানব-চিত্তের সৃজনক্ষেত্রে বিহার করিতে। তাই দেখি, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার মুকুটমণি কবি কালিদাস তাঁহার বিরহী যক্ষের "মেঘদূত"কে পাঠাইতেছেন দূরে হিমালয়ের পরপারে বিরহিনী প্রিয়ার সন্ধানে—ইহা কি শুধু কবি-কল্পনার স্বেচ্ছা-বিহার, না ভারতবর্ষের আত্মার যে বিশ্বতোমুখী আকৃতি তাহারই অমৃতময় রূপ।

প্রাচ্য মৈত্রীমণ্ডলের কেন্দ্র ভারতবর্ষ
(খৃষ্টাব্দ ৫০০—১৫০০)

হিমালয়ের পরপারে বিরহিনী প্রিয়ার জন্য কালিদাসের "মেঘদূতে" নির্ব্বাসিত যক্ষের যে-ক্রন্দন—সে ত অজানা সমুদ্রের পরপারে বৃহত্তর ভারতের জন্যই ভারতের ক্রন্দনের প্রতীক। জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিবার জন্যই ভারতবর্ষ দুইবার—একবার অশোকের যুগে আর-একবার কনিষ্কের সময়—তার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া এই বৃহত্তর ভারতের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিল। এইবার তৃতীয় বার ভারতের সাধনা ও সভ্যতা সমগ্র এশিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া নিজের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে বাহির হইল। কালিদাস, বরাহমিহির, গুণবর্ম্মণ, বসুবন্ধু, আর্য্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত, শুধু এই নামগুলির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই এ যুগের ভারতের সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য বুঝিতে পারিবেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকেরা জাতীয় জীবনের এই বিকাশের মূলে কোনো বিশিষ্ট রাজা অথবা রাজবংশের প্রভাব দেখাইতে চাহেন, এবং ভারতবর্ষে গুপ্ত ও বর্দ্ধন নৃপবংশ, এবং চীনে উয়েই (Wei) ও তাং (T'ang) বংশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন—ইহারাই এই অপূর্ব্ব সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের অন্তত্তম নিয়ামক। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় মাটি খুঁড়িয়া যে-সব নিদর্শন মিলিয়াছে তাহাতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার মূলে কোনো বিশেষ রাজার, কোনো প্রসিদ্ধ রাজবংশের একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এই সাধনা ও সভ্যতার অপূর্ব বিরাট বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল সাধারণ মানুষের প্রীতির আদান-প্রদানে; চীন হইতে রেশম এবং ভারতবর্ষ হইতে পুঁথির পথরেখা বাহিয়া আসিয়াছিল এই সভ্যতার নবযুগ। রুস, ফরাসী, ইংরেজ, জার্ম্মান্ ও জাপানী প্রত্নতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় মধ্য এশিয়ায় যে-সমস্ত শিল্প ও শাস্ত্রসম্পদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভাল করিয়া যেদিন তাহার ব্যাখ্যা ও অনুশীলন হইবে সেইদিন আমাদের ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার যথার্থ মূল্যনিরূপণ সম্ভব হইবে; এখন আমরা যাহাকে প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ জাতির ঐতিহাসিক সম্পদ বলিয়া মনে করিতেছি, তখন তাহাকে দেখিব কোন বিশিষ্ট জাতির সম্পদ বলিয়া নয়, সকল জাতি মিলিয়া, সকলের আদান-প্রদানে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে সেই বিশ্বজননী সম্পদরূপে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এই প্রেম ও মৈত্রীর, সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের আদান-প্রদানের স্বল্প পরিচয় মাত্র এখানে দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ ও চীন

ভিক্ষু কুমারজীবের ধর্ম্মদৌত্যের অবসান-কাল পর্য্যন্ত (খৃষ্টাব্দ ৩৪৪-৪১৩) বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় সাধনা মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়াই চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। চীনদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষিত ইউএচি, পার্থিয় বা সোগদিয় পণ্ডিতেরাই লিখিয়াছেন; এ বিষয়ে চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অনেক সময়েই ইঁহাদের সাহায্য লইয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'চন্দ্রগর্ভ' সূত্র এবং 'সূর্য্যগর্ভ' সূত্র প্রভৃতি মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থ এবং 'মহামযূরী' পুঁথি প্রভৃতি পড়িলে মনে হয় যেন ভারত, পারস্য, খোটান, চীন সকলে মিলিয়া সারা এশিয়ার

ভাবসম্পদকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, সকলের চিন্তা ও সাধনা ইহাদের সকলকেই পূর্ণতর করিয়াছে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলেও দেখা যায়, এইসকল গ্রন্থের অনুবাদ সকল সময় সংস্কৃত বা পালি হইতেই করা হয় নাই, বরং বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণের কথিত ভাষা বিভিন্ন প্রাকৃত হইতেই করা হইয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্

ফা-হিয়ানের সঙ্গে সঙ্গেই (খৃষ্টাব্দ ৩৯৯-৪১৪) চীনে ও ভারতবর্ষে গভীর আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ধর্ম্মপদ ও মিলিন্দপন্‌হ'র মত বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত ও পালি হইতে সরাসরি অনূদিত হইতে আরম্ভ হইল। বুদ্ধঘোষের যিনি ছিলেন গুরু, সেই আচার্য্য রেবতীর পাদমূলে বসিয়া পাটলীপুত্র নগরীতে ফা-হিয়ান্ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেইখান হইতে ফা-হিয়ান্ যান সিংহলে; সে-যুগ হইতে ভারতে ও সিংহলে ভাবের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ নিবিড়তর হয়। এ যুগের ভারতবর্ষ যেন সভ্যতার লীলাভূমি; জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া ভারত সকল দিক্ হইতে মানুষকে ডাকিল তাহার আলোকোদ্ভাসিত চন্দ্রাতপতলে; সকল বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া, দুর্গম গোবী মরুভূমি পার হইয়া, পামীর মালভূমি অতিক্রম করিয়া কুমারজীবও ফা-হিয়ানের মত অসংখ্য আলোকোন্মত্ত কত আত্মা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল। তক্ষশিলা ও পুরুষপুরের সমস্ত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি ঘুরিয়া, পাটলীপুত্রে তিন বৎসর ও তাম্রলিপিতে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, সিংহলে ও জাভায় কিছু দিন কাটাইয়া ফা-হিয়ান্ চীনে ফিরিয়া গেলেন।

ধর্ম্মদূত কুমারজীব

বৌদ্ধ ভিক্ষু, কুমারজীবের বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার কারাসহরে (Karashar-Kucha); এক চৈনিক সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করিয়া চীনে লইয়া যায়। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু বন্দী যে-ভাবে চীনকে ইহার প্রতিদান দিয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তিনি চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তত্ত্বের অনুশীলনে নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাজে চীনের সর্ব্বোত্তম পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ও অনূদিত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আজও চীন সাহিত্যের মুকুটমণি এবং তাঁহার "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক" আজও চৈনিক ভাষার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। তাঁহারই প্রতিভা ও একাগ্র সাধনায় উত্তর ও দক্ষিণ চীনের বৌদ্ধধর্ম্মের দুই বিভিন্ন শাখা একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল।

ধ্যান-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধভদ্র

এই সময়েই অন্যতম বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র সমুদ্রপথ দিয়া চীনে আসিয়া পৌঁছিলেন; তাঁহার পবিত্র জীবন, বিশ্বাস ও ভক্তিতে দক্ষিণ-চীনবাসীরা মুগ্ধ হইয়া পড়িল। বুদ্ধভদ্র সেইখানে বসিয়া একান্ত তপস্যায় চীনে ধ্যান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন—চীনের ল্যুসান (Lu-Shan) পর্ব্বতের সুবৃহৎ বিহারের ভিক্ষু, কবি, ও তত্ত্ববিদেরা সকলে মিলিয়া বুদ্ধভদ্রের এই নবপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কুমার গুণবর্ম্মণ, কাশ্মীরের ধর্ম্ম-দূত ও চিত্র-শিল্পী

কুমারজীব ও বুদ্ধভদ্র যখন চীনে ভারতের অপূর্ব্ব সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের প্রচারে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্ম্মণ তখন হেলায় রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া ভিক্ষু বেশে প্রচারে বাহির হইয়া পড়িলেন। ৪০০ শত খৃষ্টাব্দে তিনি সেই ভারতের উত্তরতম প্রান্ত কাশ্মীর হইতে দক্ষিণতম প্রান্ত সিংহলে আসিয়া পদার্পণ করিলেন, পরে সিংহল হইতে আসিলেন জাভায় এবং সেখানে রাজা ও রাজমাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। জাভা হইতে ৪২৮ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করিয়া সমুদ্র-পথে প্রাচীন ক্যাণ্টনে, ও ক্রমশঃ নান্‌কিনে আসিলেন। সর্ব্বত্র তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী ও সুনিপুণ তুলিকার সাহায্যে কারুশিল্পপ্রিয় চীনের সহস্র লোকের চিত্তকে অধিকার করিয়া লইলেন। নান্‌কিনে তাঁহারই উৎসাহে দুইটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং চীনে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই প্রযত্নে ভিক্ষুসংঘ স্থাপিত হইল। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহল হইতে ভিক্ষুসংঘকে অগ্রণী

করিয়া এক ভিক্ষুণীদল চীনে আসিয়া সিংহলী আদর্শে স্থানীয় ভিক্ষুণীগণকে সংঘবদ্ধ করিল। দেখা যাইতেছে, সিংহল ও জাভার ভিতর দিয়া ভারতে ও চীনে এই যুগে অতি নিকট আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং জাপানের পণ্ডিত তাকাকুসু (Takakusu) এ কথাও বলেন যে, ভিক্ষু বুদ্ধঘোষও ভারতবর্ষ হইতে চীনে গিয়াছিলেন, সিংহলে মধ্যপথে কিছুকাল বাস করিয়া। সেইজন্যই দেখি, কাশ্যপমাতঙ্গ, অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু, প্রভৃতি ২৪ জন ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া চীন চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা যে, আমরা কয়েকটি আচার্য্যের নাম জানিতে পারিতেছি—আরও কতজন যে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছেন তার খবর কে রাখে? পণ্ডিতবর শাভান (Chavannes) এবং সিল্‌ভ্যাঁ লেভি'র (Sylvan Levi) কৃপায় আমরা এই অজ্ঞাত বিস্মৃত কয়েকটি মহাপুরুষদের নাম জানিয়াছি—ইঁহাদের-মধ্যে চিহ্-মোঙ ও কা-মোঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন চীন হইতে; সংঘসেন ও গুণবৃদ্ধি ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিলেন চীনে।

মৌনী প্রচারক বোধিধর্ম্ম

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দেখি, ভারতে ও চীনে জলপথে আর-এক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে মালয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া; বোধিধর্ম্ম এই অভিযানের অগ্রণী। ৫২০ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ চীনে, বুদ্ধভদ্র যেখানে নীরব প্রেম ও সাধনায় সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাভিষিক্ত হৃদয়ে সেইখানে আসিয়া বোধিধর্ম্ম ও সুদীর্ঘ নয় বৎসর মৌন নির্ব্বাক্ সাধনা ও তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সুদীর্ঘ নয় বৎসর নির্ব্বাক্, তথাপি এই ভাষাহীন প্রচারের বলে কি অপূর্ব্ব প্রভাবই তিনি চীনবাসীর উপর বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন! তাঁহার সাধনার অপূর্ব্ব প্রভাবে চীন ও জাপান এক মিলন-সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছিল।

যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, পরমার্থ

বোধিধর্ম্মের পর চীনে মিলনের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বসুবন্ধুর চরিতলেখক পণ্ডিত পরমার্থ। ৫০০ খৃষ্টাব্দে পরমার্থ পৌঁছিলেন চীনে এবং তার আট বৎসর পরে মহৎ সম্মানে তিনি নান্‌কিনে আমন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধিত হইলেন। তিনি শুধু অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর গ্রন্থাবলী অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; হিউয়েন্‌থ্‌সাঙের পূর্ব্বে যোগাচার তত্ত্ব ও সম্প্রদায়কে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চীনে পরিচিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন।

চীন-ভারত-মৈত্রীর স্বর্ণযুগ

তাঙ্ বংশীয় রাজাদের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় (৬১৭-৯১০ খৃষ্টাব্দ) উত্তর ও দক্ষিণ চীন সম্মিলিত হইল এবং মধ্য এশিয়ায় আবার চীনের প্রভুত্ব প্রসারিত হইল। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই চীন ও ভারতের মৈত্রীবন্ধনে এশিয়ায় শিল্প, সাহিত্য ও তত্ত্ববিদ্যার এক গৌরবময় যুগের সূচনা হইল। হিউয়েন্‌থ্ সাঙ ও ইৎসিঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি পড়িয়া দেখিলেই বুঝা যায়, এই যুগে ভারতবর্ষই এশিয়ার সাধনা ও বৈদগ্ধ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে নানা দিক্ হইতে ভারতীয় সাধকমণ্ডলীর উপর আক্রমণের চেষ্টা যে হয় নাই, এমন নয়, কিন্তু চৈনিক সাধনা ও সভ্যতার বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও চিন্তার ধারা এমনই সুপরিস্ফুট হইয়া আছে যে, তাহা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ আজও চীন-ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য রত্ন; বৌদ্ধ তত্ত্ব ও ধর্ম্ম কেমন করিয়া মধ্য এশিয়ার বুকে হেলেনীয়, ইরাণীয়, খৃষ্টীয় ও মেনিকির চিন্তা ও সভ্যতার ধারাকে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহার প্রচুর প্রমাণ নবাবিষ্কৃত মধ্য এশিয়ার চিত্র ও তক্ষণ শিল্পে বর্ত্তমান। ভারতের শিল্পরূপ রীতি ও ভঙ্গিমা, ভারতের আদর্শ, চিন্তা, সাহিত্য, কল্পনা—ভারতবর্ষ হইতে যাহা আসিল তাহাই কল্যাণকর, তাহাই গ্রহণীয়, ইহাই ছিল চীনের মনোভাব। চীনের তোয়েন্-হোয়াঙের চিত্রাবলীতে তাই দেখিতে পাই চীন ও ভারতের শিল্পরূপের অপূর্ব্ব রাখিবন্ধন। এই দুই সভ্যতার শিল্পবিকাশধারাই পরে জাপানে প্রবেশ করিল। তাই দুর্গম মরুভূমির বুকে যে শিল্পভাণ্ডার সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও লোকলোচনের

গোচরীভূত হইল তাহাতে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের এক নূতন কক্ষ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। চীনের প্রান্তদেশ হইতে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত এশিয়ার বুকের উপর দিয়া যে বিরাট্ চলাচলের পথ, তাহারই কেন্দ্র-বিন্দুটিকে জুড়িয়া রহিয়াছে তোয়েন্-হোয়াঙের বিস্তৃত গুহামন্দির—তাহারই পাশ দিয়া ভারত ও তিব্বত হইতে মঙ্গোলিয়া যাইবার পথটি চলিয়া গিয়াছে; চারিদিক হইতে চারিটি পান্থসরণী, এমনি করিয়াই তোয়েন্-হোয়াঙের তীর্থসঙ্গমে আসিয়া মিলিয়াছে। এইজন্যই তাং যুগের বৌদ্ধ চিত্রাবলীর অনুশীলন করিয়া রাফেল পেট্রুচ্চি ও লরেন্স বিনিয়নের মতো পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—"পৃথিবীর শিল্পসাধনার ইতিহাসে তাংযুগের শিল্পবিকাশ এক অপূর্ব্ব অধ্যায়!"

ভারতবর্ষ ও কোরিয়া

চীন হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনা ধীরে ধীরে কোরিয়ায় প্রবেশ লাভ করিল। ৩৭৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর চীনের দুই আচার্য্য, আ-তাও ও শুন্-তাও কোরিয়ার রাজধানীতে আমন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধিত হইলেন। তাহার দশ বৎসর পরে, বহু ভারতীয় ও চৈনিক ভিক্ষু এবং মতনন্দ (?) নামে জনৈক আচার্য্য (ভারতীয় অনুমান করা যাইতে পারে) মধ্য-কোরিয়ার রাজসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার দক্ষিণ কোরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল এবং "কৃষ্ণ-বিদেশী" (Black Foreigner) নামক জনৈক তাপস "ত্রিরত্ন" প্রচার করিলেন।

কোরিয়ার ইতিহাসে পাই, ৫৪০-৫৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহার এক রাজা ও রাণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় ৫৫১ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াতে এক বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সৃষ্টি হইল, কোরিয়ার এক পুরোহিত হইলেন তাহার প্রধান ধর্ম্মযাজক। সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাধনা অপূর্ব্ব কল্যাণে ও গরিমায় আপন প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়াছিল। কোরিয়াতে আজও তাই বৌদ্ধপ্রত্নতত্ত্বের বিরাট্ ক্ষেত্র অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া আছে; হয়ত একদিন কোরিয়া, চীন ও জাপানের প্রত্নতাত্ত্বিক ও পণ্ডিত-বর্গের সমবেত চেষ্টায় কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

ভারতবর্ষ ও জাপান

ক্ষুদ্র নগণ্য দেশ কোরিয়া, কিন্তু এই কোরিয়াই জাপানকে চীন-ভারত-মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগেই জাপানে চীনের শিক্ষা ও সাধনা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াই সর্ব্বপ্রথম সুবর্ণ-মণ্ডিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি, কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ, কতক-গুলি সুদৃশ্য ও চিত্রিত পতাকা জাপানের রাজসভায় প্রেরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। সেই সঙ্গেই কোরিয়া জাপানকে যে-বাণী প্রেরণ করিয়াছিল তাহাও সত্যে স্থির এবং সারল্যে স্নিগ্ধ—'বুদ্ধধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই ধর্ম্মে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহার জীবন প্রেমে ও কল্যাণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে * * * ভারতবর্ষ হইতে কোরিয়া পর্য্যন্ত সকল দেশ এই ধর্ম্মকে গ্রহণ ও বরণ করিয়াছে।"

জাপানের সংরক্ষীদল এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং তাহারা যতই প্রবল হইতে লাগিল, নবীন-পন্থী জাপান ততই প্রবল হইয়া সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বিরোধীদলের পতনের সঙ্গে-সঙ্গে কুমার উমরদু শতকু (৬৯৩-৬২২ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ধর্ম্মকে রাষ্ট্র-ধর্ম্ম রূপে গ্রহণ ও প্রচার করিলেন; জাপানে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আয়ুর্ব্বেদ শিখাইবার জন্য কোরিয়া হইতে আচার্য্য আনয়ন করিলেন ও জাপানের বিদ্যার্থীদিগকে চীনে পাঠাইলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ, কারুশিল্পী ও চিকিৎসকেরা আসিলেন সাধনা ও সভ্যতার পতাকা বহন করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল আরোগ্যশালা, অতিথিভবন, বিদ্যামন্দির, দেখা দিল বিরাট চিত্রশালা, সুনিপুণ তক্ষণশিল্পী ও শক্তিমান স্থপতি। শুধু ভারত হইতেই নয়—চীন হইতে গেলেন ভিক্ষু কান্‌জিন

আরোগ্যশালা ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করিতে। এদিকে আবার ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আচার্য্য বোধিসেন তাঁহার চম্পা ও চীনের শিষ্যবর্গ লইয়া আসিলেন জাপানে। ইঁহারা অনেকেই ছিলেন শিল্পী ও গায়ক এবং ইঁহাদিগকে লইয়াই বোধিসেন ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এবং গান্ধার-রীতির অনেক প্রস্তর-চিত্র আজও জাপানের চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। এই ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা কখনও বাহুবলে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াস করেন নাই—নিজেদের দানে জাতীয় শিল্পসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াই তাঁহারা আপন আধিপত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

সমগ্র অষ্টম শতাব্দী জুড়িয়া আছে জাপানে নারা যুগের গৌরব (৭০৮—৭৯৪ খৃষ্টাব্দ)। জাপানের ইতিহাসে নারা-যুগ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির যুগ। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনা রাজধানী ছাপাইয়া সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল, সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সমগ্র দেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। এই যুগেই জাপানের চিত্র ও দারু-শিল্পের গৌরবময় সৃষ্টি ও বিকাশ আরম্ভ হইল এবং চীনের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার নব নব পথ খুলিয়া গেল। শুভকর সিংহ ও অমোঘবজ্রের "মন্ত্র"- সম্প্রদায় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জাপানে প্রবেশ লাভ করিল এবং ভারতবর্ষে ও চীনে যে-সমস্ত তত্ত্ব ও সম্প্রদায় ধীরে ধীরে লয় পাইয়া আসিতেছিল, অসঙ্গের সেই "ধর্ম্মলক্ষণ" প্রভৃতি তত্ত্ব জাপানের তত্ত্ববিদ্যার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। জাপানের জাতীয় জীবনে যাহা কিছু সুপ্ত হইয়া ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনার কল্যাণ-বারিসিঞ্চনে তাহাই নূতন শক্তিতে জাগিয়া উঠিল। এম্‌নি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম রাষ্ট্রধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবার দুই শত বৎসরের মধ্যেই জাপান ধর্ম্মের ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিল এবং জাপান নিজেই বিভিন্ন মতবাদ, বিচিত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে লাগিল—এশিয়ার দিকে আর তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হইল না। জাপানী বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সাইচো (Saicho) ও কবো (Kobo) সেই ধর্ম্মের অগ্রদূত হইলেন; সাইচো তেণ্ডই-সু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সত্যদ্রষ্টা বুদ্ধকেই প্রেম ও কল্যাণের সর্ব্বোত্তম বিকাশ এবং বুদ্ধত্ব লাভ করাই ব্যক্তিজীবনের সকল জ্ঞান, ভক্তি ও রহস্যের একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া প্রচার করিলেন। কবো শিঙন-সু বলিয়া আর-এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং "এই সমগ্র বিশ্ব ভগবান্ বুদ্ধেরই বহির্বিকাশ, তিনি সকলের অন্তরেই বিরাজমান; আমরা যদি 'কায়েন মনসা বাচা' জীবনের নিগূঢ় রহস্যের অনুশীলন করি তবেই আমরা সেই বুদ্ধকে জানিতে পারি"—এই বার্ত্তার প্রচার করিলেন।

এই দুই সম্প্রদায় জাপানের উন্নতিশীল সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অন্ধসংস্কারপীড়িত জনসাধারণও চুপ করিয়া ছিল না—তাহারাও আপনাপন সম্প্রদায় উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠায় নিজদের চিন্তা ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপানের উপর দিয়া অন্ত-বিপ্লবের কালবৈশাখীর ঝড় বহিয়া গেল এবং সমগ্র জাপানের ধর্ম্মবুদ্ধিকে ধ্বংস-ভ্রংশ করিয়া দিল। যে-তত্ত্বচিন্তা ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, জাপান তাহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিল এবং ধর্ম্মের ভাবোন্মাদনাকেই বড় বলিয়া জানিল। সেই হেতুই দেখি, হোরেন্ জাপানে ধর্ম্মবীর হইয়া দেখা দিলেন (১১৩৩-১২১২ খৃষ্টাব্দ) এবং সমস্ত তত্ত্বচিন্তা ও রহস্য-সাধনাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া "সুখাবতী" বলিয়া এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে প্রাণী, যত জ্ঞানী বা অজ্ঞান হউক সে, যত উচ্চ বা নীচ হউক, মুক্তি সে পাইবেই, যদি অমিতাভের অসীম করুণায় তাহার বিশ্বাস থাকে—'সুখাবতী'-তত্ত্বের ইহাই মর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের সেই সুপ্রাচীন শিন্তো ধর্ম্মও পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল এবং চিকুফুসা'র (১৩৩৯ খৃঃ অঃ) মত মনীষীরাও শিন্তোধর্ম্মের বিভিন্ন দেবতাকে বুদ্ধেরই অবতার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

এদিকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই চীন হইতে বুদ্ধভদ্র ও বোধিধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত সেই ধ্যান-তত্ত্ব ও সম্প্রদায় জাপানে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাহারই মধ্যে আপনাদের মনোমত ধর্ম্মমত খুঁজিয়া পাইল। এম্‌নি করিয়াই, এক দিকে ভারতবর্ষ যখন তাহার সংকীর্ণ গৃহ-সমস্যায় আপনি জড়াইয়া পড়িয়াছে, নিজের সেই বৃহত্তর বিস্তারের কথা, কোরিয়ায় জাপানে তাহার আদর্শ প্রচারের কথা ভুলিতে বসিয়াছে, তখন জাপান তাহার মন্দিরে মন্দিরে অতি সমারোহে বুদ্ধ অমিতাভের পূজা জুড়িয়া দিয়াছে এবং

ভারতীয় আচার্য্য পিখোল-ভরদ্বাজের মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে ধর্ম্মপাত্র ভরিয়া তুলিতেছে।

ভারত ও তিব্বত

তিব্বতও অধিককাল পর্য্যন্ত আপনাকে ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতা হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিতে পারিল না এবং যেদিন তিব্বত বাহিরের আলোকে আসিয়া দাঁড়াইল সেদিন একদিকে চীন, আর একদিকে ভারত, এই দুয়ের সঙ্গেই মিলনসূত্রে বাঁধা পড়িয়া গেল। তার রাজা স্রং-বট্সান্-গম্পো (৬৩০-৬৯৪ খৃঃ) নেপাল তথা ভারতবর্ষ হইতে একটি এবং চীন হইতে একটি—এই দুইটি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। নেপালের রাজকন্যা তিব্বতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তারামূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন এবং চীন রাজকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তাহার কয়েকটি আচার্য্য। গম্পো শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাঁহার মন্ত্রী থুম্মি সম্ভোটকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন বিদ্যাঅর্জ্জনের জন্য; এই থুম্মিই ক্রমে দেবনাগরী লিপিকে রূপান্তরিত করিয়া বর্ত্তমান তিব্বতী বর্ণমালার সৃষ্টি করিলেন। গম্পোর পরে খ্রি-সস্রং-দি-বল্সান (৭৪০-৭৮৬ খৃঃ) ভারতবর্ষ হইতে অনেক পণ্ডিতকে তিব্বতে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় তিব্বতের আপন ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ভারতীয় পণ্ডিত পদ্মসম্ভব ও তাঁহার শিষ্য পাণ্ডর-বৈরোচনের নাম তিব্বতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে অনুবাদ তিব্বতের ভাষা ও সাহিত্যকে চিরকালের জন্য সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশ হইতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে গিয়া সেখানের চিন্তা ও ধর্ম্মের সংস্কারে নবযুগ আনিলেন।

কিন্তু চীন জাপান যেমন করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বের নূতন নূতন মতবাদের উদ্ভব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল, তিব্বত তাহা পারে নাই। তাহাদের কাঙ্জুর ও টাঙ্জুর প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্ম ও যাদু বিদ্যা, জড়বিদ্যা ও আজগুবী গল্পের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষের মত অভিধান, মেঘদূতের মত কাব্য, চন্দ্রগোমিনের রচিত ব্যাকরণ, চিত্রলক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহারা মাঝে মাঝে অনুবাদ করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিকৃত ও বিদুষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত তাহারই মধ্যে তিব্বতীরা আপন স্বধর্ম খুঁজিয়া পাইয়াছিল—এমনি করিয়াই বজ্রযান ও কালচক্রযানের সৃষ্টি হইল এবং তাহাই ক্রমে লামাধর্ম্মে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। সেইজন্যই দেখি, তিব্বতে বুদ্ধ অপেক্ষা alchemist নাগার্জ্জুনের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশী। এমনি করিয়াই তিব্বতের পার্ব্বত্য যাদুবিদ্যা, ঝাড়ফুঁকমন্ত্র ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গেল। পণ্ডিত ওয়াডেল্ বহুদিন তিব্বতীদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন—তাঁহার অভিজ্ঞতা তিনি তিব্বতের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন—

"তিব্বতীদের যাহা কিছু সভ্যতা, যাহা কিছু তাহাদিগকে মানব-সমাজে উন্নত করিয়াছে তাহা এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধনার কৃপায়। তাহাদের মধ্যে পশুহত্যার ও রক্তপাতের প্রচলন বন্ধ করিয়া, তাহাদের বিকৃত 'ভুতুড়ে' ধর্ম্মকে সংস্কৃত করিয়া, সর্ব্বজীবে দয়া ও প্রেমের প্রচার করিয়া এই বৌদ্ধধর্ম্মই তাহাদিগকে বর্ব্বরতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে।"

ভারতবর্ষ ও তুর্কো-মঙ্গোলীয় জনসংঘ

মোঙ্গল সেনাপতি চেঙ্গিজ্ খাঁ ও কুবলাই খাঁ কর্ত্তৃক চীন ও মধ্য এশিয়া বিজয়ের পর, লামা ফাগ্স্পা (Phagspa) তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মকে লইয়া সর্ব্বত্র একটা দেবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফাগ্স্পা ছিলেন কুবলাই খাঁ'র তিব্বতীয় রাষ্ট্রবন্ধু। এই তিব্বতের ভিতর দিয়া ভারত ও নেপালের শিল্প ও কারুবিদ্যা চীনে, মধ্য এশিয়ায় ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত মঙ্গোলীয় সম্রাটদের রাজসভায় বহু আদর ও সম্মান লাভ করিল। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে ফাগ্স্পা'র মৃত্যু হইলে পর লামা ধর্ম্মপাল তাহার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইঁহাদের সকলের উৎসাহ ও পোষকতায় তিব্বত, মোঙ্গল, তুঙ্গুজ ও ওইগুর (Tunguse and Ouigur Turks) তুর্কীরা সকলে এক ধর্ম্মবন্ধনে গ্রথিত হইয়া ভারতের মৈত্রী-পরিবারের পরিধি সুদূর সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া

কোরিয়া জাপান, চীন তিব্বত ছাড়িয়া দিয়া যদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পানে তাকাই, তাহা হইলে প্রথমেই চোখে পড়ে ব্রহ্মদেশ। তার পরেই শ্যাম, কাম্বোজ,

চম্পা; ক্রমে সুমাত্রা, জাভা, মাদুরা, বালি, লম্বক, বোর্ণিয়ো এবং অন্যান্য দ্বীপ এবং সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান পলিনেশীয়া। এই সমস্ত দিক্‌টির ইতিহাস সেদিনও বিস্মৃতির আড়ালে লুক্কায়িত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি করাসী ও ডাচ্ পণ্ডিতদের চেষ্টায় এই বিস্মৃত ও অজ্ঞাত ইতিহাসের এক বিরাট্ অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই আরো নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে এবং একথা অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতা অপ্রতিহত ধারায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই ভূখণ্ডগুলিকে পরিপ্লাবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে।

হিন্দু সভ্যতা বিস্তারের ক্রম

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার বয়স খুব বেশী নয়, সেই-হেতু খুব প্রাচীন কালেই যে এদেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু কোন বিশিষ্ট রাজার দিগ্বিজয়-গাথা শিলালেখতে বা তাম্রশাসনে লিখিত হইবার বহু পূর্ব্বে, কোন বিশেষ শিল্পীকুলের বিরাট স্থাপত্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে এক দেশ ও জাতি শুধু অজানাকে জানিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষার বশে অন্য দেশ ও জাতিকে আবিষ্কার করে এবং তাহার সঙ্গে রাষ্ট্রবন্ধন, বাণিজ্যবন্ধন অথবা ধর্ম্মবন্ধনে মিলিত হয়—অথচ তাহার কোন চিরস্থায়ী ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকিতে না পারে। কাজেই ইহা অসম্ভব নয় যে, ভারতীয় শিল্পী ও আচার্য্যেরা স্থলপথে একদিকে যখন মধ্য এশিয়া ও চীনে প্রবেশ করিয়াছিল ঠিক তখনই তাহারা জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ভূখণ্ডগুলিতে আসিয়া আপন সভ্যতা, ধর্ম্ম ও শিল্পের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিল।

আমরা টলেমির (Ptolemy) ভূগোলে (১৫০ খৃঃ) দেখিতেছি, তিনি জাভা পর্য্যন্ত এদিকের সমস্ত স্থানগুলিরই নাম করিতেছেন; সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে তাহার সাধনা ও সভ্যতা বহন করিয়া অনেকেই এদিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চম্পায় যে প্রাচীনতম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী এবং তাহাতে ভারতবর্ষের প্রভাব (বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দুইই) অতি সুপরিস্ফুট। অধ্যাপক পেলিয়ো (Pelliot) মনে করেন, ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব এশিয়ায় আসিতে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া যে সুপ্রাচীন পথ তাহা তো ছিলই; তাহা ছাড়া প্রাচীনকালে আরো দুইটি পথ ছিল—একটি ছিল আসাম, ব্রহ্মদেশ, চীনের ভিতর দিয়া স্থলপথ; আর একটা ছিল ইন্দোচীনের সমুদ্রতীর বাহিয়া জলপথ। পেলিয়ো এই প্রমাণও পাইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই চীন-সাহিত্যে কাম্বোজের প্রাচীন নাম "ফুনানের" (Funan) উল্লেখ আছে। কাজেই আমরা যদি একথা বলি যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদিকে বৃহত্তর ভারতের সূচনা হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহাকে শুধু অনুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় ইহাই বৃহত্তর ভারতের প্রথম অধ্যায়।

ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পঞ্চম শতাব্দীর যুগ এক সুবর্ণযুগ—ধনে, জনে, জ্ঞানে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই যুগের হিন্দুধর্ম্ম ও সাধনা কাম্বোজ ও চম্পাকে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করিল; মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, লাওস, বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভায় সর্ব্বত্র হিন্দু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পাশাপাশি লালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৃহত্তর ভারতের এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ইতিহাস আজও অজ্ঞাত ও অলিখিত।

সিংহল ও ব্রহ্মদেশ

ভাষার দিক হইতে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে তিব্বতের সম্বন্ধ নিকটতর, কিন্তু ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদানের দিক হইতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের অতি নিকট আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের ধর্ম্মাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার কথা ঐতিহাসিক সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু ৪৫০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধঘোষ যে সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গিয়া হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এ কথার সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা ছাড়া চীন পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় সাধনার প্রচারে বুদ্ধঘোষই একমাত্র অগ্রণী ছিলেন না। তাঁহার আগেও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-

ধর্ম প্রচারকেরা ব্রহ্মদেশে আপনাপন ভাব ও সাধনার প্রচার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর যে সমস্ত প্যু (Pyu) শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ভাষাতত্ত্ব হইতেও একথা প্রমাণিত হয়। কাজেই মনে হয় পূর্ব্ব বাংলা ও আসামের ভিতর দিয়াই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ সিংহলেরই মত ভারতের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ।

চম্পা, কাম্বোজ, শ্যাম ও লাওস্

চম্পা ও কাম্বোজে হিন্দু উপনিবেশের পরিচয় অল্প কথায় দেওয়া যায় না। ভারত ইতিহাসের সে এক বিস্তৃত অধ্যায়। সে অতীত ইতিহাসের যতই অনুশীলন হইতেছে ততই নব নব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে; এবং তার রহস্যময় ইতিহাস সকলকে বিস্ময়ে ও পুলকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। ইহার আভাস ভবিষ্যতে পৃথক্‌ভাবে দিবার ইচ্ছা রহিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্যামদেশও ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করিল। কাম্বোজ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যামে আসিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল এবং কাম্বোজের মতই হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মকে বরাবর মানিয়া চলিল। চম্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর সিংহলী বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত কাবার্তো বলেন, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চম্পা ও কাম্বোজ এবং যোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ-আগমন পর্য্যন্ত শ্যামদেশ ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার প্রভাবেই আপনার জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে প্রশান্ত মহাসাগর

মং-খ্‌মের (Mon-khmer) ও মালয়-পলিনেশীয় জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়—হয়ত আর্য্য এমন-কি দ্রাবিড় আগমনের পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কিন্তু এই অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই যে ভারত মহাসমুদ্রের এক প্রান্তে মালয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আর-এক প্রান্তে মাদাগাস্কার এবং আফ্রিকার অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

এই সুবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রের বাণিজ্যপথে সিংহল ছিল অন্যতম বিশ্রামস্থল। একথা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় নাবিকেরাই বাণিজ্য-ব্যাপারে বাহির হইয়া ভারত মহাসমুদ্রের এই দ্বীপপুঞ্জগুলির প্রথম সন্ধান লাভ করিয়াছিল। ফা-হিয়ান্ ও গুণবর্ম্মণ শত শত বর্ষ পরে সেই পুরাতন বাণিজ্য-পথ ধরিয়াই সিংহল ও জাভায় গিয়াছিলেন। মালয় উপদ্বীপ ছিল ভারত হইতে পূর্ব্ব এশিয়ায় যাইবার পথে সমস্ত বণিক্ ও বিদেশ-যাত্রীর মিলন-কেন্দ্র। সুমাত্রার জনসাধারণ মালয় উপদ্বীপের ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ব্বরতা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল এবং পরে ভারতবর্ষের চিন্তা ও সাধনাকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মালয় উপদ্বীপের সর্ব্বপ্রাচীন ভাষার অনেক শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত; তাহাদের পুরাণের প্রধান প্রধান দেবদেবী হিন্দু; তাহাদের সৃষ্টিতত্ত্বও হিন্দুরই সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology)। শুধু কারু (craft) ও মণ্ডন-শিল্পের (decorative art) ক্ষেত্রেই ইহারা কতকটা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছিল। এশিয়ার শিল্প-ইতিহাসে জাভার এবং কাম্বোজের স্থাপত্য ও মণ্ডন-শিল্প চিরকাল একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

সুমাত্রার "শ্রীবিজয়" রাজ্য

৬৭১ খৃষ্টাব্দে একবার এবং ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার চীন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎসিঙ্ ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও অনুবাদ করিবার জন্য সুমাত্রায় আসিয়াছিলেন; সুমাত্রা তখন "শ্রীবিজয়"-রাজ্য নামে পরিচিত। এক হাজার ভিক্ষু-আচার্য্য সুমাত্রার বিদ্যাবিহারগুলিতে থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং হিউয়েন্ সাঙের সুমাত্রা গমনের পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহাস্থবির ধর্ম্মপাল ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার অনুশীলনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সুমাত্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইৎসিঙের সময় হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুমাত্রার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখিতেছি, সম্রাট্ আদিত্যবর্ম্মণের সময় সুমাত্রায় অবলোকিতেশ্বরের তান্ত্রিক অবতার জীন

আমোঘপাশের মূর্তি নির্মিত হইতেছে এবং পাদাঙ্ চণ্ডীর মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে—সেই মন্দিরেরই একটি শিলালেখ অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তর সুমাত্রা মুসলমানদের অধিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং হিন্দু সভ্যতা ও সাধনা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

জাভা, মাদুরা, বালি, লম্বক ও বোর্ণিয়ো

খুব প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যে জাভার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে সুবর্ণগ্রন্থ বলিয়া জাভা ও সুবর্ণদ্বীপের (বোধ হয় সুমাত্রা) বিবরণ আছে। বোর্ণিয়ো দ্বীপে শৈব ও বৈষ্ণব মূর্তি কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে এবং রাজা মূলবর্ম্মণের "যূপশিলা লেখ" হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈদিক যাগযজ্ঞাদিও সেখানে অনুষ্ঠিত হইত। সুমাত্রার মত জাভাতেও মূলসর্বাস্তিবাদিদের বিরাট্ প্রতিষ্ঠান ছিল। জাভার ধর্মগ্রন্থের ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং শিল্পে ও সাহিত্যে জাভা ভারতবর্ষকে অনেকটা অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলিত বলিয়া সেক্ষেত্রে কাম্বোজের মত জাভা এমন কিছু দান করিতে পারে নাই যাহা জাভার নিজস্ব। অষ্টম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম জাভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই, সুমাত্রার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের শৈলেন্দ্রবংশের এক রাজা অব-লোকিতেশ্বরের শক্তি আর্য্য-তারার এক মূর্তি ও চণ্ডী কলসনের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পণ্ডিতপ্রবর কার্ণ (Kern) বলেন, জাভার এই তান্ত্রিক মহাযান ধর্ম আসিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গ হইতে। নবম শতাব্দীতে জাভার যে-সব মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহাও এই মহাযান ধর্ম-প্রতিষ্ঠানেরই অংশ। কিন্তু তার পরে জাভার তক্ষণ ও স্থাপত্য শিল্প প্রধানত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি প্রভৃতির প্রভাব শিল্পে প্রকট হইতেছে।

নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে যে সাধনা ও সভ্যতার স্রোত পূর্ব্ব সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা গিয়াছিল দক্ষিণ ভারত হইতে। এই সাধনা ও সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্য। ইহা শৈলেন্দ্ররাজ বংশের কীর্তিতে গৌরবান্বিত। এই শ্রীবিজয় রাজ্যের আধিপত্য জাভায় এমন-কি দক্ষিণ ভারতেও কোথাও কোথাও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্প্রতি নালন্দায় আবিষ্কৃত দেবপালের এক তাম্রশাসনে শ্রীবিজয় রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভাব ও ধর্ম্ম, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের আদর্শে ওতঃপ্রোত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শৈলেন্দ্র-শাসিত জাভা এইসময় তার বিরাট বরোবুদোরের(Boroboudur) মন্দির গড়িয়া তুলিল। এই নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ধর্ম্মই জাভার নিজ ধর্ম্ম-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার মৈত্রীবন্ধন

প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও জাভা মাদুরা বালি লম্বকে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিল। বোর্ণিয়ো দশম, দ্বাদশ ও একাদশ শতাব্দীতে যখন ইন্দোনেশী শিল্পের চরম বিকাশ-লাভ ঘটিয়াছিল তখনই জাভায় প্রাম্বানাম, পানাতরনের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির বিরাট হিন্দু মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহার প্রাচীর-গাত্রে রামায়ণের ও কৃষ্ণায়ণের বিচিত্র ঘটনাবলী মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কাম্বোজে আঙ্কোরথোমের শৈব মন্দির, বাপুয়নের বৈষ্ণব দেউল এবং কাম্বোজ-রাজ পরমবিষ্ণুলোকের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত, মহাভারত-পুরাণাদির প্রস্তর-চিত্রে পরিশোভিত, আঙ্কোর ভাটের বিরাট বিষ্ণুমন্দিরও এই যুগেই সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পণ্ডিত কাবাতো বলেন, 'এই সব মন্দির দেখিয়া মনে হয় কাম্বোজে এমন একটা ভাব ও সাধনার বিকাশ হইয়াছিল যাহা জ্ঞান ও চিন্তা বিমুখ খ্মেরজাতির নিজস্ব সম্পদ বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না; তাহা শুধু হিন্দু বুদ্ধি ও প্রতিভা দ্বারাই সম্ভব।' যাহা হউক দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আনাম ও শ্যাম জাতির আক্রমণের ফলে এই হিন্দু সাধনা ও সভ্যতার প্রভাব ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল এবং তার কিছু পরে ইসলাম অভিযান কালবৈশাখীর মত এই হিন্দু উপনিবেশগুলি হইতে হিন্দুত্বের চিহ্ন উড়াইয়া দিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মালয়-পোলিনেশীয় ভূ-খণ্ড

মধ্য এশিয়া, চীন ও জাপানে ভারতবর্ষ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল শান্তি প্রেম ও কল্যাণের পথে সাধনা ও সভ্যতার শুভ্র পতাকা বাহিয়া; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব শুধু ঐ পথেই বিস্তারিত হয় নাই, মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধ-অভিযানের সাহায্যও

লইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও সৈন্য চালনা যুদ্ধজয় ও রাজ্য-শাসনই কখনও একান্ত হইয়া দেখা দেয় নাই; রাজ্যবিজয় ও যুদ্ধ-অভিযানের কথা সে দেশের জনসাধারণ সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল; মনে করিয়া রাখিয়াছিল শুধু, ভাবসৃষ্টি ও সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের অপূর্ব্ব দান। সেই জন্যই দেখি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রাচীন ভাষায় সংস্কৃত যে সব শব্দ পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প ও জ্ঞান বিষয়ক; পণ্ডিত স্কিট্ (Skeat) ইহা ভাল করিয়াই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত ক্রুইজৎ (Kruijt) দেখাইয়াছেন মালয়-পলিনেশীয় ভাষায় ভগবানের যত নাম সমস্তই সংস্কৃত দেবতা শব্দ হইতেই গৃহীত: সিয়াউদের মধ্যে (Siau) দেবতাকে বলা হয় "দুয়ত"; ম্যাকাশর ও বুগিনিজেরা বলে "দেউয়তা"; বোর্ণিও'র দয়কেরা (Dayaks) বলে "ববতা" অথবা "যতা"; ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা বলে "দিবতা", "দবতা" অথবা "দিউয়তা"। এই রকম ভটার, বটরগুরু প্রভৃতি আরো অনেক শব্দ দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি পলিনেশীয় গাথা ও পুরাণে ভারতীয় প্রভাবের যে প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বস্তুতই আশ্চর্য্য হইতে হয়। পণ্ডিতবর কীন (Keane) এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'মাঝে মাঝে মনে হয় এই সব মালয়-পলিনেশীয় কবিদের আত্মা যেন এক অদ্বিতীয় মহান্ত পুরুষের সত্তাকে অনুভব করিয়া অসীম ঊর্দ্ধে অনন্ত লোকে বিহার করিতেছে। হিন্দুর যাহা শাশ্বত ব্রহ্ম, পলিনেশীয়দের তাহাই তাঙ্-আরোয়া—যাহা ছিল, যাহা আছে এবং যাহা চিরদিন থাকিবে; যাহার বাস ছিল সে বিরাট শূন্য-ভূতের মধ্যে, যখন না ছিল আকাশ, না ছিল জগৎ, না ছিল জল, না ছিল মানুষ'। * * * * বেদের মধ্যে সেই অসীমের সন্ধানেরই যেন ইহা প্রতিধ্বনি, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ হইতে দ্বীপে মন্ত্রিত মুখরিত হইয়া ফিরিতেছে! স্বভাবতই প্রশ্ন হয় বৈদিক ভারতের সঙ্গে ইহাদের কোনোকালে যোগ হইয়া ছিল কি? যদি হইয়া থাকে তবে কখন কোন সময় এই সম্বন্ধের সূচনা?'—

সেবা ও মৈত্রী বৃহত্তর ভারতের মূল মন্ত্র

প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে পলিনেশীয়-বেদের এই সুগম্ভীর মন্ত্রবাণী শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন ভারতের এই বিশ্ববিহারের মর্ম্মকথাটি ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে; মনে হয় যেন তাহারই মধ্যে বৃহত্তর ভারতের, এই বিশ্বানুভূতির গোপন মন্ত্রবাণীটি ধ্বনিত মন্ত্রিত হইতেছে। ভারতবর্ষের কোনো কোনো সম্রাট মাঝে মাঝে যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংগ্রামকেই রাজধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন একথা সত্য, কিন্তু দেশ ও জাতি হিসাবে সমগ্র ভারত তার ইতিহাসে সাধারণত শান্তি ও কল্যাণের পথকেই সত্য পথ বলিয়া জানিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। ভারতবর্ষ যে সকল দেশ ও জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করিয়া চলিতে শিখিয়াছিল—নিজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই অপরকে দান করিয়া অপরের কল্যাণবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে সে জানিয়াছিল। যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর তাহারই সঙ্গে ভারতবর্ষ আপন ভাগ্যকে জুড়িয়া দিয়াছিল—জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষের এই সাধনা একটি অমূল্য তথ্য। তাহার ইতিহাসের ক্ষুব্ধচঞ্চলস্রোতে, মধ্যে মধ্যে দিগ্বিজয়ী অত্যাচারী সম্রাট এবং ধূর্ত্ত বাণিজ্য-ধুরন্ধরের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভারতের শাশ্বত জীবনস্রোতকে কখনও পঙ্কিল করিয়া দিতে পারে নাই। সেই জন্যই দেখি, কত জেতা কত রাজচক্রবর্ত্তীর নাম যখন বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে তখনও ভারতের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের বিচিত্র জনসমাজ, সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্য, বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠার জন্য এই আচার্য্য ও লোকশিক্ষকদের, এই শিল্পী ও মানবপ্রেমিকদের নিঃস্বার্থ সেবা ও মৈত্রীর কথা ভুলিতে পারে নাই—অপরিসীম যত্নে, এবং অসীম কৃতজ্ঞতার সেই দিব্য স্মৃতিকে তাহারা বুকের মধ্যে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রবাসী পৌষ, ১৩৩৩

মৃত্যু ও অমৃত

কালিদাস নাগ

মুখর দিনের মৃত্যুপারে
দেখা দিল মৌন নিশা নিয়ে তার রহস্য অপার।
অসীম আকাশভরা গ্রহ তারা নক্ষত্রের দল
কৃপা-নেত্রে চাহে যেন ক্ষুদ্র এই ধরিত্রীর পানে।
এক দিকে সংখ্যা-হারা সৃষ্টির প্রবাহ
অন্য দিকে নরনারী—
ক্ষণিকের হাসি কান্না ঘেরা এ-জীবন!
কবে তা'রা কেন তা'রা উঠিল ভাসিয়া
কোন্ ভুলে-যাওয়া সৃষ্টি-সমুদ্র মন্থনে?
কেহ বলে হলাহল কেহ বলে অমৃত এ প্রাণ
অর্ব্বাচীন মানবের দুর্ব্বোধ্য নিয়তি!

তারো আগে প্রাণ ছিল এ ধরারে ঘেরি
আদিম পঙ্কের মাঝে লতাগুল্ম কৃমি কীট দল
বেঁচেছে মরেছে কত সাক্ষ্য দেয় অঙ্গার প্রস্তর
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি কক্ষে সিন্ধুবাসী প্রাণীর কঙ্কাল
লক্ষ লক্ষ যুগ পারে মৃত্যুর বিজয়গর্ব্ব-রেখা।
সে প্রাণের সে মৃত্যুর চিহ্ন আছে ব্যথা শুধু নাই।

পশু এল শব্দ নিয়ে ফুটাল ধ্বনির স্বরগ্রাম
ক্ষুধা তৃষ্ণা হর্ষ ভয় লোভ হিংসা কতই রাগিণী
পশু শিখাইল নরে ভাঙ্গাচোরা ঠাটে!
পশু-নর প্যান্ দেখি বেণু-যন্ত্রে সঙ্গীতের গুরু
তার কাছে মানবের প্রথম সাধনা
মানব সূতিকা-গৃহে পশু ধাত্রী। পশু দেবদেবী
ছেয়ে আছে বুঝি তাই আমাদের ধর্ম্ম মরমাঝে?

কান্না নিয়ে এল নরশিশু
ধ্বনির বেসুরো তারে সঞ্চারিল সুরের সোহাগ,
দরদী আলাপে তার
ফুটাইল কালে কালে সুরের সঙ্গতি।

কিন্নর কেমনে হ'ল আদি কলাবৎ
কপি-নর কোন্ সাধনায় হল কবি
শোক তার শ্লোকরূপে করিয়া অমর?

নিযুত বৎসর আগে, মরুদ্বীপ ভূমে,
যবদ্বীপে কপাল-কঙ্কালে ছিল লেখা
মানবের সুপ্রাচীন জনম-পত্রিকা।
সেথা হ'তে বিস্তারিল নিজবংশ শাখা-প্রশাখায়
উত্তরে দক্ষিণে আর পূরবে পশ্চিমে
এক নর-গোষ্ঠী ভিন্ন আবেষ্টনবশে
শ্বেত কৃষ্ণ পীত আদি বর্ণ ভেদ করি
ছাইল ধরার বুক
গাহিল নূতন ছন্দে সৃষ্টি ধ্রুবপদ।

বিংশতি সহস্র বর্ষ আগে
মৃত্যু দিল হানা
নির্ম্মম তুষার নব রূপে!
ধুক্ ধুক্ করে প্রাণ, এতটুকু বুকের উষ্ণতা
বাষ্প হয়ে শূন্যেতে মিলায়!
বাহিরে জমাট মৃত্যু শুভ্র শ্বেত সমাধির মত
মাটি নাই জল নাই তৃণটুকু নাই
তার মাঝে নর নারী মরেছে বেঁচেছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে উৎকণ্ঠার শেষ।
সূর্য্যের নীরব আশীর্ব্বাদে
নড়েছে তুহিনরাশি সরে গেছে মৃত্যু আবরণ
জলের উচ্ছল কলতানে
কত সিন্ধু, হ্রদ, নদী নাচিয়াছে গীতছন্দসম।
আদি দেব সূর্য্যের বন্দনা
সবিতাগায়ত্রীমন্ত্র মুখরিছে তাই দেখি সাহিত্যপুরাণ।

রচি প্রস্তরের প্রহরণ
সে যুগের নরনারী গড়েছে অদ্ভুত চিত্রশালা—
রচেছে সুরম্য গুহা, সুনিপুণ লেপচিত্র দিয়ে
পশু-অরি পশু-মিত্র পশু দেবদেবী
ফুটায়েছে তুলির লিখনে
নিখুঁৎ সুন্দর!

প্রস্তর যুগের শেষে শিকারী মানব
ধাতু প্রহরণ ধরি গৃহচারী রূপে দিল দেখা।
কুটিল কুটীরক্ষেত্র পশুযূথ পশে র পশরা;—
নদীমাতৃকার শিশু
নদী বেয়ে দেশে দেশে করিল মিতালি
বিচিত্র শিল্পের কত আদান প্রদান
নগ সিন্ধু সমুদ্রের পারে।
টায়েগ্রীস্ ইউফ্রেটীস্ নীল নদী নীরে
উর্ব্বরিয়া ওঠে
মানবের চিত্তক্ষেত্র অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবে।

মিশরে মরণ-বেদী জীবনেরে ছাপাইয়া রয়।
মৃত্যুপারে কোন্ লোক? কিবা তার দিশা?
এই নিয়ে গবেষণা।
সমাধিরে কেন্দ্র ক'রে অপূর্ব্ব সভ্যতা
উঠিল গড়িয়া।
সুমে রিয়া ইলামে ইরাণে
নক্ষত্রের মৌন ভাষা, মৃৎপাত্রের অমর গীতিকা
কারুকার্য্যে মুখরিত হ'ল।
হারাপ্পা মহেঞ্জ দারো ক'রল ইঙ্গিত
হারানো মিতালি রেখা দীপ্ত হয়ে ফুটিল আবার।
মহাদেশে মহাদেশে দেখি
নিবিড় নাড়ীর যোগ, সুদূর অতীত কাল বাহি
গোত্রে গোত্রে পরিণয়
নব নব জাতির গঠন।

অনার্য্য, দ্রাবিড়, আর্য্য যুঝেছে মিশেছে পাশাপাশি
রচেছে বিচিত্র লিপি—পড়িতে জানি না!
যে নদী গড়েছে সব, সে আবার ভেঙেছে নির্ম্মম
ধ্বংসরূপিণীর তেজে!

মহাপ্লাবনের গান, মরিতে মরিতে
রচেছে মানব তাই;
পলিমাটি মরুবুকে ডুবেছে সবাই
বীজ যেন মৃত্তিকার তলে
অঙ্কুরিয়া উঠেছে আবার
লক্ষ লক্ষ নব-রক্তবীজ
ধ্বংস-দেবিকার খড়্গা অবহেলি যেন
মরেছে বেঁচেছে বার-বার।

চেতনা লোকের কোন্ অনবদ্য উষা
জাগাল মানবচিত্ত
এই ভারতের সিন্ধুতীরে!
ধীরে ধীরে তমিস্রার নেপথ্য সরিল
দেখি বেদী দেখি বেদ আর্য্যদর্শনের জাগরণ
আলোকের অগ্নির বন্দনা
মিত্র বরুণের গাথা
ইন্দ্র নাসত্যের পূজা—কোন্ নব চেতন-প্রতীক?
গভীর আস্তিক্যবোধ ফোটে ধীরে ধীরে;
আছে নিশা তবু জানি দিবা এল বলে
আছে হিংসা হানাহানি, আছে শান্তি তারই পাশাপাশি
আছে মৃত্যু তবু তারে আচ্ছাদিয়া রয়
অসীম অমৃত লোক!

এ নূতন প্রাণ-ঋক্ মুখরিল অনন্ত আকাশে
গুঞ্জি ওঠে মানবের ভীরু চিত্তবীণা
অনন্ত আশায় দীপ্ত উদাত্ত সঙ্গীতে।
অপরূপ মীড়ে মূর্চ্ছনায়
মন্দ্র মধ্য স্বর-গ্রাম ছাড়ি
শেষ সপ্তকের মাঝে ঝঙ্কারিল প্রাণের বন্দনা।
মুক্ত কণ্ঠে গায় নর নারী—
সে মহান্ত পুরুষেরে দেখিয়াছি বুঝিয়াছি আজ
"যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ"—
মৃত্যু তাঁর ছায়া তাই ডরিব না আর
রুদ্রের দক্ষিণ মুখে অমৃতের অনুপম আভা
দিয়াছে পরম শান্তি
খণ্ড জীবনের মাঝে অখণ্ড নির্ভর।

তাই বলে মরণের হয় নাই শেষ
যুগে যুগে এসেছি মরিয়া
কভু আত্মীয়ের ক্রোড়ে ভুঞ্জি দীর্ঘ আয়ু
কভু চকিতের দণ্ডে
প্রকৃতির উদাসীন ধ্বংসের খেলায়।

প্লাবনে দাহনে যুদ্ধে মহামারী কোপে,
সর্বনাশা ভূকম্পনে,
তলায়েছি ক্রূর মৃত্যু-সাগর অতলে।
ভীসুভিয়াসের ভীতি মনে আছে আজও
প্রশান্ত সাগর তার অশান্ত নর্তনে
ধসায়েছে জনদেশ,

আমেরিকা জাপানের ধ্বংসের কাহিনী
আজো নাড়া দেয় বুকে,
নর-নারী বৃদ্ধ শিশু হাজারে হাজারে
নিষ্পেষিত হয়ে গেল সেদিন ভারতে
কেউ দীপ্ত দিবালোকে, কেউ মন্দ কালরাত্রি মাঝে!

তবু বুঝে গেছি মোরা—
প্রকৃতি নিষ্ঠুর পরিহাসে
বলে নাই শেষ কথা
তাহার উপরে আছে প্রাণের অদম্য সৃষ্টিলীলা।
আত্মার গভীরে তাই জাগে
জরামৃত্যুজয়ী এই আনন্দ উদার॥

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪২

মনীষী কালিদাস নাগের স্মরণে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কালিদাস নাগ

প্রজ্ঞার জ্যোতিতে চিত্ত ছিল কী ভাস্বর!
করুণ-কোমল সেই শান্ত কণ্ঠস্বর!
দিক্ হ'তে দিগন্তরে বিস্তীর্ণ চেতনা!
তৃষাতুর আত্মার সে জ্ঞানের এষণা!
পাণ্ডিত্যের পরিব্যাপ্তি আর গভীরতা!
সুন্দরের প্রতি সেই শ্রদ্ধার গাঢ়তা!
পৃথিবীতে যাহা-কিছু বিরাট, মহান—
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার জয়-গান!
যে-অধ্যাত্ম চেতনার স্বর্গীয় সুবাস
প্রাচ্যের বাণীতে,—তারে তুমি কলম্বাস,
নিয়ে গেছ সিন্ধু-পারে! মুগ্ধ সে সৌরভে
প্রাচ্যেরে ভরিল রলাঁ* নূতন গৌরবে!
আমি কবি মহতের চির গুণগ্রাহী
ভাঙা বাঁশরিতে তব স্তব-গান গাহি!

* রামকৃষ্ণ চরিতকার রোমা রলাঁ।

ইংলণ্ডে Quaker বন্ধুদের সহিত কালিদাস নাগ পত্নী ও তিনকন্যাসহ ১৯৫২

আচার্য কালিদাস নাগ

(১৮৯১—১৯৬৬)

শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৬ সন, ৭ই নভেম্বর, ২১শে কার্তিক, ১৩৭৩ সাল, সোমবার দিবা অবসান হ'ল। সন্ধ্যা নেমে এল পৃথিবীতে ··

বিশ্বের সমগ্র মানুষের চিরকল্যাণসাধক, সর্বক্ষণ সকলের কল্যাণ চিন্তায় বিভোর আত্মভোলা ডক্টর কালিদাস নাগ আজ যেন বড় বেশী ক্লান্ত বড় আসন্ন।
ডাকতে লাগলেন, 'মা- ওমা—মাগো!'···

সন্ধ্যার পর একটু গা-বমি, গা-বমি ভাব। যেন একটু অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ বমি টমি করেন না ডক্টর নাগ। শারীরিক গঠন খুবই ভাল। বড় বড় ডাক্তারগণ বহুবার প্রশংসা করেছেন এ সম্পর্কে; বলেছেন, কষ্টকর দীর্ঘ রোগভোগ হবে না ডক্টর নাগের, হবে না থ্রম্বসিসও, হয়ও নি। (সংবাদ পত্রে একটু ভুল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল) থ্রম্বসিস হয়নি ডক্টর নাগের কোনও দিন। উচ্চ রক্ত-চাপ রোগে ভুগেছেন—আর হয়েছিল মূত্রাশয়ের একটু কষ্ট। ডাক্তার নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ, ডাঃ এ, বি, মুখার্জি, ডাঃ হিমাংশু কুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতির চিকিৎসায় সেরে উঠেছেন। গত ৩রা আগষ্ট (১৯৬৬) হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন ডক্টর নাগ। চিকিৎসকগণ যথাবিধি তৎপর হলেন, যত্ন নিলেন। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। গত দিন পনেরো ধরে শয্যা ছেড়ে বারান্দা পর্যন্ত হাঁটাচলাও করেছেন প্রতিদিন। এবার বাইরেও একটু বেড়াতে যেতে পারবেন তিনি, পরিষ্কার আশ্বাস দিয়ে গেছেন চিকিৎসক। আমরা ক'দিন ধরে এ আলোচনাই করছিলাম। এবার লেকের ধারে একটু একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসব ওঁকে···

হঠাৎ বমি সুরু হওয়াতে ডাক্তার ডাকা হ'ল। যমন কেন, তিনি দেখে যান। এলেন ডাক্তার, গৃহ চিকিৎসক, ডাক্তার হিমাংশু সেনগুপ্ত। বাড়ীর কাছেই থাকেন তিনি। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ ডক্টর নাগকে তিনি দেখছেন।

—কোন কষ্ট হচ্ছে আপনার? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

—কই, না তো! পরিষ্কার উত্তর দিলেন ডক্টর নাগ।

—কোনও রকম অস্বস্তি? কোন অসুবিধা?

—না, না. বেশ ভালই তো আছি।

একটু ঘুমোন তবে ভাল করে, বমি কেটে যাবে। বললেন ডাক্তার। বরং একটু ওষুধ দিয়ে যাই। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন…

রাত সাড়ে সাতটা অবধি কথাবার্তা বললেন ডক্টর নাগ। সমস্ত দিন শুয়ে শুয়ে বই পড়েছেন অনেক। অবশ্য রোজই পড়েন। আজ হয়তো একটু বেশি পড়েছেন ভাবলেন বাড়ীর সকলে… ক' বছর পূর্ব্বে চোখের একটা শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ভয় করেছিলেন, দৃষ্টি শক্তি হয়তো হারাবেন তিনি। কিন্তু সে শঙ্কা সত্য হয় নি। শেষ দিন পর্যন্ত ভালভাবে পড়াশুনা করেছেন,—অনেক পড়েছেন, দাগ কেটেছেন। নোট রেখেছেন যথারীতি। শেষ বারের মতন তাঁর বালিশের পাশ থেকে যে বইগুলো তুলে নিয়ে এলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা, তার বৈচিত্র্যও বড় কম নয়: (১) দু'খণ্ড মহাভারত (সংস্কৃত ভাষায়, ইংরাজীতে টীকা সম্বলিত)—ভি, এস, সুকটঙ্কর ও এস, কে, ডেল ভালকার সম্পাদিত, পুনা।

(২) Ram Mohan Roy—His Life and Teachings—Ram Mohan Roy Memorial Trust, New Delhi.

ডক্টর কালিদাস নাগের মায়ের নাম কমলা দেবী, পিতা মতিলাল নাগ। হুগলী জেলার ত্রিবেণী নিবাসী এবং কলিকাতার বউবাজারস্থ বিখ্যাত অক্রূর দত্ত পরিবারের দৌহিত্র সন্তান।

ডক্টর নাগের জন্ম অক্রূর দত্ত লেনের ওই দত্ত বাড়ীতেই, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী, বঙ্গাব্দ ১২৯৭, ২৩শে মাঘ, মাঘোৎসব কালে।

ডক্টর নাগের মাতামহ রাজেন্দ্রনাথ বসু, মতামহী সৌদামিনী দেবী, জ্যেষ্ঠ মাতুল বিজয়কৃষ্ণ বসু (পরে রায়বাহাদুর এবং ভারতের লোকসভার সদস্যা শ্রীমতী ইলাপাল চৌধুরীর পিতৃদেব) কলিকাতা আলিপুরের জুলোজিকাল গার্ডেন্‌স্ এর দ্বিতীয় বাঙ্গালী সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট।

শিশু কালিদাস ১৮৯১ থেকে ১৮৯৭ সনের কিছুদিন পর্যন্ত বউবাজারের দত্ত বাড়িতেই প্রতিপালিত হন। ১৮৯৭ সালেই পিতা মতিলাল স্ত্রীপুত্রসহ শিবপুরে কিছুদিন বসবাস করতে গমন করেন। (এ—বছরটির কথা ডক্টর নাগের খুবই স্মরণে ছিল, তাঁর মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্বেও আমার কাছে গল্প করেছেন, সে বছর এমন এক প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল যে আমাদের একটি নদী নাকি লুপ্ত হয়ে যায়।)

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণাকারে প্লেগ রোগে মহামারী দেখা দিলে মতিলাল রামকৃষ্ণপুর (হাওড়া) গঙ্গার ধারে একটি বাসা ভাড়া করে চলে আসেন স্ত্রীপুত্র নিয়ে।

মতিলাল খুব কালীভক্ত ছিলেন। চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারতেন, প্রায়ই শ্যামাসঙ্গীত বাজাতেন আপন মনে। ডক্টর নাগের 'কালিদাস' নামকরণের তাৎপর্য বোধ করি এখানেই।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুরের দীনবন্ধু ইন্‌ষ্টিটুশনের উচ্চ প্রাইমারী বিভাগে ভর্তি হন তিনি। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় গৌরকান্তি, ফুলের মতো সুন্দর, মধুর-ভাষী বালক কালিদাসকে আদরে গ্রহণ করেন এবং ওই বয়সেই সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করান।

১৯০২, জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ যখন স্বর্গারোহণ করেন, বিদ্যালয়ে স্মারক সভা হ'ল। ডক্টর নাগ কোনদিন ভোলেন নি, সহৃদয় অধ্যাপক তাঁকে কোলের কাছে নিয়ে স্বামীজীর সব কথা শোনাতে আরম্ভ করেন।

১৯০৩-০৪ সমাগত প্রায়। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) আন্দোলনের পূর্বেই স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাংলা দেশময় বয়ে যায়। সুকণ্ঠ কালিদাস স্বদেশী গানে মেতে উঠেন। ওদিকে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়া এগিয়ে চলে। অধ্যাপক অভয়াপদ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের যত্নে কিশোর কালিদাস ভাষ্যসহ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি পাঠ সমাপ্ত করেন।

কালিদাসের বয়স মাত্র চৌদ্দ পনের। মাতৃশোক পিতৃশোকের কঠিন আঘাতের সম্মুখীন হ'তে হয়। ১৯০৬-এ মা, ১৯০৭-এ পিসীমা, ১৯০৮-এ পিতা পরলোক গমন করেন। এই দুঃসহ শোকের মধ্যে ১৯০৮ সালেই তাঁর এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষা দিলেন এবং দ্বিতীয় বিভাগেই উত্তীর্ণ হলেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কালিদাসের কৃতকার্যতায় দুঃখের দিনেও আনন্দের সাড়া জাগলো।

মাতাপিতাহীন কালিদাসকে মাতুলালয়ে সাহায্যার্থী হতে হ'ল, মামা-মামীমার যত্নে মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুশন (বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে এফ্, এ, পাশ করলেন ১৯১০ সনে এবং ১৯১১-১২ দু'বছর স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রজেন্দ্র শীলের কলেজ জেনারেল এ্যাসেম্বলীতে (পরে স্কটিশচার্চ) অধ্যয়ন করে বি, এ পাশ করলেন—অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অধীনে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। ১৯১৩ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় দ্বারভাঙ্গা ভবনে এম, এ পড়তে এলেন কালিদাস। স্যার আশুতোষ ও অন্যান্য অধ্যাপকের স্নেহে এবং কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের ভাই ও সিন্ধু সভ্যতার যুগান্তকারী আবিষ্কারক (১৯২০-৩০) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদিগের গৃহশিক্ষকতা করে তিনি এম, এ পাশ করলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

পিতৃবিয়োগের পর ১৯০৮ থেকে ১৯১৮, দশ বৎসর কাল কালিদাস মামা-মামীমার কাছে জুলোজিকাল গার্ডেন্স্-এর বাসায় বাস করেন। আনন্দ সহকারে আমাদের কাছে পরে গল্প করেছেন, 'আলিপুর থেকে গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটেই স্কটিশচার্চ কলেজে যাতায়াত করে পড়েছি'।

এই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালিদাসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে (১৯১০)'। মধ্যম সহোদর 'পথিক' পুস্তক-প্রণেতা এবং 'কল্লোল' দলের নায়ক গোকুল নাগকে সঙ্গে করে কালিদাস শান্তিনিকেতনে যান। সেখানে অপর মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও দেখতে পান। শ্রদ্ধেয়া শান্তা দেবীর কাছে শুনেছি, তখন শান্তিনিকেতনে প্রতিটি উৎসবে, স্যার যদুনাথ সরকার, রামানন্দ, প্রশান্ত মহলানবীশ, কালিদাস নাগ, গোকুল নাগ, অমল হোম, স্যার নীলরতন সরকারের কন্যাগণ, শান্তা দেবী প্রভৃতি যেতেন। রামানন্দর জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠা কন্যা সীতা দেবী যান ১৯১১ সালে। হেমলতা দেবীর বারান্দায় লাইন করে ডাল ভাত খাওয়ার সে কি আনন্দ!

কালিদাসের নির্মল চাহনির মধ্যে সুদূরপ্রসারী গভীরতার ইঙ্গিত কবির চোখ এড়ায় নি। উভয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ হ'ল, গভীর হ'ল, আত্মিক হ'ল। এমন কি কবি-কণ্ঠের সঙ্গীতেও কালিদাসের কণ্ঠ মিলিত হ'ল। ১৯১১ সনের ক'লকাতা কংগ্রেসে কবির সুরে কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে 'বন্দেমাতরম্' সমবেত সঙ্গীতে অন্যান্যদের মধ্যে কালিদাসও ছিলেন শুনেছি অন্যতম। অল্পদিনের তাঁর সঙ্গে কবির সম্বন্ধ কিরূপ স্নেহমধুর পর্যায়ে পৌ তার একটি প্রমাণ অনেকেই জানেন কবিলিখিত f শিরোনামায়: Kalidas Nag, Zoological garde Human Section."

কালিদাস নাগ। আনুমানিক বয়স ৪৮

এই সময়েই আবার শিল্পরসরসিকপ্রবর সুকুমার রায়কে কেন্দ্র করে বাঙলার বৈঠক-ইতিহাসে যে অবিস্মরণীয় 'মনডে ক্লাব' (Monday club) গড়ে ওঠে বাঙলা মায়ের কয়েকটি রত্ন-সন্তানের সমাবেশে, কালিদাসও সেখানে একজন অন্যতম।

১৯১৫—১৯১৯ কালিদাস মাসে দু'শ টাকা বেতনে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভারত, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস—বিশেষপত্র অধ্যাপনার ভার পড়লো তাঁর উপর। সে-যুগের কয়েক জন ছাত্রের সঙ্গে সম্প্রতি কালেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের মুখে শুনেছি, কী গভীর ভাবে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁরা প্রত্যেকটি ছাত্র

ধ্যাপক কালিদাসের পড়ানো শুনতেন। অধ্যাপকের নাম সিংহল অবধি পৌঁছলো। দু'শ টাকা বেশি বেতনে (৪০০ টাঃ) ১৯১৯ সনে মহিন্দ কলেজের (সিংহল) কর্তৃপক্ষ কালিদাসকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করলেন এবং অবিলম্বে যোগদানের অনুরোধ সহ ১০০ টাঃ টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করলেন। যোগদান করলেন তিনি (১৯১৯)। এক বৎসরের মধ্যেই কলেজের সুনাম ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেল মহিন্দ কলেজের। অধ্যক্ষ নাগ নিজেও পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করলেন এই সঙ্গে।

এলো সুদূর সাগর পারের ডাক।

রবীন্দ্রনাথ তখন প্যারীস-এ, ১৯২০—গ্রীষ্মাবকাশে অধ্যক্ষ কালিদাস টিকেট সংগ্রহ করলেন প্যারীস-এর। ষ্টেশনে নেমেই রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্নেহাস্পদ কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে কবির কাছে উপস্থিত হলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ। কবির সে কি আহ্লাদ! সে কি খুশি! রবীন্দ্রনাথই পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক সিলভাঁ লেভীর সঙ্গে কালিদাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন—বিশেষ করে তাঁর ডক্টরেটের জন্য গবেষণার ব্যবস্থাকালে। আর পরিচয় করিয়ে দিলেন মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ও তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে।

জীবনের নূতন এক অধ্যায় শুরু হ'ল। শুরু হ'ল একাধারে গবেষণার কাজ এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা। রোলাঁ পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হওয়ায় রোমাঁ রোলাঁর স্নেহশীলা কনিষ্ঠা ভগিনী মাদলীন (Madeliene) এর সহায়তায় কালিদাসের ফরাসী ভাষায় অধিকার সুলভ হ'ল এবং মঁসিয়ে রোলাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হ'ল—অচিরেই আত্মিক যোগ সাধনের পথ প্রশস্ততর হ'ল। মনীষী রোলাঁর পক্ষেও সহজ হ'ল তাঁর অমর কীর্তি 'মহাত্মা গান্ধী', 'শ্রী রামকৃষ্ণ' 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়নের পথে অগ্রসর হওয়া। এই রোলাঁ পরিবারের সঙ্গে ৪৬ বৎসর পূর্বে স্থাপিত সৌহার্দ ডক্টর নাগের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ইল রোমাঁ রোলাঁর মৃত্যুর (১৯৪৪) পরও ভগিনী মাদলীন এবং পত্নী মাদাম মেরী রোলাঁর সঙ্গে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংস্কৃতি প্রসারের গভীর প্রচেষ্টা।

১৯২৩ সালে আচার্য কালিদাস প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থশাস্ত্রের উপর মৌলিক গবেষণার (ফরাসী থীসিস-Diplomatic Theories of Ancient India) জন্য ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন (With Tres Honourable of the Best Mention) এবং নগদ দু'হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার পান। এই নগদ অর্থ পেয়ে ডক্টর নাগের পক্ষে থীসিসটি প্রকাশ করতে এবং মিশর প্যালেষ্টাইন, ইজরেল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে খুবই সুবিধা হয়। ইজরেল-এ সে-সময় তিনি জেরুসালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যক্ষ করেন।

(৩) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৪) The Sacred kural or The Tamil Veda of Tiruvallurar—H. A. Popley

(৫) গোরা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬) Nationalism—Rabindra Nath Tagore Three ways of Thought in ancient China—Arthur Waley

(৭) Journals : Afro-Asian and World Affairs —ওষুধ খেলেন। কিন্তু থাকলো না। কিছুক্ষণ পর পড়ে গেল। কিন্তু তেমন কোন অস্বস্তি নেই তার জন্যে। একটু জ্বর এল কেঁপে, আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে 'মা—মা'—ওমা!'...বলে মাকে ডাকছিলেন একবার জেগে দুই চামচ পথ্য খেলেন।

রাত দশটায় ঘুম গাঢ় হ'ল। ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্ত আরামে, নিশ্চিন্ত শিশুটির মতো যেন মায়েরই কোলে...বশি রাতে বারে বারে উঠেও সহধর্মিণী শান্তা দেবী, জেষ্ঠ্যা কন্যা শান্তিশ্রী দেখেছেন, নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছেন ডঃ নাগ। সৌম্য, প্রশান্ত ভাব, গভীর নিদ্রা, গায়ের উত্তাপ স্বাভাবিক কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙলো না ....

ভোর পাঁচটায় শান্তা দেবী যখন স্বামীকে দেখতে গেলেন একটু কেমন কেমন যেন মনে হল। 'বাবা' বলে ডাকলেন কন্যা। সাড়া মিললো না। ডাকলেন কাকাকে, ছোট বোন পারমিতাকে। ডাক্তার ডেকে আনা হ'ল—৫-৪৫ মিঃ। ডাক্তার হিমাংশু সেনগুপ্ত। গায়ের উত্তাপ রয়েছে...স্বাভাবিক কোমল দেহ নির্মল কান্তি...শান্ত সুন্দর মুখখানি...

ডাক্তারও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, দেহে প্রাণ আছে, কি নেই…

বারবার পরীক্ষা করতে লাগলেন। রক্তের চাপ দেখলেন। নাড়ী ধরলেন, বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন—তারপর অবর্ণনীয় কাতরতায় নির্মম কথা ঘোষণা করলেন: নঃ, He has expired…হঠাৎ হার্টফেল করেছেন ভোর পাঁচটার কাছাকাছিই, হয়তো কয়েক মিনিট পর। মঙ্গলবার ৮ই নবেম্বর (১৯৬৬), বাইশে কার্তিক, তেরশ' তিয়াত্তর, ১৮, রাজা বসন্ত রায় রোডের নিজ গৃহটি অন্ধকার করে, স্ত্রী কন্যা-ভ্রাতা-ভগিনী-জামাতা-আর অগণিত বন্ধু সহযোগী সহকর্মী-অনুরাগী-মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ডঃ কালিদাস নাগ চলে গেলেন পরলোকে, স্বর্গলোকে—চির আনন্দময় পুরুষ গমন করলেন চির আনন্দলোকে…

বিদেশে থাকাকালীনই প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় ডক্টর নাগের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তার আগেও পুস্তক সমালোচনা করতেন।

ডক্টর নাগের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমাদের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ডক্টর নাগের পরিবারবর্গের নিকট তাঁর যে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, তাতে তিনি বলেছেন 'ডক্টর নাগ অন্যান্য দেশে আমাদের সংস্কৃতি প্রসারের জন্য প্রভূত কাজ করেছেন'। এ-কথা কতো খাঁটি তার গভীর প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি ১৯২১ সনেই ডক্টর নাগ জেনিভাতে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা কংগ্রেসে' এবং ১৯২২-এ সুইজারল্যাণ্ডের লুগানো শহরে অনুষ্ঠিত 'উইমেনস ইণ্টারন্যাশানাল লীগ অব্ পীস্ এ্যাণ্ড ফ্রীডম কংগ্রেস'-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর সংস্কৃতি কর্মের প্রসার শুরু করেন। ১৯২৩-এ প্যারিস-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী ও লাইব্রেরিয়ানদের কংগ্রেস-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ডক্টর নাগই। ১৯২১--১৯২৩ এর মধ্যে ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, বলকান, গ্রীস, ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, ঈজিপ্ট এবং প্যালেষ্টাইন-এর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিদেশে অধ্যয়ন করতে গিয়ে একজন দরিদ্র বাঙালী শিক্ষকের পক্ষে এ কী বিরাট, কী ব্যাপক দেশসেবার সাধনা ভাবতে বিস্ময় লাগে। শুধু এই নয়। বিদে[শে] থাকাকালে স্বদেশের দিকে, জাতীয় কর্ম সাধনার দি[কে] সদা জাগ্রত দৃষ্টি কতো তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর অদ্ভুত এ[কটি] উদাহরণের ইঙ্গিত ডক্টর নাগের পঞ্চাশ বৎসরের বন্ধু জা[তীয়] অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার উল্লেখ করেছেন [তাঁর] শোকবার্তায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমাদের জাতীয় কং[গ্রেস] একটি 'জাতীয় পতাকা' প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন, [কিন্তু] রঙটাই ছিল সে পতাকা, কিন্তু বর্তমানে আমরা আমা[দের] যে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করি এরূপ র[ং] ছিল না। এ সম্পর্কে নির্বাচিত পতাকার একটি ব্যা[খ্যা] সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হ'ল। দৃষ্টি পড়লো এই ব্যাখ[্যার] দিকে প্রবাসে অধ্যয়নরত দুটি বন্ধুরই। লণ্ডনে সুনী[তি]কুমার, প্যারিস-এ কালিদাস, উভয়ে আলোচনা কর[লেন] এ নিয়ে। ভারতীয় ভাবধারা ও ঐতিহ্যব্যঞ্জক নয় পতাকা মনে করলেন তাঁরা। এই মুহূর্তে আমার যত মনে পড়ছে, রামানন্দ বাবুর কাছেও তাঁরা তাঁদের চি[ন্তা]ধারা জ্ঞাপন করলেন। এবং বোধ করি রামানন্দের পরা[মর্শ] মতোই গান্ধীজীকে লিখলেন তাঁদের অভিমত সম্বলিত নূ[তন] প্রস্তাব। তাই গৃহীত হয়ে আমাদের বর্তমান জা[তীয়] পতাকা রূপ পেল। ঘটনাটি এরূপই যেন আ[চার্য] চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছিলাম বহুদিন পূর্বে। তি[নি] অবশ্যই পূর্ণ বিবরণ দেবেন আমাদের।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেই স্যর আ[শু]তোষের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজু[য়েট] বিভাগে ডক্টর নাগ শিক্ষক রূপে যোগদান করলেন।

১৯২৪-এ রবীন্দ্রনাথ চীন জাপান, বর্মা ভ্রমণে যা[ন।] শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এল, এলমহার্ষ্টের সঙ্গে ডক্টর নাগকেও রবীন্দ্রনাথ আহ্[বান] করলেন তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য। অবশ্যই গেলেন। এ[ই] প্রত্যাগমনের পথে ডক্টর নাগ ইন্দো চায়না, যবদ্বী[প,] বলীদ্বীপ, মালয়, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে ভারত সংস্কৃতি বি[ষয়ে] ভাষণ দেন, পিকিঙ, নানকিঙ, কাইকেঙ, হ্যাঙ্কার্ড, সাঙ[হাই] কীওটো, টোকিও, বাটাভিয়া, সুরবায়া, হ্যানয়, সাই[গন] প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯২৩—১৯৪৩ বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতন) গভ[র্নিং] বডি বা পরিচালক সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেন এ

কালিদাস নাগ পত্নী ও তিনকন্যা সহ মিনেসোটার সেণ্টপল সহরে—১৯৫২

আজীবন সদস্য নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের।

রবীন্দ্রনাথের দুটি আদরের ডাক ছিল। ডক্টর নাগকে ডাকতেন: কি হে, ঐতিহাসিক! আর প্রশান্ত মহলানবিশকে ডাকতেন, 'কি হে, বৈজ্ঞানিক!' বলে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এ-আদরের ডাক শেষ দিন পর্যন্ত সম্পদ হয়ে ছিল দেখেছি।

১৯২৪ সনেই রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বলাকা কাব্যটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনুবাদ অবশ্য করেছিলেন ১৯২৩-এ প্যারিস থেকে ফিরবার পূর্বেই এবং অধ্যাপক জুলিস ব্লক ছাত্র কালিদাস নাগকে খুশি হয়ে সাহায্য করেছেন এই সুন্দর কাজটিতে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণ শেষ করে দেশে এসেই সুনীতি কুমার, ডঃ ইউ. এন, ঘোষাল প্রমুখ বন্ধুগণের সহায়তায় বৃহত্তর ভারত পরিষদ বা গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন এবং বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু অমূল্য রচনাদি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন এবং (১৯২৪-৩০) ভারতের সর্বত্র তিনি Magic Lantern Lectures প্রদান করেন। আজ আমাদের স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে 'বৃহত্তর ভারত' নামে একটি অধ্যায় অবশ্য পাঠ্য রাখা হয়েছে দেখে আনন্দ হয়।

১৯২৫—(২ই বৈশাখ, ১৩৩২) ডক্টর নাগ মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৯৩০-এ ডক্টর নাগ লীগ অব্ নেশানস্-এ সহায়তা করার জন্য আহূত হন। ১৯৩০-৩১ আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর নিযুক্ত হন এবং নিউইয়র্কের ইন্‌ষ্টিটুট অব্ ইণ্টারন্যাশানাল এডুকেশন, নিউইয়র্কের মেট্রপলিটন মিউজিয়ম, বষ্টন মিউজিয়ম অব্ ফাইন আর্টস, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড, ইয়েল, কলম্বিয়া, পেন্‌সলভানিয়া, শিকাগো, ইভেন্সটন, পিটসবার্গ, মিনেসোটা, লস্ এঞ্জেলস্, দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া, বার্কলে, ওরেগন, মণ্টানা প্রভৃতিতে ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দেন।

১৯৩২-এ ডক্টর নাগ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্বের মনীষীগণের সহিত যোগাযোগ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় Golden Book of Tagore প্রকাশ করেন।

১৯৩৩-৩৪ ডক্টর নাগ বঙ্গীয় পি, ই, এন, (P, E, N) সংগঠন করেন।

১৯৩৪-এ গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ

ডাক্তারও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, দেহে প্রাণ আছে, কি নেই…

বারবার পরীক্ষা করতে লাগলেন। রক্তের চাপ দেখলেন। নাড়ী ধরলেন, বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন—তারপর অবর্ণনীয় কাতরতায় নির্মম কথা যে বলা করলেন: নং, He has expired…হঠাৎ হার্টফেল করেছেন ভোর পাঁচটার কাছাকাছিই, হয়তো কয়েক মিনিট পর। মংগলবার ৮ই নবেম্বর (১৯৬৬), বাইশে কার্তিক, তেরশ' তিয়াত্তর, ১৮, রাজা বসন্ত রায় রোডের নিজ গৃহটি অন্ধকার করে, স্ত্রী কন্যা-ভ্রাতা-ভগিনী-জামাতা-আর অগণিত বন্ধু সহযোগী সহকর্মী-অনুরাগী-মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ডঃ কালিদাস নাগ চলে গেলেন পরলোকে, স্বর্গলোকে—চির আনন্দময় পুরুষ গমন করলেন চির আনন্দলোকে…

বিদেশে থাকাকালীনই প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় ডক্টর নাগের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তার আগেও পুস্তক সমালোচনা করতেন!

ডক্টর নাগের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমাদের রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ডক্টর নাগের পরিবারবর্গের নিকট তাঁর যে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, তাতে তিনি বলেছেন 'ডক্টর নাগ অন্যান্য দেশে আমাদের সংস্কৃতি প্রসারের জন্য প্রভূত কাজ করেছেন'। এ-কথা কতো খাঁটি তার গভীর প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি ১৯২১ সনেই ডক্টর নাগ জেনিভাতে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা কংগ্রেসে' এবং ১৯২২-এ সুইজারল্যাণ্ডের লুগানো শহরে অনুষ্ঠিত 'উইমেনস ইন্টারন্যাশানাল লীগ অব্ পীস্ এ্যাণ্ড ফ্রীডম কংগ্রেস'-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর সংস্কৃতি কর্মের প্রসার শুরু করেন। ১৯২৩-এ প্যারিস-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী ও লাইব্রেরিয়ানদের কংগ্রেস-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ডক্টর নাগই। ১৯২১--১৯২৩ এর মধ্যে ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বলকান, গ্রীস, ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, ইজিপ্ট এবং প্যালেষ্টাইন-এর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিদেশে অধ্যয়ন করতে গিয়ে একজন দরিদ্র বাঙালী শিক্ষকের পক্ষে এ কী বিরাট, কী ব্যাপক দেশসেবার সাধনা ভাবতে বিস্ময় লাগে। শুধু এই নয়। বিদেশে থাকাকালে স্বদেশের দিকে, জাতীয় কর্ম সাধনার দিকে সদা জাগ্রত দৃষ্টি কতো তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর অন্তত একটি উদাহরণের ইঙ্গিত ডক্টর নাগের পঞ্চাশ বৎসরের বন্ধু জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার উল্লেখ করেছেন তাঁর শোকবার্তায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস একটি 'জাতীয় পতাকা' প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন, তিন রঙাই ছিল সে পতাকা, কিন্তু বর্তমানে আমরা আমাদের যে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করি এরূপ রঙের ছিল না। এ সম্পর্কে নির্বাচিত পতাকার একটি ব্যাখ্যা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হ'ল। দৃষ্টি পড়লো এই ব্যাখ্যার দিকে প্রবাসে অধ্যয়নরত দুটি বন্ধুরই। লণ্ডনে সুনীতি কুমার, প্যারিস-এ কালিদাস, উভয়ে আলোচনা করলেন এ নিয়ে। ভারতীয় ভাবধারা ও ঐতিহ্যব্যঞ্জক নয় সে পতাকা মনে করলেন তাঁরা। এই মুহূর্তে আমার যতটা মনে পড়ছে, রামানন্দ বাবুর কাছেও তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারা জ্ঞাপন করলেন। এবং বোধ করি রামানন্দের পরামর্শ মতোই গান্ধীজীকে লিখলেন তাঁদের অভিমত সম্বলিত নূতন প্রস্তাব। তাই গৃহীত হয়ে আমাদের বর্তমান জাতীয় পতাকা রূপ পেল। ঘটনাটি এরূপই যেন আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছিলাম বহুদিন পূর্বে। তিনি অবশ্যই পূর্ণ বিবরণ দেবেন আমাদের।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেই স্যর আশুতোষের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে ডক্টর নাগ শিক্ষক রূপে যোগদান করলেন।

১৯২৪-এ রবীন্দ্রনাথ চীন জাপান, বর্মা ভ্রমণে যান। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এল, কে এলমহার্ষ্টের সঙ্গে ডক্টর নাগকেও রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য। অবশ্যই গেলেন। এবং প্রত্যাগমনের পথে ডক্টর নাগ ইন্দো চায়না, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, মালয়, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে ভারত সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দেন, পিকিঙ, নানকিঙ, কাইফেঙ, হাম্বার্ড, সাঙহাই, কীওটো, টোকিও, বাটাভিয়া, সুরুবায়া, হ্যানয়, সাইগন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯২৩—১৯৪০ বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতন) গভর্ণিং বডি বা পরিচালক সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং

কালিদাস নাগ পত্নী ও তিনকন্যা সহ মিনেসোটার সেণ্টপল সহরে—১৯৫২

আজীবন সদস্য নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয়ের।

রবীন্দ্রনাথের দুটি আদরের ডাক ছিল। ডক্টর নাগকে ডাকতেন: কি হে, ঐতিহাসিক! আর প্রশান্ত মহলানবিশকে ডাকতেন, 'কি হে, বৈজ্ঞানিক!' বলে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এ-আদরের ডাক শেষ দিন পর্যন্ত সম্পদ হয়ে ছিল দেখেছি।

১৯২৪ সনেই রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বলাকা কাব্যটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনুবাদ অবশ্য করেছিলেন ১৯২৩-এ প্যারিস থেকে ফিরবার পূর্বেই এবং অধ্যাপক জুলিস ব্লক ছাত্র কালিদাস নাগকে খুশি হয়ে সাহায্য করেছেন এই সুন্দর কাজটিতে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণ শেষ করে দেশে এসেই সুনীতি কুমার, ডঃ ইউ এন, ঘোষাল প্রমুখ বন্ধুগণের সহায়তায় বৃহত্তর ভারত পরিষদ বা গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন এবং বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু অমূল্য রচনাদি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন এবং (১৯২৪-৩০) ভারতের সর্বত্র তিনি Magic Lantern Lectures প্রদান করেন। আজ আমাদের স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে 'বৃহত্তর ভারত' নামে একটি অধ্যায় অবশ্য পাঠ্য রাখা হয়েছে দেখে আনন্দ হয়।

১৯২৫—(২ই বৈশাখ, ১৩৩২) ডক্টর নাগ মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৯৩০-এ ডক্টর নাগ লীগ অব্ নেশানস্-এ সহায়তা করার জন্য আহূত হন। ১৯৩০-৩১ আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর নিযুক্ত হন এবং নিউইয়র্কের ইন্‌ষ্টিটুট অব্ ইণ্টারন্যাশানাল এডুকেশন, নিউইয়র্কের মেট্রপলিটন মিউজিয়ম, বষ্টন মিউজিয়ম অব্ ফাইন আর্টস্, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড, ইয়েল, কলম্বিয়া, পেন'সলভানিয়া, শিকাগো, ইভেন্সটন, পিটসবার্গ, মিনেসোটা, লস্ এঞ্জেলস্, দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া, বার্কলে, ওরেগন, মণ্টানা প্রভৃতিতে ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দেন।

১৯৩২-এ ডক্টর নাগ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্বের মনীষীগণের সহিত যোগাযোগ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় Golden Book of Tagore প্রকাশ করেন।

১৯৩৩-৩৪ ডক্টর নাগ বঙ্গীয় পি, ই, এন, (P, E, N) সংগঠন করেন।

১৯৩৪-এ গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ

দিতে আহুত হন। ১৯৩৫ তিনি আমন্ত্রিত হন দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা সাধারণতন্ত্রে এবং অগ্রিম পাথেয় পাঠান তাঁরা টেলিগ্রাম করে। এ সময়ে লাতিন আমেরিকার লেখক লেখিকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ডক্টর নাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়।

হাওয়াই-এ কালিদাস নাগ

১৯৩৬-এ ডক্টর নাগ হনলুলুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন এবং Buenos Aires-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব সাহিত্যিকগণের পি, ই, এন কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ওই বছরেই আবার প্রত্যাবর্তনের পথে আর্জেন্টাইন, উরুগে, ব্রেজিল, গ্রেট ব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ও সিংহলে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতি প্রচার করেন। ১৯৩৭-এ হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর নিযুক্ত হন এবং ভারতীয় বিভাগ উদ্বোধন করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল সবার উপরে মানুষ সত্য—Above all Nations is Humanity"—হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় এই ভাষণ প্রকাশ করেন। ১৯৩৭-এ ডঃ নাগের Art and Archaeology Abroad পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন।

১৯৩৮-এ অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে কমনওয়েলথ রিলেশানস্ কনফারেন্স-এ ভারতের পক্ষে যোগদান করেন এবং পার্থ, মেলবোর্ণ, সিডনী, আডেলেড এবং নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড ও ওয়েলিংটন সহরে ভাষণাদি দিয়ে ফিলিপিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (ম্যানিলা) অতিথি অধ্যাপক হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে পুনর্বার ইন্দোচায়না শ্যাম, মালয় ও বর্মাতেও রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মাগান্ধী সম্পর্কে ভাষণ দিতে হয় তাঁকে।

১৯৪১-এ ডক্টর নাগ তাঁর 'India and the Pacific World' নামক ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশ করেন। তারপর প্রকাশ করেন 'With Tagore in China and Ceylon'.

১৯৩৫-'৪৪ ডক্টর নাগ বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ প্রচারকালে India and the World নামে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন।

১৯৪২-'৪৬ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (কলিকাতা) (পরে এসিয়াটিক সোসাইটি) এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা স্যর উইলিয়ম জোন্স-এর দ্বিশত বার্ষিকী জন্মজয়ন্তীর স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোসিমা নাগাসাকিতে প্রথম এটম বোমা প্রয়োগে যে বীভৎস ও মর্মন্তুদ দৃশ্য সৃষ্টি হয়, তা নিজের চোখে দেখে ডক্টর নাগ আর একবার জাপান ভ্রমণ শেষ করে আসেন। ইতিমধ্যে তিনি 'স্বদেশ ও সভ্যতা' নামে স্কুল পাঠ্য একটি ইতিহাস রচনা করেন। উভয় বঙ্গে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এটি পড়ছেন। বর্তমানে বোধকরি ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ অতিক্রম করে গেছে।

১৯৪৭ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম Asian Relations Conference-এ ডক্টর নাগ যোগদান করেন এবং এই সম্মেলনের তথ্য সম্বলিত 'New Asia' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৯৪৯-এ ডক্টর নাগ Institute of Pacific Relations কর্তৃক আয়োজিত ভারত আমেরিকা সম্মেলনের সদস্যরূপে 'India in Asia' নামে একটি মূল্যবান তথ্য-পত্র রচনা করেন।

এই বছরেই শান্তিনিকেতনে (এবং কলিকাতায়) World Pacifists Conference অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫০-আমেরিকার দিল্লীর রাষ্ট্রদূত ডক্টর নাগকে

অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলীর জন্মদিনে কালিদাস নাগ ও বন্ধুগণ। জুলাই—১৯৬৬

Fulbright Committee-র সদস্য নির্বাচন করেন। Public Service Commission-এ ও কাজ করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলোরূপে কাজ করেছেন। Indian Council of World Affairs, Council for Cultural Relations প্রভৃতিতে ভারতীয় শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে Tolstoy and Gandhi ছাপা হ'ল (১৯৫০)। মধ্য প্রাচ্য থেকে ফিরে এসেই লিখলেন India and the Middle East.

তারপর মিনেসোটার (য়ু, এস, এ) স্বামলীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য আহ্বান এসে পড়ায় তিনি চলে গেলেন আমেরিকায় সপরিবারে (১৯৫১-৫২) অধ্যাপনার কাজে। য়ুনেসকোর (UNESCO) International Universities Association-এ ও প্যারিসে ডক্টর নাগ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৫৫ সালে ডক্টর নাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬১-৬২ সালে আন্তর্জাতিক প্রাচ্য-বিদ কংগ্রেস উপলক্ষে রাশিয়া গমনই ডক্টর নাগের শেষ বিদেশ ভ্রমণ। ঐ কংগ্রেসেরই দিল্লীতে প্রথম অনুষ্ঠান ১৯৬৪-৬৫ সালে দিল্লীর এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেই তিনি স্বদেশ ভ্রমণও সমাপ্ত করলেন। হাই ব্লাড প্রেসার দেখা দেওয়ায় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত হৃদ্‌ রোগেই ভারতের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি সাধক ডক্টর কালিদাস নাগ ইহলোক ত্যাগ করলেন।

— —

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার

শেখর সেন

উজ্জ্বল বর্ণ, সৌম্য দর্শন, পরণে ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবী, কাঁধে ঝোলান উত্তরীয়, সাধারণ বাঙালী বেশ। প্রতিভা-দীপ্ত অথচ মধুর এক সরলতামণ্ডিত মুখশ্রী; বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জগতে ডক্টর কালিদাস নাগ একটি স্বতন্ত্র, অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর তীক্ষ্ণ রসজ্ঞান, খুরধার মনীষা, ভাব ও ভাষার ওপর অসাধারণ দখল, কথা বলার বক্তৃতা করার অননুকরণীয় ভঙ্গি—সব মিলে তাঁকে এমন এক বৈশিষ্ট্য দান করেছিল যা বিরল প্রতিভার লক্ষণ। বাংলা দেশে এমন কোনো সংস্কৃতিবান নেই যাঁকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন না, এমন কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে তিনি একাধিকবার উপস্থিত হন নি বা যার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন নি। চল্লিশ বছর একাধিক্রমে তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে, পৃথিবীর নানা দেশে দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের জয়-গৌরব ঘোষণা করে গেছেন।

তাঁর ভাবের ঘরে অভাব ছিল না, দৈন্য ছিল না মানসিক সম্পদের, তাই সে সবের দাক্ষিণ্যে কৃপণতা ছিল না তাঁর। সেখানে বাছ বিচারও ছিল না, সংশয় জাগত না কখনও মনে যাকে বা যাদের তিনি তাঁর অনুপম সঙ্গদান করেছেন, তাঁর ভাষণে বক্তৃতায় পরিতৃপ্ত করেছেন, যার বা যাদের জন্যে তাঁর অমূল্য সময় দিয়েছেন, সে বা তারা সে সবের কতখানি যোগ্য। তাই তাঁর কাছে কেউ নিরাশ হ'ত না কখন, না বলতেন না কখন। এত বেশী তিনি দিতেন সকলকে, যে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝত, মনে করত তাঁকে পাওয়া সুলভ। কিন্তু অতুলনীয় ভাব সম্পদে, অন্তরের মহান ঐশ্বর্যে যিনি অভিষিক্ত, বিভূষিত, তাঁর কিসের ভয় রিক্ত হবার! সারা জীবনব্যাপী সাধনা ও কর্মের প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে তিনি নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর গোটা জীবন তিনি জনসাধারণের জন্যে, সংস্কৃতির জন্যে নিবেদন করে রেখেছিলেন। যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে— সে সব যেন তাঁর মধ্যে দিয়ে সকলকে বিতরণ করবার জন্যেই পেয়েছিলেন। তাই দ্বিধা করতেন না, কেউ তাঁর কাছে বঞ্চিত হ'ত না। বলতেন, 'দেখ, গুরুদেবকে দেখেছি, কী প্রচণ্ড পরিশ্রমই না তিনি করে গেছেন সারা জীবন! লেখা, পড়া, দেশে-বিদেশে বারবার ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রচার, বিশ্বমানবতা প্রচার, বিশ্বভারতীর কাজ—এক দিনের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নি! কাজ, কাজ আর কাজ! তাঁর কাছ থেকেই আমরা প্রেরণা পেয়েছি, তিনি আমাদের আদর্শ। কর্মের দীক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি, তাই কেমন করে চুপ করে বসে থাকব, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখব! ভুলে যাব গুরুদেবের শিক্ষা ও আদর্শ! যারা আসে আমার কাছে, তাদের নিরাশ করার অধিকার আমার নেই। তাই কাজ করে যাই।'

এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

আমার অসীম সৌভাগ্য আমার অত্যন্ত অল্প বয়সেই তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর অসীম স্নেহ লাভ করেছিলাম। বিশেষ করে দুটি মানুষের জন্মশত-বার্ষিকী পালনের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমটি তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী, দ্বিতীয়টি তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় মনীষী রোমাঁ রোলাঁর জন্মশতবার্ষিকী। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি তাঁর লেখায়, জনসভায় সর্বত্র সে সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করে আসছিলেন। তাঁর উৎসাহে, উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে প্রথম গঠিত হয় 'রবীন্দ্র শতাব্দী সঙ্ঘ'। এ সময়ে দক্ষিণ কলিকাতায় রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হল। আমি ছিলাম তার সাধারণ সম্পাদক। বাংলা দেশে সংস্কৃতি করতে গেলে যা সাধারণত হয়ে থাকে, তাই এক্ষেত্রেও হ'ল। অর্থাৎ বেশ কিছু টাকা আমার পকেট থেকে গেল খরচ মেটাতে। ডক্টর নাগকে সে কথা বলি নি। একদিন কোন সূত্রে সে কথা জানতে পারলেন, আমাকে টেলিফোন করে বললেন, 'আমাকে বল নি কেন? সভাপতি হিসাবে কি আমার সে কথা জানার অধিকার নেই?' আমি নীরবে তাঁর সেই স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনা শুনলাম। তিনি আমাকে দেখা করতে বললেন। পরদিন তাঁর বাড়ীতে যেতেই তিনি তাঁর স্বাক্ষরিত একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও, তোমার পকেট থেকে যা গেছে, সেটা বসিয়ে নিও।'

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। অভিভূত হয়ে

পেয়েছিলাম। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারি নি। তিনি হাসছিলেন আমার দিকে চেয়ে। আমি চেকটা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে এলাম। সেদিন তাঁর কাছ থেকে যা পেলাম, কোন চেকেই সে অঙ্ক লেখা সম্ভব নয়!

জীবনের শেষ দিকে তিনি মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু কাজ তাঁর থেমে থাকত না। তারই মধ্যে সব চলত। লেখা, পড়া, লোকজনের সঙ্গে দেখা-শোনা, উপদেশ, পরামর্শ নানা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে। রোমাঁ রোলাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য সকলকে সচেতন করছিলেন। রলাঁর প্রতি ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করছিলেন সারা দেশকে। তাঁর উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে গঠিত হ'ল 'নিখিল ভারত রোমাঁ রোলাঁ জন্মশতবার্ষিকী সমিতি।' সমিতির উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে উঠল আঞ্চলিক শাখা সমিতি। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ, ডক্টর জাকির হোসেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীচাগলা প্রভৃতি তাঁর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ হলেন সমিতির পৃষ্ঠপোষক। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ সম্পাদক ও আমি ছিলাম সহকারী সাধারণ সম্পাদক।

এই সমিতির কাজে তাঁর কাছে প্রায়ই যেতে হ'ত। চিঠিপত্র, কাগজের ফাইল তাঁকে দেখাতে হ'ত। দিনে বা রাত্রের যে কোন সময়ে তাঁর কাছে গেছি, বিরক্ত হন নি। হাই ব্লাড্ প্রেশারে শয্যাশায়ী, মাথা তুলতে পারছেন না, তবু শুয়ে থাকেন নি, উঠে বসেছেন, অতিথির প্রতি বিন্দুমাত্র অসৌজন্য তাঁর ধাতে বরদাস্ত হ'ত না। অসুস্থ হলেও, শারীরিক কষ্ট হলেও কখনও বলেন নি—কাগজপত্র রেখে যাও, পরে এস, আজ দেখতে পারব না। যাওয়া মাত্র সব দেখে দিতেন, পরামর্শ নির্দেশ দেওয়া এমন কি, অনেক চিঠিপত্রের জবাবও সেই অবস্থায় বলে যেতেন। তাঁকে কখনও ক্লান্ত হতে দেখি নি। অসুস্থতায়, শারীরিক কষ্টের লক্ষণ মুহূর্তের জন্যেও তাঁর মুখের রেখায় প্রকাশ পেত না। সজীব, সতেজ, অফুরন্ত প্রাণের ঐশ্বর্যে পূর্ণ হৃদয়ের অতুলনীয় সম্পদে ধনী সেই মানুষ!

গত ৩০শে জানুয়ারী মহাজাতি সদনে রোমাঁ রলাঁ জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তাঁর শেষ প্রকাশ্য উপস্থিতি। তখন তিনি খুবই অসুস্থ। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ, ঘর থেকে বাইরে বেরনো বারণ। রলাঁর জন্মশতবার্ষিকী! তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেই উৎসবে যোগ দেবার জন্যে।

রজ্জ্যা যে তাঁর জীবনে কতখানি ছিলেন, সে কথা কে না জানে! তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তিনি থাকতে পারবেন না! এ চিন্তাও তাঁর পক্ষে দুঃসহ মনে হচ্ছিল। যখনি আমি তাঁর কাছে গেছি বলেছেন, 'দেখ আমাকে যেন নিয়ে যাওয়া হয় মহাজাতি সদনে।'

ডাক্তারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। রোগ যন্ত্রণায় যে ভুগছেন, মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। সেই ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী পরনে, কাঁধে ঝোলানো উত্তরীয়। তাঁর মেয়েরা তাঁকে আস্তে আস্তে ধরে এনে মঞ্চে বসিয়ে দিলেন। প্রায় শেষ পর্যন্ত বসে রইলেন। তাঁর সভাপতির ভাষণ পড়লেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডক্টর নাগ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মঞ্চের ওপর রাখা রলাঁর বিরাট ফটোর দিকে। রলাঁর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত হৃদ্যতার, তাঁর সঙ্গে তাঁর বহু কর্মের, সুখ-দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলির কথা মনে পড়ছিল। আর মনে হচ্ছিল রলাঁর ঋণ ভারতবাসী আজ স্বীকার করছে! মুখে সেই হাসি, প্রসন্ন, তৃপ্ত চোখের কোণে জল!

তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল তাঁরই বলা কথা, "কর্মের দীক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি, তাই কেমন করে চুপ করে বসে থাকব, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখব! ভুলে যাব গুরুদেবের শিক্ষা ও আদর্শ!"

মেয়েরা এসে বললেন, 'এবার যেতে হবে।'

উঠে সকলকে নমস্কার করে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন; পা দু'টি কাঁপছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। দু'টি চোখে তখনও জলের ধারা, মুখে তৃপ্তির হাসি!

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও কর্মের উত্তরাধিকারী আজ চলে গেলেন!

কালিদাস নাগ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

একজন খ্যাতিমান বিদগ্ধ মানবপ্রেমিক সাহিত্যরসিক নিরহঙ্কার উদার-চরিত ব্যক্তি আমাদের মাঝ থেকে তিরোহিত হলেন।

যাঁর মধ্যে গত শতাব্দী ও এ শতাব্দীর বহু গুণের সমন্বয় হয়েছিল। বলতে পারা যায় এ যুগ ও সে যুগের ইনি একটি সৌজন্যশালী সহৃদয় বিশেষ মানুষ—যাঁর কাছে "বসুন্ধরায় মানুষে মানুষে" আপন পর ভেদ ছিল না। 'বসুধা'র সবাই তাঁর আপন জন। কুটুম্ব।

ব্যক্তি মানুষ কালিদাস নাগ মহাশয়কে আমার কখনো জানা চেনা ছিল না। কোনো পরিচয়ও জানতাম না। এখনও প্রায় অজানা। এঁর যে পরিচয় 'প্রবাসীর' পাতায় ছড়ান ছিল লেখা থেকে,—গত চল্লিশ বছরেরও বেশী করে আমরা তাতেই তাঁকে দেখেছি।

রোমাঁ রোলাঁর প্রথম যৌবনে টলষ্টয়কে লেখা চিঠিখানি মূল লিপি থেকে অনুবাদ করে প্রবাসীর পাতায় এঁর কাছ থেকেই বোধহয় প্রথম আমরা পেয়েছি। রোলাঁর কার্লস্পিটলারের সম্বন্ধে লেখা রচনার ও ভাব এবং সার অনুবাদ 'প্রবাসী'তে আমাদের সামনে কালিদাস নাগ মহাশয়ই এনে ধরে দিয়েছেন।

তখন কোন এক সময় নারীর অধিকার আন্দোলনের ঝড়ের যুগ। তখন দেখেছি 'এলেন কী'র (নারীর অধিকার জগতের একজন বিশিষ্ট লেখিকা) সম্পর্কেও তাঁর লেখা প্রবাসীতেই।

রোলাঁর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় না ঘটলে আমরা যে রোলাঁ রচিত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অমূল্য জীবনী দুটিও পেতাম না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর কাছেই রোলাঁ নানা তথ্য ও উপাদান পেয়েছেন। ডক্টর নাগের বিবেকানন্দের শত বার্ষিকী উপলক্ষে ও অন্য নানা রচনায় সে কথা জানতে পারি।

যেন তাঁর চরিত্রের মূল উপাদানই ছিল গীতার ভাষায় "শ্রদ্ধাবান"। যেখানে মানুষের যা কিছু মহত্ত্ব দেখেছেন, মহৎ গুণ দেখেছেন, সেখান থেকে তাঁর চোখ কিছু না নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি। তাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত যেমন সে দেশের সামনে ধরে দিয়েছেন, সেখানকারও মহান মহৎ যাঁকে পেয়েছেন এখানে ধরে দিয়েছেন তেমনি করে।

শ্রদ্ধা সাহিত্যিক সত্তাও তাঁর যেমন নানাদিকে গভীর চিন্তায় জগত ছড়ান আছে, আবার দেখতে পাচ্ছি তাঁর কাব্য চর্চাও আনাতোল ফ্রাঁসের সম্বন্ধে রচিত কবিতায়, মেঘদূত কবিতায়। আরও ছড়ান রচনা হয়ত আছে কাব্য বা সাহিত্যে

কিন্তু এগুলি কম। তাঁর অতিশয় গুণগ্রাহী শ্রদ্ধা-পরায়ণ সহৃদয় অন্তর নতুন পুরাণো যেখানে যা কিছু মহৎ ভাল অসাধারণ দেখেছে তাতেই আবিষ্ট নিবিষ্ট হয়ে গেছে। নিজের কথা নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে সর্বত্রই নিজের হৃদয়ের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি যেন মানুষের মহত্ত্ব ও জগতের সৌন্দর্য্য ছাড়া মন্দ কিছু দেখতে পান নি।

এক কথায় তাঁর অন্তর সত্তায় মানুষের গুণমুগ্ধতা মহত্ত্বমুগ্ধতা এতই গভীর তিনি আপনার ব্যক্তিগত বক্তব্য আপনার মত করে বলবার কথাতেও মন দেন নি। ভাবেন নি। যেন একটি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রণত নারী হৃদয়ের মত তাঁর হৃদয়খানি শ্রদ্ধাতে ভরা ছিল। সে আপনার কথা ভুলে যায় পূজ্য ও পূজনীয়ের পূজা করতে বসে।

তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয়ের আগে তাঁর ভ্রাতা ৺গোকুলচন্দ্র নাগের লেখার সঙ্গে গল্প ও উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। ৺বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত তখনকার 'বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রে এবং কল্লোলেও।

দীর্ঘকাল পরে গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নানা বন্ধুবান্ধবের লেখায় পারিবারিক যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় তাতে জানি তিনি কালিদাস বাবুর ভাই। তারপর কতকাল পরে শুনি তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। ঐ অবধিই তাঁকে চেনা আমাদের।

তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অসাধারণ দেশবিদেশে। সেই বিদেশের সম্মান দেশের গুণগ্রাহীদের কাছে প্রচারিত হলেও তাঁর অন্তর এত প্রচারবিমুখ ছিল যে তাঁকে আমরা যখন কোনো সভার সম্মিলনে দেখেছি, মনে হয়েছে তিনি

সাধারণ আমাদের কত আপনজন। তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাঁকে অহংকৃত করতে পারে নি।

আমি নিজে বেশীর ভাগ সময় প্রবাসে ছিলাম। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় পত্রিকা মারফৎই হয়েছে। তাতে আবার ঘোরতর রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা ও বধূ ছিলাম। চেনাজানার জগত সেকালের মত অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ। সে সময়ে বাড়ীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে কথা-বার্তায়ও নানা বিধি-নিষেধ ছিল। তেমন কালের মেয়ে আমরা।

কয়েক বছর আগে সেবার কলকাতায় প্রথম সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে গিয়েছি। সেদিন রাজেন্দ্র মল্লিকের প্যালেসে আমন্ত্রণ ছিল। আমরা জনকতক মেয়েও নেমেছি গাড়ী থেকে।

দেখি সামনে আমার প্রায় সব অচেনা মানুষ জায়গায় বসে তাঁদের মাঝে তিনি ছিলেন। সহসা ডক্টর নাগ বল্লেন "এই দেখুন এই বয়সে ইনি এখনো এখানে এসেছেন ··। আমি অপরিচিত জগতের মানুষ আমি তাঁর পরিচিত ছিলাম না। মুখ চিনতাম মাত্র। কিন্তু ঐ সহজ কথাটা এমন সুন্দর লেগেছিল। যে কোন সহৃদয় মানুষের কথার মত। আর তিনি আমাকে চিনতেন কিনা তাও আমি জানতাম না।

আরো একবার দেখি ঐ মার্বেল প্রাসাদেই। তাঁরা দাশু রায়ের কাব্য উৎসব করেন। ডক্টর নাগ ছিলেন সভাপতি। সেদিন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু সভার কাজ তো করলেনই, তারপর কয়েকটি পুরাণো কালের কথা মনোজ্ঞভাবে বললেন। যাতে ছিল 'শিবপুর ও 'ভবানীপুরে'র নাম নিয়ে নিজের আত্মীয় গণ্ডীর সরস মধুর আলোচনা। তিনি 'কালিদাস। শিব ও ভবানীর তথা শিবপুর ভবানীপুরের লোকের আত্মীয়। নাগমহাশয়কে যেন আপন করে পেলাম। নতুনভাবে দেখলাম তিনি মানুষকে এমন আপনার করতে জানেন। সব শ্রোতাই খুশী হলেন।

ইন্দিরা দেবীর শোক সভাতেও তাঁকে দেখি তেমনি নিরহঙ্কার সহৃদয় ব্যবহারে ও উক্তিতে। খুব সংক্ষেপে বক্তব্য নিবেদনের অনুরোধ ছিল সকলের প্রতিই। কিন্তু ডক্টর নাগ যাকে যেটুকু বলার ছিল বলতে দিলেন।

শেষ তাঁকে দেখি খুব কাছে শ্রীমান অমল মিত্রের কার্ত্তিক বোস লেনের বাড়ীতে।

সেদিন যে অনেকক্ষণ অনেক কথা শুনলাম। এবং

বই হাতে মই-এর উপর সর্ব্বোচ্চে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি কালিদাস নাগ এবং পাশে টুপ মাথায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। (উদয়গিরি-খণ্ডগিরির মধ্যে কোন একস্থানে যখন খনন কার্য্য চলিতেছিল সেই সময়ের ফটো)

কত শ্রদ্ধা তাঁর সেকালের বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন থেকে একালের রবীন্দ্রনাথ অবধি। কত গভীর যে শ্রদ্ধা পূর্বপুরুষদের সকলের ওপর। এবং কত গভীর তাঁর মমতা নতুন দলের ওপরও সেদিন দেখেছিলাম।

আজ মনে হচ্ছে বুঝি সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সংস্কৃতির এবং একালের ব্রাহ্ম সমাজের উন্নত নবনব আদর্শের প্রতি ঐতিহ্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান মানবপ্রেমিক একজন মহৎ মানুষ আমাদের মাঝ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তাঁর মত আর একজন এমন আছেন কিনা জানি না।

মনে হয় তিনি স্বদেশবৎসল মানবতাবাদী সত্যসন্ধ আদর্শ চরিত্র "প্রবাসী" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য জামাতা ছিলেন।

জ্ঞান পথিক ডঃ কালিদাস নাগ

লতিকা গুপ্তা

ডঃ নাগের সান্নিধ্যে এসে তাঁর চরিত্রের যে দিকগুলি আমাকে বিস্মিত ও অভিভূত করেছে তার কিছু কিছু এই স্মৃতি-তর্পণের অবকাশে আলোচনা করে নিজেকে ধন্য মনে করব।

তাঁর জীবন ও কর্ম্মসাধনা সত্যই ছিল বিস্ময়কর। ভারতবর্ষের এবং বৃহত্তর এশিয়ার মর্ম্মবাণী উদ্‌ঘাটন করাই তিনি জীবনে ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, আমরণ তিনি সেই সাধনায় অনলস আগ্রহ দেখিয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে তাঁর জন্ম ও বিকাশ। ভারতের সংস্কৃতিকে বৃহত্তর এশিয়ার সামগ্রিক সত্ত্বা ও কৃষ্টির পটভূমিকায় আবিষ্কার ও অধ্যয়ন করে তিনি ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ ভাবযোগী ভারতের আত্মাকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করে বিশ্বের দরবারে প্রকাশিত করেছেন। ভারতের এই নবজাগৃতির মর্ম্মকথা গণমানসকে এক অপূর্ব্ব চেতনা ও কৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। সেদিনের সেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত পটভূমিকায় ডঃ নাগের জন্ম ও শিক্ষার উন্মেষ। বিবেকানন্দ মানবচেতনার উদ্বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ গণমানস প্রস্তুতির কাজে পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ডঃ নাগের মানস-চেতনাও এমনই সূক্ষ্ম ও উঁচু তারে বাঁধা ছিল যে এদের দিব্যদৃষ্টির স্বপ্ন তার জীবনকে পূর্ণ অধিকার করেছিল এবং তিনি এঁদেরই ভাবশিষ্য বলে পরিচিত হবার যোগ্য।

মৃত্যুর ২ মাস আগের ঘটনা বলি, একটি জরুরী সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে যাই। তিনি তখন মাঝে মাঝেই রোগের সঙ্গে যুঝছেন। মিসেস্ নাগ সেই ভাব-পাগল শিশু-সাধককে ডানা দিয়ে আগলে রাখতে চান। কেননা সভা-সমিতির ডাক এলেই তিনি যাবার জন্য পাগল। আমি যখন গেলাম তখন তিনি খাটের ওপর ৩।৪ খানা বই খুলে উপুড় হয়ে কি যেন তন্ময় হয়ে খুঁজছেন। চেহারায় রোগের ছাপ হ'লে কি হবে, মনের তারুণ্য চোখে-মুখে উছলে উঠছে! তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে আমার মনে হ'ল, এই হ'ল প্রকৃত জ্ঞানপথিক। সারাজীবন ধরে জ্ঞানের পথে

"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর"—

সারাজীবন তিনি ধন নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, চেয়েছেন সংস্কৃতির সন্ধান। ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসকে দেখেছেন সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ঘটনার চলাচলকে তিনি ইতিহাস বলেন না। যুগে যুগে রং পাল্‌টায়, সংস্কৃতি পাল্‌টায়। এই বিবর্ত্তনের মূল কথা কি সেই অনুসন্ধিৎসা এই মন-পাগল ঐতিহাসিককে প্রেরণা যুগিয়েছে। কাজেই তিনি কেবল জ্ঞানী নন, তিনি সাধক, তিনি শিল্পী। রসরচনাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য, কেবল ঐতিহাসিক তথ্যের ভার বহনই তাঁর কাজ নয়।

ফা-হিয়েন ইত্যাদি পরিব্রাজক এসেছেন দেশ-কাল ছাড়িয়ে। উদ্দেশ্য একই—দেশ-কালের সীমারেখা তাঁদের তৃপ্ত করতে পারে নি। কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করাই তাঁদের কাজ ছিল না। ভারতের দুর্গম, দীর্ঘ পথে তাঁরা কৃচ্ছ্রসাধন করে ভ্রমণ ক'রে গেছেন। সেখানেও একই কথা—

"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।"

ডাঃ নাগের সন্ধানী মন তেমনই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অ-ধরাকে ধরতে চেয়ে পৃথিবী পরিক্রমা ক'রে বেড়িয়েছে।

ইংরাজী, বাংলা ও ফরাসী ভাষাকে পূর্ণায়ত্তে এনেও এই পরিণত বয়সে, যখন দ্রুত স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি ক্ষীণ, তখনও না কি প্রস্তাব করেছেন তামিল শিখে তামিলের মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করবেন। জ্ঞানের পথে এই পথিকের মন এমনই নিত্য-উধাও!

অজানাকে জানার কৌতূহলে তিনি বহুবার ঘর ছেড়েছেন, বাইরের দুনিয়ায় পা বাড়িয়েছেন সংস্কৃতির আহ্বানে। পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাণের যোগ তিনি নিবিড়ভাবে অনুভব

করতে পারতেন। ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে যখন প্রথম Asian Relations Conference-এর অধিবেশন শুরু হয় তখন স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ডাঃ নাগের ওপর ভার দেন সমগ্র এশিয়ার কৃষ্টিমূলক সমস্তার মূলসূত্রগুলি উপস্থাপিত করার। এই কাজের জন্ম তাঁর চেয়ে যোগ্যতম ভারতে আর কেউ না ছিল।

দেশবিদেশের মানুষের সঙ্গে ঐক্য খুঁজে ফেরা, ভারতের মর্ম্মকথাকে বৃহত্তর বিশ্বে ঘোষণা করার দীক্ষা তিনি কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের নিকট লাভ করেন সে কথা তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চীন পরিভ্রমণ করে ফিরে পুত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট এবং ভারতীয়দের নিকট খুলে দেন প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবোধের চেতনা।

পরবর্ত্তী যুগে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন পরিভ্রমণে বাহির হন এবং অচিরেই 'গীতাঞ্জলী' কাব্য চীন ভাষায় অনূদিত হয়।

১৯২৩ সালে ডঃ নাগ কবির আহ্বানে তাঁর সহযাত্রী হয়ে চীন ও পূর্ব্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জে যান। পুনরায় ১৯৩১ সালে তিনি কবির সহিত ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বাহির হন।

মৃত্যুর বছর দুই আগে থেকেই তিনি শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। অথচ এই অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর কি অস্থিরতা তাঁর এই 'বৃহত্তর ভারত' গঠনের কৃষ্টিমূলক অভিযান চালাবার; সামান্য সুস্থ না হ'তেই সুরু করতেন নানারকম গ্রন্থপাঠ আলোচনা ও নানা পরিকল্পনার কথা। ইতিহাসের ছাত্র, সেই তরুণ বয়সে মনের জানালা দিয়ে যে বৃহত্তর ভারতের আভাস-চিত্র দেখেছিলেন, তার গঠনের কাজে বাস্তব ভূমিকা গ্রহণের সাধ পুরোপুরি মেটবার নয় জেনেও শিশুসুলভ অস্থিরতা ও নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন, "তোমাদের পেয়েছি, এবার একটা নূতন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তার মাধ্যমে "আমরা ঘুচাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।" কৃষ্টির, আনন্দের, আলোকের ঝরণা ধারায় নিত্যস্নাত তাঁর মন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকত সেই আলোকের বাণী দেশের গণ-মানসের কাছে পৌঁছে দেবার জন্ম। আমাদের স্কুল-কলেজের অর্থাৎ Calcutta Girls' Academy ও Calcutta Girls' B. T. College-এর সভাসমিতির আহ্বানে এক অপূর্ব্ব হাসিভরা মুখে এগিয়ে আসতেন, যেন বলতেন, "এই ত সুযোগ পেয়েছি জীবন্ত মনগুলির সান্নিধ্যে আসবার। তাদের উৎসুক চিত্তগুলি ভরে দেব ভারতের শাশ্বতবাণী দিয়ে।" কতবার বলেছেন, 'এখানে আমরা এক নূতন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে তুলব, যেখানে রবীন্দ্র লেকচারার, গান্ধী লেকচারার নিয়োগ করবে। যীশুখ্রীষ্ট ও গৌতম বুদ্ধের আদর্শের কথা তিনি যে রকম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করতেন তাতে তাঁর উপাসক চিত্তের পরিচয়খানি ধরা পড়ে। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মহাবোধি সোসাইটির সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই জ্ঞান-তাপসের শ্রদ্ধা-বাসরে তার বিচিত্র প্রতিভার সব আলোচনা করা আর আকাশের তারা গোণা একই কথা। তাই আর একটি দিক আলোচনা করেই ক্ষান্ত হব। সবাই তাঁর জ্ঞানের দিকটাই বলে। কিন্তু তাঁর মন যে কত শিশুর মত সরল ও স্নিগ্ধ ছিল সে কথা যাঁরা তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে এসেছে তাঁরা জানেন। এই স্নিগ্ধতার মধ্যেও তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী, সত্যের পূজারী ছিলেন। সত্যের অপলাপে তিনিও যে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করতে পারেন সে পরিচয় বহুবার পেয়েছি এবং শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ (১৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ভারতের আন্তর্জ্জাতিক ঘনিষ্ঠতার কথা

ভারতের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতের নিকট বহির্জগতের সহিত কারকারবার চালান কতটা প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত কতটা লেনদেন করেন তাহা দেখিলেও বুঝা যায় ভারত সরকার আন্তর্জ্জাতিক বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করেন কি না। বিশেষত যে সকল দেশের সহিত ভারতের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ তুলনামূলকভাবে অল্পই, সেই সকল দেশের মহারথীগণ ভারতে আসিলে অতিরিক্ত গোলমাল করিয়া আন্তরিকতা দেখাইবার প্রয়োজন আছে কি না তাহাও জনসাধারণ বিচার করিতে পারেন। অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারত বর্ত্তমানে জগৎ সভায় পিছনের আসনে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং কেহ কিছুমাত্র বন্ধুত্ব দেখাইলেই ভারত সরকার কিছুটা বাড়াবাড়ি করিয়া সেই বন্ধুত্বের প্রতিদান করিয়া থাকে। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় ভারতের বিভিন্ন সহরের প্রদেশের ও কেন্দ্রীয় রাজস্ব মোট ৪০০০ কোটি টাকার অধিক। ভারতের জনসংখ্যা এখন যদি প্রায় ৫০ কোটি হয় ও মাথাপিছু আয় যদি বৎসরে ৩০০ শত টাকা হয় তাহা হইলে ভারতের মোট জাতীয় আয় বৎসরে প্রায় ১৫০০০ কোটি টাকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার তুলনায় ভারতের আন্তর্জ্জাতিক কারবারের হিসাবে দেখা যায় ১২০০ কোটি আমদানি ও ৮০০ কোটি রপ্তানি। অর্থাৎ আয়ের তুলনায় টাকায় এক আনা প্রমাণ আমদানি কারবার বিদেশের সঙ্গে ও রপ্তানি হয় টাকায় এক আনা হইতেও কম। দুইএর পার্থক্যের কারণ আমদানির ভিতর কর্জ্জা করিয়া যন্ত্রপাতি মালমশলা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে অনেক। বিদেশের যে সকল জাতির সহিত কাজ-কারবার খুব বেশী তাহারা হইল—

আমেরিকা	মোট	আমদানি	রপ্তানি	৫৮১	কোটি	বৎসরে
ব্রিটেন	,,	,,	,,	৩২৮	,,	
রুশিয়া	,,	,,	,,	১৫৬	,,	
জাপান	,,	,,	,,	১৩৭	,,	
ওয়েষ্ট জার্ম্মানী	,,	,,	,,	১২৬	,,	
ইরাণ	,,	,,	,,	৩৫	,,	
ক্যানাডা	,,	,,	,,	৪৬	,,	
অষ্ট্রেলিয়া	,,	,,	,,	৪৫	,,	
চেকোশ্লোভাকিয়া	,,	,,	,,	৩৬	,,	
ইতালি	,,	,,	,,	২৮	,,	
সুইডেন	,,	,,	,,	২৬	,,	
মলয়	,,	,,	,,	২৬	,,	
সুইৎজারল্যাণ্ড	,,	,,	,,	২৩	,,	
ফ্রান্স	,,	,,	,,	২৩	,,	
সিংহল	,,	,,	,,	২২	,,	
ইষ্ট জার্ম্মানী	,,	,,	,,	১৮	..	
ইউগোশ্লাভিয়া	,,	,,	,,	১৫	,,	,,

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, জাতীয় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে কোন কোন পরম বন্ধুদিগের অংশ অত্যন্তই অল্প। মোট আমদানি রপ্তানি যদি ২০০০ কোটি ধরা হয় তাহা হইলে তাহাতে অনেকেরই শতকরা এক বা

বেছু ভাগ আছে দেখা যায়। এই সকল দেশ আর্থিক অবস্থায় ভারতের তুলনায় বহু উন্নত। ইহাদিগের যদি ভারতের প্রতি সভ্যকার সখ্য থাকিত তাহা হইলে আমদানি রপ্তানি আরও অনেক অধিক হইত। ভারতে ধর্ম, দুনীতি ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের যে সরকারী অভিনয় দিনের পর দিন চলিতে থাকে গরীবের পয়সার অপব্যয় করিয়া তাহাতে ভারতের স্থান জগতে ক্রমশঃ নিচে নামিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকার সম্ভব হয় না যতক্ষণ ভারত সরকার বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করিয়া মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঘুরিতে থাকিবেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে, গরীব দেশের পক্ষে জাঁকজমক করিয়া অত অধিক অতিথি সম্বর্দ্ধনা না করিলেও চলে। আমরা অনেক বৎসর পৃথিবীর নানান দেশে যাঁহারা বাস করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট শুনিয়াছি যে ভারতের এই ক্ষেত্রে অশোভনভাবে বাড়াবাড়ি করা দেখিয়া অপর দেশের লোকে হাসাহাসি করে।

চীনভীতির প্রতিবিধান

চীন ক্রমশঃ সামরিকভাবে ভয়াবহ আকার ও উগ্রতা ধারণ করিতেছে। নানা অস্ত্রে পূর্ণ সজ্জিত ও তাহার ব্যবহারে নিখুঁতভাবে শিক্ষিত সৈন্যসংখ্যা চীনের আছে প্রায় এক কোটি। ইহা ব্যতীত চীনের ৩০০০-৫০০০ বোমারু ও লড়িয়ে হাওয়াই জাহাজ আছে ও সেইগুলির অস্ত্র হিসাবে কিছু কিছু আণবিক বোমাও ঐ দেশে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ডুবুরী যুদ্ধ জাহাজ ও অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজও আছে তাহাদিগের যথেষ্ট। অর্থাৎ সামরিকভাবে চীন এখন আমেরিকা ও রুশিয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে ও ভারতের তুলনায় চীনের সামরিক শক্তি সবিশেষভাবে অধিক। একথা যদিও মানা হয় যে, আত্মরক্ষার জন্য সামরিক শক্তি পরদেশ আক্রমণ করিবার প্রয়োজনের তুলনায় অল্পই লাগে; তাহা হইলেও ভারতের চীনের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সৈন্য ও অস্ত্রবল আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে স্বাবলম্বনের সহিত পরমুখাপেক্ষিতা কতটা জড়িত আছে তাহা আমাদিগের জানা নাই। অনেকটা আছে বলিয়াই সকলের ধারণা। কারণ ভারতের রাজনীতিবিদগণ সর্ব্বদাই পরের উপর নির্ভর করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। চীন যদি ভারত আক্রমণ করে অথবা পাকিস্তানকে পূর্ণ উদ্যমে সামরিক সাহায্য করে তাহা হইলে আফ্রিকা বা অপর কোন মহাদেশের অল্পশক্তিশালী জাতিদিগের সাহায্যে ভারত আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। আমেরিকা, ব্রিটেন ও রুশিয়া ভারতকে বিশেষ কোন সাহায্য করিবে বলিয়াও মনে হয় না। এই অবস্থায় ভারত রক্ষক কংগ্রেস দল অপর অনেক কার্য্যে যেরূপ সক্ষমতা দেখাইয়াছেন দেশরক্ষা করিতেও সম্ভবত সেইরূপই কর্মক্ষমতা দেখাইবেন। ভারতের জনসাধারণ অবশ্য পরাধীনতা চাহেন না, কিন্তু তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতেও জানেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের প্রয়োজন আত্মরক্ষার অধিকার নিজ হস্তে লওয়ার চেষ্টা করা। বামপন্থী রাষ্ট্রীয় দলগুলির মধ্যে বৃহৎ একটি দল সম্ভবত চীনের অধীনে যাইতে পারিলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করিবেন। অন্য দলগুলিও কংগ্রেসের অনুকরণে পরমুখাপেক্ষিতায় বিশ্বাসী। রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে কোন কার্য্যের ভার দিলে তাহার ফল মঙ্গলজনক হইবে না। দেশবাসীর কর্ত্তব্য রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে নিষ্কাশিত করিয়া শাসন-কার্য্য সাধারণের নিজ অধিকারে আনয়ন করা। ইহা করিবার উপায় দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে দেশের প্রতিনিধি খাড়া করিয়া রাষ্ট্রশক্তি হইতে নিগুর্ণ দলপতিগুলিকে অপসৃত করা। তৎপরে দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন; সামরিক সকল অস্ত্র তৈয়ারীর ব্যবস্থা ও যাহাতে অতিশীঘ্র ভারতের সৈন্যসংখ্যা ৫০ লক্ষাধিক হয় ও তাহারা স্বয়ংচালিত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে শেখে তাহার বন্দোবস্ত যেমন করিয়া হউক করা। আণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার ক্ষমতা, জ্ঞান ও উপাদান প্রভৃতি দেশে আছে। ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ও সাহস নাই। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং সেই পরিবর্ত্তন সঙ্কীর্ণ সুবিধাবাদের দাস নিষ্কর্মা ও স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব নেতাদিগের দ্বারা হইতে পারে। আমাদিগের স্বাধীনতার ও জাতীয় আদর্শের নূতন অভিব্যক্তি প্রয়োজন।

ভারত রাষ্ট্র পরিচালনা

অনেকে জানিতে চাহেন যে, ভারত সরকার অর্থাৎ ভারতের শাসনকার্য্য যে ভাবে চলিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া কিরূপভাবে রাজকার্য্য চলিলে ভারতীয় মানবের অবস্থা ও প্রগতি আরও উন্নত ও অগ্রগামী হইত। এই কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তাহার কারণ ভারত আকারে বৃহৎ ও জাতি, ভাষা, রীতিনীতি, উৎপাদনশীলতা, প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্য্যে এবং অপরাপরভাবে বৈচিত্র্যময়। ভারতের বর্ত্তমান স্বাধীন যুগের পূর্ব্বে ভারত ব্রিটেনের অধীনে ও তাহারও পূর্ব্বে মুসলমান বাদশাহ ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদিগের অধীনে কয়েকশত বৎসর থাকায় নানাস্থলে নানান প্রকারে অবস্থা-ভেদ হইয়াছিল; যাহার জের টানিয়া চলা এখনও শেষ হয় নাই। তাহার পূর্ব্বে মৌর্য্য ও গুপ্ত সম্রাটদিগের সময় ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি অনেকটা একভাবে ও একপথে চলিত, কিন্তু সে অভিন্নতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখন আর দেখা যায় না। তাহার প্রকাশ শুধু মূল সভ্যতার ও কৃষ্টির ধারার মধ্যে লক্ষিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মে, আচার-বিচারে, খাদ্যে, বস্ত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, পরস্পরের জীবনযাত্রা ও রুচির গুণগ্রাহিতায় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীগুলি নিজেদের মূল একত্ব সকলভাবে স্বীকার করিয়া চলিতে সমর্থ। বর্ত্তমান স্বাধীনতা পাইবার পরে ভারতের শাসন ও রাজকার্য্য যে ভাবে চালান হইয়াছে তাহাতে মনে হয় কংগ্রেসী নেতাগণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ভেদ নীতি বজায় রাখিয়াই চলা স্থির করিয়াছিলেন; এক জাতি, এক প্রাণ, এক জীবনধারা গঠন চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। ইহার ভিতরে আবার একটি হিন্দী ভাষা প্রচারের বিষ ঢালিয়া ভারতের আন্তরিক মিলনের পথে একটা অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। ফলে স্বাধীনতার পরে ভারতের প্রদেশগুলি স্বার্থান্বেষী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের কবলে পড়িয়া সর্বত্রই শাসন ও রাজ কার্য্যের অশেষ দুর্গতির সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ভারত সরকার ব্রিটিশ নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ঢং এ চলিতে থাকায় প্রাদেশিক রাজদ্রোহ আর বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত না। এই কারণে প্রদেশগুলি বিভক্ত হইয়া ভারতের প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়া আনিবার আশা ক্রমশঃ দূর হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। এবং এই বিভাগের মধ্যেও বৃহৎ বৃহৎ প্রাদেশিক সংখ্যা লঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়া বিভেদের বিষ আরও সর্ব্বনাশী হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যথা বিহারে মৈথিলী, ভোজপুরী ও বাঙ্গালীর অমিলন। অথবা আসামে সকল পার্ব্বত্য জাতিই আসামীদের প্রভুত্ব মানিতে অনিচ্ছুক।

তাহা হইলে দেখা যায় নেহেরুর ভারত বিভাগ ও তৎপরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রাদেশিক ভাগবাট ভারতের এক মহা সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। হিন্দী প্রচার হইয়াছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। সুতরাং ভারত যদি তাহার হৃত স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইতে চাহে তাহা হইলে প্রথমত ভারতের ভিতরের বিভাগগুলি ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া এক দেশ ও এক জাতি গঠনের আয়োজন করা একান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম, ভাষা বা রীতিনীতির বিভেদ থাকিলেও এক জাতি ও এক আদর্শ গঠন অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি ১৫।২০টি ষড়যন্ত্রকারী গণ্ডিকে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ লুট করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে দেওয়ার পথ খোলা থাকে তাহা হইলে ভারতের এক মহাজাতি গঠন করিয়া সকল ভারতবাসীর সমৃদ্ধি অর্জ্জন কখনও সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ কংগ্রেসী রাজত্বের অবসান ঘটিলে ভারতের সংবিধান বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত না হইলে ভারতের উন্নতি ও জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি অসম্ভব হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডি ও গোষ্ঠীর শোষণ কার্য্যও নিবারণ করা সম্ভব হইবে না। ইহার পরে বাকি থাকিবে পাকিস্থান ও ভারত এক হইয়া যাওয়া কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যদি ভারতের সকল দেশ এক না হয় তাহা হইলে বৃহত্তর আদর্শ উপলব্ধির কথা কেমন করিয়া উত্থাপিত হইতে পারে। হিন্দী প্রচার ও ভারতীয় মানবের জীবনযাত্রার উপর নানাভাবে আক্রমণ বন্ধ না করিলে সর্ব্বভারতীয় সহানুভূতি প্রাপ্তি ভারতের শাসকগণের কদাপি হইবে না। এই আক্রমণ বহুরূপী ও ইহার প্রকোপ সর্ব্বত্র অনুভূত। শাসন কার্য্য ও রাজ অধিকার যখন সকল মানুষের উপরই বোঝা হইয়া দাঁড়ায় ও কোন মানুষই যখন সেই বোঝা বহন করিয়া মনে করে না যে সেই কার্য্য তাহারই নিজের মঙ্গলের

জন্য সে করিতেছে তখন সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আজ ভারতীয় মানব তাই ভাবিতেছে যে সে চাহে না—

ভারতের মুদ্রা ক্রমশঃ আরও মূল্যহীন হয়,
ভারত ক্রমশঃ সামরিকভাবে আরও দুর্ব্বল হইয়া যায়,
ভারতের কোনও অংশ চীন বা পাকিস্তানের দ্বারা অধিকৃত থাকে,
ভারতের মানব দরিদ্রতা ও বেকারত্বের ধাক্কা একাধারে পাইতে থাকে,
ভারতে ক্রমান্বয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রমাণহীন আন্দাজের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালিত হয়, (যথা স্বর্ণ, সন্দেশ, বিদেশী মুদ্রা, বিদেশ ভ্রমণ, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি)
ভারতের কোন কোন ব্যবসাদার গণ্ডির লোক উত্তরোত্তর আরও অর্থশালী হইয়া উঠে,
ভারত জগতের চক্ষে হেয় কর্জ্জাদাররূপে হাত পাতিয়া দিন কাটায়,
ভারত রাজস্বজাত বা ঋণের টাকায় বৃহৎ কারখানাবাদ চালাইয়া গ্রামের লোকেদের অবস্থা আরও মলীন করিয়া তুলিতে থাকে বা গ্রামগুলি বহু ক্ষেত্রেই সহরের সহিত সকল সম্বন্ধহারা হইয়া টিমটিম করিতে থাকে, এবং
ভারতের স্বাধীনতার পরেও শিক্ষা বিস্তার পূর্ণ না হইয়া মধ্যপথে পড়িয়া থাকে।

এই সকল সমালোচনাত্মক কথার উত্তরে রাষ্ট্রনেতাগণ বলিবেন যে ভারতের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তাঁহারা এই সকল ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং এই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে ভারতকে সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে। সেই উত্তর শুনিয়া দরিদ্র ভারতবাসী খুসী হইত যদি দেখা যাইত যে, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি অন্তত সাধারণ সক্ষমতার সহিতও চালিত হইতেছে। কিন্তু দেখা যায় যে, ভারতীয় সরকারের অন্যান্য সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মতই তাঁহাদিগের আর্থিক পরিকল্পনাজাত কারবারগুলিও অক্ষম আবেগের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেলওয়ে ও পোষ্ট টেলিগ্রাফ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এরূপ একাধিপত্যের মধ্যে অবস্থিত যে তাহার সকল দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও সেগুলি লাভে চলে। কিন্তু বাস চালাইলে তাহা লোকসান খাইয়া খাইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কারখানাগুলি সবই লোকসানে চলে। জল সেচন ব্যবস্থা বা বিদ্যুৎ উৎপাদনও লোকসানের কারণ। ইহা ব্যতীত শান্তি-রক্ষার কার্য্যে যত অসংখ্য টাকা ব্যয় হয় তাহাতেও শান্তিরক্ষা বা দেশের লোকের জীবন ও সম্পদ রক্ষার কার্য্য উপযুক্তভাবে সাধিত হয় না। একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যাইবে, যে ভারতশাসন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্য্যের জন্য যত সহস্র সহস্র ইমারতে যত লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারীগণ বসিয়া থাকে সেই অনুপাতে কোন কার্য্যই ঠিক মত হয় না। শুধু জাতীয় জীবন প্রবাহে বাধা ও অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এই কারণে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্য প্রয়োজন এই সকল লোকগুলিকে প্রকৃত জাতীয় উন্নতিকর কার্য্যে নিযুক্ত করা, নয়ত তাহাদিগের মধ্যে বেশীর ভাগ লোককে কার্য্য হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া। এই কার্য্য কংগ্রেস দলের নিষ্কর্ম্মাদিগের দ্বারা হইবে না। কারণ তাঁহারা কাজ করার অর্থ বুঝেন না। নিজেরা যেরূপ শুধু কথা বলিয়া ও ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া দিন গুজরান করেন অপরেও সেইভাবে বিনা পরিশ্রমে কর্ম্মের অভিনয় করিয়া চলিলে তাঁহারা সেই বিরাট প্রবঞ্চনাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে পারেন না। যাহারা কাজ করিয়া খায় তাহারাই শুধু কাজের অর্থ ও মূল্য বোঝে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও অভিনেতাদিগকে সরাইয়া কাজের লোক আনিয়া জাতীয় উন্নতি ও অভাব নিবারণের কার্য্যের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৭৩

তৃতীয় সংখ্যা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত কোন কোন পুস্তক ভারতবর্ষের অপরাপর ভাষাতেও তর্জমা করা হইয়াছে। শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ বাংলায় বহুকাল রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির লক্ষ লক্ষ খণ্ড বাংলার শিশুমহলে প্রচারিত হইয়াছে। এখনও তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তক বিশেষভাবে আদৃত ও সুপ্রচলিত আছে। শিশুসাহিত্য রচনার যে আদর্শ ও পন্থা যোগীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এখন অবধি তাহা হইতে আরও সহজ সরল ও উপভোগ্য নূতন কিছু তাঁহার পরবর্তী লেখকেরা বাংলার শিশুদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার লেখার সমাদর বাংলার সাধারণের মধ্যে প্রায় বংশানুক্রমিকভাবে চালিত রহিয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম হয় ১২৭৩ সালের ১২ই কার্ত্তিক। তিনি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয় ছিল ২৪ পরগণার জয়নগর গ্রামে। তাঁহার পিতা নন্দলাল দেব-সরকার ঝড়ে ঘরবাড়ী উড়িয়া যাওয়ায় নিজ গ্রাম নেতড়া (ডায়মণ্ড হারবারের নিকটে) ত্যাগ করিয়া জয়নগরে শ্যালকের গৃহে গমন করেন। সেইখানেই যোগীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার তিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র, নীলরতন ও উপেন্দ্রনাথের তখন বয়স ক্রমান্বয়ে ৭, ৩, ও ১ বৎসর। দেব-সরকার পরিবারের ইহার বহুপূর্ব্বে যশোহরে নিবাস ছিল। এই পরিবারের অনেক শাখা-প্রশাখা। উত্তর কলিকাতার দেবেরাও ঐ পরিবারের ও ঐ বংশের। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পিতা নন্দলাল নামে শুধু সরকার লিখিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র প্রথম ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তৎসঙ্গে অপর ভ্রাতাগণও ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

যোগীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতাতেই হইয়াছিল। তিনি সুলেখক, সুরসিক ও স্বভাবকবি ছিলেন। শিশু-দিগের প্রতি বন্ধুভাব ও মমতা তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে জাগ্রত ছিল। আমাদিগের যতদিনের কথা মনে পড়ে আমরা তাঁহাকে শিশু ও বালক-বালিকা পরিবেষ্টিতই দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি গল্প বলিতে পারিতেন অসাধারণ কল্পনা ও বর্ণনা শক্তি দেখাইয়া। তাঁহার ভাষা সুললিত ও সহজবোধ্য ছিল। মাঝে মাঝে ছড়া কাটিয়া অথবা উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনা করিয়া তিনি গল্পের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেন। শিশুপাঠ্য বহু পুস্তক রচনা করিয়া তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে. নিছক কল্পনা গদ্যে ও পদ্যে ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শিক্ষার বিষয় লইয়া গতিশীল হইয়া উঠিতে পারে এবং শিশুরা গল্পচ্ছলে নানানভাবে জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। সুনীতি ও উচ্চ আদর্শের কথাও শিশুদিগের মনে গল্প ও কবিতার সাহায্যে স্থির নিশ্চয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তিনি পুরাতন পদ্ধতিতে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া ভূত, প্রেত,

রাক্ষস ইত্যাদির গল্প রচনা করেন নাই। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া শিশু ও বালক-বালিকাগণ চিন্তা ও ভালমন্দ বিচার ক্ষেত্রে আধুনিক আদর্শবাদ ও পুরাতন নীতিবোধের সমন্বয় করিতে সক্ষম হয়—দুর্বোধ্য উপদেশের সাহায্য কিছুমাত্র না লইয়া। যথা:

ভাল ছেলে পাঠশালে সোজা চলে যায়, দাঁড়ায়ে না কথা কয়, পথে না খেলায়।	মন্দ ছেলে পথে দেরী করে খেলা গিয়ে, পুকুরে ভাসায় জুতা পাল তুলে দিয়ে।
ভাল ছেলে বড় আশা হৃদয়েতে পোষে, এক মনে আপনার পড়া করে বসে।	মন্দ ছেলে সারাদিন ঘোরে হেসে খেলে, না চায় ছুঁইতে বই, পায়ে ছুঁড়ে ফেলে।
ভাল ছেলে পড়া দিতে নাহি করে ডর, জিজ্ঞাস' যা দেয় তার তখনি উত্তর।	মন্দ ছেলে— মাথা তার চুলকান সার "চিক্কণ" বানান করে 'চ'য়েতে আকার।
ভাল ছেলে পড়া তার ভাবে শুধু বলে, অঙ্কটি না দিতে দিতে দেয় তাই ক'সে।	মন্দ ছেলে শ্লেট ধরে কাটিয়া আঁচড়, মুখ লুকাইয়া দেয় সন্দেশে কামড়।
ভাল ছেলে ধেয়ে চলে পুলকিত মন, পাইয়াছে পুরস্কার মনের মতন।	মন্দ ছেলে দাঁড়াইয়া যেন জানোয়ার মাথায় গাধার টুপি— খাসা পুরস্কার!

ইহার সহিত উপযুক্ত চিত্রাবলী থাকায় মন্দ ছেলের শিশু-সভায় উচ্চ স্থান গ্রহণের কোন আশাই থাকে না।

"আষাঢ়ে স্বপ্ন" পুস্তকের একটি স্বপ্নে যোগীন্দ্রনাথ পশুদিগের মধ্যে মানুষের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে একত্র বাসের কথা স্বপ্নে শুনিয়াছিলেন। কুমীর সজলনেত্রে বলিল,

> "বড় সুখী হইলাম সুপ্রস্তাব শুনে
> দিবানিশি জলিতেছি মনের আগুনে।
> শত অনাহার মরে করেছি ভক্ষণ,
> বিবেক দংশনে তাই আসিছে ক্রন্দন।"

কিন্তু হস্তীর মানব চরিত্রে বিশ্বাস নাই। "মানুষের মত নীচ ত্রিভুবনে নাহি।

> সন্ধিতে সাক্ষর তার কতক্ষণ লাগে,
> সর্ত্ত কিন্তু ভাঙ্গিবে সে সকলের আগে।
> ... ...
> অন্তরে বিদ্বেষ, সদা বিষবাণ হানে
> আপনার স্বার্থ ছাড়া কিছু নাহি জানে।
> যে যত কপট আর যত বেশী খল।
> রাজনীতি ক্ষেত্রে সে ততই প্রবল!
> বুড়ো সুড়ো হইয়াছি বুঝিয়াছি সাড়;
> প্রবলের ক্রীতদাস নর কুলাঙ্গার!" ইত্যাদি।

অঙ্ক শাস্ত্র লইয়া খেলার সাহায্যে জ্ঞান সঞ্চার করা যায়। যথা, "সন্দেশের হিসাবে" দেখা যায়

> "একটি হাতে তিনটি আছে
> আরেক হাতে ছয়;
> যোগ করিয়া খাই য'দ
> 'নয়টি' শুধু হয়।
> বিয়োগ য'দি করি' মোটে
> 'তিনটি' হবে খাওয়া,
> ভাগ করিলে 'দু'য়ের বেশী
> যাবে না ক পাওয়া।
> এখন থেকে দুইটি হাতে
> যতগুলি পাবো,
> সবার আগে গুণ করিয়া
> তার পরেতে খাবো।
> একটু মাথা ঘামিয়ে যদি
> 'আঠারটি' পাই,
> বোকার মত কেন তবে
> অল্প খেতে যাই!'

সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে "কাকাতুয়া" 'বলিতেছে—

> বলিতেছে সোনার ঘড়ি 'টিক্ টিক্ টিক্,
> যাকিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক।
> সময় চলিয়া যায়
> নদীর স্রোতের প্রায়,
> যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শত ধিক্!'
> বলিছে সোনার ঘড়ি, 'টিক টিক টিক!'

গদ্য গল্প ও কাহিনীর মধ্যে অনেক গল্পই তাঁহার স্বরচিত ছিল। কিছু কিছু তিনি নিজের ভাষায় উপাখ্যান, পুরাণ, বিদেশী কাহিনী প্রভৃতি হইতে লইয়া লিখিয়াছিলেন। ছোটদের জন্ত রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া তিনি

ঐ দুই গ্রন্থের প্রচার শিশু-মহলেও করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পশুপক্ষী সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া তিনি শিশু-দিগের জীবজন্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। দেশভক্তি ও জাতীয়তা শিক্ষার জন্ত তিনি সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত 'বন্দে মাতরম' গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বৎসরে এই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ হয়। "গল্প সঞ্চয়" পুস্তকে তিনি শিশুমহলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ শিশু ও বালক বালিকাদিগের পাঠের উপযুক্ত সকল প্রকার গ্রন্থই তিনি লিখিয়া বা সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে নির্দোষ আনন্দ লাভের ব্যবস্থাই অধিক ছিল। তাঁহার কল্পনাশক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর বাংলা দেশের শিশু ও বালক-বালিকাগণ যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে নিজেদের পরম বন্ধু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকী বাংলার শিশুদিগের মহোৎসবের বিষয়। উদ্ভট কল্পনাকে সরল রূপ দান করিয়া শিশুদিগকে আনন্দ দান করা ও তাহাদিগের চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার কার্য্যে যোগীন্দ্রনাথের সমকক্ষ লোক আধুনিক ভারতে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই।

"এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো।
"আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল;
ডাঙায় চরে রুই কাতলা
জলের মাঝে চিল!

* * *

"ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই 'নে বসে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে!

* *

"ঝিঙিপী সে তেড়ে এসে,
কামড় দিতে চায়,
কচুরি আর রসাগোল্লা
ছেলে ধরে খায়!

* *

'মজার দেশের মজার কথা
বল্‌বো কত আর;
চোখ খুললে যায় না দেখা
মুদলে পরিষ্কার!"

শিশু ও বালক-বালিকাদিগের পরম বন্ধু যোগীন্দ্রনাথের নিজের সমবয়স্ক বন্ধুরও অভাব ছিল না। তাঁহার গিরিধির বাসভবন গোলকুঠিতে প্রতি বৎসর পূর্ণিমা সম্মেলন হইত পূজার ছুটির কাছাকাছি লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনে। তাহাতে গান গাহিতেন প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় কুলদারঞ্জন রায়, "বেলখোস" উদ্ভাবক হেমেন্দ্রমোহন বসু ও অন্যান্য বহু গুণী ব্যক্তি। গিরিধি তখন বাংলার গুণীজনের ছুটির সময়ের আবাস-কেন্দ্র ছিল। স্যর নীলরতন সরকার, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ ডি, এন, মৈত্র, গগনচন্দ্র হোম, প্রভৃতি বহু কলিকাতাবাসী ব্যক্তি গিরিধিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গিরিধিকে কেন্দ্র করিয়া কোডার্ম্মার জঙ্গলে মৃগয়া করিতেও অনেকে যাইতেন। যোগীন্দ্রনাথের নিজের বড় পুকুরে মাছ ধরিতে বসিতেন বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি। বাংলার কৃষ্টি যেমন সে যুগে বাংলার বাহিরে বহুস্থলে গড়িয়া উঠিয়াছিল; বারগণ্ড', গিরিধিতেও সেইরূপ একটি বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শরীর অসুস্থ হওয়ায় যোগীন্দ্রনাথ পরে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার মনপ্রাণ সর্ব্বদাই সেই দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষশোভিত গোল কুঠিতেই পড়িয়া থাকিত।

দেবজ্যোতি বর্ম্মণ

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবজ্যোতি বর্ম্মণের জন্ম হয়! ঐ বৎসরটি বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবজাগরণের আরম্ভ বৎসর। স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী বস্ত্র প্রভৃতি বর্জ্জন, যুবশক্তিকে সংহত-সংযত করিয়া প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন, ইত্যাদি বহু দেশপ্রেম উদ্ভূত আদর্শের সুরু হইল ঐ বৎসরে। অর্থাৎ জন্মকাল হইতেই দেবজ্যোতি দেশের কথা শুনিয়া, স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের আদর্শে শিক্ষিত হইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষা ও অন্তরের প্রেরণা ক্রমশঃ জোরাল হইয়া উঠিতে থাকে ও প্রায় ষোল-সতের বৎসর বয়স হইতেই দেবজ্যোতি স্বাধীনতা সংগ্রামের আবর্ত্তে পূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপাইয়া পড়েন। বি. এস-সি পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি কারাবরণ করেন এবং প্রায় আট বৎসর কাল বন্দী অবস্থায় কাল যাপন করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জেলে থাকিতেই তিনি অর্থনীতিতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, উপাধিপ্রাপ্ত হন ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে

আবার কারাগার হইতেই অর্থনীতিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন! ইহার পরে তিনি কারামুক্ত হইয়া কর্ম্ম-জীবনের কার্য্যারম্ভ করেন। এই কার্য্যের মধ্যে মধ্যে তাঁহার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল নানান বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া। তিনি ক্রমান্বয়ে সারা জীবনে অর্থনীতির দুই শাখায় দুইবার, কমার্সে একবার, ইতিহাস, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি এবং মুসলমান ইতিহাস ও কৃষ্টিতে তিনবার, দর্শনে একবার, ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও ভাষা বিদ্যায় চারবার—মোট এগারবার এম, এ, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি আইনের বি, এল, পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা অর্জ্জনের আগ্রহ ও পূর্ণভাবে পাঠ করিয়া ও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করা, ইহা তাঁহার জীবনের একটা মহামন্ত্রের মতই ছিল।

তিনি কোন কথাই উত্তমরূপে না জানিয়া বলিতেন না, ও জানিবার চেষ্টা তাঁহার সর্ব্বজনগ্রাহ্য পথেই চলিত। তিনি পরে যখন সাংবাদিকের কার্য্য আরম্ভ করেন তখন তাঁহার জ্ঞানের প্রসার ও বিস্তার জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি "আনন্দবাজার", "বসুমতী", "ভারত" প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকাতে কাজ করিয়াছিলেন ও "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" মাসিকদ্বয়ের কার্য্য বহুদিন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও পাঠকদিগকে যে-কোন বিষয় নিশ্চয়ভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা শীঘ্রই ভারতবিখ্যাত হইয়া পড়ে। যখন তিনি "যুগবাণী" সাপ্তাহিক পুনরায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি "বঙ্গবাসী" কলেজের শিক্ষকের কার্য্য করিয়া নিজ পরিবার প্রতিপালনের খরচ ও পত্রিকার লোকসান মিটাইতেন। এই অবস্থা তাঁহার বহুকাল ছিল, কিন্তু তিনি অভাবকে কখনও বিশেষ আমল দিতেন না। তিনি অকপট আদর্শবাদী ও দেশের মঙ্গল ও উন্নতির কার্য্যে নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন প্রভৃতিতে তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ও সকল স্থানেই তিনি কৃতী, কর্ম্মী ও সৎসাহসী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে উন্নত দেশগুলির উন্নতির মূল কোথায় দেখিয়া আসিয়াছিলেন ও আমাদিগের নিজ দেশের কি কি কারণে উন্নতি হইতেছে না তাহাও সাক্ষাৎভাবে দেখিয়াছিলেন। নিজের অর্থনীতির জ্ঞান ও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মিলিত শক্তি-দ্বারা তিনি এই সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনায় সবিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা জাতীয় নেতাদিগের ও শাসক মহলের আমলাদিগের বিরুদ্ধেই অনেক সময়ে যাইত। এই কারণে তাঁহাকে লোভ ও ভয় দেখাইয়া সরকার বাহাদুরের গা বাঁচাইয়া চলিতে শিখাইবার চেষ্টা হইত; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি বড় চাকুরি কিংবা অপরভাবে অর্থ বা সম্মান লাভের লোভ অনায়াসেই সম্বরণ করিতে পারিতেন; কারণ তিনি ব্যয়-বাহুল্য করিয়া জীবনযাত্রাকে শাখাবহুল করিয়া তোলায় বিশ্বাস করিতেন না। সহজ সাদাসিধে জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তাই তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল। তিনি এই কারণেই বিষয় প্রমাণ করিয়া সমালোচনা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। রাষ্ট্র বা ব্যবসার ক্ষেত্রের মহারথীদিগের দোষ দেখাইয়া দিতে তিনি ভাল করিয়াই পারিতেন ও দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রকাশিত "বিড়লা বাড়ীর রহস্য" ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। ঐ সূত্রে তাঁহাকে দাবাইবার চেষ্টা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। রাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ লোকেদের হুমকি বা অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া দেবজ্যোতি নিজ কার্য্য করিয়া চলিতেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি মধ্যমগ্রামে নিজের একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সেইখানে বাস আরম্ভ করেন। তিনি সেখান হইতেই কলিকাতায় যাতায়াত করিয়া কাজ চালাইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সিটি কলেজের (আনন্দ-মোহন কলেজ অংশের) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহাতে তাঁহার কাজ বাড়িয়া যায়। তিনি "যুগবাণী"র দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করিবারও চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সকল কারণেই সম্ভবত তাঁহার শরীর খারাপ হইতে আরম্ভ করে। তাহাতে এই অক্লান্তকর্ম্মী মহাতেজস্বী ব্যক্তির কর্ম্মের আগ্রহের ও দেশসেবার প্রেরণার কোন লাঘব হয় নাই। তিনি অসুখ অগ্রাহ্য করিয়াই পূর্ণ উদ্যমে নিজ কার্য্য চালাইতেছিলেন ও শেষে তিনি কর্ম্মের যুদ্ধক্ষেত্রেই যুদ্ধরত-ভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাংলা তথা ভারত তাঁহার মৃত্যুতে এক মহাবীর সন্তানকে হারাইয়াছে। বীরত্বের

সহিত গভীর জ্ঞানের সংযোগ থাকায় তিনি অনন্য-সাধারণ ছিলেন। দেশবাসী তাঁহার অভাব মনেপ্রাণে অনুভব করিতে থাকিবেন।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেবজ্যোতির স্থান খুবই উচ্চে ছিল। সাংবাদিক হিসাবে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিতেন তাহা দেশের উচ্চতম দরবারে পৌঁছাইয়া নেতাদিগের চিন্তার ধারার দিক ও গতিবেগ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিত। শিক্ষকতার ভিতর দিয়া তিনি তরুণদিগের মনে দেশপ্রেম ও কর্ম্মের আগ্রহ জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ও বহু ছাত্রগণ তাঁহার মতের অনুসরণ করিতেন। অনেকে বলিত তিনি ছাত্রদিগের উদ্দাম ব্যবহারের কোন প্রতিকার চেষ্টা করিতেন না; কিন্তু তিনি ছাত্রদিগকে উত্তমরূপে চিনিতেন ও তাহাদিগকে ঠিক পথে চালাইয়া লইতেও তিনি বিশেষ-ভাবে সক্ষম ছিলেন। ছাত্রদের তিনি বন্ধু, গুরু ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে শাসক বলিয়া জানিত না। যুবজনের খুঁত ধরা তাঁহার মতে বর্ত্তমান ছাত্র বিক্ষোভের প্রতিকারে সাহায্য করিতে পারে না। মূল কারণ না বুঝিয়া শুধু ছাত্রগণ উদ্দাম ও অবাধ্য বলিয়া চিৎকার করিয়া কোন লাভ হয় না। বয়স্ক লোকেরা, বিশেষ করিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, নিজ নিজ কার্য্যে অক্ষমতা দেখাইয়া দেশের অবস্থা নানাভাবে উত্তরোত্তর খারাপ করিয়া ফেলিয়া দেশে অন্যায়, অভাব ও নিরাশার প্রভাব প্রকট করিয়া তুলিয়াই সকল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় আনন্দ, আশা, সফলতা ও জীবনযাত্রায় নিশ্চয়তা না দেখিতে পাইয়া যদি অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণ সংযম হারাইয়া উদ্দামতার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। যে সকল মহারথীদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া আজ দেশের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে তাঁহাদিগকে আত্মসংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। দেবজ্যোতি এই কার্য্য সবল ভাবেই করিতেন। কিন্তু এই কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি যে সকল তরুণ-তরুণীগণ তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ দেবজ্যোতি বর্ম্মণের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া দেশের ও দেশবাসীর মঙ্গল সাধনে সক্ষম হইবেন।

ক্রিকেটের কথা

ভারত সরকার ও অন্যান্য কংগ্রেস সরকারগুলির ইচ্ছা যে ভারতের সকল খেলোয়াড় ও ব্যায়ামবিদগণ তাঁহাদিগের হুকুম ও সুবিধা অনুসারে চলেন। কিন্তু এই সকল শক্তি-সাধক ক্রীড়াক্ষেত্রের যুবজনের কোনও সাহায্য করিতে তাঁহারা অপারগ। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও ব্যায়ামবিদগণ যাইতে চাহিলে ভারত সরকারের অর্থকষ্ট হয়। যথা, এইবার ব্যাঙ্ককে আমরা যত লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক লোককে ভারত সরকার ছাটিয়া দিবার চেষ্টা করেন। কারণ? কারণ ১০০০ এক হাজার পাউণ্ড খরচ বাঁচানো! যদিও ভারত সরকারের অন্যান্য ব্যয় ও অপব্যয়ের জন্য বৎসরে শত শত কোটি পাউণ্ড জলবৎ বহিয়া যায়—কোথাও কেহ বুঝিতে পারে না। বাংলা সরকার যে টাকা খেলা ও ব্যায়ামের কার্য্যে দিয়া থাকেন তাহা ভাগ বাটি করেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। তিনি এতই উচ্চ আদর্শবাদী যে টাকা কি জিনিষ তাহা তিনি বুঝিতেও পারেন না। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা খেলাধুলার জন্য দিতে চান কিন্তু টাকা কে লইয়া যায় তাহা বুঝিতেও পারেন না। প্রদেশের স্পোর্টস কাউনসিল তাঁহারই একাধিকার ও তিনি এখন বাংলার ফুটবল ও ক্রিকেটের মহারথী।

ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করিয়া বহু লোকে বহু টাকা উপার্জ্জন করে ও এই টাকার মধ্যেও "কালো টাকা"ই অধিক। কারণ টিকেটগুলি সব সময়েই দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় হয়, অতুল্য ঘোষ ও তাঁহার অনুচরদিগের কর্ম্মশক্তির বিকাশের ফলে। ক্রিকেটের খেলাতেও ঐ কংগ্রেসী নেতৃত্ব ও কারসাজি। স্থান যদি থাকে ৫০০০০ লোকের তাহা হইলে টিকেট বিক্রয় হয় ৭০০০০। এবং টিকেটগুলি প্রথমে হাজারে হাজারে কিনিয়া ফেলেন অতুল্য ঘোষের বা অপর কোন নেতার চেলাগণ। তাহার পরে চলে "ব্ল্যাক" কারবার। যেমন ধরা যাউক ক্রিকেট খেলা হইবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সহিত ভারতের। ক্রিকেট অ্যাসো-সিয়েশন অফ বেঙ্গল লইলেন তাহার ভার। তৎপরে অতুল্যবাবুর কোন চেলা ধারে কিনিয়া লইলেন ৬০০০

টিকেট, যাহার ধার্য্য মূল্য ১৫০০০০ টাকা। সেইগুলি বিক্রয় করা হইল ধরা যাউক ৩০০০০০ টাকায়। তদুপরি কিছু টিকিট জাল করা হইল ও সেইগুলিও বিক্রয় করা হইল। তৎপরে লোকেরা খেলা দেখিতে গিয়া পুলিশের লাঠি খাইতে আরম্ভ করিল। পুলিশকে কেহ শ্রদ্ধা করে না; কারণ, পুলিশের চরিত্র। টাকা দিয়া পুলিশের লাঠি খাইতে রাজী না হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং লাঠির জবাবে ইট চলিতে সুরু হইল। তৎপরে আরম্ভ হইল কম্যুনিষ্ট দলের জগৎ রাষ্ট্রগঠন চেষ্টা বাসে ও দোকানে আগুন লাগাইয়া। অর্থাৎ পুরাতন ধরণের সকল রাজত্ব যদি অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া নষ্ট করিয়া না দেওয়া যায় তাহা হইলে জন-বা-গণ রাষ্ট্র কি করিয়া গঠিত হইতে পারে? অতএব অরাজকতার জয়ের ভিতর দিয়াই বিশ্ব-মানবের রাষ্ট্র গঠিত হইবে এই কথাটা কম্যুনিষ্টগণ প্রচলিত করেন। সেই রাষ্ট্র যে বিশ্ব-মানবের চরম দাসত্বের উপর নির্ভর করে সে কথা বলিতে সকলে ভুলিয়া যান। একদিকে কংগ্রেসের সমষ্টিবাদ অর্থে যেমন সমষ্টির অধিকাংশ লোকের অর্থকষ্টপীড়িত বেকারত্ববাদ বুঝিতে হইবে; অপরদিকে তেমনি কম্যুনিজমএর জন-স্বাধীনতার মানে হইল সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নাশ ও সকলকে কারখানা ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ পরিশ্রম বা প্রাণদান করিতে বাধ্য করা। এই উভয় "আদর্শবাদের" ধাক্কায় ভারতীয় মানবের সর্ব্বনাশ হইতেছে ও হইতে থাকিবে। যদি ভারতের সকল লোকের সমবেত চেষ্টায় কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টগণ রাষ্ট্র-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হন তাহা হইলেই ভারতের প্রগতি সম্ভব হইবে, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মানবতার অধিকারগুলি সংরক্ষিত হইতে পারিবে।

নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ ও সাধারণতন্ত্র

সাধারণতন্ত্র অর্থে বুঝিতে হয় যে দেশশাসন কার্য্য চালাইবার জন্য জনসাধারণ পূর্ণ স্বাধীন ও ন্যায্যভাবে নিজেদের প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অর্থাৎ ঐ স্বাধীনভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধি-গণ শাসনকার্য্যে সকল ব্যবস্থা করিবেন ও শাসনকার্য্য নিজেদের আয়ত্তাধীন রাখিবেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে জনসাধারণ ও নির্ব্বাচনের মধ্যে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় দল আসিয়া সেই স্বাধীন ও ন্যায্য নির্ব্বাচন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাচন কার্য্য রাষ্ট্রীয় দলগুলির নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থামত করাইয়া থাকে। এই দলগুলি ছল, বল ও কৌশলত ব্যবহার করেই নির্ব্বাচন নিজেদের ইচ্ছামত করাইবার জন্য; উপরন্তু রাষ্ট্রীয় দলপতিগণ নানা প্রকার অবৈধ উপায়ে ভোট সৃষ্টি করেন, বাজারের টাকা আনিয়া ভোটদাতাদিগের মধ্যে ভোটের বাজার খুলিয়া দেন ও ভলানটিয়ার বা সেচ্ছাসেবক-দিগকে পেশাদার ভোট সংগ্রাহকে পরিণত করেন। রাষ্ট্রীয় দলগুলি এদেশে যাহা করেন, অপর কোন সভ্য দেশে সেরূপ কার্য্য কোন রাষ্ট্রীয় দলই করে না। নির্ব্বাচন হইয়া যাইবার পরেও ঐ রাষ্ট্রীয় দলগুলি নিজেদের অর্থে ও চেষ্টায় নির্ব্বাচিত "জন প্রতিনিধি"-দিগকে দলের কেনা গোলাম হিসাবে হুকুম দিয়া চালাইতে থাকেন ও ঐ সকল ব্যক্তি জনগণের মত বা মঙ্গল চিন্তা না করিয়া দলপতিদিগের হুকুম মানিয়া চলাকেই সাধারণতন্ত্রের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লন। এই কারণে ভারতের সাধারণতন্ত্রের দ্বারা জনসাধারণের হিত সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বহু শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা শাসন চালাইবার ব্যবস্থা তাহা একটা হাস্যকর মিথ্যা অভিনয়ের মত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ রাষ্ট্রীয় দলের নেতাদিগের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রসঙ্কুল রাষ্ট্রনীতিবাদ। তাঁহারা নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে কোন মিথ্যা বা পাপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের আওতায় পড়িয়া ভারতবাসী যে কাহাকে কি কারণে ভোট দিয়া লোক ও বিধান সভায় পাঠাইতেছে তাহা কখন বুঝিতেও পারে না। রাষ্ট্রীয় দলগুলির কার্য্য হইল মূলত সকলের অধিকার কাড়িয়া অল্প কয়েকজন দলপতির হস্তে আনিয়া ফেলা ও পরে সে অধিকারের অন্যায় ব্যবহার করিয়া নিজেদের প্রভুত্বে নিজেদের দলের লোকেদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা। এই কারণে আজ আঠার বৎসরকাল সাধারণতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ চালাইয়া রাখিয়া ভারতের জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, ঔষধ, শিক্ষা ও অন্যান্য সকল জীবনযাত্রার উপকরণের চূড়ান্ত অভাব। দেশরক্ষা বা ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষাও ঠিকমত হয় না। উপার্জ্জন করিয়া কিছু করিবার ব্যবস্থাও অর্দ্ধেক লোকের নাই। রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া ও উপার্জ্জন হ্রাস করিয়া

সকল লোকেরই সর্ব্বনাশ হইতেছে। সঞ্চিত সম্পদও "ইন্‌ফ্লেসন" বা টাকার ক্রয়শক্তি নাশ করিয়া ক্রমশঃ গুপ্তভাবে সরকারী তহবিলে চলিয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তির আঠার বৎসর পূর্ব্বে দশ হাজার টাকা জমান ছিল তাহার আজ ক্রয়শক্তির হিসাবে সেই টাকা এক হাজারে দাঁড়াইয়াছে। অতএব সকল ভারতবাসীর কর্ত্তব্য প্রথমে সকল রাষ্ট্রীয় দলগুলির বিরুদ্ধে ভোট দিয়া স্বাধীন পথ অনুসরণে নিজেদের ক্ষমতা নিজেদের হাতে ফিরাইয়া আনা। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে যাঁহারা রাজত্ব চালাইয়া সাধারণের অর্থে নিজেদের সুবিধা মাত্র করেন, তাঁহাদিগের দমন প্রয়োজন। কেহ কোন রাষ্ট্রীয় দলের সমর্থিত লোককে যেন ভোট না দেন। ইহাই সাধারণতন্ত্রের মন্ত্র হউক।

অন্যায় উপায়ে নির্ব্বাচন পরিচালনা

সাধারণতন্ত্রের উদ্দেশ্য নষ্ট করিয়া দলাদলি করা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর পাণ্ডাদিগের সুবিধার জন্য জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করার বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে বর্ত্তমান ভারতে সাধারণতন্ত্র ও সমষ্টিবাদের নামে যাহা প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা হইল চক্রান্ততন্ত্র ও ষড়যন্ত্রবাদ। এই অধর্ম্ম রাজ্য যাহাতে অতঃপর প্রতিষ্ঠিত না থাকিতে পারে সেইজন্য বহুলোকে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে কয়েকটি রাষ্ট্রীয় দল আর ভারত শাসনকার্য্যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে প্রভুত্ব না করিতে পারেন। কারণ রাজ্য-শাসনের যে ব্যবস্থা তাহাতে শাসক ও শাসকদিগের বিরুদ্ধ দল মিলিতভাবে জনসাধারণের মঙ্গল চেষ্টার অভিনয় করিয়া থাকেন। সত্যকার সাধারণতন্ত্র যে ভাবে চলে, অভিনয়ের সাধারণতন্ত্রের অভিনেতাগণও সেইভাবে চলিবার অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের যে মূল প্রাণবস্তু তাহা হইল সাধারণের "স্বাধীন" নির্ব্বাচন ব্যবস্থা, প্রতিনিধি চয়ন করিবার জন্য। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন স্বাধীনভাবে যদি না হয়, তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রের মূল যাহা তাহাই বিনষ্ট হয়। নির্ব্বাচন ব্যাপারে যদি সরকার বাহাদুর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংঘ অন্যায়ভাবে নির্ব্বাচকদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছামত ভোট দিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করেন ; কিংবা যদি নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগকে ভোটের জন্য দাঁড়াইতে না দিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সেই জাতীয় কার্য্য নির্ব্বাচনের নিয়মবিরুদ্ধ ও ভারতরাষ্ট্রের মূল নিয়ম-কানুননাশক। যথা যদি কোন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও নির্ব্বাচন প্রার্থীর নির্ব্বাচনে দাঁড়ান বন্ধ করিবার জন্য প্রার্থীর উপর অন্যায় চাপ দিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে মন্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে ভারতের যে কোন আদালতে নালিশ করা চলিতে পারে। মন্ত্রী না হইয়া অপর কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় চাপ দিয়া কাহারও প্রার্থীরূপে দাঁড়ান রোধ করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলেও সেই কার্য্য আইনত দণ্ডনীয় হইতে পারে। এই কারণে সকল ভারতবাসীর উচিত "স্বাধীন নির্ব্বাচনের" স্বাধীনতা পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলা।

দেড়শত বৎসরের চেষ্টার ফল

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই বাংলায় একটা নব জাগরণের সূচনা হয়। রাজা রামমোহন রায় এক মহান জাতীয়তাবাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি বিদেশী-দিগের ভারত বিরুদ্ধতা প্রচারমূলক লেখা ও বক্তৃতার উত্তরে এতই উত্তম প্রত্যুত্তর দেওয়া আরম্ভ করেন যে বিদেশীদিগের প্রচার তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল ঘটনা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। রাজা রামমোহন আমাদিগের নিজেদের যে সকল দোষ ছিল তাহাও ধীরে ধীরে সংস্কার করিয়া ভারতকে তাহার পুরাতন কৃষ্টি ও সভ্যতার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন এবং ইহার সঙ্গেই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদের আলোকও পূর্ণবিকীর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। রামমোহনের পরে যে সকল মহাপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তাহার মধ্যে বাংলার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ বসু ও আরও অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের মিলিত চেষ্টায় বাংলা তথা ভারতবর্ষ উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। ইঁহাদিগের সহিত নাম করা যায় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, অরবিন্দ, শিবনাথ, রানাডে, গোখলে প্রভৃতির। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ স্বাধীনতালাভের চেষ্টা আরম্ভ হয় প্রবল আবেগে। শতশত যুবক এই সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া সর্ব্বহারা হইয়া যান ও অনেকে প্রাণদান করেন। এই সংগ্রামের বোধ হয় সুভাষচন্দ্রের

জাতীয় সেনা বাহিনীর ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করিবার পরে। ১৯২০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত আমাদিগের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম অপর আর এক রূপ ধারণ করিয়া সগৌরবে চালিত হইয়াছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, তিনি জনশক্তি বৃদ্ধি করিয়া অহিংসনীতি অবলম্বনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভ্যুত্থান আরম্ভ করেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান হিংসাবর্জিত অস্ত্র ছিল শাসকদিগের সহিত অসহযোগ। আইন ও আদেশ না মানা ও রাজস্ব না দেওয়া। এই সকল আন্দোলনে সহস্র সহস্র নরনারী স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান ও জার্ম্মানীর হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ও ক্ষতি সহ্য করিয়া ব্রিটিশের অবস্থা বিশেষ বিপদাপন্ন হয়। লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও ব্রিটিশ নাগরিক এই যুদ্ধে ব্রিটেনে ও অন্যত্র প্রাণ হারান। সম্পদ নষ্ট হয় লক্ষ লক্ষ কোটি পাউণ্ডের। ব্রিটেন জয়যুক্ত হইলেও ক্ষতবিক্ষত ভাবে কোনও মতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্র যখন ব্রিটিশের বিশেষভাবে বিশ্বস্ত সামরিক জাতীয় সৈন্যগণকে নিজ দলে টানিয়া লইয়া ভারত আক্রমণ করেন, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝিতে পারেন যে আর বিশ্বদমন করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্যের দ্বার রক্ষা করিতে পারিবেন না। অন্ততঃ গুর্খা, শিখ, গাড়ওয়াল, ডোগরা প্রভৃতি সৈন্য দলের সাহায্যে নহে। নেতাজী সুভাষ, যদিও সাক্ষাৎভাবে ব্রিটিশ ভারত দখল করিয়া ভারতে স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারেন নাই, তাহা হইলেও তাঁহার গঠিত ভারতের জাতীয় সৈন্য বাহিনী ব্রিটিশের বিরুদ্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদের অবসানের তাণ্ডব প্রবলভাবে বহিতে আরম্ভ করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণও ভারত হইতে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে সুরু করে। এই ব্যবস্থার প্রথম ভারত দমন করা কার্য্য হইল মুসলিম লীগের সাহায্যে ভারত খণ্ডন করিবার চেষ্টা। এই চেষ্টার অভিব্যক্তি হইয়াছিল হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা করাইয়া। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রিটিশ প্ররোচনায় দাঙ্গা ঘটান একটা চলিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহা আরও জোরাল ভাবে করান হইতে লাগিল। ব্রিটিশ সৈন্যদল ও ব্রিটিশ শাসকগণ চুপ করিয়া দেখিতেন যখন নরকের বন্যা বহিত ও নির্দোষ নরনারী ও শিশুদিগকে গুণ্ডারা হত্যা করিত। এই দুষ্কর্মের মূলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা রহিয়াছে জানিয়াও তাহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপন চেষ্টা করিতেন জবাহরলাল নেহেরু ও তাঁহার নিকটতম অনুচরগণ এবং তাহার ফলে অবশেষে ভারত বিভাগ চেষ্টা সফল হইয়া দাঁড়াইল।

তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ঐ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ ও তৎবন্ধু আমেরিকার উপদেশ শুনিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ উপদেশ ও পরামর্শের ফলে একের পর একটি আর্থিক পরিকল্পনা আসিয়া ভারতকে ক্রমশঃ আরও গভীর ভাবে পরদাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। [illegible] নেতাগণ ভারতের সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এখানে ভারত ঋণের নিমিত্ত নিমজ্জমান [illegible] নিকট অপমানিত হইয়া কোন প্রকারে দিন [illegible]। এই ব্যবস্থা [illegible] প্রতিকার না হয় [illegible] অদূর ভবিষ্যতে ভারতে বিদেশীর "বিনা ভারে" [illegible] শাসন চালাইবে। [illegible] দখল করিয়া লইবে। ভারত স্বাধীন [illegible]। [illegible] বৎসরের মধ্যে [illegible] প্রাণপাত করা উচিত ও কর্তব্য হইয়াছে [illegible] আজ কয়েকজন ক্ষমতাকারী নেতার স্বার্থ ও দলগত [illegible] চেষ্টার ফলে শেষ হইয়া যায় তাহা [illegible] পাপের শাস্তি ভারতবাসী জনগণকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এখনও [illegible] অযথা ও অসৎ [illegible] গুলিকে বর্জিত করিয়া কর্মক্ষম ও সৎ [illegible] শাসন কার্য্য ছাড়িয়া দিলে পরে ভারতের এই [illegible] দূর করিয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। [illegible] জাতীয় বার্ষিক উপার্জন এখন মাত্র ১৫০০০ কোটি। [illegible] ভারতের কর্ম্মীদিগের মধ্যে অনেকের অধিক [illegible] কোন কার্য্য করিয়া উপার্জনের ব্যবস্থা নাই। সেই ব্যবস্থা করিলে উপযুক্ত মূলধন থাকিলে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইতে পারে। মূলধন কম থাকিলেও যাহা আছে তাহাতে জাতীয় আয় বাড়িয়া ২২০০০/২৫০০০ কোটি টাকা হইতে পারে। তাহা হইলে আর ঋণ না বাড়াইয়া যথাসাধ্য জনশক্তি উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া জাতীয় জীবনযাত্রা চালাইবার ব্যবস্থা করিলে শীঘ্রই ভারতের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইতে পারিবে। তাহা হইলে স্বাবলম্বন নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত নিজের সামরিক শক্তি ও সাধারণ জীবন যাত্রার উপকরণ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া জগৎ সভায় নিজস্থান অনেক উচ্চে রাখিতে সক্ষম হইবে। ভিক্ষা পাত্র হস্তে ঘুরিয়া মরিলে কোনভাবেই আত্মসম্মান রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে না।

—)(*)(—

বাংলার শিশু-সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলার প্রাচীন রূপকথা, উপকথা, ছড়া ও হেঁয়ালী প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের সম্পদগুলির কিয়দংশ শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত করা হয়। কিন্তু এগুলিকে বাংলার বর্তমান শিশুরঞ্জন সাহিত্যের ভিত্তি বলা যায় না। কারণ উক্ত সাহিত্যের সঙ্গে এ কালের সাহিত্যের গুণগত কোন যোগ নেই। বাংলার আধুনিক শিশুরঞ্জন সাহিত্যের সূত্রপাত ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। শিশুপাঠ্য হলেও সে রচনাকে সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। কারণ তা সৃজনমূলক ত ছিলই না, এমন কি, ভাষায়, বিষয়ে ও রচনায় ছিল নীরস ও চিত্তাকর্ষক গুণ-বিবর্জিত। এর সূত্রপাত বা ভিত্তি স্থাপিত হয়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পাঠ্যপুস্তক-সাহায্যে যার রচয়িতা ছিলেন তিনজন রাধাকান্ত দেব রামকমল সেন ও তারিণীচরণ মিত্র। গ্রন্থখানির নাম 'নীতিকথা', প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ, প্রকাশক স্কুল বুক সোসাইটি। গ্রন্থখানি পাঠশালার পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়। সেকালে বাংলার শিশুগণের, কিশোরগণের, গৃহপাঠ্য সাহিত্য পুস্তকের অভাব ছিল। বাংলার লোক-সাহিত্য জলধি থেকে মণিরত্ন-তুল্য গল্প, কাব্য কাহিনী, ছড়া, হেঁয়ালী প্রভৃতি আহরণ করে সুকুমারমতি শ্রোতৃমহলে কথিত হ'ত। স্বভাবতই মুখে মুখে এগুলির বহিরঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছিল। ঠিক এই সময়েই, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায়, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়, "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্রিকাখানি। পত্রিকাখানির নাম-পৃষ্ঠার লিখিত থাকে, "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ।" তখন বাঙ্গলা গদ্যেরও শৈশব। সুতরাং উক্ত পুস্তক ও পত্রিকাখানির ভাষা যে এখনকার মত সুসমৃদ্ধ, সুগঠিত ও সুন্দর ছিল না, তা উদ্ধৃতি না দিলেও সহজেই আন্দাজ করা যায়। কিন্তু পত্রিকাখানিকে শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা বলা যায় না, সে কথা তার নাম-পৃষ্ঠায় লিখিত উক্তিটি প্রমাণ করে। মাত্র তাই নয়, এখনকার শিশুপাঠ্য পাঠ্যগ্রন্থের মতো উক্ত গ্রন্থখানিও সহজ ও সরল ছিল না। তেমন হবার উপায়ও ছিল না। আরও কথা, সেকালে গ্রন্থ বা পত্রিকা কোনটিই চিত্র সজ্জিত করা যেত না। কারণ, শিল্পীর অভাব, ব্লক নির্মাণের ও মুদ্রণের উপায়েরও অভাব। অথচ শিশুপাঠ্য গ্রন্থে চিত্র একটি প্রধান সম্পদ। এই দৈন্য বহু বৎসর চলে।

প্রথমেই বাংলার আধুনিক শিশু-সাহিত্যের গোড়ার কথা কিছু লেখা প্রয়োজন এই কারণে যে, তা না হলে বাংলার শিশুরঞ্জন সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের স্থান কোথায় ও দান কি তা সঠিক অনুমান করা যাবে না। যা হোক, মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণশিল্পে উন্নতি এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই দীনতাও ধীরে অপসৃত হতে থাকে। গদ্য ক্রমে সহজ, সরল, সুগঠিত ও সুশ্রী হয় দু-একখানি করে চিত্র দেখা দেয়, দু-একটি কবিতা কুসুম প্রস্ফুটিত হ'তে সুরু করে যায় একটি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'পাখী সব করে রব" আজও অমলিন ও উজ্জ্বল এবং শিশুমহলে সুপঠিত। বস্তুতঃ এইটিই বাংলার আধুনিক শিশু-সাহিত্যে আদি মৌলিক কবিতা। পরবর্তীকালে শিশুপাঠ্য বহু

কবিতায় এটির অল্পবিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে বিদ্যালয়-পাঠ্য গদ্য ও পদ্যের বহু বাঙলা গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। আর, ব্যক্তিগত বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের অথবা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতে থাকে, মাসিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা। সুরু থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের অধিককাল এই সাহিত্য ছিল অনুবাদ-প্রধান। ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফারসী ও ফরাসী ভাষা থেকে বহু গল্প-কাহিনী, এমন কি, কবিতাও অনুবাদ করা হ'ত। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গ শিশু সাহিত্যে মাত্র একটি মৌলিক ছোট গল্পের প্রকাশ হয়। "কদাচ চুরি করা উচিত নহে" নামক উক্ত গল্পটি রচনা করেন বিদ্যাসাগর মহাশয় যাঁর তাবৎ সাহিত্যই অনুবাদ-প্রধান, অথচ বাংলা গদ্য যাঁর লেখনী-স্পর্শে সুগঠিত, সুন্দর ও নির্মল হয়। গল্পটি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই শৈশবে 'বর্ণপরিচয় ২য় ভাগে' পাঠ করেছেন।

বাঙলা শিশু-সাহিত্যের এই যে অগ্রগতি ও পরিপুষ্টি, এর মূলে ছিল ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী শিশুরঞ্জন সাহিত্যের আদর্শ এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি কামনা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টা। তখন বাঙলার লোকসাহিত্যের সঙ্গে এই-সাহিত্যের সংযোগ রাখা বা তার উপজীব্যাদি গ্রহণ আর সম্ভব হয় না। ইউরোপের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব ও সংস্পর্শ দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করে। কল-কারখানা ও রেলপথ স্থাপন, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাষ্পীয়পোত চলাচল, নগরাদি পত্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি বিবিধ ঘটনায় যে নব যুগের সূচনা হয় তার ফলে সমাজেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। লোক-সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী মানসিক পরিবেশও আর থাকে না। সুতরাং রূপকথা, উপকথা, ছড়াদি আর রচিত হতে পারে না। আবার, সেগুলি শিশুরঞ্জন লিখিত সাহিত্যেও ঠাঁই পায় না, কথকের মুখে মুখে পরিবেশিত হয়।

সেকালে শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী থাকলেও সাময়িক পত্রিকাগুলির মুক্ত বাতায়ন-পথে স্নিগ্ধ, সুরভিত বায়ু-স্রোতের মত কেবল শিক্ষা নয় কিছু কিছু মৌলিক রচনা মারফত আনন্দ-হিল্লোলও বয়ে আসত। ঐ সকল শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাগুলিই প্রকৃত শিশুরঞ্জন সাহিত্যের ইঙ্গিত বহন করত। সেগুলির মধ্যে আচার্য কেশব চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালক বন্ধু' (১৮৭৮ খ্রী), প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত "সখা" (১৮৮৩ খ্রী), ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত "সখা ও সাথী" (১৮৯৪ খ্রীঃ), পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত "মুকুল" (১৮৯৫ খ্রীঃ), ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত "বালকের" (১৮৮৫ খ্রীঃ) নাম আজও শিক্ষিত বাঙালীর স্মৃতিতে জাগরূক। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই ইঙ্গিত গ্রহণ করেন এবং কয়েকজন সাহিত্যিকের রচনা সংকলন করে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন তার নাম "হাসি ও খেলা"। বলা বাহুল্য, গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা ছিল শিশু পাঠোপযোগী ও সৃজন-মূলক। এই সচিত্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে বাঙলার শিশু ও তাদের অভিভাবকমহলে আনন্দ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থ-প্রারম্ভে যোগীন্দ্রনাথ নিবেদন করছেন, "আমাদের দেশে বালক-বালিকাদের উপযোগী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কারপ্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্ত 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই 'ছবি ও গল্প' নামে আরও একখানি সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।"

তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'হাসি ও খেলার' দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ তখন পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবক ও 'সিটি স্কুলে'র শিক্ষক। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায়' (১৩০১, ফাল্গুন, ১৮৯৪ খ্রীঃ) মন্তব্য করেন, 'বইখানি ছোট ছেলেদের পড়বার জন্ত। বাঙলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্ত যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই। তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই। তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয়, সে পরিমাণে উপকার হয় না।

'আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বাঙালীর ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধি-বৃত্তির সহজ পুষ্টি সাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।

"হাসি ও খেলা" বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।'

সুতরাং দেখা যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থই একালের প্রকৃত বাংলা শিশুরঞ্জন সাহিত্যে অগ্রদূত। এর সাহায্যে যোগীনবাবু পথিকৃতের কর্তব্য সাধন করেন। এই গ্রন্থে রাজকৃষ্ণ রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, প্রমদাচরণ সেন ও মাইকেল চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির শিশুরঞ্জন রচনা সংকলিত হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় সেকালে সাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত হলেও একালে বিস্মৃত। রঙ্গমঞ্চে তৎ-রচিত নাটক, গ্রামে-গ্রামান্তরে তৎ-রচিত যাত্রাগান বাঙালীকে আনন্দ ও শিক্ষা দান করত। বস্তুতঃ রঙ্গমঞ্চই তাঁর দুর্দশা ও অকাল বিয়োগের প্রধান কারণ। সেকালে শিশু সাহিত্যেও সেকালের কেতাবী বাঙলার চলন ছিল। কিন্তু সরকার মহাশয় 'হাসি ও খেলায়' সাহসপূর্বক একেবারে মুখের ভাষা, ঘরোয়া ভাষা, সহজ, সরল, সুমিষ্ট ভাষার ধারা বইয়ে দেন। গ্রন্থখানি সংকলিত হলেও তাতে তাঁর নিজস্ব কয়েকটি রচনা থাকে, যেগুলির মধ্যে 'সাতভাই চম্পা' একটি। সেকালে যে দেশী রূপকথার কথক ছিল লেখক ছিল না, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু 'হাসি ও খেলা'য় আমরা সর্বপ্রথম দু'টি রূপকথার দেখা পাই—একটি উপেন্দ্রকিশোর রচিত "মজন্তালী", অপরটি যোগীন্দ্রনাথ রচিত 'সাতভাই চম্পা'। এরূপ অবস্থায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারই বাংলা শিশুসাহিত্যে সহজ, সরল ভাষায় দেশী রূপকথা প্রথম আমদানী করেন, একথা বলা যায় না কি? আমাদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই গ্রন্থের প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে রামকমল সেন-কৃত 'হিতোপদেশ' ও পাদ্রী উইলিয়াম কেরী-কৃত 'ইতিহাসমালা' নামক গ্রন্থ দু'খানি প্রকাশিত হয়। কেরী তাঁর গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ শিশুদের জন্য রচনা করেন নি, যদিও তাতে লোকরঞ্জন সাহিত্যান্তর্গত কতকগুলি রচনা ছিল। আর 'হিতোপদেশ' লোকরঞ্জন সাহিত্যান্তর্গত হলেও রূপকথা নয়। সরকার মহাশয়ের আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রসঙ্গে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকৃত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'জীবন-আদর্শ' নামক গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

ভট্টাচার্য মহাশয় সৃজনধর্মী সাহিত্য রচয়িতা ছিলেন না কিন্তু অসত্য, অন্ধ ও কুসংস্কার দূরীকরণার্থে নির্ভয়ে লেখনী চালনা করেছেন, সেকালে যেজন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হ'ত। একালেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পাশে পাশে চলেছে সাহিত্য-মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনাদির প্রবাহ, যেন উভয়ই সত্যের কষ্টিপাথরে কষে নেওয়া! ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানায় বিশ্বাস, হাঁচির শব্দে, টিকটিকির ও বিশেষ অবস্থায় কাক, চিল, বিড়ালাদির ডাকে, সর্প ও শৃগালের অবস্থানে, যাত্রাকালে ও প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে বর্ণ বিশেষের মুখ দর্শনের কুফল সম্বন্ধে নানাবিধ হানিকর সংস্কার শৈশবকালেই মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে জীবনের পরবর্তীকালকেও প্রভাবিত করা হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থখানি রচনা করেন, ভ্রান্ত ও কুসংস্কারগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে। তাঁরই মতো উনিশ শতকের প্রায় শেষ দিকে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই মহৎ শিক্ষায় সচেষ্ট হন এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও কবি সুকুমার রায় তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে এই কর্মে তৎপর ছিলেন। তাঁদের সৎ চেষ্টা কতখানি ফলোৎপাদিকা হয়েছে তা সুধী-সমাজ অবগত।

ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গ্রন্থে বলছেন, "মনুষ্য যে পরিমাণ অজ্ঞ অবস্থায় থাকে সে পরিমাণে তাহার কুসংস্কার প্রবল থাকে। কারণ, যেস্থলে অজ্ঞতা, সেই স্থলেই বিশ্বাসের আধিক্য। এবং বিশ্বাসের আধিক্যই কুসংস্কারের উত্তেজক।.."

এই গ্রন্থে ভূমিকায় একস্থলে তিনি লিখছেন,"…বিষয় বিবিধ করিয়াছি। কতকগুলি গৃহে পাঠার্থ ও কতকগুলি শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট পাঠার্থ"। গ্রন্থখানির হিত-কারিতা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে না। তথাপি কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে যোগীন্দ্রবাবুর পূর্বসূরী বলা যায়। কারণ, যোগীন্দ্রবাবুর পূর্বেই তিনি গৃহ-পাঠার্থ গ্রন্থ রচনায় কিছুটা অগ্রসর হন। তবে সে গ্রন্থ সচিত্র ও পুরো-পুরি গৃহপাঠ্য হয় না।

পর বৎসর যোগীন্দ্রবাবুর কথা মত 'ছবি ও গল্প' প্রকাশিত হয় (১৮৯২ খ্রীঃ)। এখানিও সংকলিত। তবে এতে তৎরচিত অনেকগুলি গদ্য ও ছড়া থাকে। সব কয়টিই সহজ, সরল ও সরস, যা যোগীন্দ্রবাবুর রচনা-বৈশিষ্ট। এই গুণ শিশুসাহিত্যে আর তেমন ভাবে দেখা গেল না। গ্রন্থ দু'খানির প্রথম দিককার সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে নতুন নতুন সংযোজনগুলি আলোচনায় অপেক্ষা রাখলেও সেদিকে আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বোধ হয় না।

বাংলা শিশুসাহিত্যে 'ননসেন্স-রাইম' (উদ্ভট ছড়া) একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে থেকে সুকুমারমতি পাঠক সমাজে প্রচুর আনন্দরস বিতরণ করছে। এরও সুরু যোগীন্দ্রনাথ সরকার থেকে। তিনিই 'মুকুলের' ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন সংখ্যায় লেখেন, 'কালা হাবে কি ধলা হাবে' নামক হাস্য-রসাত্মক ছড়াটি। সেই বৎসরেই প্রকাশিত হয় তাঁর 'পেটুক দাদু'। অবশেষে তৎরচিত 'ননসেনস-রাইম' সম্বলিত 'হাসি-রাশি' নামক হাস্যরসে ভরপুর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং এদিকেও যোগীন্দ্রবাবু পথিকৃৎ। এই গ্রন্থের 'মজার দেশ' অধুনা সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে। 'টমাস সাহেবের মাছ ধরা,' 'কাজের ছেলের', 'ডিম ভরা দই, চিনিপাতা কৈ' ইত্যাদি পড়ে কে

না হেসেছে এবং এখনও না হাসে? তৎরচিত 'মজার দেশ' ছড়াটি সংবাদপত্র সাহিত্যে মজা কখন কখন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

বঙ্গ সাহিত্যে নানা ধরনের ছড়া যে কত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তা সাহিত্যরসিক মাত্রেই অবগত। বাংলার সমাজ, বাঙ্গালীর সংসার, বাঙ্গালীর গ্রাম্যজীবন, কৃষিসম্পদ, জীবন দর্শন, এক কথায় গোটা প্রাচীন বাংলাকে এর মধ্যে পাওয়া যায়। যোগীন্দ্রবাবু শিশুদের জন্য ছড়া সংগ্রহেও ব্যাপৃত হন এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'খুকুমণির ছড়া' নামক সংকলন গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়—যেটি বাংলার ছড়া সম্বন্ধে অতুলনীয় প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে আছে। এর একস্থলে ত্রিবেদী মহাশয় মন্তব্য করছেন, 'বাঙ্গালাতে এরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক...তাঁহার প্রকাশিত শিশু-পাঠ্য পুস্তকগুলি সুরঞ্জিত ছবি ও কৌতুকময় উপাখ্যানাদি সমাবেশে শিশুজনের চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান কার্য্যে তিনি একটু অভিনব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সেই কারণে তিনি বিশেষতঃ প্রশংসার্হ।' সুতরাং এদিকেও তিনি পথ-প্রদর্শক।

বাংলা শিশুসাহিত্যে ও শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অদ্বিতীয় কীর্তি 'হাসি-খুসি' প্রথম ভাগ। 'খুকুমণির ছড়ার' দু' বৎসর পূর্বে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়। ছড়ারসে সিক্ত অক্ষরের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটানো সেকালে ছিল সম্পূর্ণ নূতন। পদ্ধতিটি শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত না হতে পারে। কারণ, এরূপ অবস্থায় শিক্ষার্থীর মন ছড়ারসেই মুখ্যতঃ আকৃষ্ট হয়, অক্ষরগুলি হয় গৌণ। সেকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল। তাঁর বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ বাংলার সর্বত্র শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত। তৎপূর্বে রাধাকান্ত দেব থেকে সুরু করে কয়েকজন বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন, পাদ্রী লোম-এচ যিনি নদীয়ার নীল-চাষীবিদ্রোহের সঙ্গে কিছুটা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-পদ্ধতি সহজ হওয়ায় পূর্বের গ্রন্থগুলি দুরূহ বিধায় অপ্রচলিত ও লুপ্ত হয়ে যায়। বাংলার শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে কিন্তু 'হাসি-খুসি' দিব্য আসর জাঁকিয়ে বসে। কারণ, ছড়া ও ছবিতে শিশু-চিত্ত সহজেই পুষ্প বনে ভ্রমরের মতো লুব্ধ হয়। কিন্তু সরকার মহাশয় বিদ্যাসাগরী প্রভাব এড়াতে পারেন না, তাঁরই বর্ণানুক্রমে ছড়া রচনা করে শিক্ষার সেই পদ্ধতি বজায় রাখেন, অধুনা যা আর থাকতে পারছে না। বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি অনাবশ্যক বোধে বাতিল করে তৎস্থলে বর্ণপরিচয়ের নতুন পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে। তথাপি যেমন সেকালে, তেমনি একালেও গ্রন্থখানি সর্বত্র সমাদৃত, শিশু-শিক্ষায়, ছড়া কণ্ঠস্থ করানোয় যেন অপরিহার্য। সরল ছড়াগুলির শব্দ ঝঙ্কারের এমনই মোহিনী শক্তি। সংখ্যা গণনা শিক্ষাক্ষেত্রেও 'তারাধনের দশটি ছেলের' দুঃখময় কাহিনীরও আকর্ষণী শক্তি সামান্য নয়। কিন্তু এখানেও শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বজায় থাকে নি, ছড়া ও কাহিনীটি হয়েছে মুখ্য। এটিও অতি সম্প্রতি কৌতুক-সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে।

যোগীন্দ্রবাবু সর্বসাকুল্যে তেইশ-চব্বিশখানি গ্রন্থকর্তা মনে হয়, কিন্তু তাঁর হাস্য রসভরা ছড়াগুলি, হাসিখুসি কালজয়ী হয়ে বাংলার শিশু-সাহিত্য ভাণ্ডার উজ্জ্বল করে আছে। তাঁর লেখনী কিশোর সাহিত্যে পরিচালিত হতে বিশেষ দেখা যায় না। তাতে ক্ষোভ বা ক্ষতির কিছু নেই, বরং তাঁর মতো করে প্রকৃত শিশুরঞ্জন সাহিত্য আর রচিত হয় না, এটাই দুর্ভাগ্যজনক। অবশ্য একই ধরনের প্রতিভা বা শক্তি একের মধ্যেই স্ফুরিত হয়; একই ধরনের সাহিত্য বহুজন কর্তৃক বা পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয় না, হতে পারে না। কারণ, পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তন, জীবন দর্শনের পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এ কালটি শিল্পায়নের, বিজ্ঞানের এবং রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের কাল। সুতরাং সাহিত্যও সেইমত না হয়ে পারে না।

যেমন বাংলা শিশুসাহিত্যে সরকার মহাশয়ের প্রচেষ্টা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল তেমনি পুস্তক ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্যরূপে সফল হয়েছিলেন। বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থ বাদ দিয়ে স্ব-রচিত শিশু-সাহিত্যের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জনের উদাহরণ বাংলা দেশে আর আছে কি?
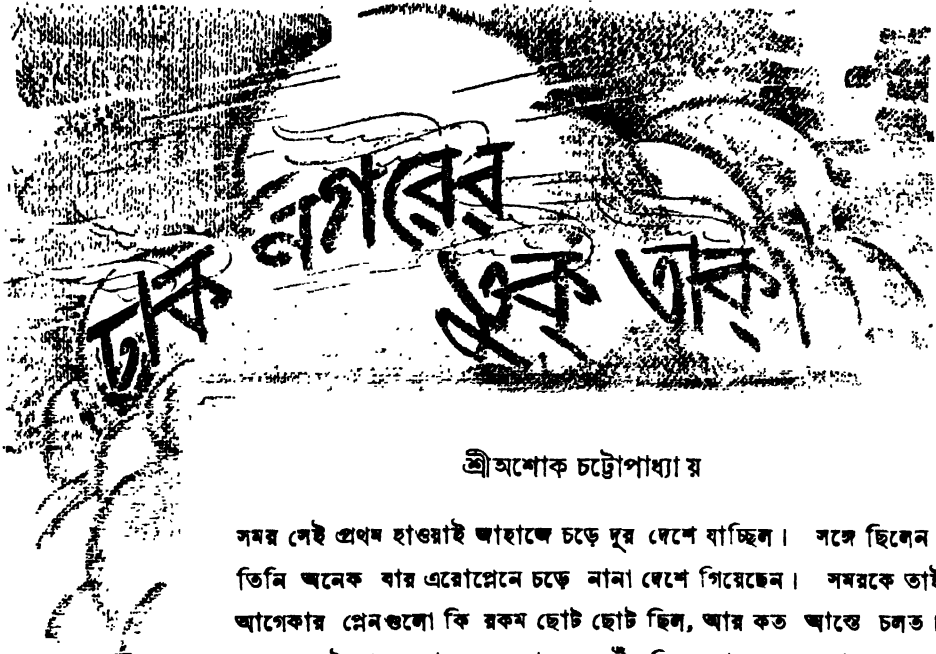
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

সমর সেই প্রথম হাওয়াই জাহাজে চড়ে দূর দেশে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিলেন তার বাবা। তিনি অনেক বার এরোপ্লেনে চড়ে নানা দেশে গিয়েছেন। সমরকে তাই বলছিলেন আগেকার প্লেনগুলো কি রকম ছোট ছোট ছিল, আর কত আস্তে চলত। এখনকার নূতন জেট প্লেন আগের তুলনায় কত উঁচু দিয়ে আর কত জোরে যায়। আগে দশ হাজার ফুট উঠতে প্লেনগুলোর প্রাণান্ত হ'ত; এখন ওঠে চল্লিশ হাজার ফুট। সেখান থেকে নিচের হিমালয়ের উঁচু উঁচু চূড়াগুলোকে মনে হয় যেন ছোট ছোট বরফের ঢিবি। বড় বড় সহরগুলো যেন অল্প কয়েকটা ইটপাথরের গাদা। বড় বড় নদীগুলো মনে হয় যেন সূতা পড়ে আছে। জঙ্গল, পাহাড়, হ্রদ আর বিরাট বিরাট চাষ-করা ক্ষেত যেন শুধু রং-এর ছোপ দেওয়া কাপড় পাতা রয়েছে। আর, সে যায় কত জোরে! খুব জোরাল বন্দুকের, মানে রাই-ফেলের, গুলী ছোটে ঘণ্টায় ৩০০০ মাইল বেগে। সাধারণ বন্দুকের গুলী যায় তার আদ্ধেক তেজে। জেট প্লেন প্রায় বন্দুকের গুলীর মতই জোরে চলে, আর মাত্র কয়েক ঘন্টাতেই কলকাতা থেকে লণ্ডনে পৌছে যায়। আগেকার কালে গরুর গাড়িতে মানুষের এক মাস দেড় মাস লেগে যেত তীর্থ করে আসতে। এখন রেলগাড়িতে লাগে এক দিন দুই দিন। মোটরকার চলে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে; গরুর গাড়ি চলত তিন-চার মাইল। মোটর গাড়িতে কলকাতা থেকে লণ্ডন যেতে ক্রমাগত গাড়ি চালালেও কুড়ি-পঁচিশ দিন লাগে। কিন্তু হাওয়াই জেট্ জাহাজ যায় কুড়ি ঘণ্টারও কম সময়ে।

সমরের এই সব কথা শুনতে শুনতে আর নীচের দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন সে খুব বড় একটা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আকাশের অনেক উপরে যেখানে উপকথার দেব-দৈত্যরা থাকেন প্রায় সেইখানে বেড়াতে বেরিয়েছে। যে কোন সময় হয়ত পাশ দিয়ে গরুড় পাখা কিংবা পুষ্পক রথ উড়ে বেরিয়ে যাবে। বীণা হাতে নারদ ঋষিই বা হঠাৎ কারুর সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেবেন। অনেক দূরে একটা হাওয়াই জাহাজ উল্টো দিকে যাচ্ছিল। সমরের মনে হ'ল যেন মহাবীর হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় কাঁধে নিয়ে উড়ে চলেছেন সিংহলের পথে। লক্ষ্মণকে বাঁচাতে হবে শক্তিশেলের হাত থেকে, মৃত সঞ্জীবনী আর 'বিশল্যকরণী ওষুধ লাগিয়ে। সমর তার ঠাকুমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের সব গল্প শোনে আর রাম, লক্ষ্ণ ও অর্জ্জুন, ভীম আর শ্রীকৃষ্ণের সব কথাই সে জানে। তাই সে অত উঁচু দিয়ে যেতে যেতে ভাবছিল যে হয়ত বা বকাসুর কিংবা তাড়কা রাক্ষসীর সঙ্গে তাকেই যুদ্ধ করতে হবে।

সময় হঠাৎ শুনল তার বাবা বলছেন, "হাওয়াই জাহাজ যদি কোন কারণে শূন্তে যেতে যেতে বিগড়ে যায় আর কলকজা ঠিক করে নেওয়া না যায়, তা হ'লে সকলকে মহা মুস্কিলে পড়তে হয়। কারণ, যুদ্ধের জন্তে যে সব প্লেন তৈরী করা হয় সেগুলিতে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্যারাসুট বা নিজের থেকে খুলে যায় এইরকম ছাতার থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলে থেকে আস্তে আস্তে হাওয়ায় ভেসে ভেসে মাটিতে নেমে যাবার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু যাত্রী নিয়ে যাওয়ার প্লেনে সে ব্যবস্থা থাকে না। আর যাত্রীরা প্যারাসুট নিয়ে শূন্তে লাফ দিয়ে পড়ে নামতেও জানেন না। তাই যাত্রী যাবার প্লেন খারাপ হলে খুব মুস্কিল হয়।" সময় বলল, "না, এই জাহাজেও ত প্যারাসুট আছে। আমি দেখেছি। ঐ ত, ঐ লাল কাপড়-পরা লোকটার কাছে।" বলে সময় এক দৌড় দিয়ে প্লেনের পিছন দিকে চলে গেল। সেখানে একটা লাল রংএর উর্দ্দি-পরা লোক বসেছিল। সময় দেখল লোকটার দুটো নাক। একটার পাশে আর একটা। লোকটা বললে, "আরে বেশী বেশী নিশ্বাস নিতে হয় শূন্তে লাফ দিয়ে চল্লিশ হাজার ফুট নামতে হলে। বুঝেছ, তাই আমি দুটো নাক করিয়ে নিয়েছি। তুমি যতক্ষণে একবার নিশ্বাস ফেলবে আমি ততক্ষণে ফেলব দু'বার। তাই দেখ না, আমার বুকটাও ডবল।" সময় দেখল লোকটার বুকের দু'পাশ ফুলে রয়েছে, যেন কোটের ভিতরে দু টুকরো মোটা মোটা গাড়ির চাকার টায়ার পরান রয়েছে। হাত দুটো লোকটার গায়ের পাশ দিয়ে ঝুলে না থেকে ঐ টায়ারের উপর দিয়ে আধ-ঝোলা ভাবে রয়েছে। সময় বললে, "প্যারাসুট দিয়ে লাফিয়ে পড়লে কি আমারও দুটো নাক হয়ে যাবে না কি? আর ঐ রকম ডবল বুক?" লাল সিং বললে, "আমায় লাল সিং বলে ডেকো। এই দেখ আমার দুটো লাল শিং আছে।" বলে সে নিজের মাথার লাল টুপিটা খুলতেই সময় দেখল তার মাথায় দুটো ছোট ছোট লাল রং-এর শিং রয়েছে। সময় বললে, "প্যারাসুট দিয়ে লাফালে আবার মাথায় শিং গজায় না কি?" লাল সিং বললে, "হ্যাঁ। তা জান না? শূন্তে ভেসে ভেসে নামবার সময় বড় বড় শকুন, ঈগল সব তেড়ে আসে। তখন আমি ইচ্ছে করলেই শিং দুটো লম্বা করে তাদের খোঁচা মেরে তাড়িয়ে দিই। এই দেখ।" বলতেই সময় দেখল ওর শিং দুটো প্রায় দেড় হাত করে লম্বা হয়ে তলোয়ারের মত লক্ লক্ করতে লাগল। দেখলে ভয় হয়।

সময় বললে, "তোমার ত খুব মজা। ইচ্ছে করলেই মাথায় তলোয়ার গজিয়ে যায়। আর কি করতে পার তুমি?"

লাল সিং বললে, "চল, লাফিয়ে পড়া যাক, তারপরে দেখবে কত তামাশা হয়।"

সময় বললে, "লাফিয়ে পড়ব? নিচে কোন দেশ, কারা থাকে কিচ্ছু না জেনে লাফিয়ে পড়ব? আর এত মেঘ রয়েছে এইখানে যে কিছু দেখাও যাচ্ছে না।"

সময় দেখল লোকটার বুকে দুপাশ ফুলে রয়েছে, যেন কোটের ভিতরে দু'টুকরো মোটা মোটা গাড়ির চাকার টায়ার পরান রয়েছে

লাল সিং বললে, "ও ও আর্ডারি মেঘ, মানে আমি ঐ মেঘগুলো আনিয়ে রেখেছি ঢাকনগরের ঢাকনা হিসেবে। তা নইলে লোকে দেখে ফেলবে যে?"

"কি দেখে ফেলবে?"

"আরে, ঢাকনগর হ'ল হাওয়াপুরের রাজধানী। হাওয়াপুর হ'ল একটা বিরাট দেশ। কেউ দেখতে পায় না। হাওয়ায় লাফ দিয়ে না পড়লে। চল না, লাফিয়ে পড়ি, তখনই দেখবে ক্যাইলা মুল্লুক আর ক্যাইলা সহর।"

সমর বললে, "আর বাবা? বাবাকে ফেলে চলে যাব? বাবা যে আমায় খুঁজে না পেলে অস্থির হয়ে পড়বেন।"

"আরে ধ্যাৎ সে প্লেন বরফি হয়ে গেছে। তোমার বাবা নিজের প্লেনে বাড়ী ফিরে গেছেন। তুমিও পরে আবার বাড়ী চলে যাবে তুকতাক্ তুকতাক্ করতে করতে হাওয়াই রেলগাড়ি চড়ে।"

"অ্যাঁ? হাওয়ায় আবার রেলগাড়ি চলে না কি?"

"হ্যাঁ, হাঁ, ঢাকনগর থেকে তাকনগর পর্যন্ত হাওয়ায় রেল পাতা আছে। এই রেলে গাড়ি থাকে নিচে আর রেল উপরে। তাকনগর-ঢাকনগর ঢাকনগর-তাকনগর, গাড়ি চলতেই থাকে আর মাঝে মাঝে তার থেকে রকেটে করে প্যাসেঞ্জারদের উপরে ছুঁড়ে দেয়। তারা যেখানে ইচ্ছে সেইখানেই গিয়ে পৌঁছয়।"
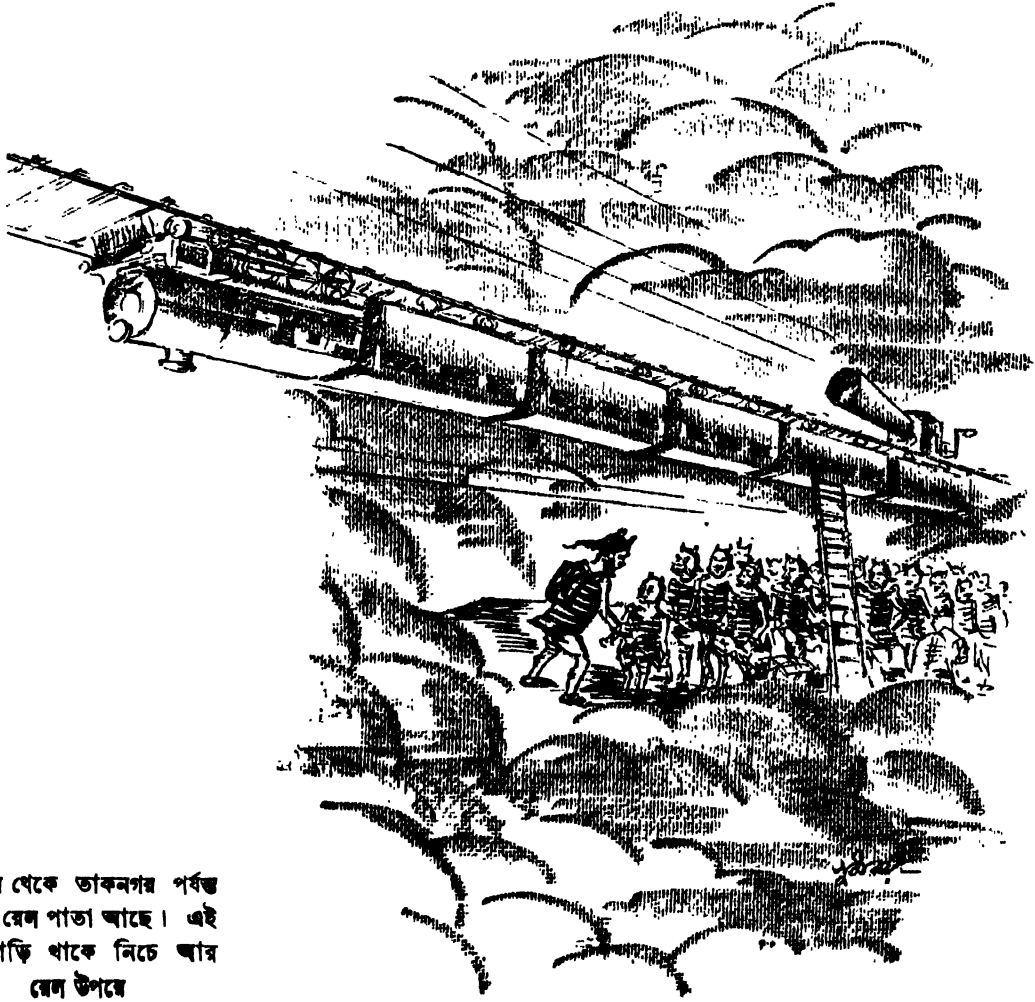
ঢাকনগর থেকে তাকনগর পর্যন্ত হাওয়ায় রেল পাতা আছে। এই রেলে গাড়ি থাকে নিচে আর রেল উপরে

সমর লাল শিংএর কথা শুনে অবাক্। পিছনে তাকিয়ে দেখলে তাদের প্লেনের আগেকার সব লোক বদ্‌লি হয়ে গিয়েছে আর তাদের জায়গায় সব লাল উর্দ্দিপরা ছুটো ছুটো নাকওয়ালা লোক বসে আছে। সমর তাদের দিকে দেখছে দেখে তারা মাথার টুপিগুলো খুলে ফেলল। সমর দেখল সকলের মাথাতেই ছুটো করে লাল লাল শিং।

লোকগুলো সমরকে শিং দেখিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না। সমস্বরে বলে উঠল, "ছুই নাক, ছুই শিং, হিং টিং হিং টিং!" লাল শিং বলল, "ওদের নাম হিং টিং।" সমর বলল, "সকলেরই এক নাম? সে কি রকম? ডাকলে কি করে বোঝে কাকে ডাকছে?"

"আরে, তাতে কিছু আসে-যায় না। একজনকে ডাকলে সবাই উত্তর দেয়। যাকে যাই বল, সকলে এক-সঙ্গে শোনে, একসঙ্গে ওঠে, বসে, চলে।" সমর বললে, "ও, সৈন্যদের মত?" লাল শিং বলল, "খানিকটা সৈন্য, খানিকটা ভেড়া, খানিকটা পঙ্গপাল। আর খিদের মত; মানে কখন আছে আর কখন নেই।" বলতে বলতেই হিংটিংরা হি হি করে হেসে উঠল খুব জোরে, কিন্তু সমর ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল একটা লোকও নেই; সব বসবার জায়গা খালি। লাল শিং বলল, "দেখলে ত, এই ছিল আর এই কোথায় মিলিয়ে গেল। দেখ দেখ!" সমর দেখল এক দুই করে ক্রমে ক্রমে সব হিং টিংরা আবার আগের মত বসে রয়েছে আর হি হি করে হাসছে।

এই সময় প্লেনের একপাশে একটা সুড়ঙ্গের মত রাস্তা খুলে গেছে দেখা গেল আর হিং-টিং এর দল সেই পথে এক এক করে লাফিয়ে পড়তে লাগল। পাশের জানলা দিয়ে সমর দেখল তারা সব প্যারাসুট খুলে ভেসে ভেসে নেমে যাচ্ছে। লাল শিং বলল, "চল আমরাও যাই।" বলে সমরের হাতে একটা বেল্ট আর তার সঙ্গে বাঁধা একটা প্যারাসুটের পুঁটলি ধরিয়ে দিয়ে আবার বলল, "পরে ফেল, পরে ফেল।" সমর বেল্টটা পরে নিতেই লাল শিং তার হাত ধরে তাকে টেনে সুড়ঙ্গের পথে গিয়ে দুজনে একসঙ্গে লাফ দিয়ে বাইরের আকাশে গিয়ে পড়ল। লাল শিং তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "প্যারাসুটের দড়িটা টেনে দেও।" সমর দড়িটায় টান দিতেই পুঁটলির ভিতর থেকে থাকে থাকে প্যারাসুটের কাপড় আর দড়ি বেরিয়ে পড়তে লাগল আর খুব জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে প্যারা-সুটটা খুলে তার মাথায় দশ-পনের হাত উপরে ছাতার মত দেখাতে লাগল। শূন্যপথে পড়ে যাওয়াটাও অনেক ধীরে ধীরে হতে লাগল। লাল শিং পাশেই ভাসছিল। সে বলল, "এইবার আর দেরি নেই। ঢাকনগর দেখতে পাবে এখনিই। এই সাবধান! একটা উদ্‌গ্রীব পাখী আসছে! ওর গলাটা ইচ্ছেমত লম্বা হয়ে যায় ও যখন ঠোক্কর মারে। তুমি তোমার শিং ছুটো বাড়িয়ে ফেল।" সমর বলল, "আমার আবার শিং কোথায়?" বলতে বলতেই বুঝতে পারল মাথায় যেন কি গজিয়ে উঠেছে। আর দেখল একটা গরুর মাথাওয়ালা পাখী তাকে তাক্ করে গুঁততে আসছে। পাখীর গলাটা হঠাৎ দশ হাত লম্বা হয়ে গেল, আর তার মাথাটা সমরের খুব কাছে এসে গেল। সমর চিৎকার করে বলে উঠল, "দুই নাক দুই শিং লাগে গুঁতো।" অমনি দেখল তার মাথার শিংগুলো তিন তিন হাত লম্বা তলোয়ারের মত উদ্‌গ্রীবের মাথায় গিয়ে খোঁচা লাগাল। উদ্‌গ্রীব পাখীটা চ্যা চ্যা করে ডাকতে ডাকতে পালিয়ে গেল।

লাল শিং বলল, "বহুত আচ্ছা! সাবাস!"

প্রায় পনের মিনিট ধরে ভেসে ভেসে নেমে গিয়ে তার মেঘের ঢাকনার নিচে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে দেখল একটা মস্ত বড় সহর। তার ঘরবাড়ী সব মাটিতে পাতা রয়েছে মনে হয়। দরজা-জানলা উপর মুখে হাঁ করে খুলে রাখা আছে। আর তার উপর দিয়ে লম্বা লম্বা দড়ি বাঁধা রয়েছে। মানুষজন সকলে দড়ির উপর দিয়ে সার্কাসের কায়দায় হেঁটে চলেছে আর বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে ঝুপঝাপ বাড়ীর ভিতরে লাফিয়ে ঢুকে পড়ছে। অনেকটা দূরে আকাশে রেল লাইন পাতা রয়েছে মনে হয়; আর তার তলা দিয়ে নিচের দিকে ঢোকবার দরজাওয়ালা রেল-গাড়ি চলেছে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া বেরুচ্ছে নিচের দিকে ঝোলান মুখ নল দিয়ে। স্টেশনের উপরে গাড়ি থামলে যাত্রীরা লাফ দিয়ে নেমে পড়ছে; আর যারা উঠবে তারা দরজার পথে আঁটা মই দিয়ে গাড়িতে উঠে বসছে। রেল

গাড়ির পিছন দিকে একটা মোটা চোঙা কামান বসান রয়েছে মনে হচ্ছে। লাল সিং বলল, "এটা রকেট ছাড়বার চোঙা। ঐ দিয়ে লোকে ঢাকনগরের ঢাকনা ফুঁড়ে বাইরে চলে যেতে পারে—যেখানে ইচ্ছে সেখানে।"

এর পরে তারা দুজনে গিয়ে নামল একটা খুব চওড়া দড়ির রাস্তার উপর। এখানে পাশাপাশি প্রায় দু'শটা দড়ি টান করে টাঙান রয়েছে আর অনেক লোকে তার উপর দিয়ে যাতায়াত করছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ লাফ দিয়ে নিচের বাড়ীগুলোর দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি উঠিয়ে দিয়ে তাই দিয়ে দড়ির উপর উঠে অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করছে। মইয়ের মত সিঁড়িগুলো আবার নেমে যাচ্ছে। লাল সিং বললে, "তোমার প্যারাস্যুটটা গুটিয়ে নাও। সমর বললে, "ঐ করতে গেলে দড়ির থেকে পড়ে যাব যে।" লাল

দেখল একটা গরুর মাথাওয়ালা পাখী তাকে তাক ক'রে গুঁতোতে আসছে। পাখীর গলাটা হঠাৎ দশ হাত লম্বা হয়ে গেল, আর তার মাথাটা সমরের খুব কাছে এসে গেল। সমর চিৎকার করে বলে উঠল, 'দুই নাক দুই শিং লাগে গুঁতো।'

সিং বলল, "বেলটের বোতামটা ধরে টান লাগাও। দেখবে প্যারাসুটটা নিজে নিজেই গুটিয়ে যাবে।" সমর বোতাম ধরে টান দিতেই প্যারাসুটটা ভাঁজে ভাঁজে পাট হয়ে পুঁটুলির মধ্যে চলে গেল। লাল সিং একটা নাক টিপে ধরে একটা হুইসিলের মত আওয়াজ করতেই একটা দরজা দিয়ে একটা মই উঠে এল। তারা দু'জনে ছড়ি থেকে নেমে মই দিয়ে দরজার ভিতরে চলে গেল। সেখানে দেখল একটা বড় উঠান। আর অনেক লোক সেখানে জড় হয়েছে। লাল সিংকে দেখে তারা 'আইয়ো ভাইয়ো!' বলে চিৎকার করতে লাগল। লাল সিংও চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ঢাকনগর ঢাক রহে; তুকতাক, তুকতাক, বাকি সব ফাঁক, সব ফাঁক!'

এর পরে তারা দুজনে গিয়ে নামল একটা চওড়া দড়ির রাস্তার উপর

অনেক লোকজন। লাল সিং বলল, 'এস এস, আলাপ করিয়ে দিই।' বলতেই অনেকজন এগিয়ে এলেন। ছেলেও ছিল, মেয়েরাও ছিলেন। লাল সিং বলল, 'আমার সঙ্গে এসেছেন চিৎনগরের মালিক, উপুড়পুরের উজির হুমড়ি খান। ইনি সব জায়গায় আজব, তাজ্জব, হুমড়ি খানেওয়ালা। এমন হুমড়ি খান যে মনে হয় ডাইভ দোয়ার। গোঁৎ খেয়ে পড়েন যার উপর সে একবার কোঁৎ করে কেঁদে উঠেই কাৎ হয়ে যায়।' সমরকে সামনে এগিয়ে দিয়ে প্রণামে ছেলেগুলোকে ডেকে বলল, 'লণ্ডভণ্ড সিং, ধুমপটাস্ খাঁ, যন্তরমন্তর পাণ্ডে, উল্টাপাল্টা মিঁয়া, ধস্তাধস্তি ঘোষ—মিলো, মিলো, ভাইয়ো!' সকলে এগিয়ে এসে হাঁটু উঠিয়ে তার উপর চাপড় মারতে লাগল। সমর বুঝল ওর মানে নমস্কার বা সেলাম। সেও হাঁটু উঠিয়ে চাপড় মেরে তার পাল্টা জবাব দিল। মেয়েরা তখন সমরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। দেখ না, কারুর লাল খোঁপা, কারুর নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনে, কালো কিংবা সাদা। লাল সিং বলল, "কিজিবিজি, কানাকানি, ফিস্‌ফাস, আঁটিস্‌টি ক্যাচকোঁচ, কোঁ কাঁ, সবাই হুমড়িখাঁকে গৎ শুনাও।" মেয়েরা বিটকেল আওয়াজ করে যেন কেঁদে উঠল এই রকম গৎ গেয়ে ফেলল। তার পরে তারা চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের চারদিকে ঘুরে এসে আবার উঠে দাঁড়াল। সমর দেখল তাদের শিংগুলো একটা সোনার আর একটা রূপোর, খোঁপার ভিতর আলো জলছে দুটো নাক লাল আর নীল রং করা।

লাল সিং বললে, "চল বাইরে যাই। মানে নিচে, উপরে নয়।" সমর বললে, "নিচে কি আছে?" লাল সিং বলল, "নিচেই ত সব ক্ষেতিবাড়ী, গাছপালা, পুকুর ডোবা। তারা সকলে দল বেঁধে একটা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর নিচের তলায় চলে গেল। সেখানে জানলা দরজা পাশের দেয়ালে যেমন হয় তেমনি। বাইরে দেখা গেল একটা গরু চরছে। তার গলাটা ইচ্ছেমত লম্বা হয় আবার ছোট হয়ে যায়। পা ফেলে হাঁটবার সময় পাগুলোও লম্বা হয়ে যায়, আবার পা ফেললেই ছোট হয়ে যায়। একটা লোক যাচ্ছিল। লাল সিং তাকে ডাকতেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, "পেয়ারা খাবে?" বলে, হাত বাড়িয়ে দিল, আর তার হাতটা বার ফুট দূর থেকে লম্বা হয়ে সমরের কাছ অবধি এসে গেল। হাতে তার একটা ছোট্ট পেয়ারা। সেটার খানিকটা সাদা আর খানিকটা কালো। সমর পেয়ারাটা

তুলে নিয়েই তার হাতটা সে গুটিয়ে নিল। হাতটা আবার যেমন তিন ফুট লম্বা তেমনি তিন ফুটই হয়ে গেল। সমর নিজের হাতের দিকে দেখতেই হাতের পেয়ারাটা ডানা মেলে উড়ে গেল। সমর চিৎকার করে উঠল, "আরে, আরে, উড়ে গেল! উড়ে গেল!" লাল সিং বললে, "উড়ে গিয়ে আবার নিজের গাছে আটকে ঝুলতে থাকবে। তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে।" সমর বলল, "বেশ ত! আশ্চর্য হব না? ফল কখনও উড়তে পারে?" লাল সিং বলল, "কেন উড়বে না? পায়রা উড়বে আর পেয়ারা উড়বে না? ঢাকনগরে সব উড়ে চলে। এই দেখ।" বলতেই তাদের বাড়ীটা হঠাৎ শূন্যে উঠে দুলে দুলে দূরের গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে উড়ে অন্য কয়েকটা গাছের মাঝে গিয়ে বসে গেল। সমর বলল, "এবার আর কি যাদু দেখাবে?" লাল সিং বলল, "চল, অন্য দিকের আকাশটা দেখতে। ওদিকেও বাড়ীঘর, দড়ির রাস্তা, শূন্য রেল—সব কিছু আছে। শুধু যখন ওদিকের বাড়ীর একতলায় ঢুকবে তখন ডিগবাজি খেয়ে মাথা উপরে করে নেবে। তা নইলে মাথা নিচে পা উপরে হয়ে থাকবে আর লোকে হাসবে।" সমর বলল, "তোমাদের পৃথিবীটা কি গোল নয়? তা নইলে এর দু'দিকেই আকাশ দুই দিকের বাড়ীর ছাদের উপর কি করে থাকে?" লাল সিং বলল, "গোল পৃথিবীটা মাঝে আছে, বুঝেছ? আমের আঁটির মত। তার চারদিক দিয়ে ফলের শাঁসের মত রয়েছে সব আকাশ আর ঢাকদুনিয়ার তুকতাকপুরের ঘরবাড়ী, রেলগাড়ি, গাছপালা, আর-তামাম।"

"তামাম টা কি?"

"আরে তামাম মানে সবকুছ। বুঝলে না? যা কিছু আছে, যা কিছু নেই, যা ছিল না, থাকবে না, আছে কিন্তু নেই, নেই কিন্তু আছে, থাকত কিন্তু ছিল না, থাকবে কিন্তু কোথায় কেউ জানে না, সব কিছু হ'ল তামাম। বুঝলে?"

"বুঝলাম, কিন্তু না বুঝে।"

"ঠিক বলেছ। এখানে না এসে আসা যায়, না খেয়ে খাওয়া যায়, না ঘুমিয়ে সবাই ঘুমায়, ঘুমলে জেগে থাকে। তুকতাকপুরের তাক্‌-লাগান ঢং, তাক-লাগান রং। এই এসে পড়েছি।"

সকলে ততক্ষণ মই বেয়ে নেমেই চলেছে। যত নামে, মইটা ততই লম্বা হ'তে থাকে। শেষকালে একটা মস্তবড় দরজা। সেটা খুলে মই দিয়ে আর নামা যায় না। কেননা সেই ঘরটা, যেটায় ঢোকা হ'ল, সেটার ছাদ ফুটো করে নেমে দেখা গেল চেয়ার, টেবল, আলমারি ঝুলে রয়েছে মনে হ'ল। আর উল্টোদিকের মেঝেতে রয়েছে কড়ি-বরগা। লাল সিং বলে উঠল, "ডিকবাজি, ডিগবাজি, তুকতাক তুকতাক।" বলেই সে এক ডিগবাজি খেয়ে পা উপরে মাথা নিচে হয়ে গিয়ে চোঁ করে ঘরটার ছাদ-মেঝের উপর দাঁড়িয়ে গেল। মনে হ'ল যেন ছাদটাই মেঝে আর মেঝেটাই ছাদ। সমরও ডিগবাজি খেয়ে সেই ছাদটার উপরে দাঁড়াল। মাথা নিচে পা উপরে হলেও দেখল সে ঝুলে নেই, দাঁড়িয়েই আছে। আর দেখল মেঝে যেটাকে ভাবছিল সেখান দিয়ে একটা লোক সুড়ঙ্গ-পথে মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে।

সমর বলল, "ঐ লোকটা নেমে না গিয়ে উঠে চলেছে কি করে?" লাল সিং বলল, "ও দিকটাও ত উপর দিক। আমরা নেমে যেদিক থেকে এলাম সেদিকটাও একটা উপর দিক। দু'দিকেই উপর আর দু'দিকেই নীচু দিক আছে। চল, আমরাও উঠে যাই।"

ওরা এরপরে যে দিক থেকে এসেছিল নেমে নেমে, এখন ডিগবাজি খেয়ে উল্টো দিকে মাথা করে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে আরম্ভ করল। পাশের জানলা দিয়ে উল্টোদিকের আকাশ দেখা যাচ্ছে: দড়ির রাস্তা টানা রয়েছে, তার উপরে মেঘ। একটা উদ্‌গ্রীব পাখী গলাটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে তার বাচ্চা পাখীগুলোকে আস্তে আস্তে ঠুকরে ঠুকরে সামলে নিয়ে চলেছে। তারও এক পাশ দিয়ে রেল লাইন ভেসে রয়েছে, আর নীচের দিকে ফানেল ইঞ্জিন ঝুলে ঝুলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে। সমর বলল, "তোমাদের পৃথিবীটা চেপ্টা তক্তার মত, আমাদের পৃথিবীর চারদিক দিয়ে গাড়ির টায়ারের মত গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে না? আমাদের পৃথিবীটা কোথায়?" লাল, সিং বলল "ঢাকনগরের তুকতাক দিয়ে ঢাকনগর ঢাকা আছে। তোমাদের পৃথিবী থেকে ঢাকনগর দেখা যায় না। আবার, তোমাদের পৃথিবীটা দেখা যায় তার আলো চোখে এসে লাগলে পরে অন্ধকারে যেমন তোমরা কিছু দেখতে পাও না; কেননা কোন জিনিসের আলো তোমাদের চোখে এসে লাগে না অন্ধকারে। আমরা কিন্তু দেখি আমাদের চোখের আলো আমাদের পৃথিবীকে আলো করে রাখে বলে। আলো চোখ থেকে বাইরে আর বাইরের থেকে চোখে যাতায়াত করতে থাকে। তোমরা তাই আমাদের পৃথিবী দেখতে পাও না, কেননা তার নিজের কোন আলো ঝলকে বাইরে গিয়ে পড়ে না। আর আমাদের চোখের আলোর দৌড় আমাদের দুনিয়া অবধি। তার বাইরে সে আলো যায় না, আর আমরাও নিজেদের দুনিয়ার বাইরে কিছু দেখতে পাই না।" সমর

বলল, "তবে তুমি আমি দুটো দুনিয়া দেখলাম কি করে?" লাল সিং বলল, "তুক্‌তাক্‌ তুক্‌তাক্‌। তোমার চোখ দিয়ে আমি দেখলাম আর আমার চোখ দিয়ে তুমি দেখলে। তুক্‌তাক্‌, তুক্‌তাক্‌, সব ফাঁক, সব ফাঁক।" দুজনে এখন একটা বাড়ীর ছাদের উপর দড়ির রাস্তার নীচে দাঁড়াল। দড়ির পথে যারা চলছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে লাল সিংএর হাত ধরে ঝেঁকে দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় তাদের হাতগুলো দশ-বার হাত লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, আবার হাত গুটিয়ে নিলেই হাতগুলো যেমন ঠিক তেমনই হয়ে যেতে লাগল। লাল সিং, সমর আরও দুই একজন দ'ড়ির পথে উঠে গিয়ে হাঁটতে লাগল। নীচে খালি বড় বড় বাড়ীর দরজা-জানলা। দূরে গাছ-গাছড়া। আকাশে ভেসে চলেছে রকম রকম পাখী। একটা পাখী এল তার শরীরটা খুব লম্বা আর তাতে চারটে ডানা। সেগুলোও আবার কমে বাড়ে। মানে জোরে চললে ডানাগুলো বড় হয়ে ওঠে, আর আস্তে উড়লে ছোট হয়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে বাড়ীগুলো শেষ হয়ে এল। সেখানে দড়ি ছেড়ে নেমে যাবার জন্যে বড় বড় সিঁড়ি লাগান। নীচে নানান রকম গরু চরছে। গরুগুলোর কোন কোনটার আট পা আর দুটো মাথা, সামনে পিছনে। কোন দিকে চলতে আরম্ভ করলে পিছনের মাথাটা ঘুরিয়ে যাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। লাল সিং আর সমর মাঠে নেমে গেল। সেখানে গরু ছাড়া কয়েকটা কুকুর বেড়াচ্ছিল। সেগুলো রেগে গেলে এক পায়ের উপর লাট্টুর মত ঘুরতে থাকে। তাদের ল্যাজে একটা শক্ত আর ধারাল কাঁটা আছে। যখন ঘোরে তখন কাছে গেলে কাঁটা দিয়ে অন্যদের ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ছাগলগুলো ভয় পেলে মাটি খুঁড়ে তার ভিতরে চলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। একটা ফুল ফুটেছিল। সমর সেটা তুলতে যেতেই ফুলটা বিকট আওয়াজ করে কেঁদে উঠল।

সমর বলল, "চল, আর ভাল লাগছে না। সবই কি রকম অদ্ভুত আর অসম্ভব।" লাল সিং বলল, চল আবার দড়ির উপর। রেল লাইনের দিকে।"

দু'জনে তখন দড়ির উপর দিয়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত হেঁটে হেঁটে রেল লাইনের দিকে যেতে আরম্ভ করল। গাছের ফলগুলো গাছ থেকে ডানা মেলে উড়ে তাদের কাছে আসতে লাগল। খাওয়ার খুবই সুবিধা। একবার এক গেলাস সরবতও ডানা মেলে উড়ে এসে সমরের মুখের কাছে নিজেকে ধরে দাঁড়াল। সমর বেশ কয়েক চুমুক সরবত খেয়ে নিল। আকাশ থেকে গোলাপজল বৃষ্টি হচ্ছিল মাঝে মাঝে। গরম লাগলে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঘুরে এসে শরীরের কষ্ট দূর করছিল, আবার এক জায়গায় খুব ঠাণ্ডা লাগতেই বেশ গরম হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। যা ইচ্ছে হয় প্রায় তাই ঘটে। সমর বলল, "বেশ সুবিধের দেশ তোমাদের।" লাল সিং হেসে শিং নেড়ে বলল, "ইচ্ছে দিয়েই ত ঢাকনগর গড়া হয়েছে। ইট, পাথর, দড়ি আর উড়ুক্কু খাবার জিনিস; আসলে সবই ইচ্ছে দিয়ে গড়া। তোমাদের পৃথিবীতে ইচ্ছে না করলেও অনেক কিছু হয়, আবার ইচ্ছে করলেও সব কিছু হয় না। আমরা ইচ্ছের হাওয়াতেই ভেসে বেড়াই। ইচ্ছে না থাকলে আমরাও থাকি না।"

সমর বললে, "ঐ যে রেলগাড়ি! দেখছ ওর উপরে একটা তোপ বসিয়েছে। যুদ্ধ হবে না কি?" লাল সিং বলল, "যুদ্ধ আমরা করি না। কেননা যুদ্ধে জেতবার ইচ্ছে দুই দলেরই থাকে। আর দুই দলই জিতে গেলে যুদ্ধ হতে পারে না। তাই যুদ্ধ এই ইচ্ছের দেশে হতেই পারে না।"

"তবে তোপ বসিয়েছে কেন?"

"আরে ও তোপ দিয়ে গোলা দাগা হয় না। ওতে মানুষ ভরে তাদের ছুড়ে দেওয়া হয়, ইচ্ছের বাইরে আসলের মধ্যে।"

"তার মানে কি? এখানটা কি আসল নয়? কোন্‌খান থেকে আসল আরম্ভ হয়?"

"এটা হ'ল ইচ্ছের তুক্‌তাক্‌। আসল এখানে ফাঁক। তোপ দেগে যেই তোমাকে ছুঁড়ে দেবে তুমি অমনি হাউই-এর তেজে উপরে উড়ে চলবে। ইচ্ছেও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে যাবে, আর তুমি গিয়ে পড়বে আসলের মধ্যে। সেখানে ঢাকাঢাকি থাকে না। ইচ্ছে না থাকলেও দেখতে শুনতে, খেতে শুতে হয়। আর ইচ্ছে থাকলেও কিছুই মিলে না।"

সমর আর লাল সিং গিয়ে তোপটার কাছে হাজির হ'ল। গোলন্দাজ বলল "খরচা দেও।" সমর বলল, "আমার কাছে ত পয়সা নেই।" গোলন্দাজ বলল, "পয়সা দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না এদেশে। পয়সা দিলে ত দোকানদারের ইচ্ছে তোমার হাতে আসে আর তোমার ইচ্ছে হাওয়া হয়ে যায়। আমি চাই তোমার দুটো নাকের একটা আর তোমার ঐ শিং দুটো।" সমর তাকে একটা নাক আর দুটো শিং খুলে দিল। সে তখন সমরকে তোপের পিছন দিকের একটা দরজা খুলে দিয়ে বললে, "ঢুকে পড়।" সমর তোপের ভিতরে ঢুকে গেল। সেখানে সুন্দর

মখমলের গদি আঁটা। সমর তার উপর শুয়ে পড়ল। হঠাৎ গোঁ গোঁ, চোঁ চোঁ, শোঁ শোঁ করে আওয়াজ হতে লাগল। তার পরেই মনে হ'ল তাকে কে ধনুক থেকে তীরের মত ছুঁড়ে দিল। সে মখমলের গদি সুদ্ধ বন্ বন্ করে আকাশের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। মাথাটা কি রকম হাল্কা হয়ে গেল। তার পরেই মনে হ'ল যেন স্বপ্ন দেখছে তার বাবার কাছে বসে আছে বলে। বাবা বললেন, "আরে, ওঠ ওঠ, প্লেন এইবার নামবে। কি ঘুমই তুমি দিতে পার! সমর, ওঠ, ওঠ!" সমর ধড়মড় করে উঠে পড়ল। দেখলে প্লেনের যাত্রীরা পেটে বেল্ট বাঁধছেন নামবার জন্য। সমর বলল, "ঢাকনগর বেড়িয়ে এলাম।" বাবা বললেন, "কি আবোল-তাবোল বকছ?"

"খেলা-পড়া"

শান্তনু মুখোপাধ্যায়

লেখাপড়া করবে খোকা 'অঙ্কটা'কে বাদ দিয়ে।
'ইংরাজী'টা পরের ভাষা, কি লাভ হবে তা' নিয়ে।
'ভূগোল' প'ড়ে দুঃখ শুধু, বিদেশ ঘোরার পয়সা কৈ?
ইতিহাসের মরা-রাজার মিছে কেন ভাবনা বই।
'বিজ্ঞান'টা জ্ঞানের ব্যাপার, জ্ঞান হ'লে তা পড়বে ত?
এখন খোকার খেলার বয়স, খেলার পড়া করবে ত?
'লেখা-পড়া' ভুল সে কথা, 'খেলা-পড়া' হ'ক না ঠিক।
খেলে খেলেই পড়বে খোকা, কাঁপিয়ে দেবে দিক্-বিদিক্।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

যৌবনে যোগীন্দ্রনাথ সরকার

অনেকদিন আগে এদেশে গভর্ণমেণ্টে অনুবাদক সমাজের সদস্যগণ বিদেশী শিশু-সাহিত্যের অনুকরণে এদেশে শিশু-সাহিত্যে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সে সময়ে তাঁহারা ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহারাই ফলে, সেকালের বাঙ্গলায়, "চকমকির বাক্স," "ছোট কৈলাস বড় কৈলাস", "কুৎসিত হংস শাবক" প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য পুস্তকাবলী, "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক-সংগ্রহ" নামে প্রচারিত হয়। তখন শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অঙ্কুরও ছিল না। ইহার কিছুকাল পরে মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে দেশে ফিরিলেন। তিনি বিলাতের সুলভ সংবাদ-পত্রের অনুকরণে 'সুলভ-সমাচার" ও শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অনুকরণে "বালকবন্ধুর" সৃষ্টি করিলেন। "বালকবন্ধুই" শিশুপাঠ্য সচিত্র সুকুমার সাহিত্যের আদি।

তাহার পর স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন 'সখা'র প্রতিষ্ঠা করিয়া কেশববাবুর উপ্ত বীজে জলসেচ করিতে লাগিলেন। প্রমদাচরণ শিশুহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—'হায়! অকালে সেই পরার্থপর কর্ম্মবীরের জীবন অবসিত হইল।' 'সখা'র সমাগমে সচিত্র শিশু-সাহিত্যে নূতন যুগের অভ্যুদয়। তখন ফুল ফুটিয়াছিল, এখন ফল ধরিয়াছে। শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র হইতেই বাঙ্গলায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যের সৃষ্টি।

বাঙ্গলা শিশুপাঠ্য সাহিত্যে সেই 'সখার' সময় হইতে যাঁহারা সেবা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার জীবিত রহিয়াছেন। উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি আর সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। নবকৃষ্ণ এবং যোগীন্দ্রনাথ দুই জনেই বৃদ্ধ হইয়াছেন; দুই জনেই পীড়াগ্রস্ত। আমরা সেদিন নবকৃষ্ণ বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেকালের ইতিহাস বলিতে বলিতে অনেক দুঃখের কথাই বলিলেন। অনেকে তিনি বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন, সেই সংবাদই জানেন না। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে নবকৃষ্ণ বাবু কিছু-দিন 'সখার' সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ বাবু এবং যোগীন্দ্র বাবু অকৃত্রিম বন্ধু। নবকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এবং তাঁহার রচিত শিশুদের পাঠ্য গ্রন্থাদির বিষয়ে আলোচনা করিবার কথা জানাইলে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন—'আমার আগে যোগীনবাবুর কথা লিখিবেন। তিনি অধ্যবসায় বলে সাহিত্যের এই নূতন বিভাগে সেকালে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বইয়ের যত আদর এমন আদর কাহারও হয় নাই।"—নবকৃষ্ণ বাবুর কথা যে কতদূর সত্য বাঙ্গলা দেশের সকলেই তাহা জানেন।

আমাদের দেশে কত লোকের 'জয়ন্তী' উৎসব হয়, কত সমাদর হয়, সম্বর্দ্ধনা হয়,—একান্ত দুঃখের বিষয় যে ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথের কথা কেহই ভাবেন না! হয়ত দেশের বড়লোকেরা মনে করেন, শিশু-সাহিত্য কি আবার সাহিত্য! কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের লোকেরা মনে করেন—যাঁহারা শিশুদের মনকে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিতে পারেন, তাহাদের কল্পনাকে প্রসারিত করিতে পারেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক।

আমাদের দেশে যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের পরেই শিশু পাঠ্য সাহিত্যের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার—সুবিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতা। এ পরিচয় না দিলেও চলে, কেন না তিনি নিজ নামেই সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক কথাই আমরা বলিতে পারিলাম না। না পারিবার কারণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভের সুযোগ আমার হয় নাই, আমি যখন যোগীন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সে সময়ে তিনি পীড়িত ছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি একটু সুস্থ হইলেই আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবেন। এ বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী হন নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ বলিতে পারিলাম না।

নবকৃষ্ণ বাবু বলেন—'সখা' উঠিয়া গেলে যোগীন্দ্র বাবু 'সখার' ব্লকগুলি কিনিয়া লইবার পর—গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি নিজে যেমন গদ্য ও পদ্য লিখিতেন, তেমনি নবকৃষ্ণ বাবুকেও ছাড়িতেন না। এজন্যই দেখা যায় যে যোগীন্দ্র বাবুর প্রায় সব বইতেই নবকৃষ্ণ বাবুর গদ্য ও পদ্য অনেক প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

যোগীন্দ্র বাবু সুকবি। তাঁহার হাতের লেখার ছবি তোমাদিগকে দেখাইবার জন্য আমরা একখানা ছেঁড়াখাতা তাঁহার ছেলেদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকগুলি কবিতা ও ছড়া আছে। যদিও তোমরা সেগুলি পড়িয়া থাকিবে, তবু এখানে তাঁহার দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম। এইগুলি কখনও পুরাণো হয় না।

ধাঁধা নয়

প্রশ্ন

'ঝুটু' যদি 'টুনু' হয়,
'নব' হয় বন,
'বাবা' তবে কি হইবে
বলত এখন ?

উত্তর

'কাকা', 'মামা', 'দাদা' নিয়ে
কর আগে চেষ্টা ;
'বাবা' পরে কি যে হয়,
বুঝা যাবে শেষটা।

* * *

ঘুমিয়ে যখন থাকি
মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে
আমার দুটি আঁখি।

হাসলে আবার চুমা,
থাকলে জেগে চুমা দিয়ে
বলেন 'খুকু ঘুমা!'

কাঁদলে আমি পরে
অমনি যেন ধারার মত
হাজার চুমা ঝরে!

মায়ের মুখের ছড়া
তাও যেন ঠিক চুমার মত
সুধা দিয়ে গড়া!

নাইকো চুমার শেষ
উঠতে চুমা বসতে চুমা
চুম চুমা চুম চুম চুমা চুম
চলছে মজা বেশ!

যোগীন্দ্রনাথের 'হাসি ও খেলা', 'রাঙা ছবি', 'ছবি ও গল্প', 'খুকুমণির ছড়া', 'বনে-জঙ্গলে' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ আছে। আজকালকার দিনে এমন ছেলে-মেয়ে ও কিশোর ও যুবক কমই আছেন, যাঁহারা বর্ণপরিচয়ের যোগীন্দ্রনাথের "অজগর আই আসছে তেড়ে', আমটি আমি খাব কেড়ে" এই সব ছড়া মুখস্থ করেন নাই। তাঁহার সব বইয়ের কবিতাগুলিই কবিত্বপূর্ণ ও সুমধুর।

আমাদের দেশের প্রাচীন ছড়াগুলি দিন দিন লুপ্ত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথই সকলের আগে সেই প্রাচীন ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি সেগুলি যত্ন করিয়া প্রকাশ না করিতেন—তাহা হইলে তোমরা কখনই জানিতে পারিতে না—

এক যে আছে একানড়ে
সে থাকে তাল গাছে চড়ে!

—যোগীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সাহিত্য-সমাজে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী তাহা তিনি পান নাই—আমাদের দেশের সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির কি কর্তব্য নয় এই জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধকে সম্বর্দ্ধনা করা। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘজীবী হউন এবং শিশুদের দাদামহাশয়ের পাকা আসনখানি গ্রহণ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করুন। (কৈশোরক হইতে)
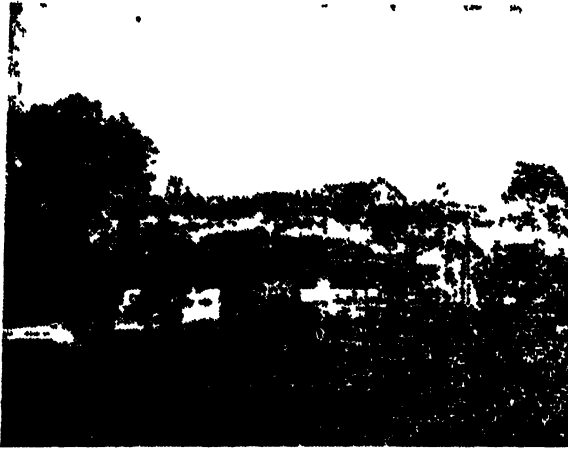
গিরিডির বাড়ী

নিজেই কিনে আনলুম। এবং তিনতলার নির্জ্জন ছাদে ব'সে বিপুল আগ্রহে বইখানি শেষ না ক'রে আর উঠতে পারলুম না। আজও প্রতিদিন বিশ্বপ্রসিদ্ধ কোন-না-কোন লেখক আমার চিত্তক্ষুধা নিবারণ করেন; কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের প্রসাদে প্রথম পুস্তকপাঠের সেই যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও উত্তেজনা, বিশ্বের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মধ্যেও পরে আর তার তুলনা পাই নি!—যেমন তুলনা মেলে না ফুলশয্যায় নববধূর প্রথম স্পর্শের! সেইদিন থেকেই যে পড়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসল, হয়তো আমি সাহিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করেছি তারই প্রেরণায়। কারণ আমার বিশ্বাস, যার বই পড়ার নেশা নেই, কোনদিন সে ছোট সাহিত্যিকও হ'তে পারে না।

•

যোগীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত "সিটি বুক সোসাইটি"র বয়স কত জানি না। তবে এইটুকু মনে আছে, অল্প বয়সে আমার কাছে ঐ পুস্তকালয়টি ছিল পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়ের মত! 'সিটি বুক সোসাইটি'র সামনের দিকে তখন ছোটদের উপযোগী যতরকম সুদৃশ্য বই সাজানো থাকত, আর কোথাও তা দেখা যেত না। দিনের পর দিন লুব্ধ দৃষ্টিতে তাদের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অর্থাভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষটা চ'লে এসেছি এবং তারপর একদিন অতি কষ্টে জলখাবারের পয়সা জমিয়ে বা কাকুতি-মিনতিতে মায়ের মন গলিয়ে মূল্য নিয়ে এক-একখানি বই কিনে 'ওয়াটার্লু' বিজয়ী বীরের মত বাড়ীতে এসে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়তে বসেছি! ঠিক সেই সময়টিতে আমি আর আমার কেতাব ছাড়া বাকি দুনিয়াটাকে রসাতলে পাঠাতে চাইলেও আমার তরফ থেকে নিশ্চয়ই কোনও প্রতিবাদ উঠত না! আমার অবস্থা হ'ত তখন অনেকটা সেইরকম—

"যোগাসনে লীন যোগীবর,—
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?"

এবং এটা মাত্র আমার কাহিনী নয়,—যে-কোন গ্রন্থভক্ত শিশুর কাহিনী! বলা বাহুল্য সে-সব বইয়ের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথের রচনাই ছিল বেশী। এখনকার ছেলে-মেয়েরা না-চাইতেই বাপ মায়ের কাছ থেকে নানান্ মজার বই উপহার পায়, সুতরাং সে-যুগের তরুণ পাঠকের সুখ-দুঃখের কথা তারা হয়তো ভালো ক'রে বুঝতেই পারবে না।

যোগীন্দ্রনাথের চেষ্টায় আমাদের শিশুসাহিত্যের আর একটি মস্ত উপকার হয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, শিশুপাঠ্য পুস্তক যে ছোটদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, এবং সেই সঙ্গে তা যে ছেলেমহলে খেলার মত লোভনীয় আনন্দ বিতরণ করতে পারে, এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে এই শ্রেণীর সুকুমার সাহিত্য যে তাদের হাতে দেওয়া অত্যন্ত দরকার, কেতাবের পর কেতাব প্রকাশ ক'রে বাঙালী অভিভাবকদের মস্তিষ্কে এই সৎবুদ্ধি দান করেছিলেন সর্ব্বপ্রথমে যোগীন্দ্রনাথই। উপরন্তু আজকের বাংলায় ছোটদের সাহিত্য-জগতে যে বিচিত্র আনন্দমেলা বসেছে এবং জনাকীর্ণ তৈরি বাজার দেখে আজ যে অগুন্তি শিশুসাহিত্যকার লেখনী ধারণের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, এ-সমস্তেরই গোড়ায় দেখি যোগীন্দ্রনাথ প্রমুখ দুই-তিনজনের বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টা যত্ন ও নিষ্ঠা। লিখছেন আজ অনেকেই, কিন্তু লেখার চাহিদা সৃষ্টি করেছেন প্রধানতঃ যোগীন্দ্রনাথই।

•

ছোটদের বই লিখে কেবল ছাপালেই হয় না, সে-বইয়ের রূপও হওয়া উচিত ছোটদের মন-ভুলানো। বাংলা দেশে এই সত্য কথাটা প্রথম বুঝেছিলেন যোগীন্দ্রনাথই। তাঁর আগে আর কেউ এমন সুন্দর সব ছবি দিয়ে সাজিয়ে ও এমন চমৎকারভাবে ছাপিয়ে নূতন নূতন বই প্রকাশ করতে পারেন নি। ছবি ও ছাপার সাজে বুড়োদেরও মন ভোলে। প্রমাণ, বাংলা দেশে পরিণত মনের উপযোগী মাসিক সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বেড়েছে তখন থেকেই, যখন থেকে তার ছবি ও ছাপার রূপ খুলেছে বিশেষভাবে। যে যুগে শিশুপাঠ্য মাসিকের-রাজ্যে "মুকুলের" আবির্ভাব, সেই যুগেই বড়দের উপযোগী আধুনিক সচিত্র মাসিকপত্রগুলির অগ্রজ ও

আদর্শরূপে "প্রদীপ" আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বর্ণ ও চিত্র বৈচিত্র্যের দিকে শিশুচিত্তের আকর্ষণ যে অধিকতর প্রবল, এবং গম্ভীর মানুষের মত গম্ভীরদর্শন পুস্তক দেখলেও যে ছোটদের মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, এটা খুব ভাল ক'রে জানতেন ব'লেই শিশুদের বাস্তব স্বপ্নের জগতে যোগীন্দ্রনাথের পসার আরো বেশী জমে উঠেছে।

*

বাংলায় গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়েছে গত শতাব্দীর প্রায় প্রথমেই। বাংলা শিশুসাহিত্যের বয়স তার চেয়েও ঢের কম। ফোর্ট উইলিয়মের পাণ্ডিতদের দৃষ্টি একবার বাঙালী শিশুদের উপর প'ড়েছিল বটে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। দু-চারখানি অনূদিত কেতাবও বেরিয়েছিল, শিশুদের দিক থেকে তার কোনখানিই উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের কাব্যসাহিত্য বয়সে প্রাচীন বটে, কিন্তু শিশুদের উপরে সে যে কোনদিন সদয় হয়েছে এমন প্রমাণ আছে ব'লে জানি না। শিশুদের পাঠশালার জন্যে আগেও পাঠ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু লেখকদের সে-সব চেষ্টাকে শিশুরা নিশ্চয় মনে করত নিষ্ঠুরতা। আমাদের দেশে ছেলেভুলানো ছড়ার অভাব নেই, কিন্তু তা উচ্চসাহিত্যে আসন লাভ করতে পারে নি। তবে গদ্যে ও পদ্যে আমাদের একালের নবীন শিশুসাহিত্যের কতক কতক অংশ যে উচ্চ-সাহিত্যের অন্তর্গত হবার যোগ্য, একাধিক লেখক সেটা প্রমাণিত করেছেন বিশেষভাবে। লুইস ক্যারল Alice in Wonderland প্রভৃতির জন্যে ইংরেজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিরও শিশুপাঠ্য অনেক রচনা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে সমস্ত বাঙালী লেখকের শিশুপাঠ্য স্বকীয় রচনা নিয়ে আলোচনা করবার সময় নেই, কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা শিশুসাহিত্যের উন্নতি হয়েছে বিস্ময়কর—যদিও এ উন্নতি এখনো সর্ব্বাঙ্গীন হ'তে পারে নি।

*

এই উন্নতির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার কার্যে অন্যতম প্রধান কর্মীরূপে যোগীন্দ্রনাথ অনায়াসেই অভিনন্দন লাভ করতে পারেন। বাংলাদেশে যে-যুগে শ্রেষ্ঠ লেখকরা শিশুপাঠ্য রচনাকে গৌরবজনক ব'লে মনে করতেন না, সেই সময়েই প্রমদাচরণ ও যোগীন্দ্রনাথ শিশুচিত্তরঞ্জনকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অমরতালাভের যোগ্য। যে মালী চারাগাছে জল না দিয়ে জলপাত্র হাতে ক'রে ব'সে থাকে ধাড়ী গাছে জল ঢালবার জন্যে, সে যত বড় পাকা মালীই হোক তাকে বোকা ছাড়া অন্য নামে ডাকা যায় না। আগেকার বাঙ্গালী লেখকরা যে ঐ রকম বোকামিই ক'রে গেছেন এ কথা বলতে আমার বাধবে না। অধিকতর ঘনীভূত সাহিত্যরস উপভোগের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে শিশুদের মন গোড়া থেকেই ধীরে ধীরে গঠন করবার চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ বাঙালী পাঠকই যে উচ্চ-সাহিত্যের সূক্ষ্মতম রস উপলব্ধি করতে পারে না, এই দুঃখজনক সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেক্সপিয়রের "ম্যাকবেথে"র মত ও রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' আর "তপতী"র মত নাটক সু-অভিনীত হয়েও বাংলাদেশে চলে নি। রবীন্দ্রনাথের উচ্চতর শ্রেণীর কবিতারও ভক্ত এখানে সংখ্যায় কত কম! এখানকার অনেক সুশিক্ষিত পাঠকেরও কাছে যে "শেষের কবিতা"র মত লেখার আর্ট ও চরিত্রসৃষ্টিতে অসাধারণ উপন্যাস দুর্বোধ্য এটাও আমি ভালো ক'রেই জানি। আমার মতে, এ-সব লক্ষণ বয়স্ক পাঠকেরও শিশু-মনের পরিচয় প্রকাশ করে। শিশুকাল থেকে তাঁদের মনকে ধীরে ধীরে সাহিত্যরসে ক্রমেই বেশী অভ্যস্ত ক'রে তুলতে পারলে সাহিত্যের উচ্চভাগ তাঁদের কাছে আজ এতটা দুর্গম ব'লে মনে হ'ত না।

যোগীন্দ্রনাথ জলসিঞ্চন ক'রে গেছেন চারাগাছেই। শিশুসাহিত্যসেবক এই তপস্বী সাধককে আমি প্রণাম করি। তাঁর স্মৃতিপবিত্র আদর্শ অন্ধদের দৃষ্টিদান করুক।

(পুরাতন ভাষণ হইতে)

'মহাপ্রয়াণ'

অধ্যাপিকা বেলা বসু

মডার্ণ রিভিয়্যু ও প্রবাসীর এক একনিষ্ঠ সেবক অকৃত্রিম সুহৃদ ও পরম শুভার্থী শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ গত ৮ই ডিসেম্বর বেলা ১ টায় পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যুর পক্ষে এ ক্ষতি অপূরণীয়। সাম্প্রতিককালে তিনি এই দুই পত্রিকার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত না থাকিলেও এক অদ্ভুত মমত্ববোধ ইহাদের জন্য তাঁহার ছিল।

১৯০৫ সালের বাঙলার সেই মহাবিপ্লবের বৎসরের যে মাসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্য ও কৈশোর কাটে শ্রীহট্ট ও ডিব্রুগড়ে তাঁহার মাতার কর্ম্মস্থলে। পরবর্ত্তীকালে তিনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই. এস-সি পরীক্ষা পাস করেন এবং সিটি কলেজে বি. এস-সি পাঠরত অবস্থায় ফাইন্যাল পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার উপর সরকারের রোষদৃষ্টি পড়ে এবং তিনি কারারুদ্ধ হন। তাঁহার শিক্ষা-জীবন সাময়িকভাবে বাধা পায় অবশ্যই। ইহার পর হইতে জেলের চার দেওয়ালের মধ্যেই পুনরায় তাঁর শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। সেখান হইতেই তিনি বি. এ. পাস করেন এবং অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করেন। জেলের অভ্যন্তরে পড়ার সুযোগ করিয়া দেন বক্সার জেলেরই সুপার। জাতিতে আইরিশ এই ভদ্রলোকটির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁহার অসীম এবং কৃতজ্ঞতারও শেষ ছিল না। এই শিক্ষা-জীবনের শেষ তাঁহার কোনদিনই হয় না, ১৯৬৫ সালে শেষ সংস্কৃতে এম. এ. পাস করার ফলে দশটি বিষয়তে এম. এ. পাস তাঁহার করা হয়। এ বৎসরও তিনি সংস্কৃত আরেকটি বিভাগে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

১৯৩৮ সালে তিনি জেলের বাহিরে আসেন এবং ১৯৩৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে কর্ম্মজীবন সুরু করেন। অবশ্য সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করেন তিনি ছাত্রাবস্থায় যখন বি. এস. সি পড়েন। তখনই প্রথমে 'বিজলী', পরে 'যুগবাণী' নামে এক পত্রিকা তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে মিলিতভাবে প্রকাশ করেন এবং এই যুগবাণীই তাঁহার কারাবরণের অন্যতম কারণ ছিল। ১৯৪০ সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একাধারে শিক্ষক ও সাংবাদিক এই দ্বৈত-জীবন সমান দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে চালাইয়াছেন। শেষের কয়েক বৎসর তিনি আনন্দমোহন কলেজের (সিটি কলেজ নৈশ) অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই পদ হইতেই আকস্মিকভাবে মৃত্যু আসিয়া চির বিশ্রামের কোলে তাঁহাকে লইয়া গেল। আচম্বিতেই এক জ্ঞান-তপস্বী কর্ম্মযোগী মহামানুষের তিরোভাব হইল। বাঙলা দেশ আজও যে কয়টি সন্তানের জন্য গর্ব্বিত, শ্রীযুত দেবজ্যোতি বর্ম্মণ ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম। নির্ভীক ভাবে সত্যকে আশ্রয় করিতে ও সত্যের জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করার মানুষ আজ যেন্য দুঃসাধ্য। শ্রীযুত বর্ম্মণ ছিলেন এই ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীরই একজন। তাঁর মৃত্যু বাঙলার দুর্দ্দিনেরই ঘোষণা করে।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণের প্রতিভাময় জীবনের পরিচয় কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া বাঙলা দেশের সমগ্র জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সামাজিক জীবন, কি শিক্ষা জীবন কোন ক্ষেত্রেই তাঁহাকে বাদ দিয়া বাঙলা দেশ চলে নাই। সাংবাদিক জীবনে তিনি ছিলেন স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তরসূরী।

সাংবাদিক জীবনে তিনিই ছিলেন দেবজ্যোতি বাবুর ভাবগুরু। যে আদর্শকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যু পত্রিকায় আমরণ দৃঢ়তার সঙ্গে বজায় রাখিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শকে বাঙলার বর্ত্তমান সংবাদপত্রের জীবনে সঞ্জীবিত করার জন্যই ছিল তাঁহার

আপ্রাণ চেষ্টা। সত্য, ন্যায়-নীতি ও দেশাত্মবোধই ছিল তাঁহার সাংবাদিক জীবনের মূল উপাদান এবং তাঁহার একান্ত সাধনার বস্তু যুগবাণীতে তিনি এই আদর্শকেই মূলধন করেন। এই মূলধন খাটাইয়াই তিনি যুগবাণীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করিতে সক্ষম হন। যাহা বোঝায় বাঙ্গলা দেশের পত্র-পত্রিকায় তাহার অভাব আছে। যুগবাণী সে দোষমুক্ত। ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার নিকট এ যুগের অক্ষয় কীর্ত্তি যুগবাণী—যাহাকে লইয়া গর্ব্ব করার অধিকার তাহার থাকিবে। বাঙ্গলা দেশের বহু দৈনিকের সঙ্গে শ্রীবর্ম্মণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। স্বর্গীয়
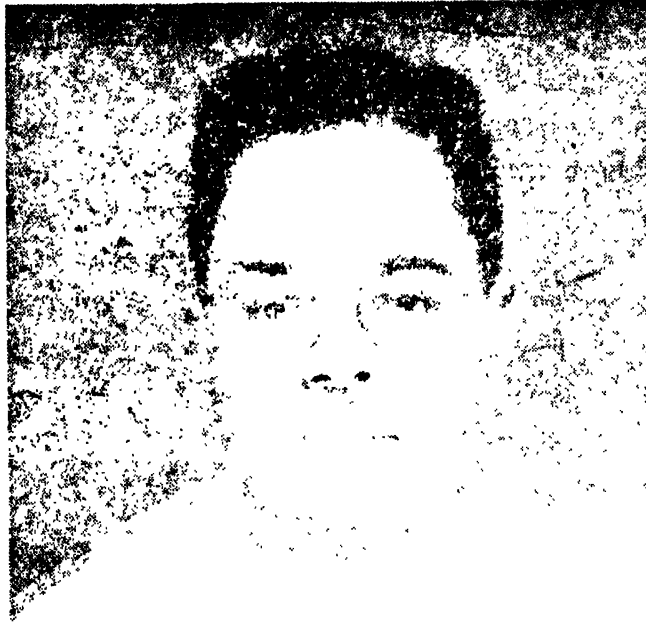
দেবজ্যোতি বর্ম্মণ

বিশ্বাস করিতে কষ্ট হইলেও এ কথা সত্য যে অসত্য প্রচার করিতেছে বুঝিলে তিনি লাভজনক বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত তাঁহার পত্রিকায় ছাপিতেন না। প্রতিটি প্রবন্ধ তিনি নিজে যাচাই করিয়া ছাপিতেন শুধু তাহা নহে, প্রতি বিজ্ঞাপন-দাতার নাড়ী-নক্ষত্র না জানিয়া কখনো তাহা কাগজে ছাপিবেন না। বাঙ্গলার সংবাদপত্রের জীবনে 'যুগবাণী' একটি সৃষ্টি। সার্থক ও আদর্শ সাংবাদিকতা বলিতে মাখন সেনের কাগজ 'ভারত'-এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় থাকাকালীন স্বর্গীয় সত্যেন মজুমদার মহাশয়ের সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং তাঁহার সাংবাদিক জীবনে এই দুই পুরুষের অবদান যে যথেষ্ট এ কথা অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করিতেন। বসুমতী কাগজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সেদিন পর্য্যন্তও প্রত্যক্ষ ছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবেই যুক্ত

ছিলেন। বাঙ্গালার সামগ্রিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের তিনি ছিলেন পুরোধা। মৃত্যু আজ যে লেখনীকে স্তব্ধ করিয়া গেল, জানি না আর কতদিনে বাঙ্গলায় এরূপ বলিষ্ঠ ও নির্ভীক লেখনীর পুনরাবির্ভাব ঘটিবে। এ কথা অতি নির্ম্মম সত্য যে এই লেখনীর প্রয়োজন বাঙ্গলায় আজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশীই ছিল।

রাজনৈতিক মতবাদে তিনি কোন্ দলীয় তাহা বলা শক্ত। প্রথম জীবনে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন। কিন্তু অন্ধ ভাবে কোন মত বা পথকে অনুসরণ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল বলিয়াই আজ তাঁহার কোন দল নাই। তিনি দেশের; কোন বিশেষ দলের নন। সমগ্র দেশ যখন বিনা দ্বিধায় গান্ধিজীর বাণীকে অমোঘ নির্দ্দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেয় সেদিনও তিনি তাঁহাকে তীব্র সমালোচনার কষাঘাতে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীনতার প্রথম যুগে সরকার তথা কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব তাঁহার একেবারেই ছিল না, বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে, দেশকে সমৃদ্ধশালী করিতে তাঁহার উদ্যম ও আগ্রহের অন্ত ছিল না। এই জাতীয়তাবোধ ও উগ্র দেশপ্রেমই তাঁহাকে নিজের রাজনৈতিক জীবনকে এক নূতন পথে চালনা করার প্রেরণা দেয়। এই পথ ছিল নিঃস্বার্থ সমালোচকের পথ, কিন্তু কখনও তাঁহার সমালোচনা ধ্বংসাত্মক ছিল না। মতবাদের দিক হইতে বিরোধী দলের সঙ্গেও এজন্য তাঁহার বিশেষভাবে আপোষহীন সংঘাত কখনই বাধে নাই। পরমতসহিষ্ণুতার অভাব তাঁহার ছিল না বটে কিন্তু সত্য ও আদর্শের অবমাননা দেখিলে কোন ক্রমেই আপোষ তিনি করিতেন না। তাই রাজনৈতিক জীবনে বন্ধু তাঁহার অনেক ছিল, দল তাঁহার একটিও ছিল না।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণের বহুমুখী প্রতিভার অপর আরেকটি পরিচয় তাঁহার শিক্ষক জীবন। এক ছাত্র দরদী মহাপণ্ডিত শিক্ষক তিনি ছিলেন বলিলে যেন তাঁহাকে ছোটই করা হয়, তিনি ছিলেন এমন একজন শিক্ষক যিনি কেবল ছাত্র তৈয়ারী করিতেন না, মানুষ তৈয়ারী করিতেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যেযাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে তাহারাই জানে যে তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বকে জাগাইতে তিনি কতটা সহায়তা করিয়াছেন। শিক্ষা প্রসারতার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করিতেন মনেপ্রাণে। যে কোন স্বাধীন দেশের নরনারীর চিন্তার জগতে অন্ধকার থাকিলে সে জাতি কখনই বাঁচিতে পারে না, এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। শিক্ষা প্রসারের জন্যই তিনি সিনেটের সভ্যপদ গ্রহণ করেন এবং আমরণ সর্ব্বভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করিয়াই গিয়াছেন। নিজে তিনি আজীবন ছাত্র; পাঠ ও পঠন তাঁহার শুধু পেশা ছিল না, তাঁহার এমন নেশা ছিল যে জীবন দিলেন তবু পাঠ ছাড়িলেন না। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমই তাঁহার এই কালব্যাধির অন্যতম কারণ। কিন্তু পাঠাভ্যাস তিনি ত্যাগ করিলেন না।

মানুষ সমালোচনার উর্দ্ধে নয়, তিনিও ছিলেন না। তাঁহার ব্যক্তিগত মত, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সাংবাদিক জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে একমত নন, এই মতবিরোধিতা, এই সমালোচনাই প্রমাণ করে তিনি ছিলেন বিশেষ একজন যাঁকে সাধারণের স্তরে ফেলা যায় না। বাঙ্গলার সাহিত্য জগতে একদিন যেমন ছিলেন সজনীকান্ত দাস, তেমনি রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন দেবজ্যোতি বর্ম্মণ। সরকারপক্ষ বিরোধীপক্ষ নির্ব্বিশেষে যাঁরাই সর্ব্বসাধারণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত তাঁহাদের সকলেরই ত্রাসের কারণ ছিলেন শ্রীযুত বর্ম্মণ। বর্ত্তমানকালে তাঁহার মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হইলেও আগামী কাল তাহাতে কার্পণ্য করিবে না, এজন্য যে তিনি ছিলেন নতুন যুগের মানুষদের কাছে একটি আদর্শ—যিনি অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

সে এসে আমায় বললে

শান্তশীল দাশ

সে এসে আমায় বললে, এ বাঁচার অর্থ আছে কিছু ?
এই যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, এর মানে আছে কোনো ?
পদে পদে বাধা আর টুঁটি টিপে সমস্ত ইচ্ছার,
এক পা এক পা করে এগিয়ে চলা মরণের পানে ?

আমি তো চাইছি বাঁচতে ; বিলাসের উচ্চাসনে নয় ;
দুটি হাতে কাজ করে, আর সেই কাজের দক্ষিণা
নিয়ে দুটো পেট ভরে খেতে চাই, আর মাথা গুঁজে
থাকতে চাই স্নিগ্ধ শান্ত ছোট এক নিভৃত আশ্রয়ে।

এর বেশি চাইনা তো। এ কি বেশি ? বল না, বল না ?
তবু এ পেলাম না কো। অথচ আমার চারিধারে
কত আলো, কত গান, জীবন ভোগের উপচার
কত শত। আমি দেখি ! চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে।

কত না রঙিন স্বপ্ন ছিল এই দুটো চোখ ভরে ;
একটি একটি করে ঝরে গেল, আর স্বপ্ন নেই।
বল না, এমন করে বাঁচার কি অর্থ আছে কোনো ?
সে বললে, উদভ্রান্ত দৃষ্টি : কী দেব জবাব, পাইনে তো।

না না আমি হারবো না, কিছুতেই হার মানবো না,
আমাকে পেতেই হবে—অকস্মাৎ ছুটে চলে গেল।

মনীষী

(Robert Southey— The Scholar. 1774-1843)

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মৃতদের মাঝে মোর দিনগুলি হয়েছে অতীত ;
চতুর্দ্দিকে মোর সদা দেখিতেছি আমি,
যেইদিকে অকস্মাৎ এই আঁখি হয় নিপতিত,
শক্তিশালী মনগুলি দেখি দিবাযামি :
চিরস্থায়ী বন্ধু মোর তাহারা সবাই,
প্রত্যহ তাদের সাথে আলাপে কাটাই।

তাদের সহিত সুখে আমি বটে আনন্দিত হই,
দুঃখের মাঝারে খুঁজি তার উপশম ;
আমি বেশ বুঝি আর অনুভব করি যে স্বতঃই
তাহাদের কাছে ঋণ করেছি চরম।
আমার কপোল কত অশ্রুসিক্ত হয়—
সুগভীর সুচিন্তিত কৃতজ্ঞতাময়।

প্রাক্তন মনীষী সাথে যুক্ত মোর চিন্তাগুলি ঢের ;
সুদূর অতীতে বাস করি যে আবার,
ভালবাসি গুণগুলি, নিন্দা করি তাদের দোষের,
অংশী হই তাহাদের আশা ও শঙ্কার,
তাহাদের শিক্ষা থেকে খোঁজ করে' পাই
উপদেশ নত মনে যখন যা চাই।

প্রাক্তন মনীষী সাথে যুক্ত মোর আশা সমুদয় ;
মোর স্থান শীঘ্র হবে তাহাদের মাঝে,
ভ্রমিব তাদের সাথে আমি সদা ভাবীকালময়
অনন্ত ভবিষ্যে শুধু আপনার কাজে ;
হেথা নাম রেখে যাবো, করি এ-বিশ্বাস—
সংসারে হবে না কভু তাহার বিনাশ।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তকে'র সুর-সপ্তক

অধ্যাপিকা বাসন্তী চক্রবর্তী

'পরিশেষে' কবি-মনে সব ছেড়ে যাওয়ার একটি করুণ বেদনার অনুরণন ক্ষীণ তারে বেজে উঠেছিল......এ বেদনা দীর্ঘকালের মর্ত্য-প্রীতি সঞ্জাত—এতদিনের রূপে ভরা, রসে ভরা, মাধুরীতে ভরা যে পৃথিবীর লীলা-বৈচিত্র্য কবি-মনকে ভরিয়ে রেখেছিল তার স্নেহে প্রীতিতে আদরে সোহাগে—তাকে চিরতরে ছেড়ে যাবার বেদনা। কবির রোমান্টিক মন জীবনকে ভালবেসেছে—ভালবেসেছে জীবনের অমৃতময় লীলা-রঙ্গ-রসকে—তার দুখে-সুখে-হাসি-কান্নায় বিজড়িত জীবন-ছন্দকে। মানবিক দিক থেকে এই মর্ত্যমাধুরী কবি-মনকে যেমন আকর্ষিত করেছে—তেমনি বহির্জগতের প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শঘেরা সৌন্দর্যলোকেও কবির শিল্পী-সত্তাকে করেছে আকুলিত......কবি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে এ জগতের রূপ-রস-ছন্দ ধ্বনিকে ধরার চেষ্টা করেছেন। আপন জীবন-বীণার বৈচিত্র্যমুখর তারের ঝঙ্কারে। আর সেই সঙ্গে একদিকে আপন 'জীবন দেবতা' অর্থাৎ শিল্পী-সত্তা বা স্রষ্টাকে অনুভব করেছেন তাঁর নানা কাজে—নানা প্রেরণায়—বৃহত্তর অর্থে এই 'বিশ্বপিতা'র অনিবার্য ইঙ্গিতের গভীর স্পর্শকে অনুভব করেছেন আপন জ্ঞানে—আপন কর্মে—আপন চেতনায় যেমন—তেমনি এ জগতের আকাশে বাতাসে তারায় আলোয় শ্যামল মাটির ঘাসে ঘাসে! এই যে আপন চৈতন্যলোকের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সহজ স্বাভাবিক চলমানতার জীবনছন্দকে মিলিয়ে দেখা—এর ফলে কবি-মনের অনুভবের ক্ষেত্রে জেগেছে এমন একটা বিশ্বচেতনা—যার ফলে শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের সময় সমস্ত দিনগুলি তার গভীর অনুভবের ক্ষেত্রে বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে উঠেছে। বেদনা-বিধুর এই সকল দিনের ভাবনাই রূপ পেয়েছে অতীত স্মৃতির মধুময় দিনগুলির অমলিন মাধুরিমার মধ্যে। তাই দেখি 'পূরবী'র 'শেষ রাগিণীর বীণে' যে সুর করুণ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—'পরিশেষে' এসে তাই-ই রূপ নিয়েছে আরও তীব্র রাগিণীতে। কিন্তু আশ্চর্য এই 'পরিশেষে'র শেষে এসে 'নূতন কালে'র আহ্বানে তার দাবি মেটাতে কবি যে গদ্য ছন্দের ব্যবহার করলেন এবং বিষয়-বস্তু হিসাবে অতি বাস্তব তুচ্ছতার মধ্যে কাব্যরস সিঞ্চন করলেন—সেই নব প্রেরণা এবং প্রয়োগ পরীক্ষার নবীন উৎসাহে কবির মন থেকে শেষ বেলাকার 'করুণ রাগিণী'র ক্ষীণ সুরধ্বনিটুকুও আকাশে বাতাসে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যায়। তাই 'গীতাঞ্জলী'—'গীতালি'—'গীতিমাল্যে'র যুগে কবি-মনে বাস্তব জগতের তুচ্ছতা হতে দূরে সরে গিয়ে আপন জীবন সাধনার ক্ষেত্রে যে আত্মমগনের ভাব দেখা দিয়েছিল—পরবর্তী 'বলাকা' কাব্যে নবযৌবন বা তারুণ্যের জয়গান করে আবার কর্মমুখর এই ধরণীর বুকে ফিরে আসায় কবি-মনে যে জীবনী শক্তির বা অনিঃশেষ প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়—'পুনশ্চে'র যুগেও আর একবার সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। 'পুনশ্চে'র কোন কবিতার মধ্যেই পূর্ববর্তী 'পূরব' বা 'পরিশেষে'র বিদায় লগ্নের ম্লানচ্ছায়া করুণ রাগিণীর সুর মূর্চ্ছনায় ধরা পড়ে নি—বরং কবি-মনের এক সদ্যোজাত জীবনী-শক্তির ছাপ বয়ে এনেছে এ কাব্যের প্রাণচঞ্চল কবিতাগুলি। নূতনের 'ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে' কবি পুরোণো কিছু হারিয়েছেন বলে মনে হয় না—কিন্তু নূতনের স্পর্শে সঞ্জীবনী শক্তিতে আপন অন্তরলোকের পুনরুজ্জীবন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু 'পুনশ্চে'র পরবর্তী (বিচিত্রিতা মাঝখানে আছে) গদ্য কবিতা গ্রন্থ 'শেষ সপ্তকে' পুনরায় সেই করুণ রাগিণীর মৃদু কম্পন ধরা দেয় সুর সপ্তকের শেষ তানে। কবি-মানসে ফেলে আসা দিনগুলির অনেক হাসি-কান্না-চাওয়া-পাওয়া দুঃখ-সুখে বিজড়িত মধুর স্মৃতি আজ যাবার বেলায় আনমনে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে—করে তুলেছে উতলা-উদাসী-উন্মনা। অনেক দেওয়া-নেওয়া-চাওয়া পাওয়ার সুখ-দুঃখে বিজড়িত স্মৃতি ব্যথিত করে তুলছে কবি-মনকে। কবি আপন

মনের পূর্ণতা খুঁজে পেতে চেয়েছেন তাদেরই মাঝে—সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাদের—সেই সমস্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন স্মৃতিগুলিকে আপন মনের মণিকোঠা হতে একে একে বের করে তাদের এক একটি কাব্যফুলকে গেঁথে তুলেছেন একসূত্রে। সুর সপ্তকের বিচিত্র সুরছন্দকে ধরতে চেয়েছেন আপন হৃদয়-বীণার ঐকতান সঙ্গীতে। তাই কবি-মনের এতদিনের যা কিছু ভাবনা-বেদনা, যা কিছু গান—যা-কিছু সুর-সাধনা সব উজাড় করে দিয়ে গেলেন এ কাব্যের বাণী-বন্দনায়। এই সমস্ত কবিতার মধ্যে তাই মোটামুটি একই ভাব, একই সুর বিধৃত—অথচ স্বতন্ত্রভাবে তাদের রূপ-সৌন্দর্য, ভাবমাধুর্য বা সৌরভ অনবদ্য শিল্প-সুষমার দাবী করতে পারে।

জীবন-সায়াহ্নে এসে কবি একবার দার্শনিকের—জীবন-রসিকের দৃষ্টিতে জীবনকে-জগতকে নূতন করে অনুভব করছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই দার্শনিক কবির সূক্ষ্ম মনন-জীবন দর্শন, গভীর আত্মোপলব্ধি যেমন প্রকাশ পেয়েছে—তেমনি শিল্পী-মানসের এই জীবনলীলা রঙ্গ-রসের যে বিচিত্র অনুভব—সুখে দুঃখে, স্নেহে প্রেমে জড়িত এই জীবনের প্রতি যে গভীর ও একান্ত ভালবাসা এবং 'অস্তাচলের পানে এসে পূবাচলের পানে' ফিরে ফেলে-আসা জীবনের রূপ, রস, সৌন্দর্য, মাধুর্যকে যে একান্ত করে অনুভব—তার জন্যে কবিমনের যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে—সেই কথাই এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। বর্তমানকেও কবি তাঁর রূপের, রঙের, রসের তুলিতে ধরতে চেয়েছেন—কিন্তু সেখানেও এক দার্শনিক-শিল্পীর অনাগত ভাবে একের পর এক ছবি আঁকার বাসনাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমস্ত জীবনব্যাপী পৃথিবীর কাছ থেকে যা পেয়েছেন—যে ভাবে তাকে দেখেছেন—কবি শিল্পীর গভীরতম এবং বৈচিত্র্যময় অনুভবের ক্ষেত্রে তারা যে রঙের আলিম্পন বুলিয়েছে, যে রসের অনির্বচনীয়তা যুগিয়েছে তারই সূক্ষ্ম তীব্র প্রগাঢ় স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটেছে এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়। কবিতাগুলির কোন 'নামকরণ' করা হয় নি—সংখ্যা দিয়ে একের পর এক এদের বাণীময় প্রকাশ। যেমন জীবন-শেষে দাঁড়িয়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষির, দার্শনিকের জীবনশিল্পীর আপন রহস্যময়, বৈচিত্র্যময় অন্তরাকাশের পট উত্তোলন—একের পর একখানি পর্দা সরে যাচ্ছে—আর অতি স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার রূপচিত্র—রসচিত্র—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখার কারিকুরি—বর্ণের সুষমা—ভাবের রসঘন ব্যঞ্জনা—এবং সব মিলে কবিমনকে জানবার, বুঝবার, অনুভব করবার এক সুন্দরতর আত্মপরিচয় এর বহু কবিতার মধ্যে কবি আপনার আত্ম-পরিচয় রেখে গেছেন। ৪৫ নং-এ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখা কবিতায়—

> ভরা যৌবনের দিনেও
> যৌবনের সংবাদ
> এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে।
> আমার মন বুঝল
> যৌবনকে না ছাড়ালে
> যৌবনকে যায় না পাওয়া।
> আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
> পূবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে।
> পিছু ডাক,
> দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
> আজ সামনে দেখা দিল
> এ জন্মের সমস্তটা।

বাস্তবিক এ কথা ধ্রুব সত্য। এই জীবনের শেষ ঘাটে এসে কবি পূবের হাওয়ায় যে পিছু ডাক শুনলেন—সেদিকে পিছন ফিরে দেখলেন সমস্ত জন্মটা তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত জন্মটার ভাল মন্দ-সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার ঋজু শুভ্র স্বচ্ছ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির কথাই বিচিত্র বিকাশে ছন্দায়িত হয়ে উঠেছে এর স্তবকে স্তবকে। মোটের উপর কবির মন এখানে অন্তর্মুখী—এবং নিরপেক্ষ দার্শনিকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কবি স্বচ্ছ 'সাবলীল ভঙ্গিতে ব্যক্তিমনের জীবন-দর্শনকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য যে সে চেষ্টা এখানে অবিস্মরণীয় সার্থকতায় ভরে উঠেছে। গদ্যের আটপৌরে চলনের মধ্যে কেবল যে তুচ্ছ নিরাভরণ বিষয়বস্তুই কাব্যের উপাদান হিসাবে গ্রাহ্য নয়—গুরু-গম্ভীর ভাব বা ভাবনাও যে এর সহজ অনাড়ম্বর চলনের অভিপ্রকাশে ধরা পড়তে পারে—তার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ না করেই—তার সার্থক প্রকাশ আছে এ কাব্যের

বহু কবিতায়। কবির দার্শনিক মনের অনেক বিচিত্র ভাব বা ভাবনা যা এর আগে ছন্দের বাঁধাধরা পথ ধরে অভিব্যক্ত হ'তে পারে নি গদ্যের সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকাশের মধ্যে কবিমনের সেই সমস্ত ভাবনা-বেদনা একের পর এক হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাস্তবিক গদ্যের আটপৌরে ভঙ্গির মধ্যে কেবল তুচ্ছ বাস্তবতাই যে তার স্থান করে নেয় নি—গুরুগম্ভীর ভাব এবং ভাবনা—দর্শন মনন এবং চিন্তন চিত্রসৌন্দর্য এবং ভাবমাধুর্যের সমন্বয়ে সুসংগতি বা সুমিতি লাভ করে গদ্যকাব্যে যে স্বকীয় আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তাতে গদ্যভঙ্গিমার কৌলীন্য বেড়ে গেছে এবং এ ছন্দের ভাবসৌন্দর্য ও রূপবৈচিত্র্যও কাব্যের অনির্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। কবির আজন্মের কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে এ এক নূতনতর সিদ্ধি। তাই এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে যখন কবির আত্মমগ্ন হৃদয়ের একান্ত আপন গোপন ভাবনা-বেদনার কথা একের পর এক গদ্যছন্দে শুনে যাই, তখন একথা স্বতঃই মনে হয় যে কবি এতদিন এ কথাকে ঠিক যেমন করে বলতে চেয়েছেন—দীর্ঘ জীবনসাধনার পরে তার যথার্থ পথটি যেন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে···সে সুরকে কবি যেন এতদিনে আপন বীণার তারে ধরতে পেরেছেন। তাই সুর-সপ্তকের শেষ রাগিণীতে দীর্ঘ জীবনসাধনার সমস্ত সুর, সমস্ত ছন্দকে উজাড় করে দিয়ে গেলেন। সুর-সপ্তকের 'শেষ সপ্তক' 'নি' তে এসে যেমন পর্দা আর চড়ানো যায় না—কবিও আপন বীণায় সেই শেষ তান ধরেছেন। 'সপ্তকে'র বিভিন্ন মীড়গুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন সুরের সাধনা করে—অথচ মূল সুর একই ঐকতান সঙ্গীতে বিধৃত—'শেষ সপ্তকে'র কবিতা-গুলিকেও সাতটি সুরের পর্দায় ভাগ করলেও তাদেরও মূল ভাব এবং ছন্দের দোল ঐ একই সুর-সাধনায় মগ্ন। 'শেষ সপ্তকে'র বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতা আলোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(১)

প্রথম শ্রেণীর কবিতার মধ্যে দেখি, সৃষ্টির এই যে আবর্তন বিবর্তন—এর বুকে দাঁড়িয়ে কবি সেই পরম দেবতার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছেন—জীবনকে গ্রহণ করেছেন সীমার কোটিতে দাঁড়িয়ে অসীমের মহা ইঙ্গিতময় ঔদার্যের মধ্যে। এই জাতীয় কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির আপন মনের সহজ স্বাভাবিক গতির কথাই বলতে চেয়েছেন। কবির শিল্পী-মানসের চাওয়া পাওয়া ভাল মন্দবোধ—আশা আকাঙ্ক্ষার বিরহ মিলনের তাপ-অনুতাপ যে আর দশজনের মতো নয়—এ সম্বন্ধে কবিও সচেতন। এই চির কিশোর রোমান্টিক মনটি 'জীবন পথে' চলে 'চির পথিক' হয়ে— 'হালকা তার স্বভাব গিরিনদীর মতো'। কিন্তু এই অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া প্রাণ—যার 'দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ'—'রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে'—সে মন 'ভিড়ের কলরব পেরিয়ে' শোনে 'গানের আহ্বান'—খোঁজে তার সত্য। তাই অহংবোধের খোলস ত্যাগ করে সুখ দুঃখ কান্না হাসির দ্বিধা দ্বন্দ্বের তরঙ্গের বুকে আপনাকে স্থাপন করে মহাকালের নৃত্যছন্দের তালে তাল মিলাতে চেয়েছেন— 'সাত নম্বরে'—

> মহাকাল সন্ন্যাসী তুমি।
> তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
> উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
> আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গ-তলে।
> তারই নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
> তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
> হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
> জীবন আর মৃত্যু পাওয়া আর হারাণোর মাঝখানে
> যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
> সেই সৃষ্টি হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
> স্তিমিত নিভৃতে
> দাও আমাকে আশ্রয়।

এই যে জীবন আর মৃত্যু—পাওয়া আর হারাণোর মাঝখানে অক্ষুব্ধ শান্তির সন্ধান—বোধ করি এ অমৃতের সন্ধান আজীবন তিনি করে গেছেন। নটরাজের ঐ রুদ্র-রূপের মাঝে সৃষ্টি এবং ধ্বংস, জন্ম এবং মৃত্যু, বেদনা এবং শান্তির এই কল্পনা তাঁর 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও দেখা যায়। এ কাব্যের '৩৭' নম্বরের সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল আছে।···

বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।

নটরাজের কাছ থেকে শক্তি বীর্য সত্য এবং শান্তি ও ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে মোহহীন বৈরাগ্যের আদর্শে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। অথচ এই মর্ত্য পৃথিবীর এবং তুচ্ছ মানব-জন্মের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ধ্বনিও তাঁকে হাতছানি দিয়েছে…উন্মনা করেছে…কবি তার অব্যক্ত সুর—অশ্রু ও ধ্বনি—অলক্ষ্য রূপসৌন্দর্যের ইঙ্গিত, আপন অন্তরে অনুভব করেছেন রেখে রেখে, চেখে চেখে। আর তাই ত সেই ভাল-লাগা মন্দ-লাগা এমন মহিমময়, এমন নৈর্ব্যক্তিক, এমন অপরূপ মাধুর্যে ভরপুর। 'ছয়', 'সাত', 'আট', 'বার' 'উনিশ', 'বাইশ', 'ছাব্বিশ', 'চৌত্তিরিশ', 'পঁয়ত্তিরিশ', 'পঁয়তাল্লিশ' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি মনের এই সমস্ত ভাবনা-বেদনাই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত কবিতার মধ্যে কবির এই জীবনপথের পথিক হয়ে সহজ আনন্দে মর্ত্য-পৃথিবীকে 'ভালোবেসে' যাবার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠেছে—'উনিশ' নম্বরে—

তখন বয়স ছিল কাঁচা;
কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
… … …
তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা আধজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রঙটা
মনের দিগন্ত রেখেছিল রাঙিয়ে
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন ঘটাবার স্বপ্ন।

'বাইশ' নম্বরে—

শুরু হতে ও আমার সঙ্গ ধরেছে
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
… … …
আমি আজ পৃথক হব।
ও থাক ঐখানে দ্বারের বাহিরে,
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক
তালি দিক বসে বসে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে;
জন্ম-মরণের মাঝখানটাতে
যে আল বাঁধা ক্ষেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উঞ্ছবৃত্তি।

'কাঁচা মনের অপরূপের রাঙা রঙটা' এমনি করে জরা মৃত্যু বার্দ্ধক্যে জড়িত হিসাবী মনটাকে সরিয়ে দিয়ে মুক্তি খোঁজে 'আকাশের অনন্ত অবকাশের মাঝে'। কিন্তু— 'ছাব্বিশ' নম্বরে—

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড করে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে।

তাই 'বনস্পতি'র সম্মুখে এসে রোজ সকালে বিকালে কবি বসেন, আর—

শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী।
… … …

তাই—

এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষ বাণীতে হোক উদ্ভাসিত
"ভালোবাসি"।

এই 'ভালোবাসা'র শাশ্বত বাণী মন্ত্রেই কবি আপন জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির থেকে…আপন মনের সেই অমৃত মাধুরী ছড়িয়ে দেন আকাশে বাতাসে লোকে লোকান্তরে…জীবনের সহজ আনন্দের দুঃখ সুখের, ভাব-ছন্দময় লীলা-মাধুর্যে। 'চৌত্রিশ' নম্বরে তাই কবি নিজের সম্বন্ধেই বলেন—

পথিক আমি
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।
… … … …

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

তাই এই অনিত্যের মাঝে, সীমার মাঝে, খণ্ডরূপের মাঝে শাশ্বত অসীম অখণ্ড সত্যের সন্ধানই কবি আজীবন করে চলেন। 'পঁয়ত্রিশ' সংখ্যকে তাই—

অঙ্কের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন কথা জানতে তার এত অধৈর্য।
যে কথা দেহের অতীত।

এই 'দেহের অতীত' যে কথা—সেই সত্য শাশ্বত কথাকেই কবি খুঁজে ফেরেন নিত্যের মধ্যে—তুচ্ছতার মধ্যে—বন্ধনের মধ্যে। খাঁচার পাখীর বন্ধনবিড়ম্বিত জীবনে তাই শুনতে পান গোপনে—'সুদূর অগোচরের অরণ্য মর্মর।' এই অশ্রুতবাণীর ইঙ্গিতেই কবিমনে—

দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে।
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য?

এই প্রশ্ন জাগে পুনরায়—

ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,
তার সত্য মিলবে কোনখানে?

'পঁয়তাল্লিশে'র মধ্যে কবির এই জীবনব্যাপী প্রশ্নোত্তরের মীমাংসা দেখি তাঁর ঔপনিষদিক সাধনায় পুষ্ট ব্যক্তিগত উপলব্ধ সত্যের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে—তাঁর সমস্ত জীবন-সাধনার যে স্বপ্ন হাসি কান্না দুঃখ সুখের লীলা-বিলাসের সঙ্গে অসীমের অমৃত সৌন্দর্যময় বাণীর সুসমন্বয় খুঁজেছে এই মর্ত্য পৃথিবীর বুকে—তা যেন এতকাল পরে সমে এসে পৌঁছেছে ভারতীয় ঋষির অকৃত্রিম জীবন-সাধনার মর্মবাণীতে।...তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে যে 'সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা' ঘটাতে চেয়েছেন—তা যেন এ কাব্যের এই ভাবছন্দে আপন অন্তর্লোকের রহস্যোদ্ঘাটন ক'রে সেই সত্যলোকের বাণী শুনায় উদাত্ত কণ্ঠে—

যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্ছি চিনে।
সমে এসে দেখছি
আমার এতকালের সুখ দুঃখের ঐ সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।

ঋষি কবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন—

"ভুবন সৃষ্টি করেছ
তোমার এক অর্ধেককে দিয়ে,—
বাকি আধখানা কোথায় তা কে জানে।"
সেই একটি আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে
আপন প্রান্তরেখায়;
দুই দিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা,—
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষ কথা বলে যাব—
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে, ভালোবেসেছি।"

যে মর্ত্যপ্রীতি এবং বাস্তব জীবনবোধ তাঁর কাব্যের মূল কথা—সেই সাধনাই এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে সহজ আনন্দের সাবলীল ছন্দে—

দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।

গদ্য ভঙ্গিমার এই অনাড়ম্বর সহজতার সাবলীল রূপছন্দে ধরা পড়েছে অন্তরের স্বাভাবিক আকুতিটুকু। 'আট' সংখ্যকেও তাই দেখি সৃষ্টির এই রূপ-রসের ধ্যানলোককে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা—

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর মধ্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।

আবার 'বার' নম্বরেও দেখি জীবনকে সহজভাবে—

স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার বাসনা। 'বলাকা'র 'নদী' সম্বন্ধে কবি যে কথা বলেছেন—

ফুড়ায়ে লয় না কিছু করে না সঞ্চয়
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথের করে ক্ষয়।

এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগের আনন্দেই জীবন ছুটে চলে যাবে খরবেগে—নৃত্যচঞ্চলা ছন্দে···এখানে সেই একই সুর ভিন্ন তারে—

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।

আবার চারদিকের এই অস্তিত্বের ধারার মধ্যে জীবনকে সহজ ছন্দে গ্রহণ করার মাঝে মাঝেই জীবনের পরম প্রাপ্তি এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে···'ছয়' নম্বরে—

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি ;
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।
অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাটে ;
কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাব্রতে।
শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,
অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাঁধা।

এইভাবে দিনের প্রান্তে গোধূলির ঘাটে এসে কবির শিল্পী-মন পিছন ফিরে জীবনের চাওয়া-পাওয়া নেওয়া-দেওয়া লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশকে মানবিকতার সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গিতে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। এ জীবনের কত টুকরো দেখা—কত ক্ষণিক পাওয়া, কত চঞ্চল পলাতক মুহূর্ত, কত তুচ্ছ দেওয়া-নেওয়া—কত গভীর তাৎপর্যে ভরে উঠেছে কবি-প্রাণে। এই জাতীয় ভাব বা ভাবনাই ছড়িয়ে আছে এ কাব্যের বহু কবিতায়। কাব্যের এত স্বচ্ছ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে শিল্পী আত্মার এই অন্তর্লোকের অবারিত প্রকাশ সত্যিই এ কাব্যকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। প্রথম শ্রেণীর এই জাতীয় কবিতাগুলিই এ কাব্যের মূল সুরকে বহন করছে।

(২)

'সুর সপ্তকে'র দ্বিতীয় রাগিণীর মূল সুরের অনুরণন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে প্রেম-চেতনায়। কাব্যের প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির বিগত যৌবনের অনেক ফেলে-আসা মূল্যবান শুভ মুহূর্ত আজ স্মৃতির আকারে কবিমনকে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। দূরকালে বাইরের না-পাওয়া বেদনার অরুণালোকে অতীতের অনেক পাওয়া—অনেক চাওয়া—অনেক ক্ষণিক মিলন মুহূর্ত—অনেক অবহেলা—অনেক টুকরো কথা—তুচ্ছ মান-অভিমান আজ বিশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর সমস্ত দেহ-মন দিয়ে এই প্রেম সৌন্দর্যের মাধুর্যটুকুকে রেখে রেখে, চেখে চেখে উপভোগ করেছেন। প্রেমের প্রগাঢ় উত্তেজনায়—উন্মত্ততায়—অহঙ্কারে একদিন মনে হয়েছিল "এক" নম্বরে—

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয়নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।

কিন্তু—

আজ তুমি গেছ চলে;
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।
এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।
তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হ'ল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।

বাস্তবিক বেদনার মধ্যেই, বিরহের মধ্যেই প্রেমের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি—তাই তখনই তার সত্যকার মূল্য নিরূপণ সম্ভব। মিলনের মধ্যে সম্ভোগের উন্মত্ততায় তার উপর

আসে ঔদাসীন্য—তাই তখন তার অপরিমেয় মূল্য প্রেমিক-প্রেমিকার নিকট ধরা পড়ে না। মিলন অপেক্ষা বিরহেই যে প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা বৈষ্ণব কবিদের এই প্রেম-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম অনুভূতিটি কবি এ যুগেও সত্য এবং সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ে তাদের মিলন-বেলার কোন ক্ষণিক মুহূর্ত স্থায়ী হয়ে যায় পরম লগ্নের মহামহিমা নিয়ে! এই পরম লগ্ন জীবনকে দান করে কত অমৃতময় মাধুর্য—কত অভাবনীয়ের রহস্যময়তা—কত চিরদুর্লভ অমৃতস্পর্শ! সে পরম লগ্ন জীবন থেকে বৃন্তচ্যুত ঝরে যাওয়া সুগন্ধী ফুল ...তার সৌরভ—তার মাধুর্য, জীবনের আকাশকে বাতাসকে চিরকাল মধুময় করে রাখে—'দুই' সংখ্যকের—

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধখোলা জানলায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ চলতি গানে;
... ...
তারপর মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়—উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

বাস্তবিক এই মনে সাড়া ক্ষণিক মুহূর্তের দান জীবনে অপরিসীম এবং অবিস্মরণীয়। প্রকৃতির রহস্যময়তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের মনকে অরূপ লোকের উদ্দেশ্যে যেমন যাত্রা করিয়েছে তেমনি বাস্তব জীবনবোধের সঙ্গে কবি প্রাণের সৌন্দর্যবোধের সমন্বয়ে নন্দিত হয়ে এ মুহূর্ত আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই পরম সত্য হয়ে উঠেছে।

আবার যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে জীবনের বহু চাওয়া পাওয়া, কান্না-হাসির স্মৃতি-বিস্মৃতিকে কবি ঝরে যাওয়া বাসন্তী ফুলের মত বেদনা-বিধুর আনন্দে অত্যন্ত সাবলীল ছন্দে বিদায় দেন—এও এক পরম পরীক্ষা আমাদের জীবনে। যা কালের অনিবার্য ইঙ্গিতে জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরে যায়—ঝরে পড়ে তাকে এ জীবনে মোহপাশে আবদ্ধ না রেখে সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে বিদায় দেওয়ার মধ্যেই আমাদের জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা! 'চার' নম্বরে—

যৌবনের প্রান্ত সীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষ;—
যাক কেটে এর আবেশটুকু;......
অথবা 'ঊনত্রিশ' সংখ্যকে—
অনেক কালের একটি মাত্র দিন
কেমন করে বাঁধা পড়েছিল
একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,
কোনো ছবিতে।
... ...
আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি,
স্তব্ধ যে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কি একটা কথা বলবে
বলা হল না,—
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে
ফেরার পথ নেই।

[ক্রমশঃ

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

(১১)

পরদিন সকালে দেখা গেল জর আজ আর ধীরার আসে নি। তবে বেশী উৎসাহ ক'রে আজ আর বিছানা ছেড়ে সে উঠল না। যশোদা আর নার্স মিলে তার সব কাজ-কর্ম্ম ক'রে দিল, তার ইচ্ছামত তাকে সাজিয়েও দিল। চা খেতে ইচ্ছা করল, কিন্তু নিরঞ্জনের অপেক্ষায় খানিকটা দেরিই করল সে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, কলকাতায় বা দিল্লীতে যদি এই কাণ্ডটা ঘটত, তা হ'লে কি রকম ব্যাপার হ'ত। কলকাতার বাড়ীতে হ'লে তার উদ্ধারকারীকে সবাই মিলে খুব উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ দিত, কিন্তু ব্যাপারটার সম্ভবতঃ যবনিকা পতন হ'ত ঐখানেই। নিরঞ্জন এত সহজে তার বন্ধু হয়ে উঠতে পারত না। এত ঘন ঘন দু'বেলা তার কাছে আসতে পারত না। দিল্লীতে হ'লে তাকে সোজা হাসপাতালে চ'লে যেতে হ'ত, সেখানে ঘড়ি ধরে একটুক্ষণ সময় সে নিরঞ্জনকে দেখতে পেত। তাতে তার মন একেবারেই তৃপ্ত হ'ত না। তা হ'লে এটা এলাহাবাদের মত আত্মীয়-হীন জায়গায় হয়ে ভালই হয়েছে। পৃথিবীতে অন্য কিছুর অভাব ত তার বিশেষ নেই, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সে বড় একলা, সেখানে তার কেউই নেই। কিন্তু এত বেশীরই কি দরকার ছিল? একে গ্রহণ করবার সাধ্যই কি আর তার হবে? কিন্তু ফেরবার ক্ষমতা ত তার একেবারেই নেই।

এই সময় একই সঙ্গে যশোদা এবং নিরঞ্জন এসে হাজির হওয়াতে তার চিন্তাসূত্রটা ছিঁড়ে গেল। ধীরার ঘরেই এল, কারণ তাকে ত আর এখন হাঁটান চলে না? জিজ্ঞাসা করল, "আজ নিশ্চয়ই জর নেই? চেহারাটা ত অনেক ভাল দেখাচ্ছে।"

ধীরা বলল, "চেহারা ভালতে ত সব সময় কিছু বোঝা যায় না?"

নিরঞ্জন বলল, "চেহারাটা আবার যদি স্বভাবতঃই বেশী ভাল হয়, তা হ'লে ত আরও কিছু বোঝা যাবে না।"

"বেশ বললেন যা হউক। চেহারা যাদের ভাল তাদের বুঝি অসুখ করলে মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না?"

নিরঞ্জন বলল, "ঠিক তা নয়। তবে অসুস্থ চেহারাটা ত দেখতে ভাল নয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, অসুস্থ ব'লেই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অন্য কারণে নয়। আবার যেখানে দৃষ্টিটা এমনিই আকৃষ্ট হয়, সেখানে অসুস্থতা আছে কি না তা খুঁটিয়ে দেখতে যায় না লোকে।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা তা ত হ'ল। তবে আমি সত্যিই ভাল আছি আজ। জর আসে নি সকালে। সারাদিন ভাল থাকলে কাল উঠে পড়ব। আর শুয়ে থাকতে পারছি না।"

"আবার তাড়াতাড়ি ক'রে অসুখ বাড়াবেন না। না হয় দু'দিন আরও শুয়ে রইলেনই? বিশ্ব-সংসার ঠিকই চলবে।"

ধীরা বলল, "কিন্তু আমি যে একটা চাকরি করি সেটা আপনি বেশ সুবিধামত ভুলে যাচ্ছেন। আমাকে কি ওরা চিরকাল ছুটি দিয়ে রেখে দেবে?"

"এই ক'দিনেই কি চিরকাল হয়ে গেল? ডাক্তারই ত আপনাকে শুয়ে থাকতে বলেছে। তবে সত্যিই আপনি যে একজন career woman সেটা আমি মনে রাখতে পারি না। মনে হয় ঘরে মায়ের কোলে ব'সে থাকলেই আপনাকে মানাত ভাল।"

ধীরা বলল, "আমার চেহারাটা তা হ'লে আমার সম্বন্ধে বড় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।"

নিরঞ্জন বলল, "না, তা একেবারেই দেয় না।"

এমন সময় চা এসে উপস্থিত হওয়াতে তাদের মন দিতে হ'ল সেইদিকে।

নিরঞ্জন বলল, "আপনার আমার সেদিন খুব শ্রদ্ধা হয়েছিল আমার উপরে তা বুঝতে পারছি খাওয়ানর ঘটা দেখে। তা হতে পারে অবশ্য, তার এত বড় উপকার আমি একটা করলাম।"

ধীরা বলল, "সে ত নিশ্চয়। আমি মরলে এমন একটি ভাল মানুষ মনিব তার আর জুটত কোথায়?"

"ভাল মানুষ ব'লেই কি আর? কোনো দিক্ দিয়েই

এ রকম মনিব সুলভ নয়। তার উপর অত ভালবাসে আপনাকে। আচ্ছা, আমাকে আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হচ্ছে। শহরের বাইরে একটা জায়গায় যেতে হবে। ফিরতেও যদি বেশী দেরি হয়, তা হ'লে ওবেলা আর আসা চলবে না। রাত্রে এসে আপনাকে disturb করা ত চলে না?"

ধীরা বলল, "রুগ্ন মানুষদের এ রকম ক'রে নিরাশ করতে নেই জানেন? তাতে অসুখ বেড়ে যায়। আমরা ডাক্তারী শাস্ত্রে পড়েছি যে অসুখ সারাতে হলে আগে মনটা সারান দরকার।"

"তা হ'লে ত অবশ্য আসতেই হয়। আচ্ছা, নিশ্চয়ই আসব, একটু হয়ত দেরি হবে। যাক, জগতে কারও যে একটুকুও কাজে লাগছি, এটা জানাও মস্ত লাভ।"

ধীরা বলল, "এদিকে আমাকে দোষ দেন যে আমি বড় বেশী ভদ্রতা করি, কিন্তু আসলে করেন আপনি।"

নিরঞ্জন বলল, "হ্যাঁঃ, আমি আবার ভদ্রতা করব; ও সব জানিই না আমি। এখন জোর ক'রে শিখতে হচ্ছে, পাছে কোথায় কি অনুচিত কথা বলে বিপদে পড়ি।"

ধীরা বলল, "আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দায়। তবে অনুচিত কথা বলার পাত্র আপনি নয়, সেটাও জানি।"

নিরঞ্জন বলল, "এখনি একটা কথা বলতে পারি, যেটা সম্ভবতঃ আপনি অনুচিত ভাববেন।"

ধীরার বুকটা দুর দুর ক'রে কেঁপে উঠল। জোর ক'রেও গলার স্বরটা অকম্পিত রাখতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, "কি কথা, শুনিই না?"

"যদি এখন থেকে ধীরা বলে ডাকি এবং 'আপনি'টাও বাদ দিই।"

ধীরা এক মিনিট প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে গলাটাকে স্থির করল, তার পর বলল, "অনুচিত কিছু হবে না। স্বচ্ছন্দে ডাকতে পারেন।"

"তুমি পারবে নাম ধরে ডাকতে, আর 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে?"

"আমি পারব না, অন্ততঃ এখনই ত নয়।"

"তার মানে আমি তোমাকে যতখানি বন্ধু মনে করি তুমি তা কর না।"

"কথাটা একেবারেই সত্য নয়। বন্ধু ত মানুষের নানা বয়সের হয় এবং নানা রকমের হয়। আপনি বয়সে অনেক বড় এবং যশোদার মতে আমাকে রক্ষা করবার জন্যে প্রভু আপনাকে পাঠিয়েছিলেন। এজন্যে শুধু যে ভারই আপনার প্রতি শ্রদ্ধা মনের ভাবটাও খানিকটা সমবয়সী বন্ধুর মত নাম ধ'রে ডাকতে করবে। খুব কি দরকার আছে তার?"

নিরঞ্জন বলল, "না সঙ্কোচ বোধ হলে ডাকতে বলছি না। তবে নামটা তোমার মুখে শুনতে পেলে খুসীই হতাম। যাক আরও কিছুদিন, তোমার শ্রদ্ধাটা কমুক একটু।"

"শ্রদ্ধা কমতে যাবে কি জন্যে?"

"আমার মত মানুষকে কতদিন আর তুমি শ্রদ্ধা করতে পারবে? নিতান্ত সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ। এই ধরনের মানুষ লোভীও হয় বড়, স্বার্থপরও হয় খুব। এ রকম লোকের ভিতর শ্রদ্ধা করবার বেশী কিছু থাকে না। তোমার কৃতজ্ঞতার ঝোঁকটা কেটে গেলে, আর এ ভাবটা থাকবে না।"

ধীরা বলল, "অহঙ্কার ভাল নয় দেখুন, কিন্তু অযথা বিনয়ও ভাল নয়। আমাকে যতই ছোট ভাবুন, আমি জন্মেছি অনেকদিন এবং মানুষও দেখেছি নানারকম। অবশ্য খুব অন্তরঙ্গভাবে কোনো মানুষের সঙ্গেই আমি মিশি নি। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, সাধারণ মানুষ যদি সত্যিই আপনার মত হ'ত, তা হ'লে পৃথিবীর এ দুর্গতি আজ হ'ত না।"

নিরঞ্জন বলল, "ভাগ্যে তোমার সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকেই আলাপ হয় নি। তা হ'লে স্বভাবে বিনয়ের লেশমাত্রও থাকত না, এবং এতদিনে নিজেকে একটা উঁচুদরের মহাপুরুষ ভেবে ব'সে থাকতাম। যাক, এমন একজন জহুরীর সঙ্গে যে মাঝপথেও দেখা হ'ল, সেও ত আমার সৌভাগ্য, এতে আমার স্বভাবের উন্নতি হোক বা নাই হোক।"

"আপনার বিনয় বেশী বেড়ে উঠবার মত, কারণ সেদিন সত্যিই কিছু হয় নি। বরং দুর্বলা নারীর রক্ষাকর্তা ব'লে অহঙ্কার একটু হ'তে পারে। বিনয়টা আমারই হওয়া উচিত। নিজের সম্বন্ধে নিজের কাছেই লজ্জিত হ'তে হ'ল অনেক কারণে এবং আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটাও খুব উঁচুদরের হ'ল না।"

"নিজের কাছে লজ্জা পাবার মত কি ঘটেছিল? Accident ত স্বয়ং হারকিউলিসেরও হতে পারত?"

"তা ত পারত। তবে তিনি নিশ্চয়ই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন না, এবং অকারণেই তাঁর জ্বর আসত না।"

"আচ্ছা, তাঁর কথা ছেড়েই দিচ্ছি, তুলনাটা ঠিক ন্যায়-

সঙ্গত নয়; কিন্তু মোটের উপর তুমি খুব ভালই ব্যবহার করেছিলে। চেঁচাও নি, কাঁদ নি, গায়ে-মুখে কাদা মাখ নি। যখন রাস্তা থেকে তুলে ধরলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন সিনেমার ছবি করা হচ্ছে, এতটাই ভাল দেখাচ্ছিল তোমাকে। অন্য রকম যদি দেখাত, তা হ'লে কি আর তখন থেকে তোমার পিছন পিছন ঘুরতাম? একটা Ambulance ডেকে দিয়ে পলায়ন করতাম তখনই।"

ধীরা হাসতে হাসতে বলল, "সব বানান কথা আপনার। কক্ষণও তা আপনি করতেন না।"

"কেন তা মনে হচ্ছে তোমার? আমাকে কতটুকুই বা চেন তুমি?"

"যতটুকুই চিনি। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত খুব চিনি না, অনেকদিন ধ'রে চিনি না, কিন্তু আপনি অমানুষের মত কিছু করছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

নিরঞ্জন বলল, "ধন্যবাদ। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না। এত মিষ্টি কথা শুনলাম নিজের সম্বন্ধে যে তার গর্ব্ব কোথায় রাখব ভেবে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি চলি এখন। ওবেলা ঠিকই আসব, দেরি যতই হোক। এখন তোমার ডাক্তার আসছেন দেখছি। ভদ্রলোক আমাকে ঠিক place করতে পারছেন না মনে হচ্ছে। একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই আমাকে দেখে থাকেন," এই বলে সে উঠে চ'লে গেল।

ধীরার দিনটা ভালই কাটল। জ্বর তার আর এল না, তবে মনটা ক্রমে যেন একটা আশঙ্কার ভাবে ভারি হয়ে উঠতে লাগল। পাগলামিটা তার চ'লে যাবার কোনোই লক্ষণ দেখাচ্ছে না। লক্ষণ সবই অন্য রকম। কি যে করবে সে ভেবেই পাচ্ছে না। এক যদি কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যায়, জীবনে আর মুখ না দেখে এই নূতন অতিথির। ভাবতেই তার বুকের রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। একি তার পক্ষে পারা কখনও সম্ভব? তার মনের মধ্যে কে একটা অচেনা মানুষ ব'সে তাকে নিরঞ্জনের দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে, সে চেষ্টা করেও মুখ ফেরাতে পারে না, মন ফেরাতে পারে না। শুধু কি দৈহিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ? নিরঞ্জন দেখতে সুন্দর বটেই, কিন্তু তার নিজের মনে ত রূপজ মোহ মাত্র আছে তা ধীরার একবারও মনে হয় না। অনেক সময় ত তার মনেই থাকে না নিরঞ্জন দেখতে সুন্দর, কি অসুন্দর। আর অন্য পক্ষে কি আছে জানবার জন্যে এই ব্যাকুলতাই বা কেন তার? নিরঞ্জন পুরুষ, নিজের মনের ভাব প্রকাশ ক'রে ফেলতে তার খুব বেশী সঙ্কোচ নেই। সে যে খুবই আকৃষ্ট হয়েছে তা ত স্বীকারই করে এক রকম। কিন্তু সে আকর্ষণই বা কি রকমের? তার দিকেও কি শুধু দৈহিক রূপের আকর্ষণ? ধীরা সুন্দরী বটে, তা সে জানে, তা নিয়ে মনে মনে অহঙ্কারও তার কম নেই, কিন্তু সেইটুকুই কি সত্য ধীরা? তার মধ্যে আর কিছুই কি নেই? যখন তার রূপ থাকবে না তখনও যদি নিরঞ্জন থাকে তার জীবনে, সে তখন ঐ আকাশের তারার মত চোখ দিয়ে ধীরার দিকে তাকাবে না?

ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। দেখে-শুনে রায় দিলেন যে আজ যতটা ভাল সে আছে, ততটাই যদি থেকে যায়, তা হ'লে X-ray করার আর দরকার হবে না। তবে বিশ্রামটা কালও নেওয়া ভাল। হঠাৎ কথা বদ্‌লে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে আপনার আত্মীয় কেউ আছেন না কি?"

ধীরা বলল, "না, কেউই নেই।"

ডাক্তার বললেন, "ও, একজন ভদ্রলোককে দেখলাম দু' তিনবার, তাই মনে হ'ল ভাই বা cousin হবেন।"

ধীরা বলল, "না, উনি আমার একজন বন্ধু।"

ডাক্তার চ'লে যাবার পর যশোদা এসে খবর দিল, "দিদিমণি, তুমি ত লিখবে লিখবে ক'রে লিখলেই না, আমিই আজ মাকে লিখে দিলাম চিঠি।"

ধীরা বলল, "তা ভাল, খুব ভয় দেখিয়ে লিখেছিস ত? পরশুই মা এসে হাজির হবেন।"

যশোদা বলল, "না গো না। আসবে নি কেউ, ভাল আছ ব'লেই লিখেছি।"

নাওয়া-খাওয়া, বই পড়া, যশোদার সঙ্গে গল্প করা, এই ক'রে ক'রে দিনটা এগিয়ে চলল সন্ধ্যার দিকে। আজ সন্ধ্যাটা বড়ই রিক্ত লাগতে লাগল ধীরার কাছে। কেউ এখন আসবে না। কারও গলার স্বর সে শুনতে পাবে না। এ রকম ব্যর্থ দিন আসে কেন মানুষের জীবনে? ভুলে গেল জীবনের সব দিনই তার এই রকম ব্যর্থ আর রিক্ত গিয়েছে তিনটে দিন আগে পর্য্যন্ত। নিরঞ্জন যে জগতে আছে তা ত ধীরা জানত না।

ঘরে ঘরে যখন আলো জ্বলে উঠল, তখন ধীরার মনটা একটা হতাশায় ভ'রে উঠতে লাগল। এলই না ত হ'লে আজ? কিন্তু সেটা কি এত বড় ক্ষতি যে চব্বিশ বছর

বয়সের একজন মহিলার চোখে জল এনে দিতে পারে? নিরঞ্জন ঠিকই ধরেছে তার স্বভাব, এক এক ক্ষেত্রে সে এখনও খুকীই থেকে গেছে। কিন্তু এত বৎসর সে বিদেশে কাটিয়েছে অনাত্মীয় লোকের মধ্যে, কোনোদিন তার এমন একলা লাগে নি। তার বিগত জীবনে, সব পরিচিত মানুষ থেকে দূরে থেকেও তার মধ্যে এ শূন্যতা আসে নি। তার ভিতরের যে নারী এতদিন মোহ নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোন সোনার কাঠির স্পর্শে এমন করে তার ঘুম ভাঙছে?

হঠাৎ দরজার কাছে সে পদশব্দ শুনতে পেল। বাইরের থেকে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, "ভিতরে আসব? জেগে আছ, না ঘুমিয়ে গেছ?"

ধীরা খাটের উপর উঠে বসল, বলল, "আসুন, আসুন। খুব দেরি করলেন যাহোক। কতক্ষণ ফিরেছেন? এত ফুল আবার কোথা থেকে জোটালেন?"

নিরঞ্জন ঘরে ঢুকে একরাশ ফুল তার ড্রেসিং টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। বলল, "ফুলগুলো দেখতে ভারি সুন্দর, তবে গন্ধ নেই। যেখানে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই আনলাম। তুমি অবশ্য মস্ত বড় ব্যাপারের মধ্যে থাক, কিন্তু আর কিই বা তোমার জন্যে আনা যেত উপহার স্বরূপ?"

ধীরা বলল, "উপহার কিসের জন্যে আবার?"

নিরঞ্জন বলল, "লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে ছিলে, জ্বর কর নি।"

"কি ক'রে জানলেন যে জ্বর হয় নি?"

নিরঞ্জন বলল, "তোমরা নাড়ি দেখে যা বোঝ, আমরা অনেক সময় মুখ দেখেই তা বুঝতে পারি।"

ধীরা বলল, "তা হবে, তবে জ্বর সত্যিই হয় নি। আপনি চা টা খেয়ে এসেছেন না কি? না যশোদাকে বলব চা আনতে?"

নিরঞ্জন বলল, "না, এখন আর চায়ে দরকার নেই। বাড়ী ফিরে স্নান ক'রে চা খেয়েই বেরিয়েছি। তোমার ডাক্তার আজ তোমায় দেখে কি বললেন?"

"ভালই আছি বলছেন ত। X-ray করতে হবে না সম্ভবতঃ। তবে যশোদা কি জানি কি মাকে লিখে ব'সে আছে আজ, তাঁরা যদি এসে হৈ চৈ বাধান তা হ'লে হয়ত আবার হাঙ্গামা বাধবে।"

নিরঞ্জন বলল, "তাঁদের একেবারে না জানান ত উচিত হ'ত না। তাঁদের মেয়ে ত, তাঁরা যতদিন বাঁচবেন তোমার সব ভার নিয়ে রাখতেই চাইবেন।"

ধীরা বলল, "মনুসংহিতার মত কি আজও চলে? স্ত্রীলোক চিরকালই কারও-না-কারও অধীনে থাকবে? আপনারও মনে হচ্ছে এই মত?"

নিরঞ্জন বলল, "প্রত্যেক মানুষ সম্বন্ধে এক আইন ত খাটে না? অনেক মেয়ের দরকার হয় না অভিভাবকের, আবার অনেক মেয়ের হয়ও। তুমি মনে হয় যেন শেষের পর্য্যায়ে পড়।"

ধীরা বলল, "এই কথাটা শুনলে কিন্তু আমার ভারি খারাপ লাগে। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি যখন আঁকতাম, তার মধ্যে চিরজীবনের অভিভাবক আঁকতে কখনও ত ইচ্ছে করে নি। স্বাধীন ভাবেই থাকতে চেয়েছিলাম।"

"সেই জন্যই বুঝি ডাক্তার হয়ে বসলে? মা-বাবা বারণ করেন নি?"

ধীরা বলল, "না, তা যে খুব করেছেন তা নয়। তবে অন্য রকম জীবন বেছে নিলেও তাঁরা অসুখী হতেন না।"

নিরঞ্জন বলল, "চিরজীবন একজন অভিভাবক থাকবে এটা ত পছন্দ কর নি বুঝলাম, কিন্তু অভিভাবক নয় অথচ বন্ধু, এমন কাউকেই কি ছবির মধ্যে রাখ নি বা রাখতে চাও নি?"

এ কথার কি উত্তর দেওয়া যায়? বেশী বলা হয়ে যেতে পারে, অথবা এতটা কম বলা হবে, যার কোন মানেই দাঁড়াবে না।

একটু পরে বলল, "আদর্শ ত ছিল তার জন্যে, কিন্তু সেটা এতদিন পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নি।"

"এখন পূর্ণ হতে পারে কি?"

ধীরাকে আবার ভাবতে হ'ল। তারপর বলল, "হবেই ত মনে হচ্ছে। তবে বন্ধুর গলার স্বরেও অভিভাবকের ভাবটা মাঝে মাঝে এসে যাচ্ছে।"

নিরঞ্জন হাসতে হাসতে বলল, "তাই তোমার মনে হয় ধীরা? তা কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তোমার চেহারাটাই এমন যে দেখলেই মনে হয় একে সংসারের সব কিছু মন্দ জিনিষের থেকে আড়াল ক'রে রাখা দরকার। বন্ধু যে, তার এ ইচ্ছা হবেই।"

ধীরা বলল, "তা হোক, আপত্তি নেই। সব জিনিষেরই দাম দিতে হয় ত? বন্ধু যদি পেতে হয়, তা হ'লে অভিভাবককেও না হয় কিছু পরিমাণে স্বীকার ক'রে নেওয়া যাবে।"

নিরঞ্জন বলল, "ভারি হিসাবী মানুষ তুমি। একেবারে ওজন ক'রে সব কিছুর দাম দেবে? যা দিচ্ছি

তার চেয়ে বেশী পাছে পেয়ে যাই, এ ভয়ও আছে দেখছি।"

সে কথাটা বলল ঠাট্টা ক'রে, কিন্তু সেটা তীরের মত গিয়ে লাগল ধীরার বুকে। হায়রে, এ বিষয়ে আর এখনও কি সন্দেহ আছে ধীরার মনে? নিরঞ্জন কি দিচ্ছে, বা কি দিতে চাইছে তা ধীরা জানে না, কিন্তু প্রতিদানে সে ত সবই পেয়ে বসে আছে ধীরার কাছ থেকে?

কথার জবাব না পেয়ে নিরঞ্জন ভাল করে ধীরার দিকে তাকিয়ে দেখল। মুখের অম্লান প্রফুল্লতার উপরে যেন মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। বলল, "হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? অন্যায় কথা বললাম না কি কিছু? সাধে বলি যে ভদ্রতা জানি না আমি?"

ধীরা বলল, "না, না, অন্যায় কিছুই বলেন নি। আর একটা কথার নানারকম মানেও ত হয়? যে যেমন মানুষ সে তেমন মানে করে। আমার আজকাল একটা marbidity পর্ব্ব চলেছে, কিছুদিন থেকেই সোজা জিনিষকেও উল্টো ভাবতে আরম্ভ করেছি।"

"এটা আবার কবে হ'ল? Accident-এর দিন থেকে ত নয়?"

ধীরা বলল, "না, সেটার সঙ্গে বিশেষ কিছু সম্পর্ক নেই এটার। পরীক্ষা পাস ক'রেই নানারকম দুর্ভাবনা এসে জুটেছে আমার মাথায়।"

নিরঞ্জন বলল, "আজ আর রাত করব না, তোমার বিশ্রামের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কাল যেমন আসি, তা আসব, তবে তুমি ত আর বেশীদিন রোগিণী হয়ে থাকতে চাইছ না। এরপর একটা নূতন routine করতে হবে।"

ধীরা বলল, "সেটা আমিই করব না-হয়। আপনার করবার দরকার নেই কিছু।"

নিরঞ্জন চলে গেল। ধীরার বুকের অস্থিরতাটা ক্রমেই যেন বাড়তে লাগল। কি করবে সে এখন? কোথায় যাবে? যে দুর্নিবার স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চলেছে তাকে ঠেকাবে কি ক'রে? প্রথম থেকেই এটা তার সাধ্যের অতীত হয়ে গেল কেমন ক'রে? প্রেম জিনিসটা এমনই কি সব সময়? তার আরম্ভ প্রয়োজন হয় না, ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না? হঠাৎ দুর্দ্দমনীয় বন্যার প্লাবনের মত এসে প'ড়ে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়? ধীরার ত আর কূল পাবার কোন আশা নেই। এই মধুর সর্ব্বনাশের ভিতর একেবারে তলিয়ে যাবার জন্যেই যেন তার সমস্ত প্রাণ হাহাকার করছে। ভগবান্ কি তাকে বাঁচাতে পারেন? কিন্তু বাঁচতে চাইছে কে? প্রেমের দূত যদি আজ মৃত্যুর দূতের রূপ ধরেই আসে, তাকেই সে ব্যগ্র দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করতে চায়।

নার্স এসে বলল, "আপনাকে আবার যেন একটু অসুস্থ দেখাচ্ছে। দিনের বেলা কোন strain করেছিলেন না কি?"

ধীরা বলল, "কৈ, সেরকম ত কিছু মনে হচ্ছে না। আজও বেশ ভারি ডোজ এই ঘুমের ওষুধ দাও, একেবারে এক ঘুমে যাতে রাতটা পার হয়ে যায়।"

খাওয়া-দাওয়া নামমাত্র ক'রে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। ঘুমটা কিছুতেই আসতে চায় না। ধীরা নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে বড় ভয় পাচ্ছে। মুখ সে লুকিয়ে থাকতে চায়। কার মুখের দিকে তাকাবে সে? এ কি শুভদৃষ্টিতে দেখা প্রিয়তমের মুখ, না ধ্বংসের দেবতার রুদ্রমূর্ত্তি? বুঝতে ত আজ আর ভুল নেই। কীটদষ্ট কুসুমের মালা, এ দিয়ে কি তাকে বরণ করা যায়, যে নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়? কিন্তু ফিরবার আর ত পথ নেই?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারে নি। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও চলল তার মরণ অভিসার। সকালে উঠেই শুনল নার্স বলছে যশোদাকে, "রাত্রে ঘুমের ঘোরে মিস রায় বড় কাঁদছিলেন। এ রকম হলে ত সারতে দেরি লাগবে। ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে গেলে এঁর ভাল। মা বাবার কাছে থাকবেন।"

যশোদা বলল, "চিঠি ত লিখেছি, এখন তারা যা স্থির করে।" বলতে বলতে নিরঞ্জন এসে বসবার ঘরে ঢুকল, যশোদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার দিদিমণি কেমন আছেন?"

সে কিছু বলবার আগেই নার্স ইংরাজিতে বলল, "রাত্রে ভাল ঘুমোন নি। ক্রমাগত-এপাশ্ ওপাশ করেছেন আর যন্ত্রণাকাতর শব্দ করেছেন। আমি ডাক্তারকে জানাব।" ব'লে চলে গেল।

অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শোবার ঘরে ঢুকে নিরঞ্জন বলল, "আবার কি হ'ল ধীরা? কাল ত মনে হ'ল ভালই আছ? কষ্টের কোন কারণ হয়েছে কি?"

ধীরা শুষ্ক মুখে বসে ছিল। আজ সকালে আর যত্ন ক'রে সাজতেও তার ইচ্ছা করে নি। একবার নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "কষ্টের

কারণ আর হবে কোন্ সময়? আপনি যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই ত ওষুধ খেয়ে শুয়েছি।"

"তা হ'লে চোখ-মুখের চেহারা এমন হ'ল কেন? নার্সের কাছে শুনলাম রাত্রে খালি ছটফট করেছ, কান্নাকাটি করেছ। এগুলো জানতে ত আমার ইচ্ছে করে ধীরা? বন্ধুর কি এইটুকুও দাবি নেই?"

ধীরার চোখ আবার সজল হয়ে উঠল। বলল, "বলতে ত এক সময় হবেই। কিন্তু আজ পারছি না কিছুতেই।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, "আমার কোন কথার বা কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছ?"

ধীরা বলল, "না, না।"

"আচ্ছা, তবে যতদিন না বল, ততদিন ত আমার করবার কিছু দেখছি না। অবিশ্যি জানলেই যে কিছু করতে পারব তারই বা স্থিরতা কি? বন্ধুর অধিকার ত খুব বেশী দূর যায় না? যতটুকু তুমি করতে দেবে তার বেশী কিছু করতে পারব না।"

ধীরা বলল, "হয়ত চাইবেনও না।"

"তাই তোমার মনে হয় ধীরা? ধারণাটা ঠিক নয়।"

ধীরা জোর করে হাসল, বলল, "যাক গে, এখন ওসব কথা থাক। একটা সাধারণ কোন কথা বলুন না? যা নিয়ে খানিকটা হাসাহাসি করা যায়?"

"হাসির কথা যে আছে কিছু জগতে, তাই প্রায় আজ ভুলিয়ে দিয়েছ তুমি। আমি আশা করে আসছিলাম, যে আজ তোমাকে আরও ভাল দেখব।"

ধীরা বলল, "আজ বিকেল থেকে তাই দেখবেন।"

"খুব ভাল কথা, কিন্তু সেটা যেন খাঁটি জিনিস হয়, অভিনয় নয়। অবশ্য অভিনয় তুমি ভাল করতে পার না। তোমার চোখই তোমায় ধরিয়ে দেয়।"

ধীরা বলল, "তা হ'লে চোখ বজে থাকব।"

নিরঞ্জন বলল, "আমি তা হ'লে আসব কি করতে শুনি? পাথরের মূর্ত্তি দেখতে?

(১২)

সেদিন বিকেলের দিকেই মস্ত এক টেলিগ্রাম এল ধীরার মায়ের কাছ থেকে। সে কেমন আছে তা যেন অবিলম্বে টেলিগ্রাম ক'রে তাঁদের জানান হয়। ডাক্তার কি বলছেন? ধীরার মায়ের যাওয়া দরকার হলে তিনি এখনি যাবেন। সম্প্রতি ধীরা আর প্রিয়নাথ তাদের বাড়ীর একপাল তীর্থযাত্রী নিয়ে এলাহাবাদ যাত্রা করেছে। তারা উঠবে ধর্মশালাতে, ধীরাকে কোনদিকে বিব্রত করবে না। তবে খবর নেবে, দেখা করবে।

ধীরা কিছুই খুসী হ'ল না। তার ত জগতের আর একটা মানুষেরও মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না? শুধু তার মা যদি একবার আসতেন, তাঁর কোলে শুয়ে খানিকটা কাঁদতে পারত। নীরা এসে অনর্থক খানিক বিরক্ত করবে। আর প্রিয়নাথ? সেও মানুষকে খুসি করে না কিছু। সবচেয়ে বেশী বিরক্তির কারণ হবে যদি সারাদিন বসে থাকতে চায় এবং নিরঞ্জনের সঙ্গে যে সময়টা সে কথা বলে সে সময়টাও দখল করে রাখে। তা হ'লে আবার অসুখ বাড়ার ভান ক'রে তাদের বিদায় করতে হবে।

নিরঞ্জন বিকালে আসতেই বলল, "কাল আবার অনেকগুলি উৎপাত করবার লোক আসছে। এই ত আমার অবস্থা, তার মধ্যে এঁদের শুভাগমনে কিছু খুসী হচ্ছি না।"

নিরঞ্জন বলল, "কে তাঁরা?"

"প্রধানতঃ আমার ছোট বোন এবং তার স্বামী তাদের সঙ্গে একপাল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও আসছেন, তবে তাঁরা আমার বাড়ী অবধি এগোবেন না, কারণ তাঁদের মতে আমি খ্রীষ্টান হয়ে গেছি।"

"বোনকে এবং ভগ্নীপতিকেও বিশেষ পছন্দ কর না মনে হচ্ছে। এটা কিন্তু একটু অস্বাভাবিক।"

ধীরা বলল, "আমি মানুষটাই একটু অস্বাভাবিক আছি। ছোট থেকেই এক মা ছাড়া কাউকেই ভাল বাসতাম না, একলা একলা থাকতেই ভাল লাগত। বিশেষ করে নীরার সঙ্গে আমার স্বভাবগত তফাৎ বড় বেশী। নিজের কাঁদুনি গাইতে ও বড় বেশী ভালবাসে আমি প্রাণ গেলেও সেটা পারি না। আর ভগ্নীপতি বড় বেশী খোলা প্রাণের লোক, অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই চেপে রাখা পছন্দ করেন না। বাইরের মানুষের যেমন privacy দরকার, ভিতরের মানুষটারও যে সেই দরকার থাকতে পারে, এটা তিনি ভাবতেই পারেন না।"

নিরঞ্জন বলল, "ক'দিন থাকবেন তাঁরা? একেই ত তুমি ভয়ানক নির্জীব হয়ে আছ, এঁরা এসে আবার তোমায় বেশী অসুস্থ না ক'রে তোলেন। আমি আবার ভাবছিলাম দিনকয়েক বাড়ীর লোকদের সঙ্গ পেলে তোমার মনটা হয়ত খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠতে পারে।"

ধীরা বলল, "সব মানুষের সঙ্গই কি আর ভাল লাগে?"

"তা ত লাগেই না। তবে মানুষ ত নিজের ওজন বোঝে না? ভাবে সবাই পছন্দ করছে তার কাছে আসাটা, ব'সে থাকাটা।"

ধীরা বলল, "ওটা কি নিজেকে উপলক্ষ্য ক'রে বলা হচ্ছে?"

নিরঞ্জন বলল, "একেবারেই যে তা নয়, তাই বা বলি কি ক'রে?"

ধীরা বলল, "আপনি যে তরুণী মহিলাদের মত আরম্ভ করলেন। যা খুব ভাল ক'রে জানেন, সেটাও আবার শোনা দরকার?"

নিরঞ্জন বলল, "শুনতে ভাল যে লাগে সেটা খুবই ঠিক। তবে সবটা এই জন্যেই শুনতে চাইছি না। দেখ, রোগশয্যার পাশে ডাক্তার, নার্স, বন্ধু-বান্ধব অনেককে ভাল লাগে। তবে সেরে গেলেও তারা যদি সারাক্ষণ ঘর জুড়ে ব'সে থাকে তা হ'লে ত ভাল নাও লাগতে পারে? আমি ত এখন নাওয়া-খাওয়া, ঘুমনো ও খানিকটা কাজ করা ছাড়া যেটুকু সময় পাই, তা এখানেই কাটাই, কিন্তু চিরদিন সেটা কি করা যায়? তোমারই ভাল লাগবে না প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ জিনিষটাকে সংসারের লোক ঠিক দৃষ্টিতে দেখবে না।"

ধীরা বলল, "তা হ'লে কি করবেন? আর আসবেন না?"

"তুমি যা করতে বলবে, তাই করব। তুমি চাও ত রোজই আসব। লোকে মন্তব্য করতে পারে, এখনই করছে হয়ত, কিন্তু তাতে আমার নিজের আসে-যায় না কিছু। ওরকম কত কথাই ত বিগত দশ বছরে শুনলাম। কিন্তু মেয়েরা এসব বিষয়ে বেশী sensitive। তোমার হয়ত এসব শুনতে ভাল লাগবে না।"

ধীরা বলল, "তা ত লাগবে না। কিন্তু আপনার না আসাটাও যে বিন্দুমাত্র ভাল লাগবে না।"

নিরঞ্জন বলল, "তা হ'লে রোজই আসব। তবে তুমি আবার কাজ আরম্ভ করলে দু'বেলা আসা আর চলবে না। তা ছাড়া আবার যদি বাইরেও ডাক্তারী ক'রে বেড়াও, তা হ'লে তোমার অবসর সময় বেশী থাকবে না।"

"প্রথমেই আর কত প্র্যাক্‌টিস্ হবে আমার? একেবারে নূতন ত? আর গাড়ি না কেনা অবধি বাইরে যাবই না ভাবছি। ট্যাক্সি চড়ার ইচ্ছা আর নেই।"

নিরঞ্জন বলল, "সেটা খুব ভাল কথা। Accident ঐ একটাই থাক তোমার জীবনে। কিন্তু তোমার আত্মীয়রা আসছেন কখন কাল? সে সময়টা এখানে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছা করি না।"

"বিকেলের আগে কি আর আসবে?"

"আচ্ছা, সকালে এসে ঘুরে যাব এখন। বিকেলেও আসতে পারি, তবে অন্য লোক থাকলে আর বসব না। কিন্তু তুমি সত্যি এবেলা ভাল আছ ত?"

ধীরা বলল, "কেন, ভাল দেখাচ্ছে না? আপনি না বললেন আমি অভিনয় করতে পারি না?"

"দেখাচ্ছে ত ভালই। আশা করি ভালই আছ। কাল যদি ভাল থাক, ত পরশু থেকে একটু বাইরে বেড়াতে পার। ঘরের মধ্যে সব সময় ভাল লাগে না। যমুনার ধারটা এখানে বেড়াবার পক্ষে বেশ ভাল।"

"দেখি, আগে আমার আত্মীয়রা বিদায় হন।"

"বেচারী আত্মীয়রা? তারা ভাবছে না জানি কত খুসিই তারা করে দেবে তোমাকে।"

ধীরা বলল, "তা আর এখন কি করা যাবে? আমি ছোট থেকেই এই রকম। বিশেষ একটা সম্পর্কের খাতিরে কাউকে ভাল বাসতে পারি না। মা ছাড়া নিজের আত্মীয়দের মধ্যেও বিশেষ কাউকে ভালবাসতে পারি নি।"

"মুস্কিলের ব্যাপার। সম্পর্কের দাবি একটা আছেই। সেটা স্বীকার না করলে বড় অপ্রিয় হতে হয় লোকের কাছে। এই জন্যেই তুমি এত একলা থাকার পক্ষপাতী।"

ধীরা বলল, "একলা থাকতে ত চাই না। তবে অবাঞ্ছিত লোক সারাক্ষণ ঘিরে থাকে এটাও চাই না।"

"কিন্তু সে হতভাগা লোকগুলো বুঝবে কি করে?"

ধীরা বলল, "মুখের কথায় না ব'লে দিলে মানুষ কি কিছুই বোঝে না?"

নিরঞ্জন বলল, "তা ত বোঝেই। নইলে সংসারে চলাফেরা করাই দায় হ'ত। ধর, আমিই কি আর দু'বেলা এসে তোমাকে জ্বালাতে পারতাম, যদি না আমার সন্দেহ থাকত যে তুমি আমার আসাটা পছন্দই কর।"

"ওটা সন্দেহ বুঝি এখনও?"

"ঠিক বুঝতে পারি না এখনও। তুমি এত শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতার কথা তোল যে আমি অনেক সময় বুঝতে পারি না, আসল মনের ভাবটা তোমার কি।

যদি সেদিন তোমাকে একটু সাহায্য করতে না পারতাম, যদি সাধারণ ভাবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ত, তা হ'লে তুমি কি আমাকে এতটা প্রশ্রয় দিতে?"

ধীরা উত্তর দেবার আগে একটু ভেবে নিল। তারপর বলল, "বোধ হয় প্রশ্রয়ই দিতাম।"

নিরঞ্জন বলল, "তুমি দেখি সত্য কথা বলতে ভয় পাও না।"

"আপনি বুঝি খুব ভয় পান?"

নিরঞ্জন বলল, "খুব ভয় পাই না। তবে মিথ্যে কথা কখনও বলি নি এমন নয়। তবে তোমার কাছে বলি নি এখনও।"

ধীরা বলল, "এর পরেও আর বলবেন না যেন।"

নিরঞ্জন বলল, "সব সত্য-কথা যদি সহ্য না হয়?"

"তবু মিথ্যার চেয়ে ভাল হবে।"

নিরঞ্জন হাতের ঘড়িটা দেখে বলল, "এবার আমি উঠি, আমার সময় পার হয়ে এল। আচ্ছা দেখ, দু'তিন দিন আমার একটু শহর ছেড়ে বাইরে যাবার কথা আছে। সেটা এই বেলা সেরে ফেলি না? তুমিও ত বোন-ভগ্নীপতিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, সময় কাটান শক্ত হবে না।"

ধীরা বলল, "ভীষণ শক্ত হবে, একে ত তারা জ্বালাবে, তার উপর আপনিও আসবেন না।"

নিরঞ্জন বলল, "দেখ ধীরা, সাধে আমি বলি যে তুমি এখনও খুকী আছ। পুরুষ মানুষকে অত বেশী প্রশ্রয় দিতে নেই, তারা সেটার অপব্যবহার কখনও করে না এমন নয়।"

ধীরা মুখটা ঘুরিয়ে নিল। সত্যিই ত প্রশ্রয় সে দিচ্ছেই। কিন্তু না দিয়ে তার উপায় নেই যে? এসব কথাগুলো কেন বেরোয় তার মুখের থেকে? এ কি ধীরা বলে, না কোন কুহকিনী বলে? যার শেষে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন সম্ভাবনাই নেই, সেই পথে পাগলের মত কেন ছুটছে সে? কথা বলছে না দেখে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, "রাগ করলে না কি?"

ধীরা বলল, "না, রাগ করি নি। তবে আপনি এসব কথা কেন বলেন?"

"তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দিতে চাই। যে পথেই যাও চোখ খুলেই এগিয়ো।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা, তাই করব।" হঠাৎ তার চোখ দুটো জলে ভরে এল।

নিরঞ্জন দেখতে পেল। বলল, "আমার সব কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি ধীরা। তুমি এতটা দুঃখ পাবে বুঝতে পারি নি। বন্ধুকে ক্ষমা ক'র। বেশী দিন যদি এই বন্ধুত্ব থাকে, তা হলে এরকম মূর্খের মত কথা অনেক শুনতে হবে। পরিচয় হয়েছে ত মাত্র তিনচার দিন, এরই মধ্যে চোখের জল ফেললাম।"

ধীরা বলল, "আপনি ত বলেইছিলেন একদিন যে, চব্বিশ ঘণ্টাটা অনেক সময় চব্বিশ মাস মনে হয়, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। নইলে বহু বৎসর হয়ে গেল, কারও কথায় ত আমার চোখের জল পড়ে নি। আর-জন্মের চেনা ছিল হয়ত আপনার সঙ্গে।"

"ভাবতে ত তাই ইচ্ছা করে। কিন্তু আর জন্ম ছিল কি না সেটা এখনও ভাল ক'রে বুঝতে পারি না। যাক্, উঠি এখন। তোমার তা হ'লে ইচ্ছা নয় যে এখন বাইরে যাই?"

"আমার ইচ্ছাতেই ত সব হবে না? আপনার চাকরির জন্ম যা দরকার তা ত আপনাকে করতেই হবে।"

"তা ত হবেই। দেখি ভেবে, কি ব্যবস্থা করা যায়। আচ্ছা চলি।' ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

ধীরা সেইখানে বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। এবং যতক্ষণ না যশোদার আসার শব্দ পেল, ততক্ষণ একইভাবে প'ড়ে রইল।

কি করবে সে? নিরঞ্জনকে কি বলবে? সে যে ক্রমেই বড় বেশী কাছে এসে পড়ছে ধীরার। আরও আসবে তার ত আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দয়া করে সে ধীরাকে খানিকটা রেহাই দিয়েছে। আজ যদি সজোরে সব বাধা ঠেলে দিয়ে ধীরার দিকে সে দু'হাত বাড়িয়ে আসে, ধীরা কি পারবে তাকে ফেরাতে? তার সে সাধ্য নেই।

এরই মধ্যে খাওয়া, ওষুধ খাওয়া, চুল বাঁধা প্রভৃতি চলতে লাগল। আজও নার্স এল। ধীরার ক্লান্ত মস্তিষ্ক আজ সকাল সকাল ছুটি নিল। ওষুধ খাওয়ার আধঘণ্টাখানিক পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে উঠতে-না-উঠতে নিরঞ্জন এসে হাজির হ'ল। বলল, "আমাকে দেখে অবাক হবে, এত সকালে। কিন্তু যাতে একটানা বাইরে থাকার দরকার না হয়, তাই ক'দিন সকালের দিকে বেশী সময় দেব কাজে। তা হ'লেই চলবে। খুসী হলে কি না বল।"

ধীরা বলল "হয়েছি খুসি।"

"আচ্ছা, যাই তাহলে। বিকেলে এসে দেখা করব,

যদি না তোমার বাড়ীর লোকে তোমাকে ঘিরে ব'সে থাকে।"

"তা না হয় থাকলই, তাই বলে আপনি কি একটুও বসতেও পারবেন না? তারা ত আপনাকে খেয়ে ফেলবে না?"

নিরঞ্জন বলল, "আমাকে খেয়ে ফেলা অত সহজ নয়। তবে একটু অবাক্ হয়ে নিশ্চয়ই। হঠাৎ কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসলে লোকে ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। সুতরাং তাদের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভাল। তবে হয়ে যদি যায়ই, তবে অবশ্য পালিয়ে যাব না। কালকের রাগটা আর নেই ত?"

ধীরা বলল, "কাল বুঝি আমার রাগ হয়েছিল?"

"কি যে হয়েছিল তা ত বুঝতে পারা শক্ত। তোমার যাই হয়ে থাক, আমার নিজের উপর খুব রাগ হয়েছিল। সারারাত ঘুমোতেই পারলাম না।"

"এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি। এমন কি হয়েছিল? আপনি ত বলেনই যে এখনও অনেক দিকে আমি খুকী আছি, এটা তারই একটা নিদর্শন ভাবুন না?"

"তা ভাবতাম, যদি না তুমি বলতে যে বহু বৎসর কারোর কথায় তুমি কাঁদ নি।"

ধীরা চুপ ক'রে রইল। একথার কি উত্তর সে দেবে? জন্মাবধি এমন কার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, যে তাকে কাঁদাতে পারত? সব হাসি, সব কান্না, সহস্র-দল পদ্মের মত ফুটে ওঠা আর দিনান্তে একেবারে নিঃশেষ হয়ে ঝরে যাওয়া সবই ত পথ চেয়ে ছিল এরই আগমনের।

নিরঞ্জন বলল, "কথাটার উত্তর নেই কিছু?"

ধীরা বলল, "উত্তর আছে, তবে এখনই বলতে পারব না।"

নিরঞ্জন বলল, "পরে বলবার কথা ত এক এক ক'রে অনেক জমল।"

"তা জমল বটে, কিন্তু বলবার দিন কি আর আসবে না?"

নিরঞ্জন বলল, "আসবে ব'লেই ত আশা করি। একটা মানুষের চিরজীবনের অনুপাতে চারটে দিন অল্পই সময়। তার মধ্যেই অনেক কথা বলা হয়ে গেছে যা চার মাসেও হয় না। এ দিক্ দিয়ে আমরা একটু অভুত-পূর্ব্ব। আচ্ছা, চলি।"

দিনটা এগোতে লাগল। নীরা আর প্রিয়নাথ কখন এসে হাজির হবে কে জানে? কিই বা বলবে? সেই তাদের চিরন্তন প্যানপ্যানানি। আগেই এসব সহ্য হ'ত না তার, এখন এই দারুণ যন্ত্রণাকাতর মন নিয়ে আরও সহ্য হয় না। সে ত মৃত্যুদণ্ডের আসামী বললেই হয়, জগৎ-সংসার এখনও এসব তুচ্ছ কর্ত্তব্যপালন আশা করে কেন তার কাছে?

ধীরার সৌভাগ্যক্রমে নীরারা আসার কিছু আগেই নিরঞ্জন এসে উপস্থিত হ'ল। বলল, "যাক, তাঁরা এখনও আসেন নি তা হ'লে?"

"আসেন নি, তবে কখন আবির্ভূত হবেন বলা যায় না।"

"আচ্ছা আসুন, তখন গোটা দুই নমস্কার ক'রে প্রস্থান করলেই হবে। আচ্ছা, ধীরা, গোড়া থেকেই তোমাকে কেন কোনদিন নমস্কার করতে পারি নি বল ত?"

ধীরা বলল, "খুব বেশী খুকী মনে করতেন ব'লে বোধ হয়।"

"তা হ'তে পারে। মনে হ'ত এ ত আশীর্ব্বাদের পাত্রী, একে আর নমস্কার ক'রে কি হবে?"

ধীরা বলল, "তা আশীর্ব্বাদই বা করেন নি কেন? ঐ জিনিষটারই সবচেয়ে বেশী দরকার বোধ হয় আমার জীবনে।"

নিরঞ্জন হঠাৎ তার মাথায় একটা হাত রেখে বলল, "আচ্ছা, দরকার থাকে ত আশীর্ব্বাদই করছি। তবে কথাগুলো আর মুখে বললাম না।"

ধীরা বলল, "নাই বলুন। আমি ধরে নিচ্ছি, যে আশীর্ব্বাদ আমি চাই, তাইই করছেন।"

"হয়ত তাই, কে জানে? তুমি নিজের জন্যে কি চাও, আর আমি কি চাই তোমার জন্যে, তা এক জিনিষ কি না কি ক'রে বলব?"

ধীরা বলল, "থাক, বলতে হবে না।"

"এই না সব সত্যি কথা শুনতে চেয়েছিলে? সব সত্য কথা শুনবার সাহস তা হ'লে নেই?"

ধীরা চুপ ক'রে রইল। নিরঞ্জন হাতটা সরিয়ে নিল।

যশোদা এই সময় এসে হাজির হ'ল। অত সব অতিথি-অভ্যাগত আসবে, তাদের জন্যে কি করা দরকার? চা-টাও খেতে দিতে হবে?

ধীরা বলল, "ও সব আর আমাকে ব'লে লাভ কি? যা দরকার হয়, তুমিই কর।"

নিরঞ্জন বলল, "তোমার আয়া কিন্তু এদিকে তোমার চেয়ে মানব-বৎসল আছে। লোক এলে তার রাগ হয় না।"

"লোকেরা তাকে জ্বালারও কম। কেউ যদি নিজেদের জীবনের সব সমস্যা এনে আপনার ঘাড়ে ফেলত সমাধানের জন্য, তা হ'লে আপনারও মানব-বৎসলতা কমে যেত।"

"কে ফেলত তার উপর নির্ভর ক'রে।"

ধীরা বলল, "এই ধরুন বন্ধু-বান্ধব।"

"তেমন গভীর বন্ধুত্ব ত আগে কারও সঙ্গে ছিল না। এখন যদি বা হ'ল একজনের সঙ্গে তা তিনি ত কোন কথা বলতেই চান না।"

ধীরা বলল, "আপনিই কি আর সব সত্যি কথা সহ্য করতে পারবেন?"

"পারব বোধ হয়। বলেই দেখ।"

এমন সময় ধীরার অবাঞ্ছিত অতিথির দল হুড়মুড় ক'রে এসে হাজির হ'ল। নীরা, প্রিয়নাথ, ঝুনু। নিরঞ্জন নীচুগলায় বলল, "তোমায় ফেলে পালাব?"

ধীরা বলল, "পাঁচ মিনিট বসলে আর কি চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে? লোকগুলোই বা কি ভাববে যদি তাদের দেখেই আপনি পালিয়ে যান?"

নীরা এসে দিদিকে প্রণাম করল, তারপর আড়চোখে নিরঞ্জনকে দেখতে লাগল। প্রিয়নাথ ধীরাকে নমস্কার করল, তারপর পরিচয় ক'রে দেওয়াতে নিরঞ্জনকেও একটা নমস্কার করল। ঝুনু বিস্মিত দৃষ্টিতে নূতন মানুষকে দেখতে লাগল।

দু'চারটে কথা ব'লেই নিরঞ্জন চলে গেল। নীরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, "কি চমৎকার দেখতে ভাই ভদ্রলোক।"

প্রিয়নাথ বলল, "না হলে কি আর দিদি এত ঘটা ক'রে চা খাওয়াচ্ছিলেন? উনি ত কুৎসিত মানুষদের দেখতেই পান না? তা আছেন কেমন? অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।"

ধীরা বলল, "তা রোগা না হয়ে উপায় কি? ভুগলাম ত কম নয়?"

নীরা বলল, "আচ্ছা ভাই, ঐ নিরঞ্জনবাবুই তোমাকে সেদিন বাঁচিয়েছিলেন, না?"

ধীরা বলল, "হ্যাঁ।"

নীরা জিজ্ঞাসা করল, "আগে তোমার সঙ্গে চেনা ছিল?"

ধীরা আবার সংক্ষেপে বলল, "না।"

নীরা বলল, "মা বলছিলেন, ছুটি নিয়ে আবার কয়েক দিন কলকাতায় গিয়ে থাকতে। এখানে একেবারে একলা থাক।"

ধীরা বলল, "যশোদা আছে, সে মায়ের মতই যত্ন করে। আর এখানকার ডাক্তার নার্স এঁরাও খুব সাহায্য করেন।"

প্রিয়নাথ বলল, "এ ভদ্রলোকও কি ডাক্তার না কি?"

ধীরা বলল, "না, উনি ইঞ্জিনিয়ার।"

নীরা বলল, "সিনেমা অভিনেতাদের মধ্যে কার মত যেন দেখতে।"

প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে বলল, "সিনেমার বাইরে বুঝি লোক দেখতে ভাল হয় না?"

"হবে না কেন? তবে কে বা অত লোকের খবর রাখছে?"

যতক্ষণ তারা বসল, পরস্পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করল। তারপর চা খেল এবং তারপর প্রস্থান করল। যাবার সময়ে ব'লে গেল যে কাল আবার ঐ রকম সময়েই আসবে। তবে ধীরা শুনে খুসী হ'ল যে তারা তিন দিনের বেশী এলাহাবাদে থাকছে না।

নীরা যাবার সময় বলল, "তুমি না গাড়ি কিনবে বলেছিলে ভাই দিদি?"

ধীরা বলল, "ঝেড়ে উঠি ত আগে। তারপর দেখা যাবে।"

নীরারা চলে যাবার পর সন্ধ্যাটা একেবারে বিবর্ণ ধূসর হয়ে গেল ধীরার কাছে। যদি সে বেশী দিন বাঁচে, তা হ'লে তার গতি কি হবে? নিরঞ্জন থাকবে না বেশী দিন তার জীবনে। তার পরেও কি সে বাঁচতে পারবে? নিজেকে সে ত জানে? সে পারবে না এই উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য নিয়ে তার দেবতার কাছে যেতে। কেন এই দারুণ সর্বনাশের পথে সে পা বাড়াল? নিজের দুঃখ যদিও বা সে সহ্য করতে পারে, নিরঞ্জনের দুঃখ সহ্য করবে কি ক'রে? কেন তাকে সে আগে বাধা দেয় নি? কিন্তু ধীরার অন্তরের ভিতর কোন কুহকিনী রাক্ষসী ব'সে আছে, যে কেবলি তাকে এই পথই দেখায়?

সে রাত্রে তার খাওয়া হ'ল না। যশোদা খানিক বকবক্ ক'রে চলে গেল নিজের কাজ সারতে। বিড়বিড় ক'রে বলল, 'যত সব যন্ত্রণা আমারই। এ মেয়ে নিয়ে করি কি? যেন ঠিক মেমদের সংসারের মত। হ্যাঁ বাপু, ভাল মনে রইলে ভাল কথা বললে, রাগ হ'ল দু' ঘা কষিয়ে দিলে, এই ত আমরা জানি। মুখ বুজে অত জ্বলে-পুড়ে মরা বুঝি না বাপু।" (ক্রমশঃ

আফ্রিকা—২

রোডেসিয়া (দক্ষিণ)

শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাদেশ আফ্রিকার অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক ধুরন্ধর শ্বেতাঙ্গগণের কাড়াকাড়ি শুরু হবার পর থেকে সেখানে যা' ঘটে এসেছে, এবং আজও যা' ঘটছে, সেই প্রসঙ্গে আফ্রিকাবাসীর দুঃখ দৈন্য-ব্যথা, তাঁদের মুক্তি-সংগ্রামের গৌরবগাথা এবং তাঁদের দেশে দেশে স্বাধীনতা সূর্যোদয়ে মুক্তিস্নাত আনন্দোজ্জ্বল পুণ্য প্রভাতের কথা 'প্রবাসী' পত্রিকার গত আশ্বিন (১৩৭৩) সংখ্যা থেকে কিছু কিছু নিবেদন করতে প্রয়াসী হয়েছি। এই প্রয়াস ও প্রেরণার মূলে একটু ইতিহাস, একটু তাৎপর্যময় উৎস আছে। তা স্মরণ করা কর্তব্য মনে করি। প্রবাসী প্রতিষ্ঠাতা মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, এই পৃথিবীতে যাঁরাই নির্যাতীত, নিপীড়িত, তাঁদেরই পরম বন্ধু, সমব্যথী—একথা সর্ববিদিত। তারপর তাঁরই স্বনামখ্যাত জামাতা এবং বর্তমান নিবন্ধকারের চির প্রণম্য আচার্য ডক্টর কালিদাস নাগ প্রবাসীর ১৩৬৭, আশ্বিন সংখ্যায় 'মুক্তিপথে আফ্রিকা' নিবন্ধে আফ্রিকায় নবযুগের সূচনা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু শারীরিক বিশেষ অসুস্থতা নিবন্ধন সেই আলোচনা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেননি। তাই তাঁরই নির্দেশে প্রবাসীর মাধ্যমে আমরা মুক্তি সংগ্রামী আফ্রিকার জয়ধ্বনি করি—তাঁদের স্বাধীনতাহস্ত প্রসারিত ভাগ্যলক্ষ্মীকে আমাদের প্রণাম জানাই।

রাজধানী : সেলিসবারী (Salisbury)

অবস্থান :

উত্তরে : জাম্বেজী নদী ও জাম্বিয়া (১৯৬৪)

দক্ষিণে : দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল

পূর্বে : মোজাম্বিক

পশ্চিমে : বেচুয়ানাল্যাণ্ড

আয়তন : ১,৫০,৩৩৩ বর্গমাইল (পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪½ গুণ)

জনসংখ্যা :	আফ্রিকান :	৩৯,০০,০০০
(১৯৬৪)	য়ুরোপীয় :	২,১৭,০০০
	অন্যান্য :	১৯,৯০০
		৪১,৩৬,৯০০ (আনুঃ)

অবস্থা : রাজনৈতিক

১৮৮৮ : সেসিল জন্ রোড্স্ (ইংরেজ) (অক্টোবর) জাম্বেজিয়ার স্বাধীন মাতাবিল (জুলু) রাজা লোবেঙ্গুলার সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া মাতাবিলল্যাণ্ডের ৭৫,০০০ বর্গমাইল স্থানে যাবতীয় ধাতু ও খনিজ পদার্থ উৎপাদনাদির অধিকার লাভ করেন। এবং প্রভুত্ব বিস্তারে তৎপর হন।

১৮৯০ : ভবিষ্যতের সেলিসবারী নামক স্থানে (১২।১৩ সেপ্টেম্বর) সিসিল জন্ রোড্স্ য়ুনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করেন।

১৮৯৩ : লোবেঙ্গুলাকে বিতাড়ন—

১৮৯৫ : সিসিল-রোড্স্ এর নামানুসারে জাম্বেজিয়ার 'রোডেসিয়া' নামকরণ।

১৮৯৩-১৯২৩ : রোড্স্-স্থাপিত ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোম্পানীর শাসন (কোন সরকারের নয়)

১৯২৩ : ব্রিটিশের ডোমিনিয়নভুক্তি এবং ব্রিটিশ (১লা অক্টোবর) রাজপ্রতিনিধি গভর্নরের শাসন শুরু।

১৯৫৩ : দঃ রোডেসিয়া, উঃ রোডেসিয়া এবং (১লা আগষ্ট) নায়াজাল্যাণ্ডের ফেডারেশন ভুক্তি।

১৯৬৪ : উত্তর রোডেসিয়ার (জাম্বেজী নামে) (২৪শে অক্টোবর) স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ রোডেসিয়ার নাম থেকে 'দক্ষিণ' কথাটি লোপ।

১৯৬৫ : ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রী আয়ান ডগলাস্ স্মিথ (১১ই নবেম্বর) (Ian Douglas Smith) কর্তৃক একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা। (ব্রিটেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, কমনওয়েলথ্ প্রভৃতির ঐ স্বাধীনতা অস্বীকার ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা)

১৯৬৬ সাল, ৬ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে কমনওয়েল্‌থ-এর সভা বসলো। সভায় বসলেন বাইশটি সদস্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ। অষ্ট্রেলিয়া, উগাণ্ডা, কানাডা, কেনিয়া, গাম্বিয়া, গায়ানা, ঘানা, জামাইকা, জাম্বিয়া, ত্রিনিদাদ, নাইজেরিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ব্রিটেন, ভারত, মালয়সিয়া, মাল্টা, মালাবি, সাইপ্রাস, সিয়েরালিওন, সিঙ্গাপুর ও সিংহলের প্রতিনিধি। কেহ রাষ্ট্রপতি, কেহ প্রধানমন্ত্রী, কেহ প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য প্রতিনিধি সম্মেলনে সমুপস্থিত।

দশদিন দীর্ঘ সভা। সভা বসবার পূর্বেই যথারীতি আলোচ্য বিষয়-সূচী প্রস্তুত হ'ল। ভারতের প্রস্তাবক্রমে আলোচনায় সর্বাগ্র অধিকার ও প্রাধান্য লাভ করল রোডেসিয়া। বস্তুতঃ রোডেসিয়া প্রসঙ্গ শুধু প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারই নয়, ওই দশদিনব্যাপী প্রকাশ্য অধিবেশনে, ঘরোয়া বৈঠকে, ডিনার পার্টিতে, গোপন পরামর্শে নেতৃবর্গকে দিবারাত্র ব্যস্তসমস্তও করে তুললো। রোডেসিয়ার সমস্যা-সমুদ্রে এমন ঝড় উঠলো যে, কমনওয়েল্‌থ ভেঙে যাবার উপক্রম।

জাম্বিয়া ও সিয়েরালিওন স্পষ্টই ঘোষণা করলে রোডেসিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহী স্মিথ-সরকারকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করা না হলে, তথাকার সংখ্যাগুরু চল্লিশ লক্ষ আফ্রিকান নরনারীর স্বার্থ রক্ষা করতে বৃটেন ব্যর্থ হলে কমনওয়েল্‌থ ত্যাগ করতেই তারা বাধ্য হবে। অবস্থা জটিল হয়ে উঠলো। আপাত সমস্যার মূলটি কি?

১৯৬৫, ১১ই নবেম্বর। ভোরবেলা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন তুললেন মিঃ উইলসন। টেলিফোন লাইনের অপর প্রান্তে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন রোডেসিয়ার প্রধানমন্ত্রী আয়ান ডগলাস্ স্মিথ।

মিঃ স্মিথ কথা কইলেন মিঃ উইলসনের সঙ্গে। জানালেন তাঁর দীর্ঘদিন-লালিত সঙ্কল্প রোডেসিয়ার একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার শেষ সিদ্ধান্ত। সেই দিনই (১১-১১-৬৫) অপরাহ্ণ ১-১৫মিঃ (গ্রীনউইচ সময়: পূর্বাহ্ণ ১১-১৫মিঃ) কুড়ি মিনিটের এক বেতার ভাষণে স্মিথ সাহেব রোডেসিয়ার একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং জারী করলেন তাঁরই প্রধানমন্ত্রীত্বে স্বাধীন সরকারের নূতন সংবিধান।

রোডেসিয়ার গভর্নর স্যার হাম্‌ফ্রে গীব্‌স (Hon. Sir Humphrey Vicary Gibbs, K. C. M. G. O. B. E.) অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্মিথ সরকারের কাযকে নিন্দা করলেন এবং বিঘোষিত স্বাধীন সরকারকে অগ্রাহ্য করলেন। লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী উইলসন অবিলম্বে সাক্ষাৎ করলেন রাণীর সঙ্গে, পরামর্শ করলেন অপরাপর নেতৃবর্গের সঙ্গে এবং পার্লামেন্টে স্মিথ-ঘোষিত স্বাধীন সরকারকে ঘোষণা করলেন বিদ্রোহী ও বে-আইনী বলে। ওই স্মিথ সরকারকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকারের ঢেউ চলল দেশ-দেশান্তরে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ব্রিটেনকে নির্দেশ দিলে অবিলম্বে রোডেসিয়া-সমস্যা সমাধান করতে এবং প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করতে। ভারত এবং কমনওয়েল্‌থ-এর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রও একে একে স্মিথ সরকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে। কিন্তু মিঃ স্মিথ অটল। ব্রিটিশ সরকারও, দেখা গেল, স্মিথ-সরকারের বিরুদ্ধে কাযকরী তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে না। মাসের পর মাস গড়িয়ে চলল।

দশ মাস পর কমনওয়েলথ সম্মেলনে (১৯৬৬, সেপ্টেম্বর) সদস্যগণ ব্রিটেনের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন বিদ্রোহী স্মিথ-সরকারের অন্যায় কার্যের যোগ্য প্রতিবিধান করতে। বললেন, রোডেসিয়ায় চল্লিশ লক্ষ আফ্রিকান সংখ্যাগুরু। তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অবহেলা করা চলে না। গণতন্ত্র-সম্মত ভাবে 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' অধিকারে রোডেসীয়-গণকেই তাঁদের সরকার গঠন করতে দিতে হবে। সরকার গঠনে সংখ্যাগুরুকে অনধিকারী রাখা ন্যায়সঙ্গত নয়।

৪৩ বৎসর পূর্বে ১৯২৩, ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ঐ রোডেসিয়া ব্রিটেনের ডোমিনিয়নভুক্ত—ক্রাউন কলোনি। সুতরাং রোডেসিয়ার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রধানতঃ ব্রিটেনেরই। কিন্তু ব্রিটেনের নীতি, সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী উইলসনের বক্তৃতা অন্যান্য সদস্যকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাই সকলে ক্ষুব্ধ। তাই রোডেসিয়া প্রসঙ্গে সম্মিলনে আগত অপরাপর নেতৃবর্গ মুখর ও ব্যাকুল।

বিশ্বের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ঐ নেতৃবর্গের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত রেখেছে বিশ্বের সকল বিদগ্ধ সমাজকে। তাই রোডেসিয়া বিশ্বমানবকে ভাবিয়ে তুলল।

ওই সম্মেলনে বেছে বেছে পাঁচটি দেশ—কানাডা, জাম্বিয়া, ব্রিটেন, ভারত, ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি নিয়ে এক বিশেষ কমিটি গঠন করা হ'ল। যদি সুরাহার পথ সহজ হয়। কিন্তু হ'ল না। শুধু সবার মন-রাখা ভাষায় ভবিষ্যতের আশা-পথ খোলা রেখে যথাসময়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটল মাত্র।

কিন্তু আজকের এই গণতন্ত্রের যুগে, জাগ্রত বিশ্বের চোখের সম্মুখে আয়ান ডগলাস স্মিথের ওই যে বেপরোয়া স্বাধীনতা ঘোষণা, যা নিয়ে উদ্ভব এত বিক্ষোভ, বিতর্কের ঝড় আর বিশ্বজনগণের ভাবনা—এর মূল সূত্রটি কি? এ কি হঠাৎ কোন অঘটন? জিজ্ঞাসা করলে একটি স্কুলের ছাত্র।

হঠাৎ নয়। অবজ্ঞার যোগ্যও নয় ছেলেটির জিজ্ঞাসা। ওর উত্তর রয়েছে রোডেসিয়ার উৎপত্তির ইতিহাসে—রোড্স সাহেব আর তাঁর অনুবর্তী বিদেশাগত শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের ইতিহাসে—আফ্রিকার সরল নরনারীর দীর্ঘশ্বাসে—আর তাঁদের ভবিষ্যতের দৃঢ় আশ্বাসে ইতিহাস বাঙ্ময়। তারই কয়েকটি পাতা—এক নাটকীয়, অদ্ভুত জীবনের দৃষ্টান্ত 'রোডেসিয়া'র স্রষ্টাকর্তা সিসিল জন রোড্স। (Cecil john Rhodes—1853—1902)। বিরল দৃষ্টান্ত সমগ্র ইংরাজকুলেও। একক উদাহরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

জন্ম তাঁর এক পাদ্রীর ঘরে। বিলাতের হার্টফোর্ডশায়ার-এ। ১৮৫৩, ৫ই জুলাই ধরণীতে এলো সন্তানভারে ক্লান্ত পাদ্রী পিতার বারোটি সন্তানের একটি হয়ে। তবু সন্তান-ভাগ্য খুব সুখকর ছিল না পিতার। এক পুত্র তাঁর অকালেই প্রাণ হারাল অত্যধিক সুরা পান করে। পিতৃ-হৃদয় সান্ত্বনা খুঁজল সেসিলের দিকে চেয়ে। ওর যেন ধর্মে মতি আছে বলে বোধ হয়? পিতা নিজেই তাকে ধর্মে-কর্মে দীক্ষা দিবেন, ভাবেন মনে মনে। যাজন-যজন শিখিয়ে দিবেন নিজের হাতে। পরিজনবর্গেরও তাই মত। ওর চোখে যেন কোন্ এক সুদূর-প্রসারী দৃষ্টির আভাস। অজানার হাতছানি। সবাই স্থির করলেন, বড় হয়ে পিতৃকর্মই হোক পুত্রের বৃত্তি। গীর্জাই হোক ওর কর্মক্ষেত্র। হ'তও তাই।

বাদ সাধল ওর স্বাস্থ্য। ছেলেটা বড় রোগা। ক্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল আরও। শেষে একেবারে রাজ-রোগ। শৈশবেই ধরল টিউবারকুলোসিস্—যক্ষ্মা। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন, বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা কর—স্বাস্থ্যোদ্ধারে পাঠাও কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে। ডাক্তারের কথাই থাকল। আফ্রিকায় পাঠানোর পরামর্শ পাকা হ'ল শেষ পর্যন্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভাগ্য মোড় ঘোরালো। গতি নিল ভবিতব্য।

১৮৭০ সাল, সেসিলের বয়স সতের। সেসিল স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে এসে উপনীত হলেন। সুফল পাওয়া গেল। অল্পকাল মধ্যেই সজীব হয়ে উঠলেন সিসিল আশাতীত ভাবে।

দু'বছর অতিক্রান্ত হ'ল। ১৮৭২ সাল—এক সহোদরকে সঙ্গে নিয়ে সেসিল গেলেন কিম্বার্লিতে। কেপ প্রদেশের একটা সহর কিম্বার্লি। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য সুগভীর। মন ছুটেছে তার মাটির গভীরে। মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কিম্বার্লির ভূতল থেকে হীরা আবিষ্কারের সংবাদ বিশ্বময় ছড়িয়েছে। রটনা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিতলে না কি হীরার ছড়াছড়ি। লুব্ধ সংবাদ প্রলুব্ধ করল তরুণ-মনকে। ভাগ্যপরীক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে সিসিল এলেন কিম্বার্লিতে। রত্নগর্ভা আফ্রিকার মাটি খুঁড়ে যদি রত্ন কিছু মিলে। মাটি খোঁড়া শুরু হ'ল। শুরু হ'ল অনুসন্ধান। হাতে হাতে ফল। উদ্যমশীল যুবকের ভাগ্যলক্ষ্মীও সুপ্রসন্না। যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভূত বিত্তের অধিকারী হলেন সেসিল। সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন তিনি।

প্রতি বছরই চলল বাড়ী যাতায়াত। ইংলণ্ড আর আফ্রিকা, আফ্রিকা আর ইংলণ্ড। এই চলল। শুধু বিত্ত নয়, বিদ্যাও চাই সেসিলের। দু'য়ের প্রতিই আকর্ষণ তাঁর। দু'ই প্রয়োজন। অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়ে গেলেন। কয়েকমাস লেখাপড়া। দীর্ঘ ছুটির দিনগুলো দক্ষিণ আফ্রিকা, ছক কেটে নিলেন সিসিল। কর্মী পুরুষের কর্ম নির্ঘণ্ট।

কিন্তু স্বাস্থ্যে সইবে তো? অক্সফোর্ডের ডাক্তারই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন তাঁর। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হ'ল। ১৮৭৩ সাল। সেসিলের বয়স কুড়ি বছর। ডাক্তারের হিসেবে বড় জোর আর ছ' মাস শরীর টিঁকতে পারে তাঁর। হুঁশিয়ার করে রায় দিলেন তিনি: এই পৃথিবীতে সেসিলের মেয়াদ ছয় মাসের বেশি নয়। কে না দুঃখিত হবে? ভেঙে না পড়বে বিষণ্ণতায়? কিন্তু অদ্ভুত খেলোয়াড়ি মন নিয়ে জন্মেছেন সেসিল নিজে। দৃক্পাত করলেন না তিনি চিকিৎসকের কথায়। যথারীতি চলল তাঁর রুটিন-বাঁধা কাজ। আফ্রিকা আর ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আর আফ্রিকা।

ছ' মাস কেটে গেল। ডাক্তারের রায় মিথ্যা হ'ল।

আর কিম্বার্লিতে রোডস্ হয়ে উঠলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্রোড়পতি। ব্যবসার প্রসারকল্পে একটা স্থায়ী সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন সেসিল। হীরক ব্যবসায়ের তাঁর প্রধান কেন্দ্র স্থাপনা কিম্বার্লিতেই স্থির করলেন তিনি। কিম্বার্লিতেই বিশ্ববিখ্যাত 'বিগ হোল' পৃথিবীর বুকে মানুষের খোঁড়া বোধ হয় বৃহত্তম গহ্বর — হীরক ভাণ্ডার। তারই অদূরে ডী বীয়ার্স নামে এক বুয়র চাষীর খামার বাড়ী। সেসিল কিনে নিলেন সেটা। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন ডী বীয়ার্স কনসোলিডেটেড মাইনস্ লিমিটেড (De Beers Consolidated Mines Ltd.) এক বিরাট কোম্পানী। এর নাম হীরক ব্যবসায়ের ইতিহাসে জগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরদিন।

কিন্তু বি. এ. ডিগ্রীটা নেওয়া হয় নি এখনো। চলে গেলেন অক্সফোর্ডে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেন বি. এ.। উচ্চতর পরীক্ষার বাসনাও রইল মনে। কিন্তু প্রতিপত্তি চাই ধনসম্পদ লাভে। ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা তার অসামান্য। তারও চেয়ে বেশি লোভ ব্রিটিশ জাতের প্রভাব বিস্তারের। তারই জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ অপরিহার্য মনে করলেন রোডস।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনির পার্লামেন্ট সভায় আসন পেতে অসুবিধে হল না তাঁর। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশ করলেন রাজনীতিক্ষেত্রে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহণ করলেন পার্শ্ববর্তী রাজ্য বেচুয়ানাল্যাণ্ডের ডেপুটি কমিশনারের পদ। কিন্তু টাকাটাই সব নয়। প্রভাব প্রতিপত্তি চাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। প্রয়োজন ব্রিটিশের আধিপত্য বিস্তারের জন্য। ব্যক্তিগত চাইতে তাঁর জাতীয় অহংকার আরও বেশি। এইখানে সেসিলের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর উৎপাদিত হীরকের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে তারই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কোম্পানী ডী বীয়ার্স কনসোলিডেটেড মাইনস্ লিঃ। এবার সোনা। সোনার স্বপ্ন জাগল সেসিলের মনে। আফ্রিকায় সোনা নেই? উত্তর অজ্ঞাত। হীরার মতই পৃথিবীর বৃহত্তম স্বর্ণভাণ্ডার যে এই আফ্রিকাই—তারই মাটির নীচে যে ঘুমিয়ে আছে স্বর্ণোজ্জ্বল বিশাল জগৎ, মানুষ তার সন্ধান পায় নি তখনো। সন্ধান পেল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ড এ (Witwatersrand) সোনা আবিষ্কৃত হ'ল।

জগতের ধনতন্ত্র আর আবিষ্কারের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সুরু হ'ল স্বর্ণযুগ। সেসিলের স্বপ্ন সফলতার পথ পেল। হীরার চাইতে মূল্যবান কম হলেও সোনাই ত পৃথিবীর রাজা। আর সোনার রাজা সিসিল রোডস্। হীরকসংস্থার মতই বিরাট এক স্বর্ণসংস্থা পত্তন করলেন তিনি আবিষ্কারের প্রথম বছরেই (১৮৮৬)। কোম্পানীর নাম হ'ল, কনসোলিডেটেড গোল্ড ফীল্ডস অব সাউথ আফ্রিকা লিমিটেড। বলা বাহুল্য ১৮৮৬ থেকেই স্বর্ণব্যবসাক্ষেত্রেও তাঁর আধিপত্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল বিপুল। অর্থ প্রাচুর্যের ভাবনা রইল না আর জীবনে। এবার রাজ্য বিস্তার।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বেচুয়ানার ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হবার পরই নজর পড়েছিল উত্তরাভিমুখে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরে বেচুয়ানাল্যাণ্ড। বেচুয়ানার উত্তরে বিরাট নদী (১৬০০ মাইল) জাম্বেজীর উভয় উপকূলে বিস্তৃত ভূভাগ। নদী-হ্রদ জলপ্রপাত বিধৌত সবুজ পাহাড়ের সুষমা ও ছায়া, বন-উপবন ঘেরা শান্ত শীতল সুবিশাল অঞ্চল। এখানেই ডেভিড লিভিংষ্টোন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর বিস্ময় ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বিস্ময়। প্রতি মিনিটে ৭,৭০,০০,০০০ গ্যালন জলপ্রপাত ৩৭৭ ফুট নীচে পড়ে, বাষ্প সন্ধানে যে অবর্ণনীয় দৃশ্য সৃষ্টি করে, সেই বর্ণ রামধনুকের খেলা মনোহারী ঝলমলি, তার কি তুলনা আছে? ও-অঞ্চলেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী তাঁদের প্রথম মিশন কেন্দ্র স্থাপনা করেছিলেন ইনিয়াতি (Inyati) নামক স্থানে।

কিন্তু ঐ বিস্তৃত অঞ্চল তখনও অনুন্নত। কোন শ্বেতাঙ্গ শাসক বা উপনিবেশিকের হাতে পড়ে নি তখনো। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোন কোন শিকারপ্রিয় ব্যক্তি মাঝেমধ্যে যায় মাত্র। ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত বুয়রগণ কর্তৃক বিতাড়িত আফ্রিকানরা বাস করেন ওই দিকে গিয়ে।

জাম্বেজিয়া রাজ্যে মাতাবেল ও মাশোনা নামে জুলুদের এক শাখা মাতাবেল উপজাতি স্থাপন করেন (১৮৩০) মাতাবিলিল্যাণ্ড। মাতাবেলের রাজা লোবেঙ্গুলা। বান্টু-রাজা মোজেলেকাৎসির পুত্র লোবেঙ্গুলা রাজাসনে বসেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিশাল রাজ্যের ভূতল কি স্বর্ণগর্ভা

হবে? রত্ন-সন্ধানী সিসিল রোডসের মনে প্রশ্ন জাগে। ভূতলেই ত ভূচর মানুষের সৌভাগ্য!

সিসিল তৎপর হলেন। গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন দূত পাঠালেন সিসিল রোডস্ রাজা লোবেঙ্গুলার কাছে। ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে চতুর ইংরাজ দূত এক চমকপ্রদ চুক্তি সম্পাদন করে নিলে সরল মাতাবিলরাজ লোবেঙ্গুলার সঙ্গে। চুক্তির সর্ত হ'ল সিসিল রোড্স লোবেঙ্গুলাকে এক হাজার বন্দুক, মাসে মাসে এক শ' পাউণ্ড অর্থ আর একটা ছোট গানবোট বা যুদ্ধতরী দিবেন। বিনিময়ে মাতাবিলল্যাণ্ডের ৭৫০০ বর্গমাইল স্থানে ধাতু ও খনিজ পদার্থসমূহের যাবতীয় স্বত্ব লিখিয়ে নিলে রোড্সের পক্ষে। এমন সস্তায় এমন সওদার কথা কেউ কোন দিন শুনেছে কোথাও? খোদ ব্রিটেন তো হতবাক্, স্তম্ভিত রোড্সের এই কারবারের কথা শুনে। তার মধ্যে ওই যুদ্ধ-তরীটি ধাপ্পাই রয়ে গেল চিরদিন!

রোড্স্ সাহেব কর্মযোজনা সুরু করে দিলেন মাতাবিলল্যাণ্ডে। লোবেঙ্গুলার শুধু জমি নয়, শুধু ভূতলের সম্পদরাশি নয়, তাঁর পুত্রদের উপরও প্রভুত্ব আরোপের লোভ দেখা গেল সিসিলের। রাজপুত্রদের ভৃত্যরূপে ব্যবহার করার লঘুচিত্তবিলাসের প্রমাণ রাখলেন তিনি। ওই উত্তরাঞ্চলের উন্নতিমূলক কর্ম প্রসার ও পরিচালনার উদ্দেশে রোডস একটা কোম্পানী গঠন করলেন 'ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানী' নামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। রাজ্য বিস্তারের বনিয়াদ পাকা হ'ল। ভারতে ইংরাজের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কথা মনে পড়ে।

মাতাবিলল্যাণ্ডের উত্তর পাশে মাশোনাল্যাণ্ড। মাতাবিল রাজধানী বুলাওয়াওর অদূরে মাতোপো পাহাড়ের ও-ধারে। মাশোনা উপজাতির বাস সেখানে। পাশাপাশি দুই উপজাতি মাতাবিল ও মাশোনা। দুই-ই চাই। সিসিলের রাজ্যলিপ্সা বেড়ে চলেছে। ব্রিঃ সাঃ আঃ কোম্পানী সশস্ত্র বাহিনী পাঠাল মাশোনাল্যাণ্ডে। ১৮৯০, ১৩ই সেপ্টেম্বর য়ুনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করল মাশোনা কেন্দ্রে। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি ক্ষেত্রেও সিসিলের প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কেপ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন তিনি। এই ইংরেজ পুত্রটির পুরুষাকার, কীর্তি-কাহানী ইংলণ্ডে বহুল প্রচারিত। ওয়াকিবহাল স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়াও। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিসিল ইংলণ্ডে থাকাকালে মহারাণী একদিন ডিনারে আপ্যায়িত করলেন তাঁকে।

—কি করছো তুমি এখন, রোডস? জিজ্ঞাসা করলেন ভিক্টোরিয়া।

—মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। খুশি হয়ে উত্তর করলেন রোড্স্।

—আচ্ছা সিসিল, তুমি নাকি নারীবিদ্বেষী! মেয়েদের না কি দু'চোখে দেখতে পার না? ভোজসভায় অন্তরঙ্গ আবহাওয়া সৃষ্টি করেন মহারাণী।

কথাটা মিথ্যা নয়। রোড্স্-এর জীবনীকাররা এমন কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গও তাঁর জীবনে নারীর প্রতি আকর্ষণ খুঁজে পান নি কখনো। রোডস্ তাই চিরকুমার। অবিবাহিত আমরণ। আরো একটা নজীর আছে। একবার এক ফরাসী সুন্দরী তাঁর পিছু নেয় একই জাহাজে রোডসের সহগামিনী হয়ে। সুন্দরীর সেই অপচেষ্টা শেষ পর্যন্ত গড়াল আদালত পর্যন্ত। মামলা করে নারীপাশ থেকে মুক্ত হলেন সিসিল। নারী-মোহ তাঁর অপছন্দ—এ কথা মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় তাঁর ডোমিনিয়ন বৃদ্ধির একক প্রচেষ্টা। জাম্বেজিয়া জয় রাজনৈতিক দিক থেকে পাকা করে নেওয়া ভাল। ভালো ও-রাজ্য ইংরাজের ছাঁচে ঢেলে সাজানো। মনে করলেন সিসিল। একটা যুদ্ধের আয়োজন করে জয়লাভ করলে কেমন হয়? পরিকল্পনাটা মন্দ নয়।

কিন্তু তৈমুর লঙ, নাদির শাহ্ বা আলেকজাণ্ডারের মতো ইংরেজ পররাজ্য আক্রমণ করবে কি? এঁরা বিজ্ঞানী জাতি। এঁদের কৌশল আলাদা। মাতাবিল আর মাশোনা দুই উপজাতি বাস করে পাশাপাশি। ইংরাজের দাবার চাল এই পথে। এইখানেই ফাটল ধরিয়ে সমঝর পাবা চলবে তার রাজনীতির।

মাশোনা গরু-বাছুর চুরি করতে সুরু করল মাতাবিলের। স্বধন রক্ষা করতে ছুটল মাতাবিল। ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে উঠল। সৃষ্টি হ'ল বিদ্বেষ, বিরোধ, প্রতিরোধ। প্রকৃতির কোলে, বনের ছায়ায় শান্ত সরল দুটি মানবজাতির জীবনে উঠল অশান্তির ঝড়। সুযোগ সৃষ্টি হ'ল ইংরাজের মতলব হাসিলের। রাজা লোবেঙ্গুলা পত্র লিখলেন সোজাসুজি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে: আমি

তোমার কাছেই শুনতে চাই মহারাজ্ঞী, জানতে চাই, যে-কোন মূল্য দিয়ে কি জনচিত্ত জয় করা যায়? কেনা যায় একটা মানবজাতিকে? আমি জানতে চাই মহারাণী, তোমার লোকেরা আমাকে নিধন করছে কেন? আমার গোধন যখন দেখি মাশোনার কবলে, তারই উদ্ধারে যাই বলেই কি মারবে আমাকে?

হায় লোবেঙ্গুলা! তোমার এ মানবিক প্রশ্নের সদুত্তর ইংরেজ শাসকের অভিধানে আছে বলে প্রমাণ কোথায়?

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাতাবিলল্যাণ্ডে তথাকথিত এক যুদ্ধ-পর্ব সমাধা হয়ে গেল। যোদ্ধা রোডস সাহেবের অনুগামীরা। তাঁরা জয়ী হলেন। বিধ্বস্ত হ'ল মাতাবিল। রাজা লোবেঙ্গুলাকে বুলাওয়াও হতে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিতে হ'ল পাহাড়ের জঙ্গলে।

'মাতাবিল! যতদিন আমাদের সোনা আছে, শ্বেতাঙ্গরা ততদিন ছাড়বে না আমাদিগকে। কারণ সোনাকেই ওরা মূল্য দেয় সবার উপরে!

"যত সোনা আছে আমার, জড়ো কর সব, দিয়ে দাও ওদের। আর বলে দিও, ওরা আমার রক্ষীদের হত্যা করেছে, জনগণকে ধ্বংস করেছে। আমার কুঁড়ে ঘরে—আমার রাজ-প্রাসাদে ওরা আগুন দিয়েছে—হরণ করেছে আমার গোধন...

'বল ওদের, আমি কেবল একটু শান্তি চাই .....'

শান্তিকামী লোবেঙ্গুলার এই বোধ হয় শেষ কথা। মাতাবিলের শেষ স্বাধীন রাজা তাঁর স্বরাজ্যে আর ফিরে আসবার সুযোগ বা সময় পান নি জীবনে। পর বৎসর, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দেই পাহাড়ের কোলে বনানীর অন্তরালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিসিল রোডস্-এর কেপ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর এবং রাজনৈতিক আধিপত্য ঘুচে গেল তাঁরই নিকটতম এবং দীর্ঘদিনের বন্ধু ডক্টর লীণ্ডার স্টার জেমসনের (Dr. Leander Starr Jameson) এক মারাত্মক ভুল পরিকল্পনার চালে।

সোনা আবিষ্কারের পর থেকে বহু লোলুপ বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গ বাসা বাঁধতে ছুটে আসে ট্রান্সভাল-এ। বলা বাহুল্য স্থানীয় বুয়র সরকার সুনজরে দেখেন নি ওই আগন্তুকদের। ওই সব নবাগত আর বুয়র সরকারের মধ্যে মাতাবিল-মাশোনা বিবাদের সূত্রানুসারেই অশান্তির উসকানি দিয়ে ট্রান্সভাল দখলের মতলব আঁটলেন জেমসন। বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় হিতে বিপরীত হ'ল। বুয়র-সরকারের কঠোর শাসনে বৈদেশিকগণ মাথা তুলতে পারেন নি। জেমসন সদল বলে নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। আর প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন সেসিল রোডস্।

কিন্তু মনঃক্ষুন্নতা নেই। বিদ্বেষ বা অভিযোগ নেই সিসিলের বন্ধু জেমসনের প্রতি। অচিরেই তাঁকে ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর ডিরেক্টর পদও ছাড়তে হ'ল। বিস্মিত হলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তেমন বিষণ্ন নয়। খেলোয়াড়ী মনোভাবেই মেনে নিলেন অতবড় ক্ষয় ক্ষতিগুলো।

সেসিল মনোযোগী হলেন উত্তরদেশে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই জাম্বেজীর উভয় উপকূলস্থ ভূভাগের নূতন নামকরণ করা হ'ল তাঁরই নামানুসারে 'রোডেসিয়া' বলে। জাম্বেজীর উত্তরে 'উত্তর রোডেসিয়া' আর দক্ষিণে 'দক্ষিণ রোডেসিয়া।' একই ব্যক্তির নামে দু'টি দেশ! মাশোনা কেন্দ্রে যেখানে ১৮৯০, ১৩ সেপ্টেম্বর প্রথম য়ুনিয়ন জ্যাক উত্তোলিত হয়েছিল, সেখানেই স্থাপিত হ'ল দক্ষিণ রোডেসিয়ার রাজধানী। রাজধানীর নামকরণ হ'ল তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে 'সেলিসবারী'।

লোবেঙ্গুলা আজ সুখ-দুঃখের বাইরে। কিন্তু মাতাবিল আর মাশোনা জাতি মাথা তুলতে চাইলে আর একবার।

১৮৯৬ সাল। সিসিল রোডস্ তখন ইংলণ্ডে। কিন্তু সংবাদটা পেলেন ঠিক সময়ে। ছুটে এলেন সিসিল রোডে-সিয়ায়। পাকা রাজনীতিবিদের দূরদৃষ্টি উদয় হ'ল তাঁর। ইংরাজের সততা আর সদিচ্ছার প্রতি আফ্রিকাবাসীর আস্থা যদি না আসে, তবে স্থায়ী শান্তি সম্ভব হবে না, সম্ভব হবে না তাঁর অভিপ্রেত ব্রিটিশ কাঠামোতে রোডেসিয়া আর রোডেসিয়ানকে ঢেলে সাজানো। সুদূরপরাহত হবে তাঁর স্বপ্নের রোডেসিয়া সৃজন।

মাতাবিল-মাশোনা সমস্যাটি সমাধানের দায়িত্ব তুলে নিলেন তিনি নিজের হাতে। পথ বেছে নিলেন আলাপ-আলোচনার, অস্ত্র-শস্ত্রের নয়। একটা পরামর্শ সভায় আয়োজন করে ডাক দিলেন তিনি দেশীয় প্রধানদের।

স্থান নির্বাচন করলেন বুলাওয়াওর অদূরে মাতোপো পাহাড় 'পরে একান্তে ঐকান্তিক আলোচনার উদ্দেশ্যে।

১৮৯৬, ২১শে অগাষ্ট।

নির্দিষ্ট স্থানে দেশীয় প্রধানগণ উপস্থিত হলেন। অবশ্যই তাঁরা একেবারে নিরস্ত্র ন'ন। কে জানে, রোডস্ সাহেবের মনে কী আছে?

রোডস্ যথাকালে মিলিত হলেন আফ্রিকানদের সঙ্গে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র তিনি। অস্ত্র পরিহার আর নির্ভিকতার পরিচয় সদিচ্ছারই দ্যোতক। অস্ত্র পরিত্যাগ করুন আপনারাও, বললেন সেসিল—বিশ্বাস করুন আমাকে, আমার সদিচ্ছাকে। আপনাদের মঙ্গলই চাই, চাই মাতাবিলের সামগ্রিক উন্নতি। সে-পরামর্শই করতে চাই আপনাদের সঙ্গে। অস্ত্র নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য অবিশ্বাস করেন নি আফ্রিকাবাসী। অস্ত্র ত্যাগ করলেন তারাও।

আলোচনা সফল হ'ল। দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরে সেসিল রোডসের ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন স্থাপনের ভিত্তি পাকা হ'ল। শুধু তাই নয়। রাজনীতির অন্য ক্ষেত্রেও রোডেসিয়া সৃষ্টি তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার দুই পার্শ্বে দু'টি পর্তুগীজ উপনিবেশ। পশ্চিমে এ্যাঙ্গোলা, পূর্বে মোজাম্বিক। এ দু' দেশের সরল পথে যোগাযোগ রুদ্ধ করল রোডেসিয়া।

রাজনীতিতে কখনো উদাসীন, কখনো সমীচীন দৃষ্টি, কিন্তু আশৈশব অনন্যসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য আর অদ্ভুত কর্মপ্রাণতার সঙ্গে সেসিল রোডসের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই তাঁরই নিজের কথায়: 'আমরা আদর্শ, প্রত্যেক সভ্য মানুষের জন্য সমান অধিকার। 'সভ্য মানুষ' বলতে বুঝি, হোক সাদা, হোক কালো, অন্ততঃ নাম স্বাক্ষরের শিক্ষা আছে যার, আছে কিছু কাজ-কারবার বা সম্পত্তি অর্থাৎ নিষ্কর্মা নয় যারা, তারাই 'সভ্যজন'। তাদেরই চাই সমান অধিকার। অনাগত কালের বিদ্যার্থীদের উচ্চশিক্ষার্থে প্রচুর অর্থ দান করে 'রোডস স্কলারশিপ' স্থাপনও তাঁর বিদ্যোৎসাহেরই চিহ্ন। আরও অনেক কিছু করবার সাধ ছিল তাঁর মনে। কিন্তু ছিল না দীর্ঘ জীবনের সুযোগ। পঁচিশ বৎসর পূর্বে অক্সফোর্ডের ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হলেও উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হতেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটল ১৯০২, ২৬শে মার্চ। তাই মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আক্ষেপ শুনি: 'কত কিছু করবার ছিল, কত সামান্য করা হ'ল।'

যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত যে ছেলেটির ভাগ্য তাঁকে একদিন ইংলণ্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেনে এনেছিল, দিয়েছিল স্বাস্থ্য, স্বর্ণ-হীরকের কল্পনাতীত প্রাচুর্য্য আর জীবননাট্যে অভ্যুদ্ভূত অভিনয়ের সুযোগ সেই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করলেন সেসিল জন রোডস্। তাঁর মরদেহ সমাধির স্থানটুকু নিজেই নির্বাচন করে রেখেছিলেন, কিনে রেখেছিলেন একান্ত একার জন্য বুলাওয়াওর দশ ক্রোশ দূরে মাতোপো পাহাড়শীর্ষে নির্জন নিস্তব্ধ বনানী-বেষ্টিত ছায়াশীতল সেই স্থানটি, যেখানে একদিন আফ্রিকান প্রধানদের হৃদয় জয় করে দৃঢ় করেছিলেন রোডেসিয়ার ভিত্তি। সুন্দর ঐ স্থানটির নাম রেখেছিলেন রোডস্ 'ওয়ার্লড্স্ ভিউ'। আফ্রিকা মহাদেশে নিঃসন্দেহে একটি দর্শনীয় স্থান। দর্শকগণ আজও দেখতে পান একটি সামান্য ফলকের গায়ে দু'টি মাত্র কথা: Here lies the remains of Cecil John Rhodes—এখানে শায়িত রয়েছে সেসিল জন রোডস্-এর দেহাবশেষ। ঐটুকু শুধু, আর কিছু নয়—কোন বাণী নয়, দিন নয়, তারিখ নয়—কথা-ভারাক্রান্ত নয় সেসিলের সমাধি।

মাতাবিলের শেষ স্বাধীন রাজা লোবেঙ্গুলা আর রোডেসিয়ার স্থপয়িতা সাগর-পারের সেসিল রোডস্ উভয়েই এক দশকের মধ্যে (১৮৯৪—১৯০২) চলে গেলেন লোকান্তরে। রয়ে গেল রোডেসিয়া। রয়ে গেল লোবেঙ্গুলার দীর্ঘশ্বাস, সেসিলের স্বপ্নের পরবর্তী পরিহাস, মাতাবিল-মাশোনার বেদনা আর ভবিষ্য আশ্বাস—তাই নিয়ে রচিত হতে চললো রোডেসিয়ার বিশ্ব-ভাবনার ইতিহাস।

ঝড়ের পরে

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

শেষটায় ঝড় সত্যিই এল—বিশ্বজোড়া ঝড়! ঝড় আসবার আগে যে দেশগুলো ঝড়ের বিরুদ্ধে যত বেশী ঝড়ো বক্তৃতা দিয়েছিল, তারাই কোমর বেঁধে এবং মহা আনন্দে ঝড়ে নেবেছে—ঝড়কে পেয়েছে সাথী। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—ঝড় মানে যুদ্ধ। বিশ্বজোড়া যুদ্ধ, যার পোষাকী নাম—ওয়ার্লড ওয়ার। এ যুদ্ধে কোনো স্বাধীন দেশেরই নিরপেক্ষ—মানে নিউট্রল থাকবার উপায় নেই;—থাকলে সকল বেলিজারেন্ট দেশই সন্দেহের চক্ষে দেখতে থাকবে। ইংলণ্ডের 'ওয়ার অব দা রোজেস'-এর মতো। হয় সাদা গোলাপ, নয় ত লাল গোলাপ গুঁজতে হবেই বুকে বা টুপীতে। গোলাপহীন হয়ে উদাসীন থাকা চলবে না। আর শাসিত দেশের উপর শাসন এই সময়ে হয় চূড়ান্ত—যুদ্ধে সায় বা সাড়া দিতেই হবে, নতুবা কারাবরণ। ভারতের কত নেতা তাই নেপথ্যে প্রেরিত হয়েছে।

যুদ্ধের ঘুর্ণিবায়ু 'পরকে আপন করে, আপনারে পর।' দূরদূরান্তর হতে আমেরিকান সৈন্য ভারতের বুকে বন্ধুরূপে দলে দলে এসে আশ্রয় নিয়েছে, অথবা তাদেরই আশ্রয়ে ভারত উৎকণ্ঠায় অবস্থান করছে। যুদ্ধের ঢেউ ভারত পর্যন্ত এসে যদি ধাক্কা দেয় তবে ঐ স্কুল-কলেজ থেকে উপড়ে আনা স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'রেগুলার' সৈন্যদল দেখিয়ে দেবে জগতকে কেরামতিটা। যতদিন সেদিনটা না আসছে, তারা আরামে আহার-বিহার করে সহরটা দেখছে ঘুরে ফিরে।

(২)

নিমতলার শ্মশানঘাট। পৃথিবীছাড়া, প্রাচীরঘেরা এই ক্ষুদ্র পরিসরটুকু। পৃথিবী যারা ছেড়ে চলে যায়, 'যাত্রা করে' একটুক্ষণের অবস্থানের জন্যে এইটুকু স্থান। এখনও কি তাদের সদ্যমুক্ত আত্মা নিজ নিজ দেহটিকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে মোহমুগ্ধ মৌচাক ঘিরে মধুপের মত!

একটু পরেই মৌচাকটিতে অগ্নিসংযোগ—ভস্মীভূত নিশ্চিহ্ন সব। পৃথিবী অবান্তর বোঝা বইবে না আর। পৃথিবীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল এতদিন যে, তার চিহ্নটুকু ঐ আগুনের মোক্ষণ দিয়ে এখুনি মুছে ফেলতে হবে।

কয়েকটি আমেরিকান সৈন্য অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ভারতের এই বিপরীত রীতি। একজন ফিরিঙ্গী বেশধারী বাঙ্গালী অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়ে এই আমেরিকান যুবকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রহেলিকাপূর্ণ নিমতলার প্রস্থানপর্ব। এমন রহস্যপূর্ণ ব্যাপার তারা দেখে নি কোন দেশে। অনেক দেশ ঘুরেছে, অনেক মারণ অস্ত্র হেনেছে অনেক অ-দৃষ্ট শত্রুর উদ্দেশে, কিন্তু মরণের পর এমন অভিনব অগ্নি-পুঞ্জের সজ্জারচনা এই দেখছে তারা ও তারই ব্যাখ্যা শুনছে এই মুখর গাইডের মুখনিঃসৃত। যাবার সময় প্যান্টের পকেট থেকে মুঠো মুঠো বক্‌শিস এই চিত্রগুপ্তের ব্যাখ্যাকারের হাতে দিয়ে যাচ্ছে।

লোকটি আগে ক্লাইব ষ্ট্রীটের একটা বিলাতী আপিসে কেরাণী ছিল। শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইংরেজীতে ক্ষিপ্র বক্তৃতার শক্তি সেখানেই অর্জন করেছে। এখন মাসের পর মাস বিনা বেতনেই ছুটির দরখাস্ত ছাড়ছে ও এই পরম লাভজনক ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকে যা জমা হচ্ছে—আর বোধ হয় কেরাণীর দাসত্ববৃত্তিতে ফিরে যেতে হবে না।

"বল হরি—হরিবোল!"

ঐ আর একটা মৃতদেহ এল। আহা কী সুন্দর সাজিয়েছে পুষ্পে, চন্দনে, বসনে! সত্যি স্বর্গরাজ্যের যাত্রা এ। সঙ্গে এসেছে বহুলোক—পুরুষ এবং স্ত্রীলোকও। একজন সৈন্য অবাক হয়ে দেখছে এই সব সাজানর সৌন্দর্য। কিন্তু একটু পরেই তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণভাবে আকৃষ্ট হল একটি শ্মশানযাত্রিণীর অপূর্ব রূপমাধুর্যে। অবিন্যস্ত কেশ, অপ্রসাধন বেশ, অবহেলগতি তার সৌন্দর্যকে তার অজ্ঞাতে কী অভিনব রূপে ফুটিয়ে তুলেছে! এ তুলনা যেন জগতে নেই। মেয়েরা বুঝি নিজেদের নৈসর্গিক শ্রীটুকুকে আভরণ ও প্রসাধনের পরিবেশে নিপুণ হস্তে উলটে নিঃশেষ করে দেয়। অথবা শোকের স্পর্শই প্রকৃত সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত

করে। কারণ সৌন্দর্য ত একতরফা নয়,—দর্শকের সমবেদনার চোখেও ফোটে সৌন্দর্য। মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ সুসজ্জিত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকের শ্মশানস্থলের প্রান্তভাগে গিয়ে পড়ল। সৈনিক যুবকটির দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে চলল। শ্মশানের সেই প্রান্তটুকু একেবারে গঙ্গার কোলের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। তারই একপাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা একটু স্থান। মেয়েটি সেইখানে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বিস্তৃতকেশ মস্তকটি মাটিতে পেতে দিল। যুবক অবাক হয়ে দেখে ভাবতে থাকে মাথা বুঝি মাটি থেকে আর উঠবে না! ফিরে গাইডের দিকে তাকিয়ে বললে, "ব্যাপার কি?"

"ঐখানে রবীন্দ্রনাথের দেহ দাহ করা হয়েছিল তাঁর উদ্দেশে এমন অগাধ প্রণতি।

"রবীন্দ্রনাথ? কে সে?"

"অবাক করলে, সাহেব! রবীন্দ্রনাথ,—যাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি, আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ মানব, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি—তুমি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের নাম শোন নি, সাহেব?"

"ও হো! ট্যাগোর, ট্যাগোর! তাই বল, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব জানি, তাঁর লেখার তর্জমাও পড়েছি আমি। কী সৌভাগ্য আমার—এ তাঁরই সমাধি!"

বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে যায় এবং তারপরই আবার বলে, "কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁর সমাধিটিকে কি অযত্নেই তোমরা ফেলে রেখেছ? ভাঙা রেলিংএ ঘেরা? আমাদের দেশ হলে ঐ স্থানটুকুকে সৌধসৌষ্ঠবে তীর্থস্থান গড়ে তুলতাম। দেশবিদেশের কত লোক এরই জন্যে আসত এই খানে।"

গাইড মনে মনে লজ্জাবোধ করল কবির এই অবহেলিত সমাধির দিকে তাকিয়ে। ভাবল, তাই ত, কবির নামে এত যে টাকা উঠল তা কোথায় কার কার নামে কোন্ ব্যাঙ্কে জমা পড়ল কে জানে! তাই কথাটার কোন প্রত্যুত্তর না করে দূরে সমাগত আরও কয়েকটি শ্বেতাঙ্গের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি হেনে ভাবতে লাগল এ লোকটা আমায় নিয়ে অনেকক্ষণ কাটাল, এখন বকশিস দিয়ে ছাড়লে বাঁচি। সৈনিক বোধ হয় তার মনের কথা বুঝতে পারল, আর এদিকে মেয়েটি এতক্ষণে তার প্রণাম থেকে উঠে দাঁড়াল এবং সৈনিকের প্রতি স্থির দৃষ্টি স্থাপন করল। যুবক মহা বিস্ময়ে দেখলে মেয়েটির চোখে-মুখে এক অপূর্ব স্বর্গীয় দীপ্তি আর প্রশান্ত পরিতৃপ্তি! সৈনিক গাইডের দিকে ফিরে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে তাকে দিয়ে বললে, "আচ্ছা, ধন্যবাদ।" গাইডও নিষ্কৃতি পেয়ে পুনরায় ধন্য হতে স্থানান্তরে ছুটল।

এদেশে এসে অবধি আমেরিকান সৈনিকটি—আদতে সে ত কলেজের ছাত্র—হিন্দি ও বাংলা যুগপৎ কিছু কিছু শিখতে সুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু কথা বলতে গেলে দুটো ভাষায় মিশিয়ে ফেলে। ভাষা দুটোর পার্থক্যবোধ এখনও হয় নি। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে, "কসুর নেবেন নেহি, আমি একঠো বাৎ জানতে চাই।"

মেঘের কোলে রোদের হাসির মত অতি মিষ্টি একটু স্মিতির আমেজ টেনে পরিষ্কার উচ্চারণে ইংরেজিতে মেয়েটি বললে, "গাইডকে ছেড়ে দিলে কেন? ও ত বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিল তোমায়।"

মেয়েটির মুখে এমন পরিষ্কার ইংরেজি শুনে সে একটু চমকে উঠল এবং পুলকিতও হ'ল। এবার নিজেও ইংরেজি ধরল।

"না, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে চাই একটা কথা, —ট্যাগোরের পার্থিব অবশিষ্টের উপর আপনারা কোন স্থাপত্য রচনা করেন নি কেন?" তরুণী নিমেষের জন্য শ্রদ্ধাভরে একবার চোখ বুজল। তারপর দৃষ্টিহীন উদাস চোখ মেলে বলতে লাগল—"কবির দেহাবশেষ সব ত ঐখানেই পড়ে নেই। অগ্নিদেবতা তাঁকে সাগ্রহে কোলে তুলে নিয়ে সৌরলোকে প্রস্থান করেছেন। ঐখানে পড়ে আছে শুধু আমাদের বিভ্রান্তি—বিভূতির অবশেষ। তাঁকে যদি রূপ দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দিই তবে কবির অসীমতাকে আমরা খর্ব করব, তাঁকেও হয়ত একদিন পুতুল বা অবতার বানিয়ে ফেলব। না, তার চেয়ে থাকুন তিনি তাঁর কাব্যেরই সম্প্রসারের মত অসীম আকাশের উদার ব্যাপ্তির মাঝে বিধৃত হয়ে।"

যুবক স্তম্ভিত হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একটা বক্তৃতা দিয়ে গেল। না, তাও ঠিক নয়—কথাগুলো যেন আপন মনে আত্মচিন্তার আবেগের একটা অভিব্যক্তি। যুবকের প্রশ্নের জবাবে যে কথা কইছে, তা যেন তার হুঁস নেই। এমন কি যুবকের উপস্থিতিই তার উপলব্ধির বাইরে যেন। তাই কথাটা শেষ করেই একটু ভদ্রভনিতা না করেই চট্ করে চলে গেল চিতার পাশে। চিতা সাজানো হয়ে গেছে, এবার অগ্নিসংযোগ হবে। চিতায় আগুন দেবার পর চিতার উর্দ্ধায়িত লেলিহান শিখার দিকে যুবকের দৃষ্টি যখন নিবদ্ধ ছিল তখন—সেই সময় কখন মেয়েটিকে তার বাড়ীর লোকেরা নিয়ে চলে গেল তা সে টেরই পায় নি। এতে তার পরিতাপ হ'ল। কারণ সে ভেবে

রেখেছিল—অবসর পেলে আরও আলাপ করবে মেয়েটির সঙ্গে। সে ভাবতে পারে নি যার সঙ্গে আলাপ হ'ল সে যাবার সময় একবারটিও বিদায়বাণী না করে চলে যাবে এমন করে। তার নামটা পর্যন্ত জানা হ'ল না।

ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে অন্যান্য সৈন্যদের যথারীতি উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসের মধ্যে সে আজ যোগ দিতে পারল না। নিজের শয্যাটির উপর চুপ করে চিৎ হয়ে পড়ে রইল। সকলের বিদ্রূপ কটাক্ষ, শ্লেষবাণী, দৈহিক বলপ্রয়োগ সমস্তই আজ হার মানল তার কাছে। সে ভাবতে লাগল—শুধুই ইংরেজী শিখেছে মেয়েটি, কোন ভব্যতা শেখে নি। কিন্তু কেনই বা তবে অভব্য মেয়েটার কথা সেই থেকে ভেবে সারা হচ্ছে সে? তবু কি যেন একটা আকর্ষণ তার মনটাকে সেই দিকেই ঝুঁকিয়ে রাখল। অমন প্রাণঢালা ভক্তির প্রণতি! কোন্ গভীরতা থেকে তার বাণীর অভিব্যক্তি, আবার নিস্পৃহতার পরাকাষ্ঠাপূর্ণ প্রমাণ! সবই যেন এই বিদেশী যুবকের চিত্তকে মুগ্ধ করছিল। ভাবছিল আশ্চর্য ভারতের ভক্তিপ্রবণতা!

(৩)

বাইশে শ্রাবণ। শান্তিনিকেতনটি আজ স্মৃতি-তর্পণের পুণ্য সাজে সেজেছে। গত রজনী থেকেই বৈতালিক ধ্বনিতে আশ্রমটি পূত, সঙ্গীত-মুখর। আজ প্রাতঃকালের উপাসনার পর থেকেই বর্ষণ সুরু হয়েছে। তার বিরাম নেই। বৃক্ষরোপণের অনুষ্ঠানটি বাইরে বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত ও অন্তরে অবরুদ্ধ বাষ্প বয়ে সবে সমাপন হয়েছে। সমবেত সকলেই নিস্পন্দ।

হঠাৎ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল—কি একটা গোলমাল! যুবকেরা ঝুঁকে পড়ল একজন বিদেশীকে ঘিরে কয়েকজন নানা অপ্রীতিকর প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করছে। জানা গেল সে শান্তিনিকেতনের শান্তিভঙ্গের পণ নিয়েই এসেছে এখানে। সকলেরই অপরিচিত সে একজন বিদেশী যুবক। তা কবিগুরুর তিরোধান তিথিতে কত অপরিচিত লোকও ত আসে এখনো। কিন্তু এ লোকটার অনুষ্ঠানের কার্যকলাপের প্রতি মন ছিল না, সে শুধু প্রত্যেকটি মেয়ের মুখের দিকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে তাকিয়ে দেখছিল। কাকে চাই শুধোতে কারুরই নাম বলতে পারে না।

* * * *

"এত দিনে আমি কৃতকার্য হলাম, ইরা?" সমস্ত উৎকণ্ঠা ভুলে মুহূর্তে গিলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর কথা ফুটল। "তোমাকে প্রায় এই বছরখানেক কত যে খুঁজেছি আমি!"

"আমার নাম যে 'ইরা', কি করে জানলে?"

"ঐ যে যখন সবাই আমায় চেপে ধরে চাঁটি চাপড় মারছে, তুমি বললে, ছেড়ে দেও সবাই, ও আমার পরিচিত; আর পরক্ষণেই ঐ ছেলেটা চেঁচিয়ে বললে 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ইরার বন্ধু ও'। কিন্তু জান, ঐ ছেলেই প্রথমটায় জোর ঘুঁষিটা বসিয়েছিল এই খানটায়। তা, ওর উপর আর রাগ নেই আমার, শেষটায় ওই থামিয়েছে সবাইকে আর তোমার বন্ধু বলে আখ্যা দিয়েছে আমায়।"

"ঘুঁষি মেরেছে? দেখি, দেখি, ইস নীল হয়ে রয়েছে যে জায়গাটা! চল, আমার বাড়ী গিয়ে ঠাণ্ডা জলের পটি দেব।" বলে সস্নেহে কপালের প্রান্তে একবার হাত বুলিয়ে দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করল পথে চলতে চলতে "কেন আমায় খুঁজে বেড়ালে অত?"

"তা জানি না। কিন্তু না খুঁজেও যেন কি রকম অস্বস্তি বোধ করছিলাম। খবরের কাগজে বিশেষ কলামে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, বিশেষ বিশেষ জায়গায় খোঁজ করেছি। তারপর ভাবলাম, তুমি এত রবীন্দ্র-ভক্ত ২২শে শ্রাবণে হয়ত এখানেই পাব তোমায়—যেখানেই থাক এইদিনে আসবে এখানে। কিন্তু তুমি যে এখানেই থাক তা জানলে কত আগেই আসতে পারতাম। এর মধ্যে পৃথিবীর অবস্থার কত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যুদ্ধের অবসান হ'ল। আমাদের দেশের যোদ্ধারা যত ছিল এদেশে, দলে দলে এখন স্বদেশে ফিরে চলেছে। কোন্ দলের কবে ছাড়পত্র আসে তারই প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু জান, আমার সেইখানেই আতংক। তোমার দেখা আবার না পেয়ে, তোমার প্রকৃত পরিচয় হতে বঞ্চিত থেকেই চলে যাব, তা আমার ভাল লাগছিল না। আচ্ছা, তুমি এখানে কি পড়?"

"পড়ি না, পড়াই।"

"পড়াও! কি পড়াও?"

"ইংরাজী সাহিত্য।"

"গুড গ্রেশাস! আমি ত এখনও ইংরাজী সাহিত্য পড়ি। Post-graduate class থেকে টান মেরে টেনে এনেছে যুদ্ধ করতে হবে বলে।"

রাতে আহারের পর বারান্দায় বসে আবার গল্প চলল এই দু'টি নতুন বন্ধুর। একটিমাত্র রাত ও কালকের দিনটুকু আছে হাতে। কালই সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরতে হবে। সৈনিকের দু'টি দিনের ছুটি। একটা বছরের

ঠাসা কল্পিত জমাইত কত কথা! দু'টি দিনে কি ফুরোয়? সে যেন হ'ল যুবকের পক্ষে। কিন্তু ইরার? সম্ভব-অসম্ভব কল্পনার উর্বর মস্তিষ্ক তার। তার অন্তরের আদর্শ নিয়ে কত বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কতবার নিরাশ হয়েছে। কেউ বলেছে ভাবপ্রবণ, কেউ দিয়েছে টিটকারী। তারপর এক সময় সে নিজেই হয়ে গেছে দুর্গম। তখন লোকে বলেছে অহঙ্কারী, অসামাজিক, অবাস্তব। সেই থেকে সে ঠিক করেছে, সে আর বন্ধু খুঁজে বেড়াবে না। যদি এমন কোন বন্ধু উপকথার রাজপুত্রের মত তার অন্তরের রত্নের সন্ধান নিতে আসে তবে তার কাছেই দেবে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। তেমন দোসরের দেখা জীবনে যদি না মেলে, নিজের আদর্শের দুর্গম বন্ধুর পথ বেয়ে বন্ধুহীন ভাবে একাই চলবে নিজের সাধনার বলে।

কি আশ্চর্য! বিধাতা কি আজ তার কল্পনাকে সত্যে পরিণত করে দিতে উদ্যত হলেন? সত্যিই ত সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসেছে এই তার বন্ধু। সে জানত সৈনিক যুদ্ধ করে—যন্ত্রের যুদ্ধ, এক একটি যন্ত্রদানব। তার মধ্যেও যে মানব বিদ্যমান তা সে আজ প্রথম জানল। এই মানবটির একটি বৎসরের একাগ্র সাধনার আয়োজন চলেছে তারই স্মৃতিকে সামনে রেখে। তাই আজকের পরিচয় যেন তাদের প্রথম বা দ্বিতীয় পরিচয়ও নয়। যেন বহুদিনের দোসরের সঙ্গে আজ পুনর্মিলন হ'ল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল ঝুপ ঝুপ—বাইশের শ্রাবণধারা। ঘরেতে কথার পর কথার মালা গেঁথে চলেছিল দু'জনে। হঠাৎ একটা লোক রাস্তার মোড় থেকে বিকট চীৎকার করে উঠল। নিঃশব্দ নৈশ আকাশভেদী সে শব্দে যুবক চমকে উঠল। ইরা হেসে বললে ভয় নেই, সাহসী সৈনিক! ও এখানকার চৌকিদার, পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, লোকটার গলার আওয়াজটা চমকে দেবার মতই।" "গুড গ্রেশাস" বলে যুবক হাসতে লাগল।

ইরা অবার বলতে সুরু করলে, "তারপর যে-কথা বলছিলাম গিল! আমাদের এই ভারতবর্ষ রত্নে ভরা। বিবিধ রত্নে। ভারতের ধনরত্নের লোভে বিদেশীর আক্রমণ ও শোষণ যে বহুকাল থেকেই চলে আসছে তা তোমরা ভাল করেই জান। তাই নিয়ে লড়াই বেধেছে, রক্তস্রোত বয়েছে বারে বারে। এবারে তোমরাও সুদূর থেকে অংশ গ্রহণ করলে। কিন্তু ভারতের ভাবরত্নের সন্ধান পৃথিবী আজও পায় নি। বহু পুরাকাল থেকে আধুনিক রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে মহা সম্পদে ভরে উঠেছে তাই নিয়ে আমার মনে হয়, মহা দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদেরই উপর। ভারত যেমন বহুজাতির সংঘর্ষের কারণ হয়েছে, আবার ভারতেরই অন্তরে নিহিত রয়েছে একটি সম্মোহন মন্ত্র, যা জগতবাসীর মিলনমন্ত্র। মহামিলন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তার সন্ধান জগতের লোক ত পায়ই নেই এবং ভারতবাসীও এই মহামন্ত্রদানে কার্পণ্যই করে আসছে বলতে হবে।"

"তুমি যে সম্পদের কথা বলছ তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু তবুও মনের মধ্যে কেমন একটা আকর্ষণের অনুভব পাচ্ছি যেন। যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধের ব্যর্থতা এসে যেন আঘাত করেছে এবার বিশ্বের বুকে। তাই জিতেও মনে হচ্ছে জিতি নি।"

ইরা চোখ দু'টি বড় বড় ক'রে বললে, "ঠিক তাই, গিল! আশ্চর্য, তুমি সৈনিক হয়ে এ কথা আজ বললে! আমাদের কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের কথা পড়েছ? সে যুদ্ধে বিজেতা পাণ্ডবগণেরও এই রকম মনোভাব হয়েছিল—এ কি জিত হল? না, হার? মর্মান্তিক হার! এই কথাটাই ভারতের নিজস্ব বাণী। তাকে আজ বিশ্বের বাণী ক'রে তোলা যায় কি ক'রে সেই হ'ল সমস্যা।"

গিলবার্ট বললে, "কিন্তু এ কথা ত রুশদেশের সাহিত্যেও পাওয়া যায়। টলষ্টয় পড়েছ নিশ্চয়। আর আমাদের দেশের এমার্সন পড়েছ তুমি? আমাদের দেশেরও প্রকৃত মনোভাব—"

ইরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, "থাক, থাক—তোমাদের দেশের কথা তুলো না। যে দেশের লোক নিরীহ নিরস্ত্র হিরোশিমা ও নাগাশিকির বাসিন্দাকে অতর্কিতে নিশ্চিহ্ন করে দিলে সে দেশের যে কি মনোভাব—"

ক্রোধে ঘৃণায় কথাটা শেষ করতেই পারল না। গিলবার্ট অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—একটু আগে পর্যন্ত যে মেয়ে বন্ধুভাবে আলোচনা চালিয়ে আসছিল, সে আচমকা এক মুহূর্তে এমন ক্ষেপে ওঠে কি করে! দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে ইরা যেন নরম হ'ল। তার উক্ত উক্তির কোন পাল্টা জবাব বা প্রতিবাদ না পেয়েই সে যেন একটু অপ্রতিভ হ'ল। নিস্তব্ধতার ব্ল্যাকবোর্ডে তার তীক্ষ্ণ বাক্যগুলির রেশ যেন তীরের মত বিদ্ধ হয়ে কণ্টকিত করে তুলল। এবার তাই ধীরে ধীরে বললে, 'জান, এই যে অ্যাটম বোমার গর্ব তোমরা কর, এর মধ্যে একটা দারুণ গ্লানি আছে।"

ইরা থামল। কারণ সে দেখল যে গিলবার্ট তার কথা শুনতে যেন আর তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছে না। বুঝল, একটু আগে যে খোঁচাটা দিয়েছে সেইটেই তাকে পীড়া দিচ্ছে। ইরা একখানি হাত গিলবার্টের কাঁধে তুলে দিয়ে বললে, "কিছু মনে কর না গিল। কথাটা হঠাৎ বড় বেশী তীব্র হয়ে গেছে আমার। সেজন্যে আমি দুঃখিত।"

গিলবার্ট এবারে গলে গিয়ে ইরার অনুতপ্ত হাতখানিকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে, "ও কিছু নয়। আমি কিছু মনে করি নি। কি বলছিলে অ্যাটম বোমের গ্লানি, না কি?"

"বলছিলাম ব্রহ্মাস্ত্র নামে এক চরম অস্ত্রের আখ্যা আমাদের পুরাণেও পাওয়া যায়। তা সে কল্পনাই হোক বা বিলুপ্তই সত্যই হোক, সে অস্ত্র-নিক্ষেপের একটা বিশেষ বিধান ছিল। যিনি সে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হবেন, তাঁকে সেই সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যায়ও পারদর্শী হতে হবে। নইলেই তা হ'ত এই বর্তমানের নিছক সংহার পরিণতি, যা দেখলাম তোমাদের অ্যাটম বোমের বেলায়। বোমাটা নিক্ষেপ করার চেয়ে বড় কথা হ'ল নিক্ষেপ করবার বিচার-বুদ্ধি। এই বুদ্ধি-বিবেচনা তোমাদের মস্তিষ্কে গজাল না। আমার মনে হয় কি জান, গিল?"

কিছুক্ষণ গিলবার্টের মুখের উপর দৃষ্টি রেখে ইরা চুপ করে স্থির হয়ে রইল। সে দৃষ্টির কোন অর্থ ছিল না, উদাস দৃষ্টি। গিলবার্টও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে অপেক্ষা করবার পর বললে, "কি মনে হয়, ইরা? চুপ করে রইলে যে।"

"মনে হয়, তোমাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে বিক্রম এবং আমাদের কাছ থেকে তোমাদের শিখতে হবে সংযম। বিক্রমে তোমরা পৃথিবীর সেরা এবং ভারতের সংযম-আদর্শের সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন দেশের তুলনা হয় না। এ দু'এ মিল ঘটানো যায় কি না তাই ভাবি, গিল? পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের এই মিলনের জন্য, আমার মনে হয় সারা পৃথিবীর অন্তস্তল আজ উৎকীর্ণ হয়ে আছে। আজ বিভ্রান্ত ধরিত্রীর দুঃখসুখ তাদের এই মিলনের উপর নির্ভর করছে। ভারত শুধু গ্রহণ করবে না, দানও করবে। তুমি আমেরিকার যুবক, ভারতের একটি মেয়ে হয়ে আমি আজ বুকের মাঝে যে আকুলতা অনুভব করছি, তা কি নিছক বাতুলতা ব'লে মনে হয় তোমার? এতে কি তোমার সায় পাব না ভাই?

ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত বিস্ময়ে গিলবার্ট নিরুত্তর হয়ে রইল। কারণ হঠাৎ নিস্তব্ধ আকাশে ভেসে এল একটি গানের চরণ। স্নিগ্ধ সিক্ত আকাশ, অপূর্ব মধুর কণ্ঠ সঙ্গীত। ইরার সম্পূর্ণ মনোযোগটুকুকে মুহূর্তে তা চুম্বকের মত যেন টেনে নিয়ে গেল। ইরা স্তব্ধ কান পেতে থাকে গানের পানে। যুবক অবাক হয়ে তাকায় শ্রবণতৃপ্তা ইরার প্রতি। ভাবে, এ কি সেই মেয়ে? যে একটু আগে অত গরম বক্তৃতা দিচ্ছিল? একটা গানের সুর ভেসে এসে তাকে এমন নরম করে দিল! আর এই নরম মেয়ের সৌন্দর্য কী অপূর্ব!

অনেকক্ষণ কান পেতে শুনবার পর স্নিগ্ধ তৃপ্ত কণ্ঠে ইরা বললে, "গোরা গাইছে। জান গিল, এই ছেলেটিই সেই, যে তোমায় ঘুঁষি মেরেছিল তখন। পাগল ছেলেটা! পথে পথে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে এই রাত দুপুরে। কী মিষ্টি গলা ওর!"

গিল কোন কথা বলল না। তখনও গান চলছিল। বোধ হয় আর একটা গান ধরেছিল। অনেক পরে গানের অবসানে—সুরের রেশটুকুও মিলিয়ে যাবার পর, স্বপ্নোত্থিত মোহাবিষ্টের মত খুব আস্তে আস্তে ইরা বলতে লাগল, "সঙ্গীত হ'ল সম্পদের সেরা। বিশ্বমৈত্রী প্রচার করতে হলে এর চেয়ে বড় উপায় যে কি হতে পারে আমি জানি না। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে, গিল, এইবার তুমি শুতে যাও। কাল সারাদিন তোমায় শান্তিনিকেতনের দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখাব।"

(৪)

* * *

খিদিরপুর জাহাজঘাটের একটা রেলিং-এ ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল দু'জনে—গিলবার্ট ও ইরা। উদাস ভাবে সৈন্য-তরীর পানে তাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ উভয়ে চুপ ক'রে থাকবার পর গিলবার্ট যেন পূর্বকথার জের টেনে বললে, "আমাদের বন্ধুত্ব তবে কি বৃথাই যাবে?"

"বৃথা কেন যাবে?"

"যদি মিলনই না হবে তবে বৃথা ছাড়া আর কি?"

"না, ও কথা বলো না গিলবার্ট। তুমি আমার বন্ধু রইলে চিরদিনের জন্যে। একটা কথা আমি বেশ স্পষ্ট করে বুঝেছি এই যে, তুমি যে আমায় ভালবেসেছ তা শুধু আমার এই ব্যক্তিগত সত্তাটুকুকে নয়, ভারত-

বর্ষের মেয়ে আমি, বিশেষ ক'রে তাকেই তুমি ভালবেসেছ। ভারতবর্ষ তোমার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিয়েছে। আমায় যদি তুমি ছিনিয়ে নিয়ে তোমার ক'রে ফেল, তোমার দেশের ক'রে নেও, তবে তুমি আমার মধ্যে আর কোনো আকর্ষণই পাবে না। তাই বলছি যাও বন্ধু, সাগর পার হতে আকর্ষণটুকু রেখো এপারের দিকে। দূরে থেকে নিকট হয়ো। নিকটে নিয়ে শেষে দূর ক'রে ফেলবে।"

"কিন্তু তুমি যদি না যাও আমাদের দেশে—"

"আচ্ছা, আমি যাব একদিন, যদি একটা মিশন নিয়ে যেতে পারি।"

"মানে?"

"মানে, কথাটা একটু উঁচু ধরণের শোনায় বটে কিন্তু কথাটা বড়ই প্রাণের কথা। একটা আদর্শের কথা।" এই পর্যন্ত বলে চুপ করে থাকে ইরা অনেকক্ষণ। চিন্তা বুঝি তার কোন্ গভীরে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "একটা কথা তোমাকে জানাই নি। হয়ত আরও আগে জানান উচিত ছিল। আমরাও প্রাণের একটা চাওয়াকে জোর ক'রে চেপেই রেখেছি। প্রাণ বলেছে গোরাকে চাই, মন বলেছে—খবরদার! গোরা যে সে উচ্ছল তরঙ্গ, সে যে বাউল, সে যে ঝর্ণার ঝংকার। তাকে ত বাঁধতে নেই, বাঁধা যায়ও না। তাই মন বলেছে রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরকে তোমার স্বার্থের বাঁধনের আকাঙ্ক্ষা করো না।"

গিলবার্টের হাতের মজবুত মুঠোয় ইরার একখানি হাত এতক্ষণ ছিল, এইবার মুঠো শিথিল হতেই ইরার হাতখানি খসে পড়ল। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইরা সুরু করলে, "যা বলছিলাম, যদি একটা মিশন গড়ে তুলতে পারি—ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের আদান-প্রদানের মিশন, যদি পাই উপযুক্ত কর্মী, যদি পাই প্রাণস্পর্শী বক্তা, যদি থাকে তাদের নিষ্ঠা, আর যদি পাই সেই সঙ্গে গায়করূপে গোরাকে, তবে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির বাণী নিয়ে যাব একদিন সাগরপারে তোমাদের দেশে। কিন্তু তুমি যাও এখন বন্ধু, সময় হ'ল তোমাদের জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল—ডাকছে তোমায়, যাও।" গিলবার্ট চমকে উঠে বলল, "তাই ত? কিন্তু তুমি এত রাতে একা ফিরবে কি করে?"

ইরা নিশ্চিন্ত সুরে বললে, "একা নই আমি, ঐখানে গোরা রয়েছে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে।"

গিলবার্ট ঘাড় ফিরিয়ে গোরাকে দেখেই 'গুড গ্রেশাস' বলে হন হন করে ছুটে যায় গোরার কাছে। গোরার গান গুনগুন করে চলছিল। গিলবার্ট বললে, "এই যে গোরা? তুমি এখানেও তোমার গান নিয়ে মেতে আছ দেখছি। শোন, তোমাদের দু'জনকে নিমন্ত্রণ করে যাচ্ছি—যেয়ো আমাদের দেশে। প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। গুডবাই!"

পর পর ইরার ও গোরার হাত ধরে ঝাঁকানি দিল। তারপর জাহাজে উঠতে উঠতে বার বার ফিরে হাত দুলিয়ে বিদায়-সংকেত জানাতে থাকে। শুধু হাত নয়, সর্বাঙ্গ দেহটাই দোল খায়, আর বোধ হয় যেন হৃদয়টাও ভিতরে দোল খেতে থাকে। ব্যথার দোলা! বেচারির বুকের উপর দিয়ে বুঝি একটা ঝড় বয়ে গেল। তারই বিদায় স্পন্দন!

নেপথ্যের রাজশেখর

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

রাজশেখর বসুর তুল্য বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি সর্বকালেই দুর্লভ। এমন বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে গুণাবলীর সমাবেশ একটি মানুষের চরিত্রে কদাচিৎ দেখা যায়। অথচ তাঁর বেশির ভাগ গুণের কথা অপ্রকাশিত আছে প্রচারের অভাবে।

বহিরঙ্গ জীবনে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্থাপিত বাংলার প্রথম যুগের শিল্প প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ। স্বদেশের মঙ্গল সাধনের চিন্তায় ও কার্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের এই মানস সন্তানটিকে রাজশেখর তার শৈশব থেকে লালন-পালন করে আত্মনির্ভর সাবালকত্বে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আচার্যের এই ভাবাদর্শকে বাস্তবে সার্থকভাবে রূপায়িত করেন। অর্ধশতাব্দের অধিককাল এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকে যাত্রা করিয়ে দেন সাফল্যের পথে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধাররূপেও তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মজীবন পরিচিত মহলে বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তিনি শুধু এখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ (ম্যানেজার) ছিলেন না সে যুগে। সেই সঙ্গে একাধারে রাসায়নিক, প্রচার-সচিব ইত্যাদি অনেক কিছু। ঔষধ, সুগন্ধী, প্রসাধন ও রাসায়নিক উৎপন্ন দ্রব্যাদির নামকরণ, বিজ্ঞাপন রচনা ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে নানা প্রকার টেকনিক্যাল কাজ, উৎপাদন ও পরিচালন-সংক্রান্ত নতুন নতুন বিভাগ স্থাপন, এমন কি গৃহ নির্মাণাদির প্রকল্প রচনাও তিনি করতেন। নব-নির্মিত বিভাগ ইত্যাদিতে কোন্ যন্ত্র কোথায় কিভাবে স্থাপন করা হবে, অফিসের নতুন পরিবেশে কি কি আসবাবপত্রের প্রয়োজন এবং কোন্ কোন্ স্থানে সেসব ব্যবহারের জন্যে থাকবে—এই সমস্ত খুঁটিনাটির নক্সা পর্যন্ত পূর্বাহ্ণে করে রাখতেন তিনি। উৎপন্ন নানা বস্তুর আবরণীর জন্যে অলঙ্করণ ও চিত্রাদি রচনার নির্দেশও শিল্পীকে দিতেন। বাংলার সেই আদি যুগের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে সংবাদ-পত্রাদিতে বিজ্ঞাপন, সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার মুদ্রণ ও প্রকাশ ইত্যাদির জন্যে তাঁকে বাংলা দেশে প্রচার-শিল্পের অন্যতম প্রধান প্রবর্তকরূপেও গণ্য করা যায়।

কিন্তু এহো বাহ্য। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের সর্বময় ও সকল পরিচালনার কথা, অর্থাৎ প্রশাসক-সংগঠক রাজশেখরের বিস্তারিত পরিচয় দান এখানে লক্ষ্য নয়। রাজশেখরের দ্বৈত সত্তা পরম অনুধাবন ও অনুশীলনের বিষয়। দ্বৈত সত্তা বললেও হয়ত যথাযথ হয় না। তাঁর ছিল বহু সত্তা। কারণ, তাঁর উল্লিখিত কর্মজীবনে যেমন নানা গুণের প্রকাশ ঘটে, তাঁর সাংস্কৃতিক সত্তাও প্রকটিত হয় বৈচিত্র্যময় বহু রূপে। কিন্তু তাঁর আত্মপ্রচারবিমুখ ও নিরহঙ্কার স্বভাবের জন্যে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় সাধারণ্যে অগোচর থেকে যায়। বর্তমানের এই ঢক্কানিনাদে বিজ্ঞপ্তির যুগে নিজে স্বয়ং প্রচারবিশারদ হয়েও আত্ম-প্রচারে একান্ত অনীহার জন্যে তিনি ছিলেন নেপথ্যচারী। সেজন্যে তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের বিবরণ দানও হবে অনেকাংশে নেপথ্য দর্শন। নাম প্রচারের পাদপ্রদীপ এমন সযত্নে পরিহার করে চলবার দৃষ্টান্ত আধুনিককালে দুর্লভ।

যে সাহিত্য-জগতে পদচারণার প্রথম থেকেই তিনি অপরিমেয় যশ ও সম্মান লাভ করেছিলেন সেখানেও তিনি ছিলেন অন্তরালবাসী। সভা-সমিতি সংবর্ধনা আড়ম্বর ইত্যাদির আকর্ষণ থেকে মুক্ত, বিদ্যাচর্চায় মগ্ন নিভৃতচারী সাধক। তাই তাঁর সাহিত্যিক সত্তার অন্তর্লোকের বার্তা, তাঁর সাহিত্য জীবনের উৎস কথা এবং তার অন্তরঙ্গ সংবাদ তাঁর অসংখ্য শ্রদ্ধাপরায়ণ পাঠক-পাঠিকাদেরও অবিদিত আছে।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এই পরিচয় কথার প্রথমে তাঁর সাহিত্য-রচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে। অবশ্য তাঁর সাহিত্যকৃতির কোন সামগ্রিক আলোচনা বা মূল্যায়ন নয়। এখানে আলোচ্য হ'ল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির উৎস-কথা, তাঁর প্রথম রসসাহিত্য রচনার প্রেরণা ও আদর্শের কথা। তাঁর সাহিত্য জীবন রহস্যের প্রথম যুগের নিগূঢ় কাহিনী। তাঁর সাহিত্য মনের তত্ত্ব নয়, তথ্য।

রাজশেখরের প্রথম ও সার্থক রচনারূপে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-ই গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি নিজেও তার পূর্বকালের সাহিত্যকর্মের কিছু উল্লেখ্য বোধ করতেন না। কিন্তু প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তার অনেককাল আগে, প্রায় কিশোর বয়স থেকে সাহিত্যচর্চা করতেন, যদিও তাতে ছেদ পড়ে যায় কলেজের ছাত্রজীবনে। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' থেকে তাঁর যে সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়, তার আগেও তাই আর একটি আরম্ভ ছিল।—'সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকালবেলায় সলতে পাকান'-র মতন। তাঁর কৈশোরকালে, স্কুলে পাঠ করবার সময়েই তিনি বাংলা রচনা করতেন, তবে তার বেশির ভাগই ছিল কবিতা বা পদ্য। দু'একটি গল্প ইত্যাদি গদ্য রচনাও ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সুলেখক শশিশেখর বসু প্রকাশ করেছিলেন যে, রাজশেখরের সেই সব বাল্য রচনা লিখিত হ'ত তাঁদের পারিবারিক সাহিত্যচর্চার খাতা এবং শশিশেখরের পত্নীর কাছে দেবরের সেই সব রচনা অনেকাংশে সংগৃহীত ছিল। পরে তার প্রায় সবই লুপ্ত হয়ে যায়। তার সামান্য ক'টি প্রকাশিত হয় বহুকাল পরে, রাজশেখরের মৃত্যুরও পরে, 'পরশুরামের কবিতা'-য়। এই পুস্তকে প্রকাশিত তাঁর পরিণত বয়সে রচিত, অটোগ্রাফের খাতায় লেখা কয়েকটি কবিতার সঙ্গে 'জামাইবাবু ও বৌমা' তাঁর প্রথম জীবনের রচনার একটি নিদর্শন। সেই বাল্যকালের কবিতা রচনার বহু বছর পরে আরম্ভ হয় তাঁর প্রকৃত সাহিত্যজীবন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রচনা থেকে। তার আগেকার অর্থাৎ বাল্য জীবনের সাহিত্য-চর্চাকে রাজশেখর ধর্তব্য মনে করতেন না, তাঁর সাহিত্য-জীবনের উৎস কথায় সেই কবিতা রচনার যুগকে প্রসঙ্গত উল্লেখ মাত্র করা রইল। সে প্রসঙ্গের অন্য কোন মূল্য বা তাৎপর্য তাঁর সাহিত্য-কৃতিতে নেই।

সাহিত্যিক

রাজশেখরের প্রথম রস-সাহিত্য সৃষ্টি 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হবার পরই বাংলার। সাহিত্য-জগতে আলোড়ন জাগে এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি গুণীজন থেকে আরম্ভ ক'রে স্থূলবুদ্ধি সাধারণ পাঠককে পর্যন্ত আকৃষ্ট করে। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের ও শক্তির সৃষ্টিকে সাদরে বরণ করে নেন সকলে। প্রথম গল্পেই এমন যশস্বী হবার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বেশি নেই।

তাঁর ৪২ বছর বয়সের অসাধারণ ব্যঙ্গ শ্লেষাত্মক এই রচনা পরশুরামের ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ছদ্মনামের প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করা হবে। এখন এই প্রথম রচনার উপলক্ষ্য বা কারণ পরম্পরার কথা। এমন স্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টির উপলক্ষ্য হবার যোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাজশেখর কর্মজীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অতি ঘনিষ্ঠভাবে এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতার নব রূপায়ণ ঘটে এই গল্পে।

যে পরিণত বয়সে তিনি রস-সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন, তাও কোন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জীবনে কচিৎ দেখা যায়। এবং প্রথম লেখাতেই এমন পরিপক্ব হাতের চরিত্র চিত্রণও দুর্লভ। এত বেশী বয়সে তিনি হঠাৎ কি ভাবে এবং কি ভেবে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন? এ প্রশ্ন তাঁর গুণমুগ্ধ, অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার মনে জাগে ও তার সদুত্তর জানতে ইচ্ছা হয়। এ বিষয়ে জানবার মতন বাস্তব তথ্য আছেও।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর জন্মসূত্রে জড়িত সেই ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হবে। রাজশেখরের প্রখর ও বিবেকবান ও ন্যায়নিষ্ঠ মনে সেই সব ঘটনা এত রেখাপাত করে যে তারই প্রতিক্রিয়া 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে' রচনার প্রেরণা জাগে তাঁর মনে। বাস্তব জগতের সত্য উপাদান নিয়ে তাঁর রস-সাহিত্য মানস গঠনে সহায়ক হয়।

গল্পটি তিনি লেখেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। তার কিছুকাল আগে বেঙ্গল কেমিক্যালের জীবনে একটি ঘোরতর সঙ্কট এসেছিল এবং সেই সময়েই উক্ত ঘটনাবলী ঘটে। তিনি তখন প্রতিষ্ঠানটির সংগঠন ও উৎপাদনের নানা কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের বহু রকমের কাজ তিনি সে সময় করলেও শেয়ার বিক্রয়-সংক্রান্ত বিষয় দেখতেন না। সে সব ভার ছিল প্রধানত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যবস্থাধীনে।

আদর্শবাদী প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর দেশসেবার স্বপ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। স্বদেশী শিল্প-ব্যবসায় গড়ে তুলতে হবে, দেশের টাকা বিদেশে না চলে গিয়ে দেশেই থাকবে, বাঙলার বহু সন্তানদের অন্ন সংস্থান হবে, বিলাতী ঔষধ, রাসায়নিক, প্রসাধন দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ ক'রে জাতীয় যন্ত্রশিল্প সেসব উৎপাদন করবে—এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং সেই লক্ষ্য রেখে তার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্যে মূলধন সংগ্রহে সচেষ্ট থাকেন তিনি। পাবলিক লিমিটেড

কোম্পানী বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উপায় হিসেবে শেয়ার বিক্রয়ে যথাসাধ্য তৎপর হন।

শেয়ার বিক্রীও হতে লাগল আশাপ্রদভাবে। সরলপ্রাণ দেশহিতব্রত প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার এই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানটির উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ কল্পনা করে উৎফুল্ল, উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি ধারণাও করতে পারেন নি, যত্রতত্র শেয়ার বিক্রয়ের সেই আপাত মঙ্গলের অন্তরালে শনির কি বিষাক্ত কীট তাঁর সাধের বেঙ্গল কেমিক্যালের পেলব অঙ্গে প্রবেশ করেছে! তিনি আদৌ লক্ষ্য করেন নি, শতকরা পঞ্চাশটির অধিক শেয়ার বাইরেকার কোন এক ব্যক্তির হস্তগত হয়ে গেছে!

পাবলিক লিমিটেড সংস্থার অর্ধাংশের বেশি শেয়ার কুক্ষিগত করে ফেললে সে ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারণ করবার ক্ষমতা পেয়ে যায়—কোম্প্যানী আইনের এই লীলাখেলার বিষয়ে অনবহিত হয়ে পড়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। এবং তাঁর অসাবধানতার সুযোগে এমন একজন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী অতর্কিতে অধিকাংশ শেয়ার করায়ত্ত করেন যিনি ধূর্ততা ও অসাধুতার জন্যে ভারতবিখ্যাত বণিকগোষ্ঠীর এক ধুরন্ধর ব্যক্তি।

অকস্মাৎ একদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের সেই বিপর্যস্ত অবস্থার বিষয় কর্তৃপক্ষ জানতে পারলেন। শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় সেই মারো-কড়ি সম্প্রদায়ের রত্নটি ইচ্ছা করলে সংস্থার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে পারেন তার বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠাতাদের হাত থেকে। বিপদের গুরুত্ব বোঝা গেলেও অবস্থা তখন আয়ত্তের প্রায় বাইরে চলে গেছে

এমন সময়—হয়ত আচার্যদেব কিংবা সেকালের বাংলার পুণ্যবলে—সেই 'লুটবেহারী' চালে এক সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেন। কিংবা হয়ত ভুল নয়, আরো কড়ি মারবার আশায় লোভে বেচাল হয়ে অনেক লাভে তাঁর শেয়ারের কিছু অংশ বিক্রয় করেন একটি জাপানী জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে, কিন্তু কোম্পানীকে না জানিয়ে শেয়ার এই ভাবে বিক্রয় করা বে-আইনী। দুর্যোগের ঘন মেঘের এই ফাঁক দিয়ে আশার বিদ্যুৎ ঝলক বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষ দেখতে পেলেন, অর্থাৎ তাঁদের পক্ষীয় আইনবেত্তারা তাঁদের দেখালেন।

হাইকোর্টে মোকদ্দমা হল বিষয় নিষ্পত্তির জন্যে। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সেই মারো-কড়ি পুঙ্গবটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন। ব্যারিষ্টার-প্রবর স্যার উপেন্দ্রনাথ সরকার অবতীর্ণ হলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের পক্ষে। এই মামলা প্রসঙ্গে রাজশেখরের ভূমিকার কথা পরে উল্লেখ করা হবে। অনেক দিনের অনেক কর্ম-ব্যস্ততার শেষে বেঙ্গল কেমিক্যাল জয়লাভ করে বিপদ থেকে মুক্ত হয়।

মোকদ্দমা সমাপ্তির কিছু দিন পরেই রাজশেখর লেখেন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। মারো-কড়ি শ্রেণীর যে লোকটি এই নাটকীয় ঘটনাবলীর শয়তান, villain of the piece, তাঁর চরিত্র মানসপটে রেখেই তিনি সৃষ্টি করেন—গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া। মডেলটির প্রকৃত নামের পদবীতেও গ আদ্য অক্ষরটি ছিল। সে ব্যক্তির অবয়ব, নাসিকা, কাপড় পরবার ধরন ইত্যাদিও গণ্ডেরিরামের প্রতিকৃতিতে কেমন প্রতিফলিত হয়েছে, সে কথা পরে রাজশেখরের চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে।

একজন অসৎ, স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তি যে বাঙ্গালীর এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়েছিলেন—এই বেদনা রাজশেখরের হৃদয়কে গভীরভাবে বিদ্ধ করে। সেই মর্মজ্বালা থেকেই জন্ম নেয় 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড।' রাজশেখর সেই অর্থ-শিকারীটিকে একেবারে সশরীরে উপস্থাপিত করে গল্পের সূত্র যোজনা করেন স্পষ্ট ভাষায় তাকে বাটপাড়িয়া নামে অভিহিত করে। এই গল্পের অন্যান্য চরিত্র এই অর্থে কাল্পনিক যে, তারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মডেল ক'রে আঁকা হয় নি।

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর নায়ক বা প্রধান চরিত্র অবশ্য গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া নয়—শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। মনে হয় পাকা শিল্পী রাজশেখর এই 'ব্রহ্মচারী' এও ব্রাদার ইন ল'-র পরিচালক অসাধু বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে আমদানী করেছেন ভারসাম্য রাখবার জন্যে। একটা একদেশদর্শী প্রাদেশিক জাতিগত বিদ্বেষ যেন রচনায় না ফুটে ওঠে, এই উদ্দেশ্যেই হয়ত শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীকে সামনে রেখেছেন। কিন্তু পার্শ্বচরিত্র গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়াই যেন সবচেয়ে সজীব হয়ে আছে গল্পের মধ্যে। লেখকের মর্ম বিদীর্ণ করা সৃষ্টি এই বিবেকবিহীন অর্থপিশাচ—যে ভেজাল ঘিয়ের কারবারে পাপ হবার কথায় বলে, 'পাঁপ? হামার কেনে পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকাত্তা, ঘই বনে হাথরস্ মে। হামি না আঁখসে দেখি, না নাকসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সিফ মহাজন আছি—রুপয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিসাব ভি লি। যদি হামি টাকা না দি,

কাসিম আলি দুর্গাপ্রসাদী সে দিবে। পাপ হোবে তো শালা কাসিম আলিকা হোবে। হামার কি?'

গল্পটি লেখবার সময় রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার কোয়ার্টারে থাকতেন এবং সপ্তার শেষে আসতেন ১৪, পার্শী বাগান লেনের বাড়ীতে। মানিকতলার সেই কোয়ার্টারের দোতলায় ঘরের সামনেকার ছাদে একদিন তাঁর আকৈশোর সুহৃদ, চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনকে বলেন, 'যতীন, একটা গল্প লিখে ফেলেছি।' যতীন্দ্রকুমার সেটি শুনতে চাইলে, পড়ে শোনালেন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। যতীন্দ্রকুমার তখন শুধু চিত্রশিল্পী নন, কয়েকটি হাস্যগল্পও তিনি তার আগে রচনা করেন এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁরই নিজের আঁকা রসচিত্রের সহযোগ তো প্রকাশ হয়েছিল।

তিনি রাজশেখর বন্ধুর অভিনব রচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "আমি এর ছবি আঁকব।'

রাজশেখর বললেন, 'বেশ, তা এঁকো। কিন্তু আমার এ বিষয়ে কিছু করা আছে, তোমায় দেখাব।'

তার কয়েকদিন পরে পার্শী বাগানের বাড়ীতে তাঁদের উৎকেন্দ্র সমিতির আসরে গল্প পড়ে তিনি শোনালেন। এই উৎকেন্দ্র সমিতির কেন্দ্রে ছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সভাপতিরূপে এবং রাজশেখরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, চিকিৎসক ও মনীষী গিরীন্দ্রশেখর বসু। রাজশেখরেরই দেওয়া ইংরেজী নাম থেকে এই বাংলা নামকরণ করেছিলেন। এখানে সমাগত হতেন সে যুগের বাংলার সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিল্পী, মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জগতের নানা কৃতী পুরুষ। মনস্তত্ত্ব, শিল্প, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নাটক, সাহিত্য ইত্যাদির আলোচনা ও পাঠ সেখানে চলত চা এবং গল্প সহযোগে। সেখানকার রবিবারের মজলিস সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হ'ত। সেখানে নিয়মিত বা মাঝে মাঝে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, জলধর সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিরজাশঙ্কর গুহ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, সুন্দরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। এই সমিতির এক আসরে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' যখন পড়া হ'ল, শ্রোতারা পুলকিত এবং চমকিত হলেন। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেন গল্পটি আদায় করে নিয়ে গেলেন ভারতবর্ষে প্রকাশের জন্যে। প্রকাশিত হতেই সাহিত্য-জগতে সাড়া পড়ে গেল।

তারপর থেকে রাজশেখরের রস-রচনা একটির পর একটি উৎসারিত হতে লাগল অন্তরের প্রেরণায় এবং অনুকূল পরিবেশে। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে জলধর সেন এবং প্রবাসীর পক্ষ থেকে সে সব সংগ্রহ করে পত্রিকা দু'টিতে প্রকাশ করতেন। বাংলা সাহিত্য নতুন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল রাজশেখরের অপূর্ব অবদানে। পরে পুস্তকাকারে একে একে প্রকাশিত হতে লাগল তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি: গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি।

যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, নিজস্ব সৃজনী প্রতিভা, মানুষের চরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রসনির্ঝর হৃদয় এতকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিল তা অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ হ'ল। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার স্বরূপ কি তা' তার পরিকল্পিত ছদ্মনামের মধ্যে পরিস্ফুট ছিল। পরশুরাম নয়—এ নাম ত তাঁর বাড়ীর স্বর্ণকারের, হাতের কাছে পেয়ে ব্যবহার করেন কোনরকম চিন্তা না ক'রে। যে ছদ্মনামটি তিনি ভেবে স্থির করেছিলেন, তা হ'ল —উপরিচর বসু। ঊর্ধ্বলোক থেকে সংসারের রঙ্গশালার বিচিত্র জীবগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং নির্বিকার নাটকীয় মন নিয়ে তাদের অবলম্বনে রস-সাহিত্য রচনা। তাঁর এই সাহিত্য-মানসের ব্যাখ্যাকারী উপরিচর নামটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবহার করেন নি।

গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া যেমন একটি বাস্তব মডেলে গড়া, তেমনি আরো কিছু গঠিত চরিত্র ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। যেমন 'বিরিঞ্চি বাবার' প্রফেসর ননী। বেঙ্গল কেমিক্যালের এক রাসায়নিক ছিলেন ওই রকম বিজ্ঞানের নানা অদ্ভুত প্রয়োগের বাতিক-ওয়ালা। 'চিকিৎসা সঙ্কটের' নেপাল ডাক্তার অমনি এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সাহিত্য সংস্করণ। বহুকাল আগে রাজশেখরের বালক বয়সে তাঁর অসুখের সময় পিতা ঐরকম একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে এনেছিলেন। সেই হোমিওপ্যাথও নেপাল ডাক্তারের মতন ধমক দিয়ে দিয়ে কথা বলতেন। 'আমার তামাকে সালকার খাটি মেশানো থাকে'—তাঁর মুখের কথা। ওই তারিণী কবিরাজও তাঁর দেখা জনৈক কবিরাজ, হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে তামাক খেতেন। 'হয়, প্রানতি পার না' কথাটিও উৎকেন্দ্র সমিতির জনৈক রসিক ব্যক্তির

মুখের কথা, কবিরাজের নামে প্রযুক্ত হয়েছে গল্পে। আর এক হাকিমকে তিনি দেখেছিলেন ট্রেণের এক কামরায় সহযাত্রীরূপে, তাঁরও দাড়ি তিন রঙা ছিল। এমনিভাবে সংসারের রঙ্গশালা থেকে এক একটি টাইপ চরিত্র তুলে এনে তাঁর রসচিত্রের এ্যালবাম সাজিয়েছিলেন রাজশেখর। তাঁর চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গে এবিষয়ে আরও কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য দেওয়া হবে।

চিত্রশিল্পী

রাজশেখর চিত্রাঙ্কনেও অপটু ছিলেন না। পরিণত বয়সেই যে তিনি বিশেষ বিশেষ টাইপের মানুষের নকসা আঁকতেন, তা নয়। ছবি আঁকবার কথা তাঁর প্রায় বাল্যকাল থেকেই জানা যায়। স্কুলপাঠ্য জীবনে তিনি ছিলেন দ্বারবঙ্গের অধিবাসী, পিতা চন্দ্রশেখর বসু দ্বারবঙ্গ রাজ্যের জেনারেল ম্যানেজার থাকার জন্যে। সেখানে তাঁরা পুরানো ষ্টেশন নামক যে স্থানে বাস করতেন, সেথানকার বাড়ীতে রাজশেখরের ১৩।১৪ বছর বয়সের আঁকা ছবির নিদর্শন দেখা যেত।—যথা, একটি পাখী, শিয়ালকাঁটার ডাল ইত্যাদি রঙীন ছবি। তার মধ্যে দু'একখানি ছবি বাড়ীর দেওয়ালে টাঙানোও থাকত। শিল্পীর বয়সের বিচারে ত বটেই, ছবি হিসাবেও সেসব নিন্দনীয় ছিল না—তাঁর আবাল্য সহচর যতীন্দ্রকুমার সেনের এই ধারণা। রাজশেখর তখন পশুপাখী, গাছপালা এই সবের ছবিই বেশি আঁকতেন। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনের ঝোঁক তেমন দেখা যায় নি, যেমন দেখা গিয়েছিল তাঁর উত্তর-জীবনে।

বালক বয়সের পর কলেজের ছাত্রজীবনেও তিনি চিত্রশিল্পের চর্চা বেশ করেছিলেন। এই সময় তাঁর নানা নিসর্গ চিত্র আঁকবার কথা জানা যায়। আর্ট স্কুলে যোগ দিয়ে রীতিমত অঙ্কন শিক্ষা করেন নি বটে, কিন্তু ঘরে যতদূর সম্ভব শিখেছিলেন তাঁর অসামান্য মেধায়। লণ্ডনের রয়াল একাডেমির প্রেসিডেন্ট স্যর ই. জে. পয়েন্‌টার প্রণীত চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ৪ খণ্ড পুস্তক Landscape painting in water colour অনুসরণ করে অনুশীলন করেছিলেন। এই গ্রন্থাবলীতে রঙ ব্যবহারের বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া ছিল—প্রত্যেক পাতার বাম পৃষ্ঠায় রঙকরা ছবি আর দক্ষিণে তার বহিঃরেখা (outline) ও শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্তে রেখে। রাজশেখর সেই নির্দেশ অনুসারে রঙ ব্যবহারের চর্চা করতেন রীভ্‌সের বাক্‌সের রঙে। ছবি তখন স্বাধীনভাবেও ভাল আঁকতেন।

তার অনেককাল পরে মধ্য বয়সে আবার তাঁর নতুন করে প্রকাশ পায় এই বিদ্যা। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি তাঁর মুখে শুনে যতীন্দ্রকুমার ছবি আঁকতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় রাজশেখর যে বলেছিলেন 'তা বেশ, কিন্তু এই সব চরিত্রের পরিকল্পনা আমার করা আছে, সেই রকম কোরো'—তারপর তিনি দেখিয়েছিলেন তাঁর স্বহস্তে আঁকা আসল গণ্ডেরিরামের পেন্‌সিল স্কেচ। হাইকোর্টে মামলা চলবার সময় সেই ব্যক্তি যখন কাঠগড়ায় দাঁড়াতেন, রাজশেখর তাঁকে দেখে দেখে পোষ্টকার্ডে একাধিক পেনসিল স্কেচ করে নেন। তাঁর আঁকা সেই সব নকসা অবলম্বন করে যতীন্দ্রকুমার ছবি ড্রয়িং করেন, যা গল্পের সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে বিপুল খ্যাতিলাভ করে। সেই 'কুছভি নেহি', 'ঐসী গতি সনসারসে' ইত্যাদিতে গণ্ডেরিরামের যে মূর্তি পরিগ্রহ করতে দেখা যায়, তা আসল মানুষের প্রায় প্রতিকৃতি বলা যায়। সেই পাগড়ি, মুখাবয়ব, এমন কি কোঁচাটি ভাঁজ করে কাপড় পরবার বিশেষ ধরণটি পর্যন্ত অবিকল। প্রসঙ্গত বলা যায়, গণ্ডেরিরামের সেই মডেলটি অর্থাৎ আসল বাটপাড়িয়া পরে ব্রিটিশ সরকারের স্যর খেতাব অর্জন করে যশস্বী হয়েছিলেন এবং কলকাতার মারো-কড়ি সম্প্রদায় কবলিত অঞ্চলের একটি মুখর পথ তাঁর নামের স্মৃতি সগৌরবে রক্ষা করছে।

এমনিভাবে রাজশেখর তাঁর নিজের অনেক স্মরণীয় গল্পের চরিত্রের নকসা নিজে প্রথম করেন এবং তাই থেকে ড্রয়িং ও ফিনিশ করেন যতীন্দ্রকুমার সেন। যেমন—'ভুশণ্ডীর মাঠে'র 'লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল,' 'গোবর গোলা জল ছড়াইয়া যায়', 'খেজুরের ডাল দিয়া রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল', 'সড়াক করিয়া নামিয়া আসিল,' 'সব বন্ধকী তমসুক দাদা' ইত্যাদি ছবির প্রথম স্কেচ রাজশেখরের। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর অন্যান্য চরিত্র শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, তিনকড়ি, অটল প্রভৃতি ছবির প্রথম নকসা রাজশেখর করেছিলেন। তিনকড়ি হলেন ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখরের একজন ডায়াবেটিক রোগীর স্কেচ। 'মহেশের মহাযাত্রা'র পেনসিলের নকসাটিও রাজশেখরের। 'প্রেমচক্রে'র সমস্ত ছবিও তিনিই প্রথম আঁকেন। 'লম্বকর্ণ' গল্পের যে ক্ষীণকায় পাগড়ি-সর্বস্ব দারোয়ান চুকন্দর সিং-এর 'হজৌর' চিত্রটি আছে তাও তাঁর ছেলেবেলায় দেখা এক বাস্তব দারোয়ানের ছবি। তখন পিতার সঙ্গে তিনি ভাগলপুরের কাছে একটি জায়গায় বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছিলেন এবং ওই রকম আকার-প্রকারের এক দারোয়ান সেখানে তাঁদের ছিল। তিনি সেই দারোয়ানের ছবিটি স্মৃতি থেকে এঁকে দেখান,

তারপর যতীন্দ্রকুমার ড্রয়িং করেন তা থেকে। পূর্বোক্ত সমস্ত ছবিই রাজশেখরের আঁকা স্কেচ থেকে যতীন্দ্রকুমার ড্রয়িং ও ফিনিশ করেন।

তা ছাড়া, 'ধুস্তুরি মায়া,' 'গড্ডালিকা', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' প্রভৃতি তাঁর পুস্তকের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন রাজশেখরের নিজের হাতের কাজ।

তাঁর স্বহস্ত অঙ্কিত একটি প্রতিকৃতি চিত্রের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। তা হ'ল তাঁর পিতা চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের পেনসিলে আঁকা ছবি। শিল্পী-যতীন্দ্রকুমারের মতে, এই ছবিখানি রাজশেখরের একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম।

অনেক ছবির আইডিয়া এবং দৃষ্টান্ত তিনি যতীন্দ্রকুমারকে বাস্তব সংস্করণ থেকে দেখিয়ে দিতেন, এমন শিল্পীর চোখ তাঁর ছিল—এবং সেন মহাশয় সেই অনুসারে ড্রয়িং করতেন। যেমন, 'চিকিৎসা সঙ্কটে'র এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার, হকিম, কবিরাজ এবং বিপুলা মল্লিক। মিস বিপুলার মডেলটি ছিলেন পার্শী বাগানের বাড়ীর নিকটবর্তী এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী সেই মহিলাটির ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক হাবভাব পার্শী বাগানের বাড়ীর দোতলার বারান্দা থেকে লক্ষ্য করে যতীন্দ্রকুমারকে বিপুলার ছবি সেইরকম আঁকতে বলেন। 'কচি সংসদে'র কয়েকটি কচি তাঁর দেখা চরিত্র—যতীন্দ্রকুমার আঁকবার সময় তাদের বর্ণনা করতেন। নকুড় মামার মতন একটি লোককে একবার দার্জিলিঙে থাকতে শীতের রাতে প্রায়ই দেখতেন ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে। 'জাবালি'র আদর্শও পার্শী বাগান স্ট্রীট দিয়ে যাতায়াতকারী শ্মশ্রুগুম্ফ-সমাকীর্ণ জনৈক ব্রাহ্ম অধ্যাপক। যতীন্দ্রকুমারকে 'স্বয়ংবরা'র কেদার চাটুজ্যে আঁকবার সময় রাস্তার একটি লোককে দেখিয়ে বলেছিলেন—'ওইরকম খোঁচা খোঁচা দাড়ি আধ-বুড়ো লোকের ছবি কোরো।'

এইভাবে তার অনেক গল্পের চরিত্র-নকশা বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া। যথার্থ শিল্পীর চোখ ছিল রাজশেখরের। কারুর অবয়বে কিংবা ভাবভঙ্গিতে কোন অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখলেই আকৃষ্ট হতেন। হয় নিজে তার নকশা আঁকতেন, নচেৎ যতীন্দ্রকুমারকে স্কেচ করতে বলতেন। পার্শী বাগানের বাড়ীর দীর্ঘ বারান্দায় অবসরকালে বসে বসে এমনিভাবে রাস্তার লোকদের উপর দৃষ্টিপাত করে টাইপ নির্বাচন ও সংগ্রহ করতেন তিনি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন, প্রচার ইত্যাদির কাজেও শিল্পী রাজশেখরের পরিচয় প্রকাশ পেত। অনেক লেবল্, বিজ্ঞাপনের নানা পরিকল্পনা তিনি করতেন, আঁকতেন অবশ্য যতীন্দ্রকুমার। তাঁকে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচারশিল্পের কাজের একজন শিক্ষাদাতাও বলা যায়। কমার্সিয়াল আর্টের প্রখ্যাত শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন এ বিষয়ে রাজশেখরের কাছে ঋণের কথা সানন্দচিত্তে স্মরণ করেন। যতীন্দ্রকুমারকে তিনি যখন প্রথম বেঙ্গল কেমিক্যালে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ছবি আঁকবার কাজ দিয়েছিলেন, সেন মহাশয়ের তখন সে সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। বিশেষ অক্ষর লেখা, যা এই শিল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজ। রাজশেখরই তখন তাঁকে অক্ষর লেখা, লেবল্ আঁকা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নির্দেশ দিতেন। যতীন্দ্রকুমারের তুল্য সুনিপুণ শিল্পী সেজন্যে তাঁকে মান্য করেন গুরু বলে। রাজশেখরের হাতের অক্ষর রচনার নিদর্শন বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম যুগের কোন কোন লেবলে সেই সূত্রে দেখতে পাওয়া যেত।

ছবির প্রসঙ্গে ঈষৎ অবান্তর হলেও জানিয়ে রাখা যায় যে, 'কচি সংসদে'র কথক কেষ্ট-পদের ইণ্টারভিউয়ের বিচারক ব্যক্তিটি এবং 'লম্বকর্ণ' গল্পের রায় বাহাদুর বংশলোচনের চিত্র স্বয়ং রাজশেখরের। এ ছবির প্রথম স্কেচ অবশ্য তাঁর নয়, পুরোপুরি যতীন্দ্রকুমারের কাজ। রসস্রষ্টার প্রতিকৃতিও অমর করে রাখবার জন্যে শিল্পীর এই সশ্রদ্ধ ও সার্থক প্রয়াস। আরো একটি কথাও প্রসঙ্গত বলা উচিত যে, 'কচি সংসদে'র উক্ত কথক মহাশয়ের পত্নীর চিত্রটি—যাঁর 'হোয়াট হোয়াট হোয়াট' নামে একটি ছবি আছে গল্পের মধ্যে—রাজশেখরেরই সহধর্মিনীর। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সস্ত্রীক রাজশেখরের চিত্র পরিবেশন করে চিরজীবী রেখেছেন গল্পের সঙ্গে।

চিত্রশিল্পীরূপে রাজশেখরের আর কোন পরিচয় তাঁর কন্যার অকাল মৃত্যুর পর থেকে আর পাওয়া যায় না। একমাত্র কন্যাকে হারাবার পর থেকে তিনি ছবি আঁকা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানী

শুধু কর্মজীবনেই যে রাজশেখর বিজ্ঞানী ছিলেন তা নয়। কলেজ জীবন থেকেই তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র। তাঁদের কালে এম. এস-সি. ডিগ্রী ছিল না, তিনি এম. এ. পাস করেছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে। রসায়ন শাস্ত্রে সেই উচ্চতম পরীক্ষায় তিনি প্রথম

হয়েছিলেন। তার আগে বি. এ. তেও তাঁর পাঠ্য-বিষয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ছিল এবং দু'টিতেই অনার্স-সহ বি. এ. পাস করেন তিনি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্মজীবনেই রাজশেখরের বিজ্ঞানীরূপে শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পায়। সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক নানা কাজ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করলেও আসলে তিনি technical man, বিজ্ঞানী। ক্রিয়াবিদ রাসায়নিক। ছাত্রজীবনে রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চায় অভিজ্ঞতার জন্যে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে যোগ্য বলে বিবেচিত হন। রাসায়নিক বলেই তাঁকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু এবং সেই হিসাবেই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ম গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা সম্ভবত উঠত না তিনি বিজ্ঞানের সেবক না হলে।

সুদীর্ঘকাল ধরে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ও ব্যাপারিক সাফল্য বিজ্ঞানী রাজশেখরের চূড়ান্ত কৃতিত্ব। এখানকার কর্মে আত্মনিমগ্ন থাকবার সময় তিনি 'গড্ডালিকা' ইত্যাদি রচনার জন্যে অসামান্য যশ ও রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন অর্জন করেন, তখন প্রফুল্লচন্দ্র ভীত হয়েছিলেন যে, রাজশেখর হয়ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ত্যাগ করে সাহিত্য-মার্গের পথিক হবেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ দানের জন্যে রাজশেখর সাহিত্যক্ষেত্রে আকৃষ্ট হতে পারেন এই আশঙ্কায় প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পত্রাঘাত করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে যে তার উত্তর দিয়েছিলেন তা রাজশেখরের জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়। বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য—কোন্‌টি তিনি জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করবেন, এমন একটি প্রশ্ন যেন তখন দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু এই দুই প্রশ্নে কোন বিবাদ তাঁর জীবনে বাধে নি। তিনি তথাকথিত দু'টি বিরোধী মানস ও সাধনের চমৎকার সমন্বয় সাধন করে নিয়েছিলেন তাঁর অপূর্ব প্রতিভায়। বহিরঙ্গ জীবনে ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং অন্তরঙ্গ জীবনে সাহিত্যচর্চা। এইভাবেই জীবনের যুগ্ম কর্মক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিলেন। তাঁর বিরাট প্রতিভার দ্বিবিধ ফলশ্রুতিতে প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আশ্বস্ত হয়েছিলেন মনে হয়। অন্তত তাঁদের নিরাশ করেন নি রাজশেখর।

বিস্তারিত রবীন্দ্রজীবনী রচনার জন্যে খ্যাতিমান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে তাঁর 'শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী' গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন যে রাজশেখরকে শান্তিনিকেতনে সংযুক্ত করবার ইচ্ছা একসময়ে রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল।...

সে যা হোক, বেঙ্গল কেমিক্যাল ভিন্নও রাজশেখরের বিজ্ঞানচর্চার আরো কিছু ফলিত নিদর্শন আছে, যা থেকে তাঁর ব্যবহারিক বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হাতে-কলমে যে ক'টি জিনিষ প্রস্তুত করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল :

Ignus Stove। তাঁর দ্বারা প্রস্তুত এই ষ্টোভটি একসময়ে অনেক বাড়িতে ব্যবহার করা হ'ত। বেঙ্গল কেমিক্যালের উৎপন্ন বস্তু রূপে এটি বাজারে প্রচলিত হয়েছিল অতি সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে পিতলের অভাবে এই ষ্টোভের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এর নামকরণও করেন রাজশেখর। Ignition অর্থাৎ প্রজ্বলন থেকে এই নাম হয় নি। সংস্কৃত শব্দ ইগ্‌নাস মানে অগ্নি, সেই অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

Idolep ও Borolep এই দু'টি মালিশের ওষুধ এবং Rodofen দাঁতের মাজন তাঁরই ফরমুলা থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রস্তুত। তিনি অবশ্য বিলাতী অনুকরণে এইসব ফরমুলা তৈরী করেছিলেন। এসব নামও তাঁরই বিশিষ্ট পদ্ধতিতে দেওয়া Lep শব্দটি ইংরেজী নয়—লেপন এই অর্থে সংক্ষেপ করে প্রযুক্ত হয়েছে। Rodofen কথাটিও ইংরেজী হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। সংস্কৃত শব্দ রদ অর্থে দাঁত এবং fen ফেনা। বেঙ্গল কেমিক্যালে উৎপন্ন অনেক দ্রব্যাদির নামকরণ এইভাবে রাজশেখর বাংলা ইংরেজীর মিশ্রণে করেন।

বিজ্ঞানকে তাঁর ঘরোয়াভাবে প্রয়োগেরও অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্য নয় এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এইসবের মধ্যেও এমন জিনিষ একাধিক ছিল যা কারখানায় প্রস্তুত হয়ে ট্রেড মার্ক ধারণ করে বাজারে বিক্রীত হ'তে পারত। সেসব তিনি ব্যক্তিগতভাবে খেয়ালখুসিতে তৈরী করলেও রীতিমত বিজ্ঞানীর কর্ম। যথা :

Hot Air Fan। যন্ত্রটির মধ্যে যে কেরসিন ল্যাম্প প্রজ্বলিত হ'ত তা থেকে উৎপন্ন গ্যাসে এই পাখা চালিত হ'ত। এই টেবল্ ফ্যানের পাখাও তিনি সেলুলয়েড থেকে নিজের হাতে তৈরী করেন। আদ্যোপান্ত বহস্তে প্রস্তুত এই যন্ত্র commercial

scale-এ উৎপাদন করবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। নানা কারণে তা ঘটে নি। এই বস্তুটির তিনি নাম দিয়েছিলেন Aero Krit. Krit কথাটি কিন্তু ইংরেজী নয়—সংস্কৃত কৃৎ রোমান হরফে লেখা। Aero Krit অর্থাৎ হাওয়া করে।

Barometer। আবহাওয়ার চাপ পরিমাপের এই যন্ত্রটি তিনি স্বহস্তে coil থেকে তৈরী করেছিলেন। এ ব্যারোমিটার এখনো তাঁর বকুল বাগানের বাড়িতে আছে সচল অবস্থায়।

Air Brush। এই ধাতব কলমটি তিনি container pump ইত্যাদি সমেত প্রস্তুত করেন ফটোগ্রাফির কাজের জন্যে এবং ফিনিশিংএ রঙ্ দেবার কাজে ব্যবহার করবার জন্যে যতীন্দ্রকুমার সেনকে (তিনি একজন উৎকৃষ্ট ও পেশাদার ফটোগ্রাফারও ছিলেন অনেকদিন) দেন। এমনি air brush রাজশেখর তিনটি তৈরী করেছিলেন। একটি দিয়েছিলেন যতীন্দ্রকুমারকে এবং বাকি দু'টি বিক্রয় ক'রে দেন ৫০ টাকা হিসাবে।

বাংলা মুদ্রণ-যন্ত্রশিল্পে যুগান্তর এনেছে যে লাইনো টাইপের ব্যবহার, তার উদ্‌ভাবন ও প্রচলনে আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে রাজশেখর technical সাহায্য করেছিলেন। এজন্যেও বিজ্ঞানী রাজশেখর স্মরণীয়। সুরেশচন্দ্রের লাইনো টাইপ প্রবর্তনের প্রথম থেকেই রাজশেখরের সক্রিয় যোগ ছিল। রাজশেখরকে সুরেশচন্দ্র বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং তার সঙ্গে অনেক পরামর্শও করেন এ বিষয়ে। তাঁর লাইনো টাইপ প্রস্তুত করার কাজে যান্ত্রিক দিকটিতে রাজশেখরের মূল্যবান সহায়তা পেয়েছিলেন। কিভাবে লাইনো টাইপ গঠন করা যায় এ প্রসঙ্গে রাজশেখর তাঁকে বলেন, 'বাংলা অক্ষরের ছাঁদের সংস্কার করতে হবে, তা হ'লে লাইনো টাইপ সফল হ'তে পারে।'

একেবারে জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় পয়েন্টের মাপ-জোক ক'রে রাজশেখর নির্দেশ দেন এবং যতীন্দ্রকুমার সেই অনুসারে গ্রাফ্ পেপারে ড্রইং করেন নতুন ছাঁদ বড় বড় অক্ষরে। তাই থেকে reduce করে লাইনোর অক্ষরের রূপ গঠিত হয়।

সুরেশচন্দ্র প্রথমে লাইনো টাইপ প্রস্তুত করে ব্যবহার করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন রাজশেখর তাঁকে সাহায্য করেন উক্ত প্রকারে। রাজশেখরকে সুরেশচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, টাইপ বড় বেশি ভেঙে যাচ্ছে। তখন রাজশেখর ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখলেন যে, বাংলা হরফের ছাঁদ সব সমান নেই। তারপর তিনি নতুন মাপ-জোক করে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মাপ স্থির করলেন এবং সেই পরিমাপের হিসাবে ডিজাইন প্রস্তুত করালেন যতীন্দ্রকে দিয়ে। সেই সুষম (uniform) মাপের টাইপ থেকে সুরেশচন্দ্র পরে যখন নতুন লাইনো তৈরী করলেন, তখন আর বেশি অপচয় হ'ত না।···

বিজ্ঞানী রাজশেখরের আর একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিধৃত আছে তাঁর প্রণীত 'ভারতের খনিজ' এবং 'কুটির শিল্প' নামে দু'টি পুস্তিকায়। এই দু'টি সংক্ষিপ্ত বই, বিশেষে 'ভারতের খনিজ' বিজ্ঞানে নানা বিভাগে তাঁর অধিকার চিহ্নিত রেখেছে। তাঁর বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয় এবং পুস্তিকা দু'টি থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞানকে তিনি সর্বতোভাবে প্রয়োগ করবার জন্যে চিন্তা ও কাজ করতেন দেশের উন্নতির জন্যে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিল।

বিভিন্ন রঙ তিনি প্রস্তুত করতে পারতেন এবং বাড়ীতে তা করেও ছিলেন। একবার নিজের তৈরি নানা রকম রঙ তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন ছবি আঁকবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ সেই সব রঙে অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন এবং রাজশেখর একবার সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলে তাঁদের তার মধ্যে থেকে দু'খানি ছবি প্রত্যুপহার দিয়েছিলেন। রাজশেখরের স্বহস্তে প্রস্তুত সেই রঙে আঁকা রবীন্দ্রনাথের হাতের সেই ছবি দু'টি তাঁর বকুল বাগানের বাড়ীতে রক্ষিত আছে তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির স্মৃতি স্বরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। এত শ্রদ্ধা তিনি আর কোন ব্যক্তিকে করতেন কি না সন্দেহ।

বিজ্ঞানী রাজশেখরের কিছু কিছু পরিচয়, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের অনেক উল্লেখ সাহিত্যিক রাজশেখরের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অনেক গল্পের মধ্যেও—বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বা পুস্তিকা ছাড়া—সেই সব নিদর্শন আছে। যদিও তা সবই প্রায় হাসি তামাসাচ্ছলে বর্ণনা করা, তা হলেও রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী ভিন্ন তেমন উক্তি করা অসম্ভব। 'বিরিঞ্চিবাবা'র প্রফেসর ননীর সেই "প্রোটিন সিন্থেসিস হচ্ছে। ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো অ্যামিনো গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস।" কিংবা "কি রকম

ধোঁয়া? যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড এণ্ড তামা, যদি বেগনী চাও তবে আয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও…" ইত্যাদি কোন অবৈজ্ঞানিকের দ্বারা লেখা সম্ভব হ'ত না। তাঁর কয়েকটি গল্পে এমনি বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে সরস প্রসঙ্গ আছে, অধিক উদ্ধৃত বাহুল্য। 'গগন চটি' গল্পে তাঁর আকাশ ও নক্ষত্র বিদ্যার পরিচয় পরিস্ফুট আছে।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীরূপেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল নানামুখী। বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি বিভাগে তাঁর অন্তরঙ্গ জ্ঞান ছিল, শুধু পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যায় নয়।

আর একদিক থেকেও বলা যায় যে, তাঁর বিজ্ঞানী মনের প্রভাব সমগ্রভাবে তাঁর সৃষ্ট মৌলিক সাহিত্যে ওপরেও পড়েছিল। তাঁর নিরাবেগ, নিরুচ্ছ্বাস matter of fact বর্ণনা, ভাবালুতা-বর্জিত রচনা, অযৌক্তিক সমস্ত কিছু বিশেষ ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি মারাত্মক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—এ সমস্তই তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্বার স্বকীয় প্রকাশ। রস-সাহিত্যকার রাজশেখরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত আছেন বিজ্ঞানী রাজশেখর। কি কর্মজীবনে, কি সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর এই সত্বা অবিচ্ছেদ্য।

(ক্রমশঃ

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ'

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দেহে তুমি বাঁধা ছিলে মাতঃ পুণ্যবতী!
আজ তুমি কোন্ স্বর্গে করিছ বসতি?
কোন্ মন্দাকিনী-তীরে? কোন্ সিন্ধু-পারে?
নিঃশেষে ফুরায়ে যাই মৃত্যুর আঁধারে?
অথবা ধূলির দেহ হয় ধূলিময়?
আসল মানবসত্বা—সে কি বেঁচে রয়?
এই মহাজিজ্ঞাসার বহ্নি-জ্বালা বুকে,
নচিকেতা, একদিন যমের সম্মুখে
দাঁড়াইলে তুমি জ্ঞান-তৃষ্ণায় আতুর!
জানিতে চাহিয়াছিলে রহস্য মৃত্যুর!
আর কিছু চাহ নাই। সেই বীর্য্য হোতে
এলো জয়! অন্ধকার মরিল আলোতে!
জ্যোতির সমুদ্রতীরে, ঋষির নন্দন,
ঘোষিলে—ভঙ্গুর দেহ; আত্মা চিরন্তন!

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সময় হয়েছে এবার

অনেকে বলিতেছেন, আগামী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে 'সংগ্রামী' কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী-প্রতীক (symbol?) এবার পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এবং এই পরিবর্ত্তন করা উচিত—ক্লান্ত "জোড়া-বলদ" দু'টিকে বিশ্রাম দিয়া "কামরাজ-অতুল্য" করিলে শোভন-সুন্দর এবং যথাযথ হইবে। এই পরিবর্ত্তনে জোড়া-বলদের মর্ম্মটুকু বজায় থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান কংগ্রেসের ধর্ম্মও রক্ষা পাইবে। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই দেখা যাইতেছে কংগ্রেসী সরকারের, (কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য) প্রায় সকল প্রশাসনিক ব্যাপারেই শ্রীকামরাজ এবং 'তস্য ভ্রাতা' শ্রীঅতুল্য—ক্ষমতা প্রয়োগ তথা হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এমন কি বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রীও, বলিতে গেলে, শ্রীকামরাজের প্রায় আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িতেছেন ক্রমে ক্রমে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন, 'দাদা' হইয়াও 'অনুজ' শ্রীঅতুল্যের পরামর্শ এবং বিধান ছাড়া এক পা-ও চলিতে পারেন না! শ্রীঅতুল্যের পুণ্য জন্ম-তিথিতে যে-ভাবে এবং যে ভাষায় শ্রীসেন শ্রীঅতুল্যের 'প্রশস্তি তুস্তি' একটি 'বহুল-প্রচারিত' দৈনিকে প্রকাশ করেন, তাহাতে কেবল আমরাই নহি, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কৃতার্থ বোধ করিবে। এই প্রকার প্রশস্তি-তুস্তি স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের ভাগ্যেও বোধ হয় জুটে নাই। বহুকাল পূর্ব্বে, আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গলার এই দুইজন যুগ-পুরুষকে যে অবস্থায় দেখিয়াছি, যে ভাবে কংগ্রেসের কার্য্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাইসাইকেল চালাইয়া ঘুরিতে দেখিয়াছি, সেই যুগের এই দুইটি অতি সাধারণ মানুষ কোন্ মন্ত্রবলে, কোন্ অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে আজ এমন অসামান্য হইয়া উঠিলেন, তাহা আমাদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব।

বর্ত্তমান বাঙ্গলার ভাবগতিক এবং চাল-চলনে মনে হইতেছে, আমরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বিপিন পাল, অশ্বিনীকুমার, রামানন্দ, তথা বিগত বাঙ্গলার সকল মহামানবের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। দেশের ইতিহাসের পাতা আজ উল্টাইয়া গিয়াছে এবং অন্ধকার ইতিহাসের পাতায় যে-সকল নাম লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পাওয়া যাইবে শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্ল সেন, ডঃ (?) প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, শ্রীঅমুক ঘোষ, শ্রীতমুক মুখোপাধ্যায়, এবং সর্ব্বশ্রী রামা, শ্যামা, হরে, গোবা, যেদো, মেধোব গৌরব-দীপ্ত এবং দেশের কারণে সর্ব্বস্বত্যাগীদের বহুত বহুত নামের বাহার! সব কিছু দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—"সেই বাঙ্গলা? এই বাঙ্গলা? হায় বাঙ্গলা!!!"

কংগ্রেসী যে সংগ্রামী 'সাধকগুষ্টি' আজ আমাদের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য দেহমনপাত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ভগবান বুদ্ধ অপেক্ষাও বড়, এবং মহৎ। ভগবান বুদ্ধ কেবলমাত্র বলেন নির্ব্বাণের কথা, কিন্তু একটা সমগ্র জাতিকে কোন্ পথে, কি ভাবে সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করাইয়া নির্ব্বানের পথে প্রেরণ করিয়া পরম মোক্ষ দান করা যাইতে পারে, বুদ্ধের সামান্য বুদ্ধিতে তাহা আসে নাই, তিনি নিজের সব কিছু ত্যাগ করিয়া পরম স্বার্থপরের মত আত্ম-নির্ব্বাণ-ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এই নব বুদ্ধের (বুদ্ধ বলিব না ইচ্ছা থাকিলেও) দল দেখাইতেছেন নবতর ত্যাগের পথ—গ্রহণের মধ্য দিয়া। পার্থিব সকল প্রকার বিত্ত-বৈভবের সকল বিষ তাঁহারা মহাদেবের মত পান করিয়া দেশ এবং জাতিকে বিশুদ্ধ নির্ব্বাণের পথে প্রেরণ করিয়া—পরম মোক্ষের সঙ্গে চিরশান্তি দিবার সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন। অতএব—হে বাঙ্গালী জাতি, (অপ-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যদি অমৃতের আস্বাদ

পাইতে চাও, অনিত্য মানবজীবনের পরিবর্ত্তে যদি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে চাও—তাহা হইলে আর একবার, হয়ত শেষ বারের মত—"জোট কর কংগ্রেস !"

পশ্চিমবঙ্গে হরতাল 'ঠিকুজী'

বিগত ১৬ বৎসরে এ-রাজ্যে হরতাল (১৯৫০ হইতে) হয়—

১৯৫০, ২৫ ফেব্রুয়ারী : পূর্ব্ববঙ্গে সংখ্যালঘু নির্য্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল।

১৯৫১, ২১ এপ্রিল : কোচবিহারে গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে হরতাল।

১৯৫২, ৭ মে : রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে হরতাল।

১৬ জুলাই : খাদ্যনীতির প্রতিবাদে হরতাল।

১৯৫৩, ২৩ জুন : কাশ্মীরে বন্দীদশায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ বাংলায় হরতাল ও শোক।

৪ জুলাই : ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল।

১৫ জুলাই : ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থনে ও পুলিশ নির্য্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল ও ধর্ম্মঘট।

১৯৫৪, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের সমর্থনে রাজ্যব্যাপী হরতাল।

১৯৫৫, ১৭ আগস্ট : গোয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সর্ব্বাত্মক হরতাল।

১৯৫৬, ২১ জানুয়ারি : রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে রাজ্যের সর্ব্বত্র হরতাল।

২৪ ফেব্রুয়ারি : পঃ বঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তির প্রতিবাদে হরতাল ও ধর্ম্মঘট।

৭ জুলাই : ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে হরতাল।

১৯৫৭, ৩০ মে : কেন্দ্রীয় সরকারের করবৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল।

১৯৫৯, ২৫ জুন : খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল। আগস্ট মাসে প্রতিরোধ আন্দোলনের ব্যাপারে ব্যাপক হাঙ্গামা।

৩ সেপ্টেম্বর : খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল ও হাঙ্গামা।

১৯৬০, ১৪ জুলাই : কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের সমর্থনে সর্ব্বাত্মক হরতাল।

১৬ জুলাই : আসামে বাঙালী নির্য্যাতনের প্রতিবাদে সর্ব্বাত্মক হরতাল। শোকার্ত্ত বাংলার স্তব্ধ সংযত প্রতিবাদ।

২০ ডিসেম্বর : বেরুবাড়ি হস্তান্তরের প্রতিবাদে সর্ব্বাত্মক হরতাল।

১৯৬১, ২৭ মে : শিলচরে ১১ জন বাঙালী সত্যাগ্রহীকে হত্যার প্রতিবাদে কলিকাতায় সর্ব্বাত্মক হরতাল। পরে মৌন মিছিল।

১৯৬৩, ২৪ সেপ্টেম্বর : খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল ও ধর্ম্মঘট।

১৯৬৪, ১৭ মার্চ্চ : পূর্ব্ববঙ্গের অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও ভারতে পুনর্ব্বাসনের দাবিতে হরতাল।

২০ মে : খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতায় হরতাল।

১৯৬৫, ৩০ জুলাই : ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতায় হরতাল। নববারাকপুর ও গোবরায় পুলিশের গুলী। ৪ জন নিহত।

৫ আগস্ট : ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী হরতাল ও ধর্ম্মঘট।

১৯৬৬, ১০ মার্চ্চ : পুলিশের গুলীতে নিহতদের বিচার বিভাগীয় তদন্তের ও রেশনের দাবিতে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী 'বাংলা বন্ধ'। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হাঙ্গামা। অন্তত ৩৭ জন নিহত।

৬ এপ্রিল : আবার ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী বাংলা বন্ধ।

১৯৫০ হইতে যতগুলি হরতাল এ-রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় ইতিপূর্ব্বে—তাহার মধ্যে ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল (নূতন নাম 'বন্ধ'!) এইবারই প্রথম হইল—গত ২২ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—'হরতাল' কথাটি গুজরাটি—যাহার অর্থ জনগণের সর্ব্বপ্রকার কাজ-কর্ম্ম, আপিস, দোকান,

কল-কারখানা সবই বন্ধ করা। আমাদের দেশে প্রথম হরতাল হয় ১৯১৯ সালে---Criminal Law Amendment Act-এর প্রতিবাদে।

ইহার পর বোধ হয় ১৯২০।২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে ইনি সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড হয়েন) কলিকাতা আগমন উপলক্ষে। এই হরতালে কলিকাতার প্রায় সকল রাস্তার আলোগুলি নির্ব্বাপিত এবং রাজপথ গুলির উপর নানা প্রকার রোড ব্লকও (road block) সৃষ্টি করা হয়। অন্ধকার রাত্রে কলিকাতার সে এক ভীষণ অবস্থা—চারিদিক অন্ধকারের ভয়াবহ রাজত্ব।

বারো ঘণ্টার হরতাল—ক্রমে ৪৮ ঘণ্টায় দাঁড়াইয়াছে। এইবার, হয়ত সাত দিনব্যাপী হরতাল অর্থাৎ 'বন্ধ' ঘোষিত হইবে পশ্চিমবঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এবং সেই প্রকার একটি হুমকিও ঝুলিতেছে। সাত দিনের হরতাল যদি সত্যসত্যই ঘোষিত এবং প্রতিপালিত হয়—তাহার অর্থ হইবে---কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাণধারা কেবল ব্যাহতই নহে—অচল হইয়া ভারতের অন্য অঞ্চলের সহিত (এই সাত দিন) কোন যোগাযোগই থাকিবে না। ইহা ঘটিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণবায়ুও মহাশূন্যে বিলীন হইবে।

প্রতিবারেই দেখা যায় হরতাল নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইবার পরই রাজ্য সরকার তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহাদের পুলিশি এবং অন্যান্য প্রকার (কঠোর) প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে তাহাদের স্বাভাবিক এবং দৈনিক কার্য্যাদি চালাইয়া যাইবার জন্য সকরুণ কাকুতিও প্রকারান্তরে জানান হয়। জনজীবন এবং সরকারী-বেসরকারী কোন প্রকার 'রুটিন-ওয়ার্ক' যাহাতে ব্যাহত না হয়, রাজ্য সরকার বাহাদুর তাহার কাগজী ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি রাখেন না। কিন্তু কার্য্য-কালে অর্থাৎ হরতালের দিন দেখা যায় যে—সরকারী সকল প্রকার কাগজী ব্যবস্থা এবং 'আর্ম্মড্' পুলিস এবং ফৌজ রাস্তার মোড়ে মোড়ে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও—পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে—কোন মানুষেরই দেখা পাওয়া যায় না—দু'-চারজন দর্শক পথচারী ছাড়া! সরকারী নিরাপত্তার আশ্বাস সত্ত্বেও মানুষ---ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়—যে কোন কারণেই হউক 'হরতালের' ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হয়। কেন? কারণ জনসাধারণ সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন আস্থা রাখিতে নারাজ। অন্যদিকে, জনগণ হরতালীদের হুমকিতে পূর্ণ আস্থাবান অর্থাৎ ভীত। সোজা কথায়—হরতালের দিন কিংবা দিনগুলিতে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে সরকারী শাসন বন্ধ থাকে এবং তাহার বদলে চলে 'উল্‌ফ'দের (ULF) পূর্ণ প্রশাসন! এই ভাবে চলিতে থাকিলে সরকারী কার্য্য এবং শাসন ব্যবস্থা 'সাময়িক' বেকারত্ব হইতে হঠাৎ একদিন দেখা যাইবে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণ বেকারত্ব লাভ হইয়াছে।

রাজ্য সরকার যদি সত্য সত্যই শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে বামপন্থী হুমকিতে বাস, ট্রাম, লোকাল ট্রেণ সার্ভিস-হরতালের দিন বন্ধ না রাখিয়া—সজোরে এবং ঘন ঘন চালাইবার ব্যবস্থা কার্য্যকর করিয়া হরতালীদের সহিত 'সড়ক—যুদ্ধে' অবতীর্ণ হউন—আমাদের দেখাইয়া দিন সরকার সত্যই শক্তিধর এবং প্রজারক্ষক॥

কৃষির উন্নতি

এ রাজ্যের কৃষি দপ্তর চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন—কারণ উপযুক্ত সারের অভাবে কেবলমাত্র উন্নত ধরণের বীজ বপনে কোন লাভই হইবে না। রাজ্য সরকার স্থির করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের ২০ লক্ষ একর (৬০ লক্ষ বিঘা) জমিতে 'তাইচুং', 'তাইওয়ান্' এবং 'কালিম্পং' ধানের বীজ বপন করিবেন। প্রথমোক্ত দুইটি ধানের বীজে একর-প্রতি ৬০ মণ করিয়া ধান হইতে পারে—এখন যেখানে হয় ১৬ হইতে ১৮ মণ মাত্র। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে—সারা বৎসর সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা এবং পর্য্যাপ্ত এবং উপযুক্ত সারের উপর। বর্ত্তমানে এ-রাজ্যের ১ কোটি ৩৪ লক্ষ একর জমির মধ্যে মাত্র ৩৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে—মধ্যে মধ্যে ইহাতেও ব্যাঘাত ঘটে। মাত্র ২০ লক্ষ একর জমিতে সারা বৎসর প্রায় কাজচলা গোছের সেচের ব্যবস্থা হয়।

এবার দেখুন ২০ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধরণের ধানের বীজ বপন করিয়া যথাযথ ফললাভ করিতে হইলে সার লাগিবে কি পরিমাণ:

১। ৫ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট,

২। ২॥ „ „ সুপার ফস্ফেট

৩। ১০ „ „ পটাস

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদন, নিবেদন এবং কাতর ক্রন্দনের ফলে এ-রাজ্য পায় কত পরিমাণে, কি সার,—প্রতি বৎসর—

১। ১ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট

২। ২০ হাজার টন সুপার ফসফেট

৩। ১৫ হাজার টন পটাস (!!)

এবার কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশেই উন্নত ধরণের বীজ বপনের ফতোয়া দিয়াছেন। চলতি খরিফ মরশুমেই সমগ্র ভারতে ২৫ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে এই উন্নত বীজ লাগাইবার প্রস্তাব আছে। এবং ইহার জন্য দেশে অতিরিক্ত সারের চাহিদাও অবশ্যই হইবে আশামত ফললাভের আশায়। উন্নত বীজ যে সকল জমিতে রোপণ করা হইবে সেখানে একরপ্রতি জমিতে প্রয়োজন :

১০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন্

৫০ „ ফসফেট্

৫০ „ পটাস্

অথচ করুণাময় কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে এইবারে সার দিবার (দান নহে, রীতিমত কানকাটা মূল্যের বদলে) কোন কথা এখন পর্যন্ত বলিবার অবকাশ লাভ করেন নাই! কবে হইবে তাহারও কোন আভাস পাওয়া যায় নাই।

অথচ অন্যদিকে দেখুন 'স্বাধীন' ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির পক্ষ হইতে অতিরিক্ত সারপ্রাপ্তির (কেন্দ্র হইতে) ব্যাপারে কোন অভিযোগ নাই—অর্থাৎ প্রয়োজনমত সার তাহারা কেন্দ্র করুণা-ভাণ্ডার হইতে যথাযথ এবং যথানিয়মে পাইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে পরিকল্পনা কমিশনের কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধিসহ একটি দল বা টিম উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরলা, গুজরাট, এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যগুলিতে উন্নত বীজ বপনের ব্যবস্থাদি সরেজমিনে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং উক্ত সকল রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে পর্য্যবেক্ষক টিমকে বলা হয় যে সার ও বীজ পাইতে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইতেছে না! মনে হয় উপরি উক্ত টিম পোড়া পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দেখিতে আসেন নাই, কিংবা দেখার কোন প্রয়োজনও বোধ করেন নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এমন বিমাতাসুলভ কদাচরণ কেন করিতেছেন কে বলিবে। এমন কি এক লক্ষ পাঁচ হাজার একর জমিতে বীজধান উৎপন্ন করিবার জন্য যে উন্নত ধরণের বীজ প্রয়োজন, তাহাও সংগ্রহ করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। আর সারের কথা? এ রাজ্যের নিজস্ব সার-কারখানা স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত—আমাদের সারের অভাব দূর হইবার কোন আশাই নাই! এ-বিষয়েও কথা আছে, পশ্চিমবঙ্গে সারের কারখানা যদি কেন্দ্রশাসিত হয়, তাহা হইলে এ-রাজ্যের উৎপন্ন সার ভারতের অন্যত্র চালান হইতে কোন বাধার সৃষ্টি কেহই করিতে পারিবেন না!

১৯৬৩-৬৪ সালে এ-রাজ্যে ধান হয় ৫২ লক্ষ টন। ১৯৬৪।৬৫তে হয় ৫৬ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে ধানের মোট উৎপাদন মাত্র ৪৯ লক্ষ টনের মত হইবে আশা করা যাইতেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ৪র্থ পরিকল্পনার অন্তিম বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ৬৫ লক্ষ টনের বেশী ধান কোনক্রমেই হইবে না। অন্যদিকে ৪র্থ পরিকল্পনার শেষ বৎসরে এ-রাজ্যের জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটির মত দাঁড়াইবে এ-আশঙ্কাও রহিয়াছে!

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে—এমত অবস্থায় এ-রাজ্যে বিষম খাদ্য সমস্যার কিছু সমাধান করিতে হইলে—উপযুক্ত সার, উন্নত বীজ এবং একান্ত প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই—কিন্তু সে-উপায় কেন্দ্রীয় সরকারের করুণা-বারি ছাড়া হইবে কি?

ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি যেখানে কেন্দ্রীয় দীর্ঘ-কর্ণ মর্দ্দন করিয়া নিজেদের দাবি আদায় করিতেছেন, সেই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁহাদেরই শ্রীকর্ণ মর্দনের সকল সুযোগ এবং নিবিড় আনন্দ দিবার জন্য সদা প্রস্তুত রহিয়াছেন! অন্যান্য রাজ্য কেন্দ্রকে ধমক দিতে জানে প্রয়োজন মত—আর আমাদের রাজ্য সরকার সর্ব্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় ধমকানি হজম করিতেছেন অবলীলাক্রমে!

বঙ্গ-সম্রাট কি করিতেছেন? তিনি কি তাঁহার

'সংগ্রামী'-কংগ্রেসী পদাতিক বাহিনীকে লইয়া আগামী নির্ব্বাচন জয়ের নূতন কোন টেক্‌নিক্ অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত আছেন? আমাদের রাজ্য সরকার কি তাঁহাদের ক্লীবত্ব সাময়িক ভাবেও পরিহার করিয়া কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের সহিত একটা শেষ বুঝাপড়া করিতে ভয় পাইতেছেন? যাঁহাদের নিকট ভদ্রতা, শিষ্টাচারের কোন মূল্য নাই, তাঁহাদের কাছে ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার প্রদর্শন একমাত্র গো-মূর্খেরাই করিতে লজ্জা পায় না। কথায় বলে, 'যেমন……তেমনি মুগুর'। বর্ত্তমানে কেন্দ্রের সহিত বুঝাপড়ার ইহাই একমাত্র হাকিমি দাওয়াই।—

—"কেন্দ্রীয় করুণা কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে!"—

কেন্দ্রীয় করুণার পরম প্রকাশ—

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৬৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ (প্রস্তাব) করা হয়। (এই বরাদ্দে কলিকাতার উন্নয়ন বাবদ একান্ত প্রয়োজনীয় ১০০ কোটি ধরা হয় নাই।)—ইহার কিছুকাল পরে কেন্দ্রীয় দয়াময়দের নির্দ্দেশে (আদেশে) ৬৬৯ কোটি টাকা হইতে ৫১ কোটি টাকা ছাঁটিয়া ৬১৮ কোটি করা হইল! ইহাতেই এ-রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় দয়া-দাক্ষিণ্যের শেষ হইল বলিয়া কেহ কদাচ মনে করিবেন না। ইহার পর দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করনে—কেন্দ্র সরকার মাথা ঘামাইয়া (ঝামা—মাথার ঘাম পড়ে কি না জানা নাই) হঠাৎ টাকার মূল্যমান প্রায় ৫৭·৬ শতাংশ কমাইয়া দিলেন, যাহার ফলে দেশের তৎকালীন বিষম শোচনীয় আর্থিক অবস্থা আরো শতগুণ খারাপ হইয়া বাজারে দ্রব্যমূল্য আকাশ-ছোঁয়া হওয়ার ফলে জনগণের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য এই অবস্থা ক্রমবর্দ্ধমান এবং ইহার শেষ পরিণাম কি, কেহই বলিতে পারে না। দ্রব্যমূল্য আর কত উর্দ্ধে উঠিবে এবং সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থা আর কত নিচে যাইবে তাহাও বলা কঠিন, অসম্ভব।

এইবার পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা বরাদ্দ আরো কাটিয়া ৫৭০ কোটি করা হইল। অর্থাৎ দুইবারের দুই কোপে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ছাঁটা হইল! কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সদা-সদয় মন ইহাতেও তৃপ্ত হইল না—এবং খাঁড়ার তৃতীয় আঘাতে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে ৩১৮ কোটি টাকা! অর্থাৎ মূল বরাদ্দের প্রায় ৪০ ভাগই বাতিল হইল! এ-সংবাদ প্রকাশ পায় গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে। রাজ্য সরকার বলেন এই পরিমাণ অর্থে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পরিকল্পনা বেকার হইবে। তাঁহাদের মতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে এক তরফা সিদ্ধান্ত লইয়া এ-রাজ্যের বরাদ্দ ছাটিলেন, তাহা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ দাবি করে তাহা বহু বিবেচনার পর। প্রথমত এই রাজ্যে—

১। (কলিকাতা সহ) অন্যান্য রাজ্য আগত ৮০ লক্ষের মত লোক বসবাস করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যভাবে রুজি রোজগারের জন্য।

২। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত প্রায় ৫৫ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের আজ পর্য্যন্ত কোন প্রকার পুনর্বাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই—হয়ত ইচ্ছা নাই বলিয়াই।

৩। পূর্ব্ব পাকিস্তানের সংলগ্ন ১৩ শত মাইল দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বও পশ্চিমবঙ্গের স্কন্ধে!

৪। কলিকাতা বন্দর উন্নয়ন এবং গঙ্গার উপর কলিকাতার দ্বিতীয় ব্রীজ নির্মাণও একান্ত প্রয়োজন অবিলম্বে—ঐ-চারিটি ছাড়াও শিক্ষা-বিস্তার এবং অন্যান্য আরো বহু প্রকার জরুরী সমস্যার সমাধানও আশু প্রয়োজন।

উপরন্তু আছে কলিকাতার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, জল নিকাশের ব্যবস্থা (সি এম পি ও-র পরিকল্পনা মত) পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থের উপরে অতিরিক্ত অর্থের অবশ্য প্রয়োজন। এবং এই সবের জন্য রাজ্য সরকার বহু পূর্ব্বেই তাঁহাদের দাবি (ভিক্ষা?) পরিকল্পনা কমিশনের নিকট পেশ করেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশ:

প্লানিং কমিশন বোধ করি ধরিয়া লইয়াছেন, যোজনার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ আমিরী খয়রাতির সামিল। যাহাকে যাহা খুশি তাঁহারা দিবেন। তাঁহাদের মেজাজ শরিফ থাকিলে মিলিবে শিরোপা; দিল বেখুস হইলে জুটিবে পয়জার। পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ ঠিক করিবার সময় তাঁহাদের মেজাজ যে বেঠিক ছিল, তাহা

তাঁহাদের বিতরণ-ব্যবস্থাতেই প্রমাণ। নয়াদিল্লীর নেক-নজরে পশ্চিমবঙ্গ কোন দিনই পড়ে নাই, কাজেই খুদ-কুঁড়া ছাড়া তাহার পাতে অন্য কিছু কেমন করিয়া পড়িবে? আর শুধু খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে কেন? সারা বাংলা দেশের নসিবেই তো লেখা আছে দিল্লী এবং করাচির লাঞ্ছনা। বাদশাহী আমলে শাহানশাহের দল বঙ্গদেশকে নরককুণ্ড বলিয়াই মনে করিতেন, ভুলেও এই জাহান্নামের ধারে-কাছেও কেহই যাইতেন না…। দিল্লীর তখ্‌তে আজ যাহারা সমাসীন, সেই বাদশাহী মেজাজ তাঁহাদেরও পাইয়া বসিয়াছে।

হতবুদ্ধি বাঙ্গালী ভাবিতেছে তাহার অপরাধ কী? কসুর কোথায়? সেকালেও দিল্লীর নজরানা যোগাইতে বাঙ্গালী কুণ্ঠিত হয় নাই, একালেও নয়। তবু কেন এই নির্ম্মম বঞ্চনার আয়োজন? (বাঙ্গালি-অবাঙ্গালী) সকল বহিরাগতদের জন্য বাঙ্গালীর দরজা সর্ব্বদাই খোলা। অন্ততঃ আশী লক্ষ অন্য রাজ্যের অধিবাসী পশ্চিমবঙ্গে করিয়া খাইতেছে, বাঙ্গালী অনুদার হইয়া তাহাদের উপর কোনও দিন তাড়না করে নাই—যেমন অনেক রাজ্য প্রবাসী বাঙ্গালী সম্পর্কে করিয়াছে। গোটা দেশটাই বাঙালীর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতেছে। বন্দর কলিকাতা বন্দর হইতে কোটি কোটি টাকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি হইতেছে। তাহাতে নানা অঞ্চলের বিদেশী জিনিসের চাহিদা মিটিতেছে তো বটেই, প্রচুর টাকাও আমদানি হইতেছে ভারত সরকারের তহবিলে। বন্দর একমাত্র না হইলেও, প্রধান বন্দর নিঃসন্দেহে কলিকাতা। তাহার মুনাফা ভোগ করিতেছেন ভারত সরকারই এবং সারা দেশ। তবুও কেন কলিকাতা সম্পর্কে এমন নিষ্ঠুর অবহেলার ভাব—তাহাকে চিরবঞ্চিত রাখিবার এ অসঙ্গত প্রয়াস কেন?

দেশের স্বার্থে বাঙ্গলা দেশ করে নাই কী? করিতেছে না কী? জাতির মুক্তি-আন্দোলনে বাঙালী সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত আত্মবলি দিয়া দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়াছে। দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশের আর্থিক ক্ষতি যা হইয়াছে তাহার হিসাবনিকাশ না হয় নাই করিলাম, কিন্তু আজও যে কয়েক লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসনের দায় এই রাজ্যকেই বহিতে হইতেছে, সেটাও কী দর্ত্তব্যের মধ্যে নয়? দেশ-বিভাগের ফলে জাতি পাইয়াছে স্বাতন্ত্র্যের স্বাদ আর পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে মিলিয়াছে এক বিরাট আন্তর্জ্জাতিক সীমান্ত সন্নিধিজনিত অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয়কর যোগাইতেছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু প্রতিদানে পাইতেছে অবহেলা ও অবমাননা! আয়কর খাতে বাঙ্গলা হইতে যে টাকা কেন্দ্রীয় তহবিলে যায়, তাহা হইতে ন্যায্য ভাগ এ রাজ্যকে আজও দেওয়া হয় না। চরম ত্যাগ বাঙ্গালী স্বীকার করিয়াছে নিজেকে অন্ন হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিয়া। নিজে বুভুক্ষু থাকিয়া ধানের বদলে পাট চাষ করিতেছে বাঙ্গালী, যাহাতে জাতির সম্পদ বাড়ে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করা সম্ভব হয়।

এত করিয়াও নয়াদিল্লীর মন পশ্চিমবঙ্গ পায় নাই। বাঙ্গলাকে ন্যায্য প্রাপ্য দিতে রাজধানীর বুক কাটিয়া যায়!

আবেদন-নিবেদনে নয়াদিল্লীর পাষাণ-ফলকে কোনও দাগ পড়ে না। অন্তত বাংলা দেশ হইতে আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল। কী পশ্চিমবঙ্গ, কী কলিকাতা কাহারও প্রতি সুবিচার করিবার অভিপ্রায় নয়াদিল্লীতে কাহারও নাই। দেখা যাইতেছে সোজা আঙ্গুলে ঘি আর উঠিবে না। এবার পশ্চিমবঙ্গকে বাঁকা পথ ধরিতেই হইবে। নহিলে চতুর্থ যোজনার যে রূপরেখা রাজ্য সরকার তৈয়ারি করিয়াছেন সেটা একটা বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় থাকিবে না। কাজ হাসিল যদি করিতে হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের নীতিকে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে।

পাটচাষ একটা বিলাস; সেটা বর্জ্জন করা দরকার (পাট চাষ করে বাঙ্গলা আর বাঙ্গালী কিন্তু তাহার সব ফলটুকু ভোগ করিতেছে রাজস্থানী মালিকরা।) পাটকলের শ্রমিক শতকরা ৮০ জনই অবাঙ্গালী—কাজেই পাটচাষ বন্ধ করিয়া এগার লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ অবিলম্বে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য—ইহা ছাড়া পথ নাই। বাঙ্গলার উৎপাদিত পাট বিক্রয় করিয়া কেন্দ্র ১৭৫ কোটি টাকা আয় করেন এবং এই আয় হইতেই দিল্লীর মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং অন্যান্য বহু সরকারী এবং কেন্দ্রপ্রীতিভাজন মহাশয় ব্যক্তিদের বিদেশ ভ্রমণের বিলাস-ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। যাহাদের পরিশ্রমে এই আয় তাহারা হতাশ নয়নে কেবল রক্তহীন শীর্ণ আঙ্গুলই চুষিতে থাকে!

বাঙ্গলার এই দুর্দ্দিনে, হতাশার কালে, ভারতের তুলনাহীন দুইনম্বর মহানেতা নীরব কেন? বাঙ্গলার এই 'একদেশদর্শী' ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ কি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন?

আজ স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর কথা মনে পড়িতেছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি উভয় বাঙ্গলাকে সংযুক্ত থাকিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পরামর্শ দেন। বাঙ্গালী তখন তাঁহাকে পরিহাস করে এবং অদূরদর্শী বলিয়াও মনে করিয়াছিল। আজ দেখা যাইতেছে তিনি বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী মালিকদের প্রকৃত রূপ এবং চরিত্র মানসলোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বার আর সকলের জন্য অবারিত রাখা চলিবে কি? বাঁচিবার চেষ্টা বাঙ্গালীকে করিতেই হইবে। তাহাতে ভারত সরকারের আর্থিক কাঠামো যদি বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হয় ত বাঙালী নাচার।

কেন্দ্রীয় করুণা-প্রবাহের ধারা

কেন্দ্রীয়-বাদশাদের মনে কিছু করুণার সঞ্চার করা যায় কি না সেই চেষ্টা রাজ্য সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী (ইঁহাদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীও ছিলেন) দিল্লীতে দরবার করিতে যান, কিন্তু যতটুকু খবর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় মালিকগণ তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারীর আয় হইতে অনাথ ভিক্ষুক পশ্চিমবঙ্গকে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য মুষ্টিভিক্ষাও দিতে গররাজী! আমাদের প্রফুল্লবাবু এবং শৈলবাবু মুষ্টিভিক্ষার বদলে পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত খাইয়াই ঘরে ফিরিলেন! কেন্দ্রীয় জমিদারীর রাজকোষ হইতে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৩৮০ কোটি টাকার এক পয়সাও বেশী পাইবে না—সাফ জবাব মিলিয়াছে! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল মুখার্জ্জি দিল্লী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াই বলেন কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি 'অতি সহানুভূতি-শীল'। পরম আশাবাদী ইহাকেই বলে! তবে এখনও আশা পরিত্যাগ না করিয়া রাজ্য সরকার তাঁহাদের সকরুণ ভিক্ষার আপীল চালাইয়া যাইতেছেন—হয়ত বা বরাদ্দ টাকার উপর শেষ পর্য্যন্ত আরো দু-চার কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষার ঝুলিতে কেন্দ্র-করুণাময় দিলেও দিতে পারেন। এ-বিষয়ে 'যুগান্তরের' সহিত একমত হওয়া ছাড়া পথ নাই—

> এই বঞ্চনা অসহ্য লাগে যখন ভাবি আজকের ভারতের সমৃদ্ধি—যার ফল আজ দিল্লীর গদীয়ানেরা ভোগ করছেন—বৃহদংশ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে, যখন দেখি এই রাজ্যের অধিবাসীদের প্রতি সুবিচারের অনুপাতে যতটুকু হওয়া উচিত, কোন কোন ক্ষেত্রে তার চাইতে বেশি সুবিধা অন্য রাজ্যের লোক এসে এখানে ভোগ করছে। এ সব কথা আমরা তুলতে চাই না, কিন্তু যখন দেখি সবদিক দিয়ে স্বার্থ-ত্যাগ করেও পশ্চিমবঙ্গকে অন্ত্যজের মত ব্যবহার পেতে হচ্ছে, যখন দেখি সবাই এই রাজ্যের মাথায় কেবল কাঁঠাল ভাঙ্গতেই উৎসুক, তখন এ সব কথা মনে না হয়ে পারে না। আরো অবাক লাগে যখন দেখি, বৃহত্তর কলিকাতা এলাকার কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় কাজ করবার টাকাও কেন্দ্র দিতে রাজী নয়।
>
> অথচ পনেরো বছর ধরে কত প্রতিশ্রুতিই না শোনান হয়েছে। একাধিক প্রধানমন্ত্রী কলকাতার জন্যে তাঁদের মস্তক ব্যথিত করেছেন। হুগলির ওপর একটি দ্বিতীয় সেতু এবং দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত একটি এক্সপ্রেস সড়ক তৈরী হওয়া যে সর্ব্বভারতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থেই দরকার, একথা কেউই অস্বীকার করেন না। বিশেষ করে মনে পড়ছে স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর কথা যিনি সুন্দরবনের উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এবং তাঁরই কন্যা, আমাদের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথা, যিনি মাত্র সেদিন দার্জ্জিলিংয়ে দাঁড়িয়ে বলে এলেন পার্ব্বত্য অধিবাসীদের কল্যাণে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ বরাদ্দ করা হবে।
>
> সেই বরাদ্দ কোথায়? সেই সব প্রতিশ্রুতি বা কোথায় গেল? যদি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষার কোন ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকে, তা হ'লে শুধু মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে এভাবে অপমান করার কি দরকার ছিল? জাতির জন্যে পশ্চিম

বঙ্গের স্বার্থত্যাগের প্রতিদান এইভাবে না দিলেই কি চলছিল না ?

পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া কেন্দ্রীয় কর্তারা দুই-চারিটি ভাল কথা এবং মৌখিক প্রতিশ্রুতি না দিলে মামুলী ভদ্রতা রক্ষা হয় না, তাই নূতন 'হস্তিনাপুরের সর্ববিষয়ে হস্তিসমান দুর্যোধনগুষ্টির সকলেই সেই মামুলী কর্ত্তব্যই করিয়া যান !

পশ্চিমবঙ্গে নূতন আমদানী ?

বিগত ২।৩ মাস যাবৎ উত্তর বিহার এবং উত্তর প্রদেশের খরা এবং বন্যাপীড়িত অঞ্চল হইতে হাজার হাজার লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিতে সুরু করিয়াছে এবং এই জনস্রোত ক্রমশঃ বৃদ্ধিমুখেই চলিয়াছে। উক্ত দুইটি রাজ্যের দুর্গত এলাকার লোকের ধারণা (ভুল নহে) যে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করিয়া কলিকাতা গেলেই নোকরির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যও মিলিবে। ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষের মত লোক আসিয়াছে এবং আরো হাজার হাজার দুর্গত লোক পশ্চিমবঙ্গ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। উত্তর প্রদেশ এবং বিহার হইতে কলিকাতায় আগত ট্রেনগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে—কি ভাবে এবং কি অবস্থায় হাজার হাজার লোক কলিকাতায় আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের অবস্থা একেই শোচনীয়—এ-অবস্থায় নূতন করিয়া যদি আবার ক্ষুধার্ত্ত লোকের অভিযান এ-রাজ্যে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এ-রাজ্যের খাদ্যাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় রোধ করা হইবে অসম্ভব। উপায় কি ? হয় (১) বিহার এবং উত্তর প্রদেশ হইতে দুর্গত মানুষদের অভিযান বন্ধ করা, আর না হয় (২) কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গকে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল-গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য প্রেরণ করা। কিন্তু

(১) আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার কোন রাজ্যের লোককে স্বাধীন ভারতের অন্য রাজ্যে গমনাগমন কখনও নিষিদ্ধ করিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় কলোনী পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই যুক্তি প্রযোজ্য।

(২) কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য ভাণ্ডার—খুব সম্ভবত বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির খাস জমিদারীর সম্পত্তি—অতএব কোন্ রাজ্যে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য কেন্দ্র-কর্তারা পাঠাইবেন, তাহা নির্ভর করিতেছে একান্ত ভাবে তাঁহাদের মর্জ্জি এবং মেজাজের উপর। তবে এক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যে কর্তাদের দাবির অর্থাৎ গুঁতা নামক বস্তুর উপরেও যে খানিকটা নির্ভর করে। কেন্দ্র সরকার জানেন, পশ্চিমবঙ্গে অহিংস কংগ্রেসী সরকার, গুঁতা নামক বস্তু দিতে জানে না—জানেন কেমন করিয়া কেন্দ্রীয় গুঁতা হজম করিতে হয়—বিশেষ করিয়া এই 'হজমের' ফল যখন এ-রাজ্যের জনগণকে ভোগ করিতেই হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সর্ব্বংসহা, পশ্চিমবঙ্গবাসী (বাঙ্গালী) সকল অনাচার-অবিচারে অভ্যস্ত আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজ্য-সরকার কেন্দ্রীয় করুণাধারার বিন্দুপ্রাপ্তিকেই চরম এবং পরম অনুগ্রহ জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত ! ! কংগ্রেসী সরকারের পায়ের তলা হইতে ক্রমশ যে মাটি সরিয়া যাইতেছে—সে বোধশক্তিও তাঁহাদের নাই। জলের পরেই যে অন্ন নামক একটি তথাকথিত 'আবাস' আছে—একথা বর্ত্তমান কংগ্রেসী মালিকদের মানসিক 'জিয়োগ্রাফীতে' নাই !

দুর্গাপুরে শিল্প সম্প্রসারণের ভবিষ্যত কি ?

সরকারী-বেসরকারী মহল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে রাজ্য সরকারের আর কোন প্রকল্প যে বাস্তবে রূপায়িত হইবে—অদূর ভবিষ্যতে—দু'-দশ বৎসরের মধ্যে, তাহার সম্ভাবনা ক্ষীণতর হইতে হইতে এবার প্রায় লোপ পাইবার মুখে ! গত ৮।৯ মাসের মধ্যে যে দুইটি শিল্প-প্রকল্প দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার সবই ঠিকই ছিল, তাহা কোন অজানা ভীষণ কারণে—কেন্দ্রীয় সরকার পেনডিং-ফাইলে বন্ধ করিয়াছেন—এবং এমন আশা আমাদের আছে যে, হঠাৎ দেখা যাইবে ঐ প্রকল্প পেনডিং ফাইল অদৃশ্য হইয়াছে ! আমাদের সদা-জাগ্রত এবং প্রজাকল্যাণরত রাজ্য সরকার, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প দপ্তর এ-বিষয়ে কিছু জানেন কি না জানি না।

দুর্গাপুরের সরকারী সার কারখানার প্রয়োজনে একান্তভাবে জরুরী একটি সালফিউরিক এসিড্ প্লান্ট দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল পাইরাইট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন বসাইবেন—এইরকমই ঠিক হয় এবং সেই অনুসারেই 'সাইমন কারভস' নামে একটি বিদেশী কোম্পানীর

সহিত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। এই প্ল্যান্টি বসাইতে আনুমানিকএক কোটি টাকার কিছু বেশী খরচ হইবে—ন্যাশনাল পাইরাইট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই কথা বলেন। মাস ছয়-সাত আগে কোনও কারণ না দেখাইয়া হঠাৎ সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন হয় এবং নূতন সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহারে এই এসিড কারখানা স্থাপিত হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যখন বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানই সালফিউরিক এসিডের অভাবে এক সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন সেই সময় দুর্গাপুরে প্রস্তাবিত এসিড কারখানাটি হঠাৎ বিহারে স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকারী ও বেসরকারী মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ক্যামেরা নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা ছিল, কার্য্যত তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করা হইবে স্থির করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার জাপানের সহযোগিতায় গত পাঁচ বছরের ভিতর দু'-দু'বার 'প্রজেক্ট রিপোর্ট' প্রণয়ন করান, কিন্তু আজ সবই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত!

ক্যামেরা নির্ম্মাণের কারখানাটি তৃতীয় যোজনার ভিতরেই শেষ হইবে---এই কথাই ঘোষণা করা হয় কিন্তু প্রথম হইতেই, কি অজ্ঞাত কারণে জানা নাই কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে কোনও পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে যে আন্তরিকতার প্রয়োজন তাহা কোন সময়েই দেখান নাই। প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকার জাপানের একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন কেবলমাত্র দামী ক্যামেরা তৈরী হইবে-এমন একটি কারখানার প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। ঐ রিপোর্ট পাইবার পর সরকার আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করেন। পুনরায় ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন আর একটি নূতন প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈয়ারী করেন, যাহাতে দামী ও সস্তা দু'রকম ক্যামেরাই নির্ম্মাণ করা যাইবে। এবারও যখন জাপানী প্রতিষ্ঠানটি রিপোর্ট পেশ করিলেন, তাহার কিছুদিন পরেই আবার বিশেষ কোনও কারণ না দেখাইয়াই তৃতীয় নূতন আর একটি রিপোর্ট দিতে বলা হয়। তবে এবার আর জাপানী প্রতিষ্ঠানটিকে তাগাদা দিয়াও কোন ফল হয় নাই। সরকারীসূত্রে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি এই ব্যাপারে আর কোনও উৎসাহ পাইতেছেন না বলিয়া নীরব রহিয়াছেন এবং নূতন কোনো রিপোর্ট দেন নাই।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়া কারখানা নির্ম্মাণ করাইবেন সেই জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য যে অর্ডার দেন তাহার জন্য এবং যন্ত্রপাতি গুদামে ফেলিয়া রাখিবার কারণে প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রের নিকট প্রায় চার লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়াছেন। এই সব তথ্যাদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অজানা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা রাজ্যের শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে কি এ-ব্যাপারে কিছুই করিতে পারিতেন না?

পারিলে হয়ত পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের তরফ হইতে কোন গরজই দেখান হয় নাই, বা দেখাইবার মত ভরসা সরকার সঞ্চয় হয়ত হয় নাই।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাসান্তিক এবং অন্যান্য নানা 'আস্তিক' রেডিও ভাষণ দিতে এবং লেভির ধান সংগ্রহকেই মুখ্যতম প্রশাসনিক কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। রাজ্য-শিল্পমন্ত্রী সভাতে এবং অন্যান্য স্থানে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন কিসে হইবে সেই বিষয়ে হিতকথার সঙ্গে উপদেশও কম দেন না। উৎসাহও প্রচুর দেখান, কিন্তু হাওড়ার বেলিয়াস রোডের ভারতবিখ্যাত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি যে ধ্বংসের পথে ইস্পাত, তামা, পিতল, সিসা প্রভৃতির অভাবে—তাহার খোঁজ রাখেন কি? দিল্লীর মোগল দরবারে কয়েক লক্ষ কারিগরকে সপরিবারে বাঁচাইবার কোন কার্য্যকর ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? কালোবাজার হইতে চার পাঁচ গুণ বেশী মূল্য দিয়া প্রয়োজনীয় মাল-মশলা ক্রয় করিয়া হাওড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল-কারখানাগুলি কতদিন চলিতে পারে? অথচ মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, কেরালা, মহীশূর রাজ্যের ছোটবড় প্রায় সকল কল-কারখানা, কেবল যে প্রয়োজনের মত মাল পায় তাহা নহে। তাহারা পায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর কাঁচা মাল, এবং ঐ বাড়তি কাঁচা মাল পশ্চিমবঙ্গে চালান হইয়া কৃষ্ণ-হাটে—চারি-পাঁচগুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে!

এই বিচিত্র কাণ্ড লইয়া সংবাদপত্রে আলোচনা কম হয় নাই, কিন্তু তাহাতে তরুণ মন্ত্রীর কিশোর মনে কোন রেখাপাত করিতে বোধ হয় পারে নাই। কিন্তু কেবল মন্ত্রীবরকে দোষ দিয়া লাভ নাই। শিল্প দপ্তর কুটীর শিল্প এবং বিকিউজি হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স্ লইয়া অতি ব্যস্ত, সঙ্গে আছে 'খাদি'-প্রহসন! নূতন মহাকরণে চৌদ্দ-তলা প্রাসাদে শিল্প দপ্তরের ডিরেক্টর এবং তাঁহার সুবিপুল পদাতিক বাহিনী কি কাজের কাজ করেন জানি না। পরিসংখ্যান? যাহার অপর নাম মিথ্যার বেসাতি।

হলদিয়ার অবস্থাও চমৎকার। এখানের প্রস্তাবিত এক একটি প্রকল্প বিহার, কেরল প্রভৃতি রাজ্যে বাস্তব রূপ লইতেছে---কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্ব্বিকার! অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ যে-সময় নিজ নিজ রাজ্যের শিল্প এবং অন্যবিধ নানা উন্নয়ন প্রকল্প লইয়া মাথা ফাটাফাটি করিতেছেন, সেই সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবই পার্থিব মায়ার খেলা বলিয়া তুচ্ছ করিতেছেন! এবং রাজকার্য্যের বিষম পরিশ্রমের ভীষণ ক্লান্তি দূর করিতে—পূজার সময় তিনি আরামবাগের 'মায়াপুর' নামক গ্রামে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেও বাধ্য হয়েন কয়েকদিনের জন্য!

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

দাক্তার অমরনাথ ঝা'র মূর্ত্তি গড়া

দাক্তার অমরনাথ ঝা কিছুদিনের জন্য দেরাদুনে এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর মূর্ত্তি গড়ি। তিনি নিয়মিত পাঁচ-ছয় দিন 'সীটিং' দিয়েছিলেন। মূর্ত্তিটা করবার সময় একদিন তিনি মুখে সুপুরি রেখে এসেছিলেন। বাঁ গালে সুপুরির একটা বড় টুকরো ছিল। মূর্ত্তি গড়বার সময় আমি ওঁর মুখ দেখে বলি, 'বাঁ গালটা ফোলা কেন আজ?" উনি হেসে বললেন, "সীটিং দেবার সময় মুখে সুপুরি রাখাও কি নিষেধ?'' এই বলে মুখ থেকে সুপুরি ফেলে দিলেন। মূর্ত্তিটা ভালোই হয়েছিল। মূর্ত্তিটা ব্রোঞ্জের ঢালাই হবার পর এলাহাবাদ য়ুনিভারসিটি কিনে নিয়েছিল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তখন U. P-র গভর্নর, মূর্ত্তিটা 'আনভেইল' করেছিলেন তিনিই। দুন স্কুলে থাকতে প্রায়ই এইরকম মূর্ত্তি গড়া চলত আমার। অনেকেরই মূর্ত্তি গড়েছিলাম। কিছু দিয়ে দিয়েছি, কিছু দুন স্কুলে রয়ে গেছে। ছেলেরাও কয়েকজন মূর্ত্তি গড়ত ভাল। প্রথম দিকে অজিত কেশরী রে—বলে একটি উড়িষ্যার ছেলে বেশ ভালোই শিখেছিল। আমি যখন মূর্ত্তি গড়্‌তাম তখন অনেক ছেলেরাই দেখত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাতে করে তাদের অনেক শেখা হ'ত—যা হাতে-কলমে শেখা যায় না। সেবারে ছেলেদেরও কয়েকজনের মূর্ত্তি গড়েছিলাম। সে সব ছেলেরা সব নিয়ে গেছে। মনি করেই কাটত আমার সে সময়ের দিনগুলো ছেলেদের নিয়ে। বাড়ীতে ছিল—বিক্কি—কুকুর। আর শ্যামলীর পোষা কবুতর ও খরগোশ। আর পুরনো চাকর 'গোবিন্দ'। ঠিক নিঃসঙ্গ জীবন একে কি বলা চলে?

বিক্কি

বিক্কিকে বাড়ী আনা হয় যখন তার বয়স সাত-আট দিন মাত্র। শ্যামলী মার্টিন সাহেবের কুকুর 'সুজানে'র বাচ্চা হবা মাত্র বিক্কিকে দেখে পছন্দ ক'রে রাখে। অনেক গুলো বাচ্চা হয়েছিল—তার মধ্যে বিক্কিই না কি সব চাইতে সুন্দর দেখতে। সেই থেকে বিক্কি রয়েছে। আহ্লাদী কুকুর ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠল। নেহাত ভালো মানুষ। বিক্কি ভালোই কুকুর, দেখতে শুনতেও ভাল—কেবল জাতে উঠতে পারে নি! কারণ তার বাবার খবর কেউ জানে না। মা—'গোল্ডন রিট্রিভার—মায়ের পরিচয়েই বিক্কির পরিচয়। স্কুলের ছেলেদের খেলার সঙ্গী বিক্কি। চাঁদবাগের সব জায়গায় অবাধে ঘুরে বেড়ায় বিক্কি! সবার সঙ্গেই সে ভাব রাখে।

ভাব নেই কেবল দুটো কুকুরের সঙ্গে। একটি প্লুটো—যোশী সাহেবের অ্যালসেশিয়েন, আরেকটি মিসেস থাওয়ালের জঙ্গলি কুকুরটা। প্রথম প্রথম লড়াই হ'লে হেরে পালিয়ে আসত। আজকাল বিক্কির কাছে 'প্লুটো'ও 'জঙ্গলি'—দু'জনেই হেরে যায়। লড়াই হ'লে অবশ্য

অথৰ হয় ছুঁ খুকুই। কখন কান কেটে আসে, কখন গায়ে দাঁতের দাগ বসিয়ে আসে। তবু, যা হোক্, বিল্লি আমার সঙ্গী বটে। রাতে বিল্লি ঘরে এলে দরজা বন্ধ ক'রে দিই। আবার ভোর সকালে ওর বাইরে যাবার দরকার হলে আমায় ডেকে তোলে। আমি দরজা খুলে দিই মাকে ও শ্যামলীকে অন্যান্য খবরের সঙ্গে বিল্লির খবরও দিতে হয়, প্রতি চিঠিতেই। খরগোশের বাচ্চা কেমন হয়েছে—ক'টা হয়েছে, সে খবরও দিতে হয় শ্যামলীকে। কবুতর ক'টা বেঁচে আছে, ক'টা শেয়ালে খেল—তার হিসাব রাখা হয়ে ওঠে না। ডিম পাড়লে কাঠবিড়ালী ও দাঁড়কাকের হাত থেকে বাঁচান মুস্কিল! ছুটিতে শ্যামলী ও মা যখন এসে থাকে, তখন দু'একটা ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। সে ওদেরই তদারকে! এই ত আমার সংসার। কোয়ার্টারের সামনে সামান্য ফুলের বাগান। টবে 'ক্যাকটাস' আট-দশ রকমের। পিছনেও ফুলের ও তরিতরকারির বাগান। মালীর হাতে যতটা হতে পারে হচ্ছে। আমার কাছে তারা তেমন যত্ন পায় না। মা'রা যখন এখানে ছিলেন, তখন তাদের যত্ন ছিল। পিছনের বাগানে লেবু, আম, পেঁপে—যা বড় হয়ে ফল দিতে আরম্ভ করেছে আজকাল, তারা সব মা'রই হাতের পোঁতা গাছ। মাঝে মাঝে বাগানে যখন ঘুরে আসি, তখন সেই কথাই বার বার মনে হয়।

*

১৯৪৯ সাল

১৯৪৯ সালের জুন মাসে ছুটি হ'লে এবারেও মুসৌরিতে গেলাম ছবি নিয়ে। মুসৌরিতে প্রদর্শনী করা আমার যেন বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'সাভয়' হোটেলে প্রদর্শনী করব ঠিক ছিল কিন্তু উঠলাম গিয়ে 'সাংলাভিল' হোটেলে। সেখানে 'ডিয়াস' ও তাঁর স্ত্রী উঠেছিলেন। এই 'ডিয়াস' আমাদের সঙ্গে 'দুন' স্কুলে ছিলেন। অঙ্ক শেখাতেন। সেখান থেকে আজমীরের 'মেয়ো কলেজে'র প্রিন্সিপ্যাল হয়ে যান। চেনাশোনা কেউ থাকলে এই রকম বড় হোটেলে একটু সুবিধে হয়। একেবারে 'অ্যাকাচোরা ভাঙা বেড়া' হ'তে হয় না। ডিয়াস দম্পতি ও আমি রোজ এক টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া করতাম। এবার প্রদর্শনীতে হৈ-চৈটা একটু কম হয়েছিল, কারণ আমি অন্য হোটেলে ছিলাম। প্রদর্শনীতে আমার ছাত্রের দল তদারক করত। ডিয়াস, থাকাতে সুবিধে হয়েছিল লোকজনের সঙ্গে আলাপ করবার। ইন্দোরের মহারাজা সেবার সাভয় হোটেলে উঠেছিলেন। তিনি কয়েকটা ছবি কিনেছিলেন। একদিন প্রদর্শনীতে অনাথদা এসে হাজির। অনাথদা শান্তিনিকেতনে আমায় পড়িয়েছিলেন। দিল্লীতে ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন তখন। মুসৌরি বেড়াতে এসেছিলেন সেবারে সপরিবারে। তিনি ত খুব তারিফ করলেন আমাকে। শান্তিনিকেতনের অনেক কথা হ'ল।

প্রদর্শনী শেষ হ'লে আরও দু'চারদিন মুসৌরিতে থেকে দেরাদুনে ফিরে এলাম। জুলাই মাসের প্রথমেই মা ও শ্যামলীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চ'লে গেলাম। মা ও শ্যামলী শান্তিনিকেতনে থাকাতে ছুটি কাটাবার এ বেশ একটা সুবিধে হ'ল আমার। প্রতি ছুটিতেই শান্তিনিকেতনে চলে আসি। নন্দবাবুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করি—একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই। নানান রকম শিল্প বিষয় কথাবার্তা হয়।

১৯৪৯ সালে শীতের ছুটিতেও শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকি। ৭ই পৌষের মেলায় ঘুরে বেড়াই। আশ্রমের সবাই মেলায় ঘোরে। সাঁওতাল ও বোলপুর শহরের লোকেরাও সব এসে জোটে। সিনেমা, নাগরদোলা, সার্কাস, মিঠাই-এর দোকান, আর কালোর চায়ের দোকান।

কালোর দোকানে বসে চা, মিষ্টি খাওয়া চলে, ৭ই পৌষের মন্দিরের পর। কলকাতা থেকে দলে দলে প্রাক্তন ছাত্রেরা আসে। রবীন্দ্র-ভক্তের দলও অনেকে এসে জোটে। বহু জানাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কালোর দোকানে ব'সেই সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সেখানে বসে থাকলে পুলিন সেন থেকে আরম্ভ ক'রে রাধামোহনের (উদয়ের পথের অভিনেতা) সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। ক্ষীতিবাবু থেকে ইন্দিরাদি-মীরাদিকেও মেলায় ঘুরতে দেখতে পাওয়া যাবে। ১৯২৫ সালে

আমি প্রথম ৭ই পৌষের মেলা দেখি, তখন আমি সেখানকার ছাত্র। তারপর কতবারই না ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনে থেকেছি। দুনিয়ার অনেক কিছু বদলায়, কিন্তু ৭ই পৌষের মেলার যে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তাও মনে হয় না। সেই পুরনো নাগরদোলা, সেই সাঁওতালদের গয়নার দোকান, সিউড়ীর মোরব্বা, ও সারি সারি মিষ্টির দোকান। যাই হোক কিন্তু ভাল লাগে। এই ব্যাকগ্রাউণ্ডে নানান বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। যাদের সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় নাই ৭ই পৌষের কল্যাণে দেখা হয়ে যায়। শীতের ছুটিটা অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে দেরাদুনে ফিরি। শান্তিনিকেতনের তখনকার মাষ্টারমশায়দের সঙ্গে সব আলাপ হয়। ছেলেমেয়েদের সাহিত্যসভা, গানের আসর, ইন্দিরাদির কাছে গিয়ে গল্পগুজব, গানের আড্ডা। এমন কি সঙ্গীত ভবনে গিয়ে ইন্দিরাদির অনুরোধে গানও গাইতে হয় দু'একটা। ভয় ভয় গান গাই। শৈলজাবাবু সঙ্গে এসরাজ বাজান, ভয় হবারই কথা। কোথায় সুর স্বরলিপির সঙ্গে মেলে নাই তা যে তাঁর নখদর্পণে। সন্ধ্যের সময় মাঝে মাঝে যাই শান্তিদেবের বাড়ী। নানান গল্পে গানে শান্তিদেব ভরিয়ে তোলে সেই সন্ধ্যেবেলাগুলো। ছুটি যেমন ভাবে কাটান দরকার ঠিক তেমনি ভাবেই ছুটি কাটিয়ে দেরাদুন ফিরি। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগি।

হেলেন ও শিল্পী

জুন—১৯৫০

দাকতার পাণ্ডে ও মানব ভারতী

দাকতার পাণ্ডের সঙ্গে আমার আলাপ শান্তিনিকেতনের নয়—দেরাদুনেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। শান্তিনিকেতনে তিনি হিন্দী পড়াতেন এবং ছোট পণ্ডিত বলে পরিচিত ছিলেন। তারপর বিলাত যান এবং সেখানকার কোন য়ুনিভারসিটি থেকে 'দাকতার' উপাধি নিয়ে আসেন। ইনি বিহারের লোক, সেইজন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রসাদ লাভে সক্ষম হন এবং রাজপুরে মিসেস শাস্ত্রীর 'শাক্যি আশ্রম' ব'লে যে একটি সুন্দর জায়গা ছিল সেখানে 'মানব ভারতী' খোলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শেই দাকতার পাণ্ডে 'মানব-ভারতী' সুরু করেন। দাকতার পাণ্ডে মানব-ভারতীর স্কুলের জন্য নাচগান, চিত্রবিদ্যা ও আরো নানান বিষয় শেখাবার

জন্ত উপযুক্ত মাষ্টার রাখেন। আমি সেই স্কুল প্রথম দেখতে যাই ১৯৪১ সালে। সেই সময় কেলু নায়ার সেখানে নাচের শিক্ষক ও রায় বলে একজন শিল্পী ছবি আঁকা শেখাবার জন্ত এবং মণিপুরী নাচের জন্তও বোধ হয় কেউ সেখানে ছিল। কেলু নায়ার ও রায় হু'জনই পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে ছিল। কেলু নায়ার আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। আমি তাঁর মূর্ত্তিও গড়েছিলাম। দুন স্কুলের 'ওপেন এয়ার' ষ্টেজে তার নাচের আয়োজনও করেছিলাম। কেলু নায়ারের কাছেই প্রথম খবর পাই যে, 'মানব-ভারতী' যেমন ভাবে চলা উচিত তেমন ভাবে চলছে না। মাষ্টাররা কেউ নিয়মিত মাইনা পায় না। ৬,৭ মাসের মাইনা বাকী পড়ে আছে। সবাই বিরক্ত হয়ে উঠেছে ইত্যাদি। নতুন স্কুল চালাতে আরম্ভ করলে এই ধরণের অসুবিধা অল্প-বিস্তর হয়েই থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ কিছু মনে হয় নাই। কিন্তু একে একে সব মাষ্টাররা 'মানব ভারতী' ছেড়ে চলে যায় ও দাকতার পাণ্ডে আবার মাষ্টার রাখেন। শান্তিনিকেতন থেকে বহু শিল্পী একে একে 'মানব-ভারতী'তে এসে যোগ দেন আর ছেড়ে চলে যান। শ্রীপ্রভাস সেনও মানব ভারতীতে বছর দুই বোধ হয় ছিলেন। বালকৃষ্ণ মেনন—কথাকলি নাচিয়ে, ইনি কেলু নায়ারের পর কাজ নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতন ছেড়ে। এমনি করে মানব-ভারতী চলতে থাকে। রাজপুর থেকে মানব ভারতী মুসৌরিতে চলে যায় দেশ স্বরাজ হবার পর। ডাম্পানীর কনভেণ্ট স্কুল যখন উঠে যায় তখন সেই স্কুল বাড়ী-ঘর খালি পড়ে থাকে। দাকতার পাণ্ডে সেই সময় বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের খাতিরে জায়গাটি লাভ করেন মানব ভারতীর জন্ত। দাকতার পাণ্ডে লোক ভাল বলেই জানি—স্কুল চালাবার যে শক্তি ও গুণ থাকা দরকার, তার সব গুণ তাঁর না থাকলেও, কিছুটা আছে সন্দেহ নেই। সেইজন্ত স্কুলটা চলছে কিন্তু ভালো করে বাড়তে পারছে না। একেবারে বন্ধও হচ্ছে না। ছেলেমেয়ে আসছে, ছেড়ে চলে যাচ্ছে—আবার আসছে, এই রকমই চলছে। গরমের ছুটিতে অনেকেই দাকতার পাণ্ডের অতিথি হয়ে মুসৌরিতে কাটিয়ে আসত। প্রভাত নিয়োগীও সেবারে সপরিবারে দাকতার পাণ্ডের অতিথি হয়ে সেখানে ছিল। আমি সেবারে মুসৌরিতে দু'একদিনের জন্ত শান্তলীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম মাত্র, কিন্তু প্রদর্শনী করতে বা থাকতে যেতে পারি নাই।

প্রদর্শনী করবার জন্ত প্রভাত নিয়োগী কিছু ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু একক প্রদর্শনী করবার মত ছবির সংখ্যা তার কাছে বোধ হয় ছিল না। সেই কারণে আমাকেও তাঁর প্রদর্শনীতে যোগ দিতে বলেন। আমি খান ত্রিশেক ছবি প্রভাতকে দিয়েছিলাম। সেবারে মুসৌরীতে সিমলার মতো দু'জনের ছবির প্রদর্শনী 'হ্যাক-ম্যান্‌স্' হোটেলে অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রদর্শনী যখন আরম্ভ হয় তখন আমার মুসৌরীতে যাবার খুব ইচ্ছে সত্বেও আমি যেতে পারি নাই।

জেনারেল থিমাইয়া, মিসেস থিমাইয়া ও সর্দ্দার প্যাটেলের মূর্ত্তি গড়া

আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেবারে আমি মূর্ত্তি গড়ার কাজ আরম্ভ করি। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডামীতে মেজর জেনারেল থিমাইয়া সে সময় 'কমাণ্ডার' হয়ে আসেন। আমি প্রথমে মিসেস থিমাইয়ার মূর্ত্তি গড়ি। এবং তাঁর মূর্ত্তি শেষ হয়ে গেলে জেনারেল থিমাইয়ার মূর্ত্তি গড়ি।

মূর্ত্তি গড়বার সময় আমি এঁদের ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনবার সুযোগ পাই। জেনারেল থিমাইয়ার স্বভাব ও গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হই। তাঁর মতো সদানন্দ স্বাভাবিক ও নির্ভীক আরমি অফিসার, আমি পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই বা সংস্পর্শে আসি নাই। তাঁর কাছে কাশ্মীর ও যুদ্ধের অনেক গল্প শুনেছিলাম। জেনারেল থিমাইয়ার মূর্ত্তি গড়া হয়ে গেলে সর্দ্দার প্যাটেলের সেক্রেটারীর কাছ থেকে খবর পাই যে, সর্দ্দার প্যাটেল আমাকে মূর্ত্তি গড়বার জন্ত 'সীটিং' দিতে রাজী হয়েছেন। তবে আমাকে 'মার্কিট হাউসে' গিয়ে মূর্ত্তি গড়তে হবে। তিনি নিজে আমার ষ্টুডিওতে আসতে পারবেন না। সার্কিট হাউসে গিয়েই সর্দ্দার প্যাটেলের মূর্ত্তি গড়তে আরম্ভ করি। সর্দ্দার প্যাটেলকে আমার ভাল লাগে কিন্তু তাঁর পারিপার্শ্বিক লোকদের সঙ্গ মোটেই আনন্দ দান

করে নাই। প্রায় এক সপ্তাহ ঘণ্টা দুয়েক করে সার্কিট হাউসে মূর্তি গড়তে আমার সময় যেত। কিন্তু সে সময়টা কখনো স্বাভাবিক ভাবে কাটে নি। আড়ষ্ট ভাবে কথাবার্তা ও চলাফেরা করতাম সব সময়।

সার্কিট হাউসের গেটে পৌঁছে রোজ আমাকে 'স্লিপ' লিখে পাঠাতে হ'ত। পুলিশের পাহারা থাকত গেটে। সেই 'স্লিপ' প্যাটেলজীর সেক্রেটারী ও মণি-বেনের কাছ থেকে ফিরে যতক্ষণ না আসত আমার গেটে বসে থাকতে হ'ত। ''স্লিপ' ফিরে আসবার পর পুলিসের অফিসার আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে নিতেন, কিছু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কি না তাও জিজ্ঞেস করতেন মাঝে মাঝে। আমি হেসে জবাব দিতাম—'না সাহেব, ভয়ঙ্কর কিছু আমার সঙ্গে নেই।' সার্কিট হাউসের ড্রইং রুমে বা বারাণ্ডায় বসবার পর মণি বেন নিজে এসে আমার খবর দিতেন এবং ভেতরে যাবার অনুমতি দিতেন। মূর্তি গড়বার সময় সর্দারজী কখনো কখনো চুপ করে বসে থাকতেন। লোকজনেরা দেখা করতে আসত। বহুলোকের সঙ্গে তখন আমার আলাপ হয়—যাদের বিশেষ কারুকে আমার মনে নেই। একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি একজন ভারত-বর্ষের বিখ্যাত ধনী লোক।··

তাঁর সঙ্গে প্রথম দিনই আমার আলাপ হয়। দ্বিতীয় দিনে মূর্তি গড়বার সময়ও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার মূর্তি গড়া দেখতে দেখতে বলেছিলেন যে তাঁকে এই শিল্পকলা আমি শেখাতে পারি কি না। উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'শেখাতে পারি, উনি শিখতে পারবেন নিশ্চয় তবে এক সর্ত্তে—

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কি সর্ত্তে?"

উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'আপনাকে আপনার বিপুল ব্যবসা ও সম্পত্তি সব ছেড়ে দিয়ে সাধারণ লোকের মতো আমার কাছে শিখতে আসতে হবে। কথাটা শুনে সর্দার প্যাটেল খুব জোরে হেসে উঠেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও হেসেছিলেন। ধনী মহাজনও হেসেছিলেন কিন্তু সে কাষ্ঠ হাসি।···মূর্তিটা শেষ হ'ল। আমি একদিন মোটরে করে মূর্তিটাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে আমার নিজের ষ্টুডিওতে ছাঁচ ঢালাই করলাম প্লাষ্টারে। এইসব কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকায় মুসুরীতে প্রদর্শনীতে আর যাওয়া সম্ভব হ'ল না। প্রভাতম নিয়োগীকেই প্রদর্শনীর সব কাজ সামলাতে হ'ল। কিছু ছবি বিক্রী হয়েছিল, আমি সশরীরে সেখানে উপস্থিত থাকলে না কি আরো ছবি বিক্রী হ'ত। প্রভাতের চিঠিতে জানলাম।

সর্দার প্যাটেলের মূর্তিটি, আমার নিজের বিশ্বাস যে আমার একটি ভালো কাজের মধ্যে গণ্য করা যায়। সর্দার প্যাটেলের চেহারার 'True-representation' কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মূর্তিটা বিরলা সাহেব থেকে আরম্ভ করে মণিবেন—কারুরই তখন পছন্দ হয় নি। এক 'রস্তোবা' সাহেব দেখে বলেছিলেন, "জিনিষটা ভালো হয়েছে"। মূর্তিটা গড়বার বছরখানেক পরই সর্দার প্যাটেল মারা যান।

• •

শান্তিনিকেতন যাত্রা

মা ও শ্যামলীকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেতে দেরি হয়ে গেল এইসব কাজে কর্মে। জুলাই মাসের ১২ তারিখ মা ও শ্যামলীকে নিয়ে দেরাদুন থেকে রওনা দিলাম। মাস দেড়েক ছুটি তখনও বাকী।

২৬শে আগষ্ট স্কুল খুলবে। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে প্রকৃত ছুটি করলাম। বর্ষার ঘনঘোর মেঘ দেখি—মালঞ্চের ছাত থেকে। বৃষ্টি থামলে বেড়াতে বা...

হই। মাঝে মাঝে গায়কদের মধ্যে গিয়ে গান শুনি। বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল চলে। রবীন্দ্র-সপ্তাহের সভাতে বসে 'পাঠ' ও আবৃত্তি শুনি সন্ধ্যেবেলা। এমনি করে দেখতে দেখতে কেটে যায় দিনগুলো।

১৫ই আগষ্ট, শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়। গোল হয়ে ছেলেমেয়েরা দাঁড়ায়। নন্দবাবু কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে আলপনা করিয়ে রাখেন। তার মাঝখানে পতাকার থাম্বা। সবচেয়ে ছোট্ট একটি মেয়েকে দিয়ে গান হয়ে যাবার পর জাতীয় পতাকাটা খুলে দেওয়া হয়। বৃষ্টি-শেষে ভিজে হাওয়াতে শুকনো পতাকা ফরফর করে উড়তে থাকে। 'জন-গণ-মন' গান গেয়ে সবাই যার যার কাজে চলে যায়।

* * *

দুঃশ্চিন্তা ও অবসাদ

আগষ্টের শেষে আবার দেরাদুনে ফিরে আসি। এমনি করে কাটতে থাকে দিন। কাজের মধ্যে দিন-গুলো একরকম কেটে যায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানান রকম দুঃশ্চিন্তা ও অবসাদ এসে মনকে বিমর্ষ করে ও দমিয়ে দেয়। মনে হয় আর কেন—অনেক ত হ'ল। কেনই বা এতে ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি। ছবিও ত কম আঁকলাম না—কি-ই বা হবে? আবর্জ্জনা সৃষ্টি নয় ত সব? এবারে নন্দবাবুর কাছে একদিন যখন বসেছিলাম, 'দেশ' পত্রিকার একজন কর্ম্মী, শ্রীকানাই সরকার এসে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে এবারকার পুজো সংখ্যার জন্য 'দুর্গার' ছবি চাই—সুরেনবাবু (মজুমদার) বলে পাঠিয়েছেন।

নন্দবাবু বললেন, 'আর কেন। বহু দুর্গার ছবি এঁকেছি প্রতি বছরেই তোমাদের জন্য। আমার আঁকা 'দুর্গার' ছবি তোমাদের চাই, না আমার নামটার জন্য—দুর্গার ছবি চাও আমার কাছে? এবারে ছাড়ান দাও আমায়—দুর্গা এঁকে এঁকে ক্লান্ত করে তবে ছাড়বে তোমরা। সেই 'থোড় বড়ি খাড়া' আর 'খাড়া বড়ি থোড়' কত করব?"—এই সব ভাবি। নন্দবাবুর বয়স হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর, অনেককাল কাজ করবার পর তাঁর মুখে এসব কথা যদি শুনি মাঝে মাঝে তবে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? কিন্তু আমার কেন এমন অবস্থা। বয়স বেড়েছে সন্দেহ নাই—কিন্তু এমন কি আর? স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা আর যেন নেই। মাঝে মাঝেই ক্লান্ত বোধ হয়। নিজেকে নগণ্য বলে মনে হয়।—কেন এ হিংসাদ্বেষ

কেন এ ছদ্মবেশ,

কেন এ মান-অভিমান—

শূন্য হৃদয়ের এই আকুল ক্রন্দনের মানে বুঝতে পারি একটু একটু।

* * *

কৃপাল সিং ও তার শিল্পীবন্ধু

কৃপাল সিং, শান্তিনিকেতনে কাজ শিখে, শান্তি-নিকেতনেরই কলাভবনে কাজ নিয়েছিল। খুব খাটে—নামও করেছে। বিরলার কাছে 'স্কলারশিপ' নিয়ে বোধ হয় শান্তিনিকেতনে কাজ শিখতে আসে। বয়স বেশী নয়, লম্বা রোগা, মাথাভরা কোঁকড়া চুল—বড় বড় ড্যাবা ড্যাবা চোখ। গোঁফ কামিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টা করেনি। এবারে গিয়ে তার ঘরে বসেছি মাঝে মাঝে। কৃপাল সিংকে ভাল লেগেছিল। খুব সাধাসিধে কিন্তু বিষয়বুদ্ধিও রাখে।

একদিন কৃপাল সিংএর ঘরে লখনউর এক যুবক শিল্পীবন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। শিল্পীবন্ধুটিকে আমি আগে চিনতাম ও তার ছবির সঙ্গেও পরিচিত ছিলাম। ছবির বোঝা নিয়ে এসেছে। নন্দবাবুকে তার ছবি দেখাবার ইচ্ছা। ছবির তাড়া কৃপাল সিংকে দেখাচ্ছিল। কৃপালের সঙ্গে আমিও ছবিগুলো দেখলাম। বহু ছবি ও স্কেচ এনেছে। সব ছবিই—'স্কেচ', ড্রইং, ডিজাইন ও ল্যাণ্ডস্কেপ—সবই বেশ পরিপাটি করে মাউণ্ট করা ভাল কার্ডবোর্ডে বা কাগজে।

বন্ধুটি বললে যে আজকে নন্দবাবু তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ছবি দেখবেন।…পরের দিন মাষ্টারমশাই-এর সঙ্গে দেখা হ'তে বললেন, 'লখনউ থেকে এক শিল্পী এসেছেন, তাঁর কাজ নিয়ে 'চেন কি তাঁকে'?

বললাম, 'চিনি'।

নন্দবাবু বললেন, "কারুকে ছাড়ে নি হে—যামিনী রায়ের ঢঙেও কাজ করেছে—তোমার ধরনেও কাজ করেছে। তারপর বিলিতি ল্যাণ্ডস্কেপ—অজন্তা ইলোরার মূর্তির স্কেচ করেছে—ওগুলো স্কেচ না 'ষ্টাডি' বোঝা দায়। খোদার ওপর খোদকারী করা চলে, কিন্তু আর্টিষ্টদের কাজের ওপর খোদকারী চলে না হে। অজন্তা ইলোরার মূর্তি স্কেচ করতে চাও ত, ঠিক মত স্কেচ কর, শিখতে পারবে অনেক। তা নয়—ছবির সংখ্যা বাড়াবার জন্তই যেন ছবি আঁকা। তারপর সব আধা-খেঁচড়া স্কেচগুলোকে ভাল কার্ডবোর্ডে মাউণ্ট করে দেখাতে এসেছে। আবার বিলিতী পোষ্টারের রং দিয়েও এঁকেছে ছবি"—

জিজ্ঞেস করলাম—'কি বললেন তাঁকে?'

একটু হেসে বললেন, 'বলেছি তাকে যা বলবার—ভেবো না ছেড়ে দিয়েছি। মতামত যখন চাইল তখন মিথ্যে প্রশংসা ত করা যায় না। বলেছি—দেশের শাসন কর্তারা আমার ওপর যদি শিল্পীর অপকর্মের বিচারের ভার দিতেন তবে তাকে দু'চার বছরের মত জেলে পাঠাতাম।

মনে মনে ভাবলাম, 'বেচারী'। ছবিগুলো একটু বাছাই করে যদি নিয়ে যেত দেখাতে তবে এইরকম কথা হয়ত তাকে শুনতে হ'ত না। ছবি বাছা বেশ শক্ত কাজ। শিল্পী সব সময় নিজে বুঝে উঠতে পারে না। আমি প্রদর্শনী করতে গিয়ে অনেক সময় ছবি বাছাই করতে গিয়ে ভুল করেছি। অনেক কাঁচা কাজ প্রদর্শনীতে সহান দিয়ে বদনাম কিনেছি। তবে মজা হচ্ছে এই—অনেক সময় কাঁচা কাজগুলোই 'ক্রিটিক'রা ভাল বলে বাহবা দেয় তাও দেখেছি। সুতরাং প্রদর্শনীতে ছবি দেওয়া চলে—কিন্তু মাষ্টারমশাইয়ের চোখে ধুলো দেওয়া চলে না। ওঁকে ছবি দেখাতে হলে ছাঁটাই বাছাইটা একটু ভেবেচিন্তে করা দরকার।

এক একটা ছুটি কাটিয়ে দেরাদুনে ফিরে আসি—কাজের ভীড়ে যখনই সময় পাই কত কথাই না মনে পড়ে টুকরো টুকরো ছবির মত।…

…দেরাদুন জায়গাটায় বহুদিন ত হ'ল রয়েছি—মন্দ নয়, গাছপালা ফুল বাতাস সবই ভাল কিন্তু জলটা সুবিধের নয়। কবিত্ব করা চলে গাছপালা, লতাপাতা, পাখী, জন্তু-জানোয়ার সব নিয়ে কিন্তু জলটা সত্যিই খারাপ। পেট যখন খারাপ হয় তখন সব কবিত্ব পণ্ড করে ঐ দেরাদুনের "হার্ড ওয়াটার"।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শিল্পী

'অটোবায়ওগ্রাফী অফ এ সাধু'

বাংলা দেশে পুজোর ছুটি আরম্ভ হয়েছে। পুজোর সময় আমাদের ছুটি নেই—পুরোদমে কাজ চলে। স্কুলের কাজ সেরে নিজের ঘরে এসেছি মাত্র—বারটা বেজে গেছে। হঠাৎ একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল বাড়ীর দোরগোড়ায়। একটা যুবক ভদ্রলোক নামলেন—আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন ইংরেজীতে, 'আমি সুধীর খাস্তগীরের সঙ্গে কথা বলছি আশা করি।' শরীর মন ক্লান্ত ছিল, তবু হেসে বললাম, "ইউ আর রাইট—কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি জানি না আমি কার সঙ্গে কথা বলছি।"

ভদ্রলোক দু'হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, "আমি মহেন্দ্রপ্রতাপ, মজাফরপুর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। মুসুরী গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আপনার আঁকা ছবি দেখেছি, নাম শুনেছি, ভাবলাম দর্শন করে যাই"।… বসতে বলতে হ'ল। ঘরে এসে আলাপ করতে আসে নাম শুনে—তাকে একটু খাতির না করলে চলবে কেন? …নানান কথাবার্তা, আরম্ভ হ'ল। শিল্পকলা ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে। একটু 'হাই ব্রাও' ব্যাপার।

আমি ধার্মিক পুরুষ নই। তবে ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া আমার ধর্ম্ম। সেই অর্থে আমি 'ধার্মিক'। আঁকাকে ও গড়াকে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ বলে মনে করি এবং তার থেকে প্রভূত আনন্দ পাই, সুতরাং আমি সাধারণ মানুষ হলেও একটু অসাধারণ।... নিজের কাজকে ভালবাসে, আজকালকার দিনে—সে রকম লোক কম। কাজকে ভালবাসে পেটের দায়ে, বেশীর ভাগ লোক। তাই কাজ থেকে যখন রেহাই পায়, তখন তাকে তারা ছুটি বলে। আমার ক্ষেত্রে, আমি যখন আঁকি বা গড়ি, তখনই আমার ছুটি।... কাজই আমার ছুটি।

কথাবার্ত্তার ধারাটা ক্রমেই একটু উঁচু স্তরে উঠতে লাগল। মহেন্দ্রপ্রতাপজীর হাতে দেখলাম একখানা বই। 'অটোবায়োগ্রাফী অফ এ যোগী'। স্বামী যোগানন্দর লেখা। বইটা দেখে বললাম, 'অটোবায়োগ্রাফী' আমি ভালবাসি। নভেল পড়ার চেয়ে আত্মজীবনী বা জীবনী পড়তে ঢের বেশী ভাল লাগে আমার। অবশ্য লেখা যদি ভাল হয়। জীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। অন্তের জীবনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হয়। খুব যদি ভেবে-চিন্তে দেখা যায় তবে প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকের জীবনের একটা মিল খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত নয়। মহেন্দ্রপ্রতাপজী বললেন—"হ্যাঁ, এই বইটা স্বামী যোগানন্দর লেখা—পড়েছেন"?

—"না পড়ি নি।"

—"পড়বেন?"

—'পড়তে পারি—আপনার পড়া হয়েছে?'

—'আমার পড়া হয়ে গেছে—আপনাকে পড়তে দেব বলেই এনেছি।'

—'বেশ, তা হ'লে রেখে যান। পড়া হয়ে গেলে পাঠিয়ে দেব। আপনার কেমন লেগেছে বইটা?'

—'কথামৃতের মত—খুব ভাল।'

মহেন্দ্রপ্রতাপজী বইটা রেখে নমস্কার করে বললেন, 'আজকে চলি। ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে—লিখবেন বইটা কেমন লাগল।'

উনি চলে গেলেন, বইটা উলটে-পালটে দেখলাম খানিকক্ষণ। লম্বা চুলওলা মেয়েলী দেখতে—স্বামী যোগানন্দের যুবা বয়সের ছবি প্রচ্ছদপটে। যুবা বয়সের চেহারায় সেক্স-অ্যাপীল আছে, চোখ দুটো ভাসা-ভাসা।

কাজে কর্ম্মে দিন কাটে ফাঁকে ফাঁকে বইটা পড়ি। অবিশ্বাস্য ঘটনার সমষ্টিতে বইটা ভরা। বিশ্বাস হয় না—অথচ পড়তে খারাপ লাগে না। অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না। কত সাধু-সাধ্বীদের জীবনীতে বইটা ভরা। লাহিড়ী মশায়, যুক্তেশ্বরজী, গিরিবালা—মাতা আনন্দময়ী, ব্যাঘ্রবাবা—নানা সাধুর গল্প, নানান ধরনের কত অলৌকিক ব্যাপার। * * *

পরজন্ম তত্ত্ব, টেলিপ্যাথী ও অন্যান্য নানান রকম আশ্চর্য্যজনক ঘটনা যা তাঁর জীবনে ঘটেছে, সবই বইটাতে আছে।—গাঁজা বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ—বিশ্বাস করাই শক্ত। বইটা পড়ে উপকার হোক বা না হোক—পড়তে খারাপ লাগে নি। অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। বইটা পড়া হয়ে গেলে মহেন্দ্র-প্রতাপজীকে চিঠি লিখলাম। কিন্তু চিঠিটায় বইটা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করতে পারলাম না। সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস আমার নেই যে তা ঠিক নয় তবে সাচ্চা সাধুর খোঁজে ঘুরে বেড়ানর সময় কই আমার? আমি আঁকি বা গড়ি যখন তখন আপনাতেই আমি পরিপূর্ণ। আমি জানতে চাই যে ভূত ও ভবিষ্যৎ। আমি জানি আমি আছি। আমার জীবন, আমার পঞ্চেন্দ্রীয় সজাগ আছে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য আমি সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করছি, উপলব্ধি করছি আমার সাধ্যমত। পেয়েছি যথেষ্ট, পাচ্ছি যথেষ্ট। ইন্দ্রীয় সজাগ যতদিন থাকবে—পাবও যথেষ্ট আশা রাখি। পরজন্মের কথা ভাবি না। "এই জনমে ঘটাবো মোর—জন্ম-জন্মান্তর।"

১৯৫১। যুধা সামশের জঙ্গ বাহাদুর

স্কুলের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের কাজ পুরোদমে চালিয়েছি। বাড়ীতে একলা আছি—বিদ্ধি পাশে পাশে সব সময়। ছবি আঁকতে ব্যস্ত—সুতরাং নিঃসঙ্গ খুব লাগে না। সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাই গুরখা লাইনের

দিকে। সঙ্গে মাঝে মাঝে সঙ্গী জুটে যায়—নায়ার, সাহী কিংবা চন্দোলা। এঁরা সবাই ডুন স্কুলের শিক্ষক। এক চক্কর হেঁটে ফিরে আসি। যুধা সামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা—নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রাইম-মিনিষ্টার দেরাদুনে এসেছেন। গুর্‌খা লাইনসএ যাবার পথেই তাঁদের বাড়ী উঠেছে—প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে ৭০।৭৫। অনেকগুলো বউ না কি ভদ্রলোকের। রোজ তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে বেড়াবার সময় ভাবি—লোকটা সৌখিন, এত বড় বাড়ীতে ফ্রেস্কো করান না কেন? ছবিরও ত দরকার হতে পারে। একবার আলাপ করলে হয়। কিন্তু আলাপ আর হয় না।···

মার্চ্চ মাস প্রায় কেটে গেছে। শীত প্রায় গেছে বললেই হয়। গরম কাপড়-জামা ব্যবহার করা ছাড়ে নি কেউ তখনও দেরাদুনে। ফুলে ফুলে বাগান এখনও ছেয়ে আছে। বুলবুল শালিখ ও কাক, শিমূল গাছে ফুলের মধু খেতে এসে জুটেছে। মনটা বসন্তের বিদায়ে উসখুস করতে আরম্ভ করেছে। মন লাগে না আর কোন কাজে। একলা বার হয়ে পড়ি প্রায়ই—খানিক খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে ফিরে আসি। এমনি সময় একদিন যুধা সামশেরের গাড়ি এসে দাঁড়াল আমার বাড়ীর দরজায়। বুড়ো সৌখিনই বটে। চেহারাখানও বেশ, বড় বড় চোখ—গোঁফ-দাড়ি আছে, মাথায় টুপি।

ঘরে ঢুকেই প্রথম কথা, তুমি শিল্পী। 'তুমি আমার একটা মূর্তি গড়ে দেবে? বসতে বললাম, বসলেন না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি দেখতে লাগলেন। 'ফায়ার-স্ক্রীন' একটা ছিল—গান্ধীজি ও গুরুদেবের—দু'জনে দু'জনকে নমস্কার করছেন। সেটার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখে বললেন—তাঁর এ,ডি,সির দিকে চেয়ে হড়বড় করে নেপালী ভাষায় কি সব। খানিক বুঝলাম—খানিকটা বুঝলাম না। খানিক পরে আমার দিকে তাকিয়ে হিন্দী ভাষায় বললেন—'টাগোর, দেখনে সে ভক্তি আ যাতা থা। হামারা সাথ মিলনে আয়া থা'।—শান্তিনিকেতনের জন্য, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে না কি গিয়েছিলেন—এবং 'যুধা সামশের' তাঁকে ঝুলি কিছুটা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাই বলছিলেন, 'ঐ মুখ বুদ্ধির এবং কৃষ্টির আলোক-রশ্মিতে ঝক্‌ঝক্ করছে যেন—ওঁকে কি ফেরান যায়?'

নানান কথাবার্ত্তার পর ঠিক হ'ল—উনি রোজ সীটিং দিতে আসবেন। আমাকে তাঁর মূর্ত্তি গড়তে হবে। সেই মূর্ত্তি তিনি মারা যাবার পর রাখবেন। গুরখা লাইনে তিনি যে মন্দির করেছেন—কৃষ্ণের মূর্ত্তি ভেতরে আছে—তাঁরই সামনে হাত জোড় করা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় তাঁর কোমর পর্য্যন্ত মূর্তি।···রোজ আসতে আরম্ভ করলেন। প্রকাণ্ড লাইফ সাইজের চেয়ে অনেক বড় মূর্ত্তি সুরু করলাম। দলবল নিয়ে তিনি আসতেন—সঙ্গে 'হাবল বাবল'ও আসত। 'হাবল-বাবল' অর্থাৎ হুকা। একজন সেই হুকা মুখের কাছে ধরত—উনি তাতে মাঝে মাঝে আরামের টান দিতেন। ভাঙ্গা হিন্দী ও নেপালী ভাষায় নানান গল্প করতেন।···

নেপালে কত মূর্ত্তি, কত কিছু তিনি করিয়েছিলেন—সেই সব গল্প আমায় শুনতে হ'ত তাঁর দাড়িওলা মুখের মূর্ত্তি গড়তে গড়তে। মূর্ত্তিটা মাটিতে শেষ হলে, তিনি তাঁর পাটরাণীকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখে 'অ্যাপ্রুভ' করলেন, তবেই ঢালাই কাজ আরম্ভ করলাম।

মা'র অসুখ ও দুঃশ্চিন্তা। শান্তিনিকেতনে আস্তানা নির্ম্মাণ। ১৯৫১

এপ্রিলের শেষে শান্তিনিকেতনে ছুটি হলে মা শ্যামলীকে নিয়ে এলেন দেরাদুনে। এবং এসেই অসুখে পড়লেন 'ষ্ট্রোক' মত। সে কি ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আমার দিনগুলো কাটতে লাগল। মা'র অসুখের খবর পেয়ে দেরাদুনে, সেই গরমের ছুটিতে আমরা চার ভাই একত্রিত হয়েছিলাম। ছোটদিও এসেছিল মা'র অসুখের খবর পেয়ে।···মেজদা বিলেতে থাকত বলে সেই শুধু আসতে পারে নি তখন। অসুখ একটু সারলে মা'কে কলকাতায় বেলেঘাটায় মেজদার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শান্তিনিকেতনের পাঠ তুলে, শ্যামলীকে বোর্ডিংএ দিলাম। অসুস্থ শরীর নিয়ে মা রইলেন বেলেঘাটায় সেজদার কাছে। কলকাতায় কিছুদিন কাটানো গেল।

লম্বা ছুটিটা যেন আর কাটতে চায় না। আগষ্টের শেষের দিকে রওনা হলাম দেরাদুনে।···আবার সেই একলা। কাজের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে চলল আমার ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া ছেলেখেলার সাধনা।

* *

ডিসেম্বরের ছুটি হতে না হতে বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার দিকে। কলকাতায় ক'দিন থেকে শান্তিনিকেতনে গেলাম। সেখানে সপ্তাহখানেক কাটালাম প্রভাতদা'র বাড়ী। বিশ্বভারতীর 'লাইফ মেম্বার'দের সস্তায় জমি দেওয়া হচ্ছিল, শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি —পূর্ব্বপল্লী বা দক্ষিণপল্লীতে। রেল লাইন পর্য্যন্ত বহু বাড়ীতে ছেয়ে গেছে শান্তিনিকেতন। সেখানে আমিও জোগাড় করলাম বিঘাখানেক। ছোটখাটো একটা বাড়ীর প্ল্যান আঁকিয়ে নিলাম সুরেনবাবুর (কর) কাছে। গৌরবাবু নিলেন বাড়ী তৈরী করবার 'কনট্র্যাক্ট'। কথা দিলেন তিন-চার মাসের মধ্যে বাড়ী তৈরি হয়ে যাবে। আমি আগামী গরমের ছুটিতে সে বাড়ীতে থাকতে পারব।···

কথাটা গৌরবাবু রেখেছিলেন। 'ক্ষুধা সামশেরের' মূর্ত্তি গড়ে যে টাকা পেয়েছিলাম—সেটা এই বাড়ী তৈরী করতে খরচা হ'ল—ভালই হ'ল। ও টাকা কি আর তা না হ'লে রাখতে পারতাম।

গান্ধীজির মূর্ত্তি। মোটরে জামসেদপুর, কটক ও কনারক। ১৯৫২, জানুয়ারী।

নিছক ব'সে থাকা আমার স্বভাব নয়। কি করি, কি করি ভাব সব সময়। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে, বেলেঘাটায় সেজদার বাড়ী উঠেছি, কারণ মা অসুস্থ অবস্থায় সেখানে আছেন। ছুটি ফুরোতে আর তিন সপ্তাহ বাকী। হৈ চৈ ক'রে সিমেণ্টে একটা দশ ফিট আন্দাজ উঁচু গান্ধীজির মূর্ত্তি গড়তে আরম্ভ করলাম। সুবিধে ছিল, সেজদা বার্ড-কম্পানীর 'পেটেণ্ট ষ্টোনের' ম্যানেজার। ফ্যাক্টরীর মধ্যেই তাঁর বাড়ী। সেখানেই সেজদার সাহায্যে সীমেণ্ট পেলাম। লোহা-লক্কড় সবই জোগাড় হ'ল।

মূর্ত্তিটা মন্দ হ'ল না, কিন্তু ওজন হ'ল সাংঘাতিক। ফ্যাক্টরীর 'শেড' থেকে সরাতে প্রায় পঞ্চাশজন কুলি দরকার হ'ল। বাগানের ভেতর এনে সেটাকে রাখা হ'ল। ছবি তুললাম মূর্ত্তিটার—সে ছবি প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, ইলাষ্ট্রেটেড উইক্‌লি ইত্যাদি কাগজে বেরিয়েছিল সে সময়। মূর্ত্তি শেষ হ'তে না হ'তেই কটক থেকে মটরুদা এলেন। উনি তখন কটকে পোষ্টেড। কলকাতায় মোটর কিনে 'বাই-রোড' যাবেন ফিরে কটকে। আমায় বললেন সঙ্গী হ'তে। তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম। ছুটি ফুরোতে তখন সপ্তাহখানেক বাকী। 'ডি-এইট' ফোর্ড গাড়ি কেনা হয়েছে। আরেকজন সঙ্গী জুটল—মটরুদার ভাইপো—চব্বিশ বছর বয়স—'সুমন্ত্র'। গাড়িতে চারজন আমরা—মটরুদা, সুমন্ত্র, আমি ও ড্রাইভার।

কথা ছিল ১৮ই জানুয়ারী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাকে তৈরী হ'য়ে থাকতে বলেছিলেন। আমি তৈরী হ'য়ে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে মটরুদা এলেন। গাড়ী ভালোই কিনেছেন। কালো রং-এর 'ফোর্ড' গাড়ি, ১৯৪৭, মডেল। জিনিষপত্র উঠিয়ে যাত্রা করলাম।

*

মটরুদা নিজেই চালাচ্ছেন—পাশে বসেছি আমি, পিছনে সুমন্ত্র ও ড্রাইভার। হাওড়া থেকে রাস্তা ধরলাম। কিন্তু রাস্তায় ভীড় থাকাতে স্পীড্ দেওয়া যায় না। বর্দ্ধমান পৌঁছতে চারটে বাজল।

বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ও নতুন গুড়ের সন্দেশ

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে চা খেয়ে নেবার জন্য আমরা ষ্টেশনের ভেতরে ঢুকবার প্ল্যাটফরম টিকিট কিনতে গেলাম। টিকিট কিনবার জায়গার কাছে এক ঝুড়ি মিষ্টি, বেশ ভাল ভাবে প্যাক করা পড়ে থাকতে দেখে, সেদিকে সুমন্ত্রর দৃষ্টি পড়ল। সে মিষ্টির ঝুড়িটার দিকে একবার দৃষ্টি হানলে। তারপর কিছুক্ষণ পর ঝুড়িটা নেড়ে-চেড়ে দেখলে। ততক্ষণে প্ল্যাটফরম টিকিট কেনা হয়েছে আমাদের। আমরা দু'জনে প্ল্যাটফরমের ভেতরে খাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। সুমন্ত্র বললে—তোমরা যাও—আমি আসছি কিছুক্ষণ পর।' আমরা 'রিফ্রেসমেণ্ট' ঘরে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুমন্ত্র শিষ দিতে দিতে খাবারের ঝুড়িটা হাতে দোলাতে দোলাতে ঘরে এসে ঢুকল। ঝুড়িটা টেবিলে রেখে, একটা সুর গুনগুন ক'রে গাইলে। পাশের টেবিলের একটি লোক আমাদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করছিলেন। সুমন্ত্রকে মিষ্টির ঝুড়ি নিয়ে আসতে দেখে বললে, 'কি মিষ্টি আনলেন? মিহিদানা বুঝি?'

সুমন্ত্র অপ্রস্তুত হবার ছেলে নয়—ভিতরে যে কি মিষ্টি

আছে তা ত আর তার জানা ছিল না। হেসে উত্তর দিলে, "অত কথায় কাজ কি মশায়—খুললেই দেখতে পাবেন কি আছে। সে মনোযোগ দিয়ে মিষ্টির ঝুড়িটা খুলতে লাগল। ভিতরে ছিল সীতাভোগ ও নতুন গুড়ের সন্দেশ। সুমন্ত্র সবার প্লেটে সেগুলো ভাগ করে দিলে। চায়ের সঙ্গে কোন অজানা পথিকের ফেলে-যাওয়া মিষ্টি খেয়ে পেট ভরালাম। মনের ভেতরটায় বাধ বাধ ঠেকছিল। মনকে সান্ত্বনা দিলাম—'এতে কি আর দোষ।' যার মিষ্টি আমাদের পেটে গেল, তিনি হয়ত, এখন আসানসোল কিংবা কলকাতার দিকে ট্রেণে চলেছেন। তাঁর কপালে ছিল না। খেলাম মিষ্টি, কিন্তু মনটা শান্ত হ'ল না। কোথায় যেন একটা অস্বোয়াস্তির কাঁটা বিঁধে রইল।

•

জীব হত্যা

চায়ের পর্ব শেষ করে আমরা তাড়াতাড়ি আবার রওনা দিলাম। রাত ন'টায় ধানবাদ পৌঁছলাম, সেখানে রাতের খাওয়া সেরে আবার মোটর ছুটল 'জামসেদপুরের' পথে। রাত্রের অন্ধকারে নির্জ্জন রাস্তায় মোটর ছুটল ৬০।৬৫ মাইল স্পীডে। সুমন্ত্রের মোটর চালাবার সখ হ'ল সে সামনে এসে বসল। চালাতে জানে সে, কিন্তু সাবধান নয়—ফলে একটি দিশী গ্রাম্য কুকুরকে হত্যা করে সে আবার মটরুদার হাতে চালাবার ভার ফিরিয়ে দিলে।

জামসেদপুর

রাত দুটোর সময় জামসেদপুরের আলো দেখা গেল। কারখানার আলোয় আকাশ লালে-লাল। সেখানে গিয়ে আমার ভাই 'সুরেশে'র বাড়ী খুঁজে বার করা সম্ভব হ'ল না। উঠলাম গিয়ে সার্কিট হাউসে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকাল বেলায় সুরেশের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। সেদিন সুরেশের আর অফিস যাওয়া হ'ল না। ডিমনাতে বেড়াতে গেলাম। সেখানকার নানান রকম ফুলে ভরা বাগানে ঘুরে বেড়ালাম। ছবি তোলা গেল, তারপর বাড়ী ফিরে খাওয়া সেরে, বেলা চারটের সময় আবার রওনা দিলাম।

কেয়নঝড় হয়ে কটক

কটক যাবার পথে 'কেয়নঝড়' বলে একটি জায়গায় রাত্রিবাস করবার ইচ্ছে। কেয়নঝড়ে আমাদের বন্ধু 'মেহতা' ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। তার বাড়ীতেই খাওয়া ও রাত্রিবাস করলাম। রাত দশটায় কেয়নঝড় গিয়ে পৌঁছলাম। মেহতা মফঃস্বলে গেছেন। বাড়ীতে মেহতা-গিন্নী তাঁর দুই ছেলে নিয়ে আছেন। আমাদের আদর ক'রেই পাঞ্জাবী-পরোটা ক'রে খাওয়ালেন। সেই রাতে কেয়নঝড়ের জঙ্গলে মোটর নিয়ে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান গেল মেহতার ছেলেদের নিয়ে। কপাল ভালোই বলতে হবে—শিকার মেলে নি। মিললে যে কি করতাম তা বলা যায় না।...পরের দিন সকালে আবার রওনা হওয়া গেল। * * *

নদী পার হলাম একটা নৌকতে ক'রে মোটরশুদ্ধ। সন্ধ্যের সময় কটকে গিয়ে পৌঁছলাম। কটকে বহুকাল আগে একবার গিয়েছিলাম। এখানে আমার এক 'মাসি' থাকেন। তাঁরা এখনও ওখানেই থাকেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা ছিল না—বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য। মটরুদা কটকের 'পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফে'র ডিরেক্টর। বেশ চমৎকার বাংলোটি তাঁর। ফুল বাগানের সখ থাকাতে বাগানটি বেশ পরিপাটি।

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী কনারক ভ্রমণ। ১১ই মাঘ

মটরুদার বোন মিনুদি (শ্রীমতী মালতী দেবী) আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। বিয়ে হয়েছিল তাঁর শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে। তিনিও ছাত্র ছিলেন শান্তিনিকেতনের। সেই নবকৃষ্ণই স্বাধীন ভারতে তখন উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমরা ছাত্রাবস্থায় একই সঙ্গে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই, তিনি খুব খুশী হয়ে আমায় আদর ক'রে বসালেন। প্রায় পঁচিশ বছর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা, কিন্তু চিনতে অসুবিধা হয়নি। নানান পুরণো স্মৃতি জাগল ও কথাবার্ত্তা হ'ল। নবকৃষ্ণকে বললাম, "অল্পদিনের জন্য এসেছি কটকে—সুবিধে হ'লে কনারকটা দেখে ফিরবার ইচ্ছে।" নবকৃষ্ণ বললে, "এ আবার একটা কথা। কত 'টম-ডিক্-হ্যারি'কে আমরা 'কণারক' দেখিয়ে আনি—সরকারী পয়সা খরচ ক'রে। তোমরা হ'লে দেশের শিল্পী—তোমাদের কনারক দেখাবার বন্দোবস্ত করব না—এ কি হতে পারে?" একটা ষ্টেশন ওয়াগনের বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। আমরা সকলে পরের দিন রাত্রে 'কনারক' রওনা হব ঠিক হয়ে গেল। রাত্রে রওনা হবার কারণ যে দিনগুলিকে কাজে লাগান। অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সাধ্য দেখাশোনা করা। ১১ই মাঘের জন্য গানের রিহার্সাল করাও একটা কাজ মটরুদার ওপর ছিল। সন্ধ্যের সময় কটকের

'ব্রাহ্ম পরিবারের' ছেলেমেয়েদের জড় ক'রে গানের রিহার্সাল করা হচ্ছিল। উৎসাহের অন্ত নেই। গানের রিহার্সালের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত ন'টা-দশটার সময় আমরা কনারকের পথে রওনা দিলাম।

*

কণারক যখন পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে তিনটে হয়েছে। গভীর অন্ধকার রাত। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সমুদ্রের জলো হাওয়া। ঝাউ গাছের সোঁ সোঁ শব্দ। অন্ধকারে দিকভ্রম হ'ল। কনারক ডাকবাংলো সেই অন্ধকারে খুঁজে বার করা মুস্কিল হ'ল। বালির রাস্তায় আর মোটর চলে না। গাড়ী থামিয়ে, মোটঘাট নামিয়ে আমরা টর্চ নিয়ে ডাক-বাংলোর রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু ব্যর্থ হল আমাদের খুঁজে বেড়ানো। অগত্যা মন্দিরের কাছে ভাঙ্গা চাতালের ওপর রাত্রিবাস করবার জন্য সেখানে বিছানা-পত্র খুলে বিছিয়ে নিলাম। কেউএর ডাক, বার্কিং ডিয়ারের ডাক মাঝে মাঝে কানে আসছিল। সেই সঙ্গে সমুদ্রের গোঙ্গানি আর ঝাউএর সোঁ সোঁ শব্দ। সবাই ক্লান্ত ছিলাম ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হ'ল না।

সূর্য্য উঠবার আগে, পূর্ব্বাকাশ একটু ফরসা হয়েছে মাত্র—ঘুম ভেঙ্গে গেল। সামনের বিরাট কনারক মন্দির। বিছানা থেকে উঠে মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। তারপর ভাঙ্গা সিঁড়িও ধাপে ধাপে মন্দিরে উপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। কণারক মন্দিরের কথা বহু শুনেছি বহু ছবি দেখেছি মূর্ত্তিগুলো ভাস্কর্য্যের আদর্শ নিদর্শন কিন্তু নানান কারণে এর আগে কণারক দেখা আমার সম্ভব হয় নি।

নগ্ন পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের মূর্ত্তিগুলো সম্বন্ধেও নানান পণ্ডিতের নানান রকম গবেষণা পড়েছি, চাক্ষুষ দেখে আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল। ভালো কি মন্দ সে কথা মনে জাগলো না। অন্যান্য মূর্ত্তি অনেকগুলির ভাঙ্গা অবস্থা হলেও তাদের সম্পূর্ণতা আমাকে মুগ্ধ করল। স্তম্ভিত-মুগ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে মূর্ত্তিগুলো দেখে বেড়াতে লাগলাম।...সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ডাক-বাংলো খুঁজে বার করতে আর দেরি হ'ল না। এত কাছে ডাকবাংলো অথচ রাত্রের অন্ধকারে কোথায় লুকিয়েছিল কী জানি। মোটঘাট সেখানে চালান করে রান্নার ব্যবস্থা করতে হ'ল। আশেপাশের গ্রামের লোক কিছু সমাগম হ'ল। একজন গ্রামে হরিজনদের স্কুলের জন্য চাঁদা আদায় করতে এলো। বর্দ্ধমান ষ্টেশন থেকে মিষ্টির খুড়ি কুড়িয়ে আনার জন্য মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল।

* * *

সেটা উচিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল—মোটরে আসবার সময়। এইবার 'সুমন্ত্র'কে বললাম, পাপ স্খালনের জন্য। কনারকের হরিজনদের স্কুলে চাঁদা হিসাবে কিছু দান ক'রে আমাদের মনের দ্বিধা মোচন করলাম। খাওয়ার পর্ব্ব শেষ ক'রে আবার কনারক মন্দিরে গিয়ে দেখতে লাগলাম—মন্দিরের গা বেয়ে যতদূর ওঠা যায় উঠলাম। অপ্সরা ও নর্ত্তকী মূর্ত্তিগুলোর স্কেচ আঁকা হ'ল কিছু কিছু। সমস্ত দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যের সময় আমরা রওনা দিলাম। ফেরবার পথে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখলাম—স্বাধীন ভারতের উড়িষ্যার রাজধানী পুরোদমে গড়ে উঠছে তখন। তারই পাশ দিয়ে আমরা কটকের পথে ফিরে চললাম।

ছোটমাসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ

১১ই মাঘ। কটকের ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সকাল হ'তেই গিয়েছি হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার ধুতি-চাদর প'রে। গানের দলে অনেকে আছেন। মায়া—আমার এক মাসতুত বোন, সেও ছিল। অনেকদিন পর তার সঙ্গে দেখা। খুব বেশী হৃদ্যতা ছিল তাদের সঙ্গে এককালে—গিরিডির বাড়ীটাই যত গোলমাল সৃষ্টি ক'রেছিল। ছোট মেশোমশায় অবশ্য তখন মারা গেছেন। মায়াদের বড়বোন 'মীরা', সেও না কি জলে ডুবে মারা গেছে। 'কাঠজুড়ি' নদীতে স্নান ক'রতে গিয়ে আর ফেরে নি। বুড়ো বয়সে ছোটমাসিকে শোক পেতে হ'য়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে 'কটক' থেকে যাওয়া ঠিক হবে না। গিরিডির বাড়ী নিয়ে মনোমালিন্যটাই সব থেকে বড় কথা নয়। ১১ই মাঘ সকালে গান ও উপাসনার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে গেলাম বখরাবাদে—ছোট-মাসিদের বাড়ী। মায়ার বিয়ে হ'য়েছে—স্বামী উদীয়মান দাক্তার। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ......ছোটমাসি খুব খুসী হ'লেন। খাওয়ালেন নানান রকম মিষ্টি, চপ, সিঙ্গাড়া ও কচুরী। পুরানো কথা স্মরণ ক'রে কাঁদলেন খানিকক্ষণ। কটক্ থেকে ১১ই মাঘ রাত্রেই কলকাতা রওনা হ'লাম ট্রেণে। কলকাতার থেকে আবার সেই দেরাদুন। স্কুল খুলবার একদিন বাকী। আবার চলল গতানুগতিক কাজ। ক্রমশঃ

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

2nd December, 1916—কাল রাত্তিরে Macbeth দেখে এলাম। Screen version অবশ্য। Picture Palaceএ হ'ল। নেপাল-বাবুরা যাচ্ছিলেন ৯াটার showএ। তাঁদের সঙ্গেই জুটে গেলাম। ছবিটা লাগল ভাল, এ পর্য্যন্ত যত ফিলম দেখেছি তার মধ্যে খুবই ভাল। Macbeth সেজেছিলেন Sir Herbert Beerbohm Tree। তাঁর যত নাম, তত ভাল কিন্তু তাঁর অভিনয় লাগল না। খালি মনে হচ্ছিল বড় overactep হচ্ছে Lady Macbeth-এর অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছিল। Weird sisters-ও খুব ভাল। সেকালের Scotland এর বেশ একটা চিত্র পাওয়া গেল। ছবি দেখে সবাই খুশী, এবং দেখতে যাবার ঝোঁকে বইখানাও আর একবার আগাগোড়া পড়া হয়ে গেল, সেটাও একটা লাভ।

18th Dec.—আজকে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের ছবি টাঙান উপলক্ষ্যে একটা উৎসব হয়ে গেল। দিদির হঠাৎ অসুখ করল, কাজেই তাকে রেখে আমি আর বাবা গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য, কলকাতার গণ্যমান্যের দল ভেঙে পড়েছে। শিক্ষয়িত্রীদের বসবার ঘরে উপাসনার জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ঐ বিপুল জনসমাবেশের সকলকে মোটেই কুলোয় নি। শুধু মেয়েরা এবং দাস বংশের লোকেরা ঘরে বসলেন, বাবুরা বেশীর ভাগ বাইরে রইলেন। শাস্ত্রী মশায় (শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী) উপাসনা করলেন, এবং গান করলেন শ্রীমতী অমলা দাস। এমন গলা আর শুনি নি।

উপাসনার পর খাওয়ান হ'ল বেশ পাত পেড়ে। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়ে খেতে বসা গেল। বাঙালী সংসারে সাধারণ নিমন্ত্রণে যথেষ্টই গোলমাল হয়, এখানে আরও বেশি হল। কোন এক হোটেলে কনট্রাক্ট দিয়ে খাওয়ানটা হচ্ছিল, তারা খুব গুছিয়ে কাজ করতে পারছিল না। Mrs. K. N. Roy (শ্রীযুক্তা কামিনী রায়) এসে কিছু কথা বলে গেলেন। এর পর বাড়ী চলে এলাম। এসে দেখি দিদির অসুখ বেশ বেড়েছে। সারারাত তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে রইল। পরদিন সকালে নীলরতন সরকার মশায় এসে তাকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্র দিলেন, তখন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আজও একটা নিমন্ত্রণ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে হোষ্টেল আছে কলেজের মেয়েদের জন্যে, সেখানে হোষ্টেলবাসিনীরা একটা গানের জলসা ও ছোটখাট অভিনয় করলেন। দিদি যেতে পারল না, কাজেই আমি পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন চার সঙ্গিনী জোগাড় করলাম। বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন। সেখানেও দেখি ধুমধাম ব্যাপার। অনেক লোক এসেছে, বেথুন কলেজের প্রফেসরও দু'চারজনকে দেখলাম।

মেয়েরা গান গাইল, কনসার্ট বাজাল, তা ছাড়া "গান্ধারীর আবেদন" থেকে খানিকটা, আর "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" থেকে খানিকটা অভিনয় করে দেখাল। শকুন্তলা সেজেছিল মি—,তার চেহারাখানা যা খুলেছিল! একে সুন্দরী তাতে অত সাজের ঘটা। ঠিক যেন কালিদাসের নাটক থেকে এই উঠে এসেছে। তবে অভিনয় "গান্ধারীর আবেদনই" বেশী ভাল হয়েছিল। ন—ধৃতরাষ্ট্র সেজেছিল বেশ এক জোড়া গোঁফ লাগিয়ে। তাকে দেখে ত হাস্য সম্বরণ করাই মুস্কিল। মেয়ের সাহস আছে বটে, অতগুলি শুঁকোর সামনে গোঁফ পরে বসতে নেহাৎ যে-সে পারে না। গান্ধারী সেজেছিল স—। তাকে সুন্দর না দেখালেও striking দেখাচ্ছিল। অভিনয়টা খুবই ভাল করেছিল। দেখে-শুনে খুশী হয়েই বাড়ী ফিরলাম। তখন থেকে ঐ অনুষ্ঠানের এমন অজস্র প্রশংসা শুনেছি, যে নিজেরই অবাক্ লাগছে।

26th Dec.—আজ সকালে প্রশান্ত মহলানবিশের ঠাকুরদাদা শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ মারা গেলেন। ইনি পাড়ার বৃদ্ধতম ব্যক্তি ছিলেন। আমরা কলকাতায় এসে অবধি এঁকে দেখছি। তিনি বেশ ভালভাবেই গেলেন, নিজেও বেশী ভুগলেন না এবং আত্মীয়-স্বজনকেও বেশী ভোগালেন না।

7th January, 1917—আজ Convocation-এ গিয়ে ডিগ্রী নিয়ে আসা গেল। কলেজ থেকেই গিয়েছিলাম, কাজেই ধড়াচূড়া পরা মূর্ত্তিটা পাড়ার লোকদের দেখান হ'ল না। কলেজেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে গেলাম। সমস্ত অনুষ্ঠানটি বড়ই দীর্ঘকাল-

ব্যাপী হ'ল। তবে আশেপাশের লেডী গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে গল্প করে, এবং পিছনের প্রেসিডেন্সী কলেজের এম. এ.-দের নানারকম মন্তব্য শুনে সময় কাটালাম। বেথুনের নতুন মেমসাহেব লেডী প্রিন্সিপ্যাল সঙ্গে ছিলেন। এবারে অনেক সুন্দরী ডিগ্রী নিতে হাজির হয়েছিলেন। এবারকার Viceroyটি১ মোটেই Lord Hardinge এর মত সুপুরুষ নয়, তবে গলায় জোর আছে বটে। Vice Chancellor মহাশয়ও২ বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু তিনিও তিন ঘণ্টা ধরে খাড়া রইলেন এবং গলায়ও বিশ্রাম দিলেন না।

14th January—গত সোমবার ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রাইজ দেখতে গিয়েছিলাম। সেটা একে হ'ল দুপুর বেলা, তায় Lady Chelmsford-এর তাড়ায় আধ ঘণ্টার বেশি সময় খরচ করা হ'ল না। সব জড়িয়ে ব্যাপারটা খুব enjoyable হয় নি। তাড়াহুড়ো করে গিয়ে দেখলাম যে হলের সব জায়গা ভরে গিয়েছে, এমন কি প্যাসেজ-এও স্থান নেই। বাধ্য হয়ে পিছন দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকলাম, এবং একজন মোটা বন্ধুর সাহায্যে বসবার জায়গাও পেলাম। নদীদের গান এবং সাজ খুব সুন্দর হয়েছিল। শুনলাম নাকি যমুনার গানে "শ্যামরায়" নামটা থাকাতে কয়েকজন বুড়ো ভদ্রলোকের খুব রাগ হয়েছে। দু' একটা concert এবং drill-ও হ'ল। Lady Chelmsford খুব শুকনো দেখতে। একটা speech ছাড়া ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়কে আর কিছু দিলেন না। ব্যাপার শেষ হবার পর এদিক-ওদিক ঘুরে কিঞ্চিৎ দেখা-সাক্ষাৎ করে তবে বাড়ী ফিরলাম।

এর পরের দিন academic পোষাক পরে কয়েকজনে মিলে ফোটোগ্রাফ তুলবার ব্যবস্থা হ'ল। ঐ ব্যাপারে প্রায় সারাদিন কেটে গেল। ছবিটা তোলা হ'ল Vandyke নামের এক ষ্টুডিওতে। ছবি দেখে সবাই মহা খুশী, কিন্তু আমি ত নিজেকে প্রায় চিনতেই পারলাম না।

24 February—আজকে আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে একটা interesting বিয়ে হয়ে গেল। বরও আমাদের বন্ধু, কনেও আমাদের বন্ধু। শ্রীমান বিজলীবিহারী সরকারের সঙ্গে বিয়ে হ'ল শ্রীমতী সুনীতি মজুমদারের। বিয়ে হ'ল ভবানীপুরের এক বাড়ীতে, আমাদের প্রায় ট্রেনে চড়ে বিদেশ যাত্রার পর্ব্ব করতে হ'ল। গাড়ি চড়ে চলেইছি ত চলেছি। অবশেষে পৌছলাম। গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম কর্ত্তা শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশ্চর্য্য মনের জোর ভদ্রলোকের, এখন একেবারেই দেখতে পান না, কিন্তু সেটা যেন গ্রাহ্যই করছেন না। যাক, ফুলের মালা-টালা নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে গিয়ে ছাদের সামিয়ানার তলে আসন গ্রহণ করা গেল। আকাশ তখন কালো মেঘে ঢাকা, দেখতে দেখতে বেশ ঝড়ও এসে গেল। সামিয়ানা ত প্রায় ছিঁড়বার অবস্থা, ইলেক্‌ট্রিক বালবগুলো এ ওর সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে ভীম কোলাহল সুরু করল। একপাল বন্ধু-বান্ধব মিলে এক জায়গায় বসেছিলাম, সবাই চেঁচামেচি জুড়লাম। যাক, ঝড়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ চলেও গেল। বর-কনে এসে বসতে না বসতেই আকাশের গায়ে চাঁদ ফুটে উঠল। ঝুমু গান করল। লোকজন বেশ হয়েছিল, Diocesan কলেজ থেকে কয়েকজন মেম এবং অনেকগুলি বাঙালী তরুণী এসেছিলেন। হেরম্ববাবু আচার্য্যের কাজ করেছিলেন।

বিয়ে হয়ে যেতে একবার নীচে নামলাম, আবার উপরেই উঠলাম, খাওয়ার জন্যে। আমাদের খাওয়া চুকল ত ভাইদের খাওয়া আর হয়ই না। শেষে আর একজন escort জোগাড় করে কুড়ুকে ফেলে রেখেই প্রস্থান করলাম।

27th Feb.—সেই একই বাড়ীতে আজ সুনীতির বৌভাত হয়ে গেল। ফিরতে খুব দেরি হ'ল এবং সুনীতির দিদিশাশুড়ী শ্রেণীর দু' চারজন মহিলা বরকনেকে নিয়ে বেশ সনাতন রসিকতা করলেন। এতটা দেখা আমাদের অভ্যাস ছিল না। বেশ হাঁ হয়ে যেতে হ'ল।

4th May.—কাল রাত্রে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে Mary Carpenter Hall-এ "ডাকঘর" দেখতে গিয়েছিলাম। আশামুকুল এমন চমৎকার অভিনয় করেছিল যে, আমার বিশ্বাস "ডাকঘরের" লেখকও দেখলে খুশী হতেন ওর অভিনয়। নাটক শেষ হয়ে যাবার পর faint করে আশামুকুল রীতিমত ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল। মুলুর "ঠাকুর্দা"র ভূমিকায় অভিনয়ও বেশ হয়েছিল। ফিরবার বেলা আর গাড়ি পাওয়া যায় না। দীঘাপতিয়া ও কাশিমবাজার এই দুই জমিদারের বাড়ীর বিয়ের উৎসবে সব ঠিকাগাড়ি আগেই ভাড়া হয়ে গেছে শুনলাম। শেষে বুলা কোথা থেকে একটা গাড়ি জোগাড় করে আনল, তার সাহায্যে পার হলাম।

11th November (1917)—আজ টুলুর (ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা) গায়ে হলুদের

১। লর্ড চেম্‌সফোর্ড।
২। সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম। চেনাশোনা অনেক মেয়ে অবশ্য গিয়েছিল, তবে বেশীর ভাগই অচেনা, ব্রাহ্ম সমাজের মানুষ নয়। টুলুকে এত বেশী গহনা পরাণ হয়েছিল যে, আমরাই প্রায় তাকে চিনতে পারছিলাম না। তার কাছে বসে খানিকক্ষণ গল্প-স্বল্প করা গেল। অন্য দলের লোকগুলি যা গল্প করছিল, তাও খানিক শোনা গেল। বসে বসে যখন ক্লান্ত লাগতে লাগল, তখন বাইরে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে এলাম। ওঁদের ভাবী জামাই ভূপতিমোহন সেনের জ্যাঠামশায়ের বাড়ীর লোকেরা এসে একবার বেরিয়ে গেলেন।

খাওয়া দাওয়া বেশ দেরিতেই আরম্ভ হ'ল এবং মহিলারা যখন উঠলেন তখন দেখা গেল, যে পাতগুলি তাঁরা বসবার সময় যেমন খাদ্যপূর্ণ ছিল, উঠবার সময়ও প্রায় তাই আছে। আমরা অবশ্য এ দলের ছিলাম না।

15th November—আজ টুলুর বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের একটু আগে আগে যাবার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ সকাল সকাল হ'ল না, প্রায় বেলা ৪॥ টার সময় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন Reception Committeeর কেউ নীচে নামে নি, কাজেই নিজেরাই উপরে উঠে গেলাম। বাড়ীর মেয়েরা তখন কেউ চুল বাঁধছে, কেউ কাপড় পরছে, কেউ বা আর কাউকে বকছে। সকলের সঙ্গেই কথা বলে বলে বেড়াতে লাগলাম। কতবার যে সিঁড়ি ওঠানামা করলাম তার ঠিকানা নেই।

লোকজন ক্রমে আসতে আরম্ভ করল, কাজেই তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কনে যে কলেজে পড়ত সেখান থেকে কয়েকটি মেয়ে এল। আমারও সহপাঠিনী দু' চারজন এলেন। কথাবার্তা কইছি, এমন সময় false alarm উঠল যে বর এসে পড়েছে। সবাই উঠে বর দেখতে নীচে ছুটল। যদিও গিয়ে দেখা গেল যে বর মোটেই. আসে নি, তবু তখন আর কারো উপরে ফিরে যেতে ইচ্ছা করল না। বিবাহ-মণ্ডপের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। জায়গাটা সুন্দর সাজান হয়েছিল। লোকের ভীড় ক্রমে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করল। আমি অনেক কষ্টে একটা চেয়ার জোগাড় করে আমার স্কুলের ছাত্রী জীবনের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর সঙ্গে গল্প করতে বসলাম। হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী বলে উঠলেন, "ঐ দেখ রবিবাবু আসছেন।" তাকিয়ে প্রথমতঃ কিছুই দেখতে পেলাম না। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন এগিয়ে এসে জগদীশ বসু মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন, তখন তাঁকে দেখতে পেলাম। খানিকক্ষণ কথা বলার পর কে একজন তাঁকে নিয়ে গিয়ে বিবাহের বেদীর সামনে বসিয়ে দিয়ে এল। এই বিয়েতে আমি যত মানুষের ভীড় আর উপহারের ভীড় দেখেছিলাম এমন আর আগে কখনও দেখি নি। সুখের বিষয় এই বিষম ভীড়ে বিয়ের serviceটা বেশী লম্বা হয় নি। আচার্য্য সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বেশ সংক্ষেপেই সারলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেখলাম, কারণ আমার চেয়ারটা ইতিমধ্যেই বেদখল হয়ে গিয়েছিল। কনের দিদি অরুন্ধতী গান করল। প্রথম তিনটে গান বেশ ভাল হয়েছিল, শেষের গানের সময় গায়িকার একটু গলা ভেঙে গেল। সাধারণতঃ ব্রাহ্ম সমাজের বিয়েতে যে গানগুলো হয়, এবারে তার থেকে একটু departure দেখা গেল. এবং বৈচিত্রের জন্য ভালই লাগল। বিয়ের শেষে সপ্তপদী গমনও হ'ল।

বিয়ের শেষে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ গল্প হ'ল, উপরে তখন প্রচণ্ড কলরব চলছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন। অরুন্ধতীর গানের একটু সমালোচনা করলেন। কনের দিদিরা তাঁকে একটু মিষ্টিমুখ করাবার চেষ্টা করল। একটা ছোট বক্তৃতা দিয়ে সেটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন।

তারপর আরো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পালা, কতবার যে উঠলাম আর নামলাম তার ঠিকানা নেই।

কনের কাছেও বার দুই ঘুরে এলাম। কি লোকের ভীড়, বাপরে বাপ!

ইতিমধ্যে আবার দিদির জুতো হারিয়ে গেল। তার খোঁজ করে খানিক সময় কাটল। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ী ফেরা গেল।

27th December—কালকে সারাদিনটা কংগ্রেসে গিয়ে এবং সেখানে যাবার গোলমালেই কেটেছে। দুপুর বেলা বেরলাম। Wellington Square-এ, সে কি বিষম ভীড়! গাড়িই চলে না, ট্রাম সারি সারি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বাড়ীর পাঁচিলে আর ছাদে, এমন কি গাছগুলোর ডালে শুদ্ধ মানুষের মুণ্ডু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

কংগ্রেস মণ্ডপে ত পৌছলাম, সামনের গেট দিয়ে ঢোকাই গেল না, এমনি লোকের ঠেলা। অনেক ঘোরা-ঘুরি করে পিছনের একটা দরজা দিয়ে ঢোকা গেল। Lady volunteer-রা অভ্যর্থনা করে বসালেন। চেয়ারে বসেই diasটার দিকে দৃষ্টি দিলাম। অনেকে এসে বসেছেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম, কালো পোষাক পরে বসে রয়েছেন। (এই পোষাকে তাঁর একটি ছবি পরে গগনেন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন)। Pandal-এর ভিতর তখন

ভীষণ গোলমাল। বাইরের crowd এক-একটা চীৎকার সুরু করছে আর ভিতরের লোকেরা সেটা takeup করছে। চীৎকার সমানেই শুনছিলাম, তবে কে যে আসছে এবং কাকে যে cheer করা হচ্ছে, তা সব সময় বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কেবল দু'বার প্রচণ্ডতর চীৎকার শুনে বুঝলাম যে গান্ধীজী আর তিলক এলেন। মণ্ডপটার যা চেহারা হয়েছিল, এত রংএর সংমিশ্রণ এক ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমে গান হ'ল "সংগচ্ছদ্ধম্ সংবদদ্ধম্।" গানের দলে দীনুবাবুর চেহারাটা সবার আগে চোখে পড়ল। অতঃপর বিপিনচন্দ্র পাল উঠে অনেকগুলি টেলিগ্রাম পড়লেন। "বন্দেমাতরম্" গান হ'ল এরপর, গানটির খানিক খানিক অমলা দাস একলা গাইলেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এবার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর Indian Prayer পড়তে বললেন। তিনি উঠে দাঁড়াতেই কি কারণে জানি না খানিক গোলমাল হ'ল, কিন্তু তাঁর তূর্যধ্বনির মত কণ্ঠস্বর সব চেঁচামেচির উপরে বেজে উঠল। গোলমাল তখনই থেমে গেল। অতি অল্পক্ষণেই তাঁর পড়া শেষ হয়ে গেল। এরপর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মিসেস বেসান্টের নাম propose করলেন সভানেত্রীরূপে, আর দু'জন তাঁকে সমর্থন করলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন তাঁর বক্তব্য বললেন এরপর, বিশেষ কিছু শুনতে পেলাম না। এরপর সভানেত্রী মিসেস বেসান্ট উঠলেন বক্তৃতা করতে। দর্শকবৃন্দ প্রচুর হল্লা করে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বৃদ্ধা এত বয়সেও বেশ সুন্দর দেখতে। শাদা চুল, শাদা শাড়ী ও শাদা ফুলের মালায় তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। তাঁর energyও কিছুই কমে নি বার্দ্ধক্যের জন্যে। ঝাড়া তিন ঘণ্টা সমানে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। সব জড়িয়ে আজকের অধিবেশনটা বড় লম্বা হ'ল। শেষের দিকে লোকেরা আর বক্তাদের দিকে মনোযোগ দিতে পারছিল না, খালি হুড়মুড় করে ঢুকছিল আর বেরচ্ছিল। মিসেস বেসান্টের বক্তৃতার পর গান হ'ল "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি।"

এরপর বেরিয়ে এলাম, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তখন। বেরিয়ে আসাও শক্ত ব্যাপার, প্রায় আধঘণ্টা লাগল। পরদিন Theistic Conference-এ গেলাম। এমন কাণ্ড কারখানা কমই দেখেছি জীবনে। একেবারে দক্ষ-যজ্ঞ। এর তুলনায় কংগ্রেসের অধিবেশন খুব শান্ত-শিষ্ট হয়েছিল বলতে হবে। প্রথমে ত ঢুকতেই পারছিলাম না, volunteerরা প্রাণপণে মারামারি করে ঢুকিয়ে দিল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, আবহাওয়া তখনও বেশী উত্তপ্ত হয়নি। কিন্তু তখনও আসল মজাটা বাকি ছিল। হলে মানুষের ভীড় বেড়েই চলেছিল, কিন্তু তাতে ত ভয়ের কারণ কিছু ঘটেনি। সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু ঢোকার সঙ্গেই আসল ব্যাপার আরম্ভ হ'ল। সে কি কাণ্ড! উপরের হলের দরজা-জানলা সব ঝন্‌ঝন্ করতে লাগল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে ঘরটা এবার মাথার উপর ভেঙে পড়বে। সিটি কলেজের অনেক পুরনোবাড়ী, তার উপর আর বিশ্বাস কি? এক একটা rush আসে আর উপরে হৈ হৈ আওয়াজ ওঠে, ছেলের দল দুম্‌দাম করে দরজা বন্ধ করতে আরম্ভ করে। নীচের ভীড়টা উপরে তেড়ে এসে উঠবে এবং সবাইকে পিষে দিয়ে যাবে, এই ভয় হতে লাগল।

বক্তা ভাল ভাল অনেক ছিলেন, কিন্তু মনের তখন এমন অবস্থা যে কিছুই শুনি নি প্রায়। মিসেস নাইডুর বক্তৃতাটা খানিকটা শুনেছিলাম। কিন্তু তিনি শেষ অবধি বলতে পেলেন না। নীচের mob-এর দুর্দান্ত চীৎকার থামাবার জন্যে নীচে চললেন। ভদ্রমহিলার pluck আছে বটে।

বিজয়বাবু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি আরো অনেকে কিছু কিছু বললেন, কিন্তু কোনোটাতেই মন দিতে পারলাম না। অতঃপর বাড়ী ফিরলাম।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনেও গিয়েছিলাম। সেদিন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি, বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রথম দিন কিছুই শুনতে পাই নি, দ্বিতীয় দিন শোনার কোনো ব্যাঘাত হয় নি। আজকেও বড় বেশীক্ষণ ধরে বক্তৃতা চলল। শেষে টিঁকতে না পেরে একজন চেনা volunteerকে দিয়ে ক্ষুদুকে ডাকিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

কালকের Ladies' Conference-এর বিষয়ে বলবার বিশেষ কিছুই নেই। অতগুলো মেয়ে এক জায়গায় জড় হ'লে যা হয় তাই হ'ল। অর্থাৎ খাওয়া, গল্প করা, লোকের নিন্দা করা, পরস্পরের জামা, শাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা করা, সবই হ'ল। কুচবিহারের নূতন মহারাণী ইন্দিরাকে দেখলাম। বক্তৃতাদিও কিছু কিছু হয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই শুনি নি।

April 1918, Shanti Niketan—এক অধ্যাপকের শিশুপুত্রের নামকরণ উপলক্ষ্যে ভোজ হচ্ছিল। আশ্রম-বাসিনীরা সকলে খেতে বসেছিলাম এক সঙ্গে। বড়মা (হেমলতা দেবী) খবর দিলেন যে নিকটের কোন এক গ্রামে বাঘ এসেছে। গ্রামের লোকেরা সন্তোষবাবুকে তাদের উদ্ধার করতে যাবার জন্যে চিঠি লিখেছে।

সন্তোষবাবুর স্ত্রীর ত খবর শুনে চোখ কপালে উঠবার জোগাড়। তার আবার সেদিন কলকাতা যাবার কথা। বাঘের খবর আরো বিশদভাবে নেবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু বড়মা নিজেই বিশেষ কিছু জানতেন না, কাজেই কিছু জানা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ সেদিনই কলকাতায় যাচ্ছিলেন, তাঁর বড় মেয়েকে দেখতে। তাঁকে বিদায় দিয়ে এসে বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ীতেই বসেছিলাম, এমন সময় খুব উত্তেজনাপূর্ণ খবর এসে পৌঁছল। মুলু এসে জানাল যে বাঘের খবরটা নিতান্ত উপকথা নয়, এরই মধ্যে দু'জন লোককে বাঘটা জখম করেছে, তাদেরআশ্রমের হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। বাঘটা শুনলাম চিতাবাঘ। সে কাছেই তালতোড়ের একটা পুকুরের ধারে বসে আছে, কেউ তার কাছে যেতে সাহস করছে না। এরকম impending আশ্রম-পীড়ার সংবাদে যে বিদ্যালয়ে বিষম হৈ চৈ বেধে গেল, তা বলাই বাহুল্য। ক্রমে ক্রমে আরও নানারকম কথা শোনা যেতে লাগল। নেপালবাবুর স্ত্রী নাকি আগের রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন, সন্তোষবাবুর গোয়ালের পালের গোদা বড় মহিষটা শিকল ছিঁড়ে কাকে যেন তাড়া করে গিয়েছিল, ইত্যাদি। আমরা ত সে রাত্রে কেউ বা খোলা মাঠে, কেউ বা দরজা-জানলা খুলে ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রা দিচ্ছিলাম, বাঘমামা আরও একটু এগিয়ে এলে ভালরকম ফলার করে যেতে পারতেন। এরপর শুনলাম আদ্য বিভাগের কয়েকজন বড় ছেলে লাঠি ভোজালি প্রভৃতি নিয়ে বাঘ মারতে গিয়েছে। প্রথমে শুনেছিলাম বন্দুকও নিয়েছে, পরে জানলাম কথাটা ঠিক নয়। বন্দুক এ তল্লাটে একটাই ছিল সেটা সন্তোষবাবুর, এবং সেটা তিনি ছাড়া আর কারও ব্যবহার করবার অনুমতি ছিল না, কাজেই ছেলেরা সেটা নিতে পারে নি। এর মধ্যে দেখলাম আশ্রমের যত বড় এবং মাঝারি ছেলে, এবং দু'চার-জন মাষ্টারও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলেছেন। অতঃপর আমাদের কাজ হ'ল বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে পথের দিকে চেয়ে থাকা। ক্রমাগত লোকজন আসছে-যাচ্ছে আর নানারকম খবর দিচ্ছে। যখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তখন মুলু দূর থেকে চেঁচিয়ে জানাল যে বাঘটা মারা পড়েছে। কে মেরেছে সেটা অনেকবার করে জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পেলাম না। মুলু আবার দৌড়ে চলে গেল। তখন দেখলাম শিশু বিভাগের সব আণ্ডা-বাচ্ছারাও চলেছে, সকলেই সেই একপথে। আমরাও এবার বেরিয়ে পড়লাম, ভাবলাম দেখাই যাক্ না, ব্যাপারখানা যদি কিছু বোঝা যায়। যখন শান্তিনিকেতনের সীমান্তে এসে পৌঁছেছি তখন শুনতে পেলাম রাস্তার একটা লোক আশ্রমের একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করছে, "বাঘটা কে মারল হে?" চাকরটি খুব গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিল, "ইস্কুলের ছেলে বাবুরা।"

এমন সময় দেখা গেল সেই খোয়াইপারের তালবন থেকে ছেলের পাল খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছে। প্রথমে ত কারণ বুঝতে পারি নি, তারপর দেখলাম একটা গরুর গাড়িও বেরিয়েছে। ছেলের দল গিয়ে দুই মিনিটের মধ্যে সেখানাকে একেবারে ছেঁকে ধরল। আমরা তখন রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে সেই দিকেই চললাম। গরুর গাড়ি অপেক্ষাকৃত কাছে এলে দেখা গেল, তার উপর একখানা লাল গামছা ফ্ল্যাগ-এর মত করে ওড়ান হয়েছে। এ হেন বিজয় পতাকা দেখে ভয়টা একেবারে দূর হ'ল। এতক্ষণ একটু একটু ভয় ছিল যে হয়ত শিকারের বদলে কোন শিকারীকেই গাড়ি করে আনা হচ্ছে। সন্তোষবাবুর গোয়ালের কাছে এসে গাড়িটা এবং ছেলের দল একটু দাঁড়াল। সে কি অতি প্রচণ্ড উৎসাহ, সবাই মিলে এক সঙ্গে এত কথা বলে চলেছে যে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। উৎসাহ হবারই ত কথা, বাঙালী ছেলের কপালে কবে এরকম অ্যাডভেঞ্চার জোটে? উত্তেজনাটা একটু কমলে শ্যামকিশোর বলে একটি ছোট ছেলে বলল, "নরভূপদা আধঘণ্টা ধরে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেটাকে মেরেছেন।" বাকিরাও তৎক্ষণাৎ সুর ধরল, নরভূপের বীরত্বের সে কি আশ্চর্য্য বর্ণনা! প্রত্যেকেই নিজের মন থেকে অনেকখানি করে রং যোগাচ্ছিল। সন্তোষবাবুর বাড়ীর সামনে যখন গাড়িটা থামল, তখন কয়েকজন ছেলে বাঘটাকে গাড়ির উপর টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে একবার সবাইকে দেখিয়ে দিল। প্রাণীটি নিতান্ত ফ্যাল্না নয়, সাড়ে ছ ফিট হবে দৈর্ঘ্যে। তার গলাটা শিকারীরা প্রায় কেটে দু' টুকরো করে দিয়েছে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বলে একটি বড় ছেলের কাছে খানিকটা বিশদ বিবরণ পাওয়া গেল। তারা জন পাঁচ বড় ছেলে মিলে কার্য্য সমাধা করেছিল। তারা লাঠি-পেটা করেছে এবং নরভূপ ভোজালি দিয়ে কুপিয়েছে। তাকে কিন্তু একবারও দেখলাম না। বাঘটা তাকেই বেশী করে আঁচড়-কামড় দিয়েছে, সে তাই ফার্ষ্ট এইড-এর জন্য তাড়াতাড়ি দৌড়ে হাসপাতালে চলে গেছে। ছেলেরা এমন মরিয়া হয়ে লাঠিপেটা করেছিল বাঘটাকে যে তাতেই সে পড়ে যায়। আর উঠতে পারে নি। ওখানের এক ঘর ছোটখাট জমিদারও আছেন শুনলাম, তাঁরা একটা ভাঙা

গোছের বন্দুক ছেলেদের দিয়েছিলেন, তারা সেটাকে গদারূপে ব্যবহার করে তার দফা সেরে দিয়েছে। আশেপাশের গ্রামের লোকরা মজা দেখতে এসেছিল, কিন্তু একবার বাঘ এবং মানুষ জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে যাওয়ায় তারা ভয়ে সব পালিয়ে যায়। আশ্রমের ছেলেরা অত অসম সাহসী না হলে সেদিন তাদের মধ্যের দু' একজনের প্রাণহানি হওয়াও অসম্ভব ছিল না। শিকারশুদ্ধ গরুর গাড়ি ত আশ্রমে এসে পৌছল। সবাই ভেঙে পড়ল বাঘ দেখতে। ছেলের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে এ দিনের বিজয়ী বীরদের "কতে" দিতে সুরু করল।

রবীন্দ্রনাথকে ট্রেনেই 'ওয়ার' করা হ'ল, কলকাতার ঠিকানায় চিঠিও লেখা হয়ে গেল। বাঘের চামড়াটা tan করার ব্যবস্থা হতেও দেরি হ'ল না।

17th May, Calcutta—কাল রাত্রে খবর পেলাম সকাল ৭টায় বেলা দেবী মারা গিয়েছেন। বাবা জোড়াসাঁকো গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই শুনে এসেছেন। জোড়াসাঁকোয় একবার আমাদেরও যাওয়া উচিত, কিন্তু যেতে ভয় করছে। শোকপীড়িত যে কোন বাড়ীতেই যেতে আমি একটা বাধা অনুভব করি মনে, কিন্তু এক্ষেত্রে ত যেতেই হবে, যতই বাধা থাক। বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বাড়ীর সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথ সামনের বারান্দায় বসে আছেন। উপরে উঠতে উঠতে দেখলাম সেখানে প্রমথ চৌধুরী এবং রথীবাবুও আছেন। আমরা গিয়ে উপস্থিত হওয়াতে সকলে সামনের বসবার ঘরে ঢুকে গেলেন। আমরাও ভিতরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করলাম। মুখে শুধু বললেন, "বসো"। চেয়ে দেখলাম তাঁর মুখের রংটা যেন ছাইয়ের মত হয়ে গিয়েছে। মা আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেন জোর করেই কয়েকটা কথা বললেন। বাবা এতক্ষণ অন্য কোথাও ছিলেন বোধ হয়, এখন এসে ঘরে ঢোকায়, তাঁর সঙ্গেও একটু কথাবার্ত্তা বললেন। মাঝে মাঝে একেবারে চুপ হয়ে যাচ্ছিলেন। অনেকদিন থেকেই জানতাম যে এই দিনটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, কিন্তু চোখের উপর এই দৃশ্য দেখবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করি নি।

মীরা দেবী ও প্রতিমা দেবীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উঠে পড়লাম। সেখানে গিয়ে তবু কথাবার্ত্তা একটু বলতে পারলাম। বেলার শেষ সময়কার কথা কিছু কিছু শুনলাম। বহুলোক ক্রমাগত আসছিল, যাচ্ছিল। সকলেই চায় সমবেদনা জানাতে কিন্তু এক্ষেত্রে কথা বলা ত সহজ নয়? ক্রমে লোক এত বাড়ল যে, বিচিত্রার হলে গিয়ে শেষে বসতে হ'ল।

এত লোকের মধ্যে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা কথাবার্ত্তা বলতেই হ'ল। মুখের চেহারাটা কিন্তু কিছুই বদলাল না। আগন্তুকদের মধ্যে দু' একজন আজে-বাজে কথাও বলল বটে, তবু সেটাও একেবারে নীরবতার চেয়ে ভাল লাগল।

June 1918. ক্ষুদু বেঙ্গল লাইট হর্স-এ যোগ দেওয়ায় এখন প্রায়ই নানারকম বীররসাশ্রিত গল্প শুনছি। একদিন খানিকটা বিনা প্রয়োজনে ঘোরাও হয়ে গেল। ক্ষুদুর স্পোর্ট হবে শুনে আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে বালিগঞ্জ যাত্রা করলাম। প্রথমতঃ মাঠ বা বাড়ী কিছুই পাওয়া গেল না। অনেক ঘোরাঘুরি করে ত বাড়ী আবিষ্কার করে গেল, তারা মাঠের সন্ধান বলে দিল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আবার যাত্রা করা গেল। মাঠে পৌছেই প্রথমে আমার ভ্রাতাকে দেখতে পাওয়া গেল। তাঁর কাছে সুখবর শুনলাম যে বৃষ্টি হয়ে মাঠ ভয়ানক ভিজে গিয়েছে বলে স্পোর্ট হতে পারল না। অতএব আমরা ফিরলাম। যদিও স্পোর্ট দেখা হ'ল না, তবুও ঐ বৃষ্টির মধ্যে ভিজে হাওয়া খেতে খেতে মাইল দশেক ঘুরে আসাটা মন্দ লাগল না।

4th December. দিন কয়েক আগে এখানে Peace Celebration হয়ে গেল। আমি দেখার মধ্যে প্রথম দিন লাট সাহেবের 'ড্রাইভিং ইন ষ্টেটটা' দেখতে গিয়েছিলাম। ক্ষুদুর দল তার সঙ্গে যাবে, তাই একটু উৎসাহ ছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল বেশ খানিকক্ষণ। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়ানোতে আমাদের দেখার সুবিধা যত হোক বা নাই হোক, অন্যদের অর্থাৎ রাস্তার লোকদের আমাদের দেখে নেবার বেশ সুবিধা হয়েছিল। রাস্তার ভীড়ও হয়েছিল খুব। লাট সাহেবের driving দেখলাম বটে তবে in state কোথায় তা বিশেষ বোঝা গেল না। গোটা কয়েক Staring পাঠান সৈন্য, তারপর ফিটনে চড়া লাটসাহেব, সব শেষে Bengal light horse এর কয়েকজন, এইত ব্যাপার। তবু নিজের ভাইকে সামরিক সাজে দেখে ভালই লাগল। পরদিন ছাদে উঠেই illumination দেখা সাঙ্গ করেছিলাম। সেদিন আবার মেঘলা, কাজেই আলো বেশীক্ষণ রইল না।

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

(৭)

সহরে ফিরে আসার পর ব্যারনেসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। সামনের বাগানে ঢুকে চারিদিকটা একবার তাকিয়ে দেখলাম। বেশ বোঝা যাচ্ছিল শীতের অভ্যাগম হয়েছে। গাছগুলো থেকে সব পাতা ঝরে পড়েছে, বাগানের বসবার আসনগুলো সব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পথের উপরের ঝরাপাতাগুলোর উপর দিয়ে শীতের হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল—এর ফলে একটা অদ্ভুত খরখরে আওয়াজ হচ্ছিল।

ড্রয়িং রুমের বদ্ধ পরিবেশের ভেতর এসে বসলাম। ঘরের উত্তাপ গরম রাখবার জন্য স্টোভ জ্বলছে। দরজা, জানলা সব বন্ধ—যেন বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া না আসতে পারে। কোন জায়গায় কোন ফাটল থাকলে তাও কাগজ এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার যেন এই বন্ধ ঘরের ভেতর দম আটকে আসছিল।

ব্যারনেস খুব আন্তরিকভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন—কিন্তু তাঁর থমথমে মুখভাব দেখেই বুঝতে পারছিলাম কোন কারণে তাঁর মনটা খারাপ হয়েছে। আঙ্কল এবং ব্যারণের বাবাও সেদিন উপস্থিত ছিলেন, পাশের ঘরে ব্যারণের সঙ্গে তাঁরা তাস খেলছিলেন। আমি ও ঘরে গিয়ে সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলাম এবং আবার ব্যারনেসের সঙ্গে ড্রয়িং রুমে ফিরে এলাম। তিনি আলোর তলায় একটা আর্ম-চেয়ারে বসে কুরুশ কাঠি নিয়ে বয়ন শুরু করলেন। তিনি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইলেন, মনের বিষাদাচ্ছন্ন ভাবটা মুখে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল—তাঁকে কিন্তু এখন মোটেই সুন্দর লাগছিল না। আমাকেই একলা কথা চালাতে হচ্ছিল—তিনি কোন সময়েই জবাব পর্য্যন্ত দিচ্ছিলেন না—ফলে আমার কথাবার্তা যেন স্বগতোক্তিতে পরিণত হচ্ছিল। আমি চিমনির ধারে বসেছিলাম এবং দেখছিলাম ব্যারনেস সামনের দিকে ঝুঁকে—এজন্য তাঁর মাথাটা নুয়ে পড়েছিল—হাতের কাজ করে যাচ্ছিলেন। গভীরভাবে রহস্যময়ী, সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন এই মহিলা সময় সময় যেন বিস্মৃত হচ্ছিলেন যে আমি ওইখানে তাঁর সামনে বসে আছি। আমার এক একবার মনে হচ্ছিল হয়ত অসময়ে এঁদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছি; অথবা এভাবে আমার সহরে ফিরে আসাটাই কারও চোখে ঠিক ভাল ঠেকে নি। ঘরের চারিদিক দেখতে দেখতে, আমার দৃষ্টি এবার এসে পড়ল টেবিলের তলায় ব্যারনেসের পায়ের গুলফের ওপর। তাঁর পায়ের গুল দু'টি দেখলাম অতি সুন্দর আকৃতির—টানা লম্বা সাদা মোজার আবরণে ঢাকা পা দু'টি দেখেই যে কেউ বুঝতে পারে যে এমন সুন্দর যাঁর পদযুগল তাঁর সারা দেহটাই যে সুন্দর হবে তাতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

তখন মনে হয়েছিল অকস্মাৎ ঐভাবে আমি ব্যারনেসের সুগঠিত পদযুগল দেখে নিয়েছিলাম—কিন্তু পরে আমার ক্রমশঃ এ জ্ঞান হয়েছিল যে, কোন নারী যখন গুলফের উপরিস্থিত কোন অঙ্গ অনাবৃত রাখেন এবং পুরুষের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়, তখন আসলে ঐ নারী আত্মসচেতন ভাবেই তা করে থাকেন। যাইহোক যা দেখলাম তা আমাকে মোহিত করে দিল,—অন্য বিষয়ে আলাপ করাই বিধেয় হবে

বলে আমার সেই তথাকথিত প্রেমের ব্যাপার নিয়েই এবার আলোচনা শুরু করলাম।

এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন ব্যারনেস, আমার দিকে ফিরলেন, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন -'আপনি অন্ততঃ এই ভেবে গর্ববোধ করতে পারেন যে, প্রেমিক হিসাবে আপনি বিশ্বাসহন্তা নন'। আমার চোখ দু'টি কিন্তু তখনও টেবিলের তলায় ব্যারনেসের তুষার-শুভ্র ষ্টকিং-এ আবৃত পদদ্বয়ের সৌন্দর্য বিশ্লেষণেই ব্যাপৃত ছিল। চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে নিলাম এবং ব্যারনেসের চোখের দিকে তাকালাম—তাঁর চোখের তারাগুলো বড় বড় দেখাচ্ছিল এবং ঘরের আলো তাঁর মুখের উপর এসে পড়াতে বেশ জল জল করছিল।

'দুর্ভাগ্যবশতঃ সে গব করতে পারি বইকি'—শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিলাম।

এরপর কিছুক্ষণ একটা বেদনাদায়ক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। ব্যারনেস আবার তাঁর কুরুশ কাঠি নিয়ে বয়ন শুরু করলেন—এরপর হঠাৎ অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে তিনি স্কার্টটা তাঁর পায়ের গুলফ অবধি নামিয়ে আনলেন। এতক্ষণ ধরে এখানে যে সম্মোহনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হ'ল। অবসন্নভাবে এবং উদাস দৃষ্টিতে ব্যারনেসকে দেখতে লাগলাম—মনে হ'ল ঐ মহিলা পোষাকে-আশাকে মোটেই সুসজ্জিত নন—এঁকে দেখে পুরুষের মনে কোন কামনার উদ্রেক হতে পারে না। অসুস্থ বোধ করছি বলে মিনিট পনের সময় অতিবাহিত হবার আগেই বিদায় চেয়ে নিলাম।

এ্যাটিকে ফিরে এসে আমার সেই নাটকটি নিয়ে বসলাম —এর আগেই ঠিক করে ফেলেছিলাম নাটকটিকে আবার নতুন করে লিখব। এই নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক প্রেমকে ভুলে থাকতে হলে আমাকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। আর এ ধরনের প্রণয় এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাপ যার প্রতি আমার ছিল স্বাভাবিক বিরাগ, বীতস্পৃহা, ভীতি এবং ঘৃণা। আমার শিক্ষা এবং সংস্কারও এ ধরনের প্রেমের থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দিচ্ছিল। আর একবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে এ বাঁধন আমাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে।

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করল। এর দু'দিন বাদে এক বইয়ের সংগ্রাহক—এ ভদ্রলোক সহর থেকে বেশ দূরে থাকতেন—তাঁর গ্রন্থাগারের বইয়ের ঠিকমত তালিকা তৈরী করে দেবার জন্য আমাকে কাজ দিলেন। একটা বিরাট ঘরে—সপ্তদশ শতাব্দীর একটি জমিদার বাড়ীর অংশ—এসে বসলাম আমার নতুন কাজের তদারকের জন্য,—চারপাশের দেয়ালের ধারে ধারে থাকে থাকে বই সাজানো রয়েছে—থাকগুলো প্রায় সিলিং অবধি উঠেছে। এই ঘরে বসে আমার কল্পনাশক্তির রাশ আলগা করে দিলাম—যার ফলে আমার মনটা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর ভেতর দিয়ে বিচরণ করে বেড়াতে লাগল। সমস্ত সুইডিস সাহিত্যই ওখানে সংগৃহীত ছিল—পঞ্চদশ শতাব্দীর পুরাণো প্রিণ্টস থেকে সুরু করে আধুনিক প্রকাশিত সাহিত্য অবধি। কাজের ভেতর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত করে ফেললাম, কারণ নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা ভুলে যেতে চাইছিলাম—এ বিষয়ে সাফল্য লাভও করলাম। এক সপ্তাহ এই ভাবে কেটে গেল, ওদের সঙ্গে যে এই ক'দিন দেখা হয় নি, সে কথা মনেও পড়ল না। শনিবারে অর্থাৎ যে দিনটাতে ব্যারনেস বিশেষভাবে বাড়ীতে থাকতেন, একজন অর্ডারলি ব্যারনের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে এসে হাজির হ'ল—চিঠিটায় ব্যারন এতদিন তাঁদের দূরে সরিয়ে রেখেছি বলে খুব অনুযোগ দিয়ে লিখেছেন। খানিকটা খুশী, খানিকটা দুঃখিত—এই মনোভাব নিয়ে জবাবে খুব ভদ্রভাবে জানালাম যে তাঁদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কারণ এখন আমার হাতে নিজের বলতে কোন সময় ছিল না।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও এই একই নিয়মে কাটল—আর একজন অর্ডারলি এবার ব্যারনেসের চিঠি নিয়ে হাজির হ'ল—সংক্ষিপ্ত পত্রে ব্যারনেস অনুরোধ করেছেন সর্দিতে শয্যাগত তাঁর স্বামীকে আমি যেন একবার দেখতে যাই। আমার খবরের জন্যও তাঁরা উদগ্রীব—এরপর আর অজুহাত দেখিয়ে না যাওয়া চলে না - সুতরাং এবারে যেতেই হ'ল।

ব্যারনেসের চেহারাটা খুব ভাল দেখাচ্ছিল না। ব্যারনও সামান্য অসুস্থ—তিনি বোধ হয় খুব অস্বস্তিবোধ করছিলেন। ব্যারণ ঘরে শুয়েছিলেন। আমাকে বলা হ'ল তাঁর শোবার

ঘরে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতে। আমার অবশ্য এ প্রস্তাব শুনে বিশ্রী লাগছিল—কোন দম্পতির শোবার ঘরে যাওয়া—যেখানটা শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব থাকবার জায়গা—কোন কারণেই সেখানকার প্রিভেসী নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়—সে ঘরে আমি যাব? এই চিন্তাটাই আমার পক্ষে ন্যক্কারজনক মনে হচ্ছিল। বড় খাটের একপাশে ব্যারন শুয়েছিলেন—তাঁর পাশে কয়েকটি বালিশ রাখা ছিল, দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ওই জায়গাটা ব্যারনেসের শোবার স্থান—ড্রেসিং টেবিল, ওয়াস ষ্ট্যাণ্ডস, তোয়ালে প্রভৃতি যা-কিছু নজরে পড়ছিল সবই আমার নোংরা এবং অপবিত্র মনে হচ্ছিল—নিজেকে অন্ধের সামিল করে তুললাম, যেন এ সব কিছুই আমার চোখে পড়ছে না—এই ভাবে অন্তরের বিতৃষ্ণাকে দমন করলাম।

শয্যার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে দু'একটি কথা বললাম ব্যারনের সঙ্গে। তারপর ব্যারনেস আমাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে এলেন এবং এক গ্লাস লিকিওর দিলেন পান করতে। এরপর ছোট ছোট কথায় তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে সুরু করলেন আমার কাছে। তারপর প্রশ্ন করলেন—এ ধরনের জীবন শোচনীয় নয় কি?

অর্থাৎ?

আপনি বেশ বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাই।··· মেয়েদের জীবনটাই হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন······ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই···সত্যিকার করবার মত কাজও নেই। এ ধরনের জীবন আমাকে যেন কুঁকরে কুঁকরে খেয়ে ফেলছে!

কিন্তু ব্যারনেস আপনার ত সন্তান আছে! অল্পদিন বাদেই তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে— তা ছাড়া আরও ছেলেমেয়ে হতে পারে···

আমার আর সন্তান হবে না। আমি কি পৃথিবীতে একমাত্র সেবিকার কাজ কববার জন্য এসেছি?

সেবিকা নয়—মা হতে, সত্যিকার মা বলতে যা বোঝায় ···সেই মায়ের কর্তব্য পালন করতে।

মা নয়—বলুন, হাউস-কিপার হতে। আপনাকে ধন্যবাদ। পয়সা খরচ করলেও হাউস-কিপার পাওয়া যায়। সেটা অনেক সহজ। কিন্তু তারপর? কি ভাবে আমি নিজেকে ব্যাপৃত রাখব। আমার দু'জন দাসী আছে, তারাই সুন্দরভাবে গৃহস্থালীর কাজ করতে পারে। না! আমি বাঁচার মত বাঁচতে চাই।

মঞ্চে অভিনয় করতে চান কি?

হ্যাঁ।

কিন্তু তা ত সম্ভব নয়।

সে কথা আমিও বেশ ভালভাবেই জানি। এবং এ বিষয়ে সাহস করে কিছু করতে পারি না বলে নিজের উপর বিরক্ত হই—এমন কি নিজেকে বোকা বলেও মনে হয়··· এই চিন্তাটাই আমার কাল হয়েছে।

আপনি ত সাহিত্যকে পেশা হিসাবে নিতে পারেন? ষ্টেজে নামলে যেমন বদনাম হবে, সাহিত্যিক হলে ত আর সে ভয় নেই?

ব্যারনেস বললেন—দেখুন আমি মনে করি সমস্ত কলা-শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নাট্য-শিল্প—আমার জীবনে যাই ঘটুক না কেন, এ দুঃখ আমার কখনও যাবে না যে সাংসারিক কারণে আমার পেশাকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আর তার বদলে পেয়েছি কি? তীব্র হতাশা!

এবার ব্যারণ আমাদের ডাক দিলেন এবং আমরা পাশের ঘরে তাঁর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্যারন জিজ্ঞেস করলেন তাঁর স্ত্রী আমাকে কি বলছিলেন।

আমরা রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম—আমি উত্তর দিলাম।

আমার স্ত্রী থিয়েটার সম্বন্ধে একেবারে পাগল।

যতটা পাগল তুমি মনে কর ততটা নয়—এই বলে বেশ বিরক্তিভরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ব্যারনেস এবং দরজাটা জোরের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে গেলেন।

ব্যারন আমাকে বললেন যে তাঁর স্ত্রী সারারাত্রি ঘুমোন না।

প্রশ্ন করলাম—তাই বুঝি?

কখনও পিয়ানো বাজাতে থাকে, কখনও সোফার উপর গিয়ে হেলান দিয়ে বসে, অথবা জমাখরচের খাতা নিয়ে হিসাব-নিকাশ করতে সুরু করে দেয়। আচ্ছা, আপনিই আমাকে বলুন এ সব পাগলামি বন্ধ করি কি করে?

বড় সংসার হলে হয়ত এসব বিষয়ে চিন্তা করবার অবসর পাবেন না ব্যারনেস।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ব্যারন। তারপর জবাব দিলেন—আমাদের প্রথম সন্তান হবার পর আমার স্ত্রী অনেকদিন অসুস্থ হয়েছিলেন···ডাক্তার তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল···আর তা ছাড়া, ছেলেমেয়ে মানুষ করার খরচও ভয়ানক বেশী···আপনি ত বুঝতেই পারেন ?

বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আর কখনও এ বিষয় নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করি নি।

এর পর ব্যারনেস তাঁর শিশু মেয়েটিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং তাকে একটি ছোট লোহার খাটে বিছানায় শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মেয়েটি কিছুতেই পোষাক ছেড়ে শুতে যাবে না—চীৎকার করতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ এ নিয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর ব্যারনেস মেয়েকে বেত মেরে শায়েস্তা করবেন বলে ভয় দেখালেন।

আমার সামনে শিশুদের প্রতি অত্যাচার করলে আমি কিছুতেই রাগ সামলাতে পারি না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একদিন আমার নিজের বাবার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও অনধিকার চর্চা করলাম—বেশ রাগতস্বরে বললাম—আমি ওকে শান্ত করছি······শিশুরা বিনা কারণে কখনও কাঁদে না।

ও অত্যন্ত দুষ্টু !

এই দুষ্টুমির পেছনেও নিশ্চয় কোন কারণ আছে। হয়ত ওর ঘুম পেয়েছে, কিংবা আমাদের উপস্থিতি ; বা লাইটের আলো ও মোটেই পছন্দ করছে না।

আমার কথা শুনে ব্যারনেস প্রথমটায় কি রকম হকচকিয়ে গেলেন—তিনি বোধ হয় একথাও বুঝতে পারছিলেন যে মেয়ের প্রতি তাঁর এই ধরনের ব্যবহার দেখে আমি বেশ বিরক্ত হয়েছি।

ব্যারনেসের হোম-লাইফের যে সামান্য পরিচয় পেলাম তার ফলে কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রেমাবেগটা বেশ স্তিমিত হয়ে এল—আমি স্বীকার করছি যে ওই বেত মেরে মেয়েকে শাসন করার চেষ্টাটাই আমাকে মোহমুক্ত হতে সব থেকে বেশী সাহায্য করেছিল। ক্রমশঃ ক্রিশমাসের সময় এগিয়ে এল। সদ্য-বিবাহিত এক দম্পতি—এঁরা ব্যারনেসের বন্ধু, ফিনল্যাণ্ড থেকে এখানে এলেন। এঁরা আসাতে আবার যেন আমাদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জেগে উঠল—আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভেতর কিছুকাল থেকে যে ফাটল ধরেছিল, এঁরা আসাতে সেটা যেন জোড়া লেগে গেল। ব্যারনেসের কৃপায় এ সময় আমার কাছে অনেক জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। ইভনিং ড্রেসে সজ্জিত হয়ে আমি অনেক সাপার এবং ডিনার পার্টিতে যোগ দিতে লাগলাম—নীচের আসরগুলোতেও।

ব্যারনেসের এই বিশেষ জগতে মিশতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করলাম এ পরিবেশে সব থেকে অভাব হচ্ছে মর্যাদাবোধের। এও লক্ষ্য করলাম অতিরিক্ত সারল্যের ভাব দেখিয়ে ব্যারনেস আসলে অল্প বয়সের তরুণদের নিয়ে একটু বেশী মত্ত হয়ে ওঠেন এবং লুকিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন তাঁর ব্যবহারে আমি কতটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছি।

ব্যারনেসের এই উগ্র ছেনালিপনা দেখে আমি মনে মনে খুবই বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করছিলাম—তাঁর আচরণে এমন একটা নির্লজ্জতা দেখছিলাম যা আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর বলে মনে হচ্ছিল। যাই হোক, আমি একটা নিরাসক্ত ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে এ সবকে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করছিলাম। আমি যে নারীকে শ্রদ্ধা করতে চাই, সে যদি ভালগার ককেটের মত ব্যবহার করে, তার থেকে বেশী পীড়াদায়ক ব্যাপার আর কি হতে পারে ?

ব্যারনেস অনেক সময়েই পার্টি দিতেন এবং এই সব পার্টিতে হৈ হুল্লোড় করে সময় কাটাতে খুব ভালবাসতেন। উৎসবকে যতটা দীর্ঘ করা সম্ভব তাই তিনি করতেন—ফলে এই জাতীয় নৈশ সম্মিলনের সমাপ্তি ঘটত বেশীর ভাগ সময়েই পরের দিন সকালে। আমার ক্রমশঃ দৃঢ় ধারণা হতে লাগল যে ব্যারনেস মোটেই তাঁর সাংসারিক জীবনে পরিতুষ্ট এবং সুখী নন। গৃহস্থালীর ব্যাপারটা তাঁর অত্যন্ত একঘেয়ে লাগে এবং তাঁর শিল্পী হতে চাইবার তীব্র বাসনার মূলেও রয়েছে ক্ষুদ্র অহংবোধ, অর্থাৎ নিজেকে কিভাবে অন্যের কাছে তুলে ধরে আত্মপ্রচার এবং প্রশংসা লাভ করা যায় এই ছিল তাঁর অন্তরের বাসনা। প্রাণবন্ত, উচ্ছল যৌবনাবেগপূর্ণ এবং সদা-চঞ্চল ব্যারনেস বেশ ভালভাবেই জানতেন কি কৌশলে নিজেকে সবার সামনে চাকচিক্যমণ্ডিত এবং মোহনীয় করে তুলবেন। যে কোন পার্টিতেই তিনি হয়ে পড়তেন কেন্দ্রবিন্দুর মত—তাঁর স্বাভাবিক দৈহিক সৌন্দর্যের

জন্যই যে এটা সম্ভব হ'ত সেকথা বললে ভুল হবে—আসলে ব্যারনেসের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে কোন লোককে তাঁর দিকে আকর্ষণ করবার। তাঁর তীব্র জীবনীশক্তি, স্নায়বিক উত্তেজনা তাঁকে এমন আকর্ষণীয় করে তুলত যে দুর্দান্ত পুরুষেরাও আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করত এবং তাঁর চারপাশে জড় হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুনতে থাকত। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি—যখনই দেখতাম ব্যারনেসের স্নায়বিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্মোহন করবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়ে যেত—এই সব সময় দেখতাম তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় কোন এক জায়গায় একা বসে আছেন, তাঁর অস্তিত্বও যেন অন্যেরা বিস্মৃত হয়েছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন, ক্ষমতাপ্রিয়, সম্ভবত-হৃদয়হীন এই মহিলা সব সময়েই সচেষ্ট থাকতেন পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য, মেয়েদের সঙ্গ এবং সঙ্গলাভের জন্য তাঁর বিরাট নিরাসক্তির ভাবটাই আমার চোখে পড়েছে সব সময়।

এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম যে ব্যারনেস চান আমি সব সময় তাঁর পদপ্রান্তে বসে থাকি, তাঁর কাছে নতি জানাই, প্রেমাহত অবস্থায় নিরুপায়ের মত ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকি। একদিন—তার আগের দিন উৎসবে ব্যারনেস বিজয়িনীর মত সবার উপর তাঁর বিধাক্ত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন—তাঁর এক বান্ধবীকে বলেছিলেন যে আমি তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। দু' একদিন বাদে এই বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে আমি জানিয়েছিলাম যে একটু বাদেই ব্যারনেস সেখানে আসবেন। বান্ধবীটি হেসে উঠে মন্তব্য করলেন—আপনি তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। আপনি কি নিঠুর বলুন ত?

সত্যিই আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসি নি—ব্যারনেসের সঙ্গে পূর্ব ব্যবস্থামত এখানে এসেছি।

তা হ'লে এটা একটা ট্রাষ্ট বলুন?

তা বলতে পারেন। যাই হোক আপনার এখানে কত তাড়াতাড়ি এসে হাজির হয়েছি বলুন ত?

সত্যিই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা ব্যারনেসই ঠিক করেছিলেন। তাঁর আজ্ঞা মতই আমি তাঁর বান্ধবীর বাড়ীতে এসেছিলাম। অথচ নিজের মান বাঁচাবার জন্য ব্যারনেস এ ব্যাপারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন।

এরপর আমি ব্যারনেসের কয়েকটি পার্টি একেবারে নষ্ট করে দিলাম—কারণ ঐ সব উৎসবে আমি না যাওয়াতে ব্যারনেস সুযোগ পেলেন না অন্যের সঙ্গে ফ্লার্ট করে আমার উপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে। কিন্তু আমাকেও এর জন্য কম অশান্তি ভোগ করতে হয় নি। যে যে বাড়ীতে ব্যারনেস উৎসবে যোগ দিতে যেতেন, আমি অলক্ষ্যে থেকে স সব বাড়ীর উপর নজর রাখতাম—জানলা দিয়ে হয়ত চোখে পড়ল নীল সিল্কের পোষাকে সজ্জিতা ব্যারনেস পার্টনারের বাহুতে হেলান দিয়ে সঙ্গীতের তালে তালে নাচছেন, আমার মনে হ'ত কে যেন আমার হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে, তীব্র হিংসায় আমি রাগে কাঁপতে থাকতাম।

(৮)

নতুন বছর এসে গেল—সামনে বসন্ত ঋতু আগতপ্রায়। সারা শীতকালটা আনন্দ উৎসবে, ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তিনজনে ভালই কাটিয়েছি। নিজেদের ভেতর ঝগড়া হয়েছে, পুনর্মিলন ঘটেছে, একজন আর একজনকে বিরক্ত করেছি, আবার সখ্যতা ঘটেছে। দূরে চলে গেছি, আবার ফিরে এসেছি। মার্চ মাস এসে গেল, এই মাসটাকে এখানে বলা হয় ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। এই সময়টায় নরনারীর অনুভূতির ক্ষমতাটা অত্যন্ত স্ফীত হয়ে ওঠে; প্রেমিক-প্রেমিকারা সাধারণতঃ এই সময়ে নিজেদের সম্পর্কটাকে একটা পরম পরিণতিতে আনবার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ নিজেদের দীর্ঘ প্রতিশ্রুতিকে ছিন্ন করে ফেলে নতুন সঙ্গীর সাহচর্যের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। সমাজ, প্রতিষ্ঠা, বন্ধুত্ব সবকিছু খাটো হয়ে পড়ে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত অন্তরাবেগের কাছে। মাসের প্রথম দিকে ব্যারণ ছিলেন ডিউটিতে—তিনি একদিন গার্ড হাউসে তাঁর সঙ্গে কাটাতে অনুরোধ জানিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আমি হচ্ছি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ—মধ্যবিত্ত ঘরে আমার জন্ম হয়েছে সুতরাং দেশের সর্বাধিক বড় শক্তির অর্থাৎ সামরিক লোকেদের কাছাকাছি হবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। দু'জনে পাশাপাশি চলছিলাম। যাতায়াতের পথ দিয়ে আমরা

হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম—অফিসারদের স্যালুট, তরোয়ালের ঝনঝনানি এবং থেকে থেকে প্রহরীদের 'হু গোজ দেয়ার' হুমকি, ড্রাম বাজানোর শব্দ শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। ক্রমে গার্ড রুমে এসে হাজির হলাম—এখানকার মিলিটারী ডেকরেশনস্, বড় বড় জেনারেলদের তৈলচিত্র আমার অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে দিল। এই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে কাপ্টেনের (অর্থাৎ ব্যারণের) ব্যক্তিত্ব যেন ভয়ানক গুরুগম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল—আমি তাঁর পাশে পাশেই থাকছিলাম, কারণ তাঁর কাছে না থাকলে অপরিচিত আমাকে দেখে কেউ হয় ত অপমান করে বসতে পারেন!

আমরা এসে ঘরে ঢুকতেই একজন লেফটানেণ্ট উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল—আমার মনে হতে লাগল আমিও অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে যার জন্ম—যেন এই সব উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারদের থেকে পদমর্যাদায় বড়। এই লেফটেন্যান্টরাই সাধারণ শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় দুর্ব্যবহার করে থাকে—এরা যদি কোন উৎসবে যোগ দেয়, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর যুবতীরা এদের দিকেই বেশী করে ঝোঁকে। একজন সৈনিক একটি বোল্ অভ্ পাঞ্চ নিয়ে এল—আমরা আমাদের সিগার ধরিয়ে বসলাম। ব্যারণ আমাকে খুশী করবার জন্য রেজিমেণ্টের গোল্ডেন বুকটি খুলে দেখাতে লাগলেন—তাতে কলাশিল্পানুমোদিত অনেক স্কেচেস ছিল, জল রং-এর ছবি এবং ড্রয়িং। ছবিগুলো সবই নামডাকওয়ালা অফিসারদের—যাঁরা বিগত কুড়ি বছর ধরে রয়েল গার্ডস-এর অফিসার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে জন্মানোর দরুণ এইসব আর্মি অফিসারদের প্রতি আমার মনে একটা স্বাভাবিক বিরূপতার ভাব ছিল। ছবি দেখতে দেখতে আমি তাই এদের নিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে লাগলাম। ব্যারণ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত—সুতরাং তাঁর জনমনের প্রতি ভাবটা বিশেষ উদার ও বিস্তৃত ছিল না। সুতরাং আমার বিদ্রূপগুলো তিনি ঠিক মন থেকে উপভোগ করতে পারছিলেন না—বেশ বুঝতে পারছিলাম আমাদের ভেতরকার জন্মগত শ্রেণী বিরোধের ভাবটা কিছুতেই অপসৃত হবার নয়। তিনি তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলেন এবং একটি বড় ড্রয়িং অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের বিদ্রোহের সময়ের ছবির কাছে আসলেন।

বিদ্রূপাত্মক মৃদু হাসির সঙ্গে ব্যারণ মন্তব্য করলেন—এ ছবিটা দেখুন! কিভাবে আমরা জনতার উপর আক্রমণ করেছিলাম।

আপনি নিজে কি এই আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন?

অংশ নিই নি! আমি সেদিনটা ডিউটিতে ছিলাম এবং আমার উপর আদেশ ছিল মনুমেণ্টের বিপরীত দিকটা রক্ষা করবার, অর্থাৎ জনতা যেদিকে আক্রমণ চালাচ্ছিল। এক টুকরো পাথর এসে আমার হেলমেটে আঘাত হান্‌ল। এরপর আমি কার্তুজগুলো সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলাম—এমন সময় একজন রাজদূত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আমাদের সামনে থেমে পড়ল—সে বার্তা নিয়ে এসেছিল যে আমরা যেন কোন কারণেই জনতার উপর গুলী না চালাই—এদিকে ক্রমাগত আমাদের লক্ষ্য করে জনতার লোকেরা পাথরের টুকরো ছুঁড়ছিল। সরকারের জনগণের প্রতি সহানুভূতির ফল এইভাবেই সেদিন আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার হাসতে হাসতে তিনি বললেন—এই ঘটনার কথা কি আপনার মনে আছে?

সম্পূর্ণ মনে আছে। সেদিন আমি ছাত্রদের মিছিলের সঙ্গে ছিলাম। —অবশ্য একথা ব্যারণকে বললাম না যে, যে জনতার উপর তিনি গুলীবর্ষণ করবার উদ্যোগ করেছিলেন আমি তারই ভেতর ছিলাম। জাতীয় উৎসবের দিনে ওই জায়গার একটা বিশেষ স্থানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শুধু সম্মানিত লোকেরাই সেখানে যেতে পারবেন এই ছিল সরকারের নির্দেশ—আমার ন্যায়বিচারবোধ এ ধরনের পক্ষপাতিত্ব-পূর্ণ নির্দেশকে জনসাধারণের ক্ষমতার প্রতি অযথা হস্তক্ষেপ হিসাবেই মনে করেছিল—তাই আমি বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে সৈনিকদের দিকে ক্রমাগত পাথরের টুকরো ছুঁড়েছিলাম।

ব্যারণ যখন আভিজাত্যপূর্ণ ঘৃণার সুরে "মব্" শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন, তখন আমিও উপলব্ধি করছিলাম এই জায়গাটা আমার পক্ষে শত্রুপুরী। আমার এবং ব্যারণের ভেতর রয়েছে জন্মগত শ্রেণীবিদ্বেষ। আমাদের একের

অন্যের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশার পথে রয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা —আমাদের বন্ধুত্বটাও মেকী—দু'জনের ভেতর একমাত্র বন্ধনী হচ্ছেন একজন নারী। ব্যারণ যেন ক্রমশঃ এই পরিবেশে উদ্ধত ও রুক্ষ হয়ে উঠছিলেন। তাঁর এই আভিজাত্যের গর্বকে সংযত করবার জন্য আমি তাঁর স্ত্রী ও ছোট মেয়েটির কথা তুললাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেল—আবার তিনি নম্র এবং শান্তভাব ধারণ করলেন।

'ক্যাজিন ম্যাটিলডা তো ইষ্টারের সময় আসছেন—তাই না ?'—জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, আসছেন।'

'ভাবছি এবার তাঁর সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করবো।' ব্যারণ তাঁর মদের গ্লাস শেষ করে উত্তর দিলেন—'চেষ্টা করে দেখতে পারেন।' বেশ বোঝা যাচ্ছিল এই ঠাট্টাটা তিনি ভেতর থেকে উপভোগ করতে পারছেন না—বিরক্তি বোধ করছেন।

চেষ্টা করতে হবে ? কেন ? তিনি কি অন্য কারোর প্রতি অনুরক্ত ? না—আমি অন্ততঃ জানি না…কিন্তু… বোধ হয় এ কথা বলতে পারি…থাকৃগে, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে যেন একটা বিদ্রূপের ভাব ছিল—আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে একবার ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দিই ওর প্রেমিকার সঙ্গে প্রেম করে। এই কাজিনটির সঙ্গে যদি আমার প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা হ'লে আমার বর্তমানের পাশবিক কামনার হাত থেকে আমি মুক্তি পাব। ব্যারনেসও পরিতুষ্ট হবেন, কারণ তাঁর দাম্পত্য অধিকারের প্রতি অত্যন্ত নোংরাভাবে আঘাত হানছিলেন ব্যারণ এই কাজিনটিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে।

রাত্রির অন্ধকার নামল—আমি বাড়ী যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। ব্যারণ প্রহরারত সৈনিকদের কাছ অবধি আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। গেটের মুখে এসে আমরা হ্যাণ্ডসেক করলাম—আমি বেরিয়ে আসতেই তিনি জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন—আমার মনে হ'ল যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন ম্যাটিলডার সঙ্গে প্রেম করার বিষয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সময় যতই দ্রুতভাবে এগিয়ে আসছে, ততই যেন বেশী করে শাসন ক্ষমতায় গত উনিশ বৎসর ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের সম্পূর্ণ সার্থকতা-হীনতার ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর ফলে আগামী নির্বাচনে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে কিংবা বিভিন্ন রাজ্য বিধান সভাগুলিতে কংগ্রেসের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে এমন আশা অবশ্য কেহ করেন না। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ একাধিক। প্রথমতঃ গত ১৯ বৎসরে নির্বাচনের ব্যাপারটা এমন মহার্ঘ্য করে তোলা হয়েছে যে, প্রচুর অর্থানুকূল্যের নিশ্চয়তা ছাড়া নির্বাচনে প্রবৃত্ত হ'তে কেহই সাহস করেন না। কংগ্রেসের একজন উচ্চ পর্যায়ের পাণ্ডার সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে জানা গেল যে, শাসকগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাবার কোনই আশঙ্কা তাঁরা করেন না, কেননা নির্বাচকদের কোন সক্রিয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ গড়ে উঠতে এদেশে দীর্ঘদিন লাগবে। ইতি-মধ্যে দলের বাঁধন (organizational strength) এবং অর্থব্যয়ের ক্ষমতাই একমাত্র নির্বাচনের ফলাফল নিরূপিত করবে। নির্বাচনে অর্থব্যয়ের ক্ষমতা কংগ্রেসের যতটা আছে, কোন বিরোধী দলের তার কাছাকাছিও নাই। তা ছাড়া দলের বাঁধনের দিক থেকেও এঁরা মনে করেন কংগ্রেস দলই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংস্থা।

অবশ্য মোটামুটি কথাটা অবাস্তব নয়। আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসই যে পুনর্বার বিজয়ী হবে এবং শাসনযন্ত্রের অধিকারে কায়েমী হয়ে থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও সমীচিন কারণ দেখা যায় না। একমাত্র বিরোধী দলগুলির মধ্যে নির্বাচন ঐক্য সাধন করা সম্ভব হলে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে না হলেও, অন্ততঃ কতকগুলি রাজ্য বা আঞ্চলিক এলাকায় বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের বর্তমান প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হবার হয়ত একটা সম্ভাবনা হতে পারত। কিন্তু একমাত্র কেরল রাজ্য ব্যতীত অন্য কোন অঞ্চলে এরূপ বিরোধী দলগুলির মধ্যে নির্বাচনী ঐক্য সাধন সম্ভব হয় নাই। কেরল রাজ্যের নির্বাচন আয়োজনের বর্তমান রূপ ও প্রকৃতির যতটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে একথাই মনে হয় যে, এবারও দ্বিতীয় বারের মতন ঐ রাজ্যটিতে কংগ্রেস দল শাসন-যন্ত্রের কায়েমী অধিকার থেকে বিতাড়িত হবে। বিরোধী দলগুলির জনপ্রিয়তা এমন একটা দানা বেঁধে উঠেছে যে, সংবাদপত্রের মারফৎ জানতে পাওয়া গেল, যে ঐ রাজ্যটিতে নির্বাচনে কংগ্রেস দলের মনোনয়নের জন্য সাধারণতঃ গভীর আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে।

অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বিরোধী দলগুলির মধ্যে অবশ্য অনুরূপ কোনও নির্বাচন-ঐক্যের সম্ভাবনা নেই। পশ্চিম-বঙ্গে এরূপ ঐক্য সাধনের খুবই চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলগুলির পারস্পরিক দাবির আতিশয্যের কারণে সেটি সম্ভব হয় নি। ফলে কংগ্রেসের নির্বাচন সম্ভাবনা এই রাজ্যে যতটা পরিমাণে বিঘ্নিত হতে পারত, সেটি হবার এখন আর কোনও সম্ভাবনা নেই। অবশ্য নির্বাচন ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলির মধ্যে আপাতঃ ঐক্য সাধন যদি সম্ভব হতেও পারত, তা হ'লেও যে তার ফলে কোন সার্থক ও স্থায়ী

ডিমোক্র্যাটিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হ'ত এমন আশা করবার উপযুক্ত কোনও পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি। ঐক্য-বদ্ধ দলগুলির দ্বারা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হলেও কোনও বিকল্প সরকার গঠন আদৌ সম্ভব হত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমত: বিরোধ-পুষ্ট ঐক্য দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করবার মতন যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ কি না সে প্রশ্নটি আছে। কেননা নির্বাচন পর্যন্ত রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদের (ideology) মূলগত (fundamental) বিভিন্নতা (cleavage) সত্ত্বেও যে ঐক্য সম্ভবত: টিঁকাইয়া রাখা সম্ভব হতে পারত, সরকার গঠনের সমষ্টিবদ্ধ দায়িত্ব গ্রহণ ও বহনের চাপে সে ঐক্য টিঁকিতে পারে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। দ্বিতীয়ত: অনুরূপ বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শের সঙ্ঘবদ্ধতা সাময়িক প্রয়োজনে এবং নির্দ্দিষ্টকালের জন্য সম্ভব হতে পারলেও, কোনও দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ঐক্য রক্ষা করতে হলে, ঐক্যবদ্ধ দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সমতা একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। বিরোধী দলগুলির মধ্যে নির্বাচন ঐক্যের এটিই ছিল প্রধান অন্তরায়।

বস্তুত: একমাত্র কমিউনিষ্ট দলটিকে বাদ দিলে আর সব বিরোধী দলগুলিই আদিতে মূল কংগ্রেসের ভগ্নাংশ মাত্র ছিল। উহাদের সকলকারই রাজনৈতিক আদর্শবাদ (ideology) বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে মূলত: আদর্শবাদের দিক থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে ইহাদের কোনও বিরোধ বা তফাৎ নেই। ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যাবে যে, এ সকল দলগুলি আদি সৃষ্টিতে নেতৃগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিরোধের কারণে কংগ্রেসের ভগ্নাংশ রূপে এবং কংগ্রেসেরই বিকল্প বিরোধী নেতৃত্ব গঠনের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল।

একমাত্র কমিউনিষ্ট দলটিরই আপন রাজনৈতিক আদর্শের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু আদর্শবাদের দিক থেকে কমিউনিষ্ট দলটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ডেমোক্র্যাটিক শাসনাদর্শের ত অনুকূল নহেই, বরং তার পরিপন্থী। বর্তমানে অবশ্য কমিউনিষ্ট দলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুইটি বিশিষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী দলের সৃষ্টি হয়েছে। এই দুইটির মধ্যে দক্ষিণপন্থী দলটি কিছুকাল পূর্বে খুব স্পষ্ট ভাষায় তাহার প্রাক্তন রাষ্ট্রবহির্ভূত (extra-territorial) আনুগত্যের (loyalties) কথা অস্বীকার করেছে। বামপন্থী কমিউনিষ্ট দলটি রাষ্ট্রবহির্ভূত (এবং কেহ কেহ মনে করেন রাষ্ট্রবিরোধীও) আনুগত্য রক্ষা করে চলেছে। এই কারণে রাজনৈতিক বিচারে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দলটিকে পাংক্তেয় বলে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু বামপন্থী কমিউনিষ্টদের এই কারণে এখনো অনেক ক্ষেত্রেই অপাংক্তেয় বলে বিচার করা হয়।

কিন্তু দক্ষিণ বা বাম কমিউনিষ্ট দলটির উভয় ভগ্নাংশেরই মূল রাজনৈতিক আদর্শবাদ ও উদ্দেশ্য গণ-বিপ্লব ও গণ-একনায়কত্বের (proletarian revolution and dictatarship of the proletariat) উপরে প্রতিষ্ঠিত। গণ-নির্বাচনমূলক প্রতিনিধিত্ববাচক ডিমোক্র্যাটিক পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে এই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কোথাও কোনও মিল নাই। উভয় দলই দেশের নির্বাচন মূলক পালামেণ্টারী যন্ত্রটির ব্যবহারের দ্বারা আপন আপন বিপ্লবপন্থী আদর্শ রূপায়িত করবার চেষ্টা করছেন। সেই কারণে ইহাদের দ্বারা কংগ্রেসের কায়েমী শাসনাধিকার বাতিল করে দিয়ে বিকল্প শাসন ব্যবস্থা গঠনের ভরসা কেহ পাইতেছে না।

কিন্তু এ কথা ঠিক যে, দলীয় গঠনশক্তির প্রাবল্যের দিক থেকে কংগ্রেসের পরেই কমিউনিষ্ট দল আজ সমধিক শক্তিশালী। কোন কোন অঞ্চল বা রাজ্যে বামপন্থী কমিউনিষ্ট দল অধিকতর প্রবল, যেমন কেরল রাজ্যে বা পশ্চিমবঙ্গে। আবার কোন কোন অঞ্চলে দক্ষিণ পন্থী কমিউনিষ্ট দল অধিকতর প্রবল, যেমন মহারাষ্ট্রে। কিন্তু মোটামুটি কোনও অঞ্চলেই কোন সম্মিলিত বিরোধী দলই কমিউনিষ্ট দল দুইটিকে বাদ দিয়া কংগ্রেসকে তাহার এতাবৎ কায়েমী শাসনাধিকার থেকে হটাইতে পারিবার ভরসা করতে পারছেন না। ফলে কমিউনিষ্টদের বাদ দিয়া কোন বিরোধী ঐক্যের সাফল্য একমাত্র কেরল রাজ্য ব্যতীত আর কোথাও সাধিত হতে পারে নাই।

তবু এ কথা ঠিক যে, আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসকে অধিকারচ্যুত করতে পারার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তার

সার্থক ব্যবহার করতে পারলে এ কাজটি সাধন করা দুরূহ হলেও নিতান্ত অসম্ভব হবার কথা নয়। তবে বর্তমানে যে সব বিরোধী দলগুলি দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রটি অধিকার করে আছে তাদের দ্বারা এই উদ্দেশ্য উপরে বর্ণিত কারণসমূহের জন্য সাধন করবার আশা সুদূর পরাহত।

গণতন্ত্রের দায়িত্ব

একমাত্র দেশের সৎ, চিন্তাশীল ও দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তিগণ যদি এই কাজে অগ্রসর হয়ে আসেন তবেই ফল পাবার সম্ভাবনা। ডিমোক্র্যাসীকে ভাষান্তরে দায়িত্বসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা (responsible government) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ডিমোক্র্যাটিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে। এই মূল সর্তটি সুষ্ঠুভাবে পালিত না হলে শাসনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীটির দ্বারা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ স্বাভাবিক এমন কি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে শাসনাধিরূঢ় দলকে তাহার দায়িত্বে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের সতত সতর্ক দৃষ্টি ও সমালোচনার দ্বারা বদ্ধ রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু তারও পূর্বের কথা, নির্বাচনের সময়ে শাসনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত দলটির ক্ষমতা প্রয়োগের ধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও সমালোচনার দ্বারা দেশের সাধারণ নির্বাচকদের সম্পূর্ণভাবে অবহিত করে দেওয়া হয়ে থাকে। শাসনযন্ত্রের ব্যবহারে, কিংবা ক্ষমতারূঢ় ব্যক্তি বিশেষের কার্যকলাপে কোন প্রকার দুর্নীতি বা ব্যবহারের ভদ্রতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটলে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা দুরূহ হয়ে পড়ে। সেই কারণে সরকারকে সর্বদা অবহিত হয়ে চলতে হয় এবং শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা ব্যবহারে রুচিবিরুদ্ধ চালচলনের অভিযোগ ঘটলে শাসকগোষ্ঠী থেকে তাহাকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে শাসক সম্প্রদায়ের উপরে সাধারণের আস্থার বিন্দুমাত্র হানি না ঘটে। তখন আর অভিযোগ প্রমাণের জন্যও সাধারণতঃ অপেক্ষা করা হয় না। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গত দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কালে অধ্যাপক হিউ ডল্টনের মতন প্রতিষ্ঠাবান মন্ত্রীকে ও সরকারমাত্র ব্যক্তিকেও অনুরূপ অপ্রমাণিত অভিযোগের ফলে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে যেতে হয়।

আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত অনুরূপ উদাহরণ ত সৃষ্টি হয়ই নাই, বরং, বারংবার অভিযোগ সত্বেও এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী অনুসন্ধান সত্বেও এ সকল বিষয়ে প্রায় কখনই কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। বরং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিশেষের কোন কোন ক্ষেত্রে দলের নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা আরো সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা যায়। ফলে শাসনের সকল স্তরে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ইত্যাদি অন্যায় কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে এখন এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে শাসকগোষ্ঠী নির্ভয়ে আপন মতলব হাসিল করে চলেছেন এবং দেশের জনসাধারণের দুর্গতি ও দুর্দশা চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্বাচনব্যয় এখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কোনও সৎ ও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই গুরুভার বহন করা অসম্ভব। শাসক সম্প্রদায়ের নির্বাচন-রীতির ফলেই যে নির্বাচন মূল্য এমন দুর্নিবার হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের এতে কোন পরোয়া নাই, কেন না দেশের বৈশ্যগোষ্ঠী তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করে থাকেন। বিনিময়ে বৈশ্য-স্বার্থ সাধনে তাঁহারা সর্বদা তৎপর হয়ে আছেন।

উদাহরণস্বরূপ গত তিন বৎসর যাবৎ দেশজোড়া খাদ্যসঙ্কট এবং সেই সম্পর্কে সরকারী প্রয়োগগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৩ সাল থেকে এই সঙ্কটের সুরু হয়। কতকগুলি রাজ্য সরকার নানাবিধ মূল্য ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এবং আংশিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা এই সঙ্কট মোচনের প্রয়াস করে থাকেন। সেই সময় আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে এই খাদ্য সঙ্কট মূলতঃ খাদ্য শস্যের সরবরাহ সঙ্কট নয়, বস্তুতঃ খাদ্যশস্যের মূল্য সঙ্কট। বিক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী মূল্য দিতে রাজী থাকিলে কোথাও খাদ্যশস্যের সরবরাহের কোনও ঘাটতি দেখা যায় নাই। সরকার অবশ্য বারংবার তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক হিসাবের দ্বারা দেশের খাদ্যশস্যের ভোগ-চাহিদার একটা অবাস্তব এবং বর্দ্ধিত অঙ্ক প্রচার করিয়া একটা

বিরাট খাদ্য-ঘাটতির চিত্র আঁকিবার প্রয়াস করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা যতদূর দেখিয়াছি দেশের অন্য কোনও রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে সরকারী উদ্দেশ্যমূলক ও ভ্রান্তিকর প্রচারের প্রতিবাদ ত করেনই নাই, বরং এ বিষয়ে কোন বাস্তব হিসাবের দ্বারা এই ভ্রান্তি অপনোদন করিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং কমিউনিষ্ট দলের প্রচারসমূহ হইতে মনে হয় এই বিভ্রান্তিকর ভোগচাহিদার হিসাব তাঁহারাও মানিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৬৪ সালের ফসল সরকারী প্রচারে এই পর্যন্ত এদেশের প্রভূততম পরিমাণের ফসল, অর্থাৎ ৮ কোটি ৩০ লক্ষ টন (8·3 million tons) খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু ফসল উঠিবার দুই মাসের মধ্যেই খাদ্যশস্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পর বৎসরের ফসলের প্রাক্কালে মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ব বৎসরের নূতন ফসল উঠিবার সময়ের তুলনায় প্রায় ২৪০% য়ে দাঁড়ায়। সরকারী প্রচারে ১৯৬৫ সালের সর্ব-ভারতীয় খাদ্যশস্যের ফসলের পরিমাণ প্রথমে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন, পরে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টন এবং অবশেষে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন বলিয়া ধার্য করা হয়। বর্তমান বৎসরে কতকগুলি অঞ্চলে খরার কারণে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাইবে না, সরকারী প্রচারিত নূতন ফসলের পূর্বাভাসের শেষ খসড়ায় বলা হইয়াছে যে ইহার পরিমাণ এখন ৮ কোটি টনের মতন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পূর্বেকার বৎসরগুলির সম্ভাব্য উদ্বৃত্তের হিসাব ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে যে. বর্তমান বৎসরে দেশের ফসল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন+আমদানী ১ কোটি টন (এই পরিমাণ শস্য ইতিমধ্যেই এদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে), মোট ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন হইয়াছে। এখন দেখা যাক আমাদের মোট বাস্তব ভোগচাহিদার পরিমাণ কি রকম হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের আদমসুমারী বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত দেশের মোট নীট জনসংখ্যার অঙ্ক প্রায় ৫০ কোটি হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। দশ বৎসরান্তর গণ গণনায় গত তিনটি হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে মোট জনসংখ্যার ৩৮·৬% ৮ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স্কদের দ্বারা অধিকৃত। অতএব ধরিয়া লওয়া যায় যে আগামী বৎসরের ভারতের জনসংখ্যার রূপ দাঁড়াইবে :—

৮ ও তন্নিম্ন বয়স্কদের সংখ্যা—১৮,০০,০০,০০০

৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা—৩২,০০,০০,০০০

এই জনসংখ্যায় খাদ্যশস্যের বাস্তব ভোগ-চাহিদার দৈনিক পরিমাণ যদি ৮ ও তন্নিম্ন বয়স্কদের জন্য ৮ আউন্স এবং ৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের জন্য ১৬ আউন্স ধার্য করা যায়—সরকারী পূর্ণ র‍্যাশনিং ব্যবস্থা যে সকল এলাকায় প্রবর্তিত হইয়াছে, সে সকল অঞ্চলে বর্তমানে যথাক্রমে ৫ ও ১০ আউন্সের বেশী দেওয়া হয় না—তাহা হইলে আমাদের বাস্তব ভোগ চাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায়—

(ক) ৮ ও তন্নিম্ন বয়স্ক ১৮ কোটি ব্যক্তির জন্য—
দৈনিক জনপ্রতি ৮ আউন্স হিসাবে—১৪৪,০০,০০০
আউন্স অথবা ৪৫,১৮০ টন।

(খ) ৮ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ৩২ কোটি ব্যক্তির জন্য—
দৈনিক জনপ্রতি ১৬ আউন্স হিসাবে
৫১২,০০,০০,০০০ আউন্স অথবা ১৪২.৮৫৭ টন

(ক) বৎসরের চাহিদা—৪০,১৮০×৩৬৫=১৪,৬৬৫,৭০০ টন
(খ) „ „ ১৪১,৮৫৭×৩৬৫=৫১,১৪৩,৯১০ „

মোট বার্ষিক চাহিদা— ৬৫,৮০৮,৮৭০ টন
অর্থাৎ মোটামুটি ৬৬,০০০,০০০ টন
ভোগ চাহিদার ১০% হিসাবে বীজশস্য ও অনিবার্য অপচয়ের পরিমাণ— ৬,৬০০,০০০ টন

মোট— ৭২,৬০০,০০০ টন

ইহার সহিত বাজার সরবরাহের উঠ্‌তি-পড়্‌তির জন্য আরো মোট অঙ্কটির ১০% যোগ করিলে—
৭,২৬০,০০০ টন

মোট ৭৯,৮৬০,০০০ টন

ইহাই আমাদের বাস্তব চাহিদার সাকুল্য পরিমাণ।

আমরা দেখিতেছি বর্তমান বৎসরে মোট সরবরাহের পরিমাণ ৮৫,০০০,০০০ টন, অর্থাৎ বর্তমান বৎসরের সকল চাহিদা মিটাইয়াও, বর্তমান বৎসরের সরবরাহ হইতে আমাদের আগামী বৎসরের ভোগের জন্য ৫,১৪০,০০০ টন খাদ্যশস্য অন্তত মজুদ থাকা উচিত। ইহার সঙ্গে বর্তমান বৎসরের অনুমিত ফসল, ৮০,০০০,০০০ টন যোগ করিলে

কথা। তাহা সত্ত্বেও আমাদের সরকার আগামী বৎসর আবার ১২,০০০,০০০ টন ঘাটতি হইবে বলিয়া ইহা পূরণ করিবার জন্য তাঁহারা বিদেশীদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এবং যথেচ্ছ অপমানিত হইতেছেন। ইতিমধ্যে দারুণ খাদ্যসংকট সঙ্ঘটিত না হইলে মানও থাকে না, তাঁহারা যে বৈশ্য-স্বার্থের আজ্ঞাবহ তাঁহাদের স্বার্থও সংরক্ষিত হয় না।

অন্যদিকে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে, শাসক দলের তথাকথিত সমাজবাদী আদর্শের অনুসরণের অজুহাত সত্ত্বেও, অনুরূপ ধারায়ই দেশের জনসাধারণের প্রাণ সংশয় ঘটাইয়া কায়েমী বৈশ্য-স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আরো বেশী করিয়া হইতে থাকিবে। এই ব্যবস্থাই যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস দল ক্ষমতার আসন দখল করিয়া থাকিবে, ততদিন পর্যন্তই চলিতে থাকিবে এবং দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি দুঃসহ অবস্থার ফলে দেশের লোকের ধৈর্যের এবং সংযমের বাঁধন একেবারেই না ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় কি? বিরোধী দলগুলির অবস্থা ও কার্যকলাপ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে; তাহাদের উপর ভরসা করিয়া লাভ হইবে না। বস্তুতঃ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিরোধী দলগুলির কার্যকলাপ তাহাদের উপরে আস্থা স্থাপন করিবার সপক্ষে কোনও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। বরং দেশের জনসাধারণ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দলগুলির উপরেই সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়াছে। নূতন দল গড়িয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত করিলে তাহারা তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে এমন আশা করিবার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই। অথচ যে দ্রুত গতিতে দেশের অবস্থা সমাজ-বন্ধনের গণ্ডী অতিক্রম করিবার দিকে চলিতেছে, এ বিষয়ে আশু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা না করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সন্দেহের বিশেষ কোনো অবকাশ নাই।

যাঁহারা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ব্যবস্থার উপরে আস্থা-[illegible] নিশ্চয়। বর্তমানের গণতন্ত্রের প্রহসন হয় বিপ্লব [illegible] জঙ্গী একনায়কত্বে শেষ হইবে। ১৯৬১ সালের [illegible] নির্বাচনের পরে আমরা বলিয়াছিলাম যে নির্দলীয়, [illegible]সম্পন্ন, সৎ ও শিক্ষিত ভারতবাসীরা যদি আগাইয়া আসিয়া দেশের লোকের নিকট স্পষ্ট করিয়া তাহাদের বর্তমান দুঃখ দুর্দশার কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সহজ সরল ভাষায় এখন হইতে বুঝাইতে সুরু করেন এবং সত্যকার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে নিজেরা দায়িত্ব স্বীকার ও পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দেন, তবেই বর্তমান ঘোরতর সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট হইতে মুক্তি পাইবার পথ প্রস্তুত হইতে পারে এবং দেশে সত্যকার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই দিকে আজ পর্যন্ত বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। দেশের সত্যকার সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণে [illegible] নাই। তাই কায়েমী নেতৃত্ব অবাধে আপন যথেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার চালাইয়া যাইতে বাধা পান নাই।

সুখের বিষয় সম্প্রতি, আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে কতিপয় এরূপ সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তি এ বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা বড় দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার জন্য প্রস্তুতি বহু পূর্ব হইতে সুরু হওয়া উচিত ছিল। যাহা হোক তবুও এই প্রকার সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনও যদি আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া আমাদের বিধান সভাগুলিতে এবং পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তবে একটা সত্যকার সুস্থ ও সার্থক আবহাওয়া সৃষ্টি হইবার পক্ষে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হইতে পারে। তাই আমরা এই প্রচেষ্টাটিকে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মহৎ প্রচেষ্টা বলিয়া অভিনন্দিত করি।

তস্করের সামাজিক প্রতিষ্ঠা

মানুষের সমাজ গঠনের ইতিহাসে যতদূর অতীত পর্যন্ত পৌঁছান যায়, দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজ

বত্র খাদ্যশস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তাহার পরে [illegible] সাল পর্য্যন্ত চাউল আমদানী করা সম্ভব হয় নাই, স্থানীয় ফসলের দ্বারাই উদর পূর্ত্তি রাখিতে পারা [illegible] কোন কোন রাষ্ট্রে রাজদণ্ড শক্তিহীন হইয়া পড়িলে ইহাদের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইত, ক্রিয়ার ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিত।

কিন্তু তস্কর বা চোর শক্তিহীন বা প্রবল যাহাই হউক না কেন, সমাজে কোনদিন তাহার কোন স্বীকৃতি ছিল না, প্রতিষ্ঠা ত ছিলই না। সমাজে তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর মূল্যবোধ সকল স্তরেই প্রবল ছিল। শাস্ত্রের বাণী, যে অধর্ম্মের দ্বারা মানুষ আপাতঃ-সুখ লাভ করিতে পারে বটে—সম্পদ আহরণ করিতে পারে, শত্রুকে বিভ্রান্ত করিতে পারে—কিন্তু অধর্ম্মকারী স্বয়ং শেষ পর্য্যন্ত সমূলে বিনষ্টপ্রাপ্ত হয়, এই শাশ্বতঃ সত্য মানুষের অন্তরের গভীরতম অনুভূতিতে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেজন্য অধর্ম্মাচরণ যে করিত সমাজ তাহাকে হয়ত কখনো কখনো ভয় করিতে বাধ্য হইত বটে কিন্তু স্বীকার করিত না। সেই জন্য আগেকার কালে, অর্থাৎ যতকাল পর্য্যন্ত মানুষের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সত্যকার মূল্যবোধ জাগ্রত ছিল, তস্কর বা চোরের সমাজে কোন স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা ছিল না।

ক্রমে শিল্প বিপ্লবের অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজের পুরাতন মূল্যবোধের বদল হইতে সুরু করিল। অধ্যাত্মের বদলে আধিভৌতিক ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতে সুরু করিল, বাস্তবের তুলনায় বস্তুর মূল্য অধিক হইয়া উঠিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ধরিয়া ধীরে ধীরে এই নূতন বস্তুতান্ত্রিক প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অধ্যাত্ম-তপস্যায় এককালে প্রায় সিদ্ধকাম ভারতবাসীর মনের উপরেও এই ঢেউ আছড়াইয়া পড়িতে সুরু করিল। কিন্তু তথাপি তাহার সত্যকার মূল্যবোধের প্রাচীন উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি পূর্ব্ববৎ প্রবলই ছিল।

দূর করে বর্ত্তমান খাদ্যনীতি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং এই নীতিই দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করিয়াছে এ কথার তাৎপর্য্য কোথায়: কোনদিন [illegible] পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না [illegible] কি ১৯৪৩ তাহা [illegible] কঠিন [illegible] ব্যবচ্ছেদের অন্যায় আপোষ রফার ভিত্তিতে [illegible] শক্তি বিদেশী রাজা ইঁহাদেরই হাতে তুলিয়া দিলেন। একে ত ইঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার শাশ্বত মূল্যবোধ ছিল লুপ্তপ্রায়, তাহার উপরে আপোষ রফার দ্বারা রাজদণ্ড ইঁহাদের অধিকারে আসিয়া পড়িল। এই শক্তির অধিকার রক্ষা করিবার দুর্নিবার লোভে যেটুকু মূল্যবোধ অবশিষ্ট ছিল, তাহা ভাসিয়া গেল। তস্কর ও চোর তাহার প্রচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দলে দলে রাষ্ট্রের ও সমাজের বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও শক্তির আসন অধিকার করিয়া বসিয়া গেলো। গত ১৯ বৎসরের কংগ্রেস শাসনের ইহাই আজ সবচেয়ে ভয়াবহ প্রকাশ। তস্কর আজ রাজদণ্ড অধিকার করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠার আসন পাইতেছে।

মুনাফাবাজকে পুষ্ট করিবার তাগিদে সমগ্র দেশের লোককে উপবাসী করিয়া রাখা,—এও বাহ্য; শাসন দণ্ড আজ শক্তিহীন, দুর্ব্বলের প্রতি উদ্যত-দণ্ড, দুর্জ্জনের পদানত,—সেও বাহ্য; আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োগের নামে দেশের দারিদ্র্যের বোঝা বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়া স্বজন পোষণ, যাহাতে দেশে একটা কায়েমী শাসক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারা যায়,—সেও গৌণ; কিন্তু যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান সমাজবিধি হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয়; সাধু যখন অবমানিত, জ্ঞানী-গুণী অবহেলিত, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে তস্কর ও চোর সম্মানিত, নিরক্ষর প্রবল হইয়া উঠে, তখনই সকলের চেয়ে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস-শাসিত ভারতে আজ তাহাই হইয়াছে। একমাত্র ভরসার ক্ষীণ আলো দেখা যায় যে, এটি আসন্ন দুর্য্যোগের পূর্ব্বাভাষ এবং বিশ্বকবি যে প্রলয়ের তাণ্ডবের পূর্ব্বাভাষ দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, হয়ত এখন তাহার পূর্ণ উদ্‌যাপন হইবার সময় আসন্ন হইয়া আসিতেছে।

খাদ্যসঙ্কট

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালী চিরকালই ভাত খেয়ে মানুষ এবং কথায় বলে ভেতো বাঙ্গালী, চাউলের জন্ত বাঙ্গালী কখনও পরমুখাপেক্ষী হয় নাই। দেশ বিভাগের পরও পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ব্রহ্মদেশ পৃথক হইবার পূর্ব্বেও বাংলা দেশ হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট চাউল রপ্তানী হইত এবং তাহার পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ টন ছিল, তাহার অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের। ব্রহ্ম বিচ্ছেদের পরও বাংলা দেশ হইতে প্রায় ১ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইত এবং তাহার প্রায় সবটাই পশ্চিমবঙ্গের চাউল। যদিও ব্রহ্ম বিচ্ছেদের পর রেঙ্গুন চাউল প্রায় ৩ লক্ষ টন বাংলা দেশে আমদানী হইত। তাহার অধিকাংশই আসাম চা বাগানে, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে যাইত। অটোয়া চুক্তির ফলে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলি ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল লইতে অস্বীকার করায় রেঙ্গুন চাউল গলাকাটা দরে ভারতের এবং সিংহলের বন্দরে বিক্রয় হইত। অস্বাভাবিক নিম্ন মূল্য হেতুই বাংলার বন্দরে ঐ সব চাউল আমদানী হইত কিন্তু তথাপি বাঙ্গালী সে চাউল পছন্দ করিত না বা পারতপক্ষে খাইত না। কারণ তখনও স্থানীয় চাউলের অভাব হয় নাই। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগিবার পর ব্রহ্মদেশ এবং ভারত মহাসাগরের বহুদ্বীপপুঞ্জ জাপানী অধিকৃত হইবার ফলে বাংলা দেশ তথা ভারতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া যায় এবং স্থানীয় চাউলের দর বাড়িতে থাকে। ১৯৪২ সালে চাউলের মূল্য মণ-প্রতি প্রায় ৬·০০ টাকা হয়। ইত্যবসরে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার নামে বাংলাদেশ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টন চাউল বাহির করিয়া লওয়া হয়। অথচ আমদানী করা আদৌ সম্ভব হয় নাই। তদানীন্তন সরকার নির্ব্বোধের মত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করেন এবং অক্টোবরমাসে বিরাট ঝড়ের ফলে বাংলার সমুদ্রকূলবর্ত্তী জেলাগুলির ফসলের অত্যধিক ক্ষতি হয়। তাহার পূর্ব্বেই জাপানী আক্রমণের ভয়ে ঐ সকল স্থান হইতে খাদ্যশস্যাদি সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, ফলে ১৯৪৩ সালে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবং অন্যায় অবাঞ্ছিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে মোটেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই এবং অন্যান্য প্রদেশে প্রচুর খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার বাংলা দেশে খাদ্যশস্য আনিবার ব্যবস্থা করেন নাই। সে বৎসর সারা ভারতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টন চাউল—যাহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২০ লক্ষ টন বেশী-উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তদানীন্তন সরকারের অনবধানতা অথবা অক্ষমতাবশতঃ বাংলা দেশে চাউল বা অন্য কোন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয় না। ফলে কাতারে কাতারে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে বছর বাংলা দেশে ফসল কম ছিল সত্য কিন্তু অন্যত্র পর্য্যাপ্ত থাকা সত্বেও আনা হয় নাই। পরে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বাধ্য হইয়া প্রত্যাহার করা হইলেও উপযুক্ত পরিমাণ ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। এ কারণ তদানীন্তন দেশের নেতারা তৎকালীন দুর্ভিক্ষকে মানুষের সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ বলিয়া অভিহিত করেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় খাদ্যশস্য পর্য্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও সরকারের নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে বহু লোককে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে থাকিতে হইতেছে, কারণ খাদ্যশস্যের মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অল্প কয়েকদিনের জন্য চাউলের মূল্য ৪০,৫০ টাকা মণ হইলেও বর্ত্তমানের মত বাজার দর ৮০-১০০ টাকা হয় নাই এবং এই দর এক দেড় বৎসর যাবৎ স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইতেছে, যদিও চাউলের খরিদ মূল্য কনট্রোল দর—২৫ টাকা মণ। বিধিবদ্ধ রেশন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল ১৯৪৪ সালে অথবা সেই বৎসর বাংলা দেশে প্রচুর উদ্বৃত্ত ফসল উৎপন্ন হয় এবং

...বিত্র খাদ্যশস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তাহার পরে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত চাউল আমদানী করা সম্ভব হয় নাই, অথবা বাঙ্গালী স্থানীয় ফসলের দ্বারাই উদর পূর্ত্তি করিয়াছে। দেশ বিভাগের পর কনট্রোল এবং রেশনিং রক্ষা করিবার জন্যই বিদেশ হইতে গম এবং সামান্য চাউল আমদানী করা হইয়াছে, চাউলের মূল্যও বিশেষ বর্দ্ধিত হয় নাই, বিধিবদ্ধ রেশনের পরিমাণও অধিকাংশ সময়ে ২ সের ১০ ছটাক থাকে। পরে ১৯৫০ সালের শেষ ভাগ হইতে চাউলের মূল্য বাড়িতে থাকে কারণ কনট্রোলের ফলে ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি দূরে থাকুক অধোগতি হয় এবং ১৭।।০ টাকা কনট্রোল দর থাকা সত্ত্বেও ১৯৫১ এবং ৫২ সালে খুচরা বাজারে চাউলের দর মণ-প্রতি প্রায় ২৮ টাকা দাঁড়ায়, পরে ১৯৫৪ সালে কনট্রোল তুলিয়া লইবার পরেই চাউলের মূল্য ১৬ টাকা মণ নামিয়া যায়, ফসলের উৎপাদনের পরিমাণও বিশেষ বর্দ্ধিত হয় এবং ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ২০ টাকার মধ্যেই খুচরা বাজারে চাউলের দর সীমাবদ্ধ থাকে। ৫৮ সালে খরার জন্য উৎপাদন হ্রাস হেতু চাউলের মূল্য কিছু বর্দ্ধিত হওয়া মাত্রই সরকার মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার মানসে ১৯৫৯ সালে জানুয়ারী মাসে পুনরায় কনট্রোল প্রবর্ত্তন করেন। ফলে মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং ছয় মাসের মধ্যে সরকার কনট্রোল তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। আবার স্বাভাবিক দর ২০।২২ টাকা মণ ফিরিয়া আসে এবং জনসাধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত এবং উপযুক্ত পরিমাণ চাউল পাইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। ১৯৬৩ সালের শেষভাগে আবার চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হয়, কারণ ১৯৬৩ সালে স্থানীয় ফসলের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানের মত চাউলের অভাব ছিল না এবং দুর্মূল্যও ছিল না। তথাপি মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের নামে ১৯৬৪-৬৫ সালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিধিবদ্ধ রেশনিং এবং কনট্রোল পুনঃপ্রবর্ত্তিত করার ফলে দেশব্যাপী দেখা দেয় অভাব এবং চাউলের মূল্য ৮০।১০০ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে। অতএব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ হেতু অথবা তথাকথিত সর্ব্বকালীন অভাব দূর করে বর্ত্তমান খাদ্যনীতি অথবা এই নীতিই দুর্ভিক্ষের করাল ক... রক্ষা করিয়াছে এ কথার তাৎপর্য্য কোথায়? কোনদিন বাংলা দেশ অথবা পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না একথা আদৌ সত্য নহে। কোনদিন, এমন কি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়েও, চাউলের দর দীর্ঘ দিনের জন্য এমন গগনচুম্বী হয় নাই। সরকারী নীতি সমবণ্টনের পরিবর্ত্তে অসমতা বৃদ্ধি করিয়াছে। মূল্য বৃদ্ধিরোধ করা দূরে থাকুক, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছে। ১২৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের প্রায় ১০০ বছর পরে আবার ১৩৫৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং সে দুর্ভিক্ষের কারণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। এখন প্রতি বৎসর কেবল পশ্চিমবঙ্গে নহে, সারা ভারতে দুর্ভিক্ষ। অন্তর্বর্ত্তীকালে খাদ্যাভাব কখনও এমন ভীষণ আকারে দেখা দেয় নাই। কনট্রোল তুলিয়া লইবার পরে দশ বছর বাঙ্গালা অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে ছিল এমন কোন প্রমাণ নাই এবং বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা সুখে ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যদিও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা অনেক দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ও চাউলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসংখ্যা ১৯৫১ সাল হইতে ৬১ সাল পর্য্যন্ত শতকরা ৩।।০ ভাগ বাড়িলেও চাউলের উৎপাদন শতকরা ৫।।০ ভাগ বাড়িয়াছে, অতএব চাউলের অভাব হইতে পারে না, বরং কনট্রোল একচেটিয়া খরিদা এবং কড়া নীতির ফলেই চাউলের অভাব এবং মূল্য বৃদ্ধি প্রকট হইয়াছে। উক্ত নীতি কিছু শিথিল করা মাত্রই চাউলের দর ২।০ টাকা হইতে ১ ০ টাকার কেজি নামিয়া আসিয়াছে এবং চাউলের অভাবও অনেক কমিয়াছে, যদিও এ বছর চাউলের ফসল ৫১ লক্ষ টন হইতে নামিয়া ৪৮ লক্ষ টনে আসিয়াছে বলিয়া সরকারী তথ্যে প্রকাশ।

একটি দেশের খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ অবশ্য আমদানীর পরিমাণ দ্বারা সহজেই নির্ণীত হইতে পারে যদি আমদানী কেবলমাত্র তত্রস্থ জনগণের খাদ্যের জন্য হয়, অন্য কোন প্রয়োজনে বা রপ্তানীর জন্য না হয়। অথণ্ড ভারতের তিনদিকে সমুদ্র একদিকে পাহাড়

থাকায় আমদানী রপ্তানীর প্রকৃত হিসাব পাওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু ১৯৪৪ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু থাকায় ঘাটতি না থাকিলেও বাধ্যবাধকতা রক্ষার জন্ত এবং মূল্য বৃদ্ধি নিরোধ জন্ত আমদানী করার প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু সে সময় যুদ্ধহেতু আমদানী করার সম্ভব না থাকায় আমদানী ব্যতীত চলিয়াছে, অতএব ঘাটতি ছিল না নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরে বিখণ্ডিত ভারতে অন্ত রাজ্যে কি পরিমাণে গিয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া মুস্কিল। বিধিবদ্ধ রেশনিং তুলিয়া লওয়ার পরেও দরের ঊর্দ্ধগতি রোধ করে আমদানীর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কিন্তু ১৯৫৫ হইতে ৫৭ সাল পর্য্যন্ত আমদানীর পরিমাণ এত অল্প যে তৎকালীন লোকসংখ্যা মাথাপিছু দৈনিক আধ সেরেরও কম। অতএব সে সময় ঘাটতি ছিল না বলা যাইতে পারে। পরে পি, এল, ৪৮০ নিয়মে আমেরিকার নিকট হইতে বহু গম এবং কিছু চাউলও অতি অল্প মূল্যে পাওয়া গিয়াছে এবং যে মূল্য নির্ধারিত ছিল তাহার শত করা মাত্র ২০ ভাগ সঙ্গে সঙ্গে দিয়া বিক্রী ৪০ ভাগ দেশের শিল্পোন্নতির জন্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা যুক্তে এবং দীর্ঘ মেয়াদের পরিশোধের কড়ারে অল্প সুদে এবং বাকী ৪০ ভাগ কোন দিনই পরিশোধ করিতে হইবে না এই সর্ত্তে পাইবার লোভে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করিয়াছিলেন, ঘাটতি পূরণের জন্ত নহে। দেশের তৎকালীন নেতারাও স্বীকার করেন যে পি, এল, ৪৮০ অনুসারে যে ১৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য খরিদের চুক্তি হইয়াছিল তাহা ঘাটতি পূরণের জন্ত নহে, মজুত ভাণ্ডার তৈয়ারী করিবার জন্ত এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ হেতু। তথাপি আমদানীর পরিমাণ এবং প্রতি বৎসর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ভোজনের জন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ এবং গবর্ণমেণ্টের ষ্টক হইতে যাহা খরচ হইয়াছে তাহার পরিমাণ একত্র করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত জনসংখ্যার হিসাব দ্বারা ভাগ করিয়া মাথাপিছু খাদ্যশস্য প্রাপ্তির যে পরিসংখ্যান ইকনমিক সার্ভেতে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে পাওয়া যায় যে, ১৯৬৪ সাল পর্য্যন্ত দশ বছরের হিসাবে এবং নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থায় মাথাপিছু ১৩·২ আউন্স করিয়া খাদ্যশস্য পাওয়া গিয়াছিল। অতএব খাদ্যের জন্ত প্রয়োজন তদতিরিক্ত হইতে পারে না এবং নিম্নতম মান যে ১৩·২ আউন্সের বেশী নয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উপরোক্ত উপায়ে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ সম্ভব নহে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী আরও ৩/৪টি রাজ্য আছে যাহাদের মধ্যে শস্য যাতায়াতের সঠিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব নহে, অধিকন্তু নদীপথে পাকিস্তানে খাদ্যশস্য যাতায়াতের প্রতিরোধ অথবা সঠিক তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন শস্য এবং আমদানীর পরিমাণ দ্বারা খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের লোক একজন ভারতবাসী বা অন্ত প্রদেশের লোক অপেক্ষা বেশী খাদ্যশস্য ভোজন করেন অথবা বেশী কর্ম্মঠ বা শক্তিসম্পন্ন প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ ভারতীয় প্রয়োজন হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন নির্দ্ধারণ সমীচীন। উক্ত হিসাবে দেখা যায় ১৯৫১ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা সেন্সাস গণনায় ২৪৮ লক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তখন মাথাপিছু ১৩·২ আউন্স হিসাবে তাহাদের খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩৩ লক্ষ টন অথচ স্থানীয় উৎপন্ন চাউল হইতে ভোজনের জন্ত প্রাপ্ত চাউলের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ টন। অতএব ঐ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ চাউলে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ভাবে সরকারী পরিসংখ্যান হিসাবে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার জন্ত উক্ত হারে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষা ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন অনেক বেশী ছিল পরে আবার ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ উৎপন্ন চাউলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩·৫ পারসেন্ট হইলেও তাহার পরে সেই পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনুমান করিবার পক্ষে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ৪০ লক্ষের অধিক লোক পাকিস্তান হইতে আগত। তদতিরিক্ত ১৭ লক্ষ লোক বিহার এবং চন্দননগর হইতে আগত এলাকার জনসংখ্যা, অতএব উক্তরূপ অতিরিক্ত

বৃদ্ধির কারণ ১৯৬২ সালের পর আর বৃদ্ধি হয় নাই। অতএব সাধারণ বৃদ্ধির হার পারসেন্টের বেশী নয়। এমনকি ২·২ পারসেন্ট হিসাবে বৃদ্ধির হার ধরিলেও ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৩৮০ লক্ষের উপর হইতে পারে না (ইহার মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ অবাঙ্গালী অর্থাৎ কেবল মাত্র চাউলসেবী নহেন, অথচ উপরোক্ত জনসংখ্যা ১৩·২ আউন্স মাথাপিছু হারে ভক্ষণ করিলে তাহাদের চাউলের প্রয়োজন ৫১ লক্ষ টন কিন্তু সরকারী তথ্য হিসাবে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ সে বৎসর প্রায় ৫৭ লক্ষ টন। তাহা হইতে শতকরা দশ ভাগ বীজ ও অপচয়ের জন্ত বাদ দিলেও প্রায় দশ হাজার টন চাউল উদ্বৃত্ত থাকে, ইহা ব্যতীত প্রায় ৭০ হাজার টন গম, ভুট্টা ইত্যাদি শস্ত ঐ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্থানীয় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্তের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ টন। সুতরাং অভাবের জন্ত বা অন্যায় সমবণ্টনের জন্ত বিধিবদ্ধ রেশনের এবং কনট্রোলের প্রবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন ছিল না এবং ১৯৬৬ সালে উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ৪৮ লক্ষ টন হইলেও কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর হইতে যে ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্ত ৬৫ সালে পাওয়া গিয়াছে এবং ৬৬ সালে যে ১৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্তই হইবে, কোন অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সরকারী খাদ্যনীতির ফলেই সর্ব্বত্র কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। চাউলের দাম এত দুর্মূল্য হইয়াছে যে সাধারণ লোক এর ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে গিয়াছে, অনেককে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিতে হইতেছে এবং উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। অতএব খাদ্য-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন জনস্বার্থে আশু এবং একান্ত প্রয়োজন।
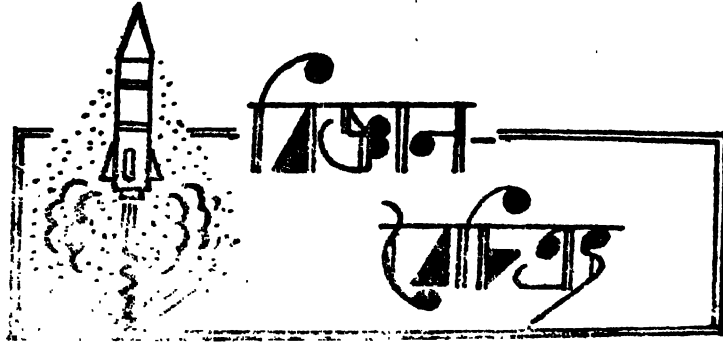
'মঙ্গলগ্রহের খবর বলছি'

শ্রীঅরূপকান্তি সরকার

মঙ্গলগ্রহের খবর বলবার আগে সাড়ে চারশ বছর আগেকার পৃথিবী সম্বন্ধে একটু ধারণা করে নেব।

মাত্র সাড়ে চারশ বছর আগে পর্য্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। নীল আকাশ দিয়ে মোড়া আমাদের এই পৃথিবী স্থির, অবিচল। যেন মহাবিশ্বের সম্রাজ্ঞী। আর এই সম্রাজ্ঞীকে প্রণতি জানিয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সব গ্রহ-উপগ্রহেরা। আকাশের দিকে তাকালে মনে হ'ত (এখনও হয়) একটা উলটানো গামলা দিগন্ত বৃত্তে এসে মিশেছে। একটি গোলকের মত। এই গোলকের উপরে-নীচে চলেছে জ্যোতিষ্কগুলের অবিরাম পরিক্রমা। দিনের বেলায় সূর্য থাকে পৃথিবীর 'উপরে' আর রাত্রে থাকে 'নীচে'। নক্ষত্রদের বেলায় ঠিক এর উল্টো—অর্থাৎ দিনের বেলায় তারা থাকে পৃথিবীর নীচে, রাত্রে থাকে পৃথিবীর উপরে। এই ছিল তখনকার সরল বিশ্বতত্ত্ব।

অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে মানুষের বিদ্রোহ চিরকাল। সাড়ে চারশ বছর আগে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক প্রথমে বিদ্রোহ করলেন। তিনি বললেন এই পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয়, সূর্য্য হচ্ছে এর কেন্দ্র। এই পৃথিবীও সূর্য্যের চারপাশে আবর্তনশীল নক্ষত্রমাত্র। এই তরুণ অধ্যাপকটির নাম কোপারনিকাস। কোপারনিকাসকে অবশ্য পথিকৃৎ বলা চলে না, তার আগে পিথাগোরাস নামে একজন গণিতজ্ঞ এইরকম উক্তি করেছিলেন। পিথাগোরাসের এই উক্তিকে সেদিন সকলে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কোপারনিকাসের পর এলেন গ্যালিলিও। গ্যালিলিওর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট ভেনিসের কাম্পানিল পাহাড়ের চূড়োয় এটি প্রথম প্রদর্শিত হয় আর পাদরিদের বড়কর্তা কার্ডিনাল বেলারমিনের বিচারকক্ষে তাঁর ডাক পড়ে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ। মাত্র সাত বছরের কম সময়ের মধ্যেই তিনি জ্যোতিষ্কলোকের আশ্চর্য্য সব তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।

কিন্তু গ্যালিলিওর এই সব রহস্য কার্ডিনালের এক ধমকেই উল্টে গেল। শেষ পর্য্যন্ত কার্ডিনালের কান মলাতেও কোন কাজ হ'ল না। গ্যালিলিও তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করলেন না। কিন্তু সত্য গোপন থাকে না। শেষ পর্য্যন্ত কার্ডিনালের ধমককে উপেক্ষা করে তিনি একটি বই লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কারাগারে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কারাগারে আবার একটি বই লিখলেন—'গতিবিজ্ঞান'।

তারপরে তিনশ বছর পার হয়ে গেছে। আজ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রও জানে পৃথিবী একটি গ্রহ, সে সূর্যের চারিদিকে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর মত আরও আটটি গ্রহ আছে। এই প্রবন্ধে পৃথিবীর মতই একটি গ্রহ মঙ্গলের কথা বলব।

সৌরজগতের মধ্যে মঙ্গলই হচ্ছে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গ্রহ। এই একটিমাত্র গ্রহ যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আমরা জানি যে খুব ছোট গ্রহে বা খুব বড় গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। ছোট গ্রহে মাধ্যাকর্ষণের টান এতই দুর্বল যে বায়ুমণ্ডল অনায়াসেই সেই টানকে ছিঁড়ে মহাশূন্যে ছুট দেয়। আবার বড় গ্রহে এই মাধ্যাকর্ষণের টান এতই বেশী যে হাইড্রোজেনের মত হালকা ধাতুও সেই টান ছিঁড়ে বাইরে যেতে পারে না। ফলে সেখানকার বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর মত না হয়ে ওঠে নানা বিষাক্ত গ্যাসের সংমিশ্রণ।

পৃথিবীর মত মাঝামাঝি ধরনের গ্রহেই জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এমনি গ্রহ সৌরমণ্ডলে আর দু'টি আছে বুধ ও মঙ্গল; বুধ গ্রহে এখনও জীবনের অস্তিত্ব থাকার মত আবহাওয়া তৈরী হয় নি। তবে অনুমান করা যায় কয়েক লক্ষ বছর পরে জীবনের অস্তিত্ব থাকার মত আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে।

বাকি থাকে মঙ্গল গ্রহ, এই গ্রহটি আকারে প্রায় পৃথিবীর অর্ধেক। গ্রহটির ব্যাস ৪,২১৬ মাইল গ্রহটির ঘনত্ব ৩.৯৪। সব সংখ্যা থেকে মাধ্যাকর্ষণের টান কত হবে হিসাব করে নেওয়া চলে। দেখা গেছে পৃথিবীর টানের তুলনায় মঙ্গলগ্রহের টান পাঁচ ভাগের তিন ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কেউ তিনফুট হাইজাম্প দেয় তা হ'লে মঙ্গলগ্রহে সে পাঁচফুট হাইজাম্প দেবে!

কক্ষপথে মঙ্গলগ্রহের ছোটার বেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ৫৪,০০০ মাইল, বা সেকেণ্ডে ১৫ মাইল। ৬৮৭ দিনে মঙ্গলগ্রহের একবার সূর্য্য পরিক্রমা শেষ হয়। প্রতি ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে গ্রহটি একবার লাটিমের মত পাক খায়।

সূর্য্য থেকে মঙ্গলগ্রহের মোটামুটি দূরত্ব ১৪,১৫,০০,০০০ মাইল। তবে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ এতবেশী উপবৃত্তাকার যে ৬৮৭ দিনের একটি বছরে এই দূরত্ব প্রায় ২.৬ কোটি মাইল বাড়ে কমে। মঙ্গলগ্রহ কখনও থাকে ১২,৮০,০০,০০০ মাইলের মধ্যে, কখনও চলে যায় ১৫,৫০,০০,০০০ মাইলের মধ্যে। ঠিক এমনিভাবে পৃথিবীর দূরত্বও বাড়ে কমে। কখনও হয় ৯,১৫,০০,০০০ মাইল, কখনও হয় ৯,৪৫,০০,০০০ মাইল।

বুধগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসতে পারে কিন্তু পৃথিবী থেকে স্পষ্ট দেখা যায় মঙ্গলগ্রহকে। মঙ্গলগ্রহ পর্য্যবেক্ষণে অসুবিধে আছে। মঙ্গলগ্রহের গায়ে যে সমস্ত সূক্ষ্ম কালো দাগ আছে তা ফটোগ্রাফীতে ধরা যায় না। শুধু চোখের দেখার উপরই নির্ভর করতে হয়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা তার নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন। সংক্ষেপে সে ব্যাখ্যা গুলো জেনে নিতে চেষ্টা করব।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে প্রথমেই চোখে পড়ে মেরুপ্রদেশের সাদা টুপি। উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরুতেই এই সাদা টুপি আছে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেরু-প্রদেশের সাদা টুপিও নিয়মিত ভাবে বাড়ে কমে বা একেবারে ক্ষয়ে যায়। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন দক্ষিণ মেরুর টুপিটি ছোট হতে সুরু করে এবং উত্তর মেরুর টুপিটি বাড়তে সুরু করে। আবার উত্তর গোলার্দ্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখন তার ঠিক উলটো ব্যাপারটা ঘটে। এ থেকে অনুমান করা যায় এই সাদা টুপি আসলে বরফ ছাড়া কিছুই নয়।

মেরুপ্রদেশের সাদা টুপির কথা বাদ দিলে গ্রহটির অন্যান্য অংশের কোথাও কালো, কোথাও লালচে। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কালো অংশগুলি সমুদ্র আর লালচে অংশগুলি শুকনো জমি।

১৮৭৭ সালে মঙ্গলগ্রহের প্রতিযোগের সময় অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে তখন শিয়াপারেল্লি নামে একজন ইটালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী মঙ্গল-গ্রহকে খুব ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করলেন মঙ্গলের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালো দাগ আছে, তিনি এগুলোর নাম দিলেন 'কানালি'; ইংরেজি অর্থে 'চ্যানেল', বাংলা অর্থে 'খাল'। কিন্তু এগুলো মোটেই খাল নয়, কোন কোনটা ১২০ মাইল পর্য্যন্ত চওড়া।

শিয়াপারেল্লি নানাভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে এই খালগুলি বিভিন্ন সমুদ্রকে যুক্ত করেছে এবং এদের মধ্যে একটি জ্যামিতিক মিল আছে। যেহেতু এদের মধ্যে একটা মিল আছে, তা হ'লে এগুলো কোন বুদ্ধিমান জীবের তৈরী।

তারপরে ১৮৯৪ সালে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক লাওয়েল মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে সূক্ষ্ম কালো দাগগুলোকে খাল বলে ধরেছি, সেই রকম দাগগুলো যে অংশকে সমুদ্র বলে মনে করেছি তার উপরেও আছে। কিন্তু সমুদ্রের উপরে খাল থাকতে পারে না। নানা যুক্তিতর্ক তুলে লাওয়েল শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণ করলেন কাল দাগগুলো উদ্ভিদ ঢাকা জমি। আর লালচে ছোপগুলো মরুভূমি, সেখানে উদ্ভিদের ছিটেফোঁটাও নেই।

লাওয়েল আরও দেখালেন যে মঙ্গলগ্রহের এইসব কালো কালো দাগগুলো ঋতুতে ঋতুতে পালটে যায়। লাওয়েল সিদ্ধান্ত করলেন গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন বরফের টুপি গলতে থাকে তখন সেই বরফ-গলা জল বিষুব অঞ্চলের দিকে বইতে সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে জলসিক্ত জমিতে গাছপালা জন্মাতে সুরু করে। শিয়াপারেল্লির একটি মতকে কিন্তু লাওয়েল মেনে নিলেন। তাঁরও সিদ্ধান্ত হ'ল খালগুলো কোন বুদ্ধিমান জীবের তৈরী। সেখানে জলের যোগান বছরে একবার। সুতরাং ব্যাপক এলাকা জুড়ে এমনভাবে খাল কাটা হয়েছে যে, মেরুপ্রদেশের বরফ গলতে সুরু করলেই যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই রকম একটা বড় পরিকল্পনাকে যারা কার্যকরী করতে পেরেছে তারা নিশ্চয়ই মানুষের চেয়ে বুদ্ধিতে কোন অংশে কম নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলছেন খালগুলোর মধ্যে কোনরকম জ্যামিতিক মিলনই, খালগুলোর অবস্থান নেহাতই এলোমেলো। তাঁরা বলছেন এগুলো দূর থেকে দেখায় বলেই মনে হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন। তাঁরা একটা সোজা প্রমাণও দেখিয়েছেন। প্রমাণটি এই একটা সাদা কাগজের উপর প্রতি আধ ইঞ্চি পরিমাণ দূরত্বে পাঁচটা কালো বিন্দু দেওয়া হ'ল ; আর ত্রিশ ফুট দূর থেকে যদি কাগজটাকে দেখা হয় তা হ'লে সেই কালো বিন্দুগুলোকে একটি কালো রেখা মনে হবে। তেমনি মঙ্গলগ্রহের খালগুলোও একটানা মনে হয় এমনি দেখার ভুলে। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন, যে দাগগুলোকে আমরা খাল বলছি ওগুলো জমির ফাটল মাত্র। সেগুলো দিয়ে আগ্নেয়গিরির বাষ্প বেরিয়ে এসে জমিকে সরস করে তোলে, আর তখন সেখানে গাছপালা জন্মায়।

যাই হোক, এসব জল্পনা-কল্পনায় আর মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। গ্রহটির অন্যান্য খবরগুলো জেনে নেওয়া যাক। মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে কি না—এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। মঙ্গলগ্রহ থেকে নিস্ক্রমণ বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ৩·২ মাইল। অতএব আশা করা যায় মঙ্গলগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে ছুট দিতে পারে নি। মঙ্গলগ্রহে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার প্রমাণ মেরুপ্রদেশের টুপি। মেরুপ্রদেশের টুপি বিশেষ এক ঋতুতে গলে গিয়ে জল হয়ে যায়, আবার বাষ্প হয়ে ফিরে এসে বিশেষ এক ঋতুতে আবার মেরুপ্রদেশে বরফের টুপি পরিয়ে দেয়—বায়ুমণ্ডল না থাকলে এ ব্যাপারটা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। এছাড়া নানাভাবে ফটোগ্রাফ নিয়েও প্রমাণ করা হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডল আছে। আমরা জানি যে, যে সব গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে সে সব গ্রহের উপরিতল চোখের আড়ালে থেকে যায়। মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডল থাকা সত্ত্বেও তার উপরিতলকে দেখা যায়। এদিক দিয়ে মঙ্গলগ্রহ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

এবার দেখা যাক মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে কি কি গ্যাস আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম। অক্সিজেন আছে কি না তা জানা যায় নি। অনুমান করা চলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে তার হাজার ভাগের এক ভাগ অকসিজেনও মঙ্গলগ্রহে নাই। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন মঙ্গলগ্রহের পাথরগুলো সবটুকু অক্সিজেন গিলে নিয়েছে, তার ফলে তার রং লালচে হয়ে গেছে। এ যেন লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের মিশ্রণ—ফল মরচে, এও হচ্ছে তাই। এই জন্যেই মঙ্গলগ্রহে অকসিজেনের এত টানাটানি। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কারণ কার্বন-ডাই-অাকসাইড গ্যাস পরিমাণে অনেক থাকি না হলে পৃথিবীর যন্ত্রে সাড়া জাগায় না।

মঙ্গলগ্রহের ঋতুর স্থায়িত্ব পৃথিবীর ঋতুর স্থায়িত্বের প্রায় দ্বিগুণ। মঙ্গলগ্রহ যখন সূর্য্যের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে তখন উত্তর গোলার্দ্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ গ্রীষ্মকাল। মঙ্গলগ্রহ যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে তখন উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্মকাল আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে শীতকাল।

এই হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের মোটামুটি খবর। এ থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত করতে পারি ? মঙ্গলগ্রহে কি সত্যি সত্যিই জীবনের অস্তিত্ব আছে ? যে গ্রহে জল আছে, পরিমাণে অল্প হলেও অক্সিজেন আছে, সেখানে জীবনের অস্তিত্ব না থাকার কোন কারণ নেই। তবে মানুষের মত উচ্চ পর্য্যায়ের জীব নেই। মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও মঙ্গলগ্রহ এক লুপ্তপ্রায় জীবনের দেশ। এই গ্রহটি তার বায়ুমণ্ডলকে খুইয়েছে, জলের সঞ্চয় নিঃশোষিত, অক্সিজেনের ভাণ্ডার উজাড় সুতরাং জীবন যেটুকু আছে তা মুমূর্ষু। শ্যাওলার মত উদ্ভিদ আজো সেখানে ঋতুতে ঋতুতে গজিয়ে ওঠে তাও হয়ত একদিন মুছে যাবে। তখন আর একটি মৃতগ্রহের সংখ্যা বাড়বে আমাদের এই সৌরমণ্ডলে।

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী : ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, এম এ, ডি, লিট; প্রকাশক : গ্রন্থনিলয়, ৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য—বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৩৭৩।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ যাবৎ প্রকাশিত সমালোচনা-গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শো, নিবন্ধ-প্রবন্ধের সংখ্যা কয়েক সহস্র। শব্দজাল অবশ্যই মহারণ্য এবং চিত্তভ্রমণ কারণ। তার মধ্যে প্রকৃত আহরণীয় সম্পদের সন্ধান করা দুরূহতম কিন্তু সার্থক কর্তব্যকর্ম। শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচক রূপে প্রথম দিকে যশস্বী হয়েছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সেন ও নলিনীকান্ত গুপ্ত।

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচক নিঃসংশয়ে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। চার বছর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁকে ডি, লিট উপাধি দান করে। বলা বাহুল্য নয় যে, তার দ্বারা প্রকৃত গুণীকে সম্মানিত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। থিসিস বা গবেষণা-নিবন্ধ দাখিল ক'রে ক্ষুদিরাম দাস মশাইএর আগে আর কেউ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বা বাংলা সাহিত্যে ডি, লিট উপাধি পান নি। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে সে-উপাধি অধ্যাপক দাসকে দেওয়া হয়।

যথার্থ জ্ঞানপিপাসুর গবেষণা উপাধি-প্রাপ্তিকে চরম লক্ষ্য বলে মনে করে না। ডঃ দাস রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষণায় ক্ষান্ত না হয়ে আমাদের জ্ঞানের দিগন্ত আরও দূরপ্রসারী ক'রে দিয়েছেন তাঁর মহত্তর সমালোচনা গ্রন্থ "চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী"-তে। ৩১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বিস্ময়োদ্দীপক বিবদ্ধ গ্রন্থে সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও পাশ্চাত্য বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা পদ্ধতির সুসমন্বয় সাধিত হয়েছে। এ বই রবীন্দ্র সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদেরও দিগ্‌দর্শনের কাজ করবে অথচ প্রথম শিক্ষার্থীরাও অনার্স ও এম, এ, ক্লাসে এ বই পড়লে রবীন্দ্রসাহিত্য মধুচক্রের মর্মকোষে প্রবেশের পথ খুঁজে পাবে।

রবীন্দ্র কাব্য সমালোচনা কবির অলোকসামান্য গীতিকাব্য প্রতিভার সান্নিধ্যে সহজেই রসানুভূতিব্যঞ্জক সমালোচনা-সাহিত্যে যে পরিণত হতে পারে, "চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী" তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবীন্দ্রকাব্য মুখ্যত দু'দিক থেকে বিচার করা হয়েছে : চিত্রধর্ম ও সঙ্গীত-স্পন্দন। কথার তুলি দিয়ে ছবি-আঁকা এবং কথার বীণাযন্ত্রে সুরের ঝঙ্কার-রচনা—উভয়বিধ জাদুবিদ্যায় রবীন্দ্রনাথের যোগ-বিভূতি অধ্যাপক দাস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দু'রকম পরিপ্রেক্ষণের রঙ্গমঞ্চে যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে তাঁকে লক্ষ্য করে বলা যায় : বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে। রবীন্দ্র কাব্য সমালোচনায় তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রনিপুণ পাঠক ভিন্ন সাধারণ লোকে ধারণাও করতে পারবে না রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্কেতিত বাণীর সৌন্দর্য প্রতীয়মানের প্রয়াসে অধ্যাপক দাস কি অসামান্য বিশ্লেষণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অলঙ্কিত পাঠক মুগ্ধ হবেন ডঃ দাসের অতি অনায়াস, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, আধুনিকতম ভাষায় শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ও রীতিগুলির বিশুদ্ধ প্রয়োগ দেখে।

শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম : ভারতীয় সমাজ শাস্ত্র—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০। মূল্য প্রতিখানি দুই টাকা।

সনাতন হিন্দুধর্মের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও তার নানাবিধ বন্ধনাদি পূর্বে যাহা প্রচলিত ছিল আজ তাহা নাই। হয়ত বিলিতি সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া কু-সংস্কার জ্ঞানে বর্তমান মানুষ তাহা ত্যাগ করিয়া থাকিবে। আজ উহার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহা বিচার করিবার পূর্বে জানা দরকার আগেকার সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল। আজ সমাজ বলিয়া কোন বস্তুই নাই, তাই সামাজিক বন্ধনও আমরা হারাইয়াছি। এই ব্যবস্থা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহার বিচার পণ্ডিতরা করিবেন।

আলোচ্য দুইখানি গ্রন্থে গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন : আর্য ও অনার্যের উৎপত্তি স্থান, মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, জাতিবিভাগ, ধর্ম ও ক্রমোন্নতিবাদ পূর্বজন্ম ও পুনর্জন্ম, বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য, ভারতীয় সমাজ ও প্রগতিতত্ত্ব, আহারাদি বিষয়ে বিধিনিষেধ, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কর্তব্য ইত্যাদি। এই গ্রন্থে লেখক আপনার মতের সমর্থন হিসাবে পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থ হইতেও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নিজ সমাজের এবং সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য মানুষের কি করা উচিত, জীবন-ধারা কি ভাবে চালনা করা কর্তব্য—মানুষেরই বা কর্তব্য কি এ সকলেই চিন্তা করেন। যে যুগে এই বিধি-ব্যবস্থা বলবৎ ছিল আজ কালপ্রবাহে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এ পরিবর্তন সকল দিক দিয়াই আসিয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্বের মত আর নাই। কালই তাহাকে নিত্য ভাঙিতেছে, গড়িতেছে। কালের সহিত পা ফেলিয়া চলিতে না পারিলে হোঁচট খাইতে হয়। যাঁহারা প্রাচীন তাঁহারা আক্ষেপ করিতেছেন, যাঁহারা নবীন তাঁহারা উল্লাস করিতেছেন। তথাপি বলিব এই বই দু'খানির প্রয়োজন ছিল। সনাতন ধর্মের এই গূঢ় তত্ত্বগুলির সহিত, যাহা ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সহিত বর্তমান যুগের মানুষের পরিচয়-সাধন কম কথা নয়।

শ্রীগৌতম সেন

অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য : অধ্যাপক অবন্তীকুমার সান্যাল। প্রকাশক : বিদ্যাভবন, বর্ধমান ; মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থটিতে ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিখ্যাত "বিভাবানুভাব ব্যভিচারি সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তি" ; সূত্রটির অভিনব গুপ্ত-কৃত টীকা অংশটি 'অভিনবভারতী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং সরস ভাষায় প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন। সে ব্যাখ্যা এ যাবৎ প্রকাশিত কোন একখানি গ্রন্থের পাঠকে সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করে নি। অধ্যাপক সান্যাল বিপুল আয়াসে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে একটি নতুন পাঠ প্রস্তুত করে নিয়েছেন অনুবাদ সৌকর্যের জন্য। গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার যে ব্যাখ্যা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা ইতালীয় অধ্যাপক রেনিয়েরো গনেলির প্রখ্যাত গ্রন্থ 'The Aesthetic Experience according to Abhinova Gupta' গ্রন্থটিকে মোটামুটি অনুসরণ করেছে। অর্থের সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে অধ্যাপক সান্যাল গ্রন্থটির আদ্যন্ত সাত বিভাগ করেছেন অনুরূপ স্থানে পরিচ্ছেদ বিভাগও সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভারতমুনি নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বা (রসাধ্যায় রূপে পরিচিত) পঞ্চ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। আত্রেয় প্রভৃতি মুনিরা প্রশ্ন করেছেন : রসের রসত্ব কেমন ক'রে হয়? ভাবের অর্থ কী ; তাদের ভাব বলা হয় কেন? তাদের কাজই বা কী? সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্তের লক্ষণ কী কী? রসতত্ত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে ভরতমুনি ব্যাখ্যাপদ্ধতির ক্রমের কথা বলেছেন— উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যাখ্যা করেছেন। এই ক্রম অনুসারেই শাস্ত্রের সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত ভেদ হয়েছে। ইতিপূর্বে নাট্যশাস্ত্রকার ২৫-৩১ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দিয়ে কয়েকটি সূত্রে নাট্যের উদ্দেশ করেছেন ; এখন তাদের আরও বিস্তৃত লক্ষণ ও ভাষ্য ক'রে পরীক্ষা করতে চলেছেন। পূর্বে তিনি রসের কথাই বলেছেন, কারণ তাঁর মতে "রস ছাড়া কোন অর্থই প্রবর্তিত হয় না" (ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে—না শা, ৬.৩১)। এই ভাবে ব্যাখ্যাসূত্রে ভরতমুনি রসাধ্যায়ের উপরি-উদ্ধৃত প্রখ্যাত শ্লোকটির অবতারণা করেছেন। রসতত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু বিতর্ক তা ভরতমুনির এই সূত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে। যুগে যুগে টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা এই সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপন আপন দর্শন মত অনুযায়ী বিভিন্নমুখী পরস্পর খণ্ডনাত্মক যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই সব পাণ্ডিত্যাভিমানী বুধবংশাবতংসের দল, আশ্চর্যের কথা, ভারতের সূত্রটিকে অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট বলেন নি বা এটিকে উপেক্ষা করার চেষ্টাও করেন নি। প্রাচীনতম ভাষ্যকার ভট্ট লোল্লট থেকে আরম্ভ ক'রে মহিম ভট্ট পর্যন্ত সকলেই আপন আপন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূত্রটির ব্যাখ্যা ক'রে 'রস নিষ্পত্তির' নিগূঢ় অর্থটি পাঠককে অনুধাবন করতে সহায়তা করেছেন। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে অভিনব গুপ্তই এই রসতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ মীমাংসক। তিনি যে রসতত্ত্বের প্রতিপাদন করেছেন, পরবর্তীকালে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত ধ্বনিবাদীদের কাছে তা প্রামাণ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। অভিধাবাদী ধনঞ্জয় ধনিক রসের ব্যঙ্গত্ব অস্বীকার ক'রে তাৎপর্যশক্তি স্থাপন করলেও অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যাত রস-লক্ষণকে মূলতঃ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। মহিম ভট্ট 'ধ্বনি-ধ্বংসের' ঘোষণা করলেও এ কথা জানাতে ভোলেন নি যে রস সম্পর্কে ধ্বনিকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই। আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তের রস নিষ্পত্তি তত্ত্বের অনুধাবন ব্যাপারে মহিম ভট্টের মতেই ধ্বনিকারের সঙ্গে অবিরোধী। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের রস ব্যাখ্যার এই প্রাচীন ঐতিহ্য ও মতবিরোধ পরিপ্রেক্ষণায় অধ্যাপক সান্যালের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানির মর্যাদাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রে আমরা এটিকে বঙ্গ ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি। কামনা করছি, এই পুস্তকের বহুল প্রচার ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের জ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তৃত করুক।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দা
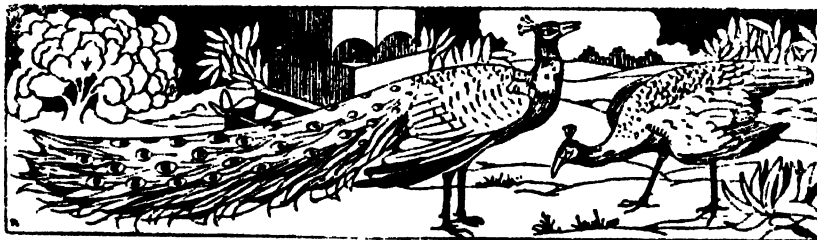
বাংলা চলিত রীতির ক্রম-বিবর্তন

শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

সাহিত্যের ইতিহাসে আকস্মিকতার ব্যাপারটি সম্ভবত অর্থহীন। বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলেও, বিশেষ করে প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে এই মন্তব্য অনস্বীকার্য। অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে সব কিছুই ক্রম-বিবর্তনের সূত্রে বিধৃত। কিন্তু তবু নিছক কাজের সুবিধার জন্যেই ব্যক্তিবিশেষের রচনাকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কোন যুগ অথবা রীতির সূত্রপাত ধরা হয়ে থাকে মাত্র।

ভূমিতে ফসল ফলানোর পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রয়োজন অপরিহার্য। ভূমি কর্ষণ, জল সেচন, বীজ বপন, সার প্রদান, নিয়মিত তত্ত্বাবধান প্রভৃতিরই স্বাভাবিক পরিণতি শস্যের উৎপাদন। অনুরূপভাবে সাহিত্যের ইতিহাসেও ক্ষেত্র প্রস্তুতির ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ, পূর্বসূরীদের প্রস্তুত ক্ষেত্রই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-বিশেষের রচনাকে চরমোৎকর্ষ দান করে থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে।—বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত সাধারণভাবে মধুসূদন থেকেই ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরী—ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল প্রমুখদের অবদানকেও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কিংবা যে গদ্য কবিতার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'কে কেন্দ্র করে, সেই গদ্যকবিতার আদিপর্বের ইতিহাস কিন্তু 'লিপিকা'র বহু পূর্বেই যে 'বেদ,' সংস্কৃত 'চম্পু' কাব্য, বাণভট্টের 'কাদম্বরী', রূপকথা, ব্রতকথা, রাজকৃষ্ণ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, প্রভৃতিদের মাধ্যমে রচিত হয়েছিল—তা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। আবার যে বাংলা গদ্যের 'জনক' বলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করা হয়ে থাকে, সেই বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন প্রমুখদের দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল, তা কোনমতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। তেমনিই যে প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'কে (১৯১৩) কেন্দ্র করে বাংলা চলিত রীতির জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল, মনে রাখতে হবে, যে সেই প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর 'সবুজ পত্রে'র আত্মপ্রকাশের বহুপূর্বেই বাংলা চলিত রীতির প্রকাশ ঘটেছিল—অবশ্য কোন ক্ষেত্রে তা হয়ত অসচেতন ভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডিতভাবে। কিন্তু তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পূর্ববর্তীকালের খণ্ডিত ভাবে প্রকাশিত চলিত বাংলাই শেষ পর্যন্ত ক্রম-বিবর্তনের ধারায় আজকে রাজকীয় আধিপত্য লাভে সমর্থ হয়েছে। এককালে যে চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাধুভাষার সমর্থকদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করতে হয়েছিল, আজ সেই ভাষাই আমাদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র না হলেও উল্লেখযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আজকের কোন লেখক আর সাধুভাষায় গল্প অথবা উপন্যাস রচনার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য—এই চলিত রীতিরই ক্রম-বিবর্তন ধারাটি। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য, তা হ'ল যে রীতিটি পরবর্তীকালে রাজকীয় আধিপত্য লাভ করবে, সেই চলিত রীতি বাংলা গদ্যের সূচনা পর্ব থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পাদ্রী মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি যে ভাওয়ালের প্রচলিত মৌখিক ভাষায় রচিত, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্যে রচিত প্রথম গ্রন্থটিই (?) তা হ'লে বাংলা চলিত ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি থেকে কিছু নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে—

গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: আমি মালা জপি না: তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাহু মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং

ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।

ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'ও আমরা চলিত বাংলার নিদর্শন লক্ষ্য করতে পাই। এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদে'র স্থায় এটিতেও খ্রীষ্ট মহিমা প্রশ্নোত্তর ছলে বর্ণিত হতে দেখা গেছে। বিষয়গত সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলেও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র সঙ্গে এটির ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়—

ব্রাহ্মণ। তুমি কারে ভজো?

রোম। পরমেশ(শ্ব)রেরে পুর্ণা ব্রমে(হ্ম)রে।

ব্র। তবে তোমোরা বরো উত্(ত্ত)ম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি (?)।

রো। যদি তোমোরা সেই পুর্ণো ব্রমে(হ্ম)রে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত কুর্বরাণ নানা অধর্ম্মো ভজোনা দেখি?

ব্র। তুমি এমত গিয়(ন)মোস্তো হইয়া আমার-দিগের পরমেশ(শ্ব)রেরে নিন্দা করহ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্র অপারনিমান নাহি?

রো। আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্ম্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যে জন অধর্ম্মেরে ধর্ম্মো বলে সে মহা নারোকী।

মনে রাখতে হবে বিদেশীদের দ্বারা যে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়েছিল তার পেছনে ছিল তাদের নিজেদেরই স্বার্থ। পোর্তুগীজ পাদ্রীরা যে চলিত বাংলার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাও বিনা কারণে নয়। পাদ্রীরা প্রথম থেকেই জনসমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যেই চলিত ভাষায় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। যাই হোক কেবল-মাত্র বাংলা গদ্যের আদিযুগের নিদর্শন হিসাবেই নয়, বাংলা চলিত রীতির ধারায় আঞ্চলিক কথ্যভাষায় রচিত এ গ্রন্থ দু'টির যে বিশেষ মূল্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কোর্ট উইলিয়াম কলেজের নেতা: উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর কারণ, কেরী যে কেবলমাত্র পণ্ডিত মুন্সীদেরই বাংলা গ্রন্থ রচনায় বিশেষ উৎসাহ দান করে-ছিলেন তাই নয়, নিজেও একাধিক গদ্য গ্রন্থ রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি একদিকে বাংলা গদ্যকে আরবী-ফারসীর প্রভাব থেকে মুক্ত করে এবং সংস্কৃত আদর্শের অনুগামী করে তার গঠন-সৌষ্ঠব এবং প্রকাশ-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আবার অপরদিকে কথ্যভাষাকে একটা সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে বিশেষ সহায়তা করেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর Dialogues Colloquies) বা 'কথোপকথন' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থটি তৎ-কালীন সিভিলিয়ানদের চলিত বাংলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

বাস্তবিক, একাধিক কারণেই 'কথোপকথন' গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগে মৌখিক ভাষা শিক্ষায় এই গ্রন্থটির যে বিশেষ অবদান ছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। ইতিপূর্বে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ঠিক ৫৮ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' গ্রন্থেও আমরা ভাওয়ালের প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার সর্বপ্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করি। কিংবা 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'ও প্রায় 'কৃপার শাস্ত্রেরই অনুরূপ ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উভয় গ্রন্থের ক্ষেত্রেই যে বিষয়বস্তুগত সীমাবদ্ধতা ছিল—তা অস্বীকার করা চলে না। বলা বাহুল্য এ দু'টি গ্রন্থের শব্দকোষও ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কেরীর 'কথোপ-কথন' এদিক দিয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। বিষয়বস্তুর ব্যাপারেও 'কথোপকথনে'র বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হবে। কারণ, কলকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এ গ্রন্থে রূপায়িত হতে দেখা গেছে। চাকর ভাড়া করা', ভোজনের কথা, মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথা, মেয়েদের ঝগড়া, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কেরীর 'কথোপকথনে'র ভাষাই পরবর্তী-কালের বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলিত ভাষায় পরিণত হয়েছে ব'লে বলা চলে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

(ক)… …চল দিদি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধসের টাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সুতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি। নারে তোরে আর সুতা দিব না আর দিন দুই যে

সুতা হাটকিরাহিলি তাহাতে আমার সুতা নষ্ট হইয়াছে।
(স্ত্রীলোকের হাটকরা)

(খ)·········তুই আমার কি অহংকার দেখিলি তিন-কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস।

·········তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাচাহ করে বাঙ্গে তবেই ও অহংকারির অহংকারে ছাই পড়ে। (কন্দল)

(গ) আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।

ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।

তোরদের কি হইয়াছিল।

আমাদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

(স্ত্রীলোকের কথোপকথন)

কেরীর পূর্ববর্তীকালে রচিত চলিত বাংলার যে নিদর্শন পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের তুলনায় 'কথোপকথনে'র বাংলা যে কত জীবন্ত, সহজ ও স্বাভাবিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামান্য কিছু পরিবর্তন-সাপেক্ষ আধুনিক চলিত বাংলার সঙ্গে এ ভাষার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন "······তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট-করা, মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গিতে রচিত যে, এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের পরবর্তীকালের কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে।" কিন্তু এ হেন 'কথোপকথনে'র রচয়িতা হিসাবে সকল সম্মান কেরীরই প্রাপ্য কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন—

"That the work might be as complete as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogeus upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers."

—সুতরাং কেরীর কথামত গ্রন্থের রচয়িতা যে একাধিক ব্যক্তি তা দেখা গেল। অবশ্য অনেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনার সঙ্গে বিশেষত তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষার সঙ্গে 'কথোপকথনে'র যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই গ্রন্থের রচয়িতা রূপে বিদ্যালঙ্কারেরই উল্লেখ করে থাকেন। সে যাই হোক, মোটের ওপর রচয়িতা অপেক্ষা 'কথোপকথনে'র পরিকল্পনা তথা সম্পাদনার কৃতিত্বই বিশেষভাবে কেরীর ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

এইবার আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসঙ্গে আসতে পারি। সাধারণভাবে সংস্কৃতজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, তাঁর গদ্য না কি জটিল এবং সংস্কৃতানুসারী। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনা নিঃসন্দেহে আংশিকতা দোষে দুষ্ট। কারণ মৃত্যুঞ্জয় যদিও এক শ্রেণীর গ্রন্থে সংস্কৃত বাক্‌রীতির ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাই বলে কেবলমাত্র এই শ্রেণীর রচনাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুঞ্জয়ের সামগ্রিক রচনা সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে। মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃতানুসারী রচনারীতির সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র (১৮৩৩) কিছু কিছু অংশকেও স্মরণ করতে হবে, যেখানে তিনি চলিত বাংলার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছেন। এমন কি নিতান্ত গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগেও তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন নি।—

কার্পাস তুলি তুলা করি সুড়ী পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফুলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুন করি কাঁইনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া কেণ আমানি খাই।

বিশেষতঃ

শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। —এরূপ অংশ যেন আজকের দিনের রচনা বলে ভ্রম হয়। বাস্তবিক, মৃত্যুঞ্জয়ের যে চলিত রীতির প্রতিই স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল,

'প্রবোধচন্দ্রিকা' তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'ও (১৮০২) সংস্কৃতানুসারী ভাষা রীতির সঙ্গে চলিত রীতি অনুসারণের প্রমাণ পাওয়া যায়।—

রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানীজনের উপযুক্ত নয়।

বাংলা গদ্যের জনক রূপে আমরা পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করে থাকি। বিশেষত আজকের সাধুভাষা যে বিশেষ ভাবে বিদ্যাসাগরেরই দানপুষ্ট, তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—."

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যাসাগর মূলতঃ সাধু-ভাষায় তাঁর গ্রন্থাদি রচনা করলেও চলিত ভাষায় রচনা করারও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সম্ভবত যেহেতু বিদ্যাসাগরের সময়ে চলিত বাংলা রীতির প্রচলন ছিল না, সেইহেতু তিনি চলিত বাংলা রীতির প্রয়োগে তেমন উৎসাহ বোধ করেন নি! "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য"—এই ছদ্মনামে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "আবার অতি অল্প হইল" পুস্তিকা থেকে বিদ্যাসাগরের রচিত চলিত বাংলার অপূর্ব নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে—

প্রথম—ইতিপূর্ব্বে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে, বড় রাজার একটা শ্রাদ্ধ হয়েছিল। খুড় আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বিদায়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়—শ্রাদ্ধের দিনে, ঐ রাজবাড়ীতে, খুড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে সন্দেশের সরা বিলতে গেলেন; এবং এক ব্রাহ্মণের হাতে একখান সরা দিয়া, সে বেটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয় জানিতে পারিয়া, তার হাত থেকে সরাখান কেড়ে নিলেন;......সকলে বলুন, পরের বাড়ীতে, বৈশাখ মাসে, কর্ম্মের দিনে, নিমন্ত্রিত শত শত ভদ্রলোকের সমক্ষে, তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে, ব্রাহ্মণকে প্রহার করা, গুণমণি খুড়র পক্ষে, উচিত কর্ম্ম হয়েছে কি না; এবং আমি, তাঁর উপযুক্ত ভাইপো হয়ে, এমন স্থলে, চুপ করে না থেকে, উপদেশ অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না।—এ গদ্য একেবারে হাল-আমলের সঙ্গে ভুল হবার সম্ভাবনা।

বাংলা চলিত ভাষার বিবর্তনে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামের অন্তরালে অবস্থিত প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম সবিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদ যে সময়ে বাংলা গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন, সে সময়ে বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের আধিপত্য। বলা-বাহুল্য এঁদের সংস্কৃতানুসারী গদ্য সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না। কেবলমাত্র শিক্ষিতজনেরই বোধগম্য ছিল। এইজন্যেও বটে, তা ছাড়াও যে চলিত বাংলা তখনও পর্যন্ত সাহিত্যিক মর্যাদা লাভে অসমর্থ ছিল, তাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্যারীচাঁদের প্রয়াস যুক্ত হ'ল। বিশেষভাবে কথ্য ইংরিজীর সাহিত্যিক মর্যাদা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল চলিত বাংলায় সাহিত্য রচনায় এবং তাকে যথাযোগ্য সম্মান দানে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ, রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় সম্পূর্ণ চলিত ভাষায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি যথাসম্ভব কলকাতার কথ্যভাষার ব্যবহার করতে লাগলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা সম্পূর্ণ চলিত বাংলা নয়। কারণ এতে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হয়েছে। তবে চলিত শব্দ—ইডিয়ম প্রভৃতির বহুল ব্যবহারের ফলে ভাষা অনেকাংশে চলিত বাংলার নিকটবর্তী হতে পেরেছে—

সকলে বলিল—মহাশয় যান কোথায়? কবিরাজ কহিলেন—উদ্রণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয়, এক্ষণে রোগীকে এখানে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা শুনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চোঁ করিয়া পিট্টান দিলেন—বৈদ্যবাটীর অবতারেরা সকলেই পশ্চাৎ ২ দৌড়ে যাইতে লাগিল—কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—নববাবুরা কবিরাজকে গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে২ গঙ্গাতীরে আসিল।

—এখানে 'ধড়মড়িয়া,' 'চোঁ করিয়া', 'পিট্টান', 'হতভোম্বা', 'গলাধাক্কা' প্রভৃতি নামধাতু ও শব্দগুলির প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদের রচনার অন্য অংশ থেকেও নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে ভাষা অত্যন্ত লঘু এবং জীবন্ত হয়ে চলিত ভাষার ঘনিষ্ঠ নিকটবর্তী হতে পেরেছে—

দেপাক—দেপাক—ভেডাং ভেডাং ভেং ভেং। চড়ুকের পিট চড় ২ করে তবুও পাগুটি নেড়ে আঙুল ঘুরায়ে এক ২ বার বলে, দে পাক—দে পাক। মাতালও সেইরূপ—গলগলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল করছে—কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকে ২ এদিক ওদিক পড়ছে, তবু বলে—চলি ২।

(মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, ১৮৫৯)

—এখানে 'ঘুরায়ে', 'সেইরূপ' প্রভৃতি দু'একটি শব্দ ব্যতিরেকে বাকি অংশ যে ত্রুটিমুক্ত চলিত ভাষায় রচিত, তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

যাই হোক, প্যারীচাঁদের ব্যবহৃত বাংলায় যা কিছু ত্রুটি ছিল, তা সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করল কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৬) হাতে। অবশ্য একথা ঠিক যে, কালীপ্রসন্ন অনেকাংশে প্যারীচাঁদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবিমিশ্র চলিত বাংলার সুষ্ঠু ব্যবহারে কালীপ্রসন্ন প্যারীচাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর পূর্ব পর্যন্ত কোন লেখকই অবিমিশ্র চলিত ভাষায় আদ্যন্ত কোন কিছু রচনা করেন নি। হয় তা সাধু ও চলিতের মিশ্রণ, নতুবা চলিত ভাষার খণ্ডিত ব্যবহারই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খাঁটি মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি উচ্চারণ অনুসরণে তিনি বানানগুলির ব্যবহার করেছেন, এক্ষেত্রে তিনি ব্যাকরণের প্রচলিত অনুশাসন রক্ষা করেন নি। বাস্তবিক, আজকের দিনেও কালীপ্রসন্নের মত দুঃসাহস দেখাবার ক্ষমতা খুব কম জনেরই আছে স্বীকার করতে হয়।

সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যা যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা রাখে না। গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো—রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মা'র কোলে কুণ্ডলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

(হুতোম প্যাঁচার নক্শা)

কিংবা,

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পূজার ভারি ধুম। প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড়ি গিস্‌গিস্ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হরীশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্ত নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙীন কফজল জাজিমে পুঁচ্চেন। (ঐ)

কালীপ্রসন্ন তাঁর রচিত নক্শায় কলকাতার খাঁটি 'ককনি' বুলি—অর্থাৎ কলকাতার নিম্ন সমাজে প্রচলিত চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন। মনে রাখতে হবে কালীপ্রসন্নের আবির্ভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটেছিল। সুতরাং কালীপ্রসন্নের কৃতিত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তবু বঙ্কিম প্যারীচাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে কালীপ্রসন্নের যে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, তার কারণ নিহিত রয়েছে বঙ্কিমের মানসিকতায়। বঙ্কিম মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। রুচিবর্জিত আচরণ অথবা বচন—বঙ্কিমের পক্ষে ছিল অসহনীয়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের রুচির প্রশংসা করতে না পারলেও, তাঁর ব্যবহৃত আশ্চর্য ভাষা যে সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম যে কেবলমাত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের সঙ্গেই যুক্ত তা নয়, বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিবর্তনেও তাঁর একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, সাধু গদ্য রচনায় দীনবন্ধু মোটেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নি। দীনবন্ধুর সাধু গদ্য যে পরিমাণে সংস্কৃতঘেঁষা, নিশ্চল, আড়ষ্ট ও কৃত্রিম তা উদ্ধৃতাংশ থেকেই বোঝা যাবে—

এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত : আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন : বজ্রাঘাতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত : প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রাস্বরূপ নিদ্রায় অভিভূত : সকলে নীরব : শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ ;—ইত্যাদি।

(নীলদর্পণ : ১৮৬০)

কিন্তু অপর পক্ষে দীনবন্ধু,

মহাদেব! বোম্ ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিত হইয়া শয়ান) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়!

রে ধর্মলজ্জা মান মর্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েচ।

(সধবার একাদশী : ১৮৬৬)

—এরকম সজীব বাংলাও ব্যবহার করেছেন। দীনবন্ধু তাঁর নাটকের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের জন্যে অমার্জিত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। বলাবাহুল্য এই অমার্জিত গদ্যকে কোন কোন সমালোচক মিশ্র ভাষা কিংবা প্রাদেশিকতা-দুষ্ট বলে মন্তব্য করলেও, এর প্রাঞ্জলতাকে যে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না তার প্রমাণ পূর্বের উদ্ধৃতাংশটি।

মহাকবি মধুসূদনের একমাত্র গদ্যকাব্য 'হেক্টর বধে' (১৮৭১) সাধু বাংলা ব্যবহৃত হলেও, মাঝে মধ্যে চলিত বাংলারও বেশ ঘনিষ্ঠ অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

হায় প্রিয়ে। বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্ নগরীর কোন ভর্ত্রিনীর আদেশে, অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া নদনদী হইতে জল বহিবে,......

—তবে এরকম ব্যবহারের ক্ষেত্র নিতান্তই সীমিত।

ধর্মজগতের অধিবাসী স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। বিশেষ করে চলিত বাংলার বিবর্তনে বিবেকানন্দের স্বল্প পরিমিত অথচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিবেকানন্দের রচনাবলীর অধিকাংশই বিদেশী ভাষায় রচিত। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এরা মূল্যহীন। কিন্তু তিনি চিঠিপত্রাদি, ডায়রী কিংবা ভ্রমণ-কাহিনীতে যে গদ্য ব্যবহার করেছিলেন, তা কলকাতার খাঁটি 'ককনি' বুলি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে তাঁর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে," ...বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষ, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্ব, পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখতে হবে।"

অতএব ভাষার ব্যাপারে বিবেকানন্দ যে কেন কলকাতার চলিত ভাষার সমর্থক, তা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বিবেকানন্দের মতে, "পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে?... স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিক ফেরাও সেদিকে ফেরে; তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না।"

(ভাব্‌বার কথা : ১৩১৪)

বিবেকানন্দ স্বয়ং বলেছেন, "ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—", তাঁর নিজের ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি ঠিক তাই করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত চলিত ভাষাও ইস্পাতের ন্যায়ই একাধারে বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী। ভাষাকে তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন নিজের ইচ্ছামত—

বলি রঙের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা গঙ্গামা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও; আর বড় একটা কিছু থাকবে না! দৈত্যদানবের হাতে পড়ে এসব যাবে।

সাধু বাংলার ক্ষেত্রে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থান, তেমনি চলিত বাংলার ক্ষেত্রে স্থান প্রমথ চৌধুরীর। অবশ্য বিদ্যাসাগর যেমন সাধু বাংলা গদ্যের জনক রূপে অভিহিত হন, চলিত বাংলার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীকে সেই একই বিশেষণে বিশেষিত করা না গেলেও, অন্ততঃ বাংলা ভাষা বিরোধের ক্ষেত্রে একজন সুষ্ঠু মীমাংসাকারীরূপে তাঁর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে অনেকেই যে চলিত বাংলায় কিছু কিছু রচনা করেছেন, তা আমরা দেখেছি। আবার একাধিক ব্যক্তিকে আমরা চলিত ভাষার সমর্থনে অভিমত প্রকাশ করতেও দেখি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখদের নাম স্মরণীয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এত সব সত্ত্বেও ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে তেমন কোন স্থায়ী সমাধান লক্ষ্য করা যায় নি। সাধুভাষা পূর্বের মতই আধিপত্য বিস্তার করে চলছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকেই আমরা প্রথম দেখি এই ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে স্থায়ী মীমাংসাকারী রূপে আত্মপ্রকাশ

করতে। এবং এই মীমাংসা তাঁর সম্পাদিত প্রখ্যাত 'সবুজ পত্রের (১৯১৩) মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। যদিও প্রমথ চৌধুরীর ব্যবহৃত চলিত ভাষা তাঁর প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেকার কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ন্যায় শক্তিশালী ও তীক্ষ্ন নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, তাঁর চলিতভাষা অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষারই নামান্তর—একদিকে তা যেমন মার্জিত, অপরদিকে তেমনি কৃত্রিম। হুতোমের ভাষার মত জীবন্ত ও প্রাঞ্জল নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা যথেষ্ট স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক। কিছু নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে—

খানিকক্ষণ পর,—কতক্ষণ পর তা বলতে পারিনে,—বেহারাগুলো সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্বেই পেয়েছিলুম,—কিন্তু সে জোর যে এত অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাঁড়েজীটিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "রামনাম সৎ হায়" "রামনাম সৎ হায়" এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে আমার মনে হ'ল যে, আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভূতেরা পাল্কিতে চ'ড়িয়ে আমাকে প্রেতপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রমথ চৌধুরীই যে প্রথম চলিত ভাষাকে নির্ভয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয় তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হ'ল, যে চলিত ভাষা তাঁর পূর্ব পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃতিলাভে ছিল অসমর্থ, তাকে সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভে সহায়তা করা। এবং আজকের দিনে যে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রেই অধিক, তার মূলেও প্রমথ চৌধুরীর অবদান বর্তমান। সুতরাং বাংলা চলিত ভাষার পথিকৃতের মর্যাদা তাঁকে না দেওয়া গেলেও, তাঁর যে একটা বিশেষ স্থান বাংলা চলিত ভাষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষত রবীন্দ্রনাথও প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-রীতিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু সমর্থন জানান নয়, নিজেও চলিত ভাষার শক্তি ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্যাপকভাবে চলিত ভাষার ব্যবহারে

মনোনিবেশ করেন। এবং সার্বভৌম প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারের ফলেই বাংলা চলিত ভাষার যে কেবলমাত্র সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভবপর হ'ল তাই নয়, বলা যেতে পারে চরম রূপলাভ করে নিজের অধিকার ক্ষেত্র বাড়িয়ে নিল অনায়াসে। পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত চলিত ভাষার কিছু নিদর্শন গ্রহণ করে বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করা যেতে পারে—

(ক) আমি প্রাচ্য, আমি আসিয়াবাসী, আমি বাঙ্গলার সন্তান, আমার কাছে য়ুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যে—আমাকে একটি নদীতীর, একটি দিগন্তবেষ্টিত কনক সূর্য্যাস্ত রঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা, খ্যাতি প্রতিপত্তিহীন প্রচ্ছন্ন চেষ্টাবিহীন নিরীহ জীবন, এবং যথার্থ নির্জ্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালবাসাপূর্ণ একটি হৃদয় দাও—আমি জগদ্বিখ্যাত সভ্যতার গৌরব, উদ্দাম জীবনের উন্মাদ আবর্ত্ত, এবং অপর্য্যাপ্ত প্রবল উত্তেজনা চাইনে। (য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি : ১৮৯০)

(খ) কাল অনেকদিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় একপ্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; (ছিন্নপত্র : ১৮৯৫)

(গ) সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক। (লিপিকা : সন্ধ্যা ও প্রভাত : ১৩২৬)

(ঘ) এদিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনও লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করে নি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে—ইমারত জখম হয়নি। (যোগাযোগ : ১৩৩৪—৩৫)

(ঙ) মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রণের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্‌সকে বলব 'মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছে।'

(শেষের কবিতা : ১৩৩৫)

(চ) উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবন গঠনে আরম্ভ হ'ল বিদিশি কারিগরি—কেমেস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে—কিছু-কিছু চেষ্টা হ'তে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবৌঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে; জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুল-মহলের আশে-পাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাষ্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা।

(ছেলেবেলা : ১৩৪৭)

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড | মাঘ, ১৩৭৩ | চতুর্থ সংখ্যা

ডাঃ রাধাবিনোদ পাল

ডাঃ রাধাবিনোদ পালের মৃত্যুতে বাংলা দেশের একজন বিশ্ববিখ্যাত মহাপণ্ডিত সুনীতি-বিধায়ক মহাপুরুষের তিরোধান ঘটিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি প্রথম জীবনে অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি দেখাইয়া ময়মনসিংহে একটি বিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি আইনচর্চা আরম্ভ করেন ও শীঘ্রই আইনের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁহাকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হেগের আন্তর্জাতিক তুলনামূলক আইন আকাডেমির যুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয় ও তৎপরে তিনি ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বিগত মহাযুদ্ধের পরে যখন বিশ্বের নানা কেন্দ্রে মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত অপরাধের জন্য যুদ্ধের নেতাদিগের বিচার করা হইতেছিল তখন রাধাবিনোদ পালকে প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবিউনালের একজন বিচারক ধার্য্য করা হয়। এই ট্রাইবিউনাল টোকিওতে অবস্থিত হয় ও অনেক মহা মহা অপরাধীর বিচার করে। বিচারের পরে যখন রায় প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় যে, সকল বিচারকই একমত হইয়া অভিযুক্তগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, শুধু রাধাবিনোদ পাল একটি ৮০০ পৃষ্ঠা বিভিন্ন মত-জ্ঞাপক রায় দিয়াছেন। এই রায়টি পরে সর্ব্বত্র বিশেষ যুদ্ধের অপরাধীগণের অপরাধের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিশ্বের আইনজ্ঞ মহলে ভিন্ন অভিমতের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুপক্ষের নেতাদিগকে প্রাণদণ্ডে বা কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডিত করা ন্যায্য কি না এ কথার আলোচনা আইনের দিক দিয়া নূতন করিয়া চালিত করা হয় এবং ইহার সূচনা হয় ডাঃ রাধাবিনোদ পালের লিখিত রায় দিয়া। অতঃপর ডাঃ পাল আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের সভ্য, হেগের স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিচারক ও ভারতের আইনের জাতীয় অধ্যাপক প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হন ও মৃত্যুকালেও তিনি নিজকার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বেও অসুস্থ শরীরে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির সমাজ-বিরুদ্ধতা ও নেতৃত্ব লালসার মূল প্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জাতির নূতন পথে রাষ্ট্র পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা করেন ও যাঁহারা সেই আলোচনা শুনিয়াছিলেন তাঁহারা ডাঃ পালের জ্ঞানের বিস্তৃতির কিছু পরিচয় লাভ করেন। ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁহার গভীর মমতা ছিল ও তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি কি করিয়া তাহাদিগের জীবন উন্নততর হইতে পারে সেই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কর্ম্মপ্রেরণা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথার সহিত

আবর্ত্তে পড়িয়া বহুক্ষেত্রে গরীবের সর্ব্বনাশ হয়। ডাঃ পাল বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও সাধারণের কথা কখনও ভুলিতেন না। জনসাধারণ এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে ও শিক্ষিত সমাজ এক সৎপথচেষ্টা পথ প্রদর্শককে হারাইয়াছেন।

শ্রীমোরারজীর নির্ব্বাচন অভিযান

শ্রীমোরারজি দেশাই বর্ত্তমানে কংগ্রেসের তরফের নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের সাহায্যার্থে নানা স্থলে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার ফলে প্রার্থীগণ যে বিশেষ উপকৃত হইতেছেন ইহা বলা চলে না। বরঞ্চ মোরারজির অতীতের কার্য্যকলাপের জন্য তাঁহার প্রতি জনগণের যে বিরুদ্ধভাব প্রবলভাবে জাগ্রত আছে তাহার ফল কংগ্রেসের নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। তিনি বিহারের বিভিন্ন স্থলে গমন করিয়া বক্তৃতা দানের চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া মিটিং ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরে বাংলা দেশে আসিয়াও তাঁহার ঐ প্রায় একই অবস্থা হইয়াছে। দুর্গাপুর ও আসানসোলে তাঁর মিটিং-এ অল্প লোকই গিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধতাই দেখা গিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান যে অগ্নিসম্ভব অর্থনীতির অবস্থা ও দেশের যে লোকের নিকট ক্রমশঃ ক্রয়শক্তি হারাইয়া পূর্ব্বের তুলনায় তুচ্ছমূল্য ধারণ করিয়াছে ও ফলে সকলের যে প্রতিভাজন নষ্ট, নৈতিক অধঃপতন ও সঞ্চিত অর্থের আর প্রায় কোন মূল্য নাই সেই সকল জাতীয় দুর্দশার মূলে আছেন তিনি বেশী দেশাই। ডিফিসিট ফাইনান্সের তিনি এক অতি প্রচারক ও স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি করিয়া লক্ষ লক্ষ স্বর্ণকারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যথাযথভাবে সরকারী ও বেসরকারী বিষয়ে অর্থ সংস্থান না করাতে দেশের বেকারগণ চাকরী হইতে বিযুক্ত হয় ও বহু কারবার মাল কেনার অভাবে বন্ধ হইয়া যায়। এক কথায় মোরারজিকে ভারতের দারিদ্র্যের অধঃপতনের প্রতীক বলিলে ভুল হইবে না। এই অবস্থায় তাঁহার মত কংগ্রেস নেতাদিগের উচিত কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাওয়া ও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কর্ম্মীদিগের হস্তে কার্য্যভার ছাড়িয়া দেওয়া। তাহা করিলেও যে কংগ্রেস দলের কর্ম্মশক্তি ফিরিয়া আসিবেই এমন কোন কথা বলা যায় না, কিন্তু কিছু আশা লোকেদের দ্বারা যে দেশের কোন উপকারই হইবে না এ কথা ভারতের সাধারণ মানুষও আজ বলিতেছেন ও সেই কারণে সর্ব্বত্র চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে পার্টি রাজত্ব বন্ধ করিয়া নির্দ্দলীয় সক্ষম ও গুণী লোকেদের দ্বারা শাসনকার্য্য চালনার ব্যবস্থা হইতে পারে। পার্টির স্বার্থরক্ষার জন্য দেশের স্বার্থনাশ করাকে দেশভক্তি বলা যায় না। এই কারণে পার্টি মাত্রেরই উচিত নিজেদের শক্তি ও সুবিধা আহরণ চেষ্টা অন্তত যাহাতে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর না হয় সেই চেষ্টা করা। পার্টিগুলি এখন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কোন কোন পার্টি বিদেশী শত্রু সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেও লজ্জা অনুভব করিতেছেন না। পৃথিবীতে বোধ হয় ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে স্বদেশ বিরুদ্ধতাও পার্টি গঠন করিয়া প্রচার করা সম্ভব হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, দেশে এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা জনমঙ্গল ও জনকল্যাণের মূল সত্যগুলি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এই বোধ পূর্ণ জাগ্রত না হইলে দেশের মঙ্গল ও কল্যাণও পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারিবে না। পরোক্ষভাবে বিদেশীর কবলে পড়িয়া দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাহা আমরা কংগ্রেসের বিদেশভক্তি ও পরমুখাপেক্ষিতার ভিতরে দেখিতে পাইয়াছি। সাক্ষাৎভাবে বিদেশীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যাহারা স্বদেশ বিরুদ্ধতা করিতেছেন তাঁহাদিগের অপরাধ আরও অনেক গুরুতর ও নিন্দনীয়। ইহা কিছুমাত্রও চলিতে দেওয়া মাতৃভূমির অপমান ও অমঙ্গলসূচক।

পার্টির অর্থনীতি

পার্টিগুলি কি করিয়া দল গঠন ও সংরক্ষণ কার্য্য চালাইয়া থাকে তাহা বিচার করিলে পার্টি গঠনের অপকারিতা আরও প্রকট হইয়া উঠে। যেখানে রাজকার্য্য ও পার্টি চালনা পরস্পর সহায়ক হয়, সেখানে রাজ অধিকার পার্টির সুবিধার জন্য খর্ব্ব ও অপব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, রেশন বিলি ব্যবস্থার অধিকার প্রাপ্তি হয়ত পার্টি নেতাদিগের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে ও পার্টি নেতাগণ হয়ত সেই সাহায্য শুধু তাহাদিগকেই দিয়া থাকেন যাহারা পার্টিকে অর্থ সাহায্য করে। বাস বা ট্যাক্সির লাইসেন্সও

ইহা ব্যতীত ছোট ছোট বিষয়েও পার্টির সহায়কগণ সুবিধা-লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া লোকে মনে করেন। অপরাধীর অপরাধ মাফ, সিনেমা, হোটেল, মদ-গাঁজা-আফিমের দোকান, আরও বহু কিছুর ভিতর দিয়া পার্টির সাহায্য হইতে পারে এবং সম্ভবত হয়। ইহার পরে রহিয়াছে সরকারী কারবারের বিরাট বিরাট দ্রব্য ও মালমশলা ক্রয়-বিক্রয়ের কনট্রাক্টের কথা। এই সকল কনট্রাক্টের লাভ হয় কোটি কোটি টাকা। সেই লাভ উপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যবসায়ীগণ বহু অর্থ দিয়া সংযোগ সৃজন করে। এবং এই সংযোগ সৃজন বা "কনট্যাক্ট" করিয়া দিবার জন্য পার্টির নেতৃস্থানীয় লোকেরা বহুক্ষেত্রে ইহাকে উহাকে লইয়া ঘোরাফিরা করেন। ইহার ফলে যাহাদিগের লাভ করিবার পথ খুলিয়া যায় তাহারা কি ভাবে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

যে সকল পার্টি বিদেশীর সহিত ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত তাহারা কেমন করিয়া অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত হয় তাহাও নিশ্চয়ভাবে কেহ জানে না। তবে যদি অবস্থার তুলনায় ব্যয় খুব অত্যধিকভাবে হয় তাহা হইলে গোপনে সাহায্য আসিতেছে মনে করা অন্যায় হয় না। বিদেশীদিগের কাজ কারবার সাক্ষাৎভাবে না থাকিলেও অপর বিদেশী কাজ কারবারের মারফতে সাহায্য লাভ সম্ভব। অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতীয় বহু লোক আছে যাহারা পারিলেও ভারত বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল লোকের মধ্যে অনেকে জাহাজের যাতায়াতের সহিত জড়িত আছে। তাহারা হংকং বা অন্য বন্দর হইতে গোপনে অর্থ আনয়নে সাহায্য করিতে সক্ষম। তাহাদিগের সহিত মিলিতভাবে কাজ এমন কি ধর্ম্মযাজকগণও করিতে পারে ও অনেক সময় করিয়া থাকে। নাগাল্যাণ্ডের বিষয় অনুশীলন করিলে এই কথার তাৎপর্য্য বোধ সহজ হইতে পারে। ভারতের পার্ব্বত্য সীমান্তের ভিতর দিয়া বিদেশী অর্থ ভারতীয় পার্টিগুলির সাহায্যের জন্য আসা অসম্ভব নহে। মাথাপিছু চার আনা, আট আনা চাঁদা দিয়া লক্ষ সভ্যের নিকট হইতে পাঁচ দশ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হইতে পারে না। কংগ্রেসেরও চার আনা চাঁদা আদায় করিয়া তাহা দশ কোটি হইতে হইলে সভ্য-সংখ্যা শতগুণ হওয়া প্রয়োজন হয়। এই সকল কারণে লোকের সন্দেহ হয় যে-পার্টিগুলি অন্যায় ও স্বদেশ-বিরুদ্ধ উপায়ে নির্ব্বাচনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয়ভাবে নির্দ্ধারণ করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু বিদেশীর অর্থ যদি এ দেশে আসা সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহাতে যে শুধু সব সময়ে নির্ব্বাচনই চলিবে এ কথার কোন নিশ্চয়তা নাই। সেইরূপ ভাবে অর্থ পাইলে তাহা দিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানও সম্ভব হইতে পারে। এই কারণে দেশের যাহারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়টার পাতা হইতে শিকড় পর্য্যন্ত তদন্ত করিয়া দেখা। তাহা না হইলে ইহার ফল পরে বিষময় হইতে পারে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

আউরঙ্গজেব যেন নিজ ধর্ম্মান্ধতার পথ অনুসরণ করিয়া ভারতের জনগণের উপর এক নিদারুণ উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বন্যা বহাইয়াছিলেন ও তাঁহার সাম্রাজ্য ভারতের সর্ব্বত্র সকল জাতির প্রজাদিগের উপর কাজীর বিচারের প্রকোপ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। তখন নিপীড়িত ভারতবাসী কোন দিকেই মুক্তির আলোক দেখিতে পাইতেছিলেন না। আউরঙ্গজেবের হুকুমে, ধর্ম্মপ্রচারের নামে, সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় ও আরও অনেক অধিক সংখ্যক লোকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত, চাবুক, গরম লৌহ, অঙ্গচ্ছেদন ও চক্ষুনষ্ট প্রভৃতি সহ্য করিয়া কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করেন। ইহার মধ্যে আউরঙ্গজেবের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বহু মুসলমানও ছিলেন ও তাঁহারাও এই উৎপীড়নের অবসান চিন্তা করিয়া দিন কাটাইতেন। আউরঙ্গজেব নিজ ভ্রাতাদিগকে ও তাঁহাদিগের সহচরদিগকেও হত্যা করান ও পিতাকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময় শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঐ সম্প্রদায়ের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশ্মীরের অনেক ব্রাহ্মণকে আউরঙ্গজেব মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। তাঁহারা ভীত হইয়া গুরু তেগ বাহাদুরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা কি করিবেন। গুরু তেগ বাহাদুর তাঁহাদিগকে বলিলেন বাদশাহকে তাঁহারা যেন জানান যে যদি গুরু তেগ বাহাদুর মুসলমান হইতে রাজী হ'ন তাহা হইলে তাঁহারাও মুসলমান

ধর্ম গ্রহণ করিবেন। গুরুকে বাদশাহের আদেশে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল ও বলা হইল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে। গুরু তেগ বাহাদুর তাহাতে রাজী না হওয়ায় ও বহু নির্য্যাতন করিয়াও তাঁহার মত পরিবর্ত্তন না করাইতে পারিয়া অবশেষে তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হইল ও তাঁহার দেহ বাজারে, জনসাধারণের মনে ভীতি জাগ্রত করাইবার জন্য, রাখিয়া দেওয়া হইল।

গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র গোবিন্দ পাটনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল। শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার পিতার খণ্ডিত মস্তক লুকাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদির জন্য পাটনা লইয়া যাইলেন ও গোপনে দেহ সরাইয়া লইয়া তাহার সৎকারও করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গোবিন্দ পিতার পবিত্র ও পুণ্যময় জীবনের এইরূপ ভয়াবহ অবসান দেখিয়া মনে মনে শপথ করিলেন যে নিজ সম্প্রদায়কে এমন করিয়া গঠিত করিবেন যে ভারতের এই মহাপীড়ন ও ধর্মধর্ষণ তাহারাই নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ আজ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃঘাতক আউরঙ্গজেবের অত্যাচার হইতে জাতি ও দেশকে বাঁচাইবার জন্য শিখ সম্প্রদায়কে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার শিক্ষায় ও প্রেরণায় শিখ সম্প্রদায় ভক্তির সহিত শক্তির সমন্বয় সৃষ্টি করিয়া যে "খালসা" গঠন করিতে সক্ষম হইলেন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মহাশক্তি বিকশিত হইয়া দেখা দিল। গুরু গোবিন্দ সিংহ মহাপণ্ডিত, পরম ধর্মপ্রাণ, ভাষা-অলঙ্কার-বিশারদ কবি, রাষ্ট্রনীতিবিদ ও সমরক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী যোদ্ধাগণ একভাবে যুদ্ধকার্য্য চালাইতেন। অন্যায়, অধর্ম ও অত্যাচার নিবারণের জন্য যে অভিযান পৃথিবীর দিকে দিকে যুগে যুগে অগ্রসর হইয়াছে সেই সকল অভিযানের নেতাদিগের মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া মহাপুরুষ সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আজ আবার সারা জগতে অধর্ম ও অন্যায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাই গুরু গোবিন্দ সিংহের ত্রিশতবার্ষিক জন্মোৎসবে আমরা তাঁহার মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রেরণা আমাদিগের মনে পুনর্জাগ্রত করিয়া মানবতার সংগ্রাম তেজময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি।

অন্যায়, অধর্ম, অত্যাচার ও অরাজকতার প্রতিকার করিবার জন্যই গুরু গোবিন্দ সিংহ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। এই অন্যায়, অধর্ম প্রভৃতি মানুষ প্রথমত নিজ চরিত্র ও কার্য্য-কলাপের ভিতর হইতে উচ্ছেদ করিবে এবং পরে সেই সংস্কারই ব্যক্তিগত হইতে জাতিগত ও পরে সর্ব্বমানবে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে, ইহাই গুরু গোবিন্দ সিংহের আদর্শ ছিল। এইজন্য সেই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রথমে শিখদিগকে নিজ চরিত্র-স্বভাব ও জীবনযাত্রা শুদ্ধ ও উন্নত করিয়া লইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিখের কেশ তাহাকে এক বিশেষত্ব দান করিয়া শিখ সম্প্রদায়কে বিশিষ্ট ও চরিত্রবান করিয়া তুলিল। কাজেই তাহাকে সেই দীর্ঘকেশ পরিষ্কার রাখিতে শিখাইল। হস্তের ইস্পাতের কঙ্কণ তাহার দৃঢ় চরিত্র ও সত্যের প্রতি কর্ত্তব্যের নিদর্শন হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আত্মদমনের প্রয়োজনীয়তা জানাইতে লাগিল। কচ্ছ তাহার চির-প্রস্তুত জীবনযাত্রার অবয়ব এবং কৃপাণ তাহার আত্মরক্ষা এবং ধর্ম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার অস্ত্র। খালসা গঠনের মূল মন্ত্র হইল ব্যক্তির আত্ম-সংস্কৃতি ও সংযম। গুরু গোবিন্দ সিংহ এই মন্ত্রে লক্ষ লক্ষ শিখকে দীক্ষা দিলেন ও তাহারা এক মহা বলীয়ান জাতিতে পরিণত হইল। শিখ ব্যতীত অপর সকল জাতিও ভারতের এই নব জাগরণের মহা নেতার পতাকার আশ্রয়ে সর্ব্ব অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল ও মোঘলদিগের অকল্যাণকর দমন ও শোষণ পদ্ধতি এই বিপুল জনশক্তির সুগঠিত অভিব্যক্তির সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আর সক্ষম রহিল না। দলবদ্ধ সুসংযত দৃঢ় চরিত্র ন্যায়ের ও সুনীতির উপাসক জনশক্তির সম্মুখে কোন অন্যায় ও অধর্মের পাপশক্তি কখনও দাঁড়াইতে পারে না। গুরু গোবিন্দ সিংহ তাহা উত্তমরূপে ভারতবাসীকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী আজ সেই শিক্ষা ভুলিতে বসিয়াছে। অন্যায় অধর্ম ও অত্যাচারের সহিত সহযোগিতা করিতে অনেক ভারতবাসী আজ লজ্জা অনুভব করে না।

বিদেশী শত্রুর সহিত হাত মিলাইয়া স্বদেশে বিদেশীর প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা করিতেও কেহ কেহ অপরাগ নহে। এই অবস্থায় ভারতবাসীর আজ গুরু গোবিন্দ সিংহকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করা প্রয়োজন ও তাঁহার মন্ত্রকে সকল দেশবাসীর প্রাণে প্রাণে জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা

আবশ্যক। নিজ দেশ, জাতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য ভুলিয়া যাহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার লোভে পড়িয়া যে কোন ঘৃণ্য, জঘন্য ও লজ্জাকর কার্য্য করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকে যথাশীঘ্র দমন করিয়া ন্যায়ের পথে চলিতে বাধ্য করা সকল দেশবাসীর কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে বিলম্ব না করিয়া আত্ম সত্বর জনশক্তি সুগঠিত ও সুসংযত করা প্রয়োজন। ইহা যে অসম্ভব নহে তাহা বিগত একশত বৎসরের মধ্যেও কয়েকবার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকবারেই দেখা গিয়াছে আত্ম-সংযম, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান ধর্ম্মবোধের সবল প্রেরণা। আজ আবার ভারতে দুর্নীতিপরায়ণতা দুর্দ্দম আগ্রহে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ ন্যায় অন্যায় বোধ হারাইয়া ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের লালসায় যে কোন অধর্ম্ম করিতে নির্লজ্জ ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিছু অর্থ ও কিছু প্রতিপত্তি লাভ হইবে আশায় মানুষ সকল পাপকার্য্যেই সকল পাপীদের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। এই প্রকার পরিস্থিতি ভারতে মোগল রাজত্ব অবসানের পরে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাই আজ আমরা নূতন চেতনা, নূতন নেতৃত্ব ও নূতন কর্মশক্তির আশায় পথ চাহিয়া রহিয়াছি। ধর্ম্ম, ন্যায়, সুবিচার, জনকল্যাণ ও মানবতার উচ্চতম আদর্শের পথ নির্দ্দেশিত। [illegible] লইয়া সেই পথে চলাই কঠিন। নূতন সত্য, নূতন ধর্ম্ম, নূতন ন্যায়, নূতন পুণ্য ইত্যাদি কথা বলিয়া নূতন আদর্শের যে সকল ব্যক্তি প্রচার চেষ্টা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পুরাতন আদর্শকে নূতনের ছদ্মবেশে উপস্থিত করিলে তাহা সত্য সত্যই নূতন হইয়া যায় না। অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অতি পুরাতন আদর্শ। সংঘের অধিকার ও ব্যক্তির অধিকারও পূর্ব্বকালে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিজাতীয় নামে অতি সাধারণ কথা বলিলে তাহা নূতন কথা হইয়া যায় না। পরমুখাপেক্ষিতা ব্যতীত তাহাতে আর কিছু ব্যক্ত হয় না। ইংরেজ রাজত্বকালে কোন কোন ভারতবাসী ইংরেজী বুলি ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি শিখিয়া নিজেদের ইংরেজ ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহাদিগের সেই দাস মনোভাব ও আজিকার বিভিন্ন নকল বিজাতীয় মনোভাব একই মানসিক বিকৃতির প্রকাশ। মানুষ নিজের আত্মজ্ঞানের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রেয়কে চিনিতে শেখে ও উন্নত হইতে পারে। এই কারণে মানবজাতির মহা মহা নেতাগণ সর্ব্বদাই মানুষকে নিজ বৈশিষ্ট্য গঠন করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। বিদেশীর দাসত্ব বা অনুকরণ করিয়া মানুষ বড় হইতে পারে না। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদিগকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া আজও শিখ সম্প্রদায় আত্ম-প্রতিষ্ঠার কার্য্যে সফলতা লাভ করিতেছে। অপর সকল ভারতবাসীর এই কথা আজ নূতনভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

সুভাষচন্দ্র বসু

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস এখন সর্ব্বভারতে অনুষ্ঠিত হইবে। সুভাষচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তরুণ বয়স হইতে তিনি জাতির স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য সকল সুখ [illegible] বরণ করিয়া লইয়া [illegible] ছিলেন। ছাত্রকাল হইতেই তিনি উচ্চ আদর্শের অনুসরণে নিজের জীবন গঠিত করিয়াছিলেন ও আজীবন সেই আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র [illegible] সংগ্রামে এক নূতন [illegible] তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। [illegible] আবার জাতিকে শিখাইয়াছিলেন [illegible] হইবার [illegible] কিছু নাই, হইতেও পারে না। [illegible] সংগ্রামকে [illegible] ও ক্রমশঃ [illegible] দ্বারে গিয়া [illegible] সময় [illegible] সুভাষচন্দ্র সেই সংগ্রামকে [illegible] যুদ্ধ করিতে [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] প্রথম ব্রিটিশকে দেখাইল যে ব্রিটিশের [illegible] ভারতীয় যোদ্ধাগণ আর ব্রিটিশের জন্য যুদ্ধ করিবে না এবং তাহারাই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। নেতাজী আরও দেখাইয়াছিলেন যে জাপানের সাহায্য লইলেও জাপানী সৈন্য বাহিনীকে ভারতে তিনি প্রবেশ করিতে দেন নাই। বিদেশীর অধিকার তিনি সহ্য করিতেন না।

আজ যাঁহারা দেশভক্তিকে শুধু নিরাপদ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করেন না; তাহা এক লাভের ব্যবসাতেও পরিণত

করিয়া নিজেদের সুবিধার ব্যবস্থা করেন; তাঁহাদিগের উচিত নেতাজীর আত্মবলিদানের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিতে শেখা। যাহারা দেশকে ক্রমশঃ বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন; তাঁহাদেরও প্রয়োজন নেতাজীর সর্ব্বজাতির মিলিত প্রচেষ্টার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিবার। জাতীয় ঐক্য ও মিলনই জাতীয় শক্তির আধার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি সৃষ্টি করিলে এই মহাজাতি অতি শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। নেতাজীর নিকট আমরা শিখিয়াছি ত্যাগ ও আত্মবলিদান, কঠোর সংগ্রাম করিয়া আদর্শরক্ষার মন্ত্র ও সত্য জাতীয়তার সম্মিলিত অভিব্যক্তি। তাঁহাকে স্মরণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে অন্যায় উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি চেষ্টা, কাপুরুষের ব্যবসাদারী ও বিদেশীর নিকট আত্মবিক্রয় জাতীয় গৌরবের পন্থা নহে।

শোষণ

অপরকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহার পরিশ্রমজাত দ্রব্য-মূল্যের উপযুক্ত অর্থাৎ ন্যায়ত গ্রাহ্য অংশ তাহাকে না দিয়া নিজের লাভ বলিয়া গ্রহণ করাকে অর্থনৈতিক শোষণ বলা হয়। এই প্রকার শোষণ ব্যক্তি করিলে তাহা মহা অন্যায় ও সমাজ করিলে তাহা ন্যায় বলিয়া অনেকের ধারণা। কারণ সমাজ বা সমষ্টিগত কার্য্য মাত্রই ন্যায় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ন্যায়শাস্ত্র অন্তর্গত নহে। কারণ মানব সভ্যতার বহু যুগে মানুষ সমষ্টিগতভাবে বহু কার্য্য করিয়াছে, যাহা ধর্ম্ম বা ন্যায় অনুগত নহে। যথা খ্রীষ্টান-দিগকে প্রথমত সমবেত জনসমষ্টি সিংহ দিয়া খাওয়াইত ও পরে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ মিলিত "কনক্লেভ" বসাইয়া ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে পুড়াইয়া মারিবার আয়োজন করিতেন। সমষ্টিগতভাবে উভয় কার্য্যেই জনগণের সহানুভূতি থাকিত। কিন্তু সিংহ দিয়া মানুষ খাওয়ান অথবা মানুষকে পুড়াইয়া মারাতে জনগণের মত থাকিলেও তাহা ন্যায় কার্য্য বলিয়া কেহ মানিবে না। ইংরেজের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইংরেজ জনগণ বৃদ্ধাদিগকে ডাইনী বলিয়া জলে ডুবাইয়া মারিত এবং অল্প কিছু চুরি করিলে মানুষকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিত। মুসলমানদিগের মধ্যে দোষীকে মিলিতভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারার রীতি ছিল। আমেরিকান জনশক্তি কু ক্লুক্স ক্লান গঠন করিয়া বা অপরভাবে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগকে "লীঞ্চ" বা জনতা কর্ত্তৃক হত্যা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। কৃষ্ণকায়গণও সুবিধা পাইলে মিলিত ভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগকে রন্ধন করিয়া ভোজন করিত। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য দিয়া ইহাই প্রমাণ হয় যে, সমষ্টিগতভাবে কোন কার্য্য করিলেই তাহা ন্যায় এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ন্যায় অন্যায় নীতির কথা। জনমত তাহাকে ইচ্ছামত এদিক-ওদিক ঘুরাইতে পারিলেও তাহার ভিতরের সত্য অপরিবর্ত্তিত থাকে। শোষণ কার্য্য সম্বন্ধেও ঐ একই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। সমাজ বা সমষ্টিবাদ কাহাকেও অধিক খাটাইয়া অল্প দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত করিলে তাহা শোষণই থাকিয়া যায়। কেহ উচ্চাসনে বসিয়া কাজীর বিচার করিতে থাকিলে তাহার পিছনে জনতার সমর্থন থাকিলেও অন্যায় বিচার অন্যায়ই থাকে, ন্যায় হইয়া যায় না।

ধরা যাউক যে পুরাতন যুগে মানব সভ্যতার প্রসার হয় নাই এবং সভ্যতার অভাবে মানুষ যে সকল অন্যায় সমষ্টি বা ব্যক্তিগতভাবে করিয়াছে এখন আর সেরূপ না করিবার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু পূর্ব্বে যখন পৃথিবীতে সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, এপিকটেটাস, সেনেকা, ক্যালভিন, লুথার নিজেদের জ্ঞান ও শিক্ষা মানব সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার পরেও যদি মানুষ অমানুষ হইতে থাকিত তাহা হইলে পরে আরও উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ আদর্শে প্রণোদিত হইয়া মানুষ যদি অন্যায়ে মগ্ন থাকিয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও অন্যান্য উচ্চ আদর্শ দেখা যায় ভারতবাসীকে ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই। খ্রীষ্টীয় আদর্শ ইয়োরোপে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই। কনফুসিও, টাও বা বৌদ্ধ আদর্শ আজ চীনে মরণোন্মুখ। ভারতে, চীনে বা অপর দেশে মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বহু কষ্ট, অপমান ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। ইহার কারণ অর্থনৈতিক শোষণ, সমষ্টিগতভাবে ব্যক্তিকে যুদ্ধ করিতে বা অপরভাবে বিনা বা অল্প বেতনে সমাজসেবা করিতে বাধ্য করা এবং অপরের ইচ্ছা অনুসারে বহু ত্যাগ, মতবাদ মানিয়া লওয়া ও নিজ মত বা ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নির্য্যাতন

ব্যবস্থা। সুতরাং সমষ্টির বা সমাজের নামে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির প্রভুত্ব মানিয়া তাহাদিগের ইচ্ছামত চলার যে কষ্ট, অপমান বা ক্ষতি তাহা একচ্ছত্র সম্রাট বা অপর কোন প্রকার প্রভুত্ব হইতে উৎপন্ন অত্যাচার হইতে বস্তুত বিভিন্ন, এ কথা ভাবিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বাধ্যতামূলক যুদ্ধ বা পরিশ্রম বাধ্যতামূলক বলিয়াই অন্যায়। কার্য্য করিয়া উপযুক্ত উপার্জ্জন না হইলে তাহা শোষণ। সে শোষণ কে করিতেছে তাহা দিয়া তাহার নৈতিক মূল্য বিচার কিছুটা করা যাইলেও সম্পূর্ণ করা যায় না। অর্থাৎ শোষণের ফলে ব্যবসার অংশীদারগণ যদি লাভবান হয় তাহা হইতে সমাজ লাভবান হইলে খুবই উত্তম। কিন্তু সমাজ অর্থে যদি কোন রাষ্ট্রীয় দল, অথবা গোষ্ঠী বা সমাজ দমনকারক জনবাহিনী হয়, তাহা হইলে বিষয়টা একটা সুবিধার হয় না। চতুর্দশ লুই ফরাসী দেশে বলিয়াছিলেন "আমিই রাষ্ট্র"! ষ্টালিন বা মাওৎসেতুঙ্গ যদি কাব্যত সেই কথাই বলিয়া থাকেন তাহা হইলে কথাটা যে ভাবেই বলা হউক তাহার মূল প্রকোপ বা অর্থ একই থাকে। মানুষের অধিকার তাহাতে একইভাবে আহত বা পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়। জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হইয়া দাঁড়ায়। সমষ্টির উৎপীড়ন সম্রাট বা অন্য প্রকার মালিকের উৎপীড়ন হইতে বিশেষ বিভিন্ন কিছু হয় না।

বর্ত্তমানে চীন দেশে যাহা হইতেছে তাহার মূল কারণ হইল মাওৎসেতুঙ্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধতা ও তাহার দমনের জন্য মাওএর দলের লোকেদের মতবাদ আওড়াইয়া সত্যকে কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া লইয়া তাহার আড়ালে মাও-বিরোধী সকল ব্যক্তিকে যে কোন উপায়ে জাতীয় নেতৃত্ব হইতে অপসৃত করা। এই ভিতরের কলহের আসল কারণ রুশীয় আদর্শে ব্যক্তির পূর্ণ দাসত্বের ব্যবস্থা না থাকা ও মাওএর আদর্শে তাহা থাকা। রুশে মানুষ কিছুটা নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, যদি না সে সমাজ-বিরুদ্ধতা করে। চীনের ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র স্বাধীন বিকাশের অধিকারী নহে। কারণ চীনের দারিদ্র্য ও ব্যক্তির পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্যের মাত্র শতকরা দশ ভাগ তাহাকে দিয়া বাকি নব্বই ভাগ সমাজের গ্রাসে ফেলিয়া দেওয়া—অর্থাৎ মাওএর দলের ব্যবহারে লাগান। এই অবস্থায় চীনের মানুষ ক্রমশঃ রিক্ত-সর্ব্বস্ব হইয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়া মাও-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। মাও তাহাদিগকে "মত পরিবর্ত্তন" অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে উদ্যত। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি মাওএর দলে অধিক না থাকায় মাও অল্পবয়স্ক নির্ব্বোধদিগকে দলবদ্ধ করিয়া লইয়া লাল পল্টন বানাইয়াছেন। তাহারা লঘুগুরু বিভেদ ভুলিয়া সকল উচ্চপদস্থ কম্যুনিষ্টগণকেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ বয়স্ক লোকেরাই মাওএর সর্ব্বব্যাপী শোষণ পদ্ধতির বিরুদ্ধবাদ চালাইতেছেন। অল্পবয়স্কদিগের দৌরাত্ম্য অল্প হইলেই চালান যায় ও চলিতেছে। কিন্তু চীনের সভ্যতা ও কৃষ্টি এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। এখন যে অবস্থা তাহাতে চীনের রাষ্ট্রশক্তি হয়ত মাওএর হস্তেই থাকিয়া যাইতে পারে অল্পকালের জন্য; কিন্তু পরে যখন তরুণ পল্টন সজাগ হইয়া উঠিবে তখন মাও আর শিশুবাহিনী গঠন করিয়া নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইবেন না।

রাষ্ট্র নেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্বের অধিকার পাইবার জন্য রাষ্ট্রীয় দলের লোকেরা বিভিন্ন দলের লোকেদের সহিতই শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না, নিজেদের মধ্যেও লড়াই ঝগড়া চালাইয়া চলেন। লাল বাহাদুরের মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের নেতৃত্বের লড়াই এখনও সকলেই মনে রাখিয়াছেন। সে লড়াই ভিতরে ভিতরে এখনও চলিতেছে। অন্যান্য দলের মধ্যেও নেতৃত্বের লড়াই সব সময়েই চলিয়া থাকে। রুশ ও চীন দেশেও ঐ জাতীয় পরস্পর-বিরোধিতা প্রচলিত আছে ও তাহার ফলে বর্ত্তমানে চীন দেশে বহু লোক হতাহত হইতেছে। যদিও নেতৃত্বের প্রলোভনই যথেষ্ট; অশোভন ও অন্যায় ভাবে পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য; তবুও অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, নেতৃত্বের আকর্ষণের সহিত কোন কোন স্থলে আর্থিক লাভের আশাও জড়িত থাকে। নির্ব্বাচন কালে যে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করা হইয়া থাকে তাহার ফলে জয়লাভ ঘটিলে, বিজয়ী ব্যক্তি ও তাঁহার অনুচরদিগের আর্থিক লাভও যথেষ্ট হয় ও সেই লাভের আশায় সকলেই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিজয় লাভ চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে সকল দেশে সাধারণতন্ত্র ও নির্ব্বাচন প্রথা বহু কালাবধি সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সকল দেশে অবশ্য এতটা টাকার খেলা দেখা যায় না। যথা, গ্রেট ব্রিটেন। কিন্তু নূতন করিয়া যাঁহারা নির্ব্বাচনের খেলা খেলিয়া দেশের শাসন-ক্ষেত্রে প্রভুত্ব লাভ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা দেশসেবা ও অর্থোপার্জ্জনের একটা সমন্বয় সৃষ্টি করিতে পারিলে খুসীই হন বহু ক্ষেত্রে। এই কারণে নেতৃত্বের ব্যাপারে কিছুটা ব্যবসা-ঘটিত কথাও উঠিয়া পড়ে। অন্যান্য

দেশেও সম্ভবত এইরূপ হয় এবং আমাদিগের দেশের আদর্শবাদীদিগের মধ্যেও কোথাও কোথাও ইহা চলিতেছে দেখা যায়। চীনের "লাল প্রহরী"গণ কিভাবে নিজেদের লড়াই-এর খরচ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতেছেন আমরা জানি না; কিন্তু মনে হয় যে ঐ বিপ্লব শতকরা একশত হারে ত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের ব্যাপার নহে। আমাদিগের দেশের কোন কোন ব্যক্তি আত্মবিসর্জ্জন করিতে গিয়া নিজের ও পরিবারের লোকেদের বহু লাভের ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন। এই কারণে নির্ব্বাচনের কার্য্যে অধিক অর্থব্যয় বেআইনী; কিন্তু সে আইন কেহ মানে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যক্তি ও সমষ্টি মহত্ব

যাঁহারা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মূল্য অস্বীকার করেন ও সমাজবাদ লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া মানব সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করেন, তাঁহারাই আবার মতবাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মহত্ব প্রচার করিয়া মহা আলোড়নের সূচনা করেন। মার্কস, এঞ্জেলস্, প্লেখানভ, লেনিন, ট্রট্স্কি, স্টালিন, মাওৎ-সেটুঙ প্রভৃতি ব্যক্তিগণই সমাজবাদী দলের জীবন সমুদ্রের নোঙর ও ঐ সকল ব্যক্তির কথা, মত বা আদর্শ লইয়াই সমাজ-যন্ত্রের "নাটবোল্ট" জাতীয় অতি সাধারণ জনগণ প্রগতি বা অবনতি ব্যক্ত করিয়া কাল কাটাইয়া থাকেন। অর্থাৎ সমাজ-যন্ত্র স্বয়ংচালিত নহে; এমন কি অবশিষ্ট জনসাধারণ সেই মহাযন্ত্রকে চালাইয়া রাখিতে অক্ষম এবং সেই যন্ত্র যথাযথ ভাবে চালিত রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রয়োজন হয়। মার্কস্ যাহা মনে মনে ভাবিলেন আর কোন মহাজন তাহা বাস্তবে পরিণত করিলেন। কিন্তু সেই সমষ্টিগত জনশক্তি তৎপরে বিকল অবস্থা লাভ করিলে আবার তাহাকে প্রাণ ও গতি দান করিতে ট্রট্স্কি বা স্টালিনের প্রয়োজন হইল। এক কথায় ব্যক্তির মহত্ব বাস্তবে উপস্থিত না থাকিলে বহু সংখ্যক নির্গুণ মানব একত্র অবস্থিত থাকিলেও সে মহাসমাজযন্ত্র শীঘ্রই অচল হইয়া পড়ে। অল্পকাল স্থায়ী কম্যুনিষ্ট জগতে এই কথা ক্রমাগতই প্রমাণ হইয়া আসিয়াছে ও এখনও প্রমাণ হইতেছে। মানব সমাজে নেতৃত্ব ব্যতীত কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানই সুচালিত থাকিতে পারে না। বৃহত্তর গোষ্ঠী যে রাষ্ট্র তাহা আরও শীঘ্র জড়ভাব প্রাপ্ত হয় যদি না উপযুক্ত চালক পায়। যে সময় রাজা বা সম্রাট অথবা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের পুরোহিতগণ জনগণকে চালাইয়া লইয়া চলিতেন সেই সময়েও ব্যক্তির মহত্ব জাগ্রত ভাবে মানব সমাজে স্বীকৃত হইত। পরে, সাধারণতন্ত্র বা একাধিকার তন্ত্রেও সেই ব্যক্তির নেতৃত্বই প্রাণশক্তি মত রাষ্ট্রকে প্রগতির পথে গতিশীল করিয়া রাখিত। আজ যদিও কথায় ব্যক্তিত্বকে উড়াইয়া দেওয়া হয় এবং মানবসমাজে ব্যক্তির স্থান যন্ত্রের "নাট-বোল্টের" সমতুল্য বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা হইলেও কার্য্যতঃ দেখা যায় ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রেরণার উপরেই সমাজযন্ত্রের গতি পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না যদি না ব্যক্তি স্বাধীনতা বিকশিত হইতে পারে। সুতরাং সমাজবাদের প্রাণবস্তু ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিয়া সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র চলিতে পারে না। সমষ্টিবাদীদিগের ব্যক্তিত্ব বিরুদ্ধতা তাহা হইলে স্বয়ং-খণ্ডিত হইয়া দেখা দেয়।

ব্যক্তির বিশেষত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতার উপরেই তাহা হইলে সমাজের বা সমষ্টির উন্নতি ও প্রগতি নির্ভর করিতেছে। সেই বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতাও গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না যদি ব্যক্তিকে দমন করিয়া সমাজযন্ত্রের অঙ্গমাত্র করিয়া ব্যক্তির বর্জ্জিত জীবনযাত্রায় নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তির ক্ষমতার উপরেই মানব প্রগতি নির্ভর করে ও করিবে এবং সেই গুণ মানব চরিত্রে পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিতে বাধা সৃজন করিতে দেওয়া উচিত পথা নহে। সমাজবাদ প্রকট ও প্রবল হইয়া উঠিলে ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ ব্যক্তিত্বনাশ ও দমন ইতিহাসে বহুবার হইয়াছে ও তাহার ফলে সমষ্টির প্রগতি ও উন্নতি আড়ষ্ট ও স্থগিত হইয়া ক্রমে অবনতির পথে গিয়াছে। অতি সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট জাতিগুলি ব্যক্তিত্ব দমন করিয়া নেতৃত্ব লাভ করিতে গিয়া শুধু বিক্ষোভ, সংঘাত ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্র পাইয়াছেন। উৎকৃষ্ট গুণ আর দিকে দিকে নূতন নূতন ব্যক্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে না ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গুণের আধার ব্যক্তিগণ নেতৃত্ব লাভ করিবার চেষ্টায় সংঘাতের সূচনা করিতেছেন। কম্যুনিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যেও ঐ একই প্রকার অক্ষমের অগ্রগমন চেষ্টা দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া ভারতের মত যে সকল দেশে সমাজবাদের মিথ্যা অভিনয় চলিতেছে, সেই দেশগুলিতে ঐ প্রকার দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ যে সকল ব্যক্তি বর্ত্তমানে দেশনেতা হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এরূপ পরিস্থিতিতে বাড়িয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহাদিগের নিজ অন্তরের অব্যক্ত গুণাবলী পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে মনে বিক্ষোভ ও বিফল প্রয়াসের নৈরাশ্য জাগ্রত হইয়া তাঁহাদিগকে নেতৃত্বের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল ব্যক্তি এখন নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ফলে সকল রাষ্ট্রীয় দলই এখন দেশ সেবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশবাসীর প্রয়োজন খুঁজিয়া খুঁজিয়া উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করা।

টয়েনবীর চোখে ইতিহাস

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস ঘাঁটলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জাতির নিশ্চল জীবনের মরা গাঙে হঠাৎ এসে গেল প্রাণবন্যা, কূলে কূলে জাগল কল্লোলধ্বনি—এমন ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক না হলেও কখনো কখনো ঘটছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এই রকমের অভ্যুদয়ের চমকপ্রদ কাহিনী-গুলি বিশ্লেষণ ক'রে ঐতিহাসিক Arnold J. Toynbee দেখিয়েছেন, সমাজের অগ্রগতির প্রেরণা এসেছে সৃজনধর্ম্মী এক একজন মহামানবের ব্যক্তিত্ব থেকে। টয়েনবী বলছেন, এই সৃজনধর্ম্মী প্রতিভার সম্পদে যারা ঐশ্বর্য্যশালী তারা সংখ্যায় চিরকালই অল্প। টয়েনবীর ভাষায়, The creative personalities are always a small minority. সমাজের জনসাধারণকে টয়েনবী বলেছেন, uncreative rank and file। সমাজের এই সাড়ে পনেরো আনা মানুষের মনে সৃষ্টির আগুন নেই সত্যি। কিন্তু আত্মার আলোর শিখা জ্বলছে না যার মধ্যে, এমন মানুষ পৃথিবীতে কি আছে? আর বেলজিয়ান্ মনীষী মেটার্লিঙ্ক তাঁর The Inner Beauty প্রবন্ধের গোড়াতে ঠিকই বলেছেন: 'মানুষের আত্মায় সুন্দরের জন্য যে গভীর পিপাসা রয়েছে, এত গভীর তৃষ্ণা আর কোথাও নেই। সৌন্দর্য্য মানুষের আত্মাকে যত সহজে বরণ করে নেয়, এমন আর কিছুকেই নয়।" তাই ত ইংরেজ কবি Edward Carpenter বেলজিয়ান মনীষীর সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন: "Is there one in all the world who does not desire to be divinely beautiful?"

তাই ইতিহাসের creative personality যাঁরা তাঁদের আহ্বানে uncreative rank and file যুগে যুগে সাড়া দিয়েছে। যে-স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ ঘুমিয়ে ছিল তাদের মর্ম্মের গভীরে সৃজনধর্ম্মী নেতৃত্বের পরশমণির ছোঁয়ায় সেই অনুরাগ জেগে উঠেছে; জাগ্রত জনসাধারণ জাতির ললাট থেকে পরাধীনতার কালিমা নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রবলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুরু করেছে বৈপ্লবিক অভিযান। যাদের দিগ্বলয় ছিল গৃহের প্রাচীর, চেতনায় ছিল শুধু স্ত্রীপুত্র আর ঘর-গৃহস্থালি—একজন লেনিনের অথবা গান্ধীর ডাকে তাদের রক্ত উঠেছে দুলে; আত্মকেন্দ্রিকতার কারাগার থেকে তারা ছুটে এসেছে মুক্ত পথের বুকে; তাদের অহংবোধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে দেশাত্ম-বোধের একটা বিপুল অনুভূতির মধ্যে; যুগযুগান্তের ইতি-হাসের কল্লোলধ্বনি তারা শুনেছে প্রসারিত চৈতন্যের অনু-পরমাণুতে; এক কথায় তাদের সমস্ত সত্তায় এসেছে আকস্মিক রূপান্তর। তাইত জার্ম্মাণ পণ্ডিত Oswald Spengler তাঁর The Decline of the West-এ মন্তব্য করেছেন:

When a nation rises up ardent to fight for its freedom and honour, it is always a minority that really fires the multitude. হাঁ, এই creative minority, এই অসাধারণ অতি-মানবেরা ইতিহাসের রণরঙ্গভূমিতে আসেন বেণুকরের ভূমিকা নিয়ে। তাঁরা বাঁশি বাজান। সেই সুরের আশ্চর্য্য যাদুতে uncreative জনসাধারণের অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে জাগে সত্তার আনন্দময় সম্প্রসারণের ব্যাকুলতা। বাঁশি বাজে আর তালে তালে পা ফেলে ফেলে যারা পঙ্গু হয়েছিল ঘরে ঘরে তারা নাচতে সুরু করে দেয়। জনসাধারণের এই নৃত্য-লীলার অপরূপ কাহিনীতে মানুষের ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে। বাঁশি বাজানোর পালা বন্ধ হয়ে গেলে জন-সাধারণের নাচও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ জনসাধারণ ত চিরদিন মহামানবদের অনুকরণই করে। তাঁদেরই চারিত্রিক দৃঢ়তার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা নবজীবনের অধিকারী হয়। তাঁদের জীবনের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছে শঙ্খচূড়ের বিষে। সেই বিষের পাত্র অম্লান বদনে তাঁরা শূন্য করে ফেলেছেন আর কণ্ঠ তাঁদের বেদনায় নীল হয়ে গেছে। ইতিহাসের সেই 'নীলকণ্ঠেরাই' তো যুগে যুগে জনসাধারণকে জুগিয়েছে দিব্য জীবন যাপনের

প্রেরণা। দুঃখ আঘাতের অগ্নিকুণ্ডে ব'সে চিরপ্রাণের জয়ধ্বনি করেছেন তাঁরা। বিষের জ্বলুনিতে ভিতরটা পুড়েছে কিন্তু প্রসন্ন মুখচ্ছবিতে সেই দুঃসহ যাতনার অণুমাত্র আভাসও দেখা যায় নি। এ লোকোত্তর পুরুষসিংহদের জীবনের আলো থেকেই কি জনসাধারণ নিজেদের জীবন-প্রদীপ জ্বালিয়ে নেয় না? তাঁদের উৎসাহদীপ্ত মাভৈঃ বাণী থেকে কি পথে চলার পাথেয় সংগ্রহ করে না? তাঁদেরই দুর্জ্জয় সংকল্প জনসাধারণের ইচ্ছায় সঞ্চারিত হয়ে তাদের সংকল্পকে জোরালো করে তোলে না?

হাঁ, দেবতার দীপহস্তে কোন বিরাট মানব এসে দিগন্তে যখন দাঁড়ায়, তাঁর কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয় নবযুগের আহ্বান, জনসাধারণ ঘরের কাজকর্ম ভুলে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অকুণ্ঠ আনন্দে, তাঁর ভাষায় কথা বলতে শেখে, তাঁর উচ্চারণের ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত নকল করতে ভোলে না, তাঁর আদর্শে বাঁচে, তাঁর আদর্শে মরতেও শেখে। Creative minority র এই নেতৃত্বের অভাব যেখানে একটা গতিশীল প্রাণচঞ্চল সমাজের অভ্যুদয় আমরা আশা করতে পারিনে। মার্কিন চিন্তাবীর উইলিয়াম জেমসের ভাষায় But the best wood-pile will not blaze till a torch is applied. কাঠের স্তূপ হাজার শুকনো হোক কিছুতেই জ্বলে উঠবে না, যতক্ষণ তাতে মশালের শিখার স্পর্শ না লাগে! সেরা সেরা মানুষ হচ্ছে প্রজ্বলিত মশালের শিখা। জনসাধারণ যেন কাঠের স্তূপ।

কিন্তু পরিবর্ত্তনের স্রোতে একদিন পুরাতন কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—তা সে পুরাতন যতই ভালো হোক। সমাজের সেরা সেরা মানুষগুলি হারিয়ে ফেলে নবসৃষ্টির প্রতিভা। বেণুকর তখন ভুলে গিয়েছে তাঁর বাঁশি বাজানোর কলা-কৌশল। Uncreative massesও সেই তালে তালে পা ফেলে চলার ছন্দময় গতিবেগ হারিয়ে ফেলবে—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? টয়েনবী এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: Where there is no creation there is no mimesis. যেখানে কোন সৃষ্টি নেই, সেখানে অনুকরণেরও প্রশ্ন নেই।

জাতির অধোগতির এই মলিন সন্ধ্যায় আমরা দেখতে পাই, বেণুকরের গৌরবময় ভূমিকা নিয়েছে ড্রিল-মাষ্টার। বাঁশির সুরে সুরে জনসাধারণকে নাচাতেন যাঁরা, তাঁরা বাঁশি ফেলে চাবুক ধরেছেন, slave-driver হয়ে জনসাধারণকে হুকুমের বশে রাখবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু চাবুকের জোরে কি মানুষের পা তালে তালে পড়তে পারে? স্বর্গীয় সুরের ছোঁয়ায় যারা আনন্দে নাচত চাবুকের কঠিন আঘাতে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

হায় রে! চরিত্র-গৌরব, বুদ্ধির স্বচ্ছতা, সৃষ্টির প্রতিভা দিয়ে যাঁরা সমাজকে পরিচালিত করতেন তাঁদের চরিত্রহীন, হৃদয়হীন, দুর্ব্বলচেতা বংশধরেরা প্রজ্ঞার সেই জ্যোতি হারিয়ে কেন নেতৃত্বের সম্মানে এত লোভ করে? গোখরো সাপ বিষ হারিয়ে যখন ঢোঁড়া হয়ে যায় তখনও কিন্তু কুলোপানা চক্রোরটার আড়ম্বর দেখাতে ছাড়ে না। এই ক্ষমতাপ্রিয়তার প্রতিক্রিয়া সমাজ-জীবনে একদিন সাংঘাতিক হয়ে দেখা দেয়। টয়েনবী মানুষের ইতিহাস সেই আদিপর্ব্ব থেকে ঘেঁটেছেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায়:

We have seen, in fact, that when, in the history of any society, a creative minority degenerates into a dominant minority which attempts to retain by force a position that it has ceased to merit, the change in the character of the ruling element provokes, on the other side, the secession of a proletariat which no longer admires and imitates its rulers and revolts against its servitude.

এর সংক্ষিপ্তসার এই দাঁড়ায় যে, কোন সমাজের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় সেরা সেরা মানুষগুলি যখন সৃজনধর্মী প্রতিভা হারিয়ে নীচুতে নেমে যায় এবং ভয় দেখিয়ে শাসন করতে চায়, বুদ্ধির এবং চরিত্রের আভিজাত্য দিয়ে নয় তখন শাসক-গোষ্ঠির এই চারিত্রিক পরিবর্ত্তন তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে জনসাধারণের সহানুভূতি আর সম্মান থেকে। তৈরী হয় একদল সর্ব্বহারা যারা অভিজাত সম্প্রদায়কে না করে শ্রদ্ধা, না করে তাদের অনুকরণ। দাসত্বের বিরুদ্ধে তখন সুরু হয় তাদের অভ্যুত্থান।

এই অভ্যুত্থানের ফলে সমাজের অঙ্গে যে ফাটল দেখা দেয় তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। বিপ্লবের ঝড়ের নিদারুণ আঘাতে সমাজের সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এই বিনষ্টির ফলে সভ্যতার ইমারত ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। টয়েনবী মন্তব্য করেছেন:

On this showing, the nature of the break-downs of civilisations can be summed up in three points: a failure of creative power in the minority, an answering withdrawal of minesis on the part of the majority, and a consequent loss of social unity in the society as a whole.

"এর উপরে ভিত্তি করে বলা যেতে পারে, নানা সভ্যতার পতনের কারণ ত্রিবিধ: যারা সংখ্যায় অল্প তাদের মধ্যে সৃজনধর্মী শক্তির অভাব, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের দিক থেকে অনুকরণস্পৃহার দৈন্য এবং ফলে সামগ্রিক ভাবে সামাজিক সংহতির বিনষ্টি।"

এখানে একটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইতিহাসে Creative indiviual দের আবির্ভাব একটা নির্জীব নিশ্চল সমাজকে প্রাণচঞ্চল করবার জন্য প্রয়োজনীয় তো বটেই। কালক্রমে অন্তরে সৃষ্টির আগুন নিবে গেলে সেই প্রতিভাবান মানুষগুলি সিংহ থেকে সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের স্তরে নেমে যায়। যারা ছিল creative তারা হয় dominant। কানুর বাঁশির সুরে যে রাধা নাচত আয়ানের বাঁশের ঘায়ে সে মরিয়া হ'লে বিদ্রোহিনীর ভূমিকা নেয়। আর ইতিহাস বলে, চাবুকের ঘায়ে জনতাকে নাচানোর চেষ্টা কখনও সফল হয় নি। সর্ব্বহারারা dominant minoirtyকে কুর্ণিশ দিতে অস্বীকার করেছে। টয়েনবী বলছেন, চাবুক দেখিয়ে জনসাধারণকে যারা বশে রাখতে চেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারাদের অভ্যুত্থানের ব্যাপারেও creative minority-র নেতৃত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। একটা নিদ্রিত সমাজ যখন জড়তা থেকে জাগে নবজীবনের প্রভাতে তখন সেই মহাজাগরণের মূলে Creative minority। সেই সমাজের সংহতি যখন সর্ব্ব-হারাদের বিপ্লবের ঝড়ে ভেঙ্গে যায়—তখনও দেখতে পাচ্ছি, রুদ্রের ধ্বংসলীলায় পুরোহিতের ভূমিকায় আবার সেই creative minority। গান্ধী, লেনিন, মার্কস, ক্রোপটকিন, আচার্য্য বিনোবা আর বার্ট্রাণ্ড রাসেল—এঁরা সবাই রুদ্রের দূত; dominant minorityর নির্লজ্জ লোভের প্রতিবাদে এঁদের রসনায় সত্যবাক্য খর খড়্গের মতই ঝ'লে উঠেছে; স্বাধীনতার, ন্যায়ের এবং প্রেমের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়বার বাণী দিয়েছেন যুগের কর্ণে। এবং প্রলয়ঙ্করের এই পতাকাবাহীরা সংখ্যায় চিরদিনই মুষ্টিমেয়। অবশ্যই মার্কস্ এবং তাঁর শিষ্য লেনিন অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু যে dominant minority সৃজনধর্মী প্রতিভার যাদুতে নয় পরন্তু বাহুবলের দ্বারা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছে তাদের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মার্কস ও লেনিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। সর্ব্বহারারা ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন আনন্দময় জীবন যাপন করছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত—এই বিরাট স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কস-লেনিন বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এতে কি কোন সংশয় আছে? ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ East and West বইতে মন্তব্য করেছেন:

Marx in one of his human moments looked forward to a future socialist Society where the fragmentary man would be replaced a completely developed individual, one for whom different social-functions are but alternative forms of activity. Men could fish, hunt, or engage in literary criticism without becoming professional fishermen, hunter or critic.

এর সারমর্ম হ'ল: মার্কস স্বপ্ন দেখতেন আগামীকালের সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের যেখানে টুকরো মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তিতে। সেই সমাজে একই মানুষের কর্ম্মধারা বিচিত্ররূপে প্রবাহিত হতে পারবে। যে-মানুষ মাছ ধরে অবসর সময়ে সে সাহিত্যের সমালোচনাও করবে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের রাজা dominant minorityর প্রতীক। সোনার নেশায় মাতোয়ারা রাজা যক্ষপুরীতে সোনা তুলবার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাউকে আস্ত রাখে নি। সেখানে কেউ মানুষ নয়, প্রত্যেকেই কেবল সংখ্যা, 'নিরবকাশ-গর্ত্তের পতঙ্গ'। তাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ। একেবারে ঠাসা দাসত্ব। সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভাষায়:

This repetitive work has brought to millions of workers boredom, fatigue and monotony.

কাজের মধ্যে সৃষ্টির গর্ব্ব আর আনন্দ না থাকলে, অন্যের হুকুম মত একই কাজের পুনরাবৃত্তির ফলে দুঃসহ ক্লান্তিতে অবে

ওঠে শ্রমিকদের জীবন। শক খেয়ে অস্তিত্বের সেই ক্লান্তি থেকে তারা মুক্তি খোঁজে পেয়ালা-ভরা তরল আগুনে। 'আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে' যারা তলিয়ে গেছে, যক্ষপুরীর নির্ম্মম শোষণ যাদের 'আখের মত চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে'—তাদের অবসন্ন স্নায়ুকে উত্তেজিত করবার জন্য মদের ভাণ্ডার খোলা আছে।

It is reverence towards others that is lacking in capitalism.

সর্ব্বহারাদের জীবনের প্রতি একটা অমার্জ্জনীয় অবজ্ঞা হচ্ছে ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই অবজ্ঞা আসে যারা ধনকুবের তাদের সোনার নেশা থেকে। সোনার তালগুলোও এক রকমের মদ। সেই নিরেট মদে মাতাল হয়ে আছে যারা, তারা ত রাস্কিনের ভাষায় fiend's servants, শয়তানের বান্দা। আর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছেই এবং থাকবেও এই শয়তানের হৃদয়হীন অনুচরেরা who have it principally for the object of their lives to make money। এরা থাকবার জন্য মানুষ মারতে কুণ্ঠা বোধ করে না এবং 'মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে'। এদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ত নেই ই; আর যাদের এরা শোষণ করে তাদেরও ব্যক্তিত্বের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আবার রাসেলের ভাষায় ধনতন্ত্র crushes the indivirduality. যক্ষপুরীতে মানুষ নেই—সব নম্বর। গাঁয়ে মানুষ ছিল যারা যক্ষপুরীতে তারা হয়েছে 'দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়াখেলা চলছে।' এই টুকরো আধখানা মানুষ-গুলো যত নীচেই নেমে যাক, ধূলায় তাদের যত অবহেলাই হোক তাদের আত্মার সুন্দরের পিপাসী কখনও মরে না। ইতিহাসের লেনিন আর গান্ধীরা এসে যখন সর্ব্বহারাদের ডাক দিয়ে বলেন, ওঠো, জাগো, আনন্দময় গৌরবের জীবনের মধ্যে সুন্দর হও, মুক্ত হও, পূর্ণ হও সেই ডাকে যুগে যুগে সাড়া দিয়েছে দলিত-মথিত জনসাধারণের মর্ম্মের গভীরে প্রশস্ত দেবদূতেরা। অবতারের বদল হয়েছে। কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে উঠেছে, বর্ম্মের বদলে বেরিয়ে পড়েছে দন্ত ধৈর্য্যের বদলে গোঁ। যক্ষপুরীর সর্ব্বনেশে দেশে এসেছে প্রলয়ের ঝড়।

ইতিহাসের কণ্ঠ থেকে কি যুগে যুগে উৎসারিত হ'ল না তিনটি সত্য? প্রথম, অতি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সমাজের সম্পদরাশি পুঞ্জীভূত হয় যখন, সে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় সত্য, বেশীর ভাগ মানুষ ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত থাকলে তাদের যা প্রয়োজন তা জোর করে ছিনিয়ে তারা নেবেই নেবে। তৃতীয় সত্য, নিরন্নেরা বন্দুকের পরোয়া করে না। সর্ব্বহারাদের সংহতি নষ্ট করতে পুঁজিপাতিরা যতই বদ্ধ-পরিকর হয় তারা ততই জোরের সঙ্গে দানা বাঁধে।

সুরু হয় প্রলয়ঙ্করের তাণ্ডব নৃত্য। কুরুক্ষেত্র মুখরিত হয়ে ওঠে গাণ্ডীবের টঙ্কারে। শ্রেণী-সংগ্রামের সে কী ভয়াল রূপ! ডমরুর তালে তালে নটরাজের প্রলয় নাচের সে কী প্রচণ্ড মনোহর মহিমা! রুদ্রের চরণের নির্ম্মম আঘাতে মৃত্যুশাসন পড়ে ধূলায় লুটিয়া। সর্ব্বহারাদের জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপে মুহুর্মুহু। মার্কসবাদীদের মতে বিপ্লবোত্তর অধ্যায়ে বিজয়ী জনসাধারণের জয়ের ফসল কুড়ানোর জন্য যে Dictatorship of the Proletariat প্রতিষ্ঠিত হবে সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব একটা সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এমন একটা সময় আসবে যখন একটা নূতনতর সমাজের প্রাণশক্তি দুর্জ্জয় হয়ে উঠবে। এই নূতন সমাজে না থাকবে গরীব, না থাকবে ধনী। সমাজ হবে শ্রেণীহীন। তখন Dictatorship of the Proletariatও থাকবে না। নূতনতর সমাজের সেই আলোঝলমল চূড়ায় রাষ্ট্রের শাসন-পর্ব্ব শেষ হয়েছে। সুরু হয়ে গেছে শান্তিপর্ব্ব। ইতিহাসের সেই শান্তিপর্ব্বে কেউ কাউকে যখন হিংসা করে না তখন রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনই বা কি?

কিন্তু একটা কথা ইতিহাস তারস্বরে ঘোষণা করছে। কথাটা হ'ল রণপর্ব্বকে এড়িয়ে শান্তিপর্ব্বে পৌঁছানো যাবে না। যুগে যুগে creative minorityর সৃজনধর্ম্মী প্রতিভার বহ্নিশিখা কালধর্ম্মের বশে কখন ছাই হয়ে গেছে! যাদের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার যাদু uncreative mass এর আনুগত্য স্বতঃই অর্জ্জন করত তারা যখন dominant minority-তে পর্য্যবসিত হয়ে গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল হয়ে দাঁড়াল, একটা দারুণ বিপর্য্যয় ঘটল সমাজ-জীবনে। জনসাধারণ নতুন মোড়লদের অনুকরণ ত করলই না, মোড়লদের সঙ্গে রীতিমত অসহযোগ আরম্ভ করল। কারণ টয়েনবীর ভাষায়, mimesis fails when the leaders' creativity gives out; নেতাদের সৃষ্টির ক্ষমতার বারোটা বেজে গেলে জন-

সাধারণ আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। তখন শুরু হয়ে যায় লড়াই। এই লড়াইতে শুধু প্রবলের শাসন-দুর্গই ভাঙে না; সভ্যতার অনেক মূল্যবান সম্পদও রক্ত-সাগরে তলিয়ে যায়।

অবশেষে রুদ্রের নৃত্যলীলার শেষে একদিন শান্তির প্রসন্ন প্রভাতে বিষ্ণুর বাঁশরি বাজে ঠিকই। সেই বাঁশরির সুরের যাদুমন্ত্রে পুরাতনের চিতাভস্ম থেকে নতুন জেগে ওঠে বসন্তের পুষ্পিত মহিমায়। কিন্তু রুদ্রের দেনা যতক্ষণ কড়ায় গণ্ডায় আমরা পরিশোধ না করছি, ততক্ষণ বাঁশি বাজানো বিষ্ণুর লীলামাধুর্য্য কখনোই আস্বাদন করা যাবে না। অর্জ্জুন যদি মনে ক'রে থাকে, গাণ্ডীব না ধরলে কুরুক্ষেত্রকে ঠেকানো যাবে, সে ধারণা ভুল। তুমি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেও, ঋতেঽপি ত্বাম, আমার সংহারলীলা বন্ধ হবার নয়। এই কথাই কি কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন না? কেন? কারণ এই আসন্ন যুদ্ধ একটা আকস্মিক দৈব-দুর্ঘটনা নয়। পাপের বীজ বোনা হয়েছে। রক্তের প্লাবনে তার ফসল কুড়াতেই হবে।

Those who have been sown the wind, must reap the whirlwind.

হায়, ইতিহাসের শিক্ষা dominant minority যদি গ্রহণ করত! যদি তারা বুঝত Things can't go on this way! নয়াদিল্লীর অভ্রংলিহ সৌধমালার ছায়ায় নোংরা বস্তীগুলিতে গরীব শ্রমিকেরা নিঃশব্দে জীবনের দুর্ব্বহ বোঝা বহন করে চলেছে বংশ পরম্পরায়—এ রকমের একটা অবস্থা দীর্ঘকাল চলতেই পারেনা। চলা উচিতও নয়। জীবদ্দশায় জাতির জনক আমাদিগকে শুনিয়েছিলেন:—

A non-violent system of Government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists.

অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন গবর্ণমেণ্ট কেমন করে ধনী আর লাখো লাখো বুভুক্ষুর মধ্যে এই বিরাট ব্যবধানকে প্রশ্রয় দিতে পারে? গান্ধীজী বলতেন শোষণই জঘন্যতম হিংসা। যেখানে হিংসা নেই, সেখানে শোষণও নেই। আর শোষণ যেখানে নেই সেখানে গরীব মেরে পেট ভরানোরও কোন প্রশ্ন ওঠে না; সেখানে সামাজিক সম্পদের প্রাচুর্য্যে সকলেই অংশীদার। সব ঝোলটুকু নিজের কোলে টানবার প্রবণতা সেখানে থাকতেই পারে না, যেখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে। অহিংসা আর সাম্য তাই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে গাঁথা।

অহিংসার এই আদর্শের আবেদনে সাড়া দিয়ে সম্পদে সবাইকে ভাগ দিলে সর্ব্বহারা কেন dominant minority থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাবে? কেনই বা তারা সশস্ত্র বিপ্লবের রক্তপতাকা ওড়াবে? Minority ত তখন চাবুক ফেলে প্রেমের বাঁশি বাজাতে সুরু করেছে, ঐশ্বর্য্যের শিখর থেকে নেমে এসে সর্ব্বহারাদের দুঃখ-সুখের ভাগী হয়েছে, সম্পদ এবং সম্পদ যে ক্ষমতা দেয় সেই ক্ষমতায় স্বেচ্ছায় সকলকে অংশীদার করেছে। ধনীরা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে সাধারণের হিতার্থে স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে —এতে বিশ্বাস করতেন গান্ধী। স্বর্গের দেবদূতেরা ঘুমিয়ে আছে সকলেরই আত্মায়!

কিন্তু দেবদূতেরা যদি ঘুমিয়েই থাকেন, প্রেমের আহ্বানে ধনীরা যদি সাড়া না দেয়? তারা যদি সোনার তালের মদ খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে? বুভুক্ষুদের কান্নায় তাদের রক্ত দুলে না ওঠে? তখন? গান্ধী বললেন, তখন

A violent and bloody revolution is a certainty. . . . . .

ভবিতব্যের কথা কিছুই জোর করে বলা যায় না। তবু টয়েনবী মানুষের ইতিহাস আলোচনা করে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে কি মনে হয় রণপর্ব্বকে ডিঙিয়ে শান্তিপর্ব্ব আসবে? Dominant minority কি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করবে? শ্রীঅরবিন্দ ত বলেছেন তাঁর গীতা ভাষ্যে:

Christ and Buddha have come and gone, but it is Rudra who still holds the world in the hollow of his hand.

মানুষের হৃদয় শান্তির উপযুক্ত হ'লে তবে ত পৃথিবীতে শান্তি আসবে। মানুষ ক্রমবিকাশের পথে অল্পই অগ্রসর হতে পেরেছে। তার সভ্যতা চামড়া পর্য্যন্ত। মানুষের স্বভাবের গভীরে আজও সেই আদিম বর্ব্বরের প্রাধান্য। Dominant minority দিব্য ভাবের প্রেরণায় স্বার্থত্যাগ করবে, শাসনদণ্ড ফেলে দেবে, এমনটি আশা করা তাই দুরাশা। সর্ব্বহারা জনসাধারণ ভয় এবং ক্রোধ বিসর্জ্জন দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে শুধু মরবে, এমনটি আশা করাও দুরাশা। তাই কি অরবিন্দ এই মহাজিজ্ঞাসা রাখলেন যুগের সম্মুখে:

To turn aside then and preach to a still unevolved mankind the law of love and oneness?

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

(১৩)

পরদিন সকালে দেখা করতে এসে ধীরার চেহারা দেখে নিরঞ্জন অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল ধীরা? এ রকম শুকনো মুখ কেন? যেন খাও নি, ঘুমোও নি, কিছুই কর নি। বোন এবং ভগ্নীপতি কতক্ষণ ছিলেন? খুব বিরক্ত করেছেন না কি?"

ধীরা বলল, "খুব বিরক্ত আর কি করবে? প্রিয়নাথ খানিকটা কাজে রসিকতা করল, এবং নীরা আপনার রূপের খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল।"

নিরঞ্জন বলল, "এতে আহার নিদ্রা টুটে যাবার মত ত কিছু দেখছি না। কোন্‌টাতে বেশী বিরক্ত হলে?"

ধীরা বলল, "জানি না, আমার এখন ওদের কথা ভাবতে বা বলতে ভাল লাগছে না।"

"কি বলতে ভাল লাগছে?"

ধীরা বলল, "একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে, তবে সেটা বললে হয়ত আপনি আমাকে পাগল ভাববেন।"

"খুব সম্ভব পাগল ভাবব না, বলেই দেখ।"

ধীরা এধার-ওধার একবার তাকাল, যেন পালাবার পথ খুঁজছে। তারপর নীচু গলায় বলল, "আমি যদি খুব বড় অপরাধ করি আপনার কাছে, আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন?"

নিরঞ্জন তার কাছে এসে তার একটা হাত ধরে বলল, "কেন এ কথা তোমার মনে এল? ক্ষমা করতে পারব বই কি? কিন্তু তুমি এমন কিছু অপরাধ করতে পার না, আমার কাছেও না, আর কারও কাছেও না।"

ধীরা সামনের টেবিলের উপর মাথা রেখে হঠাৎ কেঁদে ফেলল, বলল, "আপনি আমাকে একেবারে চেনেন না যে!"

নিরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে ধীরার মাথায় হাত রেখে বলল, "কি হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু এখন যে আর সময় নেই। ওবেলা সন্ধ্যার পরে আসব, তখন অনেক সময় থাকবে। তুমি এরকম ক'রো না ধীরা। তা হ'লে আমার কাজকর্ম্ম করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এমনিতেই মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে পারি না। এমন কি দুঃখের কারণ ঘটে থাকতে পারে? তুমি মাথা তোল, চোখের জলটা মোছ, তা না হ'লে আমি যেতে পারব না।"

ধীরা মাথা তুলল, চোখের জলও মুছল। বলল, "আমি মানুষটা বড় অপয়া, শুধু নিজে যে কখনও সুখী হতে পারব না তাই নয়, যারা কাছে আসবে আমার, তারাও অসুখী হবে।"

"এখন পর্য্যন্ত ত সেরকম কিছু দেখছি না। উল্টো-টাই মনে হয়। আচ্ছা, আসি এখন", বলে তার চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ধীরা নাওয়া-খাওয়াটা করতে চেষ্টা করল। নইলে ঘরে বাহিরে এত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, যা সে পেরে ওঠে না। ভাবল, এর পর হাসপাতালের কাজ অল্পে অল্পে আরম্ভ করতে পারে, সময়টা ত তবু কেটে যাবে?

আচ্ছা, কি হয় সে যদি কিছুই না বলে নিরঞ্জনকে? তার নিজের মন তখনই ধিক্কার দিয়ে উঠল তাকে। এ মিথ্যাচরণ সে করতে পারবে না। ক'রে লাভও কিছু হবে না, এই পাপ মনে নিয়ে কোনদিন সে তাকাতে পারবে না স্বামীর মুখের দিকে। যদি নিরঞ্জন তাকে ক্ষমা করে, যদি এই ভয়াবহ জিনিষটাকে ধীরার কলঙ্ক না মনে করে? কিন্তু ধীরাই যে পারবে না। নিরঞ্জনকে দুঃখ দেওয়া তার কাছে নিজের প্রাণ নষ্ট করারই সমান হবে, তবু তাকে তা করতে হবে। নিরঞ্জনের জীবনে যেন কলঙ্কের ছায়া না পড়ে, সংসারে সমাজে তার যেন কোন নিন্দা, অপযশ না হয়। লোকের কাছে তাকে যেন মাথা হেঁট না করতে হয়। এত দুঃখ দেওয়ার জন্যে এখন সে ধীরাকে ক্ষমা করবে না। কিন্তু পরে হয়ত করবে। জীবনে আবার যখন সুখী হবে, তখন এই হতভাগিনীকে মনে করবে, হয়ত একটু কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই করবে।

সেদিন নীরা এসেই জিজ্ঞাসা করল, "নিরঞ্জনবাবু আসেন নি?"

ধীরা সংক্ষেপে বলল, "এখনও ত আসেন নি।"

প্রিয়নাথ বলল, "কাজকর্ম্ম থাকে ত মানুষের? যদিও

তোমার ধারণা যে আমরা কাজের ছুতো করে খালি আড্ডা দিয়ে বেড়াই।"

নীরা বলল, "কোন সময়েই কর না যে তাও ত নয়? আমরা ত আর পিছন পিছন ঘুরি না যে দেখব, কখন কাজ করছ আর কখন অকাজ করছ।"

প্রিয়নাথ বলল, "এত সন্দেহ যদি তা হ'লে ঘুরলেই হয়।"

নীরা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ভাই, ভদ্র-লোকের বিয়ে হয়েছে?"

ধীরা বলল, "না।"

"আশ্চর্য্য ত, এখনও বিয়ে করেন নি! বয়স কম হলেও ত্রিশ-বত্রিশ ত হবেই? ভাল কাজ করেন, অত ভাল দেখতে।"

প্রিয়নাথ বলল, "তোমারই যে জিভে জল এসে যাচ্ছে দেখছি। কিন্তু উনি যে দিদিকে আগে দেখে বসে আছেন, তোমার দিকে আর তাকাবেন না।"

ধীরা বলল, "তোমরা যদি দু'জনে বসে বসে ক্রমাগত এই রকম ভীষণ বাজে কথা বল, তা হ'লে আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকব। অন্য কথাও কি কিছু নেই?"

নীরা অনুতপ্ত হয়ে বলল, "না ভাই দিদি, আর বলব না, রাগ ক'রো না। তোমার গাড়ি কবে কেনা হবে বল। আবার যদি এ পথে আসি তা হ'লে চ'ড়ে বেড়িয়ে যাব।"

ধীরা বলল, "আজ ত চিঠি পেলাম যে গাড়ি কিনবার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এখন দেখে কিনতে যে ক'দিন লাগে। তারপর একটা ড্রাইভারও ত লাগবে?"

অতঃপর গল্প খুব টিকিয়ে টিকিয়ে চলতে লাগল। চা খাওয়া হল, তারপর ঝুমুর অকারণে অসময়ে ঘুম পাওয়াতে বাধ্য হয়ে তার মা-বাবাকে উঠে পড়তে হ'ল। তাদের গাড়িটা অদৃশ্য হতে না হতেই আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

ধীরা বোনকে বিদায় দিতে গেট অবধি এগিয়ে গিয়ে-ছিল, নিরঞ্জন গাড়ি থেকে নেমেই তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। হাতটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল তার মুঠোর মধ্যে। নিরঞ্জন বলল, "তোমার মনে কি হয়েছে জানি না, যদিও সেটাও যে আন্দাজ খানিকটা না করতে পারি তা নয়। কিন্তু শরীরের এ কি অবস্থা করছ? মানুষের জীবনে দুঃখ আনন্দ দুইই ত ভগবান প্রচুর পরিমাণে দিয়েছেন, প্রথম ধাক্কাতেই ভেঙে পড়লে চলবে কেন?"

ধীরা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "প্রথম যে নয়?"

নিরঞ্জন বলল, "আচ্ছা, চল বসি গিয়ে। এঁরা আজও তোমায় বেশী কি জ্বালিয়েছেন?"

"ওরা খানিকটা না জালিয়েই পারে না। তবে গাড়ি কেনার কথা উঠে পড়াতে তাদের কথার মোড় ঘুরে গেল ঐ দিকে।"

নিরঞ্জন বলল, "গাড়ি কিনছ না কি? বেশ, বেশ। দু'চারটে বাইরের interest থাকা ভাল। আমি একটা ভাল ড্রাইভার দিতে পারি তোমায়। যে ছোকরাটা আমার গাড়ি ধোয়, তার একটা মামাতো ভাই আছে, ভালই চালায়। এখন লোকটা বসেই আছে। তুমি তার কাজে সন্তুষ্ট হবে। আর আমিও নিশ্চিন্ত থাকব লোকটা চেনা ব'লে।"

ধীরা হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, "আপনার কি ড্রাইভার নিয়েও ভাবনা না কি? পাছে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যায়?"

"ভাবনা আছেই নানারকম। তুমি আবার আজ আর একটা ভাবনা বেশী ধরিয়ে দিয়েছ। কেন কাঁদছিলে সকালে? আমার কি কিছুই করবার নেই? শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে হবে? এর মধ্যে আমি একেবারেই কোনখানে নেই, তা কিন্তু আমি বিশ্বাস করছি না।"

ধীরা বলল, "আমি ত তা বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু দুঃখ আমার যে নিজেকে নিয়ে, আপনাকে নিয়ে ত নয়? আমি যে মুখোস পরে আছি, যে মানুষ আমি নয় তারই ছদ্মবেশ ধরে আছি।"

নিরঞ্জন বলল, "একটু পরিষ্কার করেই বল না? দুঃখ সহ্য করা সহজ নয়, কিন্তু সংশয় সহ্য করা আরও শক্ত। কিন্তু তোমার চোখ-দুটো দেখে একেবারে বিশ্বাস হয় না যে তোমার মনে লুকোবার মত কিছু আছে। আত্মার ভিতরে পর্যন্ত যেন দেখা যায়।"

ধীরা মুখটা ফিরিয়ে নিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "ঐ চোখে একদিন কাঁটা ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছা হবে আপনার, যখন সত্যি আমিটার পরিচয় পাবেন।"

"তার আগে নিজের চোখেই কাঁটা ফুটিয়ে দেব। কিন্তু এখনও কি হেঁয়ালির দরকার আছে? আমার কাছে কিছু শুনতে চাও ত আমি বলতে প্রস্তুত আছি। যদিও ইচ্ছে ছিল আরও কয়েকটা দিন দেরি করার। বড় অল্পদিন হ'ল আমাদের পরিচয়টা হয়েছে। যদিও

হয়ত সত্যই আগের জন্মের চেনা ছিল। নইলে সাত-আটটা দিনের মধ্যে এমন অবস্থা মানুষের হয়, এটা শুনি নি আগে, এবং শুনলেও বোধ হয় বিশ্বাস করতাম না। মুখটা একটু ফিরোও এদিকে। তোমার বাড়ীতে ত চারিদিকেই লোক, এখানে কিছু বলতে বসারও বিপদ আছে।"

ধীরা চোখ মুছে আবার মুখ ফিরোল নিরঞ্জনের দিকে। বলল, "আপনাকে আমি ভয়ানক জ্বালাতন করছি ক'দিন থেকে। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়ে করছি।"

নিরঞ্জন বলল, "আরও বেশী জ্বালালেও আমার আপত্তি ছিল না, যদি ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে বোঝা যেত। কেন সবটা খুলে বলতে পারছনা ধীরা? এমন দুঃখ কি আছে যার না প্রতিকার করা যায়? প্রতিকারও যদি না করা যায়, তা হ'লে ভাগ করে নেওয়া যায় ত? সেইটুকু করতেও পার না? বাইরের জীবনে তোমার আমি অল্পদিনই স্থান পেয়েছি, কিন্তু আমরা ত বিশ্বাস করি না যে আমাদের পরিচয় এই দু'দিনের মাত্র। চিরদিন যেন এই রকম কাছেই ছিলাম মনে হয়। বন্ধুর চেয়ে বেশী হবার দাবি যদি নাও করতে পারি, বন্ধু বলে ত স্বীকার করে নিয়েছিলে? বন্ধুর কি কিছু করবার নেই? শুধু আনন্দের দিনে সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসা যায়? চোখের জলটা মোছাবার অধিকারও নেই?"

ধীরা বলল, "কতবার বলেছি যে পরে বলব। কিন্তু সে ত চিরকাল বলা যায় না? অথচ দারুণ ভয় আমার গলা টিপে রাখে। সব যেদিন আমার বলা হয়ে যাবে, কিন্তু এটাকে যে আমি বড় বেশী ভালবেসেছিলাম। আবার আপনার কাছে জানতে চাইছি, আপনি পারবেন আমাকে ক্ষমা করতে যদি অতি নিদারুণ কথাও হয়?"

নিরঞ্জন বলল, "তোমার মাথায় হাত রেখে বলছি। পারব। যাই হোক।"

নিরঞ্জনের একখানা হাত টেনে নিয়ে তার উপর নিজের মুখটা রেখে ধীরা বলল, "তবে এইটাই আমার সম্বল রইল।"

নিরঞ্জন বলল, "ঐটুকুতেই হবে ধীরা? আর আমার কাছে কিছু চাইবার নেই?"

"কি চাইব? কি পাবার যোগ্যতাই বা আমার আছে?"

"পাবার জন্যে আবার যোগ্য হতে হয় না কি? আমি কি করে পেলাম এতখানি তোমার কাছে? আমি কি খুব যোগ্য?"

ধীরার চোখের জল পড়তে লাগল অঝোরে নিরঞ্জনের হাতের উপর, উত্তর সে কিছুই দিল না।

নিরঞ্জন বলল, "চল, এখান থেকে বেরিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে বসি। দেওয়ালগুলো যেন আমার গলা টিপে ধরছে।"

ধীরা তার হাত ছেড়ে দিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "চল, কোথায় যেতে চাও।"

নিরঞ্জন একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, "যাক, চোখের জলের বানে তোমার শিষ্টাচারটা অনেকটা ভেসেই গিয়েছে। আজ আর তুমি বলতে আপত্তি নেই কিছু?"

ধীরা বলল, "না, ওসব আপত্তি মানুষের বাইরের জীবনের জিনিষ। এখন আমি আর ভদ্রতা করব কি? কিন্তু কোথায় যাবে? আবার কাপড়-চোপড় বদলাব, না এমনিই যাব?"

"তোমার সাজসজ্জা কিছু দরকার হয় না ধীরা। তবে চুলটা না হয় বেঁধে নাও। লোকে না ভাবে আবার যে আমি তোমায় নিয়ে পালাচ্ছি।"

ধীরা গিয়ে চুল বেঁধে এল। যশোদাকে ব'লে এল, সে একটু ঘুরে আসছে। যশোদা একটু বক্রদৃষ্টিতে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে দেখল, তবে মন্তব্য কিছু করল না। দিদিমণির অবস্থার জন্যে সে এই ভদ্রলোককেই দায়ী করেছিল, তবে কিছু ত আর বলা চলে না?

নিরঞ্জন বলল, "চল, নদীর ধারেই একটু ঘুরে আসি। আমার পাশে বস।"

গাড়িটা যমুনার ব্রীজের কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দু'জনে নেমে পড়ল। নিরঞ্জন বলল, "দেখ ধীরা, জোর করে তোমার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করবার জন্যে এখানে নিয়ে আসি নি। যখন তোমার বলতে ইচ্ছা হবে বোলো। কিন্তু আমিও ত রক্ত-মাংসের মানুষ? প্রাণটাকে একটু স্বস্তি পেতে দাও আমার। বল একবার আমাকে ভালবাস তুমি, সকলের চেয়ে বেশী, সবকিছুর চেয়ে বেশী।"

ধীরা বলল, "না বলতেই তুমি জেনেছ। এ ত মুখের কথায় বোঝাবার নয়।"

"জানি বলেই ত ব্যাপারটা এমন ভীষণ রহস্যময় হয়ে উঠেছে আমার কাছে। এটাও ত তুমি জান যে তোমাকে আমি নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

কিন্তু এতে তোমার কোন আনন্দ নেই কেন? কোন সান্ত্বনা নেই কেন? এটা কি খুবই সামান্য জিনিস তোমার কাছে? তুমি খুব সুন্দরী, হয়ত ভালবাসা আরও পেয়েছ জীবনে, কিন্তু আমার মত ক'রে কেউ তোমাকে বোধ হয় ভালবাসতে পারে নি।"

ধীরা নিরঞ্জনের দুই হাত ধরে বলল, "ভগবান্ সাক্ষী ক'রে বলছি, তুমি ছাড়া কোন পুরুষের দিকে আমি কখনও ভালবাসার দৃষ্টিতে চাই নি। আমাকে কেউ ভালবেসেছে কি না জানি না, কেউ সেকথা বলে নি।"

নিরঞ্জন বলল, "আমার উপকারই করেছে না ব'লে। কিন্তু অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাছে এস আমার," ব'লে তাকে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল, অশ্রুসিক্ত মুখে চুম্বন ক'রে বলল, "একটুও আনন্দ হচ্ছে না?"

ধীরা এমন ভয়ানক হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল নিরঞ্জনের দিকে, যে একটা অজানা আশঙ্কা হঠাৎ যেন তার হৃৎপিণ্ডের উপর হিমশীতল স্পর্শ বুলিয়ে গেল। ধীরাকে ছাড়ল না, তবে বাহুবন্ধনটা একটু শিথিল হয়ে এল।

বলল, "থাকগে, যা না জানাতে চাও, জানিও না। কোনদিনও জানিও না ইচ্ছে না হলে। যতটা পেলাম, তাই কি আমার কম? কিন্তু আবার কাঁপছ কেন? চল, গাড়িতে বসবে। তুমি অভিভাবক চাও না ধীরা, কিন্তু সারাক্ষণ তোমার বুকে ক'রে ধরে রাখবে এই রকম অভিভাবকই তোমার দরকার। সেই রকমই পাবে।"

গাড়িতে গিয়ে খানিক অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করল, ধীরা বেশী কিছু উত্তর দিল না।

বাড়ীর কাছে এসে একবার অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, "নিরঞ্জন!"

নিরঞ্জন বলল, "কি বলছ, বল?"

"সামনের রবিবারটা অবধি আমি কিছু বলতে পারব না। এই ক'টা দিন আমার থাক। তারপর এই আমিও আর থাকব না, আর এই তুমিও থাকবে না।"

নিরঞ্জন বলল, "নিজের উপর এরকম অত্যাচার করো না ধীরা। আত্মহত্যা মহাপাপ জানই তুমি, আত্ম উৎপীড়নও তার কাছাকাছি যায়। দেহটাকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেওয়া মানুষ আজ আইন করে বন্ধ করেছে, কিন্তু মনের উপর জুলুম অনায়াসে করা যায়, সেখানে ত পুলিশ পাহারা বসে না? দেখ, একলা থাকতে চাও ত নামিয়ে দিয়ে যাই, আর কাছে থাকতে বল ত তোমার সঙ্গে যেতে পারি।"

ধীরা বলল, "সঙ্গেই চল।"

অনেকক্ষণ ধীরার কাছে বসে বসে গল্প করল। বলল, "কাজে আবার যোগ দাও ধীরা। কাজের মধ্যে মানুষের একটা আশ্রয় আছে। যা কিছু কাজ করতে ভাল লাগে ক'রে যাও। গাড়ি কিনতে চাও, কাল নিয়ে যেতে পারি সঙ্গে ক'রে। আর কিছু করতে ইচ্ছা করে?"

ধীরা বলল, "কিছু ত ভেবে পাচ্ছি না।"

"আমি যে কিছুই করতে পারছি না তোমার জন্যে, এ চিন্তাটা আমায় বড় লজ্জা দিচ্ছে। সবই ত আমার করতে পারা উচিত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘিরে এমন এক কুয়াসার জাল সৃষ্টি করেছ, যার ভিতর মানুষের দৃষ্টি চলে না। নিতান্ত তখন বললে যে আর কোন পুরুষকে ভালবাসি নি, নইলে আমার সন্দেহ হ'ত যে আমার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী আছে।"

ধীরা বলল, "আর যাই সন্দেহ কর, ঐখানে সন্দেহ কর না। তোমাকে ভালবাসা ছাড়া ভালবাসা কথাটার কোন অর্থ নেই আমার কাছে, কোনদিন থাকবেও না।"

অনেক রাত অবধি নিরঞ্জন ব'সে রইল ধীরার কাছে। যখন নিতান্তই আর বসা গেল না, তখন উঠে চলে গেল।

ধীরা খাওয়া-দাওয়া করতে চেষ্টা করল, ঘুমোতে চেষ্টা করল, কিছুই পারল না। যশোদার রাগটা আরও বাড়ল। দিদিমণিকে ত কিছুই বলার জো নেই, সে ত একেবারেই মরেছে। নিরঞ্জনকে সে ত আর কিছু বলতে পারে না বাড়ীর আশ্রয় হয়ে? কিন্তু মানুষটার কি চোখও নেই গা? অত সুন্দরী মেয়ে, এমন ক'রে মরছে তার জন্যে?

পরের দিনটা নিরঞ্জন কাজেই গেল না। সারাটা দিন ধীরাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াল। গাড়ি দেখিয়ে আনল, ড্রাইভার জোগাড় ক'রে আনল। কিন্তু ধীরার মুখে হাসি ফোটাতে পারল না। নীরা এবং প্রিয়নাথের আসার সময় অবধি বসেই রইল।

রাত্রে যাবার সময় বলল, "আজকের দিনটা একটুও কি ভাল লাগল তোমার অন্য দিনের চেয়ে?"

ধীরা বলল, "যতক্ষণ কাছে থাক, ততক্ষণ ভাল না লেগে উপায় কি? কিন্তু ভুলতে ত পারি না যে আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। তারপর চিররাত্রি।"

ধীরার গায়ে মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে নিরঞ্জন বলল, "এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না ধীরা। চিররাত্রিই আসুক, তার মধ্যেও দু'জনে হাত ধরে চলতে পারব।"

"চলতে চাইবে না।"

"আমি চলতে চাইব না, এটা একেবারেই অসম্ভব কথা। তবে তোমার মনে কি আছে তা ত জানি না। তুমিই কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইবে?"

ধীরা বলল, "আজই জানতে চেয়োনা।"

শুক্রবার ধীরার গাড়ি এল। তাই নিয়ে নীরা, ঝুনু, প্রিয়নাথ সকলে কলরব ক'রে ঘুরে এল। তারা বিদায় হলে ধীরাও একবার গেল নিরঞ্জনের সঙ্গে বেড়াতে।

শনিবারে নিরঞ্জন বলল, "মনটা শক্ত ক'রে রাখছি আমি ধীরা। আমি পুরুষ, বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায়ও বড়। পৃথিবীটাকে চেনাও আছে খানিকটা। কিন্তু নিজেকে তুমি বেশী বিচলিত কর না। আজ তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি যেন একটা nightmare-এর মধ্যে চোখ বুজে ঘুরছ। চোখ তাকিয়ে আমার মুখটা দেখতেও কি ইচ্ছা হচ্ছে না?"

"তোমার মুখ আমি চোখ বুজেও দেখতে পাই যে।"

নিরঞ্জন একটুখানি হতাশভাবে বলল, "কালকে কোথাও বেড়াতে যাবে বিকেলে? না বাড়ীতেই থাকতে চাও?"

"দেখি কেমন থাকি। ভাল থাকলে বাইরেও যেতে পারি।"

নিরঞ্জন চ'লে গেল। আজ তার মনটাও যেন আশঙ্কায় কালো হয়ে এল।

ভোরবেলা দেখা করতে এসে ধীরাকে এক গোছা ভুঁইচাঁপা ফুল দিয়ে গেল। বলল, "তোমার শোবার ঘরে রেখ। ভারি মিষ্টি গন্ধ। দেখলেই কেন জানি না তোমাকে মনে পড়ে। আমি বিকেলে ঠিক সময়ই আসব।"

ধীরার মুখের ভিতর সবচেয়ে সুন্দর ছিল তার আয়ত কালো চোখ দুটো। একদৃষ্টে সেই চোখ চেয়ে রইল নিরঞ্জনের মুখের দিকে, কথা কিছু বলতে পারল না।

নিরঞ্জন বলল, "ও রকম করে চেয়ে আছ কেন?" ধীরা উত্তর দিল না।

নীরারা দুপুরের ট্রেনে চ'লে গেছে। তাদের নিয়ে কোন হাঙ্গাম আর নেই। ধীরা চুল বেঁধে কাপড়-চোপড় বদলে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হতে চেষ্টা করল। কিন্তু খানিক পরেই দেখল, তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, হাত-পাও চলছে না।

হতাশ হয়ে যশোদাকে ডেকে বলল, "নিরঞ্জনবাবু এলে তাঁকে এইখানেই ডেকে এন। আমার আজ আবার বড় শরীর খারাপ লাগছে।"

যশোদা বলল, "শরীরের আর অপরাধ কি বল? খাবে নি, ঘুমোবে নি, তা শরীল কি এমনি এমনি থাকে?"

নিরঞ্জন এল ঠিক সময়েই। যশোদা তাকে পৌঁছে দিয়ে এল ধীরার ঘরে। সে বসতেও পারে নি, একেবারে শুয়ে পড়েছে। মুখ-চোখ যেন প্রাণহীন মানুষের মত।

নিরঞ্জন একেবারে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। কাছে এসে ধীরার বিছানাতেই ব'সে পড়ল। বলল, "এক রাতের ভেতর এ কি হল ধীরা? কি অসুখ?"

"অসুখ করেনি।"

"তা হ'লে কি হয়েছে?"

"তুমি ত জানই কি হয়েছে। আজ ত আমার এই জীবনের শেষ দিন। এরপর কোথায় যাব জানি না। সব অজানা, সব অচেনা।"

নিরঞ্জন বলল, "একলা ত যাবে না। আমি অন্ততঃ সঙ্গেই থাকব।"

সে দুই হাত দিয়ে ধীরাকে জড়িয়ে ধরল।

ধীরা বলল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার যা বলবার আছে তা অন্ততঃ বসে নিই? আমার দিকে তাকিও না, আমাকে ছুঁয়োও না। ছোঁয়ার যোগ্য আমি নই।"

নিরঞ্জন বলল, "তুমি পাগল হয়ে গেছ ধীরা? তোমাকে আমি ছুঁতে পারব না কেন? তুমি ত আমার হলে চিরদিনের জন্যে।"

"না, সে স্বপ্নও আজ শেষ হ'ল। তোমার হতেও আমি পারব না। তুমি চাইবেও না।"

নিরঞ্জন বলল, "ঈশ্বরের দোহাই ধীরা, এ হেঁয়ালীর শেষ কর তুমি। খুলে বল কি হয়েছে। আমি এমন কিছু কল্পনাও করতে পারছি না যা তোমার আর আমার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তুমি বল, বল লক্ষ্মীটি।"

ধীরা বলল, "বলছি, না বললে তুমি যাবে না। আমার মুখের দিকে তাকিও না, সহ্য করতে পারবে না। আমি তোমার স্ত্রী হতে পারব না।"

"কেন?"

"আমার দেহ কলঙ্কিত, অপবিত্র। কি ক'রে তোমার স্ত্রী হব, তোমার সন্তানের জননী হব?"

নিরঞ্জনের মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল, প্রচণ্ড আঘাতে তার দেহও বিকল হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য।

কিন্তু ধীরার হাত ছাড়ল না। বলল, "এ কি ভয়ানক কথা বলছ ধীরা? এ কি করে সম্ভব হতে পারল?"

"কলকাতার দাঙ্গার সময় হয়েছিল। আমাকে গুণ্ডায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে তাদের কবল থেকে পালিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও আমার হাত ধরে আছ? ঘেন্না হচ্ছে না?"

নিরঞ্জন বলল, "আমাকে মানুষ মনে কর, না পিশাচ মনে কর ধীরা? এর জন্যে তোমার হাত ছেড়ে দিতে হবে? তোমার অপরাধ এর মধ্যে কোথায়? এর জন্যে কি আমি তোমায় কম আদর করব, কম মর্য্যাদা দেব? আরও ত বেশী দেওয়া উচিত তোমার এই দারুণ দুঃখের ক্ষতিপূরণের জন্যে। যাদের কাছে ছিলে তারা তোমায় রক্ষা করতে পারে নি। অপরাধ কারও হয়ে থাকে ত তাদের হয়েছে। আর অপরাধ হবে আমারও, যদি আমি এটা এক মুহূর্তের জন্যেও মনে রাখি।"

এইবার নিরঞ্জনের পায়ের কাছে প'ড়ে অব্যক্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠল ধীরা। বলল, "তুমি ভুললেই কি হবে? আমি যে ভুলতে পারব না। ও যে আমার বুকের মধ্যে নরকের আগুনের রংএ আঁকা হয়ে গেছে। ফিরে এসে খালি সব আত্মীয়-স্বজনের কাছে আক্ষেপ শুনেছিলাম যে আমি ম'রে যাই নি কেন? ম'রে যাওয়াই উচিত ছিল। তা হ'লে এ যন্ত্রণা নিজে পেতে হ'ত না, তোমাকে দিতে হতনা।"

নিরঞ্জন বলল, "তুমি অত দুঃখ কেন করছ ধীরা? আমার ভালবাসার এইটুকু বিশ্বাস তোমার নেই? ফুলের চেয়ে বেশী পবিত্রও যদি হতে তা হ'লে যে আগ্রহ ক'রে বুকে তুলে নিতাম, এখনও তাই করব। মিথ্যা বড়াই করছি না। কেঁদো না, এস আমার কাছে। আর কি ক্ষতিপূরণ এখন সম্ভব বল? বহুদিন চ'লে গেছে, এর প্রতিশোধ নেবারও কোন উপায় নেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের উপর ওটার ছায়া ফেলতে দিও না।

ধীরা উঠল না। বলল, "আমিই যে পারব না। জীবনে তোমাকে আমি সবচেয়ে ভালবেসেছি, আমার কলঙ্কের ছায়া তোমার জীবনকে স্পর্শ করতে আমি দেব না। তুমি নিন্দিত হবে, লাঞ্ছিত হবে। আমি কি করে তোমার মুখের দিকে তাকাব? এর চেয়ে ত মরে যাওয়া আমার পক্ষে ভাল হবে। আমাকে ছেড়ে দাও, আর আমার কাছে এস না। আমার মন বড় লোভী, বড় দুর্ব্বল। বেশীক্ষণ তাকে শক্ত রাখতে পারব না।"

নিরঞ্জন বলল, "এগুলো তোমার অসুস্থ মস্তিষ্কের ধারণা বই আর কিছু নয় ধীরা। আমার জীবনকে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করবে না, কারণ কোন কলঙ্ক তোমার মধ্যে নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনরাই বা এমন অমানুষ হতে গেল কেন? তোমাকে স্ত্রী বলে নিতে আমার মনে কোন বাধা নেই, তুমি কেন লজ্জা পাচ্ছ? যে পাপ নিজে কর নি, তার শাস্তি নিজে কেন নিতে চাইছ? এমন ভুল কর না, ভেবে দেখ।"

ধীরা বলল, "তুমি দেবতা, তাই এমন কথা বলতে পারছ। কিন্তু মানুষও ত বটে, সেই সঙ্গে? তুমিই এর পর মনে করবে আমি তোমায় ঠকিয়েছি। যা পাওনা ছিল স্ত্রীর কাছ থেকে তোমার, তা তুমি পাও নি। সে শাস্তি আমি সহ্য করতে পারব না।"

নিরঞ্জন বলল, "তুমি আমাকে কিছুই চেন নি ধীরা। ক'দিন বা আমাকে দেখেছ? নিজে বল বটে যে আগের জন্মের চেনা ছিল। সে জন্মে কি এমনি বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় পেয়েছিলে? আজ ভুলিয়ে নিয়ে যাব, কাল অনাদর করব? এই ভাবছ?"

ধীরা হতাশভাবে বলল, "যা আগে বলেছি, তার বেশী আর কি বলব?"

নিরঞ্জন বলল, "বেশী কি আর বলবে? বলতে পার না যে আমায় ভালবাস? বলতে পার না যে আমার ভালবাসায় তোমার বিশ্বাস আছে? এতক্ষণ যা বললে তার ভিতর এমন কোন কথা নেই যা অখণ্ডনীয়। আমি যদি আজ তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করি, তাতে কার কি এসে যাবে? কে কিসের খোঁজ করতে যাবে?"

ধীরা বলল, "নাই নিল। কিন্তু নিজের মনের ধিক্কারে আমি পাগল হয়ে যাব। মনে এত বড় জ্বালা নিয়ে কি করে তোমাকে আমি স্বামী বলে মনে করব? আমার মন ত বলবে আমি তোমার হত্যাকারী। প্রাণের চেয়েও যার মূল্য বেশী মানুষের কাছে, তোমার সেই সম্পদকে আমি নষ্ট করতে বসেছি।

নিরঞ্জন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, বলল, "বাধাটা আসলে তোমার মনে ধীরা, আর কোথাও নয়। এই বোঝা বয়ে এতদিন চলেছ কি করে সাধারণ মানুষের মত? এটা পাগলের দৃষ্টিভঙ্গি ধীরা, এর খাতিরে নিজে মরতে চাইছ, আর আমাকেও ভাসিয়ে দিতে চাইছ? শুধু আমার দিক দিয়ে জিনিষটা দেখতে চেষ্টা কর তুমি। নিজের কথা ভুলে যাও, কিসে আমি রক্ষা পাই, তাই দেখ।"

ধীরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তাই দেখছি, নিজে মরেও যাতে তোমাকে বাঁচাতে পারি, তাই করে যাব।"

নিরঞ্জন বলল, "কিছুই করবে না তুমি। তোমাকে এখন স্বার্থত্যাগের মারাত্মক নেশায় পেয়ে বসেছে। এ অবস্থায় আত্মহত্যা করা যায়, নরহত্যাও করা যায়। নিজেকে ত চিনতে তুমি? জানতে যে কোন পুরুষকে স্বামী বলে তুমি নিতে পারবে না। তা হ'লে আগে কেন সাবধান হও নি? নিজে কেন এত কাছে এসেছিলে? আমাকে এতটা এগোতে দিয়েছিলে কেন? প্রথম দিনই ফিরিয়ে যদি দিতে, তা হ'লে একদিনের মোহ ত আমার দূর হয়ে যেতেও পারত? নিজের মরবার ব্যবস্থা ত বেশ ভাল করেই করেছ কারণ তুমি বাঁচবে না সে আমি দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এ হতভাগাকে এমন মরণ ফাঁদে ফেলতে গেলে কেন?

"কি সর্ব্বনাশা নেশা আমায় পেয়ে বসেছিল জানি না, কিছুতেই নিজেকে ফেরাতে পারি নি।"

"এখনও ফিরবার সময় আছে ধীরা।"

"ফিরে কোথায় যাব? তোমার দিকে যাবার পথ ভাগ্য আমার আর রাখে নি।"

"এই তা হ'লে তোমার শেষ কথা? আমাকে আর প্রয়োজন নেই?

"আমাকে দয়া কর। আর কিছু বলতে বল না।"

নিরঞ্জন উঠে পড়ল। বলল, "দয়াই করলাম, যদিও দয়ার যোগ্য তুমি কি না জানি না। এত বড় নিষ্ঠুরতা তুমি করতে পার এ আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। তাই জানতে চেয়েছিলে যে তোমার যে কোন রকম অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি কি না? কথা দিয়েছিলাম ক্ষমা করব, তাই করলাম। কিন্তু ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করবেন কি?" এই বলে আর কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ধীরা অনেকক্ষণ একইভাবে প'ড়ে রইল। জ্ঞান তার ছিল কি না কেউ দেখতে এল না। যশোদার কোন ডাকে সে সাড়া দিল না। রাত গভীর হবামাত্র মাটিতে প'ড়ে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাকে ডাকতে লাগল, "ফিরে এস, ফিরে এস!" ফিরে কেউ এল না। চারিদিকের নীরবতার সাগরে কোন তরঙ্গই উঠল না।

ভোরের বেলা অর্দ্ধেক তন্দ্রা, অর্দ্ধেক মূর্চ্ছার মাঝ থেকে একবার সে উঠে বসল। পাগলের দৃষ্টিতে তাকাল চারিদিকে। মনে মনে বলল, "খেয়ে ফেলেছিস রাক্ষসী? কালনাগিনী তুই এখনও বেঁচে আছিস কেন?"

তার ড্রেসিং টেবিলের উপর কৃষ্ণাভ ধাতুর খুব বড় আর ভারি ঘটি ছিল। যশোদা সেইখানে নিরঞ্জনের আনা ফুলের গোছাটা রেখে গিয়েছিল। সুগন্ধে তখনও ঘর ভরে রয়েছে। কিসের সুগন্ধ? কার স্পর্শের? হঠাৎ সেইটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল কয়েকবার। রক্তস্রোতের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে গেল সেইখানেই।

শব্দ শুনে যশোদা ছুটে এল। রক্তের মধ্যে পড়ে আছে ধীরা। শাদা ফুলগুলোও ছিটিয়ে পড়েছে মাথার কাছে, যেন তার শেষ শয্যাকে অলঙ্কৃত করবার জন্যে।

ধীরাকে নিয়ে সারাদিন কোলাহল চলল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল বাড়ীর থেকে। কলকাতায় টেলিগ্রাম গেল। নবনিযুক্ত ড্রাইভারকে দিয়ে যশোদা একবার নিরঞ্জনের খোঁজ করাল। শুনল আগের রাত্রেই সে এলাহাবাদ ছেড়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে।

(১৯)

ধীরার মা-বাবা পরদিন এসে পড়লেন। মেয়ের জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু সে কোন কথা বলছে না, কাউকে যে চিনতে পারছে তারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। একবার শুধু অস্ফুটস্বরে বলল, "যশোদা।"

যশোদা চোখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল। বলল, "কি বলছ গা দিদিমণি? একটু ভাল বোধ করছ?"

ধীরা সেইরকম গলায় বলল, "আর আসে নি?"

যশোদা বলল, "আসবে কোথা থেকে? সে কি আর এ দেশে আছে? যে রাতে খাট থেকে তুমি প'ড়ে গেলে, সেই রাতেই খোঁজ করিয়েছিলাম। তিনি নেই এলাহাবাদে, বাইরে কোথায় গেছে।"

ধীরা এই ক'দিনের কথা পরে ভাল ক'রে মনে আনতে পারত না। জ্ঞান হবার পর মনে হ'ত কে যেন তাকে আগুনের সমুদ্রে ডুবিয়ে মারছে। তার মাথায় বড় যন্ত্রণা, তার বুকে বড় যন্ত্রণা। সে বড় একলা। আগুনের সাগরে ডুবতে ডুবতে কারও মুখ কি সে দেখতে পেত? মায়ের মুখটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠত চোখের সামনে, যশোদার মুখটাও এক-আধবার। আর সারা দিন-রাত দেখত তার মুখ, যাকে সে হত্যা ক'রে ব'সে আছে।

দারুণ দুর্ভাগ্যের আঘাতে তার ভাববার ক্ষমতাটাও যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। তার অহঙ্কারটা কোথায় গেল? যার বলে সে নিজেকে এতবড় শাস্তি দিল, নিরঞ্জনকেও দিল এতবড় আঘাত? কিন্তু কাকে রক্ষা করতে পারল সে? নিজেকে ত পারে নি। বহু বৎসর

গোপন দুঃখ মনের মধ্যে পুষে রেখে রেখে তার ধারণা হয়েছিল, সব সহ্য করবার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু দেখল এবার যে শাস্তি নিজেকে সে দিয়েছে তা তারও সহ্য করার সাধ্য হবে না। জীবনের উৎসমূলে তীব্রতম বিষের রাশি এসে মিশেছে, এতে প্রাণ তার বাঁচবে না। সেদিন সে নিজেকে হত্যা করতেই চেয়েছিল, যদিও ভাল ক'রে সব দিক ভেবে কিছু করার মত অবস্থা তখন তার ছিল না। এরপর যদি আবার করে, বিধাতা তা হ'লে আর তাকে টেনে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। তবু কিসের আশায় এই দারুণ যন্ত্রণাময় জীবন আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে সে?

সে কল্যাণ চেয়েছিল নিরঞ্জনের। কিন্তু কল্যাণ কোথায়? কোথায় আছে সে? গৃহহারা, স্ত্রীহারা? সবচেয়ে ভালবাসার পাত্রীর হাত থেকে এরকম বিষের পেয়ালা সে নিয়ে কি করেছে? বেঁচে আছে কি? ধীরাকে কি ভুলে গেছে? এখনও কি তাকে অভিশাপ দিচ্ছে? শেষ কথাটা তার অভিশাপের মতই শুনিয়েছিল।

কিন্তু ধীরারই কি কিছু অধিকার ছিল এরকম ক'রে তাকে বলি দিতে যাবার? কেন যে সে নিরঞ্জনকে কিছুতেই দূরে ঠেলে রাখতে পারে নি, তা নিজেকেও সে বোঝাতে পারে না। কিসের আবেগ তাকে একদণ্ড স্থির থাকতে দেয় নি, একবার পিছন ফিরে তাকাতে দেয় নি? কিন্তু যে জন্যেই এ ব্যাপার ঘটে থাক, দোষটা ধীরার দিকেই ছিল। সেই আকর্ষণ করেছে নিরঞ্জনকে দেহ-মন সবকিছু দিয়ে। কিন্তু এক জায়গায় এসে মানুষের ভালবাসা ত থেমে দাঁড়িয়ে যেতে পারে না? নিরঞ্জন যদি ধরে নিয়ে থাকে যে ধীরা তাকে সবই দিতে চায়, সবই নিতে চায় তার কাছ থেকে, তা হ'লে কে তাকে দোষ দেবে? ফুলের পাপড়ি বিছান পথে চলতে চলতে তাকে এমন কাল-সাপিনীর কামড় খেয়ে মরতে হ'ল কেন?

নিজে আর খুব বেশীদিন বাঁচবে না, এটা ধীরা ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর আগে একবারও কি সে নিরঞ্জনকে দেখতে পাবে না? একবার তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারবে না? ক্ষমা কি আর পাবে? কিন্তু নিরঞ্জনই এ আশ্বাস তাকে দিয়ে গিয়েছিল যে যাই হোক তাদের মধ্যের এ দারুণ রহস্য, ধীরাকে সে ক্ষমাই করবে। কিন্তু সেই নিরঞ্জনই আবার ব'লে কি যায় নি যে ভগবান হয়ত ধীরাকে ক্ষমা করবেন না?

তা ক্ষমা তিনি করেন নি। ধীরা মরতে চেয়েছিল, মরতে সে পারে নি। তার পরমতম শত্রু তার জন্যে যে শাস্তি কামনা করত, এ শাস্তি তার চেয়েও বড়। যতদিন সে না মরবে, তাকে এই তুষানলে দগ্ধ হ'তে হবে। খুঁজলে হয়ত নিরঞ্জনকে পাওয়া যাবে, কারণ সে ত পৃথিবীতেই আছে। কিন্তু মনোলোকের দরজা তার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। ধীরার আর সেখানে প্রবেশের উপায় নেই। জন্মান্তরের বন্ধনও ছিন্ন এখন, এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার পরেও তা আর টি'কে থাকতে পারে না। তবু কুহকিনী আশা কেন তাকে লোভ দেখায়?

কয়েকদিন পরে যখন সে খাটে উঠে বসতে পারল তখন সুবালা বললেন, "এ অলক্ষুণে কাজ ছেড়ে দে খুকি। চল, তোকে কোলকাতায় নিয়ে যাই। তবু আমার চোখের উপরে থাকবি। এখানে এসে অবধি ত তোর খালি অমঙ্গলই হচ্ছে।"

ধীরা বলল, "না মা, আমি যাব না। আমি এখানেই ভাল থাকব, যদি ভাল থাকা অদৃষ্টে থাকে। এরা যদি চাকরি ছাড়িয়ে না দেয় তা হ'লে আমি ছাড়ব না।"

যশোদা বলল, "ওরা ছাড়াবে নি গো। নার্সগুলো ত তাই বলে। বড় মেমসাহেব বলেছে, দিদিমণি সেরে উঠে এখন অল্প অল্প কাজ করবে, একেবারে সেরে গেলে পুরোপুরি করবে। ছুটি চায় ছুটি পাবে।"

দিন কয়েক আরো কাটল। তারপর ধীরা বাড়ী ফিরে এল। চুলের রাশের নীচে দগ্‌দগ্‌ করতে লাগল নূতন ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু মানুষের চোখে আর সেটা ধরা পড়ল না। ভিতরের ক্ষতচিহ্ন লুকবার দরকার হ'ল না, তবে সেখানে দর্শক রইলেন শুধু মহাকাল।

সুবালার স্বামী মেয়ে বাড়ী আসার পরই কলকাতায় ফিরে গেলেন। কি যে ধীরার হয়েছিল তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। যশোদা অনেক কিছু বানিয়ে ব'লে দিল, কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। তবে নিরঞ্জনের আসা-যাওয়াটা সারাক্ষণই মানুষের চোখে পড়ত, সে যে আর একেবারেই আসছে না, ধীরার দারুণ অসুখের সময়েও আসে নি, এটা নিয়ে সকলেই আলোচনা করল।

সুবালা একদিন আড়ালে যশোদাকে ডেকে বললেন, "হ্যাঁ গো, বল না আমাকে খুকীর কি হয়েছিল? এরকম লাগল কি ক'রে?"

যশোদা ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলল, "সব্বনেশে কথা মা, শুনে কি করবে? আমি যাই মেয়ে তাই চুপ ক'রে

আছি দেখে-শুনে। বলি বাইরে বলে কি করব ঘরের কথা? দিদিমণি ত আত্মঘাতী হতে গিয়েছিল।"

সুবালা কপালে করাঘাত ক'রে বললেন, "হায় ভগবান্! কেন?"

যশোদা বলল, "ঠিক কি তা ত জানিনে মা। সেই যে সুন্দর মত ভদ্রলোক, যে দিদিমণিকে বাঁচিয়েছিল গাড়ির তলা থেকে, সে ত সারাক্ষণ আসত-যেত। বড় ভালবাসত দিদিমণি ওকে। হঠাৎ কিসের জন্যে রাগা-রাগি ক'রে সে চ'লে গেল জানি না। সেই রাত্রেই ত এই কাণ্ড।"

সুবালা ধরেই নিলেন যে নিরঞ্জন ধীরাকে ত্যাগ করেছে তার বিগত জীবনের ইতিহাস শুনে। এই ত পৃথিবীর নিয়ম।

আরও দিন কয়েক পরে তিনি ধীরাকে বললেন, "আমি এরপর তা হ'লে যাই মা। ওদিকে ঘর-সংসার সব ভেসে যাচ্ছে। ডাকিস্ যদি ত আবার আসব। সাবধানে থাকিস! ভগবানের ইচ্ছায় মানুষের মন ফেরেও ত কখনও কখনও।"

মা যে কি বলছেন তা ধীরা বুঝতেই পারল না। কার মন ফিরবে? কার দিকে ফিরবে?

সুবালা চলে যেতে বাড়ী একেবারে নীরব হয়ে গেল। বাড়ীঘর আবার আগের মত করার ঝোঁকে যশোদা দিনরাত ঝাঁটা চালাতে লাগল, কিন্তু অন্ধকার-টাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারল না। ধীরা আস্তে আস্তে আবার কাজকর্মে মন দেবার চেষ্টা করতে লাগল। বাইরের ডাক এলে মাঝে মাঝে তাও নিতে লাগল, যদিও শরীর দুর্ব্বল থাকায় খুব বেশী খাটুনি এখনই সহ্য করতে পারত না। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে ব'সে কি ভাবত সেই জানে। চোখ তার বাইরের দৃশ্য কিছুই দেখত না, কানও কিছু শুনত না, পাথরের মূর্ত্তির মত ব'সেই থাকত। ঘুম তার কিছুতেই হয় না, নিয়ম ক'রে ঘুমের ওষুধ খেতে হয় তাকে এখন।

চেহারা খানিকটা খারাপই হয়ে গিয়েছে। বর্ণের সে উজ্জ্বলতা আর নেই। কালো চোখ এখন দারুণ মর্ম্মবেদনারই পরিচয় দেয়। মুখ দেখে মনে হয় যেন আগুনের তাপে শুকনো ফুল।

বাড়ীর চিঠিপত্র মাঝে মাঝে আসে। মা লেখেন, নীরা লেখে। কখনও কখনও বোকামি ক'রে নিরঞ্জন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। হঠাৎ বহুকাল পরে বিভার একটা এসে হাজির হ'ল।

বিভা ব'লে যে জগতে কেউ আছে তাও ধীরা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। চিঠি প'ড়ে জানল, বিভা আবার বাপের বাড়ী চলেছে। তার সন্তান-সম্ভাবনা। মনের কথা বেশী কিছু লেখেনি, শুধু জানিয়েছে সে ভালই আছে, সময়ও কেটে যায় নানা কাজে। ঘরে ব'সে ভাববার সময় তার বেশী নেই।

সময় ত সকলেরই কাটে। এমন কি ধীরারও সময় কেটে যাচ্ছে। কোন্‌দিকে যাচ্ছে সে জানে না, কিন্তু কিছু ত একটা শেষ হয়ে আসছে? তার প্রায়শ্চিত্তের দিন? সে কি এ জীবনের শেষে আবার নারী হয়ে জন্ম নেবে? নিতে হবে যে, যদি না সব পাপের শাস্তি এ জন্মে শেষ ক'রে ভোগ করে যেতে পারে? তা যদি পারে তা হ'লে নূতন জন্মে আবার কাউকে কি ফিরে পাবে? কিন্তু ফিরে পেলেও সে কি ধীরাকে আর চিন্‌তে পারবে?

যশোদা নব-নিযুক্ত ড্রাইভারকে দিয়ে প্রায়ই নিরঞ্জনের খোঁজ করাত। উত্তরটা একই পেত। সাহেব এলাহাবাদে নেই, বাইরে বাইরে কাজে ঘোরেন। এক মাস পরে হয়ত আসবেন। বাড়ী এখনও ছাড়েন নি, সেখানে শুধু দরোয়ান আছে। সহকর্ম্মিণীরা, সহকর্ম্মীরা ধীরাকে খুবই পছন্দ করে। আমোদে-প্রমোদে যোগ দেওয়াবার জন্যে টানাটানি করে। ধীরা যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু সুখ আনন্দ সবই ত তার এ জীবনের মত শেষ হয়ে গেছে। কোনমতে টিঁকে থাকা, কোনো মতে দিন গুণে চলা। আশ্চর্য্য, একটা দেড়টা মাস আগের জগতটা তার একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল কি ক'রে? তারই মধ্যে সে সব পেল, আর সব হারাল?

মাঝে মাঝে নিজেকেই যেন সে প্রশ্ন করত যে সে এমন সৃষ্টিছাড়া কেন? সব মানুষের জীবনেই সুখ থাকে, দুঃখও থাকে। দুঃখটাই বেশীর ভাগ, আনন্দ কমই। তবু সকলে চলে ফেরে, কাজ করে, আমোদ-প্রমোদও করে। এমনি ক'রেই বেশীর ভাগ লোকের জীবন শেষ হয়। তার মত দুঃখ জগতে কি কেউ পায় নি? কেউ কি স্বামী হারায় নি, চিরবিরহ ভোগ আর কোন নারী কি করে নি?

করেছে অবশ্য, পৃথিবীতে অশ্রুসাগরের কূল কোথায় বা দেখতে পাওয়া যায়? কিন্তু ভগবান্ যা তাকে দিয়েছিলেন, তা যদি তিনিই ফিরিয়ে নিতেন, তা হ'লে এই দুঃসহ জ্বালা তার শোকের মধ্যে থাকত না। সে যে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী। সে নিজে ধ্বংস করেছে প্রাণাধিক প্রিয়কে! বহুকাল আগে পড়া একটা গল্পের কথা তার বারবার মনে হ'ত। স্বামীঘাতিনী এক রাজমহিষীকে

দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বিধান দিচ্ছেন হয় সহমরণে যেতে, নয় তুষানলে দগ্ধ হতে। ধীরা শেষেরটাকে বেছে নিল নিজের দণ্ড ব'লে।

এখন যদি নিরঞ্জন আবার ফেরে, আবার তাকে চায়? কিন্তু এ ত পাগলের স্বপ্ন। তবু যদি আসে তা হ'লে কি করে ধীরা? তার হাতে দিয়ে দেয় নিজেকে। সে আগে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখে এ ব্যাপারের মীমাংসা করতে চেয়েছিল, আজ সেটাকে ভুল ব'লেই জেনেছে। তার অধিকার ছিল না অন্যের জীবনের এত বড় জিনিষের মীমাংসা করতে যাওয়ার। নিজেকে দিতে তার যদি বাধা ছিল, তবে সে স'রে দাড়ায় নি কেন মানুষের চলার পথ থেকে? আলেয়ার আলো দিয়ে কেন প্রলুব্ধ করেছিল পথিককে? যে অন্যায় সে নিজে করল, তার শাস্তি অন্যকে দিতে গেল কেন? তার ত নিজেকে নিরঞ্জনের কাছে উৎসর্গ ক'রে এ অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিত ছিল। তারপর সে ধীরাকে তুলে নিত কি ঠেলে ফেলে দিত, সেটা সেই বুঝত। কিন্তু এখন আর ভেবে কি হবে?

কিন্তু নিরঞ্জন ত মৃত্যুনদীর পারে চ'লে যায় নি, এই পৃথিবীতেই বেঁচে আছে। তাকে খুঁজে পাওয়া কি যায় না, তার কাছে গিয়ে কি ক্ষমা চাওয়া যায় না? সে ত একেবারে নির্মম মানুষ ছিল না? আর তার ভালবাসায় ধীরা ত কোনদিন কূল দেখতে পায় নি। মহাসাগরের মত চারিদিক দিয়ে সে ধীরার জীবনকে ঘিরে ছিল। আজ কি ধীরার পাপে সে সাগরও শুকিয়ে গেছে?

কিন্তু বড় ভয় করে। আকাশের মত সুনীল বিশাল চোখ তার দিকে যখন তাকাত, ধীরার মনে হ'ত যেন দু'টি স্নেহের নির্ঝরের দিকে সে চেয়ে আছে। সেই চোখেই শেষের দিন সে ক্রোধের দীপ্তি দেখেছিল, একবার তাকিয়ে আর তাকাতে সাহস করে নি। খুব আপনার জন যখন পর হয়, তখন তার মত পর বিশ্বসংসারে কেউ থাকে না। অমৃতের সাগরও অদৃষ্টের দোষে গরল হয়ে যায়।

কিন্তু ধীরা বেঁচে থাকবে কি করে? সে যে সাধারণ মানুষের মত চিত্তবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি। নিজের মধ্যে নিজে যখন সে আবদ্ধ ছিল, তখন আকাশে মেঘ থাক কি রোদ উঠুক তাতে তার খুব এসে-যেত না। কিন্তু সূর্য্যমুখী ফুলের মত একবার ফুটে উঠে তার এ উদাসীনতা আর রইল না। বাঁচতে হ'লে তাকে ঐ আলোর উৎসের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে, না হ'লে শুকিয়ে ঝরে পড়তে হবে। শেষ চেষ্টা কি সে করবে না বাঁচবার জন্যে? লজ্জা ত্যাগ করতে হয় করবে, ভয় ছাড়তে হয় ছাড়বে। তার অভিমান? অভিমান করবার তার অধিকার কোথায়?

আবার যশোদাকে দিয়ে খোঁজ করাল। একই রকম উত্তর পেল।

হঠাৎ আর একজনের কাছে একটা কথা শুনে মনে হ'ল এখনি বুঝি সে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মরবে। চঞ্চলা ব'লে যে নার্স টি হাসপাতালের কাজ করত, সে এখন মধ্যে মধ্যে ধীরার সঙ্গে এসে কথা বলে। সকালবেলার কাজ শেষ করে ধীরা তখন বাড়ী ফিরবার জোগাড় করছে, চঞ্চলা ঘুরতে ঘুরতে এসে বলল, "শুনেছেন, নিরঞ্জনবাবুর গাড়িরও একটা accident হয়ে গেছে?"

কাছেই একটা চেয়ার ছিল, তাতে ধপ ক'রে বসে প'ড়ে ধীরা জিজ্ঞাসা করল, "কখন হ'ল? কোথায়? উনি নিজে কি চালাচ্ছিলেন? খুব কি লেগেছে?"

চঞ্চলা বলল, "দাদার কাছে ওঁর গাড়ির সেই Cleaner ছোকরাটা এসেছিল, ডাক্তারের জন্যে। গঙ্গার ওপারে, ব্রীজ পেরিয়ে যে বড় রাস্তাটা আছে, সেই রাস্তায় একটা লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। কতটা লেগেছে তাঁর বলতে পারল না। ওখানেরই একটা পুরণো ডাক-বাংলায় তুলেছে। ডাক্তার হয় গিয়েছে, নয় এখনি যাবে।"

ধীরা মাথা নীচু ক'রেই রাখল। তার চোখের দৃষ্টি যেন অন্য কেউ না দেখে এখন। আবার জিজ্ঞাসা করল, "ওঁর কাছে কে আছে?"

"কে আর থাকবে? ঐ ছেলেটাই ত শুধু থাকত ওঁর কাছে, সেই আছে।"

ধীরা আর কথা বাড়াল না। একরকম দৌড়তে দৌড়তেই বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল। যশোদা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে দিদিমণি? কি খবর?"

"খারাপ খবর, তুমি ড্রাইভারকে ডাক শীগ্‌গির।"

(ক্রমশঃ

—)(*)(—

"মোহন টঙ্গাওয়ালা"

আভা পাকড়াশী

—হেই চুঃ চুঃ ধীরে চল্ বেটা! এ…ই হঠো ভা…ই…য়া! আগ্রার সিকান্দ্রার পথে টঙ্গা চলেছে। রাস্তার ধারে প্রায় আধমাইল অন্তর একটি করে গম্বুজ বাড়ছে। টঙ্গাবালা তার যাত্রী গঙ্গাচরণবাবুকে এই গম্বুজ-রহস্য বোঝাচ্ছে। বলছে শাহেনশা আকবর বাদশা তখন রাজধানী দিল্লীতে আর তাঁর আসন্নপ্রসবা হিন্দু স্ত্রী রয়েছেন এই আগ্রার কিলায়। সেই তাঁদের প্রথম আওলাদ হবে। তাঁর গুরু, শেখ সেলিম চিস্তির দোয়াতে আল্লা পরবরদিগার তাঁকে রহম করেছেন কিন্তু কর্তব্য বড় কঠিন, আগে তিনি বাদশা, তারপর তিনি স্বামী বা পিতা। বাধ্য হয়ে তাই এই সময়ে রাজধানীতে গেছেন। সেই কারণে সড়কের ধারে ধারে আধমাইল দূরে দূরে ঐ উঁচা উঁচা গম্বুজ তৈরী হ'ল—ওর ওপর থাকবে বিরাট আকার ঢাক। ছেলে হলে তিনবার আর মেয়ে হ'লে দু'বার করে সেই ঢাকে জোরে জোরে ঘা পড়বে। সেই আওয়াজ শুনে আধমাইল দূরের অন্য ঢাকিও বোল তুলবে, এমনি করে একেবারে রাজধানীতক ঐ আওলাদ হবার বিলকুল ঠিক খবর পৌঁছিয়ে যাবে। এহি ছিল দেশী টেলিফোন বাবুজী! আরে বাবুজী, আমার না হয় আওলাদ নেই কিন্তু আমি তো আবার কারুর আওলাদ! বাপের যে ছেলের জন্য কি পরিমাণ দিল দুখায় তা কি আর আমি জানি না! আপনি কিছু ফিকর করবেন না, আরামসে আগ্রা শহর দেখতে দেখতে চলুন। দেখবেন হঠাৎ আপনার আওলাদ আপনার আঁখের সামনে এসে খাড়া হয়ে গেছে। তখন আপনি একিন মানবেন যে মোহন টঙ্গাওয়ালা বাজে বকওয়াস করে না। তবে এ বাৎ তো পাক্কা যে আপনার ছেলে আগ্রাতেই এসেছে!

গঙ্গারামবাবু বলেন—হ্যাঁ বাবা, তার বন্ধু তো ফিরে গিয়ে সেই কথাই বললে। সেও ত ওর সঙ্গেই ছিল।

ঠিক আছে। কোই বাত নেই! ঐ দেখুন, সিকান্দ্রা দেখুন, আকবর বাদশার সমাধি! আরে ঐ শাহজাদা সেলিমকে তিনি কত পেয়ার করতেন! তবুও ত সে তাঁর ওপর চড়াও হয়েছিল! বিদ্রোহ করেছিল। ঐ একই কারণ, জওয়ান আওলাদ বাপের আঁখ গরম সইতে পারে নি। আরে বাবুজী, আপনিও ত একদিন জওয়ান ছিলেন। এ…ই…হঠো…হঠ…যাও! সাবাস বেটা মোতী।

লপ্ লপ্ লপ্ লপ্ ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে একটানা—তার সঙ্গে গঙ্গাচরণবাবুর চিন্তার স্রোত বইছে। হ্যাঁ, তিনিও একদিন যুবক ছিলেন, তবে তাঁরা ঐ বয়সে স্বদেশী করেছেন, গান্ধীজীর কথা মত খদ্দর পরেছেন কিন্তু প্রাণ দিয়ে নিজের সততা রক্ষা করেছেন। কখন বাবার অবাধ্য হন নি, মন দিয়ে পড়াশুনো করেছেন কিন্তু তাঁরই ছেলে কি না পরীক্ষার ফিস না জমা দিয়ে সেই টাকা নিয়ে… বাবুজি! আপনি ত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মন মানুষ আছেন তো পূজাপাঠ না করে বোধ হয় নাস্তা করেন না, হোটেলে ত আপনার চলবে না? চলবে! গঙ্গাচরণবাবু অনিচ্ছার সঙ্গেই সম্মতি দেন, বলেন—চলবে, বাবা চলবে, কি আর করব বল! ক'দিন থাকতে ত হবে! মনে মনে ভাবছেন, এই অবাঙ্গালী টাঙ্গাওয়ালা এত সব জানল কি করে! সত্যিই ত, সেই কাল দুপুরে গাড়িতে চেপেছেন, বাড়ীর খাবার তো রাতেই খেয়ে নিয়েছেন—তখন আবার বেলা দুপুর হতে চলল—একটা লাল রং-এর গেট পেরিয়ে বাগান-ঘেরা মস্ত একটা কম্পাউণ্ডে টাঙ্গা ঢুকল, সামনেই একটি বড় একতলা বাড়ী। গঙ্গাচরণবাবু বললেন, এটা কোন্ হোটেল বাবা!

—চল, বেটা চল, বলে ঘোড়াকে দুটো থাপ্পড় মেরে টঙ্গা থামাতে থামাতে মোহন বলে, আপনার ভয় নেই বাবুজী! এও হিন্দু ব্রাহমন মুকুর্জ্জিবাবুর হোটেল—কিন্তু নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে "অ্যাডভোকেট কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি"। চলে আইয়ে বাবুজী, বলে তাঁর সতরঞ্চি মোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা বিছানা আর স্যুটকেশটা কাঁধে তুলে নিয়ে সেই ছ' ফুট লম্বা বিরাট দেহ মোহন টঙ্গাওয়ালা বারান্দার ওপরেই একটা বড় ঘরে গিয়ে ঢুকল, সেখানে ধুতি আর ফতুয়া পরে একজন দীর্ঘদেহ সৌম্যদর্শন

বৃদ্ধ সামনে একটি মস্ত টেবিল নিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর সামনেও আবার অনেকগুলি চেয়ার, ঘরটি লোকে ঠাসা। মোহনের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তাঁর জিনিষগুলি একপাশে নামাল, তারপর বলল, এই বাবুজী‌ভি বিলকুল তোমার তারা ব্রাহমন আছে এখানে থাকবে, সামকো আমি এসে এনাকে শহর দিখ্‌লাতে নিয়ে যাব।

ব্যস, একলাফে বাইরে গিয়ে আবার সে তার টঙ্গায় বসে মোটি, চল্‌ বেটা চুঃ চুঃ করতে করতে টঙ্গা ঘুরিয়ে নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ভদ্রলোকটি ডাকলেন—দেওকীনন্দন!

মস্ত পাকা গোঁফ নিয়ে ময়লা কামিজ গায় বোধ হয় চাকর বা চাপরাশী এসে দাঁড়াল, তাকে দেখেই ঘরের একজন লোক বলল, পাঁড়েজী, এক গিলাস পানি পিলানা ভাইয়া!

তিনি তাকে বললেন, বাবুজীকো অন্দর লে যাও, গোসলখানা দিখলা দেও।

আর গঙ্গাচরণবাবুকে বললেন, আপনি ওর সঙ্গে ভেতরে গিয়ে স্নান-আহ্নিক সেরে নিন। আমারও কাজ শেষ হয়ে এল, এবার উঠব।

মস্ত বাড়ী। চমৎকার ব্যবস্থা। পাঁড়েজীই সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে চলে গেল। অন্দরে খানিকক্ষণ পরে এসে বলল, খানা খাবেন, চলুন এবার।

রান্নাঘর, তার পাশেই মস্ত খাবার ঘর, একেবারে বাঙ্গালী ধরণে আসন পেতে বসে কাঁসার বাসনে খাবার ব্যবস্থা। উঠোন পেরিয়ে ওদিকের দালানের কোণে ঠাকুরঘর—সেখানে রাধাশ্যামের বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে। একটি লজ্জানম্র সুশ্রী বধূ তাঁদের পরিবেশন করছে। সেই ভদ্রলোকটি আর তিনি পাশাপাশি আসনে খেতে বসেছেন। খাবারগুলি খুবই সুস্বাদু কিন্তু পদগুলি সবই নিরামিষ। তিনি গঙ্গাচরণবাবুকে প্রশ্ন করে করে তাঁর আগ্রায় আসার কারণ, কলকাতায় কিসের কারবার সবই একে একে জেনে নিলেন। গঙ্গাচরণবাবু বুঝলেন যে কৌলুলী বটে, তবু বিনয় করেই বললেন যে, এই বিদেশে এসে আপনার মত একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ যে দেখতে পাব এত আমার কল্পনাতেও ছিল না, আপনার সাহচর্য্য পাওয়াও পুণ্য! তা আপনি কি ব্রাহ্মণ যাত্রী ছাড়া আর কাউকে আপনার যাত্রী নিবাসে··· !

কি বলছেন মশাই! মাঝপথেই তিনি গঙ্গাচরণ বাবুকে বাধা দিয়ে বললেন, এ আমার নিজের বাড়ী। ঐটি আমার বউমা, কলকাতার মেয়ে। ঐ মোহনের উৎপাতে! না করতে ত আর পারব না। শাসিয়ে রেখেছে যে! ওর যাকে ভাল লাগবে তাকে এমনি করে আমার কাছে দিয়ে যাবে। তাই ব্যবস্থাও রাখতে হয় মশাই। যাক, আমার আবার কাছারির বেলা হয়ে যাচ্ছে, রাত্রে খেতে বসে আবার গল্প হবে'খন। তবে মোহন যখন কথা দিয়েছে আপনি নিরাশ হবেন না, ধরে আনতে না পারলে আপনার ছেলেকে বেঁধে আনবে দেখবেন।

গাড়ির ক্লান্তিতে আর দুপুরের গুরুভোজনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন গঙ্গাচরণবাবু। হঠাৎ শেকলটা অত জোরে নড়ে উঠতে আতঙ্কে উঠে বসলেন। দেখলেন সেই ছিটের কামিজ পরে পাগড়ি মাথায় চাবুক হাতে মোহন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে—বলছে, চলিয়ে বাবুজী, সাম হো গিয়া। শহর দেখবেন না! এখনো ত আগ্রার তাজই দেখেন নি!

তিনি কি করবেন আগ্রার তাজ দেখে! তাঁর এখন ওসব দিকে মনই নেই! কিন্তু এ বাড়ীর কর্তার কথাটি তাঁর এখন মনে পড়ল—"মোহনের উৎপাত," তাঁরও ওকে এড়িয়ে যাবার পথ নেই, ও যা বলবে তাইই করতে হবে—না হলে এই অচেনা শহরে কোথায় তিনি তাকে খুঁজবেন!

টাঙ্গায় চড়ে চলেছেন—একেবারে অলিগলি দিয়ে টাঙ্গা চলেছে—কোথায় যেন কে ঘুঙুর পায়ে নাচছে, কে যেন তবলা বাজাচ্ছে! গলিতে খুব রোশনাই, আয়না-লাগান ঝকঝকে পেতলের সাজ-বসান পানের দোকান, সারি সারি সব মেঠাইয়ের দোকান, কুমড়োর পেঠা আর ডালমুট থরে থরে সাজান রয়েছে, কত রং-বেরংএর গালচে! খুব খোসবাই ছাড়ছে আতরের আর ফুলের। হে···ই···সাব···হান করে তার মধ্যে দিয়েই ভীড় কাটিয়ে কাটিয়ে টাঙ্গা চালাচ্ছে মোহন, বলছে ঐ পেঠা আর ডালমুট হ'ল আগরার মশ্‌হুর চিজ, বুঝলেন বাবুজী! এবার সুরু হ'ল পাথরপট্টি, কত রকমারি সব শ্বেতপাথরের জিনিষ! ছোট্ট তাজমহল থেকে মস্ত মস্ত টেবিল ল্যাম্প পর্যন্ত! এবার চাবুকটা তুলে বলল, ঐ দেখুন বাবুজী তাজমহল এসে গেছে।

মাঝখানে জল, দু'ধার দিয়ে বাঁধান পথ সামনে শ্বেতমর্মরের বিরাট স্বপ্নসৌধ "তাজমহল"! সম্রাট সাজাহানএর অমর কীর্তি। কিন্তু সামনের বেঞ্চিতে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে! ঐ ত! চেঁচিয়ে

ডাকতে যান—খোকা! তার আগেই মোহন তাঁর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে, বলছে—চলে আসুন বাবুজী! ব্যস! শুধু এই পহ্‌চানটুকু চেয়েছিলাম। আমি যে গলত আদমীর পিছা করছি না এইটাই মালুম কর'ার জন্ম আপনাকে তকলিফ দিলাম।

কিন্তু বাবা, ও যদি এখান থেকে আর কোথাও পালিয়ে যায় আবার!

ঐ জন্মই ত আপনার সকল পর্যন্ত ওকে দেখতে দিলাম না। কি করে ওর মালুম হবে যে আপনি এখানে এসেছেন! আপনি বেফিকর থাকুন। তিন রোজ বাদে ও আপনিই বাড়ী ফিরে যেতে পথ পাবে না। আবার সেই গলির মধ্যে দিয়ে টাঙ্গা চলেছে—যত বা লোক তত বা দোকান! ওরই মধ্যে একটুখানি ফাঁকা জায়গা! টাঙ্গাটা নিয়ে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়ে মোহন বলল, বাবুজী আপনাকে আমি একটু তকলিফ দেব। পাঁচ মিনিট এসে আমার ঝোঁপরিতে বসুন, আমি আমার খানা খেয়ে নিই, আজ এক রোগীকে বহুত দূর নিয়ে যেতে হবে। ঘোড়ার পিঠে দুটো চাপড় মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে ডাকল, এ···ই বাসন্তীয়া, এঃ নবাব কি বেটা! টঙ্গার ঘন্টি শুনে বাহার হয়ে আসবি ত! ভেতর থেকে তেমনি ঝঙ্কারে জবাব এল, তু কান নবাব! একটু দের সয় না! তুহাঁর লাগি ত রুটি বানাওত হ্যায়েন।

আরে কুর্সি লা! সাথ মে বাবুজী হ্যায়েন!

কৌন বাবুজী, হামারে বাবুজী!

একটি স্বাস্থ্যপুষ্ট ছাপা শাড়ী আর কাঁচের চুড়ি পরা এ দেশীয় মেয়ে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার নিয়ে বেরিয়ে এল।

মোহন ভেঙ্গিয়ে উঠল, হাঁঃ, তোহার বাবুজী! উতনা খুশ কিসমত হ্যায় কা তুহার!

গঙ্গাচরণবাবু মাটির দাওয়ায় একপাশে বসে আছেন, অন্তপাশে উবু হয়ে বসে একটা কলাইকরা পেতলের থালা থেকে মোটা মোটা রুটি দই আচার ডাল আর কড়া করে মশলা দিয়ে রাধাঁ শুকনো মাংস খাচ্ছে মোহন। এবার এক ঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিয়ে উঠে পড়ে বলল, তু ভি খালে যা! আজ হাম নাই লৌটব!

বৌটির পরিপুষ্ট হাতে উল্কি আঁকা—থালা বাসন তুলতে তুলতে বলল, কাহে!

মোহন ততক্ষণে ঢেকুর তুলে টাঙ্গায় গিয়ে বসেছে।

রাত্রে তিনি খেতে বসেছেন। একটু আগেই বিগ্রহকে কর্তা স্বয়ং শয়নে দিয়েছেন। এখন সেই দুপুরের মত পাশাপাশি আসনে বসেছেন তাঁরা, এবেলা লুচি, তরকারি পায়েস সবই ঐ রাধাশ্যামের প্রসাদ। সেই সুন্দরী বৌটিই পরিবেশন করছে। কর্তা বড় গম্ভীর! খাওয়া প্রায় শেষ করে তবে কথা বললেন—জিজ্ঞেস করলেন, কি! কিছু হদিস পেলেন?

যা ঘটেছিল, সব কথাই বললেন গঙ্গাচরণ। উনি বললেন, ঠিক আছে। তবে ত পেয়েই গেছেন ছেলেকে। কি করবেন বলুন! আজকাল যুগের হাওয়াই বদলে গেছে। না হ'লে দেখছেন না! আমি এক মোহনকে পুজো করি আর অন্ত মোহনের জুলুম সহ্য করি! রাধে-শ্যাম! রাধেশ্যাম! চলুন, উঠে পড়ি।

দু'দিন হয়ে গেল মোহনের আর দেখা নেই। তিনি ত রাজার হালে আছেন, দেবতার ভোগ খাচ্ছেন কিন্তু অন্তরে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছেন না, অর্ধাঙ্গিনীর কথা ভেবে আরও অস্থির হচ্ছেন। তবে এ বাড়ীর কর্তা তাঁর সঙ্গে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করছেন, যেন সমব্যথী পেয়েছেন। সেদিন সকালে উঠতেই তিনি বললেন, আপনি সমানে ভাবছিলেন, দেখুন মোহন সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে—এই নিন কলকাতার জন্ম দুখানা রেলের টিকিটও কেটে দিয়ে গেছে। আজই দুপুরের গাড়িতে আপনি আপনার ছেলে নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন। আপ্‌সে আসবে। কাল অনেক রাত্রে এসে বৌমার কাছে সব বলে গেছে। ঐটুকু পেয়েই রাধারাণীর মুখখানি আমার ঝলমল করছে। রাধেশ্যাম! রাধেশ্যাম! করতে করতে খড়ম পায়ে স্নান করতে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক পরম বৈষ্ণব তাই বৌমাকে ডাকেন রাধারাণী! কিন্তু একটি টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে তাঁর বৌমা অত রাত্রে কথা বলেছে, আবার সেই জন্ম তার মুখ খুশীতে ঝলমল করছে! কোথায় যেন একটা ধাঁধা লাগে গঙ্গাচরণবাবুর। ক'দিন নিজের ছেলের কথা ভেবে এতই অন্যমনস্ক ছিলেন যে কোন কিছুই তিনি তলিয়ে বোঝেন নি। ঐ মোহন টাঙ্গাওয়ালার এত কিসের জোর! তবে কি সে বৌটিকে কোন মস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল! ভদ্রলোকের বৌমাটি এখানে, কিন্তু ছেলেটি কোথায়! নিজেই নিজের কথা সাত কাহন বলেছেন—ওঁর কথা ত কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি! স্নান আহ্নিক সারা হতেই দেওকীনন্দন পাঁড়ে এসে দাঁড়াল—বলল, বহুয়া বলছেন, আপনার সামান সব ঠিক করিয়ে

রাখেন, মোহন ভাইয়া এক্ষুনি টাঙ্গা নিয়ে আসবে। তারপর বাবুজীর কামরায় চালিয়ে যাবেন।

কিইবা জিনিষ গঙ্গাচরণবাবুর, তবু সব ঠিকঠাক করে রেখে গেলেন কৃষ্ণধনবাবুর ঘরে। এখনও মক্কেলরা কেউ আসে নি। তাঁকে বললেন, বসুন দাদা, বসুন! আপনি ছিলেন ক'টা দিন তবু বাড়ীর গুমোটটা একটু কেটেছিল। মোহনটাও বার কয়েক এসেছে, আবার হয়ত ডুব মারবে, তাই বলছিলাম ছেলেকে এবার বুঝে-শুনে শাসন করবেন। উত্তরে গঙ্গাচরণবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপারটি বলুন ত! ঐ টাঙ্গাওয়ালা মোহন!

ঐ শাসনের ফল! জোর করে ভাল ঘরে বিয়ে দিলাম। দেখেছেন ত লক্ষ্মী প্রতিমার মত বৌমা আমার! কিন্তু মোহনের মন উঠল না।

গঙ্গাচরণবাবুর চোখের ওপর সেদিনের সেই সন্ধ্যেবেলার দৃশ্যটি ভেসে উঠল। আশ্চর্য হয়ে বললেন, কিন্তু ওর ত!

হ্যাঁ জানি। একটি পশ্চিমা মেয়েকে ও বিয়ে করেছে। ওখানেই সে থাকে। টাঙ্গা চালিয়ে বেড়ায়। বললে বলে—মেহনতের পয়সাই হ'ল পয়সা। কাজের আবার জাত আছে না কি!

—তা ওকে কি আপনি পুষ্যি নিয়েছিলেন!

গঙ্গাচরণবাবুর এই দ্বিধাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণধনবাবু বলেন—আরে না না—ও আমার একটিমাত্র সন্তান। সাত বছর বয়সে কুম্ভমেলায় হারিয়ে যায়। ঐ টাঙ্গাওয়ালাদের কাছেই মানুষ হয় ও। আবার ওর যখন আঠার বছর বয়স তখন একদিন ফল বিক্রি করতে এসেছিল আমাদের বাড়ী, তখন বাংলা হরফে মোহন লেখা ওর হাতের ঐ উল্কি দেখে ওর গর্ভধারিণী ওকে চিনতে পারেন। হারান ছেলেকে বহুকাল পরে বুকে ফিরে পেলাম। নিজেদের ধারায় মানুষ করতে চাইলাম। কিন্তু ওর স্বভাব বদলাল না। ঐ ধরণের জীবনযাপন ওর অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেছে। ভাবলাম বিয়ে দিলে বাঁধা থাকবে, কিন্তু নাঃ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, বউমার শুকনো মুখ দেখে দেখে বুকটা ফেটে যায় আমার! এমন সময় দূরে শোনা গেল টাঙ্গার ঘন্টি আর মোহনের—চুঃ চুঃ।

গঙ্গাচরণবাবুকে নিয়ে চলেছে মোহন! তিনি আর থাকতে না পেরে বললেন তুমি এত বুদ্ধিমান, পরোপকারী ছেলে, তবে কেন বাবা তুমি নিজের বাবার মনে এত কষ্ট দাও! তোমার সুন্দরী বিবাহিতা স্ত্রীর চোখের জল ফেলাও। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মোহন বলে, কে জানে কেমন যেন পানসে লাগে ওকে আমার! যেমন ও বাড়ীর রান্না! তেমনি আমার জরু, সব নিরামিষ। ওবাড়ীর 'রাধেশ্যাম', আমার পিতাজী—আমার স্ত্রী, ইয়ে সব আমার কাছে একদম এক। আমি এদের জান দিয়ে ভক্তি করি, উঁচা ভাবি, কিন্তু কখনই আপনা ভাবতে পারি না বাবুজী! তার চেয়ে আমার বাসন্তীয়া ভাল। তার সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটিও করি, সেও সমানে তুরন্ত জবাব দেয়। কিন্তু রোটি-গোস্ত বড় বড়্‌ ঢিয়া বানায় বাবুজী! ও উত্তরপাড়ার মেয়ে তা কাস্মিনকালেও পারবে না। এবার একটা গলির মধ্যে টাঙ্গা ঢুকল। সামনেই মস্ত একটা ধরমশালা। মোহন বলল—নামুন বাবুজী! সিধা দু'তলায় চলিয়ে যান—ওখানে আপনার হারানিধি, আপনার আওলাদ আছে। উনি বললেন—তা এই টাকাটা ধর, রেলের টিকিটের দাম! ও বলে—আরে আমি ত এখানেই আছি। আপনি যান না বাবুজী!

গঙ্গাচরণবাবু মোহনের কথায় দোতলায় গিয়ে দেখলেন কয়েকজন লোক একটা ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁকে দেখেই তারা চোখ পাকিয়ে সোরগোল করে উঠল, বলল, আপনি কে আছেন এর! আমাদের পাই পয়সা শোধ না করে দিলে এ ঘরে ঢুকতে পারবেন না। এই বাঙ্গালী ছোকরা বাবু আমাদের টাকা মেরে দিয়েছে। কেউ বলল, ও আমার দোকানের পুরী খেয়েছে বাবুজী, দাম দেয় নি। কেউ বলল, রাজাসাহেব আমার টাঙ্গা চড়ে সফর করেছেন, কিন্তু ভাড়া দেন নি। তিনি তখন দরজার বাইরে থেকেই ডাকলেন, খোকা! অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে শুকনো মুখে উঠে এসে অবাক হয়ে সে বলল—বাবা, তুমি! তুমি এসেছ? এবার তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল—আমায় তুমি মাফ কর বাবা! লোকগুলো ভেজিয়ে উঠে বললে—মাফ কর! পহলে পয়সা নিকালো! উত্তরে সে বলল, বিশ্বাস কর তোমরা আমার কাছে পাই পয়সা নেই। ওরা তাঁকে বলল, জুয়া খেলে সব হেরেছে বাবু! ইয়ে লড়কা বড়া শয়তান! তিনি তখন ওদের যা প্রাপ্য, সব মিটিয়ে দিয়ে ছেলের সঙ্গে নীচে এলেন, ইচ্ছে মোহনের টাঙ্গায় এবার ষ্টেশনে যাবেন। কিন্তু কোথায় বা মোহন! আর কোথায় বা তার টাঙ্গা! এদিকে গাড়ির সময় হয়ে এলো।

ষ্টেশনে গিয়ে গাড়িতে বসে ছেলের কাছে যা শুনলেন তাতে বুঝলেন এ সবই মোহনের কারসাজি, সেই ওকে জুয়ো খেলিয়ে সর্ব্বস্বান্ত করে দিয়ে তারপর ধারে খাইয়েছে, টঙ্গায় চড়িয়েছে শেষে দেনদার সাজিয়ে ঘরে আটকে রেখেছে। এবার গার্ড হুইসিল দিল, ট্রেন ছাড়বে। এমন সময় দেখলেন মাথায় পাগড়ি, বগলে চাবুক, দীর্ঘদেহ মোহন টঙ্গাওয়ালা হাতে একটা মস্ত কাগজের বাক্স নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। এবার সেই চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাক্সটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আগ্রার মহ্‌সুর, পেঠা আর ডালমুট বাবুজী, বাড়ীর জন্ত কিছু লিয়ে যান। খোকাকে বলল—সেলাম ভাইসাহেব, আবার তসরিফ লিয়ে আসবেন। গাড়ি ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মোহন টঙ্গাওয়ালার দীর্ঘদেহ দূরে মিলিয়ে গেল। যত বড় দেহ ঠিক তত বড়ই মন ঐ দেহে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে মোহন। জুয়োতে জেতা টাকায় সে টিকিট কিনে দিয়েছে; আর বাকি টাকায় এই মিষ্টির বাক্স। ওর কল্যাণ কামনায় মনে মনে ওরই বাড়ীর রাধে-শ্যামকে প্রণাম করলেন গঙ্গাচরণবাবু।

আনন্দ তবুও আছে

মনোরমা সিংহরায়

বৈশাখের রৌদ্র দাহ যতো তাপ আনে
আনুক না। কোনো ভয় কোরো না কখনো।
তারই মাঝে গভীর প্রশান্তি আছে জেনো,
একদিন আসবেই নেমে প্রচ্ছন্ন প্রশান্তি সেই
বর্ষাধারায়।
আমার সময় নেই। যেতে হবে দূরে বহু দূরে
এ জীবনে বিশ্রাম কোথায়।
বাতাস সুগন্ধ আনে মালতী কুঞ্জের, স্বর্ণচাঁপা ফুটে আছে
অজস্র বিলাসে।
নীলাকাশে খর রৌদ্র যতো তাপ আনে
একদিন ভুলে যাবো জানি।
সত্য শুধু পথ পরিক্রমা। জীবনের আনন্দ সেখানে।
ঋতুর বদল হয় বার বার, জীবনেরও রূপ বদলায়।
হেঁটে হেঁটে একদিন সব পথ শেষ হয়ে যায়,
আনন্দ তবুও আছে। সেই কথা
এ হৃদয় জানে।

শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু

শোভনা গুপ্ত

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অবলা বসু—বাংলার ব্যক্তি, সমাজ, সংসার ও দেশ-জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ইঁহাদের দুইটি মিলিত জীবন, যেমন ব্যক্তিগতভাবে সুন্দর ও শ্রীসুষমা-মণ্ডিত, তেমনি সমাজ ও দেশের সঙ্গে কর্ম্মযোগে ইঁহাদের বাইরের জীবনটিও মহৎ ও আড়ম্বরশূন্য। তাই ঘরে-বাইরে যে দিক দিয়ে ইঁহাদের বিষয় ভাবতে যাই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি অতি সুন্দর সংযত সহজ মহৎ জীবনের কথা চোখের সামনে ভেসে উঠে। সংসার-জীবনে কর্ম্ম-জীবনে সর্ব্বদাই যেন অনাবিল, সুন্দর ও কল্যাণশ্রীর প্রকাশ দেখতে পাই। সংসারও তুচ্ছ নয়, বিবিধ কল্যাণ-কর্ম্মও তুচ্ছ নয়—সব কর্ম্মই যথোচিত শ্রদ্ধা, সংযম ও মঙ্গলচিন্তা নিয়ে শ্রীসম্পন্ন করাই যেন একমাত্র কর্ত্তব্য। ইঁহাদের জীবন ও কর্ম্ম দেখে মনে হয় গৃহজীবনও কি সুন্দর ও মহৎ হতে পারে এবং দেশের কল্যাণকর্ম্মেও নিজেদের জীবনকে কি ভাবে সার্থক করে তোলা যায়। আজ মনে হয়, আশৈশব এই দুইটি মহৎ জীবনের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ লাভ হওয়ায় যে স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি তাও পরম সৌভাগ্য। কি ভাবে এই সুযোগ লাভ করা গেল তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া গেল।

আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা বসু ও মোহিনীমোহন বাবুর স্ত্রী সুবর্ণপ্রভা বসু ছিলেন জগদীশচন্দ্রের দুই বোন এবং আমাদের পিতা ছিলেন আনন্দমোহনদের মামাত ভাই। পিতার কর্ম্মস্থল ছিল শিলংএ, সেখানেই তিনি সপরিবারে থাকতেন। শিশুকালেই আমরা মাতৃহীন হই। মোহিনীমোহন বসুর বিধবা পত্নী সুবর্ণপ্রভা আমাদের দুই বোনের ভার লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বাবাকে চিঠি দেন এবং ১৯০৭ সালে আমরা শিলং হতে কলিকাতায় এসে সুবর্ণপ্রভার কাছে প্রতিপালিত হই।

আনন্দমোহন বসু ও জগদীশচন্দ্র অনেককাল একই বাসায় ছিলেন। আনন্দমোহন বসুর সন্তান ছিল, অপরদিকে জগদীশচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। আনন্দমোহন, জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং আদর করে "অবু" বলে ডাকতেন। একদিন আনন্দমোহন বলেছিলেন, "অবু, তোমার সন্তান নাই, দুঃখ করিও না। আমার সন্তানরাই তোমার সন্তান।" ১৯০৬ সালে ভগ্নীপতি আনন্দমোহন অসুস্থ হয়ে জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে চলে আসেন এবং এই বাড়ীতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অবলা বসুর তত্ত্বাবধানে ও আদর-যত্নেই আনন্দমোহনের সন্তানরা বাস করতে থাকেন। জগদীশচন্দ্র ও তাঁর ভগ্নীপতি মোহিনীমোহনের বাড়ী পাশাপাশি একই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ছিল এবং তাহাদের দু'বাড়ীর খাওয়া-দাওয়াও একই সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতেই হ'ত। মাতৃহীন আমরা শিশু অবস্থাতেই এই মস্ত বড় অথচ অতি সুশৃঙ্খল পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়ি।

জগৎবিখ্যাত জগদীশচন্দ্রের কাছে অনেকেই আসতেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানাকে আমরা দেখেছি। এঁরা ছিলেন জগদীশচন্দ্রের প্রিয় বন্ধু। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা অনেক সময়ই তাদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতেন এবং ফিরে এসে তাঁদের বাড়ীতেই আহার করতেন। অবলা বসুর তত্ত্বাবধানে বৃহৎ সংসারের ব্যবস্থা, অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন—সমস্তই এত সুচারুরূপে ও শান্তভাবে সম্পন্ন হয়ে যেত যে, এখনও ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। অবলা বসুর চরিত্রের মধ্যে এমনই একটা স্থির ভিত্তি ছিল যে, কিছুতেই তিনি যেন বিচলিত হতেন না। সুখ ও আনন্দের দিনে যেমন, তেমনি তাঁর এই শান্ত অটল ভাবেরই পরিচয় পাই, অতি অল্প-দিনের মধ্যেই আনন্দমোহন বসুর পর পর তিনটি কন্যার পরলোক গমনের দুঃখের দিনেও। অবলা বসু ও মোহিনীমোহনের স্ত্রী সুবর্ণপ্রভাকে এই সুখ দুঃখ সব অবস্থাতেই পরস্পরের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীরূপে দেখেছি। অবলা বসু যখন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যেতেন তখন সুবর্ণপ্রভাই এই বৃহৎ পরিবারের তত্ত্বাবধান করতেন।

আর একটা ঘটনায়ও অবলা বসুর চরিত্রের স্থির

অটল শান্তভাবের পরিচয় পাই, তা আজও মনকে মুগ্ধ করেই রেখেছে। ঘটনাটা ঘটে আমার ছোট বোন রেখার বিবাহের ক'দিন আগে ও বিবাহের দিনে। এই সময়ে সুবর্ণপ্রভা অসুস্থ হওয়ায় রেখার বিয়ের ভার অবলা বসু গ্রহণ করেন। বিবাহের কয়দিন আগেই সুবর্ণপ্রভার বড় ছেলে ডাঃ অজিতমোহন সপরিবারে দার্জিলিং হতে কলকাতায় আসেন। বিবাহের দু' চারদিন পূর্ব্বে অজিতমোহনের দ্বিতীয় সন্তান পার্থ এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। অজিতমোহনের স্ত্রী মায়া বসু (অবলা বসুর ভাইঝি) ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দার্জিলিংএ চলে যান। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনার মধ্যেও অবলা বসুকে বিবাহের সব ব্যবস্থা অতি সংক্ষেপেই সম্পন্ন করতে হয়। সুবর্ণপ্রভা অসুস্থ ছিলেন, তিনি আরও কাতর হয়ে পড়লেন। বিপদের পর বিপদ, বিবাহের দিনে বিবাহের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই দারুণ ঝড়-বৃষ্টি হয়ে বিবাহ আসর জলে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কোথায় বিবাহ-কার্য্য সমাধা হবে তাই চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্ত্তব্যে অটল, অদ্ভুত শান্ত, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না অবলা বসু অতি দ্রুত নিজের বাড়ীর নীচের তলার দুটো ঘর খালি করে বিবাহের আয়োজন করে দেন এবং সকল কাজই শান্তভাবে সুসম্পন্ন করে তুলেন।

সকল অবস্থাতেই তাঁকে স্থির ধীর দেখে কেবলই মনে হয় তিনি যেন অন্তরের অন্তস্থলেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিজেকে অটল ও স্থির রাখতেন। এই জন্যই তাঁর জীবনের প্রধান ও প্রথম কাজ স্বামী সেবা ও দেশ-সেবার কাজের কোনদিন কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই।

অবলা বসু সর্ব্বদাই স্বামীর সঙ্গে দেশে বিদেশে যেতেন। একবার কেবল বারদিনের জন্য, নিজের শরীর খুব অসুস্থ হওয়ায়, যেতে পারেন নাই। বিদেশ থেকে ফিরে আসবার সময় বাড়ীর প্রতিজনের জন্য কিছু-না-কিছু সুন্দর দ্রব্য আনতে ভুলতেন না। তাঁর প্রথম দেওয়া জাপানী পুতুল, যে রকম পুতুল আগে কখনো দেখি নাই, পেয়ে যে কি আনন্দ হয়েছিল, আজ এত বৎসর পরেও ভুলতে পারি না। এমনি ছিল তাঁর স্নেহমাখা স্বভাব। জগদীশচন্দ্রও স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে আদর ও খোঁজ-খবর নেওয়া তাঁর স্বভাবের এক বিশেষ দিক।

জগদীশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী প্রতিদিনের কাজকর্ম প্রার্থনার মধ্য দিয়া আরম্ভ করতেন। সকালে অবলা বসুর গান শুনতে পেয়ে, গিয়ে দেখেছি, যে, তাঁহারা দু'জনে বসে গান ও উপাসনা করছেন। সকালে তাঁদের প্রথম ও প্রধান কাজই ছিল এই। উপাসনার পর তাঁহারা একই সঙ্গে বসে চা পান করতেন। চা পানের পর জগদীশচন্দ্র নিজের কাজে চলে যেতেন। অবলা বসু সংসারের যাবতীয় খুঁটি-নাটি কাজ সেরে, স্নান করে, সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে বাজারে যেতেন। ফিরে রান্নাবান্নার ব্যবস্থাদি দিয়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে চলে যেতেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। খাবার সময় বাড়ী ফিরে এসে স্বামীর খাবার নিজের হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে তাঁকে খেতে ডাকতেন ও নিজে পাশে বসে খেতেন। জগদীশচন্দ্র নিজের কাজে এতই তন্ময় থাকতেন, যে, কি খেলেন না খেলেন কিছুই খেয়াল থাকত না। আপন-ভোলা মানুষ ছিলেন বলিয়া জগদীশচন্দ্রের, সুখ-সুবিধা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, খুঁটি-নাটি সব বিষয়েই অবলা বসু সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে অবলা বসু ১৯১০ সাল হ'তে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত সম্পাদিকার কাজ করেন। এ সময়ে তিনি স্কুলের অনেক উন্নতি সাধন করেন। এই শিক্ষালয়ে মণ্টেসরি পদ্ধতিতে শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এমন কি মণ্টেসরি শিখবার জন্য তিনি একজন শিক্ষয়িত্রীকে রোমে, মাদাম মণ্টেসরি পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে, শিক্ষিত করে আনেন। এই নূতন বিভাগটির উন্নতির দিকে তাঁহার এত দৃষ্টি ছিল যে, এই বিভাগের ছাত্রীদের, তাদের মায়েদের ও অন্যান্য পরিচিতাদের তিনি মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে ডেকে এই বিষয় আলোচনা করতেন ও এই বিভাগটির সঙ্গে সর্ব্বদা মায়েদের যোগ রাখতে বলতেন। এই সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের শিশু-প্রীতির একটি সুন্দর চিত্র চোখে ভেসে উঠে। শিশুরা আসলেই তিনি তাঁর গাল বাড়িয়ে বলতেন, "আমার চাঁদমণিরা কৈ দে, দে, আদর করে দে," এই বলে শিশুদের খুব আদর করতেন ও নানারকম গল্প করতেন। অবলা বসুও গল্পগুজবের মধ্যে তাদের স্কুলের খবর সংগ্রহ করে নিতেন। তাহাদের দু'জনেরই স্বভাবটা ছিল এমনি মিষ্ট ও মধুর।

অবলা বসু দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরি করবার সময় বিভিন্ন দেশের কুমারী মেয়েদের দেশের নানা কাজে লিপ্ত দেখেন। এই সময় আমাদের দেশের অসহায় বিধবাদের জন্য কিছু করবার ইচ্ছা তাঁর কোমল প্রাণে জেগে উঠে। তিনি ভাবলেন বিধবা মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে পারলে দেশের অনেক কাজই তাদের দিয়ে করান যাবে। বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষার

কাজে এই বিধবা শক্তিকে নিযুক্ত করতে পারলে দেশের কল্যাণ হবে এবং বিধবারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারবে এই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবার জন্য এই সময় তিনি তাঁহার সহযোগী-রূপে কৃষ্ণপ্রসাদ বসাককে পান। কৃষ্ণপ্রসাদ, অবলা বসুর সঙ্গে এক প্রাণ হয়ে সমস্ত হৃদয়, মন, শক্তি ও সময় দিয়ে এই কাজে এসে ব্রতী হন। কৃষ্ণপ্রসাদের অসীম কার্য্যকুশলতায় ও সহায়তায় এবং অন্য আর অনেকের নানাভাবের সাহায্যে, অবলা বসু ১৯১৯ সালে নারী-শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এই সমিতির বিভিন্ন বিভাগ বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, মহিলা শিল্প ভবন, গ্রামের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, জুনিয়ার ট্রেনিং বিভাগ, বয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র, নার্সারী স্কুল প্রভৃতি গড়ে উঠে।

বিদ্যাসাগর বাণী ভবন সম্বন্ধে একটা কথা মাত্র বলা প্রয়োজন। বিধবা ভবন ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতিও অবলা বসুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সেজন্য প্রতি ছাত্রীর জন্য প্রতিদিন এক পোয়া দুধের ব্যবস্থা ছিল। এমন কি কোন ছাত্রীর জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হলে তিনি নিজ বাড়ীতেই সেই ছাত্রীর জন্য পুষ্টিকর খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতেন।

মহিলা শিল্পভবন সম্বন্ধেও এখানে এইটুকু বলার যে কেবলমাত্র কয়েকটি ছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও সাধারণভাবে বাংলার এবং পল্লীর মেয়েদের মধ্যে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি বহু বছর নারী শিক্ষা সমিতির গৃহে মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীতে ছাত্রীদের হাতের কাজের বিবিধ দ্রব্যাদি ছাড়াও সাধারণভাবে বাংলার মহিলাদের বহুবিধ হাতের কাজ এবং গ্রামের সমিতির অন্তর্গত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের সেলাই করা দ্রব্যাদিও প্রদর্শন করা হ'ত এবং এজন্য বিশেষ পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হ'ত। প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এ কাজ করতে চেষ্টা করায় ও তাঁর সুমধুর স্বভাবে তুষ্ট হয়ে অনেক ভাল দরদী কর্মী তিনি পেয়েছিলেন। তাদের সকলের সাহায্যে ও কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত জমিতে এবং মহামনা হরিমতি দত্তের বিশেষ দানে ১৯৩৩ সালে আপার সারকুলার রোডে সমিতির বর্ত্তমান নিজ সুন্দর গৃহটি নির্ম্মাণ হয়।

তিনি "নারী সমবায় ভাণ্ডার" নামে ছোট্ট একটি দোকান খুলেছিলেন, যেটাতে মেয়েরাই সব জিনিষপত্র বিক্রী করতে শিখছিল, আর মেয়েদের নানা প্রকার হাতের কাজ বিক্রীরও সুবিধা করা হয়েছিল। 'অল ইণ্ডিয়া উইমেনস অর্গানিজিসনের কর্ম্ম কিরণবালা বসুর সাহায্যে এই অনুষ্ঠানটি বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় ও পরে বিদেশে চলে যাওয়ায় উপযুক্ত লোকের অভাবে এই অনুষ্ঠান উঠে যায়। নারী সমবায় ভাণ্ডার উঠে যাবার পর তিনি দমদমে নারী সমবায় প্রতিষ্ঠান (Women's Co operative Home) গঠন করেন। সেটিই এখন কামার-হাটিতে "উদয় ভিলা উইমেনস কো-অপারেটিভ হোম" নামে পরিচিতা।

এ সকল কাজই করেছেন স্বামীর জীবিত অবস্থায়। অনেকেই বলে থাকেন বাইরের কাজ করলে সংসারটা তেমন করে দেখাশোনা করা যায় না। কিন্তু অবলা বসুকে দেখলাম, এত বাইরের কাজ করেও স্বামীর সেবাযত্নের কোন ত্রুটি কোনদিনও হয় নাই। তার ঘড়ি-ঘণ্টা একেবারে ঠিক ছিল। কোনদিন কোন মুহূর্ত্তেও স্বামীর খাবার সময়, বেড়াবার সময়, অবলা বসু নাই এমন হয় নাই। যেখানেই যান না কেন ঠিক সময়ে এসে নিজ হাতে সব করেছেন। তাঁর এ ভাবটুকু দেখে খুব অবাক হতাম আর ভাবতাম তিনি আদর্শ স্ত্রী হয়েই জন্ম নিয়েছিলেন। এও দেখেছি স্বামী বিরক্ত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করলেও তিনি অম্লান বদনে, কথাটি না বলে, চুপ করেই থাকতেন। মুখে কোন বিরূপ ভাবও দেখতাম না। এমন কি কাপড়-চোপড় সম্বন্ধেও স্বামী যদি একটা শাড়ী বদলে অপর শাড়ী পড়তে বলতেন নীরবে তিনি তা পালন করতেন। এসব দেখে কেবলই মনে হ'ত কিসের জোরে যে মানুষ এত ধৈর্য্যশীলা হতে পারে তা বুঝি না, কিন্তু জীবনে দেখেছি।

তাঁর বিশেষত্বের মধ্যে এটাও দেখেছি যে, তিনি যে এত কাজ করে গেছেন, তাতে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে ভালবাসতেন। নিজেকে জাহির করার 'তিল-মাত্র চেষ্টা কোন দিন দেখি নাই, বরং সহকর্মীদেরই প্রশংসা করতে ও কাজের জন্য গৌরব দিতে ভাল-বাসতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর পরিচিত শিক্ষিত মেয়েদের—যাঁর মধ্যে কোন দিকে তাঁর কাজে সামান্য-ভাবে সাহায্য করবার যোগ্যতা ও সময় আছে মনে করতেন তাঁদেরই বারবার কাজে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবেও বহু শিক্ষিতা মহিলাকে তিনি কর্মক্ষেত্রে টেনে এনে তাঁদের জীবনকে সংসার-এর বাইরে

ও দশের মঙ্গল কাজে সার্থক করে তোলার সুযোগ দিয়েছেন।

তাঁহার চেহারার মধ্যে কি একটা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্ত ও মধুর ভাব ছিল যে, তাহা বর্ণনা করার শক্তি আমার নাই। তবে এটা দেখেছি দেশ-বিদেশের লোকজন যাদের সঙ্গে তাঁর যোগ হ'ত, তাঁহারা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নীরা তাঁহার নানা সমস্যায় তাঁর কাছেই পরামর্শ নিতে আসতেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁরই ইচ্ছানুসারে তাঁর গচ্ছিত টাকার যথাযথ বিলি-ব্যবস্থা করে দেন। এই টাকা হতেই নারী শিক্ষা সমিতির 'নিবেদিতা ফাণ্ডে'র সৃষ্টি হয়। তার এই দানের সুদ হইতে গ্রামে গ্রামে বয়স্কা নিরক্ষরা মহিলাদের সাধারণ শিক্ষা, সেলাই শিক্ষা এবং ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীদের রেখে তাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে যান।

ভগিনী নিবেদিতার প্রতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু দু'জনেরই ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। ১৯১১ সালে দার্জ্জিলিং-এ আচার্য্য বসুর গৃহেই নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। এই মহীয়সী মহিলার প্রতি অবলা বসু তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নারী-শিক্ষা সমিতিতে "নিবেদিতা হল" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই হলে নিবেদিতার একটি প্রকাণ্ড ছবিও রক্ষা করেন। 'নিবেদিতা ফণ্ড'ও এই শ্রদ্ধারই প্রকাশ।

"বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান প্রবেশ-পথে ঢুকে ঠিক সামনেই সামান্য একটু উন্মুক্ত স্থানে বাঁ দিকের দেয়ালে দেখা যায়, ভগিনী নিবেদিতার একটি মূর্ত্তি অঙ্কিত। * * * ভগিনী নিবেদিতার মূর্ত্তির এক হাতে একটা দীপ —স্পষ্টতঃই এটি জ্ঞানের প্রতীক। এই মূর্ত্তিটি এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীদেবল। মূর্ত্তির নীচে পদ্মপরিপূর্ণ একটি ছোট জলাশয়, তার মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার দেহভস্ম রক্ষিত আছে।" এই ভাবে জগদীশচন্দ্র ও এই মহীয়সী মহিলাকে তাঁর অন্তরের নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে চিরযুক্ত করে যান।

এই ভাবের বহুবিধ প্রচেষ্টার মধ্যেও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সাধকদের, কলকাতার নিকটবর্ত্তী একটি নির্জ্জন সাধন স্থানের প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি আচার্য্য সতীশচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে আড়িয়াদহে একটি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করে দেন। ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠার দিনের ছবি আজও চোখে ভাসে। নির্জ্জন স্থান, চারিদিক খেলামেলার মধ্যে একটা সুন্দর গৃহ। পরিবেশটা বড়ই মনোরম।

এদিকে দেখতে পাই স্বামী-স্ত্রীর জীবন ছিল এক-সূত্রে গাঁথা। স্ত্রী যেমন সকল কাজের মধ্যেও স্বামী-সেবা করে গেছেন, এবং স্বামীর কাজকে সার্থক করার জন্য বরাবরই সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করেছেন, স্বামীও স্ত্রীর সকল কাজে সহায়তা করে উৎসাহ দান করে গেছেন। তাইতে দেখি উভয়ের কাজ এতটা সুন্দর হয়ে উঠেছে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নারী শিক্ষা সমিতির বাৎসরিক রিপোর্টের খাতাপত্রে সমিতির যে প্রতীক চিহ্নটি দেখতে পাই, সেই প্রতীকের উপরিভাগে লেখা আছে 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'। এই সুন্দর সংস্কৃত বচনটি, আমার যতদূর জানা আছে, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীই ঠিক করে দেন। কিন্তু ভারতমাতার ছবিটি যে ভাবে সমিতির প্রতীক হয়ে উঠে—তাহার ইতিহাসও এখানে দেওয়া গেল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ৭৮তম জন্মদিবসে, বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের বিধবা ছাত্রীরা, অবলা বসুর নিকট অনুমতি লইয়া আচার্য্যদেবকে প্রণাম করতে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য তাঁর বাড়ীতে যান। ভবনের ছাত্রীরা আচার্য্য বসুর নীচের তলার বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসেন। সেই ঘরে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা'র ছবিটি ছিল। জগদীশচন্দ্র ছাত্রীদের দেখে খুব আনন্দিত হন। ছাত্রীরা তাঁকে প্রণাম করে বসলে পর, ভারতমাতার ছবিটির দিকে, ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যে আশীর্ব্বচন করেন তাহা তুলে দিলাম:—

"আজ তোমাদের দেখে খুব খুসী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের আশা পূর্ণ হোক।"

"এই যে দেয়ালে ছবি দেখছ, এটা দেখে সবাই বোধ হয় বুঝতে পেরেছ? এটি হচ্ছে ভারতমাতার ছবি (অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি)। ইনি স্ত্রীলোক। রমণীর কাজ হচ্ছে সকলের অভাব পূরণ করা। এই দেখ ইনি এক হাতে অন্ন-বস্ত্র, অন্য হাতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিতরণ করছেন।"

"তোমরাও মাতৃজাতি; তোমরা যে শিক্ষা পাচ্ছ সেই শিক্ষা শেষ করে যখন স্বাবলম্বী হবে, তখন তোমাদের সেই জ্ঞান অন্যকে বিতরণ করে সেবার দ্বারা

অপরের দুঃখ ও অভাব দূর করবে, তখন তোমাদের শিক্ষাও সার্থক হবে। আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষার ধারাই এই। আশীর্ব্বাদ করি, অন্যের সেবার দ্বারা অন্যের জ্ঞানের অভাব দূর করে তোমরা তোমাদের জীবন সার্থক কর।"

ভারতমাতার ছবিটি ও আচার্য্য বসুর এই সুন্দর উক্তি তখনই সমিতির কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার পর হতেই ছবিটিকে সমিতির প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয় এবং জগদীশচন্দ্রের উক্তিও সেই সঙ্গে প্রতি রিপোর্টের প্রতীকের নীচে মুদ্রিত হতে থাকে। প্রতীক গ্রহণ করার পরই সমিতির বিশেষ অনুরোধে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য্য) সংস্কৃত বচনটি সংগ্রহ করে দেন। আশা করি, অবলা বসুর হাতের লেখা আচার্য্য বসুর এই আশীর্বচনটি আজও বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের ঘরে রক্ষিত আছে। এই ভাবেই তাঁরা উভয়ে উভয়ের জীবনে ও কল্যাণকর্মে সংযোগ রেখে চলতেন।

এইখানে অবনীনাথ মিত্র রচিত বহুতথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ পুস্তক "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান মন্দির" হ'তে খানিকটা তুলে দিলাম এই বিরাট মিলিত জীবনের চিত্রটি সুন্দররূপে বুঝিবার সাহায্য করিবে বলিয়া :—

"এই প্রসঙ্গে আচার্যদেবের সহধর্মিণী লেডী অবলা বসুর কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সর্বক্ষণ স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি আচার্যদেবের সাধনাকে নানাভাবে সার্থক করে তুলেছিলেন। আচার্যদেব তাঁর কর্মক্ষেত্রে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যে অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, সহধর্মিণী হিসেবে এই মহীয়সী মহিলার সহায়তা না পেলে এরূপ সর্বাঙ্গীন সাফল্যলাভ সম্ভব হতো কি না, সন্দেহ। আচার্যদেব নিজেও এ সম্বন্ধে বলেছেন—'আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষ্যে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি ...'হইতে পারে না' বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব।...আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে'।"

যাঁরা প্রতিদিনের কাজ প্রার্থনার ভিতর দিয়ে আরম্ভ করতেন তাঁদের জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পাই তাঁহাকে প্রীত করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা—এই বাক্যটিকে যেন তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবারই চেষ্টা করে গেছেন।

আজ শ্রদ্ধায় তাঁদের স্মরণ করি।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তকে'র সুর-সপ্তক

অধ্যাপিকা বাসন্তী চক্রবর্ত্তী

যৌবনের এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রেমের স্মৃতি আজ কবি-মনকে থেকে থেকে নাড়া দিয়ে যায়। সেদিনের মনের স্পষ্টতার কাছে যা যে ভাবে নাড়া দিয়েছিল—আজ আবার কবি-মনকে বিদায় বেলায় তা নাড়া দিয়ে যাচ্ছে মধুময় স্মৃতির আবেশ হিল্লোলে। 'তিরিশ', 'একত্রিশ', সংখ্যাকেও প্রেমের এই অতীত স্মৃতিতে বেদনা মধুর স্বপ্ন সঞ্চরণ! 'একত্রিশ' নম্বরে প্রেমের স্মৃতিই মুখ্য রস কিন্তু গৌণভাবে একটা গল্পও আভাসিত হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী নির্জনতা দূর করার জন্য নিজের বাড়ীর একটি ঘর পাড়ার ক্লাবকে দান করেছেন—রোজ সন্ধ্যায় অফিস থেকে এসে সেই হৈ-চৈ নিয়ে ভুলে থাকেন। একদিন নির্জন সন্ধ্যায় একা সেই ঘরে বসে ৮ বছর আগের কোন মধুময় স্মৃতিকে উপভোগ করতে করতে অনুভব করলেন সেই ঘরে তাঁর প্রিয়তমার আবির্ভাব—

> আট বছর আগে
> এখানে ছিল হাওয়ায় ছড়ানো যে স্পর্শ,
> চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
> তারি একটা বেদনা লাগল
> ঘরের সব কিছুতেই।

প্রেমিক মনে করলেন বুঝি এতদিন পরে তাঁর প্রিয়তমা নিজের ঘরটিতে এসেছেন। প্রেমিক বলে উঠলেন—

> "ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
> ... ...
> শুনলেন অশ্রুত বাণী,
> "কার কাছে আসব?"
> আমি বললেম,
> "দেখতে কি পেলে না আমাকে?"
> শুনলেম—
> "পৃথিবীতে এসে
> যাকে জেনেছিলেম একান্তই
> সেই আমার চিরকিশোর বঁধু
> তাকে তো আর পাইনে দেখতে
> এই ঘরে।
> শুধালেম,—"সে কি নেই কোথাও?"
> মৃদু শান্তস্বরে বললে,
> 'সে আছে সেইখানেই
> যেখানে আছি আমি
> আর কোথাও না।"

এ কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় প্রেমের অমরাবতীতে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যাকে একদিন রচনা করা যায় সে বাস্তবের তুচ্ছতায় কখনোই হারিয়ে যায় না। মিলন এবং বিরহের মধ্যে সমানভাবেই সে সেই ভাবলোকের স্বপ্নপুরীতে চিরকালের প্রেমিক-প্রেমিকারূপে বিরাজ করে। এ জগতের মাঝে হাতড়ে বেড়ালে তাকে পাওয়া যায় না। পার্থিব জীবনে এই 'চিরকিশোর বঁধু' প্রেমিক-প্রেমিকার আপন মনের রচনা করা মর্ত্যমাধুরী—কবির ভাষায়—'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। আট বছর বিরহের পর তাকে স্মৃতির মধ্যে দিয়ে ঐ ঘরে খুঁজে বেড়ালে আর পাওয়া যায় না। যাকে কেন্দ্র ক'রে এই স্মৃতিচারণ—তার সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরছে—প্রিয়তমার হৃদয়ের মাঝেই গোপনে রয়েছে তার মিলন-মধুর স্বপ্ন দিয়ে আঁকা পৃথিবীর 'চিরকিশোর বঁধু'—স্মৃতি—তাকে আর ও ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় না তাই।

(৩)

কতকগুলি কবিতার মধ্যে 'পুনশ্চ' কাব্যের গল্প বলার ঢঙটিকে অনুশীলন করেছেন। ও-কাব্যের বালক কালের 'স্মৃতিচারণ'ও এখানে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়েছে। 'একত্রিশ', 'বত্রিশ', 'তেত্রিশ', 'ছেচল্লিশ'—এগুলির মধ্যে এক একটি ছোট গল্পের ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'একত্রিশ' সংখ্যাকে প্রেম মনস্তত্ত্বই মূলতঃ প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু এর গল্পরসও নগণ্য নয়।

'বত্রিশ' নম্বরের গল্পটি কবির বাল্যস্মৃতির কোন গল্প শোনা সন্ধ্যাবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পটি আরম্ভের ভঙ্গিমা অপরূপ। কবির শিশুসুলভ গল্প বলা মনটিই রচনা করে চলেছে রোঘো ডাকাতের চরিত-কথাকে। বালক কালের গল্প শোনার আগ্রহ—তার সঙ্গে সমস্ত বাড়ী-ঘর—পরিবেশের

রোমান্টিক বর্ণনা এবং গল্প বলিয়ে মোহন সর্দারের বর্ণনা—গদ্যের অনাড়ম্বর বাচনভঙ্গীতে এমন সার্থক গল্পরস পরিবেশন করেছে যে কবির এই শিশুসুলভ কচি মনটির এই বয়সেও এমন সজীবতার পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। অথচ এই গল্পের মধ্যে 'রোঘো' ডাকাতের মত দুর্দান্ত লোকেরও কোমল কচি মনের পরিচয় পেয়ে সত্যিই বিস্ময় জাগে। গল্পটি আরম্ভ করার ধরনটি অনবদ্য—

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উস্‌কে দিচ্ছে থেকে থেকে।
… … …
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে
মিটমিটে আলোয়।
বুড়ো মোহন সর্দার
কলপ লাগানো চুল বাবরি-করা,
মিশ কালো রং
চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু-মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগাবার মতো তার পূর্ব ইতিহাস।

গল্প বলার ঢংটি কবির অপূর্ব। মোহন সর্দারের এমন বাস্তব একটি নিখুঁত চিত্র সত্যিই কাব্যে ঠাঁই পেয়ে কাব্যের সীমিত পরিসরকে বাড়িয়ে দিয়েছে। রোঘো ডাকাতের চরিত-কথা শেষ ক'রে কবি বলছেন—

তারপর এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

গল্প-শোনার রোমান্টিক সন্ধ্যেবেলার এসেছে আজ যুগান্তর—এ সত্য কাব্যের শেষে শিশুমনের ভাবাবেগে মগ্ন হয়েই ভাবছন্দে অনবদ্য শিল্পসুষমা লাভ করেছে—

রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

বাস্তবিক তেলের প্রদীপ বৈদ্যুতিক যুগে নিবে গেল—স্মৃতিও একদিন 'কালের কপোল তলে' লীন হয়ে যায়… সংসারে আজ শিশুর জীবন থেকে রূপকথা-শোনা এই নিভৃত সন্ধ্যাগুলোও যে অনিবার্যভাবে মুছে গেছে—এই বাস্তব সত্যের উপস্থাপনার সঙ্গে গল্প-শোনা রোমান্টিক মনের পরম ট্রাজেডির কথাই—একে কাব্যমূল্য দান করেছে। দার্শনিক, শিল্পী রোমান্টিক জীবনধর্মী কবির গোধূলি-বেলার নানা গুরুগম্ভীর দর্শন-মনন ও চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নিরাবরণ উলঙ্গ শিশুমনের পরিচয় পেয়ে আমরা চমৎকৃত হই। এই কচি মনটিই আমৃত্যু তাঁর রসিক মনটিকে সজীব রেখেছিল!

'তে'ত্রিশ' সংখ্যকে ঐতিহাসিক ছোট্ট একটি গল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিখ জাতির বীরত্বের মহিমাকেই একটি আঠারো উনিশ বছরের বালকের জীবনদানের মধ্যে দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছেন। এ ধরনের ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা পূর্বযুগের কাব্যেও দেখা যায়—শুধু এখানে গদ্যে তার নব রূপায়ণ।

শেষ কবিতা 'ছেচল্লিশ' নম্বরে কবি যে শৈশব থেকে আপন বালক বয়সের শৈশব স্মৃতিকথা বলতে বলতে—এই বার্দ্ধক্য বয়সের শেষ আশা-আকাঙ্ক্ষাটিকুও বাদ দেন নি—তা বেশ বোঝা যায়। কবির শৈশব যৌবন এবং বার্দ্ধক্য বাইরের দিক থেকে কবির কর্মময় জীবনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির যে দেনা-পাওনার ইতিহাস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কবির শিল্পী-মনের রসময় সৃষ্টি যে একে রোমান্টিক ক'রে তুলেছে—গল্পচ্ছলে সে কথা কবি বলে গেছেন। 'জীবনস্মৃতির' মধ্যে কবি যে আত্মপরিচয় দেন—সেই 'আত্মপরিচিতি'ই এখানে গদ্যভঙ্গিমার স্বচ্ছ সাবলীল গতি-ছন্দে মুক্তি পেয়েছে। কবির অন্তর্জীবন এবং বহির্জীবনের এমন সার্থক কাব্যিক স্মৃতি চিত্র বোধ হয় এই প্রথম। বালক-কালের গল্প বলতে বলতে কবির গভীর জীবনদর্শনটিও এখানে আর অ থাকে নি—

তখন আমার বয়স ছিল সাত।

ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,

কবির শিল্পী-মনের প্রথম প্রাণোন্মেষের অরুণালোকের আভাস—

... ...

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে ;
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণ।

কবি-শিশুর নূতন আনন্দে বিশ্বকে চোখ মেলে দেখার স্বপ্নময় রোমাণ্টিক কৈশোর জীবনে—

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করতে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,
সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,
হাসত আমার মুখে চেয়ে।—

আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে।

কাব্যময় রোমাণ্টিক মনের এই স্বপ্ন-সঞ্চরণ অপূর্ব কাব্যমহিমা লাভ করেছে এই সমস্ত চরণে। বাস্তবের গদ্যময় ভাব-ভাবনার সঙ্গে সৌন্দর্যলোকের এই সুসমন্বয় সত্যিই সার্থক শিল্পগরিমা লাভ করেছে। এ বর্ণনা 'জীবন-স্মৃতি'র কথাকেই স্মরণ করায়। এই কবি-বালকেরই—

তারপরে বয়স হোল
কাজের দায় চাপল মাথার পরে।
দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি।

যৌবনের কর্মময় জীবনের এমন স্পষ্ট স্বচ্ছ ইঙ্গিত কাব্য-মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয়ে উঠেছে—কিন্তু কর্মচক্রের অক্লান্ত নিষ্পেষণকে বোঝাতে গিয়ে কবি যে 'প্রয়োজনের শিকলে বাঁধা' বন্দী জীবনের কথা বলেছেন—তার থেকে—

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

কবির সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত হয়েছে গদ্যের অনির্বচনীয়তার সুস্পষ্ট ঝঙ্কারে।

(৪)

'পনেরো', 'ষোলো', 'সতেরো', 'আঠারো', 'বিয়াল্লিশ', 'তেতাল্লিশ' এগুলি পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকা হলেও তুচ্ছতাই তাদের সবটুকু নয় বা ব্যক্তিগত কথাই তার সবখানি নয়। শিল্পীর একটি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এর মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই জীবন সম্বন্ধে—দুঃখ-সুখের অনুভব সম্বন্ধে—কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা বা ব্যক্তিগত মতামত জানাতে চেয়েছেন পত্রলেখককে উদ্দেশ্য করে। তাই এগুলি আর পত্র থাকে নি—কাব্য হয়ে উঠেছে। 'পনেরো' নম্বরে 'রাণী দেবী'কে—বাসা বদলের কথা বলতে গিয়ে 'দুটি মাত্র ছোট ঘর' যে তাঁর বর্তমান আশ্রয়—এই তুচ্ছ ঘটনাটাকে নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন এবং একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—যে সেই ক্ষুদ্র ঘটনা তার তুচ্ছতার খোলসকে সরিয়ে দিয়ে সত্যিই শিল্পসুষমা লাভ করেছে।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা ;
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।

আবার 'ষোলো' সংখ্যকে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উদ্দেশ্য করে—'ছবি' আঁকা সম্বন্ধে কবির মন্তব্য বলেছেন—

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনী ঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে ক'রে
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভ অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।

গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো,
সে কাজে আছে দায়িত্ব;
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট বসানো
সে আর এক কাণ্ড।

এখানে দেখা যাচ্ছে কবি এতকাল কাব্যে কথা নিয়ে কাজ করেছেন – এবং পরে ছবি আঁকায় রেখা নিয়ে কারবার করছেন –এই দুয়ের স্বভাবধর্মের উপর কবিমনের যে ভাব বা ভাবনা তাকেই কবি রূপ দিতে চেয়েছেন।

'আঠারো'তে দেখি শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আমাদের জীবনের ওপর মনের ওপর শোকের যে প্রকোপ এবং প্রভাব—কবির শিল্পদৃষ্টিতে তার সম্বন্ধে যে দার্শনিক চিন্তা-বিশিষ্ট মনোভাব ধরা পড়েছে—সেই কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন।—

আমরা কি সবাই চাই শোকের অবসান?
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী সত্যকে—
সান্ত্বনা নেই এমন কথায়;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে।

এইভাবে কবি পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও কবি-মানসের নানা দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা—শিল্পীমনের রসরূপের পরিচয় দিয়ে গেছেন। এ জিনিষ বোধ করি বিশ্বকবির মত কোন বড় শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব!

(৫)

কয়েকটি কবিতার মধ্যে তত্ত্বপ্রাধান্য ঘটেছে। জীবন, মৃত্যু, শোক, প্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে কবি-মানসের যে দার্শনিক মনোভাব—তা এ কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তবে কয়েকটি কবিতার মধ্যে এই সমস্ত তত্ত্বকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন গদ্যের অনাড়ম্বর ভঙ্গিটির মধ্যে। আঠারো', 'সাঁইত্রিশ', 'আটত্রিশ', 'ঊনচল্লিশ', 'চল্লিশ' প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে প্রধান। 'আঠারো'তে 'শোক' সম্বন্ধে কবিমনের যে দার্শনিক মনোভাব তা অভিব্যক্ত হয়েছে। 'সাঁইত্রিশ' নম্বরে সৃষ্টিশক্তিকে 'বিশ্বলক্ষ্মী' রূপে কল্পনা করে তাঁকে 'তপস্বিনী' রূপে দেখেছেন।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে
দুঃখেরি দহনে,
শুষ্ককে জালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্যধূপে।

'আটত্রিশ' নম্বরে 'যম'কে উপলক্ষ্য করে প্রেম সম্বন্ধে কবির সৌন্দর্য-কল্পনা ভাষা পেয়েছে—

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
... ...
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করা।

'ঊনচল্লিশ' সংখ্যাকে মৃত্যু সম্বন্ধে—

মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।

এইভাবে কবি-মনের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মৃত্যু-শোক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিশেষ ধ্যান-ধারণা তাই-ই শিল্পমণ্ডিত হয়ে রূপ পেয়েছে সমস্ত কবিতায়। তত্ত্ব বা বিশেষ জীবনদর্শনগুলি কিন্তু গল্পচ্ছলে জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করে সরস হয়ে উঠেছে। গদ্যের বাহনে বস্তুজগতের তুচ্ছতাই যে কেবল সার্থক হয় না—গুরুগম্ভীর তত্ত্বপ্রধান ভাবনাও যে সাবলীল ছন্দে সার্থক হয়ে উঠতে পারে—এগুলি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

(৬)

সুর সপ্তকে'র ষষ্ঠ শ্রেণীর কবিতাগুলির অনুরণনে যে সুরের তরঙ্গ ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে—তা হোল কবি-মনের কোন এক বিশেষ মুহূর্তের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা কোন চঞ্চল অনুভূতি—কোন টুকরো ভাব বা ভাবনা, কোন বিশেষ দেখা ......কবি-মানসের সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শে এরা সজীব হয়ে উঠে কাব্যমূল্য পায়। এ জাতীয় কবিতা তাঁর পূর্ব বা পর-যুগের কাব্যেও আছে—শুধু গদ্যের স্বাভাবিক চলমানতার ছন্দে সেই ক্ষণকালের ভাব বা ভাবনাকে স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা। 'তেইশ', 'চব্বিশ', 'পঁচিশ', 'সাতাশ', 'আটাশ', 'ছত্রিশ', 'চুয়াল্লিশ'—প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা।

'তেইশ' নম্বরে কোন এক শরতের বিশেষ একটি দিনকে কবি জীবনে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। বছরে বছরে একই ঋতু একই রূপের, রঙের, রসের ডালি নিয়ে আসে

আমাদের জীবনের বহিরাঙ্গনে…মন তাকে বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ভাবেই গ্রহণ করে। মনে হয় এই চেয়ে দেখা—

'…এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।

তাই—

আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্যযুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।

এই ভাবে 'অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে' রেখে যা কিছুকে দেখেন—

চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

'চব্বিশ' নম্বরেও তাই দেখি এই ক্ষণিক দেখার চোখ—এই সুন্দরের পূজারী মন বলে ওঠে—

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,
… … …

কবি এই ফুলগুলিকে তার স্বস্থানে পেতে চান—পেতে চান তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের লীলারঙ্গভূমিতে। তাই বলেন—

আমি বলি, 'যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।
পাতার ভিতর থেকে
তার রং দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপটায়
চারদিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।

ঠিক এই একই মন নিয়ে 'পাঁচিলের এধারের ফুলকাটা চিনের টবের সাজানো গাছ সুসংযত'কে দেখতে চান তার যথাস্থানে। এই ভাবে টবে সাজানো সুসংযত গাছের সঙ্গে ছন্দের আভিজাত্যে বাঁধা কবিতার মুক্তিহীন বন্দী জীবনের তুলনা করেছেন—আর সমুন্নত স্বাধীনতা নিয়ে এবং সৌন্দর্যের মর্যাদা নিয়ে মুক্ত যে পল্লবপুঞ্জ তার সঙ্গে বেড়া ভাঙা ছন্দের কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পান কবি। তাই ফুলবাগানের সযত্নে লালিত এই বন্দী করা লতার কথা বলতে গিয়ে গদ্য কবিতার আসল স্বরূপটি এর মধ্যে ধরা পড়ে। 'পঁচিশ' সংখ্যকে তাই—

পাঁচিলের এধারে
ফুলকাটা চিনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।
… … …
পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী করা লতা।
এরা সব হাসে মধুর করে;
উচ্চহাস্য নেই এখানে;
হাওয়ায় করে দোলাদুলি
কিন্তু জায়গা নেই দুরন্ত নাচের,
এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা।
… … …

কিন্তু—

পাঁচিলের ওপারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ যুকলিপ্‌টাস
খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে!
পাশেই দুটি তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগলভ্‌।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে।
… … …
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
… … …
আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত;
বললেম, "টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে।

কবির মূল বক্তব্য এখানে আর অস্পষ্ট থাকে না। 'পরিশেষে'র শেষ থেকে কবি যে গদ্যকাব্যের সাধনা করে

চলেছেন এবং 'পুনশ্চ' কাব্যের 'কোপাই', 'নাটক', নূতন-কাল' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি গদ্য এবং পদ্যের সম্বন্ধে যে ভাবে আপন মতামত ব্যক্ত করে—কাব্যে 'গদ্যছন্দে'র অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য যে যুক্তি দেখিয়েছেন—এখানে আর একবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। শেষ পর্যায়ের এই 'গদ্য কবিতাগুচ্ছ' রচনাকালে কবি-মনে এ প্রেরণা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

(৭)

'শেষ সপ্তকের' শেষের সুরসাধনায় আর এক নূতন সুরের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কবিমনের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা ভাব-ভাবনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঐতিহাসিকের তথ্য প্রাধান্যের ঘটেছে অপূর্ব কাব্যিক সমন্বয়। গদ্য ভঙ্গিমার সহজ চলনের সাবলীল ছন্দে অভিস্নাত হয়ে ঐ সব তত্ত্বপ্রধান ও তথ্য-প্রধান ভাব বা ভাবনা 'ভারহীন সহজের রস' পরিবেশন করছে। 'সাত' নম্বরে—

অনেক হাজার বছরের
মরু যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল ;—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনযাত্রা
... ...
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,

অথবা 'একুশ' নম্বরে—

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
... ...
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না।
... ...

আবার—

ধরার ভূমিকায় মানব যুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে
... ...
বুদ্বুদের মত উঠল মহেঞ্জদারো
মরুবালুর সমুদ্রে, নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর।
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো বেড়া দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে,
কাঁচা কালির লিখনের মতো
লুপ্ত হয়ে গেল
অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

এই সমস্ত কবিতার মধ্যে দিয়ে কবির ইতিহাস চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের মধ্যে এ জিনিষের এমন সমন্বয় বোধ হয় এই প্রথম। ইতিহাস চেতনামূলক বহু কবিতা এর আগের যুগের কাব্যে পাওয়া যায় এবং বিশ্বসৃষ্টির এই আবর্তন-বিবর্তনের লীলাছন্দে মুগ্ধ কবিমনের বিস্ময়বোধও আবাল্যের—কিন্তু সে বিস্ময় বোধ স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করে সার্থক হয়ে উঠেছিল- এখানে তার উপস্থাপনা সম্পূর্ণ অভিনব!

'শেষ সপ্তকে'র সুরসপ্তকের বিভিন্ন পর্দায় এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সুরের নানা রাগ-রাগিণীর সমন্বয়ে সুর-সাধনা চলে ...কিন্তু মূল তানের সার্থকতা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন সুরের সমবায়ে গঠিত ঐকতান সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনায়! সত্যিই 'গদ্যকাব্যে'র ইতিহাসে কবির এ এক নূতনতর এবং সার্থকতর শিল্পসৃষ্টি!

নেপথ্যের রাজশেখর

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আইনজ্ঞ

কলকাতায় কলেজের ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সীতে বি. এ. পাঠের সময় রাজশেখরের বিবাহ হয়েছিল। কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলের সাহিত্য-হাটে শ্যামাচরণ দে রাস্তাটি যাঁর নামাঙ্কিত সেই শ্যামাচরণের পৌত্রী রাজশেখরের পত্নী। শ্যামাচরণের পুত্র এ্যাডভোকেট যোগেশচন্দ্রের জামাতা হন রাজশেখর এবং শ্বশুরের আগ্রহে আইন পাঠ ও পাশ করেন। তারপর যোগেশচন্দ্র উদ্‌যোগ করে জামাতাকে নিজের সঙ্গে হাইকোর্টে নিয়ে যান আইন ব্যবসায় আরম্ভ করবার জন্যে। কিন্তু দু'একদিন মাত্র হাইকোর্টে বেরিয়েই রাজশেখর আইন-পেশার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে কেউ তাঁকে সম্মত করতে পারেন নি। পাছে কোনদিন হাইকোর্টে উকিল হয়ে যাতায়াত করবার কথা ওঠে, তা এড়াবার জন্যে চাপকানটি দর্জি দিয়ে কাটিয়ে মেয়ের ফ্রক তৈরী করে ফেলেন।

কিন্তু শুধু ল'কলেজে আইন পাঠের ফলে মেধাবী রাজশেখর আইন-শাস্ত্র অধিগত করেছিলেন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের মতন। হাইকোর্টে একদিন মাত্র যে ছিলেন, সেদিন একটি মামলায় যে সুদাবিদা করেন, তা কোন কোন ধুরন্ধর আইনবেত্তার প্রশংসাধন্য হয়েছিল।

হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় এড়ালেন বটে, কিন্তু কয়েক বছর পরেই তাঁর আইনজ্ঞতার সাধন করতে হ'ল সেখানেই। তবে ব্যক্তিগত উপার্জন বা পেশার জন্যে নয়। তাঁর রসসাহিত্যিক জীবনের উদ্‌বোধনে যে মোকদ্দমার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে তিনি পুনরায় হাইকোর্টে এলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে আসল বাটপারিয়ার মামলায় তাঁকে তখন অনেকদিন হাইকোর্টে আসতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই মোকদ্দমায় বেঙ্গল কেমিক্যালের পক্ষে দণ্ডায়মান হন স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। সে সময় স্যার নৃপেন্দ্রনাথকে এই মামলা পরিচালনায় রাজশেখর আইনজ্ঞরূপে অক্লান্তভাবে সাহায্য করেছিলেন। প্রভূত পরিশ্রমে তিনি দিনের পর দিন নথিপত্র ঘেঁটে সহায়তা করেন case তৈরি করতে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর নিজেরও সাধ ও সাধনার প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যালকে একজন অসাধু অবাঙালীর আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় রাজশেখর যে মর্মাহত হয়েছিলেন সেজন্যে প্রতিষ্ঠানটিকে আইনের সাহায্যে বিপন্মুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টিত হন। মোকদ্দমা সাজানো থেকে আরম্ভ করে নানা খুঁটিনাটি কাজের জন্যে তখন প্রতিদিন তিনি হাইকোর্টে যেতেন proceedings আদ্যোপান্ত অনুসরণ করবার জন্যে। অতিশয় মানসিক শ্রমে তিনি এখন এতদূর ক্লিষ্ট হয়েছিলেন যে দু'দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সে যা হোক, সেই মামলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের জয়লাভের পশ্চাতে তাঁর আইন জ্ঞান ও নিরলস প্রযত্ন যে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল, সে কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বেঙ্গল কেমিক্যালের সেই জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নের পর রাজশেখর আর কোনদিন হাইকোর্ট অভিমুখে যান নি। কিন্তু তাঁর উত্তর জীবনে রসসাহিত্য রচনার নানা পর্বে আইনজ্ঞানের নানা রকম প্রকাশ দেখা গেছে। তাঁর মেধা ও বিবেক বোধ আইনের বিচিত্র প্রক্রিয়া ও অপক্রিয়া তাঁকে সম্ভবত বিস্মৃত হতে দেয় নি। তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ত পুরোপুরি আইনের মারপ্যাঁচেই গড়া। লিমিটেড কম্পানীর ব্যাপারে কম্পানী আইন বাঁচিয়ে কিংবা আইনেরই সাহায্যে কিভাবে ধূর্ত ও দুষ্টবুদ্ধি লোক পরের ধনে পোদ্দার ও শেষে তা গ্রাস করতে পারে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় এই গল্পে রাজশেখর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম গল্পই তার আইনজ্ঞতার এক দ্রষ্টব্য দলিল। আর্টিকলস্ অব্ মেমোরাণ্ডাম রচনা থেকে আরম্ভ করে Company's Act-এ তাঁর রীতিমত দখল এই গল্পের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট হয়েছে। বলতে গেলে আইনের চোরাবালির ওপরেই এ অপূর্ব রসসৃষ্টির কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। সেজন্যে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' সম্পর্কে কোন কোন পাঠক বলেছিলেন যে—তখন রাজশেখরের নামে সাধারণ্যে প্রকাশ করে পড়ে নি—এটি নিশ্চয় কোন উকিলের লেখা।

এই গল্পের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আরো একটি কথা মনে হয়। তাঁর সমস্ত রস-রচনার মধ্যে বোধ হয় এই প্রথমটিতেই তাঁর নাটকীয় বা নির্বিকার মন অনুপস্থিত। অর্থাৎ এর হাস্যধারার অন্তরাল থেকে একটি ক্রন্দনের

নির্ঝরিণীর সুর যেন বেজে ওঠে। সে কান্না আইনের সাহায্যে প্রার্থিত তিনকড়িরই শুধু নয়। তা যেন আইনজ্ঞ হয়েও বিবেকবদ্ধ স্বজাতিপ্রেমী রাজশেখরের মর্ম-ক্রন্দন। আইনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবে জানা ছিল বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আইনের রন্ধ্রপথ দিয়ে কেমন সুকৌশলে শয়তান অন্যায় তার প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে যায়।

আইনের হাড়গন্ধ জানা থাকায় তার লীলা-খেলা তাঁর কাছে ছিল জলবৎ সরল। তাই আইনের দৃষ্টি ও আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে তাঁর কখনো সরল, কখনো শ্লেষাত্মক, কখনো ইঙ্গিতপূর্ণ নানা প্রকার মন্তব্য ও উক্তি তাঁর অনেক গল্পের মধ্যে দেখা যায়। কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন ভাবে।

এ প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর 'ভূষণ পাল' ও 'গুপী সাহেব' এই গল্প দু'টি অনেকাংশে মামলা, আদালত, থানা, পুলিশ, জেল ইত্যাদির ভিত্তিতেই রচিত। তাঁর প্রথম গল্পের মতন এ দু'টিতেও আইনজ্ঞ লেখকের পরিচয় প্রায় সর্বত্র প্রকাশমান।

'আনন্দীবাঈ' গল্পটি সাম্প্রতিক হিন্দু বিবাহ আইন (আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এ আইন মুসলমানের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে না!) এবং বিবাহবিলাসী নায়কের তা ভঙ্গ করার দায় থেকে আধুনিক যুগোচিত পদ্ধতি অনুসারে অব্যাহতি লাভের কৌতুককর কাহিনী।

'মাৎস্যন্যায়' গল্পে রাজশেখর লক্ষণীয়ভাবে বলেছেন, "তাঁর কৃপা না হলে ইলেকসনে জয়লাভ হয় না, উঁচু দরের দুষ্কর্ম নির্বিঘ্নে করা যায় না, আইনের জাল কেটে বেরিয়ে আসা যায় না।"

আইনের নানা সূত্রের টীকা সমেত উল্লেখও আছে তাঁর নানা গল্পে। যথা—

"কিন্তু এই সব আধিদৈবিক ব্যাপারে বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিসডিকসনে পড়ে না। আইনে বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান। সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই কর নি কেন? যা হোক একবার expert opinion নেব।" (শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড)।

"গবরমিণ্ট কান পকড়কে আদায় করবে। আইন এইসি হায়।" (ঐ গল্প)

"তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিনশ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না।" (ভুশণ্ডীর মাঠে)

"এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড্ হবেনা?" এই আইনের পরিভাষাটি এবং জেরা-দড় উকিলের প্রতি কটাক্ষসূচক "আমি সাক্ষী বিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম"...উক্তিটি আছে তাঁর 'কচি সংসদ' গল্পে।

ভাষা-সংগঠক

বাংলায় লাইনো টাইপ প্রচলনের প্রসঙ্গে বাংলা অক্ষরের সংস্কারে রাজশেখরের কিছু দানের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার সংগঠনে তাঁর মহৎ ও বৃহৎ অবদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হবে।

তাঁর মতন একজন রসসাহিত্যস্রষ্টা যে শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে এমন সুপণ্ডিত হবেন, এও এক আশ্চর্য ঘটনা। সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় যাঁরা প্রতিভার পরিচয় দেন, অভিধান প্রণয়ন কিংবা শব্দের অনুশীলনে আগ্রহ ও নৈপুণ্য সাধারণত তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু মনীষী রাজশেখর এই নিয়মের বরেণ্য ব্যতিক্রম। তাঁর রসসাহিত্য রচনা এবং বাংলা ভাষা বিষয়ে গবেষণা সমান্তরালে চলেছিল। তার ফলে বাংলা শব্দের সংগঠনে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবার যোগ্য।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশে নানা প্রয়োজনে বাংলা ভাষার নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের দরকার হয়। নতুন যুগের এই চাহিদা মেটাবার জন্যে নতুন শব্দ গঠন ও পুরনো শব্দের নতুন করে সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই অতি কঠিন ও প্রয়োজনীয় জাতীয় দায়িত্ব অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন রাজশেখর। বাংলা ভাষার এই শব্দ সংগঠনে এবং নতুন শব্দের চয়নে ও প্রচলনে তিনি ভাষা-জননী সংস্কৃতের ভাণ্ডারের ওপর প্রধানত নির্ভর করেছিলেন। ফলে, আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বৈজ্ঞানিক নানা বিভাগীয় কর্মের প্রয়োজনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা পরিভাষা রচনায় রাজশেখরের দান সর্বাধিক।

এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভার যথোচিত সদ্ব্যবহারের জন্যে তাঁকে পরিভাষা সমিতির সভাপতি মনোনীত করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর নেতৃত্বে এই পরিভাষা সমিতির পণ্ডিতমণ্ডলী পদার্থবিদ্যা,

রসায়ন, ভূগোল, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা (Biology), উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা (Zoology), ভূবিদ্যা (Geology), শারীরবৃত্ত (Physiology), স্বাস্থ্যবিদ্যা (Hygiene), অর্থবিদ্যা (Economics), মনোবিদ্যা (Psychology), সরকারী কার্য (Public Services), জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি (Trigonometry , কনিক (Coincs), বীজগণিত (Algebra) ইত্যাদি বিষয়ে যে পারিভাষিক বাংলা শব্দাবলী গঠন করেন, তা বাংলা ভাষাকে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ ও আধুনিক যুগোপযোগী করে।

বাংলা ভাষার অনুশীলনে রাজশেখর সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধান বহুমূল্য আকর বিশেষ। বাংলা ভাষার চর্চা যাঁরা যথোচিতভাবে করবেন, যে সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মীরা সঠিক বানান লিখতে এবং সঠিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করতে চাইবেন এ গ্রন্থ তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। 'চলন্তিকা' শুধু সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত অর্থযুক্ত শব্দসম্ভার নয়, ব্যাকরণ ও ভাষাচর্চার অতি প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের সার সংগ্রহে সমৃদ্ধ। যথা,—বানানের নিয়ম পর্যায়ে সংস্কৃত বা তদ্ভব শব্দ, তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ; নানা সংস্কৃত শব্দের বানান, ণত্ব ও ষত্ব বিধি, সন্ধি প্রকরণ; বিস্তারিত ক্রিয়ারূপ; শব্দবিভক্তি ও কারক; সর্বনাম; অশুদ্ধ ব্যাকরণদুষ্ট শব্দের তালিকা ও শব্দের অপপ্রয়োগের কয়েকটি নিদর্শন, ইত্যাদি; তা ছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্র ও সরকারী কার্যে ব্যবহারযোগ্য পারিভাষিক শব্দাবলীর মূল্যবান সংযোজন। 'চলন্তিকা'র জন্যে তাই রাজশেখরকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ব্যক্তিস্বরূপে

এত বড় প্রতিভাধর ব্যক্তি যিনি, এমন বিভিন্নমুখী ছিল তাঁর প্রতিভার প্রকাশ, এত বিচিত্র গুণাবলীর সমাবেশ যাঁর চরিত্রে ঘটেছিল, ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর সদ্গুণের যেন অন্ত ছিল না। বলতে গেলে, তাঁর চরিত্র আদ্যন্ত উৎকর্ষের উপাদানেই গঠিত, কোন রকম অপকর্ষের খাদ তার মধ্যে মিশ্রিত হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম, আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।"—একথা রাজশেখরের রসসাহিত্য সম্পর্কে শুধু নয়, তাঁর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

এমন একজন আদর্শচরিত্র মানুষ—চরিত্র শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি—যে এদেশে জন্মেছিলেন, এ এক বিস্ময়ের বস্তু। যে আদর্শ গুণাবলী তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট তার বেশির ভাগই আমাদের জাতীয় জীবনে বর্তমানে লোপ পেয়েছে। অন্তত একটি মানুষের জীবনে তাদের সন্নিবেশ এখন নিতান্তই দুর্লভ।

নিয়মনিষ্ঠ, নিরলস, অহমিকাশূন্য এবং আত্মপ্রচার-বিমুখ। পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যাচরণ বর্জিত। শান্ত, গম্ভীর, স্বল্পবাক অথচ সুরসিক। দুঃখ-সুখে অবিচল এবং স্থিতপ্রজ্ঞ। মিতাচারী, মিতব্যয়ী অথচ বদান্য। স্পষ্টবাদী, জনপ্রিয়তার আকর্ষণে অন্যায়ের সমর্থনে পরাঙ্মুখ। গভীর সহানুভূতিশীল, স্নেহপ্রবণ এবং সংবেদনশীল অন্তর। অনাড়ম্বর অথচ অতিশয় সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার ধারা। মনে-প্রাণে স্বদেশপ্রেমী, স্বদেশ-কল্যাণব্রত অথচ জাতীয় সঙ্কীর্ণতাবিহীন, গ্রহণশীল মন। মুক্ত হৃদয়, মহাপ্রাণ এবং সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ভাস্বর চরিত্র। এত বিশেষণ ব্যক্তি রাজশেখরের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সার্থকভাবে।

চরিত্রের এই সব সদ্গুণ অনেকাংশে তাঁর পিতা চন্দ্রশেখরের (জন্ম: ১৮৩৩ খ্রী.) উত্তরাধিকার। রাজশেখরের মতন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখর এবং দুই কনিষ্ঠ কৃষ্ণশেখর ও ডঃ গিরীন্দ্রশেখর অল্প বস্তর এই গুণাবলীর লাভ করে পিতার ধরনের খাঁটি মানুষ হয়েছিলেন।

চন্দ্রশেখর বসু কর্মজীবনে কৃতী হন আপন নিষ্ঠা ও যোগ্যতার বলে। তাঁর ন্যায়পরায়ণ মন চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রথম জীবন থেকেই প্রকাশ পায়। যশোর জেলায় তিনি ডাক বিভাগের একজন সাধারণ কর্মচারী, তখনই সেখানকার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে সে সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠান কলকাতায়। কলকাতার ইণ্ডিগো কমিশনের তদন্ত-কার্য তাঁর সেই বিবৃতির ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ এমন সত্যের ভিত্তিতে রচিত।

কর্মদক্ষতা এবং সততার জন্যে তিনি স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ (যাঁর নামে কলকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের নামকরণ) সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং হগ সাহেবই তাঁকে প্রথম দ্বারবঙ্গের ষ্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের একটি কর্মে নিযুক্ত করে দেন। পরে নিজের যোগ্যতায় ক্রমে উন্নতি লাভ করে চন্দ্রশেখর হয়েছিলেন দ্বারবঙ্গ ষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার।

কিন্তু কর্মজীবনে সাফল্যই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়।

কর্মের অবসরে তিনি জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করতেন এবং তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল দর্শন ও সাহিত্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা জানা যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন চন্দ্রশেখর। গ্রন্থকার রূপেও তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর রচিত বেদান্ত প্রবেশ, সৃষ্টি, বেদান্ত দর্শন, অধিকারতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখ্য।

চন্দ্রশেখরের পৈত্রিক নিবাস (নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী) এককালে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বীরনগর বা উলা রস-রসিকতার জন্যে বিখ্যাত ছিল। তাঁর প্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের ৫০ বছর আগে উলার মুস্তোফী বংশে বিবাহ করবার পর থেকে বসুরা উলাবাসী হয়েছিলেন।

রাজশেখরের জন্ম হয় বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গ্রামের মাতুলালয়ে। শৈশব ও বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরে বিহারে অতিবাহিত। প্রথম বিদ্যাচর্চা আরম্ভ হয় মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে বাসের সময়। পরে ৮ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত দ্বারবঙ্গ রাজ স্কুলে পড়ে এণ্ট্রান্স পাশ করেন।

তার মধ্যে, কিশোর বয়সেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায় ১২ বছর বয়সে। সে সময় সমগ্র দ্বারবঙ্গ ডিভিশনের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান তিনি অধিকার করেন। সেজন্যে দ্বারবঙ্গের মহারাজা তাঁকে উপহার দেন একটি মুরেঠা।

বাল্যকাল থেকেই পিতার সান্নিধ্যে যে নিয়মনিষ্ঠা, শোভন রুচির আচার-ব্যবহার-জ্ঞানচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা, চারিত্রিক গুণের সমাদর থেকে আরম্ভ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এমন কি সুন্দর ছাঁদের হস্তলিপির পাঠ পর্যন্ত লাভ করেন, তার ফলে রাজশেখরের চরিত্র গঠন হয়ে যায় বরাবরের জন্যে।

এণ্ট্রান্স পাশ করবার পর দ্বারবঙ্গ থেকে পাটনায় এসে সেখানকার কলেজে ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খ্রীঃ পর্যন্ত পড়ে তিনি ফার্স্ট আর্টস পাশ করেন। তারপর কলকাতায় এসে ১৮৯৭-৯৯ পর্যন্ত বিজ্ঞানে বি, এ, পাঠ। এই সময়েই শ্যামাচরণ দের পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিজ্ঞানে এম, এ পাশ করা এবং আইন পড়ে শ্বশুরের আগ্রহে হাইকোর্টে যোগদান এবং তা পরিত্যাগ ইত্যাদি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মজীবনের আরম্ভ ও সমাপ্তি বেঙ্গল কেমিক্যালে এবং জীবনের শেষদিন ডিরেক্টররূপে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অর্ধশতাব্দেরও অধিককাল, প্রায় ৫৭ বছর একাদিক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে যেভাবে নিজেকে সম্পর্কিত রাখেন, তাও এক দৃষ্টান্তস্থল। তারপর ৪২ বছর বয়সে যে সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়ে অবিচ্ছেদ্য সাধনার দানে বাঙলা সাহিত্য বহু বিভাগে সুসমৃদ্ধ করে তাও তাঁর আদর্শনিষ্ঠ জীবনের এক পরম প্রকাশ এবং সাহিত্যিকদের পক্ষে প্রেরণা স্বরূপ।

সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবন সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়েছিল। প্রতিদিন ভোর চারটের সময় শয্যাত্যাগ করবার খানিকক্ষণ পরে চা পান ইত্যাদির শেষে লিখতে বসতেন তিনি। বকুল বাগানের বাড়ীর নীচের ঘরে বেলা ৯টা পর্যন্ত লেখার কাজ করে ওপরে যেতেন। বেলা এগারটার মধ্যে স্নানাহার। দুপুরে কিছু বিশ্রাম, কিছু পড়াশোনো। বিকালে সন্ধ্যায় বন্ধু যতীন্দ্রকুমার সেন, মাঝে মাঝে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে বসে বসে গল্পস্বল্প, সাহিত্য-শিল্প ও নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা। পার্শীবাগানের বাড়ীতে যেমন উৎকেন্দ্র সমিতি ছিল, তেমন বড় আসর না হলেও একটি ঘনিষ্ঠ চক্রের সাহিত্য-আসর বকুল বাগানের বাড়ীতেও তাঁর উত্তর-জীবনে বসত। মাসে একদিন করে অন্তরঙ্গ কয়েকজনের এই আসরে নতুন রচনা ইত্যাদি পাঠ করতেন জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

লেখা প্রথমে লিখতেন পেনসিলে, যাতে সংশোধন পরিবর্তন ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে রবার দিয়ে করা যায়। কাটাকুটির অপরিচ্ছন্নতা আদৌ পছন্দ করতেন না তিনি। কালিতে লিখতেন অতিশয় পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্তভাবে। লেখায় কোন কাটা বা অদল-বদল করতে হলে সেই মাপের কাগজ আটা দিয়ে সেখানে চাপা দিতেন, কোনরকম কাটাকুটি যাতে চোখে না পড়ে। পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত সুন্দর হস্তাক্ষরের সুশৃঙ্খল শব্দমালায় সজ্জিত থাকত। তাঁর অমলিন অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেন। সরলরেখার প্রতি পৃষ্ঠায় পঙক্তি শ্রেণী নির্দিষ্ট হিসাবে লেখা। সমগ্র রচনায় কত শব্দ আছে, ছাপার অক্ষরে কত পৃষ্ঠা হতে পারে, সমস্ত হিসাবই পাওয়া যায়। কোন বইয়ের পাণ্ডুলিপি যখন প্রকাশককে দিতেন, সমস্ত হিসাব নিজে ক'রে দিতেন—কত শব্দ আছে, কত পৃষ্ঠা আনুমানিক হবে ছাপায়। তাঁর হিসাব নির্ভুলই দেখা যেত ছাপাবার পর।

জীবনের প্রতিটি কাজের মতন সাহিত্য-কর্মও তাঁর

এমনি নানা অপূর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলায় চিহ্নিত থাকত। তাঁর বহিরঙ্গ জীবনের সেই সুশৃঙ্খল দৈনন্দিন ধারা কোন কারণে বিঘ্নিত হ'ত না। দুঃখ-সুখে কখনও আত্মহারা হ'তে দেখা যায় নি তাঁকে। অসীম সহনশীলতা ও ধৈর্য ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম জীবনে পরিপূর্ণ সুখের সংসারেও যেমন তাঁর মনে কোনদিন চাপল্য জাগে নি, মধ্যবয়সে নিদারুণ শোকও তেমনি অসাধারণ মানসিক বলে নীরবে সহ্য করেছিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান আদরের কন্যা অকস্মাৎ পরলোকগতা হন, স্বামীর মৃত্যুর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে। রাজশেখরের জামাতা বহুদিন থেকে দুরারোগ্য রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা সম্পূর্ণ সুস্থ থেকে স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করতেন। অবশেষে স্বামীর মৃত্যু যখন অবধারিত জানা গেল, সে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা মাত্র পূর্বে রাজশেখর-কন্যার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর শেষকৃত্য হয় একই চিতাশয্যায়। ঘটনাটি সেদিন প্রায় অলৌকিক বলে প্রচারিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সংবাদ পেয়ে তাঁকে সহানুভূতি জানাতে আসেন তাঁর তথনকার আবাসস্থল সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে।

সেই মহাশোকের সময়েও বাইরে থেকে অবিচলিত দেখা যায় রাজশেখরকে। কিন্তু তখন থেকেই তিনি এতদিনের সখ ও আনন্দের বস্তু ছবি আঁকা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। মনের একান্ত নিভৃতিতে দুঃখ-ভোগের ওই একটিমাত্র বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল তাঁর। আর কন্যার মৃত্যুতে একটি কবিতা রচনা করলেন 'সতী' নামে, যা তাঁর কোন পুস্তকে প্রকাশিত না হওয়ায় এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল :

> নিঃশব্দে কৃতান্ত কহিল দ্বার ঠেলি'—
> 'ছাড় পথ হে কল্যাণী, আনিয়াছি রথ,
> জীর্ণ দেহ হ'তে আজি পতিরে তোমার
> মুক্ত দিব। ধৈর্য ধর শান্ত কর মন।'
> কৌতুকে কহিল সতী—'দেখি দেখি রথ।'
> সম্ভ্রমে বলে যম—'দেখ দেখ দেবী,
> রথশয্যা মাতৃ অঙ্ক সম সুকোমল
> ব্যথাহীন শান্তিময় বিশ্রাম-নিলয়,
> কোন চিন্তা করিও না হে মমতাময়ী।'
> চকিতে উঠিল রথে বসে সীমন্তিনী
> বিদ্যুৎ-প্রতিমা সম। শিরে হানি' কর
> বলে যম—'কি করিলে কি করিলে দেবী!
> নামো নামো এ রথ তোমার তরে নয়।'
> দৃপ্ত স্বরে বলে সতী—'চালাও সারথি,
> বিলম্ব না সহে মোর, বেলা বহে যায়।'
> উল্কাসম চলে রথ জ্যোতির্ময় পথে,
> স্তব্ধ বসুন্ধরা দেখে কোটি চক্ষু মেলি।
> প্রবেশি অমর লোকে জিজ্ঞাসে শমন—
> 'হে সাবিত্রীসমা, বল আর কি করিব?'
> কহে সতী—'ফিরে যাও আলয়ে আমার,
> যার তরে গিয়াছিলে আনো শীঘ্র তারে।'
> কৃতান্ত কহিল—'অয়ি মৃত্যু বিজয়িনী'
> নিমেষে যাইব আর আসিব ফিরিয়া।,

জামাতা অমরনাথ পালিতের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান (একটি সাবান প্রস্তুত করবার কারখানা) ও বাসস্থল ছিল বালীগঞ্জে লেক পার্কের পাশে। তারই কাছে রাজশেখর নিজে প্ল্যান করে একটি বাড়ী করেছিলেন। সেখানে কন্যার কাছাকাছি বাস করবার ইচ্ছা ছিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর। কন্যা জামাতার আকস্মিক মৃত্যুতে সেখানে বাসের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়, পরে যখন ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্যে একটি সেবাসদন প্রতিষ্ঠায় উদযোগী হলেন, যখন রাজশেখর সেই বাড়ীটি দান করলেন এই সৎ কর্মের প্রচেষ্টায়। বাড়ী তখন একতলা ছিল, পরে ক্রমে বর্ধিত হয়। রাজশেখরের সেই বাড়ীতে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের বিখ্যাত লুম্বিনী পার্কের মানসিক চিকিৎসালয়টি গড়ে ওঠে। লুম্বিনী পার্ক নামটিও রাজশেখর রেখেছিলেন তাঁর এই গৃহনির্মাণের পর।

তা ছাড়াও, রাজশেখরের আরও অনেক দান ছিল—সবই গোপন। দানের কথা তিনি কখনও প্রকাশ করতেন না এবং গ্রহীতাদেরও তা গোপনে রাখবার নির্দেশ দিতেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর দানের কথা যেন প্রকাশিত বা প্রচারিত না হয়। কিন্তু তাঁর জীবনচরিত আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত থাকলে জীবনী লেখকের কর্তব্যপালনে ত্রুটি থেকে যায়। রাজশেখরের স্বর্গত আত্মা যেন তাঁর নির্দেশ অনুসরণে অক্ষমতার জন্যে লেখককে ক্ষমা করেন। এমন মহৎ দৃষ্টান্তের পরিচয় তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর অজ্ঞাত থেকে যাওয়া উচিত বিবেচনা হয় না। সুতরাং তাঁর কয়েকটি দানের কথা ব্যক্ত করা হ'ল এখানে।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত তাঁর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার দু'টি পুস্তিকার ('ভারতের খনিজ' ও 'কুটিরশিল্প') গ্রন্থসত্ব তিনি দান করে দেন। বিশ্বভারতীর ল্যাবরে-

টরির সাহায্যকল্পে দান করেন ১০০০ (এক হাজার) টাকা। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্যে এ্যাকাডেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকাও তিনি দান করেছিলেন। এসব ছাড়াও আরও অনেক গোপন দান তাঁর ছিল নানা সময়ে নানা ব্যক্তিকে, যা কোন তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

এমন নিভৃতচারী আত্মগোপনকারী মানুষ ছিলেন তিনি। জ্ঞানচর্চায় আত্মনিবেদিত তাঁর জীবন বাইরে থেকে আত্মমুখী মনে হলেও অন্তর তাঁর মানবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল ....

তাঁর যে মানসিক স্থৈর্যের কথা আরও উল্লেখ করা হয়েছে, তা অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত। মধ্য জীবনে কন্যার মৃত্যুতে তিনি মহাশোক পেয়েছিলেন। তারপর বৃদ্ধ বয়সে যে শোক পেলেন, তাও কি মর্মন্তুদ। পত্নীরূপে আদর্শ ছিলেন তাঁর গৃহলক্ষ্মী। সুখে-দুঃখে সেবায়-যত্নে একান্ত পতিপরায়ণা। সাহিত্য-সাধিকা অনুরূপা দেবী—যিনি রাজশেখরের সহধর্মিণীকে জানতেন—তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তিনি পরশুরামের "হাস্য সরসতার উৎস"। রাজশেখরের সেই প্রায় অর্ধ শতাব্দের জীবনসঙ্গিনী অকস্মাৎ যেন কন্যারই মতন ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করেন। বকুলবাগানের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় একদিন প্রত্যুষে তাঁকে শায়িতা দেখা যায় কন্যাজামাতার মর্মর মূর্তির পাশে। অনেক ডাকেও কোন সাড়া না পেয়ে ডাক্তার আনা হয়। তিনি পরীক্ষা করে জানান: আগেই মৃত্যু হয়েছে।

আশ্চর্য হই যে, তার পূর্ব রাত্রি পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, কোন রোগের কথাও জানা যায় নি। বাড়ীতে তাঁর ভগিনী, ভগ্নীপতি এসেছিলেন—সকলের সঙ্গে কথাবার্তায়, স্বাভাবিক কাজকর্মে দিনান্ত হয়েছে। তারপর গভীর রাত্রে তিনি কখন উঠে এসেছিলেন প্রাণ-পুত্তলি কন্যার মূর্তির পাশে, কখন তাঁর আকস্মিক জীবনান্ত ঘটেছে সেখানে—একথা কেউ জানতে পারেন নি। রাজশেখরও না। এত অগোচরে এতদিনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী চলে গেলেন চিরকালের জন্যে।

রাজশেখরের মতন প্রেমময় স্বামী যে শূন্যতা অনুভব করলেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু নিজেকে সংবৃত করে নিতেও তাঁর বেশি বিলম্ব হয় নি। যথা, শৃঙ্খলা তাঁর কর্তব্যপূর্ণ জীবনযাত্রার ধারা, তাঁর জ্ঞানচর্চা এবং সাহিত্য-সাধনা ইত্যাদি চলেছিল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আমৃত্যু।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও সাহিত্য রচনা থেকে কখনও বিরত হন নি। কারণ বহুমুখী মানস সত্ত্বেও ছিলেন প্রধানত সাহিত্য-সেবক। সাহিত্যিক জীবনই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন। শেষ লেখা অসম্পূর্ণ থেকেছে মৃত্যুরই জন্যে।

আর সে কি আদর্শ মৃত্যু! কোন রোগযন্ত্রণা নয়, বৈকল্য নয়, বিকৃতি নয়, কাউকে কোন কষ্ট দেওয়াও নয়। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে চুপি চুপি সে আর এক আশ্চর্য পরলোকযাত্রা।

বয়স তখন ৮১ বছর চলেছে। যথারীতি ধীর স্থির চিত্তে সেদিনও অতি প্রত্যূষ থেকে একে একে করণীয় কাজ করেছেন প্রায় দুপুর পর্যন্ত। আহারের পর দোতলা থেকে বেরুবার সাজে নীচে নেবে এসে বসবার ঘরে খানিক বিশ্রাম করে নিচ্ছেন। একটু পরেই বেরুবার কথা। বেঙ্গল কেমিক্যালের ডিরেকটর্স বোর্ডের মিটিং আছে, সেখানে যোগ দিতে যাবেন। গাড়ি রাস্তায় বার করে রেখে সোফেয়ার অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্যে।

তিনি একটু ঘুমিয়েছেন মনে করে কেউ তাঁকে তখন ডাকে নি। খানিকক্ষণ পরে ড্রাইভার এল ডাকতে। এখন যাবেন কি?

কিন্তু তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। প্রশান্ত মুখ চিরবিশ্রামে নিদ্রামগ্ন। কে সাড়া দেবেন? কখন সকলের অলক্ষ্যে কোন্ অজানা লোক থেকে তাঁর জন্যে অদৃশ্য রথ এসেছিল আর তিনি যাত্রা করেছেন কোন্ সুদূরে—কেউ তার সন্ধান জানে না!

রচিত গ্রন্থাবলী

১) গড্ডলিকা (গল্প। প্রথম সংস্করণ, ১৩৩২ সাল)
২) কজ্জলী (গল্প ,, ,, ১৩৩৫ ,,)
৩) হনুমানের স্বপ্ন (গল্প)
৪) গল্পকল্প (গল্প)
৫) আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প (গল্প ,, ,, ১৩৫০ ,,)
৬) কুটির শিল্প (প্রবন্ধ)
৭) ভারতের খনিজ (প্রবন্ধ ,, ,, ১৩৫০ ,,)
৮) বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ , ,, ১৩৫৩ ,,)
৯) মহাভারত (সারানুবাদ ,, ,, ১৩৫৬ ,,)
১০) মেঘদূত (অনুবাদ ,, ,,)
১১) চলন্তিকা (অভিধান ,, ,,)
১২) চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প (গল্প ,, ,, ১৩৫২ ,,)
১৩) ধুস্তুরি মায়া ইত্যাদি গল্প (গল্প ,, ,, ১৩৫৯ ,,)
১৪) কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (গল্প ,, ,, ১৩৬০ ,,)
১৫) নীলতারা ইত্যাদি গল্প (গল্প ,, ,, ১৩৬৩ ,,)
১৬) লঘুগুরু (প্রবন্ধ, প্রথম সংস্করণ)
১৭) বিচিন্তা (প্রবন্ধ ,,)
১৮) চলচ্চিন্তা (প্রবন্ধ ,,)
১৯) পরশুরামের কবিতা (কবিতা প্রথম সংস্করণ)
২০) হিতোপদেশের গল্প (অনুবাদ ,, ,,)
২১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (অনুবাদ ,, ,,)

আমাদের দেশের বাবু লোকেরা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত ত নহেই। যাহারা চাষ করিয়া কুলি মজুরের কাজ করিয়া বা কোন প্রকার কারিগরি মিস্ত্রিগিরি করিয়া খায় তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পুষ্পপ্রীতি

প্রতিমা ঠাকুর

শ্রুতিলেখক—ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

"নীলমণিলতা গাছটার বিদেশী নাম Patria। গুরুদেবের এক পুরাতন ভৃত্য ছিল, তাকে উনি খুব স্নেহ করতেন, সে উড়িষ্যাবাসী, নাম বনমালী। তার সব সময়ে বাবামশায়ের কাছে থাকা চাই। যদিও বার্ধক্য এসেছিল তারও, বনমালী সামনে না থাকলে ওঁর গল্প এবং খাওয়া জমত না। বনমালীর সঙ্গে উনি নানান গল্প করতেন, ওদের ভ যাতে মজা করে আরও সব লোকজন যাদের সঙ্গে বনমালীর বন্ধুত্ব আছে তাদের নিয়ে অনেক humorous গল্প করতেন। বনমালীর এমন গুণ যে গুরুদেবের সঙ্গে থেকে ওঁর humour-ও সব বুঝে গিয়েছিল। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে বনমালীও হাসছে, যেন মস্ত সমঝদার। তাকে গুরুদেব নীলমণি বা অনেক সময়ে নীলমণি বলতেন। গুরুদেব বলতেন, আমার বনমালীকে নীলমণি নামে ডাকব।

ফুলের নতুন নতুন নামকরণও করে গেছেন। কেউ হয়ত কোপাই-এর ধারে গেছে; কোন ফুলের গন্ধ বা বর্ণ ভাল লাগলে বলতেন, ওই ফুলের গাছটা দেখ, ওই ফুল নিয়ে আসিস। শান্তিনিকেতনে লাগান হ'ল। এই রকমের একটি বনফুল বোধ হয় কোপাই থেকে এনে ওঁকে দেখায় এবং তার নাম দেন বনপুলক। সে গাছ উদীচী বাড়ীর কাছে লাগান হ'ল। এখনও আছে। এ সুগন্ধি ফুল, কোপাই আর অজয়ের ধারে ধারে জঙ্গলে পাওয়া যায়। চামেলির নাম দেন চামেলিয়া, সোনাঝুরি, হিমঝুরি তাঁরই দেয়া নাম। হিমঝুরি শীতের ফুল, রঙ সাদা; উদীচীর গা বেয়ে পূব থেকে পশ্চিমে চলে যায় গাছের শ্রেণী। দেখতে রজনীগন্ধার মত।

কোণার্কের পেছনের জমিতে কণ্টিকারি এবং নানা রকমের কাঁটাগাছ পোঁতালেন; বললেন, এই বাগানটা হবে তোমাদের Civilised ফুলের নয়, এখানে আমার যত সাধারণ গাছ থাকবে। সে বাগানের কিছু চিহ্ন নেই, ঘর হয়ে হয়ে সব নষ্ট হয়ে গেছে। গুরুদেব যেমন অন্যান্য ফুলও ভালবাসতেন সেই রকম cactus জাতীয় ফুল, কাঁটাগাছও ওঁর খুব প্রিয় ছিল। খোয়াইতে ঝামা পাওয়া যায়, সেই ঝামা দিয়ে তিনি বাগান বানিয়েছিলেন। cactus এবং এখানে যে সব গাছ জন্মায় তা দিয়ে সুন্দর করে বাগান সাজানো হ'ল। সে সব দেখে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। এ ধরনের গাছগুলো আপনার থেকে বেড়ে ওঠে, বেশী সার লাগাতে হয় না। কাঁটাগাছের বাগান তৈরির সময়ে তাঁর বয়স ছিল ষাটের মত। কণ্টিকারির বেগুনী ফুল, শেয়ালকাঁটার হলুদ ফুল—এই রকম নানা রঙের বাহার দেখে প্রচুর আনন্দ পেতেন। ঝামা থাকার জন্যে ওখানে প্রচুর সাপের উপদ্রব হতে লাগল। তখন ওসব তুলে ফেলে দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হ'ল। এইখানে বাবলাজাতীয় এক ধরনের কাঁটাগাছ ছিল ত্রিপুরা থেকে আনা। তার নাম রাখা হয় কাঁটানাগেশ্বর।

তাছাড়া মশলাজাতীয় গাছ ধনে, সর্ষে, মৌরি এদের ফুল উনি খুব ভালবাসতেন। এক এক জায়গায় লাগানো হ'ত এবং তা দেখে কবি যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। এসব গাছ ওঁর বাড়ীর চারপাশে লাগানো হ'ত, যেখান থেকে সব সময়ে উনি তাদের দেখতে পেতেন। সর্ষে ফুল আর তার খেতি দেখতে বাবামশায় বড্ড ভালবাসতেন,—অনেক সময় এসব গাছ ওঁর নিজের বাগানের কাছাকাছি লাগিয়ে দেওয়া হ'ত ঘন করে।

আর একটা ফুল আছে, তার ইংরাজী নামও আছে, সাঁওতালরা এ ফুল ভালবাসে, তারা একে বলে লাঙ্গুল ফুল, ফুল হয় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে, শরতের শেষ পর্যন্ত খুব ফোটে। সুন্দর বাহারে ফুল, সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় পরে—রঙ হচ্ছে লাল আর হলদে, অগ্নিশিখার মতই; তাই গুরুদেব নাম দিয়েছিলেন অগ্নিশিখা। অগ্নিশিখা প্রথম মীরাদির[১] বাড়ী মালঞ্চে একটি সাঁওতাল মেয়ে কবিকে দেয় এবং ওঁর বাড়ীতেই ফুলটির নাম রাখলেন অগ্নিশিখা।* এ ফুল যেখানে হয় বেশ হয়, তবে transplant করলে ফুল হতে দেরি হয়। এ ফুলের চেহারাটা মনে অগ্নিশিখার মত একটা ধারণা এনে দেয়। শজনে ফুল ও চালতাফুল বাবামশায়ের প্রিয় ছিল। শান্তিনিকেতনের বাগানে অনেক শজনে ফুল লাগানো হয়েছিল। তা ছাড়া, শাল শিমুল বড় বড় গাছ কবির অতি প্রিয় ছিল—তাদের গাম্ভীর্য কবিকে অভিভূত করত।

১। কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবী।

* শান্তিনিকেতনে গাছটি আমি লাগিয়েছিলাম।

বিদেশী ফুল পেলে দেখতে ভালবাসতেন, প্রশংসা করতেন। বিদেশী বা ঠাণ্ডা দেশের ফুলে রঙএর বাহার বেশী। কবি অবশ্য সুগন্ধি ফুল বেশী পছন্দ করতেন। রজনীগন্ধা, বেল, চাঁপা এসব ফুল ওঁর প্রিয় ছিল। ওঁর ঘরে সব রকমের ফুল থাকত, ফুলের কোন পার্থক্য করতেন না। বকুল শিউলি চাঁপা ওঁর ঘরে থালা থালা থাকত। সঙ্গে আকন্দও থাকত। কবি বলতেন, আকন্দ বড় decorative। কলাভবনের মেয়েরা আকন্দের মালা গাঁথত, কবিকে প্রায় দিতে আসত।

শিউলি কবির অতি প্রিয় ফুল ছিল। শিউলির কত গান যে লিখেছেন। উত্তরায়ণে ও তার বাইরে শিউলকুঞ্জ ছিল। কবি ভোরে শেফালি বনের মধ্যে দিয়ে পায়চারি করে উত্তরায়ণে এসে চা খেতেন। কাঁকর ঢালা পথ শিউলি বিছানো থাকত। এখন ও জায়গায় শেফালিকুঞ্জ নেই।

পারিজাত বলতে ত স্বর্গীয় ফুলই বুঝি আর কাব্যে তিনি সেই ভাবেই ব্যবহার করেছেন বলে জানি।

ঝিমঝুরির মত সোনাঝুরি ওঁর প্রিয় ছিল। হলদে রঙএর ফুল। লতার মধ্যে মাধবীলতা ছিল কবির বড় আদরের। পলাশ শিমুল কাশের সময় ওঁর আনন্দ দেখবার মত। প্রকৃতি সম্পর্কে ওঁর interest বা জানবার আগ্রহ খুব বেশী ছিল, সেই সূত্রে গাছপালা সম্পর্কেও interest ছিল। শিশুকাল থেকে এটা develop করে। ছেলে বয়সে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে opportunity বড় একটা পেতেন না। শান্তিনিকেতনের বাগান ছাড়া শিলাইদহে কিছু বাগান করেছিলেন।

কবির হাতে লাগানো পলাশে প্রথম ফুল ফোটে উনি যে বছর মারা গেলেন। এই গাছটিতে মাঘ মাসে ফুল ফোটে কিন্তু আশ্রমের অন্য গাছে ফুল ফোটে ফাগুনে। গাছটি এখনও আছে উত্তরায়ণে। কবির খেয়ে ফেলে দেওয়া আমের আঁটি থেকে আম হয়। সে গাছও বেঁচে রয়েছে।

মৃণালিনী স্কুল (বর্তমানে আনন্দ পাঠশালা) বাড়ীর কাছে মৃণালিনী দেবীর পিসীমা প্রথম আম জাম কাঁঠাল নানা ফলের বাগান করেন। জবা বেল করবী কামিনী দিশি ফুলের বাগানও ওখানে ছিল। তরকারি খেতিও ছিল। একজন বুড়ো মালী দেখাশোনা করত। বর্তমানে সে বাগান নেই, দু'চারটি গাছ আছে মাত্র। এখন ওখানে ছেলেদের খেলার মাঠ। কবির অতি প্রিয় একটি মধুমালতী গাছ ছিল। কবির ছোটছেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে এই গাছের চারাটি কোথা থেকে নিয়ে আসে. সে নিজে মাটিতে লাগিয়েছিল। ছেলে মারা যাবার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাবামশায় এ গাছটির প্রতি নজর রেখেছিলেন। সকলকে বলতেন, আমার এ গাছটি তোমরা সব সময়ে দেখ,—তদারক কর, ওকে বাঁচিয়ে রেখ।

[কবির পুষ্পপ্রীতি সম্পর্কে প্রতিমাদেবীর সঙ্গে আলোচনাকালে মীরাদেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, কোণার্কের পাশে যে শিমুলগাছটি রয়েছে বাবার নির্দেশে তাতে মাছ ইত্যাদির সার দেওয়া হ'ত। সময়ে সময়ে বাবা বলতেন, 'ওকে মাছের ঝোল খেতে দাও।' গাছতলায় মাছের ঝোল দেওয়া হ'ত।

আলোচনা শেষে মীরাদেবী আমাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরায়ণ, মালঞ্চ এবং পথের দু'ধারের গাছপালা দেখাতে লাগলেন, তাদের সম্পর্কে পুরাণো দিনের নানা কথা বলে যাচ্ছেন, কত গাছের কত ইতিহাস যা হয়ত শুধু তাঁরই জানা রয়েছে তা শুনছি, কত গাছ কত ফুল যা আমি চিনি না যত্ন করে চিনিয়ে দিচ্ছেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, শরীর অসুস্থ সে সব কথা সেদিন ভুলে গিয়ে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন; সেই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল।

———

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

সুখের সীমা—দুঃখের শেষ···

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, মায়া দু'তিনটি শিশু পুত্র-কন্যা নিয়ে বিধবা হয়েছে। দাকতার দত্ত, হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ভগবানের রাজ্যে সুখের সীমা নেই—দুঃখের ও শেষ নেই।

রবীন্দ্রনাথ গানে লিখেছেন—

"দুঃখ যদি না পাবে ত' দুঃখ তোমার ঘুচ্‌বে কবে?
······জ্বলতে দে তোর আগুনটারে,
ভয় কিছু না ক'রিস তারে—
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বল্‌বে না আর কভু তবে।"

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সুখের সীমা ও দুঃখের শেষ যদি সাধারণ মানুষে সবাই দেখে যেতে পারত, তবে কি সেটা সুখের হ'ত—না দুঃখের? ছাই হয়ে নিভবার দরকার দেখি না—জ্বলুক আগুন দিনরাত্রি—জ্বলে-পুড়ে পবিত্র সুন্দর হোক জীবন।

"আগুনের পরশমণি ছোঁওয়াও প্রাণে—
এ জীবন পুণ্য ক'রো দহন দানে।"

১৯৫২। কলকাতায় আমার ছবির একক প্রদর্শনী

জুন মাসে ছুটি আরম্ভ হতেই মুসুরীতে সাভয় হোটেলে প্রতি বছরের মত এবারেও প্রদর্শনী করলাম। সেখানকার পাট তুলে দেরাদুনে ফিরে—জুলাই মাসের প্রথমেই ছবির পাতত্তাড়ি নিয়ে কলকাতায় গেলাম। ক'লকাতার অ্যাকাডামী অফ ফাইন আর্টস-এর প্রেসিডেন্ট—লেডী রাণু মুখার্জির চিঠি পেয়েছিলাম। তাঁরা অ্যাকাডামীর স্যালোতে আমার ছবির প্রদর্শনী করবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কলকাতায় আমি ১৯৪০ সালে বন্ধুবর পুলিনবিহারী সেনের 'হিন্দুস্থান-পার্ক'এর বাড়ীতে প্রথম প্রাইভেট একক প্রদর্শনী করেছিলাম। তাতে কলকাতার বহু বিশিষ্ট শিল্পানুরাগীরা এসেছিলেন। তারপর আবার আমার এক কাকার বাড়ীতে (শ্রীব্রহ্মধীর খাস্তগীর) বালিগঞ্জে প্রদর্শনী ক'রেছিলাম, সেও অত্যন্ত নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই। সুতরাং ১৯৫২ সালে জুলাই মাসের শেষে কলকাতায়···অ্যাকাডামী অফ ফাইন আর্টস-এর স্যালোতে যে প্রদর্শনী ক'রি, সেটাই আমার ক'লকাতায় প্রথম একক-প্রদর্শনী বললে ভুল বলা হবে না। এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন ক'রেছিলেন প্রবীণ শিল্প-রসিক শ্রীঅর্ধেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী। কলকাতার সব কাগজেই প্রদর্শনী সম্বন্ধে নানান রকম আলোচনা বার হয়েছিল। শিল্পী পক্ষে সব চাইতে কষ্টের কথা হচ্ছে যখন খবরের কাগজে কোন খবরই বার হয় না। প্রশংসা শুনতে ভাল, গালিগালাজ শুনতে ভাল নয় কিন্তু নীরব উপেক্ষা যে অসহ্য। আমার ভাগ্য ভাল যে, এই

প্রদর্শনীতে উপেক্ষা পাই নাই। প্রশংসা পেয়েছিলাম অনেক কাগজে এবং যাঁরা গালি দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে গালি না পেয়ে প্রশংসা পেলে দুঃখের ব্যাপার হ'ত।

কলকাতায় প্রদর্শনী করে আবার দেরাদুনে ফিরে গেলাম। লেডী রাণু মুখার্জীর পৃষ্ঠপোষকতায় সেবারে কলকাতার প্রদর্শনী এক রকম ভালই উৎরে গিয়েছিল বলা যেতে পারে।

জুন, ১৯৫৩

স্কুল মাষ্টারি করতে করতে মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি শিল্পী। প্রকৃত শিল্পীর মন উদার ও উন্মুক্ত। কিন্তু ছোটখাটো খুঁটিনাটি স্কুলের ব্যাপারে মন লিপ্ত হয়ে মনকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে। তার থেকে নিজেকে বাঁচানো অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে পড়ে কখনও কখনও। মাষ্টারদের মীটিংএ মাষ্টাররা ঝগড়া বাধাবে—তাতে আমাকেও লিপ্ত হ'তে হবে—কারণ আমি শিল্পী হলেও মাষ্টার ত।—নিজের কাজের ক্ষতি এতে বড় কম হয় না। যাই হোক, এরই ভেতর কোন রকমে নিজের কাজ চালিয়ে যাই। শেখানো চলে, শেখাও চলে। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল।—আবার সেই জুন মাস। শ্যামলী এবারে শান্তিনিকেতনের ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই 'ব্রহ্মধীর কাকা ও কাকী'র সঙ্গে দেরাদুন পৌঁছে যায়। কাকা ও কাকী দুতিন সপ্তাহ আন্দাজ দেরাদুনে কাটিয়ে ক'লকাতায় ফিরে যান। আমি শ্যামলীকে নিয়ে জুনের প্রথমেই মুসৌরী রওনা দিই। সঙ্গে ছবির পাততাড়ি—প্রদর্শনী করতে হবে বৈকি!

* * * *

'ফারল্যাণ্ড-হল'

লাইব্রেরী বাজার থেকে যে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে সারলাভিল হোটেলের দিকে চলে গেছে—সেই রাস্তা ধরে চলে যেতে হবে। সারলাভিল হোটেল পার হয়ে গিয়ে পাওয়া যাবে তিনটি রাস্তা। একটি গেছে দাক্তার অমরনাথ ঝ'ার বাড়ীর পথে—ডিক রোড।

নীচের রাস্তাটা চলে গেছে হ্যাপি ভ্যালি-র দিকে।

ছোট একটি বোর্ডিং হাউস। মিসেস ডেভনপোর্ট, বাড়ীর কর্ত্রী। মধ্যবিত্ত 'এ্যাংলো সাইজড' ভারতীয়েরা এই বোর্ডিং হাউসে এসে থাকেন। য়ুনিভার্সিটির ভারতীয় প্রফেসর, ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান সেবিকা, দুন স্কুলের মাষ্টার আবার বম্বে থেকে নাম-করা বড়লোক পার্শী—মিসেস মারিয়েল ওলাও এখানে এসেছিলেন সেবারে—তাঁর বুড়ো বাপ মাকে নিয়ে।

মুসৌরীতে একক প্রদর্শনী, ১৯৫৩

ফারল্যাণ্ড হলে, এসে উঠলাম শ্যামলীকে নিয়ে। ওখানে উঠবার কারণ ছিল। দুন স্কুলের একজন অধ্যাপক বন্ধু—সাহী, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে এইখানে উঠেছেন। মিসেস সাহী ইংরেজ মহিলা—ভদ্র নম্র শ্যামলীকে স্নেহ করেন। তিনি কাছে থাকলে শ্যামলীর পক্ষে ভাল, একটু দেখাশোনা করতে পারবেন, সে ভরসা ছিল। ফারল্যাণ্ড হলে, তিন সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল। সেবারেও সাভয় হোটেলেই প্রদর্শনী করলাম। কপুরতলার মহারাজকুমার 'করমজিৎ সিং' সেই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করলেন। ছবি বিক্রীও মন্দ হ'ল না।

মনে আছে ছবির প্রদর্শনী যেদিন আরম্ভ হ'ল—সেদিন সে কি বৃষ্টি—আকাশ-ভাঙা ব্যাপার। ব্রেকফাষ্টের পর সাভয় হোটেলে আমি ও শ্যামলী কোন রকমে গিয়ে পৌঁছলাম। তার আগের দিনই অবশ্য সব ছবি টাঙিয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রদর্শনী ঘরে ঢুকবার আগে শ্যামলীর নজর পড়ল নির্মল ও জয়িতার ওপর। নির্মল চট্টোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন—জয়িতা তাঁর কন্যা—শ্যামলীর সঙ্গে ভাব ছিল। তারা বিশেষ কাজে দেরাদুনে এসেছিল সেবারে—আমাদের দেরাদুনে না পেয়ে, মুসৌরীতে দেখা করতে এসেছিল।

* * * *

বৃষ্টির মধ্যেই খুব হৈ চৈ ক'রে প্রদর্শনী ত খুলে গেল। তারপর লোক ক'মলে আমি ও নির্মল এক জায়গায় বসলাম। নির্মল ব'ললে 'রথীবাবুর শরীর খারাপ। তাঁর জন্যই বাড়ী ঠিক ক'রতে সে দেরাদুনে এসেছে। রাজপুরে একটি বাড়ী ঠিক করা হয়ে গেছে। রথীবাবু সুবিধে মত একটু বর্ষা কমলেই সেখানে এসে থাকবেন।' আমি শুনে অবাক হ'লাম। কারণ দেরাদুনে

—এতদূরে শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসে থাকবেন—কেমন যেন অদ্ভুত মনে হ'ল। বড়লোকের ব্যাপার, সবই সম্ভব। সুতরাং সে বিষয়ে ভাববার বেশী কিছুই ছিল না। নির্মল ও জয়িতা সেইদিনই ফিরে গেল। আমরা জুনের শেষে প্রদর্শনী শেষ ক'রে কলকাতা রওনা দিলাম।

দাকতার সুনীল বসু

কারল্যাণ্ড হলে থাকতে অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। সারলাভিল হোটেলে দাকতার সুনীল বসু তাঁর ছেলেমেয়ে ও পামোরানীয়ান কুকুর দুটোকে নিয়ে এসে সেবারে গরমের সময়টা ছিলেন। সুনীল বসু মহাশয় নেতাজী সুভাষ বসুর ভাই। কলকাতার একজন নাম-করা হার্ট-স্পেশালিষ্ট ছিলেন। প্রায়ই আমরা একসঙ্গে বেড়াতাম। তিনি আমায় অনেক গল্প বলেছিলেন তাঁর ভাই সুভাষবাবু ও শরৎবাবুর বিষয়। মনে পড়ে এক'দিন কথায় কথায় ব'লেছিলেম যে, এই বছরটা তাঁর ভয়ের সময়, এ বছর কাটলে তিনি আরও কয়েক বছর বেঁচে যাবেন। তাঁর অন্য দু'ভাই এ বয়সেই মারা যান। হার্ট চিকিৎসার বিষয় গল্প করতে করতে হেসে বলেছিলেন—'অতি খারাপ হার্ট'-এর রুগীকেও তিনি চিকিৎসায় অন্ততঃ কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। মুসৌরী থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি আর বেশীদিন বাঁচেন নি। খবরের কাগজে হঠাৎ একদিন তাঁর মৃত্যু খবরে মর্মাহত হয়েছিলাম। হার্ট-এর স্পেশালিষ্ট হার্টের রোগেই সম্ভবতঃ মারা যান।…

জেনারল রুদ্র

জেনারল রুদ্র ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হ'ত—গল্প-গুজবও হ'ত। তাঁরাও সারলাভিল হোটেলে ছিলেন। জেনারল রুদ্র তাঁর যুদ্ধের গল্প বলে আমাদের অনেক সময় আনন্দ দিতেন।…

গল্প নয়—সেগুলো সত্য ঘটনা। বর্মায় তাঁদের কত কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছিল—সে গল্পও তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি। দেরাদুনে তাঁরা শেষ জীবনে বাসা বেঁধেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ভাল পিয়ানো বাজাতেন। দেরাদুনে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। এখন কোথায় কি জানি—অনেকদিন তাঁদের খবর পাই না। এমনি করে কত লোকের সঙ্গেই ত' দেখা হয়—আলাপ হয়, বন্ধুত্ব হয়। মনে কেউ কেউ ছাপ রেখে যায়। কিন্তু তারপর কে কোথায় যায়, অনেক সময় তার খবর রাখতে পারি কৈ?

জুলাই, ১৯৫৩। আবার কলকাতায় একক প্রদর্শনী

মুসৌরী থেকে ফিরে এবারও কলকাতায় ছবির পাততাড়ি নিয়ে পৌঁছলাম। উঠলাম এবার বিবেকানন্দ রোডে—ছোটদির বাড়ী অর্থাৎ দাকতার দেবপ্রসাদ মিত্রের বাড়ী। প্রদর্শনী করব—লেডী রাণু মুখার্জির সঙ্গে দেখা করলাম। অ্যাকাডামী অফ ফাইন আর্টস-এর স্যালোতেই প্রদর্শনী করব সব ঠিক হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে এবার কাকে দ্বার উদ্ঘাটন করতে বলা যায়—ভাববার বিষয় হ'ল। এখনও আমাদের দেশে দ্বার

শ্যামলীর সহিত

উদ্ঘাটন করবেন যিনি তাঁর ওপর প্রদর্শনীর সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর ক'রে। ঠিক হ'ল, গভর্ণরকে দিয়ে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করার। লেডী রাণুই হরেন বাবুকে বলবেন প্রথমে ঠিক হ'ল। পরের দিন টেলিফোনে লেডী মুখার্জি খবর দিলেন—হরেনবাবু রাজী হয়েছেন। এবারে আমাকে নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। মাথায় বাজ পড়ল। গভর্ণরের সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখা করা সে কি সোজা কথা। ব্রিটিশ আমলে কত পুলিশ—কত চৌকিদার পার হয়ে তবে সেখানে ঢোকা সম্ভব হ'ত। এখনও তার খানিকটা ত আছে—ওসব ঝামেলার মধ্যে সহজে কি

নিজে থেকে যেতে আছে? লেডী রাণু বার বার করে ব'ললেন—'আপনার ছবির প্রদর্শনী—আপনি গিয়ে একবার বলবেন। তা ছাড়া উনি আপনার বিষয় জানতেও চান—আপনার অ্যালবামগুলো নিয়ে যাবেন।'

বন্ধুবর গোপাল ঘোষ অ্যাকাডেমীর একজন সেক্রেটারী। অগত্যা তাঁকে নিয়ে গেলাম নির্দ্দিষ্ট সময়। হ'ল দেখা—হ'ল গল্প—হ'ল সব ব্যবস্থা।

গভর্ণর হরেন মুখার্জি বাঙ্গালী বটেন। ধুতি পরেন, সার্ট পরেন। তার ওপর কোটও পরেন—কোটের তলায় সার্ট ঝোলে। বাংলায় কথা বলেন। চমৎকার অমায়িক ব্যবহার। গভর্ণরের A. P. C-র সঙ্গেই কথা ব'লতে যেন ভয় করে বেশী।

হরেনবাবু ব'ললেন—'সুনীতির কাছে তোমার কথা শুনেছি।' চিনতে পারছি না দেখে ব'ললেন, 'সুনীতি গো—সুনীতি চাটুয্যে। তোমায় চেনে সে—তুমি না কি খুব ভাল ভাস্কর। সেই বলছিল তোমায় ভাল করে সে চেনেন!' ব'ললাম, 'হ্যাঁ, তিনি অনেকদিন থেকেই আমায় চেনে—ছাত্রাবস্থা থেকেই'।...'তবেই তাঁকেই বল না কেন কিছু ব'লুক সেদিন। আমাকে কেন আর টানাটানি, আমি কি জানি আর্টের কিছু?' ব'ললাম, "আপনি যা জানেন তাই ঢের"। ব'ললেন, 'তবে দাও কিছু লিখেটিখে তোমার বিষয়'। আমি তাঁর হাতে আমার অ্যালবামগুলো দিলাম। তিনি উলটে-পালটে দেখলেন—বললেন, 'এগুলো আমায় দিলে ত?'

'আপনার জন্তই এনেছি যে এগুলো'।

কর্তব্য শেষ হ'ল। স্বাধীন ভারতে গভর্ণররা ভালই—অমায়িক, ভয়ের বা আতঙ্কের কিছু নেই। বিশেষ করে হরেনবাবু ত আদর্শ মানুষ।

হরেনবাবু প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রলেন বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে। সুনীতিবাবুও বেশ অনেকক্ষণ বললেন। হরেনবাবুও বেশ অনেকক্ষণ ঘরোয়া ভাবে বললেন। প্রফেসর ছিলেন এককালে, সুতরাং বলতে তাঁর বাধে না। তা ছাড়া শিল্প-বিষয় অজ্ঞ নন্—তার পরিচয় পাওয়া গেল। খুব লোক হ'ল প্রথম দিন। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এসেছিল গভর্ণরের বক্তৃতার জন্ত। আর্ট-ক্রিটিক বিশেষ কারুকে নজরে পড়ল না। তাদের বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও কেন যে এল না তা তখন বুঝতে পারি নি—পরে বুঝেছিলাম।...প্রদর্শনীতে কলকাতার কিছু শিল্পী-বন্ধুরা দেখি ধারেপাশেও ঘেঁষছেন না। পি, এন, টেগোর মহাশয়ও একদিনও এলেন না। তা ছাড়া আরও অনেকেই প্রদর্শনীতে এলেন না। 'ষ্টেটসম্যানে' রিভিয়ু বার হ'ল না একেবারে। দু'তিনদিনের মধ্যেই বুঝলাম কোথাও যেন একটা গোলমাল আছে।

রোজ বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রদর্শনী ঘরে থেকে কর্তব্য করি। যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের সঙ্গে ঘুরে ছবি দেখছি।...লেডী রাণু মুখার্জি রোজই একবার করে আসে—খবর নিয়ে যান—কে এল, কে এল না, সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদককে চিঠি লিখলাম, তাঁদের কাগজে প্রদর্শনীর রিভিয়ু কেন তাঁরা বার করেন নি জানবার জন্ত। দু'দিন পরে উত্তর পেলাম। লিখেছেন—'প্রদর্শনীতে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। তাঁদের আর্ট-ক্রিটিক প্রদর্শনী দেখে কিছু লিখবার মত আছে বলে মনে করেন নি। নীরব উপেক্ষা।

প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাবার কিছুদিন পর কলকাতার এক ইংরেজী ভুঁইফোড় কাগজ এ (লাইম লাইট) ক্র্যাঙ্ক বেন্‌স নামে একজন বিদেশী আমার ছবি (পোর্ট্রেট) দিয়ে এক লম্বা-চওড়া প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধ বললে অত্যুক্তি হবে—'গালিগালাজ' বলাই ভাল। 'আর্ট-ক্রিটিক' আর্ট চর্চা করেন নি—তাঁর নিজের অনাবশ্যক মতামত প্রকাশ করেছেন। শান্তিনিকেতনের নিন্দা করে বলেছেন—"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত—ওঠো জাগো, ভারতীয় পুরাতন পদ্ধতি ছেড়ে শিল্পের মধ্যে প্রাণ ফুটিয়ে তোল। নয়ত মরো, মরেই থাক।" অবনী ঠাকুর ও নন্দলালেরও নিন্দা করেছেন। ইত্যাদি—

তার পরের সপ্তাহের 'লাইম-লাইটে' তার উত্তর বার হ'ল, শ্রীযুক্ত অবনী ব্যানার্জী লিখলেন। তাতেও আবার কাদা মাখামাখি হ'ল খানিকটা। শুনেছি সে 'লাইম-লাইট' কাগজ এমনি কাদা মাখামাখি করে বিলুপ্ত হয়েছে আপনা থেকেই—'এ ভ্যাচারাল ডেভ।' ...ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়, 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'-এ প্রদর্শনীর

বেশ ভাল রিভিয়ু বার করেছিলেন—সেইটাই এই প্রদর্শনী ক'রে সব চাইতে লাভের বিষয় হয়েছিল।

এইবার প্রদর্শনী করে বুঝলাম, কলকাতার ভেতরকার শিল্প জগতের কারবার। ঝগড়াঝাঁটি দলাদলির শেষ নেই। তারই মধ্যে সাবধানে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলতে হয় শিল্পীদের—যাঁরা দলাদলি পছন্দ করেন না। দলাদলির মধ্যে নেই এমন শিল্পীও কলকাতায় অনেকে আছেন, সেটাই আনন্দের কথা। এবারে দেরাদুনে ফিরলাম, মনের আনন্দে নয়। বাংলা দেশের শিল্প-জগতে বিশেষ করে কলকাতায় যে হাওয়া বদলেছে এবং এ হাওয়া যে সুস্থ সবল মানুষের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, তা অনুভব করেছিলাম। জনকয়েক বিদেশী আর্ট-ক্রিটিকদের পাল্লায় পড়ে গেছে খবরের কাগজগুলি। আমাদের দেশে স্বরাজ হলে কি হবে, বিদেশী সাদা চামড়ার মোহ এখনও কাটে নি। তবে দেরি নেই, চোখ খুললেই একদিন দেশের লোকের, বুঝতে পারবে বিলিতী নকল-নবিশী কারখানা। পিকাসো, ক্লী, সিজ়াঁ আমাদের গুরু নয়, কিংবা বাপ ঠাকুর্দা নয়। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালই আমাদের সত্যিকারের গুরু। যতই নকল চলুক না কেন—নিজের বাপ-ঠাকুর্দারাই বাপ-ঠাকুর্দা থাকবেন। তাঁদের জায়গায় অন্যদের বসালে একদিন বালির পাহাড়ের মত সব ধ্বসে পড়বে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।···

চোরের উৎপাত

তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। ঠাণ্ডাটা দেরাদুনে তখনও ঠিকমত পড়ে নি। জানলা খুলেই শুই রাত্রে। বোধ হয় সে রাত্রে সামনের দরজাটাই খোলা ছিল, বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। রাত দুটোর সময় আমার শোবার ঘরে কিছু একটা শব্দ হ'ল। ঘুম ভাঙতেই আলো জ্বাললাম। দেখলাম, ঘরের মাঝখানে আমার বেতের লাঠিটা কে যেন এই মাত্র বসবার ঘরের 'ষ্টিক-র‍্যাক' থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। 'বিঙ্কি' পিছনের 'ডাইনিং রুমে' দরজার হাতলে বাঁধা শিকল দিয়ে। সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, কুকুরদের রাত্রে বেঁধে রাখলে তারা বড় একটা পাহারা দেয় না। বিছানা থেকে উঠলাম—নিশ্চিত বুঝলাম ঘরে লোক ঢুকেছিল। আমার আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সরে পড়েছিলেন। বসবার ঘরে এসে দেখি, সামনের দরজা সটান খোলা। একটু চ্যাঁচামেচি করলাম। চোর পালিয়েছে, তাকে ধরা এখন আমাদের সাধ্যের বাইরে। এবারে নজর পড়ল, 'ষ্টিক-র‍্যাকে' ছাতাটা নেই। বুঝলাম ছাতাটি নিয়েছেন রাতের কুটুম। দরজা-জানলা বন্ধ করে ফ্যান খুলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে এদিক-ওদিক দেখতে

শিল্পীর সহিত জওহরলাল

লাগলাম। বাইরে নজরে পড়ল, আমার ভিজিটিং কার্ডের চামড়ার কেসটা পড়ে রয়েছে। ওটা হয়ত টাকার ব্যাগ বলে নিয়েছিল, বাইরে গিয়ে নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে ফেলে রেখে গেছে। আমার লেখবার টেবিলে এসে দেখতে লাগলাম, সব ঠিক আছে কি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম আমার পার্কার কলমটা নেই। শ্যামলীর পার্কার কলমটাও আমার কাছেই ছিল। সে 'শঙ্করস উইকলি'র ছোটদের ছবির প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল সেটা। সে কলমটাও

টেবিলে ছিল, সেটাও উধাও হয়েছে। মনটা খারাপ হ'ল। ব্যস্ত হয়ে পড়লাম—আরও কি নিয়েছে? শোবার ঘরে গেলাম। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বার আগে বই পড়ছিলাম। বিছানার পাশে টেবিলে বই, চশমা ও টর্চ রাখা ছিল। চশমা আর টর্চ উধাও হয়েছে। চোর ঘ রাত্রে আমার শোবার ঘরে আমার পাশের থেকে চশমা ও টর্চ নিয়ে পালিয়েছে ভাবতেই একটু শিহরণ লাগল শরীরে। আরও কিছু নিয়েছে কি না দেখতে লাগলাম। গরম কাপড় জামা সবই ঠিক রয়েছে। ভাবতে লাগলাম কেন নিল না। কিছুক্ষণ ভাববার পর পরিষ্কার হয়ে উঠল ব্যাপারটা। নিত আরও অনেক কিছুই। লাঠিটা ঘরে ফেলার শব্দে যদি আমার ঘুম না ভাঙত তবে কিছুই সে ফেলে যেত না।··· চশমা, টর্চ চুরি করবার সময় নিশ্চয়ই আমার ঘুম ভেঙে এসেছিল, তাই চোর শোবার ঘর থেকে সামনের বসবার ঘরে গিয়ে লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে পরখ করে দেখছিল যে আমার ঘুমটা সত্যিই ভেঙেছে কি না। লাঠিটা পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে আলো জ্বালতেই বেগতিক দেখে সে সরে পড়েছিল।

যাই হোক, এ আমার এক শিক্ষা হয়ে গেল। এর পর থেকে রোজ রাত্রে শোবার সময় দরজা-জানলা এঁটে শুই। বিঙ্কিকে খুলে দিই, শিকলে বাঁধা রাখি না। স্বাধীনতা বৈ কি—গলার শিকল নাবল কিন্তু ঘরের দরজা-জানলা হ'ল বন্ধ। বিঙ্কি তাতেই কি খুসী।···

ডিসেম্বর, ১৯৫৩

বরোদা থেকে Dr. Goeti এসেছেন, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীর 'কিউরেটার' হয়ে। আধুনিক ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করবেন। চিঠি পেলাম তাঁর কাছ থেকে। মূর্তির ছবি পাঠাতে। ছবি দেখে তাঁরা পছন্দ করবেন মূর্তি, পছন্দ হলে মূর্তি পাঠাতে হবে। পাঠিয়ে দিলাম কিছু মূর্তির ফটোগ্রাফ। জবাব এল তিনটে মূর্তি চাই। ইচ্ছে হ'ল একটা ছোট প্রদর্শনী দিল্লীতে করবার।

ধুমিমল ধরমদাসের দোকানের দোতলায় ছোট্ট ঘরে প্রদর্শনী হবে ঠিক হ'ল ১৫ই ডিসেম্বর থেকে। কিছু ছবি ও মূর্তিগুলো নিয়ে দিল্লীতে আসলাম। শ্রীঅনিল চন্দ তখন দিল্লীতে। অনিলবাবুই প্রদর্শনী খুলবেন ঠিক হয়ে গেল। ১৪ই ডিসেম্বর সকালে বাসে করে রওনা হলাম। দিল্লীতে উঠলাম গিয়ে হিন্দী লেখিকা শ্রীমতী সত্যবতী মালিকের বাড়ী। তাঁদের ফ্ল্যাট 'কনোট সার্কাসে'। অনাত্মীয় বন্ধুরা আত্মীয়ের চেয়ে খুসী হন অনেক সময় তাঁদের বাড়ী অতিথি হ'লে। আমার কপাল ভাল কিছু বন্ধু আমার আছেন, যাঁরা আমাকে স্নেহ করেন। ১৫ই ডিসেম্বর নির্দিষ্ট সময় প্রদর্শনীতে অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী এলেন, শ্রীমতী লীলা এলেন। আমীর আলী—দুন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এসে পড়ল হঠাৎ। দিল্লীর দু'চারজন আর্ট-ক্রিটিক এসে জুটল।···শ্রীমতী লীলা, সুন্দরী ব'লে খ্যাতি আছে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে জনকয়েক তাঁর 'অ্যাড-মায়ারার' সর্বদা আশেপাশে থাকে। হঠাৎ রামবাবু, (ধুমিমল ধরমদাসের প্রোপ্রাইটার) আমায় ডেকে দু'টি আমেরিকান ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁদের একটি অল্পবয়সী—অপরটি মধ্যবয়সী। অল্পবয়সী মেয়েটি কি উচ্ছ্বাসী। আমার একটি ছবি তার খুব পছন্দ হয়েছে। ছবিখানির সামনে দাঁড়িয়ে কি ভঙ্গি মেয়েটির। একবার ঘাড় কাৎ করে ছবিটা দেখে, আর একবার দেখে আমার দিকে। বার বার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ব'লতে থাকে, "তুমি এঁকেছ? তুমি এঁকেছ? তুমি এঁকেছ? সত্যিই কি তুমি এঁকেছ? কি করে পারলে আঁকতে?" আমার ডান হাতখানা ধরে ঝাঁকানি দিল কয়েকবার—'এই হাতে এঁকেছ, এই ছবি?' পাগলামির শেষ নেই। ছবিটা কিনবে সে, কত দাম? একশ পঁচিশ টাকা, এত সস্তা। আমি হ'লে আরও বেশী দাম রাখতাম। না বিক্রিই করতাম না। আচ্ছা মন খারাপ হয় না ছবি এঁকে বিক্রী করতে? এমনি কথা ব'লে চলে। ···প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন হবে এইবার। অনিলবাবুর ভাষণ আরম্ভ হ'ল। লিখে এনেছিলেন। শিল্পীদের সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা। ভাল কথা না বলে উপায় কি? তাঁর অনেক শ্যালকই শিল্পী। স্ত্রীও নামকরা লেখিকা ও শিল্পী। তিনি সঙ্গেই আছেন। অনিলবাবু হ'লেই বা ডেপুটি মিনিষ্টার, স্ত্রীর নামই বেশী। অনিলবাবু একবার রসিকতা করেছিলেন বেশ ভাল।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু অনিলবাবুকে একবার

নাকি বলেন, "রাণীকে লোকে বেশী জানে, রাণী 'ট্যালেনটেড' তোমার চেয়ে।—তুমি কি ?" অনিলবাবু জোড় হাত ক'রে ওঁকে বলেন, "আই, অ্যাম লাইক মিষ্টার নাইডু।"

অ্যামেরিকান মেয়েটি কাছে এসে বলল, 'আজই চলে যাচ্ছি, ভাগ্যিস প্রদর্শনীতে এসেছিলাম। ছবিটা সে তখনি নিয়ে যাবে,—তাঁদের প্লেন ছাড়বে পরের দিন ভোর সকালে। কি করা যায়, ছবি দিলাম দেয়াল থেকে খুলে। এইবার টাকার নোটগুলো আমার হাতে হুঁসে দিল। বললে "ঠকলে তুমি, আমি পেলাম ছবি, তুমি পেলে টাকা। ছবিটা থাকবে, টাকা যাবে খরচ হয়ে।" এইবার বয়স্কা মেয়েটি বললে, "টাইম ইজ আপ, মাই ডিয়ার, উই মাষ্ট গো নাউ।" আমার করমর্দন করার জন্য হাত বাড়ালে। হ্যাণ্ড-শেক করলাম। অল্পবয়স্কা আমার হাত ধ'রে ঝাঁকানি লাগালে। বললে, "আই উইল নেভার ফরগেট ইউ। এই ছবি আমার ষ্টাডিতে থাকবে। au revoir, তাঁরা চলে গেলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

প্রদর্শনীতে ঘণ্টাখানেক লোকের ভিড় রইল। একটি ছবি, একটি সুন্দরী মেয়ের মাথা, এককোণে রাখা ছিল। ছবিটা দেখতে নাকি লীলার মত। আমি অবশ্য মন থেকেই এঁকেছিলাম। হয়ত বা মিল এসেছিল চেহারার, সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। ভক্তবৃন্দের একজন ছবিটা কিনে ফেললেন। এমনি করেই আজকাল দু'চারটে ছবি বিক্রী হয়। মানুষে ছবি ভাল বলে সবসময় কেনে না, অ্যাসোসিয়েশন থাকলেই কিনে রাখতে চায় ঘরে।

কপাল ভাল! পরের দিন দেরাদুন ফিরবার 'ফ্রী লিফ্‌ট' জুটে গেল ষ্টেশন ওয়াগনে। মিসেস রাঠোর, তাঁর ছেলে পড়ে ওয়েলহাম স্কুলে, ছুটিতে তাকে নিয়ে আসতে চলেছেন। প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। সেখানেই ঠিক হ'ল সকাল সাতটায় রওনা দেবেন। আমাকে 'কনোট সার্কাস' থেকে তুলে নেবেন। … মিসেস রাঠোরের সঙ্গে আমার আগের থেকেই অল্প-স্বল্প আলাপ ছিল। বয়স যখন কম, তখন তাঁর শিল্পী হবার ইচ্ছা ছিল। লখনউ আর্ট কলেজে অসিতদা'র আমলে ছাত্রী ছিলেন সেখানে। তারপর দৈবদুর্বিপাকে প'ড়ে এখন করছেন ব্যবসা।

কিসের ব্যবসা তা ঠিক জানিনে। 'কনোট সার্কাসের' খান্না কোম্পানীর অফিসে বসে ফাইল দেখেন আর চিঠির 'করেসপণ্ডেন্স করেন' সমস্ত দিন।

'যমুনা ব্রীজ' পার হ'য়ে মোটর পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটল। সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যেই দেরাদুনে পৌঁছে গেলাম। বেঁটে দোহারা চেহারা মিসেস রাঠোর, মাথার চুল কোঁকড়া, ছোট ক'রে ছাঁটা। অমায়িক নম্র। কতটুকুই বা জানি তাঁকে। কিন্তু মনে আছে, দিল্লী-দেরাদুনের রাস্তায় একসঙ্গে এসেছিলাম।

গোয়ালিয়র আর্টস্কুল

দুন স্কুল স্পেশালে কলকাতা যাত্রা—পথে দুর্ঘটনা

১৭ই ডিসেম্বর ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেদের সঙ্গে একই ট্রেণে রওনা হয়েছিলাম কলকাতায়। 'দুন স্কুল স্পেশাল' ছাড়ল দুপুর দুটোর সময়। ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩, দিন আমার পক্ষে হয়ত ভাল ছিল না। পথে বিপদে পড়েছিলাম। দেরাদুনে ট্রেনে উঠে দেখি, আমার কাছেই মিসেস ধাওয়াল, মিসেস হুইটন বেকার ও তাঁর ছেলে বসে আছেন। এঁরা দু'জন দুন স্কুলের মেট্রন। এঁদের কাজ ছেলেদের দেখাশোনা করা। দু'জনেরই বয়স হয়েছে। মিসেস ধাওয়ালের সঙ্গে ছিল প্রচুর খাদ্যদ্রব্য। সেটা সঙ্গী হিসেবে কম কথা নয়। বিপদ টেনে আনল কয়েকটি বড় ছাত্র। লম্বা সেকেণ্ড ক্লাশ বগীটায় সব কলকাতা-পাটনা যাত্রী ছেলেরা ছিল। তাদের মধ্যে তিন-চারজন, আমার সঙ্গে গল্প করতে

এল। হরিদ্বার পেরিয়ে 'লাকশার' ষ্টেশনে গাড়ি পৌছল বেলা পাঁচটার সময়। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, আমাদের বগীটা রাত দুপুরে 'পাঞ্জাব মেলের' সঙ্গে জুড়ে দেবে। এখন আপাততঃ লাকশার ষ্টেশনেই সাইডিং-এ থাকতে হবে আমাদের সমস্ত বিকেল ও সমস্ত রাত। —সন্ধ্যের অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসে ছ। দু'টি ছেলে আমায় ধরে বসল, বেড়াতে যাবে তারা, আমাকেও সঙ্গে আসতে হবে। ট্রেনে বসে থেকে থেকে বিরক্তি এসেছিল। রাজী হলাম বেড়াতে যেতে। মিসেস ধাওয়ালরা আপত্তি জানালেন, যে, অন্ধকারে শীতের মধ্যে বেড়াতে যাওয়া কাজের কথা নয়। তাঁদের কথা না শুনে একটু হেসে ছেলেদের সঙ্গে বার হয়ে পড়লাম। লাকশার ষ্টেশনের আশেপাশে বহুবার ঘুরেছি, পথ চেনা।

রেল লাইনের ধার দিয়ে যে কাঁচা গরুর গাড়ি যাবার রাস্তাটা চ'লে গেছে, সেই রাস্তা ধ'রে অন্ধকারে হৈ-চৈ করতে করতে এগিয়ে চললাম। ছেলে দু'টি নানান গল্প শোনাতে লাগল। স্কুলের এই টারমে কত কুকর্ম তারা করেছে। ছেলে দু'টি স্কুল জীবন এবারে শেষ করে বাড়ী যাচ্ছে—আর স্কুলে ছাত্র ভাবে ফিরবে না—সুতরাং বেপরোয়া হয়ে তারা গল্প করছিল। কিছুদূর যাবার পর আমার ডান পা'টা পড়ল এক গর্ত্তের মধ্যে—পড়ে গেলাম রাস্তার ওপরে। পাটা যেন মচকে গেছে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের সেই জায়গাটা অসম্ভব রকম ফুলে উঠল। চোট-খাওয়া পা নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে গিয়ে বসলাম সবাই। খানিকক্ষণ গল্প করলাম, তারপর ছেলে দু'টির কাঁধে ভর দিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। কোনরকমে ষ্টেশনে পৌঁছে 'রেষ্টুরেন্টে' গিয়ে খেয়ে নেবার ব্যবস্থা করলাম। রাত তখন ন'টা। খাওয়াটা বেশ জমিয়ে হতে পারত কিন্তু পায়ের ব্যথায় বেশীক্ষণ বসা হ'ল না। দেরাদুন এক্সপ্রেস লাকশারে এসে পৌঁছবে দশটা সাড়ে দশটায়। সেই ট্রেণেও আমাদের সঙ্গী কেউ কেউ আসছেন। চোট খাওয়া পা নিয়ে, সেই শীতের রাতে প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেরাদুন এক্সপ্রেস এল। সব যাত্রীরাই শীতের রাতে দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘুম দিচ্ছে—ডেকে ডেকে কারুরই সাড়া পেলাম না। অগত্যা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে লাগলাম নিজের বগীর উদ্দেশ্যে। গার্ডের গাড়ির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন চোখ পড়ল পিছনে আমাদের বগীটা যেন দেরাদুন-এক্সপ্রেসের সঙ্গে লাগানো হয়েছে। তখন সবুজ বাতি দেখিয়ে গার্ড সাহেব গাড়ি ছাড়বার উপক্রম করেছেন। ভালো করে দেখলাম, আবার। হ্যাঁ, সত্যিই ত। ঐ ত মিসেস ধাওয়াল—তাঁর মোটাসোটা শান্ত শরীর নিয়ে বসে আছেন। ট্রেণ তখন চলতে সুরু করেছে। সেই ভাঙ্গা পা নিয়েই তড়াক করে লাফিয়ে ট্রেণে চড়লাম। একটা ফাঁড়া কাটল যেন। সচরাচর দুন স্কুলের বগীটা 'পাঞ্জাব মেলেই' লাগায়—এবারে কোন বিশেষ কারণে বগীটাকে দেরাদুন এক্সপ্রেসে লাগিয়ে লখনউ পর্যন্ত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল। ভাঙ্গা পা নিয়ে শীতের রাত্রে জিনিষপত্র বিছানা ছাড়া লাকসার ষ্টেশনে যে সমস্ত রাতটা কাটাতে হ'ল না তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। এদিকে পা ফুলে ঢোল—অসম্ভব ব্যথা। 'ডেম'দের সমবেদনা ও উপদেশ শুনতে শুনতে বিরক্তি এসে গেল। পরের দিন লখনউ ষ্টেশনে পৌঁছলে পর রেলের ডাক্তার দেখানোর বন্দোবস্ত করে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যন্ত্রণায় ঘুম কি আসে।

লখনউ ষ্টেশনে ডাক্তার এলেন, 'গুলোর্ট' লোশন দিয়ে গেলেন। পায়ে পট্টি ব্যাণ্ডেজ হ'ল। বললেন পরীক্ষা ক'রে 'স্প্রেন'। ভাঙ্গে নাই সম্ভবতঃ। হাড় ভাঙ্গলে কি আর অমনি বসতে পারতেন? যন্ত্রণা হ'ত না? ডাক্তার আমার যন্ত্রণা কি বুঝবেন? হাত-পা ছুঁড়ে বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্না জুড়ে দিই নি—তা সত্যি। কিন্তু যন্ত্রণা হচ্ছে না তাই বা তিনি কি ক'রে বুঝলেন? যাই হোক, কলকাতা না পৌঁছনো পর্যন্ত এই 'গুলোর্ট' লোশন নামের সাদা দুধের মতো পদার্থটি আর ব্যাণ্ডেজ আমার সম্বল। চার টাকা ডাক্তারের দক্ষিণা ও এক টাকা লোশানের জন্য দণ্ড দিতে হ'ল। ঘণ্টা-খানেক পর পর গুলোর্ট লোশনে ব্যাণ্ডেজ ভিজাই আর আকাশ-পাতাল ভাবি। এবারকার ছুটিটা বোধ হয় সব মাটি হ'ল। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন থেকে একটি ছেলেকে দিয়ে ছোটদির কাছে টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম—কারুকে ষ্টেশনে

পাঠাতে, নইলে বাড়ী যাওয়া মুস্কিল একলা ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র নিয়ে।

ষ্টেশনে ভাগ্নে—ছোটদির ছোট পুত্র এসেছিল। তাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে ক'রে বাড়ীতে পৌঁছলাম। পা X-Ray ক'রে দেখা গেল, 5th Metatarshal ভেঙ্গেছে। তারপর ডাঃ চ্যাটার্জি পা'টাকে প্লাষ্টার-ব্যাণ্ডেজে বাঁধলেন। অদৃষ্টের পরিহাস! ব্যস, পাঁচ সপ্তাহের মতো ছুটি, কলকাতার তেতলার ঘরে বন্দী হয়ে গেলাম। 'আমার এ পথ' লেখার হ'ল এইখানেই সূত্রপাত। সুরুতেই সে কথা বলেছি।

জানুয়ারী, ১৯৫৪। আন্দামানের জন্য গান্ধীজীর মূর্তি

কলকাতা অ্যাকাডেমির প্রদর্শনী চলছে সেই সময়। হঠাৎ একদিন সকালে লেডী রাণু মুখার্জি টেলিফোন করলেন। আগামী কাল বেলা ১১টায় প্রদর্শনীতে যেতে হবে—আন্দামানের চীফ কমিশনার দেখা করতে চান। আন্দামান! পা ভেঙ্গেছে আমার, আর ত কোন দোষ করি নাই—তবে আন্দামান কেন? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আমার গড়া ছোট গান্ধীজির মূর্তিটা যেটা অ্যাকাডেমির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে দিয়েছিলাম, সেটা দেখে তাঁদের মাথায় এসেছে যে আমাকে দিয়ে আন্দামানের জন্য আট ফিট উঁচু গান্ধীজীর মূর্তি তৈরী করাবেন। সেই জন্যই তলব পড়েছে। ভাঙ্গা পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্যাক্সিতে উঠলাম। লেডী রাণু ও শ্রীযুক্ত শঙ্কর মৈত্র, চীফ কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা সবই হ'ল। মূর্তিটা হবে সিমেন্টে ঢালাই। ব্রোঞ্জ বা মার্বল পাথরে করবার মতো অর্থ তাঁরা খরচ করতে চান না। তাঁরা চান যত শিগগির সম্ভব মূর্তিটা হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি যাতে তাঁরা তৈরী মূর্তি জাহাজে করে আন্দামানে চালান দিতে পারেন—তাই চান। আমার ছুটি মাত্র জানুয়ারী শেষ পর্যন্ত। মূর্তিটা করতে হ'লে কলকাতায় করতে হবে জানুয়ারীর ভেতর। এদিকে পা এখন প্লাষ্টারে বাঁধা। প্লাষ্টার খুলতে আরও তিন সপ্তাহ প্রায়—২০শে জানুয়ারীর আগে নয়। হাতে মাত্র দশদিন থাকবে। সেই দশদিনে মূর্তিটা ক'রতে হবে। রাজী হয়ে গেলাম। মনে মনে ঠিক করলাম যে প্রভাস সেনের শরণাপন্ন হতে হবে। তাকে দিয়ে সিমেন্টের ঢালাই কাজটা করিয়ে নেব। আমি শুধু মাটিতে মূর্তিটা গড়ে চলে যাব। বেশী টাকা তাঁরা খরচ করতে চান না—হাজার চারেক মাত্র তাঁরা দেবেন।

প্রভাস সেনের ষ্টুডিও

প্রভাসের ষ্টুডিও বেহালায়। সেইখানে রোজ গিয়ে মূর্তিটা করতে সুরু করলাম। প্রভাস অবশ্য সর্বদাই সাহায্য করতে লাগল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে মাটিতে মূর্তিটা শেষ করলাম। রবি চ্যাটার্জী বলে একজন তরুণ

পাখা হস্তে ভারতী

যুবাও কাজে সাহায্য করেছিল। যে কয়দিন মূর্তিটা করতে লাগল বেশ কেটেছিল। সকালে যেতাম বেহালায় বিকেলে ফিরতাম। প্রভাসের স্ত্রী রান্না করতেন তাই সবাই মিলে বসে খেতাম। বিনোদবাবুও (মুখার্জী) তখন সেখানে ছিলেন। সুতরাং জমেছিল বেশ।

* * *

মাটিতে মূর্তিটা শেষ হ'তে না হ'তেই প্রভাসের ঘাড়ে বাকি সব ভার চাপিয়ে দিয়ে, আমি দেরাদুন চলে এলাম।

ভীষণ বর্ষা নেমেছে দেরাদুনে। জানুয়ারীর শেষ দিন এসে পৌঁছলাম। শীতও প্রচণ্ড। একলা ঘরে

দরজা-জানলা বন্ধ করে বিঙ্কিকে নিয়ে কাটাই শীতের দিনগুলো। প্রভাস দিন পনের নিয়েছিল মূর্তিটা সীমেন্টে ঢালাই করতে। তারপর সেটা আন্দামানে চালান গেল। মার্চের গোড়ায় রাজেন্দ্রপ্রসাদজী যখন আন্দামান গেলেন সেটা তিনিই তখন 'আন-ভেল' ক'রলেন। খবরের কাগজে ও রেডিওতে সে খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। মূর্তিটা তবে আস্তই পৌঁছেছিল।

চীফ কমিশনারের টেলিগ্রাম পেলাম—পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে দু'একদিন পরে। 'গান্ধীজির মূর্তি 'আন-ভেল' করেছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।' একটা কাঁড়া কাটল যেন। অত বড় সীমেন্টের মূর্তিটা প্যাক ক'রে জাহাজে ওঠানো, তারপর আন্দামানে নিয়ে গিয়ে 'পেডেস্টেলে' বসানো সোজা কথা নয়। নির্বিঘ্নে যে সব সম্পন্ন হয়েছে—সেটা ভাগ্যের কথা বটে।

শ্রীমানবেন্দ্র রায়। ১৯৫৪

জানুয়ারী মাসের শেষে কলকাতা থেকে দেরাদুন ফিরবার কিছুদিন আগেই খবরের কাগজে পড়েছিলাম 'এম, এন, রায়' মারা গেছেন। বছর খানেক থেকেই তিনি বেশ ভুগছিলেন। কিন্তু অত শিগ্‌গীর যে মারা যাবেন তা ভাবি নি। দেরাদুনেই তিনি বাসা বেঁধেছিলেন শেষের দিকে। এই রকমই হয়, যারা বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক। সারাজীবন দৈব-দুর্বিপাকের মধ্যে অশান্ত জীবন যাপন করে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে কোন নির্জন কোণে বাসা বাঁধে।

মানবেন্দ্র রায় মশায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় দেরাদুনেই ১৯৪০ সালের শেষে। তিনি তাঁর বিদেশী স্ত্রী অ্যালেনকে নিয়ে আমার ডুন স্কুলের কোয়ার্টারে এসেছিলেন। তারপর তাঁর বাড়ীতে আমি অনেকবার গিয়েছি। তিনিও আমার কাছে এসেছেন। আমাদের সম্পর্কটা বেশ ভালই মনে উঠেছিল। ফুট সাহেবকে আমিই আলাপ ক'রিয়ে দিই এম, এন, রায়ের সঙ্গে প্রথমে। সেই থেকে তিনি ডুন স্কুলে ফুট সাহেবের কাছেও আসতেন। ফুট সাহেবও তাঁর বাড়ী যেতেন। ডুন স্কুলে একবার তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন মনে আছে। বিষয় ছিল 'কেন তিনি কম্যুনিজম্‌-এ বিশ্বাস হারিয়েছেন।' সেদিন তাঁকে খুব উত্তেজিত হতে দেখেছিলাম।

গত বছর ১৯৫৩ সালে অসুস্থ হয়ে মুসৌরী গিয়েছিলেন। সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে অল্প-স্বল্প বেড়াতেন—তখন প্রায়ই দেখা হ'ত। 'সাভয়' হোটেলে আমার ছবির প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন। মুসৌরীতে তাঁর বাড়ীতে আমি কয়েকবার গিয়েছিলাম। সেই আমার তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। তাঁর রঙীন (ফটো) ছবি তুলেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর সেই ছবি তাঁর স্ত্রীকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সুকুমার দেউস্কর

খবরের কাগজে খবরটা দেখেছিলাম। এক কোণায় ছিল—হায়দারাবাদের আর্টিষ্ট শ্রীসুকুমার দেউস্কর মারা গেছেন। পরে খবর পেয়েছিলাম—মৃত্যুটা হঠাৎই। ক্রিকেট খেলতে খেলতে ক্রিকেট ফিল্ডে মারা যান হার্ট-ফেল করে। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় আমরা একসঙ্গে একঘরে ছিলাম বহুদিন। সুকুমার আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। সুতরাং তার মৃত্যু খবরে মনটা খারাপ হয়েছিল। অবশ্য সুকুমারের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি ১৯৩০ সালের পর—সে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেল ইতালীতে। শুনেছি—তার মামা আর্টিষ্ট, ইতালীতে থাকতেন—সেখানে থেকে ছবি আঁকা শিখত। তারপর সে বিদেশ থেকে ফিরেছিল বহুদিন পরে। ফ্রান্সে ছিল কিছুকাল। সেখান থেকে মিউনিকে। তারপর দেশে ফিরে তার বাবার কাছে ছিল। তিনিও আর্টিষ্ট ছিলেন। পরে সে হায়দ্রাবাদে আর্ট স্কুলের 'প্রিন্সিপ্যাল' হয়েছিল। সুকুমার মারা যাবার পর পুলিনবিহারী সেন কলকাতা থেকে আমায় একটি চিঠি লিখেছিল—তাতে সুকুমারের মৃত্যু-সংবাদই সবচেয়ে বড় খবর ছিল। এবং পুলিন যে বড়ই মর্মাহত হয়েছে তা তার চিঠি পড়েই বুঝেছিলাম। বন্ধু-বান্ধবদের মৃত্যু-খবর যে রকম মনকে বিচলিত করে, এমন বোধ হয় পরমাত্মীয়দের মৃত্যু খবরও করে না।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

আজকে আমার জন্মদিন। সাতচল্লিশ বছর আগে এইদিনে আমি জন্মেছিলাম কলকাতায়। কে জানত, সেই আমি আজ দেরাদুনে হিমালয়ের ছায়া-প্রান্তে বসে নিজের কাজকর্ম নিয়ে দিন কাটাব। সাতচল্লিশ বছর

কম কথা নয়—আবার সাতচল্লিশ বছর কিছুই না। যে যে রকম ভাবে দেখবে। পিছন ফিরে দেখবার অবসর পেলে দেখি বৈকি। ঘাত-প্রতিঘাতে এই সাতচল্লিশ বছরে দেখবার চোখ মাত্র খুলেছে। জীবনে যা ঘটে গেছে, তার থেকে যা তখন উপলব্ধি করি নাই। আজ পিছন ফিরে দেখতে গিয়ে তার অর্থ পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ছে। তখন নিজের দিকে অন্য চোখে তাকাবার অবসর পাই নাই। দরকারও বোধ করি নাই।......

জন্মদিন ও মৃত্যুদিন সম্বন্ধে এক জায়গায় মস্ত একটা মিল আছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথিতে তাঁরই ভাষায় বহুবার বহুলোকে আলোচনা করেছেন। ক্ষিতিবাবু (সেন) মন্দিরে বারবার এক কথাই প্রতি বছর নানান ভাবে বলেছেন।

মৃত্যু ভয়কে জয় করবার পন্থা বহুলোকে বহুভাবে নিজের মনের অন্তরতম প্রদেশে উপলব্ধি করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। নির্লিপ্ত ভাবে মানুষ যখন দেখবার সামর্থ্য অর্জন করে, তখনই বুঝবার ক্ষমতাও তার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখায় নানান ভাবে সেই নির্লিপ্ততার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছেলেবেলা থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত। অথচ তিনি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। 'নৈবেদ্য'তে তিনি লিখেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

আমরা হঠাৎ মৃত্যু, হঠাৎ [illegible] বিপদ, হঠাৎ দুঃখের আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। আমাদের বড় বেশী আঘাত লাগে এই হঠাৎ-ঘটা ব্যাপারগুলোতে। অথচ মৃত্যু যখন তিলে তিলে সময় নিয়ে মানুষকে গ্রাস করে তখন আমরা ততটা বিচলিত হই না।......

মৃত্যুকে অনেকেই বলেন আত্মার 'দেহমুক্তি' হওয়া। জন্মকে কি বলা চলে আত্মার 'দেহ-বন্ধন'? 'বন্ধন' গ্রহণ করাও মুক্তির লক্ষণ হতে পারে নাকি?...

"মুসৌরীতে প্রদর্শনী...একক নয়, এবার দুই শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে সংযুক্ত।" জুন, ১৯৫৪।

এবারে মুসৌরীতে গিয়েছি থাকতে ছুটি আরম্ভ হতেই। ছ'মাসের জন্য একটা ছোট 'কটেজ' ভাড়া করেছি। প্রভাত নিয়োগী এসেছেন গোয়ালিয়র থেকে তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে। আমি শ্যামলীকে নিয়ে আছি। প্রভাতের স্ত্রী ঘর-সংসার দেখেন আমরা ছবি আঁকি, ঘুরে বেড়াই। এবারে বিনোদবাবুরাও আছেন মুসৌরীতে। ছবি নিয়ে গিয়েছি, যদি প্রদর্শনী করি। প্রভাতও ছবি এনেছে। বিনোদবাবু ত মুসৌরীতে ছোটখাটো ছবি [illegible] থাকেন। ইচ্ছে হ'ল তিনজনে মিলে প্রদর্শনী করবার। সাভয় হোটেলেই হবে প্রদর্শনী। সব বন্দোবস্ত করা গেল।

বিনোদবাবু শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন—আমিও সেখানকার ছাত্র। প্রভাত কলকাতা 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ওরিয়েন্টেল আর্ট'এর ছাত্র ছিল। ক্ষিতীনবাবুর প্রিয় ছাত্র ছিল। সুতরাং অনেকের মতে তিনজনই প্রায় একই স্কুলের বলে এক রকম ধরণের ছবি আঁকি আমরা। প্রদর্শনীতে কুড়িখানা ক'রে ছবি রেখেছিলাম আমরা, সবশুদ্ধ ষাটখানা ছবি। প্রদর্শনীতে যাঁরা এসেছিলেন, সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন [illegible] দিক, আমাদের তিনজনেরই আঁকবার ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং এই প্রদর্শনীতে এইটাই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল, এক স্কুলের ছাত্র হলেই এক ধরনের ছবি আঁকে না শিল্পীরা। প্রত্যেকের নিজের নিজের ধরণ আছে আঁকবার। নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব প্রকাশ পায় ছবির ভিতর দিয়ে।

দেরাদুনে 4th World Forestry Congress

এ'চিত্র প্রদর্শনী ডিসেম্বর ১৯৫৪—

দেরাদুনে 'ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রকাণ্ড ব্যাপার। দেখবার মত জায়গাই। এখানে 4th World Forestry Congress হ'ল। আমার ওপর ভার পড়েছিল এই উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনী করবার। ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় বড় শহরে চিত্র প্রদর্শনী চলে, সেই জন্য বেশী ছবি পাওয়া গেল না। প্রাইভেট Collection নিয়েই প্রদর্শনী হ'ল। মোট পঞ্চাশখানা ছবি রাখা হ'ল—কিন্তু আমার এবং অনেকের মতে এই প্রদর্শনীটি দেখবার যোগ্য হয়েছিল। আমি যত প্রদর্শনীর ভার নিয়েছি তার মধ্যে এই প্রদর্শনীর একটি

বিশেষ স্থান আছে। নন্দবাবু ও অন্যান্য যাঁদের ছোটখাট ছবি আমার 'কালেকশানে' ছিল—সব এই প্রদর্শনীতে রেখেছিলাম। বেশী ছবি রাখলেই যে ছবির প্রদর্শনী ভাল হয় তা মোটেই নয়।…ঘরোয়া ছবির প্রদর্শনীরও একটা বিশেষ মূল্য আছে।

বার্ণপুরে ছবির একক প্রদর্শনী ১৯৫৪

এবারে শীতের ছুটি হতেই আমি ছবির বোঝা নিয়ে বার্ণপুরে গেলাম। বরুণাক্ষ বসু—আমাদের স্কুলেরই একটি ছাত্র সেখানে থাকত তার বাবা বার্ণপুরের মস্ত এক চাকুরে। তিনি আমার ছবির ভক্ত ছিলেন। এবং তিনিই উদ্যোগ করে প্রদর্শনীর সব ভার নিয়েছিলেন। বার্ণপুরে সচরাচর ছবির প্রদর্শনী বড় একটা হয় নি। আসানসোল সহরের কাছেই বার্ণপুর। কারখানার লোকরা যে ছবি ভালবাসে—তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছবি বোঝবার ক্ষমতা এদের আছে দেখলাম। কারণ বড় সহরের লোকেদের 'সব-জান্তা' ভাব এদের নেই—এরা ইঞ্জিনীয়ার ও কারখানার লোক, হাতের কাজের মর্ম-বোঝে। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ আনন্দ পেলাম। সমালোচকদের মত টেকনিক্যাল কথাবার্ত্তার ধার এরা ধারে না। ভাল লাগলে বলে 'ভাল'—না লাগলে বলে 'বুঝতে পারলাম না।' …

আমাকে অনেক সময় অনেক লোকে এবং আর্ট ক্রিটিকরাও বলে থাকেন যে, আমি অতিরিক্ত বেশী পরিমাণে এঁকে থাকি। কথাটা হয়ত খুবই সত্যি যে, অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীদের তুলনায় বেশী আঁকি। কিন্তু এ কথাও সত্যি—আমি যে বেশী আঁকি, সে বিষয়ে আমি সজাগ নই। আঁকতে ভাল লাগে বলেই আঁকি। স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে এঁকে যাই—সচেষ্ট প্রয়াস এতে নেই। …আমি যা আঁকি তা সব সময় হয়ত 'ইনস্পিরেশন' থেকে নাও হ'তে পারে। কাজের 'মোমেনটামে' হয়ত অনেক সময় আঁকি।

কিন্তু এ কথা আমি বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি যে, যা আমি আঁকি তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। কারণ এঁকে আমি প্রভূত আনন্দ পাই। শিল্পের শ্রেষ্ঠ কাজ ব'লে এগুলির কদর হবে কি না ভবিষ্যতে সে আমি জানি না। জানতে চাইও না। ও নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভই বা কি? কেউ এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারে না। …সময় অর্থাৎ কাল এর বিচার করবে।

আবার অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করেন—"আমার সবচাইতে ভাল কাজ কোনগুলি?"…আমি সত্যিই এ কথার উত্তর দিতে পারি না। কারণ আমি নিজেই জানি না ত উত্তর দেব কি? আমার শুধু এই কথাই মনে হয় যে, আমার জীবনের একটা অধ্যায় হয়ত শেষ হ'তে বসেছে। এক 'ইনিং' শেষ হ'তে চলেছে ১৯৫৪ সালের সঙ্গে সঙ্গে। এক 'ইনিং' ত শেষ হ'ল কিন্তু খেলা এখনও শেষ হয় নি। বাসনারও শেষ নেই। দ্বিতীয় 'ইনিংস' খেলতেই হবে। খেলতে হবে আরও সুষ্ঠু সঙ্গে সুষ্ঠু ভাবে, আরও পরিশ্রম ও সাবধানতার সঙ্গে। প্রথম ইনিংসের সব অভিজ্ঞতা দিয়ে। তার কারণ, আমার বিশ্বাস আমি এখনও আমার শ্রেষ্ঠ কাজ সৃষ্টি করি নি।

(ক্রমশঃ)

———

অতিক্রম ক'রে যাবার ক্ষমতা হ'ল না, কাজেই বিকেলের আশায় ব'সে রইলাম।

বিকেল হ'ল, আবার বেরোলাম। দেখে কিন্তু দুই চোখ জুড়িয়ে গেল। একই সঙ্গে এমন লীলা আর এমন প্রশান্তি, এমন রমণীয়তা আর এমন ভীমকান্ত রূপ কোথাও ত এর আগে দেখি নি, হিমালয়েও নয়। সাগরের ফেন-কিরীট-শোভিত ঢেউগুলো কবে থেকে যে এই একই গান গেয়ে একই ভাবে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে, তা ত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে ক্লান্তির লেশ দেখলাম না। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে, কখনো ঘন নীল, কখনো শাণিত ইস্পাতের মত steel blue কখনো বা পায়রার গলার রংএর মত সবুজে লালে মিশে এক অপূর্ব ময়ূরকণ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে। রাশি রাশি ঝিনুক আর কড়ি ঢেউয়ের সঙ্গে এসে বালির বুকে ঠাঁই নিচ্ছে। প্রত্যেকটি এমন নিপুণ তুলির টানে চিত্রিত যেন জলদেবীরা সারাদিনরাত ধ'রে তাদের গায়ে আলপনা দিয়ে সাজিয়েছে। বিশ্ব-শিল্পীর মানুষকে আনন্দ দিতে কি অবিরাম, কি অবিশ্রাম পরিশ্রম; অথচ মানুষগুলো কি ফিরেও তাকায়?

একদিন দেখি একটা বুড়ো খুঁড়ি ক'রে কিছুক কুড়োচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হবে?" উত্তর দিল, কিন্তু কি যে বলল বুঝলাম না কিছু। বিক্রীর জন্য, এইটুকু বোঝা গেল।

বই প'ড়ে সাগরকে যেমন ভেবেছিলাম মোটেই তেমন নয় দেখলাম। এই যে অসীমের রূপ, একে আমি কল্পনায়ও আনতে পারি নি। দিকচক্রবাল মাঝে প'ড়ে একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে ব'লে রাগ হচ্ছিল। পায়ের কাছে এই যে ঢেউয়ের প্রচণ্ড আস্ফালন, এর থেকে চোখ যেন ফেরান যায় না। এক-একটা এমন প্রলয়মূর্তি ধ'রে ফেনার ধ্বজা তুলে তেড়ে আসছে যে, মনে হচ্ছে উনি এসে পড়লে আর তটভূমির চিহ্নও থাকবে না। দিক বিদিক কাঁপিয়ে দিয়ে তিনি ত আছড়ে পড়লেন, ও মা তারপর এ কি! কোথায় গেল সে তেজ, ভালমানুষের মত beach-এর উপর দিয়ে খানিকটা গড়িয়ে এসে আবার স'রে নিজের জলধি জননীর বুকে মিশে গেল। এই সাগর সঙ্গীতের আর বিরাম নেই। প্রথম প্রথম ভারি disturbed লাগত, একবারও যে থামে না? দিন নেই, রাত নেই। সার বেঁধে পাঁচটা-সাতটা breaker চ'লে আসছে, যেন বাহু তুলে নীল আকাশকে ডাকতে ডাকতে, তাদের ভিতর দিয়ে অসংখ্য রংএর আলো ঝিলিক হানছে; দেখতে দেখতে গড়ে এসে ভেঙে পড়ল। তাদের থেকে চোখ তুলতে না তুলতে দেখি, আর একদল এগিয়ে এসেছে, এই ভাঙল বুঝি! কোথাও ছেদ পড়বার জো নেই যেন। কিন্তু এই সব চঞ্চলতার রাজ্য খানিকটা দূর অবধি, তারপর একেবারে স্থির, অনাদি-কাল থেকে অমনিই প'ড়ে আছে মনে হয়, তাদের সুপ্তির শেষ নেই। ছেলেবেলা কপালকুণ্ডলা প'ড়ে নবকুমারের প্রথম সাগর দর্শনের উচ্ছ্বাসটাকে ঠাট্টা করতাম, কিন্তু এখন দেখলাম যে সে বিশেষ কিছু বাড়িয়ে উঠতে পারে নি।

সেদিন আর বেশী বেড়ান হ'ল না। একে সবে শুক্লপক্ষ আরম্ভ হয়েছে, পূর্ণিমাতে সাগরের চেহারা কেমন দেখব তাই ভাবতে ভাবতে ফিরে গেলাম। কিন্তু বাইরে যতই ভাল লাগুক, খাঁড়ী ডেকে এসে আর মশায় কামড়ে সব সুখ ঘুচিয়ে দিল। কি করি, মোটরের জীব, রাত্রির ছেড়ে বেরোবার সাধ্য নেই, কাজেই সারাটা রাত ছটফট ক'রে কোনমতে কাটিয়ে দেওয়া গেল।

ভোরে সাগরবক্ষে সূর্যোদয় দেখতে গেলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে নগাধিরাজ হিমালয়, রত্নাকরকে হারিয়ে দিয়েছেন। জলের ভিতর থেকে যেন সূর্যটা উঠল, এতে মুগ্ধ হবার বিশেষ কিছু খুঁজে পেলাম না। কিন্তু বহু বৎসর আগে একবার দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী 'Tiger Hill' থেকে সূর্যোদয় দেখেছিলাম, আর হাজার রংএর খেলা তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের উপর এখনও ভুলতে পারি নি।

পুরীতে প্রথম যেদিন সমুদ্রে স্নান করেছিলাম, সেদিন কি অদ্ভুতই যে লেগেছিল! নুলিয়ার হাত ধ'রে ত নামলাম, তবু ভরসা হচ্ছিল না; ঐ পর্বতপ্রমাণ ঢেউগুলো গায়ের উপর ভেঙে পড়বার পরেও যে আমার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে তা বিশ্বাস করা শক্ত। নুলিয়াগুলো খুব expert বটে, তাদের instruction-এর ফলে কয়েকবার ঢেউয়ের গুঁতো খেয়েও দেখলাম, তখনও সলিল-সমাধি লাভ করি নি। কিন্তু শেষের দিন অবধি জলে নেমে যেই দেখতাম যে বিশাল একটি ঢেউ যমরাজের মহিষের মত উদ্যত-শৃঙ্গ হয়ে

তেড়ে আসছে, তখনই বুকের ভিতরটা ভয়ে কি রকম ক'রে উঠত। ডাঙার জীব, জলকে কিছুতেই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারতাম না। নোনাজল যে কত খেয়েছি, তার ঠিক নেই। আমি শেষ পর্যন্ত নুলিয়ার সাহায্য ত্যাগ ক'রি নি, কুড়ি দিন দুই-তিন পরেই স্বাধীনভাবে সাঁতার কেটে ঘুরত, টপাটপ ঢেউ clear ক'রে চ'লে যেত, নুলিয়ারা এর বেলায় admirer হয়ে পড়েছিল।

এই নুলিয়া মানুষগুলো বেশ, এমন উভচর জীব আর কোথাও দেখি নি। জলটা যেন তাদের ঘরবাড়ী, সারা দিন ঢেউয়ের সঙ্গেই নাচছে। জাতিতে উড়িয়া নয়, তা চেহারা দেখেই বোঝা যায়। উড়িষ্যাবাসীরা যেমন জলকে ভয় করে, এরা তেমনি জলের সঙ্গে ভাব। শুনতাম, এদের পেশা মাছধরা, কিন্তু চোখে ত দেখতাম সারাদিন লোককে স্নান করান। কুড়ির একজন নুলিয়া ছিল, তার নামটা এমনি অদ্ভুত যে তা উচ্চারণ করা কোন বাঙালী জিহ্বার কর্ম নয়, কিন্তু তার চেহারাখানা ছিল grand, এবং সাঁতার কাটার skillও অসাধারণ। বেঁটে কালো, কিন্তু figureটা চমৎকার। কোথাও একটু বাহুল্য নেই, অথচ শক্তি তার গঠনের প্রত্যেক লাইনে ফুটে উঠেছে। অজন্তার ছবিতে শিকারীদের যেরকম তীক্ষ্ণ মুখ দেখা যায়, অধিকল সেই রকম মুখ। লোকগুলির পোশাকের মধ্যে একটুকরো ন্যাকড়া, তাও একবার করে জল থেকে উঠেই তখনি খুলে ফেলে নিঙড়াতে আরম্ভ করে। অথচ এ যেন তাদের হাত ধ'রে স্নান করতে কেন যে আমার সঙ্কোচ লাগত না তাই ভাবি। এমন কি তাদের বিশেষ কিছু অসভ্যও মনে হত না। তাদের চেয়ে ঢের বেশী অসভ্য লাগত bathing costume-পরা মেম সাহেবদের।

চেনা-শোনা লোক প্রথম প্রথম কেউই ছিল না, কাজেই সম্পূর্ণরূপে নিজেদের resourceএর উপরেই নির্ভর করতে হ'ত। সকাল বেলা উঠে এক-একদিন সূর্যোদয় দেখতে যেতাম। তবে জিনিষটা বেশী সুন্দর লাগত না ব'লে বেশীর ভাগ দিনই কামাই হ'ত। সকালের জলযোগ বা চা-যোগ সারতে না সারতেই রোদ প্রখর হয়ে উঠত। তারপর স্নানের পালা। নুলিয়ার সঙ্গে জলে নেমে জলধির হাতের গোটা কয়েক চাপড় খেয়ে উঠে প'ড়ে, মোটা একটা কিছু মুড়ি দিয়ে অন্যদের স্নান দেখতাম। ভিজে কাপড়ে বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হ'ত না, কাজেই লোভ সামলে একটু পরেই চ'লে আসতে হ'ত। বাড়ী এসে তোলা জলে আবার স্নান করতাম, যদিও তাতে সাগর স্নানের পুণ্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু চুলে আর গায়ে নুনের চট্‌-চটানি কিছুতেই সহ্য হ'ত না। খুশীর মত [illegible] থাকতে একটুও [illegible] করত না, বিশেষ ক'রে কানের কাছে যখন [illegible] সাগরের [illegible], কিন্তু [illegible] বেরোনো ছিল অসাধ্য [illegible]। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে গোটা কতক novel নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই প'ড়ে সময় কাটাবার চেষ্টা [illegible] তখন [illegible] সকলের [illegible], [illegible] হাতের কাছে [illegible] গিয়েছিলাম, কিন্তু [illegible] translation ছাড়া আর কিছু ক'রে উঠতে [illegible] অল্প কাজ [illegible] থাকে, এখন লেখা-পড়ার কাজে [illegible] আমি কিছুতেই পারি [illegible]

[illegible] উঠতাম, কিন্তু [illegible] একটু [illegible]। সমুদ্রের ধারে [illegible], যেতামও [illegible] দিকে [illegible] আর ঢেউগুলোর [illegible] করার [illegible] চুলগুলো [illegible] ও [illegible] না, [illegible] পারিনা [illegible]। বালিতে ব'সে ব'সে তাদের স্নান দেখত [illegible]। [illegible] এক পা [illegible] দিত [illegible], [illegible] তাদের [illegible]। কয়েকটি [illegible] alive [illegible] কয়েকজন [illegible] ছিল, [illegible] উঠত [illegible] দলে দলে স্নান [illegible] কুড়ি-টুড়ি গায়ে [illegible] দেখাত। [illegible] ভুঁড়িওয়ালা বুড়োবুড়ো [illegible] মানুষকে ঐ পোশাকে ভাল দেখায় [illegible] soldier এবং একটি সুন্দরী তরুণী [illegible] আমার নিজেরই ছুটে পালাতে ইচ্ছে করত। বাচ্চাগুলোর ভয়-ডর কিছু নেই, জলে নেমে হেসেই অস্থির, উঠতেই চায় না। যখন স্নান না করছে তখন ভিজে বালি দিয়ে খেলা লাগিয়ে দিয়েছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীদের স্নান দেখে মোটেই খুশী হতে পারতাম না। ছেলেরাও ভয়ে অস্থির, মেয়েদের ত কথাই

নেই। ছোট ছেলেমেয়েগুলো না বুঝে জলের ধারে গেলেই মা-দাসীরা চড়-চাপড় মেরে সরিয়ে নিয়ে আসত।

স্নান সেখার পালা শেষ হতেই বেড়াতে বেরোতাম। সমুদ্রের তীর ধ'রে অনেক দূর চ'লে যেতাম। কাপড়-চোপড় শুকনো নিয়ে ফেরা প্রায়ই হ'ত না। বেশ জলের ধার থেকে অনেকখানি তফাৎ রেখে চলেছি, হঠাৎ একটা বিরাট্ ঢেউ এসে গায়ে প'ড়ে বেশ ক'রে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। ক্ষুদ্র প্রায়ই ঢেউএর সঙ্গে race দিত, বোনদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে বেচারা অস্থির হয়ে উঠেছিল। শুক্লপক্ষটা অনেক রাত অবধি বেড়ান চলত, কৃষ্ণপক্ষে তাড়াতাড়ি ফিরে বাড়ীর সামনের বেলাভূমিতে ব'সে থাকতাম। শুক্লপক্ষটা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। সাগরের জলে চাঁদের আলোর খেলা, সে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। পূর্ণিমার দিন ত ঢেউয়ের মাতামাতি এমন বেড়ে উঠল যে, জলে নামতেই আমার জুলিয়া রক্ষীটি টেনে তুলে দিল। এক-একটা ঢেউ আসছে যেন আকাশে ঢুঁ মারতে। ভেঙে পড়বার পরেও তার তেজ দেখে কে? জল একেবারে তেড়ে এসে beach-এর দুটো স্তর ডিঙিয়ে তৃতীয়টাতে উঠে পড়ছে। সেদিন আর কারো জলের ধারে-কাছে যাবার জো নেই। সেদিনই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে একজন লোক ডুবে মারা গেল।

সমুদ্রের রূপ দেখে দু'চোখ সার্থক করা গেল কিন্তু। প্রত্যেক ঢেউয়ের বুকের মধ্যে যেন আলোর বিজলী চমকাচ্ছিল। জলে সেদিন দেওয়ালি উৎসব লেগেছিল; নীল সাগর সেদিন সোনায় সোনায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল। সে রাতে ত ঘরে ফেরাই দায়।

শুক্লপক্ষ কেটে যেতেই দেখলাম, সমুদ্রতটে ভ্রমণকারীর দল বেজায় বেড়ে উঠল, সাহেব-মেম কিলবিল করে গেল, বেশী লোক ক্রমেই বাড়তে লাগল। সন্ধ্যার সময় বেলাভূমিতে কত সুরে এবং বেসুরেই যে গান শোনা যেতে লাগল, তার ঠিকানা নেই; আমাদের দেখলেই যেন গানের জোয়ার এসে যেত। কেউ বা ঘুরে ঘুরে গান গাইছে, কেউ বা ভাল ক'রে গলা ছাড়বার জন্যে পা ছড়িয়ে বালির উপর ব'সে পড়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গাইতে চায়, কিন্তু এমন বিশ্রী গায় কেন? আর একটা জিনিষ ভাল লাগত না। এত লোকে বেড়াচ্ছে, তা একটারও পোশাক জায়গাটার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। বরং গা খোলা সাঁতারের পোশাক পরা সাহেবগুলোকে কিছু কম incongruous লাগত। সবচেয়ে ভাল লাগত একজন পক্ককেশ গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীকে, তাকে দেখলেই মনে হ'ত, "হ্যাঁ, এই ঠিক মানিয়েছে।"

অনেক লোককে রোজ দেখে দেখে মুখচেনা হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক কুড়নোটাও নিয়মিত চলত। নিতান্তই অকাজের খেলা, তবু লোভ সামলান যেত না। ছোটবড় রং-বেরংএর সে কি মেলা। কেউ বা প্রজাপতির মত রঙীন ডানা মেলে প'ড়ে আছে, কেউ ফুলের কুঁড়ির মত জোড়া পাপড়ি বুজে আছে মুখের কাছে একটুখানি রক্তিমা নিয়ে, কেউ খসে পড়া রক্তপদ্মের দলটির মত টুকটুক্ করছে। Starfish, cuttlefish, sea anemone, sawfish-এর করাতও অনেক জোগাড় হয়েছিল। নুলিয়াদের কাছ থেকে অনেক সময় বড় বড় ঝিনুক আর কড়ি কিনতাম। প্রায়ই লোকগুলো যতরকম অসম্ভব দাম চেয়ে বসত।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরেও ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করত না, বাইরে বাইরে ঘুরতাম। মাঝে মাঝে দেখতাম, পথের মধ্যে একটা ছোট থালা হাতে ক'রে একটা ওড়িয়া বাচ্চা শুয়ে ঘুম দিচ্ছে। এমন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ কোথাও দেখি নি। আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিবারেরই এঁটো ভাত নিতে গোটা চার শিশুর রোজ আবির্ভাব হ'ত। তার ভিতর একটা এমন কঙ্কালসার ছিল, তাকে কিছু না দিয়ে ফেরাতে মায়া হত। সবচেয়ে নাছোড়বান্দাও সেই ছিল। তার মা-বাপ আছে, অথচ ঐ অবস্থা। আমাদের বাড়ী শুধু নয়, সব বাড়ীতেই সে থালা হাতে ঘুরে বেড়াত। নাম শুনলাম তার "খলিয়া।" অনেক বাড়ীর উচ্ছিষ্টের contribution-এ তার দিনকতক ভালই কেটেছিল। প্রথম প্রথম যেরকম নির্জীব লাগত পরে আর তা লাগত না। হাসতেও সুরু করেছিল। একদিন দেখি, নেড়া মাথায় প্রচুর তেল মেখে, কপালে এবং নাকে সিঁদুরের তিলক ফোঁটা কেটে এসে হাজির হয়েছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে বলল, "সুন্দর হউছি।" আসবার সময় তাকে কিছু দিয়ে আসবার ইচ্ছা ছিল, তাড়াতাড়িতে হয়ে উঠল না। এখন সেটার কি হচ্ছে কে জানে!

ভিখারী বোধ হয় দিনে পঁচিশ-ত্রিশটা আসত। তাদের চেঁচামেচিতে বাড়ীতে তিষ্ঠনো যেত না। সামনে যা পাবে তাই কুড়িয়ে নিয়ে খাবে, এমন কি কমলালেবুর ছিবড়ে পর্য্যন্ত। আমাদের সামনেই একঘর জমিদার এসে উঠেছিলেন, তাঁদের হাতে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল ভিক্ষে দিতে দিতে। আমরা তবু অনেকগুলোকে হাঁকিয়ে দিতাম, তাঁরা পারতপক্ষে কাউকে ফেরাতেন না।

এই জমিদার পরিবারটি আমাদের একমাত্র প্রতিবেশী ছিল। তারা আসবার আগে পাশের একটা বাড়ীতে দিন কয়েক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ছিলেন, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন ছেলে ছিল। ভদ্রলোক যে ক'দিন ছিলেন, প্রচুর ভদ্রতা করেছিলেন। ছেলেগুলিও ভাল। সপ্তাহ খানিক পরেই তাঁরা চ'লে গেলেন, এলেন জমিদার বাবুরা। তাঁরা দুই ভাই, ছোটজন old bachelor, ভাবনা-চিন্তা নেই, কাউকে care করে না, স্বচ্ছন্দে সমুদ্রে দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়, জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে চ'লে আসে। বড়জন, রুগ্ন, শুষ্ক, জরাজীর্ণ, একটি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং গোটা সাত-আট ছেলেপিলে সঙ্গে। তারা সবাই সবকিছু মেনে চলে। এক ঘরে দশজন শুয়ে সব দরজা জানলা বন্ধ ক'রে রাখে, পাছে একটু হাওয়া গায়ে লেগে যায়। বারান্দাটা সুদ্ধ মাদুর টাঙিয়ে airproof ক'রে নিয়েছে। নেহাৎ নির্দোষ শিশুগুলো ছাড়া কেউ জলে নামত না। অন্যরা বালিতে দাঁড়িয়ে থাকত আর চাকরে বালতি ক'রে সমুদ্রের জল তুলে তাদের মাথায় ঢেলে দিত। মেয়েরা স্কুলে পড়ে কি না জিজ্ঞাসা করায় গিন্নী বললেন, "না, ইস্কুলে দিইনি। ইস্কুলে দিলে মেয়েদের শিক্ষা সহবৎ খারাপ হয়ে যায়।" কিন্তু তারা এমনি মানুষ মন্দ ছিল না।

শেষের দিকে ওখানে ডাঃ নীলরতন সরকার তাঁর মেয়েদের এবং ভাগ্নীকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। চেনা মানুষের সঙ্গ খানিকটা পাওয়া গেল।

বিকেলবেলা সমুদ্রের ধার ছাড়া আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করত না, তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। কারণ, পুরীতে এসে মন্দির দেখে না গেলে লোকে নিতান্তই পাগল বলবে। মন্দিরে যাবার পথটি যা অপরূপ,—একবার যেতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। যেমন ভীড় তেমন নোংরা, চারিদিকে অবিরাম অবিশ্রাম চেঁচামেচি। আশেপাশে তাকিয়ে কোথাও একটা সুশ্রী মুখ দেখতে পেলাম না। আমাদের পাণ্ডাটা কিন্তু দেখতে ভালই ছিল। যাক, পথ দুর্গম হলেও পথের অবসান যেখানে হ'ল সে জায়গাটা সুন্দর। চারিদিকের পদ্মের মধ্যে মন্দিরটি পদ্মের মত নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। সিংহদ্বারের সামনেই গরুড়স্তম্ভ, দেখতে সুন্দর। প্রকাণ্ড একটা চত্বরের মধ্যে মন্দিরে, ঢুকবার দরজা চারটে চারদিকে। অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিরও রয়েছে চারপাশে। স্থাপত্যটা বেশ distinctive। মন্দিরটি উঁচুতে এত বড় যে খানিকটা দূরে গিয়ে মাথা প্রায় উল্টে না ফেললে চূড়ার নীলধ্বজা দেখা যায় না। আগাগোড়া সমস্ত চত্বরটাই ভক্তজনদের নাম দিয়ে paved। কত হাজার লোকের নাম মাড়িয়ে যে হাঁটতে হয় তার ঠিক নেই। এরকম দীনতা যাঁরা দেখান তাঁদের নিজেদের হয়ত ভালই লাগে, কিন্তু যাদের হাঁটতে হয় এই নামাবলির উপর দিয়ে তাদের কাছে অত্যন্তই অসুবিধাজনক লাগে।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছিলাম, এত অন্ধকার যে প্রায় কিছুই দেখতে পাই নি। দেবমূর্তিগুলির থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়েই বিদায় নিলাম। পাণ্ডা মহাশয়ের কল্যাণে দিন দুই-তিন মহাপ্রসাদ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

সরকার বাড়ীর দলটি এসে পড়ায় বেড়ানর মাত্রা কিছু বেড়েছিল। দিনদুপুরে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়া হ'ত। সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে বেড়ান সেরে ওদের বাড়ী ঘুরে আসা যেত। বাড়ীর ছাদ থেকে সমুদ্রটা ভারি সুন্দর দেখাত।

শেষের দিকে আবার বৃষ্টি সুরু হয়েছিল। একদিন বৃষ্টির পর বেরিয়ে দেখি, একটি রামধনু নীল সাগরের বুক থেকে উঠে আকাশের নীলে গিয়ে মিশেছে, সমস্ত archটা আলোয় আর রঙে ঝলমল করছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কবিত্ব ক'রে ভাবলাম, এই সেতুটি বেয়ে জলকন্যারা এখনি আকাশের নন্দন বিলাসিনীদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়বে।

একদিন সন্ধ্যার সময় বালির উপর বসেছিলাম, হঠাৎ মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। সে কি কালো রংএর স্রোত,

জগতে যেখানে যত আঁধারের উৎস ছিল, সব যেন এক-সঙ্গে এসে মিশল। পৃথিবীর অন্ধকারের উপর যখন আকাশের ঐ অন্ধকার ক্রমে নেমে আসতে লাগল তখন কেমন একটা ভীত অসহায় ভাবে মনটা ভ'রে উঠল। এ যেন সেই আদি chaos আবার সৃষ্টি গ্রাস করতে আসছে। তার মধ্যে [illegible]। সেই সময়টা [illegible] মধ্যে ব'সে [illegible] জলে [illegible] উঠেছিল [illegible] phosphorus এর আগুনের [illegible] চোখের মত জ্বলজ্বল ক'রে উঠছে।

পরের দিন [illegible] দুই দিন আগে থেকে অসুখে পড়েছি। [illegible] বিকেলে ঘটা ক'রে সমুদ্রে স্নান করতে গেল। আমার আর হয়ে উঠল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢেউ আর মানুষের নাচ দেখতে লাগলাম। জলে নামবার সময় সঙ্গিনীরা যার গায়ে যত গহনা ছিল, সবই আমাকে পরিয়ে দিয়ে নেমেছিল, পাছে জলের মধ্যে কিছু খোওয়া যায়। কোথা থেকে এক সাহেব এসে ফুটন্ত camera নিয়ে, চট্ ক'রে একটা ছবি তুলে নিয়ে চ'লে গেল।

যাবার দিন কেবল চেঁচামেচি আর বকাবকি। অনেক কষ্টে মোটাকয়েক মুটের ঘাড়ে জিনিষপত্র চাপিয়ে ষ্টেশনে এসে পৌঁছন গেল। রাত্রে neuralgiaর উৎপাতে ভুগলাম। সকালবেলা আবার এই ইট-পাথরের খাঁচার মধ্যে ফিরে এলাম।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইতেছে। আজ এই স্মরণীয় বৎসরে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বিদেশী হইয়াও তিনি ছিলেন ভারতীয়। ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক। ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর নাম চিরবিজড়িত। প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে, ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাতির পরিচয়সাধনে, পাশ্চাত্ত্যানুকরণে অনুপ্রাণিত জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধকরণে নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁর 'নিবেদিতা' নামের সার্থকতা।

১৮৬৭ সালে ২৮শে অক্টোবর আয়র্লণ্ডের ডানগ্যানন শহরে এই নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তাঁর পূর্বনাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ধার্মিক পিতার ধার্মিক সন্তান। শৈশব হইতেই তাঁর মন সেইভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম জীবনে মার্গারেট ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। মনে করিয়াছিলেন এই ভাবেই তিনি জীবন কাটাইয়া দিবেন; কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহার জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

১৮৯৩ সালে চিকাগো শহরে এক ধর্ম-সম্মেলন হয়। পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই প্রতিনিধি গিয়াছিলেন. ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের মহিমা প্রচার করিতে। এইখানেই মার্গারেটের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ। মার্গারেট অভিভূত হইলেন। স্বামিজীর মধ্যেই ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক নূতন জীবন-দর্শনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল।

মার্গারেট এক প্রবল আকর্ষণে দেশ ছাড়িয়া, মাকে ছাড়িয়া—এক কথায় নাড়ীর সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বামিজীর সহিত ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন। সত্যই যেন এক অচিন্ত্যনীয় পরমাশক্তির ইচ্ছাই এই মহিয়সী বিদেশিনীকে এই পুণ্যভূমিতে টানিয়া আনিয়াছিল। তার পর ভারতমাতার চরণে অর্পিত হইয়া কিভাবে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তাহা একটি নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। তিনি ছিলেন সত্যই নিবেদিতা।

বাস্তবিক স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ মার্গারেটের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। আজ ভাবিতেও বিস্ময় লাগে, কি কঠোর ব্রহ্মচর্যপালন ও বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে! তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছিল। স্বামিজী তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে অজ্ঞ জনসাধারণের সেবায়। সেই আদর্শ লইয়াই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত—কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ। কিন্তু সেবা করিবার অধিকার কি সকলের আছে? ভারতবর্ষকে ভালবাসিলে তবেই সেবার অধিকার জন্মে এবং ভালবাসিতে গেলে তাহাকে জানা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারত হইতেই বর্তমান ভারতের জন্ম, আর বর্তমান ভারত হইতেই আবির্ভূত হইবে ভবিষ্যৎ ভারত। ভারতের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি চিন্তা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে জড়াইয়া রহিয়াছে অধ্যাত্মবাদ। ভারতীয় জীবন-যাত্রাকে অস্বীকার করিয়া তাহার অধ্যাত্মবাদকে বুঝিবার চেষ্টা করা নিরর্থক।

স্বামিজী জানিতেন, মার্গারেট তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকেই জীবনের পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া—ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। একান্তভাবে তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া মার্গারেট যাহাতে স্বাধীনভাবে নিজের কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন তাহার চেষ্টাও ঐজন্ত তিনি করিয়াছিলেন। নিবেদিতার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বদেশসেবক—প্রত্যেকে তাঁহার মধ্যে নিজ জীবনাদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং সর্বদাই তাঁহার নিকট নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিতেন।

তিনি মনে করিতেন, দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, বংশ-গৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ভারতবর্ষের জন্ত এক অদম্য ব্যাকুলতা, এইগুলির সমাবেশ হইলেই শিল্পে, বিজ্ঞানে, ধর্মে শক্তির এরূপ জোয়ার আসিবে যাহা কেহই রোধ করিতে পারিবে না।

ভারতের মুক্তি সাধনায় তাঁহার আত্মত্যাগ অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নিবেদিতার নবজন্ম।

বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিবেদিতা কলিকাতায় নারীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের সত্যতা উপলব্ধির জন্ত ত্যাগের পথ বাছিয়া লন। এ দেশের জনসাধারণের সেবা করিতে গিয়া তিনি আমাদেরই একজন হইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের দুঃখ, শোক, আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি এক হইয়া যান— এক মন, এক প্রাণ।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন: "মানবাত্মা এক। এই উপলব্ধির মধ্যেই ধর্মের সত্যতা ও মানবজাতির আত্মিক সমন্বয়ের সূত্র—মানব জীবনের সংঘবদ্ধতা এবং ধর্মের বহিরঙ্গের চর্চা নয়, একাগ্রতা, অন্তরঙ্গতার গভীরতায় এই উপলব্ধি সম্ভব। ভগিনী নিবেদিতার ধ্যান এই পথে গিয়াছিল বলিয়াই তিনি এদেশের জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাই বিদেশিনী হইয়াও নিবেদিতা সার্থক ভারতীয়।

কিন্তু তাঁহাকে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, 'আমি শিক্ষয়িত্রী।' এই শিক্ষকতার জীবনই আবার তাঁহাকে স্বামীজীর আদেশে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সত্যই তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে 'মডার্ণ রিভ্যু'তে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি বলিতেন, শিক্ষাই ত ভারতের সমস্যা। শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতি সাধন। শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র স্থাপন।

ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার যে কেবল স্নেহ-ভালবাসা ছিল তাহা নহে, তিনি বলিতেন, ভবিষ্যৎ ভারতের যাহারা প্রতিনিধি, তাহারা জীবনযাত্রায় যে কর্মক্ষেত্রই নির্বাচন করুক, উচ্চ আদর্শ, আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বদেশনিষ্ঠা যেন তাহাদের জীবনের লক্ষ্য হয়।

ভারতবর্ষের কথা উঠিলে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। তিনি মেয়েদের বলিতেন, ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করবে—"ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা! তিনি নিজেও জপমালা লইয়া জপ করিতেন, "ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা! এই ভারত প্রেমই পরে তাঁহাকে বিপ্লব ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, যদিও তিনি কোন সক্রিয় অংশ লন নাই।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ. সে ইতিহাস গঠনে আন্দোলন ও বিপ্লবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন ও বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহা বহুদূর পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। অন্যান্য নেতাদের সহিত নিবেদিতাও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেন। বোধহয় এই কারণেই তিনি প্রয়োজনমত বিপ্লবীদের সাহায্য করিয়া থাকিবেন।

নিবেদিতার সহিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগ, সেও তাঁহার অত্যধিক ভারত প্রেমের জন্যই হইয়াছিল। রামানন্দ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব উঁচু ছিল। 'প্রবাসী' বাংলা কাগজ হইলেও, তিনি সকল খোঁজই রাখিতেন। তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন, এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায়—বাংলার সুখ-দুঃখের কথা বলিয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইহার মনীষা ও ইহার চরিত্র একদিন প্রশস্ততর সাধনক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।

'মডার্ণ রিভ্যু' ইহার পরেই বাহির হয়। এবং পরে নিবেদিতা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। নিবেদিতার গভীর আধ্যাত্মিকতা, আশ্চর্য চারিত্রিক শক্তি, ভারত-প্রীতি, ভারত সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, মনীষা, পাণ্ডিত্য, শিল্পজ্ঞান, নানা বিষয়ে আশ্চর্য লিখিবার ক্ষমতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি রামানন্দের নিকট শ্রদ্ধার জিনিস ছিল। তিমি

'মডার্ণ রিভ্যু'র জন্মকাল হইতেই লেখা দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, সেরূপ সাহায্য সচরাচর কাহারও নিকট হইতে মিলে না।

নিবেদিতা তাঁহার লেখার উপর কলম চালানো পছন্দ করিতেন না। কিন্তু রামানন্দের প্রতি তাঁহার এতখানি শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল যে, তাঁহাকে সে-অধিকার তিনি দিয়াছিলেন।

নিবেদিতা ছিলেন শিল্পী। ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ে তাঁহার দান কতখানি, তাহার উল্লেখ ব্যতীত আধুনিক ভারত শিল্পের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি বলিতেন, শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বস্তুত তাঁহাকে ভারতীয় চিত্রকলার ধাত্রী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই, বি, হ্যাভেলের সহিত এই কারণেই তাঁহার পরিচয় ঘটে। এ কথা মিথ্যা নয়, মিঃ হ্যাভেল, নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ এই তিন জনের মিলন ভারতীয় চিত্রকলায় যুগান্তর আনিয়াছিল।

যে সেবাব্রত লইয়া তিনি এ দেশে আসিয়াছিলেন তাহা তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতায় যেবার প্লেগ হয়, সে সময় বস্তিবাসী রোগীদের সেবা ও বস্তি পরিষ্কার কাজে যেভাবে তিনি লাগিয়াছিলেন তাহা এখনও হয়ত অনেকের মনে আছে। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন সেকাজে নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত। কলিকাতার লোকেরা সেদিন এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিল—তাহারা দেখিয়াছিল, গেরুয়া-কাপড় পরা সাধুর দল নর্দমা পরিষ্কার করিতেছেন মেথর-ধাঙরের মত।

প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতা ভারতবর্ষকে সেবা করিবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে তাহার মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'ভগিনী নিবেদিতা যে সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজনবোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয়, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এই জন্যই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা, তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না, এও সেইরূপ ...

তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক অপরকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে ...কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা, একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে বিন্দুমাত্র হাতে রাখেন নাই ...জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপল'কে (people), এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি

আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি ত ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি ত লাগে না।"

নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন। স্বামিজীর একটি কথা কেবল তাঁহার মনে জাগিত, "আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্তও নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে বরাবরই স্নেহ করিতেন। এই বসু-পরিবারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সে সম্পর্ক অটুট ছিল।

নিবেদিতার বড় ইচ্ছা ছিল, ভারতীয় অর্থে ভারতীয়ের দ্বারা একটি বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে ভারতীয় ছাত্রগণ বিজ্ঞান সাধনার অব্যাহত সুযোগ পায়। ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লইয়া আচার্য বসুর সহিত তাঁহার জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। মন্দিরের পরিকল্পনাও নিবেদিতা করিয়াছিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ইহং যেমন হিন্দু ইউনিয়ন কমিটি, গীতা সোসাইটি, ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি, বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন, গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, স্বামিজীর আদর্শ ও বাণী জলন্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তা এবং বলাবাহুল্য ঐ সকল বক্তৃতা অনেককেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষালাভে সহায়তা করিয়াছে সাধারণ লোকের মধ্য হইতেই জগতের যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিবেই। পুনরাবৃত্তিই জগতের নিয়ম। স্বামিজীর এই কথা নিবেদিতা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই তিনি সকলের সহিত মিশিতেন। এ সম্বন্ধে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করিলেও, তিনি কোন দিন হিংসামূলক বিপ্লবকার্যে যোগদান করেন নাই। যদিও এই কারণেই পরে অর্থাৎ স্বামিজীর দেহত্যাগের পরে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বামিজী এই আশংকা করিয়াই তিনি এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আমার ভয় ছিল, নূতন বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসার ফলে তোমার মন যেদিকে ঝুঁকিবে, তুমি অপরের ভিতর জোর করিয়া সেই ভাব দিবার চেষ্টা করিবে। কেবল এই কারণেই আমি কখনও কখনও তোমাকে বিশেষ বিশেষ প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র, অন্য কোন কারণ নাই।"

"The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics."

ইহাও স্বামিজীর কথা।

মিশন হইতে বাহিরে আসিলেও, মিশনের প্রতি নিবেদিতার আকর্ষণ কম ছিল না। ইহা তাঁহার উইল হইতেও বোঝা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বষ্টন শহর নিবাসী উকীল মিঃ ই, জি, থর্প আমাকে অথবা আমার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে যাহা কিছু দিবেন, যেমন ব্যাঙ্কে আমার যে তিনশত পাউণ্ড আন্দাজ জমা আছে, পরলোকগতা ওলিবুল-পত্নীর সম্পত্তির মধ্যে আমার যে সাত শত পাউণ্ড রহিয়াছে, এবং আমার যাবতীয় পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় ও উহাদিগের মধ্যে যেগুলির গ্রন্থস্বত্ব আমার আছে, সেই সকল আমি বেলুড়ের বিবেকানন্দ স্বামিজীর মঠের ট্রাষ্টিগণকে দিতেছি। তাঁহারা ঐ অর্থ চিরস্থায়ী ফাণ্ডরূপে জমা রাখিবেন এবং ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাতীয় প্রণালীতে, জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহারা সিস্ ক্রীষ্টীন গ্রীনষ্টাইডেলের পরামর্শ মত উহার আয় মাত্র ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন।"

বাস্তবিক ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার যে ভালবাসা, তাহা সাধারণ দেশপ্রীতির ঊর্দ্ধে। ভারতের মুক্তিসাধনায় তাঁহার আত্মত্যাগ অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নিবেদিতার নবজন্ম।

লোকমাতা নিবেদিতা

শ্রীসারদারঞ্জন পাণ্ডত

এই মাসেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,—"নিবেদিতা মহৎ ছিলেন বলিয়া আমাদের প্রণম্য। আমাদের চেয়ে তিনি বড় ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। তাঁহার চরিত্র যদি আমরা আলোচনা করি, তবে হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইয়া উঠিব।"

নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭ সালে আয়ার্লণ্ডে মার্গারেট নোবলের জন্ম। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নেবার পর গুরু প্রদত্ত নতুন নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

গুরু বিবেকানন্দের প্রতি আর সেই সঙ্গে ভারতের প্রতি নিবেদিতার ছিল গভীর প্রীতি ও আত্মনিবেদন, এ দেশকে জানবার জন্যে ছিল অদম্য উৎসাহ, সর্বোপরি ছিল ভারতের কল্যাণ-চিন্তার চরম পরিণতি নিঃস্বার্থ সেবা। স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্পর্শে এই বিদেশিনী মহিলা হয়ে গেলেন সর্বত্যাগিনী ব্রতধারিণী। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতায় গঠিত জীবন-ধারাকে তিনি কেমন করে নতুন ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাঁচে রূপান্বিত করলেন আর ভারতীয় নারীজাতির শিক্ষার জন্যে, উন্নতির জন্যে নিজের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—'ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারত-বর্ষে দান করিয়াছিলেন তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।"

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে দেখে লোকমাতা বলে অভিহিত করেছিলেন, তার যাথার্থ্য আমরা মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে কি ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে, তা আমরা নিবেদিতার মহান চরিত্রে উপলব্ধি করেছি।

ভারতেই তোমার স্থান

মার্গারেটকে স্বামীজী বলেছিলেন,—"ভারতবর্ষই তোমার আপন ধাম। তার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তোমাকে সবকিছু ভেবে দেখতে হবে। আমি তোমার পাশে থাকব।"

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী মার্গারেট কলকাতায় এলেন। স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর মানস দুহিতাকে সস্নেহে স্বাগত জানালেন।

তার কিছুদিনের মধ্যে মিস হেনরিয়েটা মুলার, মিসেস ওলি বুল (ধীরামাতা), মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড বিদেশী শিষ্যাগণও স্বামীজীর পাশে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে আলমবাজার থেকে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছে। স্বামীজী তাঁর গুরুভ্রাতা ও বিদেশিনী ব্রহ্ম-চারিণাদের সঙ্গে সেই মঠেই বাস করছিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীর পাশেই যেখানে জমি কেনা হয়েছিল, সেখানে তখন বেলুড় মঠের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। এই নতুন জমিতেই একখানা ঘরে মার্গারেটসহ বিদেশিনী শিষ্যাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। মধ্যে মধ্যে স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন ও নানা বিষয় আলোচনা করতেন।

বিবেকানন্দের শিক্ষা ও নিবেদিতার উপলব্ধি

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ষ্টার রঙ্গমঞ্চে মার্গারেট একটি বক্তৃতা দিলেন। এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। সেখানে সভাপতি হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব।' সেই বক্তৃতায় দেশের লোক জানতে পারল নিবেদিতার মহান উদ্দেশ্যের কথা। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন— "দীর্ঘ ছয় হাজার বৎসর ধরে রক্ষণশীল হয়ে থাকবার আশ্চর্য নৈপুণ্য আপনাদের আছে কিন্তু এই রক্ষণশীলতার দ্বারা আপনাদের জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্ম সম্পদ-গুলিকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। এই জন্যেই আমি ভারতবর্ষে এসেছি, একনিষ্ঠ আগ্রহ নিয়ে তার সেবা করব বলে। গুরুর কৃপায় আমার মনে হয় আমি যেন ভারতের আত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। ভারতের বেদান্ত কত মহান জিনিষ, এই বেদান্তের উদার আধ্যাত্মিক চিন্তা আমার চিত্তকে দোলা দিয়েছে।

ক মনুষ্যত্বের গৌরবের পথে অগ্রসর করাবার জন্যে

নতুন করে গড়ে তুলেছে। আমি একথা জোরের সঙ্গে বলছি, এমন একদিন আসবে যখন ঐশ্বর্যের ভারে শ্রান্ত প্রতীচ্য ভারতের দিকে অন্তরের শান্তির প্রত্যাশায় আকুল নেত্রে তাকাবে। ভারতের অনাড়ম্বর দারিদ্র্যকে প্রতীচ্য ঈর্ষা করবে, এদেশের শাশ্বত অধ্যাত্ম সম্পদের মূল্য সেদিন সে নতুন করে বুঝবে।"

বহু তীর্থ গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা পরিভ্রমণ করেছেন। অমরনাথ থেকে ফেরবার পথে গুরুর কাছ থেকে নিবেদিতা জানতে চেয়েছিলেন—কালই বা কি, কালীই বা কি আর মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে কি বোঝায়? একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন শুনে স্বামী বিবেকানন্দ হাসতে লাগলেন। বললেন,—"একটু অপেক্ষা কর বৎসে, আমি একটি কবিতায় তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।" এই বলে তিনি 'Kali the Mother' নামে একটি কবিতা লিখে তাঁকে পড়ে শোনালেন।

এই কবিতায় নিবেদিতা তাঁর প্রশ্নের যে শুধু উত্তরই পেলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে জীবনাদর্শের বীজমন্ত্রকে লাভ করলেন। এই মহাশক্তির ধ্যানে নিবেদিতা আত্মস্থ হলেন।

স্বামীজীর শিক্ষা-প্রভাবে নিবেদিতা উপলব্ধি করলেন, পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত মহাশক্তির যে খেলা চলছে, সে দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্য নিত্য নানা নাম-রূপে ফুটে উঠছে তাই সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসার সমন্বয়ভূমি এক অদ্বয় চৈতন্য সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। এই বৈচিত্র্য ও অভিব্যক্তিই সৃষ্টির প্রাণ।

তাই ভারতবর্ষে নিবেদিতা তাঁর প্রাণসত্তাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন।

নিবেদিতার কর্ম ও প্রতিভা

নিবেদিতা কর্মক্ষেত্রে নেমে প্রথমেই দেখলেন দুরন্ত প্লেগরোগ এসে সারা দেশকে মহাশ্মশানে পরিণত করছে। তখন তিনি স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে প্লেগ রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। শুধু তাই নয়, একবার মেথর ধর্মঘটের সময় নিবেদিতা সম্মার্জনী হস্তে পথঘাট পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত হলেন। এই মহান দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার। তিনি তাঁর গ্রন্থে নিবেদিতা প্রসঙ্গে একস্থানে লিখেছেন,—"প্লেগের সময় কলকাতায় কি আতঙ্ক!...কলকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করতে নেমেছেন। তাঁর এ দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করে বাগবাজার পল্লীর যুবকরাও শেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামল। পরে শুনলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দ এঁকে লণ্ডন থেকে এনেছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠ দেশবাসী পেয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে।"

নিবেদিতার শিক্ষা

ক্ষুদ্র থেকে মহান এই সত্য বাণী নিবেদিতা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। বাগবাজার পল্লীর মেয়েদের নিয়ে তিনি একটি ছোট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ের শিক্ষার জন্যে যখন তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন,—"তুমি তোমার মেয়েকে কি শিক্ষা দিতে চাও?" রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন,—"ইংরেজী ভাষা অবলম্বন করে যে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, আমি সেই শিক্ষার কথা বলছি।"

নিবেদিতা তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—"বাহির থেকে কোন শিক্ষা আমদানি করে জোর করে গিলিয়ে দিয়ে লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভেতরে যে স্বাভাবিক জিনিষটা বিদ্যমান আছে, তাকে জাগিয়ে তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করি। বিদেশী শিক্ষাদ্বারা সেটাকে চাপা দেয়া আমি ভাল বোধ করি না।"

তাই নিবেদিতা মেয়েদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা পরিপূর্ণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষা।

কিন্তু নিবেদিতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবের মিলনের কথা বলতেন। তিনি বলতেন,—"নিখিল মানব মনের অনুভূতি এক। সেজন্যে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা উভয়েরই মানসিক উন্নতি ও সর্ববিধ প্রগতি সাফল্যমণ্ডিত হয়।"

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনকে আদর্শ শিক্ষা নিকেতনরূপে গড়ে তুলছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি নিবেদিতার আদর্শ ও পরামর্শ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা বাংলার পল্লী জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়কল্পে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহ গিয়েছিলেন। সেখানে পল্লীবাসীদের সঙ্গে অনাড়ম্বরভাবে তিনি মিশেছিলেন। শিলাইদহে বসে নিবেদিতা ভারতীয় শিক্ষার কল্পপ্রসূ রূপটি রবীন্দ্রনাথের সামনে তুলে ধরে-

ছিলেন। এ ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-বিনিময়ের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে নিখিল মানব সমাজের এই ভাবেই উন্নতি হয়।

নিবেদিতার শিক্ষার আদর্শ ও সেই সঙ্গে ভাবের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা দ্বারাই সমস্ত পৃথিবীকে নিকটে পাওয়া যায়—রবীন্দ্রনাথ একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করেছিলেন। তিনি 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে এক স্থানে লিখেছেন—"আমরা এই কথা উপলব্ধি করিব যে, স্বজাতির মধ্য দিয়া সর্ব জাতিকে ও সর্ব জাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিত রূপেই বুঝিব যে, আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।"

নিবেদিতার বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মধারা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ও বিশেষভাবে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার দান অবিস্মরণীয়। প্রথম জীবনে তিনি বিশ্ব ইতিহাসখ্যাত আইরিশ সিনফিন দলে ছিলেন। আলষ্টারের জঙ্গলে পিতার সঙ্গে অসম সাহসিকতার সঙ্গে বিপ্লবী সংগ্রামে কাজ করেছেন। ভারতে অরবিন্দ যখন বৈপ্লবিক কর্মে লিপ্ত হন, তখন নিবেদিতা ছিলেন তাঁর বড় সহায়। অরবিন্দের বৈপ্লবিক কল্পনার সঙ্গে নিবেদিতার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছিল বলেই ভারতে বিপ্লববাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পেরেছিল। নিবেদিতার অনুরোধে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁদের বিজ্ঞানাগার তরুণ বিপ্লবীদের ল্যাবরেটরি তৈরি করবার জন্যে খুলে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা অসামান্য বক্তৃতার সঙ্গে ও একই সঙ্গে অন্তরালে গুপ্ত সমিতি এবং প্রকাশ্যে চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। এর তুলনা বিশ্বের বিপ্লব-ইতিহাসে আর একটিও পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে আজ যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তার মূলে ভগিনী নিবেদিতার প্রচেষ্টা অনেকখানি। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত।

সাহিত্যসেবা

নিবেদিতা বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যা বিশ্ব-সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। তার মধ্যে—'The Master as I saw him', 'Civic and National Ideals,' 'The Web of Indian life,' 'Kali the Mother', 'Religion and Dharma', 'Siva and Buddha', 'Hints on National Education in India'—গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতা প্রায় ২০ খানি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর অনন্য সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য জগদীশ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রভৃতি বাংলার অনেক মনীষী লেখক তাঁদের গ্রন্থ রচনায় নিবেদিতার কাছ থেকে বহুভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন।

ভারতীয় শিল্পানুরাগ

ভারতীয় চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতিও নিবেদিতার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি যখন উইম্বলেডনে রাস্কিন স্কুলে অধ্যক্ষা হিসাবে কাজ করতেন, তখন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী এভেবান কুকের সঙ্গে তাঁর গভীর আলোচনা ও গবেষণা হয়। পরে ভারতবর্ষে এসে তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুকে ভারতীয় চিত্রশিল্প প্রসারে তিনি উৎসাহ দান করেন।

শুধু তাই নয়, নিবেদিতা নিজের খরচে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের পাঠিয়ে অজন্তার গুহাচিত্র আঁকিয়ে আনেন এবং তা প্রচার করেন।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের মধ্যে আর সেই সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে নিবেদিতা তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সত্তাকে ও সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর শিল্পতৃষ্ণা মেটাবার জন্যে তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করলেন। দেখলেন সমস্ত দেশের শিল্প ও চারুকলা। শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন,—"এই ত শিল্প, যে শিল্প মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করে, প্রাণের শাশ্বত ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে।"

অজন্তার গুহাচিত্র দেখে বললেন,—"সঙ্গীত! সঙ্গীত! পাথরে গাঁথা আছে প্রাণের অপূর্ব সঙ্গীত। এরা আকুল ভাবে গান গেয়ে ডাকছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে। বলছে—'এসো, এসো, আমার বুকে এসো। আমি ভারতবর্ষ, হে বিশ্ববাসী আমার কথা শোন।"

গেলেন কেদার বদ্রী ভ্রমণে। হিমালয়ের পথে পথে তিনি দেখলেন অসংখ্য প্রাকৃতিক ছবি, যা ভগবান সাজিয়ে রেখেছেন মানুষকে অনন্তকাল ধরে তৃপ্তি দেবার জন্যে।

সেই অপূর্ব দৃশ্য ছবি দেখতে দেখতে নিবেদিতা আকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন,—"ডুবে গেছি, একেবারে আমি ডুবে গেছি। আমাকে কেউ তোমরা তুলতে পারবে না।" যারা শুনল সে কথা, তাঁর সঙ্গীরা, সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

নিবেদিতার রূপ

আমরা নিবেদিতার ছবি দেখি, তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। তাঁর কি রূপ ছিল সঠিকভাবে জানি না। তবে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, সে রূপের তুলনা হয় না।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতা সম্বন্ধে লিখেছেন,—"ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যি ভালবেসেছিলেন, তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি! প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় এমেরিকান কন্সালের বাড়ীতে।...কি সুন্দর রূপ! গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাঘরা। গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।...সুন্দরী, সুন্দরী, কাকে বল তোমরা জানি না। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটাই আদর্শ হয়ে আছে। নিবেদিতাকে দেখলে মনে কত ভাব উঠত। তাঁকে দেখলেই কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমা দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠত।"

মহাপ্রয়াণ

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে নিবেদিতার শরীরর ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। বন্ধুদের অনুরোধে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্তে দার্জিলিং গেলেন। কিন্তু সকলের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন যেন এগিয়ে আসছিল।

মহাপ্রয়াণের পূর্বদিন নিবেদিতা তাঁর প্রিয়পাত্রদের নিয়ে একত্রে ভোজন করলেন। তারপর সুরু হ'ল প্রার্থনা। প্রার্থনা বাক্য তিনি নিজেই উচ্চারণ করলেন। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

তারপর অন্তিমকালের শেষ কথা তিনি উচ্চারণ করলেন,—'আমার দেহ-ভেলা ডুবিতেছে কিন্তু আমি সূর্যকেও তুলিয়া ধরিতে পারি (এমন শক্তি আছে)।

গুরু বিবেকানন্দের চরণে মিলিত হবার জন্তে তিনি গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরণে সমর্পিতা ভগিনী নিবেদিতা অসীম সত্তায় বিলীন হয়ে গেলেন।

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষ সংখ্যায় বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যে দ্বিতীয় কলমে ১৬ লাইনে আছে 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করছে।' ইহার পরিবর্তে হবে, 'সূর্যের চারিদিকে সে ৩৬৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করছে।' অথবা 'নিজের অক্ষদণ্ডের উপর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আবর্তিত হচ্ছে।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী

শিবু এম, এ, পাস করল কিন্তু চাকরি জোগাড় করতে পারল না। বাবা নেই, মা আছেন। কাজেই একটা কিছু করা দরকার। বন্ধু সুব্রত বড় লোকের ছেলে, সে সাহায্য করবার চেষ্টা করে কিন্তু শিবুর আত্মসম্মান খুব বেশী। সে স্পষ্টই বলে দেয়, এমন করে আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করো না। শিবুকে সুব্রত ভাল করেই জানে, ভাঙ্‌বে ত মচকাবে না। শেষে তারই চেষ্টায় শিবু একটা টিউশানী পেল। বড় লোকের একমাত্র মেয়ে। কাজেই তার আব্দারও যেমনি, জিদ্‌ও তেমনি। মেয়েটির নাম রত্না, কলেজে পড়ছে। বাবা ব্যারিষ্টার, মাও অভিজাত ঘরের মেয়ে। দেমাকটা তাই ষোল আনা আছে। শিবুকে তাই মানিয়ে নিতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

শিবু খুব যত্ন নিয়ে পড়ায়। অনেক সময় পড়াতে পড়াতে তন্ময় হয়ে যায়। দেখে মনে হয় না, কোনো কালে সে ছাত্র ছিল। অনেকের ধারণা হতে পারে টাকার অঙ্কে সময়ের মূল্য কিন্তু শিবুর প্রকৃতি অন্যরূপ। তার টাকার প্রয়োজন অনেকখানি হলেও, পড়ানোটাকে সে ব্রত ব'লে গ্রহণ করেছে। তার ব্যবহার ও আচার-আচরণে রত্না মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু রত্নার মা তাকে শিক্ষক ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারলেন না।

এমনি ক'রে প্রায় বছর খানেক কেটে গেল। রত্না আর সে রত্না নেই। আগের চেয়ে অনেকখানি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—কথায় কথায় হাসি। শিবু ধমক দেয়, কিন্তু হাসি থামে না। এ পরিবর্তন রত্নার মা'র চোখে ধরা পড়বার কথা, কিন্তু আদুরে মেয়ের আব্দারের স্রোতে সবকিছু বৈষম্য ভেসে যায়।

অবশ্য ধরা একদিন পড়ল—রত্নাই ধরা দিল শিবুর কাছে। বললে, আমি তোমাকে ভালবাসি।

শিবু আঁতকে উঠল। সোজা চেয়ার ছেড়ে সে উঠে পড়ল। বললে, কাল থেকে আর আসব না।

রত্না হাত ধরে বসাল। বললে, আমি কি অযোগ্যা?

—তুমি ছাত্রী, তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক। তা ছাড়া আমি গরীব, তোমাদের সমাজে আমি অচল।

রত্না খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। তোমাকে আমাদের সমাজে চল করবার মত আমার বাবার যথেষ্ট টাকা আছে।

—টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে চাও?

—আমাকে বিয়ে করলে, আমার টাকা আর তোমার টাকা কি পৃথক হবে!

—সে টাকা ভোগ করতে আমার আত্মসম্মানে বাধবে রত্না।

—কিন্তু আমার আত্মদানের কি কোনো মূল্যই দেবে না?

—তুমি অপাত্রে আত্মদান করেছ রত্না। তোমাকে আমি ভাববার সময় দিয়ে যাচ্ছি—তুমি মন স্থির করো। ব'লে শিবু চ'লে গেল।

রত্নার মাথায় বাজ পড়ল। জীবনে এত বড় পরাজয় আর তার কখনো হয় নি। কিন্তু এ পরাজয়ের গ্লানি সে কি ক'রে বইবে? রাত্রে সে খেতে পারল না, পরদিন তার এ ভাবান্তর মা'ও লক্ষ্য করলেন। বললেন, কি হয়েছে রত্না?

—কিছু হয় নি মা, শরীরটা ভাল নেই।

তার এখনও আশা, শিবুকে সে রাজী করাতে পারবে।

শিবু সব কথাই সুব্রতকে খুলে বলল।

সুব্রত বললে, তুই রাজী হয়ে যা শিবু, তোর ভাল হবে। ব্যারিষ্টার কালিদাস রায়ের অগাধ টাকা। তাঁর ছেলে নেই ঐ একমাত্র মেয়ে, একদিন সব সম্পত্তি ত তোরই হবে।

—কিন্তু এ ভাবে আত্মবিক্রয় আমি করতে পারব না।

—খুব হুঁশিয়ার শিবু, ওদের আত্মসম্মানে ঘা লাগলে সর্বনাশ ক'রে ছাড়বে।

শিবু হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সারারাত্রি ধ'রে অনেক চিন্তাই করল সে। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত সে স্থির করলে, লেখাপড়া শিখে সে আত্মবিক্রয় করবে না—কিছুতেই না।

পড়বার ঘরে রত্না শিবুর প্রতীক্ষায় বসে আছে। শিবু ঘরে ঢুকতেই রত্না উঠে দাঁড়াল। বললে, বলো, কি ঠিক করলে? মনে রেখো, আমার জীবন-মরণ সবকিছু নির্ভর করছে এখন তোমার ওপর।

—আমাকে নিষ্কৃতি দাও রত্না, আমি কালও একথা তোমাকে জানিয়েছি।

রত্না কাঁপতে কাঁপতে শিবুর পায়ের ওপর প'ড়ে গেল। বললে, আমাকে দয়া করো।

চেঁচামেচি শুনে রত্নার মা ঘরে এসে এই দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, রত্না কার পায়ে ধরছিস তুই?

রত্না উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি ওকে ভালবাসি। কিন্তু ও বিয়ে করতে রাজী নয়।

মা'র চোখ জলে উঠল। বললে, কেন?

—বলছে আত্মবিক্রয় করবে না।

—দেখ শিবু, এ বিয়েতে আমারও যে খুব মত আছে তা নয়। কিন্তু মেয়ের জন্যে আমাকে মত দিতে হচ্ছে। তুমি ওকে বিয়ে করলে আমার সমস্ত সম্পত্তি যৌতুক হিসেবে তোমাকেই লিখে দেব। এতে তোমার সম্মান কিছুমাত্র নষ্ট হবে না।

—আমাকে ক্ষমা করবেন, এ আমি কিছুতেই পারি না।

—তোমাকে পারতেই হবে। রত্নার মা গর্জে উঠলেন। আমার মেয়ে কখনো কারু কাছে ছোট হয় নি—তোমার কাছেও তাকে ছোট হতে দেব না।

—ছোট কি শুধু আমাকেই করতে চান গরীব বলে?

—তুমি গরীব কিসের—অগাধ তোমার সম্পত্তি। বলো, এখুনি লিখে দিচ্ছি।

—আমাকে লোভ দেখাবেন না।

—বটে! গর্জে উঠলেন রত্নার মা। সামনের ড্রয়ার খুলে ক্ষিপ্রহাতে রিভলভারটি বের ক'রে শিবুর সামনে ধরলেন। বললেন, আজ পর্যন্ত আমি কারো কাছে নত হই নি, তোমাকে আমার আদেশ মানতেই হবে। নইলে—

রত্না চীৎকার ক'রে উঠল: কি করছো তুমি মা! যান, আপনি এখুনি চলে যান।

—না, যাবার উপায় ওর নেই। আমার মুখের ওপর আমাকে উপেক্ষা ক'রে চলে যাবে, আমি তা সহ্য করতে পারব না। হয়, আমার প্রস্তাবে ও রাজী হবে, না হয়, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হবে।

শিবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—বলো, আমার প্রস্তাবে রাজী?

—না।

—না! হাতের পিস্তল গর্জে উঠবার আগেই রত্না মা, মা, ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। পিস্তলের গুলী রত্নার বক্ষভেদ করল।

গুলীর আওয়াজ শুনে ব্যারিষ্টার রায় ছুটে এলেন। এই নাটকীয় দৃশ্যের সম্মুখে এসে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে লালবাজার পুলিশ-অফিসে ফোন ক'রে দিলেন।

—পুলিশ কিন্তু তোমার একটি ষ্টেটমেণ্ট চাইবে।

যে ঘটনা রত্নার মাকে এতক্ষণ পাথর ক'রে রেখেছিল, সে পাথর এতক্ষণ বাদে এবারে গলতে সুরু করল। হাতের পিস্তল মাটিতে ফেলে, তিনি রত্নার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

নিষ্প্রাণ দেহ। কাঠ হ'য়ে গিয়েছে।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করবার আগেই রত্নার মা চিৎকার ক'রে উঠলেন, ওকে বাঁধো—আমার মেয়েকে গুলী করেছে।

শিবুর মুখে কথা নেই, সে মূক।

—এ লোকটি কে?

—আমার মেয়ের মাষ্টার—মেয়েকে পড়াত।

—গুলী করবার কারণ?

—আমার মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে ঐ স্কাউণ্ড্রেল, কিন্তু মেয়ে রাজী হয় না। এই নিয়ে কিছুদিন ধরে ঝগড়া চলছিল। তার পরিণাম যে এতটা হবে কেউ ভাবতে পারি নি।

—পিস্তল কি ওরই?

—না, আমাদের। ঐ ড্রয়ারে থাকত।

পুলিশ সব নোট ক'রে শিবুকে নিয়ে চলে গেল।

সংবাদ চাপা রইল না। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শিবুর মাও শুনলেন। সুব্রতও শুনল। সুব্রত অনেক

চেষ্টা করল তাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনবার, কিন্তু জামিন দিলে না।

সুব্রত জানত, একটা বিপদ আসছে, কিন্তু সে যে এমন ক'রে আসবে ভাবতে পারে নি। মা অন্নজল ত্যাগ করেছেন। সুব্রত তাঁকে আশ্বাস দেয়। যদিও সে মনে মনে জানে, শিবুর মুক্তির কোন পথই খোলা নেই। তবু চেষ্টা ক'রে শিবুর সঙ্গে সে একদিন দেখা করল। সুব্রত অনেক চেষ্টা করেও সত্য ঘটনা জানতে পারল না। তার মুখে ঐ একটিমাত্র কথা—'আমি খুন করেছি।'

—এ তুই ভাল ক'রে জানিস, আমি সহজে ছাড়ব না। এত বড় মিথ্যা তুই আজ আমার কাছে বললি!

শিবুর চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

—সত্যি কথা বল্ শিবু, দেখি যদি কিছু করতে পারি। বাড়ীতে মা আছেন, এটা ভুলে যাস নে। মা কি কেঁদে কেঁদে শেষে অন্ধ হয়ে যাবেন?

শিবু চুপ ক'রে রইল।

—দেখ্ 'সত্য' আমি বের করবোই। আমি জানি, তুই মা'র কাছে কখনো মিথ্যে কথা বলিস নি। আমি মাকে নিয়ে আসব তোর সামনে—দেখি, তুই বলিস কি না।

শিবু কেঁদে ফেলল। বললে, সত্যি বললেই কি তুই আমাকে বাঁচাতে পারবি? খুন আমি করি নি, করেছে তার মা। অবশ্য খুন করবে বলে করে নি। আমাকে গুলী করবার সময় রত্না ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে সে কথা। ওঁরা বড়লোক। আইন আমাদের জন্যে নয়। বিচারের নামে প্রহসন—এই ত চিরকাল ধরে চলে আসছে। কি করবি তুই, কতটুকু করতে পারিস? পারিস আদালতগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে?

কথা বলবার আর সময় ছিল না। সুব্রত চলে এল।

টাকা খরচ ক'রে শিবুকে যে রক্ষা করা যাবে না, এ সুব্রত ভাল করেই জানে। সুতরাং শিবুকে সাজা পেতেই হবে। বৃদ্ধা মাকে সুব্রত আজো সান্ত্বনা দিয়ে আসে, জানে এরও মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে।

বিচারের দিন সুব্রত কোর্টে এলো। লোকে লোকারণ্য। অনেকেই কৌতূহল দেখতে এসেছে। রত্নার পক্ষে উকীল সুধাংশু দত্ত খুনী শিবুর পূর্বজীবন, তার আচার-আচরণ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা ক'রে গেলেন। তিনি প্রমাণ ক'রে ছাড়লেন শিবু স্বহস্তে রত্নাকে গুলী করেছে। আসামীর কাঠগড়ায় শিবু দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, সে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। সুব্রত ব'সে ব'সে ঘামছে। বিচারক আসামীর দিকে চেয়ে তার কিছু বলবার আছে কি না জানতে চাইলেন। আসামী বলবার আগেই ব্যারিষ্টার মিঃ রায় উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ধর্মাবতার, বিচার প্রহসন সমাপ্ত হবার আগে মিঃ দত্তকে আমি চার্জ করছি। তিনি আসামীকে যে ভাবে খাড়া করেছেন, আমার জিজ্ঞাস্য, তিনি এ তথ্য পেলেন কোথায়? আসামী আমারই বাড়ীর গৃহ-শিক্ষক। রত্না আমারই মেয়ে। সুতরাং ঘটনার বিশদ বিবরণ একমাত্র আমিই দিতে পারি। আদালতে আসবার আগে পর্যন্ত আমি ভাবতে পারি নি, আসামী পক্ষে আমাকে 'প্লীড' করতে হবে। ব'সে ব'সে আমি মিঃ দত্তের জবানবন্দী শুনছিলাম, এইভাবে এক নিরপরাধ অসহায় বালকের মৃত্যুদণ্ড হবে এ অসহ্য মনে হ'ল। ধর্মাবতার, শিবু রত্নাকে গুলী করে নি। রত্না নিজেই আত্মহত্যা করেছে। রত্না শিবুকে ভালবেসেছিল এবং বিবাহের প্রস্তাব করেছিল। শিবু গরীবের ছেলে, তাই এ প্রস্তাবে সে রাজী হয় না। আমার একমাত্র মেয়ে রত্না, বিয়ে করলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তাদেরই হবে, এ জেনেও সে 'রিফিউজ' করে। বলে, সে আত্মবিক্রয় করবে না। হতভাগ্য শিবু জানতও না, এর পরেই রত্না ঐভাবে আত্মবলি দেবে। মেয়ে আমার বড় অভিমানিনী, শিবুর প্রত্যাখ্যান সে সহ্য করতে পারল না।

বিচারপতি বললেন, পিস্তল আপনার মেয়ে কোথায় পেলে?

—তার ড্রয়ারেই থাকত।

বিচারে শিবু খালাস পেলো।

বলো—

সন্তোষকুমার অধিকারী

নিষ্পত্র—আসেনি কলি, কাঠচাঁপা বিশীর্ণ কঙ্কাল,
সঙ্কুচিত শস্যরিক্ত মাঠ, দুচোখে করুণ আর্তি—
চেয়ে আছে রৌদ্রদগ্ধ হলুদ প্রান্তর ; অনশন-
ক্লিষ্ট বিধবার মত বৈরাগ্যে বিধুর। যতদূর
চলে যাই—জ্ব'লে ওঠে তৃষার্ত মৃত্তিকা। শিমুলের
বুক চিরে রক্ত ঝরে, মাথা ঠোকে তাহুক কেবল ;
ট্রেনের বর্বর শব্দে আর্তনাদ—শুনি কার স্বর?
বিবর্ণ দুপুর কাঁপে—কতযুগ, কতদিন আর?

বলো, কবে সন্ধ্যে হবে? বিকেল পড়িয়ে আকাশের
দগ্ধচোখে দেখা দেবে গোধূলির বর্ণাঢ্য করুণা?
পায়ে পায়ে হেঁটে যাই—এ'বিজন কোথায় নদীর
আসঙ্গে শীতল স্নিগ্ধ প্রত্যাশার ধারায় মুখর?
বলো, কবে আবার সময় হবে, হবে নম্র নত,—
আমার প্রহর ক্লান্তি মুছে নিতে ছায়ার গভীরে?

—•—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গণগুঁতা-বিশ্বাসী ভারতীয় গণতন্ত্র—

বর্ত্তমান ভারতীয় গণতন্ত্রের অভিভাবক-পরিচালক-গুষ্টি সঙ্গত কারণেই গণগুঁতায় অতি-বিশ্বাসী এবং অতিরিক্ত শ্রদ্ধাশীল। 'তন্ত্রকে' যখন 'গণ' বলিতেছি—তখন গুঁতার সহিত 'গণ' যুক্ত হইলে—তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি গণ-মহারাজের অবশ্যই থাকে না এবং থাকা উচিতও নহে। উপরে উক্ত যুক্তির প্রমাণ চাহিলে তাহাও দিব। যেমন,

১। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—পরিকল্পনায় গৃহীত—তৈল শোধনাগারটি আসামী গণগুঁতার প্রবল চাপে, কলিকাতাকে বঞ্চিত করিয়া একেবারে খাস আসামে রপ্তানী করা হইল, কার্য্যটির ঔচিত্য সম্পর্কে বিচার করিবার প্রয়োজন এবং সময়ও কর্ত্তাদের হইল না।

২। তাহার পর বিহারের গণগুঁতা এবং প্রচণ্ড গণ-গলাবাজির প্রকোপে, কোনপ্রকার সামান্য বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করিয়াই হুনমাটির দাবি অগ্রাহ্য করিয়া পরিকল্পনার একটা বিরাট অংশ কর্ত্তন করিয়া—তৈল-শোধনাগার স্থাপিত হইল রাজেন্দ্রভূমি বারাওনিতে। এই বিষয়ে খরচ, বাজার, সম্পদ প্রভৃতির বিচার না করিয়াই গণতন্ত্রভক্ত কেন্দ্রীয় লম্বকর্ণধারগণ বিহারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেলাম করিতে বাধ্য হইলেন!

এইবার বর্ত্তমানের 'গণদাবি' (এবং তাহার সহিত গণগুঁতা) উঠিল অন্ধ্ররাজ্যে ইস্পাত (৫ম) কারখানা স্থাপন।

৩। অন্ধ্রের গণদাবির সঙ্গে দৈহিক অর্থাৎ গণপ্রহারও মিলিত হইল। এবার তৈলের স্থানে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবি। অন্ধ্রের এ-দাবি সার্থক করিতে—প্রথমেই অনশন ব্রত আরম্ভ করিলেন অমৃত রাও এবং তাহার পর পুলিসের গুলীতে ১৭।১৮টি প্রাণদান এবং কত কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তির অগ্নিসংস্কার হইল, তাহার হিসাব এখনও ঠিকমত হয় নাই। একমাত্র সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের দৈনিক ক্ষতির পরিমাণই ১৪।১৫ লক্ষ টাকা,—রেল চলাচল বন্ধ হইবার ফলে। মান্দ্রাজ-অন্ধ্ররাজ্যে অরাজকতা, লক্ষ লক্ষ যাত্রীর অসীম দুঃখকষ্ট এবং আর্থিক ও অন্যবিধ ক্ষয়ক্ষতির কথা বাদ দিলাম। অবস্থার গতি দেখিয়া দিল্লীর কর্ত্তামহল ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন ৫ম ইস্পাত কারখানাটি অন্ধ্রেই হইবে!

পরম ভাগ্যের কথা, নামের গুণে শ্রীঅমৃত রাও—এত কাণ্ডের পরেও অ-মৃতই রহিয়া গেলেন, এবং অ-মৃত থাকিয়া অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী প্রজাভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকেও রক্ষা করিলেন।

বর্ত্তমান ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনও বলিতে গেলে গণগুঁতার কারণেই হইয়াছে, হইতেছে এবং আরো হইবে অচিরে। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, নাগাল্যাণ্ড—এই সব রাজ্যগুলির জন্মের ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এইবার বিদর্ভ, স্বতন্ত্র পার্বত্য প্রদেশ, মিজোল্যাণ্ড, আদিবাসী রাজ্য—এই প্রকার বহুতর স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি উঠিবে। প্রথমে বাক্যে, তাহার পর সভা-সমিতিতে, 'দিল্লী-চলো' অভিযানে কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের কঠিন মন যখন কিছুতেই গলিবে না তখনই আরম্ভ হইবে গণগুঁতার সহিত কঠিন গণপ্রহারের বিষমাঘাত—এবং ইহা ঘটিলেই কেন্দ্রীয় কঠিন মন, গণতন্ত্র-বিলাসী কর্ত্তাদের হৃদয় গলিয়া গিয়া গণদাবিকে সানন্দে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইবে!!

বিশাখাপত্তনে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবি লইয়া যে-প্রকার বিষম গলা এবং ডাণ্ডাবাজী হইল সেই সম্পর্কে একটি সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না—এ-বিষয় পত্রিকা বিশেষ বলিতেছেন :

—বিষবৃক্ষের ফল থরে থরে ফলিতেছে। মজা এই যে, গোটা লড়াইটাই যেন হাওয়ায় হইয়া গেল, কারণ চার নং ইস্পাত কারখানাটি এখনও কার্য্যত কাগজে, পঞ্চমটি স্বভাবতই স্বপ্নে, প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, জাতির সে পুঁজিও নাই। তবে অন্ধ্রের আবদারটাকে "না" বলিয়া একেবারে উড়াইয়াও দেন নাই। স্বপ্ন লইয়া বাস্তবে এত কলহ-কেলেঙ্কারি চলে কী করিয়া? ইহার পিছনেও ভণ্ডামি আছে। অন্ধ্রে কারখানা স্থাপনে আপত্তি ছিল না, যদি এই দাবির সঙ্গে জোরালো অর্থনৈতিক যুক্তি মিলিত। বিশাখাপত্তনে কারখানার পত্তনই মাত্র চতুর্থ যোজনার আমলে সম্ভব—ইস্পাত বাহির হওয়া দূর অস্ত্। অথচ রুরকেলার কারখানাটিকে প্রসারিত করিলেই কিন্তু হাতে-হাতে ফল মেলে, ঢালা ইস্পাতের যে-ঘাটতি আছে সেটা কম সময়ের মধ্যেই মিলিয়া যায়। আবদারীরা এত সোজা হিসাবের ধার ধারেন না। খতাইয়া দেখেন না যে, লোহা আর কয়লাখনি এলাকার বহির্ভূত বিশাখাপত্তনে কাঁচা মাল বহিয়া লইয়া যাইতে বাড়তি খরচ কত—আকরিক লোহের দর এখানে টন-প্রতি অন্তত পঞ্চাশ টাকা বেশী পড়িবে কি না!—

কিন্তু আগেই বলিয়াছি, এই যে হুজুগ, আর হুজুগের কাছে যো-হুজুর হওয়া—ইহার পিছনে আছে শুধু আঞ্চলিক রাজনীতির কামগন্ধ, অর্থনীতির নিকষিত হেমের স্পর্শ সামান্যই। ইনডিয়া স্থাট্ ইজ ভারত যে আসলে একটি অখণ্ড দেশ, এই স্বাদেশিক চেতনাও আছে কি না সন্দেহ। অঞ্চলের প্রতি মমতা অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু আনুগত্য থাকা চাই দেশের প্রতি। গলাবাজি বা হামলাবাজি করিয়া একটা-দুইটা রাউন্ড জেতা যায় বটে, কিন্তু আখেরী রাউন্ড বা ফাইনালে দেশটাই শেষ হইয়া যায়—যেমন যাইতেছে। অচিরে ভারত বলিয়া কোনও ভূখণ্ড আর রহিবে না—যদি কিছু বরাত জোরে টিকিয়া যায় তবে তাহা অন্ধ্র, আসাম, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ইত্যাদি নামে-মাত্র বাঁধা কয়েকটি আলুগা মুলুক, অর্থাৎ ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া আমরা আবার মোগল-পাঠান আমলের নবাবী সুবায় ফিরিয়া যাইব। দিল্লীর দরবার একটা হয়ত থাকিয়া যাইবে—সেখানে যে রাজ্যের উকিল যত শাঁসালো, সে-রাজ্যের তত কপাল ভাল। ওকালতিতে যদি না কুলায়, তবে জন-গণেশ ত রহিয়াছেই। শুঁড়ে সুড়সুড়ি দিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে কতক্ষণ?

অবস্থা যখন এই প্রকার—এবং 'গণবল' প্রয়োগ ছাড়া যখন একান্ত ন্যায্য দাবিও আদায়ের দ্বিতীয় কোন পথ নাই, তখন এই পোড়া পশ্চিমবঙ্গ কি করিবে? কলিকাতার সর্কুলার রেল, হলদিয়া, ফরাক্কা, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন, সার-কারখানা প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যক পরিকল্পনা—যাহাদের আশু সমাধানের উপর কলিকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, সে বিষয়ে কেবল কেন্দ্র নহে, রাজ্যের কংগ্রেসী সরকারেরও বিশেষ কোন মাথাব্যথা নাই।

পশ্চিমবঙ্গের অপহৃত অঞ্চলগুলি—(মানভূম, ধলভূম, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি)—আজও বিহার এবং আসামের জমিদারীর আয় এবং আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে—এবং বাঙ্গলার এই অঞ্চলগুলি কর্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রক্তক্ষরণ আজও অবিরাম চলিতেছে—যাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ অচিরে হয়ত প্রাণঘাতী এবং দুরারোগ্য অ্যানিমিয়াতেই প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এ-রাজ্যের বিষম সমস্যা নিরাকরণে, মনে হয় কাহারো কোন দায়-দায়িত্ব নাই, না বাহিরের, না ঘরের লোকের! মনে হইতেছে আজ কেন্দ্রীয় কলোনী এই পোড়া ভাগ্যহত—

—বাংলা দেশে আমাদের পোড়া কপাল চাপড়ানো ছাড়া গতি নাই। বিশৃঙ্খলা আমরা সমর্থন করি না, তাই বলিয়া এই রাজ্য যে সর্বদা সুশৃঙ্খল, শান্ত, শিষ্ট থাকে তাহাও ত নয়। হনলুলুতে হাওয়া উঠিলে এখানে কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর হাহাকার পড়িয়া যায়। এই ব্যাপারে, যে যে-ভাবে পারে, আপন-আপন হকের বা না-হকের পাওনা ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে—কিন্তু গোটা রাজ্যের কিংবা এই মহানগরীর স্বার্থ, এবং জীবন-মরণের প্রশ্ন যে সব বিষয়ে জড়িত, সে-সব বিষয়ে আমাদের কী বাম, কী অতিবাম, কী মধ্যপন্থী নায়কেরা একেবারে বোবা, টুঁ-শব্দটি নাই। চক্রবেড় রেল, ফরাক্কা, হলদিয়া ইত্যাদি কত পরিকল্পনা অবহেলায় পড়িয়া আছে, সেগুলির কোনও একটিকেও 'ইস্যু' করিয়া একটা প্রবল কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়িয়া তোলার গরজটুকুও তো কোথাও দেখি না! সরকারী প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে দিল্লিতে ধরনা দিয়া এক

প্রশ্ন তদ্বির করিয়া আসেন মাত্র। তাহার পিছনে উচ্চারিত জনমত (এবং গণগুঁতা) কই?

অথচ এই ভারতেরই অন্যত্র কিন্তু বামপন্থী দলগুলির অন্য আচার। কেরলের ঘরোয়া ব্যাপারে দেখিয়াছি কম্যুনিষ্টরাও কট্টর গৃহস্থ। ঘর গুছাইতে কেন্দ্রের উপর "প্রেসার পলিটিক্স" অর্থাৎ "চাপের রাজনীতি" খাটাইতে ইঁহাদের আন্তর্জাতিকতায় বাধে না। কোচিনে জাহাজ-কারখানার দাবি এই পথেই পূর্ণ হইয়াছে। জাতীয় শিল্পায়ন প্রকল্পে কেরল উপেক্ষিত বলিয়া এক ধুরন্ধর বামমার্গী নেতা এই সেদিনও আক্ষেপ করিয়াছেন। বাংলায়? তওবা, তওবা। রাজ্যের স্বার্থ—সে-বড় তুচ্ছ কথা, অত "সংসারী" হওয়া নেতাদের কী সাজে? দরদী নেতারা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় তাঁহাদের ভূমিকা সরকার বিরোধিতায়, রাজ্যের সার্ব্বিক কল্যাণেরও বিরোধী তাঁহারা নিশ্চয়ই নন!

আগামী নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থীরা কি বাঙলার চোরাই অঞ্চল—ধলভূম, মানভূম প্রভৃতি—পশ্চিমবঙ্গের সহিত জোড়া লাগাইবার দাবিকে একটি "MUST" ইস্যু করিতে পারেন না?

বাঙ্গলার চোরাই অঞ্চলগুলি কেন চাই

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ অত্যধিক জনচাপে আজ প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত অবস্থায়। দুর্গাপুর, আসানসোল, খড়্গপুর এবং এ-রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলি, বিশেষ করিয়া শিল্পশহরগুলিতে গত কয়েক বৎসরে অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে লোকসংখ্যায়। এখানে ইহাও মনে রাখা দরকার যে বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং ওড়িষ্যা হইতে আগত কয়েক লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। অবাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যা, বিশেষ করিয়া বিহারী, ক্রমশ বাঙ্গালী শ্রমিকদের স্থানচ্যুত করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। এমন দিন শীঘ্রই আসিবে, যখন দেখা যাইবে বাঙলা দেশে অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা সহজেই শতকরা ৯০-এর সীমা অতিক্রম করিবে। আমরা প্রাদেশিকতাবাদী নহি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন দেখি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে—বিশেষ করিয়া বিহার এবং ওড়িষ্যাতে কেবল বাঙালী শ্রমিকই নহে, বাঙালী অন্যান্য নানা শ্রেণীর সুযোগ্য কর্ম্মী-কর্ম্মচারীও কেবলমাত্র 'বাঙালিত্বের' অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে, এবং এ-বিষয়ে অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেসী কর্ত্তারাও সক্রিয় সহযোগিতা দানে কোন লজ্জা-সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না, সেইক্ষেত্রে আত্মরক্ষা এবং রাজ্যের কল্যাণ-স্বার্থের কারণেই আমাদের সামান্য একটু প্রাদেশিকতা দেখাইলে দোষ কি। বাঙলার অপহৃত অঞ্চলগুলি, বিশেষ করিয়া "পুরাপুরি ধলভূম এবং সমগ্র মানভূম আমাদের চাই-ই"—এবার এই দাবি, কেবল উচ্চ-কণ্ঠেই নহে, সজোরে জানাইতে হইবে। অন্যান্য সকল রাজ্যই যখন নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য—জাতীয় স্বার্থকেও বলি দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না, তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই কি জাতীয় স্বার্থের মহত্ত্ব রক্ষার কারণে—শতপ্রকার অন্যায়, অবিচার এবং পদাঘাত নীরবে হজম করিবে—বছরের পর বছর?

পশ্চিমবঙ্গের অতুল্য নেতা এবং আদর্শবাদী মুখ্যমন্ত্রী—এ-বিষয়ে কিছুই করিবেন না, করিবার সাহস এবং ক্ষমতা তাঁহাদের আছে কি না সন্দেহ! মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দাবির জোর এবং পরিণাম কি তাহা চতুর্থ পরিকল্পনার পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দের ছাঁটের অঙ্ক দেখিয়াই বেশ বুঝা গিয়াছে। বর্ত্তমান দিল্লীর দরবারে এখন কাতর-নিবেদন, করুণ-প্রার্থনা এবং যুক্তির কোন মূল্যই নাই। আলাপ আলোচনা এবং ন্যায্য প্রাপ্যের যুক্তিও নিষ্ফল হইতে বাধ্য। অগত্যা—অন্য রাজ্যগুলি যে 'মহান' যুক্তির ঘায়ে তাহাদের অন্যায় দাবিগুলিও আদায় করিতেছে, পশ্চিমবঙ্গ কেন তাহাই করিবে না? শ্রীঅতুল্য ঘোষ 'ভারত-চিন্তায়' মশগুল—পশ্চিমবঙ্গ বাঁচুক বা মরুক, তাঁহার কিছুই আসে-যায় না। তাঁহার অবস্থা, অযোগ্য ব্যক্তির হঠাৎ গৌরব প্রাপ্তির ফলে যাহা ঘটে, তাহাই হইয়াছে। আজ কামরাজের অনুজ হইয়া তিনি একদিন ভারত-সাম্রাজ্যের শীর্ষাসনে বসিবার স্বপ্নে বিভোর রহিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই সুখ-স্বপ্ন আগামী নির্বাচনেই শূন্যে বিলীন হইবে কি না কে জানে? হয় চোরাই অঞ্চল ফেরত, আর না হয়, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের আগত লোকদের নিজ নিজ রাজ্যে রিটার্ণ টিকিট কাটিবার ব্যবস্থা!—এই দাবি যে-যুক্তিতে এবং প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইবে—তাহা করা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

রোগী বনাম হাসপাতাল

—কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অকর্ম্মণ্যতার আমরা নূতন কোন নিদর্শন পাইলে যেমন চমকাইয়া উঠি না তেমনই কলিকাতার হাসপাতালেরও। গরীব লোকেরা হাসপাতালে যাইবার কথা শুনিলে

মড়া-কান্না জুড়িয়া দেয়। তাহাদের ধারণা, বস্তির ঘরে ছেঁড়া নোংরা কাঁথায় শুইয়া যমের সঙ্গে লড়াই করিলে যদিও বা কোনও ক্রমে সে যুদ্ধে জেতা যায় হাসপাতালে গেলে তাহারা নির্ঘাৎ শিঙা ফুঁকিবে। সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও হাসপাতাল সম্বন্ধে অনুরূপ অশ্রদ্ধা। হাসপাতালের দরজা মাড়াইতে ধনবানদেরও প্রবল আপত্তি। মধ্যবিত্তও যতটা সম্ভব হাসপাতাল এড়াইয়া চলিতে চায়। ধনীদের না হয় সামর্থ্য আছে। হাসপাতালের পরোয়া করিবার দরকার নাই, কিন্তু সকল রোগ ঘরে চিকিৎসা করাইবার সাধ্য স্বল্পবিত্ত-মধ্যবিত্তের নাই তবুও তাহারা যে হাসপাতালের ধারে-কাছে পারতপক্ষে যাইতে চায় না তাহার মূলে অন্ধ সংস্কার কিংবা হাসপাতালের প্রতি অহেতুক বিরাগ ততটা নাই যতটা আছে তাহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মক্ষমতার উপর প্রগাঢ় অবিশ্বাস।—

এই অবিশ্বাসের কারণ বহু। যে যত্ন, যে অনুকম্পা, যে সেবা, যে তৎপরতা রোগীর মানসিক শান্তি এবং রোগের দ্রুত উপশমের জন্ম একান্ত প্রয়োজন, এ দেশের হাসপাতালে যে তাহার একান্ত অভাব, সে তত্ত্ব কাহাকেও আর পীড়িত করে না বা মনে বেদনা জাগায় না, কারণ দেখিয়া দেখিয়া এবং সহিয়া সহিয়া আমরা দারুভূত মুরারি হইয়া পড়িয়াছি। কিছুতেই আমরা আর বিস্মিত ও বিচলিত হই না।

কিছুদিন পূর্ব্বে হাসপাতালের যে সব কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া কয়েকজন বিদেশীর প্লীহা চমকাইয়া গিয়াছে সে সব আমাদের কাছে গা-সহা—আমাদের হাসপাতালের পরিচালক ও কর্ম্মিদের কাছেও। ডিরেক্টার, ডাক্তার, নার্স হইতে সুরু করিয়া মায় কেরানী ও ক্লাস ফোর কর্ম্মী সকলেই ওইসব ব্যাপার নিত্য দেখিতেছেন (এবং নানা কাণ্ড নিজেরাই করিতেছেন)। মরিতেছে বেচারা চিকিৎসাপ্রত্যাশী রোগীর দল ও খাবি খাইতেছে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের গোষ্ঠী। এত করিয়াও রোগী যে বাঁচে, রোগ যে সারে তাহার কারণ তাহাদের ভাগ্য আর ডাক্তারদের হাতযশ। নহিলে যে অনাদর-অবহেলা ও দীর্ঘসূত্রতার সঙ্গে যুঝিয়া রোগীকে বাঁচিতে হয় তাহাতে যাহাদের অদৃষ্টে আরও জীবন-যন্ত্রণা ভোগ আছে তাহারা ছাড়া আর কেহ আরোগ্য লাভ করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পরও লোকে যদি হাসপাতালের নামে আঁতকাইয়া না ওঠে তবে তাহাদের আতঙ্ক হইবে আর কিসে?

হাসপাতালের রোগের নিদান উগ্র নিয়ম প্রীতি। সে রোগে অবশ্য শুধু এ রাজ্যে নয়, এ দেশে তাবৎ সরকারী (বেসরকারী হাসপাতালগুলি একেবারে বাদ যায় না এই অভিযোগ হইতে) প্রতিষ্ঠানই ভুগিতেছে। তবে নিয়মের বাড়াবাড়ির ফল হাসপাতালের বেলায় যেমন মারাত্মক হয় অন্যত্র তেমন হয় না। অন্যত্র হয়ত নিয়মের বেড়াজালের বাধায় কাজ হয় মন্থরগতিতে কিন্তু হাসপাতালে তাহার ফলশ্রুতি একেবারে মৃত্যু। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগী হাসপাতালে আসিলে যেখানে দিস্তা দিস্তা 'ফরম্' ভর্ত্তি করাই হয় সর্ব্বপ্রথম কাজ—রোগী পড়িয়া থাকে অনাদরে অবহেলায়—সেখানে রোগ নিরাময় ত কপালের কথা। হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি করিতে হয় 'ফরম্' পূরণ করিয়া, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় 'ফরম্' পূরণ করিয়া, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা হয় 'ফরম্' পূরণ করিয়া, আবার অঘটন ঘটিলে শেষকৃত্যও ওই ফরম্ পূরণ করিয়া। দলিল-দস্তাবেজ খাতাপত্র দুরস্ত করিতেই যেখানে সময় শ্রম এবং অর্থ নিয়োজিত সেখানে রোগীর চিকিৎসার আশা করাই অন্যায়।

কলিকাতার নামকরা বেসরকারী হাসপাতালগুলির কার্য্যধারা হয়ত কিছু উন্নত—কিন্তু যে-সব হাসপাতালে অবসরপ্রাপ্ত অফিসার উচ্চ বেতনে নূতন চাকরি লাভ করিতেছেন—সেই সব হাসপাতালেও 'সরকারী' আইন-বিধির অযথা প্রয়োগে—কার্য্যধারা নানা দিক হইতে বিঘ্নিত হইতেছে—কর্ম্মীদের মনেও তীব্র একটা অসন্তোষ জমা হইতেছে।

যাঁহারা দীর্ঘকাল সরকারী দপ্তরে উচ্চপদে বসিয়া হাত পাকাইয়াছেন এবং সরকারী শুষ্ক আইনকানুন দ্বারাই সর্ব্বক্ষেত্রে এবং বিষয়ে কার্য্যে শৃঙ্খলা আনা যায় এবং ইহার দ্বারাই চরম যোগ্যতা-কাম-সার্থকতা প্রমাণ করা যায় এই দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বেসরকারী হাসপাতাল তথা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানে—যথাসময়ে নিজেদের অতিবুদ্ধি (যাহাকে দুষ্ট লোকে বেকুবীও বলে—) প্রয়োগ ব্যর্থ হইল—হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ঝানু সরকারী অফিসার অবসর লইবার

পরেও—মন হইতে অফিসারী-কঠোর মনোভাব বজায় রাখেন। বদ্ অভ্যাস অবশ্য কাহারো পক্ষে সহজে ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

ঝানু অফিসারগণ—ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত, বাচনে ভদ্র—তাঁহাদের ব্যবহারে আপত্তি করিবার কারণ সাধারণত কেহ পাইবেন না। কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি তাঁহাদের একটা বিরুদ্ধতা থাকে এবং কারণে-অকারণে—এই সব কর্ম্মীদের নানাভাবে অগ্রাহ্য করা যায় এমন প্রকার সামান্য সামান্য অজুহাতে উৎপীড়িত, জব্দ করিতে একটা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করেন। দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে—এই রিটায়ার্ড অফিসারদের মনে এবং প্রকৃতিতে সাধারণ কর্ম্মীদের প্রতি কোনপ্রকার মায়া-মমতা নাই। কর্ম্মী কেন অপরাধ করে, কেন কাজে ফাঁকি দেয়, কেন তাহার কাজে মন থাকে না—ইহার কারণ খুঁজিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা তাঁহাদের দায়িত্ব নয়। সরকারী দপ্তরে যেমন তাঁহারা চিরকাল সর্ব্বভাবে উপরওয়ালাদের স্তুতি করিয়া, মন যোগাইয়া নিজ নিজ চাকরিতে উন্নতির সোপানে উঠেন, পেনসন প্রাপ্তির পরেও-'নূতন'-চাকরিতে তাঁহারা—সেই অভ্যস্ত পথেই চলিতে থাকেন। ভাব দেখিয়া মনে হয় ইঁহারাই মহাকালের মত চিরন্তন।

এবারে আর বেশী বলিব না। মহাশয় পুনঃনূতনদের একটা কথামাত্র বলিব। কর্ম্মীদের সম্পর্কে শুষ্ক আইনের মরু-প্রান্তরে না থাকিয়া—আইন কাঠামোর বাহিরে যে শ্যামল চারুভূমি আছে, কর্ম্মীদের ভালবাসিয়া, তাহাদের ভালবাসা শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া সেই চারুভূমিতে প্রবেশের পথ সন্ধান যদি করেন, পথ অবশ্যই পাইবেন এবং একবার সেই পথের খোঁজ পাইলে দেখিবেন জীবনে কি শান্তি, কি তৃপ্তি আছে। আর ইহা যদি না পারেন, তাহা হইলে জীবনের সুখ, শান্তি এমন কি নিরাপত্তা হারান অসম্ভব নহে। কথাগুলি ক্রোধের বশে নহে, গভীর দুঃখেই বলিতে হইতেছে।

বিচিত্র সরকারী ধারা

'স্বাধীনতা' প্রাপ্তির পর হইতেই দেখিতেছি, সরকারী মহলে বিশেষ এক শ্রেণীর অফিসার পেনসন প্রাপ্তির পরেও—একটার পর একটা নূতন নূতন সরকারী, বেসরকারী এবং আধা-সরকারী পদে চাকরি চালাইয়া যান পরম আনন্দে! ফলে—"next below"র দল সব সময় উপরে উঠিবার সুযোগ যথাকালে লাভ করেন না, এবং ইহাতে যাঁহারা কর্ত্তাগুষ্টির স্নেহ হইতে বঞ্চিত থাকেন, তাঁহাদের পেন্‌সেন্ প্রাপ্তির সময়ে যতটা উন্নতি, বেতনের দিক হইতে বিশেষ করিয়া তাহা হয় না। প্রকারান্তরে তাঁহারা বঞ্চিত হয়েন।

অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের—ক্রমাগত এবং পর পর একটির পর একটি নূতন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত করা বা বহাল রাখা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য কতকগুলি রাজ্যে একটা বাতিক বা রোগে পরিণত হইয়াছে। এবং এই বিষম-বাতিকের ছোঁয়াচ কতকগুলি বেসরকারী সংস্থাতেও লাগিয়াছে। এখানে পুরাণ, বিশ্বস্ত এবং দীর্ঘকাল কর্ম্মে নিযুক্ত এমন সব কর্ম্মচারী বা অফিসারদের ভাগ্য যেখানে একটা সীমায় সিল করা আছে—এই ক্ষেত্রে কিন্তু, হঠাৎ বাহির হইতে কাহার বা কাহাদের বুদ্ধি পরামর্শমত হঠাৎ বিশেষ-পদবী-ভূষিত অফিসার নিযুক্ত করা হইতেছে—যাঁহাদের কোন বিশেষ কীর্ত্তি বা বিভূতি সংস্থার কর্ত্তামহল ছাড়া আর কাহারো জানা থাকে না!

'নূতন-আমদানী অফিসার' মহাশয়দের যদি প্রকৃত কোন বিশেষ গুণ কিংবা কর্ম্মদক্ষতা দেখা যাইত, বলিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই—তাহা দেখা যায় না, তাঁহাদের থাকে কেবল পূর্ব্ব-চকুরির ছাপ এবং ছোপ একটিমাত্র গুণ—লোককে বিব্রত করার বিদ্যা! ইহার ফলে সংস্থার সর্ব্বস্তরে অসন্তোষ এবং নূতন আমদানী মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি চরম শ্রদ্ধাহীনতার উলঙ্গ প্রকাশ।

মানুষের, সহকর্ম্মীর, নিম্নস্থ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য লাভ করিতে হইলে—মূল্য দিতে হয়,—এখানে আর্থিক 'মূল্য' বলিতেছি না। এই 'মূল্য'—মানুষের প্রতি মানুষের প্রাপ্য শ্রদ্ধা, মানুষের প্রতি

মানুষের সুখ-দুঃখের সমভাগী হওয়া—। দুঃখের কথা, সরকারী দপ্তর-ফেরত অফিসারদের, বিশেষ করিয়া সেইসব অফিসার, যাঁহারা নিম্ন সিঁড়ি হইতে প্রায় উচ্চতম ধাপে অধিরোহণ করেন—তাঁহাদের থাকে কিছু কর্ম্মদক্ষতা, প্রচুর স্তাবকতা এবং তৈল-টেকনলজির কুশল প্রয়োগে, চাকুরির ক্ষেত্রে এই তিনের সমন্বয়—প্রায় "ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর" সমান, তাঁহাদের চিত্তে স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক 'দুর্ব্বলতা' থাকে না।

বহু-ঘোষিত জাতীয় সংহতির অপূর্ব্ব রূপ !

একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, পশ্চিমবঙ্গে যে চাউল উৎপন্ন হয়—তাহাতে রাজ্যের চাহিদা মিটে না, ইহা নূতন আবিষ্কার নহে। বাঙ্গলা বিভাগের পূর্ব্বেও বাহির হইতে নিয়মিত চাউল আমদানী করিতে হইত। গত বৎসর হইতে পশ্চিম বাঙ্গলায় চাউলের একান্ত অভাব দেখা যায় এবং এখনও কয়েকটি জেলাতে প্রায়-দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলিয়াছে। ইহা নূতন-কিছু নয়, চাউলের জন্য এ-রাজ্যকে প্রায়-সর্ব্বদাই বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিদেশের আমদানীর কথা বলিতেছি না—

> মুখ্যত ভারতবর্ষেরই অন্যান্য অঞ্চল। বিদেশ হইতে চাল আমদানী অবশ্যই হয়। কেন্দ্রের মারফত তাহার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গও পাইয়া থাকে। এই চালের দাবিদার কিন্তু অনেক, কাজেই শুধু বিদেশ হইতে আমদানি চাল দিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন মেটানো যায় না—অন্যান্য উদ্বৃত্ত রাজ্যের চাল নহিলে তাহার চলে না। সাধারণত প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা হইতেই পশ্চিমবঙ্গে চাল আমদানি হয়। অন্যান্য রাজ্য হইতেও চাল যে আদৌ আসে না এমন নয়। দেখা যাইতেছে চালের সেই উৎস শুকাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গকে চাল যোগাইতে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি অনিচ্ছুক।
>
> সঙ্কট এড়াইবার জন্য রাজ্য সরকার নয়াদিল্লিতে যে আপীল করিয়াছিলেন তাহাতে এখন পর্য্যন্ত কোনও ফল হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গকে চাল সরবরাহ করিতে অনিচ্ছা তাঁহাদের হয়ত নয়—অনিচ্ছা উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলির। উড়িষ্যা অন্ধ্র ও মধ্য প্রদেশের মুখ্য-মন্ত্রীদের পশ্চিমবঙ্গে চাল পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। কিন্তু সে অনুরোধ রাখিতে তাঁহারা নারাজ। উদ্বৃত্ত রাজ্য-গুলির এ আচরণ অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়—তবে নিঃসন্দেহে অদ্ভুত এবং অসংগত। বাড়তি চাল তাহাদের সকলেরই আছে অথচ তাহারা সে চাল ধরিয়া রাখিয়াছে সময়মত চড়া দামে বেচিবার আশায়। ...উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি ধরিয়া লইয়াছে তাহাদের এলাকায় উৎপন্ন চালে তাহাদের সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত—তাহাদের বাড়তি ধান কিংবা গম লইয়া তাহারা যাহা খুশি তাহাই করিবে, অন্যত্র লোকে যদি না খাইয়া মরে ত তাহাদের তাহাতে কী ?—মরুক !

খাদ্যশস্য লইয়া এমন সঙ্কীর্ণতা যদি দেশেই দেখা যায় তবে বিদেশী রাষ্ট্রকে আমরা দোষ দিব কোন্ মুখে ? ভারতবর্ষেরই এক অঞ্চল যদি আর এক অঞ্চলকে ঘোর অনটনের সময়ও খাদ্যশস্যের ভাগ দিতে অস্বীকৃত হয়, তবে আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া তাহাদের দেশ হইতে খাদ্যশস্য আমাদের সেবার্থে পাঠাইবে কেন ? হইলই বা সে গম বা চাল তাহাদের কাছে উদ্বৃত্ত, তাহারা সে গম বা চাল গুদামে পচাইবে, ভারতবর্ষকে কেন দিতে আসিবে ? না আসিলে আমরা কোন্ মুখে তাহাদের গালি দিব ? তাহাদের আচরণের নিন্দাই বা করিব কোন অধিকারে ? আমাদের নিজেদের দেশের মধ্যেই যদি আমরা দেওয়ালের পর দেওয়াল তুলিয়া বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করিয়া ফেলি তাহা হইলে অপরে মহানুভব হইয়া মহত্ব দেখাইবে এ আশা আমরা কেমন করিয়া করিতে পারি ? আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায় —এ যদি আমাদের কাছে কেতাবী বুলি মাত্র হয় তবে আমাদের কপালে অনেক দুঃখ লেখা আছে। দুঃখ হইতেছেও অসহনীয় !

উদ্‌বৃত্ত রাজ্যগুলি বাড়তি খাদ্যশস্য লইয়া যে কাণ্ড করিতেছে সেটা একটা কেলেঙ্কারী, কৃষ্ণবাজারী মাত্র নয়। অবিলম্বে প্রতিবিধান যদি না হয়, ওই সঙ্কীর্ণতার বিষবৃক্ষ যদি উৎপাটিত না হয়, তবে টান পড়িবে ভারতীয় সংহতির মূল ধরিয়া। ভারতবর্ষে সতেরোটি রাজ্য আছে বটে কিন্তু দেশ একটি। রাষ্ট্রও একটি। প্রত্যেকটি রাজ্য বিশাল ভারত রাষ্ট্রের খণ্ডাংশ। কাজেই তাহাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বা শিল্পজাত বিত্ত কাহারও একান্ত নিজস্ব নয়—দেশের সকল অধিবাসী মিলিয়া সে জাতীয় সম্পদ ভোগ করিবে ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এ নিয়ম মানিতে কিন্তু খাদ্যে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি রাজী নয়। তাহারা চায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য নিজেরাই ভোগ করিতে। সর্ব্বপ্রকার উৎপন্ন পণ্য বা প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে যদি এই একই মনোভাব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখা দেয় তাহা হইলে জাতীয়তাবোধ বিলুপ্ত হইবে, সঙ্কীর্ণতাই প্রসার লাভ করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত দেশ ভাঙিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে। রোগ এখনও হয়ত তেমন গুরুতর হয় নাই। চেষ্টা করিলে এখনও হয়ত চরম বিপত্তি এড়ানো যায়। কিন্তু অবহেলা করিলে সর্ব্বনাশ যে ঠেকানো যাইবে না তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ঠেকাইবে কে? কাহারা, বিষ যে ছোট বড়, সকল মানুষের চিত্ত-বিকৃতি ঘটাইয়াছে। বলিতে দুঃখ এবং লজ্জা হয়, কেন্দ্রের এক একজন 'চারপোয়া' মন্ত্রী —দেখা যাইতেছে স্বাধীন নৃপতি-সমান হইয়া নিজ নিজ দপ্তরের একচ্ছত্র সম্রাট!

পরিকল্পনা মন্ত্রীর কথাই বিবেচনা করুন। মহারাজ অশোক তাঁহার খেয়াল এবং খুসীমত পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করিতেছেন— ভাব দেখিয়া মনে হয়—টাকাটা যেন তাঁহার পরপারবাসী শ্রদ্ধেয় পিতার জমিদারী হইতেই আসিতেছে এবং কোন্ রাজ্যকে কি দান খয়রাত করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করার স্বাধীনতা একমাত্র তাহারই। পিতার জমিদারীর টাকায় পূর্ণ অধিকার অবশ্যই পুত্রের।

কেন্দ্রই যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এত বিরূপ, তখন ভারতের অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ নামক করদ রাজ্যটিকে পরম তাচ্ছিল্য দেখাইবে, তাহাতে বিস্ময় বোধ করিবার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। এ-রাজ্যের মুষ্টির জোর থাকিলে কেন্দ্র এমন মুষ্টি ভিক্ষা —কৃপা মুষ্টি ভিক্ষা দিতে সাহস পাইত কি? দক্ষিণে কেরল অতি ক্ষুদ্র রাজ্য কিন্তু ঐ রাজ্যের মুষ্টি জোর প্রবল, তাই হুমকি দেওয়া মাত্র হাজার হাজার ওয়াগন চাল ঐ রাজ্যে যাইবেই।

দুর্গাপুরে কি 'বিজয়ার' ছায়া ঘনাইতেছে?

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম ভাগে স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একদা বনাঞ্চল দুর্গাপুরে শিল্প প্রসারের কার্য্যাবলী আরম্ভ হয়, এবং বিধানচন্দ্রের জীবনাবসানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে যে ভাবে কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আমরা, বাঙ্গালীরা, এ-রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আশার আলো দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিধানচন্দ্রের বিদায়ের পর হইতেই—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিক হইতে দুর্গাপুরে শিল্প-প্রসার প্রয়াস প্রচেষ্টা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে দুর্গাপুরের অবস্থা সত্যই উদ্বেগজনক।

বিগত নয় বৎসরে দুর্গাপুর অঞ্চলে ৭০০ কোটি টাকার বেশী ব্যয় হইয়াছে—এই অর্থের ৯৬ শতাংশই সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলিতে খরচ করা হইয়াছে— অবশিষ্ট হইয়াছে বেসরকারী মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে। পরিকল্পনাতে ছিল এবং সরকারের আশাও এই ছিল যে, খুব কম সময়ের মধ্যেই এখানে অন্তত ৮০টি বিবিধ ধরনের কারখানা স্থাপিত হইবে এবং ইহার অধিকাংশই হইবে প্রাইভেট অর্থাৎ বেসরকারী মালিকানায়—। প্রধানত ইস্পাত কারখানা এবং কোক্ ওভেন কারখানাজাত বিবিধ উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়াই এই সব বেসরকারী শিল্প প্রয়াস গঠিত হইবে। এ আশা হইয়াছে ব্যর্থ—আজ পর্য্যন্ত এখানে বেসরকারী মূলধনে মাত্র ১২টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। নিকট ভবিষ্যত আশামত মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনাও এখন দেখা যাইতেছে না। একটি রিপোর্টে জানা যায়—

—লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও ইহার প্রতিফলন দেখা যায়। যেখানে আশা ছিল ৯০।৯২ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইবে সেখানে হিসাব ৭০ হাজারের মত।

কী কারণে দুর্গাপুরে এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও আশানুরূপ শিল্পপ্রসার হইতেছে না? উত্তর অনেকগুলি—তবে প্রধানত যা যা আছে, তাহার মধ্যে সরকারী অদূরদর্শিতা, সরকারী নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মন্দা এবং শিল্প-প্রসারে উৎসাহ দিবার উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব।

উল্লেখ করা যাইতে পারে অদূরদর্শিতার ফলে কী ভাবে শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইয়াছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাতেই রেলওয়েকে জোগান দিবার জন্য হুইল অ্যাণ্ড অ্যাকসিল প্ল্যান্ট স্লিপার প্ল্যান্ট এবং ফিস প্ল্যান্ট বসানো হইয়াছিল। প্ল্যান্টগুলি চালু হইবার বেশ কিছু দিন বাদে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের খেয়াল হইল তাঁহারা আর ইস্পাতের স্লিপার ব্যবহার করিবেন না, সিমেন্টের তৈয়ারী স্লিপার চাই। তাই নতুন করিয়া তৈয়ারী হইল সিমেন্টের স্লিপার কারখানা বিহারের গয়াতে, দুর্গাপুরে সরকারী প্ল্যান্ট প্রায় অচল করিয়া। আর অন্যদিকে কী কারণ বোঝা যায় না, রেলওয়ের চাহিদা অনুযায়ী নাকি ফিস প্ল্যান্ট ও হুইল অ্যাণ্ড অ্যাকসিল প্ল্যান্ট মাল তৈয়ারী করিতে পারে না। অতএব মাল জমিয়া পাহাড় হইতেছে! কর্তৃপক্ষ নিরুপায়।

ইহা ছাড়া সরকার পরিচালিত মাইনিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড কর্পোরেশনের কারখানাটি ত আছেই। কারখানাটি হইয়াছিল কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে, এখন কয়লার চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ এই কারখানায় (যা এখনও সম্পূর্ণ নতুন এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত) কী কী করা যায় সে চিন্তা করিতেছেন। এদিকে লোক নিয়োগও সম্পূর্ণ, ফলে, যন্ত্রপাতি বসানো সত্ত্বেও, কারখানার প্রধান কয়েকটি বিভাগ কার্য্যত অচল। একটি বেসরকারী কারখানাতেও একই দৃশ্য, তাঁহারা প্রস্তাবিত পুরুলিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বয়লার তৈয়ারীর অর্ডার এখনও পায়েন নাই। অন্যদিকে সরকার কারখানাজাত উৎপন্নের জন্য রপ্তানির অনুমতি দেন নাই। এ অবস্থায় আর বেশি দিন তাঁহারা কারখানা চালাইয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া কারখানার মুখপাত্র জানান।

পশ্চিম বাংলা সরকারের শিল্পবিভাগ দুর্গাপুরে শিল্প প্রসারে কতদূর আগ্রহী তাহা আর একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। এই মুহূর্তে পশ্চিম বাংলা সরকারের উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের পরিমাণ ৫৫ মেগাওয়াটের মত, কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য সরকার ছোট ও মাঝারী শিল্পের উদ্যোক্তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে মোটেই সুবিধা দিতেছেন না, এমন কি পাশাপাশি রাজ্যের অপেক্ষা বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। ফলে—দুর্গাপুরে কারখানাদি বসাইতে গিয়া বিদ্যুতের দর শুনিয়া উদ্যোক্তারা ফিরিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বাঙালীও আছেন, যিনি বিহারের পাত্রাতুতে কারখানা বসাইতেছেন। এ ছাড়াও অভিযোগ আছে যে, যে-অবস্থার *সৃষ্টি* করিলে শিল্পপতিরা শিল্প-প্রসারে আগাইয়া আসেন, দুর্গাপুরে তাহার একান্ত অভাব এবং এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে সম্প্রতি পাঠানো হইয়াছে।

আসানসোল প্ল্যানিং অরগানাইজেশনের রিপোর্টে দেখা যায়, এই শিল্পাঞ্চলে ছোট ও মাঝারী শিল্পের প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে হয় নাই। পশ্চিম বাংলা সরকারের নিজস্ব দুর্গাপুর কোক ওভেন কারখানাটিরও অনেক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সরকার সম্প্রসারণ স্থগিত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দুর্গাপুরে সরকারী সার কারখানার ভিত্তি স্থাপনের সময়ে যে ঘোষণা করা হয় তাহাতে ইতিমধ্যে কারখানায় উৎপাদন সুরু হওয়ার কথা, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, ১৯৭১ সালের মধ্যেও যদি উৎপাদন সুরু হয় কর্তৃপক্ষ তাহাতেও খুসী হইবেন! প্রসঙ্গক্রমে আবার বলিব যে, দুর্গাপুরে স্থাপিত হইবে

কথা ছিল এমন কতকগুলি কলকারখানা ভারতের অন্য রাজ্যে 'চালান' হইয়া গিয়াছে।—পশ্চিমবঙ্গকে সর্ব্ববিষয়ে বঞ্চিত করিবার কেন্দ্রীয় 'পরিকল্পনা' এই ভাবে ক্রমশ কার্য্যকর হইতেছে!

বাংলা এবং বাঙালীর দুর্দ্দশা মোচনের জন্য বিধানচন্দ্র রায় যে-সব পরিকল্পনা, কেন্দ্রের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবে কার্য্যকর করেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজ্য-সরকার অবহেলা এবং রাজ্যের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া—বিধানচন্দ্রের পরিকল্পনা এক এক করিয়া হয় বিনষ্ট, আর না হয় পরিত্যাগ করিতেছেন এবং যাহার ফলে অন্য দুই-তিনটি রাজ্য 'ধনী' হইয়া উঠিতেছে!

অন্যান্য রাজ্যগুলি যে সময় প্রাপ্যেরও অধিক কেন্দ্র হইতে আদায় করিবার জন্য বিবিধ প্রকার কৌশল-অপকৌশল অবলম্বন করিতে দ্বিধা-সঙ্কোচবোধ করিতেছে না, ঠিক সেই সময়, পশ্চিমবঙ্গের এমন সর্ব্ববিষয়ে বিষম সঙ্কটকালে আমাদের রাজ্য সরকার এবং রাজ্য-সরকারের নেপথ্য পরামর্শদাতা তথা পথ-প্রদর্শক বিংশ শতাব্দীর বাঙালী 'রাস্‌পুটীন'—রাজ্যকে দুর্ব্বল, নিঃস্ব করিয়া সমগ্র ভারতের হিতচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আমাদের—এবং সমগ্র বাঙালী জাতির বর্ত্তমানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতকে অতল তলে নিক্ষেপ করিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থাই করিতেছেন! যে জাতি এবং রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এমন এক ভীষণ বিকার তাঁহাদের নির্ব্বিকার করিয়া রাখে, তখন বুঝিতে হইবে আমাদের কৈবল্য প্রাপ্তির কাল উপস্থিত—। এ কথা সাধারণ বাঙালী উপলব্ধি করিলেও ধ্যানমগ্ন কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠির ধ্যান-জ্ঞানের বাহিরে—! দুঃখ এই যে, ভবিষ্যৎ বাংলা এবং বাঙালীকেই অদ্যকার পরম দেশ-কল্যাণব্রতী এবং আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেসী সরকারের কুকর্ম্মের বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। 'পাপের বেতন—মৃত্যু'—পাপ করিল যাহারা তাহাদের হয়ত অপমৃত্যু ঘটিবে, কিন্তু বহু বৎসরব্যাপী মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অদ্যকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে ভবিষ্যৎ বাঙালী, তথা সমগ্র ভারত —একদা-ভারত-ছিল-যে-অংশ তাহাও বাদ যাইবে না।

কথায় বলে 'বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা'!—আমাদের ভাগ্যেও আজ তাই ঘটিয়াছে। প্রশাসন-তোরণে ক্ষমতার আসনে যাঁহারা মুক্তার মালা পরিয়া বসিয়া আছেন, সেই তাহারাই মালা হইতে এক একটি মুক্তা ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন—। ইহার তুলনা চলে একমাত্র শাখা মৃগদের সহিত! মুক্তাগুলি শেষ হইলে তাঁহাদের গলায় থাকিবে দড়িটি মাত্র!!

ভারতীয় রেল—

১৯৬৪ সালের মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের রেলওয়েতে দুর্ঘটনার সংখ্যা—

১। ১০-৩-৬৪: ভদ্রকের নিকট মালগাড়ির সঙ্গে হাওড়াগামী এক্সপ্রেসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ২৭ জন নিহত, ৭১ জন আহত।

২। ১৬-৩-৬৪: পশ্চিম রেলওয়ের কোটানাগরা শাখায় মালগাড়ি লাইনচ্যুত। ইঞ্জিন চালক নিহত।

৩। ৩-৪-৬৪: রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনা; ১৮ জন আহত।

৪। ১৮-৫-৬৪: মাদুরাই-এ ট্রেনট্রলি সংঘর্ষ। ২ জন আহত, ২ জন নিহত।

৫। নাগপুর লাইনে ট্রেন দুর্ঘটনা; ২৭ জন আহত।

৬। ২০-৯-৬৪: গৌহাটির নিকট ২টি ট্রেনে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ৮ জন নিহত।

৭। ১৪-১০-৬৪: বোম্বাই-এ ট্রেন দুর্ঘটনা। ৪ জন নিহত।

৮। ১৫-১০-৬৪: কেটিহার স্টেশনে ট্রেন দুর্ঘটনা। ৮ জন আহত।

৯। ২৫-১২-৬৪: মাদ্রাজের নিকট ট্রেন দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত।

১০। ৩০-১-৬৫: কোলাঘাটের নিকট যাত্রিবাহী ট্রেন ও মালগাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ। ১৫ জন আহত।

১১। ১৫-১-৬৫: মাদ্রাজ-হাওড়া মেলের ৫টি বগী লাইনচ্যুত। ৭ জন যাত্রী আহত।

১২। ১-২-৬৫ : এলাহাবাদ বিভাগে শিকোহাবাদ এটোয়া শাখায় দুই মালগাড়িতে ধাক্কা। ৩ জন নিহত।

১৩। ৬-২-৬৫ : শক্তিগড়ে মাল ও যাত্রী গাড়িতে সংঘর্ষ। ২ জন নিহত।

১৪। ১২-৬-৬৫ : কাটিহার-শিলিগুড়ি সেকশনে নকশাল-বাড়ি ষ্টেশনে যাত্রী ট্রেন ও মালগাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ২ জন নিহত।

১৫। ১৯-৬-৬৫ : শিলিগুড়ি-কাটিহার শাখায় ২ খানা মালগাড়িতে সংঘর্ষ। ৭ জন রেলকর্ম্মী আহত।

১৬। ২০-৬-৬৫ : দিল্লী-বোম্বাই মেন লাইনে গঙ্গাপুর-কোটা শাখায় দুখানি মালগাড়ির সংঘর্ষ। ১৫ জন গ্যাংম্যান নিহত।

১৭। ১৩-৭-৬৫ : শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেন দুর্ঘটনা। ১৫ জন আহত। বাফার চুর্ণ-বিচুর্ণ।

১৮। ৩-১১-৬৫ : রামপুরহাট লোক্যাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে দুর্ঘটনা। ৬০ জন আহত।

১৯। ২৯-১১-৬৫ : অণ্ডালের কাছে যাত্রিবাহী ট্রেন ও মালগাড়িতে সংঘর্ষ। ২৯ জন আহত।

২০। ১৬ ২-৬৬ : কামারখানগালি ও ফারকাটিং-এর মধ্যে আপ আসাম মেল ট্রেনে বিস্ফোরণ। ৩৭ জন নিহত। আহত ৩৪।

২১। ২৩ ২-৬৬ : গুজরাট মেল ট্রেন দুর্ঘটনা। ৫ জন নিহত, ২২ জন আহত।

২২। ৪-৩-৬৬ : কাটিহারের নিকট মালগাড়ি-যাত্রিবাহী ট্রেনে সংঘর্ষ। চালক সহ ১৩ জন আহত।

২৩। ২০-৪-৬৬ : লামডিং রেল স্টেশনে তিনসুকিয়া-নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বিস্ফোরণ। নিহত ৬৭, আহত ১১৭।

২৪। ২৩ ৪-৬৬ : উত্তর সীমান্ত রেলের লামডিং-মরিয়ানি সেকশনের ডিফু ষ্টেশনে ট্রেনে বিস্ফোরণ। নিহত ৪০, আহত ৮১।

২৫। ৩০-৪-৬৬ : গৌহাটির কাছে পানিখেতিতে আসাম মেল লাইনচ্যুত। ২৬ জন আহত।

২৬। খান্না জংশন ষ্টেশনে ট্রেন-দুর্ঘটনা, ৩ জন নিহত।

২৭। ২৬-৫-৬৬ : দক্ষিণ রেলপথের লোনভা-বেলগাঁও শাখায় বাঙ্গালোর-পুণা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় পতিত। ২২ জন নিহত, ২৬ জন আহত।

২৮। ১৩-৬-৬৬ : বোম্বাইয়ের কাছে মাতুঙ্গায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। নিহত ৬৭, আহত ২০১।

২৯। ১৯ ৬ ৬৬ : আজমীরের কাছে লাদগুয়া ষ্টেশনে মালগাড়ির সঙ্গে আমেদাবাদ-দিল্লী এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ। ১৫ জন নিহত, আহত ৬১।

৩০। ইহার পর একটি সাংঘাতিক রেল দুর্ঘটনা হয় হায়দারাবাদে এবং তাহার পর আবার—

৩১। ২০-১০-৬৬ আসামের গোখরাপুর ও রাঙ্গিয়া ষ্টেশনের মধ্যে আসাম মেল দুর্ঘটনার ফলে নিহত প্রথম সংবাদে ৩ জন, আহত ১২ জন। বলা বাহুল্য এই সংখ্যা যথাকালে এবং যথানিয়মে ক্রমশ হয়ত বৃদ্ধি পাইতে পারে (ইতিমধ্যে বাড়িয়াছেও)।

উপরি উক্ত তালিকা হইতে ছোট ছোট দু'চারিটি দুর্ঘটনার কথা ছাড় গিয়াছে, বিশেষ করিয়া মিটার এবং ন্যারো গেজ লাইনগুলির।

ভারতীয় রেলের পরিচালনা ব্যবস্থার গলদের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে মাপিতে হইলে ১০ হাজারেরও বেশী কিলোমিটার হইবে! আজ রেল ক্রমশ লোকের কাছে একটা বিভীষিকার বস্তু—আমরা নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের কথাই বলিতেছি এবং এই নিম্নশ্রেণীর যাত্রীরাই শতকরা অন্তত ৯৮ জন - বেশীও হইতে পারে।

হাওড়া এবং শিয়ালদহে লোক্যাল ট্রেনগুলি যাহারা দেখিয়াছেন এবং দেখেন তাঁহারা জানেন মানুষ কি ভাবে এই সকল ট্রেনে আলুর বস্তাবন্দী অবস্থায় ভ্রমণ করে। শত শত যাত্রী প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বাদুড়-ঝোলা অবস্থায়—এমন কি ইঞ্জিনের পাশে—সামনে কোনক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করিতে বাধ্য হইতেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর! অথচ রেল-কর্ত্তাদের এ-বিষয়ে কোন প্রকার মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। দিল্লীর বাদশাহের গুষ্টি এবং তাঁহাদের আশ্রিত-স্নেহ সিঞ্চিত বাহিনীর দল ত মাটির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমণ বিলাস আকাশ-মার্গে! কর্ত্তাদের মতে

রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশনই হইল ভারতীয় রেলের চরম এবং পরম উন্নতির পরিচায়ক! যাত্রীদের অত্যাবশ্যক প্রাথমিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা অসমাপ্ত রাখিয়া রেলের চরম উৎকর্ষের বিধান অপ-বিধান ছাড়া আর কি বলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে দুইটি অতি-বৃহৎ ভারতীয় রেলের প্রধান ঘাঁটি—কিন্তু এ-রাজ্যের রেল দপ্তরগুলির প্রশাসন ব্যবস্থায় কর্তাদের মধ্যে বাঙ্গালীর নাম আজকাল আর পাওয়া যায় না, অথচ রেল-বিভাগে বাঙ্গালী সুযোগ্য অফিসারের কমতি নাই, ইহা আমরা জানি। প্রমোশনের ব্যাপারেও বাঙ্গালী কর্মচারীদের অভিযোগ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষই যেখানে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর প্রতি সদয় নহেন, সেখানে অবস্থার প্রতিকার কে করিবে? বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রেল ষ্টেশন-গুলিতে হাঙ্গামা প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। এই সকল হাঙ্গামা এবং হৈ-হল্লায় বাঙ্গালী ষ্টেশন-ষ্টাফ প্রায়ই নিগৃহীত হইতেছে, তাঁহাদের ভাগ্যে প্রহারও কম জুটিতেছে না, কিন্তু হাঙ্গামার সময় উচ্চ বেতনভোগী এবং কর্ত্তা-স্থানীয় অবাঙ্গালী বীর-অফিসারদের দেখা পাওয়া যায় না! তাঁহারা সময় বুঝিয়া আত্মগোপন করেন এবং বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের সমস্ত চোটটা পড়ে বাঙ্গালী কর্ম্মী-কর্ম্মচারীদের পৃষ্ঠে! কর্ত্তাদের দায়িত্ব কি কেবল রেল-ষ্টেশনের নাম বড় বড় অক্ষরে হিন্দীতে লিখিয়া এবং ইঞ্জিনের দেহে হিন্দীতে 'পূ-রে,' 'দ-পূ রে' খোদিত করিয়াই যাহাতে দেশের সংহতি সুরক্ষিত হয়? পশ্চিমবঙ্গ হইতে রেলের বহু বড় বড় দপ্তর খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া বিহার এবং অন্যত্র অযথা এবং কোটি কোটি টাকার অপব্যয় করিয়া গত কিছুকাল যাবত স্থানান্তরিত করা হইতেছে! ইহাও কি দেশের সংহতির কারণে বাঙ্গলার দেহে ও মনে কাটা ঘা-এর সৃষ্টি করিয়া? ভারতীয় রেলের প্রশাসনিক বিষয়ে বহু বহু কথা বলিবার আছে কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই, কারণ সবই হইবে বৃথা। ভারত-ভাগ্যবিধাতা কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের চক্ষু এবং কর্ণ—বিশেষ ফরমাস মত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় নয়নে বাঙ্গলার কোন দুঃখের দৃশ্যই প্রতিফলিত হয় না, আর কেন্দ্রীয় অতি-দীর্ঘ কর্ণে বাঙ্গলার মানুষের কাতর ক্রন্দন প্রবেশ করে না! বাঙ্গলার কাতর ক্রন্দনের সুর দিল্লীর কর্ণে পৌঁছিবার পূর্ব্বে দীর্ঘ আকাশ-পথে পরম আনন্দময় এক অপূর্ব্ব সুর-লহরীতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এবারের মত ইহাই যথেষ্ট। আমরা বর্ত্তমান রেল-মন্ত্রীর দীর্ঘ জীবন এবং আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে পরম সাফল্য কামনা করি, যাহাতে তিনি আবার রেল-মন্ত্রী হইয়া (যদি প্রধান-মন্ত্রী না হইতে পারেন) রেলের আরো উন্নতির সঙ্গে, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনায় সকল সক্রিয় সহযোগিতা দিতে পারেন।

কিন্তু শেষেরও শেষ নাই।

ভাবিয়াছিলাম এ-বছরের মত রেল-দুর্ঘটনার শেষ হইল ২০-১০-৬৬ আসামের রেল দুর্ঘটনাতেই—কিন্তু না, ২৩শে অক্টোবর মধ্যরাত্রির পরেই বিহারে লক্ষীসরাই ষ্টেশনে রেল লাইনের উপর দণ্ডায়মান যাত্রীদলের উপর দিয়া ২২ নং ডাউন নর্থ বিহার এক্সপ্রেস চড়াও হওয়ার ফলে নিহত ৩২ এবং আহত ১৪ জনেরও বেশী যাত্রী। ইহার পরে একজন পি এস পি নেতা রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু কেন? রেলমন্ত্রী পাটিল যাত্রীদের রেল লাইনে দাঁড়াইতে বলেন নাই, কিংবা ইঞ্জিন চালককে যাত্রীদের উপর দিয়া লাঙ্গল চালাইতেও বলেন নাই! পাটিল সাহেবের দোষ কোথায় আমরা ভাবিয়া পাই না! আমাদের মতে নিহত যাত্রীদের নিকটতম আত্মীয়বর্গের উপর বে-আইনী কাজের জন্য পিটুনি-ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করা। আশা করি লৌহ-মানব পাটিল লোকের কথায় টলিবেন না, এবং আরো শক্ত করিয়া রেলমন্ত্রিত্বের গদি আঁকড়াইয়া থাকিবেন, নিজের জন্য নহে, আমাদের মত নির্ব্বোধ রেল-যাত্রীদের কল্যাণেই!

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

বসন্ত এসে যাওয়াতে তুষার গলতে শুরু হয়েছিল এবং রাস্তাগুলো বরফমুক্ত হয়েছিল। পথের আশেপাশে অর্দ্ধ উপবাসী শিশুরা লাইভওয়ার্টের গুচ্ছ বিক্রী করছিল। ফুলের দোকানগুলোর শোভা নয়ন-মুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল, এ্যাজেলিয়াস, রডোড্রেনড্রন এবং বসন্তের আদিপর্বের নানা-জাতের পুষ্প-সম্ভারে। ফুলের দোকানগুলোতে সোনালী রং-এর কমলালেবুগুলো থেকে যেন উজ্জল আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। রেলগাড়িতে গলদা চিংড়ী, মূলো এবং ফুলকপি দেখা যাচ্ছিল।

নর্থ ব্রীজের তলায় ঢেউয়ের বুকে বুকে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল, জেঠিতে জাহাজগুলোকে মেরামত করে সি-গ্রীন এবং স্কারলেট রংএ নতুন ভাবে রং করা হয়েছিল। শীতের অন্ধকারে যে সব লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়ে-ছিল এখন সূর্যের আলোয় তারা আবার পুষ্ট হয়ে উঠল।

স্কুদে মেয়ে শয়তানটি এসে পৌঁছল এবং ব্যারনেসের বাড়ীতেই থাকতে লাগল। আমি এবার এ মেয়েটির প্রতি যথেষ্ট নজর দিতে লাগলাম। মহিলাও আগে থেকেই আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছিল—ফলে সেও সমান তালেই ফুর্তি এবং মজা করে আমার সঙ্গে সময় কাটাতে লাগল। একদিন আমরা ডুয়েট বাজাচ্ছিলাম—আমার বাম বাহুর উপর ডান কাঁধের ভর দিয়ে ম্যাটিলডা দাঁড়িয়েছিল। ব্যারনেস এটা লক্ষ্য করলেন এবং তাঁর ভুরু কুঁচকিয়ে উঠল। ব্যারনের চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছিল—হিংসায় এবং রাগে তিনি যেন জ্বলে জ্বলে উঠ-ছিলেন। এক মুহূর্তে তিনি স্ত্রী সম্পর্কে আমার উপর জেলাস হচ্ছিলেন, এবং পরমুহূর্তেই ভাবছিলেন আমি কাজিনের সঙ্গে ফ্লার্ট করছি। এক এক সময় তিনি যখন স্ত্রীকে ছেড়ে কোন আনাচে-কানাচেতে গিয়ে ম্যাটিলডার সঙ্গে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছিলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যারনেসের সঙ্গে জমিয়ে গল্প সুরু করছিলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলতে দেখলেই ব্যারন রাগ সামলাতে পারছিলেন না এবং আমাদের আলাপে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে এসে আজেবাজে প্রশ্ন করছিলেন। আমি এক একবার স্নেহের হাসি হেসে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম—আবার সময় সময় তাঁর উপস্থিতিটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কোনই উত্তর দিচ্ছিলাম না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা সবাই বসে খাচ্ছিলাম—আমাদের মাঝে বাইরের কারোকে ডাকা হয় নি। ব্যার-নেসের মা-ও উপস্থিত ছিলেন। কিছুকাল ধরেই দেখছিলাম তিনি যেন অন্তর থেকে আমাকে ভালবাসতে সুরু করছেন। পরিবারের বৃদ্ধাদের অনেক সময়েই একটা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়—সাংসারিক ব্যাপারে অনেক পরের ঘটনা তাঁরা আগে থেকেই আঁচ করতে পারেন। ব্যারনেসের মা-ও সন্দেহ করছিলেন এই বাড়ীতে উপর উপর যা ঘটছে তার পেছনে অদৃশ্যভাবে একটা কিছু ব্যাপার হচ্ছে।

একদিন কন্যাপ্রীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং অজানা ভয়ের আশঙ্কায়, তিনি আমার দু'টি হাত নিজের হাতের ভেতর চেপে ধরে আমার চোখে চোখ রেখে গভীর অন্তরাংগের সঙ্গে বললেন—আমি নিশ্চিত জানি তুমি একজন 'ম্যান অভ্ অনার'। এই বাড়ীতে কি সব ঘটছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাছে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আমার মেয়ের উপর তুমি নজর রাখবে—ও আমার একমাত্র সন্তান, কখনও যদি কিছু ঘটে,……অবশ্য কিছু ঘটা উচিত নয়, তা হ'লে তুমি আমার কাছে সব কথা বলবে। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর কথা রাখব।

আমরা দু'জনে যেন আগ্নেয়গিরির কিনারায় এসে নৃত্য' চর্চা করছিলাম। ব্যারনেসকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ফ্যাকাশে, রোগা এবং অত্যন্ত সাধারণের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। আর ব্যারন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন হিংসুক, রুক্ষ প্রকৃতির এবং অত্যন্ত দুর্বিনীত। একদিন বা দু'দিন তাঁদের বাড়ীতে না গেলেই ব্যারন লোক পাঠাতেন আমার কাছে। আমি এলে পর দুই হাত প্রসারিত করে আমাকে কাছে টেনে নিতেন এবং বোঝাতে চাইতেন আমাদের ভেতর একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটেছে—অথচ আমি জানতাম আমরা উভয়ে উভয়কে বেশ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছি।

ঈশ্বরই জানেন কি যে ঘটছিল এই সময়টায় এই বাড়ীতে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় মনোহারিণী ম্যাটিলডা তার শোবার ঘরে চলে গেল একটা নাচের পোষাক ট্রাই করে দেখবার জন্য। ব্যারনও নিঃশব্দে আমাকে একলা তাঁর স্ত্রীর কাছে রেখে বেরিয়ে গেলেন। আধ ঘণ্টা যাবার পর আমি ব্যারনেসকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর স্বামীর কি হ'ল? উত্তর পেলাম—তিনি ম্যাটিলডার লেভিস মেইডের কাজ করতে গেছেন। সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যারনেস কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত বোধ করছিলেন। সামলে নেবার জন্য বললেন—এতে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। ওদের আত্মীয়টাও ত পাতান সম্পর্ক নয়। আমি সহজে মনে খারাপ চিন্তা আসতে দিই না।

এরপর কণ্ঠস্বর পাল্টে তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি জেলাস হয়ে ওঠেন নি ত?

আপনি কি তাই হয়েছেন?

হয়ত এরপরে তাই হব।

ভগবান করুন তাই যেন হয়। আপনার একজন সত্যিকার বন্ধুর এটা আন্তরিক ইচ্ছা বলে জানবেন। এরপর ব্যারন মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে এলেন, তার পরণে ছিল ফিকে সবুজ রংএর সান্ধ্য পোষাক—বুকের খাঁজ অবধি কাটা ব্লাউজ। আমি এমন একটা ভাব করলাম যে তাকে দেখে যেন আমার চোখ ঝলসিয়ে গেছে—দু'হাতের পাতা দিয়ে চোখ ঢেকে বললাম—এই ধরনের দুরন্ত যৌবনা যুবতীর দিকে চেয়ে দেখতেও আমার ভয় করছে।

ওকে লাভলি লাগছে কি না বলুন—অদ্ভুত গলায় মন্তব্য করলেন ব্যারনেস। অল্পক্ষণ বাদেই ব্যারন এবং ম্যাটিলডা ওখান থেকে চলে গেলেন এবং আবার আমরা দু'জনে একা বসে নিজেদের সঙ্গটাকে ঘনিষ্ঠভাবে উপভোগ করবার সুযোগ পেলাম।

আপনি আমার প্রতি আজকাল এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন কেন? চোখের জলে ভেজা কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করলেন ব্যারনেস। বাসনায় ভরা কামনার দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চাইলেন—পোষা কুকুর প্রভুর কাছে শাস্তি পেলে যেমনটা হয় ব্যারনেসের মুখভাবটা সেই রকম করুণ দেখাচ্ছিল। আমি? আমি ধারণা করতেই পারি নি… যদি আমি কোন অপরাধ করে থাকি……ব্যারনেস তাঁর চেয়ারটা আমার আরও কাছে টেনে আনলেন। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দু'টি দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন, এবং এরপর তাঁর সমস্ত শরীর যেন কাঁপতে লাগল…আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললাম—আপনার কি মনে হয় না ব্যারনের এই ধরণের অনুপস্থিতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক? এভাবে আমাদের সম্পর্কে নিঃসন্দেহের ভাব দেখানোটা কি অপমানকর নয়?

আপনি ঠিক কি বলতে চান?

এভাবে নিজের স্ত্রীকে একজন যুবকের কাছে একলা ফেলে গিয়ে এবং একজন তরুণীকে নিয়ে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করাটা খুব উচিত কাজ হচ্ছে বলে আমি মনে করি না।

আপনি ঠিকই বলেছেন, এ হচ্ছে আমাকে অপমান করা—তবে আপনার আচরণও …

আমার আচরণের কথাটা ছেড়ে দিন। মেনে নিলাম

আপনার প্রতি আমার সাম্প্রতিক ব্যবহারও হয়েছে অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রকৃতির। কিন্তু আপনার প্রতি আমি সত্যিই বিরক্ত হব, যদি না আপনি নিজের মর্যাদারক্ষার দিকে মন দেন। এঁরা দু'জনে করছেন কি ?

ব্যারন ম্যাটিলডার 'বলড্রেস' সম্বন্ধে অত্যন্ত ইণ্টারেষ্টেড —ব্যারনেস উত্তর দিলেন। তাঁর পবিত্রতামাখানো মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এক্ষেত্রে আমাকে কি করতে বলেন ?'

এক ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না গড়ে উঠলে কোন পুরুষ কোনো নারীর টয়লেটে সাহায্য করতে যেতে পারে না।

ব্যারন বলেন, ম্যাটিলডা শিশুর মত—উনি ওকে মেয়ের মত দেখেন। বয়স্ক মেয়ে-পুরুষের কথা ত ছেড়েই দিন—সত্যিকার শিশুদের বেলাও এই 'পাপা-ম্যাম্মা' খেলা আমার অসহ্য মনে হয়। ব্যারনেস উঠে দাঁড়ালেন, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন।

বাকী সন্ধ্যাটা আমরা পাশবিক চুম্বক শক্তির ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে কাটালাম। ব্যারনেসের কপালের দিকে লক্ষ্য করে আমি আমার ইচ্ছাশক্তিকে উৎক্ষিপ্ত করলাম। তিনি স্বীকার করলেন যে, এর ফলে তাঁর নার্ভসগুলো শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু এরপর যখন মনে হচ্ছিল যে ব্যারনেস সম্মোহিত হয়ে পড়ছেন, হঠাৎ তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার দিকে বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন আমাকে যেতে দিন আমি পারছিনা—আপনি আমাকে যাদুকরী শক্তির প্রভাবে বশীভূত করে ফেলেছেন। এবার আপনার চুম্বকশক্তি পরীক্ষা করবার পালা—এ কথা ব্যারনেসকে বলে, আমি তাঁকে যেভাবে সম্মোহিত করবার প্রচেষ্টা করেছিলাম ঠিক সেইভাবে তাঁকে আমার উপর তাঁর বশীকরণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার সুযোগ করে দিলাম।

অর্দ্ধ নিমীলিত চোখে বসেছিলাম—চারদিকে নিস্তব্ধ ভাব বিরাজ করছিল—আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল পিয়ানোর পায়ার দিকে, এবং তার বীণাকৃতির প্যাডেলের ওপরে। হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম—সেই মুহূর্তে ব্যারণ পিয়ানোর অপরদিক থেকে এগিয়ে এলেন এবং আমাকে এক গ্লাস পাঞ্চ অফার করলেন। আমরা চারজনেই মদের গ্লাস উঠিয়ে ধরলাম—ব্যারণ তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন ম্যাটিলডার সঙ্গে তোমার পুনর্মিলন হোক এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করে আমরা পান করি। ছোট্ট মায়াবীনিটির স্বাস্থ্য পান করছি—মৃদু হেসে ব্যারনেস মন্তব্য করলেন এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনাকে নিয়ে আমাদের ঝগড় হয়েছে। এক মুহূর্তের মতন সময় আমি একেবারে হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম—কি উত্তর দেব বুঝতে পারছিলাম না শেষে জিজ্ঞেস করলাম—যা বললেন, তা একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন ?

না, না, কোনকিছু ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই—বাকী সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন। আমি জবাবে বললাম, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, আমার মত হচ্ছে আমরা সবাই আমাদের লুকোচুরি খেলাটাকে বড় বেশী দীর্ঘদিন ধরে টেনে নিয়ে চলেছি। সন্ধ্যাবেলার শেষাংশটা বেশ সংযতভাবেই কাটল বাড়ী ফেরবার পথে নিজের বিবেকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে লাগলাম এবং অস্ফুটস্বরে বললাম—যাকগে, আমার কি এসে গেল !

মনে মনে ভাবছিলাম এ সবের অর্থ কি ? সমস্ত ব্যাপারটা কি নিষ্পাপ মনের উদ্ভট চিন্তা ? দু'জন মহিলা একজন পুরুষকে নিয়ে ঝগড়া করছে। সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তাদের মনে ঈর্ষার ভাব রয়েছে। ব্যারনেস কি পাগল যে ওভাবে নিজের মনের চেহারাটা আমার কাছে খুলে ধরলেন ? কিন্তু তা তো ঠিক মনে হয় না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এসবের তলায় তলায় অন্য একটা কিছু ব্যাপার আছে।

ব্যারনেসের মা'র কথাটা বারবার মনে পড়তে লাগল—"এই বাড়ীতে উপর উপর যা ঘটছে, তার পেছনে অদৃশ্যভাবে একটা কিছু ব্যাপার হচ্ছে।" সন্ধ্যাবেলার অদ্ভুত দৃশ্যটা এর অস্বাভাবিক দিকটাই আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছিল এবং আমি ভাবছিলাম এটা সত্যি সত্যিই ঘটেছিল কিনা ! এই অর্থহীন জেলাসী, ব্যারনেসের বৃদ্ধা মায়ের এই সর্বনাশা পরিণতির পূর্বানুভূতি—এই সব চিন্তা, তার উপর বসন্তকালের প্রাণমন উদাস-করা বাতাস—সবে মিলে আমার মনে সব কিছু যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মাথাটা এত গরম হয়ে উঠেছিল যে সারারাত ঘুমোতে পারলাম না—দ্বিতীয় বারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম আর ব্যারনেসের সঙ্গে

দেখা-সাক্ষাৎ করবো না—তা হ'লে এ ব্যাপারের ভয়ঙ্কর পরিণতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই সকাল বেলায় উঠে ব্যারনেসকে একটি অর্থপূর্ণ চিঠি লিখলাম—খোলাখুলি এবং নম্র ধরনের চিঠি। বাছাই শব্দ চয়ন করে বন্ধুত্বের অত্যধিক সুযোগ নেবার বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলাম। নিজের ব্যবহারের সম্বন্ধে অথবা কারণ দেখাবার চেষ্টা না করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যে পাপ করেছি তার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করে নিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহলে অর্থাৎ স্বামী এবং কাজিনের ভেতর ভেদাভেদ সৃষ্টি করবার জন্য। আরও যে কত কথা লিখেছিলাম এখন তা আর স্মরণে নেই।

এর ফল হ'ল, অকস্মাৎ যেন দেখা হয়ে গেল ব্যারনেসের সঙ্গে রাস্তায়, আমি যখন নির্দ্ধারিত সময়ে লাইব্রেরীর কাজ সেরে রাস্তায় বের হচ্ছি। নর্থ ব্রিজের উপর তিনি আমাকে থামালেন, একসঙ্গে আমরা একটি এভিনিউর—যেটি চার্লস দি টুয়েলভথ্‌ স্কোয়ারে গিয়ে পড়েছিল—ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম। জলভরা চোখে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন আবার তাঁদের ওখানে ফিরে যেতে, কোন কৈফিয়ৎ না চাইতে, পুরাণো দিনের মত আবার তাঁদের একজন হয়ে উঠতে।

আজকের এই সকালে তাঁকে ভারি মনোমুগ্ধকর মনে হচ্ছিল। তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলাম বলেই তাঁর সম্বন্ধে কোন আপোষ করবার প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারলাম না।

আমাকে যেতে দিন—আমার সঙ্গে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে অপবাদ দেবে—একথা বলতে বাধ্য হলাম, কারণ তখনই লক্ষ্য করেছিলাম যে পথচারীরা আমাদের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। এতে সত্যিই বিব্রত বোধ করছিলাম। আরও কঠিনভাবে বললাম—আপনি এখুনি এখান থেকে বাড়ী চলে যান, নইলে এখানে আপনাকে একলা ফেলে রেখে আমাকে সরে যেতে হবে। এমন বিষাদ-মাখানো করুণ, কোমল দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চাইলেন যে, আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর সামনে জানু পেতে বসে, তাঁর পদপল্লবে চুম্বন করে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে।

অথচ তা না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য একটি রাস্তা ধরে আমি দ্রুতপদে ব্যারনেসের কাছ থেকে অদৃশ্য হলাম। বাইরে ডিনার খাওয়া সেরে আমি আমার এ্যাটিকে ফিরলাম—একটা বড় কর্তব্য সমাধা করতে পেরেছি ভেবে একদিকে মনটা যেমন চরিতার্থতায় ভরে উঠেছিল, আবার অন্যদিকে বেদনায় অন্তরটা মুষড়ে পড়েছিল। বারবার স্মৃতিপটে ভেসে উঠছিল ব্যারনেসের জলেভেজা চোখ দু'টি। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমার মনের দৃঢ়তা ফিরে এল। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো বর্ষপঞ্জির দিকে চেয়ে দেখলাম। ঐ দিনের তারিখ ছিল ১৩ই মার্চ। "Beware the Ideas of March!" জুলিয়াস সিজার নাটকে সেক্সপীয়ারের এই বিখ্যাত উক্তি আমার কানে বাজতে লাগল—এমন সময় চাকর ঘরে ঢুকে ব্যারণের একটি চিঠি আমাকে দিল।

এই চিঠিতে ব্যারণ অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর এবং ব্যারনেসের সঙ্গে নির্জন সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসতে—ম্যাটিলডা এ সময় বাইরে বেড়াতে যাবে। এ অনুরোধ উপেক্ষা করবার মত শক্তি আমার ছিল না—সুতরাং যেতেই হ'ল। ব্যারনেসকে মরার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল—ড্রইং রুমেই আমাদের দেখা হ'ল—তিনি আমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের উপর চেপে ধরলেন, আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ফিরে এসেছি বলে—বারবার বললেন সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাঁদের যেন আমার বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত না করি।

ব্যারণ কোনরকমে আমাকে ব্যারনেসের হাত থেকে মুক্ত করলেন এবং হাসতে হাসতে বললেন—আমার মাঝে মাঝে মনে হয় উনি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবেন।

আমি জানি আমি পাগল হয়ে গেছি। যে বন্ধু চিরতরে আমাদের পরিত্যাগ করে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তিনি ফিরে আসাতে সত্যিই আমি আনন্দে পাগল হয়ে গেছি। আনন্দের আতিশয্যে এবার তিনি কাঁদতে সুরু করলেন। এরপর ব্যারনেসের শ্বশুর এবং আঙ্কল ঘরে এসে ঢুকলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। ব্যারনেস আমার পাশে

বসলেন, ওঁরা তিনজন রাজনীতির আলোচনা সুরু করলেন।

বেলা পড়ে এসেছিল—কিন্তু সেই আবছা আলোতেও লক্ষ্য করলাম ব্যারনেসের চোখ থেকে যেন দ্যুতি বের হচ্ছে, আমি বেশ অনুভব করছিলাম তাঁর সব অঙ্গ যেন আমার সান্নিধ্য কামনা করছে। ফিসফিস করে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি লাভ-এ বিশ্বাস করেন?

না।

'না' বলাতে তিনি আহত হলেন, কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠে অন্য জায়গায় গিয়ে বসলাম। আমার মনে হচ্ছিল ওঁর মাথা তখন একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাছে আবার একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এই ভয়ে আমি ঘরের ল্যাম্পগুলো জ্বালিয়ে দেবার প্রস্তাব করলাম।

সাপারের সময় আঙ্কল এবং ব্যারণের বাবা কাজিন ম্যাটিলডার বিষয় আলোচনা করছিলেন—তার ঘরোয়া ভাব, তার সূচের কাজের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। ব্যারণ—ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েক গ্লাস পাঞ্চ পান করেছিলেন—ম্যাটিলডার প্রশংসায় এবার পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন এবং তার প্রতি তার বাড়ীতে কি অন্যায় ব্যবহার করা হয় বর্ণনা করতে করতে মাতালে-কান্না সুরু করে দিলেন। তারপরেই পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে বললেন আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি দেবীকে বাড়ী অবধি পৌঁছিয়ে দেব কথা দিয়েছি—আমার এখন তার সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়ে আসতে হবে। এক ঘণ্টার ভেতরই আমি ফিরে আসব।

তাঁর বৃদ্ধ পিতা অনেক রকমে তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু কে কার কথা শোনে! ব্যারণ আমার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেলেন যে, তাঁর ফেরা অবধি আমি থাকব। আরও পনের মিনিট ওখানে থেকে দুই বৃদ্ধ আঙ্কলের ঘরের দিকে গেলেন এবং আমরা ড্রয়িং রুমে চলে এলাম।

যে জালে পড়ব না বলে এত চেষ্টা করছিলাম, ভাগ্যের দোষে সেখানেই এসে আটকা পড়লাম। শেষে একটা সিগার ধরিয়ে মরিয়ার ভাব নিয়ে মাথা উঁচু করে বসলাম।

আপনি আমাকে ঘৃণা করেন—বললেন ব্যারনেস।

একথা বলছেন কেন?

সকালে আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলেন বলুন ত?

ও কথার আলোচনা না করাই ভাল।

আপনি আমার থেকে দূরে সরে যেতে চাইছিলেন। আমি ম্যারিয়াক্রেডে কেন চলে গিয়েছিলাম বলতে পারেন?

বোধহয় একই উদ্দেশ্যে—যে কারণে আমি প্যারিসে যাব বলে ঠিক করেছিলাম।

তা হ'লে···সবই স্পষ্ট হয়ে গেল ত? বললেন ব্যারনেস।

অতএব?

আশা করেছিলাম এবার একটা কিছু ঘটবে। কিন্তু ব্যারনেস খুব করুণ মুখের ভাব করে শান্ত হয়ে রইলেন। এক এক সময় নিস্তব্ধতা ব্যাপারটা বড় বিপদজনক—তাই আমিই কথা সুরু করলাম—

আমার মনের কথা এখন যখন জানতে পারলেন, একটা বিষয় আপনাকে সাবধান করে দিই। আমি এখানে আসি এটাই যদি চান, তবে আপনাকেও সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আপনাকে আমি যে ভালবাসি সেটা এত উচ্চ ধরনের যে শুধু আপনার কাছাকাছি আমি আছি এই চিন্তাটাই আমাকে গভীর আনন্দ দেয়। আপনাকে শুধু দেখতে পাব এই হলেই হ'ল—এর থেকে বেশী আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আপনি যদি আপনার কর্তব্য বিস্মৃত হন, আমাদের অন্তরের কথা যদি আপনার চোখের চাহনিতেও সামান্যভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা হ'লে আমি আপনার স্বামীর কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলব—তার ফল যতই ভয়াবহ হোক না!

আমার কথাগুলো শুনে ব্যারনেস আনন্দে এবং উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে গেলেন—উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন: আমি প্রতিজ্ঞা করছি তুমি যা যা বললে ঠিক সেইমতই আমি চলব। তুমি কত ভাল, তোমার মনের জোরের তুলনা হয় না···তোমার বিষয়ে আমি সব সময়েই মুগ্ধ হয়ে থাকি। নিজের মনের কথা ভাবলে আমি নিজেই লজ্জিত বোধ করি। কিন্তু আমি ভাবছি এবার আমিও তোমার সত্তাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করব···তুতুকে কি সব কথা বলে দেব?

তুমি যদি তাই মনে কর···কিন্তু তারপর থেকে আর আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। এ ব্যাপারটা তাকে নিয়ে নয়। যে অনুভূতি আমার চিত্তকে আজ প্রাণ-রসে ভরপুর করে রেখেছে, তার ভেতর কোন অপরাধ আছে বলে আমি মনে করি না। সে যদি সবকিছু জানতেও পারে তা হলেও আমাদের অন্তরের প্রেমকে সে নষ্ট করতে পারবে না। যে নারীকে আমি স্বেচ্ছায় ভালবেসেছি, যতক্ষণ না অন্যের অধিকারে আঘাত হানছি, ততক্ষণ সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু সে যা হোক তোমার নিজের যা ভাল মনে হবে তাই কর। আমি সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকব।

না, না! ওকে কোনকিছু জানাবো না—তা ছাড়া নিজের বেলায় ও যখন সবরকম লাইসেন্স নেয়—

ঐখানে আমি তোমার সঙ্গে একমত নই, এ দু'টি ব্যাপার ঠিক এক ধরনের নয়। ব্যারণ যদি নিজেকে নীচের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চান সেটা তাঁর পক্ষেই ক্ষতিকর। কিন্তু সেজন্য তাঁকে আমাদের ব্যাপারে দায়ী করে—

না, না!···

আমাদের অন্তরের উচ্ছল ভাবটা যেন স্তিমিত হয়ে এল—আবার আমরা পৃথিবীর মাটিতে এসে পা ফেললাম।

না! না! আবার জোর দিয়ে বললাম। তোমার কি মনে হয় না এটা কত সুন্দর, নতুন এবং অসাধারণ—এই যে পরস্পরকে বলতে পারছি 'তোমাকে ভালবাসি'···আর কোন কিছুরই দরকার নেই।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে ব্যারনেস বললে: এটা রোমান্সের মতই সুন্দর।

গল্পেও কিন্তু এমনটা সাধারণত ঘটে না।

আর এই 'অনেষ্ট' থাকা ব্যাপারটাও কত ভাল।

এটা ত আমাদের প্রধান কর্তব্য।

আগের মতই আমাদের দেখা হবে, মনে কোন ভয়ের ভাব থাকবে না—

আমাদের সম্বন্ধে আপত্তিকর কথা বলবার সুযোগ কারোকে দেব না—

পরস্পরকে কিছুতেই আমরা ভুল বুঝবো না।

এই! চুপ করো!

দরজাটা খুলে গেল। অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। ঐ দু'জন বৃদ্ধ একটি কাল লণ্ঠন নিয়ে এ ঘর দিয়ে চলে গেলেন।

ব্যারনেসকে বললাম নজর করে দেখলেই বোঝা যাবে জীবনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা এবং স্বর্গীয় কয়েকটি মুহূর্তের সমষ্টি। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কত তফাৎ। আজকের ঘটনাটা কোন নাটক বা নভেলে ঢুকিয়ে দিলে পাঠক বলত অবিশ্বাস্য কল্পনা। একবার ভেবে দেখ—আমরা প্রেম নিবেদন করলাম। কিন্তু আমাদের ভেতর চুম্বন বিনিময় হ'ল না, জানু পেতে বসে বা আলিঙ্গনের সাহায্যে ঘনিষ্ঠ হওয়া ত দূরের কথা—আর প্রেম নিবেদনের পরিণতিতে দু'টি বৃদ্ধ এঘর দিয়ে কালো একটি লণ্ঠন হাতে চলে গেলেন—লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল প্রেমিক-প্রেমিকার চোখের ওপর। সেক্সপীয়ারের মহত্ব কিন্তু এখানেই—ড্রেসিং গাউন পরিহিত এবং পায়ে স্লিপার্স, গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে এলেন জুলিয়াস সিজার—শিশুদের মত স্বপ্ন-কাহিনী শুনে ভীত অবস্থায়।

দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হল। বুঝতে পারলাম ব্যারন ম্যাটিলডাকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। নিশ্চয় ব্যারণ বিবেক-দংশন ভোগ করছিলেন—তাই আমাদের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করতে সুরু করলেন। আমিও নতুন ভূমিকায় অভিনয় করব বলে একটা বড় রকমের মিথ্যে কথা বলে ফেললাম—

এক ঘণ্টা ধরে ব্যারনেসের সঙ্গে খুবই কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া হচ্ছে।

নিরীক্ষার দৃষ্টিতে ব্যারন আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেন, চোখ দু'টিতে প্রতিহিংসাপরায়ণ ধারালো দৃষ্টি, অন্বেষক সারমেয়র মত বাতাসের আঘ্রাণ নিয়ে যেন পারিবেশটা বুঝতে চেষ্টা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ভুল ধারণা করলেন বলেই মনে হ'ল।

ভালবাসব অথচ আমাদের সম্পর্কের ভেতর কোন কামনার কলুষতা থাকবে না! কি অদ্ভুত যুক্তি! আমাদের এই গোপন সম্পদের মূলেই যেন বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল।

আমরা নিজেদেরও ঠকাচ্ছিলাম এবং বাইরের লোক যাতে আমাদের আসল রূপটা না জানতে পারে এজন্য ক্রমাগত ছল-চাতুরির আশ্রয় নিচ্ছিলাম। ব্যারনেসকে আমার বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমার বোনের স্বামী

ছিলেন এক স্কুলের হেডমাষ্টার—তাঁর পরিবার ছিল পুরাণো এবং সম্ভ্রান্ত—সেই জন্যই কৌলিন্সের দিক থেকে ব্যারনেসের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য ছিল।

পূর্ব-নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী অনেক সময়েই আমরা দেখা করতাম, প্রথম দিকটায় এই সব সাক্ষাৎকারগুলো হ'ত নির্দোষ ধরণের। কিন্তু কিছুকাল বাদেই নিজেদের সংযত রাখবার মত মনের জোর হারিয়ে ফেলতে লাগলাম—কারণ যুবক-যুবতীর গোপন মিলনের সময় কামনার দ্বার রুদ্ধ করে রাখা বেশীর ভাগ সময়েই হয়ে পড়ত অসম্ভব।

পরস্পরের কনফেশনের কিছুদিন বাদে ব্যারনেস আমাকে এক প্যাকেট চিঠি দিলেন—এর কতকগুলো আগে এবং কতকগুলো ১৩ই মার্চের পরে তিনি লিখেছিলেন। এই সব চিঠিতে তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা এবং ভালবাসা যেন নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন—আমার হাতে আসবার জন্য কিন্তু এ চিঠিগুলো তিনি লেখেন নি।

আমার প্রিয় বন্ধু, সোমবার

আজ—শুধু আজই বা বলব কেন? সব সময়েই তোমাকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল। তুমি আজকাল বিদ্রূপ-মাখান দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আমার সব কিছু বিচার কর। গতকাল যে আমার কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে শুনেছিলে এজন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমার বন্ধুত্ব আমার পক্ষে অপরিহার্য—তাই দরকার হলেই তোমার সাহায্য চাই—তুমি কিন্তু মুখ ঢেকে রাখতে চাও মুখোশের আবরণে। কিন্তু কেন? তোমার অন্তরের আসল অনুভূতিগুলো এ ভাবে লুকিয়ে রাখবার দরকার কি বলতে পার? একটি চিঠিতে তুমি নিজেই স্বীকার করেছ যে, তুমি মুখোসের আবরণে নিজের চেহারা ঢেকে রাখ। তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি।···কিন্তু এতে আমি ব্যথা পাই···আমার মনে হয় আমারই কোন দোষের জন্য তুমি এ রকমটা কর···আমি বিস্মিত হয়ে চিন্তা করতে থাকি আমাকে তুমি কি মনে কর এই ভেবে।

তোমার বন্ধুত্ব আমাকে উৎসুক করে তুলেছে···মনে হয় এমন সময়ও আসতে পারে যখন তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। বল, যে এ রকমটা কখনও হবে না। আমার প্রতি তোমাকে সবসময় সৎ এবং অনুরক্ত থাকতে হবে। আমি নারী, এ কথা ভুলে যেতে পার না? আমি নিজে ত বেশীর ভাগ সময়ই ও কথা ভুলে থাকি।

গতকাল তুমি আমাকে যা বলেছিলে তার জন্য আমি রাগ করি নি, বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়েছি। তুমি কি সত্যিই মনে কর যে নীচ প্রতিহিংসা নেবার জন্য আমি আমার ব্যবহারের দ্বারা স্বামীর মনে জেলাসী জাগাতে চাই? ভাল করে ভেবে দেখ—যদি জেলাসীর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে তিনি আবার আমার দিকে ফিরে আসেন তা হ'লে আবার আমার বিপদ বাড়বে বই কমবে না! আর এ করে আমার লাভ হবে কি? তাঁর যত রাগ এসে পড়বে তোমার ওপর—আর আমাদের মিলিত হবার সমস্ত সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাকে যদি কাছে না পাই, তা হ'লে আমার কি অবস্থা হবে কল্পনা করতে পার? তুমি যে আমার কাছে আমার প্রাণের থেকেও প্রিয়। আমি তোমাকে সহোদরার মত ভালবাসি—ককেটের মত নয়। অনেক নিবিড় মুহূর্তে তোমার কপালে চুম্বন রেখা এঁকে দিতে ইচ্ছা হয়েছে—যে চুম্বনের ভেতর কামনার স্পর্শমাত্র নেই। আমার স্নেহশীল মনোভাবের জন্য ত আমি দায়ী নই—তুমি যদি মেয়ে হ'তে তা হ'লেও এই একই রকমভাবে আমি তোমাকে ভালবাসতাম। তোমাকে শ্রদ্ধা করি—সেই জন্যই তোমাকে ভালবাসি। তুমি নারী কি পুরুষ সে কথা ভেবে তোমাকে ভালবাসি না।

ম্যাটিলডা সম্বন্ধে তোমার মনোভাব আমাকে আনন্দ দেয়। আমি নারী বলেই এটা পারি। আমি কি করি বল ত? সবাই যদি ম্যাটিলডার দিকে ঘেঁষে তা হ'লে আমার কি হবে বলতে পার! আর যা কিছু ঘটে তার জন্য আমাকে দায়ী করা হবে কেন? ওর ছেনালীপনায় আমি উৎসাহই যুগিয়েছিলাম কারণ এ ব্যাপারটাকে আমি ওর ছেলেমানষী হিসাবেই ধরেছি এবং সেজন্য এর ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করি নি। স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিশ্চিত ছিলাম বলেই এ সব বিষয়ে তাঁকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। কিন্তু পরিণতি যা দেখছি তা থেকে বুঝতে পারছি আমারই ভুল হয়েছিল···

বুধবার

আমার স্বামী ওকে ভালবাসেন এবং সে কথা আমাকে বললেন। ব্যাপারটা সমস্তদিক থেকে এতভাবে সীমা

ছাড়িয়ে গেছে যে তা দেখে আমি শুধু হেসেছি।…ভাবতে পার, সেদিন দরজা অবধি গিয়ে তোমায় বিদায় দি। আসার পর ব্যারন আমার কাছে এলেন, আমার হাত দু'টি নিজের হাতে নিয়ে আমার মুখপানে চাইলেন—আমি কেঁপে কেঁপে উঠলাম, কারণ আমার বিবেকও ত বলছিল আমি ঠিক নিষ্পাপ নই—তিনি আমাকে অনুনয়ের সুরে বললেন—,মারী আমার উপর রাগ করো না। আমি ম্যাটিলডাকে ভালবাসি। এরপর আমি কি করব বলতে পার? কাঁদব না, হাসব? তিনি এইভাবে আমার কাছে স্বীকৃতি দিলেন, আর আমি ত প্রতিক্ষণে অনুশোচনায় বিদগ্ধ হচ্ছি, দূর থেকে এই হতভাগিনীকে তোমাকে ভালবাসতে হবে, কিছুতেই কাছাকাছি আসতে পারবে না। কি অর্থহীন সামাজিক বিধি এবং সংস্কার আমাদের মেনে চলতে হয় বল ত! আমার স্বামী তার পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারবেন—অথচ আমার প্রাণের মানুষ তোমার কাছে আমি যেতে পারব না, আমাকে সব সময়েই স্ত্রীর কর্তব্য; মায়ের কর্তব্যের কথা স্মরণ রাখতে হবে। আমার আর একটা আশ্চর্য দ্বৈত অনুভূতির কথা তোমাকে বলছি…আমি তোমাদের দু'জনকেই ভালবাসি, তাকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেব, সে কথাও ভাবতে পারি না · আর তুমি আমার জীবন থেকে সরে গেছ একথা কল্পনায় আনতেও শিউরে উঠি।

শুক্রবার

যে পর্দাটির আবরণে আমার অন্তরের রহস্যটি ঢাকা পড়েছিল, অবশেষে তুমি সেটিকে অপসারিত করলে। জানতে পারলাম আমাকে তুমি ঘৃণা কর না। কৃপাময় ঈশ্বর! বরং তুমি আমাকে ভালবাস! তুমি এমন অনেক কথা আমাকে বলেছ যে সব কথা তুমি ঠিক করেছিলে কোন দিনই আমাকে জানতে দেবে না। তুমি আমাকে ভালবাস। আমিও অপরাধী এবং ক্রিমিন্যাল, কারণ আমিও তোমাকে ভালবাসি। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন! আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি এবং তাঁকে পরিত্যাগ করে যাবার কথা ভাবতেও পারি না। কি অদ্ভুত ঘটনা! ·· অন্যের ভালবাসা লাভ করা—কোমল, মধুর ভালবাসা! স্বামীর ভালবাসা এবং তোমার ভালবাসা! আমি এত সুখ এবং শান্তি উপভোগ করছি—আমার এই প্রেম অপরাধদূষিত হলে এটা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। এ প্রেমের ভেতর অন্যায় কিছু থাকলে নিশ্চয় আমার মনে অনুশোচনা আসত। অথবা আমি কি এতই কঠিন হয়ে গেছি যে, আমার মনে অনুতাপ হয় না? নিজের সম্বন্ধে আমি কত লজ্জিত। আমাদের ভালবাসার ব্যাপারে আমিই প্রথম মুখ ফুটে কথা বলি। আমার স্বামীও এখানেই ছিলেন কিছুক্ষণ আগে—আমাকে তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন, তাঁর চুম্বনে আমি কোন বাধা দিলাম না। আমি কি সৎ? নিশ্চয়! তিনি কেন সময় থাকতে আমাকে ঠিকমত যত্ন করেন নি?

সমস্ত ব্যাপারটাই একটা উপন্যাসের মত। এর পরিণতি কি? নায়িকার কি মৃত্যু হবে? নায়ক কি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করবে? আমাদের ভেতর কি একটা ব্যবধান এসে যাবে? পরিণতিটা কি নৈতিক মতবাদের দিক থেকে সমর্থন লাভ করবে?

এই মুহূর্তে আমি যদি তোমার সামনে উপস্থিত থাকতাম তা হ'লে তোমার কপালে ভক্তিভরে চুমো খেতাম, যে ভাবে পূজারিণী ক্রুসিফিক্সকে চুম্বন করে সেই রকম ভক্তিভরে—অন্তর থেকে সমস্ত নীচতা এবং অপবিত্রতা মেরে ফেলতাম··

ব্যারনেসের কথাগুলো কি আগাগোড়াই ভণ্ডামি-ভরা—আমি কি নিজেকেই নিজে প্রতারিত করছি? মহিলা যা বলছেন তা কি তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ সঞ্জাত, না ধর্মভাবমণ্ডিত উচ্ছ্বাস? একে শুধু কামনার আবেগ বলা চলে না। সত্যিকার ভালবাসা দেহ এবং আত্মার যোগাযোগ—শুধু দেহ বা শুধু আত্মাকে নিয়ে নয়। ব্যারনেসের প্রেমটা যদি শুধু কামনা-লালসার ব্যাপার হ'ত,—তা হ'লে আমায় মত রুগ্ন, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল যুবকের দিকে ঝুঁকে, তিনি তাঁর জায়েণ্টের মত স্বামীকে নিয়েই সমস্ত থাকতেন। আর এটা নিছক আত্মিক প্রেম হলে আমাকে চুম্বন করবার জন্য, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শ পাবার জন্য ব্যারনেস তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতেন না। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো কি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল? অথবা তিনি কি মনে মনে অনুভব করছিলেন আমার মত একজন প্রদীপ্ত যুবক তাঁর মনমরা স্বামীর তুলনায় তাঁকে অনেক বেশী সুখী করতে পারবে! ব্যারনের দেহ সম্বন্ধে তাঁর আর কোন আকর্ষণ অবশিষ্ট ছিল না—সুতরাং প্রেমিক হিসাবে ব্যারণকে তিনি মন

থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আগ্রহ পূর্ণমাত্রায় থাকাতে আমাকেই ভালবাসছিলেন।...

একদিন আমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ব্যারনেস যেন হিষ্টিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলেন। সোফাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি কান্নায় ফেটে পড়লেন। তাঁর মনে এই সব প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর স্বামীর কুৎসিত এবং নির্মম ব্যবহারে—ব্যারন এইদিন সন্ধ্যাটা ম্যাটিলডাকে নিয়ে রেজিমেন্টের নৈশ নাচে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

একটা আবেগপ্রবণ বিস্ফোরণের বহিঃপ্রকাশ হল এইভাবে —ব্যারনেস দুই হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার কপালে চুমো খেলেন—আমিও প্রতিচুম্বন করলাম। আদর করে নানা মধুর নামে তিনি আমাকে সম্বোধন করতে লাগলেন। আমাদের ভেতরকার বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হতে লাগল এবং তাঁর প্রতি আমার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল।

সন্ধ্যাবেলায় লঙফেলার 'একসেল্‌সিঅ্যর' আবৃত্তি করে শোনালাম ব্যারনেসকে—কবিতাটির সৌন্দর্য ছিল মনোমুগ্ধকর, ব্যারনেসের দিকে চেয়ে দেখলাম। মনে হ'ল তিনি যেন সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছেন, আমার মুখে অনুভূতির যে বিভিন্ন রেখাগুলো ফুটে উঠেছিল তারই প্রতিফলিত রূপ দেখলাম ব্যারনেসের মুখে। তিনি যেন দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর চোখে ছিল সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি।

সাপারের পর একটি পরিচারিকা গাড়ি নিয়ে এল ব্যারনেসকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে। আমি ঠিক করেছিলাম রাস্তা পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দেব, আর বেশীদূর যাব না। কিন্তু ব্যারনেস পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আমাকে গাড়িতে উঠবার জন্য এবং আমি বারবার আপত্তি করা সত্ত্বেও পরিচারিকাকে গাড়ির ওপরে সহিসের পাশে বসতে পাঠিয়ে দিলেন। গাড়ির ভেতর আমরা দু'জন—ব্যারনেসকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম—কেউ কোন কথা বলছিলাম না—বেশ অনুভব করছিলাম ব্যারনেসের তনুদেহ উত্তেজনায় শিহরিত হয়ে উঠছে এবং আমার চুম্বনে তাঁর সরস বিম্বাধরে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সত্যিকার কোন অপরাধ করা থেকে বিরত থাকলাম—তাঁর গৃহদ্বারে তাঁকে ছেড়ে দিলাম, অনাহত অবস্থায়—মনে হচ্ছিল তিনি ঈষৎ লজ্জিত এবং সামান্য ক্রুদ্ধ।

এরপর আমার আর কোন সন্দেহ রইল না—আমার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম ব্যারনেস আমাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছেন: তিনিই আমাকে প্রথম চুম্বন করেছেন, সব ব্যাপারের সুরুতে তিনিই 'ইনিসিয়েটিভ' নিয়েছেন। এখন থেকে অবশ্য আমিই প্রলোভকের ভূমিকা গ্রহণ করব। কারণ যদিও আমি অত্যন্ত আদর্শবাদী, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে বইকি—আর আমি ত শুদ্ধ আত্মাসম্পন্ন যোশেফের মত নিষ্পাপ চরিত্রের লোক নই। পরের দিন ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আমরা মিলিত হলাম। গ্যাবেলের সিঁড়ি দিয়ে তিনি যখন উঠছিলেন, আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। মাথার ওপরে ছিল সোনালী সিলিং, পায়ের পাতা দু'টি ছোট ছোট, কাল ভেলভেটের পোষাকে অত্যন্ত এ্যারিষ্টোক্রেটিক দেখাচ্ছিল ব্যারনেসকে। তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার গতরাত্রের ওষ্ঠ চুম্বনে তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য যেন আজ সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ধমনীর টাটকা তাজা গরম রক্ত যেন তাঁর স্বচ্ছ গালের আবরণকে টুকটুকে লাল করে তুলেছিল। এর আগে ব্যারনেস যেন ছিলেন মাটি দিয়ে তৈরী নির্জীব নারীমূর্তি। আমার কালকের আদরে, আপ্যায়নে, দেহজ প্রেমে, সেই নির্জীব নারীমূর্তি আজ যেন জীবনের অগ্নিশিখার স্পর্শে প্রাণবন্ত এবং উদ্দাম হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে এলাম—এবং ক্রমাগত তাঁর গালে ঠোঁটে এবং চোখের পাতায় চুমো খেতে লাগলাম—তিনিও দেহমন দিয়ে আমার এই আদর-আহ্লাদ গ্রহণ করছিলেন—পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠছিল তাঁর ঠোঁটের কোণায়। অনুনয়ের সুরে আমি তাঁকে বললাম - তোমার বাড়ীর ঐ বিষাক্ত পরিবেশ ছেড়ে চলে এস—এই তিনজনকে নিয়ে তৈরী করা সংসার তোমাকে ভেঙ্গে দিতে হবে—তা যদি না কর তা হ'লে তুমি আমাকে বাধ্য করবে তোমাকে ঘৃণা করতে। মায়ের কাছে ফিরে যাও—শিল্পসাধনায় আত্মোৎসর্গ কর—তা হ'লেই এক বছরের ভেতর তুমি রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ লাভ করবে। আর এই ভাবেই তুমি নিজের মত ভাবে মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারবে। ব্যারনেস

এবার যেন আগুনে ঘৃতাহুতি দেবার মত ব্যবহার করতে সুরু করলেন—ফলে আমি আরও উত্তেজিত এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলাম। আমি এবার একটানা কথা বলতে লাগলাম—আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করা যে স্বামীকে তিনি এবার সব ব্যাপারটা জানিয়ে দেবেন—কারণ তা হ'লেই আর আমাদের সম্পর্কের পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের কেউ দায়ী করতে পারবে না।

কিন্তু এর পরিণামটা যদি অমঙ্গলসূচক হয় প্রশ্ন করলেন ব্যারনেস।

আমাদের যদি সব হারাতে হয় তা হলেও। নিজেদের সম্বন্ধে যদি আমি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলি তা হ'লে তোমার প্রতিও আমার ভালবাসা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি কি ভীরু? পুরস্কার চাও, অথচ স্বার্থত্যাগ করতে পারবে না? তোমার সৌন্দর্যের যেমন তুলনা হয় না, মহত্ত্বের দিক থেকেও তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠ। সাহস করে সত্যের পথে ঝাঁপিয়ে পড়, তাতে যদি সব যায় তাতে ক্ষতি নেই। সব হারিয়েও আমাদের সম্মান বেঁচে থাক। এভাবে চললে, অল্পদিন বাদেই আমরা অপরাধের ভারে নুইয়ে পড়ব, আমার প্রেম সূর্যের কিরণের মত উজ্জ্বল এবং পবিত্র—একথা একবারও মনে স্থান দিও না সে প্রেমকে আমি কলুষিত করবো আরজনের সঙ্গে অংশীদার হিসাবে তোমাকে উপভোগ করে—এ ধরনের চিন্তাকেও আমি পাপ বলে মনে করি। ব্যারনেস আমার কথায় বাধা দেবার ভান করলেন—আসলে তিনি আমার ভেতরকার ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে উস্কে দিলেন। তারপর ব্যারনের ব্যবহার সম্বন্ধে এমন সব ইঙ্গিত দিলেন যা শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমার শুধু মনে হচ্ছিল ব্যারনের মত একজন স্থূল মস্তিষ্কের লোক, আর্থিক অবস্থাও যার আমারই মত, ভবিষ্যৎ যার অন্ধকার, সে কি না দু'জন মিসট্রেস রাখবার বিলাস উপভোগ করতে পারে, আর আমি, প্রতিভাবানদের মধ্যে অগ্রগণ্য, ভবিষ্যৎকালের অন্যতম এ্যারিষ্টোক্র্যাট, অতৃপ্ত বাসনা-কামনার যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সময় কাটাচ্ছি!

হঠাৎ ব্যারনেস কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন—আমার উত্তপ্ত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন—তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমরা চুক্তি করেছিলাম যে আমরা ভাইবোনের মত থাকব।

না, না, ওই ভয়াবহ ভাইবোনের খেলার ভেতর আর যাব না। সত্যকে সহজভাবে আমরা গ্রহণ করব—আমি পুরুষ—তুমি নারী, আমি প্রেমিক, তুমি প্রেমিকা! এইটেই আমাদের সব থেকে বড় পরিচয়। আমি তোমার পূজারী। তোমার সবকিছুকে আমি ভালবাসি। তোমার দেহ এবং আত্মা, তোমার সোনালী কেশগুচ্ছ, তোমার সহজ, সরল ব্যবহার, তোমার ছোট্ট পা দু'টি, তোমার নির্ভীক ভাবভঙ্গি, তোমার উজ্জ্বল আঁখিতারকা, তোমার চেরীর রংএর গাউন·····

কি বললে?

হাঁ, মনোহারিণী রাজদুহিতা, তোমার দেহের প্রতিটি অংশ আমার মানসপটে গাঁথা হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমার তীব্র বাসনা হচ্ছে তোমার মরাল গ্রীবাতে চুম্বন করতে, তোমার কাঁধের দু'পাশের স্ফীত পেশীগুলোকে ওষ্ঠ-স্পর্শে আস্বাদন করতে—চুম্বনে চুম্বনে আমি তোমাকে নির্জীব নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ করে ফেলতে চাই, বাহুবন্ধনে তোমাকে পিষ্ট করে। তোমার দেহের মত গন্ধ, যত মধু সব আকণ্ঠ পান করতে চাই, তোমাকে ভালবাসতে পেরে আমি যেন ঐশ্বরিক শক্তিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছি। তুমি কি আমাকে দুর্বল ভাবতে চাও? আমি স্বেচ্ছায় দৌর্বল্যের ভান করতাম—নিজের কাল্পনিক অসুস্থতাকে আসল বলে তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতাম। আমার এই অসৎ ছদ্মবেশ নিপাত যাক্—যেদিন এবং যে মুহূর্তে তোমাকে প্রথম দেখলাম, তখন থেকেই তোমাকে নিবিড়ভাবে পাবার জন্য আমার মনে তীব্র বাসনা জেগে উঠল। ফিনল্যাণ্ডবাসিনী সলমার কাহিনীটা ফেয়ারী টেলের মতই অসার··ব্যারনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব? সেটাও একটা বিরাট মিথ্যা সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ···আমি সমাজের কোন শ্রেণীতেই পড়ি না—আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারে না·এই এ্যারিষ্টোক্র্যাট ব্যারনকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। কারণ আমি নিজে হচ্ছি 'সান অফ এ সারভেন্ট।' আমার এই আত্মস্বীকৃতিতে ব্যারনেস কিন্তু বিশেষ বিস্মিত হন নি-- কারণ তাঁর কাছে আমি নতুন কোনরকম তথ্য

পরিবেশন করতে পারি নি—আমি ঢেকে রাখলেও আমার আসল মনের কথা তিনি আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন।

বিদায় নেবার আগে দু'জনে ঠিক করলাম স্বামীকে গিয়ে কোন কিছু না ঢেকে তিনি সব কথা খুলে বলবেন, তবেই আমাদের এর পরে দেখা হবে।

সন্ধ্যাবেলাটা বাড়ীতে বসেই কাটালাম। উৎকণ্ঠা এবং অস্বাচ্ছন্দ্যে মনটা ভরে ছিল। অন্যমনস্ক হবার জন্য একটি ঝোলা থেকে পুরানো বই এবং কাগজপত্র মাটিতে ঢেলে ফেলে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম—এগুলোকে বাছাই করে শ্রেণীবিভাগ করার উদ্দেশ্য নিয়েই বসেছিলাম। কিন্তু এ কাজে মন দিতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ মাথার তলায় হাত রেখে বিস্তৃত হয়ে শুয়ে রইলাম। বাতিদানের—যার ভেতর মোমবাতিগুলো জ্বলছিল—উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলাম। আমি যেন এই সময়টায় সম্মোহিত অবস্থায় ছিলাম। ব্যারনেসের চুম্বকসুধা পান করবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—কি করে তাঁকে আমার করে নিতে পারব, এই পরিকল্পনাই অত্যন্ত গভীরভাবে মনকে পেয়ে বসেছিল। ব্যারনেস ছিলেন অত্যন্ত অদ্ভুত এবং সেনসেটিভ—সুতরাং বেশ উপলব্ধি করছিলাম খুব সূক্ষ্মভাবে এবং সাবধানের সঙ্গে আমাকে চলতে হবে—সামান্য এদিক ওদিক হলেই আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

না, না, এঁকে আমার পেতেই হবে—সম্পূর্ণ নিজের করে নিতে হবে এবং চিরদিনের জন্য।

ঠিক এই সময় আমার দরজায় মৃদু আঘাত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজায় একটি সুন্দর মুখের আবির্ভাব ঘটল—আমার ঘরটা যেন সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্যারনেসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয়ার আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করলাম—শিলাবর্ষণের মত তাঁর ওষ্ঠে চুম্বনবৃষ্টি করলাম—রাস্তা দিয়া আসাতে বাইরের ঠাণ্ডায় তাঁর ঠোঁটগুলো টাটকা ফুলের মত সজীব হয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন করলাম—

তা হ'লে, ব্যারন কি করবেন ঠিক করলেন ?

কিছুই না! আমি ওঁকে এখন পর্যন্ত কোন কথা বলি নি। ব্যারনেসের ফারকোট এবং টুপি খুলে নিয়ে তাঁকে আগুনের ধারে বসালাম। তিনি বললেন, সাহস পেলাম না—ভয়াবহ ঘোষণা করবার আগে আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হ'ল। ঈশ্বর জানেন, তিনি হয়ত আমাকে ডিভোর্স করতে চাইবেন সব কথা শোনবার পর...

কাবার্ড থেকে এক বোতল ভাল ওয়াইন এবং দু'টি কাচের গ্লাস এনে ব্যারনেসের পাশে ছোট্ট টেবিলটির ওপর রাখলাম—সুরার সাহায্যে ব্যারনেসের স্বাস্থ্য পান করলাম—তাঁর সামনে জানুপেতে বসলাম এবং আমার অন্তরের পূজা তাঁকে নিবেদন করলাম।

তুমি কি অদ্ভুত সুন্দর !

ব্যারনেস এই প্রথম আমাকে তাঁর প্রেমিক হিসাবে গ্রহণ করলেন। নিজের দুই হাতের সাহায্যে আমার মুখটা কাছে টেনে নিয়ে আমার ওষ্ঠ চুম্বন করলেন, তারপর ধীরে ধীরে আমার চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে আমাকে আদর করতে লাগলেন। আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিতে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তুমি কাঁদছ ? কি হয়েছে বল ত ? ব্যারনেস জিজ্ঞেস করলেন।

কি হয়েছে বলতে পারি না। হয়ত এত বেশী আনন্দ...তুমিও কাঁদতে পার ! তুমি, দি ম্যান অভ্ আয়রণ ! চোখের জলের সঙ্গে আমার অন্তরের নিবিড় পরিচয় আছে।

আবার তিনি আমার কাছে উঠে এলেন—দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হলাম দু'জনে—আবার শুরু হ'ল ঘনিষ্ঠ ওষ্ঠ চুম্বন—স্থান, কাল, সময় সবকিছু বিস্মৃত হয়ে গেলাম।

হঠাৎ ব্যারনেস যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন—কাল্পনিক স্বপ্ন জগৎ ছেড়ে আবার যেন বাস্তবে ফিরে এলেন। বললেন—এবার যেতে হবে। আবার কাল দেখা হবে। যন্ত্রচালিতের মত আমিও উত্তর দিলাম—আবার কাল দেখা হবে।

———

শিল্পী কবি ই. ই. কামিংস্

জুল্‌ফিকার

●

দেহাৎ অল্পবয়সী নন, সত্তরের ওপর বয়স হ'ল প্রায়। শীর্ণ, ছোট-খাট লোকটি। বড় বড় চোখ, লম্বাটে মুখখানার কেমন একটা সন্দিগ্ধ ভাব। চেহারায় বেশ একটু গর্বের ছাপ। ন্যু ইয়র্ক সহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচে, একটা ছোট গলির ভিতর, পুরনো একখানা বাড়ীর এক তলার ঘরে, দীর্ঘ কয়েক যুগ একাদিক্রমে কাটিয়ে এসেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে শুধু ছবিই এঁকে গেছেন, তেল রঙে। মাঝে মাঝে চলেছে কাব্য-রচনা। নাটকও লিখেছেন দু'খানা। তা ছাড়া প্রবন্ধ—তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়।

বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেউ নেই।

সামাজিক জীবনের বড় একটা ধার ধারেন না।

ঘরে না আছে একটা রেডিও, না একটা টেলিভিশন সেট। রেডিও বা টেলিভিশন আদপেই সহ্য করতে পারেন না কামিংস; বলেন, 'ওরা আধুনিক জীবনের বিড়ম্বনা!' ইদানীং একরকম লেখাপড়া ছেড়েই দিয়েছেন। পড়াশোনার কথা উঠলে বলেন, 'I've my education'—অর্থাৎ 'পড়াশোনার পাট চুকিয়ে এসেছি হে'।

১৯১৫ সালে হারভার্ড থেকে সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোনোর সময় যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল, আজও তা একটুকু শিথিল হয় নি। কামিংস কোন একটা বিশেষ মতবাদ আঁকড়ে থাকা বা কোন একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাকে, আত্মবিকাশের পরিপন্থী জ্ঞান করতেন, তাই নিঃসঙ্গ বা দল-ছাড়া হওয়াটা তাঁর কাছে শুধু কাম্যই ছিল না, ছিল সাধনার অঙ্গ। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উপর পবিত্র বিশ্বাস তাঁকে আজীবন কঠোর সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে। বিদ্রূপ বা বিরূপ সমালোচনা তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। তাঁর এই অনমনীয় মনোভাব হচ্ছে 'ক্লাসিক ইয়াঙ্কি ট্রেট'—যেটা ছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের মধ্যে, ফ্রাঙ্কলিন, এডিসন এবং আরও অনেকের মধ্যে এবং যেটার প্রকাশ আমরা দেখেছি তরুণতম প্রেসিডেণ্ট স্বর্গত কেনেডির চরিত্রে।

সমালোচকেরা এ পর্য্যন্ত এডোয়ার্ড ইষ্টলীন (E. E.) কামিংসের লেখার প্রশংসা ও নিন্দা করে যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেগুলি পাশাপাশি তুলে ধরলে, তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সমালোচকদের ভাষায় তাঁর রচনা হচ্ছে—most powerful, arbitary, beautiful, ugly, experimental, explosive, incomprehensible (to many), admired and controversial.

●

যদিও সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে কামিংসের অনুরাগীর একান্ত অভাব ছিল না, তবুও বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর কবিতা কাব্যের আসরে একরূপ অপাংক্তেয়ই ছিল। অধিকাংশ সময়ই তা হাসি ও বিদ্রূপেরই খোরাক জুগিয়ে এসেছে। এ যাবৎ সমালোচকদের কাছ থেকে অনেক শ্লেষাত্মক আখ্যা পেয়েছেন, অনেক রকম কটু কথা শুনেছেন।

কিছুদিন আগেও তাঁকে সুখ্যাতি করবার মত লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

পুলিৎসার (Pulitzer) প্রাইজ কমিটিতে তাঁর দাবি অনেকবার উপেক্ষিত হয়েছে। কামিংস অবশ্য এর জন্য বিশেষ ক্ষোভ বা নৈরাশ্য বোধ করেন নি।

তিনি বলেছেন,—

'I'm individual.

In an age of standardization its almost impossible to express the attitude of an individual. If 180,000,000 people want to be undead ('undead' শব্দটি কামিংস-এর স্বরচিত। অর্থ : not dead but not alive also অর্থাৎ জীবন্মৃত that is their funeral, but I happen to like being alive.

কামিংসের লেখায় 'individual' শব্দটির প্রয়োগ খুব বেশী। ওঁর ধারণা individual হতে হলে জীবন্ত বা প্রাণবন্ত হওয়া চাই। ওঁর মতে বেশীর ভাগ লোকই individual নয় অর্থাৎ undead.

সব দেশেই সাহিত্যিকদের আপন আপন গোষ্ঠী বা group আছে। কামিংস কিন্তু কোন গোষ্ঠীভুক্ত নন (সাহিত্যিক বা শিল্পীদের এই গোষ্ঠী বা group কে কামিংস ঠাট্টা করে 'gang' বলেন)। প্যারীতে থাকাকালীন আরগেঁ, ব্রেতঁ ও পিকাসো গোষ্ঠীর লেখক, গায়ক ও শিল্পীদের সংস্পর্শে ও সাহচর্য্যে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল কিন্তু কোনো দলেই যোগ দেন নি তিনি।

কামিংস বলেছেন—

'They were group people, intellectuals. I was myself···If I had not known one soul in Paris it wouldn't have made the least difference. Right now I'd rather have two good friends than half a million admirers'.

●

কামিংস স্বভাবতঃই লাজুক প্রকৃতির, কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্কোচের ভাবটা ঢেকে রাখতে চান, রুক্ষ গাম্ভীর্য্যের আবরণে। কারো সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডা করবার বা বাক্-চাতুর্য্যে আসর জমিয়ে তুলবার মত দক্ষতা হয়ত তাঁর নেই, কিন্তু যখনই কোন নীতির প্রশ্ন ওঠে, তখন তাঁর অদম্য দৃঢ়তা সত্যিই বিস্ময়কর ভাবে প্রকাশ পায়।

জীবনভর কামিংস ষ্টাইলের সন্ধানে ফিরেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কি করে প্রকাশভঙ্গিকে নূতনতর ও প্রখরতর করে তোলা যায়। হারভার্ডে পড়বার সময় কীটস ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। কীটসের প্রভাব তার তরুণ মনটিকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল, তাঁর সে যুগের লেখার নমুনা থেকে এই প্রভাবটা স্পষ্টই বোঝা যায় (যদিও লিখন-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে তাঁর স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করবার মত),—

'Surely from robes of particolored peace
With month flower-faint and undiscoverd eyes
and dim slow perfect body amorous.'

হারভার্ডে কামিংস গ্রীক ভাষার বিশেষ পাঠ নিয়েছিলেন। গ্রীক (এবং কিছুটা ল্যাটিন) থেকে সংগৃহীত উপাদান নিয়ে নতুন আঙ্গিক তৈরীর কাজে লাগালেন। ···প্রথমতঃ, বড় হাতের অক্ষর বর্জ্জন (ক্লাসিক্যাল কোন বইয়ে বাক্যের প্রারম্ভে বড় হাতের অক্ষরের প্রচলন নেই এবং ইংরাজীতেই আছে)। কামিংস'I' (আমি)-র জায়গায় 'i' ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত একটা শব্দকে বিচ্ছিন্ন করে (Greek-এ যাকে বলে tmesis) তার মাঝে অপর একটা শব্দ বসিয়ে ব্যঞ্জনাকে গাঢ়তর করে তোলার প্রয়াস। loneliness-কে কামিংস লিখেছেন— l (a leaf falls) oneliness.

এ ছাড়া দু'টি শব্দের মাঝের ব্যবধান লোপ বা দু'টি শব্দের মধ্যে ফাঁকটাকে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি, অহেতুক কমার ব্যবহার বা কমার আগে-পিছে কোন ফাঁক না রাখা, ইচ্ছেমত শব্দের মধ্যে কমা বসিয়ে বা ছোট বড় হরফের সাহায্যে তাকে ভেঙে, তার অর্থকে প্রকট করে তোলবার অভিনব প্রচেষ্টা,—সবারই মধ্যে এই Greek Influence কাজ করছে।

এই শব্দ ভাঙা,—যাকে কামিংস বলেছেন 'স্ল্যাটারিং', তার একটা উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল—

'Sp RIN, k, Ling an instant with sunlight' Sprinkling শব্দটাকে যেন পাতার উপর গুঁড়ো করে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং অর্থটাও অনেক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একে বলা যেতে পারে typographical onomotopœia.

কামিংস লিখছেন,—

With up so floating many bells down'

এর সোজাসুজি অর্থ হচ্ছে 'with so many bells floating up and down', কিন্তু শব্দগুলো ওলট-পালট ভাবে বসানোয়, ব্যঞ্জনা তার মামুলী ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। সেই রকম

and our shining present must come to an end বলতে গিয়ে কামিংস বলছেন—

'and shining *this our now* must come to *then*'

our present-এর জায়গায় this our now এবং end-এর বদলে then ব্যবহার করে তিনি গতানুগতিক প্রকাশভঙ্গিতে একটা সতেজ নূতনত্ব আরোপ করেছেন।

কমার আগে পিছে জায়গা না ছাড়ার পরিকল্পনা কামিংসের স্বকল্পিত নয়। কামিংস যখন শব্দ ও চিহ্ন নিয়ে নানা প্রকার নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর কবিতা ঠিক ঠিক ছাপবার মত লোক পাওয়া সত্যিই কঠিন ছিল। একজন মুদ্রাকর স্যাম জেকবস্,—কেবল তিনিই নির্ভুল ভাবে ওঁর লেখা ছাপাতে পারতেন। জেকবস্ ছিলেন বিদগ্ধ লোক। তিনি বলেছেন—

'In fine old books, especially French ones, there was no space before and after a comma. A comma creates its our space. Mr. Cummings knows exactly what he's doing'.

কামিংস তাঁর লেখায় অনেক রকম উদ্ভট, বিভ্রান্তকারী আঙ্গিকের প্রয়োগ করেছেন—যেমন যুগপৎ দুইটি বিভিন্ন চিন্তার প্রবাহ, ক্রিয়ার স্থলে বিশেষ্যের প্রয়োগ এবং বিশেষ্যের বদলে ক্রিয়ার ব্যবহার, ইচ্ছামত চিহ্নের peneration) বিলোপ বা আমদানী, যতিহীন গায়ে গায়ে বসা শব্দ অথবা বিভক্ত শব্দ সম্বলিত বাক্য—যা পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে কামিংসের টেকনিকের সঙ্গে একবার যার ভাল করে পরিচয় ঘটেছে তার পক্ষে ওঁর কবিতার অর্থোপলব্ধি করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। কামিংসের নতুন, বেয়াড়া ঢংএর অনুকরণে, বহু ব্যঙ্গ রচনা বার হয়েছে সাহিত্যিক পত্রিকাগুলিতে, অনেক শ্লেষাত্মক কটাক্ষও অজস্রভাবে বর্ষিত হয়েছে তাঁর উপর। সম্পাদকেরা যখনই কোন মজাদার লেখা দিয়ে পাঠকদের হাসাতে চান, 'they send out a reporter to do a piece on mock Commings-ese'.

●

কামিংসের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বাইরের—ভাষারীতির মধ্যেই তা নিবদ্ধ ভাবের রাজ্যে কোন নতুন ঢংএর প্রয়োগে তিনি তাঁর কাব্যের অর্থকে ঘোরালো, দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট করে তুলতে চান নি। তাঁর রচনায় নেই কোন সিম্বলিজমের বালাই, ক্রয়োডিয়াম মন বিশ্লেষণের কারসাজি কিংবা স্যুররিয়ালিজম বা ফিউচারিজম প্রভৃতি অতি আধুনিক শিল্প-রীতির বিহ্বলকারী মারপ্যাঁচ। বস্তুতঃ তিনি রোমাণ্টিক, প্রাচীনপন্থী কবি। তার কবি মানস শেলী, কীটসের ঐতিহ্যেই গড়ে উঠেছে। সাহিত্য ও শিল্প জগতের বিপ্লব ও নব নব আন্দোলনের মধ্যেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নি।

সমসাময়িক কোন কবির লেখাই কামিংসের ঠিক মনঃপূত নয়, এক এজরা পাউণ্ডের কবিতা ছাড়া। পাউণ্ড সম্বন্ধে কামিংস খুব উচ্চ ধারণাই পোষণ করেন। তিনি বলেছেন,

'Everybody in my generation is in debt to pound. He was to the poetry of this country what Einstein was to Physics.'

বসন্ত, চাঁদ, প্রকৃতির শোভা, প্রেম, আত্মার রহস্য—কামিংসের কবিতার উৎসের মূলে এরাই রয়েছে। তবে তিনি আগের দিনের উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। ভাব অনেক ঘনীভূত হয়েছে এখন, লেখায় এসেছে একটা গভীরতা, একটা প্রজ্ঞার ছাপ। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্য-গ্রন্থ (95 POEMS) পড়লে এটা বেশ বোঝা যায়।

তাঁর তরুণ বয়সের লেখা কবিতা ও আজকালকার কাব্য রচনার পার্থক্যটা বোঝা যাবে নীচের দুটো উদ্ধৃতি থেকে :

in Just—
Spring when the world is mud—
— luscious the little
lame ballonman
whistles far and wee
and eddieandbill come
running from marbles and
piracies and its
spring
when the world is puddle wonderful,.

এটা একটা লিরিক। বসন্ত এসে গেছে বোঝাবার জন্যে, 'Just spring' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। Lame Balloonman হচ্ছেন Pagan God Pan—তাঁরই বাঁশী শুনে যেন পঙ্ক সরস (mud-luscious) কাদা জলভরা

গর্ভে সমাচ্ছন্ন আশ্চর্য্য পৃথিবীর (puddle wonderful) লোকেরা (eddieandbill—Eddie and Bill) চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা মার্বেল প্রাসাদ ছেড়ে বাঁশীর ধ্বনিকে অনুসরণ করে ছুটতে চায়। পরবর্তী কালের লেখাটাও বসন্ত ঋতুর উদ্দেশে—

In time of daffodils (who know
the goal of lining is to grow)
forgetting why, remember how...

কিন্তু এ লেখাটা বাহুল্য-বর্জ্জিত। উচ্ছ্বাসের পরিবর্ত্তে এখানে একটা দার্শনিকতার সুর জেগে উঠেছে।

কামিংসের শেষ বয়সী লেখায় আমরা যে সংযম বা দৃঢ় ভাবণের পরিচয় পাই, তার নীচের দুই ছত্রে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

He sharpens is to am
he sharpens say to sing.

(অন্তার্থ : মানুষকে তিনি নগণ্য প্রথম পুরুষ থেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উত্তম পুরুষে রূপান্তরিত করেন। তিনি কথাকে করে তোলেন সংগীত।)

অথবা

Precisely as unbig a why as i'm,
(almost to, small for death because to find)
may, fair perfect mercy, live a dream

[টীকা :—

as unbig a why as i'm :
Even so small a why—a nothing, a cipher, an unanswered question like myself.

(যা শূন্যের মতই তুচ্ছ, যা আমার নিজেরই মত অকিঞ্চিৎকর নিরুত্তর প্রশ্ন)

আন্তার্থ : মৃত্যুর চরমতা যে ক্ষুদ্রকে খুঁজে পাবে না, তারও সূত্র বিধাতার কৃপায় একটা আদর্শের মধ্যে রূপান্বিত হয়ে উঠবে]

●

কামিংসের কাব্যে যেমন একটা paganism-এর সুর রয়েছে, তেমনি রয়েছে গতানুগতিকতার মোহ কাটিয়ে ওঠবার আগ্রহ,—একটা বিদ্রোহের উদ্ধতভঙ্গি। কিন্তু এই বিদ্রোহের প্রেরণা তাঁকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত করে তোলে নি। যদিও আধুনিক জগতের অন্তঃসারশূন্যতা ও স্বার্থপরতায় তার মন অনুক্ষণ পীড়িত, তবুও ঈশ্বর বিশ্বাসে তিনি অবিচল। তাঁর কবিতায় তিনি যেমন তীক্ষ্ণ পরিহাস করেছেন, নির্মম আঘাত হেনেছেন আজকাল মানুষদের প্রতি, ঘৃণা ও নৈরাশ্যে গালিগালাজ দিয়েছেন তাদের, তেমনি ভগবানের কাছে প্রণতিও জানিয়েছেন বিনম্র ভক্তিতে, অপরূপ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে :

i thank You God for most this amafiing
day : for the leaping greenly Spirits of
tryse
and a blue true dream of sky ; and for
everything
which is natural which is infinite which
is yes
how should any tasting touching
hearing seeing
breathing any—lifted from the ho
of all nothing—human merely being
doubt unimaginable You ?

●

প্রেইরীর পশুপালক বা র‍্যাঞ্চারদের (Rancher) মধ্যে একটা শব্দের চল আছে—maverick, অর্থ অচিহ্নিত (unbranded) বাছুর অর্থাৎ বেওয়ারিশ পশু। Cummings সম্বন্ধে Schonberg বলেন—

In poetic circles in the United states, he is a maverick

(অর্থাৎ বিশেষ কোন দলের চিহ্ন তার গায়ে নেই।)

He is to this century somewhat as Walt whitman was to the nineteenth. His importtance to the twentieth century is to secaen if only for the poat that he, more than any other American poet, helped to free the language.'

ম্যারিয়ান মুর আমেরিকার কাব্য-জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তিনি বলেন আজকালকার অনেক তরুণ কবির কাব্যেই

তিনি কামিংসের প্রভাব দেখতে পান; অনেকক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারেই এটা এসে পড়েছে ওদের লেখায়।

বলতে গেলে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত কামিংস একরূপ অনাদৃতই ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর ভাগ্যে সরকারী স্বীকৃতি মেলে নি (অবিশ্যি এর প্রত্যাশাও তিনি করেন নি কখনও)। কিন্তু কিছুদিন হ'ল তাঁর প্রতি রাষ্ট্রের সুদৃষ্টি পড়েছে।

১৯৫২-৫৩ সালের জন্য হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্লস এলিয়ট নর্টন অধ্যাপকের পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। কামিংসের বক্তৃতাগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, ছাত্র মহলেও তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনতে তাঁর বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের ভিড় জমত।

কামিংস American Academy of Poets-এর সদস্য মনোনীত হয়েছেন কবিতার জন্য Bollingen Prizeও মিলেছে তাঁর ভাগ্যে।

চার্লস নরম্যান এডওয়ার্ড কামিংসের জীবনী লিখেছেন। ১৯৫৮ সালে সমালোচক ও অধ্যাপক নরম্যান ফায়েডমান তাঁর কাব্যের বিশদ আলোচনা করে বই বার করেছেন।

আজকাল কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, কনরাড অয়কেন, এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট, ডব্লু. এইচ. অডেন ডাইলান টমাস উইলিয়াম কারলস, হার্ট ক্রেন, রবার্ট ফ্রষ্ট প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিদের সঙ্গে কামিংসও আমেরিকার কাব্য-জগতে একটি বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন।

হারকোর্ট ব্রেস এ্যাণ্ড কোম্পানীর উইলিয়ম যেভানোভিচ তাঁর ১৯২৩-৫৪ সালের কবিতাসংকলনের ৪৬৮ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইখানির বেশ কাটতি হচ্ছে। সাধারণতঃ কবিতার বইয়ে প্রকাশকদের বিশেষ কিছু লাভ থাকে না (শুধু এ দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও), কেননা কাব্য পড়বার ও বুঝবার মত উৎসাহী পাঠকদের সংখ্যা সব দেশেই সীমিত।

কামিংস শুধু কবিই নন, একজন উঁচুদরের চিত্রকর। তাই তাঁর বই ছাপার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র সৌন্দর্য্য হানি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর জন্যে প্রকাশকদের অনেক সময় পাতাকে পাতা বাদ দিয়ে ফের নতুন করে বই ছাপতে হয়। প্রকাশকদের তাঁর বই ছাপতে বেশ ঝামেলা খানিটা পোয়াতে হয়, যেমন তাঁর 95 POEMS ছাপতে জেরাল্ড প্রেসকে হয়েছিল।

কামিংস ও তাঁর স্ত্রী মেরিয়ান বেশীর ভাগ সময় গ্রীনিচ পল্লীতেই কাটান। গ্রীষ্মকালে চলে যান নিউ হাম্পসায়ের পৈতৃক খামার বাড়ীতে। বছরের তিন—চার মাস কামিংসকে একাই থাকতে হয়। তাঁর গ্রামের বাড়ীর ওপর তলার ছোট্ট একটা কুঠুরীতে তাঁর ষ্টুডিও। এখানে বসে ছবি আঁকেন কামিংস।

লেখার মত তাঁর ছবিতেও একটা বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষিত হয়। তুলির টানে একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচের আভাস নেই। বর্ণ সমাবেশের ব্যাপারেও হার্মনির অভাব নেই কোথায়ও!

মোট কথা তিনি একজন আত্মপ্রত্যয়ী শিল্পী।

কবিতার মত ছবিতেও তাঁর কোন হিং টিং ছোট গোছের অতি আধুনিক বস্তুনিরপেক্ষ আর্টের দুর্ব্বোধ্যতা বা তির্য্যক ভঙ্গির স্পর্শ লাগে নি। ফ্যাসানের মোহ তাঁর নেই, তিনি চালিত হন প্যাশনে, হৃদয়ের সহজাত অনুভূতির স্পন্দনে। কোন জটিল পথে তাঁর গতি নয়,—তাঁর দৃষ্টি ঋজু, স্বচ্ছ ও গভীর।

—০—
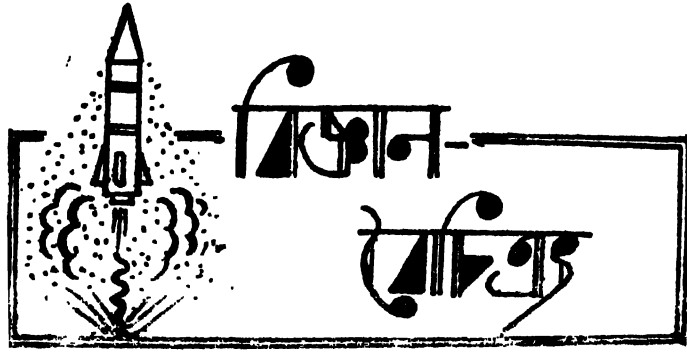
এ যুগের সাগরিকা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মানুষ আজ মহাকাশে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে চাঁদ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ বিজয়ের কথা চিন্তা করছে, স্বপ্ন দেখছে তাদের রহস্যজাল ছিন্ন করবার। কিন্তু এই পৃথিবীরই বৃহত্তর অংশে যে সাগর মহাসাগর রয়েছে সেগুলির তলায় ঐসব গ্রহ-উপগ্রহের তুলনায় কোন অংশে কম রহস্য নিহিত নেই। অথচ সমুদ্র নিয়ে রীতিমত গবেষণা এই সবে সুরু হয়েছে। সত্যি বলতে কি, কাছের সমুদ্রে এবং দূরের মহাকাশে মানুষ অভিযানে বার হয়েছে প্রায় একই সময়ে। এখনো আমরা চাঁদের পিঠ সম্পর্কে যতটুকু জানি ভারত মহাসাগরের তলা সম্পর্কে জানি তার চেয়েও কম।

সামরিক ইত্যাদি অশুভ উদ্দেশ্যের কথা যদি ধরা না যায়, তা হ'লে একথা বলা অন্যায় হবে না যে, মহাশূন্য ও মহাসাগর দুইই ভবিষ্যতে মানুষের বহু উপকারে আসবে। তাই বৈজ্ঞানিকরা হালে বলতে সুরু করেছেন যে, পৃথিবীর স্থলভাগের মতই সমুদ্রেও চাষবাস করা যাবে, কল-কারখানা ও খনিশিল্প খাড়া করা যাবে। এত দিন বৈজ্ঞানিকরা প্রধানত বিজ্ঞান ও ভূগোল শাস্ত্রের স্বার্থে সমুদ্রে অভিযান চালাতেন। এবার তাঁরা জোর দিচ্ছেন সমুদ্রবিদ্যার অর্থনৈতিক গুরুত্বের উপর।

মহাসাগরের খাদ্য, ধাতু, রসায়ন ও শিল্পসম্পদ অনিঃশেষণীয়। সমুদ্রের অফুরন্ত জল প্রথমে নির্লবণ করে অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর একদিন সাগরজল থেকে মানুষ তাপ-পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন করে কারখানা-শিল্পের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পরিচালিকা শক্তি সরবরাহ সুনিশ্চিত করবে। পৃথিবীতে আর্দ্র অঞ্চলের চেয়ে ঊষর অঞ্চল অনেক বেশি। সমুদ্রের জল থেকে নুন বার করে নিয়ে সেই জল ঊষর অঞ্চলে বইয়ে দিতে পারলে বিশ্বে কৃষির যে উন্নতি হবে তা আজ কল্পনাতীত। সেই সঙ্গে নুন সরবরাহ কত বেড়ে যাবে সেটা বোঝা যায় যখন ভাবি যে, সমুদ্রের সমস্ত নুন মাটিতে এনে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিলে এক ১৫৩ মিটার উঁচু নুনের স্তরে গোটা পৃথিবীটা চাপা পড়ে যাবে। সমুদ্রে দ্রবীভূত অন্যান্য ধাতব পদার্থ উদ্ধার ও শুকনো করে যদি সেই নুনের স্তরের উপর ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে সবশুদ্ধ স্তরটি ২০০ মিটার উঁচু হয়ে যাবে।
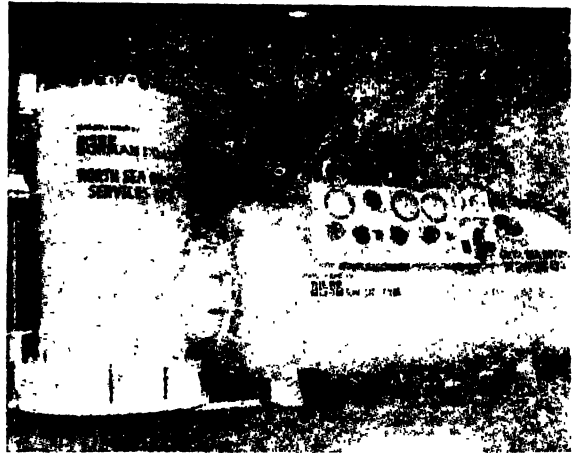
কিন্তু স্থলের তুলনায় সমুদ্রে এই সব খনিজ সম্পদ অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে বলে আহরণ করার অসুবিধা। ভূগর্ভের এক একটি জায়গায় এক এক রকমের খনিজ পদার্থের আকর। সেখান থেকে তুলে নিলেই হ'ল। কিন্তু সমুদ্রে সেগুলি মিলেমিশে সব

জায়গায় ছড়িয়ে বেড়ায়। তেমনি আবার অন্য দিক থেকে বলা যায় যে, ভূগর্ভের খনিজ সম্পদ ক্রমাগত আহরণের ফলে কিছুদিন বাদে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কিন্তু সমুদ্র থেকে যে সব পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলি নদীর জলে আবার নতুন করে ভেসে এসে সমুদ্রে পড়ে বলে আহরণের ফলে শেষ হয়ে যাবার ভয় নেই। পৃথিবীর সমস্ত নদীর জল মিলিয়ে বছরে এই ভাবে মহাসাগরগুলিকে প্রায় ৩২০ কোটি টন খনিজ পদার্থ উপহার দেয়। সেই জন্য মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সমুদ্র থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে যেতে পারবে বলে বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন।

সমুদ্রের নীচের জমিতে প্রথম খনিজ পদার্থের আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকের নাম। ১৮৭২ সালে আবিষ্কৃত সেই ধাতুপিণ্ডগুলি আয়তনে ছিল আলুর মত। সেগুলির প্রধান উপাদান ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড (শতকরা ৫০ ভাগ)। এ ছাড়া কোবাল্ট ২ শতাংশ এবং নিকেল ও তামা ১ শতাংশ। এক একটি পিণ্ডের বাজারে দাম হবে ৪০ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত। রুশ সমুদ্র বিজ্ঞানী মাদাম কর্স্যাকোভার মতে প্রশান্ত মহাসাগরের মেঝের ১০ শতাংশে ম্যাংগানিজ পিণ্ডের অবস্থিতি। অনেকের হিসাবে সেখানে প্রতি বর্গ মাইলে দেড় থেকে দুই লক্ষ টন ম্যাংগানিজ পিণ্ড আছে। এ ছাড়া খনি গাড়বার অনুকূল এলাকায় ফসফরাইট
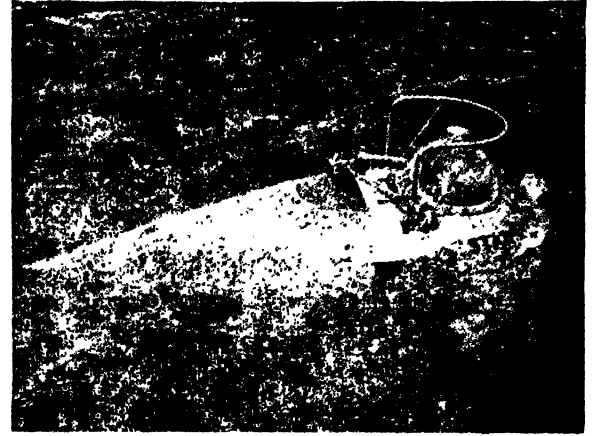
পিণ্ডের সন্ধান মিলেছে যেমন ক্যালিফর্ণিয়া উপকূলের কাছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত খনি শিল্পপতিরা সমুদ্রের বুকে তৈলখনি উদ্ঘাটনে যতটা উৎসাহ দেখিয়েছেন, অন্যান্য

ধাতুর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার জন্য ততটা দেখাচ্ছেন না। কোথাও কোথাও জলের তলায় ৩৬০ ফুট পর্যন্ত নীচে তৈলখনি চালু হয়ে গিয়েছে, অনুসন্ধান কার্য চলছে ৬০০ ফুট নীচে পর্যন্ত। আরও গভীরে যাওয়ায় অবশ্য অসুবিধা আছে আপাতত, কারণ ডুবুরীদের পক্ষে অত নীচে খনির ইউনিটগুলি সড়গড় রাখা কঠিন। তবে হালে হিলিয়াম ও অক্সিজেন মিশিয়ে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ছাড়া বর্মের মত পোষাক, ইত্যাদি নানা সাজ-সরঞ্জাম উদ্ভাবিত হচ্ছে তাদের জন্য।

পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কাছে সমুদ্রের সোনাদানা বা ধাতুসম্পদের চেয়ে খাদ্যসম্পদ অনেক বেশি মূল্যবান। দুনিয়ার এক বিরাট অংশে প্রোটিন খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। একমাত্র জাপানে বেশ ব্যাপকভাব সাগরজ খাদ্য ব্যবহার হয়। কিন্তু ভারত মহাসাগরের আশপাশের অনাহার-অর্দ্ধাহার-ক্লিষ্ট দেশগুলিতে সামুদ্রিক খাদ্যের ব্যবহার নেই বললেই চলে। অবশ্য সমুদ্রে যত খাদ্য আছে তার চেয়ে খাদকের সংখ্যা বেশি। পৃথিবীর জলভাগে যেক্ষেত্রে মোট জলজ উদ্ভিদ আছে ১৭০ কোটি টন সেক্ষেত্রে জলচর প্রাণী আছে মোট ৩২৫০ কোটি টন। স্থলভাগে ব্যাপারটা এর বিপরীত। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। সমুদ্রের এককোষী উদ্ভিদ অ্যালগির চাষ করে মানুষ বিপুল পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। বর্তমানে মাছ, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি সব রকমের জীব মিলিয়ে পৃথিবীর সমুদ্রগুলির বাৎসরিক উৎপাদিকা শক্তি মোটামুটি ১০০০০ টনের মত।

রত্নাকরের রত্ন উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের তলায় দূর-নিয়ন্ত্রিত খনি ও কলকারখানা স্থাপনের স্বপ্ন দেখছেন বিজ্ঞানীরা। সেখানে যে একদিন 'সহর' গজিয়ে উঠবে না এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? এর মধ্যেই একটি অভিনব পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে ওদেসা বন্দরের কাছে কৃষ্ণসাগরের জলে। ডুবুরীরা সেখানে জলের তলায় বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে সামুদ্রিক উদ্ভিদের বীজ লাগায়। এক সপ্তাহের মধ্যে গাছগুলি ৩ মিটার লম্বা হ'লে সেগুলি কেটে ডাঙায় নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে 'প্রোসেস' করে দেখা যায় যে, স্থলজ গাছপালার তুলনায় সেই জলজ উদ্ভিদ থেকে দশগুণ বেশি জৈব পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং সমুদ্রের নিচে এই ভাবে জলজ উদ্ভিদ চাষ করে তার ভিত্তিতে সমুদ্রের ধারে কাঠের কারখানা চালু করলে চমৎকার ফল পাওয়া যেতে পারে, কারণ সমুদ্রের জল নিচে আলো ও উত্তাপের অভাব কোন সময়ই হবে না, সেখানে বরফ পড়ে বা আগুনে বাতাসে গাছ নষ্ট হবে না। শুধু তাই নয়। মাটিতে তক্তা-শিল্পের খোরাকের জন্য একটি জঙ্গল তৈরি করতে লেগে যায় ১০০ বছর। কিন্তু জলজ উদ্ভিদ মাত্র ১ বছরে ৫০ বার ফলন দেবে! তাই বারেন্তস্ সাগরে (রাশিয়া) ইতিমধ্যেই ঐ রকম একটি কারখানা খাড়া করা হয়েছে।

সমুদ্রের জলে যে প্রাকৃতিক শক্তি নিহিত রয়েছে তাও মানুষ ব্যবহার করে শেষ করতে পারবে না। পৃথিবীর সমস্ত নদীর জলের নিহিত শক্তির পরিমাণ যে ক্ষেত্রে ৮৫ কোটি কিলোওয়াট সেক্ষেত্রে সমুদ্রের জোয়ারের মধ্যে রয়েছে হাজার কোটি কিলোওয়াট। পৃথিবী চাঁদ ও সূর্যের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে এই যে জোয়ারের সৃষ্টি—এর শক্তি সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কমতে থাকবে না। তাই দেশে দেশে উজান-চালিত বিজলী ঘর নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মুর্মানস্ক সহরের কাছে ঐ রকম একটি হাজার কিলোওয়াট পরীক্ষামূলক স্টেশন আজ নির্মীয়মান এবং শ্বেতসাগরে আর একটি ১ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোওয়াট স্টেশন নির্মাণের প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। জোয়ার ভাঁটা ছাড়াও সমুদ্রের জলের উপরের ও নিচের স্তরের মধ্যে তাপমাত্রার যে পার্থক্য হয় তাও এক অফুরন্ত শক্তির উৎস যদিও সেটি নিয়ে এখনও বিশেষ কিছু কাজকর্ম হয় নি।

সমুদ্রের 'প্ল্যাংকটন' জাতীয় উদ্ভিদগুলির এক বিরাট ভূ-রাসায়নিক ভূমিকা রয়েছে। সেগুলি বছরে ৩৬০০ কোটি টন অক্সিজেন উৎপাদন করে এবং শরীরে গ্রহণ করে ৪০০০ কোটি টন নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ, ৫০ কোটি টন ফসফরাস এবং ১২০ কোটি টন লোহা ও অন্যান্য দ্রবীভূত ধাতু। পৃথিবীর গোটা জলভাগে এককোষী প্ল্যাংকটনগুলি সমুদ্রের জল থেকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ লোহা প্রতিবছর নিকাশ করে নেয় তা পৃথিবীর সমস্ত লোহার কারখানার মোট উৎপাদনের বহু গুণ বেশি।

সমুদ্রগর্ভে নিহিত গণনাতীত রহস্য ও সমস্যার যে কোনটি নিয়ে গবেষণায় সাফল্যলাভ করতে গেলেই মানুষকে ক্রমশ সমুদ্রের বেশি করে গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আজ আর জাল ও মামুলী যন্ত্রপাতির দিন নেই। আজ দেশে দেশে বৈজ্ঞানিকরা নানারকমের ডুবো গবেষণাগার তৈরি করে সমুদ্রের তলায় কাজ করছেন। এই ধরণের ডুবো লেবরেটরী প্রথম তৈরি করেন সুইস বিজ্ঞানী অগাষ্ট পিকার্ড। জাহাজটির নাম 'ট্রিয়েস্ট'। তারপর আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি

দেশে ঐ ধরনের ডুবো জাহাজ তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। এগুলিকে বলা হয় 'সাবমার্সিব্‌ল্' এবং 'সি-ল্যাব'। আমেরিকার 'অ্যালুমিনাট্‌' নামে সি-ল্যাবটি ১৫০০০ ফুট নিচে নামতে পারে। 'ডুবো-পীরিচ' নামে আর একটি চলমান সাবমার্সিব্‌ল্ আছে যেটি একজন সঁতারুর মত অক্লেশে জলের তলায় ঘুরে বেড়াতে পারে। ফরাসী নৌবহরের প্রাক্তন অফিসার জ্যাক কস্তো এক অভিনব ডুবো-বাসা উদ্ভাবন করে তার নাম দিয়েছেন 'তারামাছের বাসা।' লোহিত সাগরের ৯০ ফুট নিচে সেইরকম একটি বাসায় গবেষকরা এক সপ্তাহ ধরে কাজ করেন, আর এক জায়গায় তাঁরা জলের ৩৬ ফুট তলায় ছিলেন ১ মাস। মার্কিন নৌবহরের মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন জর্জ বণ্ডের সি-ল্যাবে ৪ জন লোক বাহামার কাছে জলের ১৯০ ফুট নিচে গবেষণা চালান। তারপর ১৯৬৫ সালে তাঁর অধীনের ১০ জন কর্মী ক্যালিফর্ণিয়ার কাছে জলের ২০৫ ফুট নিচে ছিলেন দুই সপ্তাহ ধরে।

রাশিয়ারও ঐ ধরনের ডুবো-গবেষণাগার আছে। সেখানে 'ক্র্যাব-২' নামে যে ছোট্ট একটি ডুবো-লেবরেটরী তৈরী হচ্ছে, যার মধ্যে থাকবে দু'জন চালক-গবেষক। এই ধরনের ছোট্ট ডুবোজাহাজ পাশ্চাত্যে তৈরি করেছেন এড্‌উইন লিংক, যার নাম দেওয়া হয়েছে, "ম্যান-ইন-সী।" রাশিয়া সেভেরিয়াংকা নামে যুদ্ধের এক ডুবো-জাহাজকে সাগর-বৈজ্ঞানিক জাহাজে রূপান্তরিত করেছে যা আর কোন দেশে করা হয় নি।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে মানুষ আজ চাঁদের পিঠের চেহারা ও চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছে ভারত মহাসাগরের মেঝে সম্পর্কে ততটুকুও জানে না। তাই মানুষের কল্যাণের স্বার্থে মহাসাগরতলের রহস্য-জাল ছিন্ন করবার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর।

রাত্রির তপস্যা ব্যর্থ

জগদানন্দ বাজপেয়ী

"সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল নৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারই কাছে আসে,"

হে সন্ন্যাসী, এই বীরবাণী
একদিন যে জাতির কাণে
শোনাইলে বজ্রের নির্ঘোষে
আজ সে ভুলেছে তার মানে।

সে বাণীর বিদ্যুত পরশ
তরঙ্গিল শিরায় শোণিতে,
দ্রুততর রক্তের স্পন্দনে
ছন্দ তার লাগিল ধ্বনিতে।

যুগান্তের জড়ানিদ্রা ঘোর
চক্ষু হতে চাকতে টুটিল,
অন্ধকার নিশার নিকষে
অরুণিমা বুঝি বা ফুটিল!

তন্দ্রাহত ভারতে বুঝি বা
জাগে নব জীবন প্রভাত,
কোথা হতে কুহেলী আঁধার
আবরি আসিল আকস্মাৎ!

অপগত অমারাত্রি, তবু
প্রভাতের কুহেলিকা জালে
উদয় উন্মুখ ভানু বুঝি
অস্ত যায় দিকচক্রবালে।

ঘুম হতে জাগিল যাহারা
জীয়ন-কাঠির পরশনে
লঘু স্বচ্ছ কুহেলী আঁধারে
রাত্রি ভাবি তারা পরক্ষণে

অলস শয্যার পরে পুন
লুটিয়া পড়িল তন্দ্রালীন,
রাত্রির তপস্যা তাহাদের
আনিয়াও আনিল না দিন

দাদাজী

যাঁদের করি নমস্কার (১)

শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়

হু হু করে এগিয়ে আসছে শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনী। সামনে যা পড়বে গুঁড়িয়ে দেবে তাকে। একটি কিশোর পিঠে 'মাইন' বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ট্যাঙ্ক আরও একটু এগিয়ে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার সামনে।

ইংরাজ সৈন্য এগিয়ে আসছে—আসছে তার ট্যাঙ্ক সকলের আগে। সমস্ত বাধা ভেঙে পথ পরিষ্কার করে দেবে। তার পিছনেই আছে অগণিত ব্রিটিশ সেনা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড শব্দ। সর্বপ্রথম যে ট্যাঙ্কটি আসছিল তা অচল হয়ে গেছে। সারা পথ জুড়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পিছনের ট্যাঙ্কগুলি আর এগিয়ে আসার পথ পায় না। তারা আপনা থেকেই অচল।

কিন্তু, ব্যাপারটা কি ঘটল? ঐ যে কিশোরটি। সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ট্যাঙ্ক বাহিনীর সম্মুখে। তার পিঠে বাঁধা ছিল যে 'মাইন' তা প্রচণ্ড শব্দ করে ফাটল। আর, ঐ সঙ্গে ট্যাঙ্কটির যন্ত্রপাতি একেবারে বিকল হয়ে গেল। কিন্তু ঐ কিশোরটি! সে গেল কোথায়! সে মিশে গেল মাটির সঙ্গে। ছড়িয়ে দিয়ে গেল আকাশে বাতাসে তার প্রাণের জয়গান—জয়হিন্দ—নেতাজীর জয়।

এই নেতাজীকে তোমরা সবাই চেন। প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারী দিনটি তোমরা যে পালন কর সে এই নেতাজীকে স্মরণ করেই।

আমাদের দেশের প্রিয় নেতা শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ থেকে চলে যান। তারপর, অনেকদিন পরে আমরা তাঁর সন্ধান পাই।

আমাদের দেশের বাইরে গড়ে ওঠে আজাদ-হিন্দ ফৌজ। যে সব ভারতীয় সৈন্য ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে জাপানের হাতে বন্দী হয় তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে এই আজাদ-হিন্দ ফৌজ। সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই ফৌজের সর্বাধিনায়ক। ফৌজের সকলে তাঁকে গ্রহণ করেছিল নেতাজী নামে।

নেতাজীর ডাকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিল। কিশোর, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ তাদের জাতি ধর্ম ভুলে গিয়ে প্রাণ দেওয়ার উৎসবে মেতে উঠল। যার যা ছিল সমস্ত কিছু নেতাজীর পায়ে সঁপে দিল।

নেতাজী তাঁর ফৌজের সৈন্যদের বলেছিলেন—'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। আরও বলেছিলেন—তোমাদের তিনটি কাজ। প্রথম কাজ, পা বাড়াও; দ্বিতীয়, জয়হিন্দ বল; তৃতীয়, মর।

সেদিনের সে যুদ্ধ থেমে গেছে আজ। এখন আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন। কিন্তু, আমাদের নেতাজী কোথায়! আমাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে এল। নেতাজী ফিরে এলেন না।

তিনি যেখানেই থাকুন, এস, আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি আর একস্বরে বলি—নেতাজী, ফিরে এস।—এস ফিরে।

প্রাচীন ভারতের পার্থিব বিষয়ক উন্নতি

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন

আমেরিকা হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পুস্তক The Greek Way to Western Civilisation-এর লেখিকা শ্রীমতী Edith Hamilton উক্ত পুস্তকের এক স্থলে গ্রীক সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করিয়াছেন, এবং তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, জাগতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীগণ বাস্তবকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া যুক্তিবিহীন মানসিকতার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং এই ভাবেই তাহারা শত শত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। সুতরাং, লেখিকার মতে, প্রাচীন ভারতের সত্যানুসন্ধিৎসা কখনই বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, কারণ ভারতীয়েরা জানিতেন যে বহির্জগতের সকল কিছুই মিথ্যা মায়া এবং সেখানে সত্যের লেশমাত্র নাই। অতএব তাহারা যুক্তির কোনও ধার না ধারিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী চক্ষু নিমীলনপূর্বক নিছক আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধানই করিয়াছেন। মূলতঃ লেখিকা ইহাকে পলায়নী মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়াছেন; বলিয়াছেন, কঠিন কঠোর বাস্তবের সহিত সংগ্রাম করিবার অনিচ্ছা বা অক্ষমতা হইতেই এই হতাশ যুক্তি-বিবর্জিত অন্তর্মুখিতার জন্ম। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য বাস্তব জগত হইতে সহস্র যোজন দূরে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করা।

Edith Hamilton প্রখ্যাত ব্যক্তি নহেন, কিন্তু তাঁহার এই উল্লিখিত পুস্তকটি আধুনিক প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে অবশ্যই বহুপঠিত। অপর একটি কারণেও বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাহা হইতেছে অধুনা এই জাতীয় উক্তির প্রাচুর্য স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, এবং নির্বিচারে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে 'contemplative', 'idealistic' 'spiritual', 'mystic' প্রভৃতি নানাবিধ ইঙ্গিতপূর্ণ বিশেষণ সর্বদাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেন ভাববাদী এবং অধ্যাত্মবাদী দর্শনের অভিব্যক্তিই এই সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী বিশাল সভ্যতার একমাত্র অভিব্যক্তি; যেন দর্শন ও নৈতিকতার বাহিরে জীবনের অন্যান্য বাস্তব ক্ষেত্রে ও কর্মে প্রাচীন ভারতের উদ্যমশীলতার একান্ত অভাব ছিল।

আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখা দরকার যে, মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ব্যতীত এই পাঁচ হাজার বৎসরব্যাপী দীর্ঘায়ত সভ্যতার ভিত্তি কখনই দৃঢ়মূল রহিত না; বাস্তবতার সহিত—বিজ্ঞান ও কর্মের সহিত সম্পর্ক-রহিত হইলে ইহা বহুপূর্বেই কালের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতার একটি বিস্ময়কর কৃতিত্ব হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চেতনার মধ্যে একটি ভারসাম্য সামঞ্জস্য স্থাপন। প্রাচীনকালে এই দেশ যেমন দর্শন শাস্ত্রে ও তত্ত্বজ্ঞানে মানসিক উন্নতির ঊর্দ্ধসীমায় পৌঁছিয়াছিল, তেমনি পার্থিব বিষয়ে এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক অনুসন্ধান এবং তাহার প্রয়োগকার্যে তদনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের লক্ষ্য ছিল সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। তাহারা পার্থিব বিষয়ের জ্ঞানলাভের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছে, বাস্তবের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিয়াছে।—ইহা অস্বীকার করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। কারণ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে, গ্রীক সভ্যতার পতনের পরে মধ্যযুগ অবধি ইউরোপে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হইত, যাহার উপরে নির্ভর করিয়া কালক্রমে নবজাগৃতির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যদেশে বস্তুতান্ত্রিক আধুনিক যুগের পত্তন হয়, তাহা বহুলাংশে প্রাচীন ভারতে লব্ধ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং গ্রীসীয় ও আরবীয় সভ্যতার অবদান বলিয়া কীর্তিত বহু গবেষণাকার্য মূলতঃ ভারতেই সম্পন্ন হইয়াছিল; পরবর্তীকালে গ্রীক এবং আরবী পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহা ইউরোপে প্রচারিত হয় মাত্র। তৎকালে আফগানিস্থান হইতে এশিয়া মাইনর অবধি প্রসারিত ভূখণ্ড গ্রীক সামন্তশক্তির শাসনাধীনে ছিল; ভারতীয় সভ্যতার ধারা তাহারাই প্রথম পাশ্চাত্ত্যদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়। পরে আরবীয় বণিকদের বাণিজ্যপথ অবলম্বন করিয়া উহা আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে যাইয়া নূতন যুগের স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বিশ্বখ্যাত গবেষক উইল ডুরাণ্ট বলেন, ভারতীয় সভ্যতাই এশিয়া এবং ইউরোপের সভ্যতাসমূহের উৎস স্থান। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি বলেন, ভারত

যেন এক আলোকবর্তিকা যাহা হইতে এশিয়া এবং ইউরোপ তাহাদের নিজ নিজ দীপগুলি প্রজ্বলিত করিয়া লইয়াছিল। অবশ্যই টয়েনবি কথিত এই আলোকবর্তিকা শুধু মায়া এবং প্রপঞ্চের দীপ্তিমাত্র নয়, ইহা নিঃসন্দেহে যুক্তিবিজ্ঞান, বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান এবং কর্মের উজ্জ্বল অগ্নিশিখা। সম্যক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

বীজগণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল ভারতে এবং পরবর্তীকালে আরবীয় পণ্ডিতদের দ্বারা উহা পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচারিত হয়। দশম শতাব্দীতে ভারতীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতির সাহায্য লইয়াই পাশ্চাত্ত্য দেশে গণিতশাস্ত্রের প্রচারকার্য সুরু হয়, এবং আরও প্রায় পাঁচ শতাব্দী অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের মধ্যে বীজগণিতের চর্চা বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন ভারতে জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং গ্রীক আবিষ্কার বলিয়া কথিত বহু তথ্যই সুদূর অতীত হইতে তাঁহাদের নামের সহিত যুক্ত আছে। বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত ছিলেন; জ্যোতিষ ও জ্যামিতিতে বীজগণিতের ব্যবহার তাঁহাদের অজানা ছিল না। রেভারেণ্ড উইলিয়ার হোজ এ সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। ডাঃ বিভূতিভূষণ ভট্ট ডি-এস-সি, পি-আর-এস তাঁহার তথ্যপূর্ণ রচনায় বলিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুদের সমতল ও গোলোক জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি, পিথাগোরাসের নামে প্রচলিত Theorem of Squaring the Circle এবং Sine function-এর (শিনিজিনি) ব্যবহার সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান ছিল। জ্যোতিষ গণনায় ত্রিকোণমিতিতে শিনিজিনির ব্যবহার প্রচলিত ছিল; সংখ্যাবিশেষের স্থান নির্দ্ধারণ করা হইত দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার দ্বারা। ইহা ছাড়া এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে Differential Calculus (ভাস্করাচার্য), প্রথম এবং দ্বিতীয় degree-র Indeterminate Equation, Co-ordinate জ্যামিতি (বাচস্পতি), permulation ও combination (ভাস্করাচার্য), Continued fraction, Vulgar fraction, Radical sign-এর ব্যবহার (লীলাবতী, বরাহমিহির), ঋণ সংখ্যার ব্যবহার (আর্যভট্ট), Quadratic Equation (শ্রীধরাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত) প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট প্রাথমিক জ্ঞান প্রাচীন ভারতে লব্ধ হইয়াছিল, এবং এসব বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য জগৎ ভারতের নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঋণী।

আর্যদের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রথম পুস্তক 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে রচিত হইয়াছিল। তৎপূর্বেও রচিত (প্রায় ২৩৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি) তৈত্তিরিয় সংহিতায় আর্যদের জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়; এ-বিষয়ে লোকমান্য তিলক তাঁহার Orion পুস্তিকায় সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন। রাশিগুলি সম্পর্কে প্রাণীর নাম হিন্দুরাই প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের পূর্বে জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট তাঁহার সূর্যসিদ্ধান্ত পুস্তকে প্রচার করেন যে পৃথিবী সূর্যকে উপবৃত্তাকার (eliptical) পথে প্রদক্ষিণ করিয়া করিয়া চলে; ইহা ছাড়াও ঐ পুস্তকে তিনি অয়নানুযায়ী বৎসর গণনার, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির নির্ভুল বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। এমনকি সূর্য এবং গ্রহগুলির পারস্পরিক দূরত্ব সম্পর্কেও প্রাচীন হিন্দুদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ছিল। তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপে সর্বপ্রথম প্রায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতির বিষয় বর্ণনা করেন এবং পরে কেপলার eliptical পথের কথা বলেন, পরে গ্যালিলিও telescope যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

বস্তুর স্বরূপ বা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কেও প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট গবেষণাকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মদত্ত এবং ভাস্করাচার্য অবগত ছিলেন যে পৃথিবী, সকল বস্তুকে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে। কণাদ বস্তুর গুণাবলী —স্থিতিস্থাপকতা (elasticity), আসঙ্গশীলতা (coalesciveness), সংসক্তিশীলতা (viscosity), অভেদ্যতা (impenetrability), এবং কৈশিকতা (capillarity) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উত্তাপ, আলোক ও শব্দ যে বস্তুকণিকার সঞ্চরণ হইতে উৎপন্ন হয় প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ এ-বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি বস্তু ও শক্তি যে পরিবর্তনশীল এবং ধ্বংসাতীত ইহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন। শব্দবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রাথমিক জ্ঞান ছিল; তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রে একটি সুরের কম্পন-সংখ্যা যে তাহার পরবর্তী অষ্টমস্বরের কম্পনসংখ্যার অর্দ্ধেক তাহা এই বৈজ্ঞানিকগণ জানিতেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার 'Physical Science of the Hindus' পুস্তকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন—উত্তাপ ও আলোক একই কারণের বিভিন্ন

প্রকাশ (কণাদ); উত্তাপ ও আলোকের রশ্মি বস্তু হইতে অতি ক্ষুদ্র কণিকার রূপে সরলরেখায় বিচ্ছুরিত হয় (বাচস্পতি); তাঁহারা জানিতেন যে কোন সমতল হইতে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইলে পাতন ও প্রতিফলনের কোন (angles of incidence and reflection) সমান এবং বিপরীত হয়; স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মির প্রতিসরণ (refraction) সম্বন্ধেও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল (উদ্যতকর); তাঁহারা জানিতেন যে আলোক রাসায়নিক ক্রিয়াও সম্পন্ন করিতে পারে (জয়ন্ত)। ইহা ছাড়া চুম্বক ও বিদ্যুত-শক্তি সম্বন্ধেও প্রাচীন ভারতে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় মেলে (শঙ্কর মিশ্র)। গ্রীকদেশীয় মহাত্মা থেলিস জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়া দেখেন যে অ্যাম্বারকে রেশমী বস্ত্রদ্বারা ঘর্ষণ করিলে তাহাতে হাল্কা বস্তু আকর্ষণ করিবার শক্তি জন্মে। বিদ্যুতশক্তি বিষয়ে বিশদ তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল 'বিদ্যুৎ জিহ্বাতন্ত্রগ্রন্থে'—কিন্তু আজ আর তাহার কোনও সন্ধান মেলে না। সেকালে ভারতীয়রা সমুদ্রযাত্রাকালে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের (মৎস্য যন্ত্র) বহুল ব্যবহার করিতেন (পতঞ্জলি)। চৌম্বকশক্তির প্রয়োগ অন্যান্য বিষয়েও ছিল। গজনীর মামুদ ভারতে আসিয়া দেখিতে পান, যে সোমনাথের মন্দিরে বিগ্রহটি বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান। ইলিয়ট তাঁহার প্রণীত ভারতের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে মথুরার একটি মন্দিরে তিনি পাঁচটি বিগ্রহ বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার মূলে কিছুটা কল্পনা থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু চৌম্বক শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্ময়কর সত্যের ইঙ্গিত যে ইহাতে নাই তাহাই বা কে বলিবে?

তৎকালে ভারতে বিজ্ঞান কিরূপ প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার প্রমাণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে নালন্দা, উদন্তপুর, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ এবং রসায়ন বিদ্যা সম্পর্কে নিয়মিত শিক্ষাদান করা হইত। শিক্ষাদান ছাড়া গবেষণার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও ছিল। ডাঃ শীল বলিয়াছেন, প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়েরা লৌহের সহিত অঙ্গারের মিশ্রণদ্বারা মরিচাবিরোধী উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত করিতে সক্ষম ছিলেন; অস্ত্র চিকিৎসার জন্য ইস্পাতদ্বারা নির্মিত ১২৭ প্রকার যন্ত্রের বর্ণনা ও ব্যবহার পদ্ধতি শুশ্রুত-সংহিতায় লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে ভারত হইতে নানা দেশে উৎকৃষ্ট কাঁচ রপ্তানী করা হইত। ভারতীয়েরা বহুবিধ রঞ্জকদ্রব্য প্রস্তুত করিত এবং বস্ত্রাদি উত্তমরূপে রঞ্জিত করিতে ও অবাঞ্ছিতরঙ অপসৃত করিতে পারিত (bleaching)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার 'Hindu Chemistry' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে নাগার্জুন রসায়ণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া রস বা পারদ, রসাঞ্জন বা এ্যান্টিমনি, লৌহ প্রভৃতি ধাতু-ঘটিত কতকগুলি লবণ (salt) প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহার কিছু কিছু চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 'রসার্ণব', 'রসরত্নসমুচ্চয়' প্রভৃতি পুস্তকে রসায়ণশাস্ত্রের প্রয়োগকার্যে ব্যবহৃত কতিপয় যন্ত্রাদির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তৎ-সাহায্যে তুতিয়া বা কপার সালফেট হইতে তাম্র, জিঙ্ক পারক্লোরাইড হইতে জিঙ্ক বা দস্তা বাহির করা যাইত; আবার সিন্দুর এবং পারদের পারক্লোরাইড, সালফাইড, আয়রণ সালফেট, সোডা কার্বনেট প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইত। ভস্মীকরণ (calcination) পাতন (distillation), ঊর্দ্ধপাতন (sublimation), তাপ-বাষ্প ক্রিয়া (steaming), চিরস্থায়ীকরণ (fixation) প্রভৃতি প্রক্রিয়াও ব্যবহৃত হইত। রসায়ণশাস্ত্রে তাহাদের মৌলিকজ্ঞান বিস্ময়কর ছিল; রাসায়নিক আসক্তি (chemical affinity) সম্বন্ধেও তৎকালে রাসায়নিকগণ অবগত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। রসায়ণশাস্ত্রের জ্ঞান একমাত্র ভারত হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিশর এবং গ্রীস ইহার সহিত পরিচিত হয়। খ্রীষ্টীয় দশক শতকে আরবের জেবর ভারত হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া রসায়ণ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব হইতে অনুবাদের সাহায্যে পশ্চিম দেশে এই শাস্ত্র সম্পর্কে প্রচার সুরু হয়। ইহার পূর্বে পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ বাস্তবের সহিত সম্পর্কবিহীন অ্যালকেমির স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেন।

ডাঃ জে, টি, ওয়াইজ অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, চিকিৎসা-বিদ্যায় সর্বপ্রথম প্রাচীন হিন্দুরাই উন্নতি লাভ করে এবং পশ্চিম দেশগুলি এ বিষয়ে হিন্দুদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে মিশরীয়গণ ভারতের নিকট হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। হিপোক্রেটিসকে (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) পাশ্চাত্য চিকিৎসার জন্মদাতা বলা হয়। কিন্তু হিপোক্রেটিসের জন্মের বহুকাল পূর্বে পিথাগোরাস

মিশরে গিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। প্যারিসন বলেন যে আলেকজাণ্ডারের সময়ে ভারতে সাধারণ এবং অস্ত্র-চিকিৎসকদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন যে, সুশ্রুতসংহিতা খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে এবং চরক সংহিতার অধিকাংশ বৈদিক যুগে রচিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চরক সংহিতায় সংবদ্ধ উদাহরণগুলি সবই প্রায় বৈদিকযুগের উদাহরণ। পরবর্তীকালে হিন্দুদের আয়ুর্বেদশাস্ত্র আরবের খলিফারা উদ্যোগী হইয়া আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন খলিফা হারুণ-অল-রশিদ একবার অসুস্থ হইয়া পড়িলে ভারতের চিকিৎসক শাস্ত্র দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া নিরাময় হইয়াছিলেন। হিপোক্রেটিস আয়ুর্বেদ হইতেই চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁহার তথ্য ও পদ্ধতি আহরণ করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদে নির্দেশিত ত্রিদোষ—বায়ু, পিত্ত ও কফ বিচার করিয়া তিনি রোগীর চিকিৎসাকার্য চালাইতেন। ভারত হইতে চিকিৎসাবিদ্যা চীন, জাপান, লঙ্কা, যবদ্বীপ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয় এবং কালক্রমে ইহার প্রভূত উন্নতি হয়। ইউরোপে পূর্বে এ-বিষয়ে যৎসামান্য চর্চা হয় এবং তাহাও বিদেশ হইতে আহৃত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিল। ডাঃ শীল বলিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুরা অস্ত্র চিকিৎসায় (শল্য বিদ্যা) কৃতবিদ্য ছিল; তাহার শরীরে বিদ্ধ তীর বাহির করিতে পারিত, তাহারা লিথোটমি করিত, মৃতভ্রূণ পেট হইতে বাহির করিতে পারিত, স্থানচ্যুত অস্থি আবার যথাভাবে স্থাপন করিতে পারিত, দুর্ঘটনাগ্রস্ত শরীর হইতে ভগ্নাস্থি, লৌহ, প্রস্তর, কাষ্ঠখণ্ড শল্যবিদ্যাদ্বারা বাহির করিতে এবং ক্ষতস্থান নিরাময় করিতে পারিত। সুশ্রুত সংহিতায় ১২৭ প্রকার অস্ত্র করিবার প্রণালী বিবৃত আছে। ছাত্রেরা যাগযজ্ঞে বলিপ্রদত্ত প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিত। তাহারা পরি-পাক ব্যবস্থা (digestive system), রক্ত-নালী-বিন্যাস (vascular system) ও স্নায়ুতন্ত্র (nervous system) সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষালাভ করিত। ডাঃ ভি, সি, মাথুর তাঁহার 'A short account of Hindu Medicine' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সুশ্রুত মশকের কামড়ে যে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় সে-সম্পর্কে অবগত ছিলেন; সুশ্রুতের পচন-নিবারক (antiseptic) অস্ত্রবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল। পাশ্চাত্যেরা এ সম্বন্ধে মাত্র গত শতাব্দীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। অস্ত্র করিবার গৃহ সর্জরসীয় বৃক্ষনির্যাস (resinous gum) এর ধূম্রের সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, সুগন্ধ দ্রব্য জ্বালাইতে হইবে এবং ক্ষত এই ধূম্রে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া উৎকৃষ্টরূপে ধৌত হস্ত এবং জাল দেওয়া জল ব্যবহার করিয়া অস্ত্রকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে—সুশ্রুত অস্ত্র চিকিৎসকগণকে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। আবার ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা অস্ত্রকার্যে সুবিধার জন্য গাঁজা পোড়াইয়া রোগীকে সেই ধূম্রজাল শোঁকাইয়া সংজ্ঞাহীন করিয়া লইত। ৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ভোজের শরীরে একটি অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। অস্ত্রবিদ দুই ভ্রাতা তাঁহাকে সম্মোহন-কারক ঔষধের সাহায্যে অজ্ঞান করিয়া লইয়া মাথার খুলি trephine (ছিদ্র) করিয়া মস্তিষ্ক হইতে একটি টিউমার বাহির করেন; তৎপরে অস্থিখণ্ড ও চর্ম যথাস্থানে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে সেলাই করিয়া দেন। পরে সঞ্জীবনী নামে অপর এক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন করেন।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিবিধ শাখাও প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল,—শারীরতত্ত্ব ব্যতীত প্রাণী-বিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা তাহাদের অন্যতম। ডারউইনের ক্রম-বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহারা অবগত ছিলেন। বৃক্ষের বোধশক্তি আছে এবং সুখদুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতাও বৃক্ষ-শরীরে বিদ্যমান এই সত্যেরও নির্দেশ পাওয়া যায় (চক্রপাণি)। অথর্ববেদ বলেন যে বৃক্ষাদিও প্রাণী-দিগের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। কিভাবে বীজহীন ফল জন্মান যায়, কদলীর আকার বর্দ্ধিত করা যায় এ সম্বন্ধেও তৎকালে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারত বিজ্ঞানের বহু বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-সাধনার অন্যান্য ক্ষেত্র—অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, আইন ও ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিতেও প্রাচীন ভারতের অগ্রগতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এককালে মনুর আইন চীনদেশীয় আইনের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। পুরাণগুলি প্রকৃত-পক্ষে ইতিহাস না হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রচার, যুদ্ধবিদ্যা, বাণিজ্য, পোতনির্মাণ ও উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারত পৃথিবীর অপর কোন দেশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না।

মহাভারতের বনপর্বে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিবার পর নিহত রাজার সেনাপতি ও সৈন্যগণ দ্বারকাপুরী অবরোধ করে। শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায় ছিলেন; তাঁহার সেনানায়কেরা দ্বারকা রক্ষা

করিবার নিমিত্ত নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করেন:— সহরের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য গোলাজাত করিয়া রাখা হয়, সহরের চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হয়, শত্রুবিধ্বংসী নালিকাযন্ত্র স্থাপন করা হয়, নদীগুলির সেতু বিধ্বস্ত করা হয়, স্বাধীনভাবে নৌকা চলাচল বন্ধ করা হয়, স্থানে স্থানে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ কাটা হয়, নিষ্প্রয়োজনীয় লোকসমূহকে শহর হইতে স্থানান্তরিত করা হয়, বিশ্বাসভাজন লোকদের শহরের বাহিরে যাইবার এবং ভিতরে আসিবার সুবিধার্থে পাসপোর্ট (বিশ্বাসের চিহ্নমুদ্রা) প্রথা প্রবর্তন করা হয়। এতদ্বারা অতি উন্নত ধরনের রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়; এ-সব ব্যবস্থা অদ্যাপি পৃথিবীর সর্বত্র যুদ্ধকালীন অবরোধের সময়ে অনুসৃত হয়। উল্লিখিত আছে যে, প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ছিল; পাণ্ডবগুরু দ্রোণাচার্যের বিদ্যালয়, রাজগৃহে জরাসন্ধের বিদ্যালয়, দ্বারকায় বলরামের বিদ্যালয়, হস্তিনাপুরে কৃপাচার্যের বিদ্যালয়, মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের বিদ্যালয় প্রভৃতির উল্লেখ সাধারণভাবেই পাওয়া যায়। এই সকল বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণে শিক্ষাদানের অঙ্গস্বরূপ ব্যবহৃত অশ্ব, হস্তীযূথ এবং রথাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত রক্ষীগৃহের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যালয়ে শস্ত্রবিদ্যা, দণ্ডনীতি, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি নিয়মিত শিক্ষাদানের রীতি ছিল। সৈন্যগণকে শিক্ষানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণী, বাহিনী এবং পদমর্যাদায় বিভক্ত করা হইত। সেকালে ভারতবর্ষের পেশাদার সৈন্যেরা ভারতের বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যের সাহায্যে যুদ্ধার্থে গমন করিত; সুদক্ষ সৈনিক হিসাবে সারা পৃথিবীতে তাহাদের নাম ছিল। পারস্য সম্রাট জারাকসিসের (Xerexes) বাহিনীতে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্যের অবস্থিতির কথা গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস লিখিয়াছেন। থার্মোপলির যুদ্ধে বহু সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য অতিশয় কৃতিত্বের সহিত গ্রীসীয় বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল।

চীনের ইতিহাসেও প্রকাশ আছে যে, তথা হইতে ভারতবর্ষের নিকট সৈনিক সাহায্য চাওয়া হইত। ভারতীয় সৈন্যগণ দ্বারা ব্যবহৃত অস্ত্রাদিও অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। মহাভারতে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের বিবরণ আছে। রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁহার 'বাঙ্গালীর বল' পুস্তকে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—বৈশম্পায়নের নীতি প্রকাশিকা পুস্তকে কামানের বর্ণনা বিদ্যমান; তথায় ইহাকে নালিকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বিবরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, ইহা একটি সোজা নলাকৃতি বস্তু এবং মধ্যস্থলে ছিদ্রবিশিষ্ট। ইহা ব্যবহারকালে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত এবং ইহাতে অগ্নিসংযোগের প্রয়োজন ছিল। এই পুস্তকে লিখিত আছে যে, রাজা জন্মেজয়কে ইনি তক্ষশীলাতে ধনুর্বেদ সম্বন্ধে ও এ-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। জোহান ব্যাকম্যান তাঁহার 'History of Invention and Discovery' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'যাঁহারা বলেন, বারুদ ভারতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল আমি তাঁহাদের সহিত একমত। উহা ইউরোপে সারাসেনদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। ওপার্ট সাহেবও বলেন যে, 'India is the home of gunpowder and firearms'. রাজেন্দ্রলাল আচার্যের তথ্য সংগ্রহ অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। যদি ক্ষাত্রশক্তি সভ্যতার মাপকাঠি হয় তবে ভারত সৈন্য এবং শস্ত্রবলে অবশ্যই সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

বিখ্যাত গবেষণাকারী হেউইট লিখিয়াছেন যে ব্রোঞ্জযুগে ভারতের বিখ্যাত বণিকেরা, যথা শ্রাবস্তির অনাথ পিণ্ডিকা, তাম্রলিপ্তির খেওয়াত বণিকেরা ও তুর্বসু যাদবেরা চীন, মালাক্কা, মালয় আর্কিপেলাগো, পারস্য, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, গ্রীস, ইটালী প্রভৃতি দেশে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে উপনিবেশ স্থাপন, সংস্কৃতি বিস্তার ও বাণিজ্যব্যপদেশে প্রাচীন ভারতবাসী দেশান্তর যাত্রায় বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। ভারতের নানা বন্দর হইতে ভারতবাসী বিদেশে যাতায়াত করিত; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত বন্দর, (২) গোপালপুরের (উড়িষ্যা) নিকটস্থ পালুরা বন্দর, (৩) মসলীপটমের (মাদ্রাজ) নিকটবর্তী তিনটি বন্দর, (৪) নর্মদার মোহানায় ব্রোচের (গুজরাট) একটি বন্দর। ভারতে জাহাজ নির্মাণবিদ্যার প্রশংসনীয় অগ্রগতি হইয়াছিল; জাহাজগুলি অতি দক্ষ নাবিকদের দ্বারা চালিত হইত। ভিনিসের নাবিক ফ্রেডারিক বলিয়াছেন যে বাঙলা দেশে জাহাজ নির্মাণের উপকরণ এত সুলভ এবং দক্ষতা এরূপ সর্বজনবিদিত ছিল যে, কনষ্ট্যান্টিনোপলের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়া হইতে জাহাজ নির্মাণ না করাইয়া ঢাকা হইতে উহা স্বল্পব্যয়ে নির্মাণ করাইয়া লইতেন। মহারাষ্ট্রেও জাহাজ নির্মাণের নিমিত্ত বৃহৎ কারখানা বিদ্যমান ছিল। তৎকালে ভারতবাসী অধ্যবসায় ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য চালাইয়া অগাধ ধনরত্ন

সঞ্চয় করিয়াছিল। ভারতের নিপুণ সৌকর্যমণ্ডিত পণ্য সম্ভার, মসলিন, শাল, রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদি, গজদন্ত ও সোনারূপার কারুকর্ম ইত্যাদি সমগ্র পৃথিবীর বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্য হিসাবে গৃহীত হইত। কালক্রমে এই বৈভবের বার্তা জ্ঞাত এবং ইহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কলম্বাস প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য নাবিকেরা ভারত আবিষ্কারে বহির্গত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সুপ্রাচীন কালেও ভারতে ১৩০ ফুট অবধি দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট বৃহদাকার জলযান ব্যবহৃত হইত।

বাণিজ্য ব্যতীত জলপথ এবং স্থলপথেও ভারতীয়গণ ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রচারার্থ দেশ-দেশান্তর গমনে অভ্যস্ত ছিল। বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজর্ষি অশোক সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, সিংহল এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচারকদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ব্যাকট্রিয়া দেশে গমন করিয়াছিল, এরূপ কথা ম্যাক্সমুলার বলেন। 'Budhism in Pre-Christian Britain' নামক গ্রন্থে ম্যাকেঞ্জি বলেন, যে খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। তৎকালে বৌদ্ধভিক্ষুগণ আলেকজান্দ্রিয়া এবং প্যালেষ্টাইনে আসিয়া নিয়মিত প্রচারকার্য চালাইত। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন যে, খ্রীষ্টধর্মের উপদেশাবলী বহুলাংশে বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। উদয়বাসী ধর্মপাল ও ধর্মদেব প্রভৃতি ভারতীয় ভিক্ষুগণ চীনদেশে গিয়া তথায় বৌদ্ধশাস্ত্রাদির চৈনিক ভাষান্তরণ কার্যে আরব্ধ ছিলেন।

কর্ণেল এ্যালকট এবং আরও কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন যে একসময়ে মিশর ভারতের উপনিবেশ ছিল। নীলনদের মোহানায় যে সকল দ্বীপ আছে তাহাদের বর্ণনা পুরাণে পাওয়া যায়; পুরাণে সেগুলি 'কুশদ্বীপ' নামে কথিত হইয়াছে। ক্যাপটেন স্প্যাক ইহার ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। তৎকালে ভারতের বড় বড় বাণিজ্যপোত মিশরের উপকূলে যাইয়া ভিড়িত। মিশরের রামেসিস নামধেয় বহুসংখ্যক কারাও বা সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন; প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব হইতে কারাও সম্রাটদের রামেসিস নাম আরম্ভ হইয়াছে; ভারতে রামচন্দ্রের যুগও তৎকালবর্তী। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে ঋষি কণ্ব মিশরে যাইয়া দশ হাজার মিশরবাসীকে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। ভারতের নানাস্থানে যেমন দেবীপক্ষের প্রথম নয় দিবস পূজা করিবার রীতি আছে, এবং তাহা নবরাত্র বলিয়া অভিহিত হয়, মিশরেও ঐরূপ প্রথম নয় দিবস পূজা করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক পারগিটারের মতে প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্বে ভারতের একদল যোদ্ধা সিরিয়া দেশে গিয়া তথায় মিটানী রাজ্য স্থাপন করেন। সিরিয়ার নিকটবর্তী হিট্টি দেশের ভাষায় সংস্কৃতভাষার কতিপয় বর্ণ সংযোজিত আছে। মিটানী ও হিট্টিরা ভারতের আর্যদিগের অনুরূপ আনুষ্ঠানিকভাবে রথ-দৌড়ের ব্যবস্থা করিত। প্রতিযোগী রথগুলি একবার নির্দিষ্ট বৃত্তপথে আবর্তন করিয়া আসিলে তাহাকে 'ঐকবর্তন' বলা হইত, তিনবার নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করিলে তাহা 'ত্রৈয়াবর্তন' নামে অভিহিত হইত।

পশ্চিমদিক ব্যতীত দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে মালয়, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে বিশাল ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পূর্বভারতীয়, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশীয় সমুদ্রগামী জনগণ তথায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিপুল বিস্তার সাধন ও পরিশেষে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যপালন কার্য নির্বাহ করিয়াছিল। এসম্বন্ধে ডাঃ মজুমদার তাঁহার 'Hindu Colonisation' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। অধ্যাপক বাগচী বলেন যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে মালয় দেশের পঙ্কাশুকে হিন্দু উপনিবেশ বর্তমান ছিল। চতুর্থ শতকে একখানি শিলালিপিতে এই মর্মে লিখিত আছে যে, সিঙ্গাপুরে দীর্ঘকাল অবধি ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ ঔপনিবেশিকগণ স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে মালয়ের কাতারা এবং পাহাং রাজ্যে হিন্দু রাজা বর্তমান ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক পূর্বভারতীয় হিন্দু নৃপতি মালয় দেশের লঙ্কাশুক রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মালয় দেশ বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ উপনিবেশে বিভক্ত ছিল। তৎপরবর্তীকালে তথায় শুধু বঙ্গের পাল নৃপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। পাল রাজারা তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে জাহাজ-যোগে সমুদ্র যাত্রা করিতেন। শৈলেন্দ্র রাষ্ট্র অষ্টম শতকে স্থাপিত হয়, তাঁহারা কলিঙ্গের আদিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের সহিত পালরাজাদের শোণিত সম্পর্ক ও একাত্মবোধ ছিল। শৈলেন্দ্রগণ কলিঙ্গস্থিত গোপালপুরের পালুরা বন্দর হইতে জাহাজযোগে সমুদ্র যাত্রা করিতেন। অষ্টম শতকের শেষের দিকে শৈলেন্দ্রেরা বিশেষ শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা প্রায় সমগ্র মালয় দেশ,

কম্বোজ, এনামের একাংশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, জাভা, সুমাত্রার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; সুমাত্রার শ্রীবিনয় রাজ্য শৈলেন্দ্রের অধীন হয়। পরে একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই রাজ্যের কতকাংশ সাময়িকভাবে দাক্ষিণাত্যের চোলদের হস্তগত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অবধি পাল রাজাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এতদ্ব্যতীত আমিশক নামে হস্তিনাপুরের জনৈক প্রভাবশালী নৃপতি প্রথম শতাব্দে জাভায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনি গুজরাটের ব্রোচ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। আবার দক্ষিণ ভারতের মসলীপট্টম বন্দর হইতে দাক্ষিণাত্যের চোলরাজাগণ চতুর্থ শতকে জাভা, বোর্ণিও এবং কম্বোডিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তাঁহারা সাময়িক ভাবে শৈলেন্দ্রের হস্ত হইতে শ্রীবিজয় রাজ্য, সুমাত্রার পূর্বাংশ, মালয়ের মধ্য ও দক্ষিণাংশ নিজ শাসনে আনিয়াছিলেন। আবার বঙ্গদেশ হইতে ঔপনিবেশিকগণ স্থলপথে উত্তর ব্রহ্মে যাইয়া ইরাবতীর কূলে বসবাস করিয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণও বর্তমান। ব্রহ্মদেশ, মালাকা, বালি ও শ্যামদেশেও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

দেওয়ান চমনলাল তাঁহার 'Hindu America' গ্রন্থে বলেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জনৈক ভারতীয় হিন্দু কর্তৃক আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়; এইরূপ বিশ্বাস নাকি চীনদেশেও প্রচলিত আছে। সেই সময় হইতে সূর্যবংশের বংশধরগণ তথায় যাইয়া বসবাস করিতে সুরু করেন। মেক্সিকোর জনৈক সরকারী ঐতিহাসিকের মতে কতিপয় ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম আমেরিকা মহাদেশ পৌঁছিবার গৌরব লাভ করে। অতি দূর দেশ হইলেও তৎকালে এই পথ অতিক্রম করা অসাধ্য ছিল না। হাইয়াট ভেরিল বলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের জলস্রোত এবং উপরিস্থ বায়ুর স্রোত পূর্বদিকে আমেরিকা অভিমুখে প্রবাহমান ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিক কিমিক বলেন যে, আর্যেরা ১০০ টন মাল বোঝাই করা যায় এইরূপ বৃহদাকার অর্ণবপোতে আমেরিকা পৌঁছিয়াছিলেন। ক্রেডারিক লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের পোত ১৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিল এবং তাহাতে ৩০০ যাত্রী একত্র বহন করা সম্ভব ছিল। এইরূপ জলযানের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় মধ্য আমেরিকা ও পেরুর তীরে পাওয়া গিয়াছে। ম্যাকেঞ্জি বলেন যে, তৎকালে মেক্সিকো এবং পেরুতে বহুপরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যাইত এবং তাহাই বণিকদের আকৃষ্ট করিয়া লইয়া যাইত। মেক্সিকোর সমুদ্রতীরে অবস্থিত মায়া উপনিবেশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আর্মলা এবং তিনি নিজেকে সূর্যবংশী বলিতেন এইরূপ উক্ত আছে। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতা প্রায় ৩০০০ মাইল দীর্ঘ ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্পেনীয় আক্রমণকারীদের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্‌কাগণ অতি উচ্চ কোটির সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল। প্রাচীন ইনকা নৃপতি ম্যানকোক্যাপাকও নিজেকে সূর্যবংশী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। স্পেন যখন মেক্সিকোর অ্যাজটেক সভ্যতাকে জয় করে তখন তথাকার রাজা জেতা পিজেরাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগকে সূর্যবংশের একজন রাজা লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে মেক্সিকোতে বসবাস করাইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। হাইয়াট ভেরিল এবং ম্যাকেঞ্জি বলেন যে, অ্যাজটেক ক্যালেণ্ডার নামে একটি ১২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট প্রস্তর আছে; ইহাতে নিঃসন্দেহে ভারতের কীর্তির ছাপ আছে। চমনলাল বলেন, অ্যাজটেকরা হিন্দু ছিল ইহার সাহায্যে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। মেক্সিকোর অধ্যাপক রমাসেনা বলেন যে মায়া ও মধ্য আমেরিকার অন্য কয়েকটি স্থানের ভাষা সংস্কৃতভাষা হইতে উদ্ভূত। মেক্সিকোয় গণেশ এবং ইন্দ্রের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; যথায় হস্তী নাই তথায় গণেশের কল্পনাই সম্ভব নয়, উপরন্তু স্পেনবাসীরা স্বচক্ষে মেক্সিকোর মায়াজাতিকে এই সকল মূর্তির উপাসনা করিতে দেখিয়াছেন। এখনও মেক্সিকো এবং পেরুতে দশহরা উৎসবের প্রচলন আছে। অদ্যাপি ইহারা আত্মার অবিনাশিতা এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। স্যার জোন্‌স্ বলেন যে, ইন্‌কারা গর্ববোধ করিয়া থাকে যে, তাহারা রামচন্দ্রের বংশধর। 'Hindu America'-র লেখক চমনলালকে মেক্সিকোর ফেডারেল কোর্টের জনৈক বিচারক সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দুর উচ্চমানের সংস্কৃতির জন্য তাঁহারা অদ্যাপি গৌরববোধ করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ঘাটে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীতারকনাথ বসু

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৭৩

পঞ্চম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের আর্থিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা

দেশের আর্থিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সবল, সুস্থ সুসংযত করিতে হইলে কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্টের দ্বারা তাহা কখনও হইবে না। কারণ কংগ্রেস যে সকল বিভিন্ন আর্থিক ও আন্তর্জাতিক বিলি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা তাহার বিরুদ্ধতা করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নহে। কম্যুনিষ্টের কথা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহারা দেশের শত্রুপক্ষের সহায়ক ও তাহাদিগের কোন কোন সভ্য সেরূপ না হইলেও পরগুণগ্রাহিতা ও বিদেশীর উপর নির্ভর করা তাহাদিগের মধ্যে এতই প্রবল যে, পূর্ণ দেশপ্রেমের সহিত সে দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত কথা হইল এই যে, কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ এতই গভীর ভাবে জড়িত হইয়া আছে যে, কংগ্রেস পৃথিবীর নিকট ভারতকে অধমর্ণরূপেই শুধু উপস্থিত করিতে সক্ষম। সমানে সমানে কথা বলা কংগ্রেসী লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ কেহ রুশিয়া, চীন, বা অপর কোন কম্যুনিষ্ট দেশে যাইলে তাঁহার মনোভাব ভক্তের বা উপাসকের মতই হইবে। মতের সহজ ও স্বাধীন আদান-প্রদান উপাসক ও দেবতার মধ্যে চলিতে পারে না। সুতরাং ভারতের পক্ষে জগতজাতি সভায় কম্যুনিষ্ট মতের কাহাকেও অন্তত কম্যুনিষ্ট দেশে পাঠান চলিবে না। অকম্যুনিষ্ট দেশে ভারতের কম্যুনিষ্ট আদৃত হইবে না, একথাও সত্য। তাহার পরে দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে হইলে জাতীয় শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন হইবে। ঋণের টাকায় অধিক মূল্যে বিদেশী যন্ত্রপাতি কিনিয়া তাহা আনাড়ির হাতে তুলিয়া দিয়া লোকসানে কারখানা চালাইয়া আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। আরও হইতে পারে না কেননা কারখানা হইলেই কারবার হয় না। উপকরণ, যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উপযুক্ত যন্ত্রচালক ও মেরামতের কারিগর প্রভৃতি না পাইলে কারখানা চলিতে পারে না। তৈয়ারী মাল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় না হইলেও কারখানা চলে না। এই সকল ব্যবস্থা ঠিক যথাযথভাবে না হইলে কারবারে লোকসান হয়। আমাদিগের সরকারী কারবারে ক্রমাগতই লোকসান হইতেছে এবং লোকসানের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতেছে বলিয়া শোনা যায় না। এই দেশের যে বিরাট জনশক্তি তাহার ব্যবহারও ঠিকমত হইতেছে না। কারণ বড় বড় কারখানায় মাথাপিছু দুই-তিন লক্ষ টাকা না লাগাইলে এক একজন শ্রমিকের উপার্জনের ব্যবস্থা হয় না। বহু ক্ষুদ্র কারখানা হইলে শ্রমশক্তি ব্যবহার অল্প মূলধনেই হইতে পারে। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেসের পক্ষে অবলম্বন করার আশা অত্যন্তই কম। কম্যুনিষ্টদিগের পক্ষে "উপর" হইতে হুকুম না আসিলে কোন কাজই করা

সম্ভব নহে। কংগ্রেস এতকাল উত্তমর্ণ দেশের হুকুমে কাজ করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পক্ষে অর্থ নৈতিক সহায়ক বদলান সম্ভব হইবে না। এই কারণে দেশের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেসের শাসনকার্য্যে ইস্তফা দেওয়া উচিত। কম্যুনিষ্টের কোন কাজে না আসাই ভালো। কম্যুনিষ্টের আগমন হইলে দেশের সভ্যতা, কৃষ্টি, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, ব্যক্তির অন্তরের সকল ভাব ও অনুভূতি এমনই পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করিবে যে, ভারত আর ভারত থাকিবে না। মানবতার সকল আবেগ যন্ত্র-চালিত গতির রূপ অবলম্বন করিবে। সে পরিণতি কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। অতএব উভয় দলেরই ভারতের রাষ্ট্রনির্ণয়ন ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া যাওয়া প্রয়োজন। কারণ তাহা না হইলে স্বাধীন মতাবলম্বী ভারতীয় মানব নিজ অধিকার নিজ হস্তে লইতে সহজে পারিবে না। এই স্বাধীন মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা "পার্টি"র সভ্যদিগের তুলনায় বহু অধিক। কিন্তু "পার্টির" লোকেরা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার ব্যবহারে সর্ব্বদা বাধা দেয় ও সেই অধিকার গ্রাস করিয়া তাহার অপব্যবহার করে। জনসাধারণের কর্ত্তব্য "পার্টি"গুলির সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করা ও নিজ ক্ষমতা নিজের মনোনীত স্বাধীন-চিত্ত লোকের হস্তে ন্যস্ত করা।

বর্ত্তমানে ভারতের প্রয়োজন:

১। বহির্জ্জগতের সহিত নিজের সম্বন্ধ নূতনভাবে গঠন করা ও সেই সম্বন্ধ জাতির সম্মানরক্ষা করিয়া স্থির করা। কাহারও হুকুমে শত্রুর সহিত সখ্য স্থাপন বা শত্রুকে দেশের বাহির করিবার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রাখা চলিতে পারে না। ইউ, এন বা তাসখন্দ দেখাইয়া জাতির স্বাধীনতার অধিকার খর্ব্ব করা চলিবে না।

২। জাতির আর্থিক অবস্থা তথা জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের মান মুদ্রা "রুপিয়ার" আন্তর্জ্জাতিক মূল্য স্থির নির্দ্ধারিতভাবে ক্রম উন্নতিশীল করিতে হইবে। "রুপিয়া'কে পুনর্ব্বার স্বর্ণ-মান করিয়া মানুষের সঞ্চয় ও উপার্জ্জনের পরিমাণ নিশ্চয়-ভাবে স্থির রাখিতে হইবে।

৩। সামরিক শক্তি সকল অস্ত্র ব্যবহার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করিব না, এই প্রতি-শ্রুতি দিবার ভারতের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না ও থাকিতে দেওয়া হইবে না।

৪। জাতীয় শাসন-কার্য্যে অন্যায় ও স্বার্থসিদ্ধির পথ ছাড়িয়া শাসকদিগকে সৎ পথে চলিতে হইবে। রাজস্ববৃদ্ধি জনসাধারণের সঞ্চয় খর্ব্ব করিয়া চলিবে না। রাজস্ববৃদ্ধি শুধু উপার্জ্জন বৃদ্ধির সহিত সংযুক্ত থাকিবে। অপব্যয় বন্ধ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রগঠন ও শাসননীতি

জাতীয়তার দিক দিয়া ভারতকে ভাষাভিত্তিকভাবে খণ্ড খণ্ড ভাগ করিয়া প্রদেশ গঠন করা কংগ্রেসের একটা মহা ভুল হইয়াছে। সেই বিভাগও আবার হিন্দী প্রতিষ্ঠার সহিত জড়িত হইয়া যাওয়ায় বহুক্ষেত্রে মাতৃভাষা কাহার কি তাহা অবজ্ঞা করিয়াই প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে। যথা বাংলার অনেক অংশ এখনও বাংলার সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত ভাবে অপর প্রদেশে সংযুক্ত রহিয়াছে। আরম্ভেও যখন কংগ্রেস নেতাগণ পাকিস্থান গঠন মানিয়া লইয়াছিলেন, তখনও ভাষা লইয়া মিথ্যা প্রচার প্রবলভাবে চালিত ছিল। অর্থাৎ লীগের মুসলমান নেতাগণ উর্দ্দু ভাষা ভারতীয় মুসলমানের জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রচার করিয়া পরে মানিতে বাধ্য হন যে বাংলা ভাষাই পাকিস্থানের অধিক সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। কংগ্রেসী রাজত্বে ভাষা লইয়া মিথ্যা প্রচার এখনও বন্ধ হয় নাই। কংগ্রেস ভাষা, ধর্ম্ম ও জাতি লইয়া ভারতকে দুই টুকরা করিয়া ব্রিটিশের নিকট হইতে রাজত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অবশিষ্ট ভারতকে এক দেশ বলিয়া প্রচার করিয়াও সেই মহাদেশকে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদিগের লোভ ও লাভের খাতিরে ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড করিয়া বহু ভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখন যদি কংগ্রেস রাজত্বের অবসান হয় তাহা হইলে ভারতের একতা আবার নিজরূপ ফিরিয়া পাইতে পারে। স্বদেশী যুগের, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সময়ের, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের যে মহান এক দেশ এক মন-প্রাণের মন্ত্র, তাহা আজ কংগ্রেসের কূটনীতির বিকাশে ভেদের আলোড়নে উড়িয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস বহু প্রদেশ গঠন করিয়া ভারতের

মহা উন্নতির ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া প্রচার। কিন্তু কার্য্যত দেখা যায় যে এই "উন্নতির" মূল যে আর্থিক পরিকল্পনা গঠনকার্য্য, তাহাই এত ছিদ্রবহুল হইয়া পড়িয়াছে যে, দেশ আর্থিক উন্নতির ধাক্কায় দেউলিয়া হইয়া ডুবিতে চলিয়াছে। আর্থিক বা অর্থনৈতিক সকল প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হইল দেশের আর্থিক সামর্থ্যে অপরের ও সকলের বিশ্বাস। এই যে ভারতীয় অর্থনীতিতে অপরের ও সকলের বিশ্বাস কংগ্রেস আজ তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ভারতীয় মুদ্রা রুপিয়া আজ কোথাও মূল্যবান বিবেচিত হয় না। তাহার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য শতকরা ৫৭ ভাগ কমিয়াছে শুধু আইনত; কিন্তু বস্তুতঃ তাহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় টাকায় দুই আনাতে। অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যদি কাহারও ১০০০০ টাকা জমা ছিল তাহা হইলে আজ তাহার ক্রয়শক্তি হ্রাস হইয়া তাহা ১২৫০ টাকাতে পরিণত হইয়াছে। এই ভাবে জনসাধারণের সকল সঞ্চিত অর্থ, ইনসিওরেন্সের টাকা, সরকারী ঋণে ধার দেওয়া টাকা ও নগদ সঞ্চয়ের টাকার আজ আর পূর্ব্বের তুলনায় কোন বিশেষ মূল্য নাই। আর্থিক পরিকল্পনা দ্বারা লাভ হইয়াছে বিদেশীর দেশবাসী অপেক্ষা অনেক অধিক। বিদেশীগণ সাম্রাজ্য চালাইয়া যাহা লাভ করিত আজ তাহারা ভারতকে ঋণ দিয়া যন্ত্র বিক্রয় করিয়া ও যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা বিক্রয় করিয়া অনেক অধিক লাভ করিতেছে। ব্রিটেশের "হোম চার্চ্জে" বা এ দেশের অর্থে নিজ দেশের লোকের ভরণপোষণের জন্য যতটা লইবার ব্যবস্থা ছিল, আজ ব্রিটিশ ও অপরাপর বিদেশী ভারতের নিকট বিভিন্ন "চার্চ্জে" সূত্রে তাহার দশগুণ টাকা লইতেছেন। যন্ত্র বিক্রয়ের লাভ আজ সহস্র কোটিতে হিসাব হইতেছে। ভারতের কর্ম্মী যদিও উপকরণ ও ক্রেতার অভাবে বেকার, বিদেশী কর্ম্মী ভারতকে যন্ত্র বিক্রয় করিবার কারণে কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিতে সক্ষম। কংগ্রেসের পরমুখাপেক্ষী কার্য্যপদ্ধতি আজ ভারতকে ঋণের চাপে অচল করিয়া আনিয়াছে ও ভারতের রাজস্ব দপ্তরে যদি পাওনাদারের "রিসিভার" বসিয়া হুকুম চালায় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না।

কংগ্রেসের অপরাপর আদর্শ ও নীতি ঐ একই পথের পথিক। বিশ্বশান্তির অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইতেছে। দেশে শান্তি কোথাও নাই। প্রায়ই গুলী বর্ষণ করিয়া শান্তির আদর্শ সংরক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বত্র আগুন লাগিয়াই আছে। বন্দর ও গ্রামের লোকের আর্থিক উন্নতি পতনশীল। খাদ্যাভাবে দেশবাসী ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছেন। বহু শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বিদেশী মহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে ও তাহাদিগের আনীত যন্ত্র ব্যবহারে যে সকল জল সেচন কার্য্য করা হইয়াছে ১৮ বৎসর ধরিয়া তাহা আজ দেখা যাইতেছে উপযুক্ত সেচনে সক্ষম নহে। এখন লক্ষ লক্ষ কূপ খনন চেষ্টা হইতেছে। এই কার্য্যে ও রাস্তা নির্ম্মাণে যদি অপব্যয়ের টাকার দশ ভাগের এক ভাগও পূর্ব্ব হইতে লাগান হইত তাহা হইলে আজ ভারতের ভিক্ষাপাত্র ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র জাহাজের আয়তন লাভ করিত না।

কংগ্রেসের আদর্শবাদ ও শাসন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্ত্তন ও অবসান প্রয়োজন। আদর্শবাদ আমাদিগকে প্রায়ই ইউ এন দরবারে অকারণে অপমানিত করে। আমাদিগের সামরিক শক্তি ঐ আদর্শের প্রকোপে পূর্ণ বিকশিত হয় না ও আমরা চীন ও পাকিস্তানের নিকট প্রায়ই ইজ্জত হারাইতে বাধ্য হই। কাশ্মীরের ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের বহু অংশ ভারতের নিকট চীন ও পাকিস্তান ছিনাইয়া লইয়াছে ও আমরা বিদেশীদিগের কানমলায় তাহা মানিয়া লইয়াছি। এই অপমানজনক অবস্থার অবসান আবশ্যক।

এই সকল অপমানজনক ব্যবস্থায় কংগ্রেসের সহায়ক হইল ভারতের কম্যুনিষ্টগণ। ভিতরে ভিতরে ইহারা কংগ্রেসকে সাহায্য করে ও বর্ত্তমান নির্ব্বাচনেও ইহাদের সহিত অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস মিলিতভাবে কাজ করিতেছে। ভারত শাসনে আমাদিগের তথাকথিত "অপোজিশন" কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন শুধু বাক্যে ও স্থানীয়ভাবে যুব বিক্ষোভের খেলা দেখাইয়া। ফলে যুবকজন বদনাম কিনিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। না শিক্ষায়, না ভরণপোষণে, না উপার্জ্জন ব্যবস্থায়। যুবশক্তিকে ধোঁকা দিয়া তাহার অপব্যবহার করিয়া নিজেদের গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির এরূপ জঘন্য উদাহরণ সভ্য জগতে আর পাওয়া যায় না। কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেস

নেতৃবর্গের সকলের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সুখ-সুবিধার ক্রমবিকাশের পূর্ণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে ভারতের জনসাধারণের শোষণ ব্যবস্থায় উভয়ের অবদান প্রায় সমান সমান। এই কারণে কংগ্রেস রাজত্বের শক্তি কমাইবার উপায় কম্যুনিষ্টের সমর্থন নহে। উভয়ের সকল শক্তির অবসান ঘটাইয়া জনশক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই কারণে উপযুক্ত নির্দ্দলীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলের কথা

ভারতের বৃহৎ রাষ্ট্রীয় দলগুলির কার্য্যকলাপের সহিত ভারতবাসীর ব্যক্তি বা সমষ্টিগত মঙ্গলের বা জাতির আত্ম-সম্মান রক্ষার অল্পই সম্বন্ধ দেখা যায়। একটি দলের অভিনব আদর্শবাদের প্রথম ধাক্কায় ভারত বিভাগ হইয়া দুই টুকরা হইল ও ফলে অনেক লক্ষ লোকের প্রাণ ও সর্ব্বস্বনাশ ঘটিল। পরে ঐ দলের লোকেদের চিন্তা-শক্তির বিকাশের ফলে ভারত নিজ শত শত কোটি পাউণ্ড সঞ্চিত বিদেশী অর্থের অপব্যয় করিয়া ঋণ গ্রহণ আরম্ভ করিল ও অষ্টাদশ বৎসর ধরিয়া জাতীয় অর্থনীতির ধারা ভুল পথে চালাইয়া আজ ভারত দেউলিয়া হইয়া বিশ্বের নিকট ভিক্ষুক বলিয়া প্রমাণ হইল। ইহার মধ্যে রাজস্ব বৃদ্ধির ফল যে সকল তহবিলে সঞ্চয় হইত সেই সকল তহবিল শূন্যতা প্রাপ্ত হইল; জাতীয় ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম রুপিয়া স্বরূপ হারাইয়া কোটি কোটি কাগজের টুকরায় পরিণত হইয়া পূর্ব্বের সঞ্চিত অর্থকে মূল্যহীন করিয়া দিল ও সকল ভোগ্যবস্তুর মূল্য দশগুণ বাড়িয়া গিয়া দেশবাসীর জীবনযাত্রা অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার উপর আসিল পরিকল্পনার প্রবল বন্যা এবং প্রায় সকল পরি-কল্পনাজাত ব্যবসাতেই লোকসান ও বিদেশীর সহায়কদিগের অন্যায় ভাবে প্রাপ্ত সম্পদ বৃদ্ধি। কালোবাজার বিক্রয় বস্তুর গুপ্ত বিক্রয়ের ব্যবস্থায় ঘোর কালো হইয়া কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সহস্র কোটিপতি করিয়া তুলিল ও অপর সকল লোকের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইল। সকল বিক্রয়ের মাল-মশলাই ভেজাল হইতে আরম্ভ করিল।

বিদেশে ভারতের মাল হেয় বলিয়া তাহার রপ্তানি হ্রাস হইয়া ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পঙ্গু ও মন্থরগতি হইল ও ভারতের জনসাধারণের লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। সকল ক্ষেত্রেই দমন বা কণ্ট্রোল দেখা দিল। ছাত্র-দিগের বিদেশ গমন করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ প্রায় বন্ধ হইল। অপর উদ্দেশ্যে সকলেরই প্রায় বিদেশ ভ্রমণ অসম্ভব হইল। বিদেশী ঔষধ, যন্ত্রপাতি, উপকরণ প্রভৃতির আমদানি বন্ধ হইয়া কিছু মানুষ মরিল ও বহু ব্যবসা এবং কারখানা প্রায় বা পূর্ণরূপে বন্ধ হইল। চিন্তাশীল রাষ্ট্রনেতাগণ এই অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য স্বর্ণ ব্যবহার আইন করিয়া লক্ষ লক্ষ স্বর্ণকারের সর্ব্বনাশ করিলেন। অনেকে আত্মহত্যা করিল। স্বর্ণের চোরাই আমদানি দ্বিগুণ হইল ও ভারতের আর্থিক অবস্থা উন্নতি লাভ না করিয়া আরো গভীরে ডুবিতে থাকিল। কলিকাতা সহরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার সহচরগণ নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিবার জন্য ছানা কণ্ট্রোল করিয়া দুগ্ধের মূল্য ১·৭৫ পয়সা সের করিলেন ও সেই দুগ্ধে জলের ভাগ কিছু বাড়িল। বাংলার চাষীর নিকট তাহার চাউল রাজশক্তি ব্যবহার করিয়া অল্পমূল্যে ছিনাইয়া লইয়া তাহাই উচ্চ মূল্যে প্রায় কালোবাজারের দরে, "র‍্যাশন" হিসাবে বিক্রয় আরম্ভ হইল। কিন্তু সে "র‍্যাশন"ও মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইতে লাগিল। চাউল নাই কিন্তু বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিলে সোজা হইবে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া কালোবাজারের প্রভাব দৃঢ়তর করা হইল। যাহারা কোন ব্যক্তিগত অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতাদিগকে অবহেলা করিয়া, লাভের চেষ্টা করিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া শিখানো হইল যে সমষ্টিবাদের প্রকৃত অর্থ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-নেতাদিগকে সকল অধিকার ও উপার্জ্জিত অর্থ হাতে তুলিয়া দেওয়া। অপরদিকে দেখা গেল যে, ভারতকে সকলেই পদাঘাত করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। চীন প্রথমে তিব্বত দখল করিয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন তিব্বতীয় সভ্যতাকে অস্বীকার করিয়া প্রচার করিল তিব্বত চীনেরই একটা অংশ মাত্র ও ভারত সরকার সেই বিরাট মিথ্যা মানিয়া লইয়া হিন্দি-চীনি ভাই ভাই বলিয়া নিজেদের নির্লজ্জ কাপুরুষতা প্রমাণ করিলেন। পরে চীন যখন ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতের ২০০০০ বর্গ-মাইল দখল করিয়া বসিল তখন ভারত সরকার সে

অপমান হজম করিয়া শান্তি রক্ষা করিলেন। অপরদিকে কাশ্মীরের অনেকাংশ পাকিস্তান দখল করিয়া বসিয়া রহিল। ভারত ইউ, এন, অর্থাৎ ইংরেজ-আমেরিকার তাঁবেদারী করিয়া তাহা মানিয়া লইলেন। দুই বার পাকিস্থানকে বিতাড়িত করিয়া, বহু ভারতীয় সৈন্যের রক্তপাত করিয়া ভারত ইউ, এন, এর সুরে শান্তির ভজন গাহিয়া ভারতের মুখ নিচু করিলেন। পরে রুশও ইংরেজ-আমেরিকার সহিত পাল্লা দিয়া ভারতের কান মলিতে আরম্ভ করিল ও ভারত-পাকিস্তানের তাসখন্দ বিজ্ঞপ্তির অর্থ দাঁড়াইল শুধু ভারতেরই কাল্পনিক অপরাধ স্বীকার করিয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া থাকা। ইহা ব্যতীত ভারত আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ বর্জ্জন প্রভৃতি আরও বহু সামরিক "কণ্ট্রোল" মানিয়া লইয়া ইংরেজ-আমেরিকান চীনা ও রুশিয়ান-এর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন।

অন্য এক বৃহৎ রাষ্ট্রীয় দল চীন ও রুশের ওকালতি করিয়া ভারতের বক্ষে আজ বিরাজ করিতেছে। এই দলের উদ্দেশ্য বিদেশীর কবলে ভারতকে ফেলিয়া দিয়া স্থানীয় শাসন-কার্য্যে নিজেদের নেতাগণকে উচ্চ আসনে বসান। অথঃ সকল দিক দিয়াই ভারতের বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রীয় দলগুলির মধ্যে সত্যকার কোন দেশভক্তি বা জাতীয়তাবাদ দেখা যাইতেছে না। এই সকল দলগুলি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে ও ইহাদিগের দলপতিদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু নিজেদের সুবিধার সৃষ্টি। ভারত স্বাধীনতার আরম্ভ হইতে শুধু এই সকল ব্যক্তি ও তাহাদিগের পেটোয়াদিগেরই আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। জনসাধারণ ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় দুঃখ ও অভাবে ডুবিতেছেন ও সেই অসহায় অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার বর্ত্তমানের প্রবল রাষ্ট্রীয় দলগুলির কোনও লোককে নির্ব্বাচন না করা। যে সকল লোক কোন দলভুক্ত নহেন; অন্ততঃ বৃহৎ বৃহৎ দলের নহেন, শুধু তাঁহাদিগকেই সমর্থন করা প্রয়োজন। এইবারকার নির্ব্বাচনে স্থির হইবে "দেশ বড় না দল বড়"। আমরা বলি আমাদিগের এই দেশের রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ধর্ম্ম, জাতি, স্ত্রী, পুরুষ, ভাষা কিংবা অপর কোন পার্থক্য বা অনৈক্যকে স্বীকার করে না। অর্থাৎ আমাদিগের রাষ্ট্র মূলতঃ শুধু ভারতবাসীর ভারতীয় স্বরূপই স্বীকার করে। অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের উপর কোন অধিকার বা অনধিকার ন্যস্ত করাতে আমরা বিশ্বাস করি না; যদিও কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সকল গুণ ও বৈশিষ্টেরই সমাদর আমরা করিয়া থাকি। এইভাবে ভারতের সকল ধর্ম্মমত, ভাষা, জাতীয় বিশেষত্ব প্রভৃতির সংরক্ষণে আমরা যত্নবান, কিন্তু ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব বিচারে রাষ্ট্রীয় ভাগবাটা আমরা মানি না। সকল ভারতীয়ই রাষ্ট্রীয় অধিকারে এক।

কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, ভারত স্বাধীনতার আরম্ভেই আমাদিগের আদর্শবাদী নেতাগণ ধর্ম্মের পার্থক্যকে সর্ব্বোচ্চ স্থান ও গুরুত্ব দিয়া ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার পরেও দেখা যাইল যে ভাষা, ধর্ম্ম কিংবা জাতিগত পার্থক্য অতিমাত্রায় আমাদিগের রাষ্ট্রীয় চিন্তার ধারাকে নব নব পথে চালাইতে সক্ষম হইতেছে। প্রমাণ, বোম্বাই বিভাগে মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটি 'ভাষার কথা', পাঞ্জাব বিভাগে হিন্দি, গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাষার কথা ও কিছুটা শিখ ধর্ম্মের বা আদি সমাজীদের বিশেষত্বের গুরুত্ব। নাগা বা মিজোদিগের জাতীয় বিশেষত্ব বর্ত্তমানে আলোচিত হইতেছে ও তাহার ফলে আসামের অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কাও বাড়িয়া চলিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদিগের নেতাগণ ভাষা বা জাতির অস্তিত্ব স্বীকার একেবারেই করেন না। যথা, মানভূম (ধানবাদ), সিংভূম, পুর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, গোরখপুর, বালিয়া প্রভৃতি জেলাগুলির ভাষা ও জাতিগত বিশেষত্ব। অর্থাৎ এই জেলাগুলির প্রথম চারটি জেলা ভাষা ও ঐতিহ্য বিচারে বাংলার সহিত ও পরের দুইটি জেলা বিহারে সংযুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু হিন্দিভাষা যে ভারতের একটা মহাভাষা এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য ও হিন্দিভাষী প্রদেশগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য বাংলা দেশকে কাটিয়া ছোট করা প্রয়োজন হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে বস্তুত কার্য্যকরীভাবে আমরা সকল ভারত-বাসীর একতা মানিয়া চলি না, এবং জাতি বা ভাষার মূল্যও যথাযথ ভাবে স্বীকার করিয়া চলিনা। মূল নীতি তাহা হইলে আমাদিগের কি? মূল নীতি হইল সকল পার্থক্য ও ভেদ মানিয়া লওয়া যদি অপরপক্ষের বিক্ষোভ ও রাষ্ট্রমত

প্রকাশ ক্ষমতা প্রবল হয়। কিন্তু হিন্দির ও হিন্দি ভাষাভাষীর প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সকল অন্যায় ও মিথ্যাকে জীবন্ত রাখিতে হইবে। যথা, কিছু কিছু পাঞ্জাবীর না কি "মাতৃভাষা" হিন্দি! অতএব সুবিধাবাদই প্রকৃত রাষ্ট্রমন্ত্র। যে সকল মিথ্যা অভিনয় ও প্রচারের দ্বারা সুবিধাবাদ চালিত থাকে তাহার প্রতিকার না হইলে ভারতের একতা ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে।

অসহায়ের সহায়

দুর্ব্বল সর্ব্বদা সহায় কে হইবে, কাহার সাহায্যে সে নিজ দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা কাটাইয়া উঠিয়া নিজের জীবন সমস্যার উপযুক্ত সমাধানে সক্ষম হইবে; ইহাই সন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দুর্ব্বল যে ভাবেই দুর্ব্বল হোক না কেন; শিক্ষায়, উপার্জ্জনে কিংবা সামরিক শক্তিতে; অপরের সহায়তা সন্ধান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কে বিদ্যা দিতে পারে, কাহার নিকট যাইলে রোজগারের ব্যবস্থা হইতে পারে অথবা কে সামরিক সাহায্য করিতে পারে; এই সকল প্রশ্নই দুর্ব্বলের মনে চির জাগ্রত থাকে। নিজ দেশে বা পরদেশে, যেখানেই সম্ভব, দুর্ব্বল সহায় সন্ধান করে এবং ইহা তাহার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার প্রধান নিদর্শন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে কোন যথার্থ সাহায্য লাভ করে না। তাহার কারণ, যাহারা সাহায্য করিতে পারে, তাহারা দুর্ব্বলকে সাহায্য করিবার অছিলায় তাহার কর্ম্ম ও শ্রমশক্তি ব্যবহার করিয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। নিজ স্বার্থ ভুলিয়া দুর্ব্বলের সাহায্য করিবে এইরূপ শক্তিমান ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি পৃথিবীতে অল্পই আছে। নাই বলিলেই চলে। এই কারণে দুর্ব্বল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, শক্তিমান অধিক ক্ষেত্রেই নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া দুর্ব্বলের সাহায্যে অগ্রসর হয়। পরার্থপরতা সকলের ধর্ম্ম হইলেও, কর্ম্মে তাহার পরিচয় কদাচিৎ পাওয়া যায়। সুতরাং দুর্ব্বল যদি বিদ্যা, অর্থ কিংবা সামরিক শক্তি লাভের জন্য অপরের সাহায্য অনুসন্ধান করে তাহা হইলে তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে সাহায্য অপেক্ষা সাহায্যের মূল্য অধিক হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা চির-বর্ত্তমান। দুর্ব্বলের শোষণই সবলের শক্তিবৃদ্ধির প্রধান উপায়। এই উপায়েই পৃথিবীর সকল শক্তিমান সর্ব্বযুগে নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছে ও এখনও তাহাই চলিতেছে। ভারতবর্ষে অসহায় ও দুর্ব্বল লোকের সংখ্যাই অধিক। এই সকল ব্যক্তি সর্ব্বদাই স্বদেশে ও বিদেশে সবলের সাহায্য সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ান। সাহায্যদাতা যাঁহারা হইতে চাহেন, তাঁহারাও বিশেষ সবল বা কর্ম্মক্ষম নহেন। অনেক সাহায্যদাতা দল বাঁধিয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কোন কর্ম্ম-শক্তির উপরে গঠিত নহে। তাহার পিছনে আছে শুধু ক্ষমতার অভিনয় ও নিষ্ফল আবেগের অভিব্যক্তি। কংগ্রেস দল বিগত অষ্টাদশ বর্ষকাল এই অভিনয় চালাইয়া আসিয়া দেশের ও সাধারণের অবস্থা চরমে আনিয়া ফেলিয়াছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অর্দ্ধেকের অধিক লোক এখনও নিরক্ষর। খাদ্য সম্বন্ধে দেখা যায় অর্দ্ধাহার ও অনাহারের বীভৎসতা। উপার্জ্জন যাহারা করে—যাহাদের সংখ্যা কর্ম্মক্ষম জনসংখ্যার অর্দ্ধেকও হইবে না—তাহারা পায় উপযুক্ত বেতনের অর্দ্ধেকেরও অল্প হারের কর্ম্ম। ছয় লক্ষ গ্রামে ও ছয় হাজার সহরে গৃহ, পথ, জল সরবরাহ ও নিষ্কাশন এবং অন্যান্য সভ্যতার পরিচায়ক ব্যবস্থা প্রায় কোথায়ও দেখা যায় না। চিকিৎসা প্রভৃতির আয়োজন যথেষ্ট বা যথাযথ নাই। এক কথায় দেখা যায় যে কংগ্রেস দল সক্ষমতার অভিনয় করিয়া কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। বিদেশের যে সকল রাষ্ট্র কংগ্রেস দলকে কখন কখন আকাশের চাঁদ হাতে ধরাইয়া দিবার আশা দেখাইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে চীন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভারতের সহিত শত্রুতা করিয়া ভারতের ২০০০০ বর্গমাইল দখল করিয়া বসিয়া আছে। অপর রাষ্ট্র-গুলিও পূর্ণভাবে ভারতের সহিত সখ্য রক্ষা করিয়া চলে নাই। নিজেদের সুবিধা হইলেই তাহারা ভারতকে সাহায্য করিয়াছে; নতুবা তাহাদের সাহায্য ভারতের পক্ষে আরোই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কংগ্রেস দলের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিশেষ সবল নহে। মনে হয় অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলগুলি আশার কথা আওড়াইয়া

জনসাধারণের নিকট নূতন পথে চলিবার পরিকল্পনা ব্যক্ত করিতেছে। এই সকল দলও শক্তিশালী নহে। তাহারাও শুধু ফাঁকা আওয়াজ করিয়া অথবা অপর দেশের উপর নির্ভর করিয়া রণক্ষেত্রে নামিবার চেষ্টা করিতেছে। দুর্ব্বলের সমর্থন লাভ করিয়া কেহ সবল হইয়া উঠে না। অর্থাৎ ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ দেশবাসীর নিকট ভোট সংগ্রহ করিয়া কাহারও নিজের শক্তিবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে। শক্তিবৃদ্ধি হইতে পারে সমবেতভাবে প্রাণ-পণ করিয়া কাজ করিলে। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে শুধু যদি কথা বলা বন্ধ করিয়া সকল তথাকথিত নেতাগণ বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসেন। যদি কোন নূতন নেতা দেশের ভার পাইতে সক্ষম হন, ভোটের সাহায্যে, তাহা হইলে তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া কাজ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে হইবে। শুধু বক্তৃতায় কাজ হইবে না। পরমুখাপেক্ষিতাও তাহাদিগকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে জয়যুক্ত করিবে না।

সবল ও সক্ষম হইবার উপায়

দেশের জনসাধারণ যদি দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়, এবং তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া যাহারা চালাইতে পারে তাহারাও যদি শক্তিহীন হয়, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির উপায় কি? শরীর গঠন কার্য্যে দেখা যায় দুর্ব্বল ব্যায়াম করিয়া সবল হইতে পারে। মনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নিরক্ষর মূর্খ ব্যক্তি পাঠের ভিতর দিয়া নিজ মনের ক্ষমতা অনেক বাড়াইয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং জাতিগতভাবেও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণে দুর্ব্বল সবল ও নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতে পারে। ইহা ব্যতীত কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্জ্জন করাও শুধু কর্ম্মের ভিতর দিয়াই সম্ভব হইতে পারে। আমাদের যে জাতিগত দুর্ব্বল ও বুদ্ধিহীন অবস্থা, তাহার প্রতিকার একমাত্র সাধনার দ্বারাই হওয়া সম্ভব। ব্যায়াম, শরীর চর্চ্চা, শিক্ষা ও কার্য্যক্ষেত্রে সাধনা ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র চালাইতে পারিলে জাতির উন্নতি হওয়া সম্ভব হইতে পারে। বালক-বালিকাদিগকে যদি অল্প বয়স হইতে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া হয় ও তৎসঙ্গে শরীর গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহা হইলে তাহারা অল্পকালের মধ্যেই শরীরে মনে গড়িয়া উঠিতে পারে। ইহার সহিত তাহাদিগকে নানান প্রকার কার্য্য করিতে শিখান যাইতে পারে। কর্ম্মশক্তিবৃদ্ধি বিশেষ করিয়া সাধনা-সাপেক্ষ। বিভিন্নভাবে নানাপ্রকার কার্য্যের ভিতর দিয়া কর্ম্মশক্তিবৃদ্ধি করা সম্ভব। এই ভাবে বালক-বালিকাগণ সহজেই কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সকল কার্য্যই সফল করিতে হইলে ব্যবস্থা ও সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। দশ-পনের কোটি বালক-বালিকা ও যুবজনের শিক্ষার জন্য দুই-তিন লক্ষ বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু জাতিকে সবল, সুশিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে হইলে তাহা না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না। ঐ সকল শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত আরও অনেক লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষালয় স্থাপন করাও আবশ্যক। ইহার উপরে থাকিবে উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রগুলি।

জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবসা সংক্রান্ত বহু বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে ভারতের সর্ব্বত্র বহু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন প্রয়োজন। এই জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র কোথাও কোথাও থাকিলেও যথেষ্ট নাই। ভারতের বিরাট জনসংখ্যার সকল ব্যক্তির অবশ্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ও অবাস্তব মূল্যবান সেবার সরবরাহ ব্যবস্থা করিতে হইলে অসংখ্য ব্যক্তিকে ঐ সকল কার্য্যে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। খাদ্যবস্তু উৎপাদন প্রথম কথা। ইহার মধ্যে রহিয়াছে চাষ, বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য, কুক্কুট, হংস ও পশুপালন, গরু-মহিষ পালন ও দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত ইত্যাদি উৎপাদন ও ধানকল, তেলের কল, আটা-ময়দার কল, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদির কারখানা, হোটেল পরি-চালনা প্রভৃতি। এই সকল কার্য্য ও রন্ধন, পরিবেশন ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে করা শেখান প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই সকল ব্যবস্থা নাই। খাদ্য-সংক্রান্ত আলোচনায় সঙ্গেই উনান, বাসন, আসন প্রভৃতির কথা উঠে। ইহার সহিত চীনামাটির, এলুমিনিয়াম, তামা, পিতল, কাঁসা, প্লাষ্টিক প্রভৃতির ব্যবসা জড়িত আছে। খাদ্য বস্তু নানাভাবে রক্ষা করা, ঠাণ্ডা গুদাম নির্ম্মাণ যাহা খাওয়া যায় না তাহাকে খাওয়ার উপযুক্ত করিয়া নেওয়া ইত্যাদি

বস্ত্রের কথা। বয়ন, সিবন প্রভৃতির বৈচিত্র্য অনন্ত-বিস্তৃত এবং তাহার শিক্ষার অবয়বও অসংখ্য। বস্ত্র বর্ত্তমানে রাসায়নিক উপায়েও তৈয়ারী হয়। নাইলন, রেইয়ন প্রভৃতি আজকাল বিরাট বিরাট কারখানায় প্রস্তুত হয়। এই সকলের সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও শিল্পকৌশল আয়ত্ত করা শিক্ষাকেন্দ্র না থাকিলে হয় না। বস্ত্রের পরে আসে গৃহ ও বাসস্থান এবং আসবাব প্রভৃতির ব্যবস্থার কথা। ইষ্টক, চুন, সুরকি, সিমেণ্ট, পাথর-ইটের খোয়া, ইস্পাতের ছড়, তার, কড়ি-বরগা, কাঠের বা ইস্পাতের দরজা-জানালা ও কাচের পাত, রং প্রভৃতির আয়োজন গৃহ নির্ম্মাণের অন্তর্গত। এই সকল বস্তু ও নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য অসংখ্য কর্ম্মী প্রয়োজন হয় ও তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে ছয় লক্ষাধিক গ্রামে ও সহরে ভারতবাসীর উপযুক্ত বাস-ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইহার পরে আসে শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, শাসন, পুস্তকাগার, ক্রীড়াক্ষেত্র, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র মঞ্চ ইত্যাদির ব্যবস্থা। উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ কৌশল আহরণ ব্যতীত এই সকল কার্য্য চলিতে পারে না। উপরোক্ত সকল প্রকার কার্য্যের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতি গঠন ও উন্নয়ন কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। সকলের উপরের কথা হইল চরিত্র গঠন। অন্যায়, অসত্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ইচ্ছা ও আবেগ সকল ভারতবাসীর মনে-প্রাণে জাগ্রত করা। মূল কথা এইটিই।

দুর্নীতির বহুরূপী অভিব্যক্তি

দুর্নীতি বলিতে অনেকে বুঝেন উৎকোচ গ্রহণ, উচ্চমূল্যে দ্রব্য বিক্রয়, অতিরিক্ত লাভ করা, অন্যায় উপায়ে নিজের বা নিজের লোকের সুবিধা করিয়া লওয়া, অপরের প্রাপ্য বেহাত্ত করা ইত্যাদি। এইগুলিই লোকচক্ষে অধিক পড়ে ও বহু ব্যক্তির অসন্তোষের কারণ হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্নীতির পূর্ণ পরিচয় শুধু ঘুষ বা কালোবাজার চর্চা

চরণ আরো বহুভাবে করা হয় ও তাহার মধ্যে অনেক কার্য্য জাতির পক্ষে মহা ক্ষতিকর, সে কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলা প্রয়োজন। প্রথম কথা হইল জাতীয়তার আদর্শ নষ্ট বা হেয় করা। জাতীয়তার আদর্শ প্রথমত হইল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। সাম্য রক্ষা করিতে হইলে সকল সুযোগ ও সুবিধা সকল দেশবাসীর পক্ষে সমানভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয়দলের নেতা বা সভ্যদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলে সাম্যের আদর্শ নষ্ট করা হয় ও তাহা একটা মহা দুর্নীতির কথা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার তারতম্য করা হয়, তাহাও জাতীয়তার আদর্শ খর্ব্বকর। অর্থাৎ যে যে প্রদেশে তথাকথিত "মাইনরিটি"গণ আছেন; যথা বিহারে বাঙ্গালী কিংবা উত্তর প্রদেশে ভোজপুরী, সেই সকল প্রদেশের নেতাগণ এখন অবধি জাতীয়তার আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন না। মৈত্রীর আদর্শ নষ্ট করার মূলেও রহিয়াছে ঐ প্রাদেশিকতা। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেদের বিবাদ ও নিজ নিজ অধিকার বড় করিয়া দেখিবার আবেগ জাতীয়তা-বিরোধী এবং যে সকল জননেতা এই আবেগ ব্যবহার করিয়া শক্তিমান হইতে চাহিতেছেন; তাঁহারাও দুর্নীতিপরায়ণ। স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেন কম্যুনিষ্টগণ। তাঁহারা ভারতকে বিশ্ব কম্যুনিজমের কবলে ফেলিয়া নিজ দলের সুবিধা লাভ করিতে চাহেন। ইহা দেশভক্তি ও স্বাদেশিকতা-বিরুদ্ধ। স্বাধীনতার আদর্শও ইহাতে নষ্ট হয়। কম্যুনিজমের মধ্যে আরও লুকান আছে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিয়া বিপ্লব আনয়ন ও সেই উপায়ে বিশ্ব কম্যু-নিজমের হস্তে নিজ দেশকে তুলিয়া দেওয়া। ইহার মধ্যে আছে একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতার বিষ, যাহা দুর্নীতির প্রায় শেষ কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও তত্ত্ব

শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল

হাডসন্ট, উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে এখানে মানবচরিত্র, তাদের আচার-আচরণ ও সমাজ-বিন্যাসের পরিচয় সত্যমূলক ভাবে দেওয়া হয়। রোমান্সের মাধ্যমে আমরা জাগতিক জ্ঞান লাভ করে থাকি। ঔপন্যাসিক তাঁর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপকরণ নির্বাচন করেন। এই যে প্রবণতা এ তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এর ফলে, জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ও মতের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। স্বভাবতঃ, উপন্যাসের মূল্য বিচার করতে গিয়ে আমরা শুধু লেখকের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা-মাত্র দেখিনে, দেখি যে তিনি নূতন মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন কি না। এই অর্থে আমরা বলি যে জেন অষ্টেন বা কনরাড, ট্রোলোপ বা বেনেটের চাইতে বড় শিল্পী। আবার, ডি, এইচ, লরেন্সকে জয়েসের অপেক্ষা উচ্চাসন দিয়ে থাকি।

এই যে মূল্যবোধের কথা বলা হ'ল তার অপর নাম জীবন দর্শন, যাকে সমালোচক বলেছেন 'an accent in the Novelist's Voice'। উপন্যাসের উপকরণ বিভাগে কাহিনী, আখ্যান, চরিত্র ও কল্পনা ছাড়াও এই জীবন দর্শনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ঔপন্যাসিক জীবনের একটি বৃহৎ পরিচয়, তার শিল্পগত রূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। বাস্তব জীবন নিশ্চিতরূপে তাঁর আশ্রয়। কিন্তু এর মধ্য থেকে সেই বিশিষ্ট সুরটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। তথাপি এই সুর কোন আরোপিত বিষয় নয়, এ যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাহিনীর বিন্যাস ও চরিত্রের বিকাশের সঙ্গে উৎসারিত হয়ে ওঠে। জর্জ এলিয়ট তাঁর উপন্যাস Adem Bede-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হেটির অনুশোচনায় যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন তার মধ্যে প্রচারের সুর আছে। তাঁর চরিত্র স্থান ও কালের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে চিরন্তন মানব-লোকে আশ্রয় পায়নি। কিন্তু সমালোচক কর্‌ষ্টার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে ডষ্টয় ভেস্কির The Brothers Karamazov উপন্যাসে হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত মিটিয়া (Mitya) চরিত্র কি ভাবে লেখকের জীবন-দৃষ্টির গুণে বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আমরা আমাদের জীবনে অবস্থিত থেকেই এক অনাস্বাদিত রূপ-লোকের পরিচয় পেয়ে থাকি। ডি, এইচ, লরেন্স ভিন্ন রীতিতে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন। এডওয়ার্ড গারনেটকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছেন যে, চিরাচরিত ধারায় মানব-সত্তার পরিচয় দান তাঁর উদ্দেশ্য নয়। মানুষের যে আর একটি গোপন ও রহস্যময় সত্তা আছে তাকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করতে চান। অপর লেখকগণ হয়ত হীরার পরিচয় দেবেন কিন্তু তিনি তার মধ্যে কার্বনকে দেখে থাকেন। 'And my diamond might be coal or soor and my theme is carbon'. এই মনোভাবকে নাস্তিক্য বুদ্ধি প্রণোদিত বলা যাবে না, কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাতে আছে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। জীবনকে নূতন ভাবে দেখবার এ এক বিশিষ্ট রীতি।

বিংশ শতকে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে উপন্যাসের জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। ভ্যান গগ, পিকাসো প্রভৃতির শিল্পসৃষ্টি, চেকভ ও ডষ্টয়ভেস্কির রচনার অনুবাদ, বার্ণার্ড শ'র নাটক, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা স্বাভাবিক কারণে পরিবর্ত্তনের সুর সূচিত করে। এর ফলে উপন্যাসে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু উনবিংশ শতকে উপন্যাসে আমরা ব্যক্তিকে পেয়েছি সমাজ-জীবনের পটভূমিকায়। ব্যক্তিজীবন সমাজাশ্রিত বলে তাকে আমরা স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করি নি। স্বভাবতঃ সেখানে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি এবং লেখক কোন দৃষ্টিতে তাদের গ্রহণ করেছেন। চরিত্রের যে মূল্যবোধ নিয়ে

উপন্যাসের গুণগত বিচার আমরা করি তা কতখানি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভরশীল। আর, এইক্ষেত্রে লেখকের জীবন দর্শন কী ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এই আলোকে আলোচনার যোগ্য। স্বভাবতঃ এই ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রশ্নটি এসে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী-কেন্দ্রিক উপন্যাস কপালকুণ্ডলা থেকে সুরু করে তত্ত্বাশ্রয়ী ত্রয়ী উপন্যাসে এসে তাঁর যাত্রা শেষ করেছেন। ত্রয়ী উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা তাঁর চরিত্রসমূহের পরিচয় পাই। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র একে অনুশীলন-তত্ত্ব রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্ল চরিত্রে এই তত্ত্বের পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আনন্দমঠ ও সীতারামে বিভিন্ন চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করে তিনি দেখিয়েছেন কেন সেই তত্ত্ব সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে নি।

এখন যে প্রশ্নটি মনে আসে তা হ'ল এই যে ধর্মতত্ত্বে ব্যাখ্যাত তত্ত্বটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে প্রয়োগ করেছেন, তা কি অতর্কিতে তাঁর মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল, না, তার সূচনা পূর্বে হয়েছিল এবং উপন্যাসে তার প্রয়োগ তিনি নানাভাবে করবার সুযোগ নিয়েছিলেন।

'বিবিধ প্রবন্ধের' সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সমূহ 'বিবিধ সমালোচনা' নামে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ও অন্যান্যগুলি 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থরূপে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বের হয়। কিন্তু বঙ্গদর্শনে খণ্ড খণ্ড রূপে এরা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার, বিষবৃক্ষ থেকে সীতারাম ১৮৭৩-১৮৮৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কালে উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাসত্রয় বিষবৃক্ষ, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল, ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স চন্দ্রশেখর, (১৮৭৫), ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ (১৮৮২) ও ত্রয়ী উপন্যাস (১৮৮২ ১৮৮৭)। সুতরাং একই মানসিক পরিমণ্ডলে বিবিধ প্রবন্ধ, কমলাকান্ত ও পূর্বোক্ত উপন্যাসসমূহ রচিত হয়েছিল বলে তাদের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। 'বিবিধ প্রবন্ধের' অন্তর্গত 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম, জ্ঞান সম্বন্ধে যে ভক্তি-তত্ত্ব এবং প্রীতিকে অবলম্বন করে অনুশীলন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন তার রসরূপ কমলাকান্তের দপ্তরের নানা প্রবন্ধে পাওয়া যায়। আবার অনুশীলন তত্ত্বে উত্থাপিত সমস্যাসমূহ ও দর্শনকে তিনি তাঁর উপন্যাসে পরীক্ষা করেছেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থ হ'ল দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী। এদের রচনাকাল ১৮৬৫-১৮৬৯, সুতরাং তত্ত্বরূপে যা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদিত হয়েছিল তা বীজরূপে তাঁর মনে ছিল। এইটি কালক্রমে তাঁর মধ্যে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল।

'ধর্মতত্ত্বে' গুরুর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে তরুণ অবস্থা থেকে তাঁর মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়েছিল, 'এ জীবন লইয়া কি করিত? লইয়া কি করিতে হয়? তিনি উত্তর পেয়েছেন যে মনুষ্যত্ব অর্জন মাত্র কাম্য ও সকল ব্যক্তির পূর্ণ সামঞ্জস্যের মাধ্যমে এ সম্ভব হতে পারে। মানুষের মধ্যে যত প্রকার বৃত্তি আছে তাদের উচ্ছেদ কাম্য নহে। গুরু বলেছেন যে প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ, কিন্তু অনুশীলন ধর্ম প্রবৃত্তিমার্গ ও কর্মাত্মক। যেখানে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় তথায় প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়।

বৃত্তিসমূহ শারীরিক ও মানসিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত শারীরিক পুষ্টিসাধন ব্যতীত মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়। আবার মনের যে বৃত্তিগুলি আছে তাদের কর্ম, জ্ঞান ও চিত্তরঞ্জিনী—এই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের জন্য ভক্তি ও প্রীতি, এই দুই বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রীতি স্বজাতি, স্বদেশ ও বিশ্বকেন্দ্রিক। ভক্তির পাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেও ঈশ্বর তার পরিণাম। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নয়, ভক্তি আপনার উন্নতির জন্য উৎসারিত। ভক্তির পাত্র পিতামাতা, সমাজ ও সমাজ-শিক্ষক। সমাজ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ-পোষণ এবং রক্ষা-কর্তা, সমাজই রাজা। সমাজই শিক্ষক।

মানসিক বৃত্তিসমূহের ঈশ্বরানুবর্তিতার নাম ভক্তি। এই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নেই। বেদে কাম্যকর্মের

উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি মনুষ্যত্ব লাভের প্রতিকূল বলে গীতায় নিষ্কাম কর্ম পালনের কথা বলা হয়েছে। এই কর্মপালনের নাম ভক্তি। কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হয়। কর্মে যখন চিত্তশুদ্ধি হয় তখন জ্ঞানে অধিকার জন্মে। কর্মের দ্বারা মানুষ হয় সংযতকর্মা ও জ্ঞানের দ্বারা তার সংশয় ও মোহ ছিন্ন হয়ে থাকে। এই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান তাকে ভক্তি বলা যায়। একে গীতায় জ্ঞানকর্মন্যাস যোগ বলা হয়েছে। প্রকৃত সন্ন্যাস কর্ম ত্যাগ নয়, নিষ্কাম কর্ম পালন। ভক্তিযুক্ত কর্মই প্রকৃত সন্ন্যাস।

ভক্তি ও প্রীতি অভিন্ন। প্রীতি পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজ, স্বদেশ ও বিশ্ববোধে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। জাগতিক প্রীতি প্রীতিবৃত্তির শেষ কথা। ঈশ্বরে যেরূপ জগৎ গ্রথিত, প্রীতিতেও জগৎ গ্রথিত।

ধর্মপালনের জন্য সমাজ প্রয়োজন। সমাজ-গঠনের মূলে আছে দাম্পত্যপ্রীতি। বিবাহের মূল কথা হ'ল স্ত্রী-পুরুষ একত্র হয়ে সংসার জীবন যাপন করবে। জগতের রক্ষা ও ধর্মাচরণের জন্য দাম্পত্যপ্রীতি অপরিহার্য। কিন্তু আমার আত্মসর্বস্ব দাম্পত্যজীবন প্রকৃত সুখের কারণ হয় না।

দাম্পত্যজীবন যাপন করতে হলে সমাজ-জীবন আবশ্যক। সমাজ ব্যক্তির মঙ্গল ও উৎকর্ষের একমাত্র আশ্রয়। এই অর্থে স্বদেশ-প্রীতি কাম্য ও বরণীয়। গুরু ব্যাখ্যা করেছেন :

> সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ ধ্বংসে, সমস্ত মনুষ্যের ধর্মধ্বংস।

এই হেতু স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু এখানে সমধর্ম অবলম্বন করতে হবে। কোন মানুষ বা সমাজের অনিষ্ট সাধন যেমন গর্হিত, আবার অপরে আমাদের সমাজের ক্ষতি সাধন তারও প্রতিরোধ করতে হবে। স্বদেশ ও স্বজনপ্রীতি জাগতিক প্রীতির দিগ্বলয়কে স্পর্শ করে সমাপ্তি লাভ করে। দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতির সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। যেখানে এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটেছে সেখানে দেশপ্রীতি বরণীয়। গুরু উপসংহারে বলেছেন 'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'

নরনারীর জীবনে যে শক্তি বা বৃত্তিসমূহ আছে তাদের প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। এই চরিতার্থতা নির্ভর করছে তাদের সামঞ্জস্যের উপরে। একদিকে ব্যক্তি অপর দিকে সমাজ, এই উভয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ সহজে হতে পারে যদি ব্যক্তির চরিত্রে বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে সমতা স্থাপিত হয়। 'প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়'। প্রকৃতি সহায়ক বটে, কারণ তা উদ্দীপন বিভাগের কাজ করে। ব্যক্তির মানসিক সংস্কার ও শিক্ষা এবং সমাজশক্তি পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে সাম্য স্থাপনে সাহায্য করে। প্রকৃতির শক্তি ও ইচ্ছা নারীর মধ্যে প্রকাশিত; তাই অনেক ক্ষেত্রে তথায় দুর্দমনীয় বেগ, দুর্নিবার জ্বালা এবং সমাজ-শক্তির বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়। শিল্পী বঙ্কিম নারী-চরিত্রে এই রহস্য প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

প্রকৃতির স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের বন্ধনের সংঘাত আছে। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-দুহিতা। বিবাহিত জীবনে এসেও সে তার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে পরিহার করতে পারে নি। প্রকৃতির সাহচর্যে থাকাকালীন তান্ত্রিক ধর্ম-সংস্কার তার মনে দৃঢ়মূল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। এই ধর্মবোধের সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের বিরোধিতা আছে। তাই স্পর্শমণির স্পর্শে গোপিনী গৃহিণী হলেও ঘরণী হতে পারে নি। স্বামীর সত্তা সমাজ-সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারলে কপালকুণ্ডলা স্বামীকেও অন্তরে গ্রহণ করতে পারত।

> কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিলেন?

কপালকুণ্ডলা যে সুখ অনুসন্ধান করেছে তার নাম মুক্তি। এই মুক্তি 'সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ।'

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দু'টি নারী চরিত্র নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ।ক বিরাট পরীক্ষা করেছেন। এক'দিকে প্রবৃত্তি-তাড়িত, ষ্মন-অসহিষ্ণু শৈবলিনী, অন্যদিকে পতির অনুরাগিণী ?বাহতা দলনী বেগম। প্রকৃতির যে শক্তি নারীর মধ্যে ক্ষারিত তা মহা ভয়ঙ্করী, নানা রূপরঙ্গিনী অথচ র্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা ও সর্বকামনাপূর্ণকারিণী। ঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা দিয়েছেন জড় প্রকৃতির :

> কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তা যে জানি না —তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তি-ময়ী, তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়।

যে জড় প্রকৃতির প্রভাব নারীর মধ্যে ব্যাপ্ত সে ।কাধারে অশেষ ক্লেশের জননী, আবার সর্বসুখের ।াকর। তার 'দয়া নাই, মমতা নাই, জীবের প্রাণনাশে ষ্কোচ নাই।'

প্রকৃতির মধ্যে এই যে বিরোধী রূপ ও শক্তি তা কদিকে যেমন শৈবলিনীকে গৃহধর্ম থেকে আকর্ষণ রেছে, তা আর দলনী বেগমকে পতির সর্বাঙ্গীণ ল্যাণে নিয়োজিত করেছে। জলপ্রবাহের সঙ্গে ৗবলিনীর সাদৃশ্য আছে। 'জলে দাগ বসে না, যুবতীর দয়ে বসে কি?'

শৈবলিনী প্রতাপের রূপবহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ য়েছিলেন। প্রতাপকে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি কি ।ান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য ইয়াছিল?' অপর দিকে, গুরগণ খাঁ কর্তৃক প্রস্তাবিত ।পর স্বামী গ্রহণের কথায় দলনী উত্তর দিয়েছিলেন, ৗলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম আছে তাকে তুমি ।ান না। বিষপান করবার পূর্বে তিনি বলেছিলেন। তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই ।ামার বিষ।' দলনীর ক্ষেত্রে যে সামঞ্জস্যের ।রিচয় পাওয়া যায়, শৈবলিনীর চরিত্রে তা অনুপস্থিত। ববাহিতা রমণী হয়েও তিনি সামাজিক নীতি গ্রহণ ৃরতে পারেন নি। তাই তাঁর দুঃখ।

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, এ দু'টি সামাজিক ।পন্যাসে বঙ্কিম সমাজ-জীবনের সমস্যা উপস্থিত করেছেন। একদিকে ব্যক্তিজীবনে অসংযত প্রবৃত্তির দাবদাহ ও অপরদিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজজীবনের সংঘাত ও তার ফলাফল। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে রিপুর প্রাবল্য বিষবৃক্ষের বীজ। ঘটনাধীনে এ সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হয়ে থাকে। কোন কোন মানুষ উচ্ছ্বসিত মনোবৃত্তি সংযত করতে পারেন, আবার কেউ কেউ তা পারেন না। 'চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই ত বৃক্ষের বৃদ্ধি! এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী, একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই।' তিনি আরও লিখেছেন :

> চিত্তসংযম পক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

আসল কথা চিত্তসংযম। এই সংযমের অর্থ হ'ল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান। মানুষের সকল বৃত্তির স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য ও পরিতৃপ্তির উপরে সুখ নির্ভর করে। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্তিকে লোভ বলে তার সমঞ্জসীভূত ভোগ আনন্দের। যা উচিত মাত্রায় ভোগ করলে ধর্ম হয় তার অসংযত ব্যবহার অধর্ম। তবে 'দমনই প্রকৃত অনুশীলন; কিন্তু উচ্ছেদ নহে।' বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলাল রূপ-পিপাসায় তাঁদের সামঞ্জস্য বিনষ্ট করেছিলেন। একজনের ক্ষেত্রে, সূর্য্য-মুখীর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মোহ ভঙ্গ হ'ল। কুন্দকলির আকর্ষণ ছিল কিন্তু পূর্ণরূপে বিকশিত না হওয়ায় আচরণে ছিল ভীরুতা। তাই নগেন্দ্রর পক্ষে অমৃত হয়ে উঠেছিল বিষ। আর গোবিন্দলাল অসংযত ভোগের মধ্যে উপলব্ধি করলেন যে রোহিণী অমর নয়। রোহিণীর মধ্যে দাহ আছে কিন্তু স্নিগ্ধ মাধুর্য নেই, নেই সন্ধ্যাদীপের শান্ত আশ্বাস। রোহিণীর আত্মসমর্পণের পশ্চাতে ছিল তার অতৃপ্ত কামনা ও ভ্রমরের দাম্পত্য সুখের প্রতি ঈর্ষা।

সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রর প্রেমমুগ্ধা। নগেন্দ্রর আশ্রয় ছেড়ে সে কলিকাতায় যেতে চায় না, কারণ তা হ'লে সে তার প্রেমাস্পদকে দেখতে পাবে না। অথচ সে সূর্য্যমুখীরও ক্ষতিসাধন করতে চায় না। গৃহ

থেকে বহিষ্কৃতা হয়ে কুন্দ তাকিয়ে রইল নগেন্দ্রর গবাক্ষের দিকে। মুক্ত গবাক্ষের মধ্যে দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ শয্যাগৃহে প্রবেশ করছে। কুন্দ পতঙ্গের মত পুড়ে মরতে চায়। সে মনে করেছিল 'আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?'

কুন্দ ও রোহিণীর ক্ষেত্রে যে জ্ঞানের অভাব ছিল তা হ'ল 'সকল সুখেরই সীমা আছে'। তারা উভয়েই অপরের বিনিময়ে সুখ চেয়েছিল। অপরকে বঞ্চিত করে তাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। যে কামনার সঙ্গে শুভবুদ্ধি ও কল্যাণবোধের সংযোগ নেই, তা বিনষ্ট হতে বাধ্য।

অপর একটি সমস্যাও চন্দ্রশেখর ও এই দুই উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তি যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে সমাজ-নীতি বা অনুশাসন অতিক্রম করতে চায়, সেখানে তার অধিকার কতদূর স্বীকার হবে? বিংশ শতকে ব্যক্তি সর্বাধিক মূল্য লাভ করেছে, কিন্তু গত শতকে সমাজের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে স্বীকৃত করা হ'ত বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ছিলেন সমাজের সমর্থক। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি লিখেছেন যে সমাজের বাইরে আছে পশু-জীবন কিন্তু এর মধ্যে আছে ধর্মজীবন।

> সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকারমঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম ধ্বংস।

এই আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, শৈবলিনী, কুন্দ ও রোহিণীর কার্য্য সমর্থনযোগ্য নয়। তবে বঙ্কিমের মত ও বিশ্বাস যা থাক্, তিনি মূলতঃ শিল্পী। শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি তাঁর নায়িকাদের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নীতি প্রচারের জন্য তিনি উপন্যাস রচনা করেন নি। অথচ অনেক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে নীতিবিদের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য স্মরণীয়। 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতি-জ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্ত-শুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না

শৈবলিনীর মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা, যে মানসিক অসন্তোষ ও সমাজ বিদ্রোহ দেখে বঙ্কিমচন্দ্র বিমূঢ় হয়েছিলেন, 'রজনী' উপন্যাসে লবঙ্গলতার মধ্যে তার বিপরীত রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করে চরিতার্থ হয়েছেন। যে প্রণয়ের জন্য বিবাহিতা শৈবলিনী গৃহত্যাগ করেছিল, লবঙ্গলতা বিবাহ-বহির্ভূত সেই প্রণয়কে স্বীকার করে নি। যে প্রণয়ী অমরনাথকে বলেছে :

> না,—সে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, স্বয়ং তিনি মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহ কখন হইবে না!

বিবাহ বহির্ভূত নারীর প্রেম সমাজ-সামঞ্জস্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এ অনুশীলন-তত্ত্বের বিরোধী। রাজসিংহ উপন্যাসে নির্মলকুমারী ঔরঙ্গজেবকে বলেছিল :

> আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন দরিদ্রকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী।

পুরুষ চরিত্রে রূপোন্মত্ততা-জনিত প্রেমের যে বিকার নগেন্দ্র বা গোবিন্দলালের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ও যা অসংযত ভোগ-প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করে, তার বিপরীত দিকটি প্রতাপের চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত করেছেন। প্রতাপের প্রেমের নাম আত্ম-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। 'রজনীর' অমরনাথের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপের ন্যায় তিনিও পরের সুখ কেড়ে নিতে চান নি বলে রজনীকে সানন্দে শচীন্দ্রের হস্তে দান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?' অমরনাথ আত্মত্যাগের মাধ্যমে সুখের পরিচয় পেয়েছিলেন। একদিকে লবঙ্গলতার মুখে যদি লোকান্তর থাকে তার প্রতিশ্রুতি ও অন্যদিকে রজনীর দাম্পত্যজীবনের আশ্বাস তাঁকে সুখী করেছিল। সুতরাং যে সমন্বয়ের সূত্র বঙ্কিম অনুসন্ধান করছিলেন তা তিনি পেয়েছিলেন। প্রবৃত্তি সমূহকে পূর্ণ সামঞ্জস্য যে

নর-নারীর জীবনে গৌরব, উপন্যাসে এই সত্যে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। একদিকে রাজসিংহ ও অপর দিকে প্রফুল্ল চরিত্রে।

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের উপসংহারে রাজসিংহকে ধার্মিক বলে অভিহিত করে তাঁর কাছে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ধার্মিক এই অর্থে যে তিনি শাসন ব্যবস্থায় শুধু সমদর্শী ছিলেন তাই নয়, ব্যক্তি জীবনেও তাঁর মধ্যে সকল ব্যক্তির সামঞ্জস্য ঘটেছিল। তিনি কাম্যকর্ম করেন নি, নিষ্কাম কর্ম ধর্মরূপে পালন করেছেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়',—অধ্যাত্মচেতনময় হয়ে রাজসিংহ অনুষ্ঠেয় কর্ম করেছেন। তাঁর চরিত্রবল অসাধারণ। চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার করেও তিনি তাঁকে বিবাহ করেন নি। তাঁর পিতার অনুমতির জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'যতদিন না তোমার সঙ্গে আমার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়, ততদিন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না'। বঙ্কিমচন্দ্র ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজসিংহের দেশহিতৈষতার প্রশংসা করেছেন। বাদশাহের আক্রমণ থেকে রাজসিংহ স্বদেশ ও স্বজাতিকে রক্ষা করেছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে' বলা হয়েছে :

> আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম, কেন না, এ স্থলে আপন ও পর উভয়ের রক্ষার কথা এবং ধর্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা।

রাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশের নায়করূপে রবীন্দ্রনাথ ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ ও বিধাতা পুরুষের নাম করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে নায়ক নির্বাচন করেছেন, কারণ তাঁর চরিত্রে সকল ব্যক্তির, শারীরিক ও মানসিক, সামঞ্জস্য ঘটেছে। এ জীবন লইয়া কি করিব, এই যে প্রশ্ন তার সদুত্তর রাজসিংহ চরিত্রে তিনি লাভ করেছেন। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, অমরনাথ—এই সোপানসমূহ অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ-চরিত্রে এসে পূর্ণতার পরিচয় লাভ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে করেছেন দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ঈশ্বর-ভক্তি ও সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু প্রাচীনগণ সার্বলৌকিক প্রীতিতে দেশপ্রীতি ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষাও যে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম ও জগতের হিতের উপায়, সে সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। পূর্বোক্ত এই দুই প্রীতির সামঞ্জস্য স্থাপন অনুশীলন-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাসে এই তত্ত্বকে রসলোকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

আনন্দমঠের দেশপ্রেম, সংগঠন শক্তি, যুদ্ধজয় প্রভৃতির বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ উঠেছে। দেশে অরাজকতা ও বিপ্লব দেখা দিলে একদল নিঃস্বার্থ মানুষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তাদের সংগঠন-প্রতিভা, প্রলোভন জয়, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সমুন্নত আদর্শবাদ অনুশীলন সাপেক্ষ এবং সমসাময়িক জীবনবোধের দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত। সন্তান সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনসাধারণের যে অংশ যোগদান করেছিল তারা দীক্ষিত নয়। তাদের জড়শক্তির আকর্ষণ সন্তানদের আদর্শবাদে আঘাত করে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। সুতরাং এই জনতার সাহায্য ও সমর্থনের উপরে উন্নত আদর্শবাদ গড়ে তোলা যায় না। ভবানন্দ-জীবানন্দ কোথায় কবে রণকৌশল শিক্ষা করলেন; কি ভাবে তাঁরা যুদ্ধজয় করলেন তার বাস্তব ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র না দেওয়ায় কাহিনী বাস্তবরসপুষ্ট হতে বাধা পেয়েছে। তবে ভবিষ্যৎ চিত্রের দিক থেকে, তার সম্ভাব্যতার দিক থেকে আনন্দমঠের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। 'সকল ধর্মের উপরে দেশপ্রীতি'—এই তত্ত্ব এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে', 'আবার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব নিয়ে আনন্দমঠ রচিত।

> সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জল কল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত-করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে

চলিব তোমার মুখ রাখিব! উঠ মা, দেবি দেবানু-গৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি! মা উঠিলেন না।

সন্তান সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় কর্মের প্রেরণার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের সূচনায় দুর্ভিক্ষের চিত্র ও এই সম্প্রদায়ের দুর্বলতা চিহ্নিত করবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে লুঠ-তরাজের প্রলোভন এবং ভবানন্দের দুর্বলতার ছবি অঙ্কিত করেছেন।

সত্যানন্দের আদর্শ যেমন দেশপ্রীতি, দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠকের আদর্শ হ'ল নিষ্কাম ধর্ম। শেষোক্ত গ্রন্থে দেশসেবা বা অত্যাচারীর প্রতিরোধ উপলক্ষ্য। আসল কথা প্রফুল্লকে নিষ্কাম ধর্মের ব্রতে দীক্ষিত করে তোলা। প্রফুল্ল বৈরাগ্যের দীক্ষা গ্রহণ করলেও পরিশেষে গার্হস্থ্য জীবনকে গ্রহণ করেছেন। যিনি ছিলেন রাণী, তিনি অনায়াসে নেতৃত্বপদ পরিহার করে ব্রজেশ্বরের সতীন-কণ্টকিত সংসারে প্রবেশ করলেন। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কোন বিক্ষোভ নেই। সমাজ-জীবন যে ব্যক্তির আশ্রয়স্থল তাই প্রদর্শিত হয়েছে। প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষা পেয়েও শুষ্ক সন্ন্যাসের পথ গ্রহণ করেন নি। সীতারামে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে জয়ন্তীর প্রভাবে শ্রী যেমন নারীর সহজাত মাধুর্য হারিয়ে আসক্তিহীন হয়েছিল, নিশির সাহচর্যে প্রফুল্লর চরিত্রে তা হয় নি। বরং নিশি তাঁকে মমতা ও সমবেদনা দিয়ে পুষেছেন ও নারীরূপে তাঁকে সংসারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করেছেন। এই ক্ষেত্রে স্মরণীয় ধর্মতত্ত্বের উক্তি 'নিষ্কাম কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে'। শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহনকালে প্রফুল্ল চরিত্র কোথাও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি আকর্ষণ বিস্মৃত হয় নাই। পারিবারিক প্রীতি যে অনুশীলন ধর্মের প্রথম সোপান, এই তত্ত্ব উপন্যাসে বঙ্কিম প্রদর্শন করতে চেয়েছেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমের নিসর্গ-বর্ণনায় কলা-কৌশল। প্রকৃতির সৌন্দর্য গূঢ় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। কপালকুণ্ডলা থেকে সীতারাম পর্যন্ত বঙ্কিমের এই চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার আরণ্য-দেশের রহস্যময়তা নায়িকার মানস-প্রকৃতি গঠনে সহায়তা করেছে। শৈবলিনী চরিত্রের সাঙ্কেতিকতার পশ্চাতে আছে ভাগীরথীর প্রবাহ। প্রফুল্ল চরিত্রের সঙ্গেও ত্রিস্রোতার উদ্বেল প্রবাহের এক আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। তার প্রেমোন্মুখ হৃদয় যেন চন্দ্রালোকিত বেগবতী নদী, প্রবাহের সঙ্গে সমধর্মিতা স্থাপন করেছে। প্রকৃতি যে প্রবৃত্তির আধার এই তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নায়িকাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

'সীতারামে' ধর্মতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে তা উপন্যাসের ধর্মকে আচ্ছন্ন করে নি। এই উপন্যাসের মুখবন্ধে গীতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। তবে উপন্যাসের রস গ্রহণ করতে যেয়ে যদি গীতোক্ত তত্ত্বের কথা পাঠক বিস্মৃত হন তথাপি তা' রস গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে না। উপন্যাসের মানবিক আবেদন কোথাও বিঘ্নিত হয় নি। সীতারামের উদার চরিত্র কী ভাবে দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন হয়েছিল ও তা থেকে তিনি কোন্ পন্থায় উদ্ধার পেতে পারেন, সেই ইঙ্গিত উদ্ধৃত শ্লোকরাজির মধ্যে আছে। তবে তত্ত্ব যাই থাক, ঘটনার কার্য-করণ সূত্রে তাঁর অধঃপতনের চিত্রটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর চরিত্রে উচ্চ ভাবের সঙ্গে সাধারণ দুর্বলতা, যা রূপতৃষ্ণা তা কী অনিবার্য বেগে তাঁর চরিত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় গ্রন্থকার দিয়েছেন। রূপ ধ্যান তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যানধারণাকে বিপর্যস্ত করে দিল সেই কাহিনী বাস্তব নিপুণতা সহকারে বঙ্কিম প্রদর্শন করেছেন। আবার তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি কী ভাবে সকল দুর্বলতা পরিহার করে পূর্ব জীবনের মহত্ত্ব ফিরে পেয়েছেন তা সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। একে নিছক কল্পনাপ্রসূত ভাবাতিরেক বলা সঙ্গত হবে না, কারণ চরিত্রের ক্রম-পরিণামের সঙ্গে বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে।

দিনের পর দিন রাজা শ্রী-র সন্নিধ্যানে চিত্তবিশ্রামে কাল কাটিয়েছেন। এতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা

দিয়েছে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত, তবুও তাঁর চেতনা নেই। শ্রী তাঁকে বলেছিলেন 'রাজর্ষিগণ কখনও বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্মিনী সহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব'। কিন্তু শ্রী-র রূপ তাঁর মনে প্রবৃত্তির আগুন জালিয়ে দিয়েছিল। রোমান্স কল্পনার প্রসার প্রলেপ শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্রদ্বয়ে পড়েছে। জয়ন্তী যেন মূর্তিমতী রাজলক্ষ্মী, সীতারামের বিশুদ্ধ বিবেক ও নিষ্কাম ধর্মের মূর্ত প্রতীক। প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবেন বলে শ্রী পরিত্যক্তা হয়েছিলেন কিন্তু প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ-ভাবে তা তিনি হয়েছিলেন। তিনি রাজার ধর্মপত্নী হয়েও রাজাকে ত্যাগ করেন নি। রাজার অন্তরে কামনা প্রজ্জ্বলিত করে তিনি সন্ন্যাসিনী রয়ে গেলেন। জয়ন্তী তাঁকে বলেছিলেন 'রাজধানীতে যাও। রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধানমন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্মে রাখ। এ তোমারই কাজ। কিন্তু শ্রী উত্তর দিয়েছিলেন যে জয়ন্তীর নিকট তিনি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম শিখেছেন, মহিষীর ধর্ম শিখেন নি। অথচ সন্ন্যাসিনীর ধর্মে অনুরক্ত থাকায় রাজা ও রাজ্যের সর্বনাশ হ'ল। জয়ন্তী তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন অনুষ্ঠেয় কর্ম, অনাসক্ত হয়ে ফলত্যাগপূর্বক নিয়ত অনুষ্ঠান করা। কিন্তু রাজ সন্নিধানে থেকে শ্রী-র পক্ষে এই ব্রত পালন করা সম্ভব হ'ত না। তা হয়নি বলে রাজা ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম চরিত্রের পতন দেখিয়েছেন কিন্তু সামঞ্জস্যের অভাব শ্রী চরিত্রেও আছে। গঙ্গারামের পরাজয়ের পরে তাঁর চিত্তবিশ্রামে বাস করা সঙ্গত হয়নি। এতেই রাজা বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় আচরণ করেছেন।

> ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
> তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ গীতা-২.৬৭

ঘূর্ণায়মান বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে বিচলিত করে তদ্রূপ বেগবতী ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন যাহাকে অনুসরণ করে তার বিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

সুতরাং রাজার মানসিক সংঘাত ও প্রতিক্রিয়ার জন্য শ্রী দোষমুক্ত হতে পারেন না। শ্রী স্বামীকে চেয়েছিলেন। 'আমি ঈশ্বর জানি না—স্বামীই জানি। ...স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না।' কিন্তু ভবিতব্যের জন্য সে স্বামীকে ধরা দিল না। রাজা ও রাজ্য ধ্বংস হ'ল। শ্রী-ও অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

দেবীচৌধুরাণীতে প্রফুল্লর মুখে নিশি শুনেছে যে ভক্তি ও ভালবাসা তার কাছে নূতন। নিশি উপলব্ধি করেছে 'ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি'। নিশির নিকটে ব্রজেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর এক, কিন্তু প্রফুল্লর কাছে তা নয়। সে তাই রাণী-গিরি ত্যাগ করে সংসারে মন দিল। সাগর বৌ তাকে জিজ্ঞাসা করেছে:

> যোগশাস্ত্রের পর ব্রজ ঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মা'র হুকুম-বরদারি কি ভাল লাগিবে?

প্রফুল্ল উত্তর দিয়েছে:

> ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম; রাজত্ব স্ত্রী-জাতির ধর্ম নয়। কঠিন ধর্মও এই সংসার ধর্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।

এখানেও সেই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্যের প্রশ্ন। উপরন্ত, পারিবারিক প্রীতি যে অপর প্রীতি সমূহের ভিত্তিভূমি সে কথা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। পারিবারিক প্রীতির বৃত্তকে কেন্দ্র করে প্রীতি ও ভক্তি বিশ্বপ্রীতি রূপ দিগন্তে এসে সম্পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

আচার্য যদুনাথ সরকার সীতারাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে গ্রীক ট্রাজেডির ন্যায় এখানে অদৃষ্টের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব জয়যুক্ত হয়েছে। তথাপি পার্থক্য আছে। গ্রীক নাটকে জগতের নৈতিক শক্তিকে আঘাত করবার জন্য নিয়তি ক্রুদ্ধ হয়েছে। ঈডিপাসের কাহিনী এই সত্যকে প্রমাণিত করে। রাণী ক্লাইটেমনেস্ট্রার ক্ষেত্রেও তাই। নিরপরাধা এন্টিগনীর মৃত্যু পরোক্ষ ভাবে নিয়তির দুর্বার প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু শ্রীর ক্ষেত্রে ছিল ভবিতব্যে অন্ধ বিশ্বাস। তবে পরে, গার্হস্থ্য ধর্ম রূপ নীতিকে লঙ্ঘন করবার ফলে সে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হয়েছে। 'আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে অদৃষ্টের খেলা নাই, সেখানে পুরুষকারই জয়ী'।

প্রজ্জ্বলন্ত

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

কলকাতা ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে। সিঁথির মোড় পার হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে আরও কিছুটা এগোলে ডানদিকে নতুন একটা কলোনি। বাসরাস্তা থেকে মাত্র দু'মিনিট হাঁটতে হয়। বাড়ীটা নতুন। দোতলায় একটাই মাত্র ঘর। ঘরের সঙ্গে ছাদ। চারদিক খোলা। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল নিরঞ্জনের।

নীচের তলায় থাকে তার এক পুরনো বন্ধু পশুপতি। সেই সন্ধান দিয়েছিল। এমন একটা নির্জন পরিবেশেই একটা ঘর খুঁজছিল নিরঞ্জন। দোতলায় পৌছলে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আর একা মানুষ সে। সঙ্গে একটি চাকর শুধু। নিরঞ্জনের কোন অসুবিধেই নেই।

প্রশস্ত ঘরটার চারপাশে জানলা। ঘরে অতিরিক্ত জানলা না থাকলে নিরঞ্জনের ভালো লাগে না। শুয়ে শুয়ে যদি আকাশে মেঘের খেলা না দেখা যায়, তবে তেমন ঘরে থেকে কি লাভ? ক্যাম্বিসের আরামচেয়ারে ব'সে সারাটা সন্ধ্যেই হয়ত কেটে যাবে। সূর্য্যের সোনালি রোদ চোখে লাগলে হাত বাড়িয়ে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেই হবে। যখন প্রবল বর্ষণে আকাশ মুখর হয়ে উঠবে তখন উন্মুক্ত ছাদে ব'সে আদুল গায়ে স্নান করা চলবে। নিরঞ্জন এর চেয়ে বেশী কিছু চায় নি।

প্রথম দিনটা সে খোলা ছাতে চেয়ার পেতে বসে' রইলো। দক্ষিণ দিকে একটা পুকুর। এ পাড়ার যত লোক ওই পুকুরের পার দিয়ে বি. টি. রোডের দিকে হেঁটে যায়। অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় এই ছাতটিতে ব'সে।

সন্ধ্যের পর ঝিরি ঝিরি বাতাস বইল। তখনও অস্পষ্ট আলোতে রাস্তার লোক চেনা যায়। নিরঞ্জন চেয়ে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল এই মুহূর্ত্তে পুকুর থেকে স্নান করে যে মেয়েটি উঠে গেল, তার হাঁটার ধরন তার যেন বড্ড চেনা।

নিরঞ্জন, আপন মনেই হাসল। নিজের মনকে সে চেনে। মন যখন ছাড়া পায়, তখন সে বড্ড খেয়ালী হয়ে ওঠে। খুঁজে দেখতে চায় পরিচিতকে। হঠাৎ অচেনার মধ্যে গত জন্মের এক চেনা স্মৃতিকে আবিষ্কার করে।

রাত্রে পরিপূর্ণ একটা ঘুম দিল সে। খুব ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, নিরঞ্জন উঠেই আগে সামনের জানলাটা খুলে দিল।

হঠাৎ মনে হ'ল তার সামনের দোতলার জানলা থেকে কে যেন স'রে গেল। যে সরে গেল তার চোখ দু'টি যেন বড্ড চেনা। তার করুণ মুখের ছবিটিতে যেন অনেক পরিচিত একটা মুখের ছায়া আছে। নিরঞ্জন সেই মুখটিকে আর একবার দেখবার আশায় অনেকক্ষণ আকুল হ'য়ে চেয়ে রইলো। কিন্তু আর দেখা গেল না তাকে।

নিরঞ্জন সরে এল জানলা থেকে। ট্রাঙ্কে পুরনো বই-খাতার স্তূপ হাঁটকে—একটা মোটা বাঁধানো খাতা বার করল। অনেক পুরণো, কবে যেন লিখে রাখা একটা গল্পের আধখানা খসরা। নিরঞ্জন নতুন ক'রে সেটা পড়তে বসল। নতুন একটা নাটক লিখে দিতে হবে কয়েক দিনের মধ্যেই। নিরঞ্জন খাতার পাতা ওলটাতে লাগল।

* * *

...সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার। কলকাতা থেকে অনেক দূরে মফঃস্বলের রেল ষ্টেশন। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ঘণ্টাচারেক লাগে পৌছতে। ষ্টেশনে কেরোসিনের আলো, রাস্তা অন্ধকার। ট্রেন থেকে যে দু'চারটে লোক নামল, তারা লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিল সঙ্গে।

বিকেলে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কচু গাছের পাতায় পাতায় জলের বিন্দু। সুরকির রাস্তার দু'পাশে কাদা। অন্ধকার উৎকীর্ণ ক'রে ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁ পোকার কলতান। হাঁটতে হচ্ছিল সতর্ক হয়ে। কোঁচার ধুতিটাকে হাঁটু পর্য্যন্ত টেনে তুলে। সঙ্গের একটা লোক কেবল হাততালি

দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করায় বলল—হাততালির শব্দে তেনারা সরে যান পথ থেকে।

মাসতুতো দিদি থাকে শক্তিগড়ে। আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—কিরে, খবর না দিয়েই হঠাৎ?

—তোমায় যে দেখতে ইচ্ছে করল।

—তাই নাকি? আয়, হাত-পা ধুয়ে নে। আমি চায়ের জল বসাই।

দিদির মুখে প্রচ্ছন্ন একটু হাসির রেখা।

কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেল সেই মেয়েও—যার নাম উষা। সে বলল—এরই মধ্যে আবার এলে যে মণিদা?

—এলাম তোমারই জন্য। নইলে কলকাতা ছেড়ে এই ভুতুড়ে বাঁশ আর কচুবনে দিনরাত শুধু উচ্চিংড়ের ডাক শুনতে মানুষ আসে?

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। নিবিড় হয়ে এল রাত। চারিদিকে নিশুতি স্তব্ধতা।

—চলো, তোমাকে নিয়ে যাই উষা।

—কোথায় নিয়ে যাবে মণিদা?

—কলকাতায়। আমার একটা নাটক এবার থিয়েটারে নিচ্ছে। কিছু টাকা পাবো তাতে। একটা বই উৎরে গেলে আমার দাম বাড়বে বাজারে। টাকার অভাব হবে না তখন। যাবে?

—কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে মণিদা? কি ব'লে পরিচয় দেবে?

উষার হাত চেপে ধরলো মণি। বললো—যে পরিচয়ে তোমাকে মানাবে। যে পরিচয়ে নারী পুরুষের কাছে যায়। যাবে না উষা?

—নিশ্চয়ই যাবো। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাবো। কিন্তু সত্যি নিয়ে যাবে ত?

*   *   *

দু'টি বাচ্চা ছেলে নীচে খেলা করছিল। তাদের শিশু-কণ্ঠের কলস্বরে উঠে বসলো নিরঞ্জন। দোতলার পূর্বদিকে রাস্তা। জানলা দিয়ে সোজা নীচে তাকালো সে। দু'টি ছেলের মধ্যে একটির বয়েস বছর সাতেক হবে, কিন্তু আর একটির বয়েস তিনের বেশী নয়।

বড়টির মুখ ভালো লাগলো নিরঞ্জনের। হঠাৎ ভালো লাগলো। মনে হ'ল ওর স্থির চোখে বয়েসের গাম্ভীর্য্য প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। ছোটটির হাত সযত্নে ধ'রে সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা শিশুর মুখ এমন স্বপ্নালু হয়?

চাকরকে ডেকে বললো নিরঞ্জন—ওই বাচ্চা দু'টিকে ভুলিয়ে নিয়ে আয় ত।

ছেলে দু'টি উঠে এলো ওপরে। ছোটটি প্রায় হামা দিয়ে। ওপরে উঠে এসেই বললো বড়টি—তুমি আমাদের ডেকেছ কেন?

নিরঞ্জন ওদের হাতে চকোলেট দিয়ে বললো—ভাব করবো বলে। তোমার নাম কি?

—মনোরঞ্জন। মা মনু বলে ডাকে। ভাইটির নাম টুকলু।

—তোমাদের বাড়ী কোন্‌টা মনুবাবু?

—ওই যে। আমাদের ঘর থেকে না···তোমার ঘর আমরা দেখতে পাই।

সামনের দোতলা। নিরঞ্জন চমকে উঠলো। আস্তে আস্তে বললো—তোমার বাবা কি করেন মনুবাবু?

—দাঁড়াও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না? মা বলেছে, দোকান থেকে দু'পয়সার তেজপাতা আর দু' আনার পস্ত আনতে। দেরি হ'লে মা বকবে।

ছোট ভাইয়ের হাত ধরে গট্‌গট্ করে নেমে গেল সে।

নিরঞ্জন সিগারেট ধরালো একটা। আরামচেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলো। একটা নাটক লিখতে হবে—পরিচালক ধ্রুব গুপ্ত'র ফরমাশ। আগে গল্প লিখতে হবে। ডিরেক্টর এ্যাপ্রুভ করলে সে গল্প সাজাতে হবে সিনেমার টেকনিকে।

নিরঞ্জন চিৎকার করে ডাকলো-হরি, এককাপ চা দে ত।

একটা ইংরিজী গল্পের বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলো নিরঞ্জন। হেমিংওয়ের লেখা বই। এমন সময়ে সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ শোনা গেল।

সোজা ঘরে এসে ঢুকলো সেই সাত বছরের শিশু মনোরঞ্জন।

—মা বললে, আপনার কাছে গপ্পের বই আছে?

—হ্যাঁ আছে। তুমি বোসো মনুবাবু। চকোলেট খাও।

মনুর হাতে চকোলেট দিয়ে নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাবা কি করেন মনুবাবু?

—বাবা থিয়েটার করে।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ যেন। নিরঞ্জন আস্তে আস্তে বললো—বাবা বাড়ী আসেন কখন?

—ও' কথা আর জিজ্ঞেস করো না।

মনু গম্ভীর গলায় বললো—বাবার বাড়ী ফেরার কিছু ঠিক থাকে না। আর, জানো…?

মনু ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো নিরঞ্জনের কাছে।

—বাবা এলেই না, মাকে বকে। মা কাঁদে শুধু।

নিরঞ্জন ফিসফিস করে বললো—তোমার মায়ের নাম কি মনুবাবু?

—মায়ের নাম রাধা।

রাধা নামের কাউকে চেনে না নিরঞ্জন। একই চেহারার কত লোকই ত থাকে। এতদূর থেকে পলকের জন্যে যাকে দেখেছে সে, তার মধ্যে কোন চেনা মেয়ের মুখের ছায়া যদি থেকে যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? কিন্তু রাধা নাম তার অচেনা।

তাক্ থেকে একটা বই বার করলো সে। তার নিজের লেখা উপন্যাস; নাম 'পলাশের দিন।' বললো—নিয়ে যাও। মাকে পড়তে দিও।

সারাটা দুপুর অলস ঘুমে কাটলো। বিকেলের ছায়া যখন দীর্ঘ-হয়ে উঠলো মাঠে, তখন ছাতে বেরিয়ে এল নিরঞ্জন। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময়ে সে তন্ময় হয়ে গেল।

পুবের রাস্তা পার হলে ছড়ানো মাঠ। মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে কয়েকটা বাড়ী। মাঠের মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটা খেজুর গাছের আড়ালে ছোট্ট একটি পুকুর। মাঠের প্রান্তে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে তিনটি নারকোল গাছ।

হরির গলা শোনা গেল—বাবু চা এনেছি। নিরঞ্জন মুখ ফেরালো। আর হঠাৎ চোখে পড়ে গেল একটি মুখ। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। দু'টি চোখের দৃষ্টিতে চোখ আটকে গেল তার। হঠাৎ সেই চোখ দু'টি আড়ালে সরে গেল।

দিন তিনেক পরের কথা। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল নিরঞ্জন। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল একটা চিৎকারে। কেউ যেন গালাগালি করছে কাউকে। মাঝরাতে এমন বিশ্রী চেঁচামেচি? মাতালের কাণ্ড বোধ হয়। হঠাৎ বুকটা ধ্বক ধ্বক করে উঠলো। এ যেন সামনের ওই দোতলা থেকেই আসছে। নিরঞ্জন বিছানা ছেড়ে উঠে এল জানলায়। ঠিক তাই। কিন্তু অপরপক্ষ একেবারে নীরব। লোকটার তাতে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই।

পরের দিন সকালে তার বন্ধুটিকে বলল নিরঞ্জন—ভেবেছিলাম, তোমার এই পাড়াটা শান্ত। কিন্তু কাল কি চিৎকার রাত্রে? পশুপতিও বললো—হ্যাঁ, ওই মাতাল বদমাসটা থেকে গেছে। আমরা ওর কথা আলোচনা করেছি। ওকে একদিন মেরে তাড়াতে হবে। শুধু ওর বউটা আর বাচ্চা দুটোর কথা ভেবে এতদিন চুপ করে থেকেছি।

বেলা হলে রোজকার মতই এল মনু। সঙ্গে তার ছোট ভাই টুকলু। নিরঞ্জন হাত ভর্ত্তি ক'রে বিস্কুট দিল দু'জনকে। তারপর বললো—মনুবাবু, তোমার বাবা এসেছে না?

—রাতে এসেছিল। ভোর না হতেই চলে গেছে। মনু বিজ্ঞের মত বললো।

নিরঞ্জন ভাবছিলো, ওকে জিজ্ঞেস করবে যে ওর বাবা কাল এত চেঁচামিচি করছিলো কেন? কিন্তু মনু নিজেই বললো—বাবা না,…মাকে শুধু শুধু বকে। আমি যখন বড় হব, বাবাকেও বকে তাড়িয়ে দেবো।

শিশু সে। সাত বছর মাত্র বয়েস। মায়ের লাঞ্ছনা তার বুকে বাজে। তার দু'টি চোখে অভিমানের সজল ছায়া। মনু হঠাৎ চমকে উঠে বললো—ভুলে যাচ্ছিলাম। মা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছে তোমাকে।

—আমাকে! নিরঞ্জন অবাক হয়ে বললো।

—হ্যাঁ, তোমাকে। জিজ্ঞেস করতে বলেছে যে, তোমার জানা এমন কোন আশ্রম আছে—যেখানে আমাদের দু' ভাইকে নেয়?

তার দুটি স্থির চোখের দিকে চেয়ে নিরঞ্জন স'রে এল। দু'হাতে তাকে বুকের ওপরে তুলে নিয়ে বললো—মাকে বোলো, আছে।

* * *

…মেয়েদের এমন কোন আশ্রম নেই মণিদা যেখানে আমাকে রেখে আসতে পারো তুমি? নেই তোমার জানা? আমি তবে কি করবো বলতে পারো, আমি কি করবো তবে?

আর্তির হাহাকার উষার গলায়। সে আবার বললো—শেষ রক্ষা করতে পারবে না যদি, তবে এমন সর্বনাশ আমার কেন করলে তুমি?

মণিও সে কথা ভাবছিলো। এখন অনুতাপ করছে সে কৃতকর্মের জন্যে। উষা নামক একটি মেয়েকে তার মামার হেফাজত থেকে চুরি করে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল নিজের জীবনে। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধলো। মণি বস্তির মধ্যে একটা ঘর ভাড়া করেছিলো। টাকার চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরেছে। থিয়েটারের মালিক বিনোদবাবুর পা জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু কিছু হয়নি।…ঠকাতে তোমায় আমি চাইনি উষা। আমি নিজেই ঠকে গেছি। হেরে গিয়েছি আমি।—কিন্তু আমি এখন কি করবো? কোথায় যাবো আমি?…

খাতার বুক উষার আর্তনাদে রক্তাক্ত। বাঁধানো খাতায় লেখা সেই আধখানা গল্পের শেষ আর টানা হয় নি। অথচ হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে নিংড়িয়ে তবে সে গল্পের সূচনা হয়েছিল।

সিনেমার জন্য আপাততঃ একটি গল্প লিখতে হবে। সে গল্প ঘটনাবহুল হওয়া চাই; এবং নাটকীয়। সারাদিন একটানা লিখে গেল সে। বিকেলের দিকে কলম ছেড়ে উঠে বসলো। অনেকক্ষণ লিখে ক্লান্ত বোধ করছে সে এখন। একটু ছাদে বেড়ালে হয়।

সিঁড়িতে থপ থপ পায়ের শব্দ। সোজা হয়ে বসলো নিরঞ্জন। মনু ওরফে মনোরঞ্জন একাই উঠে এসেছে ওপরে। ঘরে ঢুকে সে বিমর্ষস্বরে ডাকলো—কাকাবাবু।

নিরঞ্জনের ভালো লাগলো সে ডাক। প্রফুল্ল কণ্ঠেই বললো সে—কি মনুবাবু?

মনু একবার অবজ্ঞাভরে চারদিকে চাইলো। তারপর মৃদুস্বরে বললো—আমরা তিনদিন ধরে কিছু খাই নি।

নিরঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে বললো—সে কি?

নির্বিকার ভঙ্গিতে মনু বলে গেল——বাবা ত টাকা-পয়সা কিছু দিয়ে যায় নি।

প্রতিদিনকার মতই মনু আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নিরঞ্জন চকোলেটের বাক্স বার করছিলো। কিন্তু আবার বন্ধ করে তুলে রাখলো। মনুকে কাছে টেনে এনে দু'হাতে ধরে বললো—আগে বলো নি কেন মনুবাবু?

মনু বললো—তুমি আমাদের কে, যে তোমাকে বলবো? মা কারও কাছে কিছু বলা পছন্দ করে না।

স্তব্ধ হয়ে থেকে নিরঞ্জন বললো—মাকে বোলো, দু'টি শিশুর জন্যে লোকের কাছে কিছু বলা অন্যায় নয়।

প্যাডের ভাঁজ থেকে পাঁচ টাকার দুটো নোট বার করে মনুর হাতে দিয়ে বললো নিরঞ্জন—মায়ের হাতে দিও। বোলো, তোমাদের দু ভায়ের জন্যে যেন রেখে দেন।

মনু কি বুঝলো কে জানে। নোট দুটো হাতে রাখলো। তারপর নিরঞ্জনের কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বললো—মাকে একটা কাপড় কিনে দেবে তুমি? কাপড় নেই বলে মা বেরোতে পারে না। সব ছেঁড়া।

নিরঞ্জন বেরিয়ে পড়লো বাসা থেকে। নতুন একটা নাটকের কাহিনী তার কল্পনায় রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে। একটা জীবনের রক্তাক্ত ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে। নিরঞ্জন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললো বি. টি. রোড ধরে।

সন্ধ্যের আগেই ফিরে এলো সে। একজোড়া নতুন শাড়ি কিনে এনেছে। শাড়ির প্যাকেটটাকে বুকের কাছে ধরে সোজা দোতলায় উঠে এলো সে। সামনের সেই ভাঙা দোতলার বারান্দায় এখনও আলোর আভাস। অনেক দ্বিধা আর সঙ্কোচে কাঁপলো তার মন। চাকর হরিকে ডেকে বললো—দিয়ে আয় ত। ওই বাচ্চা ছেলে মনু ওকে ডেকে ওর হাতে দিবি। আর কেউ যেন দেখতে না পায়।

হরি ফিরে এলে নিরঞ্জন খুশী হ'য়ে লিখতে বসলো। তার মন থেকে একটা পাথরের ভার যেন নেমে গেছে। নতুন চিন্তার আবেগে থরথর করে কাঁপছে হৃদয়। জীবনে এমন কিছু একটা যে সে করতে পারবে এ যেন তার ভাবনার বাইরে ছিল।

আট বছর আগে লেখা সেই পুরণো গল্পটা খাতা খুঁজে বার করলো নিরঞ্জন। অসমাপ্ত সেই কাহিনীটার শেষ অধ্যায় তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।…

অন্ধগলির একতলার একটা ঘর। অন্ধকারেও বোঝা যায় ধুলো জমেছে চারিদিকে। দেয়ালে পেরেক ঠুকে একটা দড়ি টাঙানো। দড়িতে ঝুলছে ছেঁড়া গামছার পাশে ছেঁড়া ব্লাউজ একটা। ময়লা হাফপ্যাটের ওপর জগোছালো একটা শাড়ি।

অন্ধকার যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মণিদা, একি করলে তুমি? এমনভাবে আমায় ফেলে পালিয়ে গেলে কেন? আমি যে কলকাতার কিছুই চিনি না। আমি কি করবো এখন? বলে দাও মণিদা। বলে দাও···

হঠাৎ বালিশে মাথা রেখে নিজেই ফুঁপিয়ে উঠলো নিরঞ্জন। কল্পিত চরিত্রের বেদনা তার নিজের হৃদয়কেই বিদ্ধ করেছে। চোখের জলে বালিশ ভিজে উঠলো।

না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ভীষণ ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। কখন সকাল হ'য়ে নতুন রোদে আকাশ ভরে উঠেছে সে জানতেও পারে নি। তার চোখমুখ সেই রৌদ্রের আভায় তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

একটা গোরগোলের শব্দে ঘুম ভাঙলো তার। কারা যেন কোথায় চিৎকার করে জটলা করছে। একটা শিশুর কান্নার শব্দ। হরিকে চা আনতে বলে বাথরুমে ঢুকলো নিরঞ্জন।

বাথরুম থেকেই সে শুনতে পেলো নীচে পশুপতির গলা। পশুপতি চিৎকার করে যেন কাকে বলছিল—জানতাম, এমন একটা কিছু হবে। একটা মাতাল বদমাস্! স্ত্রী ছেলে ফেলে রেখে থিয়েটারের মেয়ে নিয়ে আলাদা বাসা করেছে। ওকে গুলী করে মারা উচিত।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে নিরঞ্জন হরিকে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে রে?

—কি জানি? হরি বললো—ওই বাড়ীটার দোতলায় সবাই ভীড় করেছে।

গরম চায়ের কাপ পড়ে রইলো। লুঙ্গি-পরা অবস্থাতেই রাস্তায় বেরিয়ে এলো নিরঞ্জন। সামনের দোতলায় সিঁড়িতেই ত ভীড়। কেউ যেন চিৎকার করে বলছিল—দরজা ভাঙা ঠিক হবে না। আগে পুলিশ আসুক। কে জানে ভেতরে কি অবস্থা···

অভিভূত চেতনাহীন যেন নিরঞ্জন। সিঁড়ির একপাশে মনু কান্না জুড়েছে মায়ের নাম ধরে। তাকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। বন্ধঘরের দরজায় সশব্দ আঘাত হেনে আর্ত্তনাদ করলো—ঊষা, দরজা খোলো। আমি মণিদা। আমি ফিরে এসেছি ঊষা। দরজা খোলো; দরজা খোলো।

প্রবল ধাক্কায় পুরনো কাঠের দরজা পলকে ভেঙে পড়লো। আর নিরঞ্জন সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে ভেতরে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার চোখের সামনে যেন প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। ছাতের কড়া থেকে ঝুলছিল নতুন শাড়ির বন্ধনে নতুন কাপড় পরা সেই মেয়ে। আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ যেন নিরঞ্জনের চোখে। সে দুই চোখ ঢেকে বসে পড়লো: তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মাটিতে, ঠিক তার পায়েরই তলায়।

———

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

(১৫)

ড্রাইভার বেচারা তখন ভাল ক'রে তেল মেখে স্নানের জোগাড় করছিল। মনিবের ডাকে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হ'ল। কি ব্যাপার? মেম সাহেবকে এত উত্তেজিত হ'তে সে কখনও দেখে নি। তার হাত পা কাঁপছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

ধীরা জিজ্ঞাসা করল, "গাড়ি ঠিক আছে? বেশীদূর যদি যেতে হয়?"

"ঠিকই আছে। এই ত দু'দিন আগে garage থেকে servie ng করিয়ে এনেছি। তেলও অনেক আছে।"

ধীরা বলল, "এখনি বেরতে হবে। গাড়ি বার কর। ফয়জাবাদ রোড দিয়ে যাবে। ওদিকটা চেন?"

"চিনব না কেন হুজুর, ঐ দিকেই আমার বাড়ী।"

"ওখানে কাছাকাছি ডাক-বাংলা আছে কতকগুলো?"

ড্রাইভার মাথা চুলকে বলল, "আছে ত অনেকগুলোই, কয়েক মাইল পরে পরে। একটাতে আমার এক দাদা চৌকিদারের কাজ করে। সেটাই এলাহাবাদের সবচেয়ে কাছে।"

"ঐগুলোর কোন একটার কাছে মিত্র সাহেবের গাড়ির accident হয়েছে। খুঁজে নিতে হবে। আমি আসছি।"

ছুটে আবার ঘরে ঢুকল। একটা হাণ্ডব্যাগে কিছু ওষুধপত্র, কিছু টাকাকড়ি, একটা ছোট টর্চ্চ রাখল। বাড়ীতে যত টাকা ছিল সব বার ক'রে যশোদার হাতে গুঁজে দিল।

সে অবাক হয়ে ধীরার দিকে তাকাতেই বলল, "আমি চললাম, নিরঞ্জনবাবুকে দেখতে। ড্রাইভার আমাকে পৌঁছে আবার গাড়ি নিয়ে আসবে। আমি জিনিষের লিষ্ট করে পাঠাব। বাড়ীর থেকে হোক, হাসপাতাল থেকে চেয়ে হোক বা কিনে হোক, সব জোগাড় ক'রে নিয়ে সন্ধ্যার আগে নিশ্চয় পৌঁছবে। নিজের কাপড়-চোপড়, বিছানা নিও, আমারও নিও। ক'দিন ওখানে থাকতে হবে জানি না। টাকা যদি এতে না কুলোয়, তা হ'লে আমার বালা জোড়া খুলে দিয়ে যাচ্ছি।"

যশোদা বাধা দিয়ে বলল, "আঃ, থাক্ থাক্, হাত খালি করে না। ঝ্যাত সব। আমার কাছে কি আধলা পয়সা নেই নাকি? তা চললে কত দূর?"

ড্রাইভার বলল, "মাইল কুড়ি ত হবে।"

যশোদা বলল, "তা বেশ যাও, না গেলে ত চলবেনি। তুমি যদি না দেখবে ত দেখবে কে? আমি গুছচ্ছি এদিকে।" বলতে বলতে ধীরা গিয়ে গাড়িতে বসল এবং গাড়ি গেট থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

কোথা দিয়ে যে গেল, কখন যে নদী পার হ'ল, কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চারিদিকের, কোনো কিছুই ধীরার চোখে পড়ল না। রাস্তায় কোথাও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কি না, কোনো ডাকবাংলা ধরনের বাড়ী দেখা যায় কিনা, ব্যগ্র উদ্বেগ আকুল দৃষ্টি দিয়ে তাই দেখতে লাগল।

ড্রাইভার হঠাৎ ব'লে উঠল, "ঐ ত লরী একটা দাঁড়িয়ে।"

ধীরা তাড়াতাড়ি মাথা বাড়িয়ে দেখল। পুরণো বাংলো প্যাটার্ণের একটা বাড়ী, চারিদিকে ঝোপঝাড়। ফুলের গাছও রয়েছে মাঝে মাঝে, তবে সেগুলোও জঙ্গলে মিশে গেছে। লরীটা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে, ভিতরে নিরঞ্জনের গাড়ি আর একটা খুব ছোট গাড়ি।

ধীরা বলল, "গাড়ি বাইরে রাখ, অত ছোট compound-এ পঞ্চাশগণ্ডা গাড়ি ঢুকিয়ে কাজ নেই। আমি হেঁটেই যাচ্ছি।" ব'লে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল।

এইবার তাকে দাঁড়াতে হবে নিরঞ্জনের মুখোমুখী! কি রকম অভ্যর্থনা সে পাবে কে জানে? কিন্তু যেমনই হোক, যেতে হবে তাকে, সেবার ভার, শুশ্রূষার ভার নিতে হবে। ডাক্তার না এসে থাকে ত ডাক্তারীর ভারও নিতে হবে। তবে ঐ ছোট গাড়িটা দেখে ভরসা হ'ল তার একটু, ডাক্তার হয়ত এসেই গেছে।

গেটের ভিতরে ছোট একটা খোলার ঘর। চৌকিদার থাকে বোধ হয়। ধীরা নামতেই একজন হিন্দুস্থানী প্রৌঢ় মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে চাই?"

ধীরা বলল, "যে সাহেবের গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে, তিনি কোথায়?"

প্রৌঢ় বেরিয়ে এসে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বারান্দায় সিঁড়ির কাছে আসতেই এক ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরার দিকে এগিয়ে এলেন। একে সে হাসপাতালে মাঝে মাঝে দেখেছে, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী।

আলাপ ছিল না তবু তাঁকে নমস্কার ক'রে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল ধীরা, "কেমন দেখলেন মিঃ মিত্রকে?"

সুন্দরী মহিলাটিকে ডাক্তারও আন্দাজে চিনলেন, বললেন, "অবশ্য খুব serious কিছু ব'লে এখনি ত মনে হচ্ছে না। শরীরটা ওঁর বেশ খারাপই ছিল শুনলাম, তার উপর এই shock। কিন্তু উনি একলা এখানে থাকবেন কি ক'রে তা ত বুঝতে পারছি না। অথচ এই অবস্থায় খানিক বিশ্রাম না দিয়ে নিয়েও ত যাওয়া যায় না। এক বুড়ো চৌকিদার, আর ঐ ওঁর ছোক্‌রা চাকর, এই ত মানুষের মধ্যে। তা দু'টিই সমান পণ্ডিত। ওঁকে দেখবে কে? সেবা-শুশ্রূষা হবে কি ক'রে? ওষুধ-পথ্য দেবে কে?"

ধীরা বলল, "আপনি ব্যবস্থা দিন, যা যা দরকার বলুন, আমি থাকব এখানে, আমিই সেবা করব। আমার আয়াকেও আনতে পাঠাচ্ছি, সেও থাকবে, আমার ড্রাইভারও থাকবে। জিনিসপত্র সব শহর থেকে আনিয়ে নিচ্ছি।"

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী একটু বিস্মিত মুখে তাকালেন ধীরার দিকে। তারপর কি মনে ক'রে বললেন, "তা হলে ত খুব ভালই হয়। আপনার হাতে সেবা-শুশ্রূষা খুবই ভাল হবে। নিজে সব বুঝে করতে পারবেন। এখনি বেশী ওষুধে কাজ নেই, বিশ্রাম করুন। তবু এই ওষুধটা আনিয়েই রাখবেন, যদি রাত্রে দরকার হয়। আমি কাল সকালেই আসব।" ব'লে ধীরার হাতে একটা প্রেসক্রিপশনের কাগজ গুঁজে দিয়ে, নমস্কার ক'রে তিনি প্রস্থান করলেন।

ধীরা উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলল, "আমি যেন কাজ সব করে যেতে পারি। আর পিছলে চলবে না।"

দিন দুপুরের আলোটাও বড় ম্লান হয়ে ঢুকেছে এই হল ঘরটার মধ্যে। কতকাল ঝাঁট পাট পড়ে নি, ঝুল ঝাড়া হয় নি। একটা তক্তপোষ আছে ঘরের মধ্যে, আর দু' একটা চেয়ার টেবিল।

তক্তপোষের উপর বিছানায় শুয়ে আছে নিরঞ্জন। একটা বাহু দিয়ে চোখ-দুটোকে আড়াল ক'রে রেখেছে। এখনই ডাক্তার দেখে গেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই ঘুমোয় নি। সেই রাজপুত্রের মত সুন্দর দেহ, সেই অপরূপ মুখশ্রী। আজ এই নির্জ্জন বনপুরীতে, প্রায় ধূলিশয্যায় লুটিয়ে পড়েছে কেন?

ধীরার ইচ্ছা করতে লাগল সেও এই ধুলোর উপর শুয়ে একবার প্রাণভরে কেঁদে নেয়। বুকের পাষাণ ভারটা একটু নামুক। কিন্তু এখন কাঁদবার সময় কোথায়?

একটুখানি এগিয়ে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, এখন "কেমন আছ?"

নিরঞ্জন চোখের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। ছায়াচ্ছন্ন ঘরে খুব পরিষ্কার দেখা যায় না, তবু দিনের বেলা চিনতে ভুল হয় না। জিজ্ঞাসা করল, "ধীরা? তোমায় কে খবর দিল? তুমি কি করতে এলে?"

ধীরার চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করল, বলল, "চঞ্চলার কাছে শুনলাম তোমার accident-এর কথা। তাই দেখতে এলাম। এখানে তোমাকে দেখাশোনা করার লোক নেই কেউ, কয়েকদিন তাই আমিই থেকে যাই? যশোদাকে আনিয়ে নিচ্ছি।"

নিরঞ্জন অসহিষ্ণুভাবে বলল, "না, না, ও সব পাগলামিতে কাজ নেই। তোমার এখানে থাকা চলে না। আমার চলে যাবে একরকম করে।"

ধীরা তার বিছানার পাশে গিয়ে নতজানু হয়ে ধুলোর মধ্যে ব'সে পড়ল। মাথাটা বিছানায় রেখে বলল, "তুমি একটু দয়া কর আমাকে। এ রকম শাস্তি দিও না। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে যেদিন, আমি সেই দিনই চলে যাব। জীবনে আমার মুখ আর তোমাকে দেখতে হবে না। দেখ, ভগবানও কখনও আমাকে দয়া করেন নি, আমি চিরদিন খালি যন্ত্রণাই পেয়েছি। সবাই মিলে কি আমাকে মৃত্যুদণ্ডই দেবে? ভগবান বিচারক, তিনি বিচারই করবেন। তুমি দয়া কর একবার।"

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, "ভগবানের সমান হবার স্পর্দ্ধা আমার নেই ধীরা। দণ্ড দিতে আমি পারব না, মৃত্যুদণ্ড ত নয়ই। কর তোমার যা খুসি। কিন্তু এ পণ্ডশ্রম করতে এলে কেন?"

ধীরা উত্তর দিল না। চোখের জল মুছতে মুছতেই

আবার বারান্দায় বেরিয়ে ধুলোয় ব'সে পড়ল। যত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষের নাম মনে করতে পারল, সব লিখল। ওষুধপত্রের নাম লিখল। ঘরের জন্য ভাল আলো, ভাল বিছানা, মশারি যা কিছু দরকার। কর্ম্ম-স্থলেও চিঠি লিখল, দু'হপ্তার ছুটি চেয়ে। ব্যাঙ্কে চিঠি লিখল চেক দিয়ে। এই করতেই তার এক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর বিধিমতে উপদেশ দিয়ে ড্রাইভারকে এলাহাবাদে ফেরত পাঠাল। নিজে কাপড়ের ধুলো খানিকটা ঝেড়ে ফেলে আবার রোগীর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

নিরঞ্জন একইভাবে শুয়ে আছে। ধীরার দিকে তাকালও না, কোনো কথাও বলল না। ঘরে যা দু'চারটে জিনিষপত্র ছিল, ঘুরে ঘুরে সেগুলো গুছোতে লাগল। একটা ছোট জানলা খুলে দিতে ঘরের আলোটা আর একটু উজ্জ্বল হ'ল।

কিন্তু গাড়িতে ত ধাক্কা লেগেছে সেই সাত-সকালে, তখন থেকে এই রুগ্ন মানুষ কি না খেয়ে আছে? আস্তে আস্তে নিরঞ্জনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "সকাল থেকে খাওয়া হয়েছে কিছু?"

নিরঞ্জন সংক্ষেপে বলল, "সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে-ছিলাম।"

ধীরা আবার বারান্দায় বেরোল। ছোকরা চাকরটাকে জোগাড় করে চৌকিদারের কাছে খোঁজ করাতে পাঠাল যে দুধ একটু জোগাড় হয় কি না।

সৌভাগ্যক্রমে চৌকিদারের নিজেরই একটা গরু ছিল। সেটা এই সময় চ'রে ফিরে এল। কাজেই দুধ ভালই পাওয়া গেল। চৌকিদারের কাঠের উনুনে দুধ জাল দিয়েই ধীরা ঘরে আবার ফিরে এল। নিরঞ্জনের জিনিষপত্র এই ঘরেরই এক কোণে তোলা হয়েছে। ছোকরার সাহায্যে তার ভিতর থেকে একটা কাঁচের গেলাস আর একটা চামচ জোগাড় করল। দুধ খাওয়াতে গিয়ে ভাবনা হ'ল যে নিরঞ্জনকে একেবারেই নাড়াচাড়া করা উচিত হবে কি না। ডাক্তার তাড়াতাড়িতে তাকে বলতেই ভুলে গেছেন যে কোথায় নিরঞ্জনের লেগে থাকতে পারে, কি ভাবে তাকে রাখতে হবে। সেও বোকার মত কিছু জানতে চায়নি। কাল সকালে সব খুঁটিয়ে জেনে নিতে হবে। আজকের মত একেবারেই না নাড়িয়ে যতটুকু পারা যায়।

আবার সেই ধুলোয় ভরা মেঝেতে ব'সে আস্তে আস্তে সে রোগীকে দুধ খাওয়াতে লাগল। নিরঞ্জন খেতে আপত্তি করল না, তবে কথা কিছুই বলল না। বিছানায় তার একটা রুমাল প'ড়ে ছিল, সেইটা দিয়ে ধীরা নিরঞ্জনের চোখ-মুখ মুছে দিয়ে তখনকার মত কাজ সারল।

সম্প্রতি এলাহাবাদ থেকে গাড়ি না ফেরা পর্য্যন্ত আর ত কিছু করবার নেই। দরজার কাছে একটা কাগজ পেতে ধীরা ব'সে পড়ল, সামনের রাস্তা দেখতে লাগল। বুকের ভিতর যেন শ্রাবণের বর্ষা নেমেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু চিতায় আগুনের চেয়ে এও ভাল। মুখ ত দেখতে পেলাম? গলার স্বর ত শুনতে পেলাম? আমার দিকে তার মন আর ফিরবে না, তবু এইটুকুই কি কম আমার?

যাক যশোদা ধীরাকে বেশীক্ষণ ভোগাল না। ঘণ্টা দেড়েক পরেই হৈ হৈ করতে করতে জিনিষপত্র বোঝাই একটা ট্যাক্সি আর ধীরার গাড়ি ফিরে এল। ধীরা যা কিছু আনতে বলেছিল সবই এসেছে, উপরি অনেক জিনিষ এসেছে, যা তাড়াতাড়িতে ধীরা মনে আনতে পারে নি। হাসপাতাল কাছে থাকায় যশোদার আরো সুবিধা হয়েছে। নার্সদের, লেডী ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ক'রে জিনিষ সংগ্রহ করেছে। ধীরা বাড়ী থেকে বার হবামাত্রই সে নিজের আর দিদিমণির জিনিষ গোছাতে আরম্ভ করেছিল। এক সপ্তাহের মত সব-কিছুই সে প্রায় নিয়ে এসেছে।

দিনের আলো তখনও কিছু বাকি। প্রথমেই নিরঞ্জনের ঘরটা ঝেড়ে-মুছে ঝাঁট দিয়ে যশোদা পরিষ্কার ক'রে দিল। এখানের বুড়ো চৌকিদার চারদিকে এতটা পয়সা খরচের ঘটা দেখে সারাক্ষণ কাছাকাছি ঘুরছিল। তার সাহায্যে একটা মেথর ছোকরাও আবিষ্কৃত হ'ল, নিকটবর্ত্তী গ্রাম থেকে। বাথরুম পরিষ্কার হ'ল, জল ভরা হ'ল, লাইসলের গন্ধে ঘরগুলো ভরে উঠল। বারান্দায় বড় একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন জ্বালা হ'ল, ঘরের ভিতর মৃদু আলো। বিছানায় সন্তর্পণে পরিষ্কার চাদর পেতে দেওয়া হ'ল। টেবিল চেয়ার ঝেড়ে দরকারি ওষুধপত্র বাসনকোষন সব যথাস্থানে ঠিক ক'রে রাখা হ'ল। ধীরা ভয়ে ভয়েই কাজ করছিল, পাছে এত কোলাহলে বিরক্ত হয় নিরঞ্জন। বিরক্তি কিন্তু কিছু সে প্রকাশ করল না, দু'চারবার শুধু তাকিয়ে দেখল তাদের কর্ম্মতৎপরতা। ধীরা একবার বাইরে গেল, কিসের একটা কাজে, তখন যশোদাকে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, "কি আয়া, তোমরা এই ভাঙা ডাক-বাংলোটাকেই হাসপাতাল বানিয়ে দেবে নাকি?"

যশোদা তখন কোমরে হাত দিয়ে একটুখানি জিরিয়ে

নিচ্ছেন, উত্তরে বলল, "আমি 'মেলেঞ্ছ' দেখতে পারি না যে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হলে রোগ সারবে কেন চট ক'রে ?"

নিরঞ্জন বলল, "সে ত ঠিক, তবে শুধু আমাকে যত্ন করলেই হবে না ত ? নিজেরা খাওয়া-দাওয়া করেছ ত ?"

"দিদিমণিটা খায় নি, আর সবাই খেয়েছে।" বলে যশোদা আবার নিজের কাজে মন দিল। ধীরা ফিরে আসায় নিরঞ্জনও আর কথা বলল না। তার নিজের ঔষধ-পথ্য সব কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় হাজির হতে লাগল, তার সম্বন্ধে কোনো কর্ত্তব্যের ত্রুটি হ'ল না, তবে অন্যদের কি ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা সে তত্টা জানতে পারল না। অসুস্থ শরীরে মনের কাতরতায় দিনের প্রথম ভাগটায় তার একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব এসে গিয়েছিল, কিন্তু ধীরার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেটা হালকা হতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যার দিকে মনে হ'ল যেন শরীরটা তার বেশ একটু সুস্থই লাগছে, ইচ্ছা করলেই ঘুমুতে পারে। সন্ধ্যার খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার একটু পরে সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল।

ধীরা ঘরের আলো আরো কমিয়ে দিল; সবাইকে সাবধান করে দিল যেন কেউ কোনো-রকম শব্দ না করে। সন্তর্পণে একবার রোগীর নাড়ী দে'খে গেল, কোনো ভয়ের কারণ আছে কি না। ভালই আছে মনে হল। তখন বাকি আর সব ক'টা মনুষ্যের কি ব্যবস্থা হচ্ছে দেখতে গেল।

ডাকবাংলাটা খুব ছোট নয়, তবে থাকবার ঘর তিনখানি। বড় ঘরটা ত নিরঞ্জনের ব্যবহারের জন্য থাকবে, মাঝারিটা এর মধ্যে পরিষ্কার করে যশোদা ধীরার আর নিজের শোবার ব্যবস্থা করেছে। ভাগ্যে লোহার খাট একখানা ছিল তাই দিদিমণিকে মাটিতে শুতে হবেনি, নইলে ত তাই হ'ত। যশোদা খাট পালঙ্ক অবধি ত আর নিয়ে আসতে পারে নি ? কাপড়-চোপড় পরিপাটি ক'রে খানিক আলনায় রেখেছে, খানিক বাক্সেই আছে। আয়না, চিরুণী, তেল, সাবান সবই এনেছে, এখন যার জন্যে আনা সে চেয়ে দেখলেই হয়। এখন অবধি ত খায় নি, মুখে-হাতে জল দেয় নি, ধূলায় ধূসর শাড়ী প'রে ঘুরছে। এত যে মেয়ে পরিপাটি থাকা পছন্দ করত, তার হ'ল কি ? পুরুষ জাতিটা সম্বন্ধে বিদ্বেষ যশোদার আরও একটু যেন বেড়ে গেল। তবে কি না এই ভদ্রলোকও অনেক করেছে বাপু দিদিমণির জন্যে, এখন যদি কিছু উল্টে করতে হয় ধীরাকে তার জন্যে রাগ করা চলে না।

আর একটা ঘরে সব জিনিষপত্তর, রান্নার ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা। যশোদা ধীরা, নিরঞ্জন, তার চাকর এবং ধীরার ড্রাইভার একজনের রান্না যশোদাই করতে পারে। ড্রাইভার ইচ্ছা করে ত বুড়ো চৌকিদারের সঙ্গেও খেতে পারে, তাদের খোট্টাই রান্না যশোদা অত জানে না, তা ছাড়া ছোঁওয়া-ছুঁয়ির পর্ব্ব আছে। তবে মেথর ছোকরা এত রকম রান্না ত বাপের জন্মে দেখে নি, সে খোট ধরেছে, তাকে অন্ততঃ রাত্রে খেতে দিতে হবে, তা হ'লে সে সারারাত থাকতে রাজী আছে। গরমের দিন, চওড়া চওড়া চারটে বারান্দা রয়েছে, প'ড়ে যত খুশী ঘুমোও না।

যশোদা কাপড়-চোপড় ছেড়ে তোলা উনুন আর স্টোভ নিয়ে রান্না করতে ব'সে গেল। ধীরাকে বলল, "দিদিমণি, পার ত চান ক'রে নাও, গরমকাল বাপু, ধুলো-বালি মেখে ভূত হয়ে আছ। চট্ ক'রে হয়ে যাবে আমার, দুটো দুটো এক সঙ্গে চাপাব। আর ঐ দাদাবাবুর কি করব ? রাত্রে খাবে ত কিছু ?"

ধীরা বলল, "স্নান আমি এমনি ক'রে নিচ্ছি। ওঁর জন্যে কি আর এখন করবে ? দুধ, হরলিকস এই সবই খাবেন। কাল সকালে অন্ন-টন্ন আছে কি না দেখে তবে ত ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ভাল", ব'লে যশোদা নিজের কাজে মন দিল। ধীরা গেল স্নান করতে। সারাদিন তার কিছুই খাওয়া হয় নি এতক্ষণে মনে পড়ল। না হোক।

সন্ধ্যারাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে হঠাৎ নিরঞ্জনের ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘরের প্রায়ান্ধকারের মধ্যে লাবণ্যময়ী ছায়ার মত ধীরা মৃদুপদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ত্রিশ-বত্রিশটা দিন আগে সে জীবনের একেবারে সবটা জুড়ে ছিল নিরঞ্জনের, আজ কত দূরে ? তাকে ডাকা চলে না, ছোঁওয়া চলে না, তার সঙ্গে কথা বলতে হলে কত ভেবে-চিন্তে বলতে হয়। অদৃষ্টের পরিহাসে মানুষেরও হাসি আসে। এক অশুভক্ষণে আকস্মিক বিপদের পটভূমিকায় তারা দু'জন এক রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়েছিল নায়ক-নায়িকার ভূমিকায়। আবার আর এক আকস্মিক বিপদের আবির্ভাব ঘটল, সেই দুটো মানুষের জীবনে ?

এবার কি বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতন ?

নিরঞ্জন জেগেছে সেটা ধীরা কি রকম ক'রে বুঝতে পারল, কাছে এসে বলল, "ঘুমোতে পেরেছিলে ? কেমন বোধ হচ্ছে ?"

"ভালই বোধ হচ্ছে, ঘুমতে পেরেছি খানিকটা, তবে এখন ঘুমিয়ে রাত্রে হয়ত জেগে থাকতে হবে।" তার

শরীরে একটু ব্যথা হয়েছিল, কিন্তু কেন জানি না সেটা সে স্বীকার করল না ধীরার কাছে।

"সেও ত ভাল না। দেখ, বেশী রাতে হয়ত ঘুম আসবে। আর একবার খাবে ত?"

নিরঞ্জন বলল, "সে তুমি যা ভাল বোঝ। যা করতে চাও, সকাল সকাল ক'রে নিয়ে, নিজে বিশ্রাম ক'রো। সারাদিন তোমার ভয়ানক পরিশ্রম গিয়েছে। এটা আমার ভাল লাগছে না। আমার চাকরটাকে রাত্রে এই ঘরে শুইয়ে রেখ, তা হলেই হবে। আমার জন্যে নিজে আজ অন্ততঃ রাত জেগো না।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা, তুমি যা বল। রাত্রে একটা মোমবাতি জেলে দিয়ে যাব। বাড়ীটা পরিষ্কার করিয়েছি, তবে চারিদিকেই জঙ্গল। বিছে টিছে থাকতে পারে।"

"হ্যাঁ, অনেকটা Garden of Eden এর মত লাগছে, সাপ থাকাও বিচিত্র নয়," ব'লে নিরঞ্জন পাশ ফিরে শুল। কেমন যেন বিদ্রূপের মত শোনাল। ধীরা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যশোদা সমানে রান্না করছে। ড্রাইভার গিয়ে চৌকিদার বুড়োর সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে। নিরঞ্জনের চাকর নিশ্চিন্তমনে এখনই ঘুমোচ্ছে। খাক-খাওয়া লরীর ড্রাইভারও এসে জুটেছে দেখা গেল, সে রাতটা লরীতে শুয়েই কাটাবে। যাক বনগাঁয়ে দু'-চারটা লোক থাকা ভাল কাছাকাছি।

একদিকের বারান্দাটা এতটাই চওড়া যে চাতাল বললেই চলে। একপাশে ইঁট দিয়ে গাঁথা মস্ত বড় বেঞ্চির মত একটা বসবার জায়গা। তবে একপাশের হাত রাখবার জায়গাটা ভেঙ্গে পড়েছে। এখান অবধি যশোদা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রেখে গেছে। চারপাশের ঝোপঝাড় আর বুনো ফুলের গাছের একটা সৌন্দর্য্য আছে ঠিকই, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। একটা মৃদু সুবাস বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিরঞ্জনের নিশ্চয়ই একলা শুয়ে শুয়ে বিরক্ত ধ'রে যাচ্ছে। কিন্তু ধীরার ত তার কাছে যাবার সাহস নেই। যদি বেশী বিরক্ত হয়? এখন পর্য্যন্ত সে একবারও তাকায় নি ধীরার চোখে চোখে, মুখে তার একবারও হাসি দেখা যায় নি। সেবা করবার অধিকার সে দিয়েছে, নিতান্ত ধীরার কান্নায় বিচলিত হয়ে, কিন্তু সেবিকার অধিকার যেন ধীরা লঙ্ঘন না করে, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রেখেছে। অবশ্য ধীরাকে শাস্তি দেবার অধিকার তার আছেই। ধীরার ত কোনো অধিকার নেই এখন নিরঞ্জনের কাছে কিছু চাইবার। তবু আর একবার যে সে চোখ ভ'রে দেখতে পাচ্ছে, এই ত তার জীবনের কত বড় সৌভাগ্য? তাকে সারিয়ে সুস্থ ক'রে যদি আবার ধীরা সংসারে ফিরিয়ে দিতে পারে, তা হ'লে কতখানি প্রায়শ্চিত্ত তার হয়ে যাবে? এই প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর কিই বা তার করণীয় আছে এ জীবনে?

জীবনটা তার কতকাল আর বয়ে বেড়াতে হবে? হঠাৎ আজকাল থেকে থেকে তার মনে হয় বুকের ভিতর মৃত্যুদূতের পদক্ষেপ সে শুনতে পাচ্ছে। হৃদযন্ত্রটা আর তার কাজ করতে চায় না। থেকে থেকে হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন কঠিন হাতে পীড়ন ক'রে জানিয়ে দেয়, "সময় হয়েছে আর এক অতিথি আসিবার।" আসুক। এই ত তার শেষ অতিথি। হৃদয়ের রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে অধীশ্বর তার চ'লে গেছে ঘৃণায়, শূন্য পাদপীঠতলে ধূলোয় লুটিয়ে আছে তার প্রাণ।

যশোদা তাকে খেতে ডাকতে এল। ধীরা ভিতরে গেল, তবে খেতে তখনই বসতে রাজী হ'ল না। নিরঞ্জনের খাবার তৈরি হ'ল, তাকে খাইয়েও এল সে অশেষ যত্নে। রাত্রির মত সব গুছিয়ে রাখল। হাতের কাছে ছোট টেবিলে একটা ছোট্ট ঘণ্টা শুদ্ধ রেখে দিল, যদি কাউকে ডাকবার দরকার হয়। চাকর কোথায় থাকবে, মেথর ছোকরা কোথায় থাকবে সব দেখিয়ে দিল। তবু যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু এ যে পাষাণ দেবতার আরাধনা করা, চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন, মুখের একটা রেখারও অদল-বদল হয় না।

খানিকক্ষণ তবু দাঁড়িয়েই রইল যদি নিরঞ্জন কোনো কথা বলে। তারপর বলল, "আচ্ছা, ঘুমোতে চেষ্টা কর, আমি যাই। দরকার হলেই আমাকে ডেকো, আমি পাশের ঘরেই থাকব, মাঝের দরজা বন্ধ করব না।"

নিরঞ্জন সংক্ষেপে বলল, "আচ্ছা।"

ধীরা এতক্ষণে গিয়ে খেতে বসল। তাকে বেশী খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করে সফল না হয়ে যশোদা রাগ ক'রে চাকরবাকরদের ভিতর বেশীর ভাগ খাবার বিলিয়ে দিল। অবশ্য নিজে যে খেল না কিছু তা নয়। তারপর ভোরে উঠে কাজ করবার সব ব্যবস্থা ক'রে রেখে, শুয়ে পড়ে অবিলম্বে ঘুমিয়ে গেল। ধীরা আজ আর ঘুমের ওষুধ খেল না, যদিই নিরঞ্জন ডাকে।

নিরঞ্জনেরও খুব চট্ করে ঘুম এল না, সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে। শরীরটা অনেকটা ভাল লাগছে। কিন্তু মনটা বড় বিচলিত। এ বিড়ম্বনা আবার কেন জীবনে? সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মনকে আবার কেন এ

যন্ত্রণা দেওয়া? কিন্তু মানুষের জীবন দৈবাধীন। কোন্ দুর্দৈব আবার তাকে ধীরার সান্নিধ্যে টেনে আনল?

কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটল, আবার ঘুমটা ভেঙে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, বহু দূরে মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক শোনা যায়। তার ঘরে তার ছোকরা চাকর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বাইরের বারান্দায় আরো বিপুলতর নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নিরঞ্জনের মুখে একবার একটু হাসির রেখা দেখা দিল।

দুটো ঘরের মাঝের দরজাটা আধভেজান। নিরঞ্জনের মনে হ'ল একটা যেন ছায়াময়ী মূর্ত্তি সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(১৬)

ভোর হতে না হতেই ধীরা উঠে পড়ল। আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। মুখ-হাত ধুয়ে, চুল আঁচড়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বারান্দার অনেক স্থানেই এখনও লোক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চাতালের দিকটায় লোক নেই, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভারি সুন্দর ফুলের গন্ধ এখানে, ফুলও এত ফুটে আছে যে রংএর বাহারে দু'চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। কাল যে এসব দিকে তাকিয়ে দেখবার সময়ই পায় নি। ভয়ে তখন তার জগৎ সংসার কালো হয়ে ছিল।

ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখল। নিরঞ্জন উঠে বসল একবার, আবার তখনি শুয়ে পড়ল। ধীরা দরজার কাছে এসে বলল, "ডাক্তার অনুমতি না দিলে, আগেই উঠে বোসো না। উনি ত আর ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই এসে পড়বেন।" ব'লে নিরঞ্জনের মুখ-হাত ধোওয়ানোর জল সাবান প্রভৃতি আনতে স্নানের ঘরে চলে গেল।

নিয়ে এসে তার খাটের পাশের টেবিলে সব রেখে বলল, "আমিই আজ কাজগুলো করে দিই? হস্‌পিটালে গেলেও ত নার্সের হাতের কাজ নিতে হ'ত?"

নিরঞ্জন বলল, "উপায় যেখানে নেই সেখানে submit করা ছাড়া আর কি করা যায়?"

ধীরা আর কথা না বলে কাজ করে যেতে লাগল। কাজে যেন তার ভুল না হয়। এরই দাবি নিয়ে সে আবার তার নিষিদ্ধ স্বর্গে প্রবেশ করেছে। রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা, যা আছে তার ভাগ্যে সবই সহ্য করে, তাকে এই অধিকারের মূল্য দিতে হবে।

সকালের খাওয়ানোর পর্ব্ব শেষ করে ধীরা নিজে গেল চা খেতে। যশোদা একবার এসে ঝড়ের বেগে সমস্ত ঘর ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে দিয়ে চলে গেল। ঐ 'মেলেচ্ছ' মেথরটাকে সে রোগীর ঘরে ঢুকতে দিতে একেবারে রাজী নয়। ওরাই ত রোগ জুটিয়ে আনে। অন্য ঘর-দোর পরিষ্কারের কাজে অবশ্য নিরঞ্জনের চাকর খানিকটা সাহায্য করতে পারল। কাজকর্ম্ম যখন সতেজে চলেছে, সেই সময় গাড়ি হাঁকিয়ে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী এসে হাজির হলেন।

ধীরা তাড়াতাড়ি চা ফেলে উঠে পড়ল, আজ তাকে সব ভাল করে শুনে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে। ডাক্তারের রোগীকে পরীক্ষা করা শেষ হতেই সে ঘরে ঢুকে ডাক্তারকে নমস্কার করল।

ডাক্তার তাকে নমস্কার করে বললেন, "ইনি ত কালকের তুলনায় অনেকটাই ভাল আছেন। তবে আজ আর কাল শুয়েই থাকুন, সাবধানতার খাতিরে।"

নিরঞ্জন বলল, "এ যে দারুণ আলাতন।"

ডাক্তার বললেন, "দিব্যি রাজার হালে রয়েছেন. এ আর দারুণ আলাতন কি? আমি ত কাল ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে আপনাকে নিয়ে করি কি? ভাগ্যে এঁর আবির্ভাব হ'ল। সবই ত দিব্যি গুছিয়ে নিয়েছেন এরই মধ্যে। হপ্তা খানিকের মধ্যে আপনি উঠে হেঁটে বেড়াবেন এখন।"

ধীরা জিজ্ঞাসা করল, "পড়াশুনো ত করতে পারেন?"

"অল্পস্বল্প করুন না? জ্বরটর ত আজ দেখছি না। মাঝে ত শুনলাম জ্বরেও ভুগে এসেছেন কিছুদিন। তা এই বিশ্রামের চিকিৎসারই দুটোই সেরে যাবে। তার-পর না হয় একবার হাওয়া বদল করে আসবেন এখন। অত ভাল স্বাস্থ্য ছিল আপনার, অত্যাচার করে করে সেটা নষ্ট করবেন না।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, "দিন দুই পরে এখান থেকে চলে গেলে কি রকম হয়?"

"না, না, অত হুড়োহুড়ি করে সব মাটি করবেন না। যা ধাক্কা খেয়েছেন! হাড়-পাঁজর যে ভেঙে রাখেন নি সেই ঢের। এখানে অসুবিধে ত কিছু দেখছি না। Single-seated hospital-ই খোলা হয়ে গেল আপনার জন্যে। এত যত্ন আর আপনি কোথায় পেতেন? খাওয়া-দাওয়াও ত ভালই হচ্ছে দেখছি।"

নিরঞ্জন এতক্ষণ পরে ধীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "না, সে সব ত্রুটি উনি কিছু রাখেন নি।"

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বললেন, "তা ত রাখবেনই না।

তবে নিজের দিকেও তাকাবেন মাঝে মাঝে। মাস দেড় দুই আগে আপনাকে যখন প্রথম দেখি, তার চেয়ে আপনি ঢের রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন।"

ধীরা বলল, "মাঝে ভুগে'ছিলাম কিছুদিন, সে ধাক্কাটা এখনও সামলাই নি", বলেই ভয় হ'ল পাছে নিরঞ্জন জানতে চায় যে মাঝে কি হয়েছিল তার। কিন্তু সে রকম কোন প্রশ্ন নিরঞ্জন করল না। ধীরা ভাবল, সেই আমি আর এই আমি! দিন ছিল যখন আমার চোখে এক ফোঁটা জল দেখলে নিরঞ্জনের কাছে দিনের আলো কালো হয়ে যেত। কিন্তু এমন পিশাচ-মন্ত্র পড়েছি আমি, যে যা কিছু করুণ কোমল ছিল এর হৃদয়ের মধ্যে, সব ক্রূর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার আবার কাল আসার আশ্বাস দিয়ে উঠে পড়লেন। ধীরাও নিজের যা কিছু জানবার ছিল, সব জেনে নিল।

কাজ সমস্ত দিনের। ছুটি নেই, ছুটি চায়ও না। আরও যদি করতে পারত কিছু। যদি পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারত, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারত। বললে ত বই পড়ে শোনাতেও পারত? দুপুরে অনেকবার ঘুরে গেল নিরঞ্জনের খাটের পাশ দিয়ে, সে জেগে শুয়ে আছে। একবার জিজ্ঞাসা করল, "কিছু পড়ে শোনাব?"

নিরঞ্জন বলল, "নাঃ, শুনতে বেশী কিছু ভাল লাগবে না।"

ধীরা খানিকক্ষণের জন্য ঘর ছেড়ে চলেই গেল। চোখের জল সে কাকে দেখাবে? অপরাধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু অপরাধীকে কি একবারও রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে করা যায় না? নিরঞ্জন কথা রাখে নি, সে ধীরাকে একেবারে ক্ষমা করে নি। বলে গিয়েছিল ভগবান ধীরাকে ক্ষমা করবেন না, নিজেও আজ যেন বিধাতার প্রতিনিধি হয়ে প্রতিহিংসা নিতে বসেছে।

রোগীকে বৈকালিক খাবার দেওয়া, ওষুধ দেওয়া সব করবার সময় এসে পড়ল। ধীরা উঠল, চোখে-মুখে জল দিয়ে চেহারাটাকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করল, বিশেষ সক্ষম হ'ল না। খাবারের ছোট ট্রে নিয়ে গিয়ে নিরঞ্জনের পাশে রেখে বলল, "খেয়ে নাও।" নিজের কানে নিজের গলার স্বরটা অদ্ভুত ক্লান্ত শোনাল।

নিরঞ্জন আজও চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে ছিল। হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'নিজে অসুস্থ ছিলে, তা এ ভার নিতে এলে কেন?'

ধীরা বলল, "এখন অসুখ নেই।"

নিরঞ্জন আর কিছু বলল না, নীরবে খাওয়া শেষ করল। ধীরা যখন বাসন তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন একবার তার মুখের দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকাল। ধীরা সেটা দেখতে পেল না। নিজের চা খাওয়া শেষ করে চাতালটায় গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। আলো না জ্বালা অবধি ঘরের ভিতর গেলই না।

রাত্রে খাওয়াতে গেল যখন তখন নিরঞ্জন বলল, "ঘরে কারো থাকার কি খুব দরকার আছে? ছোকরাটা এত নাক ডাকায় যে, আমার ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। ওটাও বারান্দায় থাক।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা, তাই থাক। ডাকলে কেউ না কেউ সাড়া দেবে, আমরা চার-পাঁচ জন লোক ত থাকি।"

নিরঞ্জন বলল, "ডাকবার কিই বা প্রয়োজন হয়?"

ধীরা বলল, "অসুস্থ শরীর হতে ত পারে কিছু দরকার? আর দিন দুই পরে ভালই হয়ে যাবে। খুব বেশী আঘাত কোথায়ও লাগে নি।"

নিরঞ্জন বলল, "দুর্ভাগ্যও মানুষের সৌভাগ্য হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে। তবে আমার কপাল সে রকম নয়।"

বেদনায় ধীরার মুখটা কালো হয়ে উঠল, বলল, "আমি তোমার কাছে অপরাধী, আর না ডাকতে আমি যেচে এসেছি শাস্তি দেবার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু মানুষের প্রাণে সবই কি সহ্য হয়? পাপীর শাস্তি পাওয়া উচিতই, কিন্তু ক্ষমা কি একেবারে তার জন্যে কোথাও নেই?" চোখ মুছবারও সে আর চেষ্টা করল না, চোখের জল অজস্র ধারে ঝরতে লাগল।

নিরঞ্জন এইবার সোজা তাকাল ধীরার দিকে। মুখের ভ্রুকুটিটা চলে গেল, চোখের দৃষ্টি ব্যথা-কাতর হয়ে উঠল। অত্যন্ত নীচু গলায় বলল, "যন্ত্রণা আমায় অমানুষ করে দিয়েছে ধীরা এরকম আমি ছিলাম না। আমাকে স্বাভাবিক মানুষ ভেবো না আর। কয়েকদিন সহ্য কর কষ্ট করে, তারপর ত মুক্তি পাবেই।"

ধীরা অনেক কষ্টে নিজের চোখের জল সম্বরণ করল। বলল, "মুক্তি ত আমার নেই। সব কিছুর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেলে তবে ত মুক্তি? তার দেরি আছে। কিন্তু তোমাকে আর বিরক্ত করব না, আমি যাচ্ছি।"

না খেয়ে দেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক রাত অবধি শোনা গেল যে যশোদা তাকে বক্তৃতা শোনাচ্ছে,

খাওয়ার অনিয়মের জন্য। এতই প্রাণ খুলে বক্তৃতা দিচ্ছে যে নিরঞ্জনের কাণেও কথাগুলো বেশ পরিষ্কার হয়ে পৌঁছচ্ছে।

নিরঞ্জন ভাবল, এত কশাইয়ের মত নিষ্ঠুর আমি হয়ে গেলাম কি করে? এই মেয়েটা ত নিজেই মরবে ক'দিনের মধ্যে, আমি তাকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছি কেন? বিধাতা দু'জনের শাস্তি একই সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন, একই সঙ্গে কি পালা শেষ হবে? এ রকম দুর্ভাগিণী মেয়ে জগতে আর কোথাও জন্মেছে কি? ভালবাসাই এর মৃত্যুর কারণ হ'ল? নিজে শেষ হ'ল, আমাকেও ধ্বংস করল। কোথায় কার কি উপকার হ'ল এই সর্ব্বনাশা প্রেমে? অথচ মানুষের মধ্যে ভগবান্ এই প্রেমের রূপ ধরেই ত আছেন? দয়া আর ভালবাসা এছাড়া স্বর্গীয় আর কিই বা আছে জগতে? প্রত্যাখ্যাত অপমানিত ভালবাসা নিরঞ্জনকে সারাক্ষণ সাপের মত কামড়েছে, তারই বিষে আজ সে এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পেরেছে। না হলে সে ত দয়ামায়াহীন ছিল না? বিশেষ করে এই মানুষটি সম্বন্ধে এত কঠোর কি করে সে হতে পারছে, কয়েকটা দিন আগে যার উপর ভালবাসা তার একেবারে অতলস্পর্শী ছিল? অপরাধ ধীরা করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বুদ্ধির দোষে করেছে। নিরঞ্জনকে এত কঠিন আঘাত দিয়েছে যে তার মনুষ্যত্বই ভেঙে পড়েছে বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটাও তার কল্যাণ কামনা করে করেছে, আর কোন অভিপ্রায় থেকে করে নি। আর নিজে ত ধীরা তিলে তিলে মরছে, সে বুঝতে দেরি হয় না। তার মুখেই শোনা গেল যে সে সবে অসুখ থেকে উঠেছে। কি অসুখ নিরঞ্জন জানে না, সে এলাহাবাদ থেকে চলে যাবার পর হয়ে থাকবে। তবুও এসেছে, তার সেবা করতে। আর এমন করে সেবা কেউ করতে পারে না, যার প্রাণের টান নেই। ঐ অপরূপ সুন্দরী ধীরা, আজ ত প্রায় ছায়ামাত্রে গিয়ে ঠেকেছে। আর সারাদিন পরিশ্রম করছে, তার নিষ্ঠুরতা সহ্য করছে, এবং নিজের আহার নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করেছে। ক'দিন আর এ যমযন্ত্রণা ঐ সুকুমার শরীর সহ্য করতে পারবে?

হঠাৎ সচেতন হয়ে নিরঞ্জন দেখল যে তার চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়ছে। তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল কিন্তু ঘুম সহজে আসে না। ঘরে আজ আর কোন শব্দ নেই, শুধু ধরণীর বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসের মত কি একটা শব্দ হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসছে।

সকালবেলা ধীরা তার নিয়মমত কাজ করতে এল। তার ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন বলল, "তুমি ঐ ছোকরাটাকে দিয়ে খানিক খানিক কাজ করিয়ে নাও না? নিজে একটু বিশ্রাম কর। তোমাকে এ অবস্থায় এ রকম করে খাটতে দিতে আমি পারব না।"

ধীরা বলল, "আমার ত কিছু হয় নি?"

"হ'তে বাকি যে কি আছে তাও ত জানি না। নাও, কাজ তোমার সেরে নাও। ডাক্তারকে আজ বলতে হবে ঠিক করে, কতদিন আমার আর এই যন্ত্রণা চলবে। আমার বোঝা তোমার উপর কেন যে এসে চাপল তা জানি না। বড় শোচনীয় ব্যাপার। এর মধ্যে তুমি না এলেই সকলের পক্ষে ভাল ছিল। শরীর আমার আরাম পাচ্ছে বটে, কিন্তু মানুষ ত শুধু শরীর নয়? মনে আমার দারুণ অশান্তি। এটা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া দরকার।"

ধীরা বলল, "কাল থেকে ডাক্তার ত তোমায় বসতে দেবেন। তখন চাকর-বাকরে কাজ অনেকটাই করতে পারবে। আমার আর খুব বেশী আসার দরকার হবে না।"

নিরঞ্জন বলল, "দেখ ধীরা, তুমি আগে যে নিরঞ্জনকে জানতে, আমি আর সে মানুষ নেই। আমার কোন কথায় তুমি কষ্ট পেয়ো না। তুমি ডাক্তার, নানারকম অস্বাভাবিক মানুষ নিয়ে তোমাকে কারবার করতে হয়। সেই রকম একটা মানুষ মনে কর আমাকে। একটা বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ। যে ভদ্রভাবে কথাও বলতে জানে না, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে জানে না।"

ধীরা বলল, "কৃতজ্ঞতা? কৃতজ্ঞতা চাইবার কোন অধিকার আমার আছে? তার আশা কি করেছি আমি? প্রথমেই কি বলি নি যে আমি সম্পূর্ণ নিজের গরজে এসেছি? তুমি দয়া করে সেবার অধিকার দিয়েছিলে, সে অধিকারের সীমা কোথাও কি অতিক্রম করেছি আমি? তবে তুমি কেন এমন অস্থির হয়ে উঠছ? ভাল করে সেরে ওঠার জন্যে যে ক'টা দিন এখানে থাকতে হচ্ছে, মন শান্ত ক'রে থাক। তারপর ত নিজের নিজের পথ পড়ে আছে? আর ত আমাদের সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে না কোনদিন?"

নিরঞ্জন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "না, আর দাঁড়াব না। এটা যে এতটা মর্ম্মান্তিক ব্যাপার হবে, আমি সেটা বুঝতে পারিনি, নইলে তোমার এখানে থাকার মত দিতাম না। যাক, কতগুলো ঘণ্টার মাত্র ব্যাপার,

তারপর আর কোন ভাবনা আমার জন্যে অন্ততঃ তোমাকে ভাবতে হবে না।"

ধীরা নীরবে নিজের কাজ সেরে চলে গেল। অন্য দিনের নিয়মেই সব কিছু চলতে লাগল, ডাক্তারও এসে উপস্থিত হলেন। নিরঞ্জনকে দেখে-শুনে বললেন, "এ যাত্রা অল্পের উপর দিয়েই গেল মশায়। কাল থেকে উঠে বসুন, পরশু থেকে একটু একটু হাঁটাচলা করতে পারবেন।"

নিরঞ্জন বলল, "আপনাদের কল্যাণেই এতটা তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পেলাম, নইলে আরও কতদিন এ রকম পড়ে থাকতে হ'ত কে জানে?"

ডাক্তার বললেন, "আমার কল্যাণে আর কি? যাঁর কল্যাণে তাঁকেই ধন্যবাদ দিন। মিস রায় হঠাৎ এসে পড়ে সব ভার যদি না নিতেন তা হ'লে কি হ'ত ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে দেখছি না যে? অসুস্থ হয়ে পড়েন নি ত? কাল বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে।" বলতে বলতেই ধীরা এসে ঘরে ঢুকল।

ডাক্তার বললেন, "আপনার রুগী ত সেরেই গেল ভালভাবে। এইবার নিজের দিকটা দেখুন। চেহারা মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না আপনার।"

ধীরা বলল "নিজের দিক্ দেখবার সময় ত পড়েই রয়েছে। এ দিক্‌টা আগে শেষ হোক।"

"এ ত শেষ হয়েই আছে। সাবধানতার খাতিরে আজকের দিনটা শুয়ে থাকতে বলছি। কাল থেকে উঠে পড়বেন, ঘরের ভিতর হাঁটা-চলাও করতে পারেন। সেটা যদি ভালভাবে stand করেন তা হ'লে পরশু থেকে ছুটি। এলাহাবাদ ফিরেও যেতে পারেন দু' দিন পরে। আচ্ছা, এখন উঠি। কাল এসে একবার দেখে যাব, ভালই যদি দেখি, তাহলে আর আমার আসার দরকার হবে না।"

নিরঞ্জন নমস্কার করে বলল, "ধন্যবাদ। এত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি দিতে পারব, আর নিজেও পাব, তা আশা করতে পারি নি।"

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী দু'জনকে নমস্কার করে প্রস্থান করলেন। ধীরা বলল, "দেখ, উনি বেশী সাবধান মানুষ তাই আজও শুয়ে থাকতে বলছেন। তবে বিকেলে হয়ত আজ আমি তোমার কাজ করতে আসতে পারব না। যশোদা আর তোমার চাকর মিলে সব কাজ করে দেবে। তাদের করতে দিও। আর কাল থেকে ত তুমি নিজেই উঠবে, আমাকেও দরকার হবে না, অন্য কাউকেও দরকার হবে না।"

তার গলার স্বরের নিদারুণ হতাশাটা নিরঞ্জনকে যেন ছুরির খোঁচা মারল। তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "খুব শরীর খারাপ হয়েছে?"

ধীরা বলল, "হয়েছে খানিকটা। ভালই আছ, আর নিষ্কৃতি চাইছ, তাই ছুটি নিচ্ছি। কাজ যদি থাকত আর তুমি বিরক্ত না হতে, তা হ'লে কাজই আরও কিছু দিন করতাম। আমার নিষ্কৃতি তাতেই ছিল।"

নিরঞ্জন বলল, "না ভেবে কথা বলার পর্ব্বটা আমরা এস শেষ করি ধীরা। কি বলতে চাইছি, আর কি বলছি, এ দুটোতে বড় বেশী তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। এখন আর কথা বলব না, ওবেলা বলব। তুমি আজ সারা দুপুর বিশ্রাম কর, একটু সুস্থ হ'তে চেষ্টা কর। ওবেলা হোক বা কাল হোক, আমার যা বক্তব্য সব বলেই আমি বিদায় নেব। তবে আজ অন্তত, তোমাকে আঘাত দেবার কোন ইচ্ছা আমার মনে ছিল না। মুখ দিয়ে হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে গেছে। একেবারে পাষণ্ড আমি নই, এখনো হইনি। তোমার সেবার জন্যে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।"

ধীরা বিস্ফারিত চোখে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইল নিরঞ্জনের দিকে। তারপর উঠে, সে প্রায় ছুটে চলে গেল ঘর থেকে।

গল্পদাদা

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

'হ্যালো চিল্‌ড্রেন, গুড ইভনিং! গল্পদাদা স্পীকিং গল্পদাদা কথা বলছে। শুনতে পাচ্ছ? পালিও না, পালিও না, পালিও না……'

এমনি ভাষায় এক চিত্তাকর্ষক কণ্ঠস্বর ভেসে উঠত রেডিওতে, আজ থেকে তিন যুগ আগে। কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের আদিযুগে তার একটি বিশেষ বিভাগে, 'ছোটদের আসরে'।

প্রতি শনিবার আর মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায় তখনকার বাংলা দেশের বেতার শ্রোতা ছেলেমেয়েরা রেডিও সেটের সামনে বসে উৎকর্ণ হয়ে থাকত। আকাশে কান পেতে শুনত—আশ্চর্য যন্ত্রের মধ্যে অলক্ষ্য থেকে গল্পদাদা তাঁর আশ্চর্য আসর আরম্ভ করলেন তাদেরই জন্তে। আসরের প্রথমে তিনি গল্প বলতেন। গল্প বলবার তাঁর নিজস্ব এমন এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গি ছিল, এমন সহজ সুন্দর করে অথচ কৌতূহল জাগিয়ে রেখে আদ্যোপান্ত বলে যেতেন যে তাঁর অসংখ্য অদৃশ্য ছোট ছোট শ্রোতাদের তা ছিল পরম আকর্ষণের বস্তু। কত রকমের আর কত মজার গল্পই যে তিনি শোনাতেন দিনের পর দিন। পুরাণের গল্প, ইতিহাসের গল্প, রূপকথা, রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, হাসির গল্প। অনর্গল বলে যেতেন সম্পূর্ণ মন থেকে; কোন লেখা কিংবা বই পড়ে নয়। সমস্তই extempore. যেদিন যেমন সময় হাতে থাকে, সেই মতন বলেন গল্প। কোনদিন একটা, কোনদিন বা দুটো। কখনো বা কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে ধারাবাহিক গল্প।

এক একদিন বাইরে থেকে কোন বক্তাকে আসরে তিনি নিয়ে আসতেন। কোন সাহিত্যিক বা পণ্ডিত বা চিকিৎসক বা হাস্যরসিককে। তাঁরা বলতেন নানা রকমের জানবার কথা ছোটদের মনের মতন করে, সহজ সরল ভাষায়।

আসরের গোড়ার দিকে এইসব হবার পর আরম্ভ হ'ত ছেলেমেয়েদের নিজেদের অনুষ্ঠান। আসরের যে ভাইবোনেরা—এই 'আসরের ভাইবোন' কথাটিও গল্পদাদা প্রচলিত করেছিলেন তাদের মনে একটি প্রীতির স্নিগ্ধ ভাব মণ্ডিত ক'রে—বেতার কেন্দ্রে গান গাইতে, আবৃত্তি করতে কিংবা বাজনা বাজাতে, তাদের অনুষ্ঠান হ'ত। আসরের এ অংশটি ছিল ছোটদের কাছে পরম উপভোগ্য। বিশেষ কিশোর-শিল্পী বা শিশুশিল্পী হয়ে যারা সেখানে আসত, তাদের পক্ষে। কারণ সেকালে কোন 'অডিশন' বা পরীক্ষা কিংবা কোন নিয়ম নিষেধের বেড়াজাল ছিল না। বেতারের সেই আদি যুগের নানা আসরের মতন তার ছোটদের আসরেও একটি অন্তরঙ্গ সহৃদয় ঘরোয়াভাব বিদ্যমান থাকত, কোন বাহ্যিক কেতা তখনো দেখা দেয়নি সেখানে। গল্পদাদুর সে আনন্দের হাটে ছেলেমেয়েদের অবারিত দ্বার। গান গাইবে? বাজনা বাজাবে? আবৃত্তি করবে? ক'জন এসেছ? কাউকে যেন বঞ্চিত না হতে হয়, এমনভাবে সময়ের হিসেব করে তাদের অনুষ্ঠানের সময় জানিয়ে দিতেন। তারপর যথাসময়ে মাইক্রোফোনের সামনে ছেলে-মেয়েদের ডাক পড়ত অংশ নেবার জন্তে।

তখন তৌর্যত্রিকের চর্চা ছোটদের মধ্যে এত সীমিত ছিল যে, আগতদের জন্তে সময়ের সঙ্কুলান করতে বিশেষ অসুবিধা হ'ত না। পরে যে শিশু ও কিশোর শিল্পীদের সংখ্যায় অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তার জন্তে সেকালের সেই ছোটদের আসরের, তার স্থাপনকর্তা ও পরিচালক গল্পদাদার অবদান সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। তখনকার কথা আজকের দিনে চিন্তা করতে গেলে একথাই মনে হয় আর গল্পদাদার সে সময়ের কার্য-কলাপের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যায়। কিন্তু সেকথা এখন থাক।

আসরে নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও, মাঝে মাঝে তিনি ছোটদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন সঙ্গীতের, আবৃত্তির। সে সব প্রতিযোগিতাও হ'ত মাইক্রোফোনের সামনে, আসরের অংশ হিসেবে। সেসব দিনে অবশ্য ছেলেমেয়েরা কিছু বেশি সংখ্যায় আসত। কোন কোন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আবার গানটি নির্দিষ্ট করে দিয়ে সেটি আসরে শেখাবার ব্যবস্থা হ'ত, ওই মঙ্গল বা শুক্রবারের প্রোগ্রামের মধ্যে। যেমন একবারের একটি কীর্তনাঙ্গের গান—'শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী, হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি'—বিখ্যাত হাস্যসঙ্গীত গায়ক নলিনীকান্ত সরকার কয়েকদিন ধরে আসরে শিখিয়েছিলেন।

প্রতিদিনের আসরের যে কথা হচ্ছিল, প্রথমে গল্পদাদার গল্প কিংবা কখনো কোন বাইরেকার বক্তার ভাষণ ও তারপর ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠানের পর, গল্পদাদা নিয়ে বসতেন আসরের ভাইবোনদের লেখা চিঠির ঝাঁপি। যারা চিঠি লিখেছে তাদের নাম জানিয়ে দিয়ে একে একে সে সব চিঠিপত্র পড়তেন। তারপর চিঠিতে তারা যা কিছু জানতে চেয়েছে তার উত্তর দিতেন যতদূর সম্ভব সরল করে। এক এক জনের চিঠি পড়বার আগে তাদের যখন নাম করতেন তারা রেডিওতে নিজেদের নাম শুনে পুলকিত হয়ে উঠত, উন্মুখ হয়ে থাকত নিজেদের নামটি গল্পদাদুর মুখে শোনবার আশায়। এই চিঠিপত্রের সময়টিও তাদের কাছে কম আকর্ষক ছিল না।

তাদের আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার ছিল আসরের ধাঁধা। অনেক সময় লাগত বলে ধাঁধার জন্যে বিশেষ করে মঙ্গলবারের আসর নির্দিষ্ট থাকত। ছড়ার আকারে ধাঁধা বা হেঁয়ালী তৈরি করে আসরের ভাইবোনরা গল্পদাদাকে লিখে পাঠাত আর সেসব আসর থেকে পড়ে দেওয়া হ'ত, যারা তৈরি করেছে তাদের নাম উল্লেখ করে। উত্তর তখন জানানো হ'ত না। পরের সপ্তায় ধাঁধার উত্তরগুলি প্রকাশ করা হ'ত আর যাদের যেসব উত্তর সঠিক হয়েছে, তাদের নামের ঘোষণা শোনা যেত। প্রতি সপ্তায় ৪।৫টি করে ধাঁধা পাঠাত ছেলেমেয়েরা। কখনো কখনো তাদের তৈরি শক্ত ছকের ধাঁধা কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মুখপাত্র 'বেতার জগৎ'-এ প্রকাশিতও হ'ত।

আসরে এইভাবে ধাঁধা তৈরি করে পাঠানো আর তাদের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারটি ছিল একাধারে আনন্দ, বুদ্ধির চর্চা এবং ছড়া রচনারও চর্চা। এই অনুষ্ঠানটিও আসরের অন্যান্য বিভাগের মতন গল্পদাদার মনের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক এবং যাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হ'ত তাদের কাছেও ছিল রীতিমত চিত্তাকর্ষক। কখন কার নামটি রেডিওতে হঠাৎ ধ্বনিত হয়ে উঠবে সেজন্যে এই সময়টা সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকত।

এমনিভাবে চলত সে যুগের বেতারের ছোটদের আসর—ছোটরা যাকে বলত গল্পদাদুর আসর। এমনি করে প্রতি মঙ্গল আর শুক্রবার একঘণ্টা ধরে গল্পদাদা সে আসর মাতিয়ে রাখতেন। ক্ষুদে শ্রোতার দল খেলা ফেলে এসে বসে বসে শুনত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। গল্পদাদার কণ্ঠে যেন যাদু ছিল আর ছোটদের খুসি করবার, মাতিয়ে তোলবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা। নিজের চেহারার বর্ণনায় মাঝে মাঝে বলতেন—'আমার তেরো হাত দাড়ি।' কথাটা শুনে সকলের অর্থাৎ যারা তাঁকে দেখেনি, ধারণা হয়ে যায় যে তিনি প্রকাণ্ড দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মানুষ। আসরের একটি মেয়ে তাঁর একটি ছবি এঁকে পাঠিয়েছিল—সে ছবি ছাপা হয়েছিল বেতার জগতে—এক বৃদ্ধ (গল্পদাদা) চেয়ারে বসে যেন গল্প বলছেন, তাঁর লম্বা দাড়ি তাঁর সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে নেমে এসে পা ছাপিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে আর সেই দাড়ির উৎপত্তিস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত ১, ২, ৩ ইত্যাদি করে ১৩ হাত লেখা।

গল্পদাদা বেশ মজা করে বলতেন যে তাঁর তেরো হাত লম্বা দাড়ি নিয়ে তিনি যত মুস্কিলেই পড়েছেন। চলাফেরা করে বেড়াতে অসুবিধা হয় এই দাড়ির বোঝা বয়ে। তাই কোন কাজ করতে পারেন না, শুধু গল্প বলেন বসে বসে।

কিন্তু আসরের যে ভাইবোনেরা ষ্টুডিওতে তাঁর কাছে সশরীরে হাজির হ'ত তাঁকে দেখতে, কিংবা গান গাইতে বা আবৃত্তি করতে—তারা দেখত, তেরো হাত ত দূরের

কথা তেরো ইঞ্চি দাড়িও নেই। দাড়ির কোন বালাই নেই, পরিষ্কার কামানো মুখ। তবে হ্যাঁ, একজোড়া গোঁফ আছে বটে দেখবার মতন। দাড়ির অভাব বোধ হয় গোঁফজোড়া দিয়ে অনেকখানি মিটিয়েছেন। এমন সুপরিপুষ্ট গুম্ফ সচরাচর চোখে পড়ে না। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মুখের দু'দিকে ধরা রয়েছে দু'টি বিরাট বর্মা চুরুট। তাঁর ঈষৎ কৃশ, দীর্ঘ অবয়বের ও একহারা মুখের সঙ্গে সেই গুম্ফ যেন খানিক বেমানান। তাঁর দুরস্ত প্যান্ট কোট ওয়েস্টকোট আর নেকটাইয়ের ওপরও ঠিক মানানসই। অথচ সপ্রতিভ মুখে কেমন যেন মানিয়ে গেছে, তার মুখে বলা পুরাণের গল্পের মতনই।...

ছোটদের মনোহরণকারী সে এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ছিল গল্পদাদার। বাংলাভাষী ছেলেমেয়েদের সেই আনন্দময় আসরের মধ্যে দিয়ে একতাসূত্রে গ্রথিত করে তাদের বৃহত্তর মানসবিকাশের এক অপূর্ব পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। এবং আদর্শবাদী হয়েও স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না তিনি। তাই সে আদর্শকে—যে আদর্শের ক্ষেত্রে কোন পূর্বসূরীকে তিনি পান নি—সার্থক করবার জন্যে একটি সংগঠনও করেছিলেন অভিনব। বেতার-কেন্দ্রের ছোটদের আসরকে ভিত্তি করে তিনি গঠন করেছিলেন একটি ব্যাপক ও ছেলেমেয়েদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান—রেডিও সার্কল অব বেঙ্গল (Radio Circle of Bengal)। যার উদ্দেশ্য ছিল, স্কুল নির্দিষ্ট শিক্ষার বাইরে এক মনোরম সানন্দ পরিবেশে ছোটদের সুপ্ত সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন। দেশের ভবিষ্যৎরূপে তাদের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দিয়ে চরিত্র গঠন করা। তাদের চিত্তের সকল সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে চৈতন্য জাগরিত ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা।

বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে সেই প্রথম কিশোর-আন্দোলনের পথ প্রদর্শন গল্পদাদা এইভাবে করলেন। রেডিও সার্কলের উদ্‌বোধন তিনি করেন এক উন্মুক্ত উৎসবের আকারে। ছোটদের জন্যে এবং ছোটদের নিয়ে এদেশে সেই সম্ভবত প্রথম সঙ্গীত ইত্যাদি সহযোগে প্রকাশ্য আনন্দ সম্মেলন। ১৯৩০ খ্রীঃ সেই পথিকৃৎ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হ'ল। তখনকার বেতার-কেন্দ্রের কার্যস্থল ১, গার্স্টিন প্লেসে, বেতার ভবনের পাশে যে উন্মুক্ত জমি ছিল সেখানে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে বাংলার ছেলেমেয়েদের সেই প্রথম সম্মেলন। এদেশে এক নতুন দৃষ্টান্ত। রেডিও সার্কলের নিজস্ব, সুন্দর প্রতীক চিহ্ন (badge) বুকে নিয়ে ছেলেমেয়েদের দল তাদের প্রথম নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে মিলিত হ'ল। এমন সাধারণের জন্য আহূত বিরাট অধিবেশনে এই প্রথম তারা অংশগ্রহণ করলে সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে। সুকুমার কলায় কিশোর প্রতিভার অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হবার এই প্রথম সুযোগ লাভ করলে।

ছোটদের সঙ্গে তাদের পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠরাও আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন সেদিনের আনন্দানুষ্ঠানে। সেখানে গল্পদাদা তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে আলাপে আপ্যায়নে এবং তাঁর রঙ্গিনী ব্যক্তিত্বে সকলকে যেভাবে পরিতৃপ্ত করেছিলেন তা উপস্থিত সকলেরই এক মধুর অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। সে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ঝামাপুকুরের হিরণ্যকুমার মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্রের এক বংশধর। হিরণ্যকুমারের সেখানে যোগাযোগের কারণ এই যে, তাঁর একমাত্র পুত্র প্রফুল্ল কুমার ছোটদের আসরের এক প্রতিভাবান সদস্য ছিল। সাহিত্য চিত্রশিল্পাদি রচনায় তার প্রতিভার কোরক প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তা অঙ্কুরেই ঝরে যায় তার অকালমৃত্যুতে। গল্পদাদা হিরণ্যকুমারকে তাই বাংলার ছেলেমেয়েদের বৃহত্তর আনন্দযজ্ঞে উপস্থিত করে তাঁর শোকের ভার লাঘব করতে চেয়েছিলেন। কিশোর প্রফুল্লের সাহিত্য ও চিত্র রচনার নিদর্শন সমেত তার স্মৃতিকথার একটি পুস্তিকাও গল্পদাদা প্রকাশ করেছিলেন 'বাংলার নচিকেতা' নামে।

বাংলার ছেলেমেয়েদের এই অভিনব আনন্দময়সূত্রে সংগঠিত করবার মহান প্রচেষ্টার জন্যে গল্পদাদাকে অভিনন্দন জানিয়ে রেডিও সার্কলের সেই অধিবেশনে হিরণ্যকুমার মিত্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপর গল্প-দাদাকে মাল্য দান করতে গেলে, সে মালা নিজের গলায় লম্বিত হ'তে না দিয়ে এগিয়ে আসেন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে। সভার অনেকের দৃষ্টি আগে এদিকে আকৃষ্ট হয় নি, কিন্তু এখন গল্পদাদাকে অনুসরণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, প্যাণ্ডেলের একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত খুঁটিতে এক বৃদ্ধের মাটির তৈরি আবক্ষ মূর্তি টাঙানো রয়েছে আর তার তেরো হাত দীর্ঘ শ্মশ্রু লুটিয়ে রয়েছে নীচের মাটিতে খানিকদূর পর্যন্ত। গল্পদাদা তাঁর মালাখানি এনে সেই নকল গল্পদাদার মূর্তির গলায় পরিয়ে দিলেন। তখন এক হাসির হিল্লোল জেগেছিল সমস্ত সভা-মণ্ডপ মুখরিত করে।

সেই উদ্‌বোধনী অধিবেশনের সময় থেকে রেডিও সার্কল ছেলেমেয়েদের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয় বটে, কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারে নি দু'টি কারণে।

প্রথমত, তার ভিত্তিস্বরূপ ছিল ছোটদের বেতার-আসর এবং সেই বেতারকেন্দ্রের জীবনে এক চরম সঙ্কটকাল এসেছিল, কলকাতা বেতারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল রেডিও সার্কেলের সেই অনুষ্ঠানের পরেই। দ্বিতীয়তঃ, গল্পদাদুর দীর্ঘদিন রোগভোগান্তে অকাল-মৃত্যু। নচেৎ, তিনি জীবিত থাকলে রেডিও সার্কেলের জীবনে নিশ্চয় স্থায়িত্ব আনতেন এবং বাংলার ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা সম্পূর্ণ হত।...

ছোটদের মানস উন্মেষে ও বিচিত্র আনন্দলোকের সন্ধান দেবার প্রচেষ্টায় আরো একটি বিষয়ে পথ-প্রদর্শক ছিলেন গল্পদাদা। তা হ'ল, বাংলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সুদূর বিদেশের ছেলেমেয়েদের লেখনী-বন্ধু (pen friend পাতিয়ে দেওয়া। তাদের মনের একটা বড় জানলা তিনি খুলে দিয়েছিলেন, বলা যায়। সে যুগে এদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের চিঠির মাধ্যমে আলাপ-পরিচয় বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা এক অভিনব পন্থা। লণ্ডনের বেতার কেন্দ্রেও একটি ছোটদের আসর ছিল, সেখানকার কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় গল্পদাদা এখানে এই লেখনীবন্ধু পাতাবার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বাংলার ও ইংলণ্ডের যে সব ছেলেমেয়েরা পত্র-যোগে বিদেশে বন্ধুত্ব পাতাতে চায় তাদের নাম-ধাম-বয়স বেতার কেন্দ্রের ছোটদের আসর থেকে নেওয়া হয়। এবং সেখানকার ছেলেদের সঙ্গে এখানকার ছেলেদের ও এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে ও দেশের মেয়েদের সমবয়স দেখে নাম ঠিকানা সরবরাহ করা হয় পরস্পরকে।

বাংলার ছেলেমেয়েরা গল্পদাদার আসর থেকে তাদেরই সমবয়সী ইংলণ্ডের ছেলে বা মেয়ের নাম-ঠিকানা পেয়ে তাদের চিঠি লেখে। বেতার কেন্দ্রের মধ্যস্থতাতেই প্রথম চিঠি লেখার পত্তন হয়, তারপর উত্তর আসে সেখান থেকে। পরে স্বাধীনভাবে পত্রালাপ চলতে থাকে বাঙালী ও ইংরেজ ছেলেদের মধ্যে, ইংরেজ ও বাঙালী মেয়েদের মধ্যে। চিঠিতে পরস্পরের দেশের কথা, বাড়ীর কথা, নিজেদের কথা, স্কুল লেখাপড়া খেলাধুলা আর ছবি'র কথা লেখালেখি হয়। সুদূর বিলাত চলে আসে ঘরের কাছে। একটা অচেনা বিদেশকে ছেলেমেয়েরা ঘরোয়াভাবে জানতে পারে। নিজের দেশকে বিদেশীর কাছে চিনিয়ে দেয়। এ এক চমৎকার চিত্তরঞ্জক খেলা। যাকে কখনো দেখেনি, যার কথা আগে জানেনি, সেই সম্পূর্ণ ভিন্‌দেশী, ভিন্ন পরিবেশের সমবয়সীর সঙ্গে শুধু চিঠিতে জানাজানি। ঘরে বসে এ এক মজার দেশভ্রমণ। এও গল্পদাদার এক স্মরণীয় অবদান।

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের এমনি নানা অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি-চর্চা ও আনন্দভোগের এত সার্থক পরিকল্পনা গল্পদাদা করেছিলেন তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পশ্চাতে কাজ করেছিল তাঁর গভীর চিন্তাশীল মন। ছোটদের মঙ্গল কামনা তাঁর অন্তর ও ভাবনায় যে কতখানি স্থান অধিকার করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'গল্পদাদার কথা' বইটিতে। বেতারের ছোটদের আসরে তিনি দিনের পর দিন যত পুরাণের ইতিহাসের, দেশবিদেশের হাসির কিংবা আরো কত বিষয়ের গল্প বলতেন, তার কিছু কিছু নিয়ে বইখানি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকাংশে তিনি যে সব কথা লেখেন তার মধ্যে তাঁর মন ও আদর্শের অনেকখানি বিধৃত আছে। তার থেকে খানিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল:

'আকাশে কান পেতে তোমরা আমার গল্প শুনে আসছ। আমিও একটা চৌকো বাক্সের দিকে চেয়ে সারা বাংলার ছেলেমেয়েদের কচি কচি মুখগুলি ভাবতে ভাবতে কত না গল্প বলেছি। তোমরা বল, আমার গল্প শুনতে তোমরা বড় ভালবাস। আমিও তোমাদের গল্প বলতে বড় ভালবাসি। তোমরা আমাকে দেখতে পাও না, আমিও তোমাদের দেখতে পাই না। না দেখে ভালবাসা কেমন মজা। জীবনে কখনও দেখা হবে কি না সন্দেহ। নাই হ'ক গে।'...

বইখানির 'গল্পদাদার নিবেদন' তাঁর ধ্যান-ধারণাকে এই ভাবে প্রকাশ করেছে: 'আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-পরার ভার পিতামাতার উপর;

লেখাপড়ার ভার গুরুমহাশয়দের উপর; আর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দের ভার—ভগবান জানেন, কার উপর। লেখাপড়ার অবকাশে, যখন শিশুর মন তার গণ্ডী পেরিয়ে বাইরে যেতে চায়—আনন্দের দুলাল তারা—যখন মহানন্দে মাততে চায়, বুকের ভিতর আনন্দের উৎসগুলো যখন ফুটে উঠে তাদের চতুর্দিকে একটি আনন্দের রাজ্য স্থাপন করতে চায়—তখন রুক্ষবাণী, বা শুষ্ক বেত হ'ল আমাদের দেশের পিতামাতার জবাব!

আর, অন্য দেশে? হোক না বাবা খুড়ো লাটসাহেব—আস্তিন গুটিয়ে, ঢিলে পেন্টুলান বা পাজামা পরে, শুধু পায়ে, ছেলেদের নার্সারি বা খেলাঘরে ঢুকে পড়েন। বাপ, খুড়ো, দাদা—এক একজন প্রধান কর্মকর্তা হয়ে, শিশুদের কাঁধে পিঠে নিয়ে, দৌড়ঝাঁপ কত না খেলা খেলেন। তখন তাঁরা শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে, তাদের স্বপ্নরাজ্যের ভিতর ঢুকে, ছোট ছোট কোদাল খন্তা নিয়ে, মাটি খুঁড়ে treasure seeker সাজেন; নয় ত চোর চোর খেলেন। এক পয়সার পিস্তল নিয়ে, ডাকাতের হাত থেকে ছেলেদের খেলাঘরের দুর্গ, রাজবাটি, কোষাগার বাঁচান। ...এই বিমল আনন্দের ঢেউ শুধু খেলাঘরে আবদ্ধ থাকে না। তাদের সংসারও প্লাবিত করে। আবার পড়ার কিংবা খাবার ঘণ্টার সময়, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঠিক হাজির—ফিটফাট-একটু ত্রুটি অমার্জনীয়। কেল্লার গোরাদের চেয়েও কঠিন নিয়মে ছেলেদের জীবন বাঁধা। তাতেই তারা মানুষের মত মানুষ হয় এবং পরে নিজের নাম ও দেশের নাম জয়জয়কার করে।

আমাদের ছেলেরা—"এই তুই পড়ছিস না," "এই চীৎকার করছিস", "গালে দুই চড়", ইত্যাদি তাড়নায় লেখাপড়ার অবকাশটা অতিবাহিত করে। পিতামাতার দৃষ্টির বাহিরে তারা খেলা করে। সব সময় তাদের প্রাণে ভয়—হাজার নির্দোষ খেলা হলেও, যদি বাবা মা বকেন। আমরা ছেলেদের সঙ্গে মিশতে অরাজি। তাদের ভেঙ্গে দিতে চাই, গড়ে দিতে চাই না। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের আনন্দের ভাগ নেওয়া আমরা ছেলেমানুষী ভাবি। আমরা দেখি না—কে তারা? দেখলেও বুঝতে পারি না। চোখ রাঙান অবধি দৌড় আমাদের। তার ফলে যদি কেউ সৎ সঙ্গী পেলে ত ভাল। আর যদি সৎ সঙ্গী না পেলে ত বাপ-মায়ের চোখের জলের বন্দোবস্ত হ'ল।

আমার মনে হয়, কোন ছেলেমেয়ে খারাপ নয়, দুষ্ট নয়, শুধু সঙ্গীর অভাবে কি ক'রে অবকাশটা কাটাবে, তার মাল-মসলার অভাবে, ভাল-মন্দ হয়। বাংলা দেশের বাপ-মা'র লজ্জা ভাঙার সময় এসেছে। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ছেলেমেয়ে সেজে তাদের খেলাঘরে ঢুকে পড়তে হবে। আমাদের দেশের শিশুরাজ্যের একটি মহান ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতে হবে। তাই শুধু বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের ডাকছি না, তাদের অভিভাবকদেরও ডাকছি—

"আসুন, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শিখুন—ছেলেদের চিনতে চেষ্টা করুন। শুধু পেটের খোরাক নয়, মনের খোরাকও দিন।

কাপড় বুনতে গিয়ে কুড় হারিয়ে ফেললে, যেমন কাপড় বোনা হয় না, তেমনি ছেলেমেয়েদের মনের ভাব যদি বুঝতে না পারি, না চেষ্টা করি কিংবা আধাআধি বুঝি, তা হ'লে আবার তাদের ঠিক বুঝা যায় না, আর না বুঝলে তাদের মানুষ করা শক্ত হয়ে পড়ে। সেই জন্য আমি এখানে ছেলেমেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলছি।..."

দেশের ছেলেমেয়েদের এমন মনপ্রাণ দিয়ে যিনি ভালবাসতেন, তাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের এমন আন্তরিক দরদের সঙ্গে চিন্তা করেছিলেন দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে; বেতারকেন্দ্রে এবং সমগ্র দেশে ছোটদের জন্যে প্রথম প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করে এক বিচিত্র আনন্দ-যজ্ঞে তাদের আহ্বান জানিয়ে এনেছিলেন—ছোটদের সেই বন্ধু, শিক্ষক, বক্তা, সাহিত্যিক, আনন্দযজ্ঞের হোতা কে সেই বিচিত্র প্রতিভাধর গুণী, গল্পদাদু? যিনি সম্পূর্ণ নতুন পথের পথিক হয়ে একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তে অরুণোদয়ের সন্ধান দিয়েছিলেন?

সেদিনের সেই ছোটদের আসরের যারা পরে বড় হয়েছে, তাদের হয়ত কেউ কোনদিন হারাণো কৈশোরের স্মৃতির আলোয় গল্পদাদার কথা মনে করতে পারে,

কিন্তু সাধারণভাবে বাংলা দেশে তাঁর নাম এক রকম বিস্মৃত বলা যায়। এখনকার বেতারের বুধবার ও রবিবার বিকালে কিশোর-কিশোরীদের আসরটির নাম অবশ্য রাখা হয়েছে 'গল্পদাদুর আসর' (১৯৪১ থেকে, গল্পদাদুর মৃত্যুর ৮ বছর পরে এই নামকরণ হয়েছিল)। কিন্তু এখনকার কোন ছেলেমেয়েই সম্ভবত জানে না। কি মহান ঐতিহ্য বহন করছে গল্পদাদু নামটি কিংবা কি স্মরণীয় কীর্তি বিজড়িত আছে ওই মৌলিক নামটির সঙ্গে!

গল্পদাদা ছদ্মনামের অন্তরালে যে মানুষটি ছিলেন, তাঁর প্রকৃত নাম ও পরিচয় এখানে বিবৃত করা হ'ল। তিনি হলেন যোগেশচন্দ্র বসু, পেশায় আইনজীবী, হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। আর তাঁর পেশার বিবরণ এ পর্যন্ত অনেকখানি দেওয়া হয়েছে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ২৪ পরগণার দক্ষিণ বারাসতে তাঁর জন্ম। সেখানকার বর্ধিষ্ণু বসু পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে উল্লেখ্য তথ্য এই যে, উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রাজনারায়ণ বসুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন আর রাজনারায়ণের কাছে যে শিক্ষা লাভ করেন তার ফলে জাতীয়তার আদর্শ তাঁর মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। পরে সেই ভাবের সম্যক বিকাশ সাধন হয় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ১৯০৫ সাল ও তার অব্যবহিত পরে। যোগেশচন্দ্রের সেই স্বদেশী আন্দোলনের একটি শৃঙ্খল এবং তাঁর পরিণত বয়সের কিশোর সংগঠন ইত্যাদি আদর্শবাদী কার্যকলাপের মূল সেই প্রথম যৌবনকালের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনায় নিহিত।

তাঁর ছাত্রজীবন প্রধানত কলকাতায় অতি-বাহিত হয়। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ও সিটি কলেজে। সেখান থেকে বি, এ, পাঠ শেষ করবার পর তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বরাবরই মেধাবী ছিলেন, কিন্তু অধ্যয়নের অতিরিক্ত নানা বিষয়ে তাঁর ছাত্রজীবনে অনু-রাগ ও নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। সেজন্যে একান্তভাবে পাঠ্যপুস্তকে অতি নিবিষ্ট হতে পারেন নি কখনো।

কলেজের ছাত্র জীবনে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের আওয়ার সেক্রেটারিরূপে একজন উৎসাহীকর্মী ছিলেন। আবার আন্তঃ কলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর রচিত প্রবন্ধ এবং সেজন্যে তৎকালীন বাংলার গভর্ণর এডওয়ার্ড বেকার তাঁকে পুরস্কার দেন নিজের নামাঙ্কিত ছবি ও একটি despatch box.

নানাদিকে তরুণ যোগেশচন্দ্রের কার্যকলাপ দেখা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আন্দোলনের কর্ম চাঞ্চল্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে-ছিলেন। তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেসের কোন কোন নেতার সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন তিনি এবং ১৯০৫ সালের কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটে তাঁর। ফলে, সে বছরের কংগ্রেস অধিবেশনের সময় দাদাভাই নৌরজীর একান্ত সচিবের (Private Secretary) কাজ করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণা থেকে যোগেশচন্দ্র তাঁর মানস ও কর্মজীবন গঠিত করবার পথনির্দেশ পান। স্বদেশ-সেবার আদর্শ অধিকার করে তাঁর সমগ্র সত্তা। তিনি পরম নিষ্ঠায় দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন সেকালের নবযুগের প্রাণস্পন্দন অন্তরে নিয়ে। তাঁর তরুণ জীবনে স্বদেশের সেবার কাজে উৎসাহের সীমা ছিল না। খদ্দর প্রচারের জন্যে সেই কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে গেছেন বিক্রয় করবার জন্যে।

স্বদেশী ভাবাদর্শের অনুপ্রেরণা তাঁর মধ্যে ক্রমে বৃহত্তর গঠনাত্মক কাজে রূপ নেয় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য রূপে তাঁর কর্মজীবনও আরম্ভ হয়। দেশের মহত্তর মঙ্গলের কামনায়, তিনি কেবলমাত্র নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা চিন্তা না করে, সেই সঙ্গে আরো কয়েকজনের সংস্থানের কথাও মনে জাগে তাঁর।

তাই তাঁর প্রথম কর্মজীবনের প্রচেষ্টারূপে দেখা যায় এক ব্যাপক পরিকল্পনা অনুসারে কৃষিশালা পত্তন। জাতীয় কৃষির আদর্শে ব্রতী হয়ে তিনি ৮১ বিঘা জমি সংগ্রহ করে কয়েকজন ভদ্রযুবককে সহকর্মী নিয়ে কৃষি-কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। এ কাজে তাঁর আন্তরিকতা

যতখানি ছিল, সে অনুপাতে অভিজ্ঞতা ছিল না; সে জন্যে বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও বাস্তবে তা সফল হ'ল না শেষ পর্যন্ত, যদিও তার অস্তিত্ব ছিল প্রায় ৭ বছর।

কৃষিশালার শেষ পর্যায়ে তিনি আর নতুন কর্ম-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। বেলেঘাটা অঞ্চলে তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হ'ল একটি কারখানা—Bengal Paste Board and Paper Mills। বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙ্গালীর শ্রমে এবং বাঙ্গালীর পরিচালনায় মহোৎসাহে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হ'ল। কারখানাটির অস্তিত্ব ছিল ৩ বছর। উৎপাদনের দিক থেকে ব্যর্থ না হলেও, ব্যবসায়ের হিসাবে সার্থক হতে পারলে না সংস্থাটি। যোগেশচন্দ্র যে মহান আশা নিয়ে বহু বাঙ্গালী সন্তানের অন্ন সংস্থানের উপায় হবে ভেবেছিলেন, এখানে তা হ'ল না। কাগজ তৈরি এ কারখানায় হয় নি বটে, ব্লটিং পেপার ও পেস্ট্ বোর্ড উৎপন্ন হয় ভালই। কারখানাটির জীবিতকালে ভবানীপুরে যে বিরাট কংগ্রেস প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে একটি ষ্টল নিয়ে যোগেশচন্দ্র এখানে প্রস্তুত ব্লটিং পেপার ও পেস্ট বোর্ড প্রদর্শন করেছিলেন এবং তা দেশের গণ্যমান্য অনেকের প্রশংসা পেয়েছিল। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটি পদক উপহার দিয়ে সংবর্ধিত করেছিলেন যোগেশচন্দ্রের সংগঠিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে।

তাঁর দ্বিতীয় কর্ম-প্রচেষ্টাও সফল না হওয়ায়, তিনি অগত্যা আইনজীবীর বৃত্তি আরম্ভ করেন এবং হাইকোর্টে ওকালতী করতে থাকেন। কিন্তু জানা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধক ও গঠনাত্মক কর্মের আদর্শ তিনি তার পরেও ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই, হাইকোর্টের কর্মজীবন আরম্ভ করবার পরেও তাঁকে দেখা যায় হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এ্যাস্যুরেন্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদকরূপে।

বেতার-কেন্দ্রে যোগদানের আগে যোগেশচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারার এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁর গঠনমূলক মন, আদর্শ ও কার্যক্রমের পটভূমিকা। তাঁর জীবনের পূর্ববৃত্তান্তের এই রূপরেখা অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায় যে, বেতারে ছোটদের আসরের প্রবর্তন ও আনুষঙ্গিক রেডিও সার্কল ইত্যাদি স্থাপন করে তিনি বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্যে যে নতুন আনন্দলোকের সন্ধান দেন—তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর যৌবনকালের আদর্শবাদের পরিণতি স্বরূপ এই অভিনব কিশোর আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তিনি।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রে যোগেশচন্দ্র যখন প্রথম যোগদান করেন, তখন তাঁর বয়স ৪৩ বছর। এদেশে বেতারের তা আদিযুগ। সেজন্যে এখানকার বেতার ষ্টেশনের প্রথম অবস্থার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। তাহ'লে গল্পদাদার সময়ে কলকাতা বেতারের পরিবেশ এবং সেখানে তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা করবার সুবিধা হবে।

কলকাতায় প্রথম বেতার-যন্ত্রের একটি ছোট ষ্টুডিও স্থাপিত হয় টেম্পল চেম্বার্স ভবনে (হাইকোর্টের সামনে), ১৯২৫।২৬ সালে। মার্কনি কোম্পানীর কর্মকর্তা মিঃ জে আর ষ্টেপলটন ছিলেন তার অধ্যক্ষ এবং সেখানে অপেশাদার গায়ক-বাদকরা সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন। সেই বেতার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং তা শোনবার জন্যে কোন লাইসেন্স দরকার হ'ত না, এটি উল্লেখযোগ্য। তখনকার বেতার কলকাতা থেকে ৫ মাইল সীমার মধ্যে শোনা যেত এবং অনুষ্ঠান হ'ত শুধু সন্ধ্যার পরে, এক ঘণ্টা ভারতীয় ও এক ঘণ্টা ইউরোপীয় সঙ্গীতাদি।

কলকাতায় আধুনিক কলোপযোগী, বৃহত্তর পরিধিতে বেতার-কেন্দ্র ১৯২৭ খ্রীঃ ২৬ আগষ্ট স্থাপিত হয়। সে ষ্টুডিও ছিল ডালহাউসি স্কোয়ারের ১ গার্ষ্টিন প্লেসে এবং সে ব্যবসায়ী বেতার প্রতিষ্ঠানটির নাম, ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কম্প্যানী। তার একমাস আগে এই সংস্থার নামে বোম্বাইতে প্রথম ব্যবসায়ী বেতার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কম্পানীর সত্বাধিকারী ছিলেন বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের এফ, এম, চিনয় কম্পানীর কর্তৃপক্ষ। এই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং সংস্থার সর্বময় কর্মকর্তা ছিলেন এরিক ডানষ্টন এবং কলকাতার প্রথম ষ্টেশন ডিরেক্টর—সি, এন, ওয়ালিক। তখন কলকাতা কেন্দ্রের ভারতীয় অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন সুপরিচিত

ক্ল্যারিওনেট বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। সে সময় সন্ধ্যা থেকে ৩।৪ ঘণ্টা কলকাতা কেন্দ্রে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ত।

১, গার্স্টিন প্লেসে কলকাতার এই বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই যোগেশচন্দ্র বসু সেখানে যোগ দিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের আহ্বানে। নৃপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল এবং ১৯২৭ খ্রীঃ শেষভাগে বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। বলা বাহুল্য, তখন সেখানে ছোটদের আসর বা অন্য কোন বিশেষ বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না। যোগেশচন্দ্র সেখানে প্রথম আসেন বক্তারূপে। পণ্ডিত চিন্তামণি এই ছদ্মনামে তিনি বেতারকেন্দ্র থেকে নানা বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা করতেন। তা ছাড়া, এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৭-এর শেষ থেকে মাঝে মাঝে তিনি ছেলে-মেয়েদের জন্যে গল্প বলতেন রাত্রের অনুষ্ঠানে। কিন্তু তখন তা বিচ্ছিন্ন এবং স্বল্পক্ষণের এক একটি ভাষণ মাত্র। ছোটদের জন্যে নির্দিষ্ট কোন বিভাগীয় আসর সে সময় ছিল না। তবে তখন থেকেই ছোটদের আসরের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তাঁর মনে উদয় হয় এবং তিনি এ বিষয়ে নৃপেন্দ্রনাথকে জানান।

মজুমদার মহাশয় স্বীকৃত হলে, ১৯২৯-এর মাঝামাঝি গল্পদাদুর আসর বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। ভদ্র (প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কলকাতা বেতারের বহুমুখী গুণের আধার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একই সময়ে আর একটি জনপ্রিয় বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন 'মহিলা মজলিস' নামে)।

এইভাবে যোগেশচন্দ্র বসুর প্রবর্তনা ও পরিচালনায় প্রথম 'ছোটদের আসর' বিভাগটি স্থাপিত হয়। আসরের পরিচালকরূপে তিনি যে ছদ্মনামটি গ্রহণ করেন, তা পরে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে বেতার-শ্রোতা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এবং গল্পদাদার অন্তরালে যোগেশচন্দ্রের নামটি সকলের অগোচরে থেকে যায়।

ছোটদের আসর তাঁর পরিচালনায় কিভাবে অনুষ্ঠিত হ'ত, কি কি বিষয় তিনি আসরে সন্নিবিষ্ট করতেন তার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, এই নিবন্ধের প্রথমে। ছেলেমেয়েদের জন্যে পরম যত্নে ও ভালবাসায় গল্পদাদার সৃজনশীল মন মানস বিকাশের যে অভিনব আনন্দঘন পরিবেশ রচনা করেছিল, তার সমাদর তারা ঠিকই করে। তাঁর আসর বা তাদের যুগে সেই আসর আরম্ভ হবার বার্তা জানাবার জন্যে সেই আন্তরিকতাময় যুগে কোন ঘোষকের প্রয়োজন হয়নি। গল্পদাদা তাঁর দরদী কণ্ঠে যখন সকৌতুক বিনয়ে বলতেন, 'গল্পদাদা কথা বলছে, পালিও না, পালিও না, পালিও না,' তখন ছেলেমেয়েরা পালানো দূরের কথা হৈ হৈ করে সেটের সামনে হাজির হ'ত, এমন কি, কোন কোন বাড়ীর রেডিও শুনতে চলে আসত পাশাপাশি বাড়ীর ক্ষুদে শ্রোতার দল।

ছোটদের আসর কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সেই আদি-কালে যে তার একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গল্পদাদার আসর প্রবর্তিত হবার পরে বেতারে আরো কয়েকটি বিশেষ বিভাগ গঠিত হয়—যথা বিষ্ণু শর্মা (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ছদ্মনাম) পরিচালিত 'মহিলা মজলিস', নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' প্রভৃতি। এই সব বিভাগের জন্যে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'ছোটদের আসর', 'মহিলা মজলিস' ও 'বেতার-নাটুকে দল' (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পরিচালিত নাট্যবিভাগ, যার উদ্যোগে প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৭।৩০ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত এক একটি নাটকের অভিনয় হ'ত) উল্লেখনীয়।

ছোটদের আসরকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে দিয়ে গল্পদাদা ক্রমে ছেলেমেয়েদের আর একটি সংগঠন রেডিও সার্কল অব বেঙ্গল—বেশ সমারোহের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু রেডিও সার্কলের সেই উদ্বোধনী অধিবেশনের কিছুদিনের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সংস্থার জীবনে ঘোর সঙ্কট দেখা দিয়ে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি গুরুতর লোকসানের ফলে নিমজ্জমান হলে, তৎকালীন ভারত সরকার বেতার প্রতিষ্ঠানের ভার নেন এক বছরের জন্যে, পরীক্ষা হিসাবে। তখন তার নতুন নামকরণ হ'ল—ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস। কিন্তু এক বছরের মধ্যে বেতারের আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ না হওয়ায়

ভারত সরকার বেতার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন।

বেতারের সেই দুর্দিনে তার অনুষ্ঠানের যে আদর্শবাদী পরিচালকরা বিনা পারিশ্রমিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবা করবার প্রস্তাব সরকারের কাছে করেছিলেন, গল্পদাদা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের যুক্তিপূর্ণ আবেদনে এবং নানা দিক বিবেচনা করে ভারত সরকার বেতার প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার সিদ্ধান্ত নেন। বেতার কেন্দ্র বিপন্মুক্ত হয়ে নতুন উদ্যমে পরিচালনা করবার ব্যবস্থা হ'ল; কিন্তু সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে এল ছোটদের আসরের ওপর, তার দু' বছরের মধ্যেই।

গল্পদাদার হাতে-গড়া সাধের আসর যখন জমজমাট এমন সময় অকস্মাৎ তিনি কালব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। মারাত্মক ক্যান্সারের কবলিত হয়ে অবসর নিলেন আসর থেকে, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৭ সালের শেষ থেকে আরম্ভ করে প্রায় ছ বছর যাবৎ এই ছোটদের আসর তাঁর জীবনের অঙ্গস্বরূপ ছিল। এর জন্যে কত চিন্তা, কত পরিকল্পনা, কত পড়াশোনা করতেন তিনি। ছোটদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে, নব নব জ্ঞানের দীপ জ্বালাবার জন্যে কত সাধ ও সাধনা তাঁর ছিল। যেদিন আসর থাকত না, হাইকোর্টের ফেরৎ চলে যেতেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে। ছোটদের মনের বিচিত্র খোরাক সংগ্রহের জন্য সেখান থেকে দিনের পর দিন কত উপাদান সংগ্রহ করতেন। বিভিন্ন বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান আহরণের সুফল লাভ করত আসরের ছেলেমেয়েরা। এখন সেসব থেকে তারা বঞ্চিত হ'ল। গল্পদাদা দীর্ঘদিন অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে যুঝতে লাগলেন রোগ ও বিরুদ্ধ ভাগ্যের সঙ্গে।

সেই সময় ছোটদের তাঁর জন্যে একমাত্র গ্রন্থ, নানা ধরনের গল্প ও রূপকথার সংকলন, 'গল্পদাদার কথা' প্রকাশিত হ'ল। সে বইতে ছিল তাঁর কতকগুলি প্রিয় গল্প, যা তিনি মুখে মুখে আসরে বলেছিলেন নানা সময়ে। সেই গণেশের জন্ম, পাটলিপুত্র, স-সে-মি-রা, বিক্রমাদিত্য ও অলক্ষ্মী, উৎপলকুমারী ও চিত্র চণ্ডাল, সুন্দরবনের মঙ্গলচণ্ডী, বিনি সুতার হার, উকিলের ওপর ওকালতী, ভাগ্য বড় না পুরুষকার বড়, হাম্‌ভি থোড়া থোড়া আক্কিল পায়া, মামা ভাগনে, ইত্যাদি।

বই যখন ছাপা হয়ে তাঁর হাতে এল, তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে যা বলেছিলেন, ছোটরা এবং ছোটদের আসর সম্পর্কে তাই তাঁর প্রাণের কথা: 'ছোটদের আসর বাঁচিয়ে রেখো, আর মাঝে মাঝে আমার নাম করে এদের হাসিও। তা হ'লে আমি স্বর্গে, probably নরকে গিয়েও সুখে থাকব।'

শেষ দিনগুলি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে, ছোটদের জন্যে অনেক কল্যাণ-চিন্তার শেষে ও তাদের আনন্দলোকের জন্যে বহু সাধ অপূর্ণ রেখে ইহ-জগৎ থেকে বিদায় নিলেন।

কালের যাত্রায় বছরের পর বছর পার হয়ে যায় গল্পদাদার মৃত্যুর পর। সমস্ত ভারতবর্ষের কথাও বলা চলত, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, বাংলা দেশের কথাই ধরা যাক। এত বিপর্যয় এবং তরঙ্গভঙ্গের মধ্যেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ-যজ্ঞের শিখা দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তাদের নিজস্ব সঙ্ঘ সভা সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় আনন্দানুষ্ঠানে, চলচ্চিত্র প্রভৃতি বৃহৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তাদের জন্যে রচিত সাহিত্যের বিপুল সম্ভারে—ছোটদের শিক্ষা ও নন্দন জগতের তোরণ-দ্বার এখন উদ্‌ঘাটিত।

কিন্তু তাদের এই নতুন জীবনে জাগরণের স্বপ্ন যিনি অনেকের আগেই দেখেছিলেন এবং সে স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্যে এগিয়ে এসে সেই কাজে নিজের জীবন ও সৃষ্টিকর্মকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর কথা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। শুধু তাঁর সেকালের আসরের কোন কোন ভাই-বোনদের মনের পটে হয়ত উজ্জ্বল হয়ে আঁকা আছে তাঁর চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। আর হয়ত তাঁদের কোন দুর্লভ অবসর-সন্ধ্যায় স্মৃতির আকাশে এক সুদূর জগতের বেতারে কচিৎ ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটি আনন্দময় কণ্ঠস্বর—হ্যালো চিলড্রেন, গুড ইভনিং। গল্পদাদা কথা বলছে। শুনতে পাচ্ছ?...

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

আজ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী দিবস। ঠিক একশ' বছর আগে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে (শকাব্দ ১৭৮৮, ১৭ই কার্তিক) শুক্রবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বগ্‌জুড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দীনেশচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজচন্দ্র সেন বৈদ্যজাতির অন্যতম মূলকেন্দ্র খুলনা জেলার পয়ো গ্রাম ত্যাগ করে ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে এসে বসবাস আরম্ভ করেন।

দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের সুরু হয় মাত্র ৭ বৎসর বয়সে। এই বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন সরস্বতীর স্তব। তারপর থেকে তিনি কবিতাই রচনা করতে থাকেন। কবিতায় তাঁর সাহিত্য-জীবনের সুরু হয়, তাই দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তী কালে তাঁর সাহিত্যে কাব্যের মাধুর্য ও প্রসাদগুণ বর্তমান থাকত। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের চর্চাও তিনি করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের রচনা যেমন তাঁর প্রিয় ছিল, তেমনি বাইরনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড' ও 'ডন জোয়ান'ও তিনি সমান আগ্রহে পাঠ করতেন। এ দু'খানি গ্রন্থ দীনেশচন্দ্রের কবি-কল্পনাকে অনুপ্রেরিত করেছিল।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি সাহিত্যিক হবেন। এই কল্পনাই তিনি মনে মনে পোষণ করতেন আর তার জন্যে প্রাণপণ সাধনা করতেন।

দীনেশচন্দ্র তাঁর আত্মকথার একস্থানে লিখেছেন—"দশ বৎসর বয়সে আমার সহাধ্যায়ী অবিনাশ এবং আমি একদা আমাদের বাড়ীর ধারে চড়ক উৎসবের খোলা মাঠটায় দাঁড়াইয়া জীবনে কে কি করিব তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। অবিনাশ বলিল—'আমি জমিদার হইব, শত শত লোক আমার পাছে পাছে ঘুরিবে, আমরা বড় জমিদার ছিলাম, আমি সেই নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার করিব।' আমি বলিলাম—'আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়ে ঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোয়াইবেন। যদি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতে না পারি, তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে কার সাধ্য'?"

তাঁর শেষোক্ত আশা উত্তরকালে অক্ষরে অক্ষরে সার্থকতা ও চরিতার্থতা লাভ করেছিল।

ছাত্র-জীবন থেকে দীনেশচন্দ্রের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তখন থেকেই তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন এই সব পদকর্তার ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষাবিদ্ যে কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি বাংলা ভাষার আদি উৎপত্তি ও পূর্ববৃত্তান্ত জানতে চাইতেন। এমন সময় তাঁর জীবনে এল এক সুবর্ণ সুযোগ। এই সময় Peace Association থেকে ঘোষিত একটি বাংলা প্রবন্ধের প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার লাভ করলেন। তাঁর প্রবন্ধের বিচারক ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

বাংলা সাহিত্যের আদি ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্রকে আমরা লাভ করলাম তাঁর পূর্বজীবনের একটি আকস্মিক ঘটনার ফলে। তখনও তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয় নি। এমনি সময় দীনেশচন্দ্রের হাতে পড়ল একখানি অতি প্রাচীন ও মূল্যবান পুঁথি। সেই পুঁথিটির নাম 'মৃগলুব্ধ', যা দেশবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পুঁথি সংগ্রহের তীব্র নেশায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন দীনেশচন্দ্র আর অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে একশ' খানি পুঁথি সংগ্রহ করলেন।

এই সময় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দীনেশচন্দ্রকে পুঁথি সংগ্রহের কার্যে সাহায্য করবার জন্যে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে পাঠিয়ে দেন। দু'জনে মিলে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুঁথি সংগ্রহ করতে লাগলেন। এইভাবে বিভিন্ন পল্লী থেকে বহু প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ হয়েছিল। এই সকল গ্রন্থ ও পুঁথির খবর কেউ জানতেন না। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে তাঁর সংগৃহীত পুঁথি বিশেষ কাজে লেগেছিল। বাংলা ভাষায় গৌরব করবার মতো যে কিছু আছে এবং তারও যে একখানা প্রামাণিক ইতিহাস লেখা যেতে পারে, তৎকালীন শিক্ষিত মহলের এ ধারণা মোটেই ছিল না। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হবার পর তাঁদের সে ধারণা পরিবর্তিত হ'ল। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন ও অন্যান্য বিদগ্ধজনের সাহায্যে দীনেশচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট থেকে একটি বিশেষ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন।

এ ছাড়া কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দীনেশচন্দ্রের একটি আজীবন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর কাজের সুবিধার জন্ম ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সপরিবারে কলকাতায় এলেন এবং স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং তা পরে বিশেষ সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ২য় সংস্করণ হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ও দীনেশচন্দ্রকে সাদর সংবর্ধনায় আপ্যায়িত করলেন। শুধু তাই নয়, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনাকল্পে রবীন্দ্রনাথ ঐ নামে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধও লিখলেন। সেই প্রবন্ধের সূচনায় তিনি লিখলেন, —"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীনেশচন্দ্রবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া আমরা দ্বিতীয়বার আনন্দ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য বলিয়া এতবড় একটা ব্যাপার যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না,—তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।...দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলা দেশের বিচিত্র শাখ-প্রশাখা সম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।..."

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে ইতিহাস রচনা করলেন, তা পাঠ করে আচার্য যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এঁরা পত্র লিখে লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দীনেশচন্দ্রকে লিখলেন,—"জাতির সত্যকার ইতিহাস তার সাহিত্যের মধ্যে নিহিত আছে। সেই ইতিহাসের দ্বার আপনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এমন বিদগ্ধ আগন্তুক সেখানে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবে।"

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আর একটি উক্তি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বাঙালী লেখক ও ঐতিহাসিকের মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয় ও দীনেশচন্দ্র পুরাতন পুঁথি ও পুরাতন পুস্তক সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন,—

"এই সময় বাঙলা পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে আমার একজন সহায় জুটিয়াছিলেন।...শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া

দীনেশচন্দ্র সেন

এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করেন।...দীনেশবাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটি খাঁ'র অশ্বমেধ পর্ব প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাতন গ্রন্থ সংগৃহীত হয়।"

এতে মনে হয় পুরাতন পুঁথি ও পুরাতন পুস্তক সংগ্রহে দীনেশচন্দ্রই ছিলেন পথিকৃৎ।

পুরাতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই ছিল দীনেশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কাজ। তাঁরই চেষ্টায় 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' আবিষ্কারের পথ সুগম হয়েছিল। এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যায়, দীনেশচন্দ্রই ব্যাপকভাবে প্রাচীন বাংলা কাব্যের পুনরুদ্ধার করেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রামগতির মধ্যে যার সূচনা দেখা দিয়েছিল, দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত সাধনায় তা পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক জীবন ও সাহিত্য আলোকিত হয়ে উঠেছিল আর সেই সঙ্গে তার দর্পণে বাঙালীর সত্যকার রূপ জীবন্ত হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল।

সাহিত্যধর্মী দীনেশচন্দ্র তাঁর রচিত 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্যে' লিখেছেন,—"বাংলা ভাষার চর্চাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার হাত রিক্ত হইবে, প্রাণ অবলম্বনশূন্য হইবে এবং যা কিছু অবশিষ্ট আনন্দ আছে তা হারাইয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিবে।"

দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসা ছিল বাঙালীর বাঙালীত্বে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য অনুশীলনে তাঁর এই অন্বেষণা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে। তাঁর সংগৃহীত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রভৃতি

গ্রন্থের পল্লী গাথাসমূহের মধ্যে এক চিরন্তন মানব-জীবনের সুখ দুঃখে ভরা মনোরম চিত্র ফুটে উঠেছে। দীনেশচন্দ্র তাঁর অসামান্য মনীষায় পল্লীগৃহের বনিতাকে বিশ্বদরবারের কবিতারূপে পরিণত করেছেন। তিনি পল্লী গাথাগুলিকেই বাংলার সত্যকার ইতিহাসে পরিণত করেছেন।

এই কাজের দ্বারা ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের দরবারে এক নূতন গবেষক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন, যাঁদের প্রচেষ্টায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

আচার্য যদুনাথকে ঐতিহাসিক বলে দীনেশচন্দ্র যখন সম্বোধন করলেন তখন দৃপ্তভাবে আচার্য যদুনাথ সরকার লিখলেন—"কে বলে আমি ঐতিহাসিক? সত্যকার ঐতিহাসিক ত আপনি। আপনি মহৎ ঐতিহাসিক। তাই জাতীয় সাহিত্যের গুপ্তধন আবিষ্কার করে ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।"

দীনেশচন্দ্রের যশোসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। এই পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের রূপ নেয়। স্যার আশুতোষের অনুরোধে তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষাতে বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা 'History of Bengali Language and Literature' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস লেখকের খ্যাতি এতকাল বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা কেন্দ্রসমূহে তাঁর নাম প্রকাশিত হ'ল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকার বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকায় দীনেশচন্দ্রের ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

জর্জ গ্রিয়ারসন ও সিলভাঁ লেভির মত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করলেন যে, ভারতবর্ষের অন্য কেউ সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে এমন উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হননি। এই সূত্রে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের যে পরিচয় হয়েছিল, তা কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর গভীর অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। দীনেশচন্দ্র এই সব মনীষীদের কাছ থেকে যে সব পত্র পেয়েছিলেন, তা একত্র প্রকাশ করলে একটি বৃহৎ গ্রন্থের আকার নেবে। মাত্র এখানে দুইটি চিঠি উদ্ধৃত করছি :

মিঃ ফ্রেজার তাঁর পত্রে লিখেছিলেন—

"Your book makes me feel humble and ignorant but the mouse helped the lion you know, and I may at least be able to make your work known over here." অর্থাৎ আপনার বই পড়লে আমার নিজেকে ক্ষুদ্র এবং অজ্ঞ বলে মনে হয় কিন্তু ইঁদুরও সিংহকে সাহায্য করেছিল। এটি জানবেন অন্ততঃ আমি আপনার বইয়ের প্রচারের পক্ষে কিছু সাহায্য করতে পারব।

ফ্রেজার সাহেব ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক। তিনি দীনেশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর চিঠিতে যথেষ্ট হিউমার থাকত। তা থাকলেও দীনেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অটুট ছিল।

মিঃ জে, ডি, এণ্ডারসন ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক। তিনিও দীনেশচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন।

সিলভাঁ লেভি তাঁর পত্রে দীনেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন—

"...Your enthusiasm at the discovery was fully justified. Your work is the wonder of art."...

এ দু'টি পত্র ছাড়াও রোমাঁ রোলাঁ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীনেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন,—

'I congratulate you sincerely for your beautiful and wonderful work Chaitauya and His Age' and I ask you, dear sir, to believe in my high esteem and admiration."

'Chaitanya and His Age' গ্রন্থখানি দীনেশচন্দ্রের আর একটি অসাধারণ মহৎ কীর্তি। এই গ্রন্থ পাঠ করে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাংলার গৌরব শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মকে।

দীনেশচন্দ্র দেড় শতাধিক ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তি এই গ্রন্থগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে এবং তা সাহিত্য ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ রূপে পরিগণিত হয়ে আছে।

দীনেশচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। তাঁর জীবনেতিহাস সম্যকভাবে ব্যক্ত করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই সাধ্য মত তাঁর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজার দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় দীনেশচন্দ্র তাঁর বেহালার বাসভবনে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

১৯৫৫, জুন। মায়ের অসুস্থতা

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই এপ্রিল মাসের শেষেই আমার মা, শ্যামলীকে নিয়ে দেরাদুন পৌঁছালেন। এর কিছু দিনের মধ্যেই অসুখে পড়লেন। স্ট্রোক নয়তো—রক্তের চাপ বেড়েছিল। আমি অসহায় বোধ করলাম। মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'ল কলকাতা থেকে ভাইবোনেরা এসে হাজির হলে, আমি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলাম কিন্তু মা'র অসুস্থতার জন্য বিপদ বোধ করলাম। শ্যামলীকে কে দেখাশোনা করবে? অবশ্য শ্যামলী বড় হয়েছে এবারে শান্তিনিকেতনে বোর্ডিং-এই থাকতে পারবে। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। ভগবানই ভরসা। টাকারও দরকার। ছুটি ত মুসৌরীতে প্রদর্শনী করলে কিছু টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ছবি বিক্রী করে। কিন্তু মাকে ঐ অবস্থায় ফেলে মুসৌরী যাবার কথা ভাবাও যায় না। মা একটু সুস্থ বোধ করলে দাদারা ও ছোটদি ফিরে গেলেন। একটি নার্স রাখা হ'ল। মাকে অসুস্থ শরীরে এতো দূরে দেরাদুনে রাখার কোনো অর্থ নেই। আত্মীয়-স্বজন সব মাকে কলকাতায় থাকলেই মা'র ভালো লাগবে মনে করে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হ'ল। অর্থের প্রয়োজন—ভগবান সহায় হলেন। মুসৌরীতে প্রদর্শনী করবার সেবার দরকার হ'ল না। হঠাৎ একদিন সকালে একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো মুসৌরী ফেরতা। এক ভদ্রলোক মাদ্রাজ ফিরে যাচ্ছেন মুসৌরীকে বেড়িয়ে, আমার ছবি কিনতে চান। ছবি দেখলেন এবং তিনখানা ছবি বেছে কিনলেন নগদ আটশ টাকা দিয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপারটা হয়ে গেল। ভগবানকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। এ রকম আমার একাধিকবার হয়েছে। যখনই খুব দরকার হয়েছে পেয়েছি আমি। অর্থের অসুবিধা হয় নি কখনো। ছুটি হলে মাকে নিয়ে ট্রেনের একটা কামরা রিজার্ভ করে কলকাতায় রওনা দিলাম। সুরেশ আমার এক দাদা। জামসেদপুর থেকে মাকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্য এসেছিল। কলকাতায় মাকে নিয়ে সেজদার বেলঘাটার বাড়ীতে ওঠা গেল। সেজদা তখন বর্ড কোম্পানীর পেটেন্ট স্টোনের ম্যানেজার। কোয়ার্টারটি বেশ ভালো, জায়গা প্রচুর। মা'র সেখানে অসুবিধা হবার কথা নয়। শান্তি-নিকেতনের পাট উঠিয়ে দিলাম। এবারে শ্যামলী বোর্ডিংএ ভর্তি হ'ল শ্যামলীকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আমি দেরাদুনে ফিরে গেলাম। মা'র অসুস্থতায় আমারই সব চাইতে অসুবিধা হ'ল। মা আমার সংসারই দেখছিলেন - শ্যামলীকে মানুষ করেছেন তিনি শ্যামলীর সেই শিশু বয়স থেকে। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে সান্ত্বনা দিই মনকে। একলা নিঃসঙ্গ জীবন ছবি এঁকে মূর্তি গড়ে ভরিয়ে তুল। জীবনে সুখ আমার বেশীদিন স্থায়ী হয় না দেখেছি কিন্তু অসুখী আমি নই। যথেষ্ট পেয়েছি।

*   *   *   *

প্রায় পাঁচটি বছর কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল। আজকে তারই হিসাব মিলাতে বসেছি। মনে রাখবার মত অনেক কিছুই ঘটেছে কিন্তু সব ত লেখার মত নয়, তাই ভাবতে হয়।

দেরাদুন ছেড়ে এসেছি ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী।

*   *   *   *

১লা এখানে এসে লখনউ গভর্ণমেন্ট আর্ট এণ্ড ক্র্যাফট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজের ভার গ্রহণ করি। হিসেব করে দেখছি এখানে এসেছি, তাও প্রায় তিন বছর সাত মাস কেটে গেল। ডায়রী লিখবার অবকাশ বা ইচ্ছা হয়নি এতদিন।

লখনউ এলাম কেন? হেডমাষ্টার বা প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার সখ ত আমার কোনদিন ছিল না। দেরাদুনের অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও আমার কর্মক্ষেত্র স্থাপন করবো এও আমি কোনদিন চাইনি। না চাইলে হবে কি—যা হবার তা হয়েই যায়। সব কিছুর পিছনে কোন এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে, তাকে ঠ্যাকানো কারুর সাধ্য নয়।

লখনউতে এসে যেন অন্য পৃথিবীতে পড়েছি। দেরাদুনের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর এখানকার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে অনেক তফাৎ। দেরাদুনের কাজে ও এখানকার কাজে অনেক তফাৎ। অবশ্য নিজের ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়া ইত্যাদির কথা আমি বলছি না। আমি বলতে চাই চাকরীর কাজের কথা। সেখানে আমার দায়িত্ব ছিল অনেক কম—এখানে মস্ত সংস্থানের দায়িত্ব আমার ওপর।

এখানকার কথা এখন থাক। সে পর্ব্ব সুরু করবার আগে কেন এবং কি পরিস্থিতিতে দেরাদুন ছেড়েছিলাম সে কথাই লিখি। দেরাদুনে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে গিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলাম। ছাড়লাম ঠিক কুড়ি বছর পরে, ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে সেও এক শীতের রাতে। এর মধ্যে যা ঘটেছে তার খানিকটা লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি। এইবার দেরাদুনের শেষ দু'বছরের হিসেব-নিকেশ করে ফেললেই দেরাদুন পর্ব্ব শেষ হবে।

*   *   *   *

ললিতবাবুর (ললিত মোহন সেন) মারা যাবার খবর আমি খবরের কাগজে দেখেছিলাম। অসিতদার (হালদার) পর ললিত বাবুই লখনউ গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফট্‌এর প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। ললিতবাবু, ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে মারা যান। হঠাৎ না হলেও এক রকম হঠাৎই। শরীর তাঁর ভেঙেছিল, তবু আরেকটু সাবধানে থাকলে আরো কিছুকাল বাঁচতে পারতেন বলেই শুনেছি।

তিনি দিলদরিয়া ভালো শিল্পী ছিলেন। সবাই তাঁকে ভালবাসত, ব্যবহার তাঁর সরল ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর খুব একটা আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব ছিল না, তবে চেনাশোনা ছিল। কাজে দু'একখানা চিঠিও আদান-প্রদান হয়েছিল। তিনি মারা যাবার পর লখনউ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল কে হবেন সে বিষয় আমি চিন্তাও করি নি। আমাকেই যে ঐ পদে আসতে হবে কল্পনায় বা স্বপ্নেও তা ভাবি নি। দেরাদুন ছেড়ে অন্য কোথাও যে চাকরি করতে যাব সে কথাও কোনদিন ভাবি নি। দুন স্কুলের আর্ট মাষ্টারীর কাজটা আমার যেন পেয়ে বসেছিল। অথচ ভিতরে ভিতরে মনটা অস্থির ও বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।...এমনকি মনে মনে অমর্য্যাদা বোধও করছিলাম দুন স্কুলে কাজ করতে কিছুকাল থেকে।...কেন তাই বলি। পাবলিক স্কুলের আর্ট মাষ্টারীতে মর্য্যাদা আছে বটে কিন্তু শিল্পীর যতটা মর্য্যাদা পাওয়া উচিত তা এঁরা দিতে চান না।

আমি শিল্পী, আর্ট মাষ্টার অনেক পুরোনো কর্মী, সে যেন একটা দোষের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কারণ সম্ভবতঃ দুন স্কুলে যা ঘটেছে প্রথম থেকে তা সবই আমার জানা। অনেককেই আসতে ও যেতে দেখেছি। এও এক দোষের কথা বৈকি।

দুন স্কুলের 'প্রসপেকটস' বই-এ 'ষ্টাফ'-এর নাম লেখা থাকে প্রথম পাতায়। প্রতি বছর 'প্রসপেকটস' ছাপা হয়। সে বছর দেখলাম, আমাদের নাম নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে 'প্রসপেক্‌টসে।'...হাউস মাষ্টার, যাঁরা আমাদের বহু পরে এসেছেন, তাঁদের নাম উঁচুতে উঠেছে।

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয় কিন্তু মনে একটু চোট খেলাম নিজের নাম নিচে নেমে গেছে দেখে। আমি চুপ করে মেনে নিলাম না। সোজা 'হেড মাষ্টার' মার্টিনকে গিয়ে বললাম আমার অভিযোগ জানিয়ে। আমরা যে পুরোনো কর্মী তার কোনই সম্মান নেই?

অনেক কথা কাটাকাটি হ'ল। ঝগড়ার ফাঁকে নিজ শেষটায়। আমি বলে দিলাম হেডমাষ্টার সাহেবকে যে

তাঁর এইসব ছোটখাটো 'পিন-প্রিক' যতই ছোট ব্যাপার হোক, আঘাত লাগে সন্দেহ নেই। আমাদের পুরানো কর্মীদের নাম আবার ওপরে তুলে দিতে হবে, নইলে আর আমার এখানে সুখীভাবে থাকা সম্ভব নয়। ঝোঁকের মাথায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব অতটা একগুঁয়ে আমি নই। তবে জানিয়ে দিলাম, এতদিন অন্য কোথাও কাজ নিয়ে যাবার চেষ্টা করি নি, এইবার সময় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে—আমি আর যে, দুন স্কুলে মনের সুখে নেই সেকথা জানিয়ে, আমি কাজের চেষ্টায় বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লিখব এবং কোন একটা কাজের সুবিধা করতে পারলেই চলে যাব।… সাহেব বিমর্ষ হ'য়ে সাহেবী মতে 'দুঃখিত' বলে জানালেন। আমি চলে এলাম।

বাড়ী এসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম। দুন স্কুল থেকে যাতে শিগগীরই চলে যেতে পারি। সে কথাও জানালাম গভীর দুঃখের সঙ্গে। ভগবানের কাছে কারণে-অকারণে দুঃখ জানান আমার অভ্যেস ছিল না। এটা সম্পূর্ণ নতুন অভ্যেস। কারুর কাছে ত মনের দুঃখ ক্লেশ জানাব—তা না হ'লে দুঃখের যে শেষ থাকবে না। মনে পড়ল মাস খানেক আগে কানপুর থেকে 'শ্রীপৎ' বলে এক আই. এ. এস—ইউ. পি'র 'ডাইরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রীজ' এসে আমায় বলেছিলেন, 'আমি কেন লখনউ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপালের কাজে Apply করছি না?' আমি হেসে বলেছিলাম, "Why should I? 'আমি এখানে সুখেই আছি। তা ছাড়া ahply করে আর কাজ পেতে চাই না। তিনি বলেছিলেন—'যদি "আমরা কাজটা 'অফার' করি, আমি 'অ্যাকসেপ্ট' ক'রব কি না।" হেসে বলেছিলাম 'অফার' আগে কর ত—'অ্যাকসেপ্ট' করবার কথা পরে হবে।

দুন স্কুল ছেড়ে দেবার ইচ্ছা মনের মধ্যে এত প্রবল হয়েছিল, যে, শ্রীপৎ সাহেবকে চিঠি লিখে দিলাম একখানা। লখনউ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপালের কাজটা আমায় যদি 'অফার' করা হয় তবে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। চিঠির জবাবও এল, যে, তিনি আমার নাম 'প্রপোজ' করেছেন ইউ, পি, গভর্ণমেণ্টের কাছে এবং 'পাবলিক সারভিস কমিশনে'র কাছে …এদিকে মার্টিন সাহেব দু'দিন পরেই আমায় একখানা চিঠি লিখলেন। তাতে লিখেছিলেন—তিনি আন্তরিক দুঃখিত—তিনি নিজের ভুল বুঝেছেন এবং 'প্রসপেক্টসে' আবার আমাদের নাম উপরে তুলে দেওয়া হয়েছে।…কিন্তু যা হবার তা ঘটেই গেল। হঠাৎ লখনউ সেক্রেটারিয়েট থেকে ট্রাঙ্ক কল এল।

ইণ্ডাস্ট্রীজ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী ভাটিয়া সাহেব টেলিফোনে জানালেন, আমাকে আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করার সব ঠিক হয়ে গেছে, তবে একটা 'ফরম্যাল অ্যাপ্লিকেশন' চাই। পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। আমি উত্তরে জানালাম 'অ্যাপ্লিকেশান' পাঠাতে আমার আপত্তি আছে। If you want me —The post shou!d be offered to me. There is no question of my sending an application. তিন মিনিটে যা বলবার বলে দিলাম, টেলিফোন ক'রে ভাবলাম, "যাক বাঁচলাম। দেরাদুনের পাট উঠিয়ে লখনউ যাওয়া সে কি সোজা কথা। দেরাদুন আমার কুড়ি বছরের আস্তানা।"

কিছুদিন পর সেজদা কলকাতা থেকে একটা বিজ্ঞাপন কেটে পাঠালেন। কলকাতা আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজটার বিজ্ঞাপন। কয়েক মাস আগে বন্ধুবর রমেন দা (চক্রবর্ত্তী) হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। সেজদার আমার কলকাতায় কাজ নিয়ে যাওয়াতে একটু স্বার্থ ছিল। মা অসুস্থ হয়ে সেজদার কাছেই ছিলেন। সেজদার কলকাতার কাজ ছেড়ে 'কুমারধুবি' যাবার কথা। মাকে কোথায় রাখা যায়। সেজদা ভেবেছিল —আমি যদি কলকাতায় কাজ নিয়ে যাই তবে আমার কাছে মা অনায়াসে থাকতে পারবে। মা'র কথা ভেবেই কলকাতার কাজটার দরখাস্ত দিলাম। তা' না হলে কলকাতায় কাজ নিয়ে যাবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না। দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে নিজের কাজ শেখানর কাজ নিয়ে আবার ডুবে গেলাম। শীতের ছুটি এল। বড়দিনের সময় শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলাম। শ্যামলী আছে শান্তিনিকেতনে, সেবারে সে ম্যাট্রিক ক্লাশে বোধ হয়। উঠেছিলাম প্রভাতদা'র বাড়ী—আমাদের পুরনো আস্তানায়। ঘুরে বেড়াই রোজ শান্তিনিকেতনে সকাল-বিকাল। ৭ই পৌষ আগত, ছুটির হাওয়া—অতিথি আসা সবই আরম্ভ হয়েছে। নেহরু আসবেন ৭ই পৌষের সময়। হৈ হৈ, আমতলার সাজানোতে সব লেগে গেছে। সেই সময় বেড়িয়ে ফিরে একদিন পেলাম সরকারী চিঠি। লখনউ থেকে এসেছে চিঠিখানা। নন্দ বাবুর কাছে গেলাম। তিনি খবরটা শুনে খুব খুশী

হলেন। বললেন—যাঁরা আদর ক'রে ডাকছেন, তাঁদের কাছেই যাও। কলকাতার কাজে দরখাস্ত করেছ, সেখানে আর যেও না নিজের থেকে যেচে। সেখানে ত আবার 'ইণ্টারভিউ' আছে—তারপর হবে কি না হবে কে জানে। তাঁর চেয়ে এঁদের লিখে দাও রাজী হয়ে। গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করলাম। লিখে দিলাম রাজী হয়ে। শান্তিনিকেতনে ছুটিটা কাটিয়ে দেরাদুন রওনা দিলাম, পথে লখনউ হ'য়ে অসিতদা'র সঙ্গে দেখা ক'রে গেলাম। তিনিও খুব খুসী লখনউ আসছি জেনে।—শীতের ছুটির পর ফিরতে না ফিরতে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম—সেখানকার প্রিন্সিপ্যালের কাজের 'ইণ্টারভিউ' দিতে ডাক এসেছে। আমি লিখে দিলাম—'Got an offer elsewhere and accepted the same' নন্দবাবু বলেছিলেন, 'লখনউ ভাল হে, কলকাতায় বড় প্যাঁচ। বিপদে পড়বে।' ইণ্টারভিউ দিতে কলকাতায় আর গেলাম না—গেলে কি হ'ত বলা যায় না। অনেক উপযুক্ত লোক দরখাস্ত করেছিল—শ্রীচিন্তামণি কর সেখানে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হলেন।

জানুয়ারীর শেষে দেরাদুন ফিরে একমাস ছিলাম। যে মাসটা বাড়ীতে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ—'ফেয়ারওয়েল পার্টি' ইত্যাদিতে কেটে গেল। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ সালে দেরাদুন ছাড়লাম। ১লা মার্চ সকালে লখনউ পৌঁছে সেইদিন প্রিন্সিপ্যালের কাজে যোগ দিলাম। অসিত দা' আমায় সেখানকার পরিস্থিতির কথা অনেক কিছু বলেছিলেন—সুতরাং আটঘাঁট বেঁধেই গিয়েছিলাম।

লখনউ আর্ট কলেজের প্রথম কয়েকমাস

পুরণো চিঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতে অসিতদা'র ১৯৪৪-এর ১০ই ফেব্রুয়ারীর লেখা 'পোষ্টকার্ড' বার হ'ল। ১৯৬০-'র বন্যার পীড়িত কার্ডখানা। তবু পড়া যায় এখনো। তার থেকে তুলে দিচ্ছি খানকট। ত' হ'লেই ধারণা করতে পারা যাবে লখনউ কলকাতার চেয়ে এমন কিছু কম প্যাঁচের জায়গা ছিল না।

স্নেহের সুধীর,

অনেকদিন পর এবার তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমার কাজ দেখে খুব খুশী হলাম। গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করবার চেষ্টা দেখে আনন্দ হ'ল। তোমার ছবিগুলো রাধা কমল বাবু দেখিয়েছেন যেগুলি 'এগজিবিসান-এর জন্য রেখে গেছ। সময় মতো আনিয়ে নেব। হিরণ্ময় বাবুর হ'য়ে আমার জন্য চেষ্টা করতে পার, তবে আমার মনে হয়, এখানে কাজ ক'রে সুখ পাবে না, কারণ যে সব বন্ধুরা আছেন এখন জানই ত? আমি নিজেই ভাবছি কবে 'পেনসন' নিয়ে এদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচব। কেবল পাঁচ, কেবল প্যাঁচ খেলেই চলেছেন। আমিই খালি ওদের জব্দ করে যাচ্ছি, তার ফলে কুরুক্ষেত্র হওয়াটা তাঁদের পক্ষে অপমানজনক ব্যাপার।"

ভালবাসা জেনো। 'অসিত দা'

লখনউ এসে পৌঁছলাম সকালবেলা, সঙ্গে আমার দু'টি কুকুর—রিঙ্কু আর বেণী, পুরাতন ভৃত্য গোবিন্দ আর ছবির বোঝা ও মালপত্র। ষ্টেশনে ট্রেন থামতেই দেখি আর্ট কলেজের প্রায় দেড়শ-দু'শ' ছাত্র ফুল ও মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে। তারা ত আমায় ঘিরে ফেলল ষ্টেশ থেকে নামা মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ষ্টেশনে আর্ট কলেজের কোনো মাষ্টারই 'রিসিভ' করতে আসেন নাই। মাষ্টাররা সবাই যে আমি আসছি বলে খুশী ছিল তা নয়। ছেলেরা যে সবাই আমাকে ষ্টেশনে 'রিসিভ' করতে গিয়েছিল সেও নাকি মাষ্টারদের কথা অমান্য করে। আমি কখন কোন ট্রেনে আসছি সে খবর তারা পেয়েছিল অসিতদার বাড়ী গিয়ে। আমি কলেজের চার্জ নিয়ে চেয়ারে ব'সতেই পাওয়া ছেলেরা একটা কাগজ নিয়ে ঢুকলো আমার অফিস ঘরে—যেখানে অসিতদাকে আমি আগে বসতে দেখতাম। ছেলেরা আমার সম্বর্দ্ধনা জানাবে স্কুলের পর চা পার্টি হবে—তারই জন্য ছেলেরা আবেদন জানিয়েছে।—হায় কপাল। আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য আমাকেই অনুমতি দিতে হ'ল। আগে থেকে কোন মাষ্টার এ বিষয় তাদের কোন পরামর্শ দেয় নি। অবশ্য আমি সই করে অনুমতি দিয়ে বললাম ছেলেদের যে এই মিটিংএ অসিতদাকেও আমন্ত্রণ করে খবর দিতে। অসিতদা এসেছিলেন—এবং মিটিংএ কিছু বলেও ছিলেন। বলাবাহুল্য ছেলেরা অনেকে ভাষণ দেবার পর আমাকেও কিছু বলতে হ'ল।—নানান রকম পরিস্থিতির মধ্যে কাজ আরম্ভ করলাম। আমার সব কাজের যে যথেষ্ট সমালোচক আছে তা জানতাম কিন্তু তাতে আমার তখন অসুবিধা বোধ হয় নি। কারণ, তখনকার 'চীফ সেক্রেটারী' শ্রীআদিত্য ঝা'র সম্পূর্ণ 'ব্যাকিং' আমার ছিল। তিনি আমায় যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন এবং সব কাজে সাহায্য করতেন।

বহু টাকা ব্যয় করে কলেজের জন্য গাড়ি—ক্যামেরা

—নতুন এপিডায়স্কোপ-ফিল্ম দেখানর জন্য প্রজেক্টর ইত্যাদি কেনা হ'ল। নতুন ফার্ণিচার, নতুন মডেলিং ষ্ট্যাণ্ড প্রায় দেড়লক্ষ টাকার জিনিষ প্রথম মাসেই কেনা, হল। কলেজের রূপ ফিরে গেল।

কলেজের নতুন 'অ'ডটোরিয়াম' হ'ল। ছেলেদের হষ্টেলের খাবার উপযুক্ত 'হল' তৈরী হ'ল। অডিটোরিয়াম নাম অসিতদা'র নামে হ'ল—'হালদার হল'। ললিত সেনের স্মৃতিরক্ষার জন্য, ফাইন আর্ট এক্সটেনশান হল-এর নাম দেওয়া হ'ল 'ললিত হল'। আমার পুরোণো অভিজ্ঞতা কাজে দিল—নতুন ভাবে কলেজটাকে গড়ে তুলবার জন্য প্রাণপণ ভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিছু দিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি দেখে অনেকেই আশ্চর্য্য বোধ করতে লাগল।

দুন স্কুলের মিঃ ফুটকে দেখেছিলাম নিজের চোখে— কি করে গড়ে তুললেন স্কুলটাকে, সুতরাং আমার কাছে লখনউ আর্ট কলেজকে গড়ে তোলা খুব কষ্টসাধ্য হ'ল না। যে সব নতুন 'পদ' সৃষ্টি হ'ল তাতে নিজের পছন্দ মত কর্ম্মী রেখে, তাদের 'পাবলিক সারভিস কমিশনে' অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিতে বেগ পাই নি।

কাজে যোগ দেবার কয়েকমাস পরে গরমের ছুটিতে মা'র মৃত্যু হয়। কলকাতার থেকে ফিরে এসে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগলাম। মাতৃবিয়োগের দুঃখ ভুলবার জন্য কাজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ডুবে গেলাম।

১৯৫৭ সাল

প্রিন্সিপ্যাল-গিরি করে নিজের কাজ করবার সময় পাই কিছু কম। তারপর শেখানর কাজ আছে। বড় বড় ছেলেমেয়েদের, আর্টিষ্ট হতে চায় যারা—তাদের শেখান সহজ। কিন্তু যারা কোন কিছু হ'ল না বলে আর্ট কলেজে যোগ দিয়েছে, তাদের শেখান কি সহজ ব্যাপার। তাদের 'ডিসিপ্লিনের' মধ্যে রাখা সেও এক কাজ বটে। ভাস্কর্য্যের ও ফাইনাল-ইয়ার ফাইন আর্ট-এর কিছু ক্লাশ নিতে সুরু করেছিলাম। তাতে ছেলে-মেয়েরা খুসী। কিন্তু মাষ্টাররা কেউ কেউ খুসী নন। দু'বেলা কলেজ 'রাউণ্ড' দিতে গিয়ে দেখি—অনেকেই ফাঁকি দেয়। অনেক ছেলেমেয়ে চায়ের ষ্টলে আড্ডা দেয়—মাষ্টাররাও কেউ কেউ ক্লাশে সব সময় থাকেন না। সে সব ঠিক করতে বেশী সময় লাগল না। দুন স্কুলের নিয়মকানুন কিছু চালিয়ে দিলাম। প্রিন্সিপ্যালের বাইরে প্রায়ই নানান মীটিংএ যেতে হয়। সে সব যত কম করা যায়, ততই ভাল কলেজের পক্ষে। প্রিন্সিপ্যাল যদি কলেজে না থাকেন বেশীর ভাগ সময় তবে কলেজের 'ডিসিপ্লিনে' ঢিলে পড়া স্বাভাবিক।

কলেজের মেয়েদের জন্য গাড়ি হওয়াতে মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আরেক মুস্কিল হ'ল।

মিঃ এফ, জি, পিয়ার্স

ছেলেমেয়েরা যাতে সুষ্ঠুর সঙ্গে মেলামেশা করে তার দিকেও সময় দিতে হ'ল। কলেজে নানান রকম 'অ্যাক্টিভিটিস' সুরু করে দিলাম। 'সাহিত্য সমাজ' লিটররী সোসাইটি—এণ্টারটেন্‌মেণ্ট সোসাইটি, স্কেচিং ক্লাব ইত্যাদি সুরু হ'ল। প্রত্যেক সোসাইটিতে একটি উপযুক্ত মাষ্টার প্রেসিডেণ্ট হ'ল—আর কর্ম্মীরা, সব ছাত্র-ছাত্রী। মাষ্টার ছাড়া সোসাইটি চলতে পারবে না। 'ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন' বন্ধ হয়ে গেল। কাজ বেশ সুষ্ঠুর সঙ্গে চলতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের ড্রামা একটা করবার ইচ্ছা হ'ল— 'বিসর্জ্জন' হিন্দীতে মন্দ জমে নি। পরে 'তাসের দেশ', 'ডাকঘর' ইত্যাদি ছেলেমেয়েরা বেশ ভাল ভাবেই করেছে। ড্রামা করার সুবিধের জন্য 'ওপন এয়ার থিয়েটার' একটা করা হ'ল। সেখানে নানান 'অ্যাক্টি-ভিটিস' সুরু হয়ে গেল এমনি করে কলেজে বেশ একটু

সাড়া পড়ে গেল। বাইরের লোকেরাও একটু সজাগ হ'ল আর্ট কলেজ সম্বন্ধে।

অঘটন

আমি যেদিন আর্ট কলেজে যোগ দিই—সেই সপ্তাহে একটা অঘটন ঘটে। হঠাৎ খবর এনে দিল হষ্টেলের ওয়ার্ডেন যে হষ্টেলে একটি ছেলে ধুতরা খেয়েছে। মর মর প্রায়, কি মুস্কিল। তখনই ছুটলাম হষ্টেলে। দেখি ছেলেটা ঝিমোচ্ছে আর গোঁ গোঁ শব্দ করছে। হষ্টেল 'ওয়ার্ডেন' ছেলেটিকে নুন জল খাইয়ে বমি করাবার চেষ্টা করলেন। বমি করল ছেলেটা। কিন্তু বেহুঁশ ভাবটা কাটল না, তখন তাকে 'রিক্সা' ডেকে হাসপাতাল পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম। সে হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গেল। তার ঘরে খানাতল্লাসী করে পাওয়া গেল এক তাড়া প্রেমপত্র। ছেলেটির বন্ধুদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল—সম্প্রতি সহরে শরৎচন্দ্রের বই,'দেবদাস' সিনেমায় দেখানো হচ্ছে, সেই বই দেখে ছেলেটি এই কাণ্ড করেছে। ছেলেটির তার দেশের একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল সম্প্রতি অন্য একজনের সঙ্গে। তাইতে এই ছেলেটির মনে হ'ল—'এ দেহ আর রাখবার প্রয়োজন নেই'। ছেলেটি ভাল হয়ে ফিরে এল। ছেলেটির অভিভাবককে চিঠিতে জানিয়ে দিলাম যে তাকে হষ্টেলে রাখা বিপদজনক। কিন্তু তাকে শেষ পর্য্যন্ত হষ্টেলেই রাখা হয়েছিল। সে কলেজে ভাল ভাবেই ছিল—পাশ করে বেরিয়েছে—কাজও পেয়েছে ভালই। তাকে আমি বিশেষ কিছু বলি নি। একদিন শুধু বলেছিলাম যে, 'জীবনটা অত সস্তার জিনিষ নয়—ফেলনার জিনিষও নয়। কলা-দেবীর কাছে আত্মোৎসর্গ করলে আর কিছুই ভাবনা নেই। মনের দুঃখ-আঘাত সব জয় করতে পারবে।

বাংলো থেকে ছবি চুরি

প্রিন্সিপ্যালের বাংলোটি কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে। পুরোণো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ী। এ বাড়ীতে অসিতদা থাকতে ১৯৩২ সালে এসে থেকে গেছি। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে এই বাড়ীতে আমিও এসে থাকব। সেই বাড়ীতে কত কাণ্ড হয়ে গেছে। অসিতদার পর ললিতবাবু ছিলেন। ললিতবাবু একলা থাকতেন। এই বাড়ীতেই তিনি মারা যান। তিনি মারা যাবার পর দেড় বছর সে বাড়ী বন্ধ ছিল। আমি গিয়ে সে বাড়ীতে উঠলাম আমার দুই কুকুর ও চাকর গোবিন্দকে নিয়ে। বনজঙ্গল হয়ে গেছে, তারই ভেতর বাড়ীখানা ঠিক ভূতুড়ে বাড়ী মত হয়ে গিয়েছিল। আমি গোবিন্দকে ও কুকুর দুটোকে নিয়ে সে বাড়ী আবার সরগরম করে তুলবার চেষ্টা করলাম। বাংলোতে একটি ছোটখাটো ষ্টুডিও ঘরও ছিল—তার বাইরে দরজার কাছে 'নীলমণি লতা' গাছের ঝাড় ছিল—সেটাতে খুব ফুল ফুটত।

অসিতদা থাকতে বাগানে ঝোপঝাড় বেশী ছিল—ললিতবাবু সেগুলো কেটে-ছেঁটে, একটু মডার্ণ করে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে আবার জঙ্গলই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মালীকে দিয়ে আবার বাগান পরিষ্কার হ'ল। বাড়ীটার ভেতরে প্রথম রাত্তিরেই দুটো সাপ মারা হ'ল। সাপের ভয় আমার তেমন নাই—দেরাদুনেও সাপের অভাব ছিল না। ভূতের ভয়ও আমার নেই। কিন্তু তবু সন্ধ্যেবেলায় কি রকম যেন গা ছম্ ছম্ করত। অবশ্য প্রতি দিনই সন্ধ্যের সময় হষ্টেল থেকে ছাত্রদের দল এসে হাজির হ'ত। বাড়ীর ষ্টুডিওতে বসে রাত্তিরে ছবি আঁকতাম। দিনের বেলা কলেজের কাজ ও অফিসের কাজ করে প্রথম প্রথম ছবি আঁকবার সময় বড় একটা পেতাম না। অনেকে আমার আঁকা ছবি দেখতে বা কিনতে বাড়ীতে আসতেন। দেরাদুন থেকে ছবির বোঝা ত কম নিয়ে আসি নি। কত ছবি—তার হিসেবও আমি কখনও রাখি নি। একটি ভদ্রলোক এক প্রকাণ্ড গাড়ি করে আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। আমার ছবি দু'চারখানা কিনলেনও। খুব আলাপ-আলোচনাও করতেন। কখনও কখনও আমি কলেজ থেকে ফিরবার আগেই এসে পড়তেন। এবং কখনও কখনও একলাই আমার ড্রইং রুমে গিয়ে বসতেন। চাকর গোবিন্দ, তাকে আমার বন্ধু ভাবেই জানত। একদিন আবিষ্কার করলাম আমার খান দশ-বারো ছবি যেন কম মনে হচ্ছে। সব তোলপাড় করেও সে সব ছবির খোঁজ পেলাম না। তখন মনে হ'ল ছবিগুলোর ফটো তোলা আছে আমার। 'পাইওনীয়ার' কাগজে খান ছয়েক হারিয়ে যাওয়া ছবির 'ফটো' পাঠিয়ে লিখলাম—'ছবিগুলি আমার ঘর থেকে মিসিং—যদি কেউ ছবিগুলো কোথাও দেখে থাকেন ত' আমায় খবর দিতে।' ছবিগুলো এক রবিবার পাইও-নীয়ার কাগজে বার হ'ল। সেই দিনই ভোর সকালে এক ভদ্রমহিলা ও এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে হাজির। তাঁরা বললেন—আমার হারিয়ে যাওয়া ছবি-গুলি, যা পাইওনীয়ার কাগজে বেরিয়েছে—সেগুলি তাঁরা অমুক লোকের ড্রইংরুমে দেখেছেন। যদি তাঁকে ধরতে

চাই এখুনি তাঁদের সঙ্গে যদি সেখানে যাই তবে ধরা যেতে পারে। তাঁরা যাঁর নাম করলেন, বলা-বাহুল্য তিনি আমার সেই বন্ধু বড় গাড়ির মালিকটি। যিনি আমার কাছে প্রায়ই আসতেন।

শুনে আমার কেমন যেন সঙ্কোচ হ'ল। ওঁদের সঙ্গে ছবি চোর ধরতে যেতে বাধ বাধ লাগল। আমি গেলাম না। ভদ্রমহিলা 'যাব না' শুনে আরেকটা নতুন কথা শোনালেন। তিনি নাকি সম্প্রতি সেই ছবি চোরের কাছ থেকে আমার একখানা ছবি কিনেছেন। সেখানা উনি আমাকে দেখাতে চান—চোরাই মাল কিনেছেন কি না জানতে চান। আমি রাজী হলাম। তাঁদের সঙ্গে ছবিটা দেখতে গেলাম। দেখলাম আমারই ছবি বটে, তবে ছবিখানা ভদ্রলোক আমার কাছে উপহার ভাবে নিয়েছিলেন। সেটা যে আবার বিক্রী করেছেন তাইতে মনটা খারাপ হ'ল। ভদ্রমহিলাকে বললাম যে ওটা চোরাই মাল নয়—তিনি অনায়াসে রাখতে পারেন।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'ল না। কথায় কথায় অনেকেই জানল 'ছবি চোর কে?' কিছুদিন পর একদিন দুপুর বেলায় এক ভদ্রমহিলা এসে উপস্থিত। পরিচয় দিলেন নিজের, বুঝলাম ছবি চোর বলে যাঁকে সন্দেহ করা হয়েছে—ইনি তাঁর স্ত্রী। বললেন—"আমার স্বামীর কাছে আপনার ছবি নেই। আপনাকে আমার স্বামীর বিষয় ভুল বুঝিয়েছে সবাই।"

আমি বললাম, "আমার মনে অবশ্য সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নি লোকেদের কথা। প্রমাণ যদি থাকত তবে অবশ্য আমি আপনার স্বামীকে ছাড়তাম না।"

উনি বললেন, "এ যে আরও খারাপ। লোকে যা-তা বলছে—রটে গেছে কথাটা। আমার স্বামীর নাম খারাপ হচ্ছে। আমার এটা ভাল লাগছে না। শুনেছি আপনাকে অনেকে আমার স্বামীর নামে নালিশ করতে বলছেন।"

আমি বললাম—'লোকে যাই বলুক—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নালিশ করব না'।...তিনি বললেন—"আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন—আপনার কত ক্ষতি হয়েছে বলুন—আমি তা যে করে হোক, আপনাকে দিয়ে দেব। শুধু আপনি সবাইকে বলবেন যে আমার স্বামী আপনার ছবি চুরি করেন নি।" আমি বললাম, 'সে হয় না, আপনার কাছ থেকে আমি কিছু নিতে পারব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি মিথ্যা কথা রটতেও দেব না।'

শ্রীবশী সেন ও তাঁর স্ত্রী

ভদ্রমহিলা ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। আজ পর্য্যন্ত এখনও এ বিষয় সন্দেহ থেকেই গেছে। সন্দেহ হয়ত থাকত না, কিন্তু ভদ্রমহিলা ছবির জন্য কিছু যে দিতে চেয়েছিলেন তাইতে সন্দেহটা বেড়েই গেল। যদি ছবি না নিয়ে থাকেন তবে টাকা দিতে চাইছিলেন কেন? আর কোনদিন ছবি দেখতে ভদ্রলোকটি আমার কাছে আসেন নি।

লখনউ-এ আমার একক প্রদর্শনী, ১৯৫৮

লখনউতে 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র লোকেরা আমাকে ধরেছিল যে তাঁরা আমার ছবি ও মূর্তির একটা প্রদর্শনী করবে। আমি প্রথমটায় রাজী হই নি। কিন্তু পরে অনেক ভেবে-চিন্তে রাজী হলাম। 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'রা প্রদর্শনীটা খুব জাঁকিয়েই করেছিল 'ইউনিভারসিটি ইউনিয়ান হল' এ। ডঃ জাকির হোসেন তখন বিহারের গভর্ণর। তাঁকে দিয়ে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়েছিলেন।... শ্রী ভি. ভি. গিরি তখন ইউ, পির গভর্ণর, তিনি প্রিসাইড করেছিলেন। খুব হৈ হৈ ব্যাপার হয়েছিল। রেডিওতে

বক্তৃতাগুলো রেকর্ড করে নিয়েছিল—পরে তা লখনউ ষ্টেশন থেকে ব্রডকাষ্ট করা হয়েছিল। 'জাকির হোসেনে'র সঙ্গে আমার 'দুন' স্কুল থেকেই আলাপ ছিল—তিনি একাধিকবার দুন স্কুলে এসেছিলেন। আমিও তাঁর 'জামিয়া মিলিয়াতে' গিয়েছি দিল্লীতে। তিনি বিহার-হাউসের জন্য তিনখানা ছবি কিনেছিলেন। গবর্ণমেন্ট আরও কয়েকখানা ছবি 'রাধাকমল'বাবু লখনউ য়ুনিভারসিটির জন্য কিনেছিলেন।

শ্রী ডি. ডি. গিরি, আমায় বলেছিলেন—"Do you know Devi Prasad? The superman?" বলেই হেসে ফেললেন। তারপর আবার বললেন—'আমি যখন মাদ্রাজে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট-এর মিনিষ্টার ছিলাম—তখন 'দেবীপ্রসাদে'র সঙ্গে আলাপ হয়। লোকে ডি, পি-কে বলত 'সুপারম্যান'—আমি বলতাম মানুষ আবার 'সুপারম্যান' কি? কোন মানে হয় না। ডি, পি কে বলতে সে উত্তর দিলে—'আমি নিজেকে সুপারম্যান বলি না—লোকে যদি বলে তবে তাদের মুখ বন্ধ করতে আপনি আছেন।' উত্তরটা শুনে আমি খুসী হয়েছিলাম। "After that, we were very good friends"—বলা বাহুল্য এই ডি, পি—প্রখ্যাত শিল্পী ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

'পদ্মশ্রী'। ১৯৫৮

এই বছরেই একবার দিল্লী যেতে হ'ল। পদ্মশ্রী 'অ্যাওয়ার্ড' করলেন ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ। শ্যামলীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে ব্যাপারটা দেখে খুসী হয়েছিল খুব। সম্মান ত পেলাম। কিন্তু সম্মানের যোগ্য কি না সে বিষয়ে মনে সন্দেহ রয়ে গেছে। 'পদ্মশ্রী' নেবার অনেক হাঙ্গাম। যেদিন দেওয়া হ'ল তার আগের দিন রিহার্সাল হ'ল। কেমন করে দু'জন 'আর্মি'র লোক—'লেফট-রাইট' করে আসবে, ক্যানডিডেট-কে সঙ্গে নিয়ে গুটির সঙ্গে যাবে। দু'পা এগুতে হবে, দু'পা পেছুতে হবে, তারপর নাম পড়া হবে, কীর্ত্তিকলাপ বলবে। তারপর ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজের হাতে পদক পরিয়ে দেবেন। সব ত শেখা হ'ল। এত শিখেও আসল দিন অনেকেই নানান রকম অদ্ভুত ভুল করে বসল। চাপা হাসিতে ঘর ভরে গেল। পণ্ডিত 'পন্থ' সেবার 'ভারত-রত্ন' পদক পেয়েছিলেন। দিল্লীর আর্টিষ্টরা বিশেষ করে 'শিল্পীচক্রে'র থেকে একদিন 'পদ্মশ্রী' পাবার জন্য আমায় চা পার্টি দিলেন। বন্ধুবর 'ভবেশ সান্যাল'ই এ বিষয় খুব উদ্যোগী হয়েছিলেন। শৈলজা মুখার্জী খুব কায়দা করে ধন্যবাদ জানালেন। এই সভাতে আমার 'ক্রিটিক 'কাত্রী' সাহেবও ছিলেন। দিল্লীতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, লখনউ ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

লখনউ ফিরেও সোয়াস্তি নেই। সেখানেও ছেলেরা মাষ্টাররা বন্ধুবান্ধবরা পার্টি দিতে লাগলেন। এমনকি ইউ. পি. আর্টিষ্ট অ্যাসোসিয়েশান—যাঁরা আমাকে পছন্দ করত না, তাঁরাও একদিন চা পার্টি দিলেন। এবং শুধু তাই নয় ইউ পি আর্টিষ্ট এ্যাসোসিয়েশান আমায় তাঁদের 'চেয়ারম্যান' পদে অভিষিক্ত করলেন।

১৯৫৮ গরমের ছুটিতে নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, রামগড়।

গরমের ছুটি আরম্ভ হ'ল মে মাসের মাঝামাঝি। অফিসের কাজকর্ম সেরে বার হয়ে পড়লাম মে মাসের শেষেই। শ্যামলী শান্তিনিকেতন থেকে মাসের প্রথমেই এসে গেছে লখনউ। নৈনিতালে সুহৃদ মেসো, অনিন্দিতা মাসি ও তাঁদের মেয়ে 'ছন্দ' আগেই কলকাতা থেকে গিয়ে 'ভ্যালেরিও' বলে একটি হোটেলে উঠেছেন। তাঁরাই আমাদের জন্য সেই হোটেলেই ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। গিয়ে ত উঠলাম 'ভ্যালেরিও'তে, গাল-ভরা ফরাসী নাম কিন্তু খাওয়াটা, যাকে ভদ্র ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় 'ইনর‍্যাডিকোয়েট'। এককালে হোটেলটা হয়ত ফরাসী দেশের কেউ চালাত, এখন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান একজন চালাচ্ছেন। সুহৃদ মেসো (সিংহ) কলকাতায় সাইকলজির প্রফেসর, জমাতে জানেন। এ্যাংলোদের হোটেলেও স্বামী স্ত্রী মেয়ে নিয়ে জমিয়েই বসেছিলেন। কিন্তু আমার গিয়ে বাধ বাধ ঠেকল। আমাদের ঘরটাও বড় অন্ধকার, আলো-বাতাস নাই বললেও চলে। নৈনিতালে অত্যন্ত ভিড় হয় গরমের ছুটিতে, মল রোডে চলা দায়। ইচ্ছে হ'ল রাণীক্ষেত যাবার। গভর্ণমেণ্ট 'রেষ্ট হাউসে' ঘর পাওয়া গেল। নৈনিতালে কিছুদিন থেকে লেকের হাওয়া খেয়ে ও লেকে নৌকা বিহার করে আমরা সবাই 'রাণী-ক্ষেত' রওনা দিলাম। রাণীক্ষেতে আগে কোনদিন যাই নি। জায়গাটা নৈনিতালের তুলনায় নির্জ্জন এবং খুব সুন্দর। চির পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, বেড়িয়ে আরাম আছে। আমরা রোজ নিজেরাই বাজার করতাম—চাকর ছিল, সে রান্না করত, মাঝে মাঝে মাসি ও শ্যামলীরাও কিছু করত। বেশ ঘরোয়া ভাবে ছিলাম সেখানে সপ্তাহ তিনেক।

রামগড় বেড়াতে গেলাম একদিন। মোটরে যেতে

বেশী সময় লাগল না। বিখ্যাত রামগড়, এককালে রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে থাকতেন। সেই বাড়ীটা এখন আছে, সেখানকার লোকেরা আমাদের দেখিয়ে দিলে। প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ী। শ্রীমতী মহাদেবী বর্ম্মাও সেখানে বাড়ী করেছেন। উত্তর প্রদেশের মহিলা কবি ও লেখিকা ইনি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। উনি ছবিও আঁকতেন, এলাহাবাদে থাকেন—এখন ত একজন এম. পি. হয়েছেন। রামগড়ে গিয়ে 'শেষের কবিতা'র কথা মনে হ'ল—লাবণ্যর বিয়ে হয়েছিল রামগড় পাহাড়ে। জায়গাটা আমাদের খুবই ভালো লেগেছিল। গভর্ণমেণ্টের Fruit Preservation Centre—জায়গাটা, সেখানে গিয়ে অ্যাপেলের সরবত ইত্যাদি খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করেছিলাম। একদিন 'আলমোড়া'য় গেলাম সবাই। আমি অবশ্য আলমোড়ায় ১৯৪১ সালে গিয়েছিলাম। তারপর আর যাই নি। এবারে একদিনের জন্য হলেও গিয়ে ভালো লাগল। শ্রীবশী সেন থাকেন আলমোড়ায়। তিনি ও তাঁর আমেরিকান স্ত্রী অনেকদিন থেকেই আছেন সেখানে। তাঁদের কাছে যাওয়াতে তাঁরা খুব খুসী। দুপুরের খাওয়াটা সেখানেই হ'ল। আলমোড়া পাহাড়ে পলতা পাতা ভাজা খাইয়েছিলেন মনে আছে। শ্যামলীর মাথায় শান্তিনিকেতনের টোকা ছিল। মিসেস সেন-এর খুব পছন্দ, সেই রকম একখান চাই অথচ শ্যামলীরটা কিছুতেই নেবেন না। শ্যামলী পরে তাঁকে একটা 'শান্তিনিকেতনী টোকা' পাঠিয়েছিল—তিনি খুব খুসী। জুনের শেষে লখনউ, ফিরে এলাম, তখনো লখনউ-এ বেজায় গরম।

Council House Decoration Committee

লক্ষ্ণৌ 'কাউন্সিল-হাউস' ছবিও মূর্ত্তি দিয়ে সাজাবার জন্য এই কমিটি গঠন হয় ১৯৫৪ সালে। তখন আমি দেরাদুনে। সেই সময় থেকেই আমাকে এই কমিটিতে রাখা হয়। ভারতীয় শিল্পীদের (বিশেষ করে ইউ, পি'র) আর্থিক সাহায্য করবার জন্যই বিশেষ করে এই ব্যাপারটি গভর্ণমেণ্ট সুরু করেন। শ্রী আদিত্য ঝা—চীফ

সেক্রেটারীর এতে খুব উৎসাহ ছিল। ডঃ সম্পূর্ণানন্দও (চীফ মিনিষ্টার) খুব উৎসাহিত হয়ে কোথায় কি আঁকা হবে—কোথায় কি মূর্ত্তি রাখা যেতে পারে—সে সব মীটিং-এ আলোচনা করে ঠিক করতেন। প্রথম দু'বৎসর কেবল মীটিং করেই কাটল। কাজ যখন আরম্ভ হ'ল তখন আমি লক্ষ্ণৌএর আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এসে গেছি। এবং আমার ওপর দুতিনটা কাজের ভারও পড়েছে। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্যানেল আঁকবার ভার আমার ওপর পড়ল—সাইজ হবে ১৫ ফিট×১২ ফিট। গান্ধীজির ডাণ্ডি মার্চ্চের ছবি—১২×৮ ফিট—সেও পড়ল আমার ওপর। মূর্ত্তিও করতে হবে একটি সম্রাট অশোকের মূর্ত্তি। একেবারে মন থেকেই বলতে গেলে করতে হবে। সম্রাট অশোকের ছবি ইতিহাসে বড় একটা পাওয়া যায় না। এই তিনখানা কাজ করবার জন্য নানান চিন্তা মাথায় ঢুকল। কিন্তু কাজ সহজে আরম্ভ করতে পারলাম না। বাড়ীতে 'ম্যাসোনাইট বোর্ড' আনিয়ে

খসড়া তৈরী করলাম সুরু। ইতিমধ্যে বর্ষা এলো। কলেজের কাজও পুরোদমে চলছে। লক্ষ্ণৌ এসেই মহাত্মা গান্ধীর লাইফ-সাইজ মূর্ত্তি—সাড়ে আট ফিট উঁচু (ভাওী মার্চ্চ) একটা করেছিলাম।

সেটা কলেজ মিউজিয়ামের সামনে রাখা হয়েছিল। ভেবেছিলাম মূর্ত্তিটা ব্রোঞ্জে করিয়ে কোথাও বিক্রী করে দিতে পারব। কিন্তু অনেকদিন কোন হিল্লে হয় নি মূর্ত্তিটার।

লক্ষ্ণৌ ছাড়বার কিছু আগে গভর্ণর 'বিশ্বনাথ দাসে'র মূর্ত্তিটা পছন্দ হয় এবং লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেন্ট হাউসের জন্য উনি তিন হাজার টাকায় কিনে নেন। প্লাষ্টারে বলে বাড়ীর ভেতরেই রাখতে হয়েছে মূর্ত্তিটাকে।

রবীন্দ্রনাথ-এর ও গান্ধীজীর আবক্ষ মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড করে সীমেণ্টে গড়েছিলাম—১৯৫৮ সালে গরমের ছুটির আগেই। সে দুটো মূর্ত্তি বারাণসীর সংস্কৃত য়ুনিভারসিটির জন্য ঝা সাহেব কিনে নেন। লক্ষ্ণৌ য়ুনিভারসিটির লাইব্রেরীর আর্ট হলের জন্যও অনেক ছবি তাঁরা কেনেন। লক্ষ্ণৌ চিলড্রেন্স লাইব্রেরীতে সাজাবার জন্যও অনেকগুলি ছবি ও মূর্ত্তি বিক্রী হয়। অনেকেই তখন আমার ছবি কিনেছিলেন। Kartom-এর Indian Embassyর জন্য আমার ছবি এঁকে দিতে হয়। মনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব ছিল সে সময়—বেশ ভালই কাটছিল কাজেকর্ম্মের মধ্যে। কিন্তু আমি দেখেছি বেশীদিন আমার কপালে সুখ বোধ হয় সহ্য হয় না। ১৯৫৮র অক্টোবরের প্রথমে গোমতী নদীতে বন্যা এলো। আমাদের কলেজ ও আমার বাংলো গোমতীর ধারে ব'লে আমাদের বন্যা-পীড়িত হ'তে হ'ল। ভাগ্যক্রমে সেবার বন্যার জল আমার থাকবার বাংলোর Plinth অবধি উঠে আর বাড়ল না। ঘরের ভেতরে জল ঢুকল না কিন্তু সমস্ত বাড়ীটা স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেল। বাড়ীর চারিদিকে জল—সে এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আমার। নৌকো করে কলেজ গিয়েছি কয়েকবার। সেই স্যাঁৎসেঁতে বাড়ীতে থেকে আমার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। কিন্তু কি করা যায়, এমনি করে ১৯৫৮ সালটা কেটে গেল।

১৯৫৯ সাল

অনেক নতুন শিল্পী appointed হয়েছিল। নতুন উদ্যমে তারা কলেজে কাজ আরম্ভ করেছিল। কলেজে নানান রকমও সুরু হয়েছিল। কলেজ দেখবার জন্য প্রায় রোজই কেউ না কেউ আসতেন। সবাই এক-বাক্যে কলেজের প্রশংসা করে যেতে লাগল। ওরা মার্চ্চ পণ্ডিতজীও আর্ট কলেজ দেখতে এলেন। পণ্ডিত নেহরুকে নিয়ে আর্ট কলেজ ঘুরে দেখালাম—তিনি খুব খুশী হলেন। আমরা ত আরও খুশী।

তিনি 'ভিজিটরস' বইতে খুব ভাল ভাল কথা লিখে দিয়ে গেলেন। এমনি করে দিন কাটে—কাজের ভীড়ে। রাত্রে বাড়ীতে গিয়ে ছবি আঁকি। অ্যানুয়াল এগজিবিশান এসে যায়। শ্রীগোপাল রেড্ডীকে এবারে 'ডিপ্লোমা' দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে আনি। গোপাল রেড্ডী আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধু। আমরা একসঙ্গে ছিলাম ছাত্রভাবে। সে খুশী হয়ে আসে আমাদের আমন্ত্রণে। খুব হৈ হৈ করে প্রদর্শনী ও সমাবর্ত্তন হয়ে যায়। আবার গরমের ছুটি আসে। এবারে কোথায় যাই? শ্যামলী শান্তিনিকেতন থেকে এসে গেছে।

দিদি লিখেছেন 'কার্সিয়াং' যাবেন, বাড়ী ভাড়া করেছেন। আমি ও শ্যামলী সেই গরমের ছুটিতে কার্সিয়াং রওনা দিলাম।

কার্সিয়াং, দার্জ্জিলিং ভ্রমণ

লখনউ থেকে সোজা শিলিগুড়ি—সেখান থেকে দার্জ্জিলিং। লম্বা সফর কিন্তু বেশী ওঠা-নামা নেই। এই যা সুবিধা। শিলিগুড়ি পৌছে দার্জ্জিলিং-হিমালয়েন রেলওয়ের ছোট গাড়িতে উঠে বসা গেল। পাহাড়ের পথে সফর করা সে যেন এক মজা। মনটা বাতাসের মতন হালকা হয়ে যায়। বহুদিন পর আমি এই পথে যাচ্ছি—শ্যামলীর এই পথে প্রথম। সঙ্গে বম্বে থেকে ছেলেমানুষ গুজরাটী ছেলেমেয়ের দল চলেছে। ভাব করে নিতে দেরি হ'ল না। তারা যাবে সোজা দার্জ্জিলিং। শ্যামলী তাদের সঙ্গে বেশ ভাব করে নিল। কলাভবনের ছাত্রী শুনে, শ্যামলীকে যেন পেয়ে বসল। ছবি আঁকে যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী—তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব যেন তারা খুঁজে পেল। ট্রেনের আলাপ অনেক সময় বেশ স্থায়ী হয়। পরে এই দলের

সঙ্গে আমাদের দার্জ্জিলিংএ দেখা হয়। ছোট রেলগাড়ি এঁকে-বেঁকে পাহাড়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে—মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ—সচরাচর অন্ত ইউ, পির ছিল ষ্টেশনএ এ-সময়টায় বৃষ্টি বা কগ হয় না। কিন্তু দার্জ্জিলিং-এর পথে সব সম্ভব। কগে কখনও কখনও সব ঢেকে যেতে লাগল। স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যে ট্রেণ চলছে। প্রচণ্ড গরমের পর একটু ঠাণ্ডা বোধ করতে লাগলাম। বম্বে-ওলারা ত আগে থেকেই উলের জামা-কাপড় গায় চড়িয়েছে। কার্সিয়াং আসতে দেরি হ'ল না।

যখন কার্সিয়াং পৌছলাম তখন বৃষ্টি নেমেছে।··· বাড়ী খুঁজে নিতে দেরি হ'ল না। ষ্টেশনের কাছেই পুরোণো দোতলা বাড়ী। দিদি বৃষ্টির মধ্যে বার হবার সাহস পান নি। ঠিক খবরও পান নি যে কখন পৌছব। বাড়ীটার ব্যবস্থা খুব ভাল না। দোতলার সামনের বারান্দাটায় বসে অনেক সময় কাটাতাম। সেইখানে বসে নেপালী কাগজের ওপর অনেক ছবি এঁকেছি 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট'। সকাল বিকাল, বেড়ানো—আর বাড়ী-ফিরবার পথে ট্রেণ অ্যাটেণ্ড করা এক কাজ হ'ল যেন। কত লোক দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন—তার মধ্যে মাঝে মাঝে চেনা মুখ পাওয়া যাচ্ছে। কার্সিয়াং মাঝপথে—দার্জ্জিলিং যাত্রী সব ঐ পথে যায়, দ্বিতীয় পথ আর নেই।

কার্সিয়াংএ দর্শনীয় বিশেষ কিছু নেই। বোর্ডিং স্কুল কতকগুলো আছে ভালই। শিল্পী কিরণ সিংহ, তাঁর মেয়েকে কিছুকাল কার্সিয়াংএর একটি স্কুলে রেখেছিলেন। কিরণ সিংহের সঙ্গে কার্সিয়াংএ হঠাৎ একদিন দেখা হ'ল।

সুরেশ দার্জ্জিলিংএ এসেছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে একদিন দার্জ্জিলিং গেলাম শ্যামলীকে নিয়ে। কার্সিয়াংএ শ্যামলীর ভাল লাগছিল না। দার্জ্জিলিং গিয়ে খুব ভাল লাগল। সুরেশ তার বন্ধুর বাড়ীতে আছে—বাড়ীর নাম 'মালঞ্চ', জলাপাহাড়ে বাড়ী। সেদিন ত বিকেলে কার্সিয়াং ফিরে আসা গেল। রবীন্দ্র জন্মোৎসব হবে কার্সিয়াং-এও—সেখানকার 'হলে' আমাকে বলতে হ'ল। শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্র-জীবনের কথা বলেছিলাম। পরের দিন—'রক্তকরবী' অভিনয়—সেখানকার বাঙ্গালীরা করেছিলেন—মন্দ করেন নি।

লখনউ ফিরে যাবার আগে দার্জ্জিলিংএ গিয়ে দিন দশ-বারো কাটানো গেল। সুরেশের বন্ধুর বাড়ীতে। রোজ সকাল বিকাল দুপুর ঘুরে বেড়ানো, সিনেমা দেখা, এই কাজ। কিউরিও সপে ঢুকে 'টিবেটিয়ান' জিনিষ নাড়াচাড়া—শ্যামলীর সে সবের খুব সখ। রূপোর গয়না নতুন কিছু দেখলেই তার কেনা চাই। বর্ষা নেমেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা' মাত্র দু'দিন দেখা গিয়েছিল। তারপর আর ভাগ্যে ঘটল না দেখা। সব সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখে গেলে যেন অৰ্দ্ধেক 'চার্ম' অজানা থেকে যায় দার্জ্জিলিংএর। বর্ষাটা নেহাত বড় তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়ে যায় দার্জ্জিলিংএ।

সব সময় কগ-বৃষ্টি, মেঘ-তার মধ্যে আর বেশীদিন ভাল লাগে না কাজ ছাড়া। ফিরবার পালা। পাহাড় থেকে ফিরতে কিন্তু সব সময়ই মন খারাপ হয়। এবারে কলকাতা হয়ে লখনউ। মনিহারীঘাট শকরিগলিঘাট হয়ে দার্জ্জিলিং থেকে কলকাতায় আসা বড় কষ্টকর ব্যাপার। পাকিস্তান হয়ে দার্জ্জিলিং যাবার সুবিধাটাও গেছে। লখনউ ফিরে এসে আবার কাজ—ফাইল নিয়ে সই করতে বসা। কলেজের নতুন ছাত্রছাত্রীদের অ্যাড-মিশান পরীক্ষা, তাদের ইনটারভিউ নেওয়া। তারপর কলেজ খুললে আবার সেই ঘানিতে লেগে যাওয়া। চাকা ঘুরছে।

এ বছরে গোমতীর বন্যায় ভয় আমরা খুব বেশী পাই নি। বর্ষাটা এবারে তেমন ঘনঘটা করে হ'ল না। সুতরাং বেঁচে গেলাম এবারে। কলেজের বাগান খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। বহু সিমেন্টের মূর্ত্তি এখানে-ওখানে রাখা হয়েছে। তা দেখতে রোজ অনেক অতিথি সমাগম হয়। সবাই খুব খুসী।

পুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে প্রভাতদার ছেলে সুপ্রিয় তার স্ত্রী পুত্র ও শাশুড়ীকে নিয়ে এসে হাজির। তাদের নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো চলল—তাঁরা

ছুটির পর ফিরে গেলেন। তারপর শীতের সময় এলেন প্রভাতদা নিজে সঙ্গে সুধাদিও। তাঁদের কেয়ার-টেকার বন্ধুও সঙ্গে আছে। প্রভাতদাকে নিয়ে আবার বেড়ানো। সুধাদি শীতে কাতর। প্রভাতদা'র কিন্তু খুব উৎসাহ। একদিন কলেজে বক্তৃতা দিলেন। তাদা হিন্দীতেও বললেন কিছু। বাঙালীদের ক্লাবেও হ'ল একদিন ওঁ:র ভাষণ। গুরুদেবের একটা সিমেন্টের মূর্তি গড়েছিলাম—সেটা প্রভাতদাকে দিয়ে আবরণ উন্মোচন করানো হ'ল—ওপন-এয়ার থিয়েটারের কাছে। অসিত দা বলেছিলেন 'ওপন-এয়ার থিয়েটারের' নাম 'রবি-রঙ্গ-মঞ্চ' রাখতে। কিন্তু নামটা চলল না।…ওপন-এয়ার-থিয়েটারই' বলে সবাই।

১৯৬০ সাল। ওপন-এয়ার-এগজিবিশন

জানুয়ারী মাসের শেষে কলেজের স্পোর্টস হয়। এতে সবাই তেমন উৎসাহ নিয়ে যোগ দেয় না। এবারে তাই একটু বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা হ'ল। ওপন্-এয়ার এগজিবিশান হবে দু'দিনের জন্য 'স্পোর্টস'-এর সঙ্গে সঙ্গে। ছবি, মূর্তি যা কিছু রাখা হবে প্রদর্শনীতে —সব বিক্রীর জন্য—দাম সব দশ টাকার মধ্যে। ছেলে-মেয়েদের খুব উৎসাহ।

মেয়েরা খাবারের দোকান করবে ঠিক করল। তাতে যা লাভ হবে তা 'দরিদ্র ছাত্র ভাণ্ডারে' দেবে। মাটির মূর্তি—যা ক্লাশে ছেলে-মেয়েরা করে—তা সবই 'ষ্টল' করে রাখা হ'ল। ছোটখাটো কাঠের—লোহার কাজ তাও বাদ গেল না। তার ওপর ছবি, কার্ড, বাতিকের কাজ—সবই আছে। বেশ হৈ হৈ করে সাজ সাজ রব উঠল। সার দিয়ে মাটির, প্লাষ্টারের ও সিমেন্টের মূর্তি রাখা হয়েছিল—বেশ লাগছিল। দলে দলে লোক 'ওপন-এয়ার প্রদর্শনী'তে এসে জিনিষপত্র কিনতে লাগলেন। 'পটারীর' কাজও রাখা হ'ল। নির্দিষ্ট সময় 'স্পোর্টস'ও আরম্ভ হ'ল। এমনটি আর্ট কলেজে আগে কখন হয় নি। 'ওপন-এয়ার' প্রদর্শনীও এই প্রথম। এরপর থেকে স্পোর্টস-এর সময় প্রতি বছরই খোলা জায়গায় প্রদর্শনী হয়। লখনউ-এর লোকেরা এই প্রদর্শনীতে সস্তায় হাতের কাজ কিনবার সুযোগ পায়। বিক্রী হয় দেখে ছেলেরাও ১০ টাকার মধ্যে নানান রকম হাতের কাজ করে এই প্রদর্শনীতে রাখে। মেয়েরা সেলাই-এর কাজেরও 'স্টল' ক'রে রাখে বিক্রীর জন্য। …বাৎসরিক প্রদর্শনী মার্চ্চ মাসের মাঝা-মাঝি হয় প্রতি বছর। এই প্রদর্শনী শেষ হবার পরেই বাৎসরিক পরীক্ষা সুরু হয়। পরীক্ষার পর গরমের ছুটি।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

(Octoberএর পর সাল, তারিখ অনেক ক্ষেত্রেই লেখা নেই।)

পুরীর থেকে ফিরে আসার পর আমাদের দু'জন সাহিত্যিকা বন্ধু লাভ হয়েছে। একটি নিরুপমা দেবী আর একটি হেমনলিনী দেবী। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রাদ্ধের দিন নিরুপমা ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে আসার উপলক্ষ্যে আমাদের বাড়ী এসে উঠেছিলেন। সঙ্গে আরো দু'টি মহিলা ছিলেন। একজনের নাম সুশীলা, আর এক জনের নাম জানি না। নিরুপমার লেখা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে একজন খুব গম্ভীর প্রকৃতির pedantic মানুষ, এবং খুব সম্ভব বেশ মোটা। কাজে দেখলাম সে রকম মোটেই নয়, লম্বা, রোগা, ছিপছিপে মানুষ, চুল ছাঁটা এবং একান্তই হিন্দু বিধবা মহিলার বেশ। মুখ দিয়ে প্রায় কথাই বেরোয় না, অন্যের কথা শুনতেই বেশী ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গিনী সুশীলা দেখলাম তাঁর একান্ত ভক্ত, উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চোটে বেচারী নিরুপমা একটু অপ্রস্তুত।

নিরুপমাকে দেখে আমরা যেমন অবাক্ হলাম, আমাদের দেখে তিনিও তাই হয়ে থাকবেন বোধ হ'ল। বেশী কথা বলা ত স্বভাব নয়, শুধু বললেন, "ওমা, এই নাকি শান্তা সীতা? আমি ভেবেছিলাম আমাদের বয়সীই হবেন। এ যে একেবারে ছেলেমানুষ।"

হেম মাসী (শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার) ও কামিনী রায় প্রভৃতি জোটাতে বাড়ীতে বেশ রীতিমত সাহিত্য সভা ব'সে গিয়েছিল।

তাঁদের একটা return visit ত দিতে হয়। বার বার ক'রে তাঁরা ব'লে গেলেন। তাঁরা লোক পাঠাবেন নিতে কাজেই বাড়ী খুঁজে মরতে হবে না। এক ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন দিনে এক ভাড়াটে গাড়ি চ'ড়ে অচেনা এক ঝি এবং দরোয়ানের সঙ্গে যাত্রা করা গেল। যাঁর বাড়ী গিয়ে উঠলাম, শোনা গেল তিনি হেমনলিনী দেবীর ভাই। হেমনলিনী গম্ভীর প্রকৃতির গিন্নী-বান্নী মানুষ, গল্পগাছা খুব বেশী করলেন না। একটি বউ দেখলাম, গৃহস্বামীর পত্নী, নাম জ্যোতির্ময়ী, সুন্দর চেহারা বেশ হাসিখুশী মানুষ। তাঁর বাপের বাড়ী শুনলাম বাঁকুড়া, পাঠকপাড়ায়। আমাদেরই স্বদেশ ও স্বপাড়াবাসিনী তা হ'লে। খানিকক্ষণ গল্প করার চেষ্টা করা গেল, খুব যে জমল তা বলা যায় না। একটি বৃদ্ধাকে দেখলাম, শুনলাম তিনি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। ব'সে ব'সে ছবি আঁকছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য একটি, ভালই আঁকছিলেন ভদ্রমহিলা। প্রিয়ম্বদা দেবী গিয়েছিলেন, দলের একজন মানুষ পেয়ে আশ্বস্ত হওয়া গেল। হেমনলিনী দেবী একটা গান গেয়ে শোনালেন। অগত্যা আমাকেও একটা গান শোনাতে হ'ল সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে। নিরুপমা খানিক গল্পগাছা করলেন। বেশ সোজাসুজি সরল মানুষ, বেশ লাগল ভদ্রমহিলাকে। খাওয়া-দাওয়া হ'ল কিঞ্চিৎ ঘটা করে। এরপর ফিরবার পালা। যে ভাবে গিয়েছিলাম, সেই ভাবেই ফিরলাম। ফিরবার আগে তাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে এলাম আমাদের স্কুলের sports দেখতে। তাঁরা এসেও ছিলেন। বোধ হয় তাঁদের ভালই লেগে থাকবে, কারণ ব্যাপারটা মন্দ হয়নি। আমাকে অতিথিবর্গের অভ্যর্থনার ভার নিতে হয়েছিল, কাজেই খুব বেশী গল্প করবার সময় পাই নি।

Peace celebration ইত্যাদির উপলক্ষে লম্বা একটা ছুটি পাওয়া গিয়েছিল। তার মধ্যে একদিন Ladies' Park-এ মেয়ে মেলায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম। একেবারেই ভাল লাগল না। খানিকক্ষণ ব'সে মেয়েদের বিচিত্র সাজসজ্জা দেখলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই চ'লে এলাম। ছুটির শেষ দিনটা বেবুদিদের এক পার্টিতে গেলাম। পার্টিটা আমাদের সমাজের আর পাঁচটা পার্টির মতই হ'ল। Bose Institute এর বাগান থাকাতে স্থানাভাব ঘটে নি। খানিকটা গান-বাজনাও হ'ল।

এরপর আমাদের স্কুলের প্রাইজটাও হয়ে গেল খুব ঘটা ক'রে। মাসখানেক ধরে তার রিহার্স্যালের জ্বালায় কান ঝালাপালা হচ্ছিল। সেদিন যা ভীড় হ'ল! এক পরিচিত যুবকের কল্যাণে ভীড়ের মধ্যে একটা আসন পেয়েছিলাম, তাও একজন বুড়ী ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে দিতে হ'ল।

7th March, 1920. কালকে এক ঝড়ের সন্ধ্যায় এক বিয়েবাড়ীতে যাত্রা করা গিয়েছিল। গাড়িতে চ'ড়ে ঝড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটা বর কিংবা কনের পক্ষে খুবই romantic বটে! বিশেষ করে আমাদের দেশে ত শ্রীরাধিকা ঝড়ের মধ্যে সিক্ত নীলাম্বরে অভিসার যাত্রাটা বেজায় fashionable ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কেবল মাত্র নিমন্ত্রিত মানুষ হওয়াতে নীলাম্বরী প'রে ভেজাটা আমার একটুও ভাল লাগল না। কি আর করা যায়, মাঝপথে ত আর নেমে পড়া যায় না, কাজেই শেষ অবধি যাওয়াই গেল। গিয়ে দেখি তুমুল কাণ্ড! ঝড়বৃষ্টির চোটে বিয়ের আসর ত একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কাউকে বসান গেল না। পাশের বাড়ীর এক অনতি-পরিসর drawing room-এ সবাইকে ঠেলে বসিয়ে কোনরকমে কাজ সারা হ'ল। কনেকে দেখাচ্ছিল খুবই সুন্দর, তবে বাঙালী কনের মত ভাব মোটেই নয়। দিব্যি হৈ হৈ ক'রে গল্প ক'রে বেড়াচ্ছে।

বর এলেন কিছু পরে, বেশভূষাটা মোটেই বরের মত নয়। তাঁর সঙ্গের লোকরা অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করে আসন গ্রহণ করলেন, হয়ত ঝড়বৃষ্টির আতিশয্যে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটি অপরিচিত ভদ্রলোক সজোরে বাজনা বাজিয়ে এমন ভীমনাদে গান ধরলেন যে আমার মাথাশুদ্ধ ঝনঝন করতে লাগল। যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে বরকনেকে দেখাই যাচ্ছিল না, কিন্তু এত ছোটঘর যে আর কোন জায়গায় উঠে গিয়ে বসা যায় না। যাক, বিয়েটা বোধ হয় ঝড়ের জন্যই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল এবং খাওয়া-দাওয়াটাও তাই। এই দুর্যোগের মধ্যে ঠিকা গাড়ি খুঁজে পাওয়া এক বিষম ব্যাপার। যা হোক কোন মতে একটা জুটল এবং অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলাম।

দিন কয়েক আগে Bethune College-এর Prize distribution-এ গিয়েছিলাম। বেথুনের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। একেবারে গুটিপোকার থেকে প্রজাপতি। নাচ, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি খুব যে চমৎকার হয়েছিল তা নয়, তবে অনেক কাল পরে পুরণো জায়গায় গিয়ে ভালই লাগছিল। তবে Professor-দের কারও সঙ্গে দেখা হ'ল না এই যা দুঃখ। আমার চেয়ে দিদিরই মন খারাপ হয়ে গেল বেশী। মানুষের জীবনে পরিবর্ত্তন জিনিষটা বড়ই বেশী, কোন কিছুই চিরকাল ধ'রে রাখা যায় না।

1st May, Saturday, 1920. ক্ষুদুর বিলেত যাবার দিন স্থির হয়েছে। এরপর দিন কাটান আরও শক্ত হবে। ওর যতরকম অদ্ভুত এবং depressing আবহাওয়াতেও আনন্দ করবার ক্ষমতাটা খুবই বেশী, কাজেই সে চ'লে গেলে আমাদের বাড়ীর অতি গম্ভীর atmosphere একেবারে আটল হয়ে থাকবে। ওর যেতে আর তিন দিন বাকি আছে। তারপর কবে ফিরবে তা মনে ক'রে আনন্দ পাবার দিন, সে ত এখন নয়। ভাইদের মধ্যে প্রথমজন যখন বিলেত গিয়েছিল, সে অনেক দিনের কথা, বয়সটা তখন এতই কম ছিল যে, সংসারের সব আঘাত সংঘাত মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে চ'লে গিয়েছিল, কিছুই দাগ বসায় নি। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই, সংসারের চেহারাও এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন যা কিছু পাওনা আসে তা বুক পেতে নিতে হয়। কল্পনার বা অস্ফুট মনোবৃত্তির আড়াল এখন আর নেই।

16th May, Sunday. স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছে, কাজেই এখন অখণ্ড অবসর, এত বেশী অখণ্ড যে তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতে হয়েছে। পাড়ার বেশীর ভাগ লোকই ছুটির নামে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে, বলতে গেলে আমরাই একমাত্র বাকি আছি। তা আমাদের মধ্যে থেকেও একজন খুব লম্বা রকমের পাড়ি দিয়েছে, কলোম্বো থেকে তার খান দুই চিঠি পাওয়া গেল, এতদিনে আবার সমুদ্রযাত্রা ক'রে থাকবে। গত ৫ই মে আমরা তাকে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। বিদেশ যাত্রা জিনিষটাকে একদিক্ দিয়ে ভাবলে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু আর একটা দিক্ আছে যেটা একেবারেই মন্দ। সেদিন সকাল থেকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্রের স্তূপের মধ্যে বসে মনটা খারাপই লাগছিল। যাবার ঠিক সময়টাতে চেষ্টা করে মনটাকে খানিক চাঙ্গা ক'রে নিলাম। ক্ষুদুর সঙ্গে আগেই মোটরে চ'লে গেলাম, বাড়ীর দল পরে এল। সেদিন আবার ডাঃ নীলরতন সরকারের ছেলে খোকাও যাচ্ছিল, কাজেই ষ্টেশনে see off করতে যে দলটি জুটেছিল তা মোটেই ছোটখাট নয়। একদল Boy Scouts গিয়ে জুটেছিল, ক্ষুদু তাদের A. S. M. (Assistant Scout Master)।

ঘণ্টা খানিক ষ্টেশনে থাকতে হয়েছিল, বড় strain হয়েছিল। কতক্ষণে ব্যাপারটা শেষ হয় তাই কেবল ভাবছিলাম।

Boy Scout-রা খুব কোলাহল সহকারে ওকে একখানা ছড়ি present করল এবং three cheers দিয়ে

ষ্টেশনের লোকদের তাক লাগিয়ে দিল। ফুলের ছড়াছড়িও যথেষ্ট হ'ল। অতঃপর ট্রেনটা চলতে শুরু করল। ও যাবার আগে ক্ষুদ্রহীন বাড়ীটার অবস্থা যেমন হবে ভেবেছিলাম, কাজে দেখলাম ততটাই নয়। পৃথিবীর সুখ-দুঃখগুলো যেন অর্দ্ধেক কল্পনা আর অর্দ্ধেক বাস্তব। যা কিছুকে আগে অসহ্য ভাবতাম, সব সয়েও ত এখন দিব্যি ভাত খাচ্ছি, ঘুমচ্ছি। দুনিয়াটা যে আজব জায়গা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমার স্কুলটা বন্ধ হ'ল বোধ হয় ৭ই মে। বিশেষ কিছু হল্লোড় হ'ল না। Morning Schoolএ বেশী উৎসাহ প্রকাশের scope পাওয়া যায় না। আমি আর বিভা common roomএ ব'সে সুখ-দুঃখের কথা কয়ে সময় কাটালাম। তারপর বাড়ী ফিরলাম।

যেদিন ছুটি হ'ল সেদিনই সন্ধ্যার সময় পাশের বাড়ীর শোভার বিয়ে হ'ল। বিয়ের একঘণ্টা আগে অবধি বোঝা যায় নি যে বাড়ীতে কিছু ঘটছে। তবু গেলাম, নিতান্তই নিকটতম প্রতিবেশিনী। পাড়ার মেয়েরা মিলে কনে সাজান নিয়ে খানিকটা কোলাহল করলাম। বিয়ের service-এর মাঝে উঠে গিয়ে একবার বাড়ীতে রাত্রিকালীন আহার সেরে এলাম, কারণ এ বিয়েতে খাওয়ানোর পর্ব্ব ছিল না। ফিরে গিয়ে দেখি বিয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তারপর সমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণে কিছু light refreshment বিতরণ করা হ'ল। সেখানে ব'সে কিছু গল্প-গাছাও করা গেল।

দিন দুই পরে শোভার বৌভাত উপলক্ষ্যে তার বর স্বয়ং এসে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। কনেরই বোনের সঙ্গ ধ'রে গিয়ে ত উপস্থিত হলাম। দেখি কেউ কোথাও নেই, বাড়ীরই দু'চারটি লোক নির্ব্বাকভাবে ব'সে আছে। নিজেরাই একটু উৎসব কোলাহল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলাম। ক্রমে ক্রমে দু'চারজন ক'রে কনের বাড়ীর লোক আর বন্ধুবান্ধব এসে জুটতে লাগল। কিন্তু রান্না হতে এমন বিষম দেরি আর কোথাও দেখি নি। ছাদে বেড়ালাম, বৌকে সাজালাম, ঘরে ব'সে গল্প করলাম, প্রভাতবাবুর[১] সঙ্গে রসিকতা করলাম, বারান্দায় বসে হাওয়া খেলাম, কিন্তু রান্না আর কিছুতেই শেষ হয় না। বর বেগতিক দেখে নীচে পলায়ন করলেন, শোভা বেচারী ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘর আর বসবার ঘর করতে লাগল। নিমন্ত্রিত ছেলেরা একটা ঘর জুড়ে বসে চীৎকার ক'রে গান জুড়ে দিল। দাদা হেন গম্ভীর মানুষও অনেকগুলো হিন্দি, ফ্রেঞ্চ এবং জার্ম্মান গান গেয়ে ফেলল। বাংলা গানও হ'ল কিছু কিছু যথা: "তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে," ও "মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী" ইত্যাদি। যুবকদের দলে খুব গম্ভীরভাবে ব'সে প্রেমের গান শুনছিলেন কনের বাবা সীতানাথ বাবু। তাঁর এক মেয়ে বললেন, "তা বাবা ওসব খুব enjoy করেন। হাজার হলেও দু' দু'বার প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছেন ত।" প্রভাতবাবু ছেলের দল এবং মেয়ের দলের মধ্যে সেতুস্বরূপ হয়ে ঘুরতে লাগলেন।

কিন্তু শেষে ছেলেদের গানও আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। ইতিমধ্যে এক সঙ্গিনীর কৃপায় কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ ক'রে পেটের জ্বালা একটু জুড়িয়েছিল, এখন পেল ঘুম। একটা ঘরে যার যত বাচ্চা ছিল, সব শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, দু'চারজনের মা-ও সেখানে স্থান গ্রহণ করেছিলেন। আমি গিয়ে সোজা সেখানে শুয়ে পড়লাম। ঘুমটা অবশ্য পাকাপাকি হয়নি, আমার একটি খাসিয়া ছাত্রী পাশে ব'সে সারাক্ষণই গল্প করেছিল। যাক, অবশেষে পোলাওএর হাঁড়ি নামল। ছেলের দল চীৎকার ক'রে গান ধরল, "আয়রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে।" জীবনদা[২] এক বার "ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান"-ও গেয়ে দিল।

তা খাওয়া-দাওয়া ভালই হ'ল। আহারান্তে যাঁরা শিশুর পাল নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা অনেক ভাবনা ভাবতে বসলেন, আমরা হেঁটেই বেরিয়ে পড়লাম। নিদ্রামগ্ন কলকাতার জনহীন পথে হাঁটতে ভালই লাগছিল। তবে খেয়ে উঠেই হাঁটাটা একটু কষ্টদায়ক, কাজেই কবিত্বটা প্রাণে পুরোপুরি জাগতে পারল না। অনতিবিলম্বেই বাড়ী পৌঁছে গেলাম।

17th October, Sunday. এখন পুজোর ছুটি চলছে, যদিও ছুটি জিনিষটা আমার কোনো কাজেই লাগে না। তবে এবার শুনছি যে দিন কয়েকের জন্য ছুটির মধ্যে একবার এলাহাবাদ যাওয়া হবে। সেই যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লটবহর নিয়ে কলকাতা চলে এসেছিলাম, তারপর আর ওমুখো হইনি। অবশ্য যাওয়াটা কতদূর ঘটে উঠবে জানি না, এখন পর্য্যন্ত এ প্রস্তাবের ফলে কয়েক পালা ঝগড়া ছাড়া আর কিছু লাভ হয় নি। গ্রীষ্মের ছুটিটা ত কাটল প্রায় আগাগোড়াই নভেল লিখে। আর ত কিছু করবার খুঁজে পাই না। "পথিক

১। কনের ভগ্নীপতি, রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী ও তাঁর জীবনী রচয়িতা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। কবি-সাহিত্যিক শ্রীজীবনময় রায়।

বন্ধু'র ভিতর একটা চরিত্রে আমার নিজের জীবনের খানিকটা ছায়া পড়েছিল, কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা ধ'রে বসলেন আর একটাকে, যাকে আমি একেবারেই নিজের মত করবার কোনো চেষ্টা করিনি। এবারে লেখা-টেখা কিছু হবে কি না জানি না, আর কত দিনই বা একঘেয়ে জীবনের কাহিনী লেখা যায়? নিজেকে নানা মূর্ত্তিতে reproduce করা ঔপন্যাসিকের একটা কাজ বটে, কিন্তু নিজের experience ত চারখানা দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ, এর আর কত ছবি আঁকা যায়? জোর ক'রে লিখতে গেলে অন্য অনেকের মত দুই সতীনের গল্প নয়ত পতিব্রতা হিন্দুনারীর জীবনকাহিনী লিখতে হয়। দুটোর একটাও আমার মনের মত নয়, এবং ও বিষয়ে জ্ঞানও আমার অত্যন্ত কম।

তবে এ বৎসর মনটা একবার বেশ নাড়া পেল কংগ্রেসের অধিবেশনটাকে অবলম্বন ক'রে। বাংলা দেশের বেশীর ভাগ মেয়ের কাছেই দেশ একটা নাম বই আর কিছু নয়, কারণ যাকে চোখে দেখা যায় না, তাকে মনেও দেখা যায় না। এবার কিন্তু এই দেশকে আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। ভারতবর্ষের মানুষকে এমনভাবে মিলতে আগে আর কখনও দেখিনি। সেই বিরাট্ সভায় ব'সে, চারিদিকে নানা দেশী নানারকম মুখ দেখা, খুবই ভাল লেগেছিল। বুকের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পাচ্ছিলাম, যেন অনেক কাল পরে নিজের ঘরে ফিরেছি। এই ঘর থেকে আমরা চিরকাল বঞ্চিত, ছোট, অতি সঙ্কীর্ণ ঘরে বন্দিনী যারা, বিশ্বের ঘর, দেশের ঘর থেকে তারা চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত।

বছর তিন আগের কংগ্রেসের সঙ্গে বাইরের দিক্ দিয়ে এবারকার কংগ্রেসের খুবই সাদৃশ্য। জায়গা এক, চেহারা এক, কিন্তু প্রভেদও যে না ছিল, তা নয়। মণ্ডপের ভিতরের সজ্জায় উজ্জ্বল রংএর বদলে শাদার প্রাদুর্ভাব। ভাবভঙ্গি সবই অনেকটা আলাদা।

প্রথমদিন যখন গান আরম্ভ হ'ল তখন অমলা দাশকে মনে পড়ল। তাঁর নেতৃত্বে গান যেমন জমেছিল এবার তার কাছেও লাগল না। তারপর miss করলাম আর একজনকে (রবীন্দ্রনাথ) যিনি সেবার কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন। এবারে তাঁর কতগুলো নিন্দা-বাদ শুনেই কানকে সার্থক করতে হ'ল। প্রথম দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল Mrs. Besantকে ধিক্কার দেওয়া ও মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক ধিক্কারদানকারীদের তিরস্কার। ওঁর নাম অনেক শুনেছি, এই প্রথম চোখে দেখলাম। ছোটখাট মানুষ, শাদা মোটা কাপড়ের কোট ও টুপি পরা (পরবর্ত্তীকালে বেশভূষা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল, একেবারে অন্যরকম দেখাত)।

বছর তিন আগে যেখানে President রূপে দাঁড়িয়ে অত সমাদর পেয়েছিলেন, সেইখানে দাঁড়িয়েই আজ এই অপমান সহ্য করলেন মিসেস বেসাণ্ট। অসভ্যতাটা host রূপী বাঙালীরা start করাতেই ব্যাপারটা অত্যন্ত রকম শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা চুপ ক'রে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন, প্রতিবাদ করলেন না বা নেমেও পড়লেন না, রঙ্গমঞ্চ থেকে। গান্ধিজি তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালেন এবং তীব্রভাষায় অপমান-কারীদের তিরস্কার করতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, যাঁরা এখানে নিজেদের জন্যে justice চাইতে এসেছেন, তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে অন্যের প্রতি justice করা। মাত্র দু'চার মিনিট বকুনিতেই কাজ হ'ল আশ্চর্য্য। প্রায় দক্ষযজ্ঞ বাধতে বাধতে সব একেবারে চুপ হয়ে গেল। সভার কাজ আবার চলতে আরম্ভ করল। সভাপতিকে (পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু) অনেক কাল আগে ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, এখন দেখলাম চেহারা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে অন্যসব যেমন হয়ে থাকে তাই হ'ল, diversion-এর মধ্যে বাঙালী ও ভাটিয়া স্বেচ্ছাসেবকদল পরস্পরের সঙ্গে একপালা মাথা ফাটাফাটি ক'রে নিল। চোখের সামনে ব্যাপারটা খুবই সঙ্গীন মনে হয়েছিল এবং ভয়ও খানিকটা পেয়েছিলাম কিন্তু পরে খবরের কাগজওয়ালারা ব্যাপারটাকে এমনি তুচ্ছ ক'রে ফেলল যে তখন ভেবেই পেলাম না যে আমিই তিলকে তাল ভেবেছিলাম না তারাই তালকে তিল করল। চামেলী দিদির (জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী) কপালে খানিকটা প্রশংসা জুটে গেল। মেয়েদের দিকে গেট আগলে দাঁড়িয়েছিলেন বলে একদল তাঁকে দেবী চৌধুরাণী ব'লে ফেলল, আর এক দল প্রায় ব্যাপারটার কোনো noticeই নিল না। আসলে অবশ্য তাঁর স্থান এই দুইয়ের মাঝামাঝি হওয়া উচিত ছিল। যাক, সেদিন বাকি সময় নিরুপদ্রবেই কাটল।

পরদিন চারদিকে নানা ভীতিজনক গুজব শোনা সত্ত্বেও যাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। যদিও গাড়ীর ভীড়ের মধ্যে প'ড়ে প্রায় কলেজ ষ্ট্রীটেই থেকে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে কি অসংখ্য মানুষের মেলা, গাছগুলোর উপরে সুদ্ধ এমন ক'রে মানুষ উঠেছে যে পাতা দেখা যায় না।

এই দিনই প্রথম শ্রীযুক্ত গান্ধীর বক্তৃতা প্রথম

শুনলাম। এইটুকু মানুষ যে কিসের জোরে এমন "জনগণমন অধিনায়ক" হতে পেরেছেন, তা খানিক বোঝা গেল। যতক্ষণ বলেছিলেন কেউ একটি টুঁ শব্দ করেনি। তাঁর সহকারী মৌলানা শওকৎ আলির চেহারাখানা দেখে রামায়ণের অতিকায়ের কথা মনে হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতা শোনা অবশ্য ঘটে ওঠেনি, কারণ সেদিন বড়ই তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম। চেনাশোনা মানুষ ওখানে ঢের দেখলাম, মীরা[৩] সঙ্গেও একদিন দেখা হল।

দেশ যে কেবল একটা কথা মাত্র নয়, তা বুঝলাম। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তিনিও যেন এই কথাই বোঝাতে চাইলেন। ইনি একদিন আমাদের স্কুল দেখতেও গিয়েছিলেন। বেশ লম্বা-চওড়া বিরাট্ আকৃতি।

11th November, Wednesday. দিন পাঁচেক হ'ল কলকাতায় ফিরে এসেছি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইখানেই কাটে, মাঝে বড় জোর পঁচিশটা দিন বাইরে ছিলাম, কিন্তু ফিরে এসে এখনকার অভ্যস্ত জীবন-যাত্রাটাকে আবার ছাড়া কাপড়ের মত টপ ক'রে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছি না। চারিদিক থেকে যেন কাঁটা ফুটছে, মাঝে মাঝে কোটর ছেড়ে না বেরিয়েও পারি না অথচ বেরিয়ে আবার ঢোকার যন্ত্রণাটা বড় অসহ্য।

বোধ হয় ১৯শে কি ২০শে অক্টোবর এখান থেকে পাঞ্জাব মেলে এলাহাবাদ যাত্রা করলাম। নবমীর দিন ব'লেই বোধ হয় স্টেশনে কিছু ভীড় দেখলাম না। একটা পুরো compartment আমরা reserve চেয়েছিলাম কিন্তু পাই নি, গোটা চার berth নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। গাড়িতে বাজে লোক প্রচুর উঠল। প্রথমেই দু'টি এমন অপূর্ব্ব পদার্থ উঠলেন যে তাঁদের রূপ দেখেই আমার চক্ষুস্থির। বাবার কাছে পরে শুনলাম যে তারা নীচু শ্রেণীর লোক, কলকাতায় ব্যবসা করে, সেই উপলক্ষ্যেই কাশী যাচ্ছে। সুখের বিষয় তারা এক ষ্টেশন পরেই নেমে গেল। অতঃপর ত বিছানা কম্বল খুলে নিয়ে গুছিয়ে শোওয়া গেল। ভেবেছিলাম নির্ব্বিবাদেই পৌঁছব তা বিশেষ হ'ল না। লোক ত যথেষ্টই উঠল, গাড়ির ঝাঁকড়ানিতে একবার ক'রে ঘুম ভেঙ্গে যায় আর তাকিয়ে দেখি অনেকগুলি নূতন মনুষ্য মূর্ত্তি গাড়ির ভিতর ব'সে আছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে নিজেকে যথাসাধ্য অবলুপ্ত ক'রে আবার ফিরে শুই। সে যে কি বিষম অসুবিধা তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। রথে পথে নিয়ম নেই শুনি, তাই ব'লে একঘর অচেনা অজানা লোকের মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা খুব যে আরামদায়ক নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। দু'চারটি "গোরা"ও উঠে পড়লেন। সকলে ত সন্ত্রস্ত। যা হোক গোলমাল কিছু করল না। একজন তার মধ্যে বোধ হয় officer, দিব্যি মেঝের উপর প'ড়ে ঘুম লাগাল, কখন এক সময় আবার টুপ ক'রে নেমে গেল।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বিচিত্র যাত্রীর আমদানি হতে লাগল। একব্যক্তি এতক্ষণ bunk-এ চ'ড়ে ঘুম লাগাচ্ছিল, হঠাৎ উঠে ব'সে কাঁকড়ার মত বড় বড় চোখ বের ক'রে এমন বিস্মিত দৃষ্টিতে তার সহ-যাত্রিণীদের দিকে চেয়ে রইল যে দেখে বেজায় হাসি পেল। যাহোক ট্রেনের মধ্যেই একটু চা জুটে গেল, খেয়ে চুপ-চাপ ব'সে রইলাম। একটি অতি objection-able type-এর মাড়োয়ারী উঠে খানিকক্ষণ বকাবকি করল, তবে বেশীক্ষণ ছিল না, মির্জ্জাপুরে নেমে গেল। সেইখানে সপরিবারে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক উঠলেন। গৃহিণীটি একেবারে ইন্দ্রাণীর মত দেখতে। বাংলা দেশে সুন্দরী যে নেই তা নয়, তবে এরকম regal beauty চোখে পড়ে না বিশেষ। গুটি তিনেক মেয়ে সঙ্গে, তারা বাপের গুণেই বোধ হয় চেহারা হিসাবে বেশী সুবিধা করতে পারে নি। সবচেয়ে ছোটটা বছর আড়াই কি তিনের হবে। সে দেখতে মন্দ নয়, গোল-গাল আছে, যদিও তার হরিণ-নয়না মায়ের কাছে লাগে না। তবে তার বয়সে রূপ না হলেও চলে। বাস্তবিক ঐটুকু মানব-শিশুর আবির্ভাবে গাড়ির ভিতরকার আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল। এতক্ষণ সবাই সবাইকার উপরে বিরক্ত হয়ে হাঁড়ি মুখ ক'রে বসেছিল, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ঐন্দ্রজালিকটির আবির্ভাবে সকলের মুখই প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে উঠেই ছোট হাতখানা তুলে সবাইকে সেলাম করল, বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে একবার হাতখানা তুলে শাসিয়ে বলল "পিট্ দেব।" তাতেই সবাই মুগ্ধ, যেন এমন কথা, কেউ কখনও শোনে নি। শিশু হওয়ার সৌভাগ্য দেখি সম্রাট্ হওয়ারও বাড়া।

যমুনা ব্রীজ পার হওয়ার সময় মনের ভিতর কত কি যেন ন'ড়ে চ'ড়ে উঠল। এই নদীটির সঙ্গে কত দিনের পরিচয়। যদিও জন্মেছিলাম কলকাতায়, তবু আমার আসল জন্মভূমি এলাহাবাদেই, এখানেই আমার বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে পরিচয়।

৩। রবীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী।

ক্রমে গাড়ি এসে ষ্টেশনে দাঁড়াল। এখানের কিছুই বদলায় নি। বামনদাসবাবু (মেজর শ্রীবামনদাস বসু, আই এম এস) দেখলাম নিজেই নিতে এসেছেন। জিনিষপত্র ট্রেন থেকে নামান ও গাড়িতে ওঠানর হাঙ্গামের মধ্যে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিলাম। রাস্তা দিয়ে যখন চলেছি তখন দেখলাম সেই আমাদের সুন্দরী সহযাত্রিণীও সপরিবারে চলেছেন। রাস্তাঘাট সব ঢের বদ্‌লে গিয়েছে, দু'একটা জায়গা ছাড়া কোথা দিয়ে যে গেলাম তা কিছুই প্রায় বুঝতে পারলাম না।

ওঁদের বাড়ী যখন এসে পৌঁছলাম, তখন রোদে কাঠ কাটছে। রাস্তা দিয়ে গোটা কতক হাতী আসছে দেখে তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে ওদের সামনের চওড়া বারান্দায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম। শুনলাম আজ রামলীলার মিছিল বেরোবে, তারই জন্যে এই অতিকায় জীবগুলি চলেছে। কলকাতায় থেকে থেকে হাতী ব'লে যে একটা জানোয়ার আছে তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। অতঃপর বাড়ীর ভিতর ঢোকা গেল।

28th November. এলাহাবাদের কথাটাই শেষ করা যাক, অন্য কথা পরে হবে। যেদিন পৌঁছলাম ওখানে, সেদিন বিজয়াদশমী। রামলীলা তখন পুরোদমে চলে। আজকে বড় মিছিল বেরোবে। তাই বাড়ীর ভিতর ঢুকে দেখলাম সেই বিস্মৃতপ্রায় বাল্যকালে যেমন দেখেছি, ওঁদের বাড়ীর বারান্দায় আর ছাদে মিছিল দর্শনোৎসুক অতিথিদের জন্যে মাদুর শতরঞ্চি পেতে জায়গা করা হচ্ছে। কিন্তু বাড়ীর অবস্থা আর তেমন নেই। সেই বাড়ী ভর্ত্তি লোক, সেই আনন্দ উচ্ছলতা দেখা যায় না। উপরি উপরি শোক আর যন্ত্রণা পেয়ে পরিবারটা কেমন যেন বদ্‌লে গেছে। সবাইকার মুখ ম্লান, কষ্টে-সৃষ্টে যেন যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজ করছে। আমাদের অবশ্য মেয়েরা আদর-যত্ন করেই বসাল, তবু কেমন যেন কুণ্ঠিত লাগল। যাক, উঠে পড়ে স্নানটানের চেষ্টা করতে লাগলাম। শ্রীশবাবুর স্ত্রীকে বিধবাবেশে এই প্রথম দেখলাম। সেই একদিন আর এই একদিন। পৃথিবীতে মানুষ ভাগ্যের ঘুঁটি বই আর কিছু নয়।

নাওয়া-খাওয়া ত সারা হ'ল কোনক্রমে। ওঁদের নব প্রতিষ্ঠিত জগৎ-তারণ স্কুলের অনেক গল্প শুনলাম। শিক্ষয়িত্রীরা প্রায় সবাই আমার চেনা, কেউ সঙ্গে পড়েছে, কেউ উপরে বা নীচে পড়েছে। তবে এখানে এসে তাদের ধরণ-ধারণ অনেকটাই বদ্‌লে গেছে। এই ব্যাপারটা কলকাতার বাইরে, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের বাইরে প্রায়ই ঘ'টে থাকে দেখি। বিকেল হতে না হতে লোকজনে ওদের বাড়ী ভ'রে গেল। আমার তখনও বেশ ক্লান্ত লাগছিল, কাজেই ঐ ভীড়ের মধ্যে না ঢুকে আমি উপরের একটা ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে জগৎ-তারণ স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের আবির্ভাব হওয়ায় উঠে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সবাই এখানে মিসেস বা মিস অমুক নামে চলছেন, আমি যদিও পরিচিত ডাকনামগুলোই চালিয়ে চললাম। আমার এক প্রাক্তন ছাত্রী এসে মাথায় কাগড় এঁটে আমাকে একখানা খাড়া নমস্কার ক'রে ফেলল।

ইতিমধ্যে রামলীলার মিছিল ত এসে পড়ল। হাতী, ঘোড়া, উট আর মানুষের সে এক মিশ্রিত ভীড় আর কোলাহল। কত কি যে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। দেবদেবীরা সংখ্যায় এত বেশী যে অর্দ্ধেককে চিনতেই পারলাম না। ঝান্সীর রাণী, গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আশ্রমের দৃশ্য, এও ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় ত তিল ফেলবার ঠাঁই নেই। রাস্তার দু'ধারের বাড়ীগুলো থেকে মানুষ ঝুলছে, যেমন ক'রে গাছের ডাল থেকে বাদুড় ঝোলে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা, তারও আবার দু'ধারে খোলা ড্রেন, কাজেই চলা-ফেরার যা সুবিধা! তাই মধ্যেই ধুলো উড়ছে, মানুষ চলছে, হাতী-ঘোড়া চলছে, ছেলেপিলে চেঁচাচ্ছে, খাবার বিক্রী হচ্ছে, ফুল বিক্রী হচ্ছে। এক একটি ক'রে দেবদেবীর চতুর্দ্দোলা যাচ্ছে আর তাঁদের জয়ধ্বনিতে আকাশ ফেটে পড়ছে।

মনে পড়ছিল নিজের ছেলেবেলার কথা। তখন এই দেবদেবীগুলিকে কি সুন্দরই লাগত চোখে। মনে হ'ত, সত্যই যেন অমরাবতী থেকে এরা সুরলোকের সৌন্দর্য্য নিয়ে নেমে এসেছে। আর এখন disillusioned চোখে দেখলাম কতগুলো কুরূপ কাটখোট্টা ছেলেকে রঙ আর গহনাকাপড়ে যথাসাধ্য ঢেকে কাঁধে ক'রে নিয়ে চলেছে। হায়রে, absolute beauty কোথাও কি নেই? সবই দর্শকের চোখের রঙীন চশমার উপর নির্ভর করে? সে সবদিনে যতক্ষণ অবধি না মিছিলের শেষ হাতী বা রথটা পার হয়ে যেত ততক্ষণ চোখ আর কোথাও যেত না, আর এখন চোখ কেবলই এক জিনিষ থেকে অন্য জিনিষে ছিটকে বেড়াচ্ছে। ওখানে একটা ছোট নাদুস্‌-নুদুস্‌ খোকা, সেখানে একটি

সুন্দরী তরুণী। ওর গায়ের ওড়নাটা কি সুন্দর, ঐ কালো চোখীর সুরমা-পরা চোখ কি চমৎকার, এই কেবল দেখছি। যখন কেউ চেঁচিয়ে কোন বিশেষ দেবদেবীর দিকে নজর আকর্ষণ করছে, তখনই বড় জোর সেদিকে চেয়ে দেখছি।

সকলের উপর এই কথাটাই খালি মনে হচ্ছিল, এই ত আমাদের কত শতাব্দীর পুরণো ভারত, এই যে চোখের সামনে লোকের মেলা, রাস্তার দু'দিকে খোলার চালের বাড়ী, দূরে কোথাও বা একটা মন্দিরের চূড়া বা একটা মস্‌জিদের মিনারেট্‌ এ সবই ত আমাদের নিজের দেশের, সাগরপারের প্রভুরা কিছুই বয়ে নিয়ে আসে নি, আগের থাকতেই ছিল। মেয়ে-পুরুষের পোশাকেও বিদেশীয়ানা নেই, সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর চোখের উপর ইতিহাস আর উপন্যাসে পড়া পুরনো দেশের ছবি ভেসে উঠছে। আর বাংলা দেশে, যেখানে আর্য্যামি আর সনাতনপন্থীর চীৎকারে কানে তালা লাগছে, সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তার দিকে চেয়ে থাক, দেখবে ট্রাম চলছে, মোটর চলছে, ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলছে, কালো কালো সাহেব চলেছে কিন্তু তোমার সনাতন ভারত কোথায়? কেবল বক্তার কণ্ঠে আর লেখকের কলমে। তা ছাড়া বাড়ীঘরদোর, রাস্তাঘাট, যানবাহন, আহার-বিহার কোথাও নেই।

ইতিমধ্যে মহা হৈ হৈ ক'রে রামলক্ষ্মণের হাতী পার হয়ে গেল অবিরাম পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ব্যস, তারপর থেকে সব কমতে লাগল। লোকজন দেখতে দেখতে স'রে পড়ল। ফুলওয়ালার অত্যুগ্র উৎসাহ এবং ফুলের রাশ দুই লুপ্ত হয়ে গেল। বাড়ীর বারান্দা থাম, রেলিং, ছাদ ক্রমে আবার নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ করল। কোলাহলও একেবারে চুকে গেল।

চারিদিক্‌ শান্ত হতেই হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। এখানেই আমার জীবনের আদিপর্ব্ব সমাপন করেছি, এই মলিন ভাঙা খোলার ঘরের সারি, এই রাস্তাঘাট এরাই আমার কত প্রিয় ছিল। প্রথম জীবনে মনের কত শিকড় দিয়ে এই দেশকেই আমি আঁকড়ে ছিলাম। চ'লে যাবার সময় কি ভয়, কি ব্যাকুলতার সঙ্গেই এখান ছেড়ে গেলাম। আর এখন যুগ উল্‌টে ফিরে এসে এমন মনে হচ্ছে কেন? এ যে "নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়া।" এদের কেন আর নিজের ব'লে মনে হচ্ছে না?

অন্ধ বালক

(Colley Cibber—The Blind Boy)

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ওগো তোমরা আমায় বলো আলোক কা'কে বলে,
কক্ষণো ভোগ করবো নাকো যাকে ;
দেখার আশীর্ব্বাদটা তবে মিলবে রে কি হ'লে,
বলো অন্ধ দুঃখী বালকটাকে !

চমকানো সব জিনিস দেখে' তোমরা কত বলো,—
কিরণ দিচ্ছে সূর্য্য উজলভাবে ;
ভাবছি আমি গরম তাকে, তৈরি কিসে হ'ল
দিবস এবং রাত্রি তাহার ভাবে !

আমার দিবা কিংবা নিশা নিজেই আমি করি
যখন আমি ঘুমোই কিংবা খেলি ;
যখন জেগে সময় কাটাই, একটুও না নড়ি,
দিনটা আমার যায় না আমায় ফেলি' ।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার সাথে ঢের শুনেছি কানে—
দুঃখে আমার শোনাও হতাশ্বাস ;
তোমরা জেনো ধৈর্য্য সহ সহ্য করি প্রাণে
যেই ক্ষতিটা অজ্ঞাত মোর পাশ ।

যা নেই আমার তাকে পাবার করবো নাকো লোভ
নষ্ট করতে আমার মনের সুখ !
এইরূপে গান যখন করি, তখন আমি রাজা,
হই যদিও অন্ধ আহাম্মুক ।

কবির গৃহ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কোন্ সাজে তুই সাজবি এবার
বল্ না কবির গৃহ,—
আশমানী—লাল—জর্দা—সফেদ—
কোন্‌টি রে তোর প্রিয় ?
আহা, কেমন লাগবে বেড়ে
ঝুম্‌কো লতার কল্কাপেড়ে ?
রঙনে তোর অঙ্গশোভা
হবেই রমণীয়।

কট্‌কী—ঢাকাই—কাঞ্জিভরম—
বল্ না কী তোর চাহি ?
কোমল কচি শ্যামল ঘাসের
শাড়ির অভাব নাহি।
বিহগ তোরে গান শুনাবে,
ভ্রমর কানে গুণ্‌গুণাবে,
কমল-ফোটা পুকুর-জলে
উঠবি অবগাহি'।

পাতাবাহার দিবে এবার
রূপের বাহার খুলে,
হায় গরবী, লাল করবী
পরবি চিকণ চুলে।
কনকচাঁপার মদির ঘ্রাণে
অধীর করে তুলবে প্রাণে,
লাল গোধূলি কপোলে তোর
আবীর দিবে গুলে !

ওরে কবির মাটির গৃহ,
নেহাৎ গরীবখানা,
না থাক্ সোনা—ফুলের সাজে
সাজতে কি তোর মানা ?
পল্লী চিরসঙ্গী যাহার,
বল্লীবেণী, তুই যে তাহার,—
মিলবে কোথায় মুক্তামণি,—
আছেই সেটা জানা।

হেমন্তে

মনোরমা সিংহরায়

তোমায় চোখে দেখেছিলাম
অসীম নীলাকাশ।
হৃদয়মাঝে উদ্বেলিত
সাগর ঢেউ যেন ॥
তুমি শুধুই শান্ত থেকে গেলে।
চঞ্চলতা পেরিয়ে গেলে
কেমন অবহেলে ?

* * * *

হেমন্তে এই ধান ছড়ানো মাঠে
আজকে বলো দেখি
আকাশ-ভরা গেরুয়া রঙ যেন
রাঙলো মন একি ?
এতদিনের পথের শেষে এসে
হঠাৎ তোমার পড়ল মনে কী যে
দাঁড়িয়ে গেলে শেষে ?
উদ্বেলিত নদী এখন শান্ত হয়ে গেছে,
বুঝতে পারো গভীর চোখ মেলে ?

নিজেকে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছেড়েছ ঘাটের ঘাট, কনকনে শীতের বাতাস।
কাঁপে নৌকা টলোমলো, অদূরেই তো গঙ্গাসাগর।
কেন ভয় ? আগে পিছে কত নৌকা চলে,
তুমিও তাদের সঙ্গী। দাঁড় টানো, পাল তুলে দাও,
না হয় স্রোতের টানে চোখ বুঁজে হাল ধরে থাকো,
দেখো কোথা নিয়ে যায়। শুধু ঢেউ আর ঢেউ।
আকাশ আবছা হলো। একে একে স্মৃতির স্বপনে
তোমারো আবছা চোখ। হাড় কাঁপে উত্তুরে
হাওয়ায়।
তবু চলো। ভুল করে কতবার গেছ আঘাটায়,
চড়ায় ঠেকেছ কভু, আবার তো মুক্তি পেয়ে গেছ।
এবারেও পাবে মুক্তি। কে জানে, হয়তো শেষ বার
এ অনন্তে, এ অকূলে কেবা কার রাখবে খবর ?
সব খবরের অন্তে আছে এক মহাসমাধান।

দ্রৌপদী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

পঞ্চপতি-গৌরবিনী কৃষ্ণ-সখ্য-ধন্যা
যজ্ঞোত্থিতা যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণ-বেণী-ধৃতা
চির-প্রজ্জ্বলন্ত নারী। ভারত-সংহিতা
সর্ব্ব-গণ্য গুণে তা'রে করেছে অনন্যা।
কুরুক্ষেত্র-বজ্র-ঝঞ্ঝা-বাত্যা-ক্রুদ্ধ বন্যা
কেন্দ্রীভূত তা'রে ঘিরে। তবু অশঙ্কিতা
গরীয়সী—মহিয়সী বিচিত্র বনিতা
বহ্নিময়ী। দৃপ্ত বলে সর্ব্ব-অগ্রগণ্যা।
শ্রেষ্ঠ-বৃত্তি-বিভূষিত পঞ্চপতি তা'র
সঞ্চালিত অনিবার পঞ্চগ্রহ সম
রৌদ্রময়ী দ্রৌপদীরে কেন্দ্রবিন্দু করি'।
দাম্পত্য—সতীত্ব-শক্তি এ কী দুর্নিবার !
রহস্যে যে কৃষ্ণা-মূর্ত্তি চির অনুপম ;—
পাঞ্চালীর প্রাণোচ্ছ্বাসে প্রাণ ওঠে ভরি'।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নির্ব্বাচনী ঝড়ে কংগ্রেস'ভ্যারেণ্ডা' বৃক্ষের পতন !

ইহা যে ঘটিবে, তাহার সঙ্কেত আমরা বিগত প্রায় দশ-বারো মাস পূর্ব্ব হইতেই বার বার দিয়া আসিতেছি কিন্তু শক্তি-মদমত্ত বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্ব তাহা পরম ঘৃণার সহিত অবহেলাই করিয়াছেন—আমাদের কথাকে মনে করিয়াছিলেন উন্মাদের প্রলাপ, কিংবা দেশদ্রোহীর প্রচার মাত্র। পশ্চিম বাঙ্গলার কংগ্রেসের ভাগ্যে এবারের নির্ব্বাচনে যে-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা যে এত ব্যাপক ভাবে সমগ্র ভারতেই ঘটিতে পারে তাহা অবশ্য আমাদের ধারণার বাহিরে ছিল, স্বীকার করিব।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের 'হাইডা'বৃত পৃষ্ঠে যে নির্ব্বাচনী ঝাঁটা পড়িয়াছে - তাহার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী 'বঙ্গ সম্রাট' নামে খ্যাত একদেশদর্শী নেতা ! অক্ষম ব্যক্তির, অযোগ্য-মানুষের হাতে হঠাৎ অভাবনীয় এবং অতিরিক্ত ক্ষমতা আসিয়া গেলে—স্বভাবতই সেই মানুষের মানসিক ব্যালান্স নষ্ট হইয়া যায়, এবং সে যাহা নয়, কখনো হইতে পারে না, (কারণ বৃহৎ—হইবার কোন যোগ্যতাই তাহার নাই)—সে নিজেকে তাহাই মনে করিতে অভ্যস্ত হয়। ক্ষুদ্র ভেক যেমন নিজেকে হস্তী-সমান কল্পনা করিয়া নিজেকে স্ফীত করিতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ একটা শেষ সীমায় উপনীত হইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া ভেক-জন্ম পরিত্যাগ করে ! আমাদের এই বঙ্গ-সম্রাট বা বঙ্গেশ্বর নামক ভেকটিরও আজ সেই দশাই ঘটিল। ভেক নিজেও মরিল সঙ্গে সঙ্গে কেবল এ রাজ্যেই নহে, ভারতের অন্যান্য আরো আটটি রাজ্যেই কংগ্রেসী দুঃ-শাসনের অবলুপ্তি ঘটাইল ! এই একটি মাত্র মহৎ-কর্ম্মের জন্য আমরা ভেক মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

নির্ব্বাচনে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমবেদনা ছাড়া আর কিই-বা আমাদের জানাইবার আছে। রাজনৈতিক মতবাদের সহিত আমাদের সহিত যাঁহাদের ঐক্য নাই—আদর্শ এবং পথের মিলও যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের নাই কিংবা হয় না, তাঁহাদের প্রতিও আমাদের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ নাই, হিংসা করিবারও কিছুই থাকিতে পারে না, কাজেই আমাদের মতের বিরুদ্ধবাদীদের—পরাজিত যাঁহারা—সকলকেই সমবেদনা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাদের দেশের সাধারণ নির্ব্বাচনের আসরে দেখিতে পাইব এই আশাই করিব।

একদা-মহান কংগ্রেসের, অধুনা অস্তি-হীন-কংগ্রেসের বড় বড় কয়েকটি মাথা নির্ব্বাচনের গিলোটিনে কাটা গিয়াছে—ইহা সত্যই দুঃখজনক, কিন্তু বিস্ময়কর নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসী নেতৃত্বকে বহুবার বহু ভাবে সতর্ক করিয়াছি, দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা মাটিতে নামিয়া অনুভব করিতেও বলিয়াছি। বলিয়াছি, অনাবশ্যক নীতিকথা এবং আদর্শবাক্য দ্বারা মানুষকে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে। কিন্তু, দীর্ঘ বিশ বৎসরের শক্তি-সিংহাসনে বসিয়া কংগ্রেস ভুলিয়া যায়—মানব জীবনের উত্থান-পতনের অনিশ্চয়তার বিষয় ! কংগ্রেস নেতৃত্ব স্থির নিশ্চয় ভাবিয়াছিল যে, ভারতে কংগ্রেস রাজত্ব—পূর্ণ-পরাক্রমেই চলিতে থাকিবে এখনও বহু যুগ ধরিয়া ! কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, কংগ্রেসের পায়ের তলা হইতে যে মাটি সরিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার মত অবস্থাও জ্ঞানবুদ্ধি ও শক্তি-মদমত্ত কংগ্রেসী নেতৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে !

কংগ্রেসের বৃহৎ কয়েকজন নেতার পতনে আমরা দুঃখিত হইয়াছি, ইহা বলা মিথ্যাচার হইবে—কিন্তু সত্যই দুঃখবোধ করিতেছি এই দেখিয়া যে—দেশের

সাধারণজন এই সব 'মহান' কংগ্রেসী নেতার নির্ব্বাচনী পরাজয়ে কি বিষম উল্লসিত হইয়াছে—দলে দলে ঢাক, ঢোল, ব্যাণ্ড বাজাইয়া, পথে পথে কংগ্রেসের বিশেষ বিশেষ নেতার পরাজয়ে আনন্দ-উল্লাস শোভাযাত্রা করিয়াছে!

এই দৃশ্যে—কংগ্রেসের কি কিছুই শিক্ষা করিবার নাই? আমাদের দেশের সাধারণ লোক সাধারণত পরদুঃখ-কাতর—কিন্তু কংগ্রেসী কয়েকজন উচ্চ-মার্গীয় ব্যক্তির পরম দুঃখের দিনেও সেই সাধারণ মানুষই আজ এত আনন্দ-মুখর কেন? ইহার সোজা জবাব এইটুকু মাত্র যে, কংগ্রেস জনগণের মন হইতে আজ নির্ব্বাসিত। জনগণের এই বিশ্বাসই হইয়াছে যে—কংগ্রেস আজ অনাচারে পূর্ণ এবং কংগ্রেসী নেতৃত্ব বিবিধ প্রকার অনাচারীদের পৃষ্ঠপোষকতাই করিতেছে। ইহার বেশী বলার কোন প্রয়োজন নাই। দেশের লোকই যথাকালে এবং যথাস্থানে, প্রয়োজন বোধ করিলে, কংগ্রেস-কংগ্রেসীদের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে।

এই প্রসঙ্গে বিধান এবং লোক সভায় যাঁহারা নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া যাইতেছেন এবং অ-কংগ্রেসী যাঁহারা নূতন সরকার গঠন করিয়াছেন আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের প্রাক্-নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করিবেন। একথাও সকলে যেন মনে রাখেন যে—জনগণ, অবসর-অবকাশ মত অতি শক্তিমানকেও শিক্ষা দিতে পারে, জানে এবং দিয়াও থাকে! বর্ত্তমানে ইহাই যথেষ্ট।

এই সঙ্গে সংযুক্ত দলের অ-কংগ্রেসী সরকারকে স্বাগত, শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

কলিকাতার ভবিষ্যত কি?

গত দশ বৎসরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক আসিয়াছে এবং এক প্রকার স্থায়ী ভাবেই কলিকাতায় বসবাস করিতেছে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর কলিকাতায় ৫৮ হইতে প্রায় ৬০ হাজার বহিরাগত আসিয়া পাকাপাকি বাসা বাঁধিতেছে। এই বহিরাগতদের অধিকাংশই এখানে রুজিরোজগারের কারণেই আসিতেছে এবং একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়াছে ইহারা কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর অন্তত ৪০।৪৫ কোটি টাকা মনি অর্ডারযোগে নিজ নিজ গাঁও এবং শহরে প্রেরণ করিয়া থাকে। অন্যভাবেও বহু কোটি টাকা কলিকাতা হইতে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 'চালান' হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলে—শতকরা ৫০।৫৫ ভাগ চাকরি অবাঙ্গালীরাই দখল করিয়াছে—এবং এই শতকরা 'মাত্রা' ক্রমশ বৃদ্ধি মুখেই চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শিল্প-প্রধান শহরগুলিতেও বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী শ্রমিকদের অবস্থা একই প্রকার। এমন কি কোন কোন কলকারখানায় বাঙ্গালী শ্রমিক শতকরা ১০।১৫ জনও হয়ত পাওয়া যাইবে না, অথচ বাঙ্গালী শ্রমিক, দক্ষ এবং অদক্ষ, যে কম আছে তাহা নহে।

সি-এম-পি-ও'র রিপোর্টে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে অসম্ভব জনসংখ্যার চাপ, বহুকালের বহু অবহেলা এবং নাগরিক জীবনের নিম্নতম সুখ-সুবিধার একান্ত অভাবই—কলিকাতাকে এক সাংঘাতিক সংকটের সম্মুখীন করিয়াছে—এবং কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাইতে হইলে অবিলম্বে, কেবল মাত্র প্ল্যান প্রস্তুতেই বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া বাস্তবে সমস্যার সমাধানে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, অন্যথায় কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ এবং সেই সঙ্গে সমগ্র পূর্ব্ব ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো চিরতরে ধসিয়া যাইবে। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও বাস্তবে দেখা যাইতেছে কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা কলিকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙ্গালী জাতির প্রতি সামান্যতম করুণা প্রদর্শনেও প্রায় সর্ব্ব সময় একটা কঠিন এবং বিরূপ মনোভাবের দ্বারাই পরিচালিত হইতে-ছেন। কেন্দ্রে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দিন হইতেই, একটি অতি শক্তিশালী অ্যান্টি-বেঙ্গল তথা অ্যান্টি-বেঙ্গলী দুষ্টচক্র সদা সক্রিয় রহিয়াছে এবং এই দুষ্টচক্রের দ্বারা পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে সর্ব্ববিধ হিতকর প্ল্যান-পরিকল্পনা প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, বহু প্ল্যান অঙ্কুরেই শুকাইয়া যাইতেছে।

কেন্দ্রীয় করুণার সামান্য একটা নমুনা দেখুন:

১৯৬৩-৬৪ সালে নব-হস্তিনাপুরের নব-বাদশাহগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে নিম্নতম প্রয়োজনের মাত্র শতকরা—

—১১।। ভাগ তামা

— ৭ ভাগ দস্তা

—১৭।। ভাগ টিন এবং

—২.৩ ভাগ সীসা

নগদমূল্যে ভিক্ষা দিয়াছেন।

অন্যদিকে ঐ সময় মহারাষ্ট্রকে উপরিউক্ত মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা মতই দেওয়া হইয়াছে। এ-বিষয় গুজরাটের ভাগ্য আরো ভাল। গুজরাট সব কিছুই পাইয়াছে এবং পাইতেছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো আছে। সি, এম, পি ও রিপোর্টেই জানা যায় যে :—

—১৯৫৩ জানুয়ারি হইতে ১৯৬১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র ও গুজরাটকে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৯৮টি লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গকে মাত্র ২০৪টি। ফলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের ক্ষেত্রেও পিছাইয়া যাইতেছে।

১৯৫১-৬০ – মহারাষ্ট্রে চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা ৪৫, গুজরাটে শতকরা ১৩। আর পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫ ভাগেরও কম। মধ্যপ্রদেশে বছরে মাথাপিছু গড় আয় যখন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩.৯, মহারাষ্ট্রে ৩.৭, তখন পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১.৬ ভাগ।

বিপুল বেকারী। একে চাকরির সংস্থান কমিতেছে তাহার উপর অন্য রাজ্য হইতে ভাগীদার আসিয়া জুটিতেছে। ১৯৬১ সালে খুব কমকরা হিসাবেও বৃহত্তর কলিকাতায় বেকারের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার। আধা-বেকার ৪ লক্ষ ৩০ হাজার।

রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হইয়াছে একটি মাত্র শহর এলাকায় এই বিপুল বেকারী যে সীমাহীন দারিদ্র্য ও দুর্দশার সৃষ্টি করে তাহাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য দিয়াছেও।

বিপন্ন কলিকাতা। অন্যান্য রাজ্য হইতে আগতদের অধিকাংশেরই এই শহরের স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন বা পৌর রীতি-নীতির প্রতি তেমন আগ্রহ নাই। যেমন-তেমন করিয়া মাথা গুঁজিয়া কোন মতে রুজি-রোজগারেই তাঁহারা ব্যস্ত। ফলে নগরীর স্বাস্থ্য আজ বিপন্ন।

গৃহ : ১৯৬১ সালে কলিকাতার ফুটপাথ-বাসিন্দারই সংখ্যা ছিল ৪০ হাজারের বেশি। মাথার ওপর কোন রকম একটি আচ্ছাদন যাঁহাদের ছিল তাঁহারাও প্রতি ঘরে থাকিতেন গড়ে ৫ জন। কলিকাতার শতকরা ৭৭টি পরিবারেরই গড়ে মাথাপিছু ৪০ বর্গফুট যায়গাও জোটে না।

এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে বাঁচিতে হইলে ১৯৮৬ সালের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতায় অন্তত আরও ২৫ লক্ষ ঘর দরকার। বছরে কম করিয়াও আমাদের যখন ৬০ হাজার বাড়ী প্রয়োজন তখন তৈয়ারী হইতেছে মাত্র নয় হাজারের মত। রিপোর্টে স্বীকার করা হইয়াছে সমস্যাটি এমনই বৃহৎ যে সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়াও অসম্ভব।

জল : পানীয় জলের অভাব ও গভীর নলকূপের জল সরবরাহের কথা রিপোর্টে আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র পরিশ্রুত জল সরবরাহের আশু সম্ভাবনা নাই। কারণ গঙ্গার জলে লবণের পরিমাণ এত বাড়িয়াছে যে গার্ডেনরিচে দ্বিতীয় জলকল করা যাইতেছে না। পলতায় গঙ্গার জলে লবণের ভাগ প্রতি দশ লক্ষ গ্যালনে ২,৪৮০০-তে দাঁড়াইয়াছে। (লবণের ভাগ হওয়া উচিত দশ লক্ষে ২৫০) ফলে বছরে কোন কোন সময় পলতার জল সরবরাহই বন্ধ হইয়া যাইতে পারে রিপোর্টে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করা হইয়াছে। ফরাক্কা প্রকল্প চালু হওয়ার আগে এ সমস্যা মিটিবার আশা নাই।

বন্দর, পরিবহণ : বছরে গঙ্গায় দশ কোটি ঘন ফুট পলি জমা হইয়া বন্দরের ক্রমিক অবনতি হইতেছে। বন্দরের অধোগতির চিত্র, কলিকাতার যানবাহন যন্ত্রণা, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রভৃতি মূল সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া নগরীর বাঁচার দাবি এই রিপোর্টে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সি-এম-পি-ও'র আশঙ্কা, এখনই একটা কিছু করা না হইলে কলিকাতা অতি শীঘ্রই "বৃহৎ বস্তি নগরী" হইয়া পড়িবে। তখন আর তাহার উদ্ধারের কোন আশাই থাকিবে না।

'মাষ্টার প্ল্যান'। ফোর্ড ফাউনডেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রভৃতির বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই রিপোর্টটি রচিত। বৃহত্তর কলিকাতার পানীয় জল সরবরাহ, ভূগর্ভস্থ

পয়ঃপ্রণালী এবং জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে ইহার পূর্ব্বে সি-এম-পি-ও যে মাস্টার প্ল্যান রচনা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান প্রকল্পগুলি যুক্ত হইতে পারিবে।

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনা, এমন কি আর-বিলম্ব-সহে-না এমন সব অতি-অবশ্য কারণ-গুলিও, দেখা যাইতেছে কর্তৃপক্ষের—পেনডিং ফাইলে বিবেচনার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর। এই সকল পরিকল্পনা ফাইলের কারাগারমুক্ত হইয়া কবে বাহিরের আলো আকাশ দেখিবে তাহা বলিতে পারেন একমাত্র কেন্দ্রীয় করুণাময়ের সুপুত্র এবং অতিস্নেহধন্য বিশেষ কয়েকজন যাঁহাদের মধ্যে 'অঞ্চল প্রধান' হিসাবে নাম করা চলে নব-ভারতের নবাশোক মহারাজের, যিনি হঠাৎ একদিন তাঁহার পুরাতন রাজনৈতিক পার্টিকে পুরাতন বস্ত্রের মতই পরিত্যাগ করিয়া—জবাহরলাল নামক ভারত ভাগ্য-বিধাতার স্নেহাশীর্ব্বাদে দল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন এক স্বর্গীয় বলের অধিকারী হইলেন!

মাত্র-কিছুদিন-পূর্ব্বের ভারতের রাজধানী কলিকাতা আজ অবজ্ঞাত, অবহেলিত একটি তথাকথিত রাজ্যের প্রাদেশিক একটু বড় শহর মাত্র! বিগত দিনের রাজধানী আজ 'ধনী'-ভারতের দুয়ারে ভিখারিণী, কৃপাপ্রার্থিনী, ছিন্ন-বসনা, করুণবদনা নারীর মতন দাঁড়াইয়া আছে—দুই হাত জোড় করিয়া কিছু ভিক্ষা পাইবার আশায়!

অন্ধকার কলিকাতা

একদা কলিকাতার প্রাসাদপুরী বলিয়া যে খ্যাতি ছিল তাহা কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলার মত স্নেহান্ধ জননীর আদরের অতিশয়োক্তি নয়। নয়াদিল্লীতে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কলিকাতার প্রশাসনিক মর্য্যাদা যায় সত্য, কিন্তু আভিজাত্য অটুট ছিল। চৌরঙ্গী-আলি-পুরের সঙ্গে বৌবাজার-শ্যামবাজারের বিস্তর তফাৎ থাকিলেও কলিকাতা কুৎসিত, অস্বাস্থ্যকর, ভদ্রজনের বাসের অনুপযুক্ত জঞ্জালপুরী ছিল না। উন্নতি ছাড়া অবনতি বিংশ শতকের প্রথম পাদে কলিকাতার হয় নাই—যদিও বিদেশী শাসক স্বমহিমায় তখনও বিরাজ করিতেছিলেন। কলিকাতা পৌরসভায় যখন স্বাদেশিকতার জয়-পতাকা উড়িল তখন আশা হইয়াছিল চৌরঙ্গী বুঝি ধর্ম্মতলা পার হইয়া বাগবাজার-শ্যামবাজারে পাড়ি দিবে, সে অঞ্চলের দীর্ঘকালের মালিন্য বুঝি ঘুচিবে।

কলিকাতার কপাল পুড়িয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। প্রতিরক্ষার দোহাই দিয়া ময়দানকে নিরস্ত্রপাদপ করা হইল, নানা রাজপথে যে সব গাছ ছিল সেগুলি কাটিয়া ফেলা হইল। শহরের শ্যামশ্রীও বিদায় লইল। মিত্রপক্ষের একটা বিরাট ঘাঁটি হইয়া দাঁড়াইল কলিকাতা। পথে পথে দেখা দিল পথিকের বিভীষিকা সুবৃহৎ সামরিক যান। তাহাদের দৌরাত্ম্যে নিরাপদে পথ চলা ত দায় হইয়া উঠিলই—পথও ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের মত প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। তাহার পর আসিল খণ্ডিত স্বাধীনতা। তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী বাস্তুভিটা ফেলিয়া সহায়-সম্বল হারাইয়া শরণ লইল কলিকাতা মহানগরীর। যে শহরে দশ লক্ষ লোক থাকিবার কথা, দেখিতে দেখিতে তাহার অধিবাসীর সংখ্যা হইয়া দাঁড়াইল ষাট লক্ষ। সে জনপ্লাবনে কলিকাতা যে ভাসিয়া যায় নাই সেটাই আশ্চর্য। তবে একেবারে প্রেতপুরীতে পরিণত না হইলেও কলিকাতার আর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। জল-সরবরাহে টান পড়িল, ময়লা সাফের ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইল অসার্থক, জল-নিকাশের বন্দোবস্ত অপ্রচুর। এত লোকের না মিলিল মাথা গুঁজিবার ঠাঁই, না চলাফেরার যান।

স্বাধীনতার পর কলিকাতার উপর যদি নয়া-দিল্লীর কর্ত্তাদের কিছুমাত্র কৃপাদৃষ্টি পড়িত, তাহা হইলে হয়ত আজ কলিকাতার এ-হাল হইত না। রাজ্য সরকারের পক্ষে একমাত্র নিজেদের সম্বল এবং চেষ্টায় মহাযুদ্ধের এবং দেশ বিভাগের বিষম ক্ষয়-ক্ষতির নিরাশয়ে প্রলেপ প্রদানের ক্ষমতা কখনই ছিল না, এখনো নাই! এই দুই কাজের দায়িত্ব অবশ্যই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, এখনো রহিয়াছে। দুইটির কোনটিই নিছক প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সমস্যা নয়। কলিকাতা যে উত্তর-ভারতের প্রাণকেন্দ্র—সে কথা তাঁহারা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন, কলিকাতার সঙ্কটমোচনের কোন

চেষ্টাই করিলেন না। সেই পুঞ্জীভূত অবহেলার নিদর্শন কলিকাতার পথে পথে, এলাকায় এলাকায়, বন্দরে, ষ্টেশনে, এয়ারপোর্টে, অফিস অঞ্চলেও, আবার গৃহস্থের আবাস-ভূমিতেও। সমান জমীনেও ধস্ নামিল।

নয়াদিল্লীর অজ্ঞানতিমির কোনও দিনই ঘুচিত না যদি না বিদেশীর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা জোর করিয়া কেন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত করিত। তাহার পর দেখিতে দেখিতে বিশ বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু কলিকাতার চিকিৎসা এখনো সুরু হয় নাই।

রোগ-নির্ণয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে সি-এম পি-ডি'র হাতে। এতদিনে প্রাথমিক কাজ তাঁহারা সাঙ্গ করিয়াছেন—ব্যবস্থাপত্র রচনাও সমাপ্ত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সে ব্যবস্থাপত্র রাজ্য সরকারের কাছে দাখিলও তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু যত বিচক্ষণ চিকিৎসকই ব্যবস্থাপত্র দিন না কেন, যদি ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য তাহার না থাকে তবে রোগী বাঁচিবে কেমন করিয়া? কলিকাতার উন্নয়ন-সমস্যার যে কোনও গুরুত্ব আছে সে তত্ত্ব স্বীকার করিতে পরিকল্পনাবিশারদ শ্রীঅশোক মেহতা নারাজ। সে শক্তিও তাঁহার নাই। কলিকাতার "বেসিক প্ল্যান" বা মৌল পরিকল্পনা রচিত হইল বটে কিন্তু তাহার রূপায়ণের টাকাটা যোগাইবে কে?

মহারাজ অশোক মেটা তাঁহার খাস-দখলীকৃত কোষাগার হইতে এই অর্থ কলিকাতার মত একটা প্রায় মৃত লোকালয়ের জন্য দিতে রাজী নহেন—এবং তাঁহার এই সাধু ইচ্ছায় বাধা দিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কোন মন্ত্রী এমন কি প্রধানমন্ত্রী আচায্য ইন্দিরা গান্ধীরও নাই।

রাজ্যপাল বিদায়

সংবাদে দেখা গেল যে মাস-দুই পরে ভারতের ৯টি রাজ্যের নয়-জন রাজ্যপালের এবার পাঁচ-বছরী মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের বিদায় লইতে হইবে, তবে এই নয় জনের মধ্যে কয়েকজন নাকি ইতিমধ্যে যোগ্য স্থানে পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন পেশ করিয়াছেন। কাহার কিংবা কাহাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইবে বাহিরের লোকে কেহই কিছু বলিতে পারে না, তবে কোন কোন মহলে নাকি এই ব্যাপারে কিছু বেটিং চলিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। টিপ্‌স্ মিলিলে, রাজ্যপাল পাইবেন পাঁচ বছরের জন্য পুনর্বাসন এবং বেটার মারিবেন মোটা বাজী।

রাজ্যপাল কে বা কাহারা হইবেন, এবং কি কি যোগ্যতা এবং কোন্ বিশেষ গুণের জন্য এই লোভনীয় পদ-গৌরব তথা মোটা মাস মাহিনা (টাকাটা অবশ্যই সেই পুণ্য শ্লোক অমর মিঃ গৌরী সেনের—অর্থাৎ করদাতাদের)—ষ্টেট খরচায় সুসজ্জিত, সুশোভিত প্রাসাদ—আরো বহু প্রকার সুখ-সুবিধা (অথচ—মাইনাস দায়দায়িত্ব—যাহা আছে তাহা কাগজে কলমেই অবরুদ্ধ) পাওয়া তাহা ভারত সরকারের কয়েকজনই বলিতে পারেন, এমন কি প্রধানমন্ত্রী, যিনি রাষ্ট্রপতির সকাশে রাজ্যপালের নাম পেশ করেন, তিনি বোধ হয় বলিতে পারেন না। আর রাষ্ট্রপতি ত কেবলমাত্র ডটেড লাইনে স্বাক্ষর করেন। এইসব কারণেই আমাদের মত সাধারণ লোকের রাজ্যপাল নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ কোন ঔৎসুক্য-আলোড়ন লক্ষিত হয় না। যদিও মনে মনে ঐ মাসিক ভাতাটার উপর আমাদের মত অসংখ্য দরিদ্রজনের একটা মুদ্রাগত লোভ মনে মনে থাকে।

তবে রাজ্যপাল ব্যাপারে আমাদের কিছু অন্য বক্তব্য আছে। দীর্ঘ বিশ বৎসরে স্বাধীন ভারতে একমাত্র স্বর্গত ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বাঙালী রাজ্যপাল পদে বসিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন নাই। অবশ্য ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে উত্তর প্রদেশের প্রথম রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করা হয়, তখন তিনি বিদেশে। ডঃ রায় এই মহার্ঘ্য সম্মান অতি সৌজন্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। এবং ইহার ফলেই আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যপালের শ্রদ্ধেয়া মাতা শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর এই পদে বসিবার দুর্লভ অবকাশ ঘটে।

এবারে নূতন যাঁহারা রাজ্যপাল পদ লাভ করিবেন, আশা করি সেই সৌভাগ্য-গৌরব-তালিকায় কোন বাঙালীর নাম থাকিবে না, কারণ বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের বিশাল-গদিতে সুখাসীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন, এমন কোন বাঙালীর নাম আমাদের, তথা কেন্দ্রীয় অবাঙালী জহুরী-শাসকদের চোখে পড়িতে পারে না, কারণ যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা মানুষের চর্ম্মচক্ষুতে ধরা পড়িবে

কেমন করিয়া? অতএব মনে মনে যদি কোন কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালী রাজ্যপাল-গদির প্রতি গোপনে দৃষ্টি দিতেছেন, তাহা হইলে অযথা বিলম্ব না করিয়া দৃষ্টিকোণে অন্য দিকে, সম্ভব হইলে উল্টামুখী করুন।

এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলিবার আছে। পশ্চিমবঙ্গ কার্য্যতঃ দিল্লীর একটি ক্রাউন-কলোনী মাত্র। এ-রাজ্যের যে-কোন দিকে চাহিয়া দেখুন, প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা না বলাই ভাল। হিসাব লইলে দেখা যাইবে, পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বলিতে অর্থ-সম্পদই যদি প্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সেই অর্থ সম্পদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের মালিক অবাঙ্গালী, অন্যান্য রাজ্যের, বিশেষ করিয়া রাজস্থান এবং গুর্জ্জর রাজ্যের বণিকগুষ্টি। আবার এই বণিকদের মধ্যে—মাত্র বিশেষ কয়েকটি নামকরা বণিক পরিবারই অতি-প্রধান বলিয়া সুখ্যাত, সুপরিচিত। মোট কথা এই যে, আর্থিক-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যা অবস্থা ছিল, আজ তাহা নাই—এবং এই অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইতেছে। এই গতি অব্যাহত থাকিলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক দৈন্য হীনতম হইতে আর ক্ষীণতম সময়মাত্র প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় শাসনশালা হইতে বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ, উচ্চ বেতন-ভোগী এবং সুযোগ্য ব্যক্তিদের অপসারণ-পর্ব্ব সূচনা বোধ হয় বছর দশেক পূর্ব্বে, এবার তাহা প্রায় পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। খাস পশ্চিমবঙ্গের দিকেই চাহিয়া দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকারের সকল সংস্থাতেই অবাঙ্গালী অফিসার প্রভৃতির পূর্ণ রাজত্ব কায়েম হইয়াছে।

স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালীকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত করার যে বিরাট পরিকল্পনা ছিল এবং যে পরিকল্পনা মত তিনি কার্য্য আরম্ভও করেন, সেই সব পরিকল্পনা অতি অযোগ্যদের হাতে পড়িয়া—বিরাট ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। এ রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা-গোষ্ঠী সর্ব্বভারতীয় কল্যাণ এবং ভারত-সংহতি রক্ষায় সদা চিন্তিত, দেশের অন্যত্র অন্যের গৃহের আগুন নিভাইতে তাঁহারা এতই ব্যস্ত যে—নিজের ঘরই যে পরের আগুনে প্রায় পুড়িয়া গেল সে-দিকে দৃষ্টি নাই, সে-বিষয়ে কোন চিন্তাও কাহারো নাই!

এই প্রসঙ্গ যে-কথা দিয়া আরম্ভ করি, এবার সেই কথায় ফিরিয়া, তাহা দিয়াই ইহার সমাপ্তি এবারের মত ঘটাইব। রাজ্যপাল পদে বৃত হইবার জন্য কোন গোপন লালসা যেন কোন বাঙ্গালী মনে পোষণ না করেন, করিলে হতাশ হইবেন। বাঙ্গালী স্বাধীনতা পাইয়াছে, অর্জ্জন করিয়াছে বলাও অন্যায় হইবে না, অনেক ত্যাগে অনেক দুঃখে, অনেক প্রাণ বলি দিয়া এবং শেষে বাঙ্গলার দুই-তৃতীয়াংশ ত্যাগ তথা বাঙ্গালী জাতিটাকে দুইভাগে খণ্ডিত করিয়া। কিন্তু ইহার ফলে বাঙ্গালীর ভাগ্যে কি জুটিল? আপাতত পাইলাম—আরো বহুকাল কেন্দ্রীয় মালিকদের দ্বারা 'গভর্ণড্' হইবার দুর্লভ সৌভাগ্য! যথাসময়ে—হয়ত হাজার বৎসর পরে বাঙ্গালী 'গভর্ণ' করিবার অধিকার পাইলেও পাইতে পারিবে। মাত্র এই স্বল্পকাল আমরা অবশ্যই সানন্দে অপেক্ষা তথা 'গভর্ণড্' হইতে থাকিব! যেমন ব্রিটিশের মিশন্ ছিল ভারতবাসীকে যোগ্য-শিক্ষাদি দ্বারা উপযুক্ত করিয়া স্বায়ত্ত শাসনদান করার—এবং যাহা সার্থক করিতে ২০০শত বৎসরের কিছু বেশী প্রয়োজন হয়।

চির অনাথ বাঙ্গালীর মা-বাপের অভাব কখনও হয় নাই।

সকল পরিকল্পনা কি কল্পনাতেই পর্য্যবসিত?

গত কিছুকাল হইতে অত্যাবশ্যকীয় সকল সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি আকাশ-ছোঁয়া হইয়াছে, কিন্তু খাদ্য সামগ্রীর মূল্য, বিশেষ করিয়া চাউল, গম, ডাইল (এবং বহুবিধ তরিতরকারি) প্রভৃতির মূল্য স্ফীতি আকাশকেও অতিক্রম করিয়া কোন উর্দ্ধতর লোকে উন্নীত হইয়াছে। গত বৎসরের প্রথম হইতেই—দ্রব্যমূল্যের বিষম উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইলেও, সরকারী, বেসরকারী কোন মহল হইতেই এই উর্দ্ধগতি রোধ করিতে কোন সার্থক প্রচেষ্টা হয় নাই, হইয়া থাকিলেও তাহা বেকার!

পৃথিবীর বহু দেশ হইতে, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া হইতে ধার করিয়া এবং ভিক্ষার দ্বারা—বাজারে এখন গম প্রচুর, কিন্তু তাহার মূল্যও 'প্রচুর'। সরকারী মতে বাঙ্গলা দেশে

চাউলের একান্ত অভাব, কিন্তু যে-কোন বাজারে গিয়া দেখুন, কিভাবে ফলাও করিয়া চাউলের প্রকাশ্য কৃষ্ণ-বাজারী চলিতেছে। আমরা সত্যই অবাক হইয়া যাই, অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তির মুখে যখন শুনি "আজ সস্তায় চাল পেলাম—মাত্র ১·৭৫ কেজি!"—একদা এই বাঙলা দেশের যে-দামে এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, আজ সেই দরে বহু সময় এবং স্থানে এক কেজি (১ সের ১ ছটাক) চাউলও পাওয়া যায় না!

শহরের মানুষের অবস্থা দেখিয়া গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষদের অবস্থার বিচার বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। 'নির্ব্বাচনী-পরিসংখ্যান'ও বিশ্বাসযোগ্য নহে সর্ব্বক্ষেত্রে। ভোটার্জ্জনের ক্ষেত্রে হয়ত প্রয়োজনমত 'কুক্‌ড্‌-পরিসংখ্যান' কার্য্যোদ্ধার করে, কিন্তু বাস্তবে মানুষের ঘরে ভাতের হাঁড়িতে পেট ভরাইবার মত কোন কিছুই 'কুক্‌' করে না।

বাজারে গমের অভাব নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার ক্রমাগত মূল্য-বৃদ্ধি কেন হইতে থাকিবে, আমাদের বুদ্ধিতে তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না! চিনির সম্পর্কেও একই কথা। চাউলের মূল্যের হিসাব কে করিবে? বাঙলা দেশে চাউল না কি নাই এবং সেইজন্যই র‍্যাশনে চাউলের মাথা (উদর?) প্রতি কোটা কমান হইয়াছে, কিন্তু প্রতিদিন রেলে হাজার হাজার ব্যক্তি চার-পাঁচ কেজি হইতে ২।৩ কুইণ্টল পর্য্যন্ত চাউল কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে, সরকারী রক্ষীদের উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া—অন্ধকার হইতে আলোকিত বাজারে চালিয়া বিক্রয় করিতেছে? খাস কলিকাতাতেও আজ এ-দৃশ্য সর্ব্বত্র। বৈঠকখানা এবং অন্যান্য বাজারে গিয়া এ-কথার সত্যাসত্য যে-কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন।

মূল্য-বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আর একটি অতি বিপদজনক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য, যদিও সাধারণ মানুষের এ-বিষয় কষ্টভোগ ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। গত বৎসর জুন মাসে টাকার মূল্যহ্রাস করিবার সময় অর্থনীতিবিদ বৃহৎ মাথাওয়ালাদের নিকট হইতে আমরা ডিভ্যালুয়েশন সম্পর্কে বহুপ্রকার বহু আশাপূর্ণ বহু আনন্দবারতা শ্রবণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক বছর পার হইতে না হইতেই সে-সবের কি হইল? এখন বিশ্ব-বাজারে ভারতীয় টাকার আরো মূল্যহ্রাস হইতেছে—এবং মনে হয় ক্রমে ক্রমে আরো হইবে! অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের মতে, আর কিছুকাল পরে ভারতীয় মুদ্রার পুনরায় ডি-ভ্যালুয়েশন ঘটিবেই। এমনিতেই সরকারীভাবে টাকার মূল্য ডলার এবং পাউণ্ড প্রতি বেশ আশঙ্কাজনক কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ৯·৫০ টাকার বিনিময়ে ডলার বিক্রয় হইতেছে। কোথাও কোথাও ডলারের মূল্য প্রায় দশ টাকাও স্পর্শ করিতেছে। সরকারী মুখপাত্র হিসাবে—শ্রীঅশোক মেটা এবং শ্রীশচীন চৌধুরী গত বৎসর ডিভ্যালুয়েশনের পর পরম দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন, টাকার মূল্য ভবিষ্যতে আর কখনও কমানো হইবে না, কিন্তু এখন তাঁহাদের দিক হইতে আর কোন কথাই এ-বিষয়ে শোনা যাইতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যতম নেতা (কং)—ডিভ্যালুয়েশনের পর আমাদের বহুবিধ চিত্তপ্রিয় আশা-বাণী শ্রবণ করান। আজ তিনি কেন নূতন আশার কোন বাণী দিতেছেন না? অতুল্যবাবু কংগ্রেস-কর্ম্মীদের নির্দ্দেশও দিয়াছিলেন—সাধারণ লোকের ঘরে ঘরে গিয়া মুদ্রা-মূল্য কমানোর পরম-কল্যাণকর গুপ্ত তথ্যাদি—সকলকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতে। এ কার্য্য কেন অসমাপ্ত রহিল এখনও?

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে ভুঁইফোঁড় পরিকল্পনা-বিশারদ ঘোষণা করেন যে - আর মাত্র তিরিশ বৎসর পরেই তাঁহার রচিত-পরিচালিত পরিকল্পনার-পরীকে এই ভাগ্যহত দেশের মাটিতে আনন্দ-নৃত্য করিতে দেখা যাইবে। পরিকল্পনা বৃক্ষের যে বীজ তিনি রোপণ করিয়াছেন, সেই মহা-বৃক্ষ ফলদান করিতে সুরু করিবে—অবিলম্বে অর্থাৎ আর মাত্র তিরিশ বৎসর পরেই! তবে ইহার মধ্যেও একটি "কিন্তু" আছে। এই তিরিশ বৎসরের—প্রথম দশটা বছর দেশের সাধারণ-জনদের আরো ত্যাগ, আরো কষ্ট-কৃচ্ছ্রতা স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে! ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কথা জানি না, আরো ত্যাগ, কষ্ট স্বীকারের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে---গত ২০ বৎসর লোকের দিন যে-ভাবে চলিতেছে—আর কিছুকাল সেইভাবে চলিলেই—এ-রাজ্যে চির-রাত্রির ঘনতম অন্ধকার নামিয়া আসিবে।

"সোনা মাটি : মাটি সোনা"!

পশ্চিমবঙ্গে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যে-ভাবে এবং যে-হারে জমির দরবৃদ্ধি হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে—তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়! দরিদ্র মধ্য-বিত্তদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল, মোটামুটি বিত্তবান লোকেরা, যাহারা বহুকাল ধরিয়া কলিকাতায় একটি মাঝা-মাঝি সাইজের ভালো-বাসা বাঁধিবার স্বপ্ন মনের গহনে সযত্নে লালন করিতেছিলেন, এবং সেই কারণে—কিছু অর্থ

সঞ্চয়ের দিকেও যত্নবান ছিলেন, সেই সব 'ভালো-বাসায় আশাবাদি,' ব্যক্তিরাও এখন বহুকালের স্বপ্নকে একান্ত দুঃস্বপ্ন বলিয়া পরিত্যাগ করিতে অত্যন্ত দুঃখ এবং অনিচ্ছার সহিত বাধ্য হইতেছেন।

গত আট-দশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র শহরাঞ্চলে পতিত জমির যে হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে জমি প্রতি কাঠা দুই শত টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত বর্ত্তমানে সেই জমির মূল্য দাঁড়াইয়াছে অন্তত চার-পাঁচ হাজার টাকা। কলিকাতা শহরে পতিত জমির যে মূল্য দাঁড়াইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই শহরে কোন কোন জায়গায় প্রতি কাঠা জমি এক লাখ টাকারও বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছে। জমির এই মূল্যবৃদ্ধির একটি কারণ যুগপৎ চাহিদাবৃদ্ধি ও যোগানহ্রাস। যে জিনিসের ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত যোগান কমিয়া যায় সেই জিনিসের মূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, কলকারখানা ইত্যাদির জন্য অবিরত জমির পরিমাণ কমিতেছে। কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত বিভিন্ন কাজের জন্য জমির চাহিদা বাড়িতেছে। জমির মূল্যবৃদ্ধির এই সব কারণের সহিত আর-এক নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। উহা হইতেছে জমি লইয়া ফাটকা। এ দেশে অবাঙ্গালী যে সব লোকের হাতে টাকা আছে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, যে কোন জমি ক্রয় করিলে তাহাতে ক্ষতি হইবার বিন্দু-মাত্র আশঙ্কা নাই এবং দুই-চারি বৎসর জমি ধরিয়া রাখিয়া বিক্রয় করিলে তাহাতে দশ হইতে একশত গুণ লাভ সুনিশ্চিত। এই জন্য বিপুল পরিমাণ কালো-বাজারী টাকা জমি কেনাবেচার ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়াছে। জমির যে এত দ্রুত হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহার একটা প্রধানতম কারণ ইহাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে হারে গত বিশ বৎসরে এ-রাজ্যে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে—রাজ্যে জমি সে হারের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া বৃদ্ধি হয় নাই, হইতেও পারে না কোন ভাবেই। মানুষের প্রয়োজন মত দেশে জমির পরিমাণ হয়ত কমানো যায়, কিন্তু বাড়ানো যায় না। পশ্চিমবঙ্গের অধিকার, ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত ভাবেই—সেই সব জমি এখন বিহার এবং আসাম রাজ্যের জমিদারীর জবর দখলে—(ধলভূম, মানভূমি, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি)।

সিংভূমের জেলার বেশ বৃহৎ একটা অংশই থাকা উচিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দখলে, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের হিন্দী-উপরওয়ালাদের জবরদস্তি এবং যে আইনী জবরদখল আইনের বলে—সবই বিহার রাজ্যের দখলে রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যখন লক্ষ লক্ষ লোক এক টুকরা জমির জন্য হাহাকার করিতেছে—সেই সময় বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশে লক্ষ লক্ষ একর জমি পড়িয়া রাহিয়াছে পূর্ণ বেকার অবস্থায়। তবে এইবার—কংগ্রেস সরকারের যে হাল হইয়াছে নির্ব্বাচনের কল্যাণে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা উন্নতি আশা করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে জমির যে রকম অপব্যবহার হইতেছে এবং উহার মূল্য যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার প্রতিবিধান হওয়া অবশ্যই উচিত। এই দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের। গভর্ণমেণ্ট যদি পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের জমির সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করিয়া দেন তাহা হইলে উহাতে কাজ হইবে না। কারণ জমির বিক্রেতা আসলে বেশী মূল্যে জমি বিক্রয় করিয়া কম মূল্যে জমি বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া দলিল সম্পাদন করিবে। ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। গভর্ণমেণ্ট যদি জমি বিক্রয়ের লাভের অধিকাংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করেন তাহা হইলেও এই একই পন্থায় এই আইন অকেজো হইবে। আমাদের মনে হয়, এই বিষয়ে একমাত্র উপায় হইতেছে শহরাঞ্চলের সমস্ত পতিত জমি ক্রয়মূল্যের উপর কিছু ক্ষতি-পূরণ দিয়া সরকারে খাস করা, সমস্ত পতিত জমি সরকারে খাস হইলে শহরাঞ্চলে জমির অপব্যবহারও হইবে না এবং উহার মূল্যও বাড়িবে না। কিন্তু জনসাধারণের সমর্থনের জোরে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট এইরূপ একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সাহস পাইবেন কি? দেখা যাক।

এবার নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল—যাহাকে প্রকারান্তরে জনগণের সরকার বলা যাইতে পারে। নূতন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উপর ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য কোন পক্ষই অযথা কর্ত্তৃত্ব দেখাইবার কিংবা দুষ্টপ্রভাব বিস্তার করিবার দুষ্ট প্রয়াস এখন করিবেন না—এ-বিশ্বাস করি।

নূতন সরকার যদি একান্ত-প্রয়াস করেন, তাহা হইলে ভাগ্যহত পশ্চিমবঙ্গের জবর-দখলী অঞ্চলগুলি—ধলভূম, সমগ্র মানভূম, সিংভূমের সংলগ্ন-অংশ (টাটানগর সমেত)—আসামের অধীন গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি আবার হয়ত ফেরত আনা যাইতে পারে। উপরিউক্ত অঞ্চলগুলি সর্ব্বতোভাবে একদিন ছিল বাঙ্গলার—আবার কেন সেই অধিকার স্বীকৃত হইবে না? বর্ত্তমানে অতি সীমিত পশ্চিমবঙ্গের জমির পরিমাণ তথা আয়তন কিছু বৃদ্ধি পাইলে, একদিকে বাঙ্গলা বাঁচিবে, অন্যদিকে সংলগ্ন রাজ্য-গুলির দেহে একটু আঁচড় লাগিলেও—ক্ষতি হইবে না।

দাদাজী

উল্টো রাজার দেশে

সুধাকর

ঘুমের ঘোরে খোকা গেছে উল্টো রাজার দেশে
সহজ সোজা নেইক কিছু, প্রথমটা হয় শেষে।
আনন্দেতে কেউ হাসে না দুঃখে হাসি ফোটে
সূর্য্য থাকেন রাত্তিরেতে, দিনেতে চাদ ওঠে।
মাথায় হেঁটে মানুষগুলো পিছন দিকে চলে
বোবাগুলো বক্তৃতা দেয় বড় মিটিং হ'লে
গাড়ি যত চলছে সেথা ওপর দিকে চাকা
খাতির তাদের নেইক মোটে যাদের আছে টাকা
রিক্সাআলার কোলে চ'ড়ে রিক্সাগুলো যায়
আলু-পটল সুযোগ পেলেই মানুষ মেরে খায়
পাখী যত ডাঙায় চরে গরু-বাছুর ওড়ে
আকাশ আছে মাটির কোলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে
জলের জাহাজ উড়ছে জোরে বিমান জলে ভাসে
দুষ্ট যারা সবাই কেবল তাদের ভালবাসে
ভাল মানুষ দেখলে পরেই সবাই করে ঘৃণা
উল্টো রাজার উল্টো নীতি উল্টো রকম কিনা!
চেয়ারেতে ছাত্র বসে, মাষ্টাররা পড়ে
ভেঙে ভেঙে সকল কিছু সবাই সেথা গড়ে।
সিংহাসনটা মাথায় করে রাজা আছেন বসে
কারুর কাজের ত্রুটি হলে শাসন করেন ক'ষে।

যাঁদের করি নমস্কার (১০)

শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়

ছেলে পড়ছে। বাবা বসে আছেন সামনে। ছোট্ট ছেলে। বয়স মাত্র আট বছর। বই-এর পাতায় যে শক্ত-শক্ত কথা, তার মানে বলে দিচ্ছেন বাবা। এক জায়গায় পাওয়া গেল—বাঙ্গালী নিরীহ জাতি। প্রশ্ন হ'ল—নিরীহ কথাটির মানে কি? বাবা বললেন উদাহরণ দেখিয়ে—যেমন ভেড়া, ছাগল। ছেলের মুখে কথা সরল না। বই-এর সেই পাতাটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলল। রাগে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো।

রাগ হবারই ত কথা। আমরা বাঙ্গালী নিরীহ ভেড়া-ছাগলের মত! অসহ্য! বাবা বললেন—'ওটা বিদেশীর লেখা বই। ওরা আমাদের মানুষই মনে করে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছেলেকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—বই-এর পাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছ, বেশ করেছ। কিন্তু, নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে ত যে তুমি বাঙ্গালী ভেড়া-ছাগল নও। বীরের মত উত্তর হ'ল—পারব।

তারপর, বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

বিপ্লবী গুরু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছেলেদের শিক্ষা দিচ্ছেন। মনকে একদিকে-স্থির-রাখার শিক্ষা। ঘরের দেওয়ালে একটা চক্ষু আঁকা হয়েছে। ছেলেরা যে-যার আসনে বসে সেই 'চক্ষু'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু একটি তরুণ তখনও ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গুরু জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? নিজের আসন নাও।' তরুণটি উত্তর দেয়—'এ সব কাজে আমার বিশ্বাস নেই।' গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন গুরুদেব, 'কিসে বিশ্বাস আছে তোমার?' জবাব হ'ল—'জাতীয় বিপ্লবে।' গুরুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি এগিয়ে এলেন এবং তরুণটির পিঠে হাত রেখে বললেন—তা হ'লেই হবে। তুমি ঠিক আছ। এ সব কাজ তোমাকে করতে হবে না।

আরও কয়েক বছর পরের কথা। কলকাতায় বন্দুকের ব্যবসা করত 'রডা' কোম্পানী। বিপ্লবী ছেলেরা খবর পেল যে ঐ কোম্পানী, কিছু মাল বিদেশ থেকে আনছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন পাকা হয়ে গেল। যে ভাবেই হোক ঐ মাল লুঠ করে নিতে হবে। হ'লও তাই। ঐ মাল কোম্পানীর ঘরে না উঠে বৌবাজারের বিপ্লবীদের আড্ডায় এসে উঠল। বাংলার বিপ্লবীরা সেদিন হাতে পেল পঞ্চাশটি 'মশার' পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার 'রাউণ্ড' বুলেট।

পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এই ভয়ঙ্কর কাজ যারা করল তাদের নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তিনি ঐ অস্ত্র বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ইংরাজ সরকার বুঝতে পারলেন যে বাঙ্গালী ছেলেরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এবার তারা সামনা-সামনি যুদ্ধে নামবে।

কিন্তু, কে এই বিপিন গাঙ্গুলী? এ সেই তরুণ যে অরবিন্দ বাবুর কাছে প্রকাশ করেছিল জাতীয় বিপ্লবে তার বিশ্বাসের কথা,—এ সেই শিশু যে বাবার কাছে শপথ করেছিল যে সে জীবন দিয়ে প্রমাণ করবে—বাঙ্গালী ভেড়া-ছাগল নয়।

উপমন্যু

কমলেন্দু রায়

আশ্রমের লতাপ্রাচীরের অন্তরালে উপমন্যুকে দেখে মহর্ষি আয়োদধৌম্য অবাক হয়ে গেলেন। এগিয়ে গেলেন মহর্ষি। বুঝলেন, না, ভুল হয়নি তাঁর। কিন্তু অনুমান করতে পারছেন না, কেমন করে এটা সম্ভব হ'ল। এই পুষ্ট দেহকান্তি! আশ্রমের কঠোর কৃচ্ছ্রতায় কেমন করে লাভ করল এই স্থূলতনু দেহ, শিষ্য উপমন্যু!

প্রশ্ন করেন মহর্ষি আয়োদধৌম্য,—"বৎস, উপমন্যু। তুমি কি আহার করো?"

শিষ্য উপমন্যু উত্তর দেয়,—"ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ করি, গুরুদেব।"

—"তুমি কি জান না বালক, গুরুকে নিবেদন না করে ভিক্ষান্নে ভোজন অনুচিত?"

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে শিষ্য উপমন্যু। বুঝতে পারে, হ্যাঁ এই-ই লোকবিধি। সে অন্যায় করেছে। সে নির্বোধ। অকস্মাৎ হৃদয়ের মূঢ়তা চূর্ণ হয়ে যায়। অপরাধী কণ্ঠে বলে শিষ্য উপমন্যু,—"আমাকে ক্ষমা করবেন, গুরুদেব।"

স্থানান্তরে চলে গেলেন মহর্ষি। আর নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গাভী চরাতে গেল উপমন্যু।

কিন্তু কি আশ্চর্য, শিষ্য উপমন্যুর শরীরের কৃশতা ত এখনো কমে নি! মালিন্যের স্পর্শ ত এতটুকুও তাঁর অঙ্গে লাগে নি; মহর্ষি আয়োদধৌম্য ভাবলেন, এখনো সে কেমন করে নিজের দেহ পুষ্ট রেখেছে?

—"পুত্র উপমন্যু," প্রশ্ন করেন মহর্ষি, "সমস্ত ভিক্ষাদ্রব্য কি আমাকে দাও?"

—"না গুরুদেব।"

গম্ভীর কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করেন মহর্ষি, "কেন?"

বিষণ্ণ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে উপমন্যু। সজল চোখে বলে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না গুরুদেব," একটু থেমে বলে, "প্রথমবারের ভিক্ষাদ্রব্য সমস্তই আপনার চরণে নিবেদন করি গুরুদেব।"

বিস্ময়ে তাকান মহর্ষি শিষ্যের দিকে। চোখে তাঁর প্রশ্ন, মনে সন্দেহ।

—"পুনর্বার ভিক্ষা করে আমার ক্ষুধা নিবারণ করি।"

—"লোভী," ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন মহর্ষি, "তুমি জান না এতে অন্য ভিক্ষাজীবীদের কত ক্ষতি হয়?"

চমকে ওঠে উপমন্যু। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মহর্ষির কাছে মার্জনা চেয়ে নিল। আশ্রমচারী তাপসের কর্তব্যে সে এতকাল অবহেলা করেছে। উপমন্যু অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগল। শিষ্যের ব্যথাকাতর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মহর্ষি স্নেহের সুরে বলেন, "ক্ষোভ করো না বৎস। তোমার জীবনকে সত্যপথে চালনা করো।"

অতঃপর উপমন্যু একবার মাত্র ভিক্ষা করে গুরুকে ভিক্ষালব্ধ জিনিষ দিতে লাগল। পরে গুরু আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে, শিষ্যকে ত বেশ স্থূলই দেখা যাচ্ছে। এখন সে কি আহার করে? তাতে উপমন্যু জানায়, "আশ্রমগাভীর দুগ্ধ পান করি।"

—"মূর্খ," ধমকে ওঠেন মহর্ষি আয়োদধৌম্য। পরে নিষেধ করেন, "আমার বিনা অনুমতিতে দুধ পান করবে না। জান না, না বলে নিলে কি বলে লোকে?"

এরপরেও শিষ্যকে স্থূলকায় দেখে গুরু পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করায় উপমন্যু বলে যে, দুগ্ধ পানান্তে গোবৎসরা যে ফেন উদ্‌গার করে, সে তাই পান করে। গুরু বললেন, "এই গো-বৎসরা তোমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রচুর ফেন উদ্‌গার করে। এতে ওদের পুষ্টির ব্যাঘাত হয়," অপলক চোখে তিনি শিষ্য উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, "বৎস, উপমন্যু! এটা তোমার অনুচিত কাজ। ধর্ম তোমার জীবনের সহায় হউন।"

গুরুর সকল নিষেধ মেনে নিয়ে উপমন্যু গাভী চরাতে লাগল। কিন্তু একদিন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে সে অর্কপত্র (আকন্দপাতা) খেলো। সেই তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ বস্তু খেয়ে উপমন্যু অন্ধ হয়ে এক কূপের মধ্যে পড়ে গেল।

শিষ্য উপমন্যুর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে ধৌম্য সশিষ্য তাঁকে খুঁজতে বেরোলেন। মহর্ষি ধৌম্যের আহ্বান শুনতে পেয়ে কূপের মধ্য থেকে উপমন্যু আপন অবস্থা গুরুকে জানাল।

মহর্ষি বলেন,—"তোমাকে রক্ষা করবেন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার।"

কাতর কণ্ঠে উপমন্যু বলে, "কেমন করে?"

—"তোমার জীবনের পুণ্য দিয়ে।"

—"বলুন, মহর্ষি! কেমন করে আমার পুণ্য দেববৈদ্যকে দান করবো?"

—"তাঁকে স্তবে সন্তুষ্ট করে, বৎস উপমন্যু।"

চলে গেলেন মহর্ষি আয়োদধৌম্য। একাকী সেই কূপের মধ্যে নিঃসঙ্গ উপমন্যু পড়ে থাকল।

উপমন্যুর স্তবে অশ্বিনীকুমার আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পিষ্টক খেতে দিলে সে গুরুকে নিবেদন না করে তা খেতে অস্বীকার করল। তখন অশ্বিনীকুমার তাঁর গুরুভক্তিতে প্রীত হয়ে বললেন, "তোমার গুরুর দন্ত কৃষ্ণ লৌহময় হবে, আর তোমার দন্ত হবে হিরণ্ময়, তুমি চক্ষুষ্মান হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে।"

—"চাই না, চাই না আপনার এই করুণা।"

—"কেন?" বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার, "তবে তুমি কি চাও?"

—"গুরুদেবের কৃষ্ণ লৌহময় দন্তের সম্মুখে আমি আমার হিরণ্ময় দন্ত নিয়ে উপস্থিত হতে পারবো না!"

অশ্বিনীকুমার এই কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে উপমন্যুকে বর দিয়ে চলে গেলেন।

চক্ষুলাভ করে গুরুকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করার পর, মহর্ষি আয়োদধৌম্য বললেন, "সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার আয়ত্ত হবে।"

এইরূপে পরীক্ষা দিয়ে উপমন্যু নিজ গৃহে গমন করল।

মোগল সম্রাটের হিন্দু বেগম

নীহারময়ী দেবী (জয়পুর)

সকলেই জানেন মোগল সম্রাটদের কিছু হিন্দু বেগম, বা মহিষী ছিলেন। সম্রাট আকবর শা'রও একজন হিন্দু বেগম ছিলেন। কিন্তু এই বেগমের মরিয়ম নামটা শুনে, তিনি যে সম্রাটের হিন্দু মহিষী ছিলেন, এবং বাদশাজাদা সেলিম বা জাহাঙ্গীরের জননী ছিলেন, হয়ত অনেকেই তা বুঝতে পারেন না। এবং এঁর হিন্দু নামটিও কিন্তু জানা যায় নি।

এই যে রাজকন্যাকে সম্রাট আকবর বিবাহ করেছিলেন ইনি অম্বর-রাজ বিহারীমলজীর কন্যা। ১৫৬২ সালে এঁদের বিবাহ হয়, বিবাহের পর সম্রাট তাঁকে "মরিয়ম-উজ্-জওয়ানী" উপাধি দিয়েছিলেন।

১৫৭০ সালে এঁরই গর্ভে ফতেপুর সিক্রীতে জাহাঙ্গীরের (সেলিম) জন্ম হয়।

মরিয়ম বিবির একটি সুন্দর প্রাসাদ ছিল।

মরিয়ম বিবির এই প্রাসাদটিকে "সোনালী প্রাসাদ" (সুনহেরী) বলা হ'ত। এটি "পঞ্চ মহল" নামে খ্যাত সম্রাটের প্রমোদ নিবাসের দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

প্রাসাদের দেওয়ালগুলিতে সুন্দর সুন্দর পেণ্ট করা ছবি ছিল এবং পারস্য কবি ফিরদৌসির শাহনামা থেকে অনেকগুলি সুন্দর 'বয়েত'ও উৎকীর্ণ ছিল।

কিছু কাচের উপর রঙীন ছবি আঁকা কিছু ফ্রেসকোর মধ্যে দেবদূত ও আদম ইভ্, বাইবেলের ঘটনাও উৎকীর্ণ ছিল।

সে সময়ে জেসুইট সম্প্রদায়ের পাদরীরা আকবরের সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের উদার ভাবটিতে খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মোগল আর্টিষ্টরাও বেশীর ভাগ হিন্দুই ছিলেন যদিও,—তবু তাঁরা বাইবেলের মনোহর ঘটনাগুলি শুনে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং সম্রাটের ধর্ম সম্বন্ধে ঔদার্য্যে তাঁদের মনের ভাবগুলি আরও বিকশিত হয়েছিল।

প্রাসাদে বাইবেলের এই সব ছবি থাকাতে লোকেদের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি সম্রাটের খ্রীষ্টান বেগম ছিলেন কিন্তু সে ধারণা ভুল, তিনি অম্বর-রাজ-বিহারীমলজীরই কন্যা ছিলেন। যদিও তাঁর রাজপুত নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় নি। তারও কারণ আছে। রাজস্থানে এখনও রাজ-কন্যাদের বা উচ্চবংশের কন্যাদের দেশের ও বংশের নামে নাম রাখা প্রথা প্রচলিত আছে। কোশল ও কেকয় দেশের কন্যা কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর মত। বংশ হলে তোমরজী যাদবনজী। তোমর বংশের যদুবংশের মেয়ে।

আকবর তাঁর এই হিন্দু বেগমকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর জননী বলিয়া অতিশয় মর্য্যাদাও দিতেন এবং তাঁর প্রধানা স্বজাতীয়া তুর্কী সুলতানা বেগমদের মতই তাঁর প্রাসাদের নিকটেও সুন্দর সাজান বাগান এবং স্নানাগার করিয়ে দিয়েছিলেন।

১৬২০ সালে মরিয়ম বেগমের মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর আঠার বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। জাহাঙ্গীর বাদশা তাঁকে সেকেন্দ্রাতেই স্বামীর সমাধির পাশেই সমাধিস্থ করেন। জাহাঙ্গীর, বারাদরিতে অবস্থিত সেকেন্দর লোদির সমাধি-(১৪১৫ খ্রীঃ) মন্দিরের কিছু কিছু অদল-বদল ক'রে, সেইখানে তাঁর মার সমাধি রচনা করিয়েছিলেন।

সম্রাজ্ঞী যোধবাই

সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও একজন হিন্দু বেগম ছিলেন, এঁর নাম ছিল যোধবাই, এবং এঁর হিন্দু নাম ছিল মানমতী।

ইনি যোধপুর মহারাজ উদয়সিংজীর কন্যা ছিলেন। ১৫৮৫ সালে এঁদের বিবাহ হয়। যোধবাইয়ের প্রাসাদখানি বড় বড় সুন্দর পাথরে তৈরী, মধ্য এসিয়ার মত গম্বুজাকৃতি ধরণে গঠিত। আগ্রায় যে জাহাঙ্গীর মহল আছে তার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য আছে, দু'টিই এক সঙ্গে নির্ম্মিত হয়েছিল।

হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্যের প্রভাব বেশ বোঝা যায়, কারণ ঘণ্টা শিকল আদি দেওয়া বেশ সুক্ষ্ম কারুকার্য।

ফতেপুর সিক্রীকে সম্রাট পরিত্যাগ করেছিলেন ১৮৮৫ সালে, সেজন্য মনে হয় সম্রাজ্ঞী যোধবাই এখানে কখন বাস করেন নি। যদিও সেই বছরেই তাঁহাদের বিবাহ হয়।

সেই বাড়ীর প্রাঙ্গণের সহিত সংলগ্ন একটি ঢাকা বারান্দা ছিল, এবং সম্রাট আকবরের শয়ন কক্ষের সহিতও তার যোগাযোগ থাকায় মনে হয় তাহা সম্রাটের অন্তঃপুরেরই অংশ ছিল। এবং জাহাঙ্গীরের বিবাহের পর এর নাম "যোধবাই মহল" দেওয়া হয়।

(* অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত ইম্পিরিয়াল আগ্রা অফ মোগলস্ থেকে সঙ্কলিত।)

"প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা"

শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা মানুষকে সম্পূর্ণ করে। মানুষ যে সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলিকে সৎপথে পরিচালিত ক'রে মনুষ্যজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে একমাত্র শিক্ষাই সক্ষম। সমাজের প্রতিটি মানুষ, নারী অথবা পুরুষ, যখন উপযুক্ত শিক্ষা-লাভের সুযোগ পায়, তখন সে সমাজের উন্নতি অবধারিত।

কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভের ইতিহাস বেশীদিনের নয়। অধিকাংশ সভ্যদেশের প্রাচীন ইতিহাসের বিবরণ পাঠ করলে জানা যায় যে, প্রাচীন যুগে পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর স্থান ছিল অনুন্নত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করলে সে যুগের যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাতে প্রাচীন ভারতে নারীর সমুন্নত অবস্থা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীসমাজ তখন যথেষ্ট মর্যাদা ও স্বাধীনতা ভোগ করত; বিশেষ করে নারীশিক্ষার দিকটি ছিল বিশেষ উন্নত।

প্রাচীন ভারতে, বিশেষ করে বৈদিকযুগে, সকল শিক্ষাই বেদকেন্দ্রিক। বৈদিক সাহিত্যে এমন উদাহরণ ও উল্লেখ প্রচুর আছে যার থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত নারীদের বৈদিক শিক্ষা গ্রহণে কিছু-মাত্র বাধা ছিল না। বৈদিকযজ্ঞ সম্পাদনে সে যুগে নারীর যে অকুণ্ঠ অধিকার ছিল তারই ফলে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণেও তার অধিকার স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা আছে—'অযাজ্ঞয়ো বা এষ যোঽপত্নীকঃ।' অর্থাৎ যে অপত্নীক তার যজ্ঞের অধিকার নেই। ঋগ্বেদের মন্ত্রেও সপত্নীক যজমানের যজ্ঞ সম্পাদনের বিবরণ পাওয়া যায়। 'পত্নী' শব্দটিরও বিশেষ অর্থই হ'ল 'যজ্ঞফলভাগিনী।' স্ত্রীলোক যে যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী ছিল তার উল্লেখ আমরা রামায়ণেও পাই, যেখানে কৌশল্যাকে রামের রাজ্যাভিষেকের

দিন প্রাতঃকালে একাকী পুত্রের মঙ্গল কামনায় অগ্নিতে আহুতি দানরত অবস্থায় দেখতে পাই। রামায়ণের সীতা এবং মহাভারতের কুন্তীও যে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলেন তারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে নারীদের অধিকার ছিল বলেই উপনয়নবিধি পুরুষের মতন নারীর ক্ষেত্রেও অবশ্য কর্তব্য ছিল। কারণ বৈদিক উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হলেই তবে সে যুগে বেদ-পাঠের অধিকার অর্জন করা যেত। অথর্ববেদে নারীর ব্রহ্মচর্যপালনের কথা বলা হয়েছে—'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।' খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর সূত্র সাহিত্য-গুলিতেও এ বিষয়ে বিবরণ পাওয়া যায়। মনুসংহিতাকারও উপনয়নকে নারীর অবশ্যকর্তব্য সংস্কারগুলির অন্যতম বলেছেন।

উপনয়নের পর শিক্ষারম্ভ করে নারী সাধারণত ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। এরপর তাদের বিবাহ হ'ত। বৈদিকযুগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। ফলে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর শিক্ষালাভে তাদের কোন বাধা ছিল না। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে শিক্ষা শেষ করে যারা বিবাহিতা হ'তেন, তাঁদের বৈদিক সাহিত্যে 'সদ্যোদ্বধূ' বলা হয়েছে। দৈনন্দিন প্রার্থনা এবং নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে যে সমস্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন হ'ত বিবাহের পূর্বে তাঁরা সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। এ ছাড়া সঙ্গীত এবং নৃত্যেও তাঁরা শিক্ষিতা হ'তেন। এঁরা ছাড়া আর এক শ্রেণীর নারী বিদ্যার্থিনী ছিলেন যারা আরও অধিক দিন অবিবাহিতা থেকে শিক্ষালাভ করতেন, এঁদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হ'ত। এঁরা অনেক সময় সারাজীবনও অবিবাহিতা থেকে বিদ্যাচর্চা করতেন। বিদ্যাচর্চার প্রভূত সুযোগ লাভ করে তাঁরা প্রায়ই বেদের বিশেষ কোন শাখায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করতেন। কঠ এবং বহ্বৃচ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নারী শিক্ষার্থিনীরা যথাক্রমে 'কঠী' এবং 'বহ্বৃচী' নামে পরিচিত ছিলেন। নীরস মীমাংসা শাস্ত্রেও তাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কাশকৃৎস্নীর মীমাংসা গ্রন্থের উপর যাঁরা ব্যুৎপত্তি অর্জন করতেন, তাঁদের 'কাশকৃৎস্না' নামে অভিহিত করা হ'ত। এই সমস্ত বিশেষ সংজ্ঞাকরণ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে যুগে বহু সংখ্যক নারী প্রায়ই বেদের বিশেষ কোন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করতেন। কারণ তা না হ'লে এই সমস্ত সংজ্ঞা করা হ'ত না। বৈদিক যুগে জ্ঞানের চর্চায় নারীরা এতখানি উন্নতি লাভ করতেন যে তাঁরা বৈদিক মন্ত্ররচনা কাযেও অংশভাগিনী হ'তেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রসংগ্রহে এই রকম কয়েকজন মন্ত্র-রচয়িত্রী নারীর রচিত মন্ত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন ভারত যে নারীকে কতখানি সম্মান দেখিয়েছিল এ তারই বিশিষ্ট প্রমাণ। উপনিষদের যুগে নারীরা দার্শনিক আলোচনায় অংশ নিতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'যেনাহং 'নামৃতা স্যাং কিং তেনাহং কুর্যাম'—'যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কি করব'—অমৃত পিপাসার এই বাণী প্রাচীন ভারতে একজন নারীর মুখেই উচ্চারিত হয়েছিল। সে নারী যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী যাঁর কাছে পার্থিব বিষয়ভোগ অতি তুচ্ছ ছিল। জনকের রাজসভায় গার্গী বাচক্নবী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে উদ্দেশ্য করে দর্শনের যে জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন তাও তাঁর প্রকৃষ্ট মানসিক উন্নতির পরিচয় বহন করে। সুলভা, বড়বা, প্রাথিতেয়ী, মৈত্রেয়ী এবং গার্গী প্রভৃতি সে যুগের কয়েকজন নারীর নাম জ্ঞানী সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাচীন ভারত জ্ঞান রাজ্যের পথে যে বিশিষ্ট অগ্রগতি দেখিয়েছিল তার মূলে এঁদের অবদান নিতান্ত নগণ্য নয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব যখন এদেশে বিস্তৃত হয় তখন বহু অভিজাত বংশের নারী মঠের ব্রহ্মচর্যমূলক জীবন গ্রহণ করে ধর্ম ও দর্শন চর্চায় জীবন কাটাতেন। কয়েকজন নারী বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বহির্ভারতেও গিয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতে নারীগণ শুধুমাত্র জ্ঞান চর্চায় সমুৎকর্ষ লাভ করতেন তাই নয়, প্রকাশ্যে শিক্ষাদান কার্যেও তাঁরা ব্রতী হতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'উপাধ্যায়' পদের স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে 'উপাধ্যায়ানী' এবং 'উপাধ্যায়া' এই দু'টি পদ পাওয়া যায়। 'উপাধ্যায়ানী' পদের অর্থ ছিল 'উপাধ্যায়ের স্ত্রী'। এই অর্থের সঙ্গে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনাবৃত্তির বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। আর 'উপাধ্যায়া' পদের দ্বারা যে নারী স্বয়ং অধ্যাপনাবৃত্তি অবলম্বন করতেন তাঁকে বোঝাত।

স্বয়ং অধ্যাপিকা অর্থ বোঝাবার জন্যে যখন ব্যাকরণে একটি নূতন পদসৃষ্টি করা হয়েছিল তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই বৃত্তিটি প্রাচীনকালে নারী সমাজের সাধারণ বৃত্তি হিসাবেই গণ্য হ'ত। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে অবরোধ প্রথা না থাকায় এই বৃত্তি গ্রহণে তাঁদের বিশেষ কোন বাধাও ছিল না। সূত্রকার পাণিনি তাঁর ব্যাকরণের সূত্রে 'ছাত্রী-শালা'র উল্লেখ করেছেন, সম্ভবতঃ কোন অধ্যাপিকার তত্ত্বাবধানে সেখানে শিক্ষার্থিনীরা বাস করতেন।

বৈদিক সমাজে সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যেই নারী-শিক্ষার সমাদর ছিল কি না সে কথা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে উচ্চশ্রেণীর আর্যগণ যে নারীর শিক্ষা বিষয়ে পক্ষপাতী ও উৎসাহী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদুষী কন্যা লাভের উদ্দেশ্যে পিতামাতার কর্তব্য হিসাবে তিল এবং ওদন পাক করে ঘৃতসহযোগে ভক্ষণের নির্দেশ আছে—"অথ য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতাম্।" এটা যে সে যুগে নারী শিক্ষার সমাদরের প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। নারীর উপনয়ন সংস্কার এবং বাল্য-বিবাহের অপ্রচলনও সকল আর্য নারীর পক্ষে কিছু পরিমাণে বৈদিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক করে তুলেছিল।

প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার এই সমুন্নত অবস্থা পরবর্তীকালে কিছুটা অবনত হয়েছিল। এর প্রধান কারণ নারীদের ক্ষেত্রে উপনয়ন সংস্কারানুষ্ঠানের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল; এবং খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দের সময় দেখা যায় যে নারীর উপনয়ন সংস্কার একটা প্রথামাত্রে পর্যবসিত হয়েছে এবং উপনয়নের পর বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ নারীর পক্ষে আর অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য হচ্ছে না। আরও পরবর্তীকালের শাস্ত্রকারগণ নারীর ক্ষেত্রে উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ বলে নির্দেশ দিয়ে নারীর বিবাহ সংস্কারই উপনয়ন সংস্কারের তুল্য বলেছেন। ফলে উপনয়ন সংস্কারের অভাবে বেদাধ্যয়নের অধিকার হারিয়ে নারী সমাজ শূদ্রতুল্য হয়ে পড়েছে। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকারও অনিবার্যভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্ত্রীর যজ্ঞকার্যে অংশ গ্রহণ প্রথামাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া এই সময় পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহের প্রচলনও নারী শিক্ষাকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু যদিও বৈদিকোত্তর যুগে নারীর বৈদিক শিক্ষার সহজ প্রবাহ শাস্ত্র বচনের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে, যদিও সাধারণভাবে নারী সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার অবনতি হয়েছে, তবুও এ যুগে অভিজাত সমাজ এবং রাজপরিবারের মেয়েরা সাধারণভাবে সাহিত্যে এবং শিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করতেন। অনেক সময় তাঁরা কাব্য রচনায়ও তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। রাজ পরিবারের মেয়েরা প্রয়োজনবোধে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, এমন কি দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতেও পিছপা হতেন না। মধ্যযুগের রাণী কর্মদেবী বা লক্ষ্মীবাঈএর দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতেও নেহাৎ অল্প ছিল না। আর প্রত্যক্ষভাবে না হোক্, পরোক্ষভাবে স্বামীর প্রেরণাদাত্রী বা পরামর্শদাত্রীরূপে ভারতবর্ষের নারীরা চিরদিনই নিজেদের শিক্ষার পরিচয় দিয়ে এসেছেন।

—০—

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

ব্যারনেসের কাছে শুনলাম যে তিনি স্বামীকে সব কথাই খুলে বলেছেন—ব্যারন শুনে অশ্রু বিসর্জন করেছেন এবং তাই দেখে ব্যারনেসের নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হয়েছে। আমার মনে কিন্তু এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হল—ব্যারন কি সরলতাবশতঃ এই ভাবে কেঁদেছেন? না এও তাঁর এক রকমের চালাকি? নিশ্চয় সে সময় তাঁর মনে এই দু'টি ভাবেরই একটা মিলন ঘটেছিল। ভালবাসা এবং প্রবঞ্চনার ভাব একই সংগে এমনভাবে আমাদের মনে বাসা বাঁধে যে আমাদের সত্যিকারের পরিচয় আমরা নিজেরাই সঠিকভাবে বুঝতে পারি না।

ব্যারন কিন্তু আমাদের উপর রাগ করেন নি। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ব্যাপারেও তিনি কোন বাধার সৃষ্টি করলেন না। শুধু একটা সর্ত দিলেন—আমরা যেন আমাদের ব্যবহারে তাঁর সুনামকে কলঙ্কমণ্ডিত না করি।

"উনি আমাদের থেকে অনেক মহৎ এবং উদার" "ব্যারনেস তাঁর চিঠিতে আমাকে লিখলেন "এবং উনি এখনও আমাদের অন্তর থেকে ভালবাসেন।"

কি অদ্ভুত ধরনের মেয়েলী-পুরুষ! তাঁর স্ত্রীর ওষ্ঠ চুম্বন করেছে এমন পুরুষকেও তিনি নিজের বাড়ীতে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন—তাঁর কি বিশ্বাস আমরা সেক্সলেস? ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি থেকে ভাইবোনের মত জীবন যাপন করব? এ যেন আমার পুরুষত্বের প্রতি অপমান। এরপর থেকে ওঁর অস্তিত্বই যেন আমার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ল।

বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতেই থাকতাম। সমস্ত মনটা হতাশার তিক্ততায় ভরে রইল। যে আপেলটার স্বাদ গ্রহণ করেছি; সেটা যেন আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ব্যারনেস অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছিলেন—তিনি আমার উপর সমস্ত দোষ চাপাতে সুরু করলেন—অথচ এই ব্যাপারে তাঁর শয়তানীতেই আমি প্রথম প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। আমার মনের উপর দিয়েও এবার একটা অত্যন্ত কুৎসিত চিন্তা খেলে গেল। ব্যারনেসের সঙ্গে আমি কি বেশী সংযত ব্যবহার করে এসেছি? যেভাবে চান সেভাবে আমাকে না পাওয়াতেই কি তিনি অধৈর্য হয়ে আমার থেকে সরে যেতে চান? যে অপরাধ করব না বলে আমি নিজেকে সংযত রেখেছি, বোধ হয় সেটা তাঁর অপরাধ বলে মনেই হয় নি? তাঁর কামনার দিকটা নিশ্চয় আমার থেকে অনেক বেশী তীব্র……তবু আমার মন বলছে—হে প্রিয়-দর্শিনী, তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে এস, আমি নানাভাবে, নানাদিকে

তোমাকে আলোকসম্পাতে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারব।

বেলা দশটার সময় ব্যারনের একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন যে তাঁর স্ত্রী গুরুতর রকম অসুস্থ।

আমি উত্তরে অনুরোধ জানালাম আমাকে একলা শান্তিতে থাকতে দিতে। আরও লিখলাম: অনেক দিন ধরে আমারই জন্য আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে ভুলে যান, আমিও আপনাদের ভুলে যাব। দুপুরবেলায় তাঁর দ্বিতীয় পত্র এল:

আবার আমাদের পুরাণো বন্ধুত্বকে ফিরিয়ে আনা যাক। আমি সব সময়েই আপনাকে শ্রদ্ধা করেছি এবং ভুল করা সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি অ-ভদ্র-জনোচিত কোন ব্যবহার করেন নি। আসুন অতীতকে আমরা বিস্মৃত হই। আমার সহোদরের মত আমার কাছে ফিরে আসুন—এই ব্যাপারটা আমি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলব।

তাঁর সহজ কথাবার্তার ভেতর দিয়ে একটা করুণ সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। আমাদের সম্পর্কে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ভাবটা আমার মনকে স্পর্শ করেছিল—উত্তরে আমি লিখলাম: আমার অন্তরে এ বিষয়ে একটা আশঙ্কার ভাব দেখা দিয়েছে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। আমাকে দূরে থাকতে দিন—ভবিষ্যতে এসব নিয়ে আর আমাকে উত্যক্ত করবেন না।

বিকেল তিনটের সময় ব্যারনের শেষ চিঠি পেলাম। ব্যারনেস নাকি মৃত্যু-পথযাত্রী, চিকিৎসক জবাব দিয়ে গেছে। তিনি আমাকে শেষ দেখা দেখতে চাইছেন। ব্যারন আবেদন করেছেন আমি যেন তাঁর স্ত্রীর এই শেষ অনুরোধ উপেক্ষা না করি। এরপর যেতেই হ'ল। পরে কত সময় ভেবেছি যদি না গিয়ে পারতাম! সত্যিই আমি একটা হতভাগা!

আমি গিয়ে হাজির হলাম। ঘরটা ক্লোরফর্মের গন্ধে ভুরভুর করছিল। ব্যারনকে দেখলাম অত্যন্ত উত্তেজিত—তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপার কি? আমি কিছুই জানি না—শুধু বুঝতে পারছি উনি মৃত্যুর দ্বারদেশে এসে পৌঁছিয়েছেন।

ডাক্তার কি বলেন?

ব্যারন মাথা নাড়লেন এবং বললেন—ডাক্তার জানিয়েছেন এটা তাঁর কেস নয়।

তিনি কোন প্রেস্‌ক্রিপসেন দিয়েছেন?

না।

ব্যারন আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন। এ ঘরটাকেই সিক্‌-রুম করা হয়েছিল। ব্যারনেস একটা কাউচের উপর শুয়ে ছিলেন—তাঁর চোখ বসে গিয়েছিল এবং সারা শরীরটা যেন শক্ত এবং টানটান লাগছিল দেখতে। তাঁর কেশরাশি এসে কাঁধের উপর পড়েছিল—চোখ দু'টি লাল টকটকে হয়ে উঠেছিল। তিনি হাতটা তুললেন—ব্যারন সেই হাতটা নিয়ে আমার হাতে দিলেন। আমাদের দু'জনকে সেখানে রেখে ব্যারন ড্রয়িংরুমে চলে গেলেন। আমি কিন্তু খুব বেশী অস্থিরতা অনুভব করলাম না, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে আমার মনে সন্দেহ জেগে উঠল।

জান, আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম?

শুনলাম।

তোমার তার জন্য দুঃখ হ'ল না?

হ'ল বৈকি।

তুমি মোটেই মুহ্যমান হও নি, তোমার দৃষ্টিতে কোন সহানুভূতি নেই, তোমার মুখে এতটুকু অনুকম্পার ভাব ফুটে ওঠে নি।

সে সবের জন্য ত তোমার স্বামীই আছেন।

কিন্তু তিনিই ত আমাদের আবার ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ করে দিলেন।

তোমার ঠিক কি ধরনের শরীর খারাপ বল ত?

আমি অত্যন্ত অসুস্থ, একজন বিশেষজ্ঞের সংগে কন্‌সাল্ট করতে হবে।

তাই না কি?

আমি খুবই ভয় পেয়েছি। অত্যন্ত শোচনীয় এবং ভীষণ অবস্থার ভেতর দিয়ে চলেছি। তুমি যদি জানতে কি দুর্ভোগ আমাকে ভুগতে হচ্ছে।...

...তোমার হাতটা আমার কপালে রাখ...এতে আমার ভাল হবে...আমার দিকে চেয়ে একবার হাস...

তোমার হাসি শুনলে আমি যেন নতুন ভাবে বেঁচে উঠি।

ব্যারন—

তুমি কি চলে যাচ্ছ? আমাকে এভাবে ফেলে রেখে?

তোমার জন্ম আমি কি করতে পারি বল?

ব্যারনেস এবার কান্না সুরু করে দিলেন।

তুমি নিশ্চয় চাও না এই বাড়ীতে বসে—যেখানে যে কোন মুহূর্তে তোমার সন্তান বা স্বামী আমাদের মাঝে এসে পড়তে পারেন—আমি তোমার প্রেমিকের মত ব্যবহার করতে সুরু করি? তুমি জানোয়ার! তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই। তুমি···গুডবাই ব্যারনেস!

সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ড্রয়িং রুম দিয়ে আসবার সময় ব্যারনও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। তাঁর সামলে নেবার চেষ্টাটা আমার নজর এড়ায় নি—দেখলাম অন্য দরজা দিয়ে স্কার্ট-পরিহিতা কে একজন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এবার আমার মনে সন্দেহ জাগল যে সমস্ত ঘটনাটাই একটা ফার্সে গিয়ে পর্যবসিত হ'ল।

আমি বাড়ীর বাইরে আসবামাত্র প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ব্যারন সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এই ধাক্কার আওয়াজ শুনে আমার মনে হ'ল যেন আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হ'ল।

আমার বেশ মনে হ'ল আমার উপরি উক্ত ধারণাটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়েছিল। দ্বৈত কাহিনী সমন্বিত একটি ভাবাবেগপূর্ণ নাটকের শেষ রহস্য উদ্ঘাটনে আমি যেন সহায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে এসেছিলাম।

এই যে রহস্যমণ্ডিত অসুস্থতা, এটা আসলে কি? হিষ্টিরিয়া? না, বিজ্ঞান এ রোগের নাম দিয়েছে নিম্ফোম্যানিয়া; সহজ কথায় এর অনুবাদ করলে নারীর তীব্র সন্তান কামনার ইচ্ছাকে বোঝায়—সময় এবং প্রচলিত রীতির সাহায্যে এই কামনাকে দাবিয়ে রাখা হয় বটে কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দান্ত আবেগের আঘাতে সংযমের সব বাঁধন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

ব্যারনেস এই সময়টায় খানিকটা সংযত জীবন যাপন করছিলেন, মাতৃত্বের দায়িত্ব বহন করতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন। অথচ দাম্পত্য জীবন তাঁর যৌন জীবনের সম্পূর্ণতা বা কাম পরিতুষ্টি আনতে সমর্থ হয় নি। ফলে প্রেমিকের উত্তপ্ত আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে তাঁর মনে বাধা আসে নি—এ ধরনের পাপে নিমজ্জিত হয়ে তিনি মনে মনে পাশবিক উল্লাস অনুভব করেছেন। আর ঠিক যে মুহূর্তে মনে করেছেন তার প্রেমিক সম্পূর্ণভাবে তাঁর করায়ত্ত ঠিক তখনই সে যেন তাঁর আঙুল ফস্কিয়ে বেরিয়ে গেছে। স্বামীর মত প্রেমিকও তাঁর দেহজ ক্ষুধা চরিতার্থ না করেই তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াতে ব্যারনেস যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। এই সময় তিনি অনুভব করেছেন যে ব্যারনকে বিয়ে করাটা তাঁর পক্ষে একটা মারাত্মক রকম ভুল হয়েছে। আর প্রেমের ব্যাপারটাও হয়ে পড়েছে নিদারুণভাবে করুণ। এদের সম্বন্ধে বিশ্লেষণ শেষ করে আমি এই উপসংহারে এলাম যে এঁরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের দাম্পত্য জীবনে সুখী না হওয়ার ফলেই দু'জনে অন্য জায়গা থেকে আনন্দ আহরণ করে নেবার চেষ্টা করেছেন। আমি সরে গেলে ব্যারনেস তাঁর স্বামীর কাছে আবার নতুনভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন এবং এরপর থেকে স্বামী ব্যারনেসকে সুখী করবার জন্য উদ্যোগ করবেন এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল।

তাঁদের পুনর্মিলন হয়েছে—সুতরাং ইতিমধ্যে অন্য যা সব ঘটেছিল সে সব শেষ হয়ে গেছে। শয়তানের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘটনার ওপর যবনিকাপাত হওয়াটা স্বাভাবিক।

কিন্তু যবনিকাপাত হ'ল কই? ব্যারনেস আবার আমার ঘরে আমার সংগে দেখা করতে এলেন এবং আমি তাঁর কাছে থেকে একটি সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি আদায় করে নিলাম। বিয়ের পর প্রথম বছরে তিনি নাকি দেহজ প্রেমোল্লাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। শিশু জন্মাবার পর থেকেই স্বামী তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে গেলেন—পরস্পরের সম্পর্কটা এরপর থেকে যেন কিরকম আলগা হয়ে গেল। তা হ'লে তুমি এই দানবের মত দেহাকৃতি-সম্পন্ন লোকটির সঙ্গে কখনও সুখী হ'তে পার নি বল?

না···দু' এক সময় অবশ্য···না, তাও না।

এখন ?

লজ্জায় ব্যারনেসের গাল দুটি লাল হয়ে উঠল।

ডাক্তার ব্যারনকে উপদেশ দিয়েছেন, অস্বাভাবিক জীবন যাপন করাটাও এক ধরণের পাপ।

এরপর ব্যারনেস সোফাতে গা এলিয়ে দিলেন এবং দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। এই সমস্ত ঘনিষ্ঠ স্বীকারোক্তির ফলে আমি সর্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। তাঁকে নিজের আলিঙ্গনে এনে সর্বাঙ্গে চুম্বন করলাম। তিনি কোন বাধা দিলেন না—সারা শরীরটা তাঁর থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল—ভারি ভারি নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, তারপর হঠাৎ বোধহয় মনে অনুশোচনা এল এবং আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তাঁর সমস্ত ব্যবহারটাই আমার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছিল।

আমার কাছে তিনি কি প্রত্যাশা করছিলেন ? সমস্ত কিছু! কিন্তু বিরাট অপরাধ করবার মত মানসিক শক্তি ত তাঁর ছিল না। জারজ সন্তানের জননী হবার আশঙ্কায় তিনি দেহের আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন। আবার তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিবিড়ভাবে তাঁর ওষ্ঠচুম্বন করলাম—আমি চেষ্টা করছিলাম তাঁর সর্বদেহে কামনার আগুন জাগিয়ে তুলতে। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তিনি সরে দাঁড়ালেন—কিন্তু তার আগেই···

এরপর ?···জিজ্ঞেস করলেন ব্যারনেস।

স্বামীর কাছে গিয়ে যা যা ঘটেছে সে সব বিষয়ে স্বীকারোক্তি কর। তাঁর কাছে গিয়ে সবকিছু বলব ?

কিন্তু আর ত বলার কিছুই নেই।

এরপর থেকে ব্যারনেস বারবার আমার কাছে আসতে লাগলেন। যখনই আসেন, বলেন তিনি খুব ক্লান্ত এবং সোফার উপর গা এলিয়ে দেন।

আমার নিজের ভীরুতার জন্য মনে মনে লজ্জিত বোধ করছিলাম। এই অবনতির জন্য ভেতরে ভেতরে রাগও হচ্ছিল—ভয় হচ্ছিল ব্যারনেস ভাবছেন আমি একটি অত্যন্ত বোকা ধরনের লোক। পরস্পর-বিরোধী কয়েকটি অনুভূতি এবং ভাবাবেগের সংঘর্ষে আমার আত্মসংযমও যেন ক্রমশঃ ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছিল।

যাই হোক, অবস্থাটা দাঁড়াল এই : সাধারণ শ্রেণীর এক যুবক অসাধারণ শ্রেণীর এক যুবতীকে নিজের মুঠোর ভেতর এনে ফেলল, একজন এ্যারিষ্টোক্র্যাট এক প্লিবিয়ানের কাছে ধরা দিল, এক শূকরপালক আর এক রাজকুমারী তাদের ভেতরকার সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের দৈহিক মিলনের আস্বাদ অনুভব করল। কিন্তু তার জন্য পুরুষটিকে যে নগদমূল্য দিতে হোল তার পরিমাণও কম নয়।

বেশ বুঝতে পারছিলাম আমাদের জীবনে একটা ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে। সহরে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যারনেসের সুনামে কলঙ্কের ছায়া এসে পড়ছিল।

এই সময় ব্যারনেসের মা আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। তিনি আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন—একথা কি সত্যি যে তুমি আমার মেয়েকে ভালবাস ?

হ্যাঁ, সত্যি।

এ কথা বলতে তুমি লজ্জিত বোধ করছ না ?

বরং আমি গৌরব বোধ করছি।

আমার মেয়েও আমাকে বলেছে যে সে তোমাকে ভালবাসে।

আমি আগেই জানতাম সে আপনাকে সত্যি কথাই বলবে···আপনার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত বোধ করছি। এর পরের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভাবতেও আমার বেশ খারাপই লাগছে, কিন্তু আমি নিজে কি করতে পারি ? এ ব্যাপারটা খুবই পরিতাপের।···কিন্তু তার জন্য আমাকে বা আপনার মেয়েকে দায়ী করা যায় না। বিপদের সূচনাতেই আমরা ব্যারনকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলাম। আর আমাদের এ কাজ নিশ্চয় ঠিক হয়েছিল ?

আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না —কিন্তু আমার মেয়ের, তার পরিবার বা তার মেয়ের উপর এসে কোন কলঙ্ক না পড়ে সেটা ত তোমাকে দেখতে হবে।

আমাদের যাতে কোনরকম ক্ষতি হয় এমন কাজ

নিশ্চয় তুমি করবে না? এরপর এই হতভাগ্য বৃদ্ধা মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমার মনটাও কি রকম নরম হয়ে এল। বললাম: কি করতে পারি আপনিই বলে দিন। সেই ভাবেই আমি এখন থেকে চলব।

আমি তোমাকে ব্যাকুলভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তুমি এ সহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাও।

বেশ তাই করব, কিন্তু এক সর্তে।

পরিষ্কার করে খুলে বল।

ম্যাটিলডাকেও আপনাকে বলতে হবে তার নিজের পরিবারে ফিরে যেতে।

এটা কি তোমার একটা অভিযোগ?

অভিযোগ বললে কম করে বলা হবে– আমি মনে করি এ ব্যাপারে সেই সব থেকে দোষী। ব্যারনের বাড়ীতে যতদিন ঐ মহিলা থাকবে, ওরা কখনও সুখের মুখ দেখতে পাবে না।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ওই মেয়েটা! আমি ওকে আমার ওর সম্বন্ধে কি ধারণা, তা খোলাখুলি ভাবেই শুনিয়ে দেব। তোমাকে কিন্তু কালকেই এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আপনি যদি খুশী হন, আজই যেতে পারি।

এই সময় ব্যারনেস এসে গেলেন এবং একটুও দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে বলতে সুরু করলেন: তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না—আর ম্যাটিলডাকে চলে যেতে হবে।

কেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন তাঁর মা।

কারণ বিবাহ বিচ্ছেদ করবার জন্য আমি মন স্থির করে ফেলেছি। শুধুত ম্যাটিলডার স্টেপ-ফাদারের সামনে আমার সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করেছে যেন আমি একজন বর্জিত নারী। আমি এ বিষয়ে ওদের একটু উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে চাই। কি বিশ্রী হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! কোন সংসারে যখন ভাঙন ধরে তার চেহারাটা হয় যেমন বেদনাদায়ক তেমনি কদর্য। কারোর মুখে কোন বাঁধন থাকে না, অসংহত হৃদয়াবেগ এবং বিকৃত চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে বাইরের লোকের কাছে।

ব্যারনেস আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে, ম্যাটিলডাকে লেখা তাঁর স্বামীর একটি চিঠি পড়ে শোনালেন—তাতে ব্যারন আমাদের দু'জনকে যথেষ্ট গালাগাল দিয়েছেন এবং মেয়েটির প্রতি এমনভাবে প্রেম নিবেদন করেছেন যাতে পরিষ্কার বোঝা যায় এ বিষয়ে তিনি আগাগোড়াই আমাদের প্রতারিত করে এসেছেন।

এদের জীবনে আবার নতুন দুর্ভাগ্য দেখা দিল। ব্যাঙ্ক থেকে সাধারণ বাৎসরিক ডিভিডেণ্ড এবার এঁরা পেলেন না। বেশ বুঝতে পারা গেল যে সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।

ভয়াবহ দারিদ্র্যের অজুহাত দেখিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়া হ'ল—কারণ ব্যারনের তখন সংসার চালানোর মত সামর্থ্য নেই। বাইরে ঠাট বজায় রাখবার জন্য ব্যারন তাঁর বাহিনীর কর্ণেলকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর স্ত্রী যদি অভিনেত্রীর পেশা গ্রহণ করেন তবে তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর চাকরির উপর এর কোন প্রতিক্রিয়া হবে কি না! কর্ণেল স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন ব্যারনেস যদি মঞ্চে যোগ দেন তা হ'লে ব্যারনকে সৈন্য বিভাগের চাকরি ছাড়তে হবে। এ্যারিষ্টোক্রেটিক কুসংস্কারের একটা চরম উদাহরণ পাওয়া গেল এর থেকে।

এই সময়টায় কি একটা আ[illegible]ক অসুখের জন্য ব্যারনেস ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বস্তুত স্বামীর সঙ্গে সেপারেটেড হয়ে গেলেও তিনি ঐ বাড়ীতেই থাকছিলেন। সব সময়েই তিনি শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করতেন এবং এই কারণে তাঁর মেজাজ খিটখিটে এবং মন হতাশায় পরিপূর্ণ থাকত। তাঁকে মনমরা ভাব থেকে জাগিয়ে তুলতে এবং আমার আত্মবিশ্বাস তাঁর ভেতর সঞ্চালিত করতে বার বার চেষ্টা করেও আমি ব্যর্থ হলাম। আমি তাঁর সামনে শিল্পীর রঙীন আশায় ভরা কর্ম জীবনের ছবি তুলে ধরলাম—যে জীবনে আমার মতই স্বাধীনভাবে নিজের বাড়ীতে তিনি

বিচরণ করে বেড়াতে পারবেন, দেহ এবং আত্মার সম্পূর্ণরূপ মুক্তি অন্তর দিয়ে উপভোগ করবেন। কিন্তু বৃথাই এ সব কথা বললাম—আমার কথাগুলো তাঁর কানে গেলেও, মর্মে স্পর্শ করল না।

এরপর উভয়পক্ষে একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল। ঠিক করা হ'ল, এ ব্যাপারে আইনের বিধি-ব্যবস্থা দু'পক্ষই ঠিকভাবে মেনে চলবেন এবং তারপর ব্যারনেস কপেনহেগেন চলে যাবেন—সেখানে তাঁর যে আঙ্কল থাকেন তাঁর বাড়ীতেই ব্যারনেস উঠবেন। কপেনহেগেনের সুইডিস কনসাল ব্যারনেসকে তাঁর স্বামীর গৃহত্যাগ করে চলে আসবার জন্ত চিঠি লিখবেন এবং তখন ব্যারনেস ঐ কনসালকে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের ইচ্ছা জানাবেন। এরপর তিনি স্বাধীনভাবে ভবিষ্য জীবনের পরিকল্পনা করতে পারবেন এবং ষ্টকহমে ফিরে আসবেন। বিবাহের সময় যে যৌতুক এবং আসবাবপত্র দেওয়া হয়েছিল তা ব্যারনেরই থাকবে—দু'চারটি জিনিষ শুধু ব্যারনেস ফিরে পাবেন। শিশুকন্যাটি বাপের কাছেই থাকবে—যতদিন না ব্যারন দ্বিতীয় বিবাহ করেন। অবশ্যই যখন ইচ্ছা হবে, ব্যারনেসের তাঁর মেয়েকে দেখবার অধিকার থাকবে।

আর্থিক প্রশ্ন নিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। তাঁর অবশিষ্ট সম্পত্তি যাতে নষ্ট হয়ে যেতে না পারে সেজন্য ব্যারনেসের বাবা আগেই নিজের সব কিছু মেয়ের নামে উইল করে গেছিলেন। ব্যারনেসের কুচক্রী মা কি ভাবে যে ঐ সম্পত্তির কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখেছিলেন জানি না—তিনি জামাইকে ঐ সম্পত্তির একটা অংশ মাঝে মাঝে দিতেন। কিন্তু এ ব্যাপারটা ছিল বেআইনি—তাই ব্যারন ঐ সমস্ত সম্পত্তি এখন দাবি করে বসলেন। এতে ব্যারনেসের মা রাগে আগুন হয়ে উঠলেন, এবং তাঁর ভাই অর্থাৎ ম্যাটিলডার বাবার কাছে জামাইয়ের নামে ম্যাটিলডাকে জড়িয়ে বিশ্রী কুৎসা সুরু করে দিলেন। এরপর সত্যিকার ঝড় উঠল—কর্ণেল ব্যারনকে ক্যাশিয়ার করবার ভয় দেখালেন। কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদের কেস তখন উঠি-উঠি করছে।

এইবার ব্যারনেস কিন্তু তাঁর সন্তানকে বাঁচাবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করতে সুরু করে দিলেন। আর এ ব্যাপারে আমাকে চিনির বলদের ভূমিকায় নামতে হ'ল।

ব্যারনেসের চাপে পড়ে আমাকে ম্যাটিলডার বাবার কাছে একটা চিঠি লিখতে হ'ল। এ চিঠিতে সবার দোষ, পাপ, অপরাধ, দুষ্কৃতির দায়িত্ব আমি নিজের ওপর নিলাম (ব্যারনেসের কথায়) এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করে জানালাম যে ব্যারন এবং ম্যাটিলডা সম্পূর্ণ নির্দোষী এবং নিষ্পাপ—তা ছাড়া মর্মাহত ঐ বাপের কাছে আমি আমার সমস্ত অপরাধের জন্ত ক্ষমা চাইলাম। অর্থাৎ আমাকে দেখাতে হ'ল সবকিছু কল্পিত দুষ্কার্যের জন্ত এ ক্ষেত্রে আমিই দায়ী এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত।

কি অদ্ভুত, সুন্দর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলাম বলুন দেখি! আমার প্রতি ব্যারনেসের ভালবাসা যেন উথলে উঠল—কারণ নারী হিসাবে এবার তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের মান, সম্মান, সুনাম সবকিছু পদদলিত করে চলে যাবার সুযোগ পেলেন।

ব্যারনেসের মা অনেকবার আমার বাড়ীতে এলেন। তাঁর মেয়ের প্রতি আমার প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে ব্যারনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু এ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। কারণ আমি শুধু ব্যারনেসের হুকুম অনুসারে কাজ করছিলাম। তা ছাড়া এ ব্যাপারে আমার ব্যারনের প্রতিই সহানুভূতি ছিল। যেহেতু তিনিই শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যৌতুকের টাকাটাও—সেটার সত্যিকার পরিমাণ কত কে জানে!—ন্যায়ত তাঁরই প্রাপ্য।

হায়, এই এপ্রিল মাসে, যখন বসন্তকালের অভ্যাগমে প্রেমিক-প্রেমিকা দেহ মন দিয়ে পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করবে—সে সময় আমাদের কি ভাবে কাটছিল! প্রেমিকা রোগশয্যায় শায়িতা—আর তাঁদের দুটি সংসার মিটমাটের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়ে যত কিছু নোংরা ঘাঁটছিলেন এই সাক্ষাৎকারের সময়। আমার অন্তর তিক্ত হয়ে উঠছিল এদের সান্নিধ্যে আসতে। চোখের জল, অভদ্রতা, গণ্ডগোল—এ সবই হয়ে পড়েছিল ওদের বাড়ীর নিত্য

নৈমিত্তিক ব্যাপার—এতকাল এঁরা ভদ্রতার আবরণে যেসব ঘৃণ্য এবং নীচ প্রবৃত্তিগুলোকে ঢেকে রেখেছিলেন, গোলমালের সময় সেসব কুৎসিত এবং বিভৎসরূপ নিয়ে ফুটে উঠছিল চোখের সামনে।

এই অবস্থায় আমাদের প্রেমের জীবনে যে একটা কাল ছায়া এসে পড়বে সেটাই ত স্বাভাবিক। প্রেমিকার সমস্ত মনোহারিণী গুণই নিঃশেষ হয়ে যায় যখন তাকে সর্বক্ষণ সাংসারিক কলহে ব্যাপ্ত থাকতে হয়—আর কথাবার্তা বলতে এখন একটি বিষয়ই ছিল আলোচনার বস্তু—বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সেই সংক্রান্ত আইনের কথা।

বারবার আমি চেষ্টা করতাম ব্যারনেসের মনটা সান্ত্বনা এবং আশার আবেগে ভরে দিতে—এটা যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আমার ভেতর থেকে আসত। তা নয়। কারণ আমার স্নায়বিক শক্তিও তখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। ব্যারনেস যেন আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে চাইতেন—আমার মনে হ'ত তিনি আমার মস্তিষ্ক এবং অন্তরের শাঁসটা শুষে নিয়ে আমাকে শুধুমাত্র ছিবড়েতে পরিণত করছিলেন। আমি যেন তাঁর ডাষ্টবিন—যত কিছু নোংরা, যত কিছু শোক, তাপ, ভয়ের ব্যাপার, সব এই ডাষ্টবিনে বিনা দ্বিধায় নিক্ষেপ করছিলেন। এই নারকীয় জীবনে আমি ক্রমশঃ হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ব্যারনেসের নজরে পড়ল যে আমি কাজ করছি। অমনি রাগে তাঁর মুখ কাল হয়ে উঠল। এরপর দু'ঘণ্টা ধরে, কখনও অশ্রু বিসর্জন এবং কখনও ওষ্ঠচুম্বনের সাহায্যে আমাকে প্রমাণ করতে হ'ল তাঁর প্রতি আমার গভীর ভালবাসার কথা।

ব্যারনেস মনে করতেন প্রেমিকের একমাত্র কাজ হ'ল প্রেমিকার সান্নিধ্যে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকা—তাকে প্রভুর মত শ্রদ্ধা করে সব সময় খুশী রাখবার চেষ্টা করা এবং তার জন্ম সবকিছু ত্যাগ করবার জন্ম প্রস্তুত থাকা।

এই বিরাট দায়িত্বের বোঝা যেন আমাকে প্রায় শেষ করে দিচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম অপ্রত্যাশিত সন্তান-সম্ভাবনা বা কোন একটি অতর্কিত বিপদের ফলে আমি বাধ্য হব ব্যারনেসকে বিয়ে করতে। তিনি দাবি করলেন এক বছরে তাঁকে আমার তিন হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে হবে—এই টাকা খরচ করে তিনি আর্টিষ্টিক ট্রেনিং নেবেন। তাঁর ড্রামাটিক ক্যারিয়ার সম্বন্ধে আমার কোন আস্থাই ছিল না। তাঁর উচ্চারণের ভেতর দিয়ে তাঁর ফিনিস-এ্যাকসেন্ট প্রকাশিত হয়ে পড়ত, তাঁর মুখাকৃতি মোটেই রঙ্গমঞ্চের উপযোগী ছিল না। আজেবাজে চিন্তা করে যাতে তাঁর মন খারাপ না হয় এজন্য আমি তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করতে শেখাতাম। কিন্তু তাঁর সারা মন জুড়ে থাকত তাঁর ব্যর্থ জীবনের অতীত অধ্যায়গুলো—অন্যমনস্কভাবে একটা কবিতা বলেই বুঝতে পারতেন তাঁর আবৃত্তি কত দোষ-ত্রুটিতে ভরা—এরপর তাঁর শোক যেন উথলে উঠত, শত চেষ্টা করেও তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম না।

ক্রমশঃ আমাদের প্রেমটা কি একটা অসহনীয় রূপ পরিগ্রহ করছিল। শুনেছি প্রেম মানুষকে শক্তির সাধক করে তোলে, বিপদকে জয় করতে শেখায়। কিন্তু আমাদের জীবনে ভালবাসা জিনিষটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যন্ত্রণা সৃষ্টির কারণ বিশেষ।

অন্তরে তীব্র আনন্দের অঙ্কুরোদ্গম হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে পায়ে দলে নষ্ট করে ফেলা হ'ল। যে প্রেম সম্পূর্ণভাবে নরনারীকে একসত্তায় পরিণত করতে পারে না—যে প্রেম দু'জনের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করে, তাকে ত ঠিক স্বর্গীয় ভালবাসা আখ্যা দেওয়া যায় না। মরীচিকার মতই তা অসার এবং অন্তঃসারশূন্য।

কিন্তু আমি ছিলাম একান্তভাবে একগামী পুরুষ—সুতরাং এক্ষেত্রে অন্য কোন নারীর প্রতি মনকে আসক্ত করব সে উপায়ও আমার ছিল না। আমার এই ভালবাসা যতই বেদনাপীড়িত হয়ে উঠুক না, এর থেকেই একটা তীব্র রসঘন আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করছিলাম। তাই আমি চাইছিলাম যে আমাদের ভালবাসাই আমাদের জীবনে চিরন্তন হয়ে উঠুক।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও নববিধান

শ্রীসংগ্রামসিংহ তালুকদার

যে মহাপুরুষের স্মৃতি তর্পণের জন্য আজ আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করছি—তাঁর জীবনালেখ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মহা উজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান। আমি আজ তাঁর জীবনের ঘটনাবলী বা ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করব না। আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শ বা জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছিলেন যোগীশ্রেষ্ঠ মুক্তাত্মা। মুক্তাত্মাদের জাগতিক তর্পণের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের আচরিত পথ বা আদর্শকে গ্রহণ করলেই তাঁদের আত্মারা প্রীতিপ্রাপ্ত হন। এই আদর্শ কি তাই নিয়ে আজ আমরা এখানে আলোচনা করব।

সর্ব্ব-ভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥ ৬।২৯ গীতা
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি॥
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্যতি॥ ৬ ৩০ গীতা

যোগাভ্যাসে যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে নিজ আত্মাতে দর্শন করেন। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে সমুদয় দেখে, তাহার নিকট আমি অদর্শন হই না সে আমার নিকট অদর্শন হয় না।

এই "সমদর্শনই সকল ধর্ম্মের অস্তিত্ব বা গোড়া। প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতরেই আমরা সমদর্শনের সাক্ষাৎ পাই। ব্যবহারিকভাবে দেখতে পাই খৃষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ বা সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রায় সকলেই নিজ নিজ স্বধর্ম্মিগণকে আত্মীয় বা আপনার বলে বিচার করেন ও পর ধর্ম্মাবলম্বিগণকে অনাত্মীয় বা পরজন বলে গণ্য করেন। আসলে কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম আর ঈশ্বর অস্তিত্ব না হয়ে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এক দৃষ্টিতে আপামর জনসাধারণকে বা সর্ব্বজীবকে নিজ আত্মার বলেই মেনে নেবার সহজ সরল সত্য তাকেই গ্রহণ করেছে। যেহেতু বিভিন্ন মার্গীয় সাধনায় বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি, যদি চ মূল সেই এক পরমেশ্বর তবুও ধর্ম্মাবলম্বিগণ সেই বিভিন্নতাকে দিয়ে আপন আপন গণ্ডি সৃষ্টি করে অন্যের প্রতি বৈরিতা বা অসম দর্শনের দ্বারা পরস্পর নানা প্রকার সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছেন।

হিন্দু দর্শনের ভিতরে স্থায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব মীমাংসা পর্য্যন্ত যদিও আমরা বিভিন্ন মত ও পথের ভিতর দিয়ে কর্ম্মকাণ্ডের পর্য্যালোচনার দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কিছু কিছু আভাস পাই—(অর্থাৎ প্রতীক উপসানার ভিতর দিয়ে) আসলে পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র থেকেই আমরা একটি নির্দিষ্ট পরম পুরুষের সাক্ষাৎ পাই। এইখান থেকেই গীতার মীমাংসায় আমরা উত্তর মীমাংসার অর্থাৎ বেদান্তের যুক্তিই গ্রহণ করেছি। সাংখ্য কর্ম্মকাণ্ডকে যুক্তির দ্বারা সত্ত্ব করে জ্ঞান কাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু জাগতিক কর্ম্মকে অপাংক্তেয় করবার জন্য নিজ সত্যকে দৃঢ়রূপে সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নাই। গীতার কথা ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উপরেও আর একটি পুরুষ আছেন যিনি উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষর সর্ব্বানি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তম পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
যো লোক ত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

১৫।১৬-১৮ গীতা

যস্মাৎ-ক্ষরমতীতোঽহম ক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর পুরুষ ও কূটাস্থ অক্ষর পুরুষ। ইহা ভিন্ন আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন যিনি পরমাত্মা। সেই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের ও অক্ষরেরও উত্তম সেই জন্য তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।

জ্ঞান মার্গীয় সাধনায়—কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যক্ত হয়েছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদীয়া ব্রহ্মকে নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

"রূপাদ্যা কাররহিতমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ নিরাকারমেব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যম। শঙ্কর ভাষ্য

ব্রহ্মকে—নিরাকারই নিশ্চয় করা উচিত। উপাধি সম্বন্ধ হইলেও তিনি সাকার (সসীম) হয়েন না। কারণ তাঁহার উপাধি স্বেচ্ছাকৃত।"

কিন্তু তা হ'লে শ্রুতির সগুণ ব্রহ্মের উপদেশ খণ্ডিত হ'চ্ছে। আসলে কিন্তু নির্গুণও সগুণেরই অবিশেষ—অর্থাৎ একই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুইই হ'তে পারেন। যেমন :

স এব নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে ॥

বৃহদারণ্যক।৩।৯।২৩

"এই পরমাত্মা 'নেতি নেতি' এই লক্ষণের লক্ষণীয়, তিনি অগৃহ্য ও গ্রহণের অতীত।" কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে :

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

ব্রহ্মসূত্র।৩।২।২৪

অর্থাৎ সংরাধনকালে (ধ্যানে) তিনি যোগীর ধ্যানগম্য হন। তারপরই—বৃহদারণ্যক বলছেন "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা বসু দানঃ। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৪

সেই অনাদি, পরমাত্মাই কর্ম্মফলদাতা। ভোক্ত ও ভোগ্য—প্রকৃতি ও পুরুষ সেই ঈশ্বরেরই বিভাব।

অদ্বৈত মতে জীবই ব্রহ্ম তার যে বদ্ধভাব সেটা অবিদ্যারই কল্পনা। "সোঽহম" "অহং ব্রহ্মাস্মি।" অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র পথ। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, যে সাধকের অন্তঃকরণ জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগদ্বারা পরিষ্কৃত হয়েছে তিনি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করেন। গীতা বলেছেন কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ধ্যান বা ভক্তিমার্গ যে কোনও মার্গের সাধনায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়।

রাজা রামমোহন দেখলেন যে বেদান্তের নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মকে জাগতিক পর্য্যায়ে ব্যক্তি সাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ সগুণ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনার পদ্ধতি বেদান্তে নিরুক্ত থাকা সত্বেও আবিলতা, পৌত্তলিকতা ও অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্মের বহিরঙ্গ নিয়ে সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"কে বহু খণ্ডিত করে বহু দেবতার পূজায় ব্যাপৃত। এবং নিজেদের মধ্যে দেবতা ভেদে চরম ভেদাভেদের দ্বারা সমাজ বিপথগামী। এই সুযোগে ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বহুল প্রচারিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। তখন তিনি বেদান্তের একেশ্বরবাদ ও ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতির অনুকরণে সর্ব্বসাধারণের জন্য মিলিত ব্রহ্ম উপাসনার ব্যবস্থা করলেন। (Congregational worship) তিনি সগুণ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করে বেদান্তের সবিশেষ ব্রহ্মকে জনসাধারণের নিকট প্রচার করলেন। তাঁর সঙ্গীতে পাই—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে
সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
তোমার প্রভাবে দেখি না থাকি একাকী ॥

রাজা রামমোহন।

তাঁর এই কার্য্য পর্য্যালোচনা করলে মনে হয় তৎকালের সমাজের কুসংস্কার ও পরধর্ম্ম গ্রহণের পথ বন্ধ করবার জন্য তিনি বৈদান্তিক ধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণীয় করবার জন্য সম্মিলিত ব্রহ্ম উপাসনার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তাঁর পরবর্ত্তী কালে তাঁর মানস-পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধন ধারার উন্মেষই হ'ল বেদান্তের শ্লোকের ভিতর দিয়ে।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিত ধনং।

এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। কাহারও ধনে লোভ করিও না।

তিনিও সগুণ অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের ভিতর দিয়ে ব্রহ্ম উপাসনার পদ্ধতি নিরূপণ করলেন। উদ্বোধন করলেন বেদান্তের শ্লোকের দ্বারা—

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবন মা বিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

আরাধনায় ব্রহ্ম স্বরূপকে আবাহন করলেন—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—
শান্তং শিবমদ্বিতম্ শুদ্ধম অপাপবিদ্ধম্।

ধ্যানে গায়ত্রী মন্ত্রকে গ্রহণ করলেন—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব। তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োন প্রচোদয়াৎ।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে বেদান্তের সগুণ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনাই পদ্ধতিরূপে নিরূপণ করে ব্রাহ্মধর্মকে মূল বেদান্ত ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

প্রার্থনায় তিনি গ্রহণ করলেন—

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়—
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

এই ধর্ম প্রায় সম্পূর্ণ বেদান্তবাদী ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। যদিও এই বেদান্ত ধর্ম বিশ্ব মানবতার ধর্ম বা ধর্মের প্রতীক বা সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মহান্ ধারক তবুও এ ধর্ম সনাতন হিন্দুরই ধর্ম। বৈদান্তিক ধর্মের যে নির্দ্দিষ্ট সাধন পদ্ধতি নিরুক্ত হয়েছে সেটা মহাসত্য সমন্বয়। কারণ সেই অনুরূপ সাধন পদ্ধতিই জগতের প্রত্যেক সাধক অনুসরণ করে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। কিন্তু বিভিন্ন মার্গে সাধনের ধারা ও কল বা সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার পরিবেশে যে যে ধর্মের প্রচার বিভিন্ন সময়ে হয়েছে সেই সেই ধর্ম প্রচারকদের সত্য সংগ্রহ ও সাধন ধারা গ্রহণ না করলে কোনও ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। পরন্তু বিশ্বজনীন ধর্ম বা এক ধর্মের গণ্ডিতে বিশ্ব মানবকে বদ্ধ করতে না পারলে এই পৃথিবীতে শান্তির আশা সুদূর পরাহত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন বৈদান্তিক ব্রাহ্ম ধর্মকে বিশ্বজনীন সাধু সমাগমের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করে এক অপূর্ব্ব বার্ত্তা প্রচার করলেন—"নববিধান—"

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম মন্দিরং।
চিত্তঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্র মনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি প্রীতি পরম সাধন।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ততে॥

নববিধানের এই হ'ল মূল মন্ত্র।

খ্রীষ্ট ধর্মের মূলে আছে—Love, hope and Charity (প্রেম, বিশ্বাস ও নিস্বার্থপরতা)।

ভগবৎ প্রেমের স্ফুরণে বিশ্বজনীন প্রেমের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। Hopeকে এখানে আমি বিশ্বাস বলছি এই অর্থে যে, আশা অনেকটা বিশ্বাসধর্মী। Hopeকে আমরা নির্ভর বলতে পারি। এই তিনটিকে symboliseও করা হয়েছে। Love এর Symbol Heart অর্থাৎ অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণই প্রেমের আবাসস্থল। অন্তঃকরণ যদি উদার না হয় তবে পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। এই অন্তঃকরণই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র যার উৎকর্ষ সাধনে মানুষ দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারে। Hope এর symbol anchor। এই আশাতেই মানব জীবনকে সকল দুঃখ-দৈন্য থেকে রক্ষা করে চলে। Charity-এর symbol cross। নিস্বার্থপরতা বা আত্মত্যাগ। একে আমরা বৈরাগ্যও বলতে পারি। তা হ'লে বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্যের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের সুসামঞ্জস্য আছে। আমরা এদের নববিধানে গ্রহণ করেছি। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ ও ইসলামের একেশ্বরবাদ একই বস্তু। 'একমেবাদ্বিতীয়ম' নববিধানের মূল মন্ত্র। বৌদ্ধ ধর্মের বিশিষ্ট কর্মবাদই ধর্মের প্রতিপাদ্য। নানাপ্রকার কর্মের বিশুদ্ধতায় অনুশীলন দ্বারাই আত্মজয় করা সম্ভব। আত্মজয় ও আত্ম-নির্ভরতার দ্বারা পঞ্চশীলের অনুশাসন বৌদ্ধ ধর্মের মূল। নববিধান এই পঞ্চশীলকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে নবসংহিতায়—

এখন কথা হচ্ছে নববিধানের আদর্শ কি? এবং নববিধানের অর্থ কি? সত্যের সমন্বয়ই নববিধানের আদর্শ। যত সত্য বিগতযুগে এই পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে বা অনাগত যুগে প্রচারিত হবে সেই সকল সত্যের মহা সমন্বয়ই নববিধানের আদর্শ। নববিধান হচ্ছে—

It is a divine Crucible in which fashion of truths of all religions and scientific researches has taken place. Navabidhan is a digest of all truths.

নববিধান এ সকল সত্যকে কেবল যে গ্রহণ করেছে তাই নয়—নববিধানের জীবনে এই সকল সত্য পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা শিখেছি ব্যক্তিগত প্রার্থনা। (individual aspiration to commune with the Almighty through prayer), সমাজগত প্রার্থনা (community prayer) বিশ্বগত প্রার্থনা, (congregrational prayer with the people of the world)। আমরা নববিধানের আদর্শরূপে—universal Fatherhood of God and brotherhood of mankind-কে গ্রহণ করেছি।

"উদার চরিতানাম্ তু বসুধৈব কুটুম্বকং"

নববিধানের ত্রিনীতি হ'ল "ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান"। যোগকে রজ্জুরূপে গ্রহণ করে সেই যোগের পথে এই তিন মার্গের সমন্বয়ই নববিধানের বিশিষ্ট সাধন ধারা।

গীতায় যোগকে বলা হয়েছে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" কর্ম্ম করবার কৌশলই যোগ। নববিধান আরও অগ্রসর হয়েছে। নববিধান বলছে যোগ শুধু কর্ম্ম করবারই কৌশল নয়, যোগের দ্বারা ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরার্পণ দ্বারা যোগের আশ্রয় গ্রহণ করলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাঁর সঙ্গে যোগ হ'ল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা উপজাত হয়। শ্রদ্ধাকেই গীতায় ভক্তি বলা হয়েছে। ভক্তিলাভ হ'লেই শুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তি মচিরেণাধি গচ্ছতি। ৪ ৩৯ গীতা

ভাগবতে কিন্তু শ্রদ্ধাকে ভক্তি বলা হয় নাই। শ্রদ্ধা সেখানে ভক্তির অনুগামিনী। আগে যাঁর সঙ্গে যোগ হ'ল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগে ও তারপর গভীর শ্রদ্ধায় ভক্তি উপজাত হয়। এক জন্মে ভক্তি উপজাত হ'লে জন্ম জন্মান্তরে মহা মহীরুহরূপে রূপান্তরিত হয়। ভক্তি অহেতুকী। ভক্তির আবির্ভাব হ'লেই মানব অন্তর বিশিষ্ট কর্ম্মপ্রবাহে ধাবিত হয়। ভক্তি সম্মার্জ্জনী হাতে নিয়ে কর্ম্মকে শুদ্ধ করে ও পরাজ্ঞানের পথে নিয়ে চলে।

"অহেতুক্য ব্যবহিতা সা ভক্তি পুরুষোত্তম।"
ভাগবত ৩,২৯,১২

শাণ্ডিল্য সূত্রে বলা হয়েছে "সাঃ ভক্তি পরানুরক্তিশ্বরে।"
ঈশ্বরের প্রতি পরা অর্থাৎ নিরতিশয় যে প্রীতি—তাহাকেই ভক্তি বলে (শাঃ সূ-২)

ভাগবতে ভক্তির নয় প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—
।। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চাং, বন্দনং, দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্।
(ভাগবৎ ৭,৫,২৯)

এই ভক্তিই নারদের ভক্তি সূত্রে একাদশ ভাগ করা হয়েছে (না, সূ ৮২। শাস্ত্রে জ্ঞানকে নিষ্ঠা অর্থাৎ সিদ্ধা অবস্থার চরম অবস্থা বলা হয়েছে। কিন্তু ভক্তিকে নিষ্ঠা বলা হয় নাই। অনুভাবাত্মক জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। এই সিদ্ধান্ত জ্ঞান ও ভক্তি দুই মার্গেই সমান। অধ্যাত্ম বিচার কিংবা অব্যক্তোপাসনার দ্বারা পরমেশ্বরের যে জ্ঞান হয় তা ভক্তির দ্বারাও হ'তে পারে গীতাতে এ সিদ্ধান্ত আছে :—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতে যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।"
(গীতা ১৮,৫৫)

"ভক্তির দ্বারা আমার স্বরূপের তাত্ত্বিক জ্ঞান হয় এবং পরে জ্ঞান হইবার পর সেই ভক্তি আমাতে আসিয়া মিলিত হয়।"

অধ্যাত্ম শাস্ত্রে কর্ম্মের ক্ষয় জ্ঞানের দ্বারা হয় এরূপ বলা হয়েছে। কিন্তু নির্গুণ পরব্রহ্মের ভজনা জীবের পক্ষে সাধ্যাতীত হওয়ায় সগুণ পরব্রহ্মের উপাসনাই গ্রহণীয়। কারণ যদি বলি তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই তবে তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই কর্ম্ম, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই কর্ম্ম সম্পাদক এবং তিনিই ফলদাতা তবে তাঁর প্রতি ভক্তি হওয়া স্বাভাবিক ও সেটাই ভক্তি মার্গের সাধন।

গীতায় বৈদিক জ্ঞান মার্গকে শ্রদ্ধাপূত করা হয়েছে ও বৈদিক ভক্তি মার্গকে জ্ঞানপূত করা হয়েছে। নববিধানে ব্রহ্মানন্দ ভক্তি মার্গকে কর্ম্মপূত ও জ্ঞানপূত করে সমন্বয় যোগে একাত্ম করেছেন।

"কহহে নববিধান মূর্ত্তিমান এ জীবনে,
যোগ-ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান সবাকার সম্মিলনে।"

ভক্তি মার্গ শ্রদ্ধাপূর্ণ, প্রেমগম্য ও প্রত্যক্ষ হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের আচরণ করবার যোগ্য। এবং ভক্তি যে নিষ্কাম কর্ম্ম করবার অনুপ্রেরণা প্রদান করে ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উৎস খুলে দেয় এর প্রমাণ নববিধান শাস্ত্রে 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' ব্রহ্মানন্দ সাধু অঘোরনাথকে ভক্তিযোগ শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রমাণিত করেছেন।

গীতা বলছেন কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের যে কোনও একটাতেই মোক্ষ লাভ হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ বললেন, যোগকে রজ্জুরূপে রেখে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমাহারে ব্রহ্ম সান্নিধ্যে পৌঁছুতে হবে। এবং এই প্রত্যেকটি মার্গ অবলম্বন করে যে সকল সাধক সাধন করে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন তাঁদের সাধন ধারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে গ্রহণ করে পূর্ণতা লাভ করতে হবে নববিধানের এই সিদ্ধান্ত। শুধু ভক্তির পথ অবলম্বন করে থাকলে চলবে না। ভক্তির দ্বারা হৃদয়কে নির্ম্মল কর, কর্ম্মযোগ অবলম্বন করতে হবে। কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন ও ঈশ্বরার্পণ কর্ম্মযোগের এই শ্রেষ্ঠ-নীতি অবলম্বন করে ঊর্দ্ধ জ্ঞান মার্গে পৌঁছুতে হবে।

"চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মানি ময়ি সংন্যস্যমৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগ মুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।। গীতা ১৮,৫৭
"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম।। গীতা ৯।২৭

"চিত্তযোগে সমুদয় কর্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক নিরন্তর মচ্চিত্ত হও।"

"যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর যাহা কিছু দাও, যাহা কিছু তপস্যা কর সে সমুদয় আমায় অর্পণ কর।"

নবসংহিতায় দৈনন্দিন সকল কর্ম্মে, জীবনের বিশিষ্ট কর্মানুষ্ঠানে, ও সামাজিক জীবনের সকল কর্ম সংগ্রহের সকল অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি শরণাপন্ন হয়ে তাঁকেই সকল কিছু সমর্পণের যে নির্দেশ রয়েছে তার সঙ্গে গীতার উপরোক্ত শ্লোকের গভীর সামঞ্জস্য বর্ত্তমান।

ভাগবতে একটি সুন্দর শ্লোক আছে :—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মং স্তাপত্রয় চিকিৎসিতম।
যদীশ্বরে ভগবতে কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব ত্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৪।৩২-৩৬

যে দ্রব্যের কারণে যে রোগ উৎপন্ন হয়েছে সে দ্রব্য সেবনে সে রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রণালী মতে দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায় তবেই তার দ্বারা রোগের শান্তি হয়। সেইরূপ এই যে তাপত্রয়ভবরোগ এর উৎপত্তি কর্ম হ'তে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা তার উপশম হয় না। কিন্তু সে কর্ম যদি ব্রহ্মে সমর্পিত হয় তবে ঈশ্বর দ্বারা ভাবিত সেই কর্ম দ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন সাধিত হয়।

"জাগো পুরবাসী (নরনারী) সবে কর হরি গুণ গান।
জাগিল নিখিল বিশ্ব, হইল নিশা অবসান।
উঠি নবোদ্যমে, জীবন সংগ্রামে, হও বেগে ধাবমান,
প্রভুর ইচ্ছায় জীবের সেবায় দাও আত্ম বলিদান।
নবজাত প্রেম কুসুম অঞ্জলি ভক্তি ভরে হরিপদে দাও ঢালি,
নেহার সে রূপ প্রেম আঁখি খুলি গাইবে নবীন প্রাণ।

এখানে কর্মকে ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মভাবিত করা হয়েছে ও সে কর্মজীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে জীবের সেবায় উৎসর্গীকৃত।

আর এক জায়গায় পাই জীবন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে জীবন্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি। ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ :—

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান
এ যে দেখিবার ধন অমূল্য রতন
তৃপ্ত হয় কি মন করে অনুমান।
এই তো সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই তো পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়, পূর্ণকর্ম্মা পুরুষ প্রধান।
এই তো চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই তো দয়াল হরি হৃদয় রতন,
এই তো প্রাণেশ্বর প্রাণের ভিতর কোথা যাব আর করিতে সন্ধান।
এই তো নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গান;
কিবা পূর্ণ প্রভা অপরূপ শোভা, শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।
স্থানেতে এখানে কালেতে এখন, প্রাণসখা আমার প্রিয় দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হাসালে হৃদয় হয় যে স্পন্দন॥

এই যে গভীর একাত্মা বা ব্রহ্মসমন্বয় যোগ এর বিশদ আলোচনা করেছেন ব্রহ্মানন্দ তাঁর ইংরেজি "Yoga"-এর হইতে —

We see in the earliest or Vedic period, communion with God in Nature: This is objective Yoga. Then we have in the Vedantic period communion with God in the soul; this is subjective Yoga. Thirdly, in the Pouranic period we find communion with God in History or with the God of Providence: This is Bhakti or Bhakti-yoga. A little reflection will discover an analogy at once striking and suggestive. Here in Hindu theology, is a trinity which manifests a wonderful family likeness to the Christian Trinity. The only difference is in the order of development. In all other respects the coincidence of idea and sentiment is most remarkable. In Christianity, we have the Father, the Son and the Holy spirit; in Hinduism we have the Father, the Holy spirit and then the Son. These three ideas represent the different modes of divine manifestation and characterize three distinct periods in the history of Hinduism.

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে যে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প যোগের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে আমরা পাই—অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ১।১২ সূত্র

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য আয়ত্ত হইলে যোগী শ্রদ্ধা, উৎসাহ, স্মৃতি, একাগ্রতা এবং প্রজ্ঞার (বিবেক) সাহায্যে প্রথমতঃ 'সম্প্রজ্ঞাত' (সবিকল্প) সমাধি লাভ করেন। পরে অভ্যাস দৃঢ়তর এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলে "অসম্প্রজ্ঞাত" (নির্ব্বিকল্প) সমাধি তাঁহার আয়ত্ত হয়। ইহাই যোগের চরম।

ব্রহ্মানন্দ বিজয়কৃষ্ণকে যে যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি এই যোগ শিক্ষায় এক পাদ আরও অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর যোগ প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্যের সমাহারে ঈশ্বর ভাবিত পূর্ণ যোগাবস্থা। এ যোগ পদ্ধতি গীতা ও উপনিষদ উক্ত যোগ পদ্ধতির চরম উৎকর্ষ। নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বাণ লাভ করবার পরবর্ত্তী অবস্থা সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন।

নববিধানে যে সাধন পদ্ধতি আমরা লাভ করেছি সে হ'ল যোগ ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানের বিচিত্র ও মহাসমন্বয় ও এই সমন্বয় প্রত্যেকের ভিতরে গ্রহণ করে সাধনের শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়া। সেই পর্য্যায়ে আমরা পৌঁছুলে তখন আমরা ব্রহ্ম affinity বা ব্রহ্ম স্বভাব-প্রাপ্ত হয় বা ব্রহ্ম সান্নিধ্য লাভ করব। ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ ও মানব জীবনের পরমাগতি।

"কর হে নববিধান মূর্ত্তিমান এ জীবনে,
যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান সবাকার সম্মিলনে।
সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান, ঋষিদের যোগধ্যান,
মুশার বিবেক নীতি, যাচি তব শ্রীচরণে।
ঈশার অভেদ ভাব, চৈতন্যের মহাভাব
শাক্যের নির্ব্বাণ দয়া, দাও দীন অকিঞ্চনে।
মহম্মদের নিষ্ঠা রতি, ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তি
জনকের অনাসক্তি সঞ্চার হৃদয় মনে।"

অনুগীতাতে জনক ব্রাহ্মণ সংবাদে জনক ব্রাহ্মণের রূপধারী ধর্ম্মকে এইরূপ বলছেন:

শৃণু বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত্বা সর্ব্বত্র বিষয়োমম।
নাহমাত্মার্থ মিচ্ছামি গন্ধান্ ঘ্রাণ গতানপি॥
নাহ মাত্মার্থ মিচ্ছামি মনো নিত্যং মনোহরন্তে।
মনোমে নির্জ্জিতং তস্মাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥
(মহা—অশ্ব ৩২,১৭-২৩)

যে বৈরাগ্য বুদ্ধি মনে রাখিয়া সমস্ত বিষয়ের আমি সেবা করিয়া থাকি তাহা তোমাকে বলিতেছি শোন। আমি নিজের জন্য গন্ধ আঘ্রাণ করি না, চোখে আপনার জন্য দেখি না এবং মনকেও আত্মার্থ অর্থাৎ আপন লাভের জন্য ব্যবহার করি না। অতএব আমার নাক, চোখ ইত্যাদি ও মনকে জয় করিয়াছি তাহারা আমার বশে আছে।

যে গভীর আত্মত্যাগের চরম অবস্থায় রাজর্ষি জনক পৌঁছেছিলেন অর্থাৎ সংসার ও রাজ্য পরিচালনার সকল কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পূর্ণরূপে সম্পাদন করে সম্পূর্ণ অলিপ্ত থেকে সাধনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন সেই আদর্শের অনুপ্রেরণা আমরা পাই ব্রহ্মানন্দের 'নবসংহিতায়' এই কর্ম্মময় জগতে বিশেষ করে আধুনিক মানব জীবনে কর্ম্মই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু যদি নিছক কর্ম্ম করতে গিয়ে কর্ম্মের নাগপাশে নিজেকে আবদ্ধ করি তবে আত্মতত্ত্ব বা মানব জীবনাদর্শ সম্পূর্ণ ভুলে যাব। মানব জীবনাদর্শ হ'ল ঈশ্বরার্পণের দ্বারা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাজনিত কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করা।

"কর্ম্মণ্যে বাধি কারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব কর্ম্মণি।
গীতা ২ ৪৭

"কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলেতে নহে। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না; কর্ম্ম করিব না, এরূপও তোমার নির্ব্বন্ধ না হয়।"

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥
গীতা ২।৪৮

"সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান থাকিয়া, হে ধনঞ্জয় কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর; সমত্বকেই যোগ বলিয়া থাকে।"

"কর্ম্ম করিব অথচ কর্ম্মফলে নির্লিপ্ত থাকিব। সংসারে থাকিয়া যোগী হইব, ভক্ত হইব, প্রেমিক হইব, কর্ত্তা হইয়া সকলের সেবা করিব, ধর্ম্মগুরু হইয়া সকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরার্থে নিয়োজিত করিব"—এই হ'ল নববিধানের আদর্শ।

আমরা নববিধানে গ্রহণ করেছি খ্রীষ্টকে ও তাঁর বৈরাগ্য, আত্মত্যাগ ও মহা প্রেম ধর্ম্মকে। বুদ্ধকে গ্রহণ করেছি ও তাঁর মহাকর্ম্ম সাধনকে, তাঁর আত্মাশ্রিত বিশুদ্ধ কর্ম্ম প্রেরণাকে যে কর্ম্ম প্রেরণা সত্য শক্তির দ্বারা নির্জ্জিত হয়ে মানব জীবনাদর্শের ও মানব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম

বিকাশের পথে পদচারণ করে। আমরা গ্রহণ করেছি মোহম্মদকে, তাঁর নিরতিশয় নিষ্ঠা, যে নিষ্ঠার দ্বারা তিনি তাঁর 'একেশ্বরবাদকে' পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা গ্রহণ করেছি কনফিউসিয়াসকে ও তাঁর মানব জীবনের গভীর নীতিবোধকে, আমরা গ্রহণ করেছি মুষাকে যিনি ঈশ্বর সমর্পিত জীবনে তাঁর বাণী শ্রবণের দ্বারা পূর্ণ ঈশ্বর ভাবিত হয়েছিলেন। আমরা গ্রহণ করেছি চৈতন্যদেবকে যাঁর অহৈতুকী ভক্তির স্রোতে ভেসে গিয়েছিল ভারতবর্ষ। আমরা গ্রহণ করেছি নানককে যাঁর বৈরাগ্য ও অনাসক্তির গভীর সাধনে ঈশ্বর প্রীতির প্রেম বন্ধন লাভ হয়েছিল। আমরা গ্রহণ করেছি কবীর, দাদুর, তুলসীদাস, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বাসুদেব, রামচন্দ্র, জনক, যাজ্ঞবল্ক, গার্গী, মৈত্রেয়ি, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শঙ্ক, সক্রিটিস, নিউটন ইত্যাদি সকলকে ও সকলের সাধন ধারাকে। আমরা নববিধানে সকল সত্যের মহা সমন্বয় সাধন করেছি।

"নববিধানের জয় রে, কর ঘোষণা।
যার গুণে হ'ল সর্ব্বধর্ম সমন্বয় রে। (কর ঘোষণা)
প্রেমানলে গ'লে সব হ'ল একাকার রে।
(কর ঘোষণা)

যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান, ত্যজিল বিবাদ রে ;
বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ গায় একেশ্বর রে।
(কর ঘোষণা)

ঈশা মোহম্মদে জনক, আলিঙ্গন দেয় রে,
গৌর সিংহ শাক্য সিংহের গলা ধ'রে নাচে রে।
(কর ঘোষণা)

সত্যের বিজয়ডঙ্কা, বাজিল জগতে রে ;
উড়িল বিধান নিশান ভারত আকাশে রে।
(কর ঘোষণা)

গাঁথিয়া বিধান সূত্রে, ভক্তরত্ন হার রে ;
পরি গ'লে, সবে মিলে, বল জয় জননী রে।
(কর ঘোষণা)

ভূত, ভবিষ্যৎ কাল, হ'ল বর্ত্তমান রে ;
মিশিল নববিধানে প্রাচীন বিধান রে। (কর ঘোষণা)

সকলের সাধন ধারাকে ও সকল সাধন উপলব্ধিকে আপন অন্তরে নিষ্কিত করে সেই নির্য্যাস গ্রহণ করে মহামানবতার ধর্ম্মকে জাগ্রত করেছে নববিধানে। এই হ'ল Synthesis of Religions ও এই হ'ল সত্য সমন্বয়। ধর্ম্মের বহিরাঙ্গিক প্রতীকের সমন্বয়কে Synthesis of Religions রূপে কখনই গ্রহণ করতে পারি না। ধর্ম্মের প্রতীককে ব্রহ্মানন্দও গ্রহণ করেছেন। নববিধানকে Universal Religion রূপে Symbolise করবার উদ্দেশে ও নববিধান মন্দিরকে সেই Symbol-এর দ্বারা চিহ্নিত করবার প্রয়াসে। এই বহিরঙ্গের ভিতরে যে অন্তরঙ্গ চিহ্নিত প্রেমস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত তার অন্তর্নিহিত সত্তায় রয়েছে।

Fatherhood of God and universal brotherhood of mankind. Navabidhan is a digest of truths, it is the universal Religion of mankind of the universe, it is a mother of pearl and it is the future Religion of the world.

করুণাকুমার নন্দী

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

ভারতজোড়া সাধারণ নির্বাচনের উত্তেজনা ইতিমধ্যে খানিকটা প্রশমিত হয়েছে এবং এর মোটামুটি ফলাফল ও তার নিরপেক্ষ তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ এখন সম্ভব এবং প্রয়োজনও বটে। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, ভারতের ষোলটি রাজ্য বিধান সভার মধ্যে অন্ততঃ আটটি রাজ্য বিধান সভায় কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবার বিধ্বস্ত হয়েছে, যথা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান; দিল্লী পৌরসভাতেও কংগ্রেসের প্রভাব সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ কথা ঠিক যে, একমাত্র কেরল রাজ্য ব্যতীত এ-সকল রাজ্যের বিধান সভাগুলিতে কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা অন্যান্য দলের তুলনায় বৃহত্তম; কিন্তু এ সকল রাজ্যের নবনির্ব্বাচিত বিধান সভায় অকংগ্রেসী সদস্যরা একত্র জোট বাঁধায় ফলে কংগ্রেস দলের তরফ থেকে সরকার গঠনের কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু যে কোন কোন রাজ্যে অকংগ্রেসী জোটের দ্বারা সরকার গঠনের পথে কিছুটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে—বিশেষ করে যে সকল রাজ্য বিধান সভায় কংগ্রেসীদের তুলনায় এই প্রকার জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অত্যন্ত ক্ষীণ—সে কথা বলাই বাহুল্য। নূতন নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেসের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে সকল রাজ্য বিধান সভায় রক্ষা করা গিয়েছে তাদের মধ্যে আছে আসাম, অন্ধ্র প্রদেশ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ও হিমাচল প্রদেশ; নব-গঠিত হরিয়ানা রাজ্যে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরাসরি নির্ব্বাচনের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় নি; কয়েকটি নির্ব্বাচিত নির্দ্দলীয় সদস্যকে ভাগিয়ে এনে এই রাজ্যটিতেও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

এর মধ্যে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নূতন নির্ব্বাচনের ফলে যে সকল রাজ্যের বিধান সভাগুলিতে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, সে সকল অঞ্চলেও এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ অতীতের তুলনায় অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফলে, আশা করা যায়, লোকমতের এই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির ফলে কংগ্রেসী সরকারের যথেচ্ছাচার ও কুশাসন—যে সকল রাজ্যে এখন কংগ্রেস সরকার চালু থাকবে—অনেকটা পরিমাণে দমিত হবে। এই দলের পুরাতন শক্তি যে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া যায় সংসদীয় নির্ব্বাচনের ফলাফল থেকে। রাজ্য বিধান সভাগুলিতে এবং বিশেষ করে সংসদে কংগ্রেস দলের প্রবল সংখ্যাধিক্যের ফলে গত উনিশ বৎসর ধরে কংগ্রেস দল জনমত ও জনকল্যাণের জরুরী প্রয়োজনগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এসেছে। কেবলমাত্র দলীয় যথেচ্ছাচার চালু রাখবার তাগিদে ক্ষমতারূঢ় দলের সুবিধাজনক সংবিধান-সংশোধন (Constitutional amendment) উনিশটি বার করা হয়েছে। এই সকল সংশোধনের দ্বারা কেবলমাত্র শাসন-সংস্থার অনুকূলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করে নেওয়া হয়েছিল শুধু তাহাই নয়, কতকগুলি ক্ষেত্রে নাগরিকের সংবিধান অনুমোদিত মৌলিক অধিকারগুলিও অনেকটা পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। এ-সকল কংগ্রেসী অপকীর্ত্তি সম্ভব হয়েছিল একমাত্র সংসদ ও রাজ্য বিধান সভাগুলিতে কংগ্রেস দলের এতাবৎ অতি প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে। সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে (Full Bench Judgement) সিদ্ধান্ত

হয়েছে যে, সংবিধানের কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা অনুযায়ী নাগরিকের মৌলিক অধিকার সঙ্কোচনমূলক সংবিধান-সংশোধনের অধিকার সংসদের অধিকারের অন্তর্গত নহে; কিন্তু যেহেতু ভুলক্রমে এইরূপ সংবিধান-সংশোধনের ফলে বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক গোলযোগের সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে, সেই হেতু, উক্ত রায়টিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই রায়ের কার্য্যকারিতা কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হ'তে পারবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংবিধানের সংশোধনের দ্বারায় যদি নাগরিকের মৌলিক অধিকারের সঙ্কোচন ঘটান প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তা হ'লে সুপ্রীম কোর্ট নির্দ্দিষ্ট সংবিধানের ধারাগুলির অগ্রিম সংশোধন প্রয়োজন হবে। কিন্তু সংসদে যদি সংবিধান-সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়, তবে সেটি অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সক্রিয় অনুমোদনের দ্বারা পাশ করাতে হবে। সংসদে নূতন নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এতটা পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে যে, বিরোধী দলগুলির সহযোগিতা ব্যতীত এই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেসের আয়ত্তে আর নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৮টি কিংবা সম্ভবতঃ হয়ত ৯টি মাত্র রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন পূনর্ব্বহাল হবে এবং কেন্দ্রেও কংগ্রেসী শাসন কায়েমী থাকবে। তবে এই কয়টি রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সংসদেও কংগ্রেসী সংখ্যাধিক্যের প্রাবল্য প্রভূত পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে। বাকী সাতটি কি আটটি রাজ্যে অকংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে সমগ্র দেশের প্রশাসনিক ঐক্যের (administrative integration) অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটা গভীর চিন্তার বিষয়। অনেকে হয়ত এই কথা মনে করে আশ্বাস বোধ করতে পারেন যে, যে সকল রাজ্যে অকংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হবে, সে সকল অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার আপন আপন এলাকার মধ্যে সার্ব্বভৌম তার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব তেমন বিঘ্নকর হবার আশঙ্কা নেই। বিশেষ করে কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস জ্ঞাপন করেছেন; এর ফলে এ সকল অকংগ্রেসী রাজ্য সরকার এবং কংগ্রেস-শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে কোন বিশেষ মতানৈক্যের আশঙ্কা অমূলক বলে অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একদিকে সাতটি কি আটটি অকংগ্রেসী রাজ্য সরকার ও অন্যদিকে আটটি কি নয়টি কংগ্রেস-শাসিত রাজ্য সরকারের সম্বন্ধটি জটিলতামুক্ত হবার আশা নিতান্তই আশাবাদ ভিত্তিক বলে আশঙ্কা হয়।

প্রথমতঃ রাজ্য সরকারগুলির সার্ব্বভৌমত্বের (autonomy এলাকায় গত উনিশ বৎসরের দ্বিধাহীন এবং সামগ্রিক কংগ্রেস শাসনের ফলে খুবই গভীর পরিমাণে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ (concurrent) ক্ষমতার এলাকাগুলির সবিশেষ সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর ফলে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। এ ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যেও কেন্দ্রীয় সহযোগিতার উপর রাজ্য সরকারগুলি বিশেষ করে নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে এইরূপ একটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করলেই এই কথাটির তাৎপর্য্য স্পষ্ট হবে। সে বিষয়টি খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্যগুলি এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্য সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। কতকগুলি রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি সিদ্ধান্ত এই ব্যবস্থাটিকে অত্যন্ত জটিল করে রেখেছে। সামগ্রিক কংগ্রেসী শাসনের কালেও এ সকল সিদ্ধান্তের ফলে কয়েকটি কংগ্রেস-শাসিত ঘাটতি রাজ্য—উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—অতীতে অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে। বর্ত্তমানে অকংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কি প্রকারের ব্যবহার বা সহযোগিতা আশা করতে পারে সেটা চিন্তার এবং আশঙ্কারও বিষয়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচন থেকে একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা এই যে, দেশের সাধারণ মানুষ কংগ্রেসী দুঃশাসনের অবসান ঘটাবার জন্য অবশেষে জাগ্রত ও বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে এই মনোভাবের পূর্ব্বাভাষ মাত্র পাওয়া গেল। ভবিষ্যতে যে এই মনোভাব আরো দৃঢ় ও স্থির সঙ্কল্প হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন সঙ্গত কারণ নেই। তবে যে

সকল রাজ্যে বিরোধী জোট মারফৎ এখন অকংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হবে, সে সকল জোটের নেতৃগোষ্ঠীর একটি মূল বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেটা এই যে বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের ফলাফল থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট করে বোঝা যায়, যে নির্ব্বাচক মণ্ডলী, অর্থাৎ দেশের বৃহত্তর জনগণ এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের গভীর অনাস্থার কথাটাই দৃঢ় এবং স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কোন বিকল্প রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রতি তাঁদের আস্থা কিন্তু তাঁরা এখনো ততটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন নি। বস্তুতঃ এরূপ রায় দেবার জন্ত প্রয়োজনীয় সুযোগও তাঁদের কাছে তুলে ধরা হয় নি। যে সকল রাজ্যে এখন অকংগ্রেসী জোটশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হবে, সে সকল দলের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে (magnifesto) এই বিশ্লেষণের তাৎপর্য্যটি স্পষ্ট করে দেখা যাবে। এ সকল ইস্তাহারেও কংগ্রেসী সরকারের অপশাসনেরই প্রধানতঃ সমালোচনা করা হয়েছে; বিকল্প সরকার গঠন করা সম্ভব হলে এবং তাতে এঁদের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকলে, এঁদের শাসন-নীতি কি হবে তার কোন স্পষ্ট চিত্র এঁদের এ সকল ইস্তাহারে লক্ষিত হয় না।

ঘটনার প্রবাহ এখন এ সকল বিরোধী দলসমূহের কাছে সরকার গঠন ও পরিচালনার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে। এঁরা যে এই সুযোগ গ্রহণ করবার মত প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জোট সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেটা এঁদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং সুবুদ্ধি সূচিত করছে। এঁরা যদি এখন জনকল্যাণে সুষ্ঠুভাবে, নিরপেক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সততার সহিত নূতন আয়ত্তাধীন রাজ্য শাসন যন্ত্রটির পরিশোধন ও পরিচালনা করতে সমর্থ হন, তবেই তাঁরা জনগণের সক্রিয় সমর্থন লাভ করতে পারবেন, অন্তথায় কংগ্রেস দলের যে অন্তিম দুরবস্থার সূচনা বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে দেখতে পাওয়া গেল, অতি শীঘ্রই যে তাঁদেরও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

* * *

কেন্দ্রীয় সরকার ও অকংগ্রেসী রাজ্য সরকার

বর্ত্তমান সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে কেন্দ্রীয় সংসদে কংগ্রেস দলের অতীতের প্রবল সংখ্যাধিক্য এখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ সংসদের ৫২০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দল মাত্র ২৮০টি আসন লাভ করছে, অর্থাৎ ন্যূনতম সংখ্যাধিক্য ও সরকার গঠনের অধিকার পেতে হ'লে যে কয়টি আসন লাভ করা একান্ত প্রয়োজন, কংগ্রেস দল এবার তার থেকে মাত্র ১৯টি বেশী আসন লাভ করেছেন এবং সেই অধিকারে এবারও কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবেন। গত সংসদে কংগ্রেস দলের আসন সংখ্যা ছিল ৩৬৫, অর্থাৎ ন্যূনতম সংখ্যাধিক্যের চেয়ে ১০৪টি বেশী আসন।

কিন্তু কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনের এই অবাঞ্ছিত ফলটি থেকে যে শিক্ষাটুকু তাঁদের লাভ করতে পারা উচিত ছিল, সেটি যে তাঁরা মোটেই গ্রহণ করতে পারেন নি, তার পরিচয় আবার আসন্ন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আসন্ন দ্বন্দ্বে যে দুইটি ব্যক্তি নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে, তার মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই দুই দুই বার এই পদের জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি পূর্ব্বে একবার এইরূপ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং জয়ী হয়েছেন। এর থেকে দুইটি প্রশ্নের উদয় হয়; প্রথমতঃ বিরাট এবং এতাবৎ অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কংগ্রেস দলের মধ্যে উচ্চতম পর্য্যায়ের নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবার মতন যোগ্যতাসম্পন্ন বর্ত্তমানে এই দুইটি ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নেই। তেমন যদি কেহ থাকতেন তা হ'লে বর্ত্তমানের স্তিমিত শক্তি কংগ্রেস দলের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা আরো শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন হ'ত না। দ্বিতীয়তঃ এরূপ তৃতীয় ব্যক্তি যখন নাই-ই বর্ত্তমানের দুই যুযুৎসু নেতাদের, তাঁদের নিজেদের আপন আপন স্বার্থেই, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের আপোষ-সমাধানের পথ সন্ধান করে দলের অধিকতর শক্তিক্ষয়ের অনিবার্য্য পরিণতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতেন।

শেষ পর্য্যন্ত এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যিনিই কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করুন না কেন, তাঁদের পূর্ব্বেকার প্রবল ক্ষমতা যে অনেকটাই ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। একদিক দিয়ে এটা মঙ্গল। কেননা সেই কারণে ভবিষ্যতে তাঁদের দ্বারা ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ক্ষেত্রটিও অপেক্ষাকৃত অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। কিন্তু একটা আশঙ্কাও অমূলক নহে। প্রবলের অত্যাচার যেমন একদিকে অসহনীয়, দুর্ব্বলের হস্তে ক্ষমতার অধিকারও তেমনি গভীর আশঙ্কার কারণ ঘটাতে পারে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের ফলে দেশের

সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে অনিবার্য্য জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দুর্ব্বল কেন্দ্র সরকার বিরোধী নীতি-অনুসারী রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে অশেষ লাঞ্ছনা ও বাধার কারণ হ'তে পারে। যৌথ (concurrent) ক্ষমতার ক্ষেত্রে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগ অনেক সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তাৎপর্য্য-পূর্ণ উপেক্ষা বলে সন্দেহ হ'তে পারে। এর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলির স্বভাবতঃই ক্ষীণ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রটিও আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে পারে। এতে প্রশাসনিক সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। দেশের মোট ষোলটি রাজ্য সরকারের মধ্যে সাতটি কি আটটি ব্যতীত অন্য আটটি কি নয়টি রাজ্যে পূর্ব্ববৎ কংগ্রেসী সরকারই আপাততঃ বহাল থাকবে এবং কেন্দ্র সরকারও অধ্যুষিত থাকবে এই অবস্থাটা, কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অপক্ষপাতিত্বে সামান্য মাত্র তারতম্যও করেন, তা হ'লে এই জটিলতা আরো বৃদ্ধি পাবে এমন কি সমগ্র দেশে একটা প্রশাসনিক অচলাবস্থারও সৃষ্টি করতে পারে। দুঃখের বিষয় এরূপ অসম ব্যবহারের আভাস ইতিমধ্যেই অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। এরূপ ব্যবহারের স্বপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফ থেকে যে অজুহাত প্রকাশ করা হয়েছে সেটা যেমন হাস্যকর তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট। এরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করবার নিতান্ত অলীক নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারের সঙ্গে ব্যবহার ও সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে কতকগুলি ব্যাপারে দৃঢ়তারও প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বহুকালব্যাপী দুর্ব্বলতা ও পক্ষপাতের কারণে কতকগুলি জাতীয়-গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা অসম্ভব জটিলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমগ্র জাতির ক্ষোভ ও লোকসানের কারণ হয়েছে। বর্ত্তমানে বিভক্ত দলীয় প্রশাসনিক ক্ষমতার অবস্থায় এরূপ জাতীয় লোকসান ও জটিলতার আয়তন ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবার সুযোগ আরো বেশী হবে। একমাত্র অপক্ষপাত কেন্দ্রীয় দৃঢ়তাই এরূপ আশঙ্কা অপনোদন করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকারের স্পষ্ট বিচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তারই ভিত্তিতে কতকগুলি জাতীয় নীতি নির্দ্ধারণ ও প্রয়োগ। কংগ্রেস অকংগ্রেস নির্ব্বিশেষে এ সকল ক্ষেত্রে নির্দ্ধারিত জাতীয় নীতির অনুসরণ ও পরিপোষণে রাজ্য সরকারগুলিকে বাধ্য করবার শক্তি ও অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্র কংগ্রেস সংস্থাটি যে প্রকারের অন্তর্দ্বন্দ্বে মেতে রয়েছেন এবং যে ভাবে জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত কয়েকটি বিশিষ্ট কংগ্রেসী পাণ্ডা তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে আপন আপন প্রভুত্ব ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াসে নূতন দিল্লীতে নানা ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়ে উঠেছেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে কখনো উপযুক্ত দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবেন এমন মনে হয় না।

* * *

খাদ্যসঙ্কট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনগণের বিপুল অভিবাদনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার নবনির্ব্বাচিত এবং নূতন করে গড়ে তোলা সংযুক্ত বামপন্থী জোট শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ এঁদের উপরে ভরসা করে তাঁদের সম্মুখ এতাবৎ গভীর নিরাশায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের এক কোণায় যেন সামান্য একটু আশার আলোকের বিদ্যুৎঝলক লক্ষ্য করেছেন। তাই এত ভরসা।

নূতন সরকার যে বাঙালীকে অলীক আশার স্তোক-বাণী দিয়ে তাঁদের যাত্রা সুরু করেন নি, সাধারণ মানুষের পক্ষে এটাই একটা মস্ত ভরসা। রাজ্যের সমস্যা অসংখ্য এবং গুরুতর; এগুলির অধিকাংশই বহুকাল ধরে তিলে তিলে জমে জমে আজ পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে। এগুলির সমাধান একদিনে বা সহজে হবার নয় একথাটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়েছেন। কিন্তু অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য যদি এসকল গুরুতর এবং জনগণের পক্ষে জীবন মরণের সমস্যা অমীমাংসিত হয়ে পড়ে থাকে তবে সাধারণ মানুষ যে আর ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করবে না একথাটাও নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীর স্পষ্ট করে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। অতএব অচিরে মূল সমস্যাগুলির সমাধানের পথের বিচারে প্রবৃত্ত হতে হবে একথা বলাই বাহুল্য।

এ সকল গুরুতর সমস্যাগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গবাসীর দৈনন্দিন ন্যূনতম জীবনধারণের

দারটিকে ভরাক্রান্ত ও কণ্টকিত করে ফেলেছে সে গুলির বিষয়ই সর্ব্বাগ্রে বিচার করতে হবে। এর মধ্যে নিঃসন্দেহে খাদ্যসঙ্কটটির সমাধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সমস্যাটির সমাধানের প্রাথমিক প্রয়োজন এই রাজ্যে বাস্তব ভোগ চাহিদার সত্যকার পরিমাণ কতটা তাহার অঙ্কটির পরিমাপ করা। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান লোক সংখ্যার পরিমাণ, মোট ৫ (পাঁচ) কোটির কিঞ্চিৎ কম। ইহার মধ্যে শতকরা ৩৬·৬ জন। অর্থাৎ ১,৮৩,০০,০০০ (এক কোটি তিরাশী লক্ষ) ০ হইতে ৮ বৎসর বয়স্কদের অন্তর্গত এবং বাকী ৬৩·৪% অর্থাৎ ৩,১৭, ০,০০০ (তিন কোটি সতের লক্ষ লোক) ৮ ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের অন্তর্গত। ১৯৬৩ সনে প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তক (towards A self Reliant Economy) বলা হয়েছে যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টি বিচার করলে প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্য শস্যের (food cereals) দৈনিক ভোগ বরাদ্দ ১৮ আউন্স করে হওয়া উচিত। ভারতের কৃষি প্রগতির বর্ত্তমান অবস্থায় অতটা দৈনিক ভোগ বরাদ্দ এখনি সম্ভব হবে না, ১৯৭০-৭১ সন পর্য্যন্ত এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হতে পারে। আপাততঃ, উক্ত সরকারী প্রকাশনাটিতে দাবী করা হয়েছিল, প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দৈনিক ১৬' আউন্স মাত্র ভোগ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

গত দুই বৎসরের উপর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজ্য সরকার কলিকাতা ও আরও কয়েকটি শহর তথা শিল্পাঞ্চলে র‍্যাশন-বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দৈনিক মোট ১০ আউন্স খাদ্য শস্যের ভোগ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি নূতন মন্ত্রী মণ্ডলীর বিশিষ্ট সভ্য ও খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে এত কম খাদ্য শস্যে কাহারও ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়, এর পরিমাণ অন্ততঃ দৈনিক ১২ আউন্স হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের ৩,১৭,০০,০০০ প্রাপ্ত বয়স্কদের (অর্থাৎ ৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক) অধিবাসীর জন্য দৈনিক ১২ আউন্স ও ১,৮৩,০০,০০০ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের (অর্থাৎ ০ হইতে ৮ বৎসর বয়স্ক সকলের) জন্য দৈনিক ৬ আউন্স ভোগ বরাদ্দ করলে খাদ্যশস্যের মোট বার্ষিক ভোগব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯,০০,০০০ টন। এই বরাদ্দটি যথাক্রমে দৈনিক ১৬ আউন্স ও ৮ আউন্সে বৃদ্ধি করলে ভোগ-চাহিদার বাস্তব পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক ৬৭,০০,০০০ টন।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৬৬-৬৭ সন) পশ্চিমবঙ্গের মোট আমন ধানের ফসলের পরিমাণ চাউলের পরিমাপে ৪৮,০০,০০০ টন হয়েছে বলে বলা হয়েছে। পূর্ব্ব বৎসরে গমের আমদানী হয়েছে প্রায় ১১,০০,০০০ টন। পূর্ব্ব বৎসরের আমনের ফসলের পরিমাণ বলা হয়েছে ৪৪,০০,০০০ টন হয়েছিল, তার ওপর আউশ ধান থেকে আরও ৪,০০,০০০ টন চাউল এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে সরাসরি আমদানী ও কেন্দ্র সরকার থেকে অতিরিক্ত সরবরাহের পরিমাণ মোট আরও ৩,০০,০০০ টন হয়েছিল বলে হিসাব পাওয়া গেছে। অতএব ১৯৬৫-৬৬ সনে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের সরবরাহের পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল ৫০,০ ,০০০ টন মোট চাউল ও ১১ ০০ ০০০ টন গম, মোট ৬১,০০,০০০ টন খাদ্যশস্য। দৈনিক ১২ আউন্স ভোগবরাদ্দ হিসাবে বাস্তব চাহিদা এই সরবরাহ থেকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে আরও সামান্য কিছু মজুত থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই, খাদ্যশস্যের সরবরাহে বরাবর গভীর সঙ্কটাবস্থা আগাগোড়া চলে এসেছে। এটা অতি স্পষ্ট যে যতটা পরিমাণ সরবরাহ বাজারে থাকা উচিৎ ছিল ততটা কখনই ছিল না, ফলে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটে দেশের অধিকাংশ সংখ্যক নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে সম্পূর্ণ অনাহারে না হলেও অন্ততঃ অর্দ্ধাহারে কাটাতে বাধ্য করেছে। অর্থাৎ ব্যাপক পরিমাণে চাউলের লুকানো মজুতদারী ও মুনাফাবাজী চলে এসেছে। কেন্দ্রের এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী শাসনকর্ত্তারা অবশ্য এ অবস্থার বাস্তবতা কখনই স্বীকার করেন নি; এরূপ অবস্থার অর্থ তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন উন্নয়নজনক আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে দেশের লোকের কাল্পনিক ভোগচাহিদা বৃদ্ধির মধ্যে। সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই প্রমাণ হবে যে উন্নয়নজনক আর্থিক সঙ্গতির যেটুকু বৃদ্ধি ঘটেছে তার তথাকথিত সুফল উচ্চ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্য্যায়ের দেশের লোকসংখ্যার মোটামুটি ১০%য়ের নীচে আর কাহাকেও স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। আর প্রাণধারণ সীমার (subsistence) উর্দ্ধ আর বিশিষ্ট পর্য্যায়ের লোকেদের মধ্যে খাদ্যশস্যের চাহিদা মোটেই সচল নয় (inelastic)।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার সীমা থেকে এখন পর্য্যন্ত অনেক কম। এর দীর্ঘমেয়াদী এবং কার্য্য-

করী সমাধান অবশ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে। সে পথে কতকগুলি বিশেষ বাধা আছে। প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গের চাষযোগ্য জমির আয়তন লোক সংখ্যার তুলনায় কম; দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থান থেকে উচ্ছেদ হওয়া প্রায় ১ কোটির মতন অতিরিক্ত লোকসংখ্যার ভার এই রাজ্যটির উপরে বরাবরের মতন চেপেছে, কিন্তু তার জন্য অতিরিক্ত ভূমি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তৃতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গে যেটুকু বা চাষোপযোগী জমি আছে, তার প্রায় এক তৃতীয়ত্বাংশ পরিমাণ ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের সহায়তার জন্য পাট চাষে নিয়োগ করা রয়েছে। তার উপরেও সেচের অভাব, সার সরবরাহে গোলোযোগ, রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষেতের মধ্যে নোনাজলের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব, ভাল বীজের চাষ ও সরবরাহের অভাব, ইত্যাদি নানা কারণে পশ্চিম বঙ্গে আশু খাদ্যশস্যের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কতকগুলি প্রায় অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক রয়েছে। এই গুলির এখুনি সম্পূর্ণ অপসারণ রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন নয়। সমগ্র দেশ এবং জাতি পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনে উন্নতির মূল্যে উপকৃত হচ্ছে; অতএব পশ্চিম বঙ্গবাসীর খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি সম্পূর্ণ মেটাবার দায়িত্ব ও সমগ্র দেশ এবং জাতিকে গ্রহণ এবং বহন করতে হবে, অন্যথায় পশ্চিমবঙ্গকে পাটের চাষ বর্জ্জন করে সে জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। এর ফলে রপ্তানী বাণিজ্যের ঘাটতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে; বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (বাংলার পাটশিল্পে নিযুক্ত প্রায় ৩৫০,০০,০০০ লোক এবং আনুসঙ্গিক কর্ম্মে নিযুক্ত আরও ১৫০,০০০ লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অবাঙালী) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আমদানী কমে যাবে।

তবে একথাও সত্য যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সরবরাহে ঘাটতির যে চিত্র প্রকাশ করে পূর্ব্বতন রাজ্য সরকার একদিকে যেমন অন্যায় মজুতদারী ও মুনাফাবাজীর পৃষ্ঠপোষকতা বরাবর করে এসেছেন, সেটা কেবল প্রভূত পরিমাণে মজুতদারীর সহায়তা করেছে। তার একটা বাস্তব প্রমাণ বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমঃ চাষ ও ফসল সম্বন্ধে যাঁদের সামান্যতম অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁরা জানেন যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও নূতন ফসল ওঠবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাজারে চাউলের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এ বৎসর সময় মতন বৃষ্টিপাত না হওয়াতে ফসল উঠতে মাসাধিক কাল দেরী হয়েছে, অর্থাৎ নূতন ফসল উঠতে উঠতে প্রায় মাঘ মাস এসে পড়েছিল। কিন্তু দুটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথমটি এই যে গত আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ থেকেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দাম দ্রুত কমতে থাকে। কোন কোন এলাকায় এই পড়তির গতি ও পরিমাণ মাত্র দশদিনে এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান সময়, অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বাজারে একটি দানাও নূতন চাউল এসে পৌঁছায় নি। এর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অভ্যন্তরেই বিরাট পরিমাণ মজুদী চাউল বা ধান যে রয়েছে তার একটা বাস্তব অনুমান পাওয়া যাবে। আশ্বিন মাসেই যে চাউলের দাম পড়তে সুরু করেছিল তার সম্ভাব্য কারণ যে মজুতদারেরা নূতন মজুত করবার জন্য জায়গা খালি করছিল এবং এখনও যে কেবল মাত্র পুরাণো ধানের চাউলই বাজারে কেনা-বেচা চলেছে, সেটার থেকে বোঝা যায় যে সে মজুত শেষ হতে এখনও অনেক বাকী।

বস্তুতঃ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ঘাটতি হলেও সমগ্র দেশে কোন বাস্তব ঘাটতি নেই। সরকারী হিসাব মতে ১৯৫৫-৫৬ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণ গড়পড়তা ৮০,০০০,০০০ টনের মতন হয়েছে। ১৯৬৭ সনের শেষ ভাগে ভারতের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ৫০০,০০০,০০০-র মতন হবার কথা। এর মধ্যে ০ থেকে ৮ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা ৩৬·৬% হিসাবে ১৮৩,০০০,০০০ এবং ৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা ৬৩·০% হিসাবে ৩১৭,০০০,০০০। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দৈনিক ৬ আউন্স এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তার দ্বিগুণ ভোগবরাদ্দ হিসাবে সমগ্র দেশের বাস্তব ভোগ চাহিদার পরিমাণ হয় ৪৯,৯০০,০০০ টন; এর সঙ্গে অনিবার্য্য অপচয় এবং বীজ শস্যের জন্য ১০% যোগ করিলে তার পরিমাণ হয় ৫৪,৮৯০,০০০ টন; এবং এই মোট পরিমাণের আরও ১০% বাজার সরবরাহ ও অতিরিক্ত চাহিদার উঠতি পড়তি মেটাবার জন্য যোগ করলে, উপরোক্ত হারে ভোগবরাদ্দের হিসাবে ৬৬,৮০০,০০০ টন খাদ্য শস্যের সরবরাহ হলেই দেশবাসীর প্রয়োজন মেটান সম্ভব। এই ভোগবরাদ্দের হারটি বাড়িয়ে যদি প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যথাক্রমে দৈনিক ১৬ ও ৮ আউন্স বরাদ্দ ধরা যায়, তাহলেও দেশের সমগ্র চাহিদা ৮১,০৭০,০০০ টন সরবরাহের দ্বারা সম্পূর্ণ মেটান সম্ভব। দেশে

৮০,০০০,০০০ টন বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে; তার ওপর গত তিন বৎসরে আমরা গড়পড়তা বিদেশ থেকে বার্ষিক প্রায় ৭৪,০০,০০০ টন খাদ্যশস্য আমদানী করেছি। আমাদের সামগ্রিক বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ যদি বাস্তব পক্ষে ৮২,০০০০০০ টনও হয়, তাহলেও তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সম্ভাব্য উদ্বৃত্তাংশের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও, গত তিন বৎসরে আমাদের উদ্বৃত্ত মজুদের পরিমাণ এন্তত' ১৮,২৯,০০০ টন হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ এর থেকে বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্যই দেশে বর্ত্তমানে মজুদ আছে, কিন্তু সে সরকারী তহবিলে নয়, ভোক্তার রন্ধনশালায়ও নয়, মজুদ রয়েছে মুনাফাবাজের বেআইনি গুদামে। এই সম্পর্কে একটা কথা স্পষ্ট করে আমাদের বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের বোঝা প্রয়োজন যে এই পরিমাণ মজুতদারীও মুনাফাবাজী ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে একমাত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কারণে; ফসলের অবাধ চলাচলে নিয়ন্ত্রণ; তথাকথিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভোগনিয়ন্ত্রণ, বণ্টন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সকলই অবৈধ মজুতদারী ও মুনাফাবাজীর সহায়তা করেছে। অনুরূপ অবস্থা ঘটেছিল যখন পরলোকগত রফি আহমদ কিদোয়াই কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। তিনি এক লহমায় বুঝে নিয়েছিলেন অযোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই বৈধ ও সমাজকল্যাণকর ভাবে চালান সম্ভব হয় না এবং সমস্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তাঁর সহকর্মীরা সকলেই এই সিদ্ধান্তের অনিবার্য্য মারাত্মক ফলাফলের কাল্পনিক চিত্র খাড়া করে তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে দমেন নি, বরং জবাব দিয়েছেন যে অবস্থা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এর চেয়ে খারাপ কিছুই কল্পনা করা যায় না, অতএব নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিলেও এর চেয়ে খারাপ কিছু ঘটবার কোনই অবকাশ নেই। বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। নূতন খাদ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলী যদি সাহস করে খাদ্য সরবরাহ বিষয়ক সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করে নিতে পারেন এবং কেন্দ্র সরকারকে তাঁদের অদ্ভুত আঞ্চলিক ব্যবস্থা (zonal system) প্রত্যাহার করতে রাজী করাতে পারেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সঙ্কট থেকে তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়, যার প্রতি খাদ্যের পরেই রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, তার উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হল সরকারী প্রয়োগগুলিতে অবাধ দুর্নীতি ও তজ্জনিত লোকসান। কলিকাতার সরকারী পরিবহন দপ্তরে দুর্নীতি ও লোকসানের কথা সকলেই জানেন। এই সংস্থার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জে এন তালুকদার মহাশয় অনেক চেষ্টায় এই সংস্থার পরিচালনে খানিকটা সুনীতি ও দক্ষতার প্রবর্ত্তন ক্রমে করতে পেরেছিলেন যার ফলে লোকসান বন্ধ এবং এমন কি দুই এক বৎসরে সামান্য মুনাফাও হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অবসর গ্রহণের পর যিনি এই সংস্থার ভার প্রাপ্ত হ'ন তাঁর অক্ষমতা ও অযোগ্যতার বহু পূর্ব প্রমাণ সত্ত্বেও কেন যে পূর্ব্বতন রাজ্য সরকার তাঁকেই এই পদের জন্য মনোনীত করেছিলেন তাহা আমরা কল্পনা করতে পারি না। ডি ভি সি এবং পরে দুর্গাপুর শিল্প সংস্থার অধ্যক্ষ হিসাবে এঁর অযোগ্যতা এবং দুর্নীতি-পোষকতার অনেক প্রমাণই পাওয়া গিয়েছিল; এঁর আমলে দুর্গাপুর প্রজেক্টস'য়ের প্রধান করণিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্রে এ সকলের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। সরকারী পরিবহন সংস্থার অধ্যক্ষতাকালে এঁর অযোগ্যতা ও শ্রমিক নিপীড়নের প্রমাণ আরও অনেক পাওয়া যাবে।

আরো অনেকগুলির মধ্যে একটি সংস্থার উল্লেখও প্রয়োজন, সেটি সরকারী পশুপালন তথা দুগ্ধ সরবরাহ সংস্থা (Annimal Hushandry and Milk Supply Organization)। এই সংস্থাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার ঘুণ ধরে রয়েছে। এই সংস্থাটি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা প্রয়োজন হ'লে পরে প্রকাশ করিব। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে নূতন রাজ্য সরকারের আশু দৃষ্টিপাত কামনা করি।

আমাদের মনে হয় নূতন রাজ্য সরকার যদি একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করে এই সকল সংস্থার পরিচালনা, লোকসানের কারণ, অধ্যক্ষাদির স্বজনপোষকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত করবার ব্যবস্থা করেন তবে আশু সুফল পাওয়া যাবার সম্ভাবনা। এরূপ একটি কমিশনের সাহায্যে সরকারী সংস্থাগুলির পরিশোধন এবং প্রয়োজন হইলে পুনর্গঠনেরও ব্যবস্থা করতে পারলে নূতন রাজ্য সরকার এক সঙ্গে অনেকগুলি পথের বাধা একটিমাত্র সিদ্ধান্তের দ্বারা দূর করতে সক্ষম হবেন বলে আমাদের মনে হয়।

এদের জন্তে যে যত বেশী মূল্য দেয়, সে তত বেশি বঞ্চিত হয়।

শর্মিলার কথা যখন বন্ধুদের জানিয়েছিলাম তারা হেসে উঠেছিল। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামত জানাবার জন্তে তারা একটি শোক সভা আহ্বান করেছিল। সেখানে তারা আমাকে করুণ নৈরাশ্যের কথা শুনিয়েছিল, তাতে আমি বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়ি। এবং শর্মিলাকে এড়িয়ে থাকা যায় কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্তে সচেষ্ট হই।

সেই সময় বাড়ীতে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি হ'ত। আমাদের বাড়ীটা নেহাত ছোট। মাত্র দু'খানা ঘর। সরু একফালি বারান্দা। তার সঙ্গে টালির ছাউনি ছোট্ট রান্নাঘর আর স্নানঘর। আমার মা নেই। বাবা বাতের অসুখে শয্যাশায়ী। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পেন্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। বাবার ইন্স্যুরেন্স আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় বাড়ীটা কোনও ক্রমে দাঁড় করানো গেছে। এখনও অনেক কাজ বাকি।

দাদা স্কুল মাষ্টার। দিদি সরকারী কর্মচারী। আমি তখন বেকার। ছোট বোন প্রাইভেটে আই. এ. দেবে বলে তৈরী হচ্ছে।

ঘরের অভাবে দাদা বৌদিকে আনতে পারছে না। তাই সংসারের প্রতি সে ক্ষুব্ধ। দিদির অভিযোগ সংসারের এই অবস্থায় দাদার বিয়ে করা উচিত হয় নি। দিদিই সংসারটা চালাচ্ছে। দাদা যা মাইনে পায় তা অতি সামান্ত। এই সব প্রসঙ্গ উঠলেই ঝগড়া-ঝাঁটি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। দাদা-দিদির তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে একদিন এমন কতকগুলো কথা আমার কানে এল, যা শুনে আমার মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে অন্ত কোথাও চলে যাই।

চলেও গিয়েছিলাম সোজা শর্মিলাদের বাড়ী। শর্মিলা তখন পড়ছিল। বই বন্ধ ক'রে যেমন ছিল তেমনি বেরিয়ে এল আমার সঙ্গে। আমরা ময়দানে গিয়ে বসলাম।

কোনও ভূমিকা না করেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—এই মুহূর্তে তুমি আমায় বিয়ে করতে পার শর্মিলা।

শর্মিলা একটু কাঁপল না। হোঃ হোঃ করে হেসেও উঠল না। ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, হাঁ!

আমার ভার নিতে পার? [শর্মিলাদের অবস্থা বেশ ভালই বলা চলে। বাবা মোটা মাইনের অফিসর। দাদা ইঞ্জিনীয়র। সুতরাং আমার দায়িত্ব নেওয়া ওদের পক্ষে খুবই সহজ]।

এবারে শর্মিলা কিন্তু হেসে উঠল। বলল, সে আবার কি? তুমিই ত আমার ভার নেবে। বাড়ীতে কিছু হয়েছে বুঝি!

—হ্যাঁ, দাদা ভীষণ বকেছে; দিদি মুখভার ক'রে অফিসে চলে গেছে। একটা চাকরি আমাকে জোগাড় করতেই হবে। দাদা-দিদির স্কন্ধে ভর ক'রে আর থাকা চলবে না।

—সেই ভাল, একটা চাকরি পেলেই সব দিক দিয়েই সুবিধে হবে। আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব। তোমাকেও আর বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

সেই দিন থেকে আবার নতুন উৎসাহে আমি কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলাম। একদিন পাড়ারই একটি ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম,—একটি ঠিকাদার ফার্মে চাকরি খালি আছে। মরীয়া হয়ে দরখাস্ত নিয়ে নিজেই চলে গেলাম। সোজা জেনারেল ম্যানেজারের চেম্বারে ঢুকে দেখা করলাম। ভদ্রলোক ভারতীয়, কিন্তু অবাঙালী। আমার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে ভদ্রলোক পারচেজ ডিপার্টমেন্টের চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

চ্যাটার্জী সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব সৌখীন। মাথায় তেল দেন না। সরু গোঁফ, বিদেশী পোশাকে, বিদেশী ভাষায় কথাবার্তায় বেশ কেতাদুরস্ত। সব সময় মুখে পাইপ। কালো চশমা খুলে টেবিলের ওপর রেখে কিছুক্ষণ ধরে আমায় নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বোধ হয় খুশি হয়ে বললেন, বি. এ. পাশ ক'রেছ দেখছি, এর আগে কোথাও চাকরি-বাকরি ক'রেছ না কি!

আমি বললাম, না।

ভদ্রলোক আমায় ৪টার সময় আবার আসতে বললেন।

যথাসময়ে আবার আমি সেই অফিসে গেলাম। ভদ্রলোক আমার জন্তেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। পিঠ চাপড়ে বললেন, চল!

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কোথায়।

—চলই না।—বলে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

তাঁর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে চেপে আমি এস্প্ল্যানেড পর্যন্ত এলাম। ডালহৌসি থেকে এস্প্ল্যানেড আসতে দশ মিনিট সময় লেগেছিল। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই চ্যাটার্জি সাহেব জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশটুকু আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে চ্যাটার্জি সাহেব আমার

বলেছিলেন.—মিঃ মালহোত্রা, মানে আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, খুব খানদানী ঘরের লোক। বুঝতেই তো পারছো—পারবে ত জোগাড় করতে।

চ্যাটার্জি সাহেবের গাড়ি থেকে নেমে ময়দানের মধ্যে একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলাম। ওঁর কথাগুলো তখনও আমার চেতনায় মধ্যে ঝন্ ঝন্ করে বাজছিল। আমি কখনও ভাবতে পারি নি, কল্পনাও করি নি—ছাত্র-জীবনের পর যে-জীবনে পথচলা সুরু করতে হয়, তা' এমনি নোংরা, এমনি কাদাপ্যাচপেচে। নিজের ওপর, সমস্ত জাতির ওপর ধিক্কার দিয়েও মনকে শান্ত করতে পারলাম না।

মনকে এইভাবে দৃঢ় করে পরের দিন সকালেই শর্মিলার কাছে গিয়ে সব কথা বললাম।

আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফুলতে লাগল শর্মিলা। খোঁপা খুলে গেল। চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল পিঠের ওপর। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল—বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও, আমার ঘর থেকে। ও-মুখ আমায় আর দেখিও না। শীগগির বেরিয়ে যাও; ইতর, ছোটলোক কোথাকার!

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমি চলে এলাম। গভীর হতাশায় আমার সমস্ত দেহ-মন এমন ভাবে ভেঙে পড়েছিল, যে মনে হয়েছিল -এখনই গিয়ে আত্মহত্যা করি। কিন্তু আত্মহত্যা করতে গেলেও সাহসের দরকার। সে-সাহসও আমার ছিল না।

সেইদিন সন্ধ্যায় কফি হাউসে গিয়ে সতীর্থদের কাছে আমার দুরবস্থার কাহিনী বিবৃত করলাম। আমার ঘর বাঁধার বাসনাকে তারা সকলেই বিদ্রূপ করেছিল। মেয়েদের ভালবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম ব'লে তারা আমাকে ধিক্কার দিল। প্রেম-ভালবাসার কোনও মূল্য আছে না কি, আজকের এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাছে!

ওদের তীব্র, তীক্ষ্ণ, শ্লেষাত্মক কথাগুলো আমি বিনা প্রতিবাদে শুনছিলাম,—যদিও আমি জানতাম, যারা আমাকে ঐ ভাবে তিরস্কৃত করছিল,—তাদের সকলেরই মেয়ে-বন্ধু আছে। এবং মনে মনে সকলেই স্বপ্ন দেখে,—ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা। তারা ভাল করেই জানে,—হোটেল রেস্তঁরা, কিংবা সিনেমার-ময়দানে, গাছতলায় অথবা লেকের ধারে বসে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যাবে না। সুতরাং ঘরকে স্বীকার করতে হবে। অতএব ঘরণীকেও। (পরবর্তীকালে অনেক আধুনিক কবির বিয়ে-থাও হয়েছে; আর পাঁচজন অ-কবিদের মত তারা সকলেই বেশ গুছিয়ে সংসার-ধর্ম পালন করছে, এ খবরও আমার অজানা নেই)—তবুও সেদিন আমি চুপ করে থেকে ওদের বক্তৃতা শুনেছিলাম। কেননা, শর্মিলাকে সম্পূর্ণভাবে মন থেকে মুছে ফেলতে গেলে যে মানসিক শক্তির দরকার, ওদের তিরস্কারের ভাষা আমার মনের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করছিল। এবং তাতে আমি দৃঢ় হ'তে পেরেছিলাম।

ঐ ঘটনার মাস দুই পরে শর্মিলার বিয়ে হয়ে গেল। শর্মিলা ছাড়া সেই দিনই, এমন কি সেই লগ্নেই, বাঙলা দেশে আরও হাজার কয়েক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সুতরাং ঘটনাটি অতি সাধারণ এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবুও মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কিছুদিন পরে মাঝারি ধরনের একটা পত্রিকার অফিসে একটা কাজ পেয়ে গেলাম। প্রুফ দেখতাম, বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় করতাম, আর ছদ্মনামে কবিতা লিখে পত্রিকার খালি জায়গা ভরাট করতাম। অবশ্য নামে ছিলাম সহ সম্পাদক। এই কাজটা পাওয়াতে একটা সুবিধে হ'ল এই যে, বাড়ী ছাড়া আমার আর একটা আস্তানা জুটল।

নিজের একটা স্যুটকেশ আর বিছানাপত্তর নিয়ে পত্রিকা-অফিসে এসে উঠলাম। অফিস সংলগ্ন প্রেস। দিনগুলো ভাল ভাবেই কাটছিল কিন্তু বরাতে সইল না। মাস তিন চার পরে পত্রিকাটি আর চলল না। সুতরাং চাকরিটাও গেল। তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার বাড়ী ফিরে এলাম।

এসে দেখলাম, বাড়ীতে দুটি অঘটন ঘটেছে। কিছুদিন আগে দিদি তার অফিসের সহকর্মী বন্ধুকে বিয়ে করে আলাদা বাসায় চলে গেছে। এবং দাদা বৌদিকে নিয়ে এসেছে। বুঝতে পারলাম আমার বাড়ী ফিরে আসায় বিশেষ কেউ খুসী হয় নি। অবাঞ্ছিত দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মত কোনক্রমে সেখানে একখানা বেড মিলল। সেই ছোট ঘরে, রুগ্ন বাবা আর খিটখিটে মেজাজ ছোট বোন সুচেতার সঙ্গে আমার দিন কাটতে লাগল।

একদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমি কি একটা বই পড়ছিলাম। সুচেতা কখন যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল জানি না। হঠাৎ শুনতে পেলাম,—সুচেতা বলছে—এমনি করেই কি সারা জীবন কাটিয়ে দিবি ছোড়দা! একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর না। দেখতে ত পারছিস সংসারের অবস্থা।

আমি অবাক হয়ে সুচেতার দিকে তাকালাম। মনে হ'ল,—সুচেতা ঠিক আমার বোন নয়, যেন অন্য কেউ,—যে আমাকে খুব স্নেহ করে, খুব ভালবাসে। এতদিন আমি জানতাম,—সুচেতা আমাকে দু'টি চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল,—এই বিরাট পৃথিবীতে সুচেতাই আমার একমাত্র আপনজন। মনে হল সুচেতাও আমার মত অসহায়।

আমি একটি ছেলেকে বাঁচিয়েছিলাম অপমৃত্যুর হাত থেকে। নাম সেবাব্রত।

আমি কোনও দিন ভাবতে পারি নি এই ভাবে একটি কিশোরকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারব। আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সেবাব্রত কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে যে-কাহিনী সে বিবৃত করল তা যেমন মর্মান্তিক, তেমনি নিষ্ঠুর। ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হ'ল—একটা নতুন জগতের দরজা যেন অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে খুলে গেল। নিষ্পাপ, নিরপরাধ একটি কিশোরের কোমল করুণ মুখ, অশ্রুপ্লুত দু'টি বড় বড় অসহায় চোখ। আমার সমস্ত চেতনাকে এমন গভীরভাবে অভিভূত করে ফেলল, যে আমার মনে হ'ল একটি নতুন পৃথিবীতে যেন আমি ভূমিষ্ঠ হলাম। আমার জীবনের একটা অর্থ আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা বক্তব্য আছে, এই পরম সত্যটি সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম। তাই সেবাব্রতকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে আমি গভীর উৎসাহ বোধ করলাম। মনে হ'ল,—এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনের যে-অধ্যায় সুরু হবে, বিগত অধ্যায়ের সঙ্গে কোথাও কোনওখানে তার সংযোগ থাকবে না। আমি এবং সেবাব্রত,—দু'জনেই আমরা স্বয়ম্ভু। আমাদের অতীত নেই।

সেবাকে নিয়ে সোজা চলে এলাম দিদির নতুন বাসায়। বললাম,—একে আমি পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। বাপ-মা-মরা অনাথ বালক। একটু আশ্রয় পেলে, আদর-যত্ন পেলে হয়ত মানুষ হতে পারবে—এই আশায় তোমার কাছে নিয়ে এলাম।

আমার কথা শুনে এবং রকম-সকম দেখে দিদি খুব খুশি হ'ল। সেবাকে কাছে টেনে নিয়ে তার রুক্ষ চুল-গুলোর মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে দিদি আমাকে বলল,—তুইও দু'দিন থেকে যা না নীলু। কোনও দিন ত আসিস না।

আমি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। ঐ রকম একটা আশ্রয় তখন আমার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রায় দিন পনেরো দিদির ওখানে ছিলাম। তারপর সেবাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি। বেলেঘাটার চাউলপট্টি রোডে। ছোট দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়েছি। ভেতরে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মালপত্তর থাকে। বাইরের ঘর দুটো দোকানের জন্যে তৈরি হয়েছিল। সেইখানেই আমরা এখন আছি। আমি আর সেবাব্রত।

প্রথম জীবনে চাকরি করতে গিয়ে যে কুৎসিত অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছিলাম,—যার জন্যে আমার জীবনের হাজার হাজার মূল্যবান মুহূর্ত আমি বোকার মত অপচয় করেছি। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি, শালীনতা-বোধ,—সব কিছুকেই বিকৃত করে একটা অস্বাভাবিক উন্মাদনায় নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করেছি,—সেই অসহ্য অভিজ্ঞতাই আমাকে চাকরি-বিমুখ করেছিল। সেই জন্যে আর কোথাও কোনওদিন আমি চাকরির উমেদারি করি নি। আর কোনও মালহোত্রা-চ্যাটার্জি সাহেবের পাপচক্রে আমি ধরা দিই নি। আর কোনও শমিলার জীবনকে বিপর্যস্ত করতে হয় নি।

একটি নির্দোষ কিশোরকে নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা মহৎ কাজ কি না জানি না, তবে ঐ কাজটাই আমার জীবনকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চালিত করেছে। যে-পথে আশা আছে, আশ্বাস আছে! যে-পথ অন্ধকারে বিভ্রান্ত মানুষের জীবনে আলোর সঙ্কেত নিয়ে আসে। আমার কবিতার মধ্যে যার সন্ধান আমি কোনও দিনই পাই নি।

দিদির বাড়ীতে থাকতে থাকতেই এই ফেরিওয়ালার কাজই বেছে নিয়েছিলাম; আজও সেই কাজই করছি। সেবা স্কুলে পড়ছে। সে আর দাদা-বৌদির কাছে ফিরে যেতেও চায় না।

আমরা দু'জনে এক অনির্দেশ্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি। আমার আশা,—সেবা একদিন মানুষ হবে। আর সেবা ভাবে,—আমরা একদিন মস্ত বড়লোক হব,—

সংগ্রাম ক'রে বেঁচে থাকা এবং বাঁচিয়ে রাখার সে কী আনন্দ, তা তুমি নিশ্চয়ই জান। তবুও আমাদের এই ছোট্ট ঘরে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই। যদি সুবিধে হয়, একদিন এসো। আর যদি অসুবিধে না হয়, তা হ'লে জীবনের বাকি ক'টা দিন···। না, থাক। এই ছোট্ট ঘরে তোমার হয়ত ধরবে না। কিন্তু যেদিন ঐ দূরের আকাশে তার অজস্র আলোয় আমাদের এই ঘর দুটোকেও ভরিয়ে দেবে সেদিন আমি আশা করব,—তুমি নিশ্চয়ই আসবে।—

শিবরাত্রি

(একাঙ্ক নাটিকা)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

প্রথম দৃশ্য

[সহরের নদীর অনেকটা উজানে—গঙ্গা যেখানটায় একটুখানি বাঁক খাইয়াছে সেই বাঁকের মোড়ে আমাদের গ্রামখানি। যদিও চটকলের ধোঁয়ার কালিমা আমাদের গ্রামের আকাশ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছায়, তবুও আমাদের গঙ্গামায়ের দুই তীর ইঁটে, পাথরে, শিকলে বন্দী হইয়া পড়ে নাই। পর্বত-দুহিতার স্বচ্ছন্দলাস্য সচল মূর্তি সেখান পর্যন্তই ছিল। তার পরেই স্বচ্ছ সলিল সহরের ক্লেদে মলিন, তারপরেই দুকূলের সবুজ শ্যামাবরণ সহরের বিষস্পর্শে নিশ্চিহ্ন।

সেটা ছিল শিবরাত্রি। সে রাতের কথা ভুলিবার নয়। আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া ঠিক করিয়াছি রাত জাগিতে হইবে। কোথায় বসিয়া আড্ডা দেওয়া যায় সেইটা ঠিক করিতেই প্রথম প্রহরের প্রথম অংশ পার হইয়া গেল। বাড়ী বাড়ীর রকে বা চাতালে বসিতে গিয়া তাড়া খাইতে খাইতে শেষটায় গঙ্গাধারের বুড়ো শিবতলার বটগাছের বৃহৎ কাণ্ডটা ঘিরিয়া যে শানবাঁধান চত্বর আছে, সেইখানটায় চড়িয়া আমাদের মজলিশি আসর বসান গেল। উপরে গোলপাতার ছাউনি, সম্মুখে গঙ্গার বুকে কলকলানি। তারই উপর দিয়া আলেয়ার আলোর মত ছোট ছোট ডিঙির আলো ছুটিয়া চলিয়াছে। আলু-আনাজের দোকান বসে হাটের দিনে এইখানটায়। নিমেষে সুরু হইয়া গেল আমাদের চেঁচানো, খিঁচান—মায় পিটকারী সহযোগে বন্যাহীন হ্রেষাধ্বনি]

বলাই। আঃ! এ কি হচ্ছে? একে গান বলে? না আছে সুর, না আছে তাল লয়, না কিছু—ছ্যাঃ!

গদাই। না, না, ঠিকই হচ্ছে। নে তোর এই ফোড়ন দিতে হবে না, নাই বা হ'ল তোর সুর তাল-লয়। সুর-তাল লয়হীন বায়স-নিন্দিত কণ্ঠের গানই আসলে জমে ভাল। গানের সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে হাসির হল্লোড় ছোটাব, তবেই না গানের আসর জমবে। আর তোদের ঐ পাকা গাইয়ের নিখুঁত সঙ্গীতে শ্রোতারা নিঝুম মেরে যে শুনতে থাকে, বেঁচে রইল কি মরেই গেল তা বোঝবার জো নেই। তাকেই আমি উল্টে বলি—আরে ছ্যাঃ!

স্বয়ম্ভূ। কিন্তু যা বলিস গদাই, প্রথম প্রহরটার হাই-হল্লোড় লাগছিল ভালই। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রহরের নিশুতি রাতে এই বেপরোয়া গানের বেহদ্দটা যেন বেমানান ঠেকছে। বিশেষ ক'রে দেখছিস ত—সন্ধ্যে রাতে যে খানিক মেঘ জমেছিল আকাশে, এখন তা টিপ টিপ করে ঝরতে সুরু হয়েছে। আমাবস্যা রাতের ঝিরঝিরে বৃষ্টি মনের মধ্যে যেন একটা উদাসভাব এনে দেয়। প্রবল কোলাহল যেন এই মৃদু সজল ভাবণের তিরস্কারের লজ্জায় মাথা হেঁট করতে চাইচে।

বলাই। ব্রেভো স্বয়ম্ভূ! গানের আসরের বদলে একেবারে সাহিত্যের আসর।

পাঁচু। সাহিত্য রচনা করুক আর যাই করুক স্বয়ম্ভূ কিন্তু ঠিকই বলেছে।

হারু। সত্যি ভাই, কান ঝালাপালা হয়ে গেল, এখন তোমাদের গাওনা ছাড় দিকিনি।

স্বয়ম্ভূ। আমি সব সময় ঠিকই বলি। অল্প কিছুক্ষণ হৈ চৈ করলে, ব্যস্। বেশী ভাল না। টু মাচ অব এভরিথিং ইজ ব্যাড। আর আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে—অধিকন্তু ন দোষায়ঃ।

বলাই। বাঃ বাঃ বাঃ সাবাস। বেশ বলেছিস।

(সকলের হাস্য)

স্বয়ম্ভু। তা, আমি কি করবো ভাই? প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেই যদি মতভেদ থাকে তবে আমরা ত নিরুপায়। অথচ আর এক পণ্ডিত বলেছেন—গ্রেট মেন থিংক অ্যালাইক। এখন যাই কোথা বল?

চারু। স্বয়ম্ভু দেখছি সত্যিই সাহিত্য এনে ফেলছে। তা-া-া সাহিত্যের কথাই যখন উঠেছে তখন কেউ একটা গল্প বল শুনি।

পিলু। ঠিক ঠিক, একটা ভূতের গল্প।

স্বয়ম্ভু। না হে না, আজ এই শিবতিথিতে শিবচরদের নিয়ে হাল্কা গল্প-গুজব চালানো ঠিক হবে না।

গদাই। আরে আরে! ক্যাবলাকে দেখছিস? গাছের আড়ালে গিয়ে দিব্যি ঘুম লাগিয়েছে। দে ত বলাই নস্যির কৌটোটা, এক টিপ ওর নাকে গুঁজে দিই।

ক্যাবলা। হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো, বাঃ তোরা সব বজ্জ ইয়ে, মাইরি।

(সকলের হাস্য)

স্বয়ম্ভু। আহা, সুখনিদ্রাটা সশব্দে নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

(অকস্মাৎ বেণুগোপালের আবির্ভাব, তার নেত্রদ্বয় ভয়চকিত)

বেণু। (ব্যগ্রভাবে) প্রান্তকে তোরা কেউ দেখেছিস আজ?

বলাই। কৈ, না ত! প্রান্ত ফিরেছে নাকি?

(বেণুগোপাল কোন জবাব না দিয়া, যেমন ঝড়ের মতন আসিয়াছিল তেমনি আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল)

স্বয়ম্ভু। 'প্রান্ত' কি কারু নাম নাকি?

বলাই। তুমিই শুধু প্রান্তকে চেন না, স্বয়ম্ভু। সে ছিল আমাদের আড্ডার পাণ্ডা। তুমি তখনো এসে জোট নি আমাদের সঙ্গে। ওর আসল নাম হচ্ছে 'প্রাণবন্ত'। আমরা বললাম—অতবড় নাম ধরে ডাকবার ধৈর্য হবে না, তাই আগামাথা জুড়ে দিয়ে 'প্রান্ত' নামকরণ হ'ল একদিন। সেই নামকরণের ফিষ্টিটা যা হয়েছিল আমাদের—ওঃ! সে চর্বচোষ্য-লেহ্যপেয়। কি বলিস তোরা?

সকলে। সে আর বলতে!

বলাই। কিন্তু প্রাণবন্তই ওর ঠিক নাম। প্রতি কাজেই ওর প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। সেই হাওড়া ষ্টেশনের কাণ্ডটা মনে আছে?

(বলেই ঘাড়টা একটু কাৎ করে আমার দিকে তাকাল।)

আমি। সে কাণ্ড কি আর ভোলা যায়?

স্বয়ম্ভু। কি হয়েছিল বল না ভাই।

বলাই। সে ভারি মজা। আমরা যাচ্ছিলাম শিমুলতলায় পূজোর ছুটিতে দল বেঁধে বেড়াতে। বাঁধা স্পেশ্যাল দিয়েছে। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেই দেখি বেশী সময় নেই। প্রান্ত কিন্তু সময়-সংক্ষেপের জন্যে কিছুমাত্র ভাবছিল না। তার উৎকণ্ঠার কারণ হ'ল—খাবার কিছু সঙ্গে আনা হয় নি। প্রত্যেকেই পরমুখাপেক্ষী হয়ে খালি হাতেই এসেছে। ঐ দুধে পুকুর ভর্তির মত, আর কি। আমরা ছুটলাম প্ল্যাটফর্মের দিকে। প্রান্ত মাঝপথে সবাইকে আটকে টেনে নিয়ে গেল এনকোয়্যারি অফিসে! সেখানে গিয়েই হন্তদন্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, "মশাই, গরম কচুরি কোথায় পাওয়া যায়? গরম গরম?" অফিসের বাবু অবাক হয়ে প্রান্তর দিকে একবার তাকায়, আমাদের দিকে একবার। তারপর খাবারের দোকানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্রান্ত বলে, "গরম হবে ত?" বাবু বলে, "সেটা গিয়ে দেখতে হবে, আমরা ঠিক জানি না।" প্রান্ত হাঁকে, "জানেন না! তবে এনকোয়্যারি অফিসের ক্যারামতিটা কি?" আমরা তখন ওকে টেনে এনে খাবারের দোকানে পাঠিয়ে দিলাম আর বলে দিলাম—তুমি শীগগির যাও যা-হয় কিনে আন, আমরা যাই জায়গা দখল করে বসি গিয়ে। চেপে ত বসা গেল একটা কামরায় গিয়ে, কিন্তু প্রান্ত যে আসে না! প্রথম ঘণ্টা পড়ল, পড়ল দ্বিতীয় ঘণ্টা তবু প্রান্তর দেখা নেই! স্পেশ্যাল ট্রেনের বিরাটবপু খাস বিলিতি গার্ড সাহেব সগর্বে বাঁশী বাজিয়ে সবুজ নিশান উঁচু করে নাড়তে লাগলেন। তারপর

যেই ট্রেণও যোগন দিয়েছে, প্রান্তও প্ল্যাটফর্মের অপর প্রান্তে দেখা দিয়েছে—ছুটতে ছুটতে আসছে, এক হাতে খাবারের ঠোঙা আঠার মত আটকে রয়েছে, অপর হাত দাঁড় বাইবার ভঙ্গিতে ঘন ঘন ঘুরে উঠছে নাবছে। আমরা জোড়া জোড়া হাত নেড়ে চীৎকার করে তাকে ডাকতে লেগে গেলাম সারা প্ল্যাটফর্ম সরগরম করে। কিন্তু হিত করতে বিপরীত হ'ল। কারণ আমাদের চীৎকারে গার্ডের দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ছুটন্ত প্রান্তর দিকে আকৃষ্ট হ'ল। প্রান্ত সবে খাবারের ঠোঙাটা আমাদের হাতে জানলা গলিয়ে দিয়েছে তারপর যেই নিজে গাড়ি চড়তে পা বাড়িয়েছে অমনি পেছন থেকে গার্ড সাহেব তাকে ধরে থামিয়ে দিলে। বেচারি প্রান্ত থমকে দাঁড়িয়ে গার্ডের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওদিকে গাড়ির গতি বেড়েই চলেছে। গার্ড দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে পেছনে তার কামরা এলেই উঠবে ব'লে। প্রান্তও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই। এবার পাল্টা পালা। গার্ড যেই তার গাড়ির হাতল ধরতে গিয়েছে, অমনি বিদ্যুৎবেগে প্রান্ত লাফিয়ে গিয়ে ধরলে জাপটে গার্ডের কোমর। তারপর দু'জনে ঝুটোপটি।

পানু। আর সেই সময় প্রান্ত মুচকে মুচকে হাসছিল।

বলাই। হ্যাঁ, সে ভারি মজা—প্রান্ত যতই মুচকে মুচকে হাসছে গার্ড সাহেব ততই চটে লাল। গার্ড বলে, খবরদার। প্রান্ত বলে—তোম্ খবরদার, চলন্ত গাড়িতে ওঠবার অধিকার আমার যদি না থাকে তবে তোমারও নেই। তার ওপর, তুমি রেলের লোক হয়েও রেলের আইন ভঙ্গ কর! তোমারই দোষ বেশী।' ইতিমধ্যে ট্রেণ এগিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে গেছে, কিন্তু গার্ডের কামরা থেকে নিশান নাড়া দেখতে না পেয়ে ড্রাইভার দিয়েছে গাড়ি থামিয়ে। গার্ড তখন প্রান্তর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দৌড়ে গেল গাড়ি ধরতে, প্রান্তও ছুটে এসে আমাদের কামরায় উঠে পড়ল।

(সকলের হাস্য)

গদাই। তারপর গিরিডিতে গিয়ে মাইকা-মার্চেন্ট সেই বিশালবপু লিংকি সাহেবের ভুঁড়িতে হাত বুলোবার কাণ্ডটাও শুনিয়ে দেও বরতুকে।

বলাই। ওঃ সেই বাজি ধরার ব্যাপারটা?

(হঠাৎ বেণুগোপালের পুনঃপ্রবেশ। তার চোখে-মুখে ভীতির চিহ্ন)

বেণু। প্রান্ত ত তার বাড়ীতেও যায় নি? কি সর্বনাশ!

গদাই। তাতে সর্বনাশটা কি হ'ল? তুই এমন পাগলের মত ছুটোছুটি করছিস কেন বল ত? ব্যাপারটা কি?

বেণু। ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর। বলছি সব, সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। দাঁড়া, আগে একটু বসে নিই। আজ সন্ধ্যাটা যখন ঘোর হয়ে আসছিল, আমি আমাদের বাড়ীর রকটাতে বসে ছিলুম। এমন সময় আমার পাশে এসে বসল প্রান্ত।

বলাই। অ্যাঁ, তবে ত প্রান্ত ফিরেছে বল। তোর সঙ্গেই যখন দেখা হয়েছে।

বেণু। না, না, সবটা শোন্ আগে। প্রান্তকে দেখেই মনে হ'ল তার কথাটাই ভাবছিলাম সেই মুহূর্তে। আর তার কথা এই দু'মাস ধরে আমাদের মধ্যে কে না সব সময়ই ভেবেছি, বল। সেই যে গেল সে গঙ্গাসাগর মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে, আর ত ফিরল না। তাকে দেখেই মনটা আনন্দে চমকে কি রকম বিহ্বল হয়ে গেল। চোখে তার শান্ত মৃদু হাসি। শুধোলাম—এত দিন ছিলে কোথা প্রান্ত? জবাব দিলে—গঙ্গাসাগরের ডিউটি সেরে বেড়িয়ে এলাম এধার-ওধার। দেখে এলাম বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত সেই নবকুমারের পথবিভ্রান্তির জায়গাটা। দেখলাম কাপালিকের নরকংকালপূর্ণ আশ্রম। সেই ভীষণ সেই মধুর সব জায়গা। প্রান্তর এই রকম বক্তৃতা শুনে আমি কি রকম হকচকিয়ে চুপ করে রইলাম। এমন সময় কানে এল, "রামনাম সৎ হ্যায়, এহি দুনিয়াকা গৎ হ্যায়।" তাকিয়ে দেখি একটা অভিনব ব্যাপার। দু'জনমাত্র লোক একটা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে। তারা খাটটাকে বাধ্য হয়ে নিয়েছে

মাথায় তুলে। সঙ্গে আর কোন লোক নেই। আমি ত অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। প্রান্ত হঠাৎ বললে, "যাবি ওদের সাহায্য করতে?" প্রান্তর সেই প্রশ্নে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শ্মশানে যাবার আমন্ত্রণ আচমকা এলে চমকে উঠতেই হয়। বিশেষ করে শ্মশানযাত্রীর সংখ্যা যদি বিরল হয় উৎসাহটা সবল হ'তে চায় না। এক্ষেত্রে আবার অজ্ঞাতকুলশীল মড়া।

স্বয়ম্ভু। বাঃ, বেণু ত খাসা কথা কইতে পারে।

বেণু। হ্যাঃ! খাসা কথা না মাথা। বেণুর রকা যে রকা। শোন্ আগে সব কথা। এখন বাজে বকিস না মাঝে থেকে। কিন্তু প্রান্তর প্রশ্ন ত প্রশ্ন নয়—সে যে আদেশ! তার কথা জানিস ত তোরা, ফেলা বড় শক্ত। যেতেই হ'ল। দৌড়ে গিয়ে তাদের সাহায্য করতে চাইলাম। তারা আগ্রহে আমাদের দু'জনকে তাদের কাজে লাগিয়ে নিল। তখন খাটিয়াকে যথারীতি চারজনে কাঁধে নেওয়া গেল। তারা এবার পরম উৎসাহে হাঁক দিল 'রাম নাম সৎ হায়, এহি দুনিয়াকা গৎ হায়'। কিন্তু তাদের রামনাম ধ্বনিতে আমরা যোগ দিলাম না বলে তারা বললে, 'বলিয়ে বাবুজী রামনাম সৎ হায়'। প্রান্ত রামনাম না নিয়ে হরিধ্বনি করে উঠল এবং সেই সঙ্গে আমিও তাতে যোগ দিলাম। কিন্তু তারা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে খুব বিরক্তি ও উৎকণ্ঠায় কর্কশ ভাবে বললে, "নেহি নেহি, রামনাম লিজিয়ে জলদি।" তাদের জলদির তাৎপর্যটা যে কি তা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু প্রান্ত তবু আর একবার হরিধ্বনিই শুধু করলে। তখন হঠাৎ তারা বললে, "খাটিয়া জারা উতারিয়ে জী।" খাট নামান হ'ল। তখন হিজলীতলার ঝোপটার কাছে গিয়ে পড়েছি। তারা দু'জনে গুটি গুটি পা বাড়িয়ে ঝোপেরই দিকে যেতে লাগল। আমরা তাকিয়ে দেখতে লাগলাম যায় কোথা! দশ-বার পা এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ মারলে দৌড়। ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাবার দৌড়! যেন প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। তাদের এই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি মহা রেগে গিয়ে প্রান্তকে বললাম - দেখলে ত যেচে পরের উপকার করতে যাওয়ার কি পুরস্কার! প্রান্ত কিন্তু হাসতে হাসতে বললে, "এখন আর রাগ করে কি করবে বল, ওরা দু'জনে যেমন করে বয়ে আনছিল, এখন আমাদের তাই করতে হবে, মড়া ত ফেলে রেখে যাওয়া চলে না।" তখন দু'জনে মাথায় করে খাট বয়ে নিয়ে চললাম আমরা। প্রান্ত আগে আমি পেছনে। চলতে চলতে আমি বললাম, "কার মড়া কে বয়, রাম রাম!" প্রান্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, "এই নামটা তুমি এতক্ষণে উচ্চারণ করলে? ওরা যখন চাচ্ছিল তখন যদি এই নামটা শোনাতে তো হ'লে আর ওরা পালাত না।" আমি বললাম, "কি? এই রামনাম?"

"হ্যাঁরে, ওরা কেন পালাল তা এতক্ষণ বুঝতে পারিস নি? ওরা আমাদের কি মানুষ ভেবেছে, না আর কিছু?" আমি বললাম, "ভূত ভেবেছে না কি?" প্রান্ত বললে, "ঠিক তাই; ভূতের মুখে ও নাম উচ্চারণ হয় না। তাই আমাদের পরখ করছিল। আচ্ছা বেণু তোমার মনে একবারও সন্দেহ হয় নি আমার ওপর?" কথাটা শুনেই আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল আর খাটের পেছনের দিকটা দড়াম করে দিলাম ছেড়ে। আর পেছন ফিরে দিলাম ছুট। সেই মুহূর্তেই আমার মাথায় এমন একটা চোট খেলাম যে কি আর বলব। সে কি খাটিয়ার পায়াটাই উলটে লাগল, না মড়াটার ঠ্যাংই ঠিকরে এসে লাগল, না প্রান্তের প্রেতাত্মাই মারলে মাথায় চাঁটি কে জানে?

(কথা শেষ করে বেণু হাঁপাতে লাগল)

গদাই। (মহা খাপ্পা হয়ে) যা যাঃ! প্রেতাত্মা অতক্ষণ ধরে তোর সঙ্গে প্রেতাত্মা কথা বলেছে? কী যে বকিস? তুই যে এত বড় কাওয়ার্ড তা জানতাম না। প্রান্তকে সেই তেপান্তরের মাঠে এই ভাবে ফেলে চলে এলি! খোট্টারা তবু খাট নাবিয়ে তবে

পালিয়েছে, আর তুই কিনা মড়াশুদ্ধ খাটটা দড়াম করে উলটে দিয়ে চলে এলি। প্রান্ত বেচারি এতক্ষণ কি করছে কে জানে? চল্ আমরা যাই, ওঠ সব, সব্বাই চ। চট করে উঠে পড় বলছি।

বংশু। (গম্ভীরভাবে) অত হটকারী হয়ো না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা—

গদাই। আরে ধ্যাৎ অগ্রপশ্চাৎ! ওঠ সব চট্ করে।

(আমরা সকলেই উঠিয়া পড়িলাম)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(শ্মশান বলিতে পাড়াগাঁয়ের শ্মশান। যাইবার পথটা পর্যন্ত যেন আতংকে থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে। নেদাতলার পথটা বাঁয়ে রাখিয়া হাড়গিলা খালের ধার দিয়া দিয়া খানিকটা গিয়া তবে হিজলীতলা।)

বলাই। এই ত হিজলীতলা।

বেণু। হ্যাঁ, ঐ ঝোপটার দিকে পালিয়েছিল খাট্টারা।

গদাই। আর তুই কোন্ খানটায় প্রান্তকে ফেলে পালিয়েছিস?

বেণু। সে আরও খানিকটা এগিয়ে ঐ বটগাছটা পার হয়ে।

গদাই। এই ত বটগাছের কাছে এসে পড়লাম।

বেণু। হ্যাঁ, ঠিক ঐ জায়গাটায়।

(বলিয়াই কাদার মধ্যে ঝুঁকিয়া কি যেন দেখিতে লাগিয়া গেল)।

গদাই। কৈ, এখানে ত প্রান্ত বা মড়ার খাট কিছুই দেখছি না। কিন্তু তুই ওখানে ঝুঁকে পড়ে কি দেখছিস বেণু?

বেণু। দেখছি এক কাণ্ড, এখানে আমার পায়ের দাগ

রয়েছে, কিন্তু প্রান্তর পায়ের দাগ নেই—এর মানে কি?

স্বয়ম্ভু। হুঁম। ভেরি সিরিয়াস!

গদাই। যা যাঃ? ওসব তোর কল্পনা—তোর দেখবার ভুল। অন্ধকারে কি সব দেখা যায়? চল চল এগিয়ে চল শ্মশানের দিকে। প্রান্ত নিশ্চয় একাই বয়ে নিয়ে গেছে মড়া শ্মশানে, ও যা কর্তব্যনিষ্ঠ ছেলে!

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

(হিজলীতলার বেতঝোপ ডাইনে ফেলিয়া দৈত্য দীঘির ধারে তালগাছের শিরের সারি এই অমাবস্যার রাতেও আবছা আবছা দেখা যায়। তালের দৈত্যরা এই শ্মশানের পথে তাকাইয়া দেখে—আবার কে যায়? হঠাৎ দমকা হাওয়ায় হাসিয়া বলে—হা হাঃ। যাবে সবাই এ পথে যেদিন যার সময়। আমরা মহাকালের মহারথী বসিয়া বসিয়া দেখিব সবই।

তারপর মাঠের রাস্তা অজগর সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রবেশ করিয়াছে গিয়া শেওড়া বনে। বনের মাঝে গাছের ডাল কোথাও হেলিয়া কোথাও বাতাসে দুইয়া পড়িয়া খাটের মড়ার কানে কানে কি যেন কথা কয় আবার রামনাম করিতেই খাড়া হইয়া উঠিয়া পড়ে। কোথাও কালপ্যাঁচার গুরুগম্ভীর আতংকপূর্ণ ধ্বনি—ভুতভুতুম, ভুতভুতুম, ভুতভুতুম! শ্যাওড়া বন পার হইয়া ভাগীরথীর তীরে বিশাল শাল্মলী তরুতলে শ্মশান ঘাট। অপর প্রান্তে একটা নিমগাছও আছে। আমরা তাকাইয়া দেখিলাম একটিমাত্র চিতা। তাহাতে সবেমাত্র আগুন ধরিয়া উঠিতেছে)

গদাই। এই ত মড়াটাকে প্রান্ত একাই বয়ে এনে চিতা সাজিয়ে আগুন দিয়েছে। সে কাছেই কোথাও আছে নিশ্চয়। (উচ্চস্বরে) প্রান্ত! প্রান্ত! প্রান্ত!

সকলে (উচ্চস্বরে) প্রান্ত? প্রান্ত? প্রান্ত?

স্বয়ম্ভু। কোথায় তোদের প্রান্ত?

বেণু। (চিতার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ চেঁচাইয়া) সর্বনাশ?

গদাই। কি কি? কি হ'ল রে?

বেণু। সর্বনাশ, চিতায় শুয়ে ঐ ত প্রান্ত!

গদাই। (আগুনের শিখার ফাঁকে ফাঁকে তাকাইয়া) না, না, কি যে বলিস! তোর কি মাথা খারাপ হ'ল?

স্বয়ম্ভু। ওর মাথা খারাপ হয় নি, ও ঠিকই বলেছে। বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে বিধান আছে—নিজের বিপন্ন মৃতদেহকে নিজেই বইতে পারে, নিজেই পোড়াতেও পারে।

গদাই। আরে খ্যাৎ, রেখে দে তোর বেতাল-পঞ্চবিংশতি!

নেপথ্যে। ভুতভুতুম! ভুতভুতুম!! ভুতভুতুম!!!

নারগিস

জুলফিকার

(এক)

গল্পটা শুনেছিলাম আমার পিসতুতো বোন অশোকার মুখে। সত্য-মিথ্যা ভগবানই জানেন।

অশোকা আমার ঢের ছোট, আমাকে সম্ভ্রমও করে যথেষ্ট। আমার কাছে যে মিথ্যে কথা বলবে, তা মনে হয় না।

অশোকার স্বামী ব্রজদুলাল ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের কর্মচারী। ওরা তখন বার্ণের ইণ্ডিয়ান এমব্যাসীতে। বার্ণ থেকে ইণ্টারলাকেন হয়ে ফরাসী সীমান্তে যেতে পড়ে, ছবির মত হ্রদটি, শ্যামল টিলাগুলোর পেছনে, পাইন বনের মাথা ছাড়িয়ে, তুষার-চূড় আল্পস তার গর্বোন্নত মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টিলার গায়ে সারি সারি শ্যালে (Chalet),—কাঠের বাড়ী, কাঁচের শার্সী, টাইলের লাল ছাদ। দূর থেকে মনে হয়, পাহাড়ের গায়ে কে যেন কতকগুলো পুতুলের খেলাঘর সাজিয়ে রেখেছে।

এই হ্রদের ধারে ওরা এমব্যাসীর কয়েকজন, একটা ছুটির দিনে এসেছে পিকনিক করতে। ব্রজদুলাল সব ব্যাপারেই সিরিয়াস। সে ফ্রেঞ্চ শিখছে, ছুটির দিনটা নষ্ট করতে চায় না। তাই যোগ দেয় নি পার্টিতে। পাশাপাশি কয়েকটা বার্চ আর আপেল গাছের নীচে, জাপানী মাদুর বিছিয়ে বসেছে ওরা।

লাইলাকের ঝোপগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। ভারী মিষ্টি গন্ধ লাইলাকের।

ঊর্দ্ধে নিঃসীম নীল আকাশ, আর নীচে পাহাড়-ঘেরা হ্রদের অথৈ সুনীল জলের দিকে তাকিয়ে, অশোকার মন মুগ্ধ বিস্ময়ে ভরে ওঠে। মনে হয়—যুগ-যুগান্ত ধরে আকাশ ও হ্রদের তারা-মৈত্রের প্রেম চলছে—চলছে উভয়ের অশ্রুত, অশ্রান্ত আলাপন। আকাশ ও পৃথিবী,—এই দুই বিরাট সত্তার সঙ্গমে অশোকা যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলে।

শঙ্করলাল দীক্ষিত কৌটো থেকে বিস্কিট বার করে চিজ মাখাচ্ছিল। বলল, 'দিদি আপকী কফি ঠাণ্ডি হো যাতি।'

ইন্দুমতী জৈন টিপ্পনী কাটে, 'নেচারকি বিউটী দেখ্ কর দিদিকা জী ভর গয়া। উমিদ হ্যায় পেটভি এইসেহি ভর জায়গা, আউর খানে পিনেকী কোই জরুরত নেহি পড়েগী।'

ওয়াল্টার ডি কুনাহ্ ট্রাভাঙ্কোরের লোক, অশোকাদের সঙ্গে এর আগে সৌদি আরবে ছিলেন, অশোকার মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান বহু শুনেছেন।

'মিসেস সেনগুপ্তা হ্যাজ মাচ এ রোমাণ্টিক সোল', বললেন ডি কুনাহ্, শী মাস্ট বি ইন হার ট্রু এলিমেণ্ট, ইন এ পোয়েটিক সারাউণ্ডিং লাইক দিস।...এ্যাণ্ড হোয়াট এ্যাবাউট ইউ কাপুর? ডোণ্ট ইউ ফিল এ থ্রীল, এ্যান এক্সট্যাসী, ইন দিস চার্মিং এনভাইরনমেণ্ট?'

সহকর্মী কাপুরকে খোঁচা দিয়ে আনন্দ পান ডি কুনাহ্।

'অল আই ফিল নাউ ইজ এ সেনসেশান অব হাঙ্গার' —জবাব দেন ঈশ্বরদাস কাপুর, বড় এক টুকরো সসেজ মুখে গুঁজতে গুঁজতে।

কাপুরের স্ত্রী নির্মলা বলল, "মিষ্টার ডি কুনাহ্ আপনে উস্ রোজ কহা কি,—'টু রিসাইট পোয়েট্রি আনটু কাপুর ইজ এ্যাজ মিনিংলেস, এ্যাজ টু হোল্ড এ বাঞ্চ অব রোজেস আণ্ডার দ্যা নোজ অব এ ক্যাট'—বহোৎ আচ্ছী বাত বোলা।'

চতুর্বেদী কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল—সাহাবকী বাত ছোড় দিজীয়ে। লেকিন্ দিদিতো বংগালকী

লড়কী, পোর্ষ্ট্রি বংগালীয়োঁকী আম বিমারী হ্যায়।'

কাপুর বলে উঠলেন, 'হাঁ, জী, হাঁ! জাহির হ্যায় কি, উর্দু। ওঁর নক্সিস্ চিজোঁপর তো আকসার নজ্মে লিখে গয়ে হ্যায়, মগর বংগালমে কভি কভি বিল্লীকে ত্রুম পর ভি আচ্ছী কবিতা বন যাতী। ম্যয়নে শুনা হ্যায়, বঙলেকো লেকর টেগোরনে এক বহোৎ মস্তর নজম্ লিখি হ্যায়।'

কাপুরের কথায় সবাই হেসে ওঠে।

কফির সঙ্গে চিজ-বিস্কিট, সসেজ ও রোস্টেড চেষ্টনাট খেতে খেতে ওরা গোল হয়ে বসে যায় তাস নিয়ে, তিন পাত্তির খেলা খেলতে। এ খেলায় ওদের আগ্রহ কারো কম নয়—কি পুরুষ, কি মেয়ে।

খেলা চলবে অন্ততঃ সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত, তার আগে খাওয়ার গরজই হবে না কারো।

অশোকা এ খেলাটা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, অথচ ওদের কোন পার্টি বা পিকনিক, এ খেলা না হ'লে জমেই না। অশোকা না খেললেও, ওকে ছাড়া কোন পিকনিক বা পার্টি অচল। রান্না ও পরিবেশন ওর মত অমন পরি-পাটী ভাবে কে করবে? এমব্যাসীতে অশোকার রান্নার দারুণ খ্যাতি।

এ্যামেরিকান কালচারাল এ্যাটাশে ডঃ হামফ্রীজ বছর দুই আগে ওর হাতের বীন আর পার্সনীফ দিয়ে রান্না সোনা মুগের ডাল আর এ্যাসপারাগাসের সর্ষে বাটা দিয়ে চচ্চড়ির কথা আজও ভুলতে পারেন নি। আর্জেনটিনায় বদলী হয়েও দু' দু'খানি চিঠিতে জানিয়েছেন সে কথা।

ওদের সঙ্গে ষ্টেশন ওয়াগনে প্যান্ ও ডেকচি ভর্তি খাবার এসেছে (বাড়িতে বসে অশোকাই করেছে সব), আর এসেছে দুটো ষ্টোভ। খাবারগুলো গরম করে নিতে আর কতই বা সময় লাগবে।

অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক এখন ওরা তাস নিয়ে মসগুল থাকতে পারবে।

দেহ-সর্বস্ব এই নর-নারীর সংস্পর্শ অশোকার কাছে মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক উন্মুখতা প্রায় এদের কারোরই নেই। খাওয়া-দাওয়া হৈ হুল্লোড়, অশ্লীল রসিকতা হেয়ারলোশান ক্রীম-কজ-ম্যাসকারা-লিপষ্টিক লাগিয়ে ঝকমকে হাল-ফ্যাসানের পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানো, পরচর্চ্চা, ড্রিংকিং, ডান্সিং, ফ্লার্টিং, গ্যামব্লিং—এই নিয়ে আছে ওরা। হাল্কা 'মেরা-জুতা-হ্যায়-জাপানী' গোছের গান, সস্তা ডিটেকটিভ বই—যাকে বলে শিলিং শকার, রংচং-এ সিনেমা পত্রিকা, ইয়োলো কভার বুক্স বা পর্ণোগ্রাফিক সাহিত্য-এগুলোই ওদের স্থূল চিন্তা ও রুচির খোরাক জোগায়।

সেবার ল্যুভেরে গিয়ে এক ডি কুনাহ ছাড়া অন্য সবাই সারাক্ষণ ক্যাফিটেরিয়ায় বসে আড্ডা দিয়েই কাটাল।

দীক্ষিত বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ, অথচ রেমব্রাণ্ট কি ভাগনারের নামই শোনে নি। ইন্দুমতী এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রীর এম. এ, অথচ ফ্রাউ টাইফেনথেলার সেদিন যখন ব্যাক্‌ট্রোগ্রীকদের কথা তুললেন, ওর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। ককটেল প্রসঙ্গ উঠলে কিন্তু অনেক খাঁটী মেমসাহেবও ওর পান্ডিং সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে থ মেরে যাবে।

অথচ এই দীক্ষিত-জৈন-কাপুর এরাই বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে।

(দুই)

ওরা সবাই তাস নিয়ে বিভোর।...একা একা আর কি করে অশোকা। হ্রদের তীরে পাইচারী করে ফেরে। একখানা ছোট বোট বাঁধা আছে একধারে। ওটা নিয়ে লেকের মাঝে ঘুরতে পারলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু নৌকো চালাতে জানে না অশোকা।

বেড়াতে বেড়াতে অশোকা দেখতে পেল, একটা পায়ে-চলা পথ, দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে।

একধারে শ্যাওলা-ঢাকা মস্ত বড় একখানা পাথর, আর তারই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা চেষ্টনাট গাছ। এই পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অশোকা দেখতে পেল, পাহাড়ের উপত্যকায় পাঁচিল-ঘেরা ছায়া-ঘন একটা বাগান, আর গাছপালার মাথার উপর দিয়ে চোখে পড়ে একটা প্রাচীন কাসেলের ধূসর টারেট।

অশোকা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায়।

ফটকের কাছে একটা বুড়ো লোক চীনামাটির লম্বা পাইপে তামাক টানছিল। মুখে পালপাট্টা দাড়ি, আকর্ণ-বিস্তৃত গোঁফ। পরণে সেকেলে মিলিটারী ইউনিফর্ম,—লাল জামার বুকে, পাঁজরার মত সারি সারি কয়েকটি সমান্তরাল সাদা পটী,

লম্বা প্যাণ্টের দু'পাশেও কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পট্টি।

অশোকাকে দেখে, লোকটা পাইপ নামিয়ে, কোমরের ওপরের অংশটা বেঁকিয়ে, সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল।

'এৎ ভু দে ল্যান্দ, মাদাম ? (আপনি ভারত থেকে আসছেন, মহাশয়া ?)

অশোকা বলল, 'হাঁ।'

কথাবার্তা চালানোর মত অল্প-বিস্তর ফ্রেঞ্চ জানা আছে ওর। ভাল বলতে না পারলেও, বুঝতে পারে।

জিজ্ঞেস করে সে কি এই শাতোর (Chateau) চারপাশ ও ভেতরটা একটু ঘুরে দেখতে পারে ?

লোকটা বলল, 'স্যুরমাঁ (নিশ্চয়ই), মাদাম।'

'তোমার মনিব বাড়ী আছেন, তাঁর কোন আপত্তি নেই ত ?'

'তিনি খুসীই হবেন। দয়া করে এই পথে আসুন, আমার সাথে।'

লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে—আপেল, পীচ, চেরী ও পিয়ার গাছের মাঝ দিয়ে, মার্বলের শুকনো ফোয়ারাটার (যেখানে আগে তিনমুখো সিংহের মুখ দিয়ে জল ঝরতো) পাশ দিয়ে, বড় একটা সূর্য ঘড়ি পেরিয়ে, সদর দেউড়ির দিকে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সাদা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা উঠলে, বিরাট এক কাঠের দরজা। দরজার দু'পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেত পাথরের জোড়া থাম।

ঘণ্টা বাজানোর একটু পরেই, দরজাটা খুলে যায়। অশোকা দেখল একজন দীর্ঘকায় ভদ্রলোক ওদের সামনে দাঁড়িয়ে।

একরাশ সোনালী চুল কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে, মুখশ্রী সুন্দর কিন্তু মোমের মত সাদা, রক্তশূন্য। অপূর্ব ভাবময় নীল চোখ দু'টি। একটা করুণ কোমলতা ওঁকে ঘিরে আছে যেন।

পরণে আঁট-সাট ভেলভেটের পোশাক। গলায় মস্ত বড় একটা মস্ত রঙা ক্র্যাভাট বাঁধা। এ ধরণের পোশাকের চল বহুদিন উঠে গেছে। অশোকার কেমন আশ্চর্য্য লাগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পোশাকে সজ্জিত এই ভদ্রলোকটিকে দেখে।

ওকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোকটি অধীর, ব্যগ্র বাহু মেলে এগিয়ে আসেন, পরক্ষণেই হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে কয়েক পা পেছিয়ে যান। আশাহত অস্ফুট আর্ত কণ্ঠে কি যেন বলে ওঠেন। অশোকা বুঝতে পারে না ওঁর কথাগুলো।

দু' হাতে মুখ ঢাকলেন ভদ্রলোক।

'ম' ম্যাৎর (আমার প্রভু), ব্যারণ দ্যে লনী,' বলল বুড়ো দারোয়ানটি।

ততক্ষণে ভদ্রলোক মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছেন। অনেকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে।

অশোকা করজোড়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে নমস্কার জানাল। সৌজন্য প্রদর্শনে ফরাসী ঐতিহ্যকে ম্লান হতে দেন না ব্যারণ, অপরূপ ভঙ্গিতে বাও করলেন, খানদানী ক্যাভেলিয়ারী কায়দায়।

'আমি আসছি বার্ণ থেকে। লেকের ধারে পিকনিক করতে এসেছি ইণ্ডিয়ান এমব্যাসীর আমরা কয়েকজন। অন্য সবাই তাস খেলছেন, সেই ফাঁকে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি আপনার এই শাতোর ধারে। বাগানের ফটকের কাছে আপনার এই বৃদ্ধ অনুচরটির সঙ্গে দেখা হতে, জিজ্ঞেস করলাম —আমি এই প্রাচীন শাতোটার ভিতরে গিয়ে সব দেখতে পারি ? ও তাই সঙ্গে করে নিয়ে এলো আমাকে, আপনার কাছে।

অশোকাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলাতেই বলতে সুরু করলেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য ! আপনি বাংলার মেয়ে ?... অনেকদিন বাংলা দেশের খবর জানি নে, ও, সে বহুদিন হ'ল ! কতদিন তার হিসেবও নেই।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যারণ।

অশোকা কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, —'দিব্যি বাংলা বলতে পারেন ত আপনি। শিখলেন কোথায় ?

ব্যারণের কথায় বিদেশী টান বোঝাই যায় না, তবুও কথা বলার ঢংটা যেন একটু কেমন কেমন।

'বলতে গেলে এক রকম বাংলা দেশের আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছি,' বললেন দ্যে লনী 'আমার ছেলেবেলা কেটেছে চন্দননগরে—একটানা প্রায় দশ বছর।'

'আপনাদের এ শাতো ত বহু প্রাচীন। কৌতুহল মার্জনা করবেন, দেশে জমিদারী থাকতে, বিদেশ বিভূঁইয়ে কেন মানুষ হ'তে হয়েছিল আপনাকে?'

একটু হেসে উত্তর দেন ব্যারণ,—

'আমাদের বংশের ব্যারণ উপাধি ও জমিদারী নিঃসন্তান জ্যেঠামশাই মারা যাবার পর, আমার ওপর বর্তেছে। আমার বাবার আগেই মৃত্যু হয়েছে, আমার বাবাকে রোজগারের চেষ্টায় যেতে হয়েছিল ভারতবর্ষে। দু' বছর বয়সে যাই চন্দরনগরে বাপ-মা'র সঙ্গে। দেশে যখন ফিরলাম, তখন আমার বয়স বছর বারো। বাঙালী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কত মিশেছি, খেলা করেছি। দিশি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাতে আমার বাবা কোন দিনই আপত্তি করেন নি, বরঞ্চ এ ব্যাপারে তাঁর খানিকটা উৎসাহই ছিল। তার নিজেরও বহু ভারতীয় বন্ধু ছিল।'

'ইংরেজদের মত আপনারা ফরাসীরা অতটা সংকীর্ণমনা বা জাত্যাভিমানী নন।'

'কথাটা যে খুব ঠিক, তা নয়। ভারতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে আমাদের দেশেরও কেউ কেউ গোঁড়া মনোভাব পোষণ করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমার মার কথাই ধরা যেতে পারে। তিনি কালা আদমীদের সান্নিধ্য বিশেষ পছন্দ করতেন না। আফ্রিকায় থাকার সময় সত্যিকার কালো মানুষ অনেক দেখেছি। তাদের তুলনায় বাংলার লোকেরা ঢের ফরসা, কারো কারো রঙ বিশেষ মেয়েদের, প্রায় আমাদের কাছাকাছি শুধু বাঙালী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা আমাকে মিশতে দিতেন বলে, বাবার সঙ্গে মা'র প্রায়ই ঝগড়া হ'ত।

'বাঙালীদের আপনি খুব পছন্দ করেন?'

'তা করি বই কি! বাঙালীদের ওপর সত্যিই আমার খানিকটা দুর্বলতা আছে। একোল (স্কুল) থেকে বেরিয়ে আমি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ফরেন সার্ভিসে ঢুকি। অল্প কিছুদিন আফ্রিকায় কাটানোর পর, তদ্বির করে চলে আসি ছেলেবেলাকার সেই চন্দরনগরে। গেছেন আপনি সেখানে? ষ্ট্র্যাণ্ডের কাছে, গঙ্গার পাড়ে বড় থামওয়ালা বড়ালদের বাড়ীটা দেখেছেন? চেনেন বড়ালদের, খুব মস্ত ব্যবসা ওদের,—গ্রাঁ মারশাঁ?'

ব্যারণের কণ্ঠে কেমন যেন উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে। ঘাড় নেড়ে অশোকা জানালো, না।

(তিন)

ব্যারণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অশোকাকে সাথে নিয়ে দ্যে লনী সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন। বড় বড় ঘর, জানলায় ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে, দামী মেহগনী ও সেগুন কাঠের আসবাব। সুদৃশ্য কাট গ্লাসের শ্যাণ্ডেলিয়ার, পূর্বপুরুষদের প্রাচীন লৌহ বর্ম, শিরস্ত্রাণ, ক্রুশের মত হাতলওয়ালা ভারী তলোয়ার। তুর্কিস্থান ও পারস্যের গালিচা মালয়ী ক্রীস্, তিব্বতী প্রেতনৃত্যের মুখোস, মার্বেল ও জেডের বুদ্ধমূর্তি, কষ্টি পাথরের সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেব, ক্ষীণমধ্যা, পীবরস্তনী যক্ষিণী, নৃত্যপর নটরাজ, চোখে জ্বলজ্বলে লাল পাথর বসানো চীনা ড্রাগন মূর্তি। রেশমী পর্দার ওপর সূক্ষ্ম তুলিতে আঁকা জাপানী ছবি। দুষ্প্রাপ্য পোরসেলিনের চিত্রিত ভাস, হাতীর দাঁতের কৌটা ও খেলনা। বেত ও বাঁশের তৈরী টুকিটাকি হরেক রকম জিনিষ।...

এগুলোর অধিকাংশই ওঁর জ্যেঠার সংগ্রহ। ভদ্রলোক যথার্থ শিল্পানুরাগী ছিলেন। ব্যারণ নিজেও কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য নিয়ে এসেছেন বিদেশ থেকে। আফ্রিকার নিগ্রো শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আছে ওঁর কালেকশানে।

সব খুঁটিয়ে দেখতে হলে একটা পুরো দিনেও কুলোবে না।

হঠাৎ ম্যাণ্টেলপিসের ওপর একখানা ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ায়, অশোকা থমকে দাঁড়ায়।

একটা কিশোরী মেয়ের রঙীন ছবি।

দেখলেই বোঝা যায়, বাঙালী মেয়ে।

একরাশ মেঘবরণ চুল, কালো কালো ঢলঢলে আয়ত চোখে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি, পাৎলা টুকটুকে ঠোঁটে ভারী মিষ্টি হাসি, তাতে কেমন একটু দুষ্টুমির ছোঁয়া।

তবে মেয়েটার নাকে নাকছাবি, কানে কানবালা, মাথায় সিঁথি, গলায় চিক, সাতনরী হার। এ সব জবরজং গয়নাগুলোয় ওকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। ওর রূপ কিন্তু এগুলোতে একটুও ঢাকা পড়ে নি।

সত্যিই মেয়েটি অসামান্যা লাবণ্যময়ী।

'এটা কার ছবি?' অশোকা প্রশ্ন করল।

ব্যারণের মুখে একটু গর্বমেশানো সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে।

'ম' কম্পাইন্‌' দা ফাঁস (আমার বাল্য সহচরী) ফ্ল্যার— ফু-ল-বা-লা।'

ভারী মধুর শোনায় নামটির উচ্চারণ, ওঁর মুখে।

'বাঃ, সত্যিই ফুলের মত মেয়েটা! ফুলবালা নামটি চমৎকার খাপ খেয়েছে ওর চেহারার সঙ্গে।'

'আমি ওকে ফ্ল্যার বলেই ডাকতাম।···ওর খবর বহুদিন পাইনে। ওরই আসার আশায় প্রতীক্ষা করে বসে আছি, বছরের পর বছর।···শাড়ীপরা আপনাকে দেখে প্রথমটায় আমি চমকে উঠেছিলাম। ঠিক তারই মত গালে আপনার তিল,···আমার ভুলটা ক্ষমা করেছেন নিশ্চয়ই।'

'না, না, আমি কিছু মনে করি নি। আমিও ভেবেছিলাম আপনি আপনার পরিচিত অন্য কেউ বলে ভুল করছেন।' ব্যারণ অশোকাকে পেয়ে কেমন যেন মুখর হয়ে ওঠেন।

'জে নে পুৎরে জার্মা উব্লিয়ে লে মেমোরিয়াল দ্য, শান্দারনাগর সে জুর্‌লা অঁ গ্রাভে লে তেমোঁআঁইয়াজ দোরে দাঁ ম' ক্যার।'

(চন্দরনগরের স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। আমার মনের পাতায় সেই সব দিনগুলো তাদের সোনালী স্বাক্ষর রেখে গেছে।)

বাংলার চোখ-জুড়ানো শ্যামল-শ্রী, উচ্ছল গঙ্গার বুকে শরতের রোদের ঝিলিমিলি, আকাশে কালো মেঘের গায়ে উড়ে-চলা সাদা বকের শ্রেণী, মর্মরিত নারিকেল শাখার আন্দোলন,—এখনও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। শিউলি, চাঁপা, বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসে অতীতের উজান স্রোতে। পাপিয়া কোকিলের গান শুনতে পাই।···

ঝাড় লণ্ঠনের নীচে বড়ালদের প্রকাণ্ড বাড়ীটার ছাদ-ঢাকা প্রাঙ্গণে বসে, অনেক যাত্রা গান শুনেছি। নারদ মুনির লাল জটা দাড়ি দেখে খুব মজা লাগত। বিদ্রোহী সেনাপতির সঙ্গে নির্বাসিত রাজপুত্রের চোখ-ধাঁধানো তলোয়ারের যুদ্ধ আতঙ্ক ও বিস্ময়ে নিস্পন্দ হয়ে দেখেছি।

জে আঁতান্দু প্লুজিয়্যার শাঁ লে মেলদি এ পাথস্‌ দে সেজ ভিব্রে ম' জেন্‌ ক্যার। কেলকে কোয়ন, ইল্‌ আমেনে দে প্ল্যার আ মেজিয়ে।

(কত সুন্দর সুন্দর গান শুনেছি, যাদের মধুর করুণ সুর আমার বালক হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেছে। গান শুনতে শুনতে চোখ জলে ভরে উঠেছে।)

হাসি-কান্নার বিচিত্র রঙে রাঙানো সেই দিনগুলো আমার মনের নিভৃতে এখনও মিছিল করে ফেরে, আর সেই সঙ্গে ভেসে ওঠে একখানা মুখ, বড় বড় কালো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি,—বিশ্বাস, সারল্য ও প্রীতিতে বিহ্বল।

বড়ালদের বাঁধা ঘাটের সিঁড়ির ওপর বসে গঙ্গায় পাল তুলে ভেসে-চলা নৌকাগুলোর পানে চেয়ে চেয়ে অনেক সন্ধ্যে কাটিয়েছি আমরা পাশাপাশি বসে। ঘাটের পারের বকুল গাছ থেকে আমাদের গায়ে টুপটাপ ঝরে পড়েছে ফুল।···আ, কেল্‌ পারফ্যাঁ সুক্রে দে ফ্ল্যার বকুল, ইল সুরপাস্‌ লে ভিয়লেৎ দে নৎর ভিল্‌।

(আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ বকুল ফুলের! আমাদের ভায়োলেটকেও হার মানায়!)

আমার মা ভারতীয় কালো মানুষদের ঘৃণা করলেও ভারতের এই ফুলটিকে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন। দেশের বন্ধুদের কাছে চিঠির ভাঁজে বকুল ফুল গুঁজে দিতেন,··· এই ফুলের মালা গেঁথে ফ্ল্যার আমাকে দিত। ফুল শুকিয়ে গেলেও গন্ধ থাকত বহুদিন।'

অশোকা বলল, 'প্রেমাস্পদের মৃত্যু হলেও, তার স্মৃতি যেমন আমাদের মনকে ঘিরে থাকে, ঠিক তেমনি।'

ব্যারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, 'ম্যারভেইয়ো (মার্ভেলাস), খাসা বলেছেন।'

'আপনি ফুলবালার আর কোন খবর পান নি?'

'না,···তারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি আমি। আত্তাঁ এ্যাক্সিয়েৎমাঁ পুর্‌ দে জানে।'

তারপর স্বগতোক্তি করেন,—

'ঠ, সু রাঁকেনত্রেঁ অাঁ কর···জে সে কে সেল।' নে পা ভ্যাঁ দেসেপায়ার (একদিন আমাদের আবার দেখা হবে। আমি জানি এটা দুরাশা নয়।)'

ব্যারণের অন্তস্থল থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।

অশোকা করুণ চোখে চায়, সহানুভূতি জানায় দে ল্যানীকে। কোমল কণ্ঠে বলে,—

'ম'শিয়ে ল্যো ব্যারণ, বহুদিন আগে একটা পার্শী

কবিতার অনুবাদ পড়েছিলাম। সেটা মনে পড়ে গেল।... কবি এক বিজন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে চলতে চলতে, পথের ধারে কবরের ওপর ফুটে-ওঠা দুটো নারসি'সাস (পারস্যে বলে নারগিস) ফুল দেখে, থমকে দাঁড়ান। প্রশ্ন করলেন, 'নারগিস, এই জনশূন্য প্রান্তরে, সবার চোখের আড়ালে কেন তোমরা ফুটে আছ?

ফুল দুটো বলল, 'হে পথিক, এই সমাধিতে শায়িত ব্যর্থ প্রেমিকের ব্যাকুল চোখ দু'টি আজ আমরা ফুলের রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছি। যদি কোনদিন প্রিয়তমা এই পথ দিয়ে চলে যায়, তাকে একবারটি দেখব সেই আশায়।'

'চমৎকার! 'স'প্লাদির!' বলে উঠলেন ব্যারণ।"

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অশোকা চমকে ওঠে। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আর নয়, এক্ষুণি যেতে হয়। খাবার-দাবার গরম করা আছে, তা ছাড়া দু'চারটে ভাজাভুজি—সবই ওর করবার কথা।

বলল, 'আমার সাথীরা এতক্ষণ আমার অদর্শনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন বোধ হয়। আচ্ছা, আজ ত' হ'লে আদি ব্যারণ। অন্য একদিন এসে আপনার চমৎকার কালেকশানগুলো দেখে যাব, আর শুনব আপনার বাল্যসখী ফ্লার গল্প, অবিশ্যি বলতে যদি আপত্তি না থাকে আপনার। ভগবান যেন শীগ্‌গিই আপনাদের মিলন ঘটান। আপনার প্রতীক্ষা সফল হোক!...আমার স্বামী মিঃ সেনগুপ্ত ইণ্ডিয়ান এমব্যাসীর ফার্ষ্ট সেক্রেটারী। তাঁকে নিয়ে আসব একদিন। ...আচ্ছা আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে? সবাই খুব খুসী হবে আপনি গেলে। চলুন না, আমি সকলের তরফ থেকে আপনাকে নেমন্তন্ন করছি। ভু জেৎ অ্যাভিতে পুর মাঁজে কেলকেসোজ আভেকনু (আমাদের সাথে বসে একটু কিছু খাবেন, তাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি)।'

'পার্দঁ, মাদাম! লোকজনের মধ্যে গেলে আমার কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ হয়, জে নেম্ পা কম্পাইয়োঁ।

ব শাঁস (শুভ সুযোগ (আসুক আপনার জীবনে)!) ম'াসিয়ে। ও রেভোয়া!'

'বড়ই দুঃখিত আপনাকে ঠিক মত অভ্যর্থনা করতে পারলাম না।...আমার সেলারে খুব পুরাণো মেদিরা আছে। বিদায় নেওয়ার আগে তাই একটু চেখে দেখবেন কি?'

'ম্যারসী (ধন্যবাদ)! আমি মদ খাইনে। চললুম, ও রেভোয়া!'

'ও রেভোয়া, মাদাম।'

(চার)

তরুণী উদ্বিগ্ন গালপাট্টা-ধারি সেই বুড়ো লোকটির সঙ্গে ফিরল অশোকা ছায়াঘন বাগানের পথ ধরে। লোকটা বাইরে ওরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

লোকটা সারাটা পথ বক্ বক্ করতে করতে চলে। ও নিশ্চয়ই দক্ষিণ প্রদেশের লোক অশোকা ভাবল। দক্ষিণ ফ্রান্সের লোকেরা স্বভাবতঃ একটু দিলখোলা ও বাচাল হয়ে থাকে। দো ল্যানীদের এখানে বহুদিন ধরে আছে সে, ওদের পারিবারিক ইতিহাসের অনেক কথা জানে।

ওর মুখ থেকেই অশোকা জানতে পারল যে ব্যারণের বাবার আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা ছিল। প্রথমে পণ্ডিচেরীতে, পরে চন্দননগরে। চন্দননগরের একজন খুব বড় বাঙালী ব্যবসায়ী ওঁদের প্রতিবেশী ছিলেন। ওদের দুই পরিবারের খুব হৃদ্যতা জন্মেছিল, ও বাড়ীর পূজো বা উৎসবের সময় দো ল্যানীরা যেতেন, নাচ তামাসা যাত্রা দেখতেন। দিশি মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করতেন, সেই বাঙালী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের ছোট্ট মেয়েটি বালক দো ল্যানীর খেলার সাথী ছিল।

খুব কাঁচ বয়সে, বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে, মেয়েটা বাপের ঘরেই বাস করছিল। ছ' সাত বছরের ছোট মেয়ে দু'টির মেলামেশায় কেউ কোনদিন আপত্তি তোলে নি। ...ক্রমে এই বিদেশিনী হিন্দু মেয়েটির চিন্তা দো ল্যানীর সারা মনটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ওকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন যুবক দ্যেল্যানী। ওঁর মা তখন ওঁর কাছেই থাকতেন। এই বিবাহে তাঁর আদৌ সমর্থন ছিল না। এই নিয়ে শেষটায় ছেলের সঙ্গে প্রায় তাঁর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটার বাপ-মা'র দিকে থেকেও প্রবল আপত্তি উঠল। তাঁদের বিধবা মেয়ে যে খ্রীষ্টান হয়ে একজন বিদেশীকে বিয়ে করবে, তাঁদের সামাজিক চেতনার কাছে সেটা ছিল অসহ্য।

কিছুদিন পর মেয়েটার বাবা ও মা দু'জনেই মারা গেলেন, মাস কয়েকের আগুপিছু।…ভায়েদের সংসারে মেয়েটির লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। ওর দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতে পেরে দ্যো ল্যনী কৌশলে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন পণ্ডিচেরীতে। সেখানে ওঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার কাছে ওকে রেখে এলেন। এই আত্মীয়াটির সাথে ব্যারণের মা'র সদ্ভাব ছিল না।

এ ব্যাপার নিয়ে মহা হৈ চৈ বাধে, দ্যো ল্যনীর নামে মেয়েটির দাদারা ফরাসী সরকারের কাছে নালিশ জানান। ফলে চাকরি ছেড়ে দ্যো ল্যনীকে দেশে ফিরে আসতে হ'ল।

ফিরবার সময় তাড়াতাড়িতে মেয়েটিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলেন না। কিছুদিন পর ওঁর আত্মীয়া, মেয়েটিকে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হলেন, কিন্তু ঝড়ে ওঁদের জাহাজ-ডুবি হয়ে যায় (মেয়েটির পরণে ইউরোপীয় পোষাক ছিল, নামও নিয়েছিল ফরাসী) উৎকণ্ঠিত দ্যো ল্যনীর কাছে আর ওঁদের ফিরে আসা হ'ল না।…

ব্যারণ যখন দেশে ফিরে এলেন, তার আগেই তাঁর মা'র মৃত্যু হয়েছে। বাড়ীতে তার এক পিসী ছিলেন, তিনি ওঁকে খুবই স্নেহ করতেন। ওঁর প্রণয়-কাহিনী তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। যাতে দু'টি বাল্য-প্রণয়মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর মিলন ঘটে সে বিষয়ে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। জাহাজ ডুবির মর্মান্তিক সংবাদটা তিনি কি করে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু এ খবর যাতে ব্যারণের কানে না ওঠে সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। • গল্প শেষ করে বুড়ো লোকটি বলল, 'ম্যঁ্যা লে মাৎর ন্য আ এতে আমে শার্লে্ সে এ্যাসিদাঁ ত্রাজিক (এই দুর্ঘটনার কথা আমার মনিবকে জানতে দেওয়া হয় নি)। আ আত্তাঁ পুর্ দে আনে (বহুদিন ধরে তিনি প্রতীক্ষা করছেন)।'

পিকনিক সেরে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যায়। সারাটা পথ অশোকাকে নিয়ে দীক্ষিত-কাপুর-চতুর্বেদীর দল নানারকম ঠাট্টা-মস্করা করতে থাকে। অশোকার কানে ওদের কথা আদৌ ঢোকে কিনা সন্দেহ! সেই চন্দননগরের ফুলবালার কথাই কেবল ওর মনে জাগছিল।

শ্যামল বাংলার মেয়ের কালো চোখের মায়ায়, বাঁধা পল আল্লাইন উপত্যকার এই ফরাসী তরুণ। দিনের পর দিন নির্জন আধা-অন্ধকার প্রাচীন প্রাসাদে সে নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবন যাপন করছে। ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে আছে তার প্রাচ্যদেশীয়া প্রিয়ার জন্য। কিন্তু সে কোথায়? মৃত্যুর তমসা পেরিয়ে সে কি ওর ব্যগ্র বাহুবন্ধনে ধরা দেবে?…

বাড়ী ফিরে ব্রজদুলালকে অশোকা তার এই অভিনব অভিযানের কাহিনী শোনাল। ব্রজ বিদগ্ধ ব্যক্তি। পড়াশোনা প্রচুর, দেশবিদেশের অনেক খবর রাখে সে। ওর গল্প শুনে বলে, 'তুমি ব্র্যাম স্টোকারের সেই বিখ্যাত ভ্যাম্পায়ারের গল্পটা পড়েছ ত—হাঙ্গেরীয়ান কাউন্ট ড্রাকুলার? কার্পেথিয়ান পাহাড়ের কোলে, অরণ্য-বেষ্টিত জনশূন্য প্রাচীন কাসেলের ভল্টে রক্ষিত শবাধার থেকে উঠে, রক্তপিপাসু কাউন্ট রাতের অন্ধকারে তাঁর পৈশাচিক অভিযান চালাচ্ছেন।

বাধা দিয়ে অশোকা বলে, 'না না, কি যে বল! ব্যারণ দ্যো ল্যনী আদৌ ভয়ানক লোক নন,—হলফ করেই বলতে পারি আমি একথা! ভারী কোমল তাঁর মন। সত্যিকার প্রেমিক লোক, যাঁদের নিয়ে কাব্য বা গাথা রচনা হ'ত সেকালে। বাল্যসখীর চিন্তা তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে রয়েছে।…আর কি সুন্দর ফুলবালা মেয়েটি! নামটা ওর সার্থক। • আসছে শনিবার ছুটি আছে,চল না ব্যারণের ওখান থেকে ঘুরে আসি। কালেকশানগুলো দেখবার মত।

(পাঁচ)

অশোকার পীড়াপীড়িতে ব্রজ শেষটায় তার সঙ্গে না গিয়ে পারল না; সেই হ্রদের ধারে বার্চ ও পাইন গাছের নীচ দিয়ে, পায়ে-চলা পথ ধরে, ওরা দু'জনে চলল। দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তা।

ঐ ত সেই শ্যাওলা-ঢাকা মস্ত বড় পাথরটা, আর ঐ ত তারই পা ঘেঁষে চেষ্টনাট গাছটা শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে যায় ওরা

কিন্তু কোথায় সেই পাঁচিল-ঘেরা আপেল-পীচ-পিয়ার-চেরীর বাগান আর কোথায় সেই বিশাল প্রাচীন কাসেল—শাতো স্যো দ্যো ল্যনী? ‥

সামনে ঢালু উপত্যকায় গোটাকত পার্বত্য ছাগ চরে ফিরছে। একধারে ফুটে আছে ড্যাফোডিলের রাশি। একটু দূরে কয়েকটা আপেল এ্যাপ্রিকট ও পিয়ার গাছ,—তাদেরই

আশেপাশে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রস্তর স্তূপ, ঘাস ও লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন।

অশোকার চোখে বিস্ময় জাগে।

এ যেন ঠিক ভোজবাজী! যেন স্বপ্নে দেখা জিনিষ, চোখ খুলতেই কোথায় মিলিয়ে যায়।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অত বড় বাগানশুদ্ধ বাড়ীটা কোথায় হারিয়ে গেল—ভেবেই পেল না অশোকা।

ব্রজদুলাল হো হো করে হেসে ওঠে।

'কি গো! আজকাল দিন দুপুরেও স্বপ্ন দেখ নাকি? কোথায় তোমার দ্যো ল্যনীর কাসল? এই সেদিন দেখে গেলে এরই মধ্যে পাখীর মত উড়ে পালাল নাকি?'

অশোকা কথা না বলে ঢালু বেয়ে নেমে যায় নীচে, সোজা এ্যাপেল ও এ্যাপ্রিকট গাছ কয়টার কাছে।...আশেপাশে ঘাসে ঢাকা ধূসর ও শ্বেতাভ পাথরের স্তূপগুলি কোন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলেই মনে হয়। দূর থেকে এগুলোকে টিলা বলেই ভ্রম হয়েছিল। এই স্তূপগুলির ওপরে জন্মেছে বন্য লতা, হর্থনের কাঁটা ঝোপ ও মাঝে মাঝে এডেল হ্বাইসের শুভ্র পুষ্পমঞ্জরী।...হঠাৎ ঝোপের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে একটা সমাধি ফলক।

অশোকা হাত ইশারায় ব্রজকে ডাকল।

লতাপাতা সরিয়ে দু'জনে দেখে,—মার্বেল পাথরের ফলকের গায়ের লেখাগুলো জায়গায় জায়গায় অস্পষ্ট অবোধ্য হয়ে উঠেছে। ব্রজ ফ্রেঞ্চটা মোটামুটি রপ্ত করেছে, অতি কষ্টে সেই পড়ল:

BARON PIERRE VALENTINE

De LAUNY

Ne en—1786

Decede en—1820

Il est, decede omme un martyr a cause d'une Jeune fille Bengalie son camarade d'enfance pour laquelle il avait beaucoup sou ffept.১

QUE SON AME REPOSE EN PAIX !২

GLORIE A SON IMMORTEL AMOUR !৩

আশ্চর্য!

এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি অশোকা। কবরটার গা ঘেঁষে নাম-না-জানা ছুটো নীল ফুল মাথা উঁচিয়ে ঝোপের ওপর থেকে উঁকি মারছে।

ও দুটো কি মারগিস?

(১) বাল্য সহচরী একজন বাঙালী তরুণীর প্রেমের জন্য ইনি জীবনপাত করেছেন, অনেক ক্লেশ ভোগ করেছেন।

(২) তাঁর আত্মা শান্তি পাক!

(৩) মৃত্যুহীন প্রেমের জয় হোক!

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

‘নির্বাণ’

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::
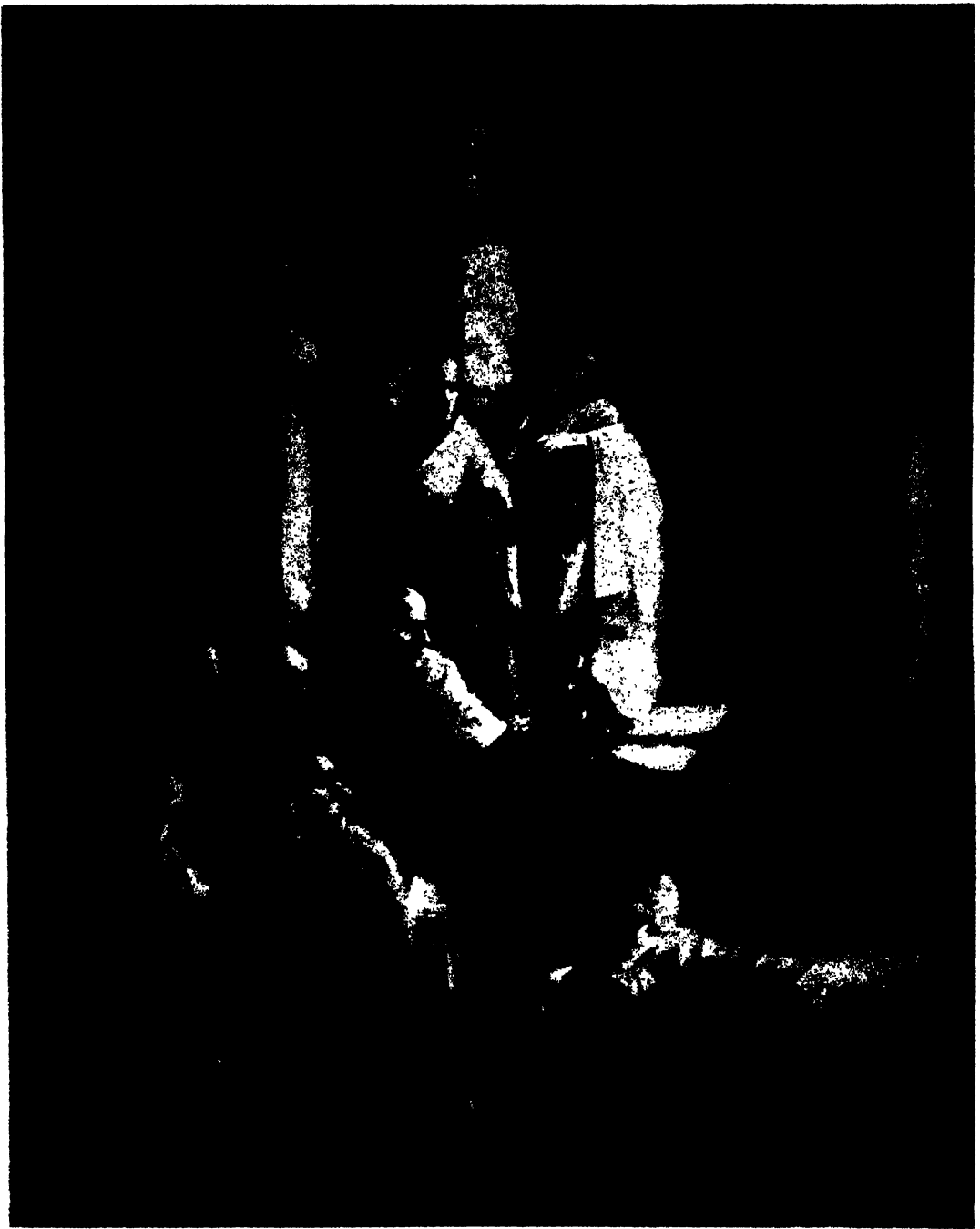
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৬শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড	চৈত্র, ১৩৭৩	ষষ্ঠ সংখ্যা

নির্ব্বাচনের স্বরূপ

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের জনসাধারণ বিগত দুই মাসকাল নির্ব্বাচন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। কোন্ প্রতিনিধিত্ব কাহাকে দেওয়া হইবে ইহাই ছিল চিন্তা, বিচার ও উত্তেজনার বিষয়। কারণ প্রতিনিধিগণই জাতির রাজকার্য্য সাধারণের তরফ হইতে চালাইবেন ও তাঁহাদিগের যোগ্যতা জনপ্রিয়তার উপরেই রাজত্ব চালনার সক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা নির্ভর করিবে। মূলতঃ নির্ব্বাচন পদ্ধতির সৃষ্টিই হইয়াছে সাধারণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সেই আদর্শ হইল জনগণের উপর শাসনকার্য্য চালান হইবে জনগণের দ্বারাই ও জনগণের মঙ্গলের জন্যই। কিন্তু যেহেতু জনগণ অসংখ্য ও অত অধিক সংখ্যক শাসক কখনও সাক্ষাৎভাবে শাসন কার্য্য চালাইতে পারে না, সেই কারণে জনগণ নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা ঐ রাজকার্য্য চালনার ব্যবস্থা করেন। প্রদেশে ৬০০০০। ০০০০ হাজার ব্যক্তি একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় ৪৫০০০০।৫০০০০০ লক্ষ ব্যক্তির একজন প্রতিনিধি হয়েন। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অধিকার পাইতে হইলে প্রত্যেক জন ভোটের অধিকারী ভারতবাসীর নাম সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভোটদাতার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক কারণ তালিকায় নাম না থাকিলে ভোট দিবার অধিকার পাওয়া যায় না।

নির্ব্বাচন বিষয়ের গলদের আরম্ভ হয় ঐ তালিকায়। দেশের বহু পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির নাম ঐ তালিকাতে স্থান লাভ করে নাই। অনেকের নাম ভুল থাকে; অনেকের পিতার বা স্বামীর নাম ভুল থাকে। ভারতের ভোটের অধিকারী জনসাধারণের নামের তালিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত করাইলে দেখা যাইবে যে ভোটের যথার্থ অধিকারীগণের মধ্যে শতকরা ২৫।৩০ জনের নামই তালিকায় নাই। ভারত সরকার প্রকাশিত ভারত বিবরণের পুস্তক অনুসারে (India 1966) ভারতের শতকরা ৪ জন লোক শিশু ও বালক বালিকা। ২২ বৎসর বয়স বা ততোধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা হিসাবে দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৫০ জন। ভারতের জনসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪৩৯০ লক্ষ। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইল বৎসরে ৮০ লক্ষ। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহা হইলে ভারতের জনসংখ্যা হইয়াছে ৪৮ কোটি ৭০ লক্ষ। ইহার অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকের ভোটের অধিকার থাকিলে ২৪ কোটি ৩৫ লক্ষ লোকের ভোটের তালিকায় নাম থাকা উচিত। কিন্তু বস্তুত ছিল ২০ কোটিরও অল্প সংখ্যক লোকের! তাহার মধ্যে মৃত ব্যক্তির নাম, ভুল করিয়া

লিখিত নাম ও ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাওয়া ব্যক্তির নাম ছিল ২।৩ কোটি। অর্থাৎ মাত্র ১৭।১৮ কোটি ব্যক্তির নাম যথাযথভাবে তালিকায় লিখিত ছিল এবং ৬।৭ কোটি ব্যক্তির নাম ছিল না বা অব্যবহার্য্যভাবে লিখিত ছিল। এই গলদটি আকারে বিরাট এবং কার্য্যত সাধারণতন্ত্রের আদর্শনাশক। এইরূপ গলদবহুল ভোটার তালিকা অনুসারে যে নির্ব্বাচন কার্য্য সাধিত হয় তাহা আইনত ও ন্যায়ত গ্রাহ্য কি না তাহা আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচার করিতে পারেন। আমাদিগের মতে কোন ভোটার তালিকাতে যদি শতকরা ৫ জনের অধিক ব্যক্তির নাম বাদ পড়ে বা ভুলভাবে লিখিত হয় তাহা হইলে সেই তালিকা নির্ব্বাচন কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নহে।

তালিকার পরে হইল রাষ্ট্রীয় দলগুলির কর্ম্মীদিগের মধ্যে অনেকের ভোট সংগ্রহ পদ্ধতি। সাধারণভাবে বলা চলে যে ভারতে ভোট সংগ্রহ কার্য্য যে ভাবে করা হয় তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সুনীতি বিরুদ্ধ। এক ব্যক্তি কয়েকজনের নামে ভোট দিয়া আসিবার কথা প্রায়ই শোনা যায়। রাসায়নিক উপায়ে ভোট দিবার পরে যে আঙ্গুলে রংএর ছোপ দেওয়া হয় তাহা উঠাইয়া দিয়া এই দুষ্কর্ম করা হয়। মৃত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তি ভুল নামের ব্যক্তি প্রভৃতি অনেকের ভোটই কেহ না কেহ অন্যায়ভাবে দিয়া চলিয়া যায় অনেক স্থলেই। ইহা ব্যতীত কাল্পনিক ব্যক্তির নাম সৃজন করিয়া পূর্ব্ব হইতে ভোটার তালিকায় ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে ঝুটা ভোটও দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল মিথ্যা উপায়ে দত্ত ভোট সংখ্যা কোন কোন স্থলে শতকরা ২০।২৫টি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সারা ভারতে কয়েক কোটি ঝুটো ভোট প্রদত্ত হইতে পারে এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক হইবে না বলিয়াই মনে হয়। এই সকল দুষ্কার্য্য সাধারণতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিনাশক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার প্রতিকার করা অত্যন্তই কঠিন এবং জাতির চরিত্রবল বৃদ্ধি না হইলে প্রতিকারও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অপরাপর অন্যায় ও অবৈধ উপায় অনুসরণ করিয়া যে ভাবে ভোট আহরণ করা হয়, তাহার কিছু কিছু বিবরণ দিলে পাঠকের মনে নির্ব্বাচনের স্বরূপ বোধ আরও প্রকট হইয়া উঠিবে। নির্ব্বাচন সময় আগত হইলেই প্রার্থীগণ নিজেদের রাষ্ট্রীয় দলের সাহায্যে অথবা ব্যক্তিগতভাবে ভোট সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়েন। নিজ নিজ দলের গুণ-গান ও বিরুদ্ধ দলের সমালোচনা সকলেই করিয়া থাকেন ও সত্য ও সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দোষাবহ হয় না। মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার সর্ব্বদাই নিন্দনীয় এবং বহু স্থলে তাহা হইয়া থাকে। আর একটি উপায় হইল বিরুদ্ধপক্ষের প্রার্থীদিগের নিকট বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে শিখান স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ ও ভোটের সময় এই সকল লোকের সাহায্যে বিরুদ্ধ-দলের প্রার্থীদিগকে প্রতারণা করিয়া তাহাদিগের ভোট ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করা। অনেকক্ষেত্রে এই সকল বিশ্বাসঘাতক প্রতারকগণ শেষের দিকে ভোটারদিগকে যাইয়া বলিয়া আসেন "অমুক নির্ব্বাচনে আর দাঁড়াইতে চাহেন না, আপনাদের অনুরোধ করিয়াছেন অমুককে ভোটটা দিয়া দিবেন।" এই জাতীয় মিথ্যা ও প্রতারণা কতটা ঘৃণ্য তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অপর প্রার্থীর গাড়ি চাহিয়া পাঠাইয়া নিজেদের ভোট আদায় কার্য্যে ব্যবহার করাও অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত অবৈধ ও অন্যায় উদাহরণগুলি ব্যতীত আরও দুই চারিপ্রকার দুর্নীতিপূর্ণ উপায় আশ্রয় করার উদাহরণও ভোটের বাজারে দেখা যায়। গরীব ভোটদাতাগণকে টাকা দিয়া ভোট ক্রয় ইহার একটি উপায়। অনুন্নত জাতির মধ্যে মদ্যপান ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আর একটি। যে সকল ব্যক্তি সহজে ভয় পান তাঁহাদিগকে ভয় দেখান ও যাঁহারা নির্ব্বোধ তাঁহাদিগকে নানা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিয়া ভোট গ্রহণ কার্য্য সিদ্ধি করাও অজানা নহে। যথা কূপ খনন বা জলের কল অথবা স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি সচরাচর দেওয়া হইয়া থাকে। যে সকল প্রার্থী পূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া আছেন ও সরকারী দফতরে যাঁহাদিগের যাতায়াত আছে তাঁহারা বহু ক্ষেত্রে কালোবাজারে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অথবা বাস লাইন বা অপর কিছুর পারমিট লাইসেন্স করাইয়া দিয়া নিজেদের বিভিন্ন কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতে সক্ষম হয়েন। এই সকল বিষয়ের ভিতরের সত্য দেখিতে পারিলে সহজেই বুঝা যায় যে নির্ব্বাচন কার্য্যে বহু পাপ

লুকাইয়া থাকে ও জাতীয় চরিত্রের দিক দিয়া নির্ব্বাচন ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্র নহে। নির্ব্বাচনকে সুনীতি সঙ্গত করা বড়ই কঠিন মনে হয়। অবশ্য কোন চেষ্টাও কেহ করেন না এই ক্ষেত্রে সদাচার প্রতিষ্ঠার জন্য।

অন্যায় ও অসত্যের পথ দিয়া চলিয়া উচ্চ আদর্শ সিদ্ধি হইতে পারে কি না, এ কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অধর্ম মজ্জাগত হইয়া যাইলে সেই দেহে ধর্ম প্রতিষ্ঠা কঠিন, এমন কি অসম্ভব হইয়া যাইতে পারে। সাধারণতন্ত্রের মূল বস্তু হইল ন্যায়; অর্থাৎ মানব-সমাজে মানুষের শাসন পদ্ধতি তাহার নিজ স্বাধীনতা ও নিজ অধিকারের উপর ন্যস্ত করা। এই কার্য্যে গোড়াতেই যদি সেই অধিকার খর্ব্ব করা হয় একটা ব্যাপক অন্যায় ও মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কখনও মানবের পক্ষে শুভ হইতে পারে না! এই জন্য মনে হয় যে রাজ্য শাসন অধিকার হস্তগত করিয়া যখন এই দল বা ঐ দল সকল অন্যায়, অবিচার ও অধর্ম দমন করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদিগের পক্ষে গোড়ার অন্যায় ও মিথ্যার কথাটা ভুলিয়া যাইলে চলিবে না। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে যে দল বা ব্যক্তি যতগুলি মিথ্যা ভোট সংগ্রহ করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকুন না কেন; ভবিষ্যতে তাঁহারা যেন এইরূপ ব্যবস্থা করেন যাহাতে সমাজের লোকের নির্ব্বাচনের উপর একটা ঘৃণার সৃষ্টি না হয়। প্রথমত ভোট দিবার অধিকারের তালিকা পূর্ণ ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত কোন ব্যক্তি যাহাতে একের অধিক ভোট না দিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির যদি উপযুক্ত চিত্র সম্বলিত পরিচয়পত্র থাকে (card of identity) তাহা হইলে এক লোক ভিন্ন, ভিন্ন নামের ভোট দিবার সুবিধা পাইতে সক্ষম হইবেন না। এইরূপ পরিচয়পত্র এখন হইতে সকল ভারত বাসীর জন্য করাইলে তাহা দ্বারা অপরাধ দমন কার্য্যও সুসাধিত হইতে পারিবে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হইল অন্যায় ও মিথ্যার আশ্রয়ে ভোট সংগ্রহের বিরুদ্ধে প্রচার প্রয়োজন। জননেতাগণ এই বিষয়ে কি মত পোষণ করেন তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আমরা এখন অবধি কোন নেতাকে এই বিষয়ে কিছু বলিতে শুনি নাই। তাঁহারা নিজ নিজ মত প্রকাশ করিলে সাধারণের মঙ্গল হইবে।

স্বাবলম্বন বা পার্টি নির্ভরশীলতা

আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে রাজ্য শাসনক্ষেত্রে সাধারণতন্ত্রের প্রকৃত আদর্শ হইল সাধারণের স্বাবলম্বনপ্রসূত শাসন পদ্ধতির সৃষ্টি। শাসন অধিকারে পার্টি বা রাষ্ট্রীয় দলের এক প্রকার মধ্যসত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া সাধারণের নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় দলের হস্তে তুলিয়া দেওয়ার কোনই সার্থকতা থাকে না যদি না সেই দলগুলি সম্পূর্ণরূপে দলপতি ও সভ্যদিগের সুবিধাবাদ বর্জ্জিতভাবে গঠিত ও চালিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে যেখানে যত দলই গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে সবগুলিই এরূপ সভ্য ও নেতাসম্বলিত যে অধিকদিন কোন দলই স্বার্থপর মতলব বর্জ্জিত ভাবে চলিতে পারে না। ফলে দেখা যায় দলের নেতাদিগের বাছাই করা নির্ব্বাচন প্রার্থীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই জাতীয় ব্যক্তি নহেন যাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলে দেশের উন্নতি হইতে পারে ও সাধারণের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অর্থাৎ দলগুলির হস্তে নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া জনসাধারণের কোন লাভ ত হয় না, বরঞ্চ সর্ব্বৈব ক্ষতিই হয়। এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিবে যে রাষ্ট্রীয়দল বাদ দিয়া সাধারণতন্ত্র চলিতে পারে কি না। যদি না পারে তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় দলগুলির শাসন ক্ষমতা অপব্যবহার কি করিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে রাষ্ট্রীয়দলগুলি যখন সাধারণের দরবারে উপস্থিত হইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভিক্ষা করেন, তখন সাধারণ দলগুলির কার্য্যকলাপ ও প্রাপ্ত ক্ষমতার ব্যবহার বিষয়ে নিয়ম কানুন প্রণয়ন করিবার অধিকার দাবী করিতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় দল মাত্রই নিজ কার্য্যে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে এইরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে ও নিয়মগুলিকে আইনের মতই বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। এই সকল নিয়ম কি হইবে তাহার পূর্ণ বর্ণনা এই স্থলে সম্ভব নহে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে যদি কোন দল সাধারণকে দলের সভ্যতার অধিকার না দিবার জন্য এবং দলের নেতৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার জন্য নানা প্রকার কূটবুদ্ধি জাত ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে, সেই দলকে

বেআইনি ধার্য্য করার নিয়ম করা যাইতে পারে। নির্ব্বাচন হইয়া যাইবার পরে রাষ্ট্রীয় দলগুলির সাক্ষাৎ বা বা পরোক্ষভাবে রাজ্য শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার সীমা নির্ণয় করিবার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ কোন দলের প্রার্থীগণ যদি নির্ব্বাচনে অধিক সংখ্যায় সক্ষম হইয়া শাসন কার্য্য হস্তগত করিতে পারেন তাহা হইলে সেই দলের সকল সভ্যেরই দেশের উপর আর্থিক শোষণ অধিকার জন্মায় এইরূপ ধারণা শুধু ভারতীয় সাধারণতন্ত্রেই দেখা যায়। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রীয় দলের সভ্যদিগের শাসন কার্য্যের সহিত কোন সাক্ষাৎ সংযোগ লক্ষিত হয় না। তাহার কারণ অন্য দেশে রাষ্ট্রীয় দলগুলি দেশ শাসনের দ্বারা কোন আর্থিক লাভ করিবার চেষ্টা করেন না। এদেশে ঐ ভাবে আর্থিক লাভ চেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় দলগুলির রাষ্ট্রীয় অধিকার নির্ণয়ন ও সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা এদেশে অত্যাবশ্যক।

ভারতের রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে সুনীতির পথে চলিতে শিখান সাধারণেরই কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া যদি জনসাধারণ দলগুলির সহিত মিলিতভাবে অন্যায়কার্য্য করিতে থাকেন তাহা হইলে এই দেশের রাষ্ট্রে সুনীতির প্রতিষ্ঠা হওয়া বিশেষ কঠিন হইবে মনে হয়। যে সকল রাষ্ট্রীয় দল ইতিপূর্ব্বে রাজত্ব করিবার সুবিধা লাভ করেন নাই সেই সকল দলগুলি এখন শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রায়ই বলিতেছেন যে দুর্নীতি নিবারণ করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ইহা যদি তাঁহাদিগের সত্যকার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় দলগুলির গঠন, পরিচালনা, রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার ও কর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্দেশ প্রভৃতি লইয়া এখন হইতে নিয়ম প্রণয়ন চেষ্টা করিলে দেশের উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার জন্য যদি নূতন করিয়া রাষ্ট্রীয় দল গঠন প্রয়োজন হয় ত তাহার ব্যবস্থাও করা উচিত হইবে। নতুবা এখন যেরূপ রাষ্ট্রীয় দলগুলির জনমঙ্গল বিরুদ্ধ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ভবিষ্যতেও সেই অবস্থাই থাকিয়া যাইবে।

কংগ্রেসী দলের দায়ীত্ব

কংগ্রেস যখন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল তখন সহস্র সহস্র অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তি কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়া নিজেদের স্বার্থ বলি দিয়া দেশের জন্য সকল দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ত্যাগ ও সংযমের উপরেই কংগ্রেস গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরে যখন কংগ্রেস রাজ্য শাসনভার প্রাপ্ত হইল, তখন ঐ সকল লোকের সহিত অসংখ্য বাহিরের স্বার্থান্বেষী লোক আসিয়া যুক্ত হইল ও ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতার বিষ রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ইহার সহিত আরও ভয়াবহ একটি শক্তি আসিয়া ভারতের সর্ব্বনাশের কার্য্যে যোগ দিল। ইহা হইল বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতা যে ভাবেই দেখা দিল তাহাতে ভারতের লাভ অপেক্ষা লোকসান অধিক হইল। কোন দেশ ভারতকে ঋণ গ্রহণ করিতে শিখাইল। অপর কোন দেশ উচ্চমূল্যে যন্ত্র সরবরাহ করিল। কেহ নিজ দেশ হইতে যন্ত্রবিদ পাঠাইল ভারতকে কারখানা চালাইতে শিখাইবার জন্য—অতি উচ্চ বেতনে; কিন্তু ভারতের সে শিক্ষা লাভ কিছুতেই যথাযথভাবে হইল না। কোন কোন দেশ সোজাসুজিভাবে ভারতের শত্রুতা করিল। এক কথায় অপর দেশের সহিত সখ্য বা শত্রুতা কোন কিছুতেই ভারতের সুবিধা হইল না। বৃটিশ যুগের ভিতরেই এবং স্বাধীনতা লাভের পরেও আরও অনেক রাষ্ট্রনৈতিক দল ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল দলের নেতা ও সভ্যগণ কংগ্রেসের নেতা ও সভ্যদিগের তুলনায় ভিন্ন জাতীয় লোক ছিলেন না। সেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও বিশ্বজাতি সভায় ভারতের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই ঐ সকল অকংগ্রেসী দলগুলিও গড়িয়া উঠিয়াছিল। দোষে গুণে এই দলগুলিও কংগ্রেসের সহিত তুলনায় জাতিগত ভাবে বিভিন্ন নহে। নানান প্রকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া জল্পনা কল্পনা ও ভারতবাসীকে জীবনপথে নানান মন্ত্র মানিয়া চলিতে শিক্ষা দেওয়া সকল দলের নেতাদিগের মধ্যেই দেখা যায়। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে যে প্রবল কংগ্রেস বিরুদ্ধ সমালোচনার বন্যা বহিয়াছিল তাহার ভিতর কংগ্রেসের আদর্শ লইয়া তত কথা উঠে নাই যত উঠিয়াছিল কংগ্রেসের নেতাদিগের চরিত্র ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যে অবহেলা ও দুর্নীতি লইয়া। এই কারণে এখন যে সকল অকংগ্রেসী দল একত্র হইয়া বাংলা ও অন্য আরও পাঁচটি প্রদেশে শাসন কার্য্য চালাইতে আরম্ভ

করিয়াছেন তাঁহাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে দেশের জনসাধারণ তাঁহাদিগের নিকট নূতন নীতিবাদ শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে গদীতে বসাইয়াছেন একথা সত্য নহে। রুশ চীন বা আমেরিকার সহিত ভারতের সম্বন্ধ কি হইবে অথবা মার্কসবাদ কিম্বা হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যান লইয়া দেশবাসীর মাথা ঘামাইবার বিশেষ আগ্রহ নাই। দেশবাসী নূতন পথে রাজ্যশাসন কার্য্য চালাইতে চাহেন অপর অপর রাষ্ট্রীয় দলগুলির উপর কার্য্যভার দিয়া, ইহার উদ্দেশ্য শাসন কার্য্যে শৃঙ্খলা ও সুনীতি আনয়ন করা। ইহা ব্যতীত খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, উপার্জ্জনের উপায় সৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ের উপযুক্ত মীমাংসা ও ব্যবস্থা করিতে না পারার জন্যই দেশে কংগ্রেস বিরুদ্ধতা জাগ্রত হইয়াছিল। এখন অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলগুলির প্রধান দায়ীত্ব হ'ল ঐ সকল কার্য্য সক্ষমতার সহিত সুসম্পন্ন করা। নূতন জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া তাঁহাদিগের অথবা দেশবাসীর কোন বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আদর্শবাদ ও রাষ্ট্রীয় দলের নেতৃত্ব

রাষ্ট্রীয় দলগুলি আরম্ভে আদর্শবাদ অবলম্বন করিয়া উঠে। যথা কংগ্রেস আরম্ভে অহিংসা নীতি, খদ্দর ও চরখা, বিলাসিতা বর্জ্জন প্রভৃতি বহু উচ্চ আদর্শ লইয়া জোরাল হইয়া উঠিয়াছিল; পরে কংগ্রেস শাসন পদ্ধতিতে অহিংসা কোন বিশেষ স্থান লাভ করে নাই। কারখানা বাদ ও আধুনিক আর্থিক পরিকল্পনা কুটীর-শিল্পকে রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে এবং দূরদূরান্তরের গ্রামে পাঠাইয়া দিয়া ভারতকে কারখানাবহুল অত্যাধুনিক রূপ দান করিবার ব্যবস্থা করে। কংগ্রেস এই আদর্শেই চলিতে থাকেন। ভারতের প্রাচীন গৌরবের কথা ভুলিয়া গিয়া সস্তার পাশ্চাত্য ঢং এর চালচলন ভারতের বৃহৎ বৃহৎ সহরে প্রবল হইয়া উঠিল। ককটেল পার্টি, নরনারীর মিলিত সামাজিক নৃত্য, রিসেপসন, ক্লাব গমন প্রভৃতি কংগ্রেসী জীবন যাত্রার অঙ্গ হইয়া উঠিল। বিলাসিতার চুড়ান্ত হইল। ৫০০০০।১০০০০০ টাকা দিয়া বিদেশী মোটর গাড়ী ক্রয় করা হইতে লাগিল। সেইরূপ গাড়ীতে কংগ্রেসী নেতাগণ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এয়ার কণ্ডিশন ঘরে ঘরে চলিতে আরম্ভ করিল এবং রেলের এ.সি. ক্লাশ নেতাদিগের একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি কংগ্রেসের নেতাদিগের বাগান বাড়ীও ঠাণ্ডা কলের সাহায্যে কাশ্মীরের আবহাওয়া প্রাপ্ত হইতে লাগিল! এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেসী আদর্শ স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ভি. আই. পি. দিগের অন্তরের মোহাচ্ছন্ন আগ্রহে রঙীন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল এবং গরীব দেশবাসীর সুখ দুঃখের কথা নেতাদিগের অন্তরের প্রাণের স্পর্শ হারাইয়া নথিগত অসহায় ভাবে ফাইলে ফাইলে উপেক্ষিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। নেতৃত্ব এখন যাহারা পাইলেন তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মোন্নতি চেষ্টাই করিতে লাগিলেন, দেশবাসীর উন্নতির কথা রাজকার্য্যের ধীর মন্থর গতিতে চলিয়া ক্রমশঃ অচল হইয়া উঠিল। অপরাপর দলের যাহারা নেতা রহিলেন তাঁহারাও বিক্ষুব্ধ জনতাকে স্তোকবাক্য শুনাইয়া বিশ্বের বহু মহাপুরুষের প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করিতে থাকিলেন। কার্য্যত তাঁহারা বিশেষ কিছু করিবার চেষ্টা করিলেন না। এই ভাবে ১৯৪৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত ১৯৬৭ তে পৌঁছাইল এবং সেই বৎসরের নির্ব্বাচনে ভারতের নানা স্থলে কংগ্রেসী নেতৃত্ব কিছু কিছু আহত হইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল।

এখন দেখিতে হইবে ভারতবাসী এই অর্দ্ধনূতন পরিস্থিতিতে কি আশা করিতে পারে। নেতৃত্বের আসরে এখন নূতন যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদিগের আদর্শ কি তাহা আমরা কিছু কিছু শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তি কতটা এবং তাঁহারা জনসাধারণের দৈনিক জীবনযাত্রা কতটা সুগম করিয়া তুলিতে পারিবেন, এই সকল কথার আলোচনাই সাধারণের নিকট একান্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্য সমস্যা অথবা অপর কোন সমস্যার সমাধান বিচার লইয়া যদি দিন কাটিয়া যায় এবং বিশ্বের সকল মহাপুরুষের সেই সংক্রান্ত মতবাদ যদি চুল চিরিয়া বক্তৃতামঞ্চে, বেতারে বা সংবাদপত্রে দেখান হয়, তাহাতে, সাধারণ ভাষায় হাঁড়ি চড়িবে কি? শিক্ষার উচ্চ আদর্শ বিচার করিলে পাঠশালার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিবে কি? মালিক-শ্রমিক সম্বন্ধ বিচার করিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে কি? কোন সমাজ বা রাষ্ট্র সংস্কারক মহাপুরুষের মতবাদ ঘাঁটিয়া জনমতের জল ঘোলা করিলে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক কোন অভাবই কি

করার উদাহরণ এইরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না। মাও চীন দেশের কোন কোন দলের বা গণ্ডির সহিত কি কি ভাবে নূতন সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়া নিজ রাজত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার পূর্ণ সংবাদ আমরা এখনও জানি না। জানিলে বুঝা যাইবে যে মাওৎসেতুঙ্গ সত্য সত্যই নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না।

রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্য

রাজ্য শাসনকার্য্য কি তাহা লইয়া গভীর মতভেদ অসম্ভব নহে। কারণ রাজ্যশাসনের মূল উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি ও ব্যক্তি এবং সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা এবং সেই সম্বন্ধ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা। এই সকল নিয়ম কি হইবে তাহা সাধারণতন্ত্রে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্থির করেন; কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি গণ্ডিও মতবাদের উপর তাহা নির্ভর করে না। অর্থাৎ এক ছত্র রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছাই নিয়ম হইয়া থাকে। অপরাপর ধরণের এক বা অল্প লোকের প্রভুত্বও কোন কোন দেশে দেখা যায়। কিন্তু সাধারণতন্ত্র সর্ব্বসাধারণের প্রভুত্বের উপর নির্ভর করে এবং অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি কর্তৃক নিয়ম প্রবর্ত্তন না করিয়া কোন নিয়ম কাহারও ইচ্ছায় প্রচলিত হইতে পারে না। এই কথাটা অনেক সময় রাজ্য শাসকগণ মনে রাখেন না। দেশের নিয়ম কানুন কি তাহা ভুলিয়া শাসনভার প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারাসক্ত হইয়া পড়েন। স্বেচ্ছাচার কখনও শাসনক্ষেত্রে ন্যায় বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাহার প্রেরণা যদিও ধর্ম্ম বা দর্শনের বিচারে উচিত প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলেও যতক্ষণ তাহা সাধারণতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মের দ্বারা সমর্থিত না হয় ততক্ষণ তাহা রীতি বা নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়াই ধার্য্য হইতে থাকিবে। সুতরাং নূতন পদ্ধতিতে কোন কার্য করিবার ইচ্ছা হইলে শাসকগোষ্ঠী সর্ব্ব প্রথমে তাহা নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ন্যায়সাপেক্ষ করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথা নূতন পদ্ধতি স্বৈরাচার দোষ-দুষ্ট হইয়া দেখা যাইবে ও সাধারণতন্ত্রের সুরক্ষিত মূলমন্ত্র থাকিবে না। বাংলা দেশে যে নূতন শাসকগণ রাজকার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজের ইচ্ছা বা অন্তরের আদর্শকে সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিতেছেন। যদি কোন মন্ত্রী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়েন তিনি যেমন সাধারণের ভোজনা-লয়ে গিয়া কুক্কুট হনন নিবারণ করাইতে পারেন না; সেই রূপ অপর কোন মন্ত্রী অপর কোন ক্ষেত্রে নিজ মতবাদকে আইনের ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিতে যাইলে তাহাও অন্যায় ও বেআইনী হইবে।

খাদ্য সমস্যা

বাংলার নূতন রাজ্যশাসকদিগের মধ্যে মতবাদের ঐক্য নাই। বাংলা কংগ্রেস মতবাদে কংগ্রেসী কিন্তু নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী। কম্যুনিষ্ট (উভয় শাখা) মত বাদে কম্যুনিষ্ট। ইহার অর্থ কি তাহা বলা কঠিন; কারণ কম্যুনিজম নানা ক্ষেত্রে নানা রূপ ধারণ করিয়া কার্য্য সিদ্ধি চেষ্টাকে আদর্শ বিরুদ্ধতা মনে করে না। কম্যুনিষ্ট অর্থে আমরা কি বুঝিব তাহা সঠিক জানা না যাইলেও একথা স্বীকার করা যায় যে কম্যুনিষ্ট অর্থে অধিক সংখ্যক লোকের ইচ্ছায় রাজ্যশাসনে বিশ্বাসী লোকেদের বুঝায় না। কোন না কোন প্রকারে সংখ্যালঘুদিগের প্রভুত্ব সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত করাই কম্যুনিষ্টদিগের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এই কারণে সাধারণতন্ত্র ও কম্যুনিজম পরস্পর বিরোধী। বাংলার নূতন রাজ্যশাসন পদ্ধতি বিভিন্ন মতের লোকের মিলিত চেষ্টায় চলিবে। বিভিন্নমত অনেক সময় এতই বিভিন্ন হইবে যে শাসন কার্য্য তাহাতে অচল হইয়া যাইতে পারে। যাইবে কি না তাহা মন্ত্রীদিগের আত্মসংযম ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে। শাসন কার্য্যে বর্ত্তমানে প্রবলতম সমস্যা হইল খাদ্য সমস্যা। ইহার সমাধান নির্ভর করিবে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সংগ্রহের উপর। উৎপাদন কি ভাবে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ান যাইতে পারে সে বিষয়ে আমরা এখনও কিছু শুনি নাই। খাদ্য সংগ্রহ বৃদ্ধি চেষ্টা চলিতেছে। ফল কি হইবে তাহাও জানা যায় নাই। সুতরাং নূতন শাসকদিগের এই ক্ষেত্রে পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলা যাইতে পারে। যদিও শুনা যায় নূতন মন্ত্রীগণ জনমতের উপর বিশেষ আস্থাবান তাহা হইলেও তাঁহারা জনমত বলিতে জনতার মত মনে করেন বোধ হয়; কারণ তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়া দেশের সকল লোকের মত শুনিবার কোন চেষ্টা এখনও করেন নাই। পরে করিবেন কি না তাহা আমরা জানি না।

বহুমুখী সঙ্গীত প্রতিভা

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান কদাচিৎ পাওয়া যায়। বেশীর ভাগই দেখা যায়, কণ্ঠসঙ্গীতের এক একটি রীতিতে কিংবা একটিমাত্র যন্ত্রে শিল্পী আজীবন সাধনা করে থাকেন। তার প্রধান কারণ, ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি ও রাগবিস্তার অতল গভীরতা এবং অবাধ বিস্তার। যেমন অসংখ্য রাগ, তেমনি বিভিন্ন রাগের রূপায়ণে সুর-বিহারের লীলা। স্বরের বন্ধনের মধ্যেও মুক্তির এমন পরম আস্বাদ রাগ প্রকরণের মধ্যে সঙ্গীত সাধক লাভ করেন যে, বহুমুখীনতার তাঁর প্রয়োজন হয় না।

এক একটি মাধ্যম অবলম্বন করেই তাঁদের সঙ্গীত-সাধনা চরিতার্থতা লাভ করে। তাঁদের সঙ্গীত প্রতিভা বহুমুখী হবার, অর্থাৎ বহু শৈলীতে অভ্যস্ত হবার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা এক একটি পদ্ধতিতে কিংবা যন্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে সেই একের মধ্যেই বহুকে অনুভব করেন। যাঁর চর্চা কণ্ঠসঙ্গীতে, তিনি সাধারণত নির্বাচন করেন একটি অঙ্গ : ধ্রুপদ, খেয়াল, ধামার, টপ্পা কিংবা ঠুংরি। কেউ হয়ত দু'টি দু'টি নির্বাচন ক'রে নেন : ধ্রুপদ ও ধামার, খেয়াল ও ঠুংরি কিংবা ধামার ও তেলেনা, ইত্যাদি। সেই অঙ্গে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন এবং সিদ্ধিলাভ করেন। তার চেয়ে অধিক অঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করলে গুণী-সমাজে লঘুচিত্ততার পরিচায়ক মনে করা হয়। তার আরো একটি কারণও, প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক অঙ্গের রীতিনীতিতে কণ্ঠের এক একটি বিশিষ্ট কারুকৃতি শোভা পায়। একই কণ্ঠের আধারে বহু রীতির চর্চা হ'তে থাকলে সেই সব স্বতন্ত্র কারুকর্ম গায়ক সম্যক অর্জন করতে পারেন না। তাঁর কণ্ঠ থেকে যায় সাধারণ পর্যায়ে।

যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কেও একই কথা। বীণা, সরদ, সেতার, বেহালা, বাঁশী কিংবা সারঙ্গ। এর একটির মাধ্যমেই সঙ্গীতশিল্পী সাধনায় অগ্রসর হন। বহু যন্ত্রে চর্চার প্রয়োজন হয় না, শুধু নয়, সিদ্ধিও সুদূর পরাহত হয়ে থাকে। তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। প্রত্যেক সঙ্গীতযন্ত্রের যান্ত্রিক নিয়ম-কানুন ও ব্যবহারিক প্রয়োগে গুরুতর বৈশিষ্ট্য আছে, অঙ্গুলি চালনায় নির্দিষ্ট রীতিনীতি আছে এবং তা সুনিপুণ-ভাবে আয়ত্ত করা সাধনা-সাপেক্ষ। এবং বিভিন্ন যন্ত্রের পৃথক প্রক্রিয়া সত্ত্বেও বাদনের বিষয় অর্থাৎ রাগের রূপ অভিন্ন, একথা বলা বাহুল্য। যন্ত্রশিল্পী সেজন্যে একাধিক যন্ত্র অবলম্বন করেন না, এক একটির যন্ত্রের সীমিত ভিত্তিতেই তিনি সীমাহীন সুরলোকের রহস্য সন্ধানে আত্মনিমগ্ন হন। প্রসঙ্গত বলা চলে, শুধু একটি অঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত কিংবা একটি যন্ত্রে চর্চা নয়। কোন কোন গুণী আবার কয়েকটি মাত্র রাগের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, দেখা যায়। বহু রাগের সঙ্গে পরিচয় সাধন হলেও সিদ্ধ হন তিনি গুটিকয়েক রাগে। সেই ক'টি রাগের রূপায়ণে তিনি অন্তহীন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের আস্বাদন লাভ করেন। রাগ-সঙ্গীত সাধকের তাই একটি অন্তরের কথা হল – এক করে ত সব করে, সব করে ত সব যায়। একথা রাগ সাধনার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রেও। বহুর সাধনায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও লঘু হয়ে যায়।

কিন্তু সব নিয়মের মতন এরও ব্যতিক্রম আছে। তাই বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় ভারতীয় সঙ্গীত জগতেও অজানা নয়। এ প্রসঙ্গে বাংলা দেশের বাইরে যাঁদের নাম স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত প্রসন্ন-মনোহর বংশে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ। এই বংশের একাধিক গুণী একাধারে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রে এবং বিভিন্ন রীতির কণ্ঠ-সঙ্গীতে সাধনা করে পারদর্শী হয়েছিলেন। বিশেষ এই বংশীয় আধুনিকতম প্রতিভা লছমীপ্রসাদ মিশ্র। তিনি সুদীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থান করে ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল ইত্যাদি অঙ্গের গানে এবং বীণা, সেতার, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রে গুণপনার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

বাংলায় সঙ্গীত জীবনে বিধৃত আছে অন্তত দু'জন

all rounder সঙ্গীত প্রতিভার নাম। প্রথম ব্যক্তি হলেন বিগত শতকের লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী—ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি গায়ক এবং বীণা, সেতার, এসরাজ, পাখোয়াজ ও তবলা বাদক। অন্যজন হলেন, লক্ষ্মীনারায়ণের পরবর্তীকালের সঙ্গীতগুণী মোহিনীমোহন মিশ্র। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা বিংশ শতকের প্রথম যুগ থেকে বহু ধারায় বিকশিত হ'তে আরম্ভ করে।

বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে বহুমুখী সাধনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন মোহিনীমোহন মিশ্র। তাঁকে সর্বতোমুখী সঙ্গীত প্রতিভা বলেও অভিহিত করা যায়, যে কথা অন্য কোন সঙ্গীতজ্ঞ সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে কি না জানি না। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি বিভাগেই তিনি দক্ষতার সঙ্গে চর্চা করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ জীবনে। তাঁর সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় যাঁদের সবিশেষ জানা নেই, তাঁদের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হ'তে পারে। কারণ, শুধু গত শতাব্দে নয়, বর্তমান শতকেও স্বদেশের বহু সঙ্গীত সাধকদের কথাই সাধারণ্যে উপযুক্তভাবে কীর্তিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত একটি উপেক্ষিত বিভাগ।

মোহিনীমোহনের সঙ্গীতকৃতির মুখ্য পরিচয় এই যে, তিনি ধ্রুপদ, ধামার, ভজন, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল এবং কীর্তনও গাইবার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি অতিশয় সুকণ্ঠ। তেমনি যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চায় তিনি প্রায় কোন যন্ত্রেই সার্থকভাবে হাত দিতে বাকি রাখেন নি। সুরের যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি সঙ্গতযন্ত্রে পর্যন্ত। সুরের যন্ত্রের মধ্যে তিনি বীণ, সুরবাহার ও সুরশৃঙ্গার বাজাতেন বেশি। সঙ্গত-যন্ত্রের মধ্যে পাখোয়াজ ও তবলায় তাঁর হাত রীতিমত তৈরি ছিল এবং অনেক বড় বড় আসরে, সম্মেলনে তিনি এই দুই যন্ত্রে সঙ্গত করেছেন। অন্যান্য সুর যন্ত্র প্রায় সবই বাজিয়েছেন তিনি—সেতার, এসরাজ, সরদ, সারঙ্গ, দিলরুবা, কাবুলি রবাব, রবাব ইত্যাদি। ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট বেণু প্রভৃতি সব রকমের বাঁশী তিনি প্রথম জীবনে বাজাতেন। তা ছাড়া, কয়েকটি মিশ্র যন্ত্র তিনি বাজাতে অভ্যস্ত ছিলেন যে সব যন্ত্র বিশেষভাবে ফরমায়েস ক'রে যন্ত্র-নির্মাতাদের সাহায্যে প্রস্তুত করান তিনি। যথা,—সুররাজন, কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ২২টি তারের যন্ত্র, হার্পের অনুকরণে গঠিত, দু'হাতে শক্ত কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজান হ'ত। সুররঞ্জন, ব্যাঞ্জোর অনুকরণে নির্মিত। প্লেট এবং সাধারণ আকারে ব্যাঞ্জোর মতন, কিন্তু যন্ত্রের মাথার অংশ ব্যাঞ্জোর মতন সরু নয়; জোয়ারিও ব্যাঞ্জোর নয়, সেতারের। মাথার অংশ সরু না হয়ে সমান হওয়ার জন্যে আওয়াজ অনেক বেশি, যদিও সেজন্যে বাজান অপেক্ষাকৃত কঠিন। সুরচয়ন—সেতার, সরদ ও এসরাজের সংমিশ্রণে গঠিত। যন্ত্রটির মূল অবয়ব সেতারের মতন, নীচের অংশে এসরাজের চর্মের পরিবর্তে কাঠের গঠন, সমগ্র পিছনের অংশ সরদের অনুকরণে নির্মিত এবং সরদের মত, কোলে রেখে সরদেরই মতন জবা দিয়ে আঘাত ক'রে বাজাতে হ'ত। আওয়াজ সরদের চেয়ে মিষ্টতর।

এ সব ছাড়াও, ঢোল ও হারমোনিয়মে তাঁর রীতিমত হাত ছিল। ঢোলে যেমন সঙ্গত করতে পারতেন, তেমনি খেয়াল ইত্যাদি গানের সঙ্গে হারমোনিয়মে অনুসরণ করতেন তিনি।

যাঁরা এক একটি যন্ত্রে আজীবন সঙ্গীত সাধনা করেন, তাঁদের তুল্য কর্তৃত্ব মোহিনীমোহন এতগুলি যন্ত্রে অর্জন করেন নি, এ কথা বলা বাহুল্য। কোন সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তবে প্রায় সব উচ্চশ্রেণীর অঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক যন্ত্রে তিনি যতখানি নিপুণ ছিলেন, তাও এক দুর্লভ প্রতিভার প্রকাশ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি পল্লবগ্রাহী ছিলেন না এবং যতগুলি যন্ত্রের নাম করা হয়েছে সে সবই তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল। সঙ্গীতচর্চায় বৈচিত্রের জন্যে তিনি অভ্যাস রাখতেন প্রত্যেকটিতে, যেমন কণ্ঠসঙ্গীতের প্রায় সব অঙ্গেই রেওয়াজ ছিল তাঁর।

এই বহুমুখীনতা তাঁর প্রতিভার এমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁর ক্ষেত্রে সঙ্গীতচর্চায় লঘুচিত্ততার অপবাদ দেওয়া সম্ভব ছিল না। স্বভাবের যথার্থ প্রেরণাতেই বহুর সাধনা তিনি করতেন একের বিচিত্র

উপলব্ধির সূত্রে। একটিমাত্র যন্ত্রে কিংবা এক অঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁর রাগবিদ্যার চর্চা এর চেয়ে তাঁর কম হ'ত না এ কথাও অবশ্য সত্য। কারণ সঙ্গীতের আর্ট আসলে অভিন্ন ও অবিভাজ্য। কিন্তু মোহিনীমোহনের সঙ্গীত মানসের আন্তরিক প্রবণতাই ছিল বহু মাধ্যম অবলম্বনে একের সাধনা। তাঁর প্রতিভার এই বহুমুখী প্রকাশ তাঁর পক্ষে পরম স্বভাবজ প্রক্রিয়া; সুতরাং অনিন্দনীয়। অন্য প্রকার হলে বরং অস্বাভাবিক হ'ত তাঁর ক্ষেত্রে। অল্পমূল্যের বাহাদুরি প্রদর্শনের বহুরূপী হওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না, যেজন্যে তৎকালীন বোদ্ধা ও রসিক সমাজে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাই সে যুগের উচ্চাঙ্গের আসরে, বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি একাধিক অঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করতে, একাধিক যন্ত্রে গুণপনা দেখাতে আমন্ত্রিত হয়েছেন বহুবার।

এই দিক থেকে সঙ্গীতক্ষেত্রে মোহিনীমোহনের এক অনন্য স্থান ছিল। নানা রীতির চর্চা করলেও নিষ্ঠার অভাব আদৌ ছিল না তাঁর। বহু-বল্লভ হওয়ার জন্যে তাঁকে পরিশ্রম ও সাধনা করতে হ'ত অতিরিক্ত। কিন্তু সেজন্যে ক্লান্ত বোধ করতেন না তিনি। এক অসাধারণ বৈচিত্র্য-বিলাসী সঙ্গীত-মানস তাঁকে নানা রূপের লোকে লোকে সুর ছন্দের অরূপ আলোকের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করত। সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর নিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম প্রতিভা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল ঠিক। তাই দেখা গেছে, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন (নামে বঙ্গ হলেও কার্যত যা ছিল শ্রেষ্ঠ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন) মোহিনীমোহনের বহুমুখী সঙ্গীত প্রতিভা প্রকাশের অন্যতম বাহন হয়েছিল। সেই উচ্চ মানের সম্মেলনে বিভিন্ন বছরের ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে মিশ্র মহাশয় সুমিষ্ট কণ্ঠে শুনিয়েছেন ধ্রুপদ, খেয়াল, ধামার, টপ্পা, ভজন, গজল। বিখ্যাত গায়কদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন পাখোয়াজে, তবলায়। যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরূপে পরিচয় দিয়েছেন বীণা ও সুরচয়ন যন্ত্রে। বাংলা দেশের বাইরে, একাধিক সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে পশ্চিমাঞ্চলের শ্রোতাদের ধ্রুপদ গেয়ে শুনিয়েছেন, সুরচয়ন ও সুরায়ন বাজিয়ে চমৎকৃত করেছেন।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠান হ'ত মোহিনীমোহনের এবং সেখানকার সঙ্গীত শিল্পীরূপে তিনি বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন দীর্ঘকাল যাবৎ। সে যুগের বেতার-শ্রোতারা তাঁর সঙ্গীত-কৃতিতে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দিনের পর দিন শুনেছেন মোহিনীমোহনের সুকণ্ঠে পরিবেশিত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন, কীর্তন এবং তাঁর স্বরচিত বাংলা গান। তাঁর বীণা, সুররঞ্জন, সুরচয়ন ও সুরায়ন যন্ত্রের বাদন। বেতারকেন্দ্রের সঙ্গীতানুষ্ঠানের ইতিহাসে কোন একক শিল্পীর পক্ষে তা যেমন অভিনব, তেমনি অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

মিশ্র মহাশয়ের প্রতিভা গুণী সমাজে রীতিমত সমাদরের বস্তু ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর একদিনের গুণপনার কাহিনী এখানে বিবৃত করা যায়। তা হ'ল, মুরারি সম্মেলনের ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক অধিবেশনের কথা। তাঁর সেদিনের অনুষ্ঠানের বিবরণ দেবার আগে মুরারী সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ সেসবের কোন লিখিত ইতিহাস নেই। আধুনিককালের সঙ্গীত সম্মেলনগুলি আরম্ভ হওয়ার আগে, বর্তমান শতাব্দের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কলকাতায় কয়েকটি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে সাধারণের সঙ্গীত পিপাসা চরিতার্থ করত। যথা, মুরারি সম্মেলন, শঙ্কর উৎসব ও লালচাঁদ উৎসব। তার মধ্যে বিখ্যাত গায়ক লালচাঁদ বড়ালের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর পুত্রদের উদ্যোগে প্রবর্তিত লালচাঁদ উৎসব সর্বভারতীয় গুণীদের সমাবেশের জন্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তেমনি দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্যে উল্লেখ্য হ'ল মুরারি সম্মেলন। বিখ্যাত পাখোয়াজগুণী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর সঙ্গীতগুরু মুরারিমোহন গুপ্তের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই সম্মেলনের প্রবর্তন করেন। বিশ শতকের সূচনায় মুরারিমোহনের মৃত্যুর পরের বছর থেকে আরম্ভ হয়ে এই বার্ষিক সম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ দশক পর্যন্ত। এই সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন-

গুলিতে বাংলার তাবৎ প্রথম শ্রেণীর গুণীরা যোগ দিয়েছেন, কখনো কখনো পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞও অংশ গ্রহণ করেছেন। ঠনঠনিয়া অঞ্চলে শিবনারায়ণ দাস লেনে দুর্লভচন্দ্রের বাড়ীর কাছে মণ্ডপ নির্মাণ ক'রে মুরারি সম্মেলনের আসর হ'ত মহাসমারোহে। সারারাত্রিব্যাপী সঙ্গীত অনুষ্ঠান চলত। বাংলা দেশে রাগ-সঙ্গীত চর্চার প্রসারে বর্তমান শতকে মুরারি সম্মেলনের নাম স্মরণ রাখার যোগ্য।

এই সম্মেলনের ১৯২৮ সালের একটি অধিবেশনে মোহিনীমোহন আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এক অত্যুজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছিলেন। সে আসরে উপস্থিত ছিলেন এবং গানও গেয়েছিলেন সেকালের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যও সেখানে ছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের ধ্রুপদ গানের পর মোহিনী-মোহন যখন তাঁর অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন, তখন রাত প্রায় একটা। তিনি প্রথমে দরবারী কানাড়া রাগে ধ্রুপদ গাইলেন। আলাপ ও গানে দরবারী শেষ করলেন দেড় ঘণ্টা পরে। শুধু উক্ত ধ্রুপদী ও পাখোয়াজীরা নন, অন্যান্য শ্রোতারাও মোহিনীমোহনের গানের সাধুবাদ এবং আরো গান শোনাবার জন্যে অনুরুদ্ধ হলেন। তিনি তারপর একটি খেয়াল ধরলেন মালকোষ রাগে। সম্পূর্ণ আলাপচারির পর ত্রিতালে গান আরম্ভ করলেন এবং তান কর্তবে বিস্তারিত করে প্রায় ঘণ্টাখানেক মালকোষ গাইলেন। খেয়াল শেষ হতেই আনন্দ ধ্বনির মধ্যে আবার অনুরুদ্ধ হলেন আর একটি গান শোনাতে। তিনি এবার টপ্পা ধরলেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে টপ্পার জমজমা ও গিটকিরি ফুটত চমৎকার। টপ্পার দানায় ভরিয়ে দিয়ে তিনি খাম্বাজ গাইতে লাগলেন। টপ্পা অঙ্গ শেষ হতেও উচ্ছ্বসিত শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে আবার অনুরোধ করলেন গায়ককে আরো গান শোনাবার জন্যে। মোহিনীমোহন এবার ঠুংরি অঙ্গে কাফী গাইলেন। যথাসময়ে ঠুংরি শেষ হ'ল, ওদিকে রাতও তখন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু শ্রোতাদের অনুরোধের তখনো শেষ নেই। তিনি এবার গান আরম্ভ না করে সুরচয়ন যন্ত্রটি বেঁধে নিয়ে যন্ত্রসঙ্গীত আরম্ভ করলেন। সুরচয়ন বাজাবার পর আবার গান ধরলেন—ভজন। তখন সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রোতারা সারারাত ঠায় বসে একাগ্রচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপভোগ করেছেন তাঁর সঙ্গীত। কেউই উঠে যান নি, অন্যান্য গায়ক বাদক থেকে সাধারণ শ্রোতারা পর্যন্ত। একা মোহিনীমোহনের জন্যেই জমজমাট আসর। ভজন গানের সঙ্গে তিনি অবশেষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন। তখন বেলা সাতটা। সঙ্গীতের এই যাদুকরকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। একাদিক্রমে ছ' ঘণ্টা এই বিচিত্র ধারায় সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে চমৎকৃত করেছেন তিনি। আসরের প্রধান উদ্‌যোক্তারূপে দুর্লভচন্দ্র তাঁর গুরু মুরারি গুপ্তের চিত্রে অর্পিত মালাখানি তুলে এনে মোহিনীমোহনের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বললেন,—'আশীর্বাদ করি, এ সম্মান যেন তোমার থাকে। স্বল্পভাষী দুর্লভচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মূল্য অল্প নয়, গোপালচন্দ্র প্রমুখ সমবেত গুণীরা সমর্থন জানিয়ে পুরস্কৃত করলেন মোহিনীমোহনের গুণপনার।

সঙ্গীতের নানা রীতিতে এমনি নৈপুণ্য অর্জন করলেও তিনি প্রধানত ছিলেন ধ্রুপদী। বেশীর ভাগ আসরে, বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনে সাধারণত তিনি ধ্রুপদই গাইতেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন, সর্বভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রের নিরিখেও একথা বলা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতাসরে ও সম্মেলনে তিনি ধ্রুপদ গুণী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। ভারতবর্ষীয় গুণী সমাজে তাঁর যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের নানা অধিবেশনে তাঁর যোগদান থেকে। বছরের পর বছর তিনি লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আগ্রা, বারাণসী, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে বাংলার ধ্রুপদ সাধনার স্বাক্ষর রেখেছেন।

রাগসঙ্গীতের ভিত্তিমূলে আছে ধ্রুপদ, তাই ধ্রুপদে সুদক্ষ থেকে অন্যান্য অঙ্গের চর্চায় অবাধে সঞ্চরণ করেন তিনি।

রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা তিনি একজন মাত্র গুরুর নির্দেশেই করেছিলেন এবং তাঁর কাছে পদ্ধতিগতভাবে প্রধানত ধ্রুপদই শিখেছিলেন। তাঁর সেই সঙ্গীতগুরুর অধীনে শিক্ষা আরম্ভ করবার আগেও মোহিনীমোহন গাইতেন খেয়াল ও টপ্পা গান এবং বাজাতেন তবলা ও পাখোয়াজ। কি অপূর্ব মেধার জন্যে সেসব শিখতে পেরেছিলেন, সে বিবরণ পরে দেওয়া হবে। ধ্রুপদী গুরুর কাছে শিক্ষার প্রসঙ্গ এখানে বর্ণনীয়। তাঁর গুরু খেয়ালে অভিজ্ঞ হলেও প্রধানত ছিলেন ধ্রুপদ গুণী। ধ্রুপদাঙ্গে যন্ত্র-বাদক এবং ধ্রুপদী।

তাঁর কাছে মোহিনীমোহন যখন শিক্ষার্থী হয়ে আসেন, তিনি বলেন যে, ধ্রুপদ না শিখলে খেয়াল গাওয়া হয় না। তাঁর কথায় মোহিনীমোহন ধ্রুপদ শিক্ষা আরম্ভ করেন তাঁরই নির্দেশিত পদ্ধতিতে। ধ্রুপদ গান, রাগালাপ ও কিছু খেয়াল তাঁর অধীনে মোহিনীমোহন শেখেন। প্রায় ৪ বছর নিয়মিত, পরেও অনেকদিন মাঝে মাঝে যেতেন তাঁর কাছে শিক্ষা করতে।

তাঁর সেই গুরুর নাম প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য সুরশৃঙ্গারবাদক ও ধ্রুপদী। কৃতী শিষ্যমণ্ডলীর গঠনকর্তা এবং বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীতজগতের অন্যতম দিক্‌পাল। বর্তমান শতকের প্রথম পাদে বাংলার বাইরে একাধিকবার নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে বাংলার পক্ষ থেকে প্রথম আমন্ত্রিত এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলার সুনাম প্রতিষ্ঠিত করেন। সঙ্গীত সম্মেলন ছাড়াও পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকেন্দ্রে ও আসরে বহুবার অনুষ্ঠান করে প্রথম শ্রেণীর রাগসিদ্ধ গুণীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি। আমেদাবাদ ও লক্ষ্ণৌর নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ছাড়া তিনি পুণা, নাগপুর, বাঙ্গালোর, লাহোর, সিমলা, কাশ্মীর, বারাণসী, গিধৌড়, পাটনা, দ্বারবঙ্গ ইত্যাদি দরবারে ও আসরে আমন্ত্রিত হয়ে গুণপনা দেখিয়েছিলেন। যে সব বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্ববিখ্যাত রুশ পিয়ানোশিল্পী মিরোভিচ। জীবনের শেষ ৫ বছর (সুদীর্ঘ ৯৩ বছর ছিল তাঁর আয়ু) প্রমথনাথ দিল্লীর সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমির কার্যকরী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁর উত্তরকালের সঙ্গীতজীবন যেমন গৌরবের, তেমনি ছিল তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার পর্বত। একাধিক মহাগুণীর শিক্ষা লাভের তিনি সুযোগ পেয়ে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। আসরে তিনি সাধারণত সুরশৃঙ্গার বাদক রূপে সুপরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু সারস্বত বীণাতে ও রীতিমত শিক্ষা পান পুণার বিখ্যাত বীণকার ও দ্বারবঙ্গ রাজের সভাবাদক আল্লা ঘোড়পুরের কাছে। তানসেনের কন্যাবংশীয় গুণী উজীর খাঁ কলকাতায় বাস করবার সময় প্রমথনাথ তাঁরও তালিম প্রায় দু' বছর পেয়েছিলেন। তা ছাড়া উনিশ শতকের কলকাতায় আগত দুই প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ এবং আলী বখশের কাছেও কিছুকাল ধ্রুপদ ও রাগালাপ শিখেছিলেন। তেমনি, নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র মেটিয়াবুরুজ দরবারের গায়ক আনসাদ দৌলার কাছে খেয়াল, সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীজান বাঈয়ের খেয়াল ও টপ্পা, মেটিয়াবুরুজ দরবারের শানাইবাদক প্যারে খাঁর শিষ্য শ্যামলাল মিশ্রের অধীনে এসরাজ ইত্যাদি বহু বিচিত্র শিক্ষা লাভ করেন প্রমথনাথ।

প্রমথনাথের প্রতিভা সবচেয়ে স্ফূর্তি পেত বিলম্বিত লয়ের আলাপচারিতে। এত ঢিমা চালের আলাপচারিতে মুন্সীয়ানা খুব কম গুণীই দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁর এই আলাপের পদ্ধতি উজীর খাঁর অনুবর্তী ছিল না, তা ছিল অনেকাংশে আল্লা ঘোড়পুরের অনুসারী। প্রমথনাথের কৃতী শিষ্য মোহিনীমোহন বলতেন যে, ধ্রুপদী মুরাদ আলীর ঢিমা আলাপের ঢঙ্ ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাজনায় ফুটে উঠত। আসরে প্রমথনাথ অনেক সময় সুর শৃঙ্গার যন্ত্রে রাগালাপ করে গৎ বাজাতেন হার্পের অনুকরণে গঠিত একটি ২২ তারের যন্ত্রে, যার তিনি নাম দেন—সুর আয়না।

মোহিনীমোহনের কোন গুরুর নির্দেশিত পথে শিক্ষা বলতে একমাত্র প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নাম করা যায়। বাকি সমস্ত কিছুই মোহিনীমোহন শিখেছিলেন পরোক্ষে, নানা সাঙ্গীতিক পরিবেশে, বিভিন্ন গুণীর অনুষ্ঠান শুনে শুনে, নিজের অসাধারণ শ্রুতিধর ও সহজাত

প্রতিভাবলে। সে সব প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। কারুর অধীনে শিক্ষালাভ সম্পর্কে মোহিনীমোহন বলতেন প্রমথনাথের নাম করে, 'তিনি ছাড়া অন্ত কোন ওস্তাদের কাছে কখনো মাথা হেঁট করি নি।'

মোহিনীমোহনের যে বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা দান করার ব্যাপারেও দেখা যায়। তিনি বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসঙ্গীতে এবং ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতী ছিলেন তাঁরই পুত্র মুরারিমোহন মিশ্র। পিতার প্রতিভার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী তিনি ছিলেন এবং কিশোর বয়স থেকেই পিতার শিক্ষায় ধ্রুপদ-খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, ভজন ইত্যাদি সঙ্গীতে নৈপুণ্য দেখাতে আরম্ভ করেন এবং অতি তরুণ বয়সে শুধু বাংলার সঙ্গীত সম্মেলনে নয়, নিখিল ভারত সম্মেলনের এলাহাবাদ, কাশী লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অধিবেশনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। এই উদীয়মান সঙ্গীত-প্রতিভা কিন্তু নিতান্ত অকালে, মাত্র ২৫ বছর বয়সে পরলোকগত হন। আরো দুঃখের বিষয় এই যে, মুরারিমোহনের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে ঘটে নি এবং পশ্চিমের একস্থানে খাদ্যের সঙ্গে গোপনে বিষ প্রয়োগ করার ফলে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যে প্রাণত্যাগ করেন তারও মূলে ছিল তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার জনৈক ব্যক্তির ঈর্ষা। সে এক উপন্যাসের মতন স্বতন্ত্র কাহিনী।

মোহিনীমোহনের আর এক শিষ্য ছিলেন, ক্ল্যারিওনেট বাদক গোপালদাস লাহিড়ী (নট ও নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ীর ভ্রাতা)। গোপাল লাহিড়ীকে ক্ল্যারিওনেট যন্ত্রে মোহিনীমোহন নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আরো কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীকে বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসঙ্গীত এবং কয়েকটি যন্ত্রে শিখিয়েছিলেন মোহিনীমোহন। তবে তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক তাঁরা কেউই হন নি।...

মোহিনীমোহনের জীবন-কথা এখানে বিবৃত করা হ'ল।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী (সন ১২৯০ সালের ২৫ মাঘ) তারিখে ২৪ পরগণার বর্ধিষ্ণু গ্রাম মজিলপুরে মোহিনীমোহনের জন্ম হয়। মজিলপুরের অন্তর্গত দক্ষিণপাড়ায় তাঁদের পৈত্রিক নিবাস। পিতা হরিনাথ মিশ্র আইনজীবী ছিলেন। তাঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ, মিশ্র উপাধি। মোহিনীমোহনের উর্ধতন দশম পুরুষে তাঁদের দামোদর নামে জনৈক পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে দোভাষীর কাজ করতেন। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন এবং মহামিশ্র উপাধি লাভ করবার পর থেকে এই বংশে পদবী স্বরূপ মিশ্র প্রচলিত হয়।

মোহিনীমোহন শিশুকাল থেকেই সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেছিলেন, বলা যায়। তাঁর সঙ্গীতে অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত। পিতামহ উমাচরণ মিশ্র ভাল তবলাবাদক ছিলেন এবং অন্যান্য আসরের মধ্যে তিনি নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারেও তবলা সঙ্গত করেছিলেন বলে প্রকাশ। মোহিনীমোহনের পিতা আইনজ্ঞের কাজের অবসরে সুরের চর্চা করতেন, এস্রাজ বাজাতেন। মোহিনীমোহনের জননী ঘরে গান গাইতেন; পুত্র জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে তার পরিচয় পেতেন। ঘরে এই সাঙ্গীতিক পরিবেশ। ঘরের আশে পাশে সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়াও বিশেষ অনুকূল ছিল।

২৪ পরগণার এই মজিলপুর অঞ্চলটি সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের মতন সঙ্গীতচর্চাতেও ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ। সে সময়ে বেশ কয়েকজন সঙ্গীতসেবী এখানে অবস্থান করায় মজিলপুর একটি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানকার কয়েকটি পরিবারে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি গান এবং পাখোয়াজ, তবলা, সেতার, বাঁশী প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা বেশ ভাল ভাবেই হ'ত তখন। ভূম্যধিকারী দত্ত বংশ সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের সঙ্গীতসভায় শুধু আঞ্চলিক গুণীরা নন, কলকাতার এবং কলকাতায় আগত পশ্চিমের কলাবতরাও আমন্ত্রিত হয়ে সঙ্গীত-পরিবেশন করতেন। কোন কোন সময় ভারত বিখ্যাত গুণীকে দত্ত পরিবারের নিযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞরূপেও দেখা গেছে। এই বংশীয় হেমচন্দ্র দত্ত যেমন ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ, ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক আলী বখ্‌শ এবং টপ্পাগুণী রমজান খাঁকে একই সঙ্গে কিছুকাল নিযুক্ত রাখেন তাঁর সঙ্গীতসভায়। সঙ্গীতসাধক অঘোরনাথ চক্রবর্তী ছিলেন

নিকটবর্তী রাজপুর গ্রামের অধিবাসী এবং মজিলপুরে তাঁর যাতায়াত ছিল, তাঁর কোন কোন শিষ্য এবং আত্মীয়েরও বাস ছিল এখানে। অঘোরনাথ এখানে তাঁর আত্মীয়দের গৃহ এবং বিশেষ দত্ত পরিবারের সঙ্গীত-সভায় অনেকবার গান গেয়েছেন, মোহিনীমোহন কিশোর বয়সে সে সব অনুষ্ঠান শুনেছেন। ময়ূরভঞ্জ দরবারের সভাগায়ক-গুণী ধ্রুপদী যদুনাথ রায়ের গানও মোহিনীমোহন সে যুগে শোনেন দত্ত বাড়ীর আসরে। যদুনাথ রায় ছিলেন ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ'র সবচেয়ে কৃতী শিষ্য। যদু রায় সম্পর্কে আর একটি সংবাদ যেন যা' অন্যত্র পাওয়া যায় না। তা হ'ল, যদুনাথ ভাল বীণকারও ছিলেন এবং মজিলপুরে তাঁর বীণায় রাগালাপ মোহিনীমোহন একাধিকবার শুনেছিলেন। যদু রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ রায়ও ছিলেন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ গায়ক এবং পিতৃব্যেরই শিষ্য। আশুতোষের গানও মোহিনীমোহন মজিলপুরে অনেকবার শুনেছিলেন।

উক্ত বহিরাগত গুণীদের সঙ্গে স্থানীয় যে সব সঙ্গীতজ্ঞ মোহিনীমোহনের প্রথম জীবনে মজিলপুরে সাঙ্গীতিক পরিবেশ রচনা করেছিলেন তাঁদের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তখনকার মজিলপুরের পাখোয়াজীদের মধ্যে বেশি উল্লেখ্য ছিলেন তিনজন—কেদারনাথ কাব্যায়ন, অতুলকৃষ্ণ বসু এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা তিনজনই কলকাতার অন্যতম মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের শিষ্য। ধ্রুপদীদের মধ্যে অপূর্বকৃষ্ণ দত্তের নাম মোহিনীমোহন বলতেন। অপূর্বকৃষ্ণ ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন মুরাদ আলী খাঁর কাছে। অঘোরনাথ চক্রবর্তীর অন্যতম শিষ্য এখানে ছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহিনীমোহনের মেসোমশায় চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং পূর্বে উল্লিখিত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দ্রকান্তের পুত্র। গায়ক দেবেন্দ্রনাথ এবং পাখোয়াজ বাদক উপেন্দ্রনাথ দু'জনেই নিকট আত্মীয় হওয়ায় মোহিনীমোহন তাঁদের সঙ্গীতচর্চার সময় প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। মোহিনীমোহনের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর ও মিত্রদের বাড়ী ছিল পাশাপাশি, মাঝে একটি সরু গলিপথ। প্রবোধচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর মাতুলপুত্র। সেই গৃহে অঘোরনাথ মাঝে মাঝে আসতেন এবং তাঁর গানও হ'ত। প্রবোধচন্দ্র নিজেও পাখোয়াজ ও তবলা বাজাতেন এবং তাঁর ঘরে যে নিয়মিত আসর বসত সেখানে অন্যান্য গায়ক বাদকও উপস্থিত হতেন। মোহিনীমোহন বিশেষ ভাবে উপকৃত হন প্রবোধচন্দ্র এবং তাঁর বাড়ীর সঙ্গীতচর্চা থেকে। তা ছাড়া, ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্তের বাগানের শিবমন্দিরে আর একটি সঙ্গীতের আসর নিয়মিত বসত। সেখানে কেদারনাথ কাব্যায়ন পাখোয়াজ বাজাতেন, অন্য কোন কোন গায়ক-বাদকও আসতেন। এখানেও প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন বালক মোহিনীমোহন। কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সেতারী ছিলেন। তাঁরও সেতার-বাদনের একজন শ্রোতা হতেন সেই উৎসুক কিশোর, দিনের পর দিন।

ঘরে ও বাইরে এই নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত পরিবেশ মোহিনীমোহনের সঙ্গীতজীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি সাহায্য করে। সেই সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় তাঁর সহজাত সঙ্গীতপ্রতিভা, পিতৃ-পিতামহের ধারায় যা তিনি স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেছিলেন। সেজন্যে নিতান্ত বাল্যকাল থেকে তাঁর সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ হয় কোন সঙ্গীত-শিক্ষকের শিক্ষা না পেয়েও অসামান্য প্রতিভা ও শ্রুতিধর স্বভাবের বশে তিনি শৈশব থেকেই অপরের শুনে সঙ্গীতের পাঠ নিতেন। এত অল্প বয়স থেকে তিনি বাজাতে আরম্ভ করেছিলেন যে, পরবর্তীকালে নিজে আর তা সঠিক স্মরণ করতে পারতেন না। কবে যে বাজাতেন না সেকথা আর তাঁর মনে পড়ত না। জননীর কাছে পরে শুনেছিলেন যে, ৪ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে থেকে তিনি তবলা বাজাতে আরম্ভ করেন, প্রবোধ চক্রবর্তীর তবলা বাজানো শুনে।

তারপর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে নিজেই সঙ্গীত-চর্চায় অভ্যস্ত হয়েছেন। একটির পর একটি যন্ত্র বাজনা শুনে আকৃষ্ট হয়েছেন, দিনের পর দিন লক্ষ্য ও আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তার বাদন পদ্ধতি। এবং পরে এক সময় তা বাজাতে আরম্ভ করেছেন আপন মনের প্রেরণায়। এমনিভাবে গানও অন্যের শুনে ক্রমে শিখেছেন, কেউ তাঁকে শেখান নি বা শেখাবার ব্যবস্থাও করে দেন নি।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বোধ হয় আলোচনা ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। একথা সকলেরই জানা আছে যে, রাগসঙ্গীত লোক সঙ্গীতের তুল্য সহজ ও সরল নয়। সেজন্যে রাগ-সঙ্গীত রীতিমত শিক্ষাসাপেক্ষ, অন্তত কোন উপযুক্ত গুরু কিংবা শিক্ষকের অধীনে। অন্য নিরপেক্ষভাবে সাধারণের পক্ষে তা শিক্ষা করা সম্ভব নয়। একথা সত্য হলেও যথার্থ প্রতিভাবানের পক্ষে শিক্ষার পথ নিজের শক্তিতে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। মোহিনীমোহনও প্রতিভা-বলে এবং অন্তরের প্রেরণায় প্রবোধ চক্রবর্তীর বাড়ী, চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ী, ভূপেন্দ্রনারায়ণের বাগানের শিব মন্দিরে কেদারনাথ কাষায়ণের আসর, সেতারী কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ এবং নিজেরও বাড়ী থেকে সঞ্চয় করে নিজের সঙ্গীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে লাগলেন।

তাঁর প্রথম যে তবলা বাজাবার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ৭ বছর বয়স পর্যন্ত শুধু তবলা বাজাতেন তিনি। সেই সঙ্গে মায়ের মুখে শুনে কিংবা প্রবোধ চক্রবর্তীর ঘর থেকে শোনা গানও ৫।৬ বছর বয়স থেকে গাইতে আরম্ভ করেন। কণ্ঠ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই মিষ্টি ছিল আর সেই সঙ্গে অনুকরণ ক'রে গাইবার ক্ষমতাও। তাই শুনে শুনে গান গাওয়া অগ্রসর হ'তে লাগল। তারপর যখন তাঁর বয়স ৭ বছর, তখন একটি পেতলের বাঁশী কিনলেন বাজাবার জন্যে। বাঁশীর সুর বড় ভাল লাগত। তাই বাঁশী বাজাবার ইচ্ছা হ'ল। পেতলের বাঁশীর চর্চা আরম্ভ করলেন। সুরবোধ, গানের গলা ছিল, ফুঁ দিয়ে বাজাবার কায়দা অভ্যাস করতে লাগলেন এবার।

দু'বছর এই বাঁশী বাজাবার পর একটি পিক্‌লু (বাঁশী) সংগ্রহ করলেন। বয়স তখন তাঁর ৯ বছর। ১২ বছর বয়স পর্যন্ত পিক্‌লু বাজাবার ঝোঁক রইল। তারপর ক্ল্যারিওনেট আর কর্ণেট ধরলেন পর পর এবং এই সুর-সমৃদ্ধ বাঁশী দু'টিতে সুরের চর্চা করলেন প্রায় ৩ বছর ধরে। আরো পরেও হয়ত বাজাতেন তাঁর প্রিয় এই বিলীতি বাঁশী দু'টি, বিশেষ ক্ল্যারিওনেট। কিন্তু পিতার নিষেধের জন্যে তখনকার মতন ক্ল্যারিওনেট আর কর্ণেট দু'টিই ছেড়ে দিলেন। উত্তর জীবনে অবশ্য ক্ল্যারিওনেট আবার মাঝে মাঝে বাজাতেন এবং এই বাঁশীতে শিক্ষাও দিয়েছিলেন, যেমন গোপাল লাহিড়ীকে। কিন্তু সেই ১৫ বছর বয়সে পিতার আপত্তির জন্যে ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট তাঁকে বন্ধ করতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীতচর্চায় পিতার আপত্তি ছিল না, তিনি নিজেও ছিলেন সৌখীন এসরাজ-বাদক। পুত্রের লেখাপড়ার চেয়ে সঙ্গীতে আসক্তি ও চর্চা দুই-ই বেশি দেখেও তিনি কখনো গান-বাজনায় আপত্তি করেন নি। ক্ল্যারিওনেট আর কর্ণেট বন্ধ করতে বলেছিলেন অন্য কারণে। এই দু'টি যন্ত্রেই দম রাখবার জন্যে এত বেশী ফুৎকার দিতে হয় যে, পাছে বুকে অতিরিক্ত চাপ পড়ে সেই ভয়ে মোহিনীমোহনকে এই বাঁশী ত্যাগ করতে বলেছিলেন।

১৬ বছর বয়সে পাখোয়াজ বাজাতে আরম্ভ করেন মোহিনীমোহন। তালের যন্ত্র দিয়েই তাঁর প্রথম সঙ্গীত-জীবন আরম্ভ হয়েছিল, বাল্য থেকে তবলা বাজাতে আরম্ভ করেছিলেন। জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই শুনে আসছেন পাশের বাড়ীর প্রবোধবাবুর ঘরে এবং মেসো-মশায় চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ীতে তবলা, পাখোয়াজ। তাই পাখোয়াজ অভ্যাস করতে বিশেষ কঠিন বোধ হ'ল না। মাসতুত ভাই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মুরারি গুপ্তের শিষ্য। তাঁর রেওয়াজের সময় কাছে বসে শুনতেন, লক্ষ্য করতেন, তারপর সেখান থেকে মুরারি গুপ্ত রচিত পাখোয়াজের বই বাড়ীতে এনে তাই থেকে বোল ইত্যাদি ওঠাতেন। শুধু প্রবোধ চক্রবর্তী বা উপেন্দ্রনাথের পাখোয়াজ বাজনা শুনতেন না, শিব মন্দিরে কেদারনাথ কাষায়ণ এবং মজিলপুরের ধ্রুপদ গানের সঙ্গ নানা আসরে অন্যান্য পাখোয়াজীদের বাজনাও নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন তিনি। নিজের অন্তরের প্রেরণায়, সাধনায় এবং মজিল-পুরের সাঙ্গীতিক পরিবেশে এইভাবে তাঁর পাখোয়াজ শিক্ষা অগ্রসর হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি বলতেন যে, কোন গুরুর কাছে যন্ত্রের তালিম তিনি নেন নি। পাখোয়াজেও তাই। পাখোয়াজে হাত তৈরি করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। অথচ উত্তরজীবনে তিনি অনেক ধ্রুপদের আসরে, এমন কি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, মুরারি সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদিতে পাখোয়াজ সঙ্গতে গুণপনা দেখিয়েছিলেন।

১৬ বছর বয়স থেকে তিনি যে পাখোয়াজ বাজানো আরম্ভ করেছিলেন, তা তাঁর সমগ্র সঙ্গীতজীবনে আর পরিত্যাগ করেন নি। ২৪ বছর বয়স থেকে যখন প্রধানত ধ্রুপদের চর্চা আরম্ভ করেন এবং পরে যে সুখ্যাত ধ্রুপদীরূপে সঙ্গীত সমাজে সুপরিচিত থাকেন, তাঁর সঙ্গীতজীবনের সেই পরিণত অবস্থায় পাখোয়াজ সাধন ছিল অন্যতম।

পাখোয়াজ চর্চা যখন তিনি আরম্ভ করলেন, সেই সঙ্গে খেয়াল গানও কিছু কিছু গাইতে থাকেন মজিলপুরের পূর্বোক্ত নানা আসর থেকে শুনে। তবলা বাদনও তাঁর কোন সময় একেবারে বন্ধ থাকে নি। এই ভাবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের বিভিন্ন অঙ্গে ও বিভাগে যুগপৎ তাঁর সাধনা এগিয়ে চলে পরিণতির পথে। তার মধ্যে কোনক্রমে স্কুলের পাঠ শেষ হয়। প্রথমে জয়নগর স্কুলে ও পরে ডায়মণ্ড হারবার স্কুল থেকে এনট্রান্স।

কিন্তু তারপর কোনক্রমেই তাঁর বিদ্যাশিক্ষা আর অগ্রসর হ'ল না। সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিমগ্ন হতে লাগলেন একান্ত-ভাবে। অথচ অর্থকরী জীবন আরম্ভ করবার বয়স হয়েছে, উপার্জন আর না করলে নয়। সে হ'ল বর্তমান শতকের একেবারে প্রথম দিকের কথা। সঙ্গীতকে জীবনের মূল বৃত্তিরূপে অবলম্বন করার প্রচলন তখন বাঙ্গালী সমাজে হয় নি। বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞরা যত বড় গুণী বা কৃতী হোন, সঙ্গীতচর্চাকে সাধারণত পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন না। তার একটি প্রধান কারণ—সঙ্গীতকে তাঁরা আদর্শবাদীর নিষ্ঠায় সেবা করতেন, তা থেকে অর্থোপার্জন বা সাংসারিক সুখ-সুবিধা আদায় করার কথা চিন্তা করতে অভ্যস্ত হন নি তাঁরা। তাই দেখা যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতন আচার্য স্থানীয় ব্যক্তিরাও একান্তভাবে পেশাদার ছিলেন না। প্রসঙ্গত বলা যায়, বাংলার কোন কোন সৌখীন গুণীর তুলনায় অল্প পুঁজি সম্বল করেও পশ্চিমাঞ্চলের পেশাদার কলাবন্তেরা বাংলা দেশ থেকেই যশ ও অর্থ দুই-উপার্জন করেছেন। সঙ্গীত ব্যবসায়ী হওয়ার জন্যেই সাধারণের দৃষ্টিতে অধিকতর অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞরূপে প্রতিভাত হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশনের আর্থিক মূল্য আছে, অতএব মূল্যবান—এই মনোভাব শ্রোতাদের মধ্যে অনেক সময় কার্যকরী হয়েছে।

সে যা হোক, সঙ্গীত তাঁর সমগ্র চিত্ত ও চৈতন্যকে অধিকার ক'রে থাকলেও সে যুগের ভদ্র বাঙ্গালী সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে মোহিনীমোহনকেও অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতে সচেষ্ট হ'তে হ'ল। কিন্তু কোন কাজেই অন্তরের সাড়া জাগল না। পিতার ইচ্ছায় আইনের পথ কিংবা চালের আড়ৎ বা জমিদারির কাজ ইত্যাদি কিছুতেই আসক্ত হ'তে পারলেন না তিনি। মত ও পথ নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধল। মোহিনীমোহন দেশ থেকে কলকাতায় চলে এলেন ২১ বছর বয়সে। ভবানীপুরের একটি বাসাবাড়ীতে প্রথমে রইলেন এবং সন্ধান ক'রে একটি অফিসে কাজ সংগ্রহ করলেন। সঙ্গীতচর্চাও চলতে লাগল সেই সঙ্গে।

কলকাতার বৃহত্তর পরিবেশে সঙ্গীতে তিনি নানাভাবে শিক্ষার সুযোগ পেলেন এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে জীবনের বিভিন্ন সময়ে বাস করেছেন তিনি এবং কাজও করেছেন নানা প্রতিষ্ঠানে। অচঞ্চল থাকেন শুধু একটি বিষয়ে। সঙ্গীতচর্চায়। ধ্রুবতারার মতন সঙ্গীতের লক্ষ্য থেকে কোনদিন চঞ্চল হয়ে দূরে সরে যান নি। তার বৈচিত্র্য ময় আনন্দলোকের সন্ধানে নিমগ্ন রেখেছেন নিজেকে।

ভবানীপুরের প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে মোহিনীমোহনের ধ্রুপদ গান, রাগের আলাপচারি এবং খেয়ালের রীতিনীতি শিক্ষার প্রসঙ্গ যথাস্থানে বিবৃত করা হয়েছে। সেভাবে কোন যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি অন্য কোন কলাবন্তের তালিম নেন নি, তাও দেখা গেছে। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতের একটি অঙ্গে সেকালের এক বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করেন তিনি। অতি বিচিত্র এবং পরোক্ষ ভাবে তাঁর সেই শিক্ষা সম্ভব হয়েছিল। ওস্তাদের নাম রমজান খাঁ এবং সে গীতিরীতি হ'ল—টপ্পা।

উনিশ শতকের বারাণসীর টপ্পা সাধিকা ইমাম বাদীর শিক্ষায় গঠিত হয়ে তাঁর পুত্র রমজান খাঁ ওই শতকের শেষ পাদে কলকাতায় আসেন। তখন তাঁর প্রথম পরিচয় ছিল সারঙ্গ-বাদক, পরে প্রকাশ পায় তাঁর টপ্পা ও টপ-খেয়াল অঙ্গে অমৃত কণ্ঠ। এমন মধুকণ্ঠ গায়ক পশ্চিমাঞ্চল থেকে

বাংলা দেশে অতি অল্পই এসেছিলেন। রমজান খাঁ তাঁর প্রায় সমগ্র সঙ্গীত জীবন কলকাতায় অতিবাহিত ক'রে পরলোকগতও হন এখানে। বর্তমান শতাব্দের প্রথমভাগে বাংলা দেশে টপ্পা অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধিতে রমজান খাঁ'র অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর কৃতী শিষ্যবৃন্দ সকলেই বাঙালী, যথা—লালচাঁদ বড়াল, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তেলিনী পাড়ার কালো বাবু নামে সঙ্গীত সমাজে সুপরিচিত), নিকুঞ্জবিহারী দত্ত (শিবপুরের অন্ধ গায়ক, ধ্রুপদাঙ্গে তিনি অঘোরনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য), গগনচন্দ্র দাস (বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা), গিরিবালা (প্রসিদ্ধ পেশাদার গায়িকা), ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শিবপুর), হৃষীকেশ বিশ্বাস (এণ্টালি), শরৎচন্দ্র দাস (খিদিরপুর) প্রভৃতি। বর্তমান কালের গুণী টপ্পা গায়ক কালীপদ পাঠকও প্রথম জীবনে নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ও ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে রমজান খাঁ'র শিক্ষা কিছু লাভ করেন। মোহিনীমোহনকেও রমজানের এক শিষ্যরূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু সে কথা রমজান খাঁ কিংবা বাইরের অন্য কেউ জানতেন না, মোহিনীমোহন তাঁর শিক্ষা নিয়েছিলেন এমন সুকৌশলে।

সে ঘটনার বিবরণ এই যে, শিবপুরের ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে যখন রমজান তালিম দিতে যেতেন, মোহিনীমোহন তখন ফণীশঙ্করের নিকট প্রতিবেশী ছিলেন। সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ফণীশঙ্কর কণ্ঠ-মাধুর্য ও নৈপুণ্যের জন্যে রমজানের অতি প্রিয় শিষ্য হন এবং অকালমৃত্যু না ঘটলে ফণীবাবু সুপ্রসিদ্ধ হতেন, একথা বলতেন মোহিনীমোহন। রমজান খাঁ ফণীশঙ্করকে প্রতি সপ্তায় একদিন কিংবা দু'দিন তালিম দিতে যখন যেতেন, সে সময় মোহিনীমোহন তবলা বাদক রূপে ফণীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। ফণীশঙ্করের রেওয়াজের সময়ে শুধু যে তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতেন, তাই নয়, রমজান যখন শিক্ষা দিতেন তখনও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন তবলাবাদক হয়ে। এইভাবে রমজান খাঁ এবং ফণীশঙ্করেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে মোহিনীমোহন রমজানের ঘরাণা টপ্পা সম্পদ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু ছ'মাস এই পরোক্ষ শিক্ষা চলবার পর ঘটনাচক্রে মোহিনীমোহনের গুপ্ত উপায় জানতে পারেন ফণীশঙ্কর। তার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া মোহিনীমোহনের বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু তখন মিশ্র মহাশয় টপ্পা অঙ্গের বিশিষ্ট রীতিনীতি এবং রমজানের গানের সঞ্চয় বেশ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। তারই ভিত্তিতে সাধনা ক'রে পরবর্তীকালে তিনি একজন বিশিষ্ট টপ্পা গায়করূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন কলকাতার নানা সঙ্গীতাসরে, সম্মেলনে এবং বেতার-কেন্দ্রে।

পরিণত বয়সে মোহিনীমোহন তাঁর বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভায় ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে যে যশ ও সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন, তার পরিচয় এই নিবন্ধের প্রথম অংশে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীত জগতে তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তিস্বরূপে পরিগণিত হতেন এবং সঙ্গীতের আসরে তাঁর ছিল বিশিষ্ট মর্যাদা। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদিতে তাঁর গুণপনার স্বীকৃতিই অবশ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র বলা যায়। সঙ্গীতের সে সব আসর ভিন্ন অন্য কিছু উপাধি ও সম্মানাদিও লাভ করেন তিনি।

"কাশী সঙ্গীত সমাজ" তাঁকে "সঙ্গীত রত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ধ্রুপদ-প্রবীণ হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের (ধ্রুপদী রামদাস গোস্বামীর প্রধান শিষ্য) আমৃত্যু সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বারাণসীর বিখ্যাত "সানন্দে ধ্রুপদ ক্লাব" মোহিনীমোহনকে উপাধি দেন "সঙ্গীত নায়ক"। কলকাতা আগত কোন কোন বিদেশী গুণীও মিশ্র মহাশয়ের সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। যথা—লণ্ডন সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রার বিখ্যাত বেহালা শিল্পী কেনেথ মুর এবং তুর্কীর লে চেক ডি অর্কেষ্ট্রার পরিচালক এস্রেক এ্যান্টিকাজী। তাঁরা যন্ত্রসঙ্গীত শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন এবং তা' পত্রেও লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন।

উত্তরকালের সঙ্গীত জীবনে বেতার কেন্দ্রে ও কোন বিশেষ আসর বা সম্মেলনে কিংবা কখনও শিক্ষা দানের জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলেও, বিগত যুগের অনেক বাঙালী সঙ্গীত সেবকের মতন তিনিও সম্পূর্ণ সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিলেন না। সেজন্যে চাকুরি জীবনকেই

অবলম্বন করেছিলেন যথাযথ। জীবনের নানা সময়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কাজের পর শেষ ১৫ বছর আগে ন ব্দর্´-এ নিযুক্ত থেকে ১৯৫৭ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার চেতলা অঞ্চলে ১৯২১ খ্রীঃ তিনি বাসগৃহ নির্মাণ করান ১৩৬, প্যারীমোহন দাস লেনে এবং সেই সময় থেকে সেখানেই অতিবাহিত হয় তাঁর অবশিষ্ট জীবন।

নানা কারণে জীবনের শেষ পর্বে তিনি বিশেষ সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারেন নি। প্রথমত, তাঁর অসাধারণ প্রতিভাধর পুত্র মুরারিমোহন (যাঁর স্মরণে প্রতি বছর মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীতাসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে) অকালে এবং শোচনীয় ঘটনা-পরম্পরায় মাত্র ২৫ বছর বয়সে (১৯৪০ খ্রীঃ) পরলোকগত হন। অসীম ধৈর্যে সেই শক্তিশেল সহ্য করেছিলেন তিনি। বাইরে প্রকাশ না পেলেও, বহু বছর এই মর্মান্তিক শোক বহন করে তাঁর অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায়। দেহ তাঁর অসাধারণ ব্যায়ামবলিষ্ঠ না হলে ওই আঘাতই তাঁর পক্ষে মারাত্মক হ'ত।

নিজের একান্ত সাধনার ক্ষেত্র সঙ্গীত জগতেও অসুখী ছিলেন শেষ বয়সে। বৃদ্ধ হলেও বার্ধক্য বা জরাগ্রস্ত হন নি। সতেজ কণ্ঠ এবং সর্বপ্রকার সাঙ্গীতিক নৈপুণ্য যথাসম্ভব অটুট ছিল মৃত্যুর বছর খানেক আগে পর্যন্ত। কিন্তু ক্রমেই নানা কারণে সঙ্গীতের আসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। পূর্ব যুগের সঙ্গীত চর্চার পরিবেশ ও ধারা পরিবর্তিত হতে লাগল নতুন যুগের রুচি ও চাহিদায়। তাঁদের হিসেবে লঘু বস্তুর কদর ও আদর বৃদ্ধি পেলে। মূলত তিনি ধ্রুপদী ছিলেন, তাই ধ্রুপদের হৃত-গৌরব অবস্থার জন্যে তাঁর সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র হ'ল অতিশয় সঙ্কুচিত। পূর্ণ শক্তির অধিকারী থেকেও নেপথ্যে অপসৃত হয়ে যেতে লাগলেন। আগেকার শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগীরা কোথায় চলে গেলেন সব।

তখনো অনেক কিছু দেবার ছিল। কিন্তু নেবার জন্যে তেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে আর ত আসে না কেউ!

নিজেরও ব্যবহারের দিক থেকে দোষ-ত্রুটি কিছু ছিল – ত্রুটিহীন মানুষ জগতে ক'জন থাকেন। কিন্তু দোষ বাদ দিয়ে গুণ গ্রহণের, সম্পদ আহরণের জন্যে আগ্রহ নতুন যুগে তেমন দেখা যায় না কেন?

এ এমন এক বিদ্যা যা দান না করলে সার্থক হয় না। কিন্তু গ্রহীতা কোথায়?

তা ছাড়া, শেষ বয়সে উপযুক্ত স্বীকৃতি ও সম্মান পান নি, এ ক্ষোভও মনের মধ্যে ছিল। এই সবের ফলে নিঃসঙ্গতা সঙ্গী হ'ল শিল্পীর। অভিমান তাঁর মন অধিকার করতে লাগল। অভিমান—সঙ্গীত জগতের ওপর, সঙ্গীতের নতুন পৃষ্ঠপোষকদের ওপর। আরো অনেকের ওপর।

দুর্জয় অভিমানী মন নিয়েই জগত থেকে চির বিদায় নিয়ে গেলেন!
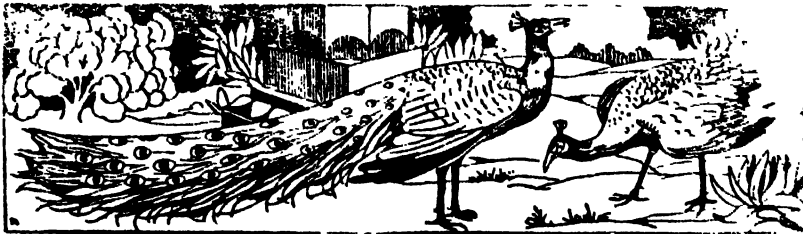
প্রেমদা

রণজিৎকুমার সেন

দীর্ঘ বিশ বছর পরে হঠাৎ আবার প্রেমদার সঙ্গে দেখা। প্রেমরঞ্জন বসাক। আপাততঃ কলকাতার উপকূলেই খুব কাছাকাছি আমরা বাস করছি, কিন্তু কারুর সঙ্গে কারুর দেখাসাক্ষাতের বালাই ছিল না এতকাল। শুনলাম—সোনারপুরে কোন রকমে একখণ্ড জমি নিয়ে অনেক কষ্টে খান দুয়েক ঘর তুলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আছেন। প্রেমদা বিয়ে করেছেন—তাও প্রায় বছর একুশ-বাইশ হয়ে গেল। আমরাই কয়েকজন অনুরাগী সাগরেদ প্রেমদার সঙ্গে বরযাত্রী হয়ে খুব স্ফূর্তি করে এসেছিলাম কৃষ্ণনগরে গিয়ে। ঠাট্টা করে বলেছিলাম: 'বিড়ালের ভাগ্যে এবারে শিকে ছিঁড়লো প্রেমদা। কিন্তু ভাবছি কি জানেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেশের মেয়ের সঙ্গে এরপর প্রতাপাদিত্যের দেশের ছেলের মিল খেলে হয়!'

অকস্মাৎ চিরকালের স্বভাবগত হাসিকে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের আবরণে ঢেকে নিয়ে কিছু একটা জবাব দিতে উঠে প্রেমদা প্রশ্ন করেছিলেন: 'কেন, বাঙাল বলে কি ঠাট্টা করছ না কি?'

বলেছিলাম: 'না, না, আপনি কেন বাঙাল হবেন, আপনি হলেন প্রেসিডেন্সী ডিভিশন; আপনাকে ঠাট্টা করতে পারি, এমন ধৃষ্টতা আমাদের নেই প্রেমদা।'

'ঠাট্টার বাকীই রাখলে বড়!' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের আবরণ ভেদ করে অলক্ষ্যেই আবার তাঁর স্বভাবগত হাসি ফুটে পড়েছিল।

চিরকালের অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তি প্রেমদার। প্রাণ খুলে এমনভাবে কাউকে হাসতে দেখি নি জীবনে। থাকি তখন আমরা যশোহরে। যশোহর-খুলনা তখন প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের অন্তর্গত। প্রেমদাকে ঠাট্টা করলেও অতসী বৌদিকে দেখেছি—প্রেমদাদের সংসারে এসে কেমন অদ্ভুত ভাবে সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। প্রেমদার সাগরেদ হিসেবে আমরাও বাদ যাই নি। কাছে এসে মিষ্টি হেসে কথা বলেছেন, সাদরে চায়ের কাপ এগিয়ে ধরেছেন সামনে; কখনও কোনদিন প্রেমদার কথার অপেক্ষা না রেখেই খাবার নিমন্ত্রণ করে বসেছেন। আমরা লজ্জিত হয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু তা নিয়ে কখনও আমাদের অপ্রস্তুত হতে দেন নি তিনি। বিরাট বনেদী বাড়ী; প্রেমদা যখন হাসতেন, অতবড় বাড়ীখানা সেই হাসির তরঙ্গে নেচে উঠত। অতসী বৌদি বলতেন: 'তুমি দেখছি ভূমিকম্প সুরু করে দিলে, এরপর যে পেটে খিল ধরে দাঁতকপাটি লাগবে গো।'

হাসির বেগ উচ্চগ্রামে রেখেই আমার দিকে তাকিয়ে প্রেমদা বলেছেন: 'শুনলে ত বেণু, বলি তোমাদের বৌদির কথাটা একবার শুনলে ত? আমি যে নকুলানুজ সহদেব নই, অর্জুনাগ্রজ বৃকোদর, একথাটা ভাবতেই পারে না অতসী। শপথ রেখে যে দাঁত দিয়ে একদিন দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করেছি, দাঁতকপাটি লেগে সে দাঁত ইচ্ছে করলেই বিদ্রোহ করতে পারে না, কি বল বেণু?'

কথাটা বলবার পিছনে একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল। প্রেমদাকে নিয়ে আমরা একবার থিয়েটার করেছিলাম: 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'। যাত্রার নাটককে থিয়েটারে রূপ দিয়ে খানিকটা অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম আমরা। গদাধারী বৃকোদরের ভূমিকাটা নিজে থেকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রেমদা। শারীরিক স্থূলতার দিক থেকে প্রেমদাকে অদ্ভুত মানিয়েছিল। অতসী বৌদির সঙ্গে প্রেমদার তখনও আত্মীয়তা হয় নি, হলে দর্শকদের আসন থেকে মনে মনে করতালি বাজাতেন অতসী বৌদি। দুঃশাসনের রক্তপানের দৃশ্যের জন্য পর পর সাতটা মেডেল পেয়েছিলেন প্রেমদা। পরদিন বাজারে টেনে নিয়ে শশধর ময়রার দোকানে

বসিয়ে আমাদের পেট পুরে রসগোল্লা খাইয়েছিলেন তিনি। মনে মনে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম আমরা: এবারে শীগগির একটা গতি হোক প্রেমদার। অর্থাৎ বিয়ে। সেই বিয়ে শেষ পর্যন্ত হ'ল।

বিষয়টা অতসী বৌদিকে বুঝিয়ে দিয়ে বললাম: 'আপনি এসে প্রেমদাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে নিয়েছেন, নইলে ইতিমধ্যে আবার কিছু একটা বই ধরে রিহার্সাল সুরু করে দিতে পারতাম।'

প্রেমদার হাসি এবারে অতসী বৌদির ঠোঁটে এসেও লাগল, বললেন; 'থাক হয়েছে, অভিনয়টা এখনও কিছু কম হচ্ছে না। রিহার্সালের পার্ট কদ্দুর মুখস্থ হয়েছে, আপনাদের দাদাকে একবার সেই কথাটাই শুধু জিজ্ঞেস করুন।'

নিজে কখনও আমি সংসার-অভিজ্ঞ লোক নই। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাই জানিও না কিছু। অতসী বৌদির কথা শুনে খানিকটা বিস্মিত হলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু দু'একটা দিন কেটে গেলে তার গূঢ় অর্থটা আপনি থেকেই প্রকাশ পেয়ে গেল। অর্থাৎ অতসী বৌদি অন্তঃসত্ত্বা; প্রেমদার আসন্ন সংসার বৃদ্ধির একটা আকস্মিক সংবাদ। তাই নিয়ে অতসী বৌদির স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তার আর নানা কোম্পানীর পেটেণ্ট ফাইল নিয়ে ইতিমধ্যে হিমসিম খেয়ে উঠেছেন প্রেমদা। অভিনয়ের দিক থেকে দারুণ একটা রিহার্সালের ব্যাপার বৈকি! স্বামীত্ব থেকে একেবারে পিতৃত্ব: রীতিমত একটা দ্বৈত ভূমিকা। সংসার ক্ষেত্রকে যে-মহাকবি একদিন রঙ্গমঞ্চ বলে ঘোষণা করেছিলেন, মিথ্যে নয় তার এক বর্ণও। ঠাট্টা করেই বললাম: 'করেছেন কি প্রেমদা, ইতিমধ্যে বাপ হয়ে গিয়ে আপনি যে বুড়ো হতে চললেন! একা বৌদির হাত থেকেই আপনাকে ছিনিয়ে নেওয়া কষ্ট, এরপর নন্দন।'

প্রেমদার মুখে এবারে বাচালতার বদলে কেমন একটা অদ্ভুত চিন্তার জড়তা। বললেন: 'ভাবছি, নন্দন না হয়ে নন্দিনী হ'লে কি করব? বাংলা দেশে মেয়ে পার করতে হলেই যে কমপক্ষে পাঁচ-সাত হাজার নিয়ে টানাটানি!'

বললাম: 'হোঃ, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ। আপনাকে দেখছি কেষ্টনগরের বাসর রাত্ত থেকেই উনপঞ্চাশে ধরেছে।'

—'উনপঞ্চাশ, মানে ফরটি-নাইন? হাউ সিলি ইউ আর টকিং!' সহসা প্রেমদার সারা মুখখানিকে বিকশিত ক'রে আবার তাঁর সেই চিরকালের স্বভাবগত হাসির ব্যঞ্জনা বেরিয়ে এল। বললেন: 'আমার জীবনীশক্তিতে কি এরই মধ্যে ঘুণ ধরেছে বলে বিশ্বাস কর বেণু?'

প্রেমদার মুখে এমন কথা আজ এই প্রথম। সবিনয়ে বললাম: 'বিশ্বাস করলেই কি আপনি তার প্রমাণ দিতে পারবেন? আপনি আমাদের চিরকালের গদাবাহী, আপনি গেলে আমরা দাঁড়াই কোথায়?'

বোধ করি এবারে কিছু একটা আশঙ্কায় মুখ বন্ধ করলেন প্রেমদা, মুখ বন্ধ করলেন মানে কথা বন্ধ করলেন নয়। একটুকাল থেমে পরে গাত্রোত্থান করে বললেন: 'এবারে সত্যিই আর একখানা বইটই ধর বেণু, নইলে কেমন যেন সব ঝিমিয়ে যাচ্ছে। দেশের আবহাওয়াও ইদানিং অনেকখানি বদলে গেছে, ওপরে সময়োপযোগী কিছু একখানি ভাল বইয়ের ব্যবস্থা করতে পার কি না, দেখ ত?'

আশ্বাস দিয়ে বললাম: 'এ আর শক্ত কথা কি, কালই আমি কলকাতায় অর্ডার দিয়ে বই আনিয়ে নেব। কিন্তু বৌদি পারমিট করবেন ত?'

—'বৌদির জন্যে ত আর চক্র ভেঙে যেতে পারে না, চক্রকে বাঁচাতে হবে।' কথাটা শান্ত সুরে হলেও উত্তেজক সন্দেহ নেই। চিরকালের স্বভাবগত প্রশান্ত হাসির মধ্যে সেই উত্তেজনার একটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের কাজে কোথায় একদিকে পা বাড়ালেন প্রেমদা।

এমন মশালের প্রয়োজন ছিল না—যদি না আমাদের সংস্কৃতিচক্রের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হয়ে তিনি আমাদের সাগরেদ করে নিতেন! সেবার কলকাতা থেকে খুব বড় একজন কথাসাহিত্যিক এলেন যশোহরে। তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার সূত্র নিয়েই প্রথম আমাদের এই সংস্কৃতিচক্রের জন্ম। বন্ধুদের মধ্যে কম-বেশী সাহিত্য-

প্রীতি ছিল অনেকেরই। বয়স, বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে প্রেমদা ছিলেন আমাদের পুরোধা। সঙ্ঘ করে সঙ্ঘ গুরুর আসনটা তাই প্রেমদাকেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। নিয়মিত প্রতি সন্ধ্যায় সংস্কৃতিচক্রের আসর জমে উঠত। এজন্য প্রথম প্রথম প্রেমদা তাঁদের বৈঠকখানা ঘরখানিই ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাদের। গান-বাজনা, আবৃত্তি, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ থেকে সুরু করে চা আর পানের খিলি অবধি কিছুই বাদ যেত না। কিন্তু অভাব ছিল সত্যিকারের একজন কাহিনীকারের। বিশেষ করে কলকাতার সেই খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা জানাবার পর থেকে সে অভাবটা যেন আরও বেশী তীব্র হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে প্রেমদা নানা উপকথা বলে আসর খানিকটা জমিয়ে রাখতেন। জানতাম—প্রেমদার মধ্যে একজন বলিষ্ঠ শিল্পী বাস করেন। খ্যাতিমান একজন কাহিনীকার হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের মত প্রেমদারও কম নয়। কিন্তু মুখের কথা কলমে এসে কোথায় যে হারিয়ে যায়, তা প্রেমদার মত প্রেমদার সাগরেদদেরও বুঝবার উপায় ছিল না। প্রেমদা বলতেন: 'বার বার অকৃতকার্যতাই হচ্ছে নিশ্চিত ফলপ্রসূতার লক্ষণ। অতএব কলম কেউ বন্ধ কর না, একদিন এই আসরই হয়ত বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে দাঁড়াবে।'

বলতে লজ্জা নেই যে, প্রেমদার কথাটা সেদিন খুব উৎসাহিত করেছিল আমাদের। সেই থেকে রাত্রির পর রাত্রি জেগে কলমের নিবকে ভোঁতা করে ফেলেছি। কিন্তু দেখলাম—কোন একটি লেখাই কিছু একটা কাহিনী হয়ে উঠল না। প্রেমদার ইচ্ছে ছিল—নিজেরা গল্প লিখে সেই কাহিনী থেকে নিজেদের নাটক আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করে নেব। কিন্তু আশা যত বড় ছিল, ক্ষমতা ছিল না তার এক কড়িও। থাকবে কেমন করে? 'মহাজনো যেন পন্থা'—যেমন প্রেমদা, তেমনি ত তাঁর সাগরেদ হবে:

তবু প্রেমদা ছিলেন আমাদের খাঁটি সোনা। তাতে খাদ ছিল না। অতসী বৌদিকেই ত কতবার ঠাট্টা করে বলেছি: 'এমন খাঁটি সোনা যাঁর জীবন সর্বস্ব, তাঁর দেহ অলঙ্কারের আতিশয্য শোভা পায় না।'

অতসী বৌদি বলেছেন: 'আমি ত ছেড়ে রাখতেই চাই, আপনাদের দাদাটিকে সামলান না! কখনও যদি গলার হারটা খুলে রেখেছি, অমনি এসে বলবে—বড্ড শুকনো শুকনো লাগছে তোমাকে।' বলে নারীত্বের গৌরবে সঙ্গে সঙ্গেই হেসে ফেলেছেন অতসী বৌদি।

সেই হাসি থেকে প্রেমদার অফুরন্ত পত্নী-প্রেমকে খুঁজে নিয়েছি আমরা। বন্ধুরা মিলে তা নিয়ে কৌতুক করেছি, সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেমদাকে একটি দিনের জন্যেও অস্বীকার করতে পারি নি আমাদের জীবনে। তাঁর হাসি ছিল আমাদের সঙ্ঘের প্রাণশক্তি। সেই শক্তিকে লতার মত জড়িয়ে জড়িয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মুহূর্তগুলি মঞ্জরিত হয়ে উঠত।

কিন্তু এমন মানুষকেও একদিন ছেড়ে আসতে হ'ল। হঠাৎ একটা ব্যবসার সূত্রেই যশোহর থেকে একদিন ছিটকে পড়লাম এসে কলকাতার এই শহরতলীতে। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে বছর বিশেক কেটে গেল, লক্ষ্যই করি নি এতদিন। আসার সময় প্রেমদাকে কিছুটা সাংসারিক বিপর্যয়ে জড়িয়ে পড়তে দেখে এসেছিলাম। সংসারে তখন তাঁর সংখ্যার একাধিপত্য। আসার সময় মুখ মনে দুটো ভাল কথা বলেও আমাকে বিদায় দিতে পারেন নি প্রেমদা। শুধু বলেছিলেন: 'সংস্কৃতিচক্রের ছাদের বড় ইটখানাই যখন খসে পড়ল, তখন এখানেই আমাদের ইতি।'

তারপর কি হয়েছিল, আদৌ সেই চক্র আর বেঁচে রইল কি না, জানবার অবকাশ হয় নি। দেখতে দেখতে কত বছরই ত কেটে গেল! ইতিমধ্যে বাংলার উপর দিয়ে মন্বন্তর এসেছে, দাঙ্গার রক্তে সারা পথ ভেসে গেছে, দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা এসেছে, কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রামে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জটিল হয়ে উঠেছে। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে যখনই অতীত

দিনগুলির দিকে তাকিয়েছি—বন-প্রকৃতির আচ্ছাদনে আবৃত আমার মর্মময়ী জন্মভূমির মত দু'চোখ মেলে আর যাকে দেখেছি—তিনি প্রেমদা, পাশে তাঁর হরিদ্রাভ অতসী ফুলের মতই শান্তশ্রী অতসী বৌদি।...

আজ এই এত বছর বাদে প্রেমদাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে অতীত দিনগুলির মতই খুশীতে মনে মনে উচ্ছল হয়ে উঠলাম। প্রথমটা বাক্যর মুখেই কোন কথা নেই, তারপর কিছুটা স-রব হয়ে প্রেমদাই প্রথম বললেন: এতকাল পর আবার তা হলে তোমার দেখা পেলাম বেণু।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'খবর কি, কোথায় আছেন প্রেমদা?'

স্থানের নির্দেশ দিয়ে প্রেমদা বললেন: 'চল, বাড়ীটা একেবারে চিনেই আসবে।'

হাতে জরুরী কাজ ছিল, তাই বাধা দিয়ে বললাম: 'আজ থাক, যায়গা যখন চেনা রইল, তখন ইতিমধ্যেই একদিন গিয়ে উপস্থিত হব। বৌদিকে আমার নমস্কার জানাবেন।'

—'জানাব।' একটুকাল থেমে প্রেমদা বললেন: 'তা হ'লে এক কাজ কর বেণু, কাল বাদে পরশু রববার আছে, সকালের দিকেই আমার ওখানে চলে এস, খাওয়া-দাওয়া করে সারা দিন কাটিয়ে তবে আসবে।'

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটায় আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রেমদার মুখের দিকে তাকিয়ে সেটুকু আর ব্যক্ত করতে পারলাম না। রাজি হয়ে বললাম: 'বেশ, তা-ই যাব।'

খুশী হয়ে বিদায় নিলেন প্রেমদা।

তাকিয়ে দেখলাম—হাঁটতে গিয়ে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছেন। যে স্বাস্থ্য নিয়ে একদিন তিনি স্বেচ্ছায় বৃকোদরের অভিনয় করেছেন, সে স্বাস্থ্য আজ আর নেই। একটু আগে কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম—চোখ দুটো অনেকখানি ভিতরের দিকে বসে গেছে, সারা মুখখানি কেমন একটা ক্লান্তিতে বিষণ্ণ। তবু মুখের উপর কেন যেন জিজ্ঞেস করতে পারি নি: 'এ কি চেহারা হয়েছে আপনার প্রেমদা?'

একটা দিন বাদ দিয়ে রববার বেশ ভোরে ভোরেই শিয়ালদায় এসে ট্রেন ধরলাম। প্রেমদ দের কলোনীতে যেতে হলে ট্রেনেই সুবিধে। শিয়ালদার সাউথ ষ্টেশনে টিকিট কাটলে আর কোন হাঙ্গামা নেই। সোনারপুরে নেমে মিনিট পনের হাঁটলেই কলোনী। নানা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে এগোচ্ছি, কিন্তু প্রেমদার পরিচিত কাউকে পেলাম না। মনে মনে ক্ষোভ হ'ল: একদিন যাঁর সাগরেদি গ্রহণ করে আমরা সংস্কৃতিচক্র গড়ে তুলেছি, এখানে তাঁকে চিনবার মত একটি লোকও নেই! অবশেষে একটি কিশোর ছেলে ইজ্জত বাঁচালো। সে-ই চিনিয়ে নিয়ে এল প্রেমদার ঘরে। এতক্ষণে বুঝলাম—ছেলেটি প্রেমদারই প্রথম সন্তান: হুটু। যশোহরে থাকতে এই হুটুকেই হতে দেখে এসেছিলাম। লিকলিকে স্বাস্থ্য, বাপের স্বাস্থ্যের এককণাও তার গায়ে নেই।

আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রেমদা বললেন: 'কাকাবাবুকে প্রণাম কর হুটু।'

এতক্ষণে হুটু একেবারে লজ্জায় ভেঙে পড়ল। মাথা নিচু করে আমার পায়ের দিকেই তার হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে পাঁচ টাকার একটা নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম: 'থাক, প্রণাম আর তোমাকে করতে হবে না। এই দিয়ে ইচ্ছে মত কিছু মিষ্টি কিনে খেয়ো, কেমন?'

হাতে টাকা পেয়ে লজ্জা আর সঙ্কোচ মেশানো কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার বাবার মুখের দিকে একবার তাকাল হুটু, তারপর বোধ করি অন্দর মহলে গিয়ে ঢুকল।

অন্দরমহল বলতে অবশ্য বাড়ীটার তেমন কিছু একটা আব্রু ছিল না। ছোট ছোট দু'খানি চালাঘর কোন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ীর চতুঃসীমানায় বাখারীর

ভাঙা বেড়া নড়বড় করছে। কোথায় সেই যশোহরের চকমেলানো বনেদী বাড়ী, আর কোথায় এই সোনারপুরের জীর্ণ কুটীর। মনে মনে দুঃখ হল। সেটুকু নিজের মধ্যে চেপে নিয়ে বললাম: 'হুটুকে না পেলে আমাকে হয়ত আজ ফিরেই যেতে হ'ত প্রেমদা। হুটু যে এত বড়টি হয়েছে, ভাবতেই পারি নি।'

প্রেমদা বললেন: "তুমিও ত যশোর ছেড়েছ আজ বছর বিশেক। এর মধ্যে হুটুর কচি-ঠেঁরাও যে তরতর করে কলাগাছ হয়ে উঠেছে।'

শুনে আশ্চর্য হলাম।—'বলেন কি, হুটুর তবে আরও ভাইবোন আছে?'

—'এ আর নতুন কথা কি! তোমাদের বৌদি যখন আছেন, তখন এরাও আছে; সর্বত্র প্রায় সব ঘরেই থাকে।' ব'লে এতকাল বাদে প্রেমদা আজ এই প্রথম আবার তাঁর সেই স্বভাবগত হাসি হাসলেন। বড় মিষ্টি বড় প্রাণখোলা। তবু লক্ষ্য করলাম—হাসির অন্তরালে আজ কোথায় যেন মস্ত বড় একটা বেদনা লুকিয়ে রয়েছে!'

ঘরের আড়াল থেকে কড়ার উপর খুন্তির আওয়াজ এসে কানে বাজছিল। বললাম: 'কই, বৌদিকে খবর দিন।'

—'খবরের কি বাকী আছে, মনে করেছ? বসো, এক্ষুণি এসে যাবে।' ব'লে খাঁকারি দিয়ে গলাটা একবার পরিষ্কার ক'রে নিলেন প্রেমদা।

ভাবছি—এবারে কি প্রসঙ্গ টানা যায়, ইতিমধ্যে স্বয়ং অতসী বৌদি এসে সামনে উপস্থিত। এতটুকুও সঙ্কোচ নেই, এতটুকু ঢাকাঢাকি নেই কোথাও; সারা শাড়ীতে লঙ্কা আর হলুদের দাগ, শাড়ীখানিও সেই পরিমাণে মলিন। এসে দাঁড়াতেই দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার জানিয়ে বললাম: চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না বৌদি, তারপর—খবর কি বলুন?'

অতসী বৌদি বললেন, আসতে খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না? বসুন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি; চা খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, ততক্ষণে রান্না নেমে যাবে।'

বললাম, 'রান্না দু'দণ্ড দেরীতে হ'লেই বা এমন কি ক্ষতি? রবিবারে সাধারণতঃ দেরী করে খাবারই অভ্যাস। এ জন্যে আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হবে না।

দরজার আড়ালে নজরে পড়েছিল ছোট ছোট কয়েকটি মুখ। তাদের সাড়া পেয়েই প্রেমদা বললেন, কৈ গো, তোমার রেজিমেন্টের সঙ্গে বেণুর পরিচয় করিয়ে দাও।'

মুখ টিপে হেসে অতসী বৌদি বললেন, 'পরিচয় আর করিয়ে দিতে হবে না, এরপর বেণু ঠাকুরপো নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন।'

প্রেমদা বললেন, 'বুঝলে বেণু, উনিশ-পনেরো-দশ আর ছয়, আপাতত এই ছয়ে এসে দাঁড়ি পড়েছে।'

—'মানে?'

—'মানে—হুটু, রীণা, পিণ্টু আর আন্না।' থেমে দরজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে প্রেমদা বললেন, 'দেখ না রেজিমেন্ট-পাওয়ার ইতিমধ্যেই এক্সারসাইজড হ'তে সুরু করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা দুপদাপ শব্দ। এতক্ষণ শিশু গিনিপিগ্ বলে যাদের মনে হয়েছিল, এবারে অশ্বখুরের তীব্র ধ্বনিতে মেঝের উপর পদশব্দ রেখে ছুটছাট কোথায় যে কে সরে পড়ল—বোঝা গেল না। অতসী বৌদিও আর অপেক্ষা করলেন না। সম্ভবতঃ চায়ের জল উনুনে চাপাতেই আবার তিনি অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ালেন।

হুটু, রীণা, পিণ্টু, এবং আন্নার সঙ্গে পরিচয় হ'তে সত্যিই কিন্তু দেরী হল না। বারকয়েক সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করল, তারপর কে কাকে ডিঙিয়ে আগে আসতে পারে কাছে, তাই নিয়ে পাল্লা। সময় কাটাবার দিক দিয়ে মন্দ নয়।

ক্রমে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল। যত্ন-পরিপাটির অন্ত নেই অতসী বৌদির। মাছ-মাংস-পোলাও-এর ব্যবস্থা না হলেও পাঁচপদ নিরামিষের সঙ্গে গরম ভাত বেশ লাগল। এক সময় রান্নাঘরের কাজ চুকিয়ে

সুস্থির মত এসে দু'দণ্ড কাছে বসলেন অতসী বৌদি। এতক্ষণে একবার ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম তাঁকে। একদিন যাঁর কাঁচা সোনার মত গায়ের রং ছিল, আজ তা প্রায় কালসে হয়ে গেছে। দেখে মনেই হয় না—প্রেমদার বরযাত্রী হ'য়ে এই মেয়েকে আমরা কোনদিন কৃষ্ণনগর থেকে তুলে এনেছিলাম। প্রেমদাকে বলতে যাচ্ছিলাম, 'বৌদির স্বাস্থ্যের দিকে আপনি কি একটুও নজর দিতে পারেন না? কিন্তু মুখে এসেও কথাটা বেধে গেল। কাকে বলব? যা স্বাস্থ্য হয়েছে, তাতে নজরটা যে প্রেমদার দিকে না দিলেও না! কত বড় বনেদী ঘরের ছেলে, আজ যেন শাপগ্রস্ত হয়ে জীবন থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়েছেন!

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'যশোর ছেড়ে আসার সময় আপনার যেন পারিবারিক কি একটা গণ্ডগোলের কথা শুনে এসেছিলাম প্রেমদা, এখন ত আর কোন ঝামেলা নেই?'

—'না, সব ঝামেলা কাটিয়ে তবে পথে বেরিয়ে ছিলাম।' থেমে প্রেমদা বলতে আরম্ভ করলেন, 'বাবার ইচ্ছে ছিল—নতুন মা-ই যাতে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেন! শেষ পর্যন্ত হলও তাই। বাবা জীবিত থাকতে লজ্জায় কাজটা চুকিয়ে যেতে পারলেন না। বাবা সংসার থেকে চক্ষু বুজে গেলে নতুন মা'র হয়ে তাঁর ছেলে হেমই দু'কথা বলতে সুরু করল। শুনলাম—আমার অংশ নাকি আমাকে লিখে দিয়ে তারা আলাদা হবে। বললাম অত দিয়ে কাজ কি, ষ্টেজ বেঁধে অভিনয় করলেও ঘরে বসে কোনদিনই অভিনয় করতে পারব না, ও বিদ্যেটা কোনকালে শিখিনি। তার চাইতে আর, আমার অংশটাও তোর নামেই লিখে দিই। সঙ্গে সঙ্গে হেম দেখলাম রাজি হয়ে গেল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস টেনে বাঁচলাম। দুটু তখন কোলে; অতসী আর দুটুকে নিয়ে সেদিনই ভেসে পড়লাম পথে। সামান্য পুঁজি যা পকেটে ছিল, তাই দিয়েই কিছুকাল লড়লাম। দুটুর মুখে এক কৌটা দুধ পর্যন্ত তখন দিতে পারিনি। ভাবলাম—গ্রামে গিয়ে কিছু জমি নিয়ে চাষবাস করি। নিলামও বটে, কিন্তু কপালে টিকল না। রাষ্ট্রবিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। একসময় প্রাণ নিয়ে তাই সবার মত আমরাও যশোরের মাটি ছেড়ে পালিয়ে এলাম। কিন্তু এ কোথায় এলাম?'

বলতে গিয়ে চোখ দুটো একবার চক্-চক্ করে উঠলো প্রেমদার। এমন সাধ্য রইল না যে সহজভাবে সেই চোখ দুটোর দিকে তাকাই। অতসী বৌদি তখনও সেই একইভাবে বসে আছেন। ছেলেমেয়েরা এক একবার কাছে দিয়ে এসে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু প্রেমদা বা অতসী বৌদির সেদিকে লক্ষ্য নেই। স্বল্পকাল থেমে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন প্রেমদা; 'চেষ্টা করে একটা কন্ট্রাকটারীর কাজ ধরলাম। না ধরে উপায় কি? সংসারে দুজনের যায়গায় হয়েছি ছ'জন, খেয়ে-পরে বাঁচতে তো হবে! সেই সঙ্গে মাথা গুঁজবারও একটা চালা চাই। কোনোদিন এ সবে তো বড় একটা অভ্যাস ছিল না, বাঁশ জোগাড় করে কখনও নিজের হাতে ষ্টেজ বাঁধতেও শিখিনি, বাড়ী তো দূরের কথা। কিন্তু দেখলাম—সংসারে কারুর জন্যে কিছু আটকায় না। চেষ্টা করে দুটো চালাও দাঁড় করালাম। কিন্তু বাজার মন্দা; কন্ট্রাকটারিতেও এখন আর কিছু হচ্ছে না বেশ। আমাদের জীবনে এ যে কী অভিশাপ নেমে এলো, শুধু সেই কথাটাই ভাবি। দুঃখ হয়—যখন চোখের সামনে ছেলেমেয়েগুলোকে চোখের জল ফেলতে দেখি; একটা ভালো জামা পর্যন্ত কিনে দিতে পারি নি ওদের। দুটুকে যে কোথাও কিছু একটা কাজে ঢোকাবো, সে সুযোগটুকু অবধি নেই।'

কথা শেষ করতে গিয়ে অলক্ষ্যে প্রেমদার বুক টেনে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

বললাম: 'এ অভিশাপ তো শুধু আপনার জীবনেই নয় প্রেমদা, মধ্যবিত্ত বাঙালী মাত্রের জীবনই আজ এই দারুণ অভিশাপে জর্জরিত। এজন্যে দুঃখ করে লাভ

নেই। সংগ্রাম করে যেতে হবে, সংগ্রাম করেই নিজেকে দাঁড় করাতে হবে। যে গদায় একদিন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়েছে, সে গদা কি উদ্যত হয়ে কখনও দেশের অন্যায় অব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে পারে না ?'

—'একদিন পারতো, কিন্তু আজ আর পারে না' বলে আরও যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন প্রেমদা, ইতিমধ্যে অতসী বৌদি বললেন; 'আপনাদের ফার্মে কিংবা অন্য কোনো যায়গায় কিছু একটা বাঁধা মাইনের আপনাদের দাদাকে আর হুটুকে কি ঢুকিয়ে দিতে পারেন না? একবার দেখুন না ভাই চেষ্টা করে? নইলে এ পাপের সংসার এখন আর আদৌ চলছে না।'

চলছে যে না, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। অথচ প্রেমদার এ অবস্থা দেখবার জন্য আদৌ কোনোকালে প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের উষর মরুভূমিতে একদিন প্রেমদা ছিলেন ওয়েসিস; তাঁকে অবলম্বন করেই একদিন আমরা জয়যাত্রার পথে পা বাড়িয়েছিলাম। সে যাত্রা শুভ হয়নি জানি, কিন্তু তাই বলে প্রেমদার জীবনে যে এমন অশুভ গ্রহ এসে ভর করবে, একথা কল্পনাও করতে পারিনি কোনদিন। প্রেমদার ঘরে নেমন্তন্ন খেয়ে এখন মনে হলো এ বাজারে অনর্থক কতকগুলো বাজে খবরের বোঝা চাপিয়ে প্রেমদাকে শুধু বিব্রত করা হলো। সেই সঙ্গে অতসী বৌদির দুর্ভোগটাই বা কম কি!

বললাম: 'চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করবো', তবে বাজারের যা অবস্থা, তাতে কোথায় যে কি সুবিধে করে উঠতে পারি, বলতে পারছি না।'

বাড়ীর ভিতরের দিকে গিয়ে ইতিমধ্যে পিন্টুরা বোধ করি নিজেদের মধ্যে কি একটা নিয়ে মারপিট সুরু করে দিয়েছিল, জবাবে কিছু একটাও তাই না বলে অস্তে সেই দিকেই উঠে গেলেন অতসী বৌদি।

নিজেও এবারে উঠে পড়তেই উদ্যোগী হলাম। কথায় কথায় কখন যে সারা সোনারপুরের উপর দিয়ে গোধূলির ছায়া নেমে এসেছিল, এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। ছটা পাঁচের ট্রেণ ধরতে না পারলে নিজেরই অসুবিধে।' বললাম: 'আজ তবে আসি প্রেমদা, চাকরীর কথা আমার মনে রইল, খোঁজ করব। করে দেখি - কোথায় কি করতে পারি!'

মেঝের পাতা ফরাসের উপর থেকে উঠে এসে এবারে চৌকাটের উপর পা রাখলাম।

সম্ভবতঃ টের পেয়েছিলেন অতসী বৌদি, তাই ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব শাসন করে একটুকালের মধ্যেই আবার তিনি ফিরে এলেন। বললেন: এরই মধ্যে তা হলে উঠে পড়লেন বেনু ঠাকুরপো? চা খেয়ে যাচ্ছেন না?

বললাম: 'দুপুরে যা খাওয়ালেন, তা হজম হতেই আজ রাত কাবার হবে, এর উপর আবার চা?'

আঁচলের একটা পাশ দাঁতে কামড়ে নিয়ে অতসী বৌদি বললেন: 'ঐ একটা খাওয়া, তাই নিয়ে আবার ঠাট্টা! দুধ মাছ ভিন্ন আমরা কোনোদিন কিছু মুখে তুলেছি, বলতে পারেন বেনু ঠাকুরপো?'

কথাটার কিন্তু সত্যিই এবারে জবাব দিতে পারলুম না। শুধু অতসী বৌদির মুখের উপর দিয়ে নীরবে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সামনের পথে পা বাড়ালাম। তাকিয়ে দেখলাম—গোধূলির ছায়ার মতই প্রেমদার মুখখানি ম্লান। কোনদিন উচ্ছ্বসিত হাসি ছাড়া এমুখে কখনও মালিন্য দেখিনি। সোনার মত উজ্জ্বল ছিলেন সেদিন প্রেমদা। আজ দেশেও যেমন সোনা নেই, তেমনি সোনারপুরে এসে ঘর বাঁধলেও প্রেমদার মধ্যে সে সোনা কবেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

———

বজ্রের আলোতে

শ্রীসীতা দেবী

তারপর শোনা গেল একটা তীব্র অথচ অস্ফুট আর্তনাদ আর পতনের শব্দ।

দরজার কাছে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিরঞ্জন কপাটটাকে ঠেলে খুলে ফেলল। ধীরা মেঝের উপর পড়ে আছে। জ্ঞান নেই বোধ হয়। মুখে দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন, ওষ্ঠাধর নীল দেখাচ্ছে।

এরই আভাসে কি সারা সকাল কাল হচ্ছেছিল নিরঞ্জনের চোখে? ধীরা কি বিদায় নিচ্ছে? কোনো কথা বলে গেল না, কোন কথা শুনেও গেল না?

কি করা উচিত এখন? নিরঞ্জন হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। তুলে নেবে কি ধীরাকে মাটির থেকে? কিন্তু তাকে ছোঁবার অধিকার কি আর নিরঞ্জনের আছে? কিন্তু এমনি করে ধুলোয় পড়ে থাকবে? ধীরার পাশে বসে পড়ল নিরঞ্জন, তার কপালে, মুখে, চুলের উপর হাত বুলিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠিতভাবে ডাকল, "ধীরা; ধীরা।"

কোনো সাড়া পেল না। তার মাথাটা এবার নিরঞ্জন কোলে তুলে নিল। ধীরা কি নেই? ক্ষমা প্রার্থনা করেও গেল না, ক্ষমা যে পেয়েছে তা শুনেও গেল না। নিরঞ্জনকে ডাকলও না একবার। জীবনে যার সঙ্গে বিচ্ছেদ একেবারে সহ্য করতে পারে নি, তাকে এমন অবহেলায় ফেলে দিয়ে গেল? কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ছে ত? দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল একবার নিরঞ্জনের স্পর্শ পেয়ে। চোখ খুলেই তারপর তাকাল নিরঞ্জনের মুখের দিকে। মুখের ভাবটা এক নিমেষে বদলে গেল। হঠাৎ এমন নিদারুণ কান্নার ভেঙে পড়ল সে, যে নিরঞ্জনের ভয় হ'ল যে এখনই সে আবার মূর্চ্ছিত হয়ে যাবে।

বহুদিন থেকেই নিরঞ্জনের মনটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। দারুণ একটা অবসাদ তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তার উপর গত ক'দিনের ব্যাপারে মন তার আরও বিক্ষুব্ধ বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এখন এই পরিস্থিতির জন্যে সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না।

তার মনের স্থৈর্য্য যেটুকু বা ছিল, তাও এবার লোপ পেল। চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে গেল। ধীরার মাথায় হাত বুলতে বুলতে কোনমতে বলল, "চুপ কর লক্ষ্মীটি, চুপ কর। নিজেকে আর বিচলিত ক'রো না, শান্ত হও। আরও বিপদ ঘটাতে দিও না।"

ধীরার কান্না থামল না। অস্পষ্ট স্বরে বলল, "একবার বল যে তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করেছ। আমি ত যাচ্ছি, মৃত্যুপথের পাথের আমার এইটুকু হোক।"

নিরঞ্জন অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলল, "তোমায় ক্ষমা না করে কি আমি পারি ধীরা? এমন নিদারুণ দুঃখ যার জন্যে পেলে সে কি তোমায় ক্ষমা করবে, না তুমি তাকে ক্ষমা করবে? আমিও বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে, সে অপরাধ কি কম? মরার কথা কেন বলছ? তুমি জীবন পূর্ণ করে আনন্দ পাও, শান্তি পাও, সব দুঃখ তোমার দূর হোক। ক'টা দিন বা জীবনের তোমার কেটেছে? এখনও সব বাকি। ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন কোন আঘাত, কোন দুঃখ তোমায় পেতে না হয়।"

ধীরা হতাশভাবে বলল, "আমি শান্তি পাব, আমি আনন্দ পাব। কি করে পাব? তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর ত ভগবানের আশীর্ব্বাদও যে আমার জীবনে বিফল হয়ে যাবে? আমি বাঁচব কি নিয়ে? তুমি ত জান আমার আর কোন অবলম্বনই নেই।"

এত দুঃখের মধ্যেও নিরঞ্জনের মুখে একটা ক্লিষ্ট

হাসির ছায়া পড়ল। তখনই আবার সেটা মিলিয়ে গেল। সে বলল, "আমি ত্যাগ করব বলছ তুমি ধীরা? ত্যাগ কি আমিই করেছিলাম? একবারও ওকথা কি আমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল?"

ধীরা এবার হাত বাড়িয়ে নিরঞ্জনের একটা হাত চেপে ধরল। বলল, "না তোমার মুখ থেকে বেরোয় নি, আমারই মুখ থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু আমি ভিক্ষা চাইছি এখন তোমার কাছে। আমাকে ফিরে নাও তুমি। আমাকে আশ্রয় দাও তোমার জীবনে। নইলে বেঁচে থেকে আমার কি হবে?"

ধীরার মাথা তখনও নিরঞ্জনের কোলে। সে অনুভব করল যে নিরঞ্জনের শরীরটা হঠাৎ পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল। একটু পরে খানিকটা রুদ্ধ কণ্ঠেই সে বলল, "ফিরেই নিতাম ধীরা। এর চেয়ে বড় কামনা, বড় আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে আর কিছু ছিল না। কিন্তু এখন ত দেরি হয়ে গেছে। যে মানুষকে ভালবেসেছিলে তুমি, সে আর নেই। সে আজ পতিত, কলঙ্কিত, তোমাকে স্পর্শ করবার অধিকার তার আর নেই।"

ধীরার চোখ আতঙ্কে আর ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। উঠে বসতে চেষ্টা করল, নিরঞ্জনের দিকে তাকাবার জন্যে। কিন্তু তার দুর্বল দেহ আশ্রয়হীন হয়ে সোজা থাকতে পারল না, আবার নিরঞ্জনের বুকের উপর এলিয়ে পড়ল। কম্পিত কণ্ঠে বলল "কি হয়েছে? কি বলছ তুমি, আমি বুঝতে পারছি না।"

নিরঞ্জন চেষ্টা করে গলাটা খানিকটা স্বাভাবিক করল, তারপর বলল "সে রাত্রের ভীষণ আঘাতে আমি আর মানুষ ছিলাম না ধীরা। অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমে গিয়েছিলাম। দেহ আমার কলঙ্কিত, মনে হয় আত্মাও যেন অশুচি হয়ে গিয়েছে। আমি নরকবাস করে এসেছি।

নিরঞ্জন থেমে গেল। রুদ্ধশ্বাসে যেন অপেক্ষা করতে লাগল ধীরার উত্তরের জন্য। কি বলবে সে? যে নিজেকে চরমদণ্ড দিয়েছিল শারীরিক শুচিতার অভাবের জন্য সে নিরঞ্জনকে ক্ষমা করবে? তার অপরাধ যে গুরুতর, সে জেনে শুনে পাপের পথে পা বাড়িয়েছে। আজই কি এই দারুণ বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্ক?

কিন্তু তার আশঙ্কাটা যে অমূলক, তা প্রায় তখনই সে বুঝতে পারল। ধীরার মুখ শাদা হয়ে গেল বটে, কিন্তু সরে যাবার বদলে সে সর্ব্বশক্তি দিয়ে নিরঞ্জনকেই আঁকড়ে ধরল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল তার, দুর্ব্বল দেহ কান্নার বেগে কাঁপতে লাগল। তার মুখের দিকে চেয়ে নিরঞ্জনের ভয় হল যে ধীরার আবার না জ্ঞান হারায়। তার মাথায় হাত রেখেই নিরঞ্জন বলল "ভয় পেয়োনা ধীরা ভয় পেয়োনা। তুমি চেষ্টা করে একটু শান্ত হও। তুমি যা চাইবে, তাই হবে। তোমার জীবন থেকে আমি বিদায় হয়ে যাব না। চোখে দেখতে চাও, চোখে দেখতে পাবে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে চাও তাও পাবে। সব অকল্যাণ থেকে আমি তোমায় রক্ষা করব, সব বিপদ থেকে আড়াল করে রাখব। কিন্তু ধীরা, আমি জানি দৈহিক পবিত্রতাকে তুমি কত বড় স্থান দাও। তুমি কি পারবে আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে? নিজে ভেবে স্থির কর। একেবারে কোন সম্পর্ক না রাখতে চাও তাও, বল। আমাকে spare করতে চেওনা।"

ধীরার চোখের জল পড়তেই থাকল। অস্পষ্ট স্বরে বলল "ভগবান এ দুঃখ তোমাকেও কেন দিলেন? আর ত আমি দূরে থাকতে পারব না। এখন তুমি আর আমি এক জায়গায়। তোমার যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা আমি ছাড়া কে বুঝবে? কিন্তু এও আমাদের ভুলতে হবে। ক্ষতি পূরণ করতে হবে দুজনে দুজনের কাছে। এর পর আমরা সবই ক্ষমা করতে পারব।"

নিরঞ্জন দুহাতে ধীরার মুখ ধরে বলল "এটাও তুমি এখন ক্ষমা করতে পারছ, আমি জেনে শুনে পাপ করেছি তা শুনেও? তাহলে নিজেকে কেন ক্ষমা করতে পারনি ধীরা? বিনা দোষে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও এমন নিদারুণ শাস্তি দিয়ে বসলে কেন?"

"আমি বড় নির্ব্বোধ ছিলাম। বয়স হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা হয়নি। মনগড়া জগতে বাস করতাম, তার নিয়ম কানুনও আমারই গড়া ছিল। কঠিনতম শাস্তি দিয়ে বিধাতা বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর আইন আর আমার আইন এক নয়। অতখানি সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসার

কাছে ঘৃণার কোন স্থান নেই, সে কথা মনেই আসে না।”

নিরঞ্জন একটু ম্লান হাসি হেসে বলল “এটা যদি একটু আগে বুঝতে ধীরা তাহলে এই নিষ্ঠুর আঘাত আমাকে দিতেনা, নিজেকেও দিতেনা। আমার ভালবাসাটার বেশী মূল্য দাওনি তুমি। তোমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও আমি ক্ষমা করতে পারব না, এই তুমি ভেবেছিলে।”

ধীরা অশ্রুসিক্ত অধরে নিরঞ্জনের হাত স্পর্শ করে বলল “যা বুদ্ধির দোষে ঘটে গেছে তা ত আর ফেরাতে পারব না আমি? তবে সারাজীবন ধরে তোমার সেবা করে এই আঘাতের চিহ্ন আমি মুছে ফেলব তোমার মন থেকে।” এক জন্মে না পারি শতবার জন্ম নেব, এই প্রায়শ্চিত্ত শেষ করবার জন্যে।”

নিরঞ্জন আবহাওয়াটাকে একটু হাল্কা করবার জন্য বলল, “তাহলে ত ভালই হয়, অন্ততঃ একশটা জন্মের মত নিশ্চিন্ত হতে পারি যে এ রত্নটি আমারই থাকবে, কেউ ছিনিয়ে নেবে না। তুমি জন্মান্তরটা খুব পুরোপুরি বিশ্বাস কর না?”

“করি ত। তুমি কর না?”

নিরঞ্জন বলল ‘যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারি না অবশ্য, কিন্তু খানিকটা বিশ্বাস যে না করি তা নয়। অন্ততঃ বিশ্বাস করতে খুবই ইচ্ছা করে যখন হাজার মানুষের মধ্যে একজনকে দেখে মন বলে ওঠে, “একে ত চিনি, এ যে আমার। সৃষ্টির গোড়ার থেকে এ আমার সঙ্গে আছে, অনন্তকাল তাই থাকবে।”

নিরঞ্জনের হাতের উপর হাত বুলতে বুলতে ধীরা বলল “ঠিক আমার যা মনে হয়েছিল। সকলের ত এমন হয় না। যার তার সঙ্গে জুটে যায়, তারপর চিরজীবন জ্বলে পুড়ে মরে। এই সব বন্ধনও কি জন্ম জন্মান্তর ধরে চলে? কি ভয়ানক হয় তাহলে।”

নিরঞ্জন বলল “প্রকৃত ভালবাসা না জন্মালে বন্ধন কোথা থেকে আসবে? রূপজ মোহ বা দৈহিক কামনা মাত্রই ত ভালবাসা নয়? সত্যি মিথ্যা বুঝবার জন্যে অগ্নিপরীক্ষা দরকার, যা আমরা পার হয়ে এলাম।”

ধীরা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিরঞ্জন চেয়ে দেখল নিজের বক্ষলগ্ন সুন্দর মুখখানার দিকে। যাকে সৌন্দর্য্যের সম্পদ এত দিয়েছিলেন ভগবান, তাকে আনন্দের সম্পদ দিতে এত কৃপণতা করলেন কেন? কি করুণ, কি বিষণ্ণ মুখ। একটু হাসি কি ঐ মুখখানিতে আনা যায় না?

হঠাৎ ধীরার চোখের জলটা নিরঞ্জন মুছে দিল ধীরারই শাড়ীর আঁচল দিয়ে। ধীরা তার দিকে তাকাতেই বলল, “আর চোখের জল ফেল না। আমি সহ্য করতে পারি না, মনে বড় আঘাত লাগে। তুমি হাসনা একটু। কবিরা শিশিরসিক্ত পদ্মের রূপে মোহিত হন, কিন্তু আমার মত অ-কবিদের শিশিরমুক্ত পদ্মের শোভাই দেখতে ইচ্ছা করে।”

একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল ধীরার মুখে, বলল “তাই দেখবে এখন থেকে, তবে তোমার একটু সাহায্য করতে হবে,”

“কি রকম করে?”

“আমাকে কোন সময়ে, কোন কারণেই কাছ ছাড়া করোনা, যতদিন আমি বেঁচে থাকব।”

“সেটা নিজের প্রাণের দায়েই করব, তোমার বলতে হবে না।”

“তা হলেই হবে। আর আমার কিছু চাইবার নেই। ঐ এক পাওয়ার মধ্যেই আমার সব পাওয়া হয়ে যাবে।”

নিরঞ্জন বলল “তুমি বড় অল্পে সন্তুষ্ট ধীরা। কিন্তু শুধু কাছে থেকে খুশি হলে ত চলবে না আমার। আমি যে তোমায় আরো অনেক দিতে চাই?”

“কি দিতে চাও বল।”

“এই ছন্নছাড়া জীবনের সমস্ত ভারই আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। আমার অসহ্য দুঃখের ভারও তুমিই নাও, যেমন করে পার ওটাকে মুছে দাও আমার জীবন থেকে।

আমাকে শান্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও। আমার বোঝা বইবার শক্তি শেষ হয়ে গেছে।”

ধীরা তার দিকে চেয়ে বলল” তাই হবে। এই চেষ্টাই করব আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে। পৃথিবীতে

আমার সবচেয়ে ভালবাসার জিনিষ তুমি। তোমার নামে শপথ করলাম।

দুজনে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। একটা পরিপূর্ণতার অনুভূতি যেন তাদের ধ্যানমগ্ন করে রাখল।

দিনের আলো নিভে আসছিল। নিরঞ্জন হঠাৎ যেন রেগে উঠে বলল "চল তোমায় খাটে শুইয়ে দিই গিয়ে। মাটিতে পড়ে ত অনেকক্ষণ রইলে।"

'ধীরা বলল" আমি নিজেই উঠতে পারব, একটু ধর আমাকে। তুমি নিজেই ত সবে উঠে বসেছ, আর strain কোরো না।"

নিরঞ্জনের সাহায্যে ধীরা উঠে খাটে শুয়ে পড়ল। তার মাথার কাছে বসে নিরঞ্জন তার রুক্ষ চুলের উপর হাত বুলতে লাগল।

বাইরে একটা গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। কিন্তু সেদিকে মন দেবার মত অবস্থা এদের তখন ছিলনা। ঘরের জানলা খোলা, বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। এতক্ষণ সেখানে কেউ ছিল না। এখন গাড়ী থেকে নেমে যশোদা হন হন করে এসে বারান্দায় উঠল। খাওয়া দাওয়া এরা ঠিকমত করল কিনা কে জানে? যা ত দিদিমণির অবস্থা। আর দাদাবাবু উঠে দাঁড়িয়েছে বটে, তবে সেও ত এখনও ভাল করে সারেনি। অত করে বলে গেলাম মানুষটাকে, তা সে কিছু বলল কিনা দিদিমণিকে কে জানে? হঠাৎ খোলা জানলার পথে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি পড়ায় সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মেমদের বাড়ী এ রকম দৃশ্য ঢেরই দেখেছে, কাজেই অবাক আর কি হবে? এরা ত মেমদের মতই চলে ফেরে? পরম নিশ্চিন্তে দেখি দাদাবাবুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। ইস্ আদরের ঘটা দেখনা এখন। প্রায় মেরে ফেলেছিল আর কি মেয়েটাকে। যাক্ সুবুদ্ধি যে হয়েছে সেই ঢের। 'ঝ্যাত সব' বলে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে রান্না করতে বসে গেল।

ঘরের ভিতরটা যখন সত্যিই অন্ধকার হয়ে এল, তখন ধীরা বলল" এখন ত ঘরে একটা আলো-টালো জ্বালা দরকার। এখনই তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যশোদাটা না ফিরলে ত আলোটা জ্বালাও শক্ত। মোমবাতি ছিল কতকগুলো, কিন্তু ও কোথায় কি রাখে আমি জানিও না।"

নিরঞ্জন বলল তাতে কি? আমি ত তোমাকে বেশ দেখতে পাচ্ছি। তোমরা হলে কমল হীরার জাতের জিনিষ, শরীর থেকেই আলো বেরয়।

ধীরা বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে। এখন তোমার টর্চটা নিয়ে এসত খুঁজে দেখি বাতি-টাতি একটাও পাই কি না।"

নিরঞ্জন বলল আর বাতির দরকার কি? যশোদা ত এসেই গিয়েছে মনে হচ্ছে।"

"ওমা তাই নাকি? কি করে জানলে?

"গেটে গাড়ী ঢোকার শব্দ পেলাম। ড্রাইভার মহোদয়ের গলার স্বরও শুনতে পাচ্ছি।"

ধীরা বলল তোমার চোখ, কান বেশ সজাগ আছে দেখছি। আমি নিজের মধ্যে নিজে এমনই ডুবে গিয়েছিলাম যে কিছু লক্ষ্য করিনি। তাহলে ত যশোদা এই বারান্দা দিয়েই গিয়েছে। ঘরের ভিতরটা ত দেখা যায় ওখান থেকে। কি ভাবল কে জানে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে।"

"ভারি ত কাণ্ডকারখানা, তা আবার ভাববে কি? আমি যদি খুব romantic type এর মানুষ হতাম, তাহলে আরো কত কি চটকদার দৃশ্য দেখত, যা নিশ্চয়ই ওর মেমদের বাড়ী দেখা অভ্যাস আছে। তোমাকে ত একটা চুমোও খাইনি, পাছে ভয় পেয়ে যাও, শুধু চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। অতটুকু যত্ন ত পীড়িতা দিদিমারও করা যায়।'

ধীরা হাসতে হাসতে বলল, "যাও তুমি ভারী দুষ্টু। সাধ মিটিয়ে নিলে না কেন? আমি ভয় পেতাম না আরো কিছু। "ও ক্যাংলা ভাত খাবি না হাত ধোব কোথায়?"

"তা হলে যশোদা আসবার আগে সাধটা মিটিয়েই নিই," বলে নিরঞ্জন ধীরার নরম গালে, চোখে মুখে অনেকবার করে চুম্বন করল! তারপর তার মাথাটা বালিশের উপর নামিয়ে দিয়ে বলল "এইবার ডাক তোমার যশোদাকে।"

ধীরা বলল "ঐ যে ছোট ঘণ্টাটা, যেটা ক'দিন আগে

তোমার ঘরে থাকত, ওটা রয়েছে ঐ টেবিলের উপর। ওটা বাজিয়ে দিলেই যশোদা আসবে।

ঘণ্টার শব্দে যশোদা ঠিকই এল, তবে সোজাসুজি ঘরে না ঢুকে বাইরের থেকে বলল "ডাকছ কেন গা দিদিমণি?"

ধীরা বলল "আলোটা জেলে দিয়ে যাও। আমার শরীরটা বড় খারাপ এখনি উঠব না।"

যশোদা তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ঢুকল। আলো জেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধীরার দিকে তাকিয়ে বলল কি অসুখ করল আবার? সকালে ত কিছু বলনি, তা হলে কি আর আমি যাই?"

"সকালেও শরীর ভাল ছিল না, তবে ভাবলাম তুমি অনেকদিন বেরওনি, একটু ঘুরে এস। এতটা যে বেড়ে যাবে ভাবিনি। এখন খানিকটা ভাল বোধ করছি।"

যশোদা গালে হাত দিয়ে বলল" দেখ দেখি কাণ্ড! না বাপু আমার ভাল ঠেকছেনি কিছু। তোমরা চল দেখি শহরে ফিরে। এখানে কি ডাক্তার আছে না বদ্যি আছে? বিপদ বাধতে কতক্ষণ? একজন যদি বা অনেক কষ্টে সারলে ত আর একজনের অসুখ করল। ওখানে হাঁসপাতালের বাড়ীতে নিশ্চিন্দি, যখন যা চাও, তখন তাই পাবে। তা দাদাবাবুকে ডাক্তারবাবু কি এখনও গাড়ী চড়ার অনুমতি দেননি?

নিরঞ্জন বলল, "কাল সকালে ত তিনি আসছেন, কি বলেন দেখি। নানাকারণেই এখন ফিরে যাওয়া দরকার। হয়েও গেল অনেকদিন। এতদিন যে আমাদের থাকতে দিয়েছে সেই ঢের।"

যশোদা কথা বলতে বলতেই চটপট ঘর গুছিয়ে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল। তারপর হাত ধুয়ে এসে ধীরার চুল নিয়ে পড়ল। নিরঞ্জন যে খাটের পাশে চেয়ারে বসে আছে সেটা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মস্ত বড় ক্ষত চিহ্নটা একবার বেরিয়ে পড়ল। সেটা তখনি যশোদা ঢেকে দিল, কিন্তু নিরঞ্জনের চোখ এড়িয়ে গেলনা। কি ভীষণ! তার মনটা যেন শিউরে উঠল।

চুল বাঁধা শেষ করে যশোদা বলল, "আচ্ছা, তুমি এখন শুয়েই থাক দিদিমণি, উঠোনি। আমি রান্নাবান্না সেরে এসে বিছানার চাদর পাল্টে দেব এখন, আস্তে আস্তে। দরকার কিছু হয়, দাদাবাবুকে বোলো, আমাকে ডেকে দেবে।"

যশোদা বেরিয়ে যেতেই ধীরা বলল, যাক, ব্যাপারটা মোটামুটি accept ই করে নিয়েছে।"

নিরঞ্জন বলল "না নেবে কেন? এইটাই ত চাইছিল, এবং এটা ঘট বার চেষ্টারও ত্রুটি করেনি।

ধীরা বলল "তাই নাকি? কি করেছিল?"

তার কাছেই ত শুনলাম তোমার কীর্ত্তির কথা।

ছি ধীরা, কি করে এমন কাজ করতে পারলে?"

ধীরা একবার কাতর দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের দিকে তাকাল। তারপর অত্যন্ত নীচু গলায় বলল, কিছুতেই যে সহ্য করতে পারলাম না।"

নিরঞ্জন উঠে গিয়ে বারান্দার দিকের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর ধীরার খাটে এসে বসে তাকে নিজের বুকের উপর টেনে নিল। বলল আমার বুকে মাথা রেখে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে আজ। তা না হলে আমার মনে শান্তি আসবেনা। এই প্রতিজ্ঞা যদি ভাঙো কোনও দিন তাহলে আমি চিরদিনের মত চলে যাব।"

ধীরা সভয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর আর ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। অস্ফুট স্বরে বলল কি প্রতিজ্ঞা বল, নিশ্চয় করব।

"প্রতিজ্ঞা কর কোনদিন কোনো কারণেই তুমি নিজের অনিষ্ট করবেনা। আমি বেঁচে থাকতে নয়। যত বড় দুঃখই হোক, সহ্য করবে।"

ধীরা নিরঞ্জনের বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'প্রতিজ্ঞা করছি, সব দুঃখ সহ্য করব, তুমি আমার কাছে থাকলে।"

"আমি কাছে না থাকলেও কোরো। আত্মহত্যার পাপ নরহত্যারই সমান ভগবানের চোখে।"

ধীরা অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে রাখল। নিরঞ্জন ওটা দেখতে চায় না। শুধু বলল এমন দুঃখ ভগবান কেন দেন মানুষকে যা সে একেবারে সহ্য করতে পারে না।'

"ভগবান কি অকারণে শাস্তি দিয়েছিলেন ধীরা? তুমি নিজের অন্যায়টা ভুলে যেওনা। একটা নিরপরাধ মানুষ যে তার অস্তিত্বের সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে ভালবাসে, তাকে এক নিমেষে ঠেলে দিলে হতাশার গভীরতম নরকে। সে পাগল হয়ে গেল ধীরা, তখন থেকে পাগলের মতই জীবন যাপন করেছে সে।"

ধীরা মুখ তুলে তাকাল, বলল," আমি অপরাধ স্বীকার করছি। বুদ্ধির দোষে করেছিলাম বললেই সে অপরাধ ছোট হয়ে যাবে না। যে শাস্তি এর জন্য পাওনা তাই দাও আমাকে। তাতেই আমার মঙ্গল হবে।" কোনো শাস্তি দিতে চাইনা, শাস্তি তুমি কম দাওনি নিজেকে। শুধু এই ভুলের কথাটা মনে রেখো, আর আমার ভালবাসাটাকে তোমার ভালবাসার চেয়ে দুর্ব্বল ভেবোনা। আমারও একান্ত নির্ভর তোমার ভালবাসার উপরেই। আমার মঙ্গল অমঙ্গল সব রইল তোমার হাতে। তোমারও জীবনের সব নিজের ভার আমি নিলাম। শুধু আমার মঙ্গল ইচ্ছাটার উপর আস্থা রেখ, কষ্ট পেলেও কখনও ভেবোনা যে তোমার অকল্যাণ চাইছি আমি।"

ধীরা বলল "ভগবানের হাত দিয়ে যা আসে তা মঙ্গলের জন্যেই আসে। এটাকে যেমন বিশ্বাস করি, তেমনি করে বিশ্বাস করি যে তোমার কাছ থেকে যা আসবে তা আমার কল্যাণের জন্যেই আসবে।"

ধীরার গালটা টিপে ধরে নিরঞ্জন বলল "তোমার আদালতে বুঝি মাঝামাঝি কোনো ব্যবস্থা নেই? হয় ভগবানের পর্য্যায়ে ঠেলে তুলে দিলে, নয়ত অন্ধতামস নরক? আমরা পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। তবে মঙ্গল ইচ্ছাটার সঙ্গে তুলনা চলে হয়ত।"

ধীরা বলল "যতই বিজ্ঞান পড়িনা কেন, বাংলাদেশের মেয়ে ত! পার্থিব জীবনে একজন ভগবানকে পেলে আমরা খুব স্বস্তিতে থাকি। কেউ স্বামীর মধ্যে তাঁকে পায়, যাদের অদৃষ্টে সে সুখ নেই, তারা গুরু খুঁজে বেড়ায়।"

তুমি তাহলে সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে একজন। দেখা যাক কতদিন এ সৌভাগ্য থাকে। বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠতাটা বড় বেশী ধরা পড়িয়ে দেয় মানুষকে, সব মুখোসই খুলে ফেলতে হয়, সব আবরণই চলে যায়। তখন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখা শক্ত হয় বই কি? তবে ভালবাসাটায় যদি খাদ না থাকে, তাহলে হাজার দোষ ত্রুটিও দেখা যায় না।"

ধীরা বলল "এমন মানুষও জন্মায় জান, যাঁদের যত কাছে যাবে, তত বেশী ভালবাসবে।"

"সে রকম ক'টাই বা আসে জগতে? কিন্তু তুমি উঠে পালাতে চাইছ মনে হচ্ছে? ভাল লাগছে না আর আমার কাছে থাকতে? এখন যেতে পাবে না।"

"পালাতে চাইব আবার কোন দুঃখে? কিন্তু তোমাকে এইভাবে বসিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না। সবে ত কাল উঠেছ। যদি আবার লেগে যায়?

"লাগবে না গো, লাগবে না। মনে রেখ আমি তোমার মত সুকুমারী নয়, রীতিমত লোহা পেটান মজদুর ক্লাসের মানুষ। এইটুকুতে আমার কিছু হবে না। শরীরে যা আঘাত লেগেছিল, তার চিকিৎসা ত ডাক্তার ঢের করল, তুমিও করলে, এখন মনে যে আঘাতটা লেগেছিল, সেটার একটু চিকিৎসা হতে দাও।" তার বাহুবন্ধনটা আরও কঠিন হয়ে উঠল।

ধীরা বলল "ডাক্তার মানুষের কথাটা একেবারেই শুনবেনা?"

"যা গুণের ডাক্তার। নিজের যা চিকিৎসা করেছ তা একেবারে অপূর্ব্ব। আর এই নূতন বুক ব্যথা করার রোগ কবে জোটালে? আগে ত ছিল না?"

"তুমি চলে যাবার পর হয়েছে।"

"কিছু চিকিৎসা হয়েছে? কাকে দেখিয়েছ?"

"চিকিৎসা বিশেষ কিছু হয় নি, কাউকে দেখাই নি।"

"কেন?"

ধীরা অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলল "কারণ শুনলে তুমি রাগ করবে।" নিরঞ্জন বলল, "না শুনেও আমি রাগই

করছি। কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই তোমার। এত তাড়াতাড়ি যমের গলায় মালা দিতে ছুটে যাবার কি দরকার ছিল? একটু অপেক্ষা করতে পারলে না? একবার ভাবলে না যে বেঁচে থাকলে মানুষটা নিশ্চয় ফিরে আসবে তোমার কাছে? তোমাকে কতখানি যে ভালবাসতাম, তা তুমি না জানতে এমন নয়?"

ধীরা এবার আর চোখের জল সামলাতে পারল না। দুফোঁটা জল তার পাণ্ডুর মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। বলল "নিজের অপরাধের কথা মনে ছিল, কোন ভরসা আর আমি করতে পারি নি।"

নিরঞ্জন আদর করে তার চোখের জলটা মুছে দিল, বলল "থাকগে, ওসব দুঃখের কথায় আর কাজ নেই। খানিকটা না বলে উপায় ছিল না, দুজনের মনটা জানার দরকারও ছিল। এখন ভবিষ্যতের ভাবনাটাই বেশী করে ভাবতে হবে, অতীতে যা হয়ে গেছে, তা ত গেছেই। এখন এলাহাবাদে ফিরে প্রথম কর্ত্তব্য হবে তোমার চিকিৎসার খুব ভাল ব্যবস্থা করা। এলাহাবাদে না হয় কলকাতায় যাব, সেখানেও না হয় ত বিদেশেই যাব।"

ধীরা বলল "কাজকর্ম্ম কিছু আর থাকবে না নাকি?"

নিরঞ্জন বলল, "এখনকার মত ঐটেই কাজ। আমি সাত বছর কাজ করছি, একদিনও ছুটি নিই নি, যথেষ্ট ছুটি পাওনা আছে। টাকাও মন্দ জমাইনি। মদ খাওয়া বা সুন্দরীদের পশ্চাদ্ধাবনের অভ্যাস ছিল না। কাজেই ও দিক দিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে না। আর তোমার ত একেবারে ছুটি এবার। কাজ আর করতে হবে না"।

"সেরে গেলেও না?"

"সেরে গেলেও না। কি দরকার কাজের তোমার? স্বাস্থ্য তোমার মোটেই ভাল নয়, কোন strain সইবে না। অবশ্য বিবাহিত জীবনেও strain-এর অভাব নেই, তবে বুঝে সুঝে ত চলা যায়। বাড়ীতে তোমার কাজের অভাব হবে না ধীরা। আমিই ত সারাক্ষণ তোমায় ব্যস্ত রাখব, একশ' জন্ম না হোক, এ জন্মে ত বটেই।"

"যা তুমি বল, তাই হবে।"

"হ্যাঁ এই রকম বাধ্য হয়েই থেকো। যদিও আমাদের বিয়েটাতে কোন মন্ত্র উচ্চারণ খুব সম্ভব করতে হবে না, তবু মনে মনে একবার বলে নিও to love, honour obey"।

বাইরে থেকে যশোদা বলল "আমার রান্না ত হয়ে গেছে দিদিমণি, তোমাদের কার খাবার কোথায় দেব?

নিরঞ্জন ধীরার দুই গালে আদরের স্পর্শ রেখে উঠে গিয়ে আবার চেয়ারে বসল। যশোদার কথার উত্তরে বলল, "এই ঘরেই দুজনের খাবারই দাও। ছোট টেবিল একটা না হয় নিয়ে এস আমার ঘর থেকে।"

যশোদা টেবিল নিয়ে এল এবং চটপট করে খাবার জায়গাও করে ফেলল, তারপর গিয়ে সব খাবার বয়ে নিয়ে এল। ধীরার দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা দিদিমণি, তোমাকে টুলের উপর খাবার দেব? তা হলে শুয়েই খেতে পারবে?"

ধীরা বলল, "না, না, আর শুয়ে কাজ নেই। গা-ময় সব পড়বে, আমি শুয়ে মোটে ভাল করে খেতে পারি না। আর শোওয়ায় অরুচি ধরে গেছে বাপু। এ জন্মে আর যেন শুতে না হয়।"

যশোদার মুখের উপর দিয়ে হাসির ছায়ার মত কি একটা যেন ভেসে গেল। তখনি আবার গম্ভীর হয়ে গেল। খাবার গোছান শেস করে এসে ধীরারে ধরে বসিয়ে দিল। বলল "তাহলে বসেই খাও। আহা, আজ বাজারে বড় সুন্দর সব তরকারি দেখলাম দিদিমণি। একবার ভাবলাম কিছু কিনে নিয়ে যাই, তারপর ভাবলাম কার জন্যে বা নেওয়া, সব ত ঐ ছোঁড়া ছুটোর পেটে যাবে। দাদাবাবুকে যা দেব, সবই সরিয়ে রেখে দেবে, বলবে "কিদে নেই", আর তুমি ত একটা কিছু দাঁতেও কাটবে নি।"

ধীরা বলল, "কেন এই ত বেশ খাচ্ছি?"

যশোদা বলল "খাচ্ছ ত বটে, তবে তার সঙ্গে অসুখও ত বাধিয়েছ। দাদাবাবুর ডাক্তারকে কাল দেখাও ভাল করে, আর শহরে কবে ফিরবে তার ঠিক কর। মাকে লিখব কিনা ভাবছি। তাঁদের মেয়ে তাঁরা একটু এসে দেখুক। আমরা হাজার হলেও মুখ্য মানুষ ত? বলে দিলে সব কাজই করতে পারি, তবে সব কিছু ত আর বুঝে নিতে পারি না, নিজের থেকে?"

ধীরা বলল, "সাত তাড়াতাড়ি মাকে ভয় পাওয়াতে হবে না। ফিরেই যাব আর দুএকদিনের মধ্যে। আর সব বুঝবার, বলে দেবার মানুষের অভাব হবে না কিছু।"

"যাই তোমাদের দুধটা নিয়ে আসি", বলে যশোদা প্রায় দৌড়েই ঘর থেকে চলে গেল। নিরঞ্জন বলল, 'বেচারী মহা মুস্কিলেই পড়েছে। নার্সারি মেডের ভূমিকাটাই রাখবে, না তোমার হাউস কীপারের পার্টটাই অভিনয় করবে বুঝতে পারছে না। খোলাখুলি বলেই দাওনা ওকে, ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচুক।"

ধীরা বলল "ও যেন আর বুঝতে পারে নি? কিন্তু সে হবে এখন, সম্প্রতি মা বাবাকে একটা চিঠি ত লেখা উচিত? যদিও কিভাবে যে লিখব তা মোটেই বুঝতে পারছি না। তুমি লিখবে না বাড়ীতে?"

"লিখব নিশ্চয়ই, তবে আমার মা বাবাকে জানান আরও মুস্কিল। তোমার পরিবারটা কলকাতাবাসী, এ সব নব্য ধরণ ধারণে খানিকটা অভ্যস্ত আছেন। আমার বাড়ীর মানুষগুলি একেবারেই প্রাচীনপন্থী, এ সব গান্ধর্ব বিবাহের প্রয়োজন যে কি তা তাঁরা বুঝেই উঠতে পারবেন না। ঘটা করে কনে দেখা হল না, পণ ও গহনা নিয়ে দরদস্তুর করা হল না, হঠাৎ হট করে শুধু কাগজে সই করে বিয়ে হয়ে গেল, এটা তাঁরা মন থেকে মেনে নিতে পারবেন বলে মনে হয় না।"

ধীরা বলল "তাহলে কি হবে?"

"হবে আর কি? যা আমরা ঠিক করেছি, তাই হবে। তাঁরা বিয়েটা মেনে হয়ত নেবেন না, আসতে চাইবেন না, কিন্তু বাধা দিতেও চেষ্টা করবেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে আমি সম্পূর্ণ রূপেই তাঁদের হাতের বাইরে। বহুকাল হয়ে গেল আমি তাঁদের অভিভাবকত্বের গণ্ডির বাইরে চলে এসেছি। মাসে দু একখানা চিঠি লেখা ছাড়া কোন যোগসূত্রই নেই আমাদের।"

"তোমার খারাপ লাগবে না?"

"বিশেষ খারাপ কি আর লাগবে? অনেককাল থেকেই নিজের সুখ ও দুঃখ একলাই উপভোগ করেছি, আর কাউকে তার ভাগ দিই নি। এখন আমার যা মনের অবস্থা তাতে বিবাহের আসরে কনেটি উপস্থিত থাকলেই আমি বর্তে যাব।"

ধীরা হেসে বলল, "আমারও সেই দশা। তবে মা এলে আমার খুবই ভাল লাগত। বড় দুঃখ করেন তিনি আমার জন্যে। নীরাকে দেখেও তাঁর ধারণা যে মেয়েমানুষের পক্ষে বিবাহিত জীবন ছাড়া আর কোন জীবন সুখের হতে পারে না।"

"তোমার মা বাবার বিবাহিত জীবনটা বেশ happy, না?"

"তাই ত মনে হয়। ঝগড়াঝাঁটি বিশেষ ত করতে দেখিনি।"

"নীরার এত unhappy হবার কারণ কি?"

"কি জানি, ঠিক বুঝতে পারি না। প্রিয়নাথ সম্বন্ধে jealousyটা খুব আছে, কিন্তু ভালবাসা খুব আছে বলে মনে হয় না। প্রিয়নাথও ওকে বেশ খানিকটা অবহেলা করেই চলে, ওর যে আরও ভাল স্ত্রী হওয়া উচিত ছিল, সেটা নীরাকে জানাতে বেশ ব্যস্তই।"

"আচ্ছা অসভ্য ত।"

"ও রকম অসভ্য ত আমাদের দেশের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক আর পুরুষই? স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রেও যে ভদ্রতা বজায় রাখা দরকার, তা কে বা মনে রাখে?"

"এইবার একটা exception দেখবে।"

ধীরার মুখে হাসি দেখা দিল। বলল "তা ত দেখবই। কিন্তু শুধু আমি নয় তুমিও দেখবে।"

নিরঞ্জন বলল, "দেখব কি? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া না করে চিরকাল কাটিয়েছে, এমন স্ত্রী কি জন্মেছে কোথাও?

"তুমি সব স্ত্রীর খবর রাখ নাকি? এ বিষয়ে কোন statistic ত নেই?"

"তা নেই বটে। তবে তুমি ঝগড়া করলেও আমি তোমাকে সহজেই ঠাণ্ডা করতে পারব এখন।"

এমন সময় যশোদা এসে দেখা দিল বাসন তুলতে। বলল, "ওমা, আমি বলি বুঝি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।"

"হয়েই গেছে, এই দুধটা খেয়ে নিই, "বলে দুধ খেয়ে ধীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে দিল। নিরঞ্জন অনেকক্ষণ থেকেই হাত গুটিয়ে বসে ছিল। যশোদা বাসনকোসন তুলে নিয়ে গেল।

নিরঞ্জন হাত ধুয়ে এসে বসে বলল, "অতঃপর কি goodnight?

ধীরা বলল "এত তাড়া কিসের? এখনও যশোদার শুতে আসতে ঢের দেরি। সে খাবে, বেশ ধীরে সুস্থে খাবে, চাকরদের খাবার দেবে, বাসন ধোবে সকালে চায়ের সব জিনিষ গুছিয়ে রাখবে, তবে ত শুতে আসবে। সে এখনও ঘণ্টা দেড়ের ব্যাপার।

নিরঞ্জন বলল "এইবার দিন পনের কুড়ি বড় খারাপ কাটবে। তুমি থাকবে এক জায়গায়. আমি আর এক জায়গায়। দিনে দুএকবারের বেশী দেখাই হবে না।"

ধীরা সজোরে মাথা নেড়ে বলল "মোটেই তাহতে দেবনা। তুমিও কাজ করবে না, আমিও কাজ করব না. তাহলে আলাদা আলাদা বাড়ীতে বসে কি করব? দিনের বেলাটা ত একসঙ্গে থাকতে পারি?"

"তা হলে আমাকেই তোমার বাড়ী গিয়ে থাকতে হয়, তোমাকে ত আর বলা যায় না এখনি আমার ঘর আলো করতে আসতে? দেখা যাক্।"

যশোদা না আসা অবধি নিরঞ্জন বসেই রইল ধীরার ঘরে। তারপর যশোদার পায়ের শব্দ শুনে উঠে পড়ল। সস্নেহে ধীরার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলল "চলি এখন। কাল খুব ভোরে উঠ কিন্তু। আমাকেও তুলে দিও।"

(১৯)

শেষ রাত্রে নিরঞ্জনের ঘুম একটু এসে থাকবে। কাল সন্ধ্যায় এমন প্রবল হৃদয়াবেগের আবর্ত্তের মধ্যে তাকে পড়তে হয়েছিল যে ঘুমবার সম্ভাবনা কমই ছিল। মস্তিষ্ক তখন তার দারুণ উত্তেজিত। অনেক সময় গেল নিজেকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ করতে। ঘুরে বেড়াল নিজের ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ, পড়বার চেষ্টা করল, কিছু সুবিধা হল না।

কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝতে পারে নি। হঠাৎ একটা উত্তপ্ত কোমল স্পর্শে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। পরিচিত একটা সৌরভ যেন পেল। স্বপ্নপাখীর মত কি যেন তার মুখের উপর মৃদুভাবে ডানা বুলিয়ে চলে গেল। চোখ খুলে তাকাল। মাথার কাছে ধীরা বসে আছে। এত ভোরেই স্নান করে এসেছে। চুল উড়ছে হাওয়ায়। তারই একগুচ্ছ কখন নিরঞ্জনের নিদ্রিত মুখের উপর এসে পড়েছিল।

নিজের মাথাটা ধীরার কোলের উপর তুলে দিয়ে সে বলল "কতক্ষণ এসেছ?"

ধীরা তার কপালে হাত বুলতে বুলতে বলল, "এই মিনিট দুই তিন হবে। তুমি একটুও ঘুমিয়েছিলে?"

নিরঞ্জন বলল "কই আর পারলাম? জীবনটাকে আবার নূতন করে প্ল্যান করে নিতে হবে ত? এখন ত শুধু নিজের ভাবনা নয়? তোমার সব ভাবনাও ভাবতে হবে যে? তবে এ ভাবনাগুলো একলা আমাকেই ভাবতে দাও, তুমি এর মধ্যে এস না। যা আমি ঠিক করব তাই তুমি মেনে নেবে।

ধীরা বলল "মেনে নেব, একথা ত দিয়েইছি। তুমিও যে কথা দিলে তা মনে রেখ। ভগবান আমাদের আলাদা করবার আগে, কোন কারণেই আমাকে দূরে সরিও না।

নিরঞ্জন বলল "দূরে কোথায় সরাব? আমার প্রাণের সঙ্গে এখন এমন করে মিশে গিয়েছ যে তোমাকে আলাদাই করা যায় না।"

যশোদার সাড়া পাওয়া গেল এবার। ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছে সে। ধীরা বলল "চল বাইরে গিয়ে বসি। ও ত এখন সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াবে।"

"যাচ্ছি, তুমি এগোও, "বলে নিরঞ্জন উঠে পড়ল। ধীরা গিয়ে বসল বাইরের সেই বাঁধা চাতালটায়। নিজেও সে কাল ভাবনার আতিশয্যে ঘুমতে পারেনি। ভাবনা তার নানারকম, দুঃখের আছে আনন্দের আছে। নিরঞ্জনকে সে ফিরে পেয়েছে। এর চেয়ে বড় আনন্দ ধীরা ত কিছু কল্পনা করতে পারে না? কিন্তু এমন ভিখারিণীর সাজে তাকে যেতে হচ্ছে কেন প্রিয়তমের কাছে, এর দুঃখ আর লজ্জাও ত কম নয়? প্রায় সব নারীই যে সম্পদ নিয়ে যেতে পারে সে কেন তা পারল না? কিন্তু দুঃখ করে হবে বা কি? মৃত্যুর মধ্যে থেকে যে অমৃত আজ তার জীবনে এসেছে, তাই নিয়েই সে ধন্য হোক, কৃতার্থ হোক।

নিরঞ্জন বেরিয়ে এল। ধীরার কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল "মুখটা অমন. উদাস করে কি ভাবছ? তোমার চোখের এই দৃষ্টিটাকে আমি ভয় করি। আর

একদিন ঐ রকম করে চেয়েছিলে, তারপরেই ঘনিয়ে এল সর্ব্বনাশ। এই একটু আগেই অত হাসিমুখ দেখলাম, এরই মধ্যে কি হল?

ধীরা তার একটা হাত ধরে বলল, "নিজের জন্যে একটু দুঃখ করছিলাম।

নিরঞ্জন ধীরার মুখটা দু হাতে তুলে ধরে বলল "আবার কিসের দুঃখ এল? কাল হিসাব নিকাশ একটা হয়ে গেল ত? সেটা যথেষ্ট হল না? তোমার সব দুঃখ দূর হয়, এতটা আমি দিতে পারলাম না?"

ধীরা বলল "শুধু তুমি দিলেই কি হবে? আমি যে যতটা দিতে চাই, তা দিতে পারছি না? আমাকে যে বড় রিক্তহাতে যেতে হচ্ছে?"

নিরঞ্জন তার মুখটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "এতদিনেও এ দুঃখ গেল না তোমার? এটা তুমি ভুলতেও পারছ না, এবং নিজের বেলায় ক্ষমা করতেও পারছ না? বাল্যকালে যদি তোমাকে বাঘে কামড়ে দিত বা হাতিতে মাড়িয়ে দিত এবং ফলে তুমি বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে, তাহলে সেটাকে কি তুমি নিজের অপরাধ ভাবতে। পশুরই মত কতগুলো মানুষ যদি তোমার সম্বন্ধে অপরাধ করে থাকে তাহলে তুমি ভগবান বা মানুষের কাছে ক্ষমা পাবে না কেন? তোমার মন, তোমার ইচ্ছার কি কোন যোগ ছিল ঐ ব্যাপারের সঙ্গে? তাহলে কি বুঝব তুমি আমাকেও ক্ষমা করনি? অপরাধ ত একই, আমি স্বইচ্ছায় করেছিলাম বলে আমারটা বেশী গণ্য। শুধু দয়া করেই কি আমাকে গ্রহণ করতে চাইছ?"

ধীরা নিরঞ্জনের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। তার দুই হাত ধরে বলল, "এতখানি ভুল বুঝ না আমাকে। আমি দয়া করছি তোমায়? তোমার দয়াতেই আমি প্রাণ ফিরে পেলাম। তোমার যে অপরাধ, তারও ত মূলে আমি? আমি যদি অত নিষ্ঠুরতা না করতাম, তাহলে কি আর তুমি ও পথে পা বাড়াতে? শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ত ওটা আমার মন থেকে মুছে গেছে। ও ত তুমি করনি, তখন কিসে তোমায় পেয়ে বসেছিল, তার প্ররোচনায় করেছ। তুমি আমার কাছে প্রথম থেকে যা ছিলে, তাই ত আছ। তেমনি পবিত্র তেমনি নিষ্কলঙ্ক। কোন ত্রুটি যদি হতও, তাহলেও কি আমি সেটা ভুলতাম না? তাহলে আমার, কিসের ভালবাসা?"

নিরঞ্জন বলল, "আর সকল দিকে এত শুভবুদ্ধি তোমার কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না কেন? আমিই কি ত্রুটি হলে ভুলতাম না, ক্ষমাও করতাম না? আমার ভালবাসার কি কোন ক্ষমতাই নেই?

ধীরা বলল "তা কিন্তু আমি ভাবিনি। আমার ভাগ্য দোষে যা হয়ে গেছে, তা তুমি মনে রাখনি, অপরাধ বলে গণ্য করনি, তা কি আমি জানি না? না জানলে কোন সাহসে আবার তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে পারলাম? কিন্তু স্মৃতি যে যায় না? তখন বাড়ীর লোকেও যে বুঝিয়ে ছিল যে আমার মরে যাওয়াই ভাল ছিল। যতদিন বাঁচব কলঙ্কিনীর জীবনই আমায় যাপন করতে হবে। আমি মানুষের কোন অধিকার পাবনা। মা বাবা আমাকে বুক দিয়ে আগলে ছিলেন, তাই বাঁচতে পেরেছিলাম, নইলে সেই সময়ই শেষ হতাম। কিন্তু মানুষের দেহে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলে তার দাগ যেমন যায় না, ঐ কথাগুলোর ছ্যাঁকা আমার মন থেকে যায় না। বুদ্ধি দিয়ে সবই বুঝি কিন্তু মন মানে না।"

নিরঞ্জন তাকে টেনে তুলে নিজের পাশে বসাল। বলল "তুমি আমার কাছে কালই প্রতিজ্ঞা করেছ যে নিজের কোন অনিষ্ট তুমি করবে না। শুধু দেহে আঘাত করলেই কি অনিষ্ট হয়? মনের মধ্যে এই নিদারুণ ক্ষতকে তুমি পুষে রেখ না ধীরা, পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষই বড় নীচ আর বড় অজ্ঞ, তাদের কথাকে কোন মূল্য দেবার দরকারই বা কি? তোমার মা বাবা তোমাকে অপরাধী ভাবেন নি, আমিও ভাবছি না, এটাই যথেষ্ট নয় কি?"

ধীরা বলল "যথেষ্ট ত হওয়া উচিত। মন আমার এক এক দিকে বড় দুর্ব্বল, তাই পারি না। এবার তোমার আশীর্ব্বাদে ভুলতে পারব হয়ত। তোমার কাছে কোন দিন আমি আর একথা তুলব না, মনে যদি আসেও।"

নিরঞ্জন বলল "মনকে অন্য চিন্তায় এমন করে লাগিয়ে রেখ, যেন এ সব আজেবাজে কথা মনের ধারে-কাছে আসতেই না পায়।"

"তোমার কাজ করেই দিন কাটাব আমি। ঐ আমার রক্ষাকবচ হয়ে থাকবে।"

চা দেওয়া হয়েছে ঘরে, তার ডাক এসে পৌঁছল। ধীরা আর নিরঞ্জনকে কথা বলতে দেখলে যশোদা আর পারতপক্ষে সেদিকে আসে না, অন্য কাউকে যেতেও দেয় না। এটাও তার মেমদের বাড়ীর শিক্ষা। দূর থেকে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল, আজ দুজনেই একটু খাওয়া দাওয়া করছে। চা ঢালতে আর দিদিমণির হাত কাঁপছে না। দেখে শুনে তার প্রাণে একটু শান্তি এল।

চায়ের পর্ব্ব শেষ হতে না হতে, ডাক্তারের গাড়ীর আসার শব্দ শোনা গেল। নিরঞ্জন বলল "দেখ ধীরা, মনের দিকের বোঝাপড়া ত অনেক কষ্টে শেষ হল, কিন্তু অন্য অনেক ভাবনাই ত বাকি। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল তোমাকে সারিয়ে তোলার ভাবনা। এক্ষেত্রে তোমার নিজের ডাক্তারি চলবে না। অন্যের পক্ষে তুমি খুবই ভাল চিকিৎসক এবং নার্স হিসাবে একেবারে অতুলনীয় এ certificate আমি দেব। সেরে গিয়েছি বলে কষ্টই হচ্ছে এক একবার। যাক, চিরজীবনের মত ও দুটি নরম হাতের উপর দখল পাচ্ছি, কাজেই ও দুঃখ না হয় ভুলেই গেলাম। তবে নিজের কোন ভাল তুমি কোনদিন কর নি। সুতরাং এখন ডাক্তার যা বলবেন, তাই শুনবে। তারপর শহরে ফিরে গিয়ে আরও ভাল কি চিকিৎসা হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ধীরা বলল ' তুমি যা বলবে, সে ভাবেই চলব।"

নিরঞ্জন হেসে বলল "মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে, তাই যা খুশি কথা দিচ্ছ। দেখা যাবে কতটা কথা রাখ। স্বামীর সব কথা শুনে চলে এমন স্ত্রী কি জগতে কোথাও আছে? থাকে যদিও পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বলতে হবে তাকে।"

ধীরা বলল, "আচ্ছা দেখো তুমি। কথা যখন দিয়েছি তখন কথা রাখব। তবে তুমিও নিজের কথা রেখ।"

"তোমাকে সর্ব্বদা কাছে রাখার কথা ত? এ পর্য্যন্ত ত একবারও আমি তোমাকে দূরে সরাতে চাই নি, এবং আশা করছি কোন দিনই চাইব না। আর যে দুঃখ পাও, এ দুঃখ তুমি আমার কাছে পাবে না।"

ডাক্তার আজ সকাল সকালই এসে উপস্থিত হয়েছেন। দূর থেকে তাঁর মনে হল নিরঞ্জন যেন ধীরার হাত ধরে রয়েছেন। একটু বিস্মিত হলেন তারপর ভাবলেন তাঁর ভুলও হতে পারে। আর ভুল যদি না হয় তাতেই বা কি? অমন সুন্দরী তরুণীর প্রতি যে কোন যুবক আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে। কাছে এসে বললেন, ' আপনি ত পুরোপুরি সেরেই গেছেন দেখছি। ভাল, কত আর শুয়ে থাকবেন? মিস রায় কেমন আছেন? চেহারা ত কিছু improve করেনি?"

নিরঞ্জন বলল " ভালই যে নেই মোটে, ত improve করবে কি? কাল ত অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁকে দেখুন আপনি ভাল করে। কি ভাবে থাকা উচিত বলুন। এখান থেকে নিয়ে যাবার strain কি এখন সহ্য হবে?"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, ' কি হয়েছিল? কাল ত কোন অসুখের কথা শুনি নি?

ধীরাকে অগত্যা তখন নিজের রোগের কাহিনী বলতে বসতে হল। নিরঞ্জন সেখান থেকে নড়বার কোনো লক্ষণ দেখাল না। যা কিছু জানবার ডাক্তার নিরঞ্জনের সামনেই প্রশ্ন করে জানলেন। তারপর বললেন, "রোগ ত সুবিধের নয়। তবে একেবারে প্রথমে ধরা পড়েছে, সারা সহজ হবে। পুরো বিশ্রাম নিন আপনি, এখন বেশ কিছুদিন চাকরি করার কথা আর ভাববেন না। অভিভাবকদের জানান, তাঁরা যদি নিয়ে যেতে চান ত চলেই যান। মনের সম্পূর্ণ শান্তি দরকার।

নিরঞ্জন হেসে বলল "অভিভাবকদের স্থান ত দিন কয়েকের মধ্যে আমাকেই পূর্ণ করতে হবে। তা আপনি নির্দ্দেশ দিন, সেই মতই সব ব্যবস্থা করা হবে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তাই নাকি মশায়? বেশ, বেশ বড় খুসী হলাম শুনে। আপনার দেখি শাপে বর হল। এলেন accident করে আর ফিরছেন লক্ষ্মী লাভ করে। তা মিস রায় এখন ভালই থাকবেন আশা করি। বেশী মানসিক strain এ অনেক সময় এ সব অসুখ হয়। মনের শান্তি এরপর অক্ষুণ্ণই থাকবে। আর এখান থেকে যাওয়া? তা কাল যাবেন, আজ না গিয়ে। কালই attackটা

হ'ল ত? আচ্ছা এখন উঠি। এলাহাবাদে গিয়ে আবার দেখা হবে। শুভকর্ম্ম উপলক্ষ্যেও ত দেখা হবে।" এই বলে তিনি হাসতে হাসতে প্রস্থান করলেন।

নিরঞ্জন বলল "দেখ আমি যে লক্ষ্মীলাভ করেছি, তা সকলেই জানে, বুঝেছে, খালি লক্ষ্মী যিনি তিনি বুঝছেন না।"

ধীরা বলল, "তিনি যে এতদিন মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মীই ছিলেন। লক্ষ্মীর পদে এই ত তার সবে অভিষেক হল। এটা মনে বসতে সময় লাগবে ত? কিন্তু দেখ এই বাড়ীটা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না? আমার ত একেবারেই ভাল লাগছে না।"

নিরঞ্জন বলল "ভাল কি আর আমারই লাগছে? লোকের ভীড়টা আরো কিছুদিন এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তার সুবিধা কোথায়? unofficial honey-moon আর কতদিন চালান যায়? কাল যাবারই ব্যবস্থা কর। কিন্তু তোমাকে একেবারে শুইয়ে রাখার ব্যবস্থাটা যদি ডাক্তারকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যেত ত বেশ হত।"

কি বেশটা হত শুনি?"

"এই আমি একটু তোমার সেবার ভার নিয়ে ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করতাম। সেবা তোমার কতদূর হ'ত জানি না, তবে আমি খুব আনন্দে থাকতাম।

ধীরা বলল "তুমি বেশ কৃতজ্ঞ মানুষ ত? এত করে সেবা করে খাড়া করলাম, আর এখন আমাকে জব্দ করার ফন্দি আঁটছ? কিন্তু ডাক্তারবাবু তোমার কথামত চলতেন না কখনও। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ ত? বুঝেছেন রোগের উৎপত্তি কোথা থেকে, আর সারবেই বা কিসে?

নিরঞ্জন বলল "তা হলে ত চিকিৎসার ভার আমার উপরেই রাখা উচিত।"

ধীরা বলল "তাই ত থাকবে। পুরাকালের সব গল্পে যেমন মানুষের প্রাণ তার নিজের দেহে না থেকে অন্য জিনিষে থাকত, কোনো একটা কৌটতে বা ফুলেতে, আমার আমার প্রাণও তেমনি থাকবে তোমার ভালবাসার মধ্যে। সেটা যদি শুকিয়ে যায় ত আমিও সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাব।"

নিরঞ্জন বলল, "মাটি করলে দেখছি। তোমাকে মিথ্যে করেও একটু কাঁদান যাবে না, খুনসুটি করা যাবে না, অমনি প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।"

"পড়বেই ত। কত সাবধানে চলতে হবে, দেখ তখন।"

যশোদা খানিকদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে, দেখা গেল হঠাৎ। নিরঞ্জন বলল "ওর মুখে ত সহজে হাসি ফোটে না, কি বলছে শুনে এস ত।"

ধীরা উঠে গেল। ফিরে এসে বলল "মহা সমস্যা। যশোদার প্রথম জিজ্ঞাস্য সে এখন তোমাকে জামাইবাবু বলবে না দাদাবাবু বলবে। তুমি ডাক্তারবাবুকে কি বলেছ তা সে শুনেছে, কাজেই তার কোনো সন্দেহ নেই আর। যদিও কাল থেকে তার চালচলন দেখে বোঝাই যাচ্ছে সে সব সন্দেহ তার আগেই দূর হয়ে গেছে। যাই হোক তার আরেক জিজ্ঞাস্য হল যে আজ সে আমার মাকে একখানা চিঠি লিখবে। বহুকাল তাঁকে আমার কোনো খবর জানান হয় নি, তিনি নিশ্চয়ই ভেবে আকুল হচ্ছেন। এই বনগাঁর খোঁজ কেউ জানে না, কাজেই খোঁজ তিনি নিতেও পারেন নি। এখন যশোদা জানতে চায় যে বিয়ের কথাটা সেই কি লিখবে, না আমি আলাদা করে লিখব? এ প্রশ্নের জবাব আমি দিয়ে দিয়েছি ওই লিখুক এখন। আমি ত ভেবেই পাবনা মাকে কি করে এই পুনর্জন্ম লাভের কথা বলা যায়। ও যশোদাই পারবে। তারপর মা চিঠির উত্তর দিলে আমি তখন যা পারি লিখব।

নিরঞ্জন বলল "তা হলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলে দাও যে যেটা তার ভাল লাগে সেইটেই বলুক। মানুষটা ভারি helpful. ওকে একটা ভালমত বখসিস দেওয়া উচিত।

ধীরা আঁৎকে উঠে বলল "ওরে বাবা, অমন কর্ম্মও করো না। ও ভয়ানক অপমানিত হয়ে যাবে তা হলে। পারলে সেই এখন তোমায় বকশিশ দেয় তার দিদিমণিকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে।"

"তাই দিক না হয়। কিন্তু তার সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি দিদিমণিটিকে ফিরে পেতাম না। যা বুদ্ধি আমার, এগোব না পেছব ঠিক করতেই আরও কত দেরী হত কে জানে?

ধীরা বলল "আমি ত তোমাকে খুবই বুদ্ধিমান বলে জানি। সেখানে আবার কি ত্রুটি হল ?"

নিরঞ্জন বলল "যেই তুমি চলে যেতে বললে, অমনি চলে গেলাম অভিমান করে। এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হল ?"

"আর কিই বা করতে পারতে ?

"তোমার কথা না শুনে যদি তোমাকে দু হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে থাকতাম, তা হলে কি তুমি আমার হাত ছাড়াতে পারতে? আমাকে কতখানি ভালবাস তা কি আর আমি জানতাম না? মনই বা তোমার কতক্ষণ শক্ত থাকত? যাকে ছেড়ে পাঁচ ঘণ্টার বেশী বেঁচে থাকাই তোমার অসাধ্য হয়ে উঠেছিল, তার কাছে আত্মসমর্পণ তোমার করতেই হত একটু পরে।"

ধীরা মুখটা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। বলল "তাই কেন করলে না? আমি কতক্ষণই বা পারতাম তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে? আমার সে সাধ্যিই ছিল না। হার আমাকে মানতেই হত।"

নিরঞ্জন এবার কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। বলল "ও কথাটা এরপর চাপা পড়ুক আর আলোচনায় কাজ নেই। যা হবার তা ত হয়েই গেছে, এখন ভুলে যাবার চেষ্টা করাই ভাল।"

যশোদা কোথায় গিয়েছিল, হঠাৎ ধীরা আর নিরঞ্জনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল ড্রাইভার বলছে কাল নাকি আমরা এখান থেকে চলে যাব? ডাক্তারবাবুর ড্রাইভারের কাছে শুনেছে। তা হলে ত জিনিষপত্র গোছাতে হয় আজ থেকে। তোমার জিনিষপত্র আর জামাইবাবুর জিনিষপত্র সব ত মিলে মিশে গেছে। সব ত আবার আলাদা করতে হবে ?"

নিরঞ্জন বলল "অত ঘটা করে আলাদা করে কিই বা হবে? এক সঙ্গেই নিয়ে চল! দিন কয়েকের মধ্যে আবার সব এক জায়গায়ই গিয়ে জুটবে ?"

"তবে এমনিই গুছিয়ে নিই গিয়ে" বলে যশোদা চলে গেল।

একটু পরে ধীরা বলল, "ভাগ্যে যশোদা ছিল। সত্যি ও না থাকলে কি যে করতাম আমি। তোমার সেবাশুশ্রূষাও ভাল করে হত না, আর সংসারের এত কাজই বা কে করত ?"

নিরঞ্জন বলল "ও রত্নটিকে ছেড়ো না ধীরা। আমাদের সংসারে দরকার হবে ?"

ধীরা বলল "ও কি আমায় ছাড়বে নাকি তুমি ভেবেছ ?" আমি ছাড়া সংসারে ভালবাসার মানুষ ওর কেউ নেই।" নিরঞ্জন বলল "আমার সংসারে থাকবার উপযুক্ত লোক। তোমাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে, এ বিশ্বাস না থাকলে আমার জায়গা হবে না।"

ধীরা হাসল, বলল "আচ্ছা দেখাই যাক্ বাড়ীর কর্তারই কতদিন এ বিশ্বাস থাকে।"

নিরঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, বলল "দেখ যত খুসি। ফেল করব মনে হয় না। এখন সম্প্রতি মাথায় আর কপালে হাত বুলিয়ে দাও দেখি, একটু শুয়ে নিই। কাল থেকে ত প্রেমালাপ করবার খাতিরে বসেই কাটাচ্ছি। খুব বেশী ক্লান্ত নিজেকে করে ফেলা ঠিক নয়। আসচে কাল ত গাড়ীও চালাতে হবে খানিকক্ষণ।"

নিরঞ্জন শুয়ে পড়ল! ধীরা পাশে বসে তার কপালে হাত বুলতে লাগল। বলল "নার্সের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

নিরঞ্জন বলল "ওটুকু কাজ চিরকালই থাকবে। তোমাকে না খাটিয়ে ছেড়ে দেব নাকি?

(২০)

যশোদা চিরকালই খুব ভোরে ওঠে, আজ একেবারে শেষ রাত্রে উঠে পড়েছে। আজকে শহরে ফিরতে হবে ত? কাল অনেক রাত অবধি কাজ করে সে সব জিনিষপত্র গুছিয়েছে। কিন্তু সব ত আর আগে সারা যায় না? রাত্রে বিছানা পেতে শুতে হবে, সে ত আগে ভাগে বেঁধে রাখা যায় না, কতক্ষণে শহরে পৌছবে, রান্না করবে, তবে ত দুটি ভাত পড়বে পেটে? কাজেই চায়ের বাসন-কোষণও বাইরেই রইল।

যশোদা একেবারে নীরবে কাজ করতে পারে না। একটু খুটখাট হলই। ফলে ধীরা আর নিরঞ্জন দুজনেই জেগে গেল। দুজনেই উঠে পড়ে হাতমুখ ধুয়ে চাতালে বেরিয়ে

এল। নিরঞ্জন বলল "আজ দেখি যশোদা নিজেকেও surpass করছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ল কেন ?'

ধীরা বলল, 'বেরুতে হবে ত চা খেয়েই ? তারই তোড়-জোড় করছে আর কি ? তা ছাড়া বিছানা বাঁধা আর কিছু কিছু বাসন-কোষণও গোছাতে হবে বোধহয়।

নিরঞ্জন বলল "আমার ছোকরাটাত গিলে আর ঘুমিয়ে এমন চেহারা করেছে যে এরপর নড়তে চড়তে পারলে হয়।"

ধীরা বলল, "যশোদার ঐ বড় দোষ। নিজে যে পরিমাণে খাটে অন্যকে সেই পরিমাণে বসিয়ে রাখে। আর কেউ কাজ করছে দেখতে ওর ভাল লাগে না, কারণ ওর পছন্দ মত কাজ কেউ করতে পারে না। কাজেই ওর পাশের লোকগুলো সব বাদশা কুঁড়ে হয়ে যায়।"

নিরঞ্জন বলল, "আমার বাড়ীতে সে ব্যবস্থা চলবে না। কতগুলি কাজ আছে যা তোমাকেই করতে হবে, সেখানে ঝি চাকরের সাহায্য চলবে না।"

ধীরা জিজ্ঞাসা করল, "কি সে কাজগুলি ?"

"এই আমাকে লালন পালন করার কাজ। ওটা এত সুন্দর করে কর তুমি, যে ভাবছি নিজে একেবারে অক্ষম হয়ে গিয়ে পড়ে পড়ে তোমার সেবা যত্ন নেব শুধু।"

ধীরা বলল, "বেশ চমৎকার প্ল্যান। সংসারটা চলবে তবে কেমন করে ? আমিও কাজ করব না এবং তুমিও শুধু শুয়ে থাকবে।"

"সংসার চলার ব্যবস্থা অবশ্যই একটা হবে। কিন্তু যশোদা ডাকছে যে শুনতে পাচ্ছ না। ওর চায়ের জোগাড় হয়ে গেছে বোধহয়।"

দুজনে ঘরে ঢুকল তারা চা খাবার জন্যে। নিরঞ্জন বলল, "আজ এত এলাহি কারখানা কেন ? অন্যদিন ত রুটি, মাখন আর ডিম দিয়েই সারা হত।"

যশোদা জবাব দিল, "আজ কি আর ঐ দুখানা টোষ্ট রুটি দিয়ে চা খেয়ে বেরনো চলে ? কতক্ষণে শহরে পৌঁছব, ঘরদোর সাফ করব, উনুন ধরাব, রান্না করব তবে ত পেটে দুটো ভাত পড়বে। সেই যার নাম বেলা দুটো। তাই ভাবলাম খানকয়েক লুচিই করি, ভাজাভুজি দিয়ে খেয়ে নাও, ক্ষীর দিয়েও দুখানা খাও।"

বাস্তবিক সে এত লুচি ভাজা আর ক্ষীর এনেছে যে শুধু নিরঞ্জন আর ধীরা নয়, বাড়ীর চাকর-বাকর জমাদার সকলেরই খাওয়া হয়ে যেতে পারে।

নিরঞ্জন বলল, "এলাহাবাদ পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশী লাগবে বলে মনে হয় না। দশটাতে বেরলেও বারোটার মধ্যে পৌঁছব এবং তার ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই তোমার দিদিমণি ভাত মাছের ঝোল খেতে বসে যাবেন সন্দেহ নেই। তোমার ত ম্যাজিক জানা আছে এর বেশী সময় তোমার লাগবে না। আমারই হবে মুস্কিল, আমার পাচকটি একে ত রান্নাবান্না কিছু জানে না, তার উপর এখানে শুধু বসে বসে খেয়ে এবং ঘুমিয়ে এমন আয়েসী হয়েছে নড়তেই পারে না। আর বাড়ীর যা অবস্থা গিয়ে দেখব তা কল্পনা করতেই পারছি। সব কটা ঘরে মানুষের সমান উইয়ের ঢিপি হয়েছে এবং লম্বা লম্বা ঝুলের দড়ি অজগর সাপের মত ছাদ থেকে মেঝে অবধি ঝুলছে। এ সব পরিষ্কার করে ও যে আজ আর কিছু রান্না করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজেই যশোদার লুচি করবার ব্যাপারটা আমার পক্ষে বড়ই মূল্যবান হয়েছে, কারণ এই খাওয়ার পর আর কিছু খাবার জোটার সম্ভাবনা কম।"

ধীরা বলল, "ওমা, কি কাণ্ড। এই রকম করে ও সংসার চালায় নাকি ? রোজ খেতে পাও ত, না তাও পাও না ?"

যশোদা বলল, "ও ছোঁড়া যা কুঁড়ে, ও আবার ভাল করে খেতে দেবে। তা আপনি ওর সঙ্গে যাবেই বা কেন এখন ? শহরে পৌঁছে ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও জিনিষপত্র সমেত। সে গিয়ে ঘরদোর সাফ করুক। আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে, একেবারে নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করে চা খেয়ে তবে যাবে। ইচ্ছে করলে রাত্রের খাওয়াও খেয়ে যেতে পারবে। আমাদের ত সকাল সকালই হয়ে যায়।

ধীরা বলল, "ঠিক কথাই বলেছে যশোদা। এই ত সবে উঠলে রোগ থেকে, এখনই এমন অনিয়ম করলে চলে কখনও ?"

নিরঞ্জন বলল, "লোভ দেখিও না বেশী, শেষে সত্যিই তোমার বাড়ী গিয়ে উঠব।"

ধীরা বলল, উঠবেই ত। এত কষ্ট করে সারালাম, আবার গিয়ে শোও আর কি ? আর লোকে যদি কিছু

বলে বলুক। বলবার মত কাজ যে কিছু করি নি তা ত নয়? লোক-মতকে অগ্রাহ্য করলে তার জন্যে খেসারৎ কিছু দিতেই হয়। তার জন্যে তৈরিই আছি।"

যশোদা আবার রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে সশব্দে জিনিষ গোছাচ্ছিল। নিরঞ্জন বলল, "দুর্নাম কিনে এখন কি অনুতাপ হচ্ছে?

ধীরা বলল, "না বাপু। কথায় বলে "যাক প্রাণ, থাক মান।" আমার তার উল্টো অবস্থা হয়েছিল, এবং সে অবস্থার এখনও অবসান হয় নি। অর্থাৎ ঠিক করেছি, "যাক মান থাক প্রাণ।"

যশোদা আবার এসে আবির্ভূত হল, বলল "এইবার উঠে পড়গো দিদিমণি, তৈরি হয়ে নাও। আমার সব গোছান হয়ে গেছে, খালি এই বাসন কটা ধুয়ে তুলব, আর দাদাবাবুর ছোকরাটাকে আর দরোয়ানটাকে ডেকে বিছানাগুলো বেঁধে ফেলব। সারাপথ ত ঘামতে ঘামতে যাব, ওখানে গিয়ে চান করতেই হবে, এখানে আর ও সব হাঙ্গাম করে কাজ নেই।"

যশোদা বাসন নিয়ে চলে গেল, আর দুজন গিয়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকল, পথে বেরবার জন্য প্রস্তুত হতে।

বাইরের দিকের বারান্দায় তখন শোকসভা বসে গেছে। দরোয়ান মাথা নীচু করে বসে চোখ মুছছে মেথর ছোকরা হাপুসনয়নে কাঁদছে। প্রতিবেশী এখানে বেশী নেই, তবু যা দুচারজন আছে তারাও এসে জুটেছে সাহেব আর মেম-সাহেবকে বিদায় জানাতে। নিরঞ্জন সাজসজ্জা করে বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলল এবং খুব দরাজ হাতে যোগ্য অযোগ্য নির্ব্বিশেষে সকলকে বখশিস দান করে শোকের আবহাওয়াটা ভাল করেই কাটিয়ে দিল।

ধীরাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল এবং পিছন থেকে বলল "ও কি এ রকম হরির লুট লাগিয়েছ কেন?"

নিরঞ্জন বলল, "বহুকাল পরে নিজে অত্যন্ত বেশী খুশি হয়েছিলাম, তাই এদের একটু খুশির ভাগ দিচ্ছি।"

এরপর জিনিষপত্র গাড়ীতে তোলা আরম্ভ হল। ধীরার এবং নিরঞ্জনের গাড়ী দুটো ছোটই, নিতান্তই একলা চলার গাড়ী। অথচ এলাহাবাদ থেকে বারে বারে এত রকম এত জিনিষ এসে জমা হয়েছে যে ছোটখাট একটা পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে লটবহরের স্তূপ। যে লরীটার সঙ্গে নিরঞ্জনের গাড়ীর ধাক্কা লেগেছিল, তার চালকটি এই গ্রামেরই লোক, রোজই ডাকবাঙলার দরোয়ানের কাছে আসত আড্ডা দিতে। সে ভাল ভাড়া পেলে বেশীর ভাগ জিনিষপত্র শহরে পৌছে দিতে রাজী হয়েছিল। সেও এখন লরী নিয়ে উপস্থিত হল। সব জিনিষই প্রায় লরীতে উঠল। ধীরার গাড়ীতে যশোদার সঙ্গে চলল যত কাঁচের বাসন, ধীরার কাপড়-চোপড়ের স্যুটকেস আর যশোদার টিনের বাক্স। নিরঞ্জনের ছোকরাও নিজের পোঁটলা নিয়ে যশোদার সঙ্গে যেতেই আগ্রহ দেখাল। সাহেবের সঙ্গে এক গাড়ীতে গেলে এই দীর্ঘপথ তাকে মুখ বুজে বসে থাকতে হবে, এ গাড়ীতে গেলে সেদিক দিয়ে সুবিধে আছে। যশোদা বকতেও পারে যত, অন্য লোককে বকাতেও পারে তত।

নিরঞ্জন আর ধীরা গাড়ীতে বসার আগে সারাবাড়ীটা একবার ঘুরে এল। ধীরা বলল "আমাকে যদি কেউ এক দিনের জন্যে রাজা করে দেয়, তাহলে আমি সবার আগে এই ভাড়া বাড়ীটা কিনে নিই।"

নিরঞ্জন বলল "এটা নিয়ে কি করবে? Museum বানাবে?

ধীরা বলল "তা কেন? এখানে একটা সেবায়তন হবে। যে সব মানুষকে দেখবার দুনিয়ায় কেউ নেই, তারা এখানে আশ্রয় পাবে, সেবা যত্ন পাবে।"

নিরঞ্জন বলল "ভাল প্রস্তাব। রাজা না হয়েও এটা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।"

বাইরের থেকে যশোদা ডেকে বলল "চলে এসগো দিদিমণি। বেশী রোদ হয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে তোমার।"

দুজনে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। সবার আগে চলল জিনিষ-বোঝাই লরী, তার পিছন পিছন দুটো গাড়ী। নিরঞ্জনের চাকরটার মন বড় খারাপ, এ কটা দিন সে বড় আনন্দে কাটিয়েছে, কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে হয়নি, চমৎকার খাওয়া-দাওয়া করেছে, আর প্রাণ ভরে গল্প করেছে। শহরের বাড়ীতে তাকে দিনরাত মুখ বুজে খাটতে হয়, আর পান থেকে চুন খসলেই সাহেবের বকুনি খেতে হয়। দরোয়ান আছে বটে একটা, ত সেটা নিজেকে একেবারে বাদশাজাদা মনে করে, কোন কাজে সাহায্য করে না এবং প্রায় কোন কথার উত্তর দেয় না।

যশোদা বলল "কি যে বলিস। দাদাবাবু আবার কাউকে বকতে জানে নাকি? কাউকে ত একটা উঁচু গলায় কথা বলতেও শুনিনি।"

ছোকরা বোঝাল যে এখানে সাহেব এমন খোশ মেজাজে ছিলেন যে কাউকে বকবার কথা তাঁর মনে হয়নি! এবার শহরের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে আবার নিজের মূর্ত্তি ধরবেন।"

যশোদা বলল, "ঘরে বউ গেলেই আর বকাবকি করবে না, মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

ছোকরা দন্তবিকশিত করে হেসে জানাল যে সাহেবের আসন্ন বিবাহের কথাটা তার জানা আছে। আর ডাঃ মিস সাহেবের মত ভাল বউ ঠিক হওয়াতে তারা সবাই খুব খুশি।

আরও খুশি হল শুনে যে যশোদা দিদিও বউয়ের সঙ্গে তার ভাবী বাড়িতে গিয়ে অধিষ্ঠিত হবে, কাজেই ভাল ভাল রান্না খাওয়াটা তার কায়েমীই হয়ে থাকবে।

গাড়ীগুলো খুব জোরে চলছিল না, কাজেই শহরে পৌঁছতে প্রায় বারোটা বাজল। নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকে স্বাগত জানাতে হাঁসপাতাল শুদ্ধ বেরিয়ে আসবে না ত?"

ধীরা বলল, "সবাই আসবে না, দু একজন আসতে পারে, ঐ সময়টায় ত সব কাজ full force এ চলে; ছুটি হয় সাড়ে বারোটারও পরে। চঞ্চলা আসবে হয়ত। আর আসে যদি তাতেই বা কি? আজ না হোক কাল ত দাঁড়াতেই হবে সবার সামনে? আমার নিজের কিছু অপ্রস্তুত লাগবেনা, তোমার কথা জানিনা।"

নিরঞ্জন বলল "আমার অপ্রস্তুত লাগতে যাবে কেন? আমি ত আগাগোড়া ভাল ছেলের পার্ট করেছি। লজ্জা পাবার মত কিছু করিনি। তবে তোমার অন্যায় আচরণগুলোর বাধা দিইনি অবশ্য।"

ধীরা বলল "বাধা দিতে আরম্ভ ত করেছিলে, ভাগ্যে "কান্না অস্ত্র" ব্যবহার করে তোমায় থামালাম।"

এখন অবধি রোদটা খুব চড়া হয়নি, হাওয়াও দিচ্ছে বেশ। ধীরা বলল "এমন সুন্দর রাস্তাটা, আশ্চর্য্য যে আসবার সময় একবারও চেয়ে দেখিনি। কোথায় ভাঙা গাড়ী দেখব, সেই আশঙ্কায়ই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল।"

নিরঞ্জন বলল "আমিও দেখিনি। চর্মচক্ষু দুটো কি যে দেখছিল জানি না, অতবড় শরীটাকেও দেখতে পেলাম, আর মানস-চক্ষে ত খালি অতীতের ছায়াচিত্রই দেখেছি, কাজেই গাড়ীচাপা পড়ব সে আর আশ্চর্য্য কি?"

আশ্চর্য্য মানুষ বাপু তুমি। একবার খোঁজও নিলেনা যে বোকা মেয়েটার কি হল। রোষই না হয় করেছিলাম, তাই বলে এতটা কঠিন হতে হয়না।"

নিরঞ্জন বলল "অপমানিত ভালবাসা মানুষকে কঠিনই করে তোলে। আমি যদি তুমি হতাম, আর তুমি আমি হতে তাহলে কি আর কঠিন হতেনা?"

ধীরা বলল, "হতাম হয়ত কিন্তু কতক্ষণই বা থাকতে পারতাম কঠিন হয়ে? আমার মনের সে জোর নেই।"

পিছনে ধীরার গাড়ীটা কঁ্যাচ করে থেমে গেল। তার টায়ারে কি একটা গোলমাল হয়েছে। নিরঞ্জন নামল তদারক করতে, ধীরাও নেমে এসে তার পাশে দাঁড়াল। যশোদা চটেই গেল। নাও এই চড়চড়ে রোদের মধ্যে এখন এখানে বসে থাকি। বেলা বাড়ছে না কমছে? আমি বলে মিনিট গুণছি কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছে স্নান করে রান্না চড়াব, না দিলে ঘ্যাচাং করে গাড়ী থামিয়ে। হয়েছেটা কি শুনি?"

নিরঞ্জন বলল "হয়েছে বেশ কিছু। এই টায়ারে ত চলবেনা এখন, এটা শহরে নিয়ে গিয়ে সারাতে দিতে হবে। spare tyreটা বার করে লাগাও, খানিকটা সময় নষ্ট হল আর কি?"

ধীরা যশোদার লাল থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল "ও জিনিষপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুক, দেরি করলে সত্যি ওরও যত অসুবিধা, আমাদের অসুবিধা তার চেয়ে বেশী। ড্রাইভার টায়ার বদলাক, তোমার ছোকরাটা থাকুক ওকে সাহায্য করতে আমরা এগোই।"

সেই ব্যবস্থাই হল। যশোদা পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে এসে নিরঞ্জনের গাড়ীতে উঠল। ছোকরা কাতর মুখে থেকেই যেতে বাধ্য হল। তার দুঃখ কেউ বুঝল না।

এইবার ধীরা ও নিরঞ্জন শহরের কাছাকাছি এসে পড়ল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে বাড়ীঘর। ধীরা বলল আবার খাঁচার পাখী খাঁচায় ফিরে চললাম।"

নিরঞ্জনের সামনে যশোদা আজকাল আর বড় একটা মুখ খোলেনা। কিন্তু কথাটা ভাল না লাগায় সে বলে বসল কে জানে দিদিমণি, তোমাদের কেন এত বন-বাদাড় ভাল লাগে। শহরে থাকার সুবিধা কত। খাওয়া বল, শোওয়া বল, কোন্ সুবিধাটা এখানে নেই? পাড়াগাঁয়ে কোন দুঃখে যে মানুষ থাকে, তা জানিনা বাপু। জীবন যেতে বসে কথায় কথায়।"

ধীরা হেসে বলল "আজন্ম শহরে বাস করে করে আমার শহরে অরুচি ধরে গেছে।"

যশোদা বলল "তা হবে হয়ত ঐ জন্যেই আমার পাড়াগাঁ ভাল লাগে না। ছোটবেলায় কম দুঃখ পেয়েছি আমরা?"

নিরঞ্জন বলল আমি খাঁচার পাখী বা বনের পাখী কারো দিকেই পুরোপুরি মত দিতে পারলাম না।"

ধীরা বলল "তোমারও বুঝি যশোদার মত শহর ভাল লাগে?"

নিরঞ্জন বলল, শহরে যে সুখসুবিধাগুলো পাওয়া যায়, তা ভালই লাগে।"

গাড়ী এবারে শহরের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। নামবার আশায় যশোদা এবার গুছিয়ে গাছিয়ে বসল। ধীরা বলল "আমার ড্রাইভারটার বুদ্ধিশুদ্ধি ত বেশী নেই, কি করছে, কে জানে?"

যশোদা বলল তবু ভাগ্যে জিনিষপত্রগুলো নিয়ে এসেছি না হলে কত অসুবিধায় পড়তে হত কে জানে।

এরপর হাসপাতালের এলাকায় এসে পড়তে খুব বেশী দেরি লাগলনা। জিনিষ বোঝাই লরীও এসে গেল।

নিরঞ্জন বলল "নাও এই পাহাড় প্রমাণ জিনিষপত্র নামায় কে? আমাকে দিয়ে এসব কাজ এখন চলবেনা, আমি এখনও invalid, ড্রাইভার আর ছোকরাটা থাকলে খানিক সাহায্য হত। এখন আবার কুলী ডাকতে যায় কে?"

যশোদা নেমে পড়ে বলল "কুলী আবার ডাকতে যাবে কেন? হাসপাতালের দারোয়ান আর বেয়ারাগুলো ত এ সময় দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে খালি পা নাচায়। ওদের বললেই আসবে। দিদিমণি এসেছে শুনলেই আসবে, আমি বলছি ওদের," বলেই সে হনহন করে দরোয়ানদের ঘরের দিকে চলে গেল।

ধীরার যে চাকরটা এতদিন বাড়ী আগলে ছিল, সে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে যে কটা জিনিষ ছিল, তা নামিয়ে দিল। নিরঞ্জন আর ধীরা বারান্দায় উঠে সেখানে পাতা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। দেখা গেল, গোটা পাঁচছয় বেয়ারা আর দরোয়ান যশোদার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, আর তাদের আগে ছুটতে ছুটতে আসছে চঞ্চলা।

ধীরা বলল "তোমার বোনের খুব টান আছে বাপু তোমার উপর। ওর কাছেই যা খবরাখবর পেতাম।"

চঞ্চলা এসে ধপ্ করে নিরঞ্জনের পাশে বসে পড়ল। বলল "যা হোক ঘাবড়ে দিয়েছিলে বাবা। কোথায় কোন্ বনগাঁয়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে পড়ে রইলে, আমরা ভেবে মরি।"

নিরঞ্জন বলল, 'খুব যে ভেবেছ তা ত চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না, বেশ ত গোলগাল রয়েছ।"

চঞ্চলা বলল "তা খুব বেশী ভয় পাইনি। জানলাম যখন যে মিস রায় গিয়ে পড়েছেন, তখন বুঝলামই যে সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ে আসবেন।"

লরী থেকে এখন স-রবে জিনিষপত্র নামান হতে লাগল। ধীরা উঠে গেল সেসব গুণে গেঁথে নিতে, যদিও তার যাবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, যশোদা সেখানে অতি সাবধানে খবরদারি করছিল। কিন্তু ধীরার মনে হল চঞ্চলা নিরঞ্জনকে কিছু বলতে চায়, তবে ধীরার সামনে বলতে চায় না।

সে উঠে যেতেই চঞ্চলা বলল "ঝগড়াঝাঁটি সব মিটে গেছে ত?"

নিরঞ্জন হেসে বলল "তোমার কি মনে হয়? ভাল করে ঝগড়া করব বলে এখানে তার সঙ্গে তার বাড়ীতে এসে উঠেছি?"

চঞ্চলা বলল 'মনে হয় ত বেশ ভাল কথাই! দুজনেই হাসিমুখে এসেছ। আর মিস রায়ের ত মনে হচ্ছে পুনর্জন্ম হয়েছে। তা উনি বাসা বদল করছেন কবে? আমরা একটু লুচি পোলাও খাব না?"

নিরঞ্জন বলল "তা খাবে বৈকি। ধীরার মা বাবারা এসে পৌঁছন আগে, তাঁদের বাদ দিয়ে ত কিছু করা যায় না?"

ধীরা এসে বলল "চল ভিতরে গিয়ে বসি। যশোদা বলছে যে সে ওখান থেকে আম পুড়িয়ে এনেছে, এখনি সরবৎ করে দেবে, আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ভাতে-ভাত খাইয়ে দেবে।"

তিনজন গিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যশোদা ট্রের উপর শরবতের গেলাস নিয়ে এসে হাজির হল। ট্রে শুদ্ধ নামিয়ে বলল "খাওয়া হলে এইখানেই নামিয়ে রেখ, ছোকরা এসে নিয়ে যাবে! আমি যাই চট করে চানটা করে নিই' বলেই চলে গেল।

শরবৎ খেতে খেতে চঞ্চলা বলল "মিস রায়ের কপালটা খুব ভাল। হাতে যা আসে তা খুব ভাল জিনিষই আসে!"

ধীরা একটু হেসে বলল "হ্যাঁ তবে মাঝে মাঝে হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাবার জোগাড়ও করে।"

নিরঞ্জন বলল "ভাল করে ধরলে আর বেরিয়ে যাবে কোথায়? জিনিষগুলোরও ত একটা রুচি বলে বস্তু আছে? ভাল হাত থেকে পিছলে আবার কোন্ ঘোলা জলে পড়বে?

সমাপ্ত

পাড়াগাঁয়ের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র পূর্ব্বে প্রবাসীতে "পাড়াগাঁয়ের কথা" নিয়মিতভাবে লিখিতেন। নিজগ্রাম হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া পাড়াগাঁয়ের সামাজিক পারিবারিক অবস্থা সুখ, দুঃখের কথা বর্ণনা করিতেন। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক প্রতি মাসে তাঁর প্রবন্ধ পড়িবার জন্য অধীর আগ্রহে থাকিতাম। আজ বর্দ্ধমান জেলার একটি পাড়াগাঁয়ের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা প্রবাসীতে লিখিতে সাহসী হইতেছি। প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পল্লী-অনুরাগী ছিলেন। আমার লিখিত "জাড়গ্রাম" ও "জাড়গ্রামের কালু রায়" দুইটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। জাড়গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমার জামালপুর থানার অন্তর্গত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাঢ়ের একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। বহু ধনী, উচ্চ-শিক্ষিত, রাজকর্ম্মচারী ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর আবাসভূমি ছিল এই জাড়গ্রাম। আজ বনজঙ্গলাকীর্ণ জনবিরল গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দু রাজত্বকালে রাজবাড়ীর ও গড়খাইয়ের চিহ্ন আজিও এখানে বর্ত্তমান। ইহা ব্যতীত কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, বাসুলীমঙ্গল, কবি রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল বা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে এই জাড়-গ্রামের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার বাংলা ভাষার ইতিহাসে উক্ত প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থ হইতে জাড়গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। জাড়-গ্রামের বিখ্যাত ধর্ম্মরাজ কালু রায়ের মন্দিরে আজিও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বার দিন ধরিয়া ধর্ম্ম পুরাণের গীত হইয়া গাজন উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জাগ্রত দেবতা কালুরায়ের বর্ণনা রহিয়াছে কবি রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল বা ধর্ম্ম-পুরাণের ২য়, ৩য় পৃষ্ঠায়—যথা:

জাড়গ্রাম বড় স্থান ধর্ম্ম যথা অধিষ্ঠান,
দয়ার ঠাকুর কালু রায়

*   *   *

ধর্ম্মগৃহ মনোহর, সম্মুখেতে দামোদর
সদাই সঙ্গীত হয় নাটে।

*   *   *

জাড়গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালু রায়
যাহার কৃপায় কবি রামদাস গায়।

*   *   *

কবি রামদাস আদক জাড়গ্রামের কালু রায়ের বরে মূর্খ রাখাল বালক হইয়াও বিখ্যাত অনাদিমঙ্গল কাব্য রচনা করেন—"আজি হইতে রামদাস কবিবর তুমি, জাড়গ্রামে বাস কালুরায় আমি।" কিংবদন্তী আছে যে "দিল্লীড়ের কালু রায় জাড়গ্রামে বাড়ী, জ মাজোড়া হাদা ঘোড়া উত্তম পাগড়ি'। হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামের সন্নিকট দিল্লীড়ে কালুরায়ের ভগ্ন মন্দির ও পুষ্করিণী আজিও বর্ত্তমান।

এই গ্রামে ১৮৯৮ সালে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিবেচক কর্ম্মীর অভাবে বহু মূল্যবান পুস্তকসহ গ্রন্থাগারটির বিলুপ্তি ঘটে। পুনঃ সন ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তখনকার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর (বর্ত্তমানে ৯ম শ্রেণী) ছাত্র শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকালি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় মাত্র ১৫ খানি সংগৃহীত পুস্তক লইয়া ৺মন্মথনাথ বসুর বহির্বাটিতে একটি অস্থায়ী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে ৺মন্মথ-নাথ বসু, ৺মাখনলাল দে, ৺জ্ঞানকাপ্রসাদ দেব প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। ৺মাখন-লাল দে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, দেশপ্রেমিক, ঋষিকল্পচরিত্র ব্যক্তি।

অবশেষে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২১ সালের ৪ঠা জুলাই) গ্রামস্থ জনসাধারণ এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া আদর্শ চরিত্র ৺মাখনলাল দে মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য গ্রন্থাগারটির নামকরণ করেন—"জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার"। এই সভায়

শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক ও ৺জানকীপ্রসাদ দেবকে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করেন গ্রামবাসী। ৺মাখনলাল দে'র আংশিক অর্থানুকূল্যে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলটি স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিত্যক্ত গৃহটিকে সংস্কার করিয়া উক্ত গৃহে পাঠাগারটিকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন কর্ম্মীবৃন্দ।

প্রথমে গ্রামবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্ত লইয়া প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার কার্য্যধারা ব্যাপকতর হইয়া পড়ে ও ডাক, মিউজিয়াম, অনুসন্ধান, জনসেবা, ব্রতচারী, ব্যায়াম, প্রাথমিক চিকিৎসা, নৈশ বিদ্যালয়, সান্ধ্যসভা, জনরঞ্জন বিভাগ, বীজভাণ্ডার, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়া পাঠাগারটি আজ পল্লীর শ্রেষ্ঠ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এই পল্লী পাঠাগারটি পরিদর্শন করিয়া ইহার ব্যাপক কার্য্যধারার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন ও উহা একটি বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস রচনা ও গবেষণার সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মন্তব্য করেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী সম্পাদক ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ সম্পাদক ৺জলধর সেন, পূজ্যপাদ ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ ও সাহায্য-পুষ্ট।

জাড়গ্রামের এক ভগ্নস্তূপে ১০৪২ শকাব্দের এক মূল্যবান পোড়ামাটির ইষ্টকফলক পাওয়া গিয়াছে এবং উহা পাঠাগারের মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিভিন্ন বিভাগে বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে এই পল্লী প্রতিষ্ঠানটি, ইহার ব্যায়াম বিভাগ, শিল্প বিভাগ, সেবা বিভাগ, প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগ, জনরঞ্জন, বিভাগ প্রভৃতির কার্য্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠাগারের শিশু-বিভাগের ছেলেমেয়েদের ও শিল্প বিভাগের মহিলাদের হস্তশিল্প ও সূচীশিল্প বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পুনঃ পুনঃ পুরস্কৃত হইয়াছে। পাঠাগারের মিউজিয়মে প্রাচীন শিল্পদ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, পুঁথিপত্র, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, ডাক টিকিট, চিত্র, মানচিত্র, সচিত্র প্রাচীরপত্র, প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য মাসিক পত্রাদি, অসংখ্য শিক্ষণীয় দ্রব্য-সম্ভার সযত্নে সজ্জিত আছে। গবেষকগণের প্রয়োজনীয় বহু গবেষণার বস্তু এখানে রক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত পাঠাগারের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের কার্য্যকলাপও উল্লেখ-যোগ্য। আদিবাসী কোড়া পল্লীতেও একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বিভিন্ন উপায়ে নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে এই স্থানে ব্যাপক ভাবে বক্তৃতা, অভিনয়, গানবাজনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে। পাঠাগারে একটি উচ্চাঙ্গের বেতার-যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পাঠাগারটি ১৯৫৮ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত "রুর্যাল লাইব্রেরী"তে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওনকে নিয়মিত ভাবে মাসিক ৮০৲ ও ৪৫৲ টাকা বেতন দিয়া থাকেন ও পাঠাগারের নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত মাসিক ৫০ টিঃ প্রদান করেন। পাঠাগারের নূতন ভবন নির্ম্মাণের জন্ত এককালীন তিন হাজার টাকা সরকার প্রদান করেন। উক্ত টাকার ও গ্রামবাসিগণের সাহায্যে পাঠাগারের একটি নূতন ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন ভবনটি জীর্ণ হওয়ায় নাগপুর ও বেরারের অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ জাড়গ্রাম নিবাসী রায়বাহাদুর ৺গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় তিন হাজার টাকা দান করেন। তাঁহার আর্থিক সাহায্য ও বিভিন্ন গ্রামবাসিগণের সাহায্যে পুরাতন গৃহটি নূতন ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহটির "গোষ্ঠবিহারী ভবন" নামকরণ করা হয়। বর্ত্তমানে উভয় ভবনেই পাঠাগারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারকল্পে পাঠাগারের লেনদেন চলিতেছে পার্শ্ববর্ত্তী আটটি পল্লীতে। উক্ত ৮টি পল্লীতে ইহার শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে"র বর্দ্ধমান অধিবেশনে প্রশংসা-পত্র অর্জ্জন করিয়াছিল মাখনলাল পাঠাগারের প্রদর্শনী বিভাগ। গত বৎসরে চকদিঘী সারদাপ্রসাদ অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জামালপুর থানা উন্নয়ন সংস্থা কর্ত্তৃক আয়োজিত এক বিরাট কৃষি-শিল্প-শিক্ষা প্রদর্শনীতে জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং বর্দ্ধমানের জেলা শাসক শ্রীমেনন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বর্দ্ধমান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান্ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পাঠাগারের ষ্টল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

মাখনলাল পাঠাগারের সরস্বতীপূজা ও তদ্‌উপলক্ষে সহস্রাধিক দরিদ্র নর-নারায়ণসেবা, শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রদর্শনী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এছাড়া নববর্ষ উৎসব, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের জন্মবার্ষিকী পাঠাগারে আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক পাঠের বিচিত্র ব্যবস্থা আছে ইহার নিঃশুল্ক পাঠককে আর এইখানে দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা রক্ষিত আছে। সভ্যবৃন্দের চাঁদা ও দান, জাড়গ্রাম গ্রামসভা, বর্ধমান জেলা পরিষদ ও সরকার বাহাদুরের আর্থিক সাহায্য পাঠাগারের প্রধান আয়। প্রত্যহ বেলা ১ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুস্তক লেন-দেন ও পুস্তক পাঠের জন্য পাঠাগার খোলা থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক পূর্ণ ছুটি ও শুক্রবার অর্দ্ধ ছুটি থাকে।

ছাত্র ও মহিলা সহ পাঠাগারের বর্ত্তমান সভ্য-সংখ্যা ১৬২ জন ও সভ্যগণের চাঁদার হার শ্রেণী হিসাবে মাসিক ২৫ ও ৫০ পয়সা। ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র, ও গরীব গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে চাঁদা লওয়া হয় না।

পাঠাগারের পুস্তক সংগ্রহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার মিউজিয়াম ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পত্রিকা, ও দলিলপত্র ইহাকে গবেষণা গ্রন্থাগারে পরিণত করিয়াছে। বর্ত্তমানে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ৩,৮৫৭, মাসিক পত্রাদির সংখ্যা ৫,৮৬৭ খানি। গত বৎসরে মোট ৬,৭৮৫ খানি পুস্তকাদি পঠনার্থে সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। ১৯৩৬ সাল হইতে এই পল্লীর শিক্ষায়তনটি "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের" অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। এবং পরিষদের কার্য্যকরী সমিতিতে বর্ধমান জেলার প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটি "বঙ্গীয় জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ", "বর্ধমান যুব-কল্যাণ সমিতির" অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর পাঠাগারের শিশুবিভাগের সভ্যগণ শারীরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। পাঠাগারের পরিচালনায় ৫টি প্রতিযোগিতা ক্রীড়া ও ২টি শৈত্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে প্রতি বৎসর।

১২৩৫ সালের ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হাতে-লেখা চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবত ১২৩৩ সালে ছাপা শ্রীমদ্ভাগবত সার (মাধবাচার্য্য); ১২৪৭ সালে ছাপা "শিশুসেবধি" "পদকল্পতরু", (জগন্নাথ দাস, ১২৯৯); বসুমতী প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত "উপন্যাস ভাণ্ডার", ১২৮৭ সালের নাটক; ১২৯১ সালের এক পৃষ্ঠায় ছাপা পঞ্জিকা; এ্যান এ্যাটলাস অব হিন্দু এ্যাষ্ট্রনমি, পপুলার এডিশন অফ্ এসিয়াটিক রিসার্চেস (১৭৭৪—১৭৮৮); বঙ্গদর্শন মূল, ভারতী, প্রচার, অবসর, সবুজপত্র প্রভৃতি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ।

মাখনলাল পাঠাগারের বর্ত্তমান সভাপতি জামালপুর থানার বি, ডি, ও, শ্রীদেবকনাথ বসুঠাকুর; সহ-সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত; সম্পাদক শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়; যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসচ্চিদানন্দ পণ্ডিত, গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় (ট্রেনিং প্রাপ্ত)।

জগদীশ্বরের কৃপায় ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই পল্লী-প্রতিষ্ঠানটি বর্ধমান জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

ইতিহাসের উপাদান

হাসিরাশি দেবী

বাংলার নিম্নাঞ্চল, বা তার কাছাকাছি স্থানের সম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে তা কেবল একটিমাত্র নির্দিষ্ট স্থান খুঁজলেই পাওয়া যাবে না; তার চারপাশে এমন অনেক অখ্যাত, এবং প্রায় অজ্ঞাত স্থানেও জানবার মত ঐতিহাসিক মাল-মশলা ছড়ানো আছে, যা সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ও শ্রমসাধ্য।

তবু, এ কাজে যদি কেউ ব্রতী হন, তিনি দেশের ও দেশবাসীর কাছে ধন্যবাদার্হ।

পশ্চিম বাংলার শেষ সীমায়, আজও যে বাংলার ইতিহাসের ছিন্নপত্রগুলি ছড়ানো ও ছিটানো আছে, সেগুলি একযুগের নয়। একই ধর্ম এবং একই সংস্কৃতি সেখানকার জন-জীবনকে শাসিত করে নি।

হিন্দু বৌদ্ধ ও মুস্লিম সভ্যতার যেখানে বারবার সংমিশ্রণ ঘটেছে,—আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা তার ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত।

এই প্রসঙ্গে বর্তমান বিভক্ত বাংলার বহু স্থানের কথা মনে আসাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এবং মনে হয়, এখনও এসব জায়গায় প্রাচীন বঙ্গসভ্যতা ও সংস্কৃতির যে নিদর্শনগুলি ছড়ানো আছে, কালে তাও নিশ্চিহ্ন হবে, এবং 'বাঙালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি', এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

কিন্তু এই নৈরাশ্যজনক মনোভাবকে সম্ভবতঃ আজকের দিনে আর কেউই প্রশ্রয় দিতে চাইবেন না, এবং সেইজন্যই একাজের আদি-অন্ত কেবলমাত্র ভূতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের জন্য সরিয়ে না রেখে সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষও যদি আপনাপন অনুসন্ধিৎসার উপর নির্ভর ক'রে এ বিষয়ে চেষ্টা করেন, তাতে দেশের উন্নতি ও জাতি সংগঠনের পক্ষে সহায়তা করা হবে।

বাংলার যে অংশ অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব দিক—ক্রমাগত ঢালু হয়ে, সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, সেই নিম্নাঞ্চল জুড়ে আছে অসংখ্য জলপথ।

এই সব নদী, খাল-বিল-বাঁওড় বা জলায় বিভক্ত হয়েছে মাঝে মাঝে; আবার গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে সম্ভব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই। এই জলা বা জঙ্গল দেখে আজ আর মনে করার উপায় নাই, যে একদিন এইখানেই কোন-না-কোন সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, এবং সেইসব জনপদের উপর দিয়েই একে একে স্বাক্ষর রেখে গেছে হিন্দু বৌদ্ধ-মুস্লিম-যুগ-সংস্কৃতি।

এইরকমই একটি অখ্যাত অঞ্চলের নাম এক সময়ে ছিল—'কুশদ্বীপ', পরে সেই নামই দাঁড়ায়—'কুশদহ।'

যদিও প্রাচীন বাংলার বৃহৎ জনপদ-পরিচয়ের কারণে 'দহ' 'দিয়া', ও 'ডী' শব্দ দ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত ব'লে জানা যায়, তবু 'কুশদ্বীপ' বা 'কুশদহ' নাম দুইটির সঠিক কাল-নির্ণয় আজও হয় নাই; কেবল স্থানীয় দুই-একজন অনুসন্ধিৎসু কিছুকাল আগে তার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র; এবং তা 'কুশদহ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল।

'কুশদ্বীপ' বা 'কুশদহ' সম্বন্ধে পুরাতন সংবাদ যা জানা যায়, তাও খুবই সামান্য, সেজন্য হয়ত ঐ কাহিনীর উপর নির্ভর করে ধারাবাহিকরূপে ইতিহাস রচনা সম্ভব হয় নাই। পুরাতন নথি-পত্র হিসাবেও ঐ সব স্থানের লিখিত বিশেষ প্রমাণাদি পাওয়া যায় নাই।

ইংরাজ আমলের আগে পর্যন্ত এই স্থানের সীমানা-চিহ্নিত কোন মানচিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই,—তবে প্রাচীন সাহিত্যে বা স্থান-পরিচয়ে মাঝে মাঝে 'কুশদ্বীপ'

নামের উল্লেখ দেখা যায়। সে যুগের কবি সৈয়দ আলা-ওলের লেখা 'সপ্তদ্বীপের' বর্ণনাতেও 'কুশদ্বীপ' ও 'ক্রৌঞ্চ-দ্বীপে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। শোনা যায় একসময়ে—'রঘুনাথ শিরোমণিও' মিথিলা নিবাসী পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের কাছে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কুশদ্বীপের নামোল্লেখ করেছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এড়ুমিশ্রের কারিকাতেও সেন রাজাদের আমলে যেরূপে দ্বীপময় উপবঙ্গের বিবরণ বিস্তারিত হ'য়েছে তা থেকেও অনুমান করা যায় যে সে সময়ে 'কুশদ্বীপ' নামে গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যে একটি খণ্ডরাজ্য ছিল।

অনেকে মনে করেন তখনকার সময়ে, কুশদ্বীপের অধিবাসীদের সমৃদ্ধিশালী হবার কারণ 'সমতট'র সঙ্গে যোগাযোগ।

'সমতট' নামটি বৌদ্ধযুগের বিশেষ পরিচয়-জ্ঞাপক স্থানের নাম।

গঙ্গাতীরের জনপদগুলির সঙ্গে সমতটবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কুশদহের উপর দিয়ে প্রবাহিত যমুনার জলপথে চলত বলে জানা যায়।

কিন্তু সমতট যে কোথায় এবং কতখানি সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এ বিষয়ে বহু মতান্তর আছে।

দেশীয় এবং বিদেশীয় লেখকের লেখায় 'সমতট' অবস্থিতির নানারূপ নির্দ্দেশ থাকলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী কুশদহের লেখক জানিয়েছেন—যে ভাগীরথী ও কপোতাক্ষীর মাঝা-মাঝি যে জায়গা, অর্থাৎ তখনকার সময়ে যে জায়গাকে তিনি 'কুশদ্বীপ' বলে নির্দ্দেশ করতে চান, তারই উপর দিয়ে বেত্রবতী বা বেদনা নদী বয়ে যেত এবং তারই তীরে 'সমতট' অবস্থিত ছিল।

("সমতট ও ডবাক" : কুশদহ, আশ্বিন ১৩২০—দ্রষ্টব্য)

শোনা যায়, এখনও বেতনা নদীর ধারে 'সামটা' নামে একখানি ছোট গ্রাম বর্ত্তমান আছে, এবং এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি খণ্ডরাজ্য, যেগুলির অধিকারীদের হিন্দুনাম পাঠান অধিকারের সময় থেকে লোকগাথার সঙ্গে জড়িত, সেগুলির আশপাশে এখনও অনেক প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়; এজন্যও অনুমান করা যায়, যে 'সামটা' গ্রামটি 'সমতট' নামের অপভ্রংশ হ'তেও পারে।

কুশদ্বীপের মধ্যে এবং পাশাপাশি সে সময়কার আরও যে সব হিন্দু রাজা ও রাজ্যের নাম জানা যায়, সেগুলির সম্বন্ধেও কোন প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ সহজ ও সুপ্রাপ্য নয়, তবু যাঁদের মতামত সারগর্ভ, তাঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির কিছু এখানে উল্লেখ করছি—

"প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও চব্বিশ পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এমন কি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা পরগণা নগণ্য পরগণার মধ্যে গণ্য, সেখানেও বৌদ্ধ বিহার ছিল।"

যাই হোক, সমতটের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের মীমাংসা, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপরই নির্ভর করে হওয়া উচিত; সাধারণ যুক্তিতে বলা যায়, সমতটের সংবাদ সে যুগের যে ভাষাতেই লিখিত হোক, এবং উপস্থিত তা যদি আর কোথাও সংগৃহীত অবস্থায় থাকে, তার বিষয়—জন-সাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব নয়; তবে—জানলে, তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে আরও বেশী শক্তি লাভ করত।

কিছুদিন আগেও নিম্নবাংলায় যে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের উল্লেখ পাওয়া গেছে, তা-ও হিন্দু বা বৌদ্ধ যুগের নয়—সম্ভব মুস্লিম যুগ থেকে।

এই প্রসঙ্গে প্রথম ঘূর্ণী ঝড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়—১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এরপরে ১৬৮০ ও ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দেও ঘূর্ণী ঝড় হয়। তৃতীয়বারের ঘূর্ণী ঝড়ের সঙ্গে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, এবং এই ভূমিকম্পের দরুণ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস অতর্কিতে ছুটে এসে তীরবর্ত্তী জনপদকে বিপর্য্যস্ত করে।

শোনা যায়, বরাবরের জলপ্লাবনে ও ঝড়ে যত প্রাণ-হানি এ অঞ্চলে ঘটেছিল, ১৭৩৭-এর ভূমিকম্প ও প্লাবন তার বহুগুণ বেশীই ঘটিয়েছিল।

বাংলা দেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চল,—একসময়ে যেখানে 'সমতট' নামে সমৃদ্ধিশালী জনপদটি অধিষ্ঠিত ছিল বলে অনুমান করা যায়,—তার ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার দুইটি কারণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

এবং ঝড়, প্লাবন ও ভূমিকম্প, এবং দ্বিতীয়টি—মগ ও পর্তুগীজদের অকথ্য অত্যাচার।

এর মধ্যেই সমস্ত ষোড়শ শতাব্দী জুড়ে বাংলায় যেমন চলেছে রাজতক্ত নিয়ে মোগল আর পাঠানের দাপাদাপি আর কাটাকাটি, তেমনি মগ আর পর্তুগীজরা চালিয়েছে অবাধ লুণ্ঠন—আর বাঙ্গালীদের নিয়ে দাস-দাসী বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

বাঙ্গালীর ভাগ্য থেকে তখনও বিড়ম্বনার মেঘ কাটে নি, সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে আতঙ্কিত বাঙ্গালী আবার গঙ্গাতীর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বার হ'ল।

শোনা যায়, এই সময় থেকে কুশদহ আবার নূতন করে জন-সম্পদে ভরে উঠতে থাকে, কারণ, সপ্তগ্রাম বন্দর ত্যাগ ক'রে বহু ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ আপনাপন পরিবারবর্গ নিয়ে কুশদহ এবং এর কাছাকাছি স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন।

মোট কথা—প্রাচীন কুশদ্বীপ প্রসঙ্গে ঘটক-গ্রন্থে কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও,—তাকেই কুশদ্বীপের সম্পূর্ণ সংবাদ মনে করা ভুল হবে।

মোটামুটিভাবে তা থেকেও জানা যায় যে কুশদ্বীপের পূর্ব্বদিকে বুড়নদ্বীপ, পশ্চিম-দক্ষিণে এঁড়েদহ, দক্ষিণে প্রবাল-দ্বীপ বা হা তয়াগড়, পশ্চিমোত্তরে চাকদহ, সুবর্ণপুর, কুমারহট্ট প্রভৃতি, এবং উত্তরদিকে ছিল 'শ্রীনগর'।

এইসব খণ্ডরাজ্য, খুব সম্ভব একজন ভূস্বামীর অধিকারেই ছিল না এবং সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতও ঘটকগ্রন্থে নাই।

তবে তখনকার কুশদ্বীপের আয়তন যে পরবর্ত্তী সময়ের 'কুশদহ' অপেক্ষা আট-দশ গুণ বেশী ছিল, সে কথা বোঝা যায়।

———

লেডি অবলা বসু

নলিনী রাহা

লেডি অবলা বসু-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হতে চলল, প্রতিটি কাগজে তাঁর বাংলাদেশে শিশু-শিক্ষা প্রচলনের প্রসঙ্গে যে শিক্ষিকাটিকে তিনি বিদেশে পাঠিয়ে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সে নিজে কিছু বলল না, লেডি বসুর প্রতি তার শ্রদ্ধা জানাল না, এবং শিশুশিক্ষা বিস্তারে তাঁর (লেডি বসুর) অবদান কতটা সার্থকতা লাভ করল সে বিষয়ে সে মৌন হ'য়ে রইল একথা ভেবে মনে মনে আমি (অর্থাৎ সেই শিক্ষিকা) পীড়িত হতে লাগলাম। ৮ই আগষ্ট যতই নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল ততই আমি ক্রমাগত উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

তাঁর বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত বুঝেছি, কিন্তু প্রবন্ধ লেখা বা কিছু বলার কাজে আমি উপযুক্ত নই ভেবে চুপ করে থেকেছি। আমার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা আমাকে এ বিষয়ে অনুযোগ জানালেন, অবশেষে নন্দী মাসিমার কাছে (বিপিন পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) সাহস পেয়ে আমার বিশেষ কর্ত্তব্য কাজটি করবার চেষ্টা করছি।

লেডি অবলা বসুর নাম আমরা আগ্রায় থাকতেই শুনতাম এবং তিনিও আমাকে আমার বাল্যকাল থেকে পারিবারিক সূত্রে জানতেন। (আমার পিতৃবন্ধু শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় আগ্রায় আমাদের বাড়ীর খুব কাছে থাকতেন। আমরা তাঁকে আমাদের আত্মীয় বলেই জানতাম। ইনি আনন্দ বসুর কন্যা শ্রদ্ধেয়া নলিনী নাগকে বিবাহ করেন। এ বাড়ীতে বসু পরিবারের আনাগোনা ছিল।) ছোটবেলা থেকেই লেডি বসুর কথা শুনলেও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে ট্রেনিং পড়তে এসে (১৯২১ খ্রীঃ। ট্রেনিং কলেজটি তখন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের বাড়ীতেই খোলা হয়) তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

আমার বার বৎসর বয়সে আমি পশ্চিম থেকে কলকাতায় পড়াশুনো করতে এলাম। ঐ সময়ে আমি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দূর থেকে লেডি বসুকে বহুবার দেখেছি। জানা গল্পের নাটকে যেমন লোকে জানা চরিত্রগুলিকে দেখে, আমিও তখন খুব স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট লোকদের, যাঁদের বিষয় আমি ছোটবেলা থেকে শুনে রেখেছি, তাঁদের যেন দেখলেই চিনতে পারতাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু এবং লেডি অবলা বসু প্রভৃতি, এঁদের সকলকে যেন আমার খুব চেনা লোক বলে মনে হ'ত।

লেডি অবলা বসু যখন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের গ্যালারি দিয়ে মাথা উঁচু করে গট গট করে হেঁটে চলে যেতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম "ইয়েহ চলি মলকা ভিক্টোরিয়া" (আগ্রা থেকে এসে তখন আমি উর্দ্দু, হিন্দী, বা মিশ্র বাংলায় মনে মনে কথা বলতাম।) আমার কেমন জানি তখন তাঁকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মত মনে হ'ত। এই মলকা ভিক্টোরিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে আমি ভবিষ্যৎ জীবনে কাজ করব এমন কথা তখন কে ভেবেছিল।

আমার কৈশোরকাল থেকেই তিনি আমাকে তৈরী ক'রে নিয়ে কাজে লাগাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। লেডি বসু সৌন্দর্য্য ও শিশুকলার অনুরাগী ছিলেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে যখন আমি ট্রেনিং পড়ি তখন আমার ছবি আঁকার উৎসাহ দেখে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমার ছবি আঁকা শেখার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। সর্ত্ত ছিল ছবি আঁকা শিক্ষাকালীন পাঁচ ছয় বৎসর ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে কিছু কাজ করব, বোর্ডিংএ থাকবো এবং সামান্য কিছু হাত খরচ আমাকে দেওয়া হবে। তখন নানা অবাস্তব কল্পনায় আমার কৈশোরের মন ঘুরে বেড়াত, অবনী ঠাকুরের কাছে ছবি আঁকতে শেখা আমার স্বপ্নবিলাস; কিন্তু সময়টা তখন আমার কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইলাম; সুতরাং তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে প্রথম গিরিডি স্কুলে, এবং পরে হেম মাসিমার কাছে (শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা) 'দার্জিলিং মহারাণী স্কুল' কাছে

দিলাম। শিল্পী হওয়ার সুযোগ নষ্ট করে পরে অনুতাপ করেছি কিন্তু আরও পরে জানতে পারলাম, এক আশ্চর্য্য উপায়ে আমি শিল্পী হয়ে গেছি। 'মারিয়া মন্তেসরির পদতলে বসে যে শিক্ষা লাভ করলাম এবং লেডি অবলা বসুর ব্যবস্থায় সে শিক্ষা প্রয়োগ করে বুঝলাম শিশুকে শিক্ষা দেওয়া ও তাকে গড়ে তোলা এক শিল্পকলার কাজ। এই শিল্প কাজের আজীবন চর্চা করেই আমি শিল্পী হওয়ার সুখ সাধ ও সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি।

দার্জিলিংএ হেম মাসিমার কাছে যে সময়টা আমি ছিলাম সেটা আমার ভবিষ্যৎ শিক্ষিকা-জীবনের প্রস্তুতির সময়। এই প্রতিভাময়ী মহিয়সী মহিলার সংস্পর্শ থেকে তাঁর উৎসাহ ও স্নেহ পেয়ে আমার উন্নতি ও উপকার হয়েছিল। ব্রাহ্ম স্কুলে কাজ করতে করতে আমার I. A. পাশ করার সংবাদে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা নীচে দিলাম—

North View, Darjeeling
May 19th 1932

স্নেহের নলিনী

তোমার কৃতিত্বের সংবাদ পেয়ে ভারি সুখী হয়েছি। তোমাকে আমিই সর্বাগ্রে আবিষ্কার করেছি। তোমাকে ফোটাবার কৃতিত্ব খানিকটা আমার।...ভগবান তোমার সাফল্যের পথ আরও প্রসারিত করে দিন এই প্রার্থনা করি। B. A. আরও ভাল করবে তাতে আর সংশয় নেই।

আশীর্ব্বাদিকা মাসিমা।

দার্জিলিংএ মহারাণী স্কুলের প্রাইজে আমার শেখান অভিনয় ইত্যাদি দেখে এবং হেম মাসিমার কাছে আমার সুখ্যাতি শুনে লেডি বসু আরও কয়েকবার হেম মাসিমার কাছে প্রস্তাব করেছেন আমাকে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে নিয়ে আসার জন্য। যাহোক অবশেষে আমার বিবাহের পর আমি কলকাতায় এসে স্বেচ্ছায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে কাজ গ্রহণ করি।

কয়েক বৎসর পর কোন এক বিলাতী ফার্ম থেকে আমি বিলাত ঘুরে আসার এক প্রস্তাব পাই। কাজটা কি এক যন্ত্র-সংক্রান্ত, তাতে লেখা ও ছবি আঁকা প্রভৃতি হয়। বিদেশ ঘোরার উৎসাহে (এবং আর্থিক উন্নতিও বটে) আমি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ছেড়ে দেওয়ার কথা লেডি বসুকে জানাই। তিনিও আর কি করেন, অগত্যা আমাকে একটি ভাল ছাড়পত্র দেন। সেই ছাড়পত্র, হেম মাসিমার সার্টিফিকেট এবং মিস্ সেকারের (ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের তখনকার Head mistress) চিঠি প্রভৃতি নিয়ে আমি সাহেবকে interview দিয়ে এলাম। এমন সময়ে লেডি বসু আমাকে ডাকিয়ে বললেন "নলিনী তুমি শিক্ষকতার কাজ ছেড় না, আমি তোমাকে বিলাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আমি Montessori departmentটা improve করতে চাই তুমি রোমে গিয়ে মন্টেসরি ট্রেনিংটা বরং নিয়ে এস।" তখনও ডাঃ মন্তেসরি ভারতবর্ষে আসেন নি।

রোম মন্তেসরির নিজের দেশ, কিছুটা খরচের সুবিধা হবে মনে করে এবং রোম শিল্পীর দেশ এই সব মনে করে তিনি আমাকে রোমে পাঠালেন।

আজ লেডি বসুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ অর্থ উপার্জনের পথ থেকে আমাকে নিবৃত্ত করে ভাবের জগতে সৃষ্টির কাজে আমাকে নিয়োগ করে তিনি আমার পরম মঙ্গল সাধন করেছেন।

লেডি বসু অন্যান্য সমাজ ও দেশ হিতৈষণার কাজের সঙ্গে এদেশে শিশু-শিক্ষা প্রচলনের চিন্তা ও চেষ্টা, ঐ সময় করেছিলেন। মিসেস নন্দী (বিপিন পালের কন্যা) মায়া সোম, এবং মিস ভকিল (একজন পার্শী মহিলা) প্রভৃতিকে নিয়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে একটি একটি মন্তেসরির খুলেছিলেন*। সেটি কোনমতে চলছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই শিশু-বিভাগটি ভাল ক'রে গড়ে তোলা।

লেডি বসু যদি কারও মধ্যে কোন গুণ বা সম্ভাবনা দেখতেন তবে তাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করবার এবং তার গুণটা ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন,

* শিশু বিভাগটির প্রথম দিকের ইতিহাস মিসেস নন্দীর কাছ থেকে ভালভাবে পাওয়া যাবে। এঁকে শিক্ষিকা হিসাবে খুবই উপযুক্ত জেনে এবং তাঁর নানান ক্ষমতার কথা বুঝে লেডি বসু এঁকে শিশু বিভাগের জন্য নিয়ে আসেন। একটু বড় শিশুদের নিয়ে তিনি নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে ভালই কাজ করেছিলেন; কিন্তু সমগ্র বিভাগটি তখন কেন জোর পাচ্ছিল না, কেন তখন আমাকে ঐ কাজ শিখে আসার জন্য রোমে পাঠান হ'ল এবং তখন কি কি সুবিধা বা অসুবিধা হয়েছিল মিসেস নন্দীর কাছে লেডি বসুর এ বিষয়ে অনেক চিঠি আছে। শিশুশিক্ষা প্রচলনের ইতিহাস লেখা কোনদিন দরকার হ'লে গোড়ার দিকের সব কথা তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখা দরকার। কারণ তাঁর বয়স ৮০ বৎসর।

এবং কোন না কোন উপায়ে তাকে তাঁর দেশ সেবার উপযুক্ত করে নিতেন। তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতায় তাদের ছোট ক্ষমতাটিকে আবিষ্কার করে ফেলতেন তারপর তাকে আরও সাহসিকতার কাজে, বড় কাজে বিশ্বাস অর্পণ ক'রে উপযুক্ত করে নিতেন।

আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। নানা প্রতিবন্ধক বাদানুবাদ এবং বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে তিনি অনেক চেষ্টা করে স্কুল কমিটির কাছ থেকে আমার বিদেশ যাবার জন্য ২০০০৲ অনুমোদন করিয়ে নিলেন। স্কুল থেকে ঐ টাকাটা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সব রকম চেষ্টা বিলি ব্যবস্থা, উদ্যোগ লেডি বসু করেছিলেন। নার্সারি বা মন্তেসরি স্কুলের কোন দরকার আছে অথবা সেটা এ দেশে চলবে এ কথা সে সময়ে কেউ বিশ্বাস করতেন না; সুতরাং টাকাটা নষ্ট হবে এই একটা ভাব স্কুল কমিটির অনেকের মধ্যে ছিল।

পরে আমি আশ্চর্য হয়ে বুঝেছি আমাকে তৈরী করতেই যদি তাকে এত সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাহলে এতগুলি প্রতিষ্ঠান চালাতে এবং তার প্রতিটি কর্মীকে সন্তুষ্ট রাখতে কত না সংগ্রাম তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

তিনি শক্তিরূপিণী ছিলেন কিন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা জানেন কি অপূর্ব আন্তরিকতা, মমতা, স্নেহ ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিয়ে তাঁদের প্রত্যেকটি তিনি পরিচালিত করতেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

যাহোক লেডি বসুর চেষ্টায় ও আগ্রহে আমি ১৯৩৪ সালে ১৮ই জুন রোম নগরের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করি। আমিই বোধহয় প্রথম ভারতীয় মহিলা ছাত্রী। কালিদাস নাগ মহাশয় লেডি বসুকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন এবং আমার জন্য ইতালি সরকারের কাছ থেকে কিছু বৃত্তির (২০০০ লিরে)* ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কালিদাস নাগ মহাশয়ের কাছে এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে বিদেশে যে ভারতীয় ছেলেরা আমাকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েই লেডি বসু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁর লেখা দু' একটি চিঠি পড়লে জানা যাবে যাতে আমি আর্থিক অসুবিধায় না পড়ি, ভাষার অসুবিধার জন্য আমাকে যাতে অকৃতকার্য না হতে হয়, সব সময় তিনি সে বিষয়ে চিন্তিত, ও উৎকণ্ঠিত থাকতেন, কালিদাস নাগ মহাশয়ের পরামর্শ নিতেন এবং যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে আমাকে চিঠি লিখতেন।

আমি যাতে বিদেশে একলা প'ড়ে গিয়ে না ঘাবড়াই এ জন্য তিনি উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়ে নিয়মিতভাবে আমাকে চিঠি লিখতেন। কি ভাবে আমি ভবিষ্যতে এ দেশে শিশুশিক্ষা প্রচলন করার উপযুক্ত হতে পারি, তার জন্য উপদেশ পরামর্শ ও উৎসাহপূর্ণ চিঠি সর্ব্বদাই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

6th June
Mayapuri Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

তুমি ত শীঘ্রই রওনা হইবে, সঙ্গের চিঠিটা তোমার কাছে রাখিও। Rome এ গেলে ভারতীয় ছেলেরা Dr. Das এর ঠিকানা বলিতে পারিবেন তখন তাঁকে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিও।*

তুমি ইতালিতে পৌঁছিয়া সব খবর জানাইবে আমার ইচ্ছা যে (রোমে) মন্তেসরি ডিপ্লোমা ছাড়াও Perugia তে একটা ডিগ্রি নাও।

"ওখানকার course এর কথা তোমার কাছ থেকে শুনিলে তবে তোমার Programme ঠিক করতে পারি। ...তোমার Montessori Deploma শেষ হইলে আমার ইচ্ছা তুমি Paris যাও, কারণ সেখানকার Council School গুলি কত Superior তাহা দেখিতে যাইবে।

...তুমি Italian ভাষা জাহাজেও একটু অভ্যাস করিও তাহা হইলে naples (Rome?) গেলে আর অসুবিধা হ'বে না। Italian শিখিলে French ও শেখা কঠিন হবে না। যদি Perugia তে ** French

* ১ লিরা তখন আমাদের দেশের সাড়ে তিন আনা মত ছিল মনে হয়।

* ঐ চিঠি এখনও আমার কাছে আছে। আমি যখন ইতালিতে পৌঁছিলাম Dr. Dass তখন ইংলণ্ডে, আবার আমি যখন ইংলণ্ডে পৌঁছলাম তখন শুনলাম তিনি আমেরিকায়; সুতরাং ঐ চিঠি আর তাঁকে দেওয়া হয়নি।

** আমি Perugia তে মাত্র ১২।১৩ দিন ক্লাসে যোগ দিয়েছিলাম। তার পরে, আমাকে Nice এ

শেখার সময় হয় তাহা হইতে শিখিও। অবশ্য সময় না হলে অনর্থক কষ্ট করিও না। ...

আশা করি সুস্থ শরীরে লেখাপড়া শিখিয়া আমাদের শিক্ষা প্রচারের সহায়তা করিবে। গরীব দেশের জন্য আমাদের স্থানীয় দ্রব্যাদির সাহায্য নিতে হইবে। নিজেদের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী গঠন করিতে হইবে।

শুভার্থিনী অবলা বসু।

20th May
Mayapuri,
Darjeeling

কল্যাণীয়াসু,

তাড়াতাড়িতে আর নানা কাজের মধ্যে তোমাকে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিতে পারি নাই।...... Montessori Sehool Practice করার পর আমার ইচ্ছা তুমি Paris এ গিয়া সেখানকার স্কুলগুলি দেখ।... এটা অবশ্য তুমি মনে রাখিবে যাহাই দেখ বা শেখ আমাদের দেশে তাহা adopt করিতে হইবে। মূল ideas গ্রহণ করিয়া আমাদের মতে সেটা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

...কারণ আমার যতদূর ইচ্ছা তুমি শেখ তাহা ২০০০৲ টাকাতে সম্ভব না, কিন্তু Italian Government ভাল ছেলে মেয়েদের Scholarship দেন, সেই আশাতেই সাহস করিয়া তোমাকে পাঠাচ্ছি। Scholarship পাইলেই তোমাকে Paris পাঠাতে পারিব। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের দেশে শিক্ষা প্রণালীর উন্নতি হয়। স্কুলে যখন একটা প্রণালী আরম্ভ করা গিয়াছে তখন তাহার test যাহাতে আমরা পাইতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই তোমাকে পাঠাতে চেষ্টা করিতেছি।

...Europe এ থাকাকালীন কোন Political বিষয়ে যোগদান করিও না, কোন partyর সঙ্গে বিশেষ ভাবে মিশিও না। লেখাপড়া নিয়াই থাকিও এবং সব রকমে জ্ঞান বৃদ্ধি করিও। মাসে একখানা করিয়া আমাকে চিঠি দিও।

শুভার্থিনী অবলা বসু

(ইতালীর সীমানায়, ফরাসী দেশে) আন্তর্জাতিক montessori Course এ যোগ দিতে হয়। দুই মাস পরে রোমে এসে practical course অভ্যাস করি। এর কারণ ডাঃ মন্তেসরীর সঙ্গে মুসোলিনীর মতান্তর ও বিবাদ। মুসোলিনীর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তিনি জন্মের মত স্বদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

93 Upper Circular Rd Calcutta
25th March (1935)

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন তোমার কোন খবর না পাইয়া চিন্তিত আছি। তুমি টাকার কি ব্যবস্থা করিয়াছ তাহাও বুঝিতেছি না, Dr. Nag বলিলেন March মাস পর্য্যন্ত আবার হয়ত দিতে পারে। তুমি লিখিয়াছ ২০০০ লিরাও পাও নাই, তবে খরচ চালাইবে কি করিয়া? আমার ইচ্ছা তুমি June মাসে Perugia join করে July মাসের শেষে বা Aug মাসের আরম্ভে দেশে ফের, অবশ্য টাকায় কুলাইলে। তুমি ইটালীয় ভাষা যেরকম শিখিয়াছ তাহাতে ...। এসব বিষয়ে তোমার উপর সম্পূর্ণ ভার জানিবে। তুমি যেমন ভাল মনে কর তাই করিবে। তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তুমি ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে স্কুলটি ভাল করিতে পার তাহার সাহায্য করিব।

আমাদের দেশে পিতামাতার অজ্ঞানতা বশতঃ কাজ করা বড় কঠিন, তুমি পদে পদে বাধা পাইবে, কিন্তু এটা মনে রাখিও যে Pioneers দের অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হয়। আশা করি তুমি চারিদিক দেখিতেছ এবং যতটা পার শিখিয়া আসিতেছ। লণ্ডনে যদি ভাল কয়টা স্কুল দেখিতে পার তবে ত ভালই—কিন্তু ওখানে গেলে তাদের advancement দেখিয়া আরও হতাশ হবে। তাদের সঙ্গে Compete করিতে আমাদের অনেক বৎসর* লাগিবে। তুমি ঘাবড়িও না।...... তোমার চিঠি পড়িয়া খুব খুশী হই। তোমার খবর জানিতে ব্যগ্র রহিলাম।

শুঃ অবলা বসু

এই রকম কত যে চিঠি লিখে বিদেশ বাসের সময় আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে অবশেষে কাজের উপযুক্ত করে নিয়ে এলেন।

আমার বিদেশ বাসের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনা এখানে বাদ দিয়ে গেলাম। রোমে কি ভাবে আমার শাড়ী

---

* লণ্ডনে যে সব স্কুল আমাকে দেখান হয়েছিল রোমের স্কুলগুলির কাছে সেগুলি আমার নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল।

কিছুটা সময় লাগলেও পরে লেডি বসু দেখে গিয়েছিলেন আমাদের ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষিকারাও প্রায় তাদেরই মত নিজেদের তৈরী করে নিতে পেরেছেন।

পরা চেহারায় চারিদিকে ভীড় জমে যেত, তারা আমায় কত কত মু স্কলে পড়তাম এবং পরে চলনসই কথা বলার মত এবং পাঠ্য পুস্তক পড়ার মত ইটালিয়ান ভাষা শিখে নিতে হ'ল সে অন্য কাহিনী।

সস্তার Pensioneতে, সস্তার পাড়ায় থেকে কাজ গুছিয়ে নিয়ে চলে আসতে পারলাম, কারুর কোন কথায় কান না দিয়ে, এতে আমি নিজের 'পরেই খুব খুসি হয়েছি। লেডি বসুকে এ বিষয়ে বিব্রত করিনি এবং আমাকে দেওয়া টাকা দিয়েই চালিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

মন্তেসরি শিক্ষা শেষ করে আমি রোম প্যারিস ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্কুল দেখে বেড়াই। এই স্কুল দেখে বেড়ানতেই আমার যথার্থ শিক্ষা হয়েছিল। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের নার্সারি স্কুলটি নূতন করে গড়ে নেবার উপকরণ এই স্কুল পরিদর্শন করাতেই বেশীর ভাগ সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। লেডি বসুর এই রকমই ইচ্ছা ছিল, যাতে মন্তেসরি পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য প্রণালী আমি দেখে শুনে আসতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের মন্তেসরি স্কুলটি, কাঠামো ঠিক রেখে নানা পদ্ধতির সংমিশ্রণে (এবং আমাদের শান্তিনিকেতনের আদর্শে) আমাকে গড়ে নিতে হয়েছে। পরে অনেক নার্সারি স্কুল (মন্তেসরি উপকরণ বাদ দিয়েও) এই আদর্শে তৈরী হয়েছে। একে "লেডি বসু মন্তেসরি স্কুল" বলা চলে, কারণ তারই ইচ্ছা বুঝে আমি যথাসাধ্য বর্তমান স্কুলটি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

অবশেষে ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি আমি দেশে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করে কাজ আরম্ভ করি। ফিরে এসে আমি মায়া সোম ও মিসেস নন্দীর সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। এই সময়ে দেশী মিস্ত্রি দিয়ে উপকরণ তৈরী করা, নানারকম নিয়ম কানুনের ব্যবস্থা করা দেশী ভাষায় দেশী ধাঁচে স্কুলটি গড়ে নিতে সময় যায়। সে সময় অন্য কোন নার্সারি বা মন্তেসরি স্কুল এখানে না থাকায় কারুর কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পাবার উপায় ছিল না, নিজেকেই ঠেকে ঠেকে ভেবে চিন্তে প্রত্যেক বিষয়ের সমাধান ও ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে। এ বিষয়ে লেডি বসুর অনুমতি ও পরামর্শ সব সময়ে পেয়েছি। এখন দেখি আমাদের চালু করা ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন বিভিন্ন নার্সারি স্কুলে গ্রহণ করা হয়েছে।

কিছুপরে প্রতিষ্ঠানটির incharge হয়ে আমি একক ভাবে অন্যান্য শিক্ষিকাদের দিয়ে বিভাগটি পরিচালিত করতে থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সহযোগী শিক্ষিকাদেরও কাজ শিখিয়ে নিই।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের শিশু বিভাগটি প্রথম এবং বিশিষ্ট নার্সারি স্কুল হয়ে উঠে। এই স্কুলটি থেকে অনেকে অনুরূপ স্কুল তৈরীর প্রেরণা লাভ করেন। আজ যে অনেকগুলি নার্সারি স্কুল কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিশু প্রতিভার বিকাশ ও শিশু কর্মতৎপরতার অপচয় নিবারণ হতে চলেছে এ শুধু লেডি অবলা বসুর উদ্যোগ ও ক্ষমতায় সম্ভবপর হয়েছে।

লেডি বসু যে মাছিমারা বিলাতী নকল ভালবাসতেন না একথা সকলেই জানেন। দেশী উপকরণে দেশী ভাব নিয়ে গরীব দেশের উপযুক্ত করে যেন তাঁর মন্তেসরি বিভাগটি পুনর্গঠন করা হয় এ বিষয়টি তিনি বার বার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন।

প্রচলিত হুবহু মন্তেসরি স্কুল যা আজকাল দক্ষিণ কলকাতায় উচ্চবিত্ত পাড়ায় চলে আমাদের এই মন্তেসরি স্কুলটি সেরকম নয় বলে অনেকে মনে করতে পারেন "এটা মন্তেসরি স্কুল নয়" কিন্তু মন্তেসরি আবিষ্কারের নীতি ও সূত্র মেনে, আমাদের প্রয়োজন বুঝে রোম, লণ্ডন, প্যারিস এবং সর্কোপরি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির সংমিশ্রণে, মন্তেসরি নিয়মকানুন প্রয়োগ করে স্কুলটি যে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেছে একথা সকলেই স্বীকার করেন। লেডি বসু বলতেন "কেন আমরা যেখানে যা ভাল দেখব এবং সুবিধার বুঝব তাই-ই গ্রহণ করব।"

Hastings এর অধ্যক্ষা শ্রীমতী নলিনী দাস একদিন আমাকে বলেছিলেন "নলিনীদি আপনি যদি Pure Montessori School তৈরী করতেন তাহলে এতটা কৃতকার্য হতে পারতেন না।"

আমরা পরে কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে, এবং marwari sammelan Calcutta, জালানদের দ্বারা পরিচালিত Health Exhibitionএ ছোট একটি মন্তেসরি স্কুল বসিয়ে demonstration দিয়েছিলাম। এতে অবাঙ্গালীদের মধ্যেও এই নার্সারি স্কুল তৈরীর উৎসাহ আমরা জুগিয়েছিলাম। শ্রীযুক্তা লেডি অবলা বসুর দূরদর্শিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

গান্ধীর Pre-basic স্কুলের আদর্শও লেডি বসুর

মিশ্র মন্তেসরি পদ্ধতি তা পরে বাণীভবনের Pre basic স্কুলটি দেখে বুঝেছি।

একবার আমি ও মায়াসোম মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনে স্কুল থেকে আহূত হয়ে, মন্তেসরি পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়েছিলাম। জিনিষপত্র কিছু কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। ইন্সপেকট্রেস সুনীত গুপ্ত মহাশয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি ত ভালই বললেন। এসব প্রথম দিককার কথা; তখন আমাদের স্কুলের নাম এতটা ছড়ায়নি। আমার সাহসও তখন খুব কম, ভয়ে ভয়ে কোনমতে যা পারলাম বললাম ও দেখলাম।

নীচে কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃতি করছি, তাতে বোঝা যাবে আমাদের কাজ ঐ সময় থেকে কি ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল।

Marwari Sammelan Calcutta,
152B, Harrison Road. Calcutta. 2nd Sept. 1949

The Head Mistress,
Brahmo Girls School.

Dear Madam,

We are very much thankful to you for your co-operation in enabling us to hold the Health Exhibition at Sri Jamnadas Tibrewala Bhawan.

The Montessori system of education which has been well exhibited at the place, has been very much appreciated by the visitors and we hope that this exhibition will put up other institutions thinking about the introduction of the system at their schools as well.

We have received innumerable requests to extend the period of the exhibition. It has therefore been decided to keep the ehxibition open upto 6th instant. May we therefore request you to kindly permit us to keep your exhibits at the exhibition upto 6th inst.

We are also very grateful to the incharge of your Montessori Section for having taken so much troubles in arranging the exhibits so attractively as well as for bringing the students and other teachers for practical demonstration. Will you kindly convey our hearty thanks to each of them for the same and request them to be kind enough to continue the demonstration up to the 6th inst. Thanking you......above request.

Yours faithfully,
Hony. Secretary.
N. K. Jalan.

Gun And Shell Factory,
Dated the 11th Aug. 1955.

To

The Head Mistress.
Brahmo Balika Shikshalaya.

I take this opportunity to express my heartfelt and warmest thanks to you for showing to us the Montessori Section of your School on 9th instant.

If is not play but work method of teaching through developing artistic sense with admirable discipline which has impressed us the most as visitors.

Once again I would like to thank you and we have carried back with us a pleasant idea that we shall soon intioduce similar items into our growing little school at the Towers, Gun and Shell Factory.

Yours truly,
(Signature)
A. K. Israni.

লেডি বসুর ইচ্ছা ছিল এই শিশু-শিক্ষার আরও প্রচার ও প্রসার করা। একটি প্রধান স্কুলকে কেন্দ্র করে ছোট নার্সারি স্কুল (প্রতি পাড়ায়) স্থাপন করা কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেছে।

একটি ভাল শিশু-শিক্ষিকা ট্রেনিং স্কুলের বিশেষ প্রয়োজন। সে রকম স্কুল প্রায় নেই বললেই চলে।* আমি আমাদের স্কুলটি গড়ে তুলবার সময় বুঝেছি শুধু শিক্ষিকা নয়, School Mother এবং শিশু-সেবিকাদেরও (ঝি জমাদারনী প্রভৃতি) কাজ ও দায়িত্ব শেখানর বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি কোন শিশুদরদী এ কার্য্যভার গ্রহণ করে লেডি বসুর অপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবেন। আমাদের সকল শিশু-শিক্ষিকার মিলিত চেষ্টায় ও লেডি অবলা বসুর আশীর্বাদে শিশু শিক্ষার প্রসার হোক ও উন্নততর মানুষ সৃষ্টির কাজ অগ্রসর হতে থাকুক।

আমার সৌভাগ্য যে লেডি বসুর মত দেশভক্ত মহিয়সী মহিলার সংস্পর্শে থেকে তাঁর দেশ-সেবার কাজে যোগ দিয়ে নিজেকে ধন্য করতে পেরেছি।

---

* একটি ট্রেণিং স্কুল গোখেল মেমোরিয়ালে হয়েছে শুনেছি।

বঙ্কিম সাহিত্যে অলৌকিকত্বের তাৎপর্য

মীরা রায়

বঙ্কিমচন্দ্র এমন সময়ে বঙ্গ সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হন তখন সে আকাশ যুগসন্ধিক্ষণের অজ্ঞান. রহস্য ঝঞ্ঝায় প্রবল ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাহিত্যের সেই নিশানাবিহীন ঘোর তামসী রাত্রিতে অন্যের পথপ্রদর্শক রূপে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রই অসীম সাহসে অগ্রণী হয়েছেন। যদিও এপথে বাঁকা চোরা খানা ডোবা সবই ছিল তবুও সাহিত্যে নব্য ভাবধারায় রাজপথ সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এগুলি তুচ্ছ করে সব্যসাচীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। "সেই সময়ে সব্যসাচী বঙ্কিম একহস্তে গঠন কার্যে, এক হস্ত নিবারণ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বঙ্কিম প্রসঙ্গে অবিসম্বাদী সত্য হিসাবে প্রযুক্ত।

৯৯৭ খৃষ্টাব্দের নিদাঘ শেষে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার মধ্যে দিয়ে যে অশ্বারোহী নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়ে প্রথম সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির পথ দেখালেন, তিনি কল্পিত কাহিনীর নায়ক জগৎ সিংহের ছদ্মবেশে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে এক অভিনব সাহসের পরিচয় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারার সংযোজন আনয়ন করে যে আলোকপাত করে গিয়েছেন, সেই সুদূরবিদারী আলোর রশ্মি তাঁর উত্তরসূরীর সৃষ্টি পথ আলোকিত করে রেখেছে। এযুগের মানবজীবনভিত্তিক সাহিত্যের জন্মসূত্র পাওয়া যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই নূতন আলোকপাতের মাঝে, তাঁর সাহিত্য সমীক্ষার নব্য দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে। কথাসাহিত্যের প্রথম সার্থক রূপকার হিসাবে বঙ্কিমের অবদান বাংলার সর্বশ্রেণীর 'সর্বকালের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয়।

কথা সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হল লৌকিক জীবনের সূক্ষ্ম ও সম্যক নিরীক্ষা—সাহিত্যে কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে এর সুষ্ঠু পরিবেশন কথা সাহিত্যিকের অন্যতম কৃতিত্ব। বঙ্কিমই প্রথম বাংলার কথা সাহিত্যের জন্মদান করে তাকে বাল্য থেকে যৌবনে আনয়ন করলেন। সাহিত্যের সঙ্গে 'হিত' অথবা মঙ্গল শব্দটির আত্মিক যোগ আছে, অর্থাৎ সাহিত্যের কাজ হিত সাধন অথবা মঙ্গল বিধান করা। সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লক্ষ্য রাখবেন তাঁর সাহিত্য রচনায় 'হিতের' সংযোগ আছে কিনা। মূলতঃ বঙ্কিমরচনা প্রায় সবগুলিই সামগ্রিকভাবে 'হিত' অথবা কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই হিত সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনো ইতিহাস, কখনো রোমান্স, আবার কখনো অলৌকিক পরিবেশের সাহায্য নিতে হয়েছে। লৌকিক জীবনের সাধারণ ভাবধারাকে রূপরসানুভূতির সাহায্যে আবশ্যকতম কিছু প্রাচীন, কিছু নবীন কিছু ইহলৌকিক, কিছু পারলৌকিক অতি প্রাকৃত সাজ সজ্জায় সাহিত্যিক উপচারে সুসজ্জিত করে পাঠকসমাজকে যে ভাবে উপহার দিয়েছেন, সেই অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টিগুলি সাহিত্যিক মূল্যায়নে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করে কালজয়ীর আসন লাভ করেছে।

সব সাহিত্যিকই নিজ নিজ দেশকাল পাত্র অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে থাকেন, কেউই আপন সংস্কার মুক্ত হতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও সেই মধ্যযুগীয় লৌকিক চিন্তাধারা ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বয়ং তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন, এবং মানুষের জীবনে সাধু সন্ন্যাসীর তন্ত্রমন্ত্রের অলৌকিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে সেকালের মানুষের মনে যে দৃঢ় আস্থা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রও সেই সম্বন্ধে গভীর আস্থাশীল ছিলেন। কর্মজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাংলার সাধারণ লৌকিক জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর পক্ষে তৎকালীন লৌকিক প্রবাদ, সংস্কার লৌকিকধর্ম বিশ্বাসের নীতি নিখুঁত

পর্য্যালোচনা করা ও নিরীক্ষা পরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া গিয়েছিল। তাই বাংলার মধ্যযুগীয় লোক-জীবনের প্রতিটি রূপরেখা বঙ্কিম-তুলিতে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল এইটি বঙ্কিম উপন্যাসগুলিতে তথা সেযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। লোক সংস্কৃতি ও শিক্ষা, প্রবাদ ও কিম্বদন্তী ইত্যাদি অতি সহজ থেকে সহজতম মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বঙ্কিমের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক দৃষ্টির সামনে ধরা পড়েছিল। বঙ্কিম প্রতিভার চরম উৎকর্ষতা হ'ল রোমান্স ও বাস্তববিজড়িত উপন্যাস রচনায় মানব জীবন চিত্রকর হিসাবে, এই চিত্রকারিতার পটুতার মূলে রয়েছে দৈবশক্তির লীলায় লীলায়িত অতিপ্রাকৃত শক্তির নিয়মে নিয়মিত মানব-জীবন যাত্রার 'অহিতের' সঙ্গে 'হিতের' বিজয় বার্ত্তার চিরন্তন সত্যের সাহিত্যিক পরিবেশন। বঙ্কিমসাহিত্যে তাই অলৌকিক তত্ত্বের, অতিপ্রাকৃতের অবতারণার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।

বাংলার প্রথম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর গড় মান্দারণের কাহিনী বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রচলিত কিম্বদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, এ কথার স্বীকারোক্তি রয়েছে তাঁর আত্মীয় শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর একটি মন্তব্যে। এই কিম্বদন্তীর ওপর তথ্য ও রোমান্সধর্মী বৃত্তির সাহিত্যিক রূপারোপ করে দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রথম রাজপথের সূচনা করলেন। সন্ন্যাসী অভিরাম স্বামীকে পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে আনয়নে বঙ্কিম মানসে মানব জীবনে অলৌকিক শক্তির প্রভাবের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন অন্তর্নিহিত রয়েছে। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় এই শ্রেণীর লোকাতীত পুরুষ চরিত্রের প্রয়োজন ঘটে না, কিন্তু সংকট কালে কোন নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করবার জন্য উপন্যাসে যে প্রয়োজনীয়তা থাকে সেই অবস্থার আকস্মিকতার সঙ্গে বাস্তবতার সমতা ও সামঞ্জস্য রাখতে গেলে এই সব অনন্যসাধারণ পুরুষের অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন ঘটে। অভিরাম স্বামীর পার্শ্বচরিত্র হিসাবে উপন্যাসে স্থান হলেও নায়ক নায়িকার নাটকীয় ভাবে মিলন সাধনে অর্থাৎ উপন্যাসের মূল পরিণতি সাধনে এবং কাহিনীর আগাগোড়া সম্পূর্ণতা সাধনে নিজ কর্মের ও প্রভাবের পরিধি বিস্তৃত রাখায় এ উপন্যাসে মূল চরিত্রের গুরুত্ব পাবার যথার্থ অধিকারী।

দুর্গেশনন্দিনীর দুবছর পরে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার তন্ত্রসাধনার একটি কৃচ্ছ্রসাধন নৃশংস রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এটিও দক্ষিণ বাংলার ও মেদিনীপুর অঞ্চলের লৌকিক ধর্ম বিশ্বাস ও তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আস্থাশীল মনের একটি সাহিত্যিকসৃষ্টি। প্রকৃতি ও অরণ্যপালিতা সমাজবহির্ভূতা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের অসম্পূর্ণতা ও সামাজিক জীববৃত্তির অনুপস্থিতির মূলে প্রধানাংশে দায়ী তার অলৌকিক পরিবেশে জীবন গঠন। সমস্ত উপন্যাসে একটি বিষাদময় কাব্যের সুর পাঠকচিত্তের কোমল তন্ত্রীতে ঝংকারের রেশ রেখে দিয়ে যায়—এই উপন্যাসটি একটি কাব্য রসিক মনের অনুপম রস সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে। এতে রোমান্স সৃষ্টি করায় যে সমস্ত অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব পরিবেশের সাহায্য নিতে হয়েছে সেগুলিকে অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়না কারণ উপন্যাসের প্রথমেই সেযুগীয় ধর্ম বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি পাঠকচিত্তকে পরবর্তী অলৌকিকত্বকে সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে সাহায্য করা হয়েছে; এতে বাস্তবের সঙ্গে এই লোকাতীত পরিবেশ একটি সহজ বিশ্বাস্য সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে।

তাই অসামাজিক ও অসম্পূর্ণ চরিত্র হলেও নায়িকা কপালকুণ্ডলা পাঠকচিত্তের কাছে অতিপ্রাকৃত পরিবেশের কল্পনার রঞ্জনীবৃত্তিপ্রসূতা পরম রমণীয়া।

তান্ত্রিকপ্রথার ধর্মপ্রবণতা থেকে এই চরিত্রের উদ্ভব এই চরিত্রে অসাধারণত্ব থাকলেও বাস্তবের সঙ্গে এর সুসামঞ্জস্য আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে যে সমস্ত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের সহিত একটি নিগূঢ় ও সুসঙ্গত সম্বন্ধবিশিষ্ট।" যাবতীয় অলৌকিক বিশ্বাস ও জীবনে অতিপ্রাকৃতের প্রভাব একটি অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে স্বাভাবিক রূপ নিয়ে নায়িকার ভবিষ্যৎ জীবন নির্দেশনায় প্রভূত

কার্যকরী হয়েছে। নায়িকার চরিত্র পরিস্ফুটন ও তার পরিণতি প্রধানত এই অতিপ্রাকৃত শক্তিকে ও পরিবেশকে কেন্দ্র করেই সহজ ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

এরপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস চন্দ্রশেখর প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসেও ইতিহাস ও রোমান্স যুগপৎ অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সাহায্যে কাহিনীর আবেদনকে বিশেষ মনোজ্ঞ করে তুলেছে। আদর্শবাদী বঙ্কিম নায়িকার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অধ:পতনের পরিমার্জিত সংস্কারের ও প্রায়শ্চিত্তের যে উপায় অবলম্বন করেছেন সেটি একটি বিশেষভাবে রূপায়িত অতিপ্রাকৃত শক্তির অবতারণার সাহায্যে নায়িকার প্রায়শ্চিত্তের চরম কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। নীতিবাদী বঙ্কিম ব্যক্তিচরিত্রে আদর্শবিক্ষেপে কঠোর দণ্ডদাতার ভূমিকায় দৃঢ় সংবদ্ধ—এই কঠোরতার গভীরতা নির্ণয়ে বঙ্কিম অনুসৃত অতিপ্রাকৃত শক্তি সর্বাংশে কার্যকরী হয়েছে। শৈবলিনীর মনোবিকারে যে নরকদর্শনরূপে মহাপ্রায়শ্চিত্তের পালা চলছিল, আধুনিক মনোবিজ্ঞান তার মানসিক বিশ্লেষণে মনবিকৃতির এক বিশেষ ব্যাখ্যা দিলেও প্রকৃতপক্ষে এটি যেন ঐন্দ্রজালিক যাদুবিদ্যার এক অপার্থিব প্রতিক্রিয়া বিশেষ। এর জন্যও অলৌকিক গুণসম্পন্ন সন্ন্যাসী রামানন্দ স্বামীর প্রয়োজন ঘটেছে।

পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের অভিযানে বঙ্কিমচন্দ্র এই সব অলৌকিক শক্তির সেপাই-শান্ত্রীকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন সমাজে যে আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন সেটি এই সব অলৌকিক পরিবেশের সাহায্যে পাঠক-মনে পাপ সম্বন্ধে ভীতিপ্রবণতা সৃষ্টি করে আদর্শের জয়গানকে সোচ্চার করে তুলেছে। লোকাপবাদ ও লোকপ্রবাদের ভিত্তিতে কল্পনা রূপারোপ করে সমাজের মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করে দেবার জন্য বঙ্কিম সাহিত্যে অলৌকিক অবস্থাগুলির অবতারণা করা সার্থক প্রতিপন্ন হয়েছে। এই অনৈসর্গিক রচনায় বঙ্কিম মনের কল্পনা বৃত্তি শ্রেষ্ঠ সৌকর্য দাবী করতে পারে। এইভাবে অত্যাশ্চর্যের সঙ্গে বাস্তবের সংহতি রক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রোমান্সের বর্ণাঢ্যের গাঢ় প্রকাশ, এবং গদ্যসাহিত্যে কাব্যিক অনুভূতির পরিবেশন, ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক সৃষ্টির মাধ্যমে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে।

এরপর যথাক্রমে ১৮৭৩ ও ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিষবৃক্ষ ও রজনী প্রকাশিত হয়। বিষবৃক্ষে অতি প্রাকৃতের প্রভাব খুব কম দেখা যায়। যদিও কুন্দের অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন, ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কল্পিত আশঙ্কা, ভাগ্য নির্দ্ধারণে পূর্বাভাষ ইত্যাদিতে কিছুটা মধ্যযুগীয় সংস্কার ও স্বপ্ন-বিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অপ্রাকৃতের ইঙ্গিত কিছুটা থাকলেও এই সব ঘটনা মানুষের বিশ্বাসভিত্তিক ও দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শ: ঘটে থাকে বলে এতে অনৈসর্গিক উপলব্ধি থাকলেও বিচার বিশ্লেষণে এতে বাস্তবতার উপাদান সর্বতোভাবেগ্রাহ্য। কুন্দের স্বপ্নদর্শনে তার সমগ্র জীবনের একটা রহস্যময় আভাস পাওয়া যায়—এটি পাঠকচিত্তে কৌতূহল জাগাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

রজনীতে অলৌকিক ক্রিয়ার প্রভাব সমস্ত উপন্যাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সন্ন্যাসীর মন্ত্রে ও স্বপ্নদর্শনের কৌশলের মধ্য দিয়ে নায়ক শচীন্দ্র অন্ধ রজনীর প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং এজন্য পরে নায়ক নায়িকার মিলন সম্ভব হয়েছে। এই কাহিনীকে মিলনাত্মক পথে সার্থক পরিণতি ঘটাতে সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি সর্বাংশে কার্যকরী হয়েছে, সুতরাং দেখা যাচ্ছে লেখকের বক্তব্য ও অভিলাষকে উপন্যাসে রূপ দিতে অলৌকিক পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে উপন্যাসের শেষে যখন অন্ধ নায়িকা এই অলৌকিক শক্তিরই সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত ফিরে পেয়ে সুখে সংসার করে উপন্যাসটিকে সর্বাংশে মধুর মিলনাত্মক পর্যায়ে স্থান দিতে পেরেছে, তখন নি:সন্দেহে মানতে হয় যে উপন্যাসের মূল গতিতে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধিও পরিপূর্ণতা দান করতে অলৌকিক পরিবেশনা মূলত: দায়ী। রূপকাহনীর শেষে যেমন বাহু বলে জটিলতা প্রতিকূলতা সব অন্তর্হিত হয়ে মিলনাত্মক ও সুখকর পরিস্থিতিতে পরিসমাপ্তি ঘটে, তেমনি রজনী উপন্যাসেও যেন কোন ঐন্দ্রজালিকশক্তি সব দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ প্রতিকূলতা দূর

করে কাহিনীকে পরম ঈপ্সিত পরিণতির পথে পরিচালিত করে একটি সুখবহ পরিসমাপ্তি দ্বারা বঙ্কিমমানসের চরম শিল্পোৎকর্ষতার পরিচয় প্রদান করেছে। যদিও শচীন্দ্রের মনোবিকার ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে একে বাস্তবিক তথ্যের ভিত্তিতে সহজ সম্ভব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে লেখকের মধ্যযুগীয় সংস্কার ধর্মবিশ্বাস বা সাধু সন্ন্যাসীর অত্যাশ্চর্য শক্তি ঝাড়ফুঁক তুকতাক বশীকরণ ক্ষমতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত ছিল সেই যুক্তিবিহীন গোঁড়া মতবাদ উপন্যাসের আগাগোড়া লক্ষণীয়। শচীন্দ্র চরিত্র লেখকের বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণ রীতির রূপ সজ্জায় আবৃত স্বীয় সংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ প্রসূত একটি জাতকবিশেষ।

এরপর যথাক্রমে ১৮৮২ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী প্রকাশিত হয়। বাস্তব সজ রহিত তত্ত্বানুশীলনে পরিপূর্ণ এই দুই উপন্যাসে অপার্থিব ঘটনা ও অলৌকিক পরিবেশের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু জীবনে গীতার কর্মযোগের সাহিত্যিক রূপ দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এবং দেশাত্মবোধক অনুভূতির সঙ্গে পারমার্থিক যোগের এক অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করা হয়েছে আনন্দমঠ উপন্যাসের মধ্যে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র জীবনের আদর্শ ও চিন্তাধারা যেন ঔপন্যাসিক রূপ পরিগ্রহ করে এই গ্রন্থদুটির মধ্যে একনিষ্ঠ হিন্দু জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমকে এক বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছে। নিষ্কাম কর্মের এক মূর্ত্তিমতী রূপের প্রকাশ ঘটেছে দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রে, এবং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রয়ীর চারিত্রিক প্রতিভূ আনন্দমঠের সত্যানন্দ। স্বদেশপ্রীতির মহত্তর পরিসমাপ্তি মৈত্রী প্রেমে এ তত্ত্বটুকু প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আনন্দমঠ উপন্যাসে বহু অলৌকিকত্বের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। লোকাতীত পরিবেশ ও অপ্রাকৃত ঘটনাগুলি বাদ দিলে উপন্যাস দুটি যুক্তিহীন অসার গল্পকথায় পর্যবসিত হবে। উপন্যাসের কল্পনা চিত্রণের দিকটিও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপন্যাসের বাস্তবতার ঘাটতি এদের আছে কিন্তু সামগ্রিক রচনায় অতি বাস্তব বা অপ্রাকৃতের সূক্ষ্ম পরিবেশনায় কাহিনীর উপস্থাপনের নৈপুণ্যে এই উপন্যাস দুটি পরিপূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা পাবার উপযোগী। দেশব্যাপী অরাজকতা, অভাব অনটনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই অলৌকিকত্ব সৃষ্টির সাহায্যে তাঁর সাহিত্য রচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে, সমাজকে হিত ও কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করেছেন, এইখানেই সাহিত্যের চরম সার্থকতা।

সীতারাম উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, এবং এটিও একটি অনৈসর্গিক পরিবেশে সুসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ দলিলস্বরূপ। এতে কিছুটা ইতিহাসপন্থী বাস্তবস্পর্শ থাকলেও উপন্যাসের মূলগতি একটি লোকোত্তর আদর্শদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। জ্যোতিষীর অবতারণা এবং শ্রীর জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণীর ওপর উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত রয়েছে। শ্রী মূর্তিমতী যোগসাধনা জয়ন্তীর সাহচর্যে আপন জীবনও লোকত্তরা সাধিকায় পর্য্যবসিত করে এক অপার্থিব জগতে উত্তীর্ণা তার প্রভাব নায়ক সীতারামের ওপর অনেকখানি কার্যকরী। অনেক ক্ষেত্রে অতি প্রাকৃতের অবতারণায় বঙ্কিমচন্দ্রের গাঢ় ঈশ্বরানুভূতি ও সুচিন্তিত দার্শনিক বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিম সাহিত্যে অলৌকিকত্ব অবতারণার প্রধান তাৎপর্য নিহিত রয়েছে বঙ্কিম ধারণায় পাপবোধ সম্বন্ধে সহজ সঙ্কোচ বোধ এবং আদর্শের বিমুখতায় চিত্ত বিক্ষেপের প্রতীকার সাধন। সুতরাং এটি স্পষ্টতঃ লক্ষণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্র লৌকিক জীবনে ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শে এসে লৌকিক ক্রিয়া কলাপ ধর্ম-বিশ্বাস, লোকপ্রবাদ সংস্কার সবকিছুকে নিজস্ব করে গ্রহণ করে সেগুলিকে সাহিত্যে এমনভাবে রূপ দিয়ে গেলেন যে ঐগুলি তাঁর উপন্যাসে অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে একান্ত অপরিহার্য। এই দিক দিয়ে বঙ্কিম সাহিত্য জনজীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। আদর্শ ও নীতি-বোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, চরিত্র চিত্রণের পারিপাট্যে এবং নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির কৌতুহলোদ্দীপনায় বঙ্কিমের অলৌকিকত্ব রচনার অসামান্য অবদান রয়েছে। কিছুটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের স্পর্শ দিয়ে কিছুটা মধ্যযুগীয় লৌকিক সংস্কারের ভিত্তিতে বঙ্কিম যে অতিপ্রাকৃতকে উপন্যাসে চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে কাজে লাগিয়েছেন তা অনেক সময়ে বিচারশক্তিতে অযৌক্তিক হলেও সাহিত্যিক মূল্যায়নে এর দান অনেকখানি।

প্রবীণ শিল্পী তাকেসী হায়াসী

সুধা বসু

সপ্তদশ শতক থেকে সুরু করে আমেরিকার নৌ-সৈনানায়ক পেরীর আগমনকাল (১৮৫৩) পর্য্যন্ত ইউ-রোপীয় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ও বণিক গোষ্ঠীর অভিযান জাপানের সমাজ ও অর্থ নৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপান তার নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। বিদেশের নানা প্রভাব থেকে দেশকে বিমুক্ত রাখার চেষ্টা তখন জাপানবাসীদের মধ্যে বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পেরীর আগমনের পরে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব জাপানে এত দ্রুত তালে বিস্তার লাভ করতে লাগল যাকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা আর সম্ভবপর হয় নি। ক্রমশঃ জাপান কেবল আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্প বাণিজ্যেই পরিবর্ত্তন স্বীকার করতে বাধ্য হয়নি, দর্শন ও ধর্ম্মীয় জীবনেও পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ-গ্রহণ করতে হয়েছিল আগ্রহশীল। এর ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশের বাস্তববাদী শিল্পকলার ধারাও বাধাবন্ধহীন ভাবে দেশের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তোকু গাওয়া যুগের শেষ ভাগেই (১৮০১-১৮৫০) জাপানে পাশ্চাত্ত্য শিল্প ধারার ক্রমঃবিস্তার সুরু হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপ থেকে রূপকথার যে আদর্শ জাপানে এসে পৌছতে লাগল, তা ছিল অত্যন্ত নিম্ন প্রকৃতির। জাপানে পাশ্চাত্ত্য শিল্প-চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল সরকারী কলা শিক্ষা-গারে। কিন্তু শিক্ষা ও চর্চ্চা কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা পদ্ধতিতে চালিত হয়নি। কেবল কতকগুলি বাঁধা ধরা রীতি পদ্ধতির আবরণ যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল জাপানের আধুনিক চিত্রকলার উপরে। ফলে, পাশ্চাত্ত্য প্রথার শিক্ষা ও চর্চ্চার গতি তখন আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে নি। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল উৎসাহী রূপকার ও রূপবিদ শিল্পকলার ক্ষেত্রে একটি নতুনতর পথ উন্মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জাপানের প্রাচীন চারু শিল্পকে ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় একটি উচ্চ আদর্শ-মূলক স্তরে উন্নীত করা। এঁদের আদর্শ ছিল কলাশিল্পে জাতির স্বকীয় আত্মার সঠিক প্রতিফলন করা। এই আন্দোলনের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "নিপ্পন বিজিৎ সুইন" নামক জাতীয় শিল্প সাধনার একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। জাপানের প্রখ্যাত মণীষী ও কলাবিদ কাকাশু ওকাকুরা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান একজন। তাঁরই প্রেরণায় ও উদ্যোগে জাপান থেকে ভারতবর্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্যত্ব

তাকেসী হায়াসী

গ্রহণ করতে এসেছিলেন হিশিদা, তাইকান প্রমুখ কুশলী কলাকারগণ। এই শিল্পীরা জাপানের নিজস্ব চিরাগত কলা-পদ্ধতিতে ছিলেন অতি সুদক্ষ ও সুনিপুণ। তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন দুই দেশের চিত্র পদ্ধতি ও শিল্প ভাবনা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাতে জাপানের কলাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পদ্ধতির উগ্র পরি ভাব মধ্যেও তাইকান দেখিয়েছেন সুগভীর কল্পনা ও অদ্ভুত ধ্যানধারণার অভিব্যক্তি। তাঁর এই জাতীয় চিত্ররাজির মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় হল, 'নীরস অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য অঞ্চলে কুৎ সুজেনের (সোবংশের নির্ব্বাসিত রাজকুমার) উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ'। চিত্রপটে রূপায়িত পরিবেশে রয়েছে শুধু বায়ুর হিল্লোলে আন্দোলিত নার্গিসাস ফুলের বাহার। সেফুল হল পবিত্রতার নীরব মাধুরী। শিল্পীর অন্তরে যে প্রবল উদ্দীপনা ও আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল এযেন তারই অভিব্যক্তি।

এইরূপে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন নতুন পরিবেশে যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের প্রবল প্রতাপের মধ্যেও জাপানের রূপকলা একটি উচ্চতর জীবনাদর্শের সন্ধান করেই চলেছিল।

নিপ্পন বিজিৎসুইন (জাতীয় কলাপরিষদ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। আর ১৮৯৬ সালে টোকিও সহরে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী তাকেসী হায়াসী। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে যখন শিল্পীর জীবন-বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুতির পথে এগিয়ে চললেন, তখন জাপানের চিত্রকলার গতি-প্রকৃতি এক দোটানার মুখে পড়ে অনেক রূপকার ও রূপবিমুগ্ধকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। একদিকে চলেছিল জাপানী-শিল্পের মূল ভিত্তি যে আদর্শবাদিতা, তার পরিপূর্ণরূপে অনুশীলন ও চর্চা। সেখানে কালিতে তুলিতে এবং নানাবর্ণ বিন্যাসের মাধ্যমেও অতি চমৎকার চিরাগত রীতির চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির ধারা এগিয়ে চলছিল অবাধ গতিতে। পূর্ব্বসূরীদের সেই বিশেষ আংগিক শৈলী ও ধরন ধারণ শিল্পীরা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেই যথেষ্ট প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেন। উহার শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন হয়েছিল 'কানো' শিল্পী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সম্ভারে। মূল জাপানী শিল্পের বিবর্তন ধারা এগিয়ে এসেছিল নারাযুগ (৭০০—৮০০ খ্রীঃ) থেকে এবং তা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। এই বিবর্তন ধারায় শিল্পী ও শিল্পবিদ্‌গণ মনে করতেন যে জাতীয় ভাবাদর্শের মধ্যেই বাস্তবিক শিল্পসত্তা থাকে নিহিত। শ্রেষ্ঠ শিল্প হবে এমন জিনিষ, যার জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হবেন।

কিন্তু ইউরোপের শিল্পরীতি ও আদর্শ জাপানে আমদানী হওয়ার পরে কতক শিল্পী ওলন্দাজী চিত্রকলার রেখাবর্ণ প্রভৃতির নকলকর্ম্মে করেছিলেন আত্মনিয়োগ। কেহ কেহ আবার বিদেশাগত নবরীতিকে নিজস্ব দেশীয় আঙ্গিকের সঙ্গে মিশিয়ে চিত্র রচনায় হয়েছিলেন ব্যাপৃত। প্রকৃতিকে হুবহু চিত্রপটে রূপায়ণ ও বস্তু সামগ্রীর খুঁটি-নাটির প্রতি আগ্রহ দেখা দিল অত্যধিক পরিমাণে। জাপানী চিত্রশিল্পের মামুলী দেশজ জলরং ও সূক্ষ্ম তুলিকা ত্যাগ করে শিল্পীরা হাতে তুলে নিলেন বিলেতী তেলরং ও উহার উপযোগী ব্রাশ তুলি।

এই বিদেশী প্রভাবযুক্ত নতুন পরিবেশে আকৃষ্ট এবং নব পদ্ধতিতে আস্থাবান নিকাকাই' নামক তেল রং এর চিত্রকার গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হলেন উল্লিখিত নবীন শিল্পী তাকেসী হায়াসী। কিন্তু শিল্পী জীবনের গোড়ার দিকে দীর্ঘদিন তিনি নিজেকে তেল রং এর নব প্রবাহের আওতার বাইরেই রেখেছিলেন। তখন তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন জাপানের নিজস্ব চিরাচরিত চিত্র পদ্ধতির চর্চায় এবং তিনি স্বকীয় ও স্বতন্ত্র, আর অতি শক্তিশালী ও গুরুগম্ভীর ভাবময় একটি আঙ্গিক করে-ছিলেন সৃষ্টি। চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন এই পন্থার সাধক। পঁচিশ বছরে পৌঁছে তিনি তেলরং এর রীতিতে চিত্র সাধনার পথে করলেন পদক্ষেপ। তখন-কার অন্যান্য যুব শিল্পীদের ন্যায় তিনিও এই পথে দ্রুত এগিয়ে চললেন এবং তাঁর সহজাত নিপুণ শিল্প বৃত্তির

প্রভাবে ও তাঁর স্ত্রীর অতিমাত্রার উৎসাহে তিনি তেল রং এর পথে চিত্র রচনা করেও অচিরে সুসিদ্ধি ও সাফল্যের উচ্চস্তরে হয়েছিলেন উন্নীত। ১৯২১ সালেই 'নিকাকাই' প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীতে তাঁর একখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল শিল্পীর অজ্ঞাতসারেই। চিত্রখানি প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন শিল্পীর চিত্র চর্চায় অত্যুগ্র উৎসাহী পত্নীটি এবং চিত্রের মডেলও ছিলেন স্বয়ং শিল্পীর সেই পত্নী। ছবিখানি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে "চোগিউ" পুরস্কার পেয়েছিল সেই প্রদর্শনীতে। পরের বছরও হায়াসী আবার নিকাগ্রুপের পুরস্কার লাভ করেন। তখুনি তিনি জাপানের আধুনিকপন্থী তরুণ কলাকারদের পুরোভাগে স্থান অধিকার করার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

১৯৩০ সালে তিনি একটি স্বাধীন শিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতিটির নাম দিয়েছিলেন "দোকুরিৎসু বিজুৎসু কিওকাই।" এরপরে ১৯৩১ সালে থেকে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত তিনি ইউরোপে, বিশেষ করে প্যারিসে কাটান।

তারপরে আবার ১৯৬০ সালে তিনি প্যারিস ভ্রমণ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৯ সালে তিনি প্রথম "মাইনিচি" শিল্প পুরস্কার এবং ১৯৫৯ সালে আর্ট একাডেমির পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর চিত্র প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বলিষ্ঠ ধরণে, প্রত্যক্ষরূপে চিত্রপটে ব্যক্তি সত্ত্বার আরোপণ। প্রকৃতির রূপাবলীকে বিশিষ্ট রকমে নৈরূপ্যময় রীতিতে প্রকাশ, গভীর সতেজ রেখারীতিতে চিত্রায়ণ। চিত্রপটে আর একটি বিষয়ে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন ও মনোনিবেশ করেন। তাহ'ল, চিত্রে বস্তু সমাবেশ ও বিষয় বিন্যাসে ভাবসাম্য রক্ষা। হায়াসীর মতে যে কোন রীতির চিত্রেই মুখ্য বিষয় হ'ল বস্তু বিন্যাসে সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষা।

তেল রং এর চিত্র সাধনায়ও তিনি তাঁর সেই আদি মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কখনও পরিত্যাগ করেন নি। ইহার ফলে পাশ্চাত্য প্রথায় চিত্রাঙ্কণ করলেও তিনি হলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতির, স্বাধীন প্রকৃতির একজন শিল্পী। তাঁর এই বিখ্যাত স্বকীয় রীতির নাম হ'ল "হায়াসী ষ্টাইল" তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির বিশিষ্টতা হচ্ছে সতেজ, দীপ্তিময় রূপ এবং ভাবের গভীরতা। তিনি সর্ব্বদাই চিত্রপটে নতুন নতুন রূপ রহস্য আবিষ্কারে উৎসাহ অনুভব করেন। এই জন্য তাঁর চিত্রে সব সময়ই নতুন নতুন গুণ ও জীবন্তভাবের প্রকাশ দেখা যায়। উহা নিত্যই নতুন। একজন সমালোচক একদা বলেছিলেন যে তাকেশী হায়াসীর চিত্র কখনও সমাপ্তি লাভ করে না। অর্থাৎ তিনি উহাতে আরও নতুন নতুন ভাব ও গুণ প্রকাশ করতে পারেন।

হায়াসীর চিত্রশৈলীর মধ্যে যে চতুষ্কোণ রীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা তিনি পেয়েছেন মোদিগ্লিয়ানির সঙ্গে ভ্যাগ গগের তুলিচালনার কায়দাকানুন প্রত্যক্ষ ভাবে মিলিত হয়ে যে পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে।

ব্যক্তিগত জীবনে হায়াসী অত্যন্ত সাদাসিধে ও সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁর পরিচিত মহলের সকলের প্রতি তিনি খুব সহানুভূতিশীল। শিল্পীর অতি রূঢ় সমালোচকও একথা বলেন যে হায়াসী হলেন অকপট প্রকৃতির, আড়ম্বরহীন ও স্পষ্টবাদী স্বভাবের লোক।

তাঁর সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ চিত্র হ'ল ফুজি পর্ব্বতের শিখর ও দৃশ্যের বিরাটাকার চিত্র। পর্ব্বতের কোলে স্থাপিত শিল্পী তাঁর ষ্টুডিওতে বসেই এই চিত্রখানি অঙ্কন করেন। সুনীল আকাশের বুকে সুউচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের বেগুনী রংএর উপরে লাল চূড়াটি অত্যুজ্জলরূপে দীপ্যমান। পর্ব্বতের পাদদেশে হলুদ সবুজের গভীর আবেশ। ফাঁকে ফাঁকে কাল রং এর তুলির টান একটা গূঢ় রহস্যের প্রভাব দিয়েছে এনে। তেলের রংএ অঙ্কিত দৃশ্যচিত্রের এখানি একটি সার্থক ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পাশ্চাত্য পর্যটনে আমার অভিজ্ঞতা

মীরা গুহ

ভারতবর্ষ থেকে প্রথম যেদিন অক্সফোর্ডে এসে পৌঁছলাম সেই দিনেই মনে সাধ হয়েছিল ইউরোপ ভ্রমণ করার, তাই প্রথম যেদিন লণ্ডন ছেড়ে ব্রাসেলস্‌এ এসে পৌঁছালাম, সেদিন আমার জীবনে বোধ হয় একটি স্মরণীয় দিন। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম রাস্তায় বেরিয়ে নিজেকে অসহায় বোধ করলাম। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্‌। বিরাট একটি আধুনিক গঠন রাজধানী। মনে অনেক পুলক ও বিস্ময় নিয়ে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু বিস্ময়ের চরমে এসে যে পৌঁছবে- তা আগে ভাবতে পারি নি, আর আমার মনে হয় আমার অবস্থায় না পড়লে ঠিক আমার তখনকার অবস্থা উপলব্ধি করতে কেউ পারবে না। বেলজিয়ামে ডাচ ও ফ্রেঞ্চ ভাষা চলে, ও দু'টি ভাষাই আমি জানি না। তাদের চাল-চলন, রীতি-নীতি আমার জানা নেই, কারণ রাস্তায় বেরিয়ে দেখি অসম্ভব জোরে গাড়ি চলছে। শুনলাম এখানকার প্রাইভেট গাড়িতে নাকি কোন লাইসেন্স নেই, যে কেউই গাড়ি-চালাতে পারে, সুতরাং গাড়ি চাপা পড়লে গাড়িচালকের কোন দোষ হবে না, আমি ত হতভম্ব। জিনিষ কিনতে গিয়েও ধাক্কা খেলাম, দেখলাম এখানে আর পাউণ্ডের চলন নেই, সব গিল্ড হয়ে গিয়েছে।

ব্রাসেলস্‌এ অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আন্তর্জাতিক অ্যাটোমিয়াম। একটি বিরাট ষ্টিলের তৈরী মনুমেণ্ট। এর বিরাটত্ব দেখলে বিস্ময় লাগে, কোণাকুণিভাবে নয়টি বল শূন্যে ঝুলছে, এর উচ্চতা ৩৩৫ ফিট এবং প্রত্যেকটি বলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬৯ ফিট এবং সমগ্র অ্যাটোমিয়ামের ওজন ২২০০ টন। সবচেয়ে উঁচু বলটিতে একটা রেস্তোঁরা আছে, যার মধ্যে ১০০ জন লোক বসে খেতে পারে এবং সেই উঁচুতে পৌঁছাবার জন্য ইলেকৃট্রিক সিঁড়ির (Escelators) বন্দোবস্ত আছে এবং সেই সিঁড়িতে একসঙ্গে ২৭ জন যেতে পারে। বলগুলি রূপোর বলের মত মনে হয়, এত এর জেল্লা।

ব্রাসেলস্‌এ আরও অনেক কিছুই দেখার জিনিষ আছে, যেমন আন্তর্জাতিক গিল্ড মার্কেট গ্র্যাণ্ড স্কোয়ার, পঞ্চদশ লিওপোল্ডের বিজয় তোরণ আর 'Manneken-Pis' একটি ছোট্ট শিশুর নগ্ন মূর্তি, শুনলাম বহু রাজা, মহারাজা তার নগ্নতা ঢাকার জন্য দামী দামী পোশাক পাঠায়।

বেলজিয়াম কয়েকদিন থেকে আমি হল্যাণ্ডে পাড়ি দিলাম। হল্যাণ্ডের রাজধানী ডেন হেগ। এই শহরের দু'টি ভাগ আছে, একটিকে তাঁবুর শহর বলে। এটি অস্থায়ী শহর, যখন গরম পড়ে তখন বহু দেশ থেকে টুরিষ্টরা এসে সমুদ্রের ধারে রৌদ্র উপভোগ করে, তার ফলে অস্থায়ী দোকান, বাড়ী ও হোটেলের সৃষ্টি, শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তাঁবুর শহর অদৃশ্য হয়ে যায়। আর একটি চমৎকার জিনিষ দেখলাম 'মাডুরোডাম' (Madurodam), সমস্ত শহরের দ্রষ্টব্য স্থান ও বাড়ীর একটি ছোট্ট মডেল করে দেখান হয়েছে। গাড়ি, ট্রেন, লরী, বাস এমন কি বিভিন্ন পরিকল্পনা পর্যন্ত ইলেকট্রিকে দেখান হচ্ছে। হেগ শহরের মাঝখানে আছে 'শান্তির প্রাসাদ', এই প্রাসাদে বিভিন্ন দেশ থেকে শান্তির নমুনা হিসাবে এই প্রাসাদে কেউ দিয়েছে জানলা কেউ দিয়েছে দরজা ইত্যাদি—কিন্তু হায়রে, তবুও কি দেশে শান্তি ফিরে এসেছে?

তারপর জাহাজে করে এলাম ডাচ-জেলেদের দ্বীপে। কেমন অদ্ভুত পোশাক তাদের, তারা সব কাঠের বুট

জুতো পরে, বাড়ীগুলো অনেকটা মাচার মত। আর গেলাম আমষ্টারডামে (Amsterdam), দেখলাম জাতীয় স্মৃতি-সৌধ, রাজপ্রাসাদ, হীরার কারখানা।

হেগে তিনদিন থাকার পর এলাম জার্মানীর কলোনে। শুনলাম কলোনে ওডিকোলন বিখ্যাত, বিশেষ করে 4711. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ক্ষত-বিক্ষত হয়েও আজও পৃথিবীতে সে যন্ত্রপাতির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে, বিশেষ করে ক্যামেরা। তাদের বিরাট রাস্তার পরিকল্পনা দেখলাম, আর তাদের অত্যন্ত পুরাতন চার্চ, শহরের প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট ও অত্যন্ত কারুকার্য। এই চার্চের স্থাপত্য শিল্প একটা দেখার মত জিনিষ।

সেখান থেকে রাইন নদীর উপর দিয়ে চলতে চলতে দেখলাম পাহাড়, পাহাড়ের উপরে ব্যারনদের পুরাতন দুর্গগুলি, অতি সুন্দর। তারপরে এসে পৌঁছলোম বিশ্ববিদ্যালয় হাইডেলবার্গে।

হাইডেলবার্গে বিশ্ববিদ্যালয় দেখে মনে একটা পুলকের সৃষ্টি হ'ল, কারণ আমি নিজে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী। রাত্রে নিজের হোটেলে আছি, ওয়েটার এসে জানাল যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এসেছে টুরিষ্টদের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে শুনলাম সে আমাদের নিয়ে যেতে এসেছে তাদের আস্তানায়, সেখানে আমোদ স্ফূর্তি করার জন্য। এটা তাদের একটা নিয়ম।

হাইডেলবার্গ প্রিন্টিং মেশিনের জন্য বিখ্যাত, সে সব প্রিন্টিং মেশিন দেখে মনে বড় লোভ হচ্ছিল, ভাবছিলাম কবে আমাদের দেশে এই ধরনের মেশিন করবে!

কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ড প্রাকৃতিক দৃশ্যে পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত, অত্যন্ত মনোরম এবং নয়নাভিরাম। আমি সুইটজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণে পাঁচ দিন ছিলাম। সেখানে ষোড়শ শতাব্দীর ঘড়ি দেখেছি, বিরাট ও সমস্ত রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বার্ণ শহরে আর একটি মজার জিনিষ আছে, সে হচ্ছে বিয়ার পিট (Bear-pit)। একটা গর্তের মধ্যে তিনটি ভাল্লুক আছে—ওপরের দর্শকরা তাদের খাবার দেবার লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি দেখে নিচ্ছে, অনেকটা আমাদের দেশের চিড়িয়াখানার হাতীদের মত, পয়সা ও খাবার দেওয়ার পরিবর্তে শুঁড় দিয়ে নমস্কার দেওয়া। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য বার্ণে পাওয়া যায় না, তাই তাকে দেখবার জন্য এবং উপলব্ধি করার জন্য চলে গেলাম ইনটারল্যাকেনে। অপূর্ব দৃশ্য! পাহাড়ের উপর তুষার জমে আছে, পাহাড়ের গা দিয়ে শত শত ঝর্ণা নেমে আসছে এবং সেই ঝরণা দিয়ে বিরাট হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে, আবার সেই পাহাড়ের গা দিয়ে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে; শুধু তাই নয়, পাহাড়ের গায়ে সুদৃশ্য ছোট ছোট্ট বাড়ীগুলি যেন ছবির মত। বার্ণে সুইস ফেডারেশান দেখে চোখে আনন্দ হয়েছিল, এখন যেন চোখে তৃপ্তির আমেজ পেলাম, চোখ যেন আমার জুড়িয়ে গেল।

প্রকৃতি-গড়া দেশ থেকে মানুষের গড়া দেশে এলাম ফ্রান্সে। Paris-এ পথে পথে আছে মানুষের তৈরী নানা কীর্তি, বেশীর ভাগই চতুর্দশ লুই বা নেপোলিয়ানের অবদান। কিন্তু Paris-কে জানতে হ'লে, বুঝতে হ'লে দিনের আলোতে নয় রাতের বিজলী বাতির ইশারায় জানতে হবে। Paris দিনের বেলায় ঘুমায় আর রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে এবং তখন তরুণ-তরুণীরা ভালবাসার অঞ্জন মেখে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে, একটা হোটেলের তরুণ বেয়ারাও তার ধনী তরুণী ক্রেতাকে লিডো হোটেলে রাত্রে তার সঙ্গে নাচার জন্য আমন্ত্রণ করতে পারে, এতে এদের দেশে কেউ কিছু মনে করে না।

রাত্রে জলের মধ্যে কাঁচ ঘেরা বোটে করে যখন সাইন নদী পার হচ্ছিলাম, তখন মনে একটা পুলকের শিহরণ খেলে গেল। এই সাইন নদী শহরটাকে দু'ভাগ করেছে। কিছুদূর অন্তর এক একটা ব্রীজ, এই ব্রীজের উপর দিয়ে গাড়ি ও মানুষ চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের শব্দ আমাদের

সেই কাঁচ-ঘেরা নৌকায় পৌঁছায় না। এই ব্রীজগুলো একেকজন রাজার বিজয়ী কীর্তি, যেমন নেপোলিয়ানের ব্রীজে বড় বড় করে 'N' লেখা, কারুর সিংহের মুখ আঁকা, কারুর ফুলের, সবই পাথরে খোদাই করা, রাত্রের আলোতে সেগুলি যেন অপূর্ব! প্যারিস রাত্রে আলোর সজ্জা গায়ে দেয়, সেই আলোর মধ্যে দেখলাম প্রেমিক দ্বীপ—এটা কপোত-কপোতীদের নির্জন কেলীকেন্দ্র, সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। আর দেখলাম পুরাতন শিল্পীদের বাসস্থান, একটি নির্জন দ্বীপ, শুনলাম, আগে কোন শিল্পী জনসাধারণদের মধ্যে থাকতে চাইত না, তাই সমাজ থেকে দূরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্ম নির্জন বাস। দিনের আলোয় নটর ডেমী (Notre-Dame Cathedral) ক্যাথিড্রেল দেখেছি, সে এক রকম সুন্দর, আবার রাতের আলোয় জল থেকে দেখা যেন অন্যরকম, একটা রহস্য ঘেরা।

স্থলে দেখলাম স' এলিসি রাজপথ, যা নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর রাজপথ, চারিদিকে ঝর্ণা এবং বিচিত্র আলোর খেলা, সেই বিরাট আইফেল টাওয়ার আলোকিত হয়ে দূর থেকে পথিকদের হাতছানি দিচ্ছে, চতুর্দশ লুইয়ের বিরাট রাজপ্রাসাদ এখন বিরাট মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে, যা দেখতে অন্তত ১৫ দিন লাগে। নেপোলিয়ানের অপূর্ব বিজয়ী তোরণ কিন্তু আলোহীন, কারণ সেটা সংস্কার হচ্ছে। মেরী এ্যান্টোনিয়েটের বধ্যভূমি এখন আলো ও ঝর্ণায় বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে, তার বন্দীশালা ও ফরাসী বিপ্লবীদের বন্দীশালা এখনও অটুট ও অপূর্ব। কনকর্ড স্কোয়ারের বিভিন্ন আলো ও ঝর্ণার মধ্যে দিয়ে অবশেষে মুলিন রুশে এসে পৌঁছলাম, এটি পৃথিবীর মধ্যে 'ক্যান ক্যানের' জন্ম বিখ্যাত। বাইরে একটি যুবতীর নগ্ন মূর্তিকে এমনভাবে আলোর সজ্জায় সাজিয়েছে যে মনে হচ্ছে রাস্তার যুবকদের সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাকে জানবার জন্ম—সেই জানবার দুর্নিবার আকর্ষণে হয়ত অনেক যুবক পতঙ্গের মত প্রাণ দিয়েছে (?)।

রাত্রে যখন নিজের হোটেলে ফিরলাম, রাত তখন দু'টো। আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে, কিন্তু প্যারিস তখনও তার উত্তাল তরঙ্গে নেচে নেচে তার ইন্দ্রজাল বিস্তার করছে—আর পারলাম না তাকে দেখতে —ঘুম, ঘুম, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—

———

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

গরমের ছুটিতে কাশ্মীর ভ্রমণ ১৯৬০

কাশ্মীরে আমি আগে কখনো যাই নি। যেতে পারতাম—দেরাদুন থাকতে অনেকবার সুযোগও হয়েছিল—কিন্তু যাওয়া হয় নি। কাশ্মীর সম্বন্ধে এত শুনেছি—এত লোক সেখানে যায় যে আমার যাবার স্পৃহা হয়নি আগে। এপ্রিলের শেষে শ্যামলী শান্তিনিকেতন থেকে গরমের ছুটিতে এসে গেছে। আমাদের ছুটি হলেই রওনা হব। মে মাসের মাঝামাঝি রওনা হলাম—পাঠানকোট এক্সপ্রেসে। পাঠানকোট পৌঁছে সেখান থেকে বাসে করে শ্রীনগর। এত লম্বা পাহাড়ের পথে বাসে করে যাওয়া ভেবেছিলাম কষ্টকর হবে, কিন্তু তা হ'ল না। বেশ ভালভাবেই শ্রীনগর পৌঁছানো গেল। প্রথমে ভেবেছিলাম শ্রীনগরে বেশীদিন না থেকে, 'পাহাল গাঁও' গিয়ে থাকব। কিন্তু ভেবে-চিন্তে দেখলাম—শ্রীনগরে থেকে সেখান থেকেই নানান জায়গায় ঘুরে দেখবার সুবিধা। সেই জন্য শ্রীনগরের 'বুলিভার্দে' একটা হোটেলের (নিউ প্যালেস হোটেলে) তেতলায় 'ডাল' লেকের ওপর আস্তানা করা গেল।

তেতলার ঘর থেকে মনে হয় যেন 'হাউস বোটেই আছি। অথচ 'হাউস বোটে' থাকার যে অসুবিধা, সেগুলো নেই। প্রথম সপ্তাহ ত' রোজ শিকারায় ঘুরে বেড়ান চলল। যেখানেই যাই শিকারায় ডাল লেকের ভেতর দিয়ে যাই। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো সব এক এক করে দেখা গেল। সে সব না লেখাই ভাল। এত লোকে এত কথা সে সব জায়গার বিষয় বলেছে যে নতুন কিছু বলা মুস্কিল। কাশ্মীরী জিনিষ কিছু কেনা-কাটা হ'ল। চেনা লোক কাশ্মীরে কেউ কেউ আছেন জানা গেল। কাশ্মীরের মহারাজা করণ সিং সেও ত চেনা-জানা ছেলে। আমাদের ছাত্র ছিল ছেলে বয়সে 'দুন স্কুলে'। কিন্তু নানা কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করা হ'ল না।

হঠাৎ কর্ণেল দত্ত ও তাঁর স্ত্রী রমা দত্তর সঙ্গে একদিন দেখা। 'রমা'—শ্রী জে, আর, দাশ, এর (এস, আর, দাশ এর ভাই) কন্যা। এখন চণ্ডীগড়ে বাসা বেঁধেছেন। দেরাদুনেও ছিলেন আগে। তখনই আমার সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়। কর্ণেল দত্ত'রা একদিন আমাদের 'ডিনারে' ডাকলেন তাঁদের হোটেলে। এই একমাত্র 'ডিনার' খেয়েছি অন্যদের সঙ্গে, হয়ত নিজের হোটেল ছাড়া কোথাও খেতে যাইনি। শ্যামলী ও আমি কোন রকমে একটা শিকারায় ক'রে ডাল লেকের অন্যদিকে সেই হোটেলে গিয়ে ত পৌঁছলাম। ভাল হোটেল। আরও কয়েকজনকে বলেছেন। দেখি, তাঁরা চেনা লোক। মিঃ জি, ডি, সোন্ধী—যিনি লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন—লাহোরে আমার প্রদর্শনীও উদ্ঘাটন করেছিলেন। গম্ভীর মানুষ। অন্য কারোকে কথা বেশী বলতে দেন না—নিজেই বলেন

বেশী। অবশ্য তার কারণ তাঁর নানান বিষয় অভিজ্ঞতা বেশী- সুতরাং তাঁর কথা শুনতে খারাপ লাগে না। আমাকে মনে আছে তাঁর। নানান রকম কথাবার্ত্তা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধ ফরসা রোগা তাঁর সর্ব্বস্ব খরচ করে। পাকিস্থান হওয়াতে সব গেছে। লাহোরে টিঁকতে পারেন নি। অসিত দা'র মুখে সমরেন্দ্রবাবুর অনেক গল্প শুনেছি—তাঁর আঁকা ছবিও প্রদর্শনীতে ও প্রবাসীতে আগে দেখেছি।

শান্তি দূত

(সাহেবী ধরণ ধারণ) বসে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। তাঁর সঙ্গে বহুদিন আগেই আলাপ হতে পারত—কিন্তু এতদিন পরে হ'ল। তিনি হলেন শিল্পী সমরেন্দ্র গুপ্ত। লাহোরে মেয়ো স্কুল অফ আর্ট এর প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। লাহোরে বাড়ী করেছিলেন

ছবির প্রিন্ট জমানোতে আমার উৎসাহ ছিল। বহু ছবি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' থেকে কেটে কেটে জমিয়েছিলাম। তার মধ্যে সমরেন্দ্র বাবুর ছবিও বাদ যায়নি। লখনউতে এসে গোমতীর বন্যায় সে সব গেছে। এতদিন পরে হ'লেও তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে

খুব ভালই লাগল।...কাশ্মীরে থাকতেও অনেক 'স্কেচ' করেছিলাম শিকারায় বসে। নেপালী কাগজের অজস্র স্কেচ (ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট এও) করেছিলাম। দান ধ্যানে কিছু গেছে—কিছু গেছে গোমতীর বন্যায়—অবশিষ্ট দু'চারখানা এখনো আছে। কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে দুটো ডাল লেকের বড় করে ছবি এঁকেছিলাম। একটা ছবি ছিল কাশ্মীরি মেয়ে ফুল বিক্রী করছে শিকারায়। দুন স্কুলের একটি ছেলে হঠাৎ একদিন লখনউ এসে নিয়ে গেল ছবিখানা জোর করে। ছাত্র ছিল না বলতে পারলাম না। আর একখানা ছবি লখনউএ আমার ড্রইং রুমে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। মিসেস নাগ বলে এক ভদ্রমহিলা আছেন লখনউএ তিনি নিয়ে গেলেন একদিন মোটরে তুলে। প্রায়ই এসে ছবিটা দেখে বলতেন—'বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! একদিন এমনি বলছেন বসে বসে।ছবির দিকে তাকিয়ে। আমাকে বলতেই হ'ল 'লইয়া যান'। ভদ্রমহিলা ময়মনসিংএর মেয়ে। আর বাক্য ব্যয় না করে অমনি ছবিখানা নিয়ে মোটরে তুললেন। তাঁর দুই মেয়ে যত বলে 'মা নিও না—নিও না'—মা কি শোনেন সে কথা। ভাগ্যি ভাল তাঁর যে ছবিখানা তাঁর মোটরে এঁটে গেল। আরেকটু বড় হলেই মোটরে ঢুকত না। কেউ যদি মনে প্রাণে ছবি চায় তাকে ছবি দিয়ে দিতেই হয়। আঁকি কেন ছবি—জমা করতে নয় নিশ্চয়ই। বিক্রী করে টাকা কিছু পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে টাকা থাকে না, খরচ হয়েই যায়। ছবিটা কিন্তু বেশ কিছুদিন থাকে, অবশ্য রাখতে পারলে যত্ন করে। গুলমার্গের চেয়ে শোনমার্গ আমার ও শ্যামলীর ভাল লেগেছিল। ঘোড়ায় (টাট্টু) চড়া—বরফের ভেতর গিয়ে খেলা। সবই করেছিলাম ছেলেমানুষের মত। থাকবার মত জায়গা অবশ্য 'পাহালগাঁও।' ঝর ঝর করে নদী বয়ে চলেছে। পাহাড়ের চুড়ায় চুড়ায় বরফ। নদীর কিনারে হাজার হাজার তাঁবুতে লোকেরা মনের আনন্দে রয়েছে। ছুটি কাটাবার অতুলনীয় জায়গা।

কাশ্মীরে শ্রীনগরে শিল্পীদের সঙ্গে দেখা হল। গভর্ণমেণ্ট 'ডিজাইন সেণ্টার' খুলেছে। সেখানে ত্রিলোক সিং আছেন দেখা হ'ল—তাঁর আঁকা ছবি দেখালেন।

'ডিজাইন সেণ্টার' ঘুরে দেখলাম তাঁর সঙ্গে। ত্রিলোক মডার্ণ ছবি আঁকে—অথচ হাত ও ড্রইং ভাল। প্রিণ্টারস্ ইঙ্ক্ ব্যবহার করে মাঝে মাঝে—তাই ছবিতে চেকনাই ভাব আছে।

কাশ্মীরে আমাদের সঙ্গে মহম্মদ হানিফ, লখনউ আর্ট কলেজের মডলিংএর লেকচারার এসেছিলেন।

শিল্পীর সঙ্গে

আমাদের সঙ্গেই সর্ব্বদা বেড়াতেন। সে মুসলমান, নামেই সবাই বুঝতো—মুসলমানরা তার কথাবার্ত্তায় বুঝে নিত। আমার পদবী 'খাস্তগীর' সুতরাং আমাকেও অনেক সময় সেখানে মুসলমান ভেবে নিত। এতে টাঙ্গাওয়ালা শিকারাওয়ালারা বড় বন্ধুভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলত। একদিন হজরতবাল যাবার পথে একটি টাঙ্গাওলা আমাদের মুসলমান ভেবে খুব গল্প লাগাল। সে বলছিল নেহেরু সাহেব কাশ্মীরের যে 'কায়দা' করেছেন তা পাকিস্তান করতে পারত না—তাইত চুপ করে আছি। 'কায়দা' যা নেবার নিয়ে পাকিস্তানের ত আমরা হয়েছি তাতে আর সন্দেহ নেই। এই যদি সব কাশ্মীরের লোকেদের মনোভাব হয় তবেই হয়েছে। ভালোয় ভালোয় কাশ্মীর থেকে ফিরলাম। দ্রষ্টব্য জায়গা যতদূর সম্ভব যা দেখেছিলাম তাতেই খুসী। আরো অনেক ঘুরতে হয়ত পারতাম কিন্তু তবে ঘোরাই হত—ছুটি হত না ঠিক।

গোমতীর বন্যা। অক্টোবর ১৯৬০

গরমের ছুটি ফুরোলো। আবার নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ হ'ল। নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা শেষ হ'ল।

কিন্তু বর্ষার জন্য প্রায়ই কাজে ঢিলে পড়তে লাগল। বৃষ্টির প্রাচুর্য্য একটু বেশী যেন এবারে। বৃষ্টি হয় আর গোমতীতে জল বাড়ে, বন্যার ভয় দেখায়। বর্ষাকাল ত কাটলো। পূজোর সময় তখন—অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। আমার কাছে শ্যামলী পূজোর ছুটিতে এসে গেছে। আমার তিন বোন এবারে আমার কাছে এসেছেন বেড়াতে : দিদি—ছোট দিদি ও শান্তি। শান্তির

বধূ

দুই মেয়েও সঙ্গে আছে। বাড়ীটায় লোক সমাগম হওয়াতে অতটা ভূতুড়ে বাড়ী মনে হচ্ছে না। শান্তির মেয়েরা হৈ হৈ ক'রে বাড়ীটাকে সজীবতা এনেছে। অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ, গোমতীর বন্যার জল কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করল। তা' দেখে আমি কলেজ হষ্টেলের দিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছলাম।

হষ্টেলের সব ছেলেরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি তাদের আর অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ যে যার বাড়ী চলে যেতে বললাম। পঁচিশটি জন ছেলে তখন হষ্টেলে ছিল—তার মধ্যে নানান কারণে ১৯ জন ছেলে বাড়ী যেতে পারল না। কারো কাছে হয় টাকা নেই, হয়ত কেউ ট্রেন ধরতে পারল না। কলেজের ভেতরে মাষ্টার যাঁরা থাকতেন—তাঁরা সবাই হষ্টেলের দোতলায় এসে আস্তানা গাড়লেন। তখন গোমতীর জল ঘণ্টায় দু' ইঞ্চি করে বাড়ছে। আমার বাংলোর সামনে যখন জল এসে পৌঁছল তখন শ্যামলী ও আমার বোন, বোনঝিদের নিয়ে প্রথমে কলেজের ডিজাইন সেকশনে গিয়ে উঠলাম। কলেজের 'প্লিন্থ' আমার বাংলোর 'প্লিন্থ' এর চেয়ে দেড়ফুট খানেক উঁচু। ভাবলাম বাংলোয় জল ঢুকতে সন্ধ্যে বেলা হ'য়ে যাবে। আর কতই বা জল বাড়বে। জিনিষপত্র উঁচু টেবিলে, খাটের ওপর রেখে দিলাম বাংলোতেই। ছবি বোঝাই ট্রাঙ্কগুলি, আর্কিটেকচার ক্লাসের উঁচু টেবিলে তুলে ভাবলাম নিরাপদ রইল—জল অতটা কি আর বাড়বে? দরকারী কাপড় চোপড় বিছানা কিছু ও সামান্য জিনিষপত্র নিয়ে বাংলো থেকে আমরা সবাই বেরিয়ে কলেজ বাড়ীতে উঠলাম যখন, তখন বিকেল হয়েছে। কুকুর দুটোকেও সঙ্গে নিলাম। ভুলে গেলাম কেবল টিয়া ও ছোট ছোট পাখী দশবারোটির কথা। তারা খাঁচায় ঝুলছিল পিছনের বারান্দায়। বোনঝি ছেলেমানুষ তাদের খুব ফুর্তি। রাত কি করে কাটানো হবে? টেপ রেকর্ডটা সঙ্গে নিয়ে যেতে তাদেরই উৎসাহ। নিলাম টেপ রেকর্ডটা সঙ্গে—বোনঝিরা গান গাইবে—তা টেপ রেকর্ড করে শোনা যাবে। ঘরে ঘরে কার্নিচার গরম কাপড় চোপড়ের বাক্স—শ্যামলীর দামী শাড়ীর বাক্স সব টেবিলের ওপর চড়িয়ে বাড়ী বন্ধ করে চলে এলাম। বড় বড় ম্যাসোনাইট এর ওপর ছবিগুলোও ষ্টুডিওর পাশের ঘরে একটা তক্তপোষের ওপর রেখে দিলাম। রেডিও রইল যেখানকা'র জিনিষ সেখানেই। কলেজের ডিজাইন সেকশনে আছি আর লাঠি নিয়ে থেকে থেকে সিঁড়ির কাছে গিয়ে জল মাপি। জল বাড়ছেই ত বাড়ছেই। কলেজের প্রকাণ্ড মাঠ জলে থৈ থৈ করছে। জল ছুটছে কল কল—ছল ছল, আর কি কেনা।

কলেজ বাড়ীটাতে যত সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি এসে উঠছে। তাদের আবার মারা হচ্ছে। চৌকিদার সন্ধ্যের সময় খবর নিয়ে এল—আমার বাংলোর ভেতর জল ঢুকেছে। আর সে সেখানে থাকতে পারবে না। ঘরে তালা

লাগিয়ে তাকে চলে আসতে বললাম কলেজ বাড়ীতে। তখনও টিয়াটির কথা ও ছোট পাখীগুলোর কথা মনে পড়ল না।···কলেজের ডিজাইন সেকশনে জল উঠতে আর দেরি হ'ল না। যে রকম ভাবে জল বাড়ছে তাতে সকাল হবার আগেই জল ঘরের ভেতর ঢুকে যাবে। আবার সবাই মিলে জিনিষপত্র নিয়ে জল ভেঙে কলেজ হষ্টেলের দোতলায় গিয়ে ওঠা গেল। কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে এই দিকটারই জমি উঁচু, তবু এখানেও নীচের তলায় জল এসে গেছে। রান্নাঘর হষ্টেলের নীচের তলায়, সেখান থেকে রান্নার সরঞ্জাম তুলে উপরের তলায় নিয়ে আসতে হল। হষ্টেলের দোতলায় আরও পাঁচটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। আমার বাংলোতে তখন জল থৈ থৈ করছে—হেঁটে জল ভেঙে আর যাবার উপায় নেই। স্রোতের তোড় সাংঘাতিক ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ভয় আছে। জল বেড়েই চলেছে—সকাল হতেই নৌকো নিয়ে কলেজের দিকে যাওয়া গেল। জিনিষপত্র, প্রদর্শনীর জন্ত যে সব ছবি একটা ঘরে জমা করা হয়েছিল, তা সব নৌকোয় করে হষ্টেলের দোতলায় নিয়ে আসা হল। কলেজের মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী ঘরের জিনিষপত্র ও বই সব নিচের দিকে যা ছিল, তা উপরে তুলে ফেলতে হ'ল। একটিমাত্র ছোট নৌকো আমাদের কাছে —বহুকষ্টে টেলিফোন করে করে সেখানা পাওয়া গিয়েছিল। সেই নৌকোই আমাদের ভরসা। আমার বাংলোর দিকে একবার নৌকো নিয়ে যাবার চেষ্টা করে দেখা গেল—অসম্ভব। যাওয়া হতেই পারে না। ছোট নৌকো স্রোতে ভেসে যাবে কোথায় কে জানে। কলেজের রেজিষ্টার বীরেন্দ্রচন্দ্র ছোটখাটো মানুষটি, কলেজের অফিসঘরে টেবিলের ও আলমারির দরকারি কাগজপত্র আগলাচ্ছিলেন। তিনি সে ঘরে দুপুর পর্য্যন্ত ছিলেন—জল বাড়ছে দেখে, তাকেও ফিরে আসতে হল কলেজের হষ্টেলের দোতলায়। কলেজ কম্পাউণ্ডের বাগান ডুবে গেছে—মূর্তিগুলো এখন মাথা তুলে জেগে আছে। আরেকটু জল বাড়লে সে সব ডুবে যাবে।

গ্রীষ্মে

পুরোণো রেকর্ড 'ব্রেক' করা হয়ে গেছে—এখন কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে। সেদিনটাও গেল—রাত গেল—জল বাড়ছেই। তৃতীয়দিন জল যখন পুরোণো রেকর্ডের চেয়েও পাঁচ ফুট বেশী তখন আমাদের অবস্থা সাংঘাতিক! কিংকর্তব্যবিমূঢ়—ভা'খানা। ঝুপ-ঝাপ শব্দ, কোথাও দবাড়ী পড়ছে—কোথাও পাঁচিল ধ্বসে পড়ছে। সহর থেকে য়ুনিভারসিটি ও আমাদের কলেজের দিকে আসবার চারটে পোল আছে গোমতীর ওপর—তার মধ্যে তিনটিই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ত পোলটির ওপর দিয়ে যাওয়াও হাঙ্গাম ভীড়ের মধ্যে দিয়ে। সব রাস্তাই প্রায় বন্ধ। এই অবস্থায় আর ত

বন্যার জলের মধ্যে কলেজ হষ্টেলে থাকাও নিরাপদ নয়। কলের জলও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইলেক্‌ট্রিক লাইট ত আগেই গেছে। পায়খানা আর ব্যবহারযোগ্য নয়। এইবার নৌকোতে করে এক এক পরিবারকে থাকলে ভেসে যাবার ভয় ছিল। ছেলেদের জন্য য়ুনিভারসিটির হষ্টেলে থাকবার ব্যবস্থা করা হ'ল। অবতার. সিং ও তাঁর স্ত্রী প্রভা, তাঁদের ছেলেমেয়ে ও কুকুরদের নিয়ে য়ুনিভারসিটির আর এক হষ্টেলে আস্তানা গাড়ল।

চিন্তিতা

হষ্টেল থেকে বার করে য়ুনিভারসিটির দিকে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। সব শেষে আমি, শ্যামলী ও কুকুর ছুটোকে নিয়ে বার হলাম। কলেজের জনকয়েক ছাত্র ও যুবক মাষ্টার কয়েকজন নৌকোর সঙ্গে সাঁতরে নৌকো সামলাছিল। লম্বা দড়ি বাঁধা হয়েছিল হষ্টেল থেকে য়ুনিভারসিটির সুভাষ হষ্টেল পর্য্যন্ত। তাই ধরে ধরে নৌকো কোন রকমে টাল সামলে চলছিল। দড়ি না যে যেখানে সুবিধে করে নিতে পারল গিয়ে উঠল। দাক্তার রাধাকমল মুখার্জীর ব.ড়ীতে গিয়ে আমি উঠলাম শ্যামলী ও তিন বোন ও বোনঝিদের নিয়ে। জীবনে এযে কতবড় একটা অভিজ্ঞতা তা লিখে কি আর বোঝাব। কলেজ তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ রইল। আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবি নি যে বন্যা এই রকম ভীষণ আকার ধারণ করবে। তা না হলে বাংলোতে সব

জিনিষ ওরকম ভাবে ফেলে আসতাম না। জল কমলে বাংলোতে ফিরে গিয়ে জিনিষপত্র ও ছবির, মূর্ত্তির যা অবস্থা দেখলাম—তাতে মন ভীষণ দমে গেল।

আসবাবপত্র সব এখানে ওখানে, একফুট বালি জমেছে ঘরের মেঝেতে। বাংলোর ডানদিকে আর বাগান নেই—সেখানে পনের কুড়ি ফিট গভীর একটি পুকুর হয়ে গেছে। বাংলোর ভীতও কাটতে সুরু করে ছিল—জল আরও দু'একদিন থাকলে বাড়ীটাও ধ্বসে পড়ত হয়ত। রেডিওটা বার হ'ল ধুলোকাদার মধ্যে ঘরের এক কোণায়। ছবির ট্রাঙ্কগুলো খুলে দেখা গেল—অনেক ছবি জলে গলে গেছে। পাঁচ শ' রঙীন কাজ ও ছেলেদের কাজ যা কলেজে রাখা ছিল তাও অনেক নষ্ট হয়েছে। দুঃখ করবার যেন কিছুই নেই—যা আছে তাই সবাই পরিশ্রম করে গুছিয়ে তুলতে লাগলাম। এযে কত বড় আঘাত খেলাম—কারুকে জানতে দিলাম না। দ্বিগুণ উৎসাহে বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিষপত্র উদ্ধারে লেগে গেলাম। রোজকার কাজও আবার চালানও হ'ল ঠিক মতই। ধ্বংসশীল জগতে সবই একদিন ধ্বংস হবে—এই মনে করে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

'যা গেছে তা গেছে, তার জন্য আর ভেবে কি হবে। আবার নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করলাম। গায়ে ও

দ্বৈত নৃত্যে

'ট্রান্সপ্যারেন্স' ছিল—আমার কাজের রেকর্ড স্বরূপ—প্রায় সব গেছে নষ্ট হয়ে। 'মেসনাইট'এর ওপর তেলের রংএর ছবিগুলো বেঁচে গেছে। কিন্তু কাদা মাখা। সব ধুয়ে পরিষ্কার করা সেও কম কষ্ট নয়। কতকগুলো ভাল মূর্ত্তি তখনও প্লাষ্টারে ঢালা হয় নি কিম্বা পোড়ান হয় নি সেগুলি সব গলে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চার পাঁচ শ, স্কেচ ও জলরং এর ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। আমি জানি না ইতিহাসে এসব দৃষ্টান্ত আছে কিনা যেখানে শিল্পীকে তার নিজের সৃষ্টি এমনি ভাবে ধ্বংস হতে দেখতে হয়েছে। মনের ওপর যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল তা প্রাণপণে চেপে রেখে কলেজের কি ক্ষতি হয়েছে তারই তদারক করায় লেগে গেলাম। লাইব্রেরীর অনেক দামী বই একেবারে গলে পচে গেছে। মিউজিয়মের বহু মূল্যবান জিনিষ নষ্ট হয়েছে। অন্যান্য মাষ্টারদের হাতে ব্যথা সুরু হ'ল—কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলাম না। এমনি করে দিনের পর দিন কাটতে লাগল।... পুজোর ছুটি ফুরল। দিদিরা ও শ্যামলী আবার ফিরে গেল। শ্যামলীর ভাল কাপড়চোপড় যা ছিল তাও জলে ডুবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার গরম কাপড়ও সব বন্যার জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সব দোকানে দিয়ে ধুয়ে রং করিয়ে ঠিক করাতে হল। একলা ঐ ভুতুড়ে প্রকাণ্ড স্যাঁৎ স্যাঁতে বাংলোয় আবার দিন কাটাতে লাগলাম কোন রকমে। টিয়া পাখীটা সাতদিন না খেতে পেয়েও কি করে বেঁচে ছিল তা জানি না। দু'ইঞ্চি জল আরও যদি বাড়ত তবে তার খাঁচার তলায় জল ঢুকে যেত। জল যখন কমে গেল, তখন টিয়াটাকে আনিয়ে নিয়েছিলাম। ছোট পাখীগুলো বাঁচে নি। তারা সবাই মরে গিয়েছিল। তাদের কথা মনে হলে এখনও দুঃখ হয়।

দিল্লীতে প্রদর্শনী। ১৯৬০ সাল

এ বছরে দিল্লীতে প্রদর্শনী করবার আমার একটুকুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অনুরোধে মানুষে নাকি ঢেঁকি গেলে। প্রদর্শনীতে ছবি দেওয়া ত তার কাছে কিছুই নয়। একদিন দিল্লীর এক 'আর্ট-ডিলার জ্যোতি মাথুর এলেন দেখা করতে। তিনি লখনউ আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। এখন দিল্লীতে একটি আর্ট গ্যালারী খুলেছেন 'কনট সারকাসে। তাঁর ইচ্ছা লখনউ আর্ট কলেজের চারজন শিল্পীর প্রদর্শনী করার। পাঁচ ছটি, করে প্রত্যেকের যদি ছবি থাকে—তবে চব্বিশ-পঁচিশটি ছবি হবে চারজন শিল্পীর—তাঁর প্রদর্শনী ঘর তাইতেই ভরে যাবে। এই চারজন শিল্পী হচ্ছেন—১লা নম্বর আমি, ২নং মদনলাল নাগর, ৩নং অবতার সিং, ৪নং রণবীর সিং বিষ্ট। আমি সব চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ—তারপর নাগর, অবতার ও বিষ্ট সমবয়সী, বয়স ত্রিশের কোঠায়। জোর-জবরদস্তি ছবি ত নিয়ে গেল। বাছাই করে দেওয়া হল না—যা সামনে ছিল তাই নিয়ে গেল। দিল্লীর আর্ট ক্রিটিকরা একরকম ছবি পছন্দ করে অথচ দর্শকরা আরেক রকম পছন্দ করে। প্রদর্শনী নির্দিষ্ট দিনে আরম্ভ হল। কয়েকজন দর্শকদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলাম—তাঁদের আমার ছবি খুবই ভাল লেগেছে—জেনে ছিলাম। অথচ খবরের কাগজে ক্রিটিকদের মন্তব্য হল অন্য রকম। একটি খবরের কাগজে লিখল—খাস্তগীর, শিল্প শিক্ষক হিসাবে বিখ্যাত, তিনি কয়েকখানা ভাল ছবি পূর্ব্বে এঁকেছেন বটে, কিন্তু এই পাঁচ ছয়খানি ছবি অত্যন্ত দুর্ব্বল।' আমার একটি ছবি ছিল পলাশের।—নাম ছিল "ফ্লেম"। দিল্লীর কোন নাম করা খবরের কাগজের ক্রিটিক 'লিখলেন—"খাস্তগীরের একটি ছবি 'ফ্লেম'—ফুলের মত দেখতে 'ফ্লেম' এর মত নয়।

ছবিটা যে ফুলেরই সেটা ক্রিটিক মশায় ধরতেই পারেন নি। ক্রিটিকরা এই রকম না বুঝে যা 'তা' লিখে যান—আর লোকেদের তাই পড়তেও হয়। শিল্পীরা চুপ করেই থাকেন, ক্রিটিকদের কথায় কোনদিন ভ্রূক্ষেপ করি নি। দরকার হলে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছি তাঁদের। সেইজন্য আর্ট ক্রিটিকদের সুনজরে পড়ি নাই কখনও।

আমার মনে হয় আজকাল 'মডার্ণ আর্ট' বলে যা দিল্লীতে 'চালু' হয়েছে তা বুঝবার জন্য আর্ট ক্রিটিকদের প্রয়োজন বেড়েছে। একদিকে তাঁরা বলেন যে মডার্ণ আর্ট, (অ্যাবষ্ট্রাক্ট বা Non-representational) বোঝান যায় না—তার কোন নামেরও প্রয়োজন নেই। যাঁদের বুঝবার শক্তি আছে তাঁরা বুঝতে পারেন—রস গ্রহণও করতে পারেন। যাঁরা বুঝতে পারেন না—তাঁদের বোঝান যায় না। তাই যদি হয় তবে আর্ট ক্রিটিকদের কাজটা কি আজকাল। তাঁদের দরকারই বা কি। প্রত্যেক দর্শক ছবির রস গ্রহণ করবে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব রেখে। একজন শিল্পীর পক্ষে সবাইকার মন রেখে ছবি আঁকা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় শিল্পীদের ক্রিটিকদের কথা শোনা ক্ষতিকর অনেক সময়। শিল্পীদের নিজের কাছে 'সাচ্চা' থাকাই সব চাইতে দরকার।

প্রিন্সিপ্যালগিরি কি শিল্পীর কাজ?

শিল্পীরা যে শুধু ভাবুক নয়, শিল্পীরা যে নিয়ম-কানুনের মধ্যে চলতে জানে—এইটে অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রকৃত শিল্পী যে সে সব পারে। তবে কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে যে সব কাজ করতে হয় তা হয়ত তার শিল্প সৃষ্টির কাজে পদে পদে বাধা দেয়। লখনউ আর্ট কলেজে অনেক কিছুই আমাকে করতে হত। এবং আমি তা বেশ সুষ্টুর সঙ্গে করতে চেষ্টা করতাম। আমার অফিসের কাজে সাহায্য পেতাম—রেজিষ্টারের কাছে। কিন্তু কর্ণধার যে তাকে সব কিছুতেই নির্দ্দেশ দিতে হয়—তা না হলে গোলমাল বাধতে সময় লাগে না। প্রিন্সিপ্যাল যদি ঠিক সময় কলেজে না আসে তবে সব শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীও ক্লাশে ঠিক সময় আসে না। সেই কারণে আমি কলেজ বসবার প্রায় আধঘণ্টা আগে গিয়ে অফিসের কাজ কিছুটা সারতাম। এবং ঠিক দশটার সময় কলেজে 'রাউণ্ড' দিতাম।

'রাউণ্ড' দেবার সময় যাকে যা নির্দ্দেশ দেবার থাকত তাও দিয়ে দিতাম। অফিসের ফাইল ও চালান সই করা অবশ্য শিল্পীর পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু এসব কাজও প্রিন্সিপ্যালের করতে হয়। যতদিন স্বাস্থ্য ভাল ছিল এ সব কাজে, আমার সৃষ্টির কাজে ক্ষতি করেনি। বস্তায় আমার বাংলোটি স্যাঁৎ স্যাঁতে হয়ে যাওয়ায় আমার প্রায়ই শরীর খারাপ হতে লাগল। গায়ে, হাতে পায়ে ব্যথা হতে লাগল। তখন অফিসের কাজে আর মন লাগত না। রাত্রে বাংলোতে বসে ছবি আঁকতাম। দিনের বেলায় কলেজের কাজ সেরে আর ছবি বা মূর্ত্তি গড়ার কাজে মন বসত না। রাত বারটা পর্য্যন্ত কাজ করা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। আবার সকালে উঠে স্নান করে—ব্রেকফাষ্ট খেয়ে সাড়ে নটার মধ্যে

কলেজে পৌঁছে যেতাম। ছেলেদের ডিসিপ্লিনে রাখা যে খুব শক্ত তা নয়। একটু 'ট্যাক্টফুল' হলেই ছেলেদের ম্যানেজ করা যায়। কিন্তু ৪০জন মাষ্টারকে সব সময় ম্যানেজ করা শক্ত হয়ে পড়ত। শিল্পীরা স্বভাবতই একটু ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব রেখে চলেন, সহজে নিয়ম-কানুন মানা তাঁদের আসে না। দুচারজন পুরোণো মাষ্টাররা মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত করতেন বটে কিন্তু মোটের ওপর আমাকে কখনও কেউ অমান্য করেন নি। করছি। আমাকে কেউ কেউ হেসে বললে—"১৯৬০এর বন্যার মত বন্যা ৫০ বছরে একবার আসে—প্রতি বছর আসে না।" কিন্তু যে যাই বলুক এ বছরেও ১০ই অক্টোবর বন্যা এল গোমতীতে—যদিও ১৯৬০এর মত অত বেশী নয়। বন্যার জল এবারেও আমার বাংলার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আমাকে এবারেও বাড়ী ছাড়া করল। ভাগ্যক্রমে এবা'র শ্যামলী ছাড়া আর কেউ পুজোর সময় আসে নি। আমার জিনিষপত্র আমি

ঝড়ে মৎস্য শিকার

সব চেয়ে বিরক্তিকর হত যখন এম, এল, এ বা মিনিষ্টর বা সুপারিশ করে ছেলে ভর্ত্তি করতে বলত বা যে ছেলে কোন কর্ম্মের নয় তাকে 'স্কলারশিপ' দেবার জন্য অনুরোধ করত। মোটের ওপর প্রিন্সিপ্যালের কাজ শিল্পীর পক্ষে করা শক্ত নয়। তবে শিল্পী নিজের সৃষ্টির কাজে যে আনন্দ পায়—সে আনন্দ প্রিন্সিপ্যালের কাজে নেই। তবু একটা কলেজকে গড়ে তুলবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। এবং যথাসাধ্যমত আমি কলেজটাকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। সেটা বড় কম আনন্দের কথা নয়।

গোমতীতে আবার বন্যা ১৯৬১

১৯৬১ সালের প্রথম থেকেই আমরা সাবধান হয়ে ছিলাম। জুলাই মাসে যখন বৃষ্টি পড়ে গোমতীতে ছোট-খাটো বান এলো তখনই মনে হ'ল এবারেও হয়ত ভোগাবে। আমরা আমাদের সব ছবি ইত্যাদি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেললাম আগের থেকেই।

আমি সব রকম ভাবে সব দিক থেকে সাবধান হয়ে রইলাম, বন্যা যদি আসে কিছুই ক্ষতি যেন না হয়। কেউ কেউ ভাবলে আমি একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আগেই কলেজ হষ্টেলের দোতলায় সরিয়ে ফেলেছিলাম। এবারেও শ্যামলীকে নিয়ে আমি রাধাকমলবাবুর বাড়ী গিয়ে উঠলাম। এ বছরেও আমি প্রায় তিন সপ্তাহ তাঁর বাড়ীতে ছিলাম। তিন সপ্তাহ পরে আবার সেই স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে ফিরে এসে, ঘরে আগুন রেখে ঘর শুকোতে চেষ্টা করলাম। কাজকর্ম্মও সুরু করে দিলাম। মনে হ'ল, বন্যাটা আমাদের প্রতি বছরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অপ্রীতিকর ব্যাপার হ'লেও এছাড়া আর ত আমাদের যেন গতি নেই মনে হল, কাজের মধ্যে থাকাই, সব ভাবনা চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া, শিল্পীদের পক্ষে। কাজ করতে করতে সেই সময় আমার প্রায়ই মনে হত, ভগবান সত্যিই আমায় ভালবাসেন, যখন আমি ছবি আঁকি। আর মূর্ত্তি গড়ি যখন তখন আমার ভালবাসার চেয়েও বেশী কিছু দান করেন। এই কথাই বার বার মনে হত, বন্যা হোক বা নাই হোক—ক্রিটিকরা যাই বলুক বা না বলুক—আমি কাজ করতে ক্ষান্ত হব না, যতদিন বেঁচে থাকব। আঁকব—গড়ব নিজের মনের আনন্দ ও তৃপ্তির জন্য। অন্যের যদি ভাল লাগে ভাল, না লাগে তাতে যায় আসে না।

লখনউতে যাঁদের আন্তরিক ভাবে চিনবার সুযোগ হয়েছিল

দেরাদুন থেকে লখনউ আসবার সময় আমার একজন বন্ধু বলেছিলেন—"গভর্ণমেন্টের কাজে যাচ্ছ, একটা কথা মনে রেখ—বেশী কাজ নিয়ে মেতে যেও না। যত কম কাজ করবে—ততই ভাল, নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। সোসাইটি করবে—বড় বড় মিনিষ্টর ও ওপরওলা অফিসরদের সঙ্গে যাওয়া আসা রাখলে—কাজ করবার আর বিশেষ দরকার নেই।" কথাটা শুনে বিশেষ ভালো লাগে নি। আমি নিজের স্বভাব ত আর বদলাতে পারি না। সোসাইটি করা আমার ধাতে নেই—তবু কাজের মধ্যে দিয়েও অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল। পুরোণো চেনা জানা যাঁরা লখনউতে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার হালদার একজন। লখনউতে কাজে যোগ দিয়েই অসিতদার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি নানান বিষয় আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "কিছু ভাবতে হবে না বিশেষ—এ হচ্ছে কর্তা-ভজার দেশ। কুর্শিতে একবার বসলেই সবাই কুর্নিশ করে তোমায় খুসী করবে, মানবেও। তবে আর্ট কলেজের ব্যাপার অর্থাৎ আর্টিষ্টদের নিয়ে কারবার ত"—বলে কয়েকজনের নাম করে সতর্ক করে দিয়ে বললেন 'আমাকে ত এরা জালিয়ে মেরেছে—তোমাকে কি করবে জানি না।

অসিতদা কাজের থেকে অবসর গ্রহণ করে লখনউ-তেই একটা বাড়ী ভাড়া করে আর্টকলেজের কাছেই থাকতেন।

আর্টকলেজে প্রায়ই আসতেন আমি প্রিন্সিপ্যালের পদ নেবার পর। আমি যতদিন ছিলাম উনি সব অনুষ্ঠানেই আসতেন। আরও আসতেন প্রতি বছর পেনসেনের কাগজে আমাকে দিয়ে সই করাতে যে তিনি বেঁচে আছেন। আমি অসুস্থ হয়ে লখনউ থেকে চলে আসতে উনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। আমার কন্যা ও জামাতা যখন লখনউতে যায়, তাদের অসিতদা বলেছিলেন—"সুধীর কি করলে? এই বয়সেই শরীর খারাপ করে বসলে? আমাকে দেখ ত ৭' বছর হয়ে গেছে—এখনো বেশ আছি খাচ্ছি, দাচ্ছি, কাজকর্ম করছি। সুধীরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও থাকতে—শরীর ঠিক করে দেবো।" এর কিছুদিন পরই হঠাৎ রেডিওতেই প্রথম খবর পেলাম যে অসিতদা আর ইহ-জগতে নেই। তিনি একরকম হঠাৎ মারা যান। এত তাড়াতাড়ি যে তিনি চলে যাবেন ভাবি নি—সেই জন্য মনে বড় লেগেছিল অসিতদার মৃত্যু সংবাদ। অসিতদা, তাঁর মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত নিজেকে কাজেকর্মে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। ছবি আঁকতেন—কবিতা গান লিখতেন, তাতে সুর দিতেন। শিল্পের ওপর বেশ কয়েকখানা বইও লিখে গেছেন।

সম্প্রতি অসিতদার ৭৫ বছরের জন্মতিথিতে আমাকে 'কলকাতা'-আকাশবাণী থেকে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করে—সে অনুরোধ আমি অগ্রাহ্য করতে পারি নি। তাতে আমি যা বলেছি তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি।

৺অসিত কুমার হালদার। অসিতদার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বললে কম করেই বলা হয়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা প্রায় গুরু-শিষ্যের মতো ছিল। আমি ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলাম ছাত্র ভাবে, তার অনেক আগেই তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং আমি শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় পুরো-পুরিই আচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্র ছিলাম। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে ভারতবর্ষ ও সিংহল ঘুরে বেড়াবার সময়, লখনউতে যখন যাই তখনই প্রথম আমার অসিতদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে প্রায় ৩৩/৩৪ বছর আগেকার কথা। অবশ্য তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্যকাল থেকেই।

'প্রবাসী'তে অসিতদার আঁকা ছবি অনেক দেখে-ছিলাম। তার মধ্যে 'দুর্দিন' ছবিখানি বড়ই করুণ লাগতো কিন্তু ভালোও লাগতো। 'আপদ-বিদায়' বলে যে ছবিখানি 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল সেখানিও মনে খুব দাগ কেটেছিল। শান্তিনিকেতনে থাকতে অসিতদার বিষয় অনেক গল্প শুনেছিলাম। যখন প্রথম দেখা হ'ল লখনউতে উনি আর্টকলেজের অফিসে, প্রিন্সিপ্যালের অফিস ঘরেই ব'সে ছিলেন প্রথম দেখেই ভালো লাগলো। সুপুরুষ-ফিটফাট লম্বা ছিপছিপে, ফরসা কালো শেলের চশমা পরা। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন 'কোথায় উঠেছি। বললাম। শুনে বললেন 'তুমি নন্দদা'র ছাত্র নন্দদার ছাত্র হয়ে আমার কাছে ওঠা উচিত ছিল। আজই চলে এসো। তাঁর কথা ঠেলতে পারি নি। তাঁর বাড়ীতেই উঠে আসলাম। আর্ট-কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই প্রকাণ্ড প্রিন্সিপ্যালের বাংলো। তারই ডান পাশের ঘরটায় আমি ছিলাম।

সেই তখন থেকেই অসিতদার সঙ্গে আমার জানাশোনার সূত্রপাত। তাঁর চেহারা দেখেও আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং তাঁর মূর্তিও গড়েছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর নিজের ছাত্রদের চেয়ে বরং বেশীই ভালো বাসতেন— আমিও তাঁকে গুরুর মতোই মনে কোরতাম। তাঁর কাছে 'প্লাই বোর্ডের" ওপর ছবি আঁকা শিখেছিলাম। চাকরি নিয়ে লখনউ ছেড়ে চলে যায় তখন তিনি একলাই থাকতেন কাজকর্মে মশগুল হয়ে। 'খেয়ালিয়া' নাম দিয়ে তিনি একটি কবিতার বই ছাপেন, তার ছবিও তিনি আঁকেন নিজেই। 'সন্দেশে' রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'চরকা কাটা বুড়ি' যখন বেরিয়েছিল তখন অসিতদাই চিত্রিত করে দিয়েছিলেন সেই কবিতা। সে ছবি আমার

সংঘ

অসিতদার নিজস্ব একটা বিশেষত্ব ছিল সেই রকম করে ছবি আঁকায়—উনি হেসে বলতেন 'নন্দদার ছাত্রকে নতুন একটা কিছু শেখানো গেল। উনি সেই আঁকার পদ্ধতিকে নাম দিয়েছিলেন ল্যাক-সিট। ল্যাকারের 'ল্যাক' আর অসিতের 'সিট'।

অসিতদার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ছিল—তিনি হাসি তামাশাও ভালবাসতেন। কবিতা এবং গানও তখন লিখতেন। ছোটদের নিয়ে বাড়ীর বারান্দায় অভিনয় করতেন—খুব হৈ হৈ হ'ত। সেই স্বতঃস্ফূর্ত ছেলেমানুষের ভাবটি তাঁর আজীবন ছিল। দুঃখকে তিনি জয় করেছিলেন। তা না হলে তার মনের মধ্যেকার সেই চির-যৌবনের ভাব তিনি রাখতে পারতেন না। জীবনে দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু তা নিয়ে অযথা হা-হুতাশ করতে তাঁকে দেখিনি। অসিতদা লখনউ আর্টকলেজ থেকে অবসর নিয়ে লখনউতেই ছিলেন। এবং আমি যখন লখনউ আর্টকলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করি তখন আবার অসিতদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পাই। তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠপুত্র ও কন্যাকে নিয়ে ভাড়া বাড়ীতে থাকতেন। পরে তারাও

এখন মনে আছে। তাঁর আঁকা অনেক ছবিতে 'রোমান্টিক' ও 'লিরিক্যাল' ভাব থাকতো এবং আমার বেশ মনে আছে তা ছেলেবেলায় মনে বেশ দাগ দিত। 'প্রবাসী'তে যখন ছবি বার হ'ত, তা উদগ্রীব হয়ে দেখতাম। 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' ছবিটার কথা মনে পড়ে— 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'ও প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। 'ওমার খৈয়ামের' এক সিরিজ ছবি উনি এঁকেছিলেন তা বই আকারে বেরিয়েছে, তা অনেকেই জানেন। 'অরিজিন্যাল' ছবিগুলি এস. ডি. রামস্বামী'র কালেকশানে আছে।

১৯৪২।৪৩ সালেই বোধহয় অসিতকুমার তাঁর ছবি আঁকার ধারা বদলেছিলেন। 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' ছবির ধারা তাঁর হাত থেকে বার হয়ে আসছিল। তিনি সে ছবিগুলিকে 'কসমিক' ছবি বলতেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি সে রকম ছবি আঁকেন নি। যদি সে ধারা বন্ধ না করতেন তবে হয়তো তিনি আজ আধুনিক শিল্পরাজ্যেও নাম রেখে যেতেন আমার বিশ্বাস।

আমি তাঁকে অনেকবার সে কথা বলেছি। তিনি কাণ দিতেন না কারণ আমার অনুমান যে বিদেশী শিল্পের আধুনিকতার তিনি নকলনবিশী করতে চান নি। কিন্তু

যদি করতেন তাহলে আমার বিশ্বাস—তাঁর হাতে তা নতুন ভারতীয় আকারই নিত। কয়েকটি ছবি আমার মনে আছে, যেগুলি এলাহাবাদ-মিউজিয়মে রাখা আছে "Vision of the Bee" "As the bird sees the world" ইত্যাদি। অসিতদার ছবি বহু জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। তিনি জীবনে এঁকেছেনও অনেক। তাঁর অনেক কাজ এলাহাবাদ মিউজিয়মে—'হালদার হলে' আছে। কিছু কাজ উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট কিনে লখনউর কাউন্সিল হাউসের একটা ঘরে রেখেছেন। নানান লোকের কাছে দেশে ও বিদেশে তাঁর কাজ ছড়ানো আছে। এখন তা উদ্ধার করে একত্রিত করা সম্ভব নয়—তবু যতটা সম্ভব তা করা আমাদের কর্তব্য বলেই মনে করি।

*

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সাল

শরীর মন ক্লান্ত। পঞ্চান্ন বছর হয়ে গেল। কিন্তু অবসর নেওয়া হ'ল না—Extension পেলাম। ওদিকে শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে, ডাক এল সেখানকার কাজে যোগ দেবার জন্ম। দোটানায় পড়লাম। কিন্তু শরীরটা ভেঙেছে—আর কলেজের প্রশাসনের কাজ করতে মন নেই। এদিকে আমার কন্যা শ্যামলী শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। কন্যার শিক্ষাও সমাপ্ত হয়েছে। শ্যামলীর বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে ডিসেম্বরের ২৭শে তার বিয়ে হবে, অধ্যাপক তান, য়ুন, শানের ছেলে 'তান-লি'র সঙ্গে। আমার জীবনের সাংসারিক দায়িত্ব সবই প্রায় সমাপ্ত হতে চলল। লিখছি জীবনে যা ঘটেছে —আর ভাবছি—জন্ম-মৃত্যু, আর মাঝে কিছু ঘটনা, এই ত জীবন। লিখবার মত, জাহির করবার মত কিই বা ঘটেছে, কিন্তু আমি যে পথে চলেছি সেটা আমারই জন্ম যেন তৈরী করেছিলেন আমার সৃষ্টিকর্তা। প্রায় শেষ করে এনেছি এখন বাকি জীবনটা সামর্থ মত ছবি এঁকে পুতুল গড়ে কাটিয়ে দেব, তাহলে আর জবাবদিহির কিছু থাকবে না।

আদিত্য নাথ ঝা

আমি যখন লখনউএ কাজে যোগ দিই, শ্রীআদিত্য নাথ ঝা তখন সেখানকার চীফ সেক্রেটরী। উনি ডাক্তার অমরনাথ ঝা মহাশয়ের ভাই। চমৎকার লোক সব কাজেই সাহায্য করতেন। ওঁর সাহায্যেই আমি আর্ট কলেজে অনেক উন্নতি করতে পেরেছিলাম। লম্বা চওড়া চেহারা। কাজের সময় কাজ অন্য সময় দিলদরিয়া হাসিতে ভরা তাঁর মুখখানি। প্রকাণ্ড, মোটা পাইপখানা তাঁর মুখে বেশ মানিয়ে যেতো। ওঁর সঙ্গে হৃদ্যতা থাকাতে সত্যিই খুব সুবিধা হ'য়েছিল। উনি প্রায়ই আমার কাছে ও আর্ট কলেজে আসতেন ও আমাদের সবাইকে কাজে উৎসাহ দিতেন। ওঁর লখনউ থেকে চ'লে যাবার সময় আমি ওঁর একটা মূর্তি গড়েছিলাম। মূর্তিটা ওঁকেই দিয়েছিলাম। আমার অনেক ছবি উনি কিনেওছিলেন। ছবি মূর্তি উনি তাঁর দাদা অমরনাথের চেয়ে কিছু কম ভালবাসতেন না। ডাক্তার অমরনাথ ঝা মারা গেলে তাঁর আর্টের ওপর যত বই ছিল, এবং ছবিও যা ছিল তার অনেকগুলি আর্ট কলেজের লাইব্রেরীতে প্রেজেণ্ট করেছিলেন। সেই জন্ম লখনউ আর্ট কলেজের লাইব্রেরীর নাম ডাঃ অমরনাথ ঝা লাইব্রেরী রাখা হয়েছিল!

ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ

ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ ছিলেন চীফ মিনিষ্টার। কাজে যোগ দিয়ে অসিতদার সঙ্গে একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনিও আর্টের ভক্ত ছিলেন এবং আর্টিষ্টদের শ্রদ্ধা করতেন। ওঁর সঙ্গে ছুন স্কুলে থাকতে আমার একবার দেখা হয়েছিল। উনিও আর্ট কলেজের সব ফাংশানেই আসতেন।

মনে আছে একদিনের ঘটনা। তখনো আমার বাংলোতে টেলিফোন লাগান হয় নি। কলেজ বিলডিং থেকে একটি চাপরাশি এসে খবর দিলে, চীফ মিনিষ্টারের বাড়ী থেকে কে একজন তলব করেছেন। আমি শুনে বললাম, কে তলব করেছে নাম জিজ্ঞেস ক'রে এস। চাপরাশি ফিরে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস ক'রে এসে বললে, "এক 'সম্পূর্ণানন্দ' করকে কোই হ্যায়।" আমি হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটলাম টেলিফোন ধরতে। উনি বললেন, "আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে। এখুনি যদি একটু আসেন।" ছুটলাম কি জানি কি কথা আছে। ওঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি ড্রইংরুম ভরা লোক অপেক্ষা করছে। আমি যেতেই ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী আমায় ডেকে ভেতরের একটা ছোট ঘরে বসালেন। সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণানন্দজী এসে মুখ কাঁচু মাচু করে বললেন, 'খাস্তগীর সাব বুরা নেহি মানিয়ে। আপকো এক বাত পুছনা হ্যায়—বলে চুপ করে রইলেন। আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললাম,—'কেয়া বাত হ্যায় কহিয়ে।' উনি কেবল কিন্তু কিন্তু করেন, কি কথা তা' আর বলেন না। আমি

ত' ভয় পেয়ে গেলাম। পরে যা বললেন, তার মর্ম হচ্ছে—আপনি দেশের একজন গুণীলোক আপনাকে যদি 'পদ্মশ্রী' খেতাব দেওয়া হয়, তবে আপনি খুসী হয়ে accept করবেন ত'?" সম্পূর্ণানন্দজীর দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম,—কেন accept করব না? এ ত আর ইংরেজ আমলের 'রায় সাহেব' 'রায়বাহাদুর' খেতাব নয় যে আপত্তি করব। আমি খুশী হয়েই accept করব।"

শুনে বললেন, 'ব্যস ব্যস ব্যস, এহি পুছনা থা—

ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ আমার কাজে উৎসাহ দিতেন। শিল্পী বলে যথাযোগ্য মান্য করতেন। উনি চীফ মিনিষ্টার পদ ছাড়বার সময় ওঁরও একটা মূর্ত্তি আমি গড়েছিলাম। সে মূর্ত্তি এখন ষ্টেট ললিতকলা আকাদমীতে আছে।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

রাধাকমল বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ বহুদিনের। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ পাই ১৯৫৬ সালে যখন লখনউ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হ'য়ে সেখানে যাই। তিনি বহুকাল থেকে য়ুনিভারসিটির মধ্যে একই বাংলোতে আছেন।

উনি ১৯৫৬ সালে লখনউ য়ুনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার হ'য়েছিলেন। আমার আর্ট কলেজে থাকবার বাংলো থেকে তাঁর বাংলো বেশী দূরে ছিল না। আমাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। উনিই বেশী আসতেন। কি নতুন আঁকছি তা' দেখবার সখ তার খুব ছিল। যখনই আসতেন দু' একখানা ছবি নিয়ে যেতেন। কিছু কিনতেন। য়ুনিভারসিটির টেগোর লাইব্রেরীতে আমার বহু ছবি—অন্ততঃ ২৫।৩০ খানা ভাল ছবি আছে। তাঁর বাড়ীতেও অনেক শিল্পীরই ছবি আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যায় বেশী বোধহয় আমার ছবির। আমার গড়া মূর্ত্তিও কতকগুলি তাঁর কাছে আছে। ছবি ও মূর্ত্তি উনি খুবই পছন্দ করেন এবং সাধ্যমত সংগ্রহ করেন। আমাকে তিনি সত্যিই আন্তরিক স্নেহ করেন। বন্যায় পীড়িত হয়ে আমি কন্যা ও বোনেদের নিয়ে তাঁরই বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ!

এখন তিনি লখনউতে ষ্টেট ললিতকলা আকাদমীর চেয়ারম্যান। এবং লখনউ থেকে চলে আসবার সময় আমার বহু ছবি ও মূর্ত্তি ষ্টেট ললিতকলা আকাদমীতে তাঁর জিম্মায় রেখে এসেছি। উনি সেগুলি যত্নেই রেখেছেন। আমার বহু ছবি লখনউতে ও U. P. র নানান সহরে ছড়িয়ে আছে। মিউজিক স্কুলেও তাঁরই জন্য আমি অনেকগুলি ছবি দিয়েছি। হাঁসপাতালে, বাল সংগ্রহালয়েও আমার ছবি আছে। আমার ছবির কোন হিসাবই আমি রাখি নি। এঁকে গেছি, বিলিয়ে দিয়েছি, বিক্রীও করেছি।

শ্রীযুক্ত প্রভাত চৌধুরী

শ্রীযুক্ত প্রভাত চৌধুরী গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরে ছিলেন। কাজে অবসর নিয়ে তিনি লখনউতে এসে দিন কাটাচ্ছিলেন। উনি প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীহিরণ্ময় রায় চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে রোজ যেতেন। হিরণ্ময় বাবু মারা গেলে তাঁর বড়ই মনে দুঃখ হয়েছিল। তাঁর বাড়ীতেও আমার যাতায়াত ছিল। প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে আমি যেতাম, উনিও প্রায় হেঁটে আমার বাংলোতে এসে গল্প করে যেতেন। ওঁর মতো স্পষ্ট বক্তা, সত্যবাদী লোক আমি খুব কমই দেখেছি। মনটা তাঁর অত্যন্ত কোমল এবং সেই কোমলতার মধ্যেই তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন। ওঁর বাড়ীতে আমি প্রায়ই গিয়ে গল্পগুজব ও গান গেয়ে সময় কাটাতাম। উনি গান শুনতে বড় ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ও কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ, তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করে শোনাতেন আমাদের। তাঁর শিল্প ও শিল্পীদের উপর দুর্ব্বলতা দেখে আশ্চর্য হতাম। তিনি যে খুব রসিক মানুষ সে বিষয় আমার কোনই সন্দেহ নেই।

একদিন তাঁর বাড়ী যেতেই তিনি তাঁর শোবার ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। একটা আলমারীর পরদা সরিয়ে কতকগুলি জিনিষ দেখালেন। রাস্তার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কাঠের টুকরো তিনি বেছে বেছে সংগ্রহ করে, হাতুড়ি বাটালি দিয়ে নয়, ছুরি বা নরুণ দিয়ে নয়, বোতল ভাঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে অনবরত ঠুকে ঠুকে তিনি নানান 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' (abstract) আধুনিক মূর্ত্তি তৈরী করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি একথা ব'সে ব'সে কাঁচের টুকরো দিয়ে সেই সব কাঠের টুকরতে ঠুকে ঠুকে অদ্ভুত গড়ন বার করেছেন। সেই সব কাজ দেখাতে দেখাতে প্রায়ই বলতেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য তিনি এই কাঠের কাজ করতে করতে পেয়ে থাকেন। তাঁর কথার মধ্যে সত্য নিহিত আছে মনে হ'ত।

আমি লখনউ থেকে চলে আসবার কিছুদিন আগে তিনি লখনউ ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলেন। আমার চেয়ে বয়সে তিনি বড় হলেও তাঁকে বন্ধু ভাবেই

জেনেছিলাম। ইনি দেরাদুনের স্বর্গীয়া হেমন্তকুমারী চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র।

১৯৬২

শ্যামলীর বিয়ে হয়ে গেল নির্ব্বিঘ্নে কলকাতায়। পৃথিবীতে যা লোকে বলে 'সাংসারিক দায়িত্ব'—সে যেন শেষ হল। সরকারী কাজে আর মন নেই শরীরেও যেন আর কুলোচ্ছে না। এইবারে লখনউ'র কাজে ইস্তফা দিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসবাস করবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে সাড়া জাগালো। শান্তিনিকেতনে আমার শিল্পী-জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল—আবার সেইখানেই শেষ জীবনটা নিরিবিলি কাটিয়ে দেব ঠিক করে ফেললাম।

এখানেও কম জিনিষপত্র জমেনি সাত বছরে। বহু ছবি ও মূর্ত্তি বন্যায় নষ্ট হয়েও জমেছে অনেক। ছবি কম আঁকিনি। আঁকার ও গড়ার কাজের মধ্যেই যে মুক্তির আনন্দ পাই। লখনউ ছাড়ার আগে সেখানে আবার একবার One man show করবার অনুরোধ করলো সবাই। কলেজের হলে সে আয়োজন হল। কিছু ছবি ও মূর্ত্তি বিক্রী করে দিলাম।

State Lalit Kala Academyর ইচ্ছা, সহরে তাদের হলেও আমার প্রদর্শনী হয়। সেখানেও প্রদর্শনী হল। বোম্বাইএর জাহাঙ্গীর হলেও এইসময় ৫০ খানা ছবি দিয়ে প্রদর্শনী হল আমার ছবির। আমি ছবি পাঠিয়ে দিয়েই খালাস সেখানকার বন্ধুবান্ধবরাই সব ভার নিয়েছিলেন। ছবি মাত্র দু'তিনখানা বিক্রী হল সেখানে—দুঃখ করবার কিছু নেই। নিজে উপস্থিত না থাকলে প্রদর্শনীতে ছবি বিক্রী বিশেষ হয় না আজকাল। এমনি করে আবার এক গ্রীষ্মকাল এলো। শরীরটা বিগড়েছে আর সে উৎসাহ নেই। ঠিক করলাম—মুসুরীতে গরমের ছুটিটা কাটাবো। বহুদিন পরে আবার সেই 'দেরাদুন এক্সপ্রেসে' উঠে বসলাম ১০ই মে, ১৯৬২ সাল।

মুসুরীতে দুমাস ছুটি কাটিয়ে আবার সেই লখনউ। এবারে জাল গুটোবার পালা। চাকরী জীবন অনেক ত হল। এবারে Free Lance কাজ করে দেখা যাক না। শক্তি সামর্থ যা আছে বাকী সেটা নিজের মনে ইচ্ছে মতো ছবি এঁকে মূর্ত্তি গড়ে কাটানোই শোভন মনে হল। লখনউতে সাতবছর কাটিয়ে কি দিলাম বা কি পেলাম তাই ভাবি। কলেজটা reorganize করার ভার নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। যা গড়ে উঠেছিল বন্যার জন্য তা খানিকটা নষ্ট হলেও উন্নতি মন্দ হয়নি। সেখানে সবাই স্বীকার করে যে কলেজের সব দিক থেকেই উন্নতি হয়েছে। তাতেই আমি খুশী।

শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষরা চাচ্ছিলেন আমি কলা-ভবনের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করি। রাজীও হয়েছিলাম কিন্তু শরীরটা ভেঙেছে—এই ভাঙা শরীর নিয়ে নতুন উদ্যমে যদি কাজ করতে নাই পারলাম, তবে সে কাজ গ্রহণ করা কি উচিত হবে? ভাববার কথা। ভাবলাম লম্বা ছুটি যা পাওনা আছে তা নিয়ে শরীরটাকে যদি আবার চাঙ্গা করতে পারি তবে শান্তিনিকেতনের কাজ গ্রহণ করবো। ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলাম কিন্তু শরীরের কল বেশ বিগড়েছে সে আর বাগ মানতে চায় না। তা ছাড়া আবার সেই প্রিন্সিপ্যালের কাজ, আবার সেই reorganize এর কাজ। সাহস বা উৎসাহ পেলাম না। কাজটা নিলাম না। সবাই অবাক হল। এতো সম্মানের কাজ নিলাম না দেখে। কিন্তু আমার মন আর মান সম্মানের ধার ধারে না। এখন আমি চাই একটু নির্জ্জনতা—নিজের মনে ইচ্ছেমতো সময় কাটাতে। ইচ্ছেমতো ছবি আঁকা ও গড়া নিয়ে থাকতে পারলেই আমি খুশী থাকবো। লখনউর কাজে আর ফিরলাম না। শান্তিনিকেতনে পূর্ব্বপল্লীতে নিজের ছোট আস্তানায় একটা ষ্টুডিও ঘর করে বসেছি। বাকী জীবনটা এখানেই কাটাবো ঠিক করেছি। সকালে উঠি একটু বেড়াই, সূর্য্যোদয় দেখি, তারপর নিজের মনে কাজকর্ম নিয়ে সময় কাটাই। বাগানের কাজ করি। কোথাও কারো কাছে বিশেষ যাওয়া হয়ে ওঠে না। পুরোণো বন্ধুরা মাঝে মাঝে আসেন। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে দেখে আমি কি আঁকছি বা গড়ছি। বিকেলে সূর্য্যাস্ত দেখি বাড়ীর বারান্দা থেকে আর মনে মনে বলি…"এমনি করে যায় যদি দিন যাক না।"—

আর পথ চলা নয় ক্লান্ত আমি।
এখন "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে বসন্ত।"

একটি রূপালি ভোর

শ্রীকরুণাময় বসু

একটি রূপালি ভোর উড়ে আসে হাঁসের ডানায়
ঘুম ঘুম ছায়া পথে, মুক্তোঝরা হিমভেজা ঘাসে,
ঝিলিমিলি পদ্মকুঁড়ি বনে : মুঠো মুঠো সোনা রোদ
কে যেন দিয়েছে ছুঁড়ে ঝিকিমিকি সোনালি আকাশে !
আশ্চর্য জীবন-গ্রন্থ লেখা যেন বাঁকা বন পথে,
মানুষেরা হেঁটে যায় লাল মাটি আঁকা শাল বনে,
ক্ষুরধার জীবনের পথ : এই আলো ঝলমল
সোনার মুহূর্তগুলি অকারণ তবু পড়ে মনে।
খুসি দেখি কৃষ্ণচূড়া বন, সবুজ আনন্দ ঢেউ
ছুঁয়ে যায় লতা পাতা ফুল, শান্ত মুদে আসা প্রাণ,
বেঁচে থাকি পৃথিবীতে, এই কথা দোলা দিয়ে ওঠে,
মাঠে মাঠে ঘাসে ঘাসে এই সুরে আশ্চর্য আহ্বান !
কত দুঃখ, অশ্রুজল প্লাবন করেছে বন্যাদিন,
শ্রাবণের কান্না দিয়ে সাজায়েছি সময়ের ডালা ;
তবু, তবু ভাবি দুর্বদীপ্ত ভালবাসা দিয়ে হোক
আশা শুভ্র স্বপ্নহীন মনে মনে মনি দীপ জ্বালা।
নীড় ভেঙে গেছে ঝড়ে, পাখি তবু গান গেয়ে যায়,—
কত, কতদূরে সমুদ্র-দ্বীপের সে স্বপ্ন-বাসরে ;
সেই গান আজো দেখি ভেসে আসে রৌদ্রছায়া দিনে
সোনালি আবীর মাখা হাসি মুখ পদ্ম-কুঁড়ি-ভোরে।

আমার সঙ্গে থাকো

Henry Trancis Lyte—Abide with me 1798-1847

অনুবাদক : শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মোর সাথে থাকো, সন্ধ্যা যে দ্রুত আসিতেছে অবতরি'।
আঁধার ঘনায়ে আসিছে, প্রভু হে, রহো গো আমারে ধরি'।
যবে আর কেহ হয় না সহায়, সান্ত্বনা হয় দূর,
অসহায়দের সহায় তুমি গো হিয়া রেখো ভরপুর।

জীবনের ছোট দিন যে আমার শীঘ্র ফুরায়ে যায়।
পার্থিব সুখ ম্লান হয়ে আসে, গৌরব লোপ পায়।
পরিবর্তন, ক্ষয় শুধু দেখি জগতের চারিধার ;
পরিবর্তন হয় না তোমারি, থাকো কাছে অনিবার !

প্রতি গতিশীল ঘণ্টায় চাহি তোমার উপস্থিতি।
তব কৃপা বিনে পাপ-প্রলোভন কেমনে এড়াবো নিতি ?
তোমার মতন অবলম্বন দুখে সুখে কেবা আছে ?
কে মোরে চালাবে তুমি ছাড়া আর, থাকো মোর কাছে কাছে !

ডরি না অরিরে কাছে থেকে তুমি করিলে আশীর্বাদ !
অন্তরের বোঝা, দুখের অশ্রু রহে নাকো অবসাদ !
মৃত্যুর জ্বালা কোথায় তখন ? শ্মশানের ভীতি কই ?
যদি থাকো তুমি আমার সঙ্গে আমি যে বিজয়ী হই।

অভয় হস্ত দেখায়ো আমায় নয়ন মুদিব যবে !
আঁধারের মাঝে আলোক হানিয়া পন্থা দেখায়ো তবে।
নব জীবনের আলো পাবো তবে, মিলাবে ধরার ছবি।
জীবনে মরণে কাছে থাকো তুমি, তা হলে পাইব সবি !

নিয়ম

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূর্য উঠে ফুল ফুটে
ঘড়ি চলে টিক্ টিক্ টিক্ .....
এই তো নিয়ম।

সূর্য ডুবে ফুল ঝরে
একদা ঘড়িও বন্ধ হয়
এই তো নিয়ম !

আমি চলেছি
দিন মাস বছর বছর ধরে
পৃথিবীর পথে পথে
কত প্রয়োজনে, কিন্তু

সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে
চলেছি আমি,
নিয়ম মাফিক
মানুষের জীবন কখনো কি চলে ?

অথচ সূর্য ফুল ঘড়ি এ সব
আমার চাই
চলার-ই প্রয়োজনে,
এই তো নিয়ম।

প্রেমের কবি গ্যেটে

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

জার্মান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি গ্যেটের সাহিত্য এবং জীবন-বোধ পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি কোন একটি বিশেষ কালের গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন না—তাঁর জীবনযাত্রা এবং কর্মের গতি ছিল মন্থর—কাব্যানুশীলনের এই মন্থরতা থেকে তাঁর চরিত্রের (বিশেষ ক'রে কাব্য-ক্ষেত্রের) পরিচয় পাই। গ্যেটের এই দীর্ঘ-সূত্রিতা ক্ল্যাসিক-সাহিত্য রচনায়, সম্ভবতঃ, অনুকূল আব-হাওয়ার সৃষ্টি করেছিল!—য়ুরোপের নবজাগরণ কালে যে সকল মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে গ্যেটে অন্যতম। তৎকালীন যুগের জার্মান সাহিত্যে তিনি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। কোন কোন সমালোচক uni-versal genius' বলে গ্যেটে প্রতিভাকে চিহ্নিত করেছেন। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, তিনি একাধারে ছিলেন কবি এবং 'ফাউস্ট'-এর মত মহাকাব্যের রচয়িতা, এছাড়া রাজ-নীতি ও শিল্পে-বিজ্ঞানে অসাধারণ তীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। গ্যেটের মতে, তাঁর সমগ্র শিল্প-সাহিত্যই হচ্ছে আত্মচরিত। তিনি জীবন সম্পর্কে ছিলেন ভীষণ সচেতন। তাঁর যৌবনকালে রচিত কাব্য সমষ্টিতে ছিল, সমালোচকের ভাষায়, রোমাণ্টিক জীবন-দৃষ্টি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বোধের পরিবর্তন হয়—তখন তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু জীবন। স্টিফেন স্পেণ্ডার একদা গ্যেটে সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—"অ্যাট কার্স্ট হিজ লাইফ্ রোট্ হিজ্ পোয়েট্রি; আফটার, হিজ্ গ্রেট্‌নেস্ রোট্ হিজ্ লাইফ।"—উক্তিটিকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। কারণ, চল্লিশোধ বয়সের রচনায় জীবন-বোধ সুপ্রত্যক্ষ। আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, তিনি অকপটে আত্মকথাই লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষ করে 'ফাউস্ট'-এ। তাঁর দোষ-গুণের স্বীকারোক্তির সঙ্গে রুশোর মিল লক্ষণীয়। রুশো তাঁর 'কনফেসনস্' গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আলো-চনা ক'রেছেন অকপটে। কিন্তু মহাকবি গ্যেটে অতটা সরল সহজ ভাবে কিছু বলেন নি। আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, গ্যেটে এবং তাঁর সমসাময়িক কালের জার্মান নাগরিক জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জনৈক প্রবন্ধকার একদা বলেছিলেন, "আত্মজীবনী গ্রন্থে আপন জন্ম-ক্ষণের যে বর্ণনা দিয়েছেন গ্যেটের তা থেকে স্পষ্টতঃই ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর কালে জ্যোতিষী ও গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের ওপর জার্মান জনসাধারণের এমন কি তাঁর নিজেরও যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। তাঁর জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের শুভ অবস্থানের ফলেই তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, গণৎকারদের সেইমত তিনি সেজন্যই সানন্দে আত্মকথায় প্রকাশ করেছেন। তবে চন্দ্রের অধিষ্ঠানে প্রতিকূল পরিবেশের দরুণ তাঁর মাকে দীর্ঘ সময় প্রসব বেদনা ভোগ করতে হয় এবং একটি মৃত শিশুর জন্ম হয়েছে বলে তখন যে সবার মনে সন্দেহ হয়েছিল তাও সেই প্রতিকূলতারই ফল, জ্যোতিষীর সে মতও তিনি উল্লেখ ক'রেছেন।" প্রসংগত এ কথা বলতে পারা যায় যে, ভারতের সঙ্গে জার্মানের এখানেই বিরাট ঐক্য—ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সঙ্গে জার্মান জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাদৃশ্য আছে। জার্মানী ভারতীয়দের কাছ থেকে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিখেছে এও সম্ভব। কারণ জার্মানরা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত—সম্ভবতঃ গ্যেটেও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন—নয়ত শকুন্তলা নাটক সম্পর্কে ঐ রকম সুন্দর মন্তব্য করা সহজ নয়।

গ্যেটে ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং প্রেমের কবি। রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রাম অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধে। তিনি তাঁর পুত্রকে ফরাসী-শক্তি প্রসার নীতির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে নিষেধ করেছিলেন। এজন্য অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে অনেকে অনেক অভিযোগ করেন। গ্যেটের কাছে এই সত্য হয়ত উদ্ঘাটিত হয়েছিল যে, যুদ্ধের পরিণতি ধ্বংস মৃত্যু ক্ষয়। মৃত্যুর দৃশ্য গ্যেটেকে বিষণ্ণ-স্তম্ভিত করে তুলত। গ্যেটের বয়স যখন খুব অল্প তখন তাঁর একমাত্র খেলার সাথী ছিলেন কর্নেলিয়া—কর্ণেলিয়া তাঁর বোন।

কিছুদিন পর গ্যেটের ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়, কিন্তু অল্প বয়সে তার মৃত্যু হয়। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি এক ফোঁটা অশ্রুপাত করেন নি—এর অর্থ এই নয় যে, সেদিন তিনি দুঃখিত হন নি—মৃত্যুকে প্রথম দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ছোট ভাইকে তিনি ভালবাসতেন কি না তাঁর মা'র এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি দেখিয়েছিলেন তাঁর অনেক লেখা, সেগুলো ছোট ভাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ম হয়েছিল।

জার্মান ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটে ইতালী ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত—তিনি ইতালী ভাষা মনোযোগের সঙ্গে শেখেন। ইতালী ভাষা ও সাহিত্যে যখন দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন তখন তাঁর পিতৃদেব খুশী হয়েছিলেন। গ্যেটে একদা লিখেছেন,

"All fathers entertain the pious wish of seeing their own lacks realised in their sons. It is quite as though one could live for a second time and put to full use the experiences of one's first carreer."

গ্যেটে প্রেমের উদ্দেশে অভিযান করেন শৈশব থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত। তাঁর শৈশব কালে একটা ঘটনা ঘটে যা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষালাভের জন্ম তিনি ফ্রাংকফুর্টে গিয়েছিলেন। সেখানেই ফ্রেডারিকা নামে জনৈক যাজক-কন্যার সংগে পরিচয় হয় এবং তিনি তার প্রেমাসক্ত হন। শেষে ফ্রেডারিকা-ব্রায়ামের প্রেম তাঁকে বেদনার্ত করে তুলেছিল। বস্তুতঃপক্ষে গ্যেটে কোন নারীর প্রেমেই শান্তি পান নি—যদি পেয়ে থাকেন তা ক্ষণিকের জন্য। গ্যেটে ছিলেন অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসু—তিনি একাধিক নারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন, এবং তা ছিন্নও হয়। ফ্রেডারিকা ব্রায়ানের সংগে গ্যেটের যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি আত্মকথায় সে-কথা সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন—কিন্তু শেষের দিকে ফ্রেডারিকার কথা শুধু এই বলেছেন "The were painful days, the memory of which has not remaind with me"—ফ্রেডারিকার সংগে যে প্রণয় হয় তা গ্যেটের মনে কি খুব গভীর রেখাপাত করে নি? পরবর্তী কালের প্রণয়নী সম্পর্কে উচ্ছ্বাসময় ভাষায় তিনি অনেক কিছু বলেছেন। কোন কোন সমালোচকের মতে গ্যেটের বিখ্যাত ফাউস্ট-এ ফ্রেডারিকা অনেকখানি চিত্রিত হ'য়েছে মার্গারেট চরিত্রে। তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য Dia Liden des jungen werthers নামক রচনা—যা গ্যেটেকে অমর করে রেখেছে এবং তৎকালীন জার্মান-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করেছিল। উক্ত রচনাটি ফ্রেডারিকার সংগে প্রণয়ের পটভূমিকায় রচিত। এ ছাড়া গ্যেটের প্রণয়িনী ফ্রেডারিকা সম্পর্কিত কবিতাবলীর মধ্যে Welcome and farewell-এর নাম উল্লেখ না করলে অনেক কিছু না-বলা থেকে যায়। উক্ত কবিতার ইংরাজী অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"With tereful
glance and tender
Thou gazedst
after me afler;
And yet, what bliss
in love's surrender,
And to be loved
our very star."

উপরি উক্ত কবিতা থেকে ফ্রেডারিকার প্রতি গ্যেটের প্রণয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

গ্যেটের প্রণয়-কাহিনী সম্পর্কিত ইতিহাসের ধারা তাঁর রচনাতেই রক্ষিত। যেমন, আত্মজীবনী, ফাউস্ট তরুণ হ্বার্থারের মৃত্যু ইত্যাদি গ্রন্থে। তিনি কিশোর বয়স থেকে সুরু করে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত একাধিক নারীর প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হন। বিশেষ করে যৌবন কালে গ্যেটে একাধিক নারীর প্রেমে তন্ময় হ'য়েছিলেন। তখন তাঁর এমন অবস্থা কোন সুন্দরী মহিলা দেখলেই অভিভূত হয়ে পড়তেন। এবং অতি সহজেই যে কোন নারীকে ভালবাসতেন—প্রেম যত সহজে আসে তত সহজেই ছেদ পড়ে—এবং অনিবার্য কারণে বিচ্ছেদ ঘটলে তিনি ভেঙে পড়তেন। তাঁর এই অবস্থা থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্যেটের প্রণয়নীদের মধ্যে ফ্রেডারিকা, গ্রেট্‌চেন্, লিলি-শোনম্যান, শার্ল'ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।—ফ্রেডারিকার কথা পূর্বে পূর্বে উল্লেখ করেছি। গ্যেটের যখন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স তখন তিনি গ্রেটচেনের প্রেমে পড়েন—গ্রেট্‌চেন্ ফ্রাংকফুর্টেই থাকতেন। গ্রেট্‌চেন্‌কে তিনি জীবনে বেশী

দিনের জন্ম পান নি, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিলে জোসোরেফ অভিষেক উপলক্ষে উৎসবের দিনই তাঁর সঙ্গে গ্রেটচেনের শেষ দেখা। এ সম্পর্কে গ্যেটে লিখেছেন—"When I accompanied Gretchen to her own door she kissed me on the forehead it was the first and the last time that she lestowed a kiss upon me, for I was destined never to see her again." গ্যেটে গ্রেটচেনের সেই প্রথম এবং সেই শেষ চুম্বনকে সম্বল করে ফিরে এসেছিলেন। তার সঙ্গে কবির আর কোন দিন দেখা হয় নি।—লিলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'য়েছিল কর্ণেলিয়ার বিয়ের সময়। লিলির রূপে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন কবি। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের পরিচয় হয় এবং দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে—এ ব্যাপারে গ্যেটের মা'র সমর্থন ছিল। কারণ তাঁরও পছন্দ হয়েছিল লিলিকে—তিনিও নাকি লিলিকে পুত্রবধূ রূপে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাতা-পুত্রের আশা সফল হয় নি। লিলির সঙ্গে অন্য একজন ভদ্রলোকের বিবাহ হয়ে যায়। এই ব্যাপারে গ্যেটের মনে খুব বড় আঘাত লেগেছিল।—যৌবনে তিনি শার্লটকে ভালবেসেছিলেন। শার্লট একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর স্ত্রী। বয়সে গ্যেটে অপেক্ষা অন্ততঃ সাত বছরের বড়। তা ছাড়া তিনি (অর্থাৎ ঐ মহিলাটি) ছিলেন সাতটি সন্তানের জননী।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে গ্যেটে তরুণ হ্বার্থারের মৃত্যু নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানি রচনা ক'রে জার্মান-সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন—উক্ত গ্রন্থখানি ছিল মৌলিক এবং সার্থক রচনা। গ্যেটে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত 'ফাউস্ট' নামক নাট্য কাব্যখানি। যখন তাঁর মাত্র বাইশ বছর বয়স তখন তিনি উক্ত গ্রন্থখানি লিখতে সুরু করেন। দীর্ঘ তিরিশ বছরের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করেন। তারপর পুনরায় প্রায় তিরিশ বছরের পরিশ্রমের ফলে দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হয়। দীর্ঘকাল ধরে গ্যেটে তাঁর অমর কাব্য 'ফাউস্ট' রচনা করেন। 'ফাউস্ট' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। 'ফাউস্ট' রচনা শেষ হওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান। দার্শনিক তথ্যে পরিপূর্ণ এই বিপুলাকার নাট্যকাব্য 'ফাউস্ট' পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত জাজ্জ্বল্যমান থাকবে। গ্যেটে কাব্যে এইটিই লক্ষণীয় যে, তিনি ছিলেন জীবনমুখী। তিনি ছিলেন জীবন-সচেতন কবি। "প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সের এই কবিতাটি নিঃসন্দেহে এক অন্তর্নিহিত ধর্মবোধের সাক্ষ্য বহন করে। সার্বিক সত্যের কাছে অন্তর থেকে সমর্পণের সুর কবি-চেতনায় ইতিপূর্বেই পরিস্ফুট হ'য়েছিল। এক পরিপক্ক জীবন বোধে সে সুরের সঙ্গে এসে মিলল অমরত্বের প্রতীতি। জীবনের উদ্দেশে মৃত্যুকে বরণ করার যে নির্দেশ (die or live) হেগেলীয় দর্শন থেকে উদ্ভূত তারই যেন কাব্যিক রূপায়ন লক্ষিত হয় এই কবিতার মর্মবাণীতে। জীবনের উপর গ্যেটের অগাধ বিশ্বাস; সে বিশ্বাসে মরণের বিরো-ধাত্মক রূপটিও অন্তর্হিত। মৃত্যু তাঁর শত্রু নয়, বরং গোড়া থেকেই তিনি মৃত্যুর সঙ্গে সখ্যসূত্র স্বীকার করে এসেছেন। পুনর্জীবনে গ্যেটে বিশ্বাসী। সুদীর্ঘ আট দশক ধরে তাঁর জীবনের ভূমিকা পাতা, জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা রূপেই মৃত্যুকে তিনি অবলোকন করেন। খ্রীষ্টমতাবলম্বী হয়েও এক এক বিশ্বাতীত ঈশ্বরব্যক্তিতে বিশ্বাসেই গ্যেটের জীবন-দর্শনের পরিণতি নয়। তা উত্তীর্ণ হয়েছিল বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রকাশ-মান পরমসত্তার সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্যের বোধে। এই বিশ্ব-বীক্ষাই গ্যেটে উপস্থিত ক'রেছেন 'ফাউস্টে'র দ্বিতীয় খণ্ডে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে এই বাণীই ধ্বনিতে হ'য়েছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান তা ঐশীশাশ্বতেরই প্রতিবিম্ব—'যা কিছু অনিত্য তা শুধু যেন প্রতিরূপ'।"—জীবন সচেতন এবং প্রেমের কবি গ্যেটের 'ফাউস্ট' নাট্যকাব্যখানিতে জীবন-দর্শন সুপ্রত্যক্ষ। 'ফাউস্টে'র দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হওয়ার পর কবি বেশী দিন বাঁচেন নি।

জীবন ও ডি. এন. এ.

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

জীবন সৃষ্টি হয়েছিল জড় পদার্থ (non-living) থেকে, কি জীবনের উৎপত্তি আরেক জীবন থেকেই,—এ এখনও একটি বহু-বিতর্কিত বিষয়।* সৃষ্টির আদি-পর্বে, (প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে?) পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল জলীয় বাষ্প, এ্যামোনিয়া আর মিথেন গ্যাসে ভরা; গ্র্যানাইট, লাভা আর উঁচু-নীচু পাথরে ভরা নিষ্প্রাণ সেই সময়ের পৃথিবীর বুকে চলেছিল প্রচণ্ড আলোড়ন; প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল উদ্দাম, উত্তপ্ত, অশান্ত; মোট কথা হ'ল, সেই সময়ে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না।

এর বহু, বহু পরের অধ্যায়ে পৃথিবী কিছুটা প্রকৃতিস্থ হ'ল, বহু শতাব্দীর বৃষ্টি জমে (?) পৃথিবীর নীচু জায়গা-গুলোতে সমুদ্রের আবির্ভাব সূচিত হ'ল।

সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে—বহু খনিজ পদার্থ, বৃষ্টির জলে মেশা বহুতর গ্যাস(১), ও বিভিন্ন পদার্থ সমুদ্রের জলে গিয়ে মিশেছিল; স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ ছিল বৃহৎ; বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে—বহুতর জটিল এবং বিচিত্র বিক্রিয়ার পথে, সর্ব-প্রথম জৈবপদার্থ (Organic Substance)(২) তাই সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রের বুকেই।

বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, প্রোটিন (protein) ও নিউক্লীক এ্যাসিডের (nucleic acids) জন্ম হয়েছিল সমুদ্রেই। কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন-হাইড্রোজেন, ফসফরাস ও অন্যান্য বহু পদার্থের সুনির্দিষ্ট সংযোগ অনুকূল আবহাওয়ায় সম্ভব হয়েছিল, মনে হয়, আকস্মিকভাবেই (Coming together in right proportions, under the right conditions)। (প্রোটিন এবং নিউক্লীক এ্যাসিডের যোগাযোগে জন্ম নিল প্রোটোপ্লাজম (protoplasm)। জীবজগতে, এরপর এল কোষ (cell)। নিউক্লীক এ্যাসিড যেন জীবন তৈরী করার আসল প্ল্যান (Blueprint); সৃষ্টির এত বৈচিত্র্যের মূলে নিউক্লীক এ্যাসিডের আণবিক গঠনের (Molecular configuration) বিভিন্নতা; এক জীবন থেকে অন্য জীবনে বংশধারা (Heredity) সংক্রামিত করার পেছনেও কাজ করেছে এই নিউক্লীক এ্যাসিড। (৩) আর জীবনের প্রধান ধর্ম, পুনঃরুৎপাদন (Reproduction) করে বংশগতি বজায় রাখা, দেখেই জীববিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন জীবন আসে জীবন থেকেই (Life from anything—living)। পরমাণুতত্ত্ব নিয়ে জীবন-রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে আজকের বিজ্ঞানীরা কিন্তু অনুভব করছেন, ডারউইনের সেই বাণী:

"The world has evolved little by little from a small beginning, and has increased through the activity of the elemental forces embodied within itself."

---

* আমার লেখা: 'আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা,' প্রবাসী—(কার্তিক, ১৩৭৩) দ্রষ্টব্য।

১। জীবন-সৃষ্টির সহায়ক প্রধান ক'টি উপাদান—কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তখনও প্রকৃতির বুকে স্বাধীন বিচরণ আরম্ভ করে নি; সমুদ্রে, জলের হাইড্রোজেনের সঙ্গে বাঁধা ছিল অক্সিজেন; কার্বন, নাইট্রোজেন—এরা সবাই কোন-না-কোন পদার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল (যেমন, কার্বন ছিল ভূত্বকের নীচে খনিজ লোহার সাথে আয়রণ কার্বাইড হিসেবে।)

২। পূর্বে ধারণা ছিল, জৈব পদার্থ একমাত্র জীবিত বস্তু থেকেই আসে। সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, আবহাওয়াস্থিত মিথেন অণুর ওপর কসমিক রশ্মি এবং বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফলেই, প্রথম তৈরী হয়েছিল হাইড্রো-কার্বন (Complex Hydrocarbons)।

৩। নিউক্লীক এ্যাসিডের অস্তিত্ব অবশ্য মিশরি (Miescher) ১৮৬৯ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন; কিন্তু জীবন-রহস্যের সঙ্গে এর যোগসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে হালফিল।

দু'রকমের নিউক্লীক এ্যাসিড, DNA (Deoxyribonucleic acid) এবং RNA (Ribonucleic acid) এর মধ্যে তফাৎ হ'ল—চিনির উপাদানে (Kind of Sugar present)।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু (Bacteria), ভাইরাস (Virus) থেকে আরম্ভ করে উদ্ভিদ, মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি জীব-কোষে DNA'র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

জীবনের প্রকাশ সামগ্রিকভাবে DNA অণুর গঠনের ওপর নির্ভরশীল। এক জাতীয় জীবাণুর DNA, অন্য একজাতীয় জীবাণুর ওপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে, গ্রহীতা জীবাণুর (Receipient Bacteria.) স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে, দাতা জীবাণুর (DNA—Donor Bacteria.) বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে।(৪) (Bacteria Transformation) এ-ছাড়াও, অনেক জিনিষ DNA অণুর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম; পরিব্যাক্তিজনক (Mutagen) সেই সমস্ত জিনিষ(৫) দিয়ে DNA অণুর গঠনে পরিবর্তন আনলে, দেখা গেছে জীবনের বিচিত্র প্রকাশও পরিবর্তিত হচ্ছে (যেমন, সাদা ফুলকে লাল রং করা যাচ্ছে; কোন জিনিষের গুণাগুণ (Quality) বা বৃদ্ধি (Development) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে; বংশানুক্রমিক রোগ নিরাময় করা যাচ্ছে।) অর্থাৎ DNA'র সূত্র ধরে, উদ্ভিদ, মানুষ, মাছ, পাখী কিংবা জীবজগতের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কোন অমিল নেই; আপাতদৃষ্টির এই সমস্ত প্রভেদের মূল কারণ, DNA'র গঠনগত ভিন্নতা।

উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের কোষের মধ্যেকার কেন্দ্রকে (Nucleus) থাকে ক্রোমোজোম (Chromosome)।(৬) এই ক্রোমোজোমের মধ্যেই থাকে DNA। ক্রোমোজোমের অন্তর্গত, কিছুদূর অন্তর বিশেষ কয়েকটি বিন্দুতে (চোখে দেখা যায় না; অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে আঘাত করা যায়।) আবার বেশী পরিমাণে সঞ্চিত থাকে এই ন্যুক্লীক এ্যাসিড; এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে—জিন (Gene)।

১৯২৭ সালে, H. J. Muller এক্সরে প্রয়োগ করে 'ড্রসোফিলা' জাতীয় ফড়িংয়ের DNA অণুর পরিব্যক্তি (Mutation,) ঘটিয়েছিলেন; অনুরূপ পরীক্ষা বার্লি গাছের ওপর করেন তার পরের বছর L. J. Stadler।

একটি ক্রোমোজোমেই এই রকম বিন্দু ১,০০০ থেকে ১০,০০০ অবধি থাকতে পারে। প্রতিটি জিনের মধ্যেকার DNA অণুর গঠন বিভিন্ন। এই রকম এক একটি জিন, ওরকে তার DNA এক একটি কাজ করে। ফর্সা কি কালো রংয়ের জন্য দায়ী একটি জিন; লম্বা-বেঁটের জন্য দায়ী আর একটি; বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য দায়ী একটি; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী আবার অন্য একটি—সহজভাবে বলতে গেলে এইরকম আর কি।

DNA অণুর (Macromolecule of DNA) গঠন আবার ভারী চমকপ্রদ। জীবনের বিচিত্রতর প্রকাশের মূলে যে—DNA, সেটা কিন্তু তৈরী সামান্য কয়েকটি জড় বস্তুর অণুর সুষ্ঠু সংযোগে। বিভিন্ন জড় বস্তু কণিকার সার্থক সম্মেলনে জীবনের প্রকাশ হচ্ছে সম্ভব ;—এর থেকেই কি প্রমাণিত হয় না—জড়, জীবন—এমন কি সৃষ্টির সবকিছুই, মূলতঃ সেই আদি, অকৃত্রিম—এক মহাশক্তি দ্বারা বিধৃত? সেই মহাশক্তির পরিমাণগত তারতম্যই সমস্ত বৈচিত্র্যের মূলকথা। DNA অণু তৈরী, নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ পিউরিন, পিরিমিডিন (Purines and Pyrimidines), কার্বনসমৃদ্ধ চিনি (5 Carbon Sugar.) এবং ফসফরাস (Phosphorus) দিয়ে।(৭) পিউরিন, পিরিমিডিনগুলো চিনি এবং ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত থাকে। একটি এ্যাডিনিনের সঙ্গে সব সময় যুক্ত থাকে একটি থাইমিন (A + T); তেমনি একটি গুয়ানিনের সঙ্গে একটি সাইটোসিনের অণু থাকে সংযুক্ত (G + C)। বিভিন্ন জীবের

৪। F. Griffith এই ধরনের পরীক্ষা দিয়ে দেখিয়েছেন, DNA'ই জীবনের প্রকাশের মূলে—Genetic material।

৫। বিভিন্ন পরিব্যাক্তিজনক (Mutagen) জিনিষ, যেমন—এক্সরে, আলট্রাভায়োলেট রে, গামা রে ইত্যাদি। অনেক রাসায়নিক জিনিষও DNA অণুর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, যেমন—হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, নাইট্রাস এ্যাসিড, ফেনল, এই সব।

৬। অতিক্ষুদ্র, টুকরো টুকরো এই ক্রোমোজোমগুলোকে—অণুবীক্ষনের তলায় দেখায় ঠিক পাকানো দড়ির মত (Coiled threadlike)। বিশেষ কিছু রং (Biological Stains) দিয়ে (যেমন Feulgen Stain) রাঙালে এদেরকে উজ্জ্বল দেখায়।

বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে, এই ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট—যেমন, মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬ কিন্তু, ভুট্টা গাছের কোষে ক্রোমোজোম পাওয়া যাবে, ২০টা।

৭। দু'রকমের পিউরিন,—এ্যাডিনিন (Adenine) এবং গুয়ানিন (Guanine)। দু'রকমের পিরিমিডিন, —থাইমিন (Thymine) এবং সাইটোসিন (Cytosine)।

ভেদে, এই (A+T) : (G+C) সম্পর্ক, পরিমাণের (Quantitatively) দিক থেকে বিভিন্ন।

এক্সরে ছবি থেকে DNA অণুর গঠন (X-Ray diffraction pattern) সম্বন্ধে আন্দাজ করা গিয়েছে। ওয়াটসন এবং ক্রীক(৮) DNA অণুর মডেলও (ছবিটি দেখুন।) তৈরী করে ফেলেছেন; দেখতে অনেকটা—একটা খুঁটির চারদিকে, দু'দিক থেকে দুটো শেকল প্যাঁচালে যেরকম দেখায়, সেই রকমটি। প্রতিটি শেকল যেন পিউরিন-পিরিমিডিন, চিনি এবং ফসফেট দিয়ে তৈরী, এইরকম দু'টি শেকল যেন মইয়ের মতো, মাঝে মাঝে হাইড্রোজেন (H-Bonds) অণু দিয়ে জোড়া।

DNA অণুর মধ্যেকার পিউরিন-পিরিমিডিনগুলো স্বভাবতঃই বিভিন্ন কায়দায় সাজানো সম্ভব (Many different sequences of Purine-Pyrimidine pairs are possible)। বিবর্তনের ফলে, জীব জগতের যত পরিবর্তন হয় (During Evolution) তা' এই সাজানোর কায়দার তারতম্যের জন্যই।

কৃত্রিম DNA তৈরী এখনো সম্ভব হয় নি; গবেষণাগারে যেদিন তা' তৈরী করা সম্ভব হবে, জীবন-রহস্যের অনেকটারই সমাধান সেদিন হয়ে যাবে। (৯)

এমন দিন আসতে আর বেশী দেরী নেই, যেদিন আমরা একটি DNA তালিকা (Table) তৈরী করতে পারব। সেই তালিকা অনুসারে, DNA অণুর গঠন পছন্দ সব পাল্টে আমরাই নবজাতকের জন্ম-মৃত্যু ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো; সারাতে পারবো ক্যান্সার রোগ সম্পূর্ণভাবে; প্রকৃতি এতদিন আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে, DNA আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এমনি এক আশ্চর্য্য আলাদীনের প্রদীপের মতো ক্ষমতা, যা' দিয়ে আমরা ইচ্ছেমতো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

৮। J. D. Watson এবং F. H. C. Crick; এই কাজের জন্য সম্প্রতি এঁদেরকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

৯। জীবনের প্রধান ধর্ম পুনরুৎপাদন করে বংশবৃদ্ধি; কোষ বিভাজনের সময়, DNA অণু অবিকল নিজের ছাঁচে (Replica) অন্য একটি DNA অণু পুনরুৎপাদনে সক্ষম।

নানা রং-এর দিনগুলি

শ্রীসীতা দেবী

22nd October, 1920. এর পরদিনও রামলীলার মিছিল যাবার কথা। যাঁদের বাড়ী এসেছি তাঁদের আগ্রহে সেদিনটাও তাঁদের ওখানেই থেকে যাওয়া গেল, যদিও দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখবার বিশেষ কিছু ইচ্ছা আমার ছিল না। ভবিষ্যৎ কয়েকদিনের জন্য আমাদের বাসস্থান ঠিক হয়েছিল গঙ্গার ওপারে গদ্যপুর বা গদ্দপুর বলে একটা গ্রামে। সেখানে মেজর বসুর একটা ছোট বাগানবাড়ী আছে।

বিকেলে ওঁদের শহরের বাড়ীতে আবার প্রচুর জনসমাগম হতে লাগল। বিজয়ার সম্ভাষণ আর আশীর্ব্বাদ, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টিমুখ করার চোটে বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠল। বাড়ীর একটি নবাগতা বৌ এবং তার শিশুপুত্রকে এই প্রথম দেখলাম। দুটিই সুন্দর। খোকাটির ত আমাকে এমন পছন্দ হয়ে গেল যে বাড়ীর লোকে অবাক্।

এর মধ্যেই আবার এক visitorএর আবির্ভাব হল। তিনি হলেন আমার এককালীন সহপাঠিনী ইন্দুমতী, এখন এখানকার নবপ্রতিষ্ঠিত জগৎতারণ স্কুলে কাজ নিয়ে এসেছেন। খুব গল্প জমল, ইন্দুমতীর এদিকের ক্ষমতা অসাধারণ। গল্পের শেষে সেই রাত্রেই আমাকে তার বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে অনেক টানাটানি করল। শরীর ভাল ছিল না, যেতে ইচ্ছা করল না। সেও ছাড়বে না, শেষে অনেক গবেষণার পর ঠিক হল যে তারপরদিন সকালে হয় সে নিজে নয়ত তার ছোট বোন এসে আমাদের নিয়ে যাবে। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করব এবং মা বাবা গদ্দপুর যাবার পথে আমাদের ওখান থেকেই তুলে নিয়ে যাবেন। এরপর ত আগন্তুকরা বিদায় হলেন।

তবে পরদিন নিমন্ত্রণকর্ত্রীরা নিতে আসতে এত দেরি করলেন, যে আমি ত প্রায় হাল ছেড়ে দিলাম। যা হোক শেষ অবধি গাড়ী এল, এবং আমরা দুই বোন যাত্রাও করলাম।

পথগুলো এবার একটু চেনা চেনা লাগতে লাগল। এক-একটা জায়গা যেন রীতিমত হেসে বলছিল "কি গো চিনতে পার ?" কত পরিচিত মাটির ঢিপি আর ভাঙা বাড়ীর সঙ্গে যে এতকাল পরে দেখা হল। এরা যে মনের কোন্ গোপন কোনে লুকিয়ে ছিল তা জানতামনা ত। খোঁজ নিয়ে জানলাম একেবারে হারিয়ে যায় নি।

ইন্দুমতীরা এখন এলাহাবাদের যে দিকে থাকে তার নাম George Town. নিতান্ত আধুনিক পাড়া, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নূতন বাড়ীতে ভর্ত্তি। আমরা যখন এলাহাবাদের বাসিন্দা ছিলাম তখন এই জায়গাটার নাম ছিল সোবাতিয়া বাগ। বাড়ীঘরের চিহ্নমাত্রও ছিল না, ছিল কেবল অড়হরের ক্ষেত, জুঁধরির ক্ষেত, ধূ ধূ করা মাঠ, কেউটে সাপ, ধর্ম্মের ষাঁড় আর মেড়ো ডাকাত। বছরের অধিকাংশ সময় জনমানবহীন হয়ে থাকত, কেবল মাঝে মাঝে যখন শহরের মধ্যে প্লেগ মহামারীর ধুম বেধে যেত, তখন দলে দলে ভীত নাগরিকবর্গ এইখানে টাটের কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিতে ছুটত। আমরাও এসেছিলাম একবার, বেশ বিচিত্র জীবন যাপন কিছুকাল করা গিয়েছিল। স্বচ্ছন্দে তা নিয়ে গল্প রচনা করা চলে।

সেবারে এলাহাবাদে দারুণ মহামারীর প্রকোপ হল। সম্ভবত সেটা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৯০৫। যারা পারল তারা এলাহাবাদ ছেড়েই পালাল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই সে সুবিধা ছিল না। কাজকর্ম্ম সকলের শহরে, কাজেই পুরুষ মানুষদের থেকে যেতেই হবে। মেয়েরা ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় যাবে ? কে তাদের অভিভাবকত্ব করবে ? কাজেই অন্য ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করা হল। সোবাতিয়া বাগের বসতিবিহীন দিগন্ত বিস্তৃত মাঠগুলিকে কাজে লাগান হল। এইখানে **plague camp** বসল। সব বেড়ার ঘর। সেই-

খানেই দলে দলে লোক পরিবার নিয়ে এসে উঠতে লাগল। আমরা ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। কারণ বাবাকে রোজই শহরে আসতে হবে, তাঁর সব কাজই সেখানে। যান বাহনের মধ্যে ওদিকে একা ছাড়া কিছুই ছিল না। দীর্ঘ পথ, আসা-যাওয়ায় খুবই কষ্ট হবে। তা ছাড়া অন্য ভয়ও ছিল। অফিসের টাকাকড়ি সব তাঁকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ফিরতে হবে, অথচ পথে ডাকাতির খবর খুব শোনা যেতে লাগল। তবে হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতি ঘটল যে আমাদেরও সোবাতিয়া বাগে গিয়ে আশ্রয় নিতে আর দেরি করা সম্ভব হল না। পাড়ার নানা বাড়ীতে ইঁদুর মরতে আরম্ভ হল। এটি প্লেগের পূর্ব্ব লক্ষণ। আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম যাবার জন্য. এবং যেখানে বাঘের ,ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়, আমাদের বাড়ীর একটা out houseএ একটা মৃত ইঁদুর আবিষ্কৃত হল। আমাদের বাড়ীওয়ালা এক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক নিজে সেটাকে ল্যাজ ধরে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন এবং বাড়ী ফিরেই ঐ ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন।

আমরা জিনিষপত্র নিয়ে প্রায় গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি তখন দাদা জানাল যে তার জ্বর হয়েছে। সকলে ত কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু বাবা তখনি সামলে নিয়ে নূতন ব্যবস্থা করে ফেললেন। স্থির হল তিনি আর মা দাদাকে নিয়ে বাড়ীতেই থাকবেন, আর আমরা বাকি ভাইবোনরা মেসোমশায়ের সঙ্গে চাকর বাকর নিয়ে সোবাতিয়া বাগের কুঁড়েঘরে গিয়ে উঠব। ইনি নিজের মেসোমশায় নয়, কিন্তু নিজের মেসোমশায়ের চেয়ে অনেক নিকটতর আত্মীয় ছিলেন আমাদের; এঁর নাম শ্রীইন্দুভূষণ রায়। তাড়াতাড়ি আবার জিনিষপত্র দুভাগ করে গোছান হল, এবং আমরা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী চড়ে নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে। রাস্তাঘাট অতি বাজে, গাড়ীর ঝাঁকড়ানি খেতে খেতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়বার জোগাড়। গিয়ে পৌঁছে থাকবার ঘর দেখে আমরা ত অবাক্। এরকম ঘরে থাকা ত দূরে থাক, এ ধরণের কিছু চোখেও কখনও এর আগে দেখেছিলাম কিনা সন্দেহ। চারটি দেওয়াল বেড়ার, উপরে খড়ের ছাউনি, দরজা বলতেও একটা বাঁশ আর পাতালতার ঝাঁপ। সেটাই টেনে রাত্রে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। রান্নাঘরও সেইরকম, স্নানাদির ব্যবস্থাও কিছু উন্নততর নয়। এখন হলে ত ঘর দেখে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়তাম, কিন্তু একান্ত বালিকা বয়সে এটা ভয়ানক মজা মনে হল। মহোৎসাহে দুই বোনে মিলে ঐ ঘর দুটিকেই বাসযোগ্য করে গোছাতে লাগলাম। সঙ্গে এসেছিল একজন অজ পাড়াগেঁয়ে নূতন চাকর, তার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে গোঁ গোঁ করে কি একটা বলল, আমরা শুনলাম "আইবরণ।" এ হেন নামও আগে কখনও শুনিনি, আরো মুশকিল হ'ল যে তার প্রচণ্ড দেহাতী হিন্দী আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারলাম না। যা জবাব দেয় তা আমাদের কানে শোনায় "আঁই" আর "কাঁই"। আমরা ত তার আশা ত্যাগ করলাম, কিন্তু মেসোমশায় হাল ছাড়বার লোক নয়, তিনি নানারকম ইসারা ইঙ্গিতে তাকে বোঝাতে লাগলেন, এবং কাজও করাতে লাগলেন। মেসোমশায়ের অসংখ্য গুণের ভিতর একটা ছিল যে তিনি সাধারণ মহিলাদের চেয়ে ভাল রাঁধতে পারতেন। তিনিই রান্নাবান্না করে আমাদের খাইয়ে দিলেন। কিন্তু সেদিকেও বিপদ্ উপস্থিত হল বিকেল বেলা। থেকে থেকে ঝোড়ো হাওয়া বেড়ার ঘরগুলিকে নাড়া দিয়ে যেতে লাগল, এবং কর্তৃপক্ষ ঢোল বাজিয়ে সর্ব্বত্র প্রচার করে দিতে লাগলেন, ঐ সময় কেউ যেন বেড়ার রান্নাঘরে আগুন না জ্বালায়। কারণ একবার আগুন লেগে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত campটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না। তাহলে খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা? জানা গেল, প্রতি blockএ এক-একটি করে হালুয়াইকরের দোকান আছে। তাদের ইটের ঘর, তারা সারা পাড়ার জন্যে লুচি আর আলুর তরকারি করবে, সবাইকে তাই কিনে খেতে হবে। এখন ঐ "পুরী" আর তরকারি মুখে রুচত কি না জানি না, তখন কিন্তু বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছিলাম। মেসোমশায় খাবারের দোকান থেকে এসে খবর দিলেন যে দোকানী বোধহয় তিন চার দিনের মধ্যেই লক্ষপতি হয়ে যাবে, এমন ক্রেতার ভীড় তার দোকানে। চার পাঁচ জনে মিলে একসঙ্গে কাজ করেও

তারা সকলকে খুশী করতে পারছে না। একখানা অতিকায় কড়ায় একসঙ্গে দশ বারোখানা লুচি বেলে ছেড়ে দিচ্ছে, এবং সেই রকমই আর একটা কড়াতে আলুর তরকারি সিদ্ধ হচ্ছে। আলু যাতে তাড়াতাড়ি গলে যায়, তার জন্ত ছাদ পেটান দুরমুষ দিয়ে একজন লোক আলুগুলোকে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে।

সে রাত্রি ত আমরা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। ভয় করত হয়ত, কিন্তু মেশোমশায়ের বীরত্বের উপর আমাদের অটুট আস্থা ছিল, তা ছাড়া শোনা গেল এক এক পাড়ার যুবকরা মিলে রক্ষীদল গঠন করেছে, এরা সারারাত পাহারা দিয়ে বেড়ায়। রাত্রে ঘুম ভেঙে মধ্যে মধ্যে তাদের প্রচণ্ড চীৎকারও বার কয়েক শুনলাম।

যাক, তারপর দিন সকালে শহরের থেকে খবর এল যে দাদার জ্বর এক দিনেই ছেড়ে গিয়েছে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলছেন যে কোনো সামান্য কারণে হয়েছিল, ওকে নিয়ে সোবাতিয়া বাগে চলে যেতে কোন বাধা নেই। কাজেই সন্ধ্যাবেলা মা বাবা এবং দাদাও আমাদের সঙ্গে এসে জুটবেন। আমাদের আনন্দটা এ খবরে আরো বেড়ে গেল। নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে পরিবারের সকলকেই সঙ্গী পাব ভাবতে খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাই, মুলুর বয়স তখন মাত্র তিন বছর, সে মায়ের কাছ ছাড়া হয়ে একটু মনমরা হয়ে গিয়েছিল।

সোবাতিয়া বাগে সব জড়িয়ে মাস খানিক বোধ হয় আমরা ছিলাম। জীবনযাত্রাটা খুব সোজা-সুজি সরল ছিল। খাওয়া, শোওয়া আর বেড়ান। সংসারের কাজকর্ম মা চালাতেন চাকর-বাকরের সাহায্যে। আমরা বেড়াবার সময় ঢের পেতাম। নূতন প্রতিবেশী দু'চার ঘরের সঙ্গে আলাপও জমে গিয়েছিল। প্রায়ই ঝড় উঠত এবং পুরি তরকারি কেনার জন্তে ছুটতে হত। সাপ এবং ষাঁড়ের ভয় ছিল খুব। সাপগুলিও আবার ছোটখাট নয় বিরাট্ বিরাট্ কেউটে আর গোখরো। কিন্তু আমাদের রক্ষীদলরা খুব সতর্ক শিকারী হয়ে উঠেছিল। পরপর কয়েকটা সাপকে তারা অল্প দিনের মধ্যে মেরে ফেলাতে, সাপগুলো বোধহয় সেদিক্ ছেড়েই চলে গেল, কারণ পরে আর তাদের খবর শুনতাম না। ষাঁড়গুলিকে বিদায় করা যায়নি, কারণ তাদের মারা বারণ। এমনিতে তাদের কেউ কিছু বলত না, তবে হঠাৎ হঠাৎ এসে তারা যখন ঘরের বেড়া খেতে আরম্ভ করত তখন তাদের লাঠিপেটা করা ছাড়া উপায় থাকত না। রক্ষীদলই এ সব ব্যাপারে সবার আগে এগিয়ে আসতেন, অন্য ছেলেরাও দলে দলে যোগ দিতেন। রক্ষীদের ভিতর একজনের বেশ অদ্ভুত নাম ছিল এখনও মনে আছে। তাঁকে সবাই "লেলিহান" বাবু বলে ডাকত। এটা তাঁর পিতৃমাতৃদত্ত নাম না সঙ্গীদের দেওয়া তা মনে নেই। মাঝে মাঝে ষাঁড় তাড়াতে গিয়ে স্পেনের Bull fightএর মত খণ্ড যুদ্ধ হয়ে যেত, আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতাম, এবং ভয়ও পেতাম।

অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক একটা পাড়ায় অগ্নিকাণ্ড হয়ে যেত। যাদের ঘরে লাগত, তাদের সর্ব্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যেত কারণ বেড়ার আর খড়ের ঘরের আগুন দেখতে দেখতে সব গ্রাস করে নিত। লোকজন এসে পড়ে আশে-পাশের ঘরগুলো রক্ষা করত, গৃহহারাদের অন্য কুটিরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করত। এই সূত্রে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা মনে পড়ছে। দূরের একটা block-এ একদিন আগুন লাগল, সেটা আমাদের ঘর থেকে এতই দূরে যে আমাদের দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। হঠাৎ আমার তিন বছর বয়সের ছোট ভাই মুলু ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, "ঐ দেখ, ঘর পুড়ে যাচ্ছে।" আমরা অবাক্ হয়ে চার দিকে তাকিয়ে কোথাও ঘর পোড়া দেখতে পেলাম না। সে ক্রমাগত ব্যস্তভাবে বলতে লাগল, "ঐ যে পাখী পুড়ে গেল, ঐ দেখ, লোকরা সব বাক্স ছুঁড়ে ফেলছে, বালতি করে সবাই জল ঢালছে, দেখ না!"

আমরা ত কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সত্যিই জানা গেল ঐ রকম অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে, খাঁচায় রাখা টিয়া পাখীও পুড়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে Theosophist ছিলেন দুচারজন, তাঁরা এটাকে clair-voyance-এর ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করলেন। মুলুর ছোট জীবনে এরকম অলৌকিক ঘেঁষা ঘটনা আরো দু একটা ঘটেছিল।

এর পর শহরে মহামারীর প্রকোপ কেটে গেল আমরাও বনবাস ছেড়ে আবার নগরবাসী হলাম। পনেরো ষোলো

বছর পরে আবার সেই সোবাভিয়া বাগে পদার্পণ করলাম। কিন্তু এখন সে মাঠ নেই, কাঁচা রাস্তা নেই, সাপ বা ষাঁড়ও নেই। এখন সে George Town নূতন নূতন পাকা বাড়ীতে ও বিজলী বাতিতে ঝল্‌মল্‌ করছে। রাস্তা ঘাট সব আধুনিক।

ইন্দুমতীর বাড়ীটি ছোট তবে ফিটফাট সাজান গোছান। সে নিজে তখন খাবার ঘরে ষ্টোভ জেলে রান্না করতে ব্যস্ত। সেইখানেই বসে গেলাম আড্ডা দিতে।

অনেক নূতন মানুষের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীনীলরতন ধর ও তাঁর দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত নীলরতনের অগ্রজ জীবনরতন ডাক্তার গত বিশ্বযুদ্ধে I. M. S. হয়ে Mesopotamia গিয়েছিলেন, তার অনেক গল্প করলেন। নীলরতন ফ্রান্সের গল্প খানিক করলেন। অতঃপর তাঁরা বিদায় হলেন। ইন্দুমতীর বাড়ীর পাশে একটা বড় বাড়ী, সেখান থেকে অধ্যাপক অমিয়কুমার ব্যানার্জী এসে খানিক গল্প করে গেলেন। এঁরা ব্রাহ্ম সমাজের এবং এঁদের অনেকগুলি আত্মীয়স্বজন আমাদের চেনা, কাজেই সহজেই গল্প জ'মে গেল।

ওখানে এক মহিলার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ইনি কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভ্রাতৃজায়া। খুব অমায়িক ভাবে একটানা হেসে গেলেন। কথাবার্ত্তা অল্পকিছু বললেন, এবং তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

এরপর নাওয়া খাওয়ার পালা। শরীরটা ভাল না থাকায় এ বিষয়ে বেশী কিছু সুবিধা করতে পারলাম না। কোনোমতে সেরে নিয়ে বসে বসে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের খাওয়া দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই গদ্দপুর যাত্রী গাড়ী এসে গেল, আমরাও উঠলাম। বিশেষ কিছু খেতে পারিনি বলে ইন্দুমতী টিন-ভরে অনেক খাবার সঙ্গে দিয়ে দিল। আবার চললাম। শরীরটা ক্রমেই বেশী করে খারাপ লাগতে লাগল এবং রোদটা ঠিক মুখের উপর পড়ে বেশ অস্থির করে তুলল। পথের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গাড়ীর কোণে মাথা গুঁজে বসে রইলাম। ঘণ্টা দেড়েক পরে আমাদের গন্তব্য-স্থানে এসে উপস্থিত হলাম। নিজের শরীরের অবস্থার জন্য ভয় করতে লাগল। এলাম ত বনগাঁয়ে, serious কোন অসুখ যদি বাধাই ত বাবা মা, আমাকে নিয়ে করবেন কি? চারিদিকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য যে কিছু চেয়ে দেখলাম না, তা বলাই বাহুল্য। শুধু দেখলাম সামনে একটি ছোট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী, বেশ ভাঙাচোরা। আর কিছু দেখবার আগেই সদর দরজার তালা খোলা হল, এবং ভিতরে ঢুকে দেখলাম ছোট হল-ঘরটার ভিতর আর কিছু থাক বা না থাক, গোটাকতক খাটিয়া গোছের আছে। আর কথা না বলে একটার উপর শুয়ে পড়লাম। মা বাবা সংসার পথের পুরাতন যাত্রী, তাঁরা সহজে কাতর হন না। তাঁরা লোকজন ডাকাডাকি জিনিষপত্র ঘরে তোলা প্রভৃতি করাতে লাগলেন। আমি অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে সব দেখতে ও শুনতে লাগলাম।

বেশ খানিকক্ষণ পরে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম। দিনের আলো তখন প্রায় নিভে এসেছে, ঘরের ভিতরটা ছায়াচ্ছন্ন। উঠে বসে দেখলাম দিদিও আর একটা খাটিয়ায় ঘুমচ্ছে, ঘরে আর কেউ নেই। আর সকলের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পিছন দিকের বারান্দায় তোলা উনুন জেলে মা তখন রান্নাবান্নার আয়োজন করছেন, বাবা আর বামনদাসবাবু বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে ভদ্রলোক খুব সম্মান সংকারে ডাকলেন "আসুন"। তাঁর মেয়ের বয়সী হলেও এই "আপনি" সম্বোধন তিনি কোন দিনই ছাড়েন নি।

আহ্বান পেয়ে ত নীচে নেমে গেলাম এবং এতক্ষণ পরে ভাল করে চেয়ে দেখলাম যে যেস্থানে এসেছি, সেটা কি প্রকার। সূর্য্য তখন একেবারে অস্ত যাবার মুখে। বাংলোটা গোটা পঞ্চাশ ষাট বিঘা জমির মাঝখানে, এই জমির খানিকটা বাগান আর খানিকটা ক্ষেত। সামনে একটা বেশ চওড়া রাজপথ। এর উপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর সবই হাঁকান যায়। নাম তার বোধহয় ফয়জাবাদ রোড। ছোট একটা কাঠের গেট দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। যাঁদের বাড়ী, তাঁরা ঐ জায়গাটাকে বাগান ছাড়া আর কিছু বলেন না, তাই আমিও বলছি। নইলে জায়গাটার মধ্যে বাগানত্ব খুব বেশী নেই, ফুল এবং

গাছের chaos বললে বরং চলে। গেটের দুধার দিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেয়ালের পরিবর্ত্তে চ'লে গিয়েছে দুসারি ঝাঁকড়া ফুল গাছ। কি যে সেগুলোর নাম তা জানি না, রং হাল্কা বেগুনি, গাছগুলো ঝাড় করা মস্ত বড় বড়, এমনি তাদের thick growth যে দেয়ালের কাজ তারা নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করতে পারে। ফুলগুলোর চেহারা funnelএর মত। তারপর চারিদিকেই ফুলের ছড়াছড়ি। বাগানটায় এককালে হয়ত plan ব'লে কিছু ছিল। এখন প্রকৃতি রাণী অবাধ সুবিধা পেয়ে সব কিছুর উপর নিজের শ্যামল আঁচলটি এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন যে সব plan চাপা প'ড়ে গেছে, মানুষের হাতের কাজের সব চিহ্নই অবলুপ্ত। কামিনী, সন্ধ্যামালতী, রজনীগন্ধা এ ওর গায়ে পড়ছে, বিলিতী ফুল, দেশী ফুলের থোকায় থোকায় জট পাকিয়ে গিয়েছে। গোলাপ ফুলের গাছ অনেক, ফুলও ফুটেছে ঢের, তবে অযত্নে অনাদরে অনেক ফুল ঝ'রে পড়েছে, মধ্যে মধ্যে অন্য ফুলের ঝাড়ের মধ্যে থেকে নানা রংএর গোলাপ উঁকি মারছে। মস্ত মস্ত বক ফুলের গাছ এধারে ওধারে অনেকগুলো। বকের পালকের মত শাদা ফুলের স্তূপে তলাগুলো সব ছেয়ে রয়েছে। একদিকে একটা জবা ফুলের avenue. একটা রাস্তার দুধার দিয়ে জবাফুলের পুষ্পিত ডালপালা মাথার উপরে এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। লাল ফুল আর সবুজ ডালপালা জড়াজড়ি করে বেশ একটি নিভৃত নিকুঞ্জ গড়ে তুলেছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই স্বাভাবিক bowerটি চলে গিয়েছে। জায়গাটা ভারি সুন্দর।

বাংলোর সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোজা তাকালে প্রথমে চোখে পড়ে ফয়জাবাদ রোড। তারপর রাস্তা পার হয়ে মস্ত এক জুঁধরীর ক্ষেত, তার প্রান্তদেশে দু একটা খোলার ঘরের চাল। গঙ্গার একটা ধারা বর্ষাকালে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে এগিয়ে এসে তারপর গ্রীষ্মকালে আর ফিরে যাবার পথ না পেয়ে আটকে গিয়েছে। জুঁধরীর ক্ষেতের পাশে এর শুভ্র জলধারা ঝিকমিক করছে দেখা যায়। তারপর মস্ত বড় বালির চড়া, প্রচুর গাছপালা গজিয়েছে এর উপর, তবে এই জায়গাটা প্রতি বছর বর্ষার সময় ডুবে যায়। এরপর আসল গঙ্গা। গঙ্গার ওপারে এলাহাবাদ শহরের দু একটা বড় বড় tower, মন্দির এবং গম্বুজ নীল আকাশের গায়ে ছায়ার আলপনার মত আঁকা দেখা যায়।

বারান্দার ডাইনে সেই জবাফুলের কুঞ্জে চোখ আটকে যায়, তারপরে আছে ক্ষেত খামার অনেক কিছু। এক পাশে প্রাচীন নীলকর সাহেবদের দুচারটে স্মরণচিহ্ন এবং গোটা কয়েক কুঁয়ো আর খোলার ঘর। এদের অধিবাসীদের থেকেই এখানকার চাকর বাকর সব আসে। এই ছোট গ্রামের পর শুনলাম মস্ত পেয়ারা বাগান আছে, চোখে দেখিনি।

বাঁদিকে ঝরা এবং তাজা ফুলের মেলা, তারপর বস্তুতান্ত্রিকদের নয়নরঞ্জন তরকারি এবং শাকের ক্ষেত। এরপর ধূ ধূ করা মাঠ, তাতে খাপছাড়াভাবে এখানে ওখানে গোটাকয়েক গাছ ছড়ানো।

বাড়ীখানা ভাঙাচোরা হলেও বাসের অযোগ্য নয়। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু কার legacy স্বরূপ জানি না সামনের হল-ঘরটায় একটা লেসের পরদা ঝুলছে। চেয়ার টেবিল দু চারটে আছে।

বামনদাস বাবু চলে যাবার পর বাকি রইল শুধু খাওয়া আর ঘুমনো। অগত্যা তাতেই মনোনিবেশ করা গেল।

গদ্দপুরে প্রথম দিন যখন রাত ভোর হ'ল, তখন চারদিকে চেয়ে বুকের ভিতরটা একেবারে যেন দমে গেল। কেমন যেন একটা desolationএর ভাব পেয়ে বসল। আমরা ইট কাঠের কোটরে বাস ক'রে মনটাকে এমনই আড়ষ্ট করে ফেলেছি যে বন্ধন-মুক্তিতে আরামের চেয়ে অস্বস্তিই ঘটে বেশী। যাক, খানিক পরে চা টা পান করে সে ভাবটা খানিকটা কেটে গেল।

তারপর কয়েকটা দিন কাটল মন্দ নয়। কাজকর্ম্ম ছিল না, recreation এর ব্যবস্থাও যে অনেক ছিল তা মোটেই নয়। অথচ এমনি স্থানমাহাত্ম্য যে dull লাগবার অবকাশ হয়নি। সকাল বেলাটা বাগানে ঘুর ঘুর করেই কাটাতাম, যতক্ষণ না রোদের তেজে পালাতে হ'ত। তারপর কয়েকটা ঘণ্টা নাওয়া খাওয়া ও সেগুলির আয়োজন করতেই কেটে যেত। দুপুরবেলা রোদ এমন প্রখর যে বাইরে বেরনোর উপায় ছিল না। তাই সেই সময়টা ঘরে বন্ধ হয়েই কাটাতে হত। কলকাতা এবং এলাহাবাদ থেকে যে কয়েকখানা বই সংগ্রহ ক'রে এনেছিলাম, তারই শরণ নিয়ে সময়টা কাটাবার চেষ্টা করতাম। মনুষ্য

সঙ্গী একটিও ছিল না, দিদি ছাড়া। অর্থাৎ গল্প-গাছা করা যায় এমন মানুষ। থাকবার মধ্যে ছিল বামনদাসবাবুর steward and bailiff ভরত এবং গুটিকতক কাহার জাতীয় ভৃত্য এবং তাদের কাহারীন্‌রা। দু'একজন চাষীও ছিল, মালীর কাজ খানিকটা করত। ভরত জাতে ছত্রী (ক্ষত্রিয়)। সে মধ্যে মধ্যে মায়ের রন্ধনশালার সীমান্তে ব'সে নিজের বাড়ীর অধুনালুপ্ত ক্ষাত্রমহিমার গল্প করত এবং কাহারীন দুটো alternately মায়ের কাছে গাল খেত এবং মাকে compliment দিত তাঁর সুদীর্ঘ চুল এবং সুকণ্ঠের জন্য। আমাদের দুই বোনের সঙ্গে কারুরই বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

বিকেলবেলা একটু বেড়াতে যাওয়া যেত। এমনই বনবাসে এসেছিলাম যে বেড়ানোর সময়ও একটু প্রসাধনের দরকার হত না। লোকে বাইরে যাবার সময় ভাল কাপড়-চোপড় খানিক খানিক নিয়ে যায়, দরকার হবে ব'লে। আমরাও এনেছিলাম কিন্তু সে আর বাক্স থেকে বার করার প্রয়োজন হ'ল না। এমন অদ্ভুত বেশে এক-একদিন বেরোতাম যে এখন মনে করলেই হাসি পায়। বেড়াবার জায়গা ঐ একটিই, ফয়জাবাদ রোড ধরে এগিয়ে যাওয়া। রাস্তাটির সব ভাল শুধু তিনি ধূলিসম্পদে বড়ই ঐশ্বর্য্যশালী। দুধার দিয়ে গাছের সার আর তার পরেই ক্ষেত হয় জুঁধরীর নয় বাজরার। খোলার ঘরের আধিক্য নেই, মাঝে মাঝে দুচারখানা দেখা যায়। চোখকে বাধা দিতে কোন দিকে বিশেষ কিছু নেই। এখানকার গাছগুলো দেখলে চোখ জুড়োয়। ঠেলাঠেলি মারামারি নেই, যে যতখানি জায়গা, আলো, বাতাস চায়, তা পেয়েছে তাই কোনদিকে তাদের বাড় আটকা পড়ে নি। গাছগুলির মাথা এমন সুগোল আর সুডৌল, যেন কেউ যত্ন করে মাপ নিয়ে গড়েছে, পাতার ভারে একটিও ডাল দেখা যায় না। রাস্তা দিয়ে অনবরত একা আর গরুর গাড়ী চলেছে, তাদের আরোহীরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পদাচারীগুলির দিকে চেয়ে আছে। রামলীলা ফেরত গোটাকয়েক হাতীও একদিন এই পথে দেখা গেল। মধ্যে মধ্যে ধূলিধ্বজার প্রচণ্ড আস্ফালন সহকারে মোটরকারের দর্শনও মিলত। তার তিরোধানের পর প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত রাস্তার দিকে আর চাইবার জো থাকত না। মাইলষ্টোনের হিসাব নিয়ে নিয়ে প্রায়ই দেখতাম বেড়ানটা মাইল দেড় দুই হয়। তারপর ফিরে এসে জাল ঘেরা বারান্দায় মা রান্না চড়াতেন। সেই-খানে বসে আমরা গল্প করতাম। কাঠের আগুনের ছায়াপাতে মাটির দেওয়ালগুলো বেশ আলোছায়ার ছবিতে ভরে উঠত। তখন শুক্লপক্ষ ছিল, চাঁদের আলোয় বাগানটা ফুটফুট করত।

এখানে এসে সকলেরই দৈহিক এবং মানসিক উন্নতি খুব বেশীই হয়েছিল। বিশেষ ক'রে মায়ের। এখানে তিনি ভালই ছিলেন। গ্রামের লোকগুলিকে পছন্দই করতেন, নিজের শৈশব আর বাল্যকাল গ্রামেই কেটেছে।

একদিন মা আর দিদি গেলেন সেই গঙ্গার শাখায় স্নান করতে, আমিও গেলাম স্নান করতে নয়, বেড়াতে। স্রোতটা গভীর নয়, ব'সে না পড়লে মাথা ডোবান যায় না। চারদিক খোলা ত বটেই, তার উপর কয়েকজন কৌতূহলী রাখাল শিশুর আবির্ভাবে স্নান করা ব্যাপারটা খুব যে সুবিধাজনক হ'ল তা নয়। মা এবং তাঁর কাহারীন্ পরিচারিকা ছেলেগুলোকে বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য না ক'রে ইচ্ছামত স্নান ক'রে নিলেন। দিদিরই হল মুশকিল। আমি ব'সে ব'সে শুধু মজাই দেখলাম। এখানে আসবার পথটি দেখতে বেশ তবে চলবার পক্ষে তত সুগম নয়। দুধারে বাবলা গাছের সোনালী ফুল দেখে মনে বেশ কবিত্বের উদয় হ'ল বটে, কিন্তু পায়ে বাবলা কাঁটার কঠিন পরিচয় তখনই মনে পড়িয়ে দিল, "সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে।" জায়গাটা সমতল নয়, মাঝে মাঝে মস্ত বড় বড় ঢিপি, আবার তার পাশেই গভীর গর্ত্ত। একটা ঢিপির পাশে খানকয়েক খোলার ঘর, গুটি দুই-তিন নিম গাছ, তার ছায়ায় গরু বাছুর বাঁধা, বেশ একটি rural ছবির মত। দু একটি মেয়ে মানুষ ছেলেপিলে এদিক্ ওদিক্ ঘুরছে। তবে গোটাকয়েক হাড্ডিসার সিঁটকে কুকুরের সরব উৎপাতে ছবিখানার মহিমা অনেকটাই কমে গেল।

দিন দুই-চার এ ভাবে থাকার পর একদিন দুপুরবেলা বামনদাসবাবু এসে উপস্থিত হলেন। প্রতিদিনই একজন না একজন কেউ চিঠিপত্র নিয়ে এলাহাবাদ থেকে আসত,

কারণ জায়গাটি এমন অজ পাড়াগাঁ যে ডাকঘরের উৎপাতও নেই। অথচ বাবার ত সব কারবারই ডাকঘর মারফৎ। বামনদাসবাবু সেদিন রাত অবধি থাকলেন, ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ বাবার সঙ্গে গল্প করলেন, আমাকেও গল্পের ভাগ খানিকটা দিলেন। তাঁদের নব প্রতিষ্ঠিত জগৎতারণ স্কুল দেখবার জন্য তারপরদিন আমাদের এলাহাবাদে নিমন্ত্রণ হল।

বিকেলে তিনি আর বাবা তিনমাইল দূরের কোন এক ভাঙ্গা বাড়ী দেখতে গেলেন, আমরা বেড়ানটা সেদিনকার মত বাগানেই সম্পন্ন করলাম।

পরদিন সকালে উঠেই হুড়োহুড়ি করে নাওয়া খাওয়া সারলাম। ঐ বনবাসে কবিত্ব করার খোরাক প্রচুর জুটত, কিন্তু প্রতিদিনের অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র জোটাতে অনেক সময়ই খুব কোলাহল করতে হত। জল তোলাতে হলে কত জায়গায় যে তার জন্যে আবেদন নিবেদন করতে হ'ত তার ঠিক নেই, কারণ কেউই নিজেকে ও কাজের ভারপ্রাপ্ত ব'লে স্বীকার করত না।

যাক, সেদিন ত কাজকর্ম সেরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হওয়া গেল। প্রথমে ঠিক ছিল যে ষ্টেশন অবধি এক্কা করে গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে এলাহাবাদ পৌছান যাবে, কিন্তু পরে শোনা গেল যে সকাল বেলার ট্রেনটা বাতিল হয়ে গেছে। অতএব plan বদলে ঠিক করা হল যে সারা পথটাই এক্কা করে যাওয়া হবে। সারাদিনই এক পোশাকে টো টো করতে হবে ভেবে তদুপযোগী বেশভূষাই করা হ'ল। আমি আর দিদি ঠিক করেছিলাম, শুধু জগৎতারণ স্কুলই নয়, আরো অনেক জায়গা বেড়িয়ে আসতে হবে। দুটো এক্কা অতঃপর এসে হাজির হল, একটি অবগুণ্ঠিত আর একটি খোলা। কিন্তু ভরা রোদে আট দশ মাইল পথ খালি মাথায় যাওয়া শক্ত ভেবে র‍্যাপার ও বিছানার চাদর দিয়ে একটা ঘেরাটোপ improvise করা গেল। দুচারটে ছোটখাট ফল-ফুলের পুঁটলি নিয়ে সলক্ষে ত এক্কায় চড়া গেল। ভেবেছিলাম, কলকাতায় থেকে থেকে বুঝি এ বিদ্যা ভুলে গেছি, কিন্তু কার্যতঃ দেখলাম যে বিশেষ ভুলিনি।

এক্কা ত চলল। রজনী সেন গান লিখে যে এক্কাকে অমর করেছেন, এগুলো ঠিক তার জাতীয় নয়। বসতে বিশেষ অসুবিধা হয় না, spring থাকাতে "ধুপধাপ বিষম ধাক্কা"ও লাগে না। ঘেরাটোপের তলায় প্রবেশ করলাম বটে, কিন্তু সমস্ত শরীরটা মোটেই যবনিকার অন্তরালে আড়াল করতে পারলাম না। অন্ততঃ আমার মোজা জুতো শোভিত শ্রীচরণকমল দুটি বেশ খানিকটা বেরিয়ে রইল। আঙুল দিয়ে ঘেরাটোপের ঘুলঘুলিটাকে ফাঁক করে চারিদিক দেখতে দেখতে চললাম।

কাকামউ ষ্টেশনটা মাইল দেড়েক দূরে। গদ্দপুর গ্রামখানা বিশেষ বড় নয়, যেখানেই গোটাকয়েক গাছ গজিয়েছে, তারই তলায় খোলার ঘর বেঁধে এবং ইন্দারা খুঁড়ে এরা কয়েক ঘর লোক বসে গিয়েছে, এই হল পশ্চিমের গ্রাম। বাদ বাকি সব ধু ধু করছে মাঠ না হয় শস্যক্ষেত। দোকান পাটের ঘটা কমই। হাট যদিও হয় তা হলেও তাতে লঙ্কা আর শাক ছাড়া আর বড় বেশী কিছু আসে বলে মনে হয় না। হাটের দিন বড় রাস্তাটা দিয়ে অনেক গরুর গাড়ী চলত বটে। কিন্তু সেগুলোর বোঝা ত দেখতাম প্রায়ই হয় চেলাকাঠ নয় হাঁড়ি। হাঁড়ির ভিতর রাখবার জিনিষ যে বিশেষ কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। মোট কথা পশ্চিমের গ্রাম বলতেই মনে যে চিত্রটা ভেসে ওঠে তাতে দেখি, সার দিয়ে অনেকগুলি নিম গাছ, তার তলায় নীচু নীচু ঘর, মাটির দেওয়াল, খোলার চাল। নিম গাছের ফুল ফল পাতা ঝরে ঝরে দরজার গোড়ায় একটি প্রাকৃতিক গালিচা পেতে রাখা হয়েছে প্রতি গৃহস্থের ঘরেই। আর তার উপর উবু হয়ে বা পা মেলে ব'সে, ময়লা রঙীন শাড়ী আর হাতকাটা ছিটের কুর্ত্তা প'রে পল্লীবালারা গল্প করছেন, উকুন বাছছেন বা ঝগড়া করছেন। দুই-একটি গরু ছাগল এদিক্ ওদিক্ বাঁধা আছে, এবং মেটে রংএর দেশী কুকুর এক-একটা জায়গায় প'ড়ে ঘুম লাগাচ্ছে। তবে গদ্দপুর গ্রামের আর একটা সম্পত্তি ছিল, সেটা হচ্ছে একটা পাথরের শিবমন্দির। বাংলাদেশের শিব মন্দিরের মত লেপাপোছা চেহারা নয়, দিব্য কারুকার্য্যশোভিত। চূড়ার কাছে পাথর ফুঁড়ে আবার একটি শিশু অশ্বত্থ গাছ এক গোছা সবুজ পাতার জয়ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দুধারে ক্ষেত, বন, ঝোপ, পগার প্রভৃতি পার হতে হতে

ষ্টেশনে পৌছান গেল। সেখানে গুটিকয়েক খাবারের দোকান আছে এবং একটি একার আড্ডা। এখান থেকে share-এ একা নিয়ে অনেকযাত্রী নদীর এপার ওপার করে। যতবার গদ্দপুর থেকে একা চড়ে এলাহাবাদ গিয়েছি, ততবারই একাওয়ালারা এই ষ্টেশনে এসে একা থামিয়ে রান্না করেছে ও জল খেয়েছে এবং নিজেদের ভাষায় অনর্গল বকবক করেছে। ষ্টেশনের পরে মস্তবড় সেতু গঙ্গার উপর দিয়ে। নদী এখানে খুব শীর্ণা হয়ে পড়েছেন, মস্ত মস্ত চড়া তাঁর বক্ষ ভেদ করে মাথা উঁচিয়ে উঠেছে, তাদের গাছপালার সম্পদ্ দেখে মনে হয় যে আর কিছুকালের মধ্যেই এরা চড়ার উপর কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে, বর্ষাকালেও নিজেদের অবলুপ্ত করতে চাইবে না। গঙ্গার স্রোত চড়ার এধার ওধার দিয়ে কোনমতে বয়ে চলেছে। গঙ্গার তীরের উপর লালা রামচরণ দাসের উদ্যানবাটিকা "রামবাগ"। দূর থেকেই তার শুভ্র সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে। সেতু শেষ হবার মুখে রাস্তা এমন গড়ানে যে ভয় হয় এইবার গাড়ীঘোড়া সুদ্ধ ঘাড়মুড় ভেঙে পড়ে মরতে হয় বুঝি বা। কিন্তু একার ঘোড়ারা এপথে অভ্যস্ত, শেষ অবধি সামলে নেয়। তারপর আবার চল মাঠের পাশ দিয়ে আর গ্রামের ধার দিয়ে। গাঁয়ের থেকে কতগুলো ছোট ছেলে বেরিয়ে এসে পয়সার জন্য প্রায়ই চেঁচাতে থাকে, অথচ professional ভিক্ষুক তারা একেবারেই নয়। ভিক্ষে করাটা যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয়, এ জ্ঞানই তাদের নেই। এমন mentality তাদের কোথা থেকে হ'ল ?

শহরের দিকে যত এগোন যায়, রাস্তাটা তত সুন্দর হতে থাকে। এলাহাবাদের মত সুন্দর রাস্তা আমি আর কোথাও দেখিনি। গাছের সার রাস্তার দুধারে, এতে পথের সৌন্দর্য্যও বাড়ে এবং পশ্চিমের রোদের খরদীপ্তির থেকে খানিকটা আশ্রয়ও মেলে। গাড়ী ঘোড়ার সংখ্যা কম, এবং ট্রাম বাসের চিহ্নমাত্রও নেই। এখানে "যাত্রাপথের আনন্দগান" স্বচ্ছন্দে গাওয়া যায়, কারণ প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে গাড়ী চাপা পড়ার থেকে বাঁচাতে হয় না।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শাপমোচন

দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে দেশের বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের শাপমোচন হইল—বর্ত্তমান কদাচারী কংগ্রেসের দুঃশাসন মুক্ত হইয়া। ৪র্থ নির্ব্বাচনের বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশের মানুষ এই আশাই করিতেছিল এবং আশা যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহার জন্য দেশ-ভাগ্য-বিধাতার শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনাও—প্রতি দিন জানাইতেছিল। প্রাতে এবং সন্ধ্যায়, নিয়মিত ভাবে জানাইতেছিল। বিধাতার প্রাণ আছে এবং সেই প্রাণে যে দয়া মায়া আছে, তাহাও আজ প্রমাণিত হইল।

কংগ্রেসী শাসনের অবসানের পূর্ব্বে এক একজন মহা মন্ত্রীর নির্ব্বাচনে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙ্গলায় যে উল্লাস এবং আনন্দ-নৃত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা সত্য সত্যই অকল্পনীয়—অভাবনীয়! কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কুশাসনের ফলে দেশের সাধারণ লোকের জীবন প্রায় অসহনীয়ও হইয়াছিল! কংগ্রেসী রাজা-মহারাজারা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেশের ভাগ্যবিধাতা এবং তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অনিয়ম-অনাচার-প্রশাসনিক-ব্যভিচার—দেশের লোক—(ভাল না লাগিলেও) কখনও অস্বীকার করিবে না, অমান্য করিবার ক্ষমতা কিংবা শক্তিলাভও তাহারা কখন করিবে না।

কবি বলিয়া গিয়াছেন বহুকাল পূর্ব্বে—

"আমাদের শক্তি মেরে,
তোরাও বাঁচবি নেরে
মাথার উপর আছেন ভগবান।"

সমবেত জনগণের মধ্য দিয়া, নির্ব্বাচনী অস্ত্রের দ্বারা সেই ভগবানই আজ অনাচারী 'পচাই' শক্তিমদ-মত্তদের পথের ধূলাতে নিক্ষেপ করিলেন—কঠোর নির্ম্মম হস্তে! কংগ্রেসকে যাঁহারা একদা ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন, কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়া বহুপ্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য এবং পার্থিব নানা সুখসুবিধা ত্যাগ করিতেও যাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই, সেই তাঁহাদেরই এক অতি বৃহৎ অংশ আজ কংগ্রেস-বিরোধী হইতে বাধ্য হইয়াছেন কেন,—আদ্যকার ডি-ভ্যালুড কংগ্রেসী নেতারা আজ তাহা একবার চিন্তা করিতে চেষ্টা করিবেন—যদি পারেন, এবং আত্ম-ও-আত্মার স্বার্থ-চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করিবার শক্তি যদি আজ সামান্য মাত্রও তাঁহাদের বিকৃত-বিকল মনে অবশিষ্ট থাকে!

বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী উপ-নেতারা দেশবাসীকে বহু গভীর তত্ত্বকথা এবং নীতি শিক্ষা দিবার প্রবল প্রয়াস করিয়াছেন—এবং, হইতে পারে, সেই পরম শিক্ষা লাভের কারণেই দেশবাসী কংগ্রেসকে আজ যে মোক্ষম শিক্ষা দান করিল—তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং অর্থ কংগ্রেসী নেতাদের চিত্তপটে আগামী বহুকাল স্পষ্ট থাকিবে।

মাত্র বিশ বৎসরেই এত মহান এবং এত অসীম ক্ষমতাধর কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরিণাম সত্যই বর্ত্তমান শতকের বিরাটতম ঐতিহাসিক ঘটনা এবং যে ঘটনার সকল কৃতিত্ব—দেশের সাধারণ লোক দাবী করিতে পারে। কিন্তু দেখিয়া অবাক হইতে হয়, পশ্চিম-

বঙ্গ কংগ্রেসের ডিক্‌টেটার (যাঁহার অপর নাম বঙ্গেশ্বর) সেই ব্যক্তিটির, যখন তাঁহার বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে নব-নির্ম্মিত বিশাল বিলাসপুরীতে গিয়া আত্মগোপন করাই হইত কেবল শোভন সুন্দর নহে. বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য, তাহা করিয়া তিনি তাঁহার বর্ত্তমান-মুকুটহীন-অবস্থায় হস্তিনাপুরে, ভারতের ভবিষ্যত প্রধান মন্ত্রিত্ব লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, দোসর সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতা পরাজিত কামরাজের সঙ্গে। এই দুই জনের নির্ব্বাচনী-হাড়ভাঙ্গা প্রহার সেবন করিয়াও চেতনলাভ হয় নাই! দেশের লোক যাহাদের করিল বাতিল, নাকচ, সেই তাহারাই যদি নিজেদের অমূল্য এবং অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিতে লজ্জাবোধ না করে, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন আর কিছু অপমানকর থাকিতে পারে না। যাহা লাভ করিয়া এই শ্রেণীর মানুষ অপমানিত বোধ কিংবা লজ্জিত হইবে! ইহাদের হাবভাব এবং ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় ইঁহারা ভাবিতেছেন "আমরা যদি অপমানিত বোধ না করি, তোমাদের পিতা পিতামহদের এমন সাধ্য নাই যে আমাদের অপমানিত করিতে পারে!" আর লজ্জা? স্বয়ং লজ্জা-ঠাকুরানী যাঁহাদের দেখিয়া লজ্জা পান, তাঁহাদের লজ্জা দিবে কিসে, কাহারা?

নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশ হইবার পর এরাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের প্রশংসা করিতে হয়। তিনি পরাজিত হইয়া মুখ বন্ধ রাখিয়াছেন, ভোটারদের রায় নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া নিজেকে প্রায় 'অন্তরীণ' করিয়াছেন। কাহারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-অনুযোগ তিনি এখন পর্য্যন্ত করেন নাই। এই ভদ্রলোকের জন্য সত্যই দুঃখ হয়, অনুজ-অতুল্যর প্রতি অতি স্নেহ এবং অতি বিশ্বাসই তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বনার প্রধানতম কারণ—দুষ্টলোকে এই কথাই প্রচার করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন অ-কংগ্রেসী সরকার

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট কলিকাতার পথে ঘাটে আমাদের নূতন স্বাধীনতা উপহার পাইবার দিন যে-দৃশ্য দেখি, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কংগ্রেসী শাসনকে যে অসীম শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং সেই অফুরন্ত গুড-উইলের 'কাণ্ড'—দিয়া স্বাগত জানায় তাহার তুলনা নাই। দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে আবার দেখিলাম, কংগ্রেসী শাসনের পতনের পর—শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়-এর মুখ্য-মন্ত্রিত্বে গঠিত এ-রাজ্যের প্রথম অ-কংগ্রেসী সংযুক্ত-দলের নূতন সরকারকে জনগণের, হর্ষোন্মাদ সুবিপুল আনন্দ-অভিনন্দন! এ-দৃশ্যও অপূর্ব্ব এবং যাঁহারা দেখিয়াছেন—তাঁহারা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। নূতন সরকারের প্রকাশ—ঠিক যেন গভীর নিরাশাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির পর প্রভাতে নূতন সূর্য্যোদয়!

প্রসঙ্গক্রমে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের কথা মনে পড়িতেছে, ঐ ঐতিহাসিক দিবসে রাজভবনের (কলিকাতার) দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। প্রবল বন্যা-স্রোতের মত জনস্রোত রাজভবনের প্রাঙ্গন ছাড়াইয়া প্রবেশ করে রাজভবনের অভ্যন্তরে মার্ব্বেল হলে, দরবার হলে, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে। সেই দিন জনগণের মধ্যে দেখা দিয়াছিল অদম্য একপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছাস, দুইশত বৎসর পরে হারানোস্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তিতে মানুষের মন আনন্দে উন্মাদ-প্রায় হইয়াছিল। সেইদিন বহুযুগ পরে আবার নূতন স্বাধীনতার অমৃত-আস্বাদলাভ করিয়া—কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে অবশ্য কিছু পরিমাণ কাঁচ-চিনামাটির বাসনপত্র নষ্ট হয়, ফল ফুলের গাছ, গাছের টবও কিছু কিছু নষ্ট হয়—কিন্তু তাহা এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নহে, অন্য দেশ হইলে এমন অবস্থায় মানুষ যাহা করে এবং করিতে পারিত, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারিব না। পুরাণ কথা বেশী বলিবার প্রয়োজন এইবার ১৯৬৭ সালে, ৮ই মার্চ্চের কথা এই দিন রাজ্য বিধান সভায় সর্ব্ব-মানুষের জন্য অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল, এই দিনটিতেও দেখা যায় জনস্রোতের প্রবল বন্যা, কিন্তু এই বন্যাস্রোতে রাজ্যবিধান সভার মনোহর উদ্যানে একটি গাছ, একটি ছোট ফুলের ক্ষুদ্রতম পাপড়িও নষ্ট হয় নাই! এই পবিত্র দিনে, কংগ্রেসী

পাপশাসনের মুক্তি দিবসে আনন্দ-উচ্ছল জনস্রোত অতি-সংযত ভাবে রাজ্যবিধান সভা ভবনের লনে বিচরণ করিয়াছে, সভা-ভবনের অভ্যন্তরেও, লবিতে, মন্ত্রিদের কক্ষে, করিডরে, সর্ব্বত্র। সভাগৃহের কোন কিছু কেহ স্পর্শ করে নাই, নষ্ট করা ত দূরের কথা।

বাঙ্গলার ছোটলাট স্যর ষ্ট্যান্লি জ্যাকসন এই বিধান সভাগৃহ উদ্বোধন করেন—বহু যুগ পূর্ব্বে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত—এই অ্যাসেম্ব্লী ভবনের ভিতরে এবং বাহিরে ১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ্চের দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। এই অঞ্চলের সর্ব্বজন-পরিচিত এবং আনিত দৃশ্য ছিল জনতাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য পুলিশ-বেষ্টনী, কংগ্রেসী আমলে ইহার সহিত যুক্ত হইল ১৪৪ ধারার অবিরাম প্রয়োগ! স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও কংগ্রেসী আমলে তথাকথিত 'জনগণের প্রতিনিধি' হিসাবে জনভোটে নির্ব্বাচিত বিধান সভার কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং সাধারণ সদস্যবৃন্দ জনগণকে ক্রমশ দূরে সরাইয়া, এখানে 'জনপ্রতিনিধিত্ব' কায়েম করিতে লাগিলেন! এই ভাবে কংগ্রেসী 'পপুলার' সরকার জনচিত্ত হইতে নিজেদেরকে ক্রমশ এবং শেষ পর্য্যন্ত একেবারেই নির্ব্বাসিত করিল, 'সরকারী' চালে-চলনে এই 'পপুলার' সরকার ব্রিটিশ বুরোক্র্যাসীকেও বহুগুণে ছাড়াইয়া গেল! দেশবাসীর খাঁটি সোনার মত যে শুভ-ইচ্ছা এবং সহযোগিতার সীমাহীন ভাণ্ডার কংগ্রেস ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট লাভ করিল মাত্র বিশ বৎসরে সেই স্বর্ণ মাটির ঢেলায় পরিণত করিল এই কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী সরকারই!

চতুর্থ নির্ব্বাচনে দেশের নির্ব্বোধ জনগণ হঠাৎ যেন এক দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়া কংগ্রেসী প্রতারণা, অনাচার, অবিচার, প্রশাসনিক ব্যভিচারের চরম বিচার ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসকে ভোটরূপ পদাঘাতে একেবারে ধাপার আবর্জ্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করিল! যে-কংগ্রেসের জন্য জনগণ সকল-কষ্ট, পুলিশ মিলিটারী অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করে এই বাঙ্গলার হাজার হাজার মানুষ হাসিমুখে ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করে, আজ সেই-কংগ্রেস এবং কংগ্রেসীদের প্রতি দেশের শতকরা অন্তত ৯৫ জন মানুষের মনে জাগিয়াছে অসীম ঘৃণা এবং ক্রোধের জ্বালা—যাহা আর কোন দিন প্রশমিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অদৃষ্টের কী বিষম বিচিত্র পরিহাস! যে সকল অকংগ্রেসী নেতা মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই, বিধান সভায় জনবিক্ষোভ জানাইতে আসিয়া ১৪৪ ধারার বেষ্টনী-এলাকার বাহিরে গতিরুদ্ধ হইতেন সেই সব নেতাদেরই অনেকে আজ পশ্চিম বঙ্গের নূতন সরকারের মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। তফাৎ আরো আছে, কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী দেশের মানুষের যে-শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সামান্যতম বিশ্বাসও কোন দিন লাভ করিতে পারেন নাই, এই নূতন সরকারের নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা লাভ করিতেছেন অপরিমিত ভাবে অজস্র ধারায়।

একান্ত ভাবে আশা করি এই নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী জনগণের অগাধ বিশ্বাস এবং সহযোগিতার পূর্ণ-বিশ্বাস রক্ষা করিবেন। এ রাজ্যে সমস্যা বহুতর রহিয়াছে এবং সকল সমস্যা অল্পদিনে দূর করা অসম্ভব, কিন্তু জনগণ যদি দেখে দেশের সকল দুঃখকষ্ট, অভাব অসুবিধা সকলেই সমানে ভোগ করিতেছে—সকলেই সকল দুঃখ কষ্টের সমভোগী এবং ভাগী, তাহা হইলে দেশের বহু অবাঞ্ছিত হৈ হল্লা এবং হাঙ্গামা বন্ধ হইতে বাধ্য। জনগণকে বঞ্চিত করিয়া অনাহারের মুখে ঠেলিয়া দিয়া আর এক শ্রেণীর লোকই দেশের সকল সম্পদ দখল করিয়া, আরাম আহার করিয়া অনাহারী-মানুষকে, বঞ্চিত-মানুষকে কেবল নীতি কথার দ্বারা, দেশের কারণে কেবল কষ্ট ছাড়া আর কিছুরই ভাগীদার করিতেন না—এ ব্যবস্থা, অনাচার অত্যাচার আর যেন কখনও না ঘটে। সম্পদ দুঃখ কষ্ট সকলকেই আজ সমানে ভোগ করিতে হইবে!

রাজ্য-বিধান সভায় 'নব'-বিরোধী দল

বিধি হইলেন বাম—কপাল পুড়িল কংগ্রেসীদের। এবারের নূতন বিধান সভায় আজ বামপন্থীদের ভূমিকায় দেখা যাইতেছে কংগ্রেসীদের। বিধান সভায় যে কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতেই বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কংগ্রেসী এম-এল-এর দল, সংযুক্ত দলীয়

সরকারকে সকল বিষয়েই বাধা দিবেন, ভালমন্দ বিচার না করিয়া। অথচ মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই বর্ত্তমানে হতমান হৃতমুকুট হতমান বঙ্গেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় শ্রী অতুল্য ঘোষ ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস-বিরোধী সকল দলগুলি এক হইয়া এবং এক হইয়া সরকার গঠন যদি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার বিরাট দেহস্থিত বিরাটতর মন এক অতি ভীষণ আনন্দে অবশ্যই নৃত্য করিবে! কথাটা বোধ হয় এই মনে করিয়াই ঘোষ মহাশয় বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শাসন-ক্ষমতা চিরকাল থাকিবে কংগ্রেসের এবং সেই কংগ্রেসকে শাসন করিবার অধিকার থাকিবে তাঁহার হাতেই! কিন্তু কার্য্যকালে, অর্থাৎ নির্ব্বাচন পর্ব্ব পুরাপুরি শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীঘোষ-সূর্য্য হইল অস্তমিত, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাতানো দাদারও গদি গেল! এমন যে হইবে এই দুইজনের একজনও ভাবিতে পারেন নাই! ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়া অতিবড় পাষণ্ডের হৃদয়ও গলিয়া যাইতেছে। যাক—

কিন্তু এখন এ রাজ্যের কংগ্রেসী-বিরোধী দলের কর্ত্তব্য কি? পূর্ব্বে, বিধান সভায় কি ভাবে চলা-বলা উচিত, জনকল্যাণমূলক কার্য্যে বিরোধী দলের অতি অবশ্য পবিত্র কর্ত্তব্য কংগ্রেসী সরকারকে সমর্থন করা, কথায় এবং কাজে। কিন্তু কংগ্রেসী-দল বিধান সভায় যে ভাবে অধিবেশনের প্রথম দিন হইতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনের নমুনা দিতেছেন, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তির এই ধারণাটাই হইতে বাধ্য যে, কংগ্রেস যে-কোন প্রকারেই হউক, সংযুক্ত দলীয় সরকারকে শাসন ক্ষমতা হইতে হটাইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসের কোন কিছুতেই আটকাইবে না। প্রসঙ্গক্রমে বহুবৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ সরকারকে দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য দেশবন্ধু যে কথা বলেন, তাহার উল্লেখ করা দোষণীয় হইবে না। দেশবন্ধু প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন—'no means is too mean to achieve our ends' অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য আমরা কোন উপায় বা পন্থাকেই হীন মনে করিব না। বিদেশী সরকারকে দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য হয়ত এমন কথা ততটা দোষের নহে, কিন্তু কথায় কথায় নীতি প্রচারকারী এই-দুর্নীতি-গ্রস্ত অনাচারী অদ্যকার কংগ্রেস দেশেরই আর একটি দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য দেশবন্ধুর সেইকালে বলা বাক্যের অপপ্রয়োগ করিতেও কোন দ্বিধাই করিবে না। ক্ষমতা এবং তাহার সঙ্গে বিবিধ প্রকার সুখ সুবিধা প্রশাসনিক প্রসাদ বঞ্চিত হইয়া এই কংগ্রেসী দল একেবারে (যাহাকে বলে) হন্যে হইয়া উঠিয়াছে। হিংসা এবং দ্বেষের বিষে কংগ্রেস-দেহ জর্জ্জরিত—একমাত্র হয়ত অটো-ভ্যাকসিনে এই বিষের সামান্য প্রশমন হইতে পারে। কিন্তু অটো-ভ্যাকসিন প্রস্তুত করিতে হইলে যে মূল বস্তুর একান্ত প্রয়োজন, সেই বস্তু সংগ্রহ করিবে কে? করিতে বিপদও আছে।

বিবিধ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে ইহা জানা যাইতেছে যে সংযুক্ত দলে ভাঙ্গন ধরাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে পূর্ণ উদ্যমে এক দিকে আর অন্য দিকে বাঙ্গলা কংগ্রেসে প্রবেশ করিবার কাতর আবেদনও বিশেষ কয়েকজন কংগ্রেসী সঙ্গোপনে করিতেছেন! আবার কয়েকজন নামকরা কংগ্রেসী চেষ্টা করিতেছেন শ্রীঅজয় মুখার্জ্জিকে কোন প্রকারে কংগ্রেসে ফিরাইয়া আনিয়া শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং তাঁহার একান্ত বশম্বদদের কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করা।

ফাটল ধরাইবার অপচেষ্টা?

সংযুক্ত দলের মধ্যে কিসে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়—সে চেষ্টার কমতি নাই কংগ্রেসী ক্যাম্পে। ভবিষ্যৎ পুরস্কারের টোপ বিফল! এই মহৎ কর্ম্মে কংগ্রেসীদের মুস্কিল হইয়াছে এই দেখিয়া যে সংযুক্ত দলের মন্ত্রী-মণ্ডলীতে "লোভী-চোর-পকেটমার আত্মীয়-বন্ধু-পোষক" বোধ হয় একটিও নাই। আমাদের ধারণা ইহাই। ইহাদের সকলের রাজনৈতিক মতবাদের সহিত হয়ত অনেকের মিল হইবে না, কিন্তু এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না যে বর্ত্তমান সংযুক্ত দলীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে একজনও অসৎ ব্যক্তি আছেন। প্রশাসনের কাজে ইঁহারা নূতন, কাজেই ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক,—কিন্তু ঐ সব ভুলচুক—স্বাভাবিক, সহজ-ভুলচুক, মতলবী নহে।

দেশের এবং দেশবাসীর মঙ্গল ইচ্ছা লইয়া আজ ইহারা গুরু কর্তব্য ভার লইয়াছেন, এবং দেশের সাধারণ মানুষদের আজ প্রধানতম কাজ হওয়া উচিত সংযুক্ত দলীয় মন্ত্রীদের কোন প্রকার অনাবশ্যক, অযথা আন্দোলন, হৈ-হল্লা এবং দাবীদাওয়া লইয়া বিব্রত না করা। অন্তত একটা বছর এই নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীকে স্থির-চিত্তে, সুস্থভাবে তাঁহাদের জন-কল্যাণ পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তব রূপ দিবার সময় অবশ্যই দিতে হইবে, দেওয়া কর্তব্য। গত বিশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী অত্যাচারে অবিচারে, অনাচারে দেশের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল—এবার পাপ এবং পাপী বিতাড়িত হইয়াছে। গত বিশ বৎসরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যতকিছু আগাছা এবং জঞ্জাল জমা হইয়াছে, কিছু করিবার আগে ঐ সব ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতে হইবে। কাজেই একদিনে ফলের আশা করা অন্যায়, ক্ষেত্র ঠিকভাবে প্রস্তুত করিবার সময় কমপক্ষে এক বৎসর অবশ্যই দিতে হইবে আমাদের এই জনগণ-অভিনন্দিত নূতন সরকারকে।

সম্পত্তি, বাড়ীঘরের এবং অন্যান্য সম্পত্তির (অর্থের) সোর্স কি ?

কংগ্রেসী রাজত্বকালে বহুবার মন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চ মার্গীয় মহাশয় ব্যক্তিদের—কাহার কি সম্পত্তি আছে এবং কি ভাবে অর্জিত অর্থে ঐ সম্পত্তির অধিকারী তাঁহারা হয়েন, ইহার পূর্ণ হিসাব এবং বৃত্তান্ত ঘোষণা করিবার নির্দেশ নীতিবান কংগ্রেসী আদর্শব্যক্তিগণ ঘোষণা করেন, কিন্তু এই নির্দেশ ঘোষণার ফল কি হইল, সাধারণ মানুষ তাহা এখনও জানিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ বিষয় যথাযথ নির্দেশ পালন করেন, এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণও প্রকাশ করেন এ কথা স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে। অন্যান্য রাজ্যেও দু-চার জন মন্ত্রীও ঘোষণা নির্দ্দেশে সাড়া দেন, কিন্তু যাঁহারা নিজ নিজ হিসাব দাখিল করেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধহয় দুই আঙ্গুলে গোণা যায়। অন্যান্য সবাই এ বিষয় একেবারে নির্বিকার—আজ পর্য্যন্ত।

অন্য রাজ্যের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের এই রাজ্যের বর্ত্তমানে তেমনি কংগ্রেসী এক মহানেতা নাকি বাঁকুড়া জেলায় এক অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁহার বিরাট বাড়ী এবং সংলগ্ন মনোহর এক উদ্যানও রচনা করিয়াছেন, যে উদ্যানে হাজারো রকমের দুষ্প্রাপ্য মনোহর ফুল ও ফলের গাছও অজস্র দেখিতে পাওয়া যাইবে—দুষ্ট লোকে এমন কথাই বলিতেছে। 'বঙ্গেশ্বর' নামে প্রখ্যাত এই মহানেতার মাসিক আয় কত এবং (সংসদ সদস্য হিসাবে মাসহারা ছাড়া)—কি ভাবে কোথায় হইতে তাহা আসে আমরা জানি না। তবে এইটুকু জানি যে তিনি পূর্ব্বে কলিকাতার কোন এক—বালাট্যাঙ্ক গলিতে ভাড়াটে বাড়ীতে বসবাস করেন—(বর্ত্তমানে হয়ত সাময়িকভাবে অন্যত্র আছেন বিশেষ কারণে)। ব্যবসা বাণিজ্য কিছু তিনি করেন বলিয়া শুনি নাই, প্রকাশ্যভাবে ইহা করিলে লোকে অবশ্যই জানিতে পারিত। বাঁকুড়ার অজ পাঁড়াগাঁয়ে যে সম্পত্তি তিনি করিয়াছেন তাহার মূল্য কম করিয়া বোধ হয় দু-চার লক্ষ হইবে। এই অর্থের সূত্র এবং সোর্স—কি, তাহা এখন নূতন রাজ্য সরকার সন্ধান লইতে পারেন। এ-বিষয় বারান্তরে আরো কিছু হয়ত বলিতে পারিব।

দুই নম্বর পশ্চিমবঙ্গ 'আপার হাউসের' চেয়ারম্যান। মাত্র কয়েক বছর পদ-গৌরবের কল্যাণে তিনি মাসিক বোধহয় হাজার দুই টাকা মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। গড়িয়া নামক স্থানে "প্রতাপ গড়ের" মালিক কে এবং কাহাদের জমি বেদখল করিয়া এই গড় কে নির্ম্মাণ করিল ? এই গড়ে বোধহয় তিন চারখানি পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে—একটিতে প্রতাপগড়ের মালিক এবং অন্য বাড়ীগুলি ভাড়া দিয়া মালিকের বেশ কিছু আয় হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। যে জমির উপর গড় নির্ম্মিত হইয়াছে, শুনিতে পাই তাহার মালিক অন্যলোক —এবং জমির দখল পাইবার জন্য মামলাও নাকি প্রায়

৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে আদালতে দায়ের করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা ঝুলিতেছে কোন্ অনিবার্য্য কারণে তাহা জানা নাই।

আমরা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অনাবশ্যক কোন কুৎসা রটনায় পক্ষপাতী নই, কিন্তু যে সকল মহান-মহাশয় ব্যক্তি—গত কয়েক বৎসর দেশবাসীকে, বিশেষ করিয়া আমাদের মত অভাজনদের অহরহ নীতি উপদেশ দান করিয়াছেন, বলিয়াছেন দেশের এবং জাতির কল্যাণে সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিতে, সেই সব মহাশয় ব্যক্তি—কি ভাবে কতখানি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, আজ বিত্ত বৈভবের অধিকারী হইলেন তাহ'র পূর্ণ প্রকাশ প্রখর দিবালোকে লোক চক্ষুর সামনে উদ্ঘাটিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চিম বঙ্গের নূতন রাজ্য সরকার এবং এই সরকারে মন্ত্রীবর্গ নিজেদের দেশ এবং জাতির কল্যাণে নিবেদিত করিয়াছেন—বলিয়াছেন দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন স্বার্থ নাই। আমরা আশা করি, বিশ্বাস রাখি, আমাদের নূতন মন্ত্রীগণ, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় রাজ্যের কংগ্রেস-কলঙ্কিত প্রশাসনক্ষেত্রে নূতন এক শ্রীকল্যাণময় শুদ্ধ আদর্শ এবং জীবন্ত কর্মধারা প্রবর্ত্তন করিতে অবশ্যই সকল সার্থকতা লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের সকল শুভ-প্রচেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গের সকলজন সর্ব্ব সহযোগিতাও দান করিবেন, কোন প্রকার অনাবশ্যক চাঞ্চল্য কিংবা সমাজ-জীবনে ঘোলাজলের প্লাবন সৃষ্টির কু-প্রয়াস হইতেও বিরত থাকিবেন।

নূতন রাজ্য-মন্ত্রীসভা ঘোষণা করিয়াছেন—যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এ রাজ্যের সকল প্রশাসনিক কার্য্যাদি বাঙ্গলার মাধ্যমেই নির্ব্বাহিত করার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—বিগত কংগ্রেসী রাজের আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী মুখে বাঙ্গলা ভাষার জয়গান করিলেও—এ রাজ্যে বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড়ে অনাবশ্যক হিন্দী চাপাইবার জন্য যে প্রকার উৎকট উৎসাহের সঙ্গে কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহার তুলনা ভারতের অহিন্দী ভাষী অন্য কোন রাজ্যে পাওয়া যাইবে না। দিল্লীর হিন্দী ভাষী মালিকদের তোষণ করিতেই যে এ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা যে কোন মূর্খ লোকও সহজেই বুঝিবে।

বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রীদের ৫ম শ্রেণী হইতেই হিন্দীকে করা হইল অবশ্য পাঠ্য। এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্‌দের যুক্তি, প্রতিবাদ বিগত মন্ত্রীমণ্ডলীর দীর্ঘকর্ণ কোন গো-পণ্ডিতই গ্রাহ্য করেন নাই, বিশেষ করিয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। ইঁহাকে কোন্ বিশেষ গুণের জন্য, কি অতুলনীয় বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া কংগ্রেসী প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রিত্ব পদে বরণ করিলেন তাহা বলিতে পারিবেন একমাত্র তিনিই।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীতে যাহার উপর শিক্ষা-দপ্তরের ভার অর্পিত হইয়াছে, তিনি বয়সে নবীন, শিক্ষিত। কেবল ইহাই নহে, ছাত্রসমাজ নূতন শিক্ষা মন্ত্রীকে শ্রদ্ধা করেন ভালবাসেন এবং তাঁহার উপর যথেষ্ট আস্থাও রাখেন। জ্যোতিবাবু ছাত্রদের সামনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ভরসা রাখেন, কারণ তিনি মনে প্রাণে ছাত্রসমাজের পরম হিতৈষী, একান্ত আপনজন। আমাদেরও বিশ্বাস আছে যে—জ্যোতি-বাবুর আমলে কোনপ্রকার ছাত্রবিক্ষোভ কিংবা অযথা আন্দোলন ঘটিবে না। সেরকম কিছু ঘটিবার উপক্রম হইলে নূতন শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রদের মধ্যে গিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইবেন এবং যে কোন সমস্যার সহজ সমাধান করিতে অবশ্যই সক্ষম হইবেন, পুলিশ লেলাইয়া দিয়া তিনি ছাত্র-আন্দোলন দমনের অপচেষ্টা কদাচ করিবেন না।

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আবেদন এই যে, তিনি অবিলম্বে এ রাজ্যের পাঠ্যক্রম হইতে হিন্দীকে তুলিয়া দিন। হিন্দীকে 'আবশ্যিক' পাঠ্যক্রমের মধ্যে বজায় রাখিয়া বাঙ্গালা ছাত্রছাত্রীদের অযথা ভারগ্রস্ত করিয়া, তাহাদের সহজ বিদ্যাশিক্ষার পথে কোন প্রকার অযথা অপ্রয়োজনীয় বাধার সৃষ্টি যাহাতে আর না হয়, মন্ত্রী মহাশয় দয়া করিয়া সেই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করুন। হিন্দী যাহারা সখ করিয়া শিখিতে চায়, তাহাদের কেহ

বাধা দিবে না, কিন্তু হিন্দীর জবরদস্তি এবার এবং শেষ বারের মত বন্ধ করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলিতে বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের কি ভাবে তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করা হইতে জোর করিয়া বঞ্চিত করা হইতেছে, সে বিষয় মন্ত্রী মহাশয় বেশী দূরে না গিয়া পাশের হিন্দী ভাষী রাজ্যের স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং হিন্দীর দাপট সম্পর্কে সহজেই সংবাদ লইতে পারেন। কথিত রাজ্যে হাজার হাজার বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীকে একান্ত বাধ্য হইয়াই হিন্দী শিখিতে হইতেছে। ঐ রাজ্যের বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদেরও—ছাত্র না হইয়াও হিন্দীর পরীক্ষায় পাশ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে এবং ইহা না করিতে পারিলে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িতেছে। এমন কি, চাকরীর স্থায়িত্ব হয়ত না থাকিতে পারে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এমন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা নাই, কখনও হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের ছাত্রছাত্রী তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সকল সুযোগ পাইয়া থাকে। কিন্তু কাছাকাছি কয়েকটি রাজ্যে বাঙ্গালী ছাত্রদের ভাগ্যে কেবল বিড়ম্বনা ছাড়া পরে কিছু জুটে না। চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী—ভিন্নরাজ্যের বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয়, এবং যাহাতে তাঁহারা বাঙ্গলার মাধ্যমে পড়াশুনা করিতে পারে, সে ব্যবস্থাও হয়ত করিতে পারিবেন, বিশেষ করিয়া ঐ সব রাজ্যে এখন কংগ্রেসী অরাজকত্ব যখন শেষ হইয়াছে। কংগ্রেসী রাজ থাকিলে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর প্রতি কোন করুণার আশা আমরা করিতাম না, করুণার ভিখারীও হইতাম না।

ভারতের সংহতির সংহারে হিন্দীর অবদান

জনকয়েক হিন্দী-প্রেমিকের গায়ের জোরে হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার বিষম অপ-প্রয়াসের বিষম বিষময়-ফল ফলিয়াছে এবারের নির্ব্বাচনে। স্বয়ং কংগ্রেসাধিপতি শ্রীকামরাজ তরুণ ছাত্রনেতা শ্রীনিবাসনের নিকট পরাজিত হইয়া নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আশ্রয় লইয়াছেন হস্তিনাপুরের নিরাপদ আশ্রয়ে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিবাসন ঘোষণা করেন যে তিনি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবেন এবং তাঁহাকে পরাজিতও করিবেন। যুবক ছাত্রনেতা তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন এবং ইহার জন্ত তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ কামরাজকেও আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পরাজয় হিন্দীর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতে তথা সমস্ত অহিন্দী রাজ্যে, জনগণের সমর্থনের পরিমাণ কি তাহা সহজে অনুমেয়। মাদ্রাজে 'ডি এম কে'র অদ্ভুত সাফল্য এই একই কারণে বলা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পূর্ব্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি মত, নানা টালবাহানা করিয়া, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সংবিধানের নির্দ্দেশ আজ পর্য্যন্ত সংশোধন ত করেনই নাই, উপরন্ত আরো নানাভাবে গোপন পথে সর্ব্বত্র হিন্দীর অনুপ্রবেশ ঘটাইবার সর্ব্ব-প্রকার অপপ্রয়াস এবং অনাচারের আশ্রয় লইতে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ করেন নাই। শ্রীনন্দা এই কার্য্যে পরম তৎপরতা প্রদর্শন করেন। হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলিতে, বলিতে গেলে হিন্দী ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল ভাষাকেই উদ্বাস্তু করিয়া দিয়াছেন। মাত্র ১৩ কোটি লোকের ভাষাকে ৪০ কোটি লোকের উপর জোর জবরদস্তি করিয়া চাপাইবার অপপ্রয়াসের ফল কি হয়, এবার তাহা প্রকট হইতেছে। ভারতের সংহতি রক্ষার নামে হিন্দী চালাইবার অপচেষ্টা আজ ভারতের সংহতি-সংহার করিবার উপক্রম করিয়াছে—অনতি-বিলম্বে—যদি হিন্দী প্রচার প্রয়াস প্রতিরোধ করা না হয়, তাহা হইলে এমন দিন আসিতে বিলম্ব হইবে না যখন এই অর্দ্ধ-পক্ক ভাষা ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া—আবার তিনশত বৎসর পিছাইয়া দিবে। ভারত আবার ১৫।১৬টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়া—বিদেশী শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির শিকারক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

হিন্দীর উপর আমাদের 'কোন প্রকার বিরাগ বা

বিরুদ্ধভাব নাই, কিন্তু হিন্দীকে যদি জোর করিয়া, বাধ্যতামূলক ভাবে আমাদের "শাসক"-ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করা হয়, তখন হিন্দীকে প্রতিরোধ করাকে আমরাও বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অবশ্যই বাধ্য হইব! ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তি চলিবে না।

হিন্দী সম্পর্কে কেন্দ্র সরকারের হুকুম এবার আর বিশেষ কার্য্যকর হইবে না, কারণ ভারতের ৮।৯টি রাজ্য নির্বাচনের কল্যাণে কংগ্রেসী অপশাসন মুক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বেকার মত কেন্দ্রের ন্যায়-অন্যায় সকল কিছু ফতোয়াই নত-মস্তকে 'জো-হুজুর' বলিয়া তামিল করিবে না। এতদিন কেন্দ্রীয় মধ্যমণিদের ধারণা ছিল, ভারতের রাজ্য-সরকারগুলি—যে হেতু কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা অধিকৃত, সেই হেতু কংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলিও কেন্দ্রের অধীন সর্ব্বতোভাবে এবং কেন্দ্র সরকার রাজ্য-সরকারগুলিকে তাহাদের ভৃত্য বলিয়া অবশ্যই মনে করিয়া সেই মত আচরণও তাহাদের সহিত করিতে পারে, করিতে ছিলও।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি, এখন আশা করা যায়, পূর্ণমাত্রায় তাহাদের 'অটোনমি' অর্জ্জন এবং যথাযথ প্রয়োগও করিবে। বিশেষ কয়েকটি 'বিষয়' ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যাপারে রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে রাজ্য-শাসনের। অবশ্য ভারতের ঐক্য এবং অখণ্ডতার পরিপন্থী কোন কিছু করার অধিকার রাজ্যগুলির (এমন কি কেন্দ্রেরও) থাকিবে না, নাইও, বলা বাহুল্য। আমরা আশা করি পশ্চিমবঙ্গের নূতন সংযুক্তদলীয় সরকার, প্রাক্তন কংগ্রেসী রাজ্য সরকারের মত কেন্দ্রের কংগ্রেসী-সরকারের আজ্ঞাবহ ভৃত্যবৎ আচরণ করিবেন না এবং রাজ্যের, রাজ্যবাসীর তথা দেশের কল্যাণকর সর্ব্ববিধ ক্রিয়া-কর্ম্মে তাঁহারা কেবল তৎপর নহে সদা-সক্রিয়ও থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলে কেন্দ্র সরকারকে—রাজ্য-সরকারের সঙ্গে 'বিহেভ' করিতেও শিক্ষা দানে বিরত রহিবেন না। রাজ্যের সীমিত স্বাধীনতা যেন কোন প্রকারে কেন্দ্র ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে—সে দিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন।

শ্রমিক তথা শ্রম-ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন?

পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তদলীয় সরকার (ইউ-এফ) প্রতিষ্ঠিত হইবার পরদিন হইতে শ্রমিক-মহলে একটা 'মানসিক' পরিবর্ত্তন চোখে পড়িতেছে। শ্রমিক-মহল মনে করিতেছেন—নূতন সরকার একান্তভাবে তাঁহাদেরই এবং ন্যায় অন্যায় যাহাই হউক না কেন, শ্রমিকদের দাবি এই সরকার, কেবল গ্রাহ্য নহে, পূরণ করিতে বাধ্য। 'ইউ-এফ' সরকার শাসনভার হাতে লইবার পর হইতে এ রাজ্যে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা এবং কাছাকাছি অঞ্চলের কল-কারখানা এবং অন্যবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য বহু প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষকে 'ঘেরাও" এবং প্রয়োজনমত উত্তম মধ্যম শিক্ষাদানও বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। শ্রম-হাঙ্গামা মিটাইতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। শ্রম হাঙ্গামা মিটাইতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য-শ্রম মন্ত্রী মহাশয়কে অকুস্থানে হাজির হইয়া অবস্থা আয়ত্তে আনিতে হইয়াছে। শ্রমিক-মহলে এবং ইউনিয়ন কর্ণধার মহাশয়দের মনের এই পরিবর্ত্তন ভাল কি মন্দ সে বিচার আমাদের দায়িত্ব নহে—কিন্তু ইহার ফলে বিভিন্ন শিল্প-মহলের কর্তৃপক্ষ এবং মালিকদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে,—ভীতিরও সঞ্চার হইয়াছে। যাহাতে এই রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারী, বিশেষ করিয়া যেসব শিল্পগুলি অবাঙ্গালী মালিকানার অধীন, এ রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হইবার অশুভ আশঙ্কা কার্য্যকর হইতে পারে।

অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের মনে এই ধারণা হইয়া থাকিতে পারে (হয়ত ভুল) শ্রম বিরোধ দেখা দিলে মালিক পক্ষ কোন প্রকার সাহায্য কিংবা সরকারী 'প্রোটেকশন'—তাঁহারা পাইতেন না।

শিল্পপতিদের এই ধারণা যে সত্যই ভুল তাহা তাঁহাদের বুঝাইয়া বিশ্বাস করাইতে হইবে। কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক মালিকের মধ্যে—বিশ্বাস এবং এক পক্ষের উপর অন্য পক্ষের শ্রদ্ধাও থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে শ্রমিকপক্ষ—এ যাবত সকলক্ষেত্রে সুবিচার পায় নাই, একান্ত ন্যায্য দাবীগুলি এমন কি বাঁচিবার পক্ষে

ন্যূনতম যে মজুরী তাহাদের প্রাপ্য—তাহা দিতেও মালিকপক্ষ (সামান্য কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) সহজে রাজী হয়েন নাই, এখনও বহুক্ষেত্রে হইতেছেন না। এই ব্যবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার প্রয়োজন, আশা করি নূতন শ্রমমন্ত্রী (শুনিয়াছি কিছুদিন পূর্ব্বে বিশেষ একটি ট্রেড ইউনিয়নের সহিত জড়িত ছিলেন)—এ বিষয় তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

শ্রমিকদেরও একটি কথা সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে—তাঁহাদের কর্ত্তব্যে কোন প্রকার অবহেলায় কিংবা দাবী আদায়ের জন্য অযথা হাঙ্গামার প্রয়াসও বন্ধ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সরকার যখন শ্রমিক মালিকের সর্ব্ব প্রকার বিরোধ আপোষ-আলোচনার দ্বারা মিটাইবার সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতেছেন, সেই অবস্থায় অযথা কলহ বিবাদের দ্বারা কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

আর একটি বিষয়ে সকলকে সাবধান থাকিতে হইবে। বর্ত্তমান-বিরোধী দলের উস্কানী যাহাতে শ্রম-বিরোধের কারণ হইয়া না দাঁড়ায় সেই বিষয় বারান্তরে এ-আলোচনা করিব। শিল্পক্ষেত্রে অবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে আর বিলম্ব করা অনুচিত। শ্রমিক মালিকের সম্পর্কও বিরোধের না হইয়া—মধুরতর করিবার সকল প্রয়াসও একান্ত প্রয়োজন।

যাঁদের করি নমস্কার (১১)

অপরেশ ভট্টাচার্য

শীতের সন্ধ্যা। আপন মনে হেঁটে চলেছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড ধরে। এণ্টালী-বাজার ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেয়েছি। হঠাৎ চমকে উঠলুম, কানে ভেসে এল একটা অস্পষ্ট স্বর—প্রাণে তা' করল আঘাত—"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে।" দাঁড়িয়ে পড়লুম। চোখ ফেরালুম, চোখে পড়ল 'সিমেট্রি' (সমাধিস্থান)। সেই সুরে আবার ভেসে এল এক অস্পষ্ট ধ্বনি তরঙ্গ—"তিষ্ঠ ক্ষণকাল"। স্বর অস্পষ্ট কিন্তু অপরিচিত নয় কারণ 'জন্ম মম বঙ্গে'। মনে পড়ল এই ধ্বনি তরঙ্গই একদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সঞ্চার করেছিল উদ্দাম প্রাণ-বন্যা, চোদ্দ অক্ষরে বন্দিনীর কাব্যবীণায় তুলেছিল উদাত্ত স্বর-ঝঙ্কার। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম—গিয়ে দাঁড়ালুম একটি সমাধি স্তম্ভের পাশে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল সেই অস্পষ্ট ধ্বনি তরঙ্গ—

> "দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
> বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
> (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
> বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
> দত্তকুলোদ্ভব কবি—শ্রীমধুসূদন।
> যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
> জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
> রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

শব্দতরঙ্গ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল বহুদিন আগের এক দৃশ্য। সে দৃশ্যের নায়ক এক তরুণ-কিশোর ছেলে। ডাগর-ডাগর দুটি চোখ, টানা-টানা ভুরু আর মাথা ভরতি একরাশ ঢেউ খেলানো চুল। মায়া-ভরা ঢল ঢল মুখ। আর তাকে ঘিরে বসেছে তারই সমবয়সী আর পাঁচটা কচি কিশোর। কখনো চলেছে গল্প বলার পালা। আর কখনো বা গানের পরে গান। গল্প সুরু করার আগে একবার বলে নেয় সে—"অমুকের কাছে শোনা"। কিন্তু কারও কাছে শোনা গল্প সেগুলো তার নয়। "অমুকের কাছে শোনা" বলে না নিলে পাছে সঙ্গীরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে—তাই ও কথা বলা। নিজেই মুখে মুখে বলে যেত গল্পের পর গল্প। আর সঙ্গীরা আপন মনে মশগুল হয়ে শুনত সেসব গল্প। গল্প শুনতে শুনতে কখনও তাদের চোখগুলি উত্তেজনায়, আবেগে ড্যাব ড্যাবে হয়ে উঠত—কখনও বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে শুনত সে সব গল্প। গানের বেলাও ঠিক তাই। কোন জায়গা ভুলে গেলেও কোন অসুবিধা ছিল না তার। সঙ্গে সঙ্গেই মুখে মুখে তৈরী হয়ে যেত বাকীটুকু।

বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলায় এত পটু যে ছেলে, সে কিন্তু নিজে বিপদে পড়ে কোনদিন বানিয়ে কিছু বলতে পারেনি। মিথ্যার আড়াল দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাও সে কোনদিন করেনি। আর করেনি বলেই খেজুর গাছের মাথায়-চড়া সেই ছেলেটির কান্নায় সেদিন গ্রামের লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। সে ভারী মজার কাণ্ড। পরামর্শটা ছিল তার এক খুড়তুতো ভায়ের। চুরি করে খেজুর রস খাবার পরামর্শ। যেমন পরামর্শ তেমনি কাজ। দু'জনে ত গিয়ে উঠল খেজুর গাছের

রাখার। আর কাছেই ছিল সেই খেজুর গাছের মালিক। ধর ধর' বলে সে এল তাড়া করে। খুড়তুতো ভা টি ত সঙ্গে সঙ্গেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে পিঠটান। সেই ছেলেটি কিন্তু পালাল না। পালাতে চাইল না। অথচ ভয় হয়েছে খুব। তাই গাছের উপর বসেই কান্না জুড়ে দিল। ভীষণ কান্না। কান্না শুনতে পেয়ে ছুটে এল বাড়ীর চাকর—আর গাছ থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে বাড়ী গেল শেষে।

ছেলেটি গল্পও বলত, গানও গাইত ঠিকই—কিন্তু তার সব চাইতে বেশী মন ছিল পড়াশুনায়। মা-বাবার একমাত্র ছেলে। খুবই আদুরে ছেলে। অবস্থাও ছিল খুব ভাল। কিন্তু কোন কছুতেই তার পড়াশুনার ত্রুটি হয়নি কোনদিন। ছেলের জন্য সকালে ভাত চাপানো হত পাঁচ সাতটা হাঁড়িতে, পাঁচ সাতটা উনুনে, চান করে এলে যেন সুসিদ্ধ এবং গরম ভাত খেতে পায়। কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন—তার কিন্তু এ সব দিকে মোটে নজর ছিল না। যা হক কিছু হলেই হল তার। এমন কি কোন কোন দিন আধা সেদ্ধ ঝোল তরকারী দিয়ে খেয়েও সে গিয়ে সবার আগে হাজির দিত পাঠশালায়। বাড়ীর আর পাঁচটা ছেলে যখন তারই সঙ্গে বসে "এটা দাও, সেটা দাও, ও টা খাব সেটা খাব" করে তুল-কালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত তখনও কিন্তু সে দিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ থাকত না। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার প্রতি তার ছিল সব চাটতে বেশী অনুরাগ এবং সবার সেরা হবার স্বপ্ন আর অমর হবার সাধ।

এ স্বপ্ন, এ সাধ তাঁর সফল হয়েছে। অমর হয়েছেন তিনি। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, বাঙালী জাতি থাকবে ততদিন শ্রীমধুসূদনও থাকবেন অমর। তারই হাতে প্রাণ পেল বাংলা নাটক। তিনিই ঘুচালেন কাব্যসরস্বতীর বন্ধন-দশা। অমিত্রাক্ষর ছন্দের করলেন সৃষ্টি। রচনা করলেন মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ।" অভিনন্দিত হলেন মহাকবি শ্রীমধুসূদন। বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকল—

"দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।"
"জন্ম মম বঙ্গে, তোমা জানাই প্রণতি।"

সমস্যা

প্রভাকর মাঝি

মস্ত একটা ক্যাসাদে পড়েছি—যাকে বলে ভারি সমস্যা যে—
কেবল ভাবছি, ভাবছি কেবল পাচ্ছিনে কূল কিনারা যে।
ভাখ্ রে ক্যাবলা, নানান কেতাব ডাঁই হয়ে আছে চারদিকে,
কেউ যদি গেছে সমস্যাটার হদিস কোথাও কিছু লিখে।
হঠাৎ কোথাও পেয়ে যাই যদি একটু সূত্র এই নিয়ে,
নতুন রাস্তা বের করবই বাঁধানো সড়ক ছেড়ে দিয়ে।
সমাধান যদি করতে পারি রে সমস্যাটার খেটে খুটে,
তুই দেখে নিস এখানে ওখানে সব দিকে যাবে নাম ছুটে।
ঘোড়-বড়ি-খাড়া অঙ্ক ভূগোল হিন্দী তখন সব গত
খেতাব মিলবে গবেষক শ্রী, নেহাৎ ডি. ফিল. অন্ততঃ।
কত মালা অভিনন্দন সহ মানুষ আসবে সার দিয়ে
তুই হতভাগা, তখনও মরবি জ্যামিতির থিয়োরেম নিয়ে।
খেতেও বসতে দিন রাত্তির তাই চিন্তার জাল বুনি,
কোন্ মুখ দিয়ে লঙ্কার রাজা রাবণ খেত যে শুক্তুনি?

কথার মূল্য

(এল. পান্তেলইয়েভ)

ভাবানুলেখন : শ্রীআশাবরী চৌধুরী

গ্রীষ্মের এক সুন্দর বিকেলে পার্কে বসে পড়ছিলুম। চমৎকার বই! এত তন্ময় হয়ে ডুবে গেছি বইতে যে কখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে বুঝতেই পারিনি। শেষে যখন চোখ ঠিকরেও আর পড়তে পারি না—তখন হুঁশ হয়েছে। বই বন্ধ করে গেটের কাছে এলুম।

সন্ধ্যাবেলা। পার্ক তখন খালি হয়ে এসেছে। রাস্তার আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। গাছপালার আড়ালে মালীর ঘণ্টার টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পার্ক বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে পা চালিয়ে চললুম। হঠাৎ চলা থেমে গেল আমার—কে যেন কাঁদছে ঝোপের আড়ালে।

ঝোপঝাড়ের আঁকাবাঁকা পথে একটু যেতেই নজরে পড়ল অন্ধকারে সাদা ধপধপে একটা পাথরের ছাউনি। তার দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি সাত আট বছরের ছেলে—ফুলেফুলে কাঁদছে সে।

ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'কি হয়েছে খোকা? কাঁদছ কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয় পেয়ে ছেলেটি কান্না গিলে ফেলে মাথা তুলে আমায় দেখে বললে—'ও কিছু নয়।' 'কিছু নয়ত কাঁদছিলে কেন? তোমায় কেউ কিছু বলেছে?' 'না।'

'বাঃ! কাঁদছ কেন তবে?'

ওর কথা বলতে তখনও অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ তখনও ওর মাঝে মাঝে ফোঁপানি এসে পড়ছিল। ও কেবলই ঢোঁক গিলে আর নাক টেনে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। বললুম—'চলো এখান থেকে। দেখছ না—সন্ধ্যা হয়ে গেছে—এখুনি পার্কের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।' বলে ওর হাত ধরতে গেলুম।

কিন্তু তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে ছেলেটি বললে—'না না, আমি যাব না! যেতে পারি না'।

'কেন পারো না?'

'না, না আমি যেতে পারব না।

'কেন বল ত? কি হয়েছে তোমার?'

'কিছু না।' ও উত্তর দিল।

'বলই না ভাই। কি হয়েছে তোমার শরীর খারাপ?'

'না। শরীর ভাল আছে।'

'তবে? এখান থেকে যাবে না কেন?'

সে বললে 'আমি একজন প্রহরী।'

'প্রহরী? কি প্রহরী, কিসের প্রহরী?'

'উঃ, আপনি কিছু বোঝেন না কেন? বুঝতে পারছেন না আমরা যে খেলচি।'

'কার সঙ্গে খেলচো?'

চুপ করে থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও বলল 'জানি না।'

এবার আমি সত্যিই ভাবলুম সত্যিই ছেলেটি অসুস্থ, বোধহয় ওর মাথারই গোলমাল।

বললুম—'ভাই শোন! তুমি বলছ কি? তুমি খেলচো বলছ অথচ জান না কার সঙ্গে খেলছ? কি করে এটা হয়?'

ছেলেটি জবাব দিল—'হ্যাঁ, সত্যিই আমি জানি না। আমি এই পার্কের ঐ বেঞ্চিটাতে বসেছিলুম—এমন সময় কয়েকটি বড় বড় ছেলে এসে আমায় বলল—'এই, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলবি?' আমি বললুম 'খেলব।' খেলা শুরু করে ওরা আমায় বললে 'তুই একজন সার্জেণ্ট বুঝলি?' তারপর খেলার দলের সেনাপতি একটি মোটাসোটা

বড় ছেলে আমায় এইখানে নিয়ে এসে বললে—'এইটে হচ্ছে বারুদ ঘর আর তুই হলি এর প্রহরী। এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি—যতক্ষণ না আর কারুকে পাঠাই।' আমি রাজী হলে সেনাপতি বললে 'কথা দে যে তোর জায়গা ছেড়ে যাবি না?'

'তাই নাকি? তারপর?'

'তখন আমি বললুম 'কথা দিচ্ছি যাব না।'

'তারপর?'

'তারপর দেখুন না! এই আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ত রয়েছিই—ওদের কোন পাত্তা নেই।' আর একটা ফোঁপানি শোনা যায়!

হেসে ফেলে বলি—'তাই নাকি? অনেকক্ষণ চলে গেছে তারা সবাই।

'বেশ বেলা ছিল তখন।'

'কোথায় গেছে তারা দেখেছ?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল ওর—'বোধহয় চলেই গেছে একেবারে।'

'তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন শুধু শুধু?'

'কথা দিয়েছি যে...'

হাসতে গিয়েও হাসতে পারলুম না। হাসবার ত কিছুই নেই—ছেলেটি ঠিকই করেছে। কথা যখন দিয়েছে তখন কথা রাখতে হবেই যে করে হোক। খেলাই হোক আর সত্যিই হোক—কথার মূল্য সমানই।

আমি বললুম—'তাহলে এই ব্যাপার? এখন কি করবে তুমি তাহলে?'

'জানিনে!' ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওকে কি করে সাহায্য করি এই হল আমার ভাবনা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কি সাহায্য করব ভেবে পাইনে। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে যে বুড়ো ছেলেগুলি পালিয়েছে—সেই গর্দভগুলিকে এখন কোথায় পাই? এতক্ষণ নিশ্চয় তারা খেয়েদেয়ে ঘুম দিচ্ছে আর এই বেচারী ছোট্ট ছেলে পাহারা দিয়ে দিয়ে হয়রাণ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে শীতে খালিপেটে।

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে—না ভাই? জিজ্ঞাসা করলুম।

'হ্যাঁ ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

তখন একটু ভেবে বললুম—'আচ্ছা এক কাজ করা যাক।

আমার সঙ্গে ডিউটি বদল করে তুমি বাড়ী চলে যাও, আমি এবার বারুদ-ঘর পাহারা দিচ্ছি।'

'তা কি হয়?' ও একটু ভেবে বলল।

'কেন?'

'আপনি ত সৈন্য নন।'

মাথা চুলকে বললুম—তা' ঠিক বটে। আমি তোমায় পাহারা ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিতে পারি না। তোমার ওপরওয়ালা কোন সৈন্যই কেবল তা পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ভাবলুম কেবল একজন সৈন্যই বেচারি ছেলেটিকে ঐ মারাত্মক কথার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কেমন করে? একজন সৈন্যকে খুঁজে পেতেই হবে।

ওকে একটু দাঁড়াতে বলে আমি আবার তাড়াতাড়ি পা চালালুম। দরজা তখনও বন্ধ হয়নি। "মালি ঘন্টা বাজাতে বাজাতে তখনও পার্কের ধারে ধারে ঘুরছে।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। একজন সৈন্যও কি যাবে না এ পথে? কিন্তু এমনই কপাল যে সৈন্য এক জনকেও যেতে দেখি না পথে।

শেষকালে ট্রাম রাস্তার এক পাশে দেখি অশ্বারোহী সৈন্যের লালফিতা-মার্কা টুপি মাথায় একজন এগিয়ে চলেছেন। মনে হল এত খুসী বুঝি জীবনে হইনি। পড়ি কি মরি করে ছুটলুম সেদিকে। হঠাৎ হতাশ হয়ে দেখি একখানি ট্রাম এসে থেমেছে আর অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে অশ্বারোহীদলের তরুণ মেজরটিও গাড়ীর পা-দানিতে উঠে পড়েছেন। ছুটে গিয়ে আমি তাঁর হাত ধরে চেঁচিয়ে বললুম—'কমরেড মেজর। একটু দাঁড়ান, কমরেড মেজর।'

খুব আশ্চর্য হয়ে পিছু ফিরে ভদ্রলোক বললেন—'কি ব্যাপার?'

বললুম—'শুনুন সব ব্যাপারটা। —ঐ পার্কে মালীর ঝুঁপের কাছে একটি ছোট ছেলে পাহারা দিচ্ছে। যেতে পারছে না কেন না সে কথা দিয়েছে। খুব ছোট্ট সে। সে কাঁদছে।

মেজর সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু যখন একটু বিশদভাবে তাঁকে সব ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলুম তখন বিনা দ্বিধায় তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—'চলুন, চলুন—আগে বলতে হয়, চলুন, চলুন।

ফিরে এসে দেখি পার্কের মালী তখন গেটে তালা দিচ্ছে। একটি ছেলেকে ফেলে গেছি বলে তাকে একটু দাঁড়াতে বললুম। মেজরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকলাম। বেশ কষ্ট করে অন্ধকারের মধ্যে সাদা ঘরটি খুঁজে পেলুম আমরা। সেই যেমনকার তেমন ছেলেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে—আবার কাঁদছেও, তবে এবার খুব চুপিচুপি। ওকে ডাক দিতে ও খুসী হয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো। বললুম—'এই দেখ ভাই। আমি এবার মেজর সাহেবকে নিয়ে এসেছি।'

অফিসারকে দেখেই ছেলেটি খাড়া হয়ে বুক ফুলিয়ে বেশ একটু যেন লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেজর বললেন 'কমরেড রক্ষী' আপনার পদ কি?'

'আমি একজন সার্জেণ্ট।' ছেলেটি বললে।

'কমরেড সার্জেণ্ট, আপনি যেতে পারেন, এই আদেশ দিচ্ছি।'

ছেলেটি চুপ করে থেকে, নাকটি তুলে বললে. 'আপনি কে? আপনার জামায় কটা তারা আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না।'

আমি একজন মেজর।'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি স্যালিউট করে বললে—

'আচ্ছা কমরেড মেজর। আপনার আদেশমত আমি পাহারা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

এমন গম্ভীর সজাগ স্বরে সে কথাগুলো বললে যে আমরা আর হাসি চাপতে পারলুম না। ছেলেটিও হাসল মন খুলে। পার্কের গেট পেরোতেই মালী তালা বন্ধ করে দিল। মেজর বললেন, 'ছোট্ট কমরেড সার্জেণ্ট, তোমার মত ছেলে থেকেই তৈরী হবে সত্যিকারের সৈনিক। 'বিদায়।' অস্ফুটভাবে কি যেন বলে ছেলেটি উত্তর দিল 'বিদায়।' মেজর বিদায় নিয়ে ট্রামে উঠলেন। তখন ছেলেটির সঙ্গে করমর্দন করে বললুম—তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব।

না, ধন্যবাদ। আমি কাছেই থাকি। ভয় করছে না আমার।' ওর দিকে চেয়ে আমার মনে হল সত্যিই ওর কোন কিছুতেই ভয় নেই। যে ছেলের এত মনের জোর আর এত দাম কথার—সে অন্ধকার, কি জন্তু, কি অন্য কোন ভয়ঙ্কর জিনিষকেও ভয় করতে পারে না।

আর যখন ও বড় হবে? কি ওর পেশা হবে জানিনে তবে নিঃসন্দেহে সে সাচ্চা মানুষ হবে।

ভেবে ভারী আনন্দ হল—পরিচিত হলুম এমন এক ছেলের সঙ্গে!

আনন্দ আর আন্তরিকতাভরে আর একবার ওর করমর্দন করলুম।

———

শ্রী অশোক সেন

নির্বোধের স্বীকারোক্তি

আজ তারিখটা ছিল ১লা মে। সমস্ত দরকারী ডকুমেণ্টস সই করা হয়ে গেছিল। ঠিক করা হয়েছিল যে কাল বাদে পরশু ব্যারনেস এখান থেকে রওনা হবেন। হঠাৎ ব্যারনেস এসে হাজির—আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তিনি বললেন: এখন আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার—আমাকে গ্রহণ কর। এর আগে আমরা কখনও বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করি নি, তাই আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তিনি কি বলতে চাইলেন। আমার ছোট্ট এ্যাটিকটিতে দুজনে বসে রইলাম, বিষণ্ণ এবং চিন্তাচ্ছন্ন মনে। আজ আমাদের মধ্যে আর কোন ব্যাপারেই কোন বাধা নেই, কিন্তু ব্যারনেস সম্বন্ধে প্রলুব্ধ হবার ভাবটাও যেন মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল। আমার এই উদাসীনতার জন্য তিনি আমাকে অনুযোগ দিতে শুরু করলেন—কিন্তু তার পরেই যখন আমি তাঁর তরঙ্গায়িত দেহসৌন্দর্যের মাধুর্যের আস্বাদনে মত্ত হয়ে উঠলাম, অমনি ব্যারনেস আমাকে অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্ত বলে দোষারোপ করতে লাগলেন। এএক অদ্ভুত ধরণের নারী।

আসলে তিনি চাইছিলেন আমি তাঁকে খুব প্রশংসা করি—তাঁর দেহমনকে উত্তেজিত করে তুলি।

এরপর তিনি হিষ্টিরিয়া রুগীর মত আচরণ করতে লাগলেন, আমি আর তাঁকে ভালবাসিনা বলে অনুযোগ দিলেন। আধঘণ্টা ধরে তাঁকে তোষামোদ করলাম, তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগ দেখালাম, এরপর তিনি শান্ত হলেন। অবশ্য হতাশায় আমার চোখে জল না আসা পর্যন্ত ব্যারনেস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন নি। তারপর আমাকে নিয়ে তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করলেন। যত আমাকে অবনমিত করেন, যত আমি তাঁর পদতলে জানু পেতে বসি, অর্থাৎ যত আমি নিজেকে তাঁর কাছে ছোট করি এবং নামিয়ে আনি, সেই অনুপাতেই তাঁর স্নেহ এবং প্রেম যেন আমার উপর উথলে পড়তে লাগল। আসলে আমার ভেতর পৌরুষ এবং দৃঢ়মনোভাব দেখলেই ব্যারনেস আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করতেন। তার ভালবাসা পাবার জন্য আমাকে ভাণ করতে হোত আমি যেন অত্যন্ত হতভাগ্য এবং দুর্বল যাতে তিনি সহজেই নিজেকে আমার থেকে অনেক বেশী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করতে পারেন এবং ক্ষুদ্র জননীর ভূমিকা নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন।

আমার ঘরেই দুজনে সাপার খেলাম। তিনিই খাবার তৈরী করে টেবিল সাজালেন। খাওয়ার পর আমি প্রেমিকের প্রাপ্য সব কিছু তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিলাম—ব্যারনেস এ ব্যাপারে কোন বাধা দিলেন না।

ভালবাসা জিনিসটার ভেতর কি একটা অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তি আছে। প্রেমের মাদকতায় আমাদের দুজনেরই দেহমন যেন যৌবনরসে কানায় কানায় ভরে উঠল। একজন যুবতী নারী আমার বাহুবন্ধনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন—থেকে থেকে তাঁর সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল—আমাদের দেহমন থেকে পাশবিকতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়ে একটা কোমল মাধুর্যে ভরে গেল। আমি জোর গলায় বলতে পারি, নরনারীর আত্মিক মিলনের পরমক্ষণে তাদের ভেতর আর কোন পাশবিকভাব থাকতে পারে না। কিন্তু একথা বলা ত সম্ভব হয় না কতোটা পর্যন্ত গিয়ে স্পিরিচুয়ালের পরিসমাপ্তি

ঘটে এবং আবার নরনারীর ভেতরকার পশুগুলো জেগে ওঠে।

আমি মৃদুস্বরে বললাম—প্রেমের ভেতর দিয়েই নরনারী জীবনের সার্থকতা লাভ করে। ঈশ্বরের অপার মহিমা, যে এত দুঃখ কষ্টের ভেতরও যৌন প্রেমের অনুভূতির ভেতর দিয়ে মানুষ স্বর্গসুখ উপলব্ধি করতে পারে।

ব্যারনেস কোন জবাব দিলেন না, বেশ বুঝতে পারছিলাম যে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তাঁর তীব্র বাসনার দিকটাও যেন সংহত হয়ে গিয়েছিল। চুম্বনে চুম্বনে আমি তার সারা দেহে যেন উষ্ণ রক্তস্রোতের প্রবাহ সৃষ্টি করছিলাম—তাঁর গালদুটি টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর বয়স ষোল বছরের বেশী নয়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নরম কোমল ঢেউ-খেলানো দেহের ভেতর থেকে যেন ছন্দ এবং সঙ্গীত বিস্ফুরিত হচ্ছিল।

সোফাতে তিনি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় হেলান দিয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন একজন দেবী, আর আমি তাঁর পূজারী। আড়চোখে মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছিলেন যেন কিছুটা লজ্জিত, আবার আমার ভেতর কামনার বহ্নি জাগিয়ে তোলবার ইচ্ছাটাও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতিভাত হচ্ছিল।

মনে মনে ভাবছিলাম—এই মহিলাকে তাঁর স্বামী দূরে সরিয়ে রেখেছেন—সুতরাং এঁর আর ঐ স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—ইনি স্বামীকে আর কোনদিক দিয়েই আনন্দ দিতে পারছেন না। ব্যারন এখন স্ত্রীকে মোটেই সুন্দরী বলে মনে করেন না। আমারই উপর দায়িত্ব পড়েছে ফুলটিকে ফুটিয়ে তোলবার, সেই প্রস্ফুটিত ফুলটির অসাধারণ সৌন্দর্য দেহমন দিয়ে অনুভব করবার যোগ্যতা ক'জনেরই বা আছে।

মধ্যরাত্রির ঘণ্টাধ্বনি হল। এবার বিদায়ের পালা! ব্যারনেসকে বাড়ী অবধি পৌঁছিয়ে দিলাম। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল আমার বাড়ীতে চাবি ফেলে এসেছেন। অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। সামনের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম—ভাবছিলাম ব্যারন এসে দরজা খুলে দেবেন এবং বিশ্রীভাবে আমাদের গালাগাল দিতে শুরু করবেন। তখন কিভাবে ব্যারনেসকে আড়ালে রেখে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করবো মনে মনে তারই তালিম দিচ্ছিলাম। কিন্তু দরজা খুললো এসে একটি ভৃত্য। পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে আমি রাস্তায় এসে পড়লাম এবং বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

আমি যে তাঁর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এরপর থেকে সেকথা ব্যারনেস বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার সুযোগ নিয়ে আমার ভালবাসার যে অপব্যবহার তিনি করলেন তা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

আজ ব্যারনেস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্বামীকে প্রশংসা করবার ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ম্যাটিলডা চলে যাবার পর ব্যারন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ব্যারনেস কিছুদিন পরে যখন ইকহয়ে যান তাঁকে স্টেশনে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য ব্যারনকে আসতে রাজী করেছিলেন। ব্যারনেসের ইচ্ছানুসারেই তাঁর স্বামী এবং আমি দুজনেই স্টেশনে গিয়েছিলাম। ব্যারনেস বলেছিলেন, এ না করলে লোকে হয়তো মনে করবে তিনি স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমটায় এভাবে আসতে আমি রাজী হইনি। ব্যারনেস আমাকে বোঝাতে লাগলেন, ব্যারনের আমার উপর আর কোন রাগ নেই, আমাকে বাড়ীতে গ্রহণ করতেও তাঁর আপত্তি নেই, এবং আমাদের সম্বন্ধে গুজব-প্রচার বন্ধ করতে হলে আমার এবং ব্যারনের একসঙ্গে কয়েকদিন সহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। ব্যারনের দিকটা ভেবে আমি এ প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলাম।

ব্যারনকে আমরা এভাবে অপমান করতে পারিনা—বলেছিলাম আমি।

ব্যারনেস উত্তর দিয়েছিলেন—এর সঙ্গে আমার সন্তানের সম্মানের প্রশ্নটাও জড়িত।

ব্যারনের সম্মানের কি কানাকড়িও মূল্য নেই!

ব্যারনেস হো হো করে হেসে উঠে বুঝিয়ে দিলেন কারো কোন সম্মানের কোন দামই তাঁর কাছে নেই। এমন ভাব দেখালেন যেন আমার চিন্তাধারাটাই উল্টো।

উত্তেজিত ভাবে এবং ঘৃণাপূর্ণ স্বরে আমি চীৎকার করে উঠলাম—তোমার ব্যবহার ক্রমশঃ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তুমি আমাদের সবাইকেই নীচে নামিয়ে আনছ। অপমান করছ!

এবার ব্যারনেস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। সে কান্নাও সহজে থামে না—শেষ পর্যন্ত তাঁকে শান্ত করবার জন্য আমাকে কথা দিতে হল যে তাঁর নির্দেশমতই আমি চলব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারলাম আমার এবং তাঁর স্বামীর তুলনায় ব্যারনেসের মনের জোর অনেক বেশী। আমাদের দুজনকেই তিনি নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোচ্ছেন। কিন্তু কেন আমাদের দুজনের ভেতর মিলন ঘটাতে চাইছিলেন? তিনি কি ভয় পাচ্ছিলেন এরপর আমরা মারাত্মক অস্ত্রযুদ্ধে লিপ্ত হব? অথবা আমাদের সম্পর্কটা সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে?……

আবার তাদের সেই বিষাদাচ্ছন্ন বাড়ীতে আমাকে যেতে হল—ব্যারনেসের খেয়াল মেটাতে সেই ধরণের শাস্তিও আমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হল। কিন্তু তাঁর স্বভাবটাই ছিল নির্দয় ধরণের এবং অহঙ্কারী—অন্যের মনের অবস্থার কথা ভেবে কাজ করার মত ধৈর্য তাঁর চরিত্রে ছিল না। আমার কাছ থেকে তিনি এখন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে, তাঁর স্বামী এবং তাঁর কাজিনের অবৈধ সম্পর্কের কথা কখনও উঠলে আমাকে বলতে হবে এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি এ কথা বললেই নাকি তাঁদের পরিবারকে নিয়ে কোন কলঙ্ক রটাবার উপায় কেউ খুঁজে পাবে না। ব্যারনের বাড়ীতে শেষবারের মত গেলাম—ধীর পদক্ষেপে এবং কম্পিত হৃদয়ে।

তাঁদের বাড়ীর ছোট্ট বাগানটি নানা ফুলে ফলে এবং সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করে রেখেছিল। আমি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম তাঁর মেয়েটি পরিত্যক্ত অবস্থায় একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার পরিচর্যার ভার একজন চাকরের উপর—তার পড়াশুনার ব্যাপারে

নজর রাখবার মতনও আর কেউ নেই। আমার মানসপটে আরও ভেসে উঠল মেয়েটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে, এখন সে বাস্তব জীবনের অনেক কথাই বুঝতে শিখেছে, একদিন সে জানতে পারবে তার মা শৈশবে তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন।

ব্যারনেস এসে সামনের দরজা খুলে দিলেন এবং আমি ভেতরে ঢুকলে দরজার আড়ালের আবরণে আমাকে চুম্বন করলেন। ভেতর থেকে একটা ঘৃণার ভাব এসে আমার মনটা তিক্ততায় ভরে দিল—ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলাম। আমার মনে হচ্ছিল বাড়ীর ঝি-চাকরেরা যেমন বাড়ীর পেছন দিকের দরজার কাছে গিয়ে লুকিয়ে ওষ্ঠ চুম্বনের দ্বারা দেহের ক্ষুধা মেটায়, ব্যারনেসের আচরণেও সেই জাতীয় পাশবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে যৌনক্ষুধা মেটাবার প্রচেষ্টা—শিক্ষা, দীক্ষা, সামাজিক কৌলিন্য সব কিছু বিস্মৃত হয়ে ব্যারনেস যেন শিশুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন এই সময়টায়।

ব্যারনেস এমন একটা ভাব করলেন যেন আমি ড্রয়িং-রুমে ঢুকতে চাইছি না এবং উচ্চকণ্ঠে আমাকে অনুরোধ করলেন ভেতরে যেতে—আমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম এবং ইতঃস্তত করতে শুরু করলাম—ভাবছিলাম ফিরে যাই। এমন সময় তাঁর চোখের দিকে তাকালাম—তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ফুটে বের হচ্ছিল—সেই মুহূর্তে আমার মন থেকে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ অন্তর্হিত হল। তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে সম্মোহিত করে ফেলল—আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

দুজনে বসে গল্প করবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু এই অবস্থায় গল্প জমানো অত্যন্ত কষ্টকর। ব্যারন ডাইনিং-রুমে কি সব চিঠিপত্র লিখছিলেন—শুনলাম তিনি এরপর এ ঘরে আমার সঙ্গে বসে দেখা করবেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল - চমকে চোখ তুলে তাকালাম। না, ব্যারন নয়—তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকেছে—আমার দিকে এগিয়ে এসে সে তার কপালটা আমার মুখের কাছে তুলে ধরল—যাতে আমি তার কপালে চুমো খেয়ে আদর করি। লজ্জায় সঙ্কোচে, বিরক্তিতে আমার সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল। ব্যারনেসের দিকে তাকিয়ে বললাম—"এই ধরণের একটা বিশ্রী পরিস্থিতির ভেতর আমাকে টেনে না আনলেও পারতে।"

কিন্তু আমার কথার মর্মার্থ গ্রহণ করবার মত মনের ক্ষমতা ব্যারনেসের ছিল না।

"মা-মণি চলে যাচ্ছেন ফেরবার সময় তোমার জন্য অনেক খেলনা নিয়ে আসবেন"—বললে শিশুটি। নিজের কাছেই নিজেকে যে কত ছোট লাগছিল কি বলব।

এরপর ব্যারন এসে ঘরে ঢুকলেন (আমার দিকে তিনি এগিয়ে এলেন—দেখেই বোঝা যাচ্ছিল অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন—চোখদুটি হতাশায় ভরা, সারা মুখে একটা বিষাদাচ্ছন্নভাব। তাঁর এই বেদনাহত চেহারা দেখে আমি সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে রইলাম—কারণ আমার মনে হচ্ছিল এই অবস্থায় কোন কিছু না বলাটাই সর্বদিক থেকে শ্রেয়—একমাত্র এই ভাবেই তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি দেখানো যাবে। এরপর ব্যারন আবার উঠে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছিল। বাড়ীর পরিচারিকা এসে ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে গেল। তার ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ওই ঘরে আমার উপস্থিতিটা নজরেই নিল না। খাবারের সময় হওয়াতে আমি উঠতে চাইলাম—কিন্তু ব্যারনেসের সঙ্গে ব্যারনও এমন সনির্বন্ধ ভাবে আমাকে তাঁদের সঙ্গে খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন এবং পিড়াপিড়ি শুরু করলেন যে আমার পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না।

এরপর আমরা সাপার খেতে বসলাম—আমরা তিনজন—যেমন অতীতের দিনগুলোতে তিনজনে বসতাম। আমাদের জীবনে এতাবৎ যা ঘটেছে সেই সব নিয়ে আলোচনা শুরু হল—এজন্য আসলে কে দোষী? কেউ না! ভবিতব্য বা পারস্পরিক কয়েকটি ঘটনা আলাদা আলাদা ভাবে দেখলে যেগুলিকে মনে হয় অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার? আমরা পরস্পরের প্রতি আজীবন আনুগত্যের বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম, একে অন্যের স্বাস্থ্যপান এবং করমর্দন করলাম—মনে হচ্ছিল আমরা যেন আবার সেই অতীতের ঘনিষ্ঠতার দিনগুলিতে ফিরে গেছি। আমাদের

ভেতর এক ব্যারনেসই স্বাভাবিকতা বজায় রেখে উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি পরের দিনের প্রোগ্রামও ঠিক করে ফেললেন—সহরের কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াব, ষ্টেশনে একসঙ্গে মিলব ইত্যাদি, আমরা তাঁর সব প্রস্তাবেই সম্মতি জানালাম।

শেষ পর্যন্ত যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। ব্যারন আমাদের সঙ্গে ড্রয়িং-রুম অবধি এলেন। সেখানে তিনি ব্যারনেসের হাতটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন :

"আপনি এঁর সত্যিকার বন্ধু হন। আমার ভূমিকার অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। ওঁর যত্ন করবেন, পৃথিবীর সমস্ত ঝড়ঝাপটার আঘাত থেকে ওঁকে আড়াল করে রাখবেন, ওঁর প্রতিভার যথাযথ স্ফুরণে সাহায্য করবেন। এ বিষয়ে আপনি আমার থেকে যোগ্যতর ব্যক্তি—কারণ মানুষ হিসাবে আমি ত সামান্য একজন সৈনিক। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।"

এরপর ব্যারন উঠে গেলেন এবং আমরা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ থাকলেন না।

ব্যারন কি সরলভাবেই ঐ সব কথাগুলো বলেছিলেন? তখনও ঐ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল এবং ভবিষ্যতেও বহুবার এক প্রশ্নই মনে এসেছে। তিনি যে সেন্টিমেন্টাল প্রকৃতির এবং আমাদের তাঁর ভাল লাগে সেকথাও আমি জানতাম। সে কারণেই বোধহয়, তাঁর সন্তানের জননী কোন শত্রুর হাতে না পড়ে, তাঁর পছন্দমত একজনের

কাছে চলে যাচ্ছেন এ চিন্তাটা তাঁকে খানিকটা সান্ত্বনা দিয়েছিল।

… … …

সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আমি সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের বড় হল-ঘরটিতে পায়চারি করছিলাম। কোপেনহেগেনের ট্রেন ৬-১৫ মিনিটে ছাড়বে—অথচ ব্যারন বা ব্যারনেস কারোরই দেখা নেই। অবশেষে শেষ মুহূর্তে ব্যারনেস এসে হাজির। তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন উন্মাদ হয়ে গেছেন। ব্যারনের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—"পুরোদস্তর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে। কথা দিয়ে কথা রাখল না। ও আসবে না।"

—এত জোরে কথাগুলো বললেন যে আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছিল তারা ফিরে তাকাল।

তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা পরিতাপের বিষয় হলেও ব্যারনের এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। তাই বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—

"উনি ঠিক কাজই করেছেন। যার সামান্য বুদ্ধি আছে সেই ওঁর এ কাজের সমর্থন করবে।"

"তাড়াতাড়ি করে একটা কপেনহেগেনের টিকেট কিনে নেও নিজের জন্য। তা না হলে আমিও এখানে থেকেই যাব"—বললেন ব্যারনেস।

"না, না তা হতে পারে না—ব্যাপারটা তা হলে একটা ইলোপমেন্টের মত মনে হবে—কাল সকালের ভেতরই এ কাহিনী সারা ষ্টকহল্‌ম্‌ সহরে ছড়িয়ে যাবে।"

"আমি তাতে ভয় পাই না…তাড়াতাড়ি কর।"

"না! আমি যাব না!"

সেই মুহূর্তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যারনেসের প্রতি একটা করুণার ভাবে মনটা ভরে উঠল—বুঝতে পারছিলাম পরিস্থিতিটা ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠছে—একটা ঝগড়া বাধবার পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম।

ব্যারনেসও যেন ব্যাপারটা ভেতর থেকে অনুভব করে, আমার হাত দুটি ধরে অনুরাগভরে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন—এরপরও আর নিজেকে দৃঢ় রাখতে পারলাম না—মনে দ্বিধা এল—শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলাম……

বললাম—"ক্যাটরিণহোম অবধি যাব—তার বেশী নয়।"

"তোমার কথাই রইল—ওই পর্যন্তই না হয় চল।"

বেশ বুঝতে পারলাম আমার দৃঢ়তার অভাবে সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল – নিজের সম্মান, সুনাম পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম। এই ট্রেন-জার্নিটা যে আমার পক্ষে কতটা বেদনাদায়ক হবে ব্যারনেস তার কি বুঝবেন।

ট্রেন ছাড়ল—আমরা দুজনে একটি ফার্ষ্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে বসেছিলাম—আর কোন যাত্রী এই কামরায় ছিলেন না। ব্যারন না আসাতে আমরা দুজনেই মন-মরা হয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ একটা বিশ্রী নীরবতা বিরাজ করল তারপর ব্যারনেস বললেন ঃ

"এ্যাক্সেল, তুমি বোধহয় আর আমাকে ভালবাস না।"

"হয়ত তোমার কথাই ঠিক—একমাস ধরে তুমি যে সব গোলমালের সৃষ্টি করছ তার ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি।

"অথচ আমি তোমার জন্য সব কিছু বিসর্জন দিয়েছি"—বললেন ব্যারনেস।

এরপর শুরু হল অবিরাম অশ্রুবর্ষণ।

কি চমৎকার ওয়েডিং টুর। আমি নিজের মনকে শক্ত করে নিলাম। একটা উদাসীন এবং অনাসক্ত ভাব নিয়ে বললাম—

"উদ্দাম ভাবাবেগকে সংযত করবার চেষ্টা কর। আজ থেকে সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু দেখতে শেখ। তুমি ঠিক বুদ্ধিমতী মহিলা নও—অথচ আমি তোমাকে শাসকের মত, সম্রাজ্ঞীর মত সম্মান দেখিয়ে এসেছি। আমি এতদিন নির্বিচারে তোমার আজ্ঞা পালন করে এসেছি, কারণ আমি মনে করতাম আমাদের দুজনের মধ্যে আমিই বেশী দুর্বলচিত্ত। এ আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। যা ঘটেছে তার জন্য একা আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অপরাধী কে? তুমি? আমি? ব্যারন? কাজিন? অথবা তোমার সেই ফিনিশ বান্ধবী?

কিন্তু ব্যারণেসের চিন্তাধারাটা ছিল স্বার্থপরতাদুষ্ট—নিজের বিবেকের দংশন এড়াবার জন্য তিনি সমস্ত অপরাধের জন্য আমাকেই দায়ী করতে লাগলেন।

এরপর আর কথা বলা চলেনা। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। তারপর ব্যারনেসের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে

লাগলাম? সত্যিই কি তাঁর সমস্ত দায়িত্ব, তাঁর ভবিষ্যতের সন্তানাদি, তাঁর মা, আণ্ট, অর্থাৎ তাঁর পরিবারের সমস্ত ভার আমারই উপর?

আমাকেই তাঁর মঞ্চাভিনয়ের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তাঁর সমস্ত দুঃখ হতাশা, অসাফল্য—সব কিছুর সমাধান খুঁজে দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে প্রেম করেছিলাম বলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকিয়ে দিতে হবে!

ব্যারনেস নির্বাকভাবে একই জায়গায় বসে রইলেন। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজল। আর এক ঘণ্টা বাদে আমি নেমে যাব।

আমি মনকে দৃঢ় করে রাখলাম—ব্যারনেসের চোখের জলে আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না। আমি জানি নিজের ব্যক্তিত্বকে তাঁর কাছে অবনমিত করলেই তাঁর ভালবাসা পাওয়া যাবে নচেৎ নয়।

ট্রেণ এবার ষ্টেশনে এসে থামল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ব্যারনেস আমাকে চুম্বন করলেন—এ যেন সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহবর্ষণের মতন। গাড়ি থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম—শেষ বিদায় নিতে না নিতে ট্রেণ আবার ছেড়ে দিল।

এতক্ষণে যেন নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। মুক্তির আনন্দ অনুভব করলাম। কিন্তু এ মুক্তি অতি স্বল্পসময়ের জন্য। গ্রামের পান্থশালায় এসে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা হতাশায় ভরে গেল। ব্যারনেসের ট্রেণ ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে অনুভব করলাম যে আমি তাঁকে ভালবাসি—গভীরভাবে সমগ্র দেহমন দিয়ে। আমাদের প্রথম আলাপের দিনগুলোর মধুর স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে উঠছিল।

এই অদ্ভুত রহস্যময়ী মহিলাই আমার স্ত্রী হবার একমাত্র যোগ্য রমণী! কাগজ, কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম—ব্যারনেসকে জানালাম যে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে আনন্দময় করে তোলবার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।

প্রতিভাদীপ্ত শিল্পীর জীবনের পতনের ইতিহাসের এই হচ্ছে প্রথম পর্ব।

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :

ফরম্‌ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১।	প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২।	কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩।	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৪।	প্রকাশকের নাম	ঐ
	জাতি	ঐ
	ঠিকানা	ঐ
৫।	সম্পাদকের নাম	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
৬।	(ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা এবং (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ২। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৩। শ্রীমতী সুনন্দা দাস, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৪। শ্রীমতী ইশিতা দত্ত, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৫। শ্রীমতী নন্দিতা সেন, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৬। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৭। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৮। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়, ৩এ এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৯। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ১০। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—১৫।৩।১৯৬৭ ইং

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত

রুশ সাহিত্যের রূপরেখা : গোপাল হালদার। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য টাঃ ১০·০০।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার পাঠক-মহলে সুপরিচিত। বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ। ইতঃপূর্বে তাঁর বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস বেরিয়েছে। এবারে রুশ সাহিত্যের ইতিহাস। তাঁর লেখার গুণে ইতিহাস শুধু তথ্যসমৃদ্ধ নয়, সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত হয়েছে। যদিও ইংরেজী বইয়ের সাহায্য তিনি নিয়েছেন, তবু তাঁর জ্ঞান নিতান্ত দূর থেকে নয়। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ওদেশে গিয়েছেন, বৎসরাধিক কাল মস্কো শহরে থেকেছেন এবং পুশ্‌কিন-ভবনে রুশ সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন।

বইখানি যদিও 'রূপ-রেখা', তবু এতে প্রয়োজনীয় সব খবরই আছে। কুড়িটি পরিচ্ছেদে, ৩৭৪ পৃষ্ঠায়, তিনি প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। পুরোণো যুগের কথা প্রথম পরিচ্ছেদেই শেষ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ শতক, যখন সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম পদ-সঞ্চার। প্রারম্ভে রুশ ভাষার জন্ম ও কুলপরিচয় দেওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে। গোগল, তুর্গেনেভ, দস্তোয়েভস্কি, তলস্তয় প্রভৃতির প্রধান গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ তাঁদের বৈশিষ্ট্য বোঝবার সহায়ক হবে।

সাহিত্যরসিক দেখে খুশী হবেন, লেখক ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। স্তালিন-যুগে সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা লোপ এবং পরবর্তী-কালে তাঁদের মুক্তি প্রচেষ্টার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। পাস্তেরনাক, শলোখভ, এহ্রেনবুর্গ প্রভৃতির ভাব ও রচনারীতির বিশ্লেষণ এবং নবীনতর লেখকদের প্রচেষ্টা ও প্রবণতার বিবরণ বইখানিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। প্রধান লেখকদের সুমুদ্রিত চিত্রগুলি এবং গ্রন্থের বহিঃসজ্জা শোভন ও রুচিসঙ্গত।

অশোক সেন

আজাদ হিন্দ নেতাজী : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১৭। মূল্য কুড়ি টাকা।

স্বপ্ন-বিলাসী সুভাষচন্দ্র একদা ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ধর্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধ করা পাপ নয়। তাই সুভাষচন্দ্র অহিংস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও, হিংসার পথ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

"ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চক্ষে কেবল ভাসে
যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়—ধর্মেই পরকাশে"

নেতাজীর কর্ম-জীবনে সেই ধর্মেরই অনুস্মৃতি দেখিতে পাই। মহাকাব্য রচনার কোন কালাকাল নাই, অতিমানব যাঁরা তাঁদের জীবনই মহাকাব্যে রচিত।

'আজাদ হিন্দ নেতাজী' গ্রন্থে শুধু যুদ্ধের কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয় নাই, মহাভারতের মতই ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, তুলনামূলক বিবিধ শৌর্য-বীর্যের কাহিনী—বিশেষ করিয়া ভারত-দর্শনের মূল তত্ত্ব ইহার মর্মকথা।

'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনেও দেখিতে পাই, রাজনীতির প্রভাব নেতাজীকে ভারতধর্ম হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। আর সেই জন্যই তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল সর্বধর্ম সমন্বয়ের।

"নেতাজীর বোধে সর্বমানব-মৈত্রীর সুমধুর
চেতনায় জাগে নব ভারতের সৃষ্টির অঙ্কুর—
নেতাজীর বোধে সকল ধর্মে সত্যেই ভগবান
তাই নেতাজীর সার্বভৌম ধর্মে দৃষ্টিপাত ।।"

কালীপদ ভট্টাচার্য জাত-কবি। নহিলে ছন্দে সুরে এমন করিয়া নেতাজীকে বাঁধিতে পারিতেন না। ইতিহাস যেন ধরা দিয়াছে তাঁহার এই মহাকাব্যে। এই সঙ্গে কবিকে অভিনন্দিত করি : অমর হোক তাঁর লেখনী।

অঘটনের পূর্বরাগ : শ্রীদিলীপকুমার রায়, হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুনা-১৬। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য নয় টাকা। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭৩ সাল।

বাংলা উপন্যাসে দিলীপকুমারের আবির্ভাব একটি নতুন পথের প্রথম পথিকরূপে, যাকে আন্তর্জাতিক উপন্যাস বলা যায় তিনিই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে তার প্রথম প্রবর্তক। অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্মালা দেবী—এঁরা পরবর্তীকালে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে কন্টিনেন্টাল মডেল বা মহাদেশীয় উপন্যাসেরও প্রবর্তনা তাঁর রচনায় কল্লোল যুগের আগেই—"দুধারা", "বহুবল্লভ" প্রভৃতি তার প্রমাণ।

প্রথম দিকে দিলীপকুমার বুদ্ধিজীবি অথচ সৌন্দর্যপ্রিয় ঔপন্যাসিকরূপে আবির্ভূত হন। ইনটেলেকচুয়াল রোমান্সে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। "মনের পরশ" ও "রঙের পরশ" তার প্রমাণ।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাওয়ার পর দিলীপকুমার অধ্যাত্মবাদী উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। পরবর্তীকালে আশ্রম ত্যাগের পর তিনি "অঘটন"-বর্গীয় কাহিনী রচনায় নিযুক্ত হন।' "গল্প কিন্তু গল্প নয়" উপন্যাসটি

তিনি আশ্রমে থাকাকালে রচনা করেন। এটিই হরিকৃষ্ণ মন্দিরে নব কলেবরে "অঘটনের পূর্বরাগ" আখ্যা লাভ করেছে।

অধ্যাত্মবাদী রোমান্স-রচনায় দিলীপকুমার যে সিদ্ধহস্ত, এই উপন্যাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংস্কৃতিদীপ্ত সৌন্দর্যরসিক মানসের পরিচয়ও ছত্রে ছত্রে। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অধিকার মন্ত্রী সাহেব চরিত্রকে উপলক্ষ করে অভিনব কৌতুকপ্রিয়তায় ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পীতবাস চরিত্র। সুন্দর ভক্তির স্বচ্ছ প্রকাশের একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। নায়ক অসিত দিলীপকুমার স্বয়ং, তা যে কোন পাঠক বুঝতে পারেন। দুটি নারী-চরিত্র দু রকমের: শমিতা ও মূর্ছনা। উপন্যাসিকের নারী-চরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অসামান্য। মূর্ছনা হয়ত হাই সোসাইটি গার্ল' ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু শমিতাও কি একটু ন্যাকা ধরনের নয়? এদের নিয়ে অধ্যাত্মজীবনে চলা দায়—নায়কের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। এটি এবছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা রোমান্টিক উপন্যাস।

উপন্যাসের নামকরণ সঙ্গত হয় নি। প্রতি উপন্যাসে "অঘটন" নাম সংযোজনা স্থূল বাণিজ্যবুদ্ধির দ্যোতক। লেখক প্রতি উপন্যাসকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করুন, এই আমাদের অভিমত।

শ্রীগোতম সেন

"এ্যারাউণ্ড দি চাইল্ড"

এটি কলিকাতার মন্টেসরীয়ান এসোসিয়শনের মুখপত্র এবং ডাঃ মারিয়া মন্টেসরীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর ৩১শে অগষ্ট তারিখে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণ এতটা সচেতন হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের কাছে আজ আর ম্যাডাম মারিয়া মন্টেসরীর এবং তাঁর উদ্ভাবিত শিশুশিক্ষা পদ্ধতির বিশেষ পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না।

মন্টেসরী প্রণালী অনুযায়ী শিশুশিক্ষা বিষয়ক তালিমের ব্যবস্থা কলিকাতায় প্রথম ১৯৫৪ সনে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রাথমিক চেষ্টা খুবই উৎসাহের সঞ্চার করে এবং তার ফলে পরে কয়েকবারই এরূপ তালিমের ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রথম তালিমী অনুষ্ঠানের পর এদেশের মন্টেসরী প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলের মধ্যে ভবিষ্যতে যাতে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আদান প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সনের অগষ্ট মাসে এঁদের এ্যাসোসিয়েশনটি গঠিত হয়।

এই এ্যাসোসিয়েশন গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মন্টেসরী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং আন্তর্জাতিক মন্টেসরী সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করা। ইহার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে মন্টেসরী প্রণালী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা এবং শিশু-শিক্ষার বিশেষ দাবী সম্বন্ধে প্রাপ্তবয়স্কদিগকে সচেতন করে তোলা। এই এ্যাসোসিয়শনের প্রয়াস ও উদ্যোগে কিছুকাল পরে পরে মন্টেসরী অনুমোদিত শিশু-শিক্ষার প্রণালী ও আসবাবের প্রদর্শনী, বক্তৃতা, আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া "শিশু-গৃহ" প্রতিষ্ঠার দ্বারা যাতে ক্রমেই অধিক সংখ্যক শিশু উপকৃত হতে পারে, সেই বিষয়েও এঁরা সচেষ্ট।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩